উপন্যাস

পূর্ব-পশ্চিম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড-সূচনা পর্ব 8
১ একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকা হয়েছে 9
২ বৈদ্যনাথধাম স্টেশনে দাঁড়িয়ে 19
৩ ভবদেব মজুমদারের আমলে 31
৪ বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে তুতুলকে 40
৫ দেশ বিভাগের পর দুটি নতুন দেশ 51
৬ ছাত্র বয়েসে প্রতাপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু 61
৭ মেঘনা নদী পার হয়ে দায়ুদকান্দি 70
৮ মালখানগরে প্রতাপদের বাড়ির সামনে 87
৯ সত্যেন ভাদুড়ীর গায়ের পাঞ্জাবী 103
১০ দুটো সাইকেল ভাড়া করা হয়েছে 114
১১ দুপুরবেলা নানা গল্পের মধ্যে 131
১২ জেল থেকে ফেরার পর 141
১৩ বাগানে নতুন গোলাপ চারা 150
১৪ ওপরতলায় নিজেদের অংশটায় 161

১৫ ঐ ছেলেটা মুসলমান বুঝি ১৭১
১৬ বন্যা হবার দরকার হয় না ১৮২
১৭ কলকাতার তালতলা অঞ্চল ১৯৪
১৮ বিমানবিহারীদের আদি বাড়ি ২০৬
১৯ পিকলু আর বাবলু এক স্কুলে পড়তো ২১৭
২০ তুতুল বাগবাজারের একটি স্কুলে ২৩১
২১ সরকারি কর্মচারির চাকরি ২৪৩
২২ বঙ্কুবিহারীর স্ত্রী এলিজাবেথ ২৫৪
২৩ একটা মোটরবাইক চেপে হাজির ২৬৬
২৪ হারীত মণ্ডলকে নিয়ে ত্রিদিব ২৭৭
২৫ বাড়িতে অসময়ে কোনো অতিথি এসে ২৮৯
২৬ প্রতাপ সিগারেট খেতে খেতে ২৯৮
২৭ ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেল প্রতাপের ৩০৭
২৮ কলকাতার ভদ্রলোকদের বাড়িতে ঝি-চাকর ৩১৭
২৯ প্রীতিলতার হাঁপানির টান বেড়েছে ৩২৮
৩০ ট্রেনে আসবার সময়ে ৩৩৯
৩১ স্বাধীনতার কয়েক বছর পর ৩৫০
৩২ ঢাকার সেগুনবাগানে মামুনের এক দিদির বাড়ি ৩৬২

৩৩ বেশ তাড়াতাড়িই শীত পড়ে গেছে ৩৭৭
৩৪ দেওঘরে প্রতাপকে থেকে যেতে হলো ৩৯১
৩৫ মোহনবাগান লেনে চন্দ্রাদের বাড়ি ৪০৫
৩৬ মোটর বাইকের গর্জনে পাড়া কাঁপিয়ে ৪১৯
৩৭ অল ওয়েভ রেডিও ৪৩৫
৩৮ কানু যে ব্যাঙ্কে কাজ করে ৪৪৮
৩৯ কলেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে ৪৬৩
৪০ দেওঘরে এসে উপস্থিত হলেন সত্যেন ৪৭৮
৪১ পাতিপুকুরের বাড়ির ভিত তৈরির কাজ ৪৯০
৪২ কানুর বাড়ির ছাদের আলসেতে ৫০২
৪৩ পাড়ার কয়েকটি ছেলে ধরাধরি করে ৫১৫
৪৪ আর্মানিটোলার পিকচার প্যালেস ৫২৮
৪৫ পাড়াটির নাম বাগবাজার ৫৪০
৪৬ একটা নড়বড়ে কাঠের টেবিল ৫৫৬
৪৭ আগের দিনই খবর দিয়ে ৫৭০
৪৮ নতুন বাড়ি ঠিক হলো কালীঘাটে ৫৮৫
যৌবন পর্ব ৬০৩
১ টানা তিন দিন বৃষ্টির পর ৬০৪

২ শেষ পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা.....৬১৮
৩ দুপুরবেলা প্রবল ঝড় হয়ে গেছে ৬৩২
৪ বাড়ির সামনে যে গেট ছিল ৬৪৬
৫ বাবুল বুঝতে পারেনি ৬৫৯
৬ খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছেন প্রতাপ.....৬৭১
৭ পাতিপুকুর স্টপে বাস থেকে নেমে.....৬৮৫
৮ গাড়ি ভাড়া করেছে আলতাফ ৬৯৮
৯ প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট দিয়ে ৭১১
১০ কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস.....৭২২
১১ রেল লাইনের ধারে.....৭৩২
১২ টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে ৭৪২
১৩ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ৭৫৩
১৪ কয়েকদিন এড়িয়ে এড়িয়ে চলার পর.....৭৬৪
১৫ মুড়ি ও তেলেভাজা খাওয়া ৭৭৬
১৬ অসুখ-বিসুখের ব্যাপার ৭৯০
১৭ টেবিলের ওপর জোর একটা চাপড় মেরে ৮০২
১৮ কফি হাউসে ঢোকার মুখে.....৮১৪
১৯ তিন তিনটে সাধারণ নির্বাচন.....৮৩১

২০ ভিত নেই তবু বাসস্থান গড়ে উঠেছে ৪৪২
২১ বৃষ্টির ছাঁট আসছে খুব ৪৫৪
২২ আদালতে প্রতাপ ৪৬৬
২৩ সীট রিজার্ভেশানের সুযোগ ৪৭৭
২৪ লোদি গার্ডেনসে ত্রিদিব আর সুলেখা ৪৮৭
২৫ পত্রিকার নাম নিয়ে আলাপ-আলোচনা ৯০৩
২৬ নোয়াখালিতে বসিরের বাড়ি ৯১৫
২৭ থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে ৯২৭
২৮ কবি জসিমউদ্দিনের বাড়িতে ৯৩৭
২৯ অতীনদের স্টাডি সার্কল ৯৪৭
৩০ আজকালকার যুদ্ধে ৯৫৭
৩১ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ৯৬৭
৩২ কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস ৯৮০
৩৩ টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে ৯৯৫
৩৪ মেডিক্যাল কলেজ থেকে বাড়ি ১০০৭
৩৫ নোয়াখালিতে সিরাজুল ১০২১
৩৬ স্টাডি সার্কল থেকে ১০৩৩
৩৭ তিনতলার এই ঘরখানি ১০৪৩

৩৮ আলপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ১০৫৬
৩৯ কয়েকদিনের জ্বরেই একেবারে কাবু ১০৭১
৪০ একটা ভিড়ের বাসে চেপে..... ১০৮৩
৪১ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এলাকা ছাড়িয়ে ১০৯৬
৪২ মামুনের মেজাজ খারাপ ১১০৯
৪৩ তুতুল একা একা..... ১১২৩
৪৪ ঝোঁকের মাথায় প্রতাপ..... ১১৩৫
৪৫ সন্ধ্যারতির সময় ভক্ত ও দর্শক ১১৪৪
৪৬ দোতলা থেকে কল্যাণী ডাকছেন ১১৬৩
৪৭ অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ১১৮১
৪৮ বড় তেঁতুল গাছ ১১৯৩
৪৯ স্টাডি সার্কেল শেষ হয়ে যাওয়ার পর ১২০৭
৫০ জানলায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে..... ১২২১
৫১ চায়ের কাপ তুলে একটা চুমুক..... ১২৩৩
৫২ আকাশে জোরে বিদ্যুৎ চমকালে ১২৪৪
৫৩ দিনের পর দিন কেটে যায় ১২৫৫
৫৪ করোনেশান ব্রীজের কাছে..... ১২৬৭
৫৫ তিনবার সিটি দিয়ে থেমে গেল ট্রেনটা..... ১২৮০

৫৬ সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে ১২৯৪
৫৭ তুতুলের খুব অস্বস্তি হয় ১৩০৭
৫৮ বছরের প্রথম দিনটি ১৩২৪
৫৯ পুরোনো গাড়িটার বদলে ১৩৩৮
৬০ অকস্মাৎ মামুনকে গ্রেফতার..... ১৩৪৯
৬১ লণ্ডন শহরে পা দিয়ে..... ১৩৬০
৬২ সারারাত ঘুমোতে পারেনি তুতুল ১৩৭৪
৬৩ ট্রাম ধর্মঘট মিটলো..... ১৩৮৪
৬৪ ট্রেন সাড়ে চার ঘণ্টা লেট ১৪০২
৬৫ শহরের সমস্ত লোক ১৪১৩
৬৬ সিঁড়ির মুখে ল্যান্ডলেডি..... ১৪২৫
৬৭ তুতুল যে সার্জারিতে কাজ করে ১৪৩৪
৬৮ পমপম একটা রেডিও রেখে গেছে ১৪৪৯

প্রথম খণ্ড- সূচনা পর্ব

১ একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকা হয়েছে

একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকা হয়েছে। লোকজন আর মালপত্র তো কম নয়, এক গাড়িতে আঁটানো মুশকিল। বেডিংটাই তো বিরাট। সতরঞ্চি মুড়ে সেটাকে বাঁধবার সময় প্রতাপ আর কানু দু'দিক দিয়ে দড়ি টেনেছে আর পিকলু বসে থেকেছে তার ওপর, তবু আয়তন বিশেষ কমেনি। এ ছাড়া একটা সুটকেস, একটা ট্রাংক আর বইপত্রের একটা মস্ত বড় পুঁটুলি। দুই টিফিন কেরিয়ার ভর্তি পরোটা আর আলুর দম।

মালপত্র সব চাপানো হলো ঘোড়ার গাড়ির ছাদে। বাবলুর ইচ্ছে সেও ছাদে বসে যাবে, কিন্তু প্রতাপ সে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। মালপত্র সামলাবার জন্য একজনকে ওপরে থাকতে হবে ঠিকই, সে দায়িত্ব দেওয়া হলো কানুকে। এত বড় বেডিংটা প্রতাপ, কানু আর গাড়ির কোচওয়ান মিলে ওপরে তুলতেই হিমসিম খেয়ে গেল।

রাত সাড়ে নটায় ট্রেন, সন্ধে ছটা থেকেই প্রতাপ বেরিয়ে পড়বার জন্য তাড়া দিচ্ছেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে ঘণ্টা দেড়েক লাগবে, আগে ভাগে গিয়ে ট্রেনে জায়গা দখল করতে হবে। কিন্তু মমতার আর খুঁটিনাটি কিছুতেই শেষ হয় না। রান্নাঘরের জানলাটা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না, সেটা তো আর খোলা রেখে যাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত কানু একটা নারকোল দড়ি দিয়ে জানলার পাল্লা দুটো বেঁধে দিল লোহার সিকের সঙ্গে। টেনে বাঁধতে গিয়ে হাত ছড়ে গেল কানুর, তবু সে হাসিমুখে বললো, বৌদি, তোমার আর কী সমস্যা আছে বলো!

মমতা বাবলুকে বললেন, তুই টিয়া পাখির খাঁচাটা ওপরে রাধুর কাছে দিয়ে আয়। আর এই আটআনা পয়সা দিবি, ও ছোলা কিনে দেবে।

বাবলু পাখির খাঁচাটা নিয়ে উঠে গেল তিনতলায়। টিয়া পাখিটা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাবলুর দিকে। যেন অভিযোগ করছে, আমায় তোমরা ফেলে চলে যাচ্ছো, বাঃ, বেশ!

বাবলুর অবশ্য পাখিটার ওপর কোনো মায়া নেই। অতি পাজি পাখি! একদিন বাবলুর আঙুল কামড়ে দিয়েছিল।

রাধু এখন নেই, ওপরের মাসিমা বললেন, তোদের যাওয়ার সময় হয়ে গেল; আমার জন্য কী আনবি রে, বাবলু? তোর মাকে আমার নামে পুজো দিতে বলেছি, মনে করিয়ে দিস,? যা, খাঁচাটা বারান্দায় টাঙিয়ে দিয়ে যা। আমি চান করে এসেছি, আমি এখন ছোঁবো না!

ওপরের মাসিমাদের অনেকগুলো পাখি। একপাশে বাবলু তার খাঁচাটা ঝুলিয়ে দিল। তারপর উঁকি দিয়ে দেখলো নিচের দিকে। মালপত্র সব তোলা হয়ে গেছে, এখন বাঁধাবাঁধি চলছে। ঘোড়াটার মুখে একটা কাপড়ের থলি, তার মধ্যেই ঘাস রয়েছে, মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সে ঘাস খাচ্ছে। চেকলুঙ্গি আর গেঞ্জি-পরা কোচওয়ানটি খুব রোগা, এত রোগা যে পিঠটা কুঁজো হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আছে একটা বাচ্চা ছেলে, বাবলুর থেকেও ঘোট, সে গাড়ির পেছনে দাঁড়ায়। ঐ জায়গাটার প্রতি বাবলুর বরাবর লোভ। আজ সে ওখানে দু'বার তিনবার বসে নিয়েছে। এটা তাদের নিজেদের ভাড়া করা গাড়ি, সে যতবার খুশী বসতে পারে। তাদের পাড়ার লালু প্রায়ই চলন্ত ঘোড়ার গাড়ির পেছনে বসে অনেকখানি যায়। তার দেখাদেখি বাবলু একদিন বসতে গিয়েছিল আর সেই গাড়ির কোচোয়ান পেছন দিকে ছপটি মেরেছিল।

গাড়ির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পিকলু ডাকছে, মা এসো। সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। বাবলুটা আবার গেল কোথায়?

পিকলু ফুল প্যান্ট পরেছে, তার ওপরে একটা চেন লাগানো গেঞ্জি। পিকলু হঠাৎ লম্বা হতে শুরু করেছে, কিছুদিন আগেও সে আর বাবলু প্রায় সমান সমান ছিল। একদিন চুল উল্টে আঁচড়েছিল পিকলু, তা দেখে মমতা বলেছিলেন, ছিঃ, ওকী করেছিস, একদম বখাটে ছেলেদের মতন দেখাচ্ছে! তোর বাবা দেখলে মাথা ন্যাড়া করে দেবে!

যাত্রা শুরু হলো পৌনে সাতটায়। বাগবাজার থেকে মণীন্দ্র কলেজের পাশ দিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ। মমতার পাশে বাবলু আর মমতার কোলে মুন্নি। উল্টোদিকে প্রতাপ আর পিকলু। বাবলু ছটফটে ছেলে, এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে পারে না, বারবার সে বাইরে উঁকিঝুঁকি মারছে। মাড়োয়ারিদের একটা বিয়ের মিছিল যাচ্ছে, প্রচুর আলো আর বাজনা, ঘোড়ার পিঠে বসে আছে জরির পোশাক পরা বর, তার কোমরে তলোয়ার, বাবলু অনেকখানি। মুখ ঝুঁকিয়ে দিতেই মমতা সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, এই, কী করছিস, মাথায় ধাক্কা খাবি তবে বুঝবি! দ্যাখ তো, দাদা কেমন চুপ করে বসে আছে।

পিকলু বললো, বাবলু, তুই আমার জায়গায় আসবি? এখানে বসে ভালো দেখা যাচ্ছে।

বাবলু তাতে রাজি নয়। মায়ের পাশ ছেড়ে সে বাবার পাশে যেতে চায় না। সেইজন্যই তো সে আগে থেকে গাড়িতে উঠে এই জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে।

প্রতাপ কোনো কথা বলছেন না, থুতনিটা উঁচু করে আছেন। তার মুখোনি গম্ভীর, বিষণ্ণ। যদিও সপরিবারে তিনি বেড়াতে যাচ্ছেন, তবু তার এখন মনে পড়ছে অন্য কথা।

প্রতাপ সজাগ হলেন হাওড়া ব্রিজের ওপর এসে। সাংঘাতিক ট্র্যাফিক জ্যাম। দশ মিনিটে এ গাড়ির ঘোড়া এক পা-ও এগোলো না। ওপর থেকে কানু বললো, সেজদা, সামনে একেবারে সলিড হয়ে আছে। কিছুই নড়ছে না।

প্রতাপ পাঞ্জাবির ঘড়ি-পকেট থেকে গোল ঘড়ি বার করে দেখলেন। যথেষ্ট সময় আছে এখনো। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। এত মালপত্র নিয়ে তো গাড়ি ছেড়ে হাঁটা যাবে না! তিনি বললেন, কানু, তুই আর পিলু বরং আগে চলে যা। ট্রেন ইন করলে উঠে জায়গা রাখবি।

পিকলু তড়াক করে নেমে পড়তেই বাবলু বললো, বাবা, আমিও যাবো!

প্রতাপ মাথা নেড়ে বললেন, না!

পিকলু আর কানু টিকিট আর দু-একটা ছোটখাটো মালপত্র নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। একটু পরেই বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো বাবলুর। যদি তারা শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে না পারে? দাদা আর কাকা চলে যাবে, না ফিরে আসবে? ওরা টিকিট নিয়ে গেছে, ওরা নিশ্চয়ই ট্রেন থেকে আর নামবে না।

প্রতাপ শান্ত ভাব বজায় রেখে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন, কিন্তু মমতা একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তাঁর ফর্সা মুখোনিতে সবরকম অভিব্যক্তি স্পষ্ট বোঝা যায়। বরং কখনো যেন বেশি বেশিই লাগে। একটা সিল্কের লাল পাড় শাড়ি পরেছেন মমতা, ঘোমটা নেমে গেছে, মুখের ওপর কয়েকটি চূর্ণ অলক। ব্রিজের ওপর নানারকম গাড়ি ঘোড়ার ভেঁপু ও মানুষের চিৎকারে। একটা বিচিত্র কলরোল।

মমতা আতঙ্কিতভাবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হবে? আমরা এইরকম চুপ করে বসে থাকবো?

প্রতাপ বললেন, কী করবো? এত মোটঘাট নিয়ে...অতবড় বেডিং নিতে আমি বারণ করেছিলাম না?

মমতা বললেন, শীতের জায়গায় যাচ্ছি, লেপ নিতে হবে না? তুমি কুলি ডাকো।

শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো। জ্যাম গলবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কুলিরা মওকা বুঝে স্টেশন ছেড়ে ব্রিজের ওপর এসেসব গাড়িতে মাথা গলাচ্ছে। আট আনা রেট, এখন তারা দেড় টাকার কমে যাবে না। তিনটি কুলির মাথায় চাপানো হলো সব কিছু। ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানটি কোনো দরাদরি করলো না, প্রতাপ তাকে একটি পাঁচ টাকার নোট দিতে সে লম্বা সেলাম দিয়ে বললো, যান বাবু, ভালো করে ঘুরে আসুন। কাশীর গাড়ি তো, পেয়ে যাবেন, চিন্তা নেই।

বাবলু ছুট লাগাতে যাচ্ছিল, প্রতাপ তাকে ধমক দিয়ে হাত চেপে ধরলেন। অতি দুরন্ত ছেলে, ভিড়ের মধ্যে একবার হারিয়ে গেলেই হয়েছে আর কি! কুলিদের ওপরেও নজর রাখতে হবে, ওরা মাথায় মোট নিয়েই বড্ড জোরে দৌড়োয়।

শীতের সময়টায় অনেকেই পশ্চিমে বেড়াতে যায়, তাই হাওড়া স্টেশনে প্রচুর জনসমাগম। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মে লেগে গেছে, কিন্তু চতুর্দিকে এত মানুষের মাথা যে কানু বা পিকলুকে দেখা যাচ্ছে না। কোন্ কামরায় উঠলো ওরা? ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস, থার্ড ক্লাস। এর মধ্যে থার্ড ক্লাসেই কোনো আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই, তার ফলে কুমড়ো গাদাগাদি অবস্থা। কোনো দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবার উপায় নেই। প্রত্যেকটা থার্ড। ক্লাস কম্পার্টমেন্টের কাছে গিয়ে প্রতাপ বেশ জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন, কানু! পিকলু!

শেষ পর্যন্ত একটা কামরার জানলা দিয়ে বেরিয়ে এলো পিকলুর হাত। সেটা যে-কোনো কিশোরের হাত হতে পারতো, কিন্তু মমতা দেখেই চিনলেন। নানারকম উৎকণ্ঠার মধ্যেও বাবলুর একটু ক্ষোভ হলো। দাদাটা বড়দের দলে চলে যাচ্ছে। তাকে ফেলে। এরপর কানুকাকার মতন দাদাও সিগারেট খেতে শিখবে।

বাবলু আর মুন্নিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো জানলা দিয়ে। তারপর শুরু হলো কুলিদের দাপট, দরজার কাছে এক তিল জায়গা নেই মনে হয়েছিল, তবু একটার পর একটা মালপত্র ঢুকে যেতে লাগলো, প্রকাণ্ড বেডিং-এর ধাক্কাতেই অনেকখানি ফাঁকা হয়ে যেতে প্রতাপ আর মমতা উঠে পড়লেন সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে।।

কানু ওপরের একটি বাঙ্কে শুয়ে পড়েছে, আর নিচের বেঞ্চে এক কোনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে পিকলু। তার অধিকৃত জায়গা সঙ্কুচিত হয়ে আসছে ক্রমশ। কোনোরকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে বাবলু বললো, আমি ওপরে ছাড়া কিছুতেই বসবো! আমি ওপরে যাবো!

সে চলে গেল ওপরে। মমতার নিজস্ব ছোট বাক্সটি রাখা হলো কানুর হেফাজতে। নিচের জায়গাটুকুতে মমতা আর প্রতাপ বসলেন কোনোক্রমে। এই নভেম্বর মাসেও কপালে ঘাম জমে গেছে। সামনে মানুষের দেয়াল, বিকিরিত হচ্ছে মানুষের শরীরের উত্তাপ। গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে এখনও।

প্রতাপের ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি দেহাতী স্ত্রীলোক, বুকের কাছে একটি বাচ্চা। বছর খানেক বয়েস হবে বাচ্চাটির, বেশ মোটকা সোটকা। স্ত্রীলোকটির শাড়ীটি মাটি বর্ণ, খুব সম্ভবত কলকাতা শহরে এরা মাটি বিক্রি করতে আসে। এই শ্রেণীর যাত্রীরা কখনো ট্রেনের টিকিট কাটে না। দৈবাৎ চেকার এলে এক টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দেয়।

প্রতাপ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সেই স্ত্রীলোকটিকে বললো, আপনি বসুন!

মমতা অবাক হলেও কিছু বললেন না। তিনি জানেন, তাঁর স্বামীর এই ধরনের উটকো ইচ্ছের প্রতিবাদ জানিয়ে কোনো লাভ নেই। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের দাঁড়িয়ে যাওয়ার অভ্যেস আছে। সারা রাত ঠায় দাঁড়িয়ে যেতে প্রতাপেরই কষ্ট হবে খুব।

স্ত্রীলোকটিও ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়েই রইলো। প্রতাপ আবার আদেশের সুরে গম্ভীরভাবে বললেন, আপ বৈঠিয়ে!

মমতার পাশের লোকটি এই সুযোগে কয়েক ইঞ্চি সরে আসছিল, প্রতাপ চোখ গরম করে তাকালেন তার দিকে।

দেহাতী স্ত্রীলোকটি তাতেও বসছিল না, মমতাকেই তখন তাঁর স্বামীর ইচ্ছা পূরণে সাহায্য করতে হলো। তিনি ঐ স্ত্রীলোকটির হাত ধরে টেনে নরম করে বললেন, তুম বৈঠো, বাবু ছোড়। দিয়া, তুমারা সাথমে বাচ্চা হ্যায়।

পিকলু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বাবা, আপনি এখানে আসুন!

প্রতাপ উদাসীনভাবে বললেন, না, তুই বোস।

মমতা পিকলুকে চোখের ইঙ্গিতে বসতে বলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রতাপের মনের অবস্থাটা তিনি অনেকটা বুঝতে পারছেন। পাঁচ-সাত বছর আগেও প্রতাপ ফাস্ট ক্লাস ছাড়া ট্রেনে চাপতেন না। গত পুজোর আগের পুজোয় খুলনা যাওয়া হয়েছিল সেকেণ্ড ক্লাসে। এবারেই প্রথম সপরিবারে তাঁর থার্ড ক্লাসে ওঠার অভিজ্ঞতা। এবারে দেওঘর যাওয়ার প্রস্তাব উঠতেই মমতা বলেছিলেন, থার্ড ক্লাসে যেতে তাঁর একটুও কষ্ট হবে না। ছেলে মেয়েদের কষ্ট? ওদেরও তো সব রকম অবস্থা সইয়ে নিতে হবে। এখন থেকেই শিখুক, তা হলে ভবিষ্যতে সব কিছু সহ্য করতে পারবে। ভবিষ্যৎটা যেন ক্রমশ পাতালের দিকেই নেমে যাচ্ছে।

প্রতাপের আত্মাভিমান প্রবল। তিনি বিলাসী নন, কষ্টসহিষ্ণু। প্রবল রোদের মধ্যেও তিনি। মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারেন। নুন দেওয়া ফেন ভাত আর আলু সেদ্ধ খেলেও তাঁর তৃপ্তি হয়। কিন্তু নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে তিনি তেমন আরাম-সম্ভোগ দিতে পারছেন না, যেমন তিনি নিজের বাবা-মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, এই চিন্তা তাঁকে পীড়া দেয়। মমতাও সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছেন, তাঁর কৃচ্ছ্রতার পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই, তবু তিনি বেশ মানিয়ে নিতে পারছেন। প্রতাপ অসহিষ্ণু।

জসিডি পৌঁছোতে রাত ভোর হয়ে যাবে। প্রতাপ দাঁড়িয়ে থাকলে মমতার চোখেও ঘুম। আসবে না।

বাবাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে বাবলুও অবাক হয়ে গেছে। তার এখন যা বয়েস তাতে আরও দাও, আরও চাই, এই ভাবটাই বেশি থাকে, কারু জন্য কিছু ছেড়ে দেবার কথা মানে আসে না। সে ফিস ফিস করে কানুকে জিজ্ঞেস করলো, ছোটকা, বাবা কি ওপরে আসবে?

কানুও তার সেজদাকে খানিকটা চেনে। সে জানে যে এখন কিছু বলতে গেলেই ধমক খাবে। ঐ বিহারী মেয়েলোকটির কোলে যে বাচ্চাটা, তার একটা পা ঝুলছিল, সেই পা

বোধহয় একবার সেজদার মুখে লেগেছে, তাই সেজদা জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঐটুকু বাচ্চার ওপর তো রাগ করতে পারে না। কানুর শুধু একটাই মুশকিল হলো, সেজদা দাঁড়িয়ে থেকে ওপরটা দেখতে পাচ্ছে। এই অবস্থায় সে সিগারেট টানতে পারবে না।

কানু প্রতাপের বৈমাত্রেয় ভাই। অনেকদিন পর্যন্ত সে তার মামাদের কাছেই ছিল। বড় মামার মৃত্যু হবার পর তাকে প্রতাপের কাছেই আশ্রয় নিতে হয়েছে। আই এ পরীক্ষায় একবার ফেল করার পর তার আর পড়াশুনো হয় নি, তারপর থেকে সে একটানা চাকরি খুঁজে যাচ্ছিল। পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলেও কানুর এক ধরনের বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ। সে জানে, বেশিদিন বেকার থাকলে তার পথের কুকুরের মতন অবস্থা হবে। স্বাধীনতার পর শুধু ছাঁটাই আর ছাঁটাইয়ের রবই শোনা গেছে, নতুন চাকরি একটাও তৈরি হয় নি। তার পাড়ার বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে, শ্মশান ঘাটে গিয়ে বসে থাক, দ্যাখ, রিটায়ার করার আগে কে কে মলো। সেই সেই অফিসে ছুটে যাবি। কানু নিজস্ব উপায় বার করে মাঝে মাঝেই পঁচিশ-তিরিশ টাকা উপার্জন করে আনতে লাগলো। লম্বা, পাতলা চেহারা তার, চোখ দুটি ঝকঝকে। প্রতাপের মতন তার মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ নেই, তাতে তার সুবিধেই হয়েছে, সে অনায়াসে ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকতে পারে।

উপার্জনের টাকাটা সে প্রতাপ কিংবা মমতার হাতে দিতে সাহস পায় না। সংসারের সুরাহার জন্য সে মাঝে মাঝে কয়লা, আটা কিংবা মাছ কিনে আনে। প্রতাপ অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর এই ছোট ভাইটির উপার্জনের ব্যাপারটা টের পাননি, একদিন জানতে পেরে চেপে ধরলেন। চাকরি করে না, টিউশানি করে না, তবু কানু টাকা পায় কোথা থেকে? চুরি বা জোচ্চুরি ছাড়া তো কলকাতা শহরে এমনি এমনি টাকা পাওয়া যায় না।

কানুর উপার্জনের পথটি পুরোপুরি অবৈধ নয়। বরং বলা যেতে পারে এক ধরনের ব্যবসায়ের উদ্যোগ। সে কন্ট্রোলের শাড়ী কিনে এনে বাজারের সামনের ফুটপাথের দোকানে বেচে দেয়। কানুর সময়ের অভাব নেই। কন্ট্রোলের শাড়ীর দোকানের সামনে লম্বা লম্বা লাইন পড়ে, কানু সারা দিন সেই লাইনে দাঁড়ায়। প্রতি শাড়ীতে দু'টাকা তিন টাকা মুনাফা।

শাড়ী যখন সহজে পাওয়া যেতে লাগলো, তখন কানু চলে এলো কয়লায়। কয়লারও রেশন। এখন দেশে প্রায়ই কোনো না কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। সরকার তখন সেগুলি কন্ট্রোল দরে দেবার চেষ্টা করে। সেটা একটা নিয়ম রক্ষা মাত্র, অতি অল্প লোকেই তা পায়। যারা পায়, তাদের মধ্যেও আবার কানুর মতন মানুষই বেশি।

প্রতাপ এই বৃত্তান্তটি শুনে তার বাইশ বছর বয়েসী ভাইয়ের গালে ঠাস ঠাস করে দুটি থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন, হারামজাদা, তোর লজ্জা করে না? তুই কোন বংশের ছেলে তা তোর খেয়াল নেই? ফের যদি এরকম নোংরা কথা শুনি তা হলে আমার বাড়িতে তোর স্থান হবে না। বস্তিতে গিয়ে থাকবি!

সেই ঘটনাটা মনে পড়ে যাওয়ায় কানু নিজের গালে একবার হাত বোলালো। দাদার ওপর তার রাগ নেই, বরং একটা করুণার ভাব আছে। সেজদা সব সময় সতোর গর্ব করে, অশেষ দুঃখ আছে সেজদার কপালে। এই যুগটাই যে অন্যরকম।

গত বছরের গোড়ার দিকে প্রতাপ অবশ্য বহু চেষ্টা করে কানুর জন্য একটা চাকরি জোগাড় করে দিয়েছেন। সাধারণ চাকরি, তবু যা হোক, সরকারি, বাঁধা মাইনে। চাকরিটা কানুর খুব পছন্দ। কারণ এরই মধ্যে সে ঐ সাধারণ চাকরির দেয়াল ফুটো করে উপরি রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছে।

চলতে শুরু করেছে ট্রেন। বাতাস চলাচল করতেই আর আগের মতন অত ভিড় বোধ হয় না। চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে কিছুটা জায়গা বেরিয়ে আসে। দাঁড়ানো মানুষগুলো কেউ কেউ এদিক সেদিকে একটুখানি করে নিতম্ব ছোঁয়ানোর ব্যবস্থা করে নেয়।

প্রতাপ দাঁড়িয়েই রইলেন। তাঁর মুখোনি বিমর্ষ, তিনি কারু দিকে চেয়ে নেই, শূন্য দৃষ্টি। তার হাতে একটি সিগারেট, কিন্তু আগুন জ্বালানো হয় নি, সেটাই মাঝে মাঝে ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছেন।

বাবলু এখনও বুঝতে পারছে না, বাঙ্কের ওপরে বসা আর নীচে বসার মধ্যে কোনটা বেশী। ভালো। সে ভেবেছিল, ওপরে বসার মধ্যে একটা বড় বড় ভাব আছে। তা ছাড়া বাবা যখন তখন বকুনি দেন বলে সে বাবার কাছাকাছি থাকতে চায় নি। কিন্তু দাদাটা মায়ের পাশে বসেছে, জানলা দিয়ে বাইরের কত কিছু দেখছে। ওপর থেকে শুধু মানুষ ছাড়া আর কিছুই। দেখা যায় না। ট্রেন ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝিমোতে শুরু করেছে অনেকে।

কানু ফিসফিস করে বললো, দেখছিস বাবলু, তোর বাবার খুব মন খারাপ। আমরা এত কষ্ট করে ট্রেনে জায়গা করলুম, তবু জায়গা ছেড়ে দিলেন। কেন বল তো?

বাবলু মন খারাপ-টারাপ তেমন বোঝে না। সে শেষ প্রশ্নটির জের টেনে পাল্টা প্রশ্ন করলো, কেন? কিসের জন্য মন খারাপ!

কানু মুচকি হেসে বললো, আমরা উল্টো দিকে যাচ্ছি যে!

বাবলু তবু বুঝতে পারলো না। তবে কি তারা দেওঘরে ঠাম্মার কাছে যাচ্ছে না, রেলগাড়িটা ভুল দিকে ছুটে যাচ্ছে?

কানু আবার বললো, এই দিকে তো আমাদের দেশ নয়। আমাদের দেশ ছিল অন্যদিকে।

দরজার কাছে দু চারজন ছাড়া কামরার মধ্যে প্রতাপ ছাড়া প্রায় আর কেউই দাঁড়িয়ে নেই। এখন কিছুটা চাপাচাপি করে প্রতাপ কোনোক্রমে বসতে পারেন, কিন্তু মমতার দু' তিনবার অনুরোধেও প্রতাপ রাজি হননি। অচেনা মানুষদের সঙ্গে গায়ে গা সেঁটে ঘাম বিনিময় করতে তাঁর ঘৃণা হয়। প্রতাপ অবশ্য একদিকের দেয়ালে হেলান দেবার সুযোগ পেয়েছেন, হাত দুখানি বিবেকানন্দের ভঙ্গিতে বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা। তাঁর মতন। একজন বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় মানুষকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে অন্যদের অস্বস্তি হচ্ছে, সাধারণত এই ধরনের মানুষরাই অনেকখানি জায়গা অধিকার করে বসে। অন্যদের বিস্মিত দৃষ্টি

এড়াবার জন্য প্রতাপ চোখ বুজে রইলেন। কিন্তু তাঁর মুখের অভিমানের রেখা গোপন করতে পারলেন না।

২ বৈদ্যনাথধাম স্টেশনে দাঁড়িয়ে

বৈদ্যনাথধাম স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বনাথ গুহ। গুণ গুণ করে আশাবরী রাগে সুর ভাঁজছেন। ভালো করে এখনো ভোর হয়নি, এখানে-সেখানে ঝুলছে অন্ধকার। এরই মধ্যে প্ল্যাটফর্মে অনেক মানুষ-জন, অধিকাংশই পাণ্ডা ও মুটে, আরও কেউ কেউ ভোরের দিকে স্টেশনে বেড়াতে আসে, নতুন মুখ দেখবার জন্য।

সদ্য শীত পড়তে শুরু করেছে, বিশ্বনাথের গায়ে একটা নস্যি রঙের চাঁদর, ধুতিটা মোটা খদ্দরের, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় বাবড়ি চুল, হাতে মোটা চুরুট। রাত্রে শোবার সময় তিনি যে চুরুটটা নিভিয়ে রাখেন, ঘুম থেকে উঠেই তাঁর প্রথম কাজ সেই চুরুটটাকে ধরানো। অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় কেউ তাঁকে চুরুট ছাড়া দেখেনি।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি আপন মনে গুণগুনিয়ে যেতে পারেন, অন্য কোনোদিকে তাঁর খেয়াল থাকে না। সহকারি স্টেশন মাস্টার রামরতন মিশ্র তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তিনি দেখতে পেলেন না; তিনি তখন টৌড়িতে চলে গেছেন।

–রাম রাম গুহাজী! এত বিহানে চলে এসেছেন! কেউ আসবে নাকি? গান থামিয়ে বিশ্বনাথ রেল বাবুটির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর যেন সহসা চিনতে পেরে বললেন, রাম রাম মিশ্রজী! আপনার কথা মনেই ছিল না। তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে আপনার ঘরে চা খেতে যেতাম।

মিশ্রজী বললেন, চলেন তো, এখন চলেন, চায়ের ব্যবস্থা হোয়ে যাবে। কিংবা, এখানেই খান?

অদূরে এক চা-গারা ছোঁকরাকে দেখতে পেয়ে মিশ্রজী হাঁকলেন, আরে এ লেড়কে, ইধার চায়ে লা!

চা-ওয়ালাটি এর আগে বিশ্বনাথের আশপাশ দিয়ে দু তিনবার হেঁকে গেছে, বিশ্বনাথের হুঁসই হয়নি, অথচ তাঁর চায়ের তেষ্টা পেয়েছে বেশ।

ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করলেন, গাড়ি লেট আছে নাকি?

–না, জসিডি পঁহুছে গেছে। এই তো এই মাহিনা থেকে চেঞ্জারদের ভিড় শুরু হলো, সব জিনিসপত্তর মাংগা হোবে। দুধ তো মিলবেই না।

–মন্দিরের কাছে আপনার শালার প্যাঁড়ার দোকান আছে না? চেঞ্জাররা এলে তারও তো বিক্রি বাড়বে? সব দোকান এই সময়টার জন্যই হাঁ করে থাকে।

–আমার শালার নাফা হবে, তাতে আমার কী? সে শালা কী আমাকে ভাগ দিবে? আপনার কেউ আসছে নাকি?

–হ্যাঁ। আসছে, শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

–তবে তো গুহাজী আপনার বেশ গাঁট গচ্ছা যাবে! ভালো চাউল এখন পঙ্গুরো টাকা মন, আউর বাড়বে!

বিশ্বনাথ চুরুটে টান দিতে লাগলেন। সকালবেলাতেই টাকা পয়সার কথা তাঁর একেবারে পছন্দ হয় না। টাকা যখন থাকে না, তখনই তো টাকার চিন্তা করা দরকার। অথচ, আশ্চর্য, দুনিয়ায় যাদের টাকা আছে, তারাই টাকা পয়সা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়।

দূরে ট্রেনের শব্দ পাওয়া যেতেই মিশ্রজী বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে আরও কয়েকটি চেনা মুখ চোখে পড়লো বিশ্বনাথের। তিনি আবার সর-গ-ম ধরলেন। ট্রেনের হুইলে ঠিক যেন কড়ি মধ্যম লাগে।

কয়লার ধোঁয়ায় প্ল্যাটফর্মটি ভরিয়ে দিয়ে ইঞ্জিনটি এসে থামলো ঠিক বিশ্বনাথের সামনেই। পাণ্ডা আর মুটেরা হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। বিশ্বনাথ ব্যস্ত হলেন না, একটু দূরে সরে গেলেন, পাণ্ডাদের গায়ে বড় গন্ধ হয়!

প্রথমে নামলো কানু, সে এদিক ওদিক তাকিয়ে বিশ্বনাথকে একবার দেখেও চিনতে পারলো না। কয়েকজন পাণ্ডা তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, পিতার নাম কী? পিতামহর নাম কী? আদি নিবাস কোথায়?

পিকলুই প্রথম চেঁচিয়ে উঠলো, পিসেমশাই! তারপর সে দৌড়ে এসে বিশ্বনাথকে প্রণাম করলো।

বিশ্বনাথ তার থুতনি ছুঁয়ে আদর করে বললেন, কত বড় হয়ে গেছিস রে! গোঁফ উঠে গেছে দেখছি! হ্যাঁরে, রাস্তায় কোনো কষ্ট হয়নি তো?

কানু মালপত্রের তদারকি করতে লাগলো, প্রতাপ এগিয়ে এসে বললেন, ওস্তাদজী! আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি আপনাকে। দাড়ি রাখলেন কবে থেকে?

শালা এবং জামাইবাবু কেউ কারুর নাম ধরে ডাকেন না। প্রতাপ যেমন ওস্তাদজী বলেন, বিশ্বনাথও তেমনি প্রতাপকে বলেন ব্রাদার। দু'জনের বয়েসের তফাৎ প্রায় দশ বছর। বিশ্বনাথের চুল কালো হলেও দাড়িতে বেশ পাক ধরেছে।

পুজোর পরে দেখা, তাই আগে কোলাকুলি সেরে নেওয়া হলো। বিশ্বনাথ বললেন, পিকলু কিন্তু এক নজর দেখেই আমাকে চিনেছে। মেরিটোরিয়াস ছেলে। হ্যাঁ, গতবছর থেকে দাড়ি রাখছি, জীবনে আর কোনোদিন দাড়ি কামাবো না ঠিক করেছি। একটা অকারণ পরিশ্রম বাদ গেল, বুঝলে না!

মমতাকে দেখে বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত রোগা হয়েছো কেন, মুমি? এখানে কিছুদিন থাকো, তোমার শরীর একেবারে নবদুর্গার মতন করে ছাড়বো। আর সব কই? বড়দিরা এলেন না?

প্রতাপ নিচু গলায় বললেন, না, ওঁদের আসা হলো না। বড় জামাইবাবুর অসুখ।

-কী অসুখ? খবর পাইনি তো কিছু!

প্রতাপ কথা ঘুরিয়ে নিলেন। বড় জামাইবাবুর অসুখ সাজান। আসল ব্যাপার হলো, হঠাৎ তাঁর চাকরি গেছে। পরিবারের সকলের ট্রেন ভাড়া সংগ্রহ করে তাঁর পক্ষে বেড়াতে আসা সম্ভব নয়। প্রতাপ অবশ্য ওঁদের টিকিট কাটতে চেয়েছিলেন, বড় জামাইবাবু রাজি হননি।

কয়েকটি নাছোড়বান্দা পাণ্ডা তখনও ওদের ঘিরে চিলুবিলু করছে, বিশ্বনাথ দু'হাত তুলে তাদের বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দেখিয়ে জী, ম্যায় তো খুদ-ই এক পাণ্ডা হ্যায়। ইয়ে সব লোক হামারা যজমান।

কানু মুটেদের মাথায় মালপত্র চাপাচ্ছে, মমতা হঠাৎ আর্ত স্বরে বললেন, বাবলু কোথায়?

প্ল্যাটফর্ম অনেকখানি ফাঁকা হয়ে এসেছে, চতুর্দিকে চেয়ে বাবলুর চিহ্নমাত্র চোখে পড়লো না। তাকে কেউ ট্রেন থেকে নামতেও দেখেনি। কানু আর পিকলু বাবলুর নাম ধরে ডেকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

ছোট্ট মেয়ে মুন্নি এখনও সুযোগ পেলেই মুখে আঙুল পুরে দেয়। মমতা দেখতে পেলেই বার করে দেন, বকুনি দিয়ে বলেন, তুই কি খেতে পাস না যে সবসময় নিজের আঙুল খাস! চার বছরের মুন্নি বেশ চটাস চটাস কথা বলে। পিকলুকে সে দাদা বললেও বাবলুকে সে নাম ধরে ডাকবেই। সে মুখ থেকে লালাসিক্ত আঙুল বার করে গেটের দিকে দেখিয়ে বললো, বাবলুটা ভীষণ পাজি! ঐদিক দিয়ে একা একা চলে গেল!

কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি, দেওঘরে টাঙ্গা। স্টেশনের বাইরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। টিকিট চেকারের পাশ দিয়ে গলে বেরিয়ে এসে বাবলু একটা টাঙ্গার একেবারে ওপরে উঠে বসে আছে গাড়োয়ানের পাশে। নীল রঙের হাফ প্যান্ট আর নীল হাফ শার্ট গায়। তার বেশ শীত করছে। ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়ার পর মা তার গায়ে একটা চাঁদর চাপা দিয়েছিল, সেটা সে ট্রেনেই রেখে এসেছে। কলকাতায় শীত নেই, অথচ এখানে ঠাণ্ডা। বাবলুর ভারি আশ্চর্য লাগে। ইস্কুলের ভূগোল বইয়ের জ্ঞান তার মনে পড়ে না। কাল ছিল গরম দেশে, আজ চলে এলো শীতের দেশে।

গাড়োয়ানকে সে তাড়া দিয়ে বললো, চলো, যাবে না? আমাদের বাড়ি চলো? আমি আগে আগে যাবো। ঠাকুমা পয়সা দিয়ে দেবে!

সদলবলে বাইরে এসে প্রতাপ বাবলুকে ঐ অবস্থায় আবিষ্কার করে ক্রুদ্ধ হলেন। আঙুল তুলে তিনি পিকলুকে আদেশ করলেন, যা তো, পাজীটার কান ধরে টেনে নিয়ে আয় এখানে।

পিকলু একপলক মায়ের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেল।

মমতার বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। বাবলু যা ছেলে, মাঝরাত্তিরে কোনো স্টেশনে নেমে যাওয়া তার পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়। ভোর রাতে অনেকক্ষণ জসিডিতে ট্রেন থেমেছিল, তখন ঘুমে চোখ টেনে এসেছিল মমতার। তারপর থেকে তিনি আর বাবলুকে দেখেন নি। এখন বাবলুকে দেখতে পেয়ে তিনি একটা স্নিগ্ধ শিহরন বোধ করলেন। দেওঘরের বাতাস তাঁকে শান্তি দিল।

অন্য লোকজনের সামনে মমতা তাঁর স্বামীর কথার প্রতিবাদ করেন না। আবার প্রতাপের সব মতামত তিনি মেনেও নেন না। প্রতাপের চোখে চোখ রেখে তিনি নিঃশব্দে জানিয়ে দিলেন, এখন বাবলুকে কোনো শাস্তি দেবার দরকার নেই।

পিকলু অতি শান্ত ও নম্র ছেলে। সদ্য সে স্কুল ফাঁইনালে চতুর্থ স্থান অধিকার করে জলপানি পেয়েছে। সে তার ছোট ভাইয়ের ঠিক বিপরীত। বাবলু যেমন পড়াশুনোয় অমনোযোগী, সেইরকমই কথার অবাধ্য। সব সময় তার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি ঘোরে। এই জন্য শাস্তিও পায় যথেষ্ট, তবু তার গ্রাহ্য নেই। পিকলু ছোটভাইকে আড়াল করার চেষ্টা করে যথাসাধ্য।

পিকলু বুঝতে পারলো, নতুন জায়গায় বেড়াতে এসেই বাবলু মার খাবে বাবার হাতে। প্রতাপ জেদ করে সারা রাত প্রায় দাঁড়িয়ে এসেছেন, তা ছাড়া অন্য কারণেও তাঁর মেজাজ ভালো নেই। তিনি প্রত্যেক বছর পূজোর সময় দেশের বাড়িতে যেতে ভালোবাসতেন। গত দু'বছর যাওয়া হয়নি।

পিকলু কাছে এসে কিছু বলবার আগেই বাবলু বললো, দাদা, পাহাড় কোথায় রে? পাহাড় তো দেখতে পাচ্ছি না?

–বাবলু, নেমে আয়।

–না, আমি এইখানে বসবো।

পিকলু ওপরে উঠে এসে ফিসফিস করে বললো, বাবার কাছে মার খাবি তুই! শিগগির গিয়ে পিসেমশাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়া। পিসেমশাই বাঁচিয়ে দেবেন।

বাবলু তবু গোঁজ হয়ে বসে রইলো।

সেই টাঙ্গার গাড়োয়ান সুযোগ বুঝে তড়াক করে নেমে গিয়ে মালপত্র ধরে টানাটানি করতে লাগলো। অর্থাৎ তার টাঙ্গা তো ঠিক হয়ে গেছেই, দরদামের আর প্রশ্ন নেই।

বাবলু জেদ ছাড়েনি, ওপর থেকে নামলোই না কিছুতেই। বিশ্বনাথ বললেন, বাঃ, বেশ মানিয়েছে, বাবলু, তোকে ঠিক গাড়োয়ানের অ্যাসিস্টেন্টের মতন দেখাচ্ছে।

প্রতাপ এমনভাবে তাকালেন, যার অর্থ, আচ্ছা, পরে তোমার হবে!

বিশ্বনাথ আবার বললেন, আমি টাঙ্গা চালাতে পারি। জানো, ব্রাদার, আগ্রায় থাকতে আমি বেশ কিছুদিন টাঙ্গা চালিয়ে রুজি-রোজগার করেছি। কী, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যিই।

বিশ্বনাথ সম্পর্কে কিছুই অবিশ্বাস্য নয়। জীবনের অনেকগুলি বছর তিনি বাউণ্ডুলেপনা করে কাটিয়েছেন। গ্রাম থেকে কলকাতার কলেজে পড়তে এসে তাঁর গানের নেশা চাপে। পাথুরেঘাটার ঘোষ বাড়িতে টিউশানি করতেন, সেই সূত্রে অনেক বড় বড় ওস্তাদ কলাকারদের সামনাসামনি দেখার সুযোগ পান। ক্রমে তাঁর ঝোঁক চাপলো তিনি মার্গ সঙ্গীতের সম্রাট ফৈয়াজ খাঁর কাছে নাড়া বাঁধবেন। বি এ পরীক্ষা না দিয়ে, অভিভাবকদের কিছু না জানিয়ে চলে গেলেন আগ্রায়। ফৈয়াজ খাঁ প্রথমে তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হননি। বলেছিলেন, বেটা, দু ঠোঁটের মাঝখানে একটা সূচ বসিয়ে তিন বচ্ছর শুধু সা সেধে যা, তারপর আমার কাছে আসবি!

তাতেও দমে যাননি বিশ্বনাথ, বাড়ি ফিরে আসেননি, বাড়ি থেকে টাকা পয়সাও চাননি। ঐ সব অঞ্চলেই ঘুর ঘুর করেছেন। পরে প্রতাপ যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঐ সময় আপনার চলতো কী করে, ওস্তাদজী? উত্তরে বিশ্বনাথ হাসতে হাসতে শঙ্করাচার্যের মোহমুদগর থেকে আবৃত্তি করতেন একটি স্রোত্র :

সুরমন্দির-তরুমূল-নিবাসঃ
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব পরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥

আগ্রা, পুণা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একসময় মায়ের অসুখের খবর শুনে বিশ্বনাথ দেশের বাড়িতে ফেরেন। মাকে তিনি ভালোবাসতেন অনেকটা অন্ধের মতন, শিশুর মতন, সাধকের মতন। প্রায় মৃত্যু শয্যাশায়ী মায়ের অনুরোধে তিনি বিয়ে

করলেন, সংসারী হবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর অবশ্য সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায় আর রইলো না, আবার শুরু হলো ছন্নছাড়া জীবন।

প্রতাপের দুই দিদি, তার মধ্যে শান্তি আর তিনি প্রায় পিঠোপিঠি। এই শান্তির সঙ্গে যখন বিশ্বনাথের বিয়ে হয়, তখন প্রতাপ তাঁর এই জামাইবাবুটিকে বেশ পছন্দ করেছিলেন। রূপবান, হাসিখুশী, দিলদরিয়া মানুষ, স্বভাবে কোনো মালিন্য নেই। বিয়ের পর মাত্র কিছুদিন বিশ্বনাথ ব্যবসায়ে নেমে অর্থ উপার্জন করতে চেয়েছিলেন, রঙের কারবার, ছ' সাত মাসের মধ্যেই সে কারবার লাটে ওঠে। আবার বিবাগী।

বিশ্বনাথ গান শিখতে গিয়েছিলেন শেখার আনন্দেই, গানকে পেশা করতে পারেননি। এরকম মানুষ থাকে, যারা নিজেদের চারপাশটা গুছিয়ে নিতে জানে না। কোনো কিছু জমিয়ে রাখার চেয়ে বিলিয়ে দিতেই যাদের বেশি আনন্দ। বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দটাই তো সবচেয়ে বড় যে যাতে আনন্দ পায়।

বিশ্বনাথের গান শুনে তারিফ করে কেউ কেউ যখন জিজ্ঞেস করতো, আপনি কোনো জলসায় গান করেন না কেন? রেকর্ড করান না কেন? উত্তরে বিশ্বনাথ বরাবর বলে এসেছেন, আমার গুরুর নিষেধ আছে। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ কিছুদিন তালিম দেবার পর নাকি এই বাঙালী শিষ্যটিকে বলেছিলেন, বেটা, তোকে আমি যা জিনিস দিচ্ছি, তুই গলায় তুলে যা, কিন্তু আমি হুকুমনামা না দিলে তুই কোনোদিন পাবলিক ফাংশানে গান করবি না! ব্যস, এরপর খাঁ সাহেব বিশ্বনাথকে হুকুমনামা দিতে ভুলে গেছেন, বিশ্বনাথও কোনোদিন নিজে থেকে মুখ ফুটে অনুমতি চাননি। তারপর তো ফৈয়াজ খাঁ মারাই গেলেন, বিশ্বনাথেরও পাদপ্রদীপের সামনে যাওয়া হলো না।

কে জানে একথাটা সত্যি কি না! তবে বিশ্বনাথ খুব সন্তোষের সঙ্গেই এই কাহিনীটা বলতে ভালোবাসেন।

বেশ দিন কাটছিল, মাঝে মাঝে বিশ্বনাথ দেশে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আবার উধাও হয়ে যেতেন। তাঁর বিপদ ঘটলো ভারত স্বাধীন হবার পর। স্বাধীনতা মানেই

দেশ ভাগ। কানপুরে বসে বিশ্বনাথ শুনলেন বরিশাল জেলায় তাঁর পৈতৃক বাড়িটি এখন অন্য দেশ হয়ে গেছে। তাঁকে ঠিক করতে হবে, তিনি এখন কোন্ দেশের নাগরিক হবেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো না, কেউ তাঁর মতামত নিল না, অথচ তাঁর বাড়িটা অন্যদেশে চলে গেল? বিশ্বনাথ মাথা ঘামালেন না, ফিরলেন না, কালক্রমে বে-দখল হয়ে গেল সেই বাড়ি।

অল্প কিছুদিন মাত্র শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন শান্তি, তারপর থেকে নিজের মায়ের কাছেই। বিক্রমপুরের মালখানগরে প্রতাপদের পরিবার বেশ সচ্ছল ছিল। মেয়ের বিয়ের পর সেই মেয়ের বাপের বাড়িতেই থেকে যাওয়াটা পূর্ববঙ্গে তেমন কিছু অস্বাভাবিক ছিল না।

প্রতাপের বাবা ভবদেব মজুমদার ঘোরতর বিষয়ী এবং আশাবাদী মানুষ ছিলেন। দেশ বিভাগ তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি।

হিন্দুস্থান-পাকিস্তান তাঁর কাছে অবাস্তব মনে হতো। এতকালের সব চেনা মানুষ কখনো হঠাৎ শত্রু হয়ে যেতে পারে? পিতৃপুরুষের ভূমি কেউ ছেড়ে চলে যায়? তিনি শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ নাকি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে,দশ বছরের মধ্যেই দুই খণ্ড আবার মিলিত হয়ে যাবে। ১৭৫৭-তে পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৫৭-তে সিপাহী যুদ্ধ, ১৯৫৭-তে ভারত-পাকিস্তান এক হয়ে শুরু হবে নতুন ইতিহাস। ভবদেব সরকারও এই তত্ত্বে প্রবলভাবে বিশ্বাসী।

মালখানগর ছেড়ে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীরা সবাই চলে আসছেন পশ্চিমবাংলায়। প্রতাপ কলকাতা থেকে বারবার চিঠি লিখছেন বাবা-মাকে চলে আসবার জন্য, কিন্তু ভবদেব সরকার অটল। তিনি বরং একটি অদ্ভুত কাজ করতে লাগলেন। যে-সব হিন্দুরা বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে আসছে, তিনি তাদের সম্পত্তি কিনে রাখতে লাগলেন জলের দামে। সবাইকে আশ্বাস দিলেন, ১৯৫৭র পর তারা যদি ফিরে আসে, তিনি ঐ দামেই তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবেন।

ভবদেব মজুমদারের হিসেবে একটি ভুল ছিল। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি নিজে বাঁচবেন কি না সে কথা চিন্তা করেননি। ওদেশে তিনি কোনো শত্রুতার সম্মুখীন হননি বটে কিন্তু অকস্মাৎ হৃদরোগ তাকে হরণ করে নিয়ে গেল। দরদালান, আমবাগান, কয়েকটি দীঘি, ধানজমি এইসবের ওপর দিয়ে উড়ে গেল অতৃপ্ত ভবদেব সরকারের শেষ নিশ্বাস। মৃত্যুকালে শান্তি ছাড়া অন্য সন্তানদের মুখ-দর্শনও হলো না।

পিতৃশ্রাদ্ধ করতে প্রতাপ শেষবার গিয়েছিলেন মালখানগরে। প্রতাপ শক্ত চরিত্রের মানুষ, সবাই তাকে তেজস্বী পুরুষ হিসেবে মানে, কিন্তু সেবার তিনি খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল, মাটি থেকে উপড়ে তোলা হলো এক বর্ধিষ্ণু বৃক্ষের শিকড়। পূর্ববাংলার এই নদীময় প্রান্তর, এই মিষ্টি বাতাস, খেজুর রসের স্বাদের মতন ভোর, ঠাকুমার গল্পের আমেজমাখা সন্ধ্যা, এসব আর দেখা হবে না। এরপর থেকে কলকাতায় ভাড়াটে বাড়ির অন্ধকার ঘুপচি ঘরে চির নির্বাসন।

দেশ বিভাগের পরেও প্রত্যেক বছর পূজোর সময় একমাস সপরিবারে প্রতাপ কাটিয়ে যেতেন মালখানগরে। সেই একমাসেই যেন তিনি সারা বছরের এনার্জি সঞ্চয় করে নিতেন। নিজেদের পুকুরের মাছের স্বাদই আলাদা। বাড়ির গরু, বাড়ির কলাগাছ, এমনকি চিড়ে-মুড়কিও নিজেদের খেতের। তা ছাড়া যে-মাটিতে পিতৃপুরুষেরা পদস্পর্শ রেখে গেছেন, সেই মাটি। পূজোর সময় প্রতাপ কাশ্মীর-গোয়ায় ভ্রমণের আহ্বান পেলেও প্রত্যাখ্যান করতেন।

ভবদেব প্রত্যেকবারই প্রতাপকে বলতেন, তোকে না হয় কলকাতায় চাকরি করতেই হবে, তুই আর বৌমা কলকাতায় থাক, ছেলে মেয়েদের এখানে রেখে যা! ওরা খাঁটি দুধ-ঘি খেয়ে শরীরটা মজবুত করুক। কলকাতায় কি ওসব পাওয়া যায়? কলকাতায় না আছে খেলার মাঠ, না আছে বাগান, না আছে পুকুর!

প্রতাপ বলতেন, তা কি হয়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া আছে না?

ভবদেব বলতেন, কেন, এখানে লেখাপড়া হয় না? ভালো ইস্কুল আছে। তোরা তো এই ইস্কুলেই লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছিস। এই ইস্কুলের কত ছেলে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে!

তবু দিনকাল যে বদলে গেছে তা বাবাকে বোঝানো যায় না। দাঙ্গা-হাঙ্গামা না থাকলেও সবসময় একটা টেনশান রয়েছে, এইরকম অবস্থায় পূর্ব-পশ্চিমবাংলায় বিভক্ত পরিবার মানসিক শান্তিতে থাকতে পারে না।

বড় নাতি পিকলু ছিল ভবদেবের সবচেয়ে প্রিয়। একবার তো তিনি পিকলুকে প্রায় জোর করেই ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। সেবার পিকলু টাইফয়েডে ভুগে খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ভবদেব চেয়েছিলেন, একটা বছর দেশে থেকে পিকলু শরীরটা সারিয়ে নিক। একটা বছর না হয় ওর পড়াশুনো বন্ধ থাক। প্রতাপ রাজি হতে পারেননি। পিকলু প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় ফাস্ট হয়, সে একটা বছর নষ্ট করবে কেন? সহপাঠীদের তুলনায় পিছিয়ে গিয়ে পিকলু তো পরে বাবা-মায়ের ওপরেই দোষ দেবে।

বাবলুকে নিয়ে প্রত্যেকবারই বেশ সমস্যা হতো। তার তো পড়াশুনোয় মন নেই। কলকাতার তুলনায় দেশের বাড়িই তার বেশি পছন্দ। প্রায় সারাদিনই তো সে পড়ে থাকতো আমবাগানে। ওখানে বকুনি দেবার কেউ নেই, ঠাকুমা আর পিসিদের অগাধ প্রশ্রয় আর আদর, ঐসব ছেড়ে সে আসতে চাইবে কেন? প্রতিবছরই ফেরার দিন বাবলুকে খুঁজে পাওয়া যেত না। শেষ বছরে তাকে টেনে হিঁচড়ে আনা হয় গোয়ালঘরের পেছনের আদাড় থেকে, যেখানে দিনেরবেলাতেও কেউ ভয়ে যায় না। বাবলুর সেকি হেঁচকি তুলে কান্না!

পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে প্রতাপ বুঝতে পেরেছিলেন, এবার চিরকালের মতন মালখানগরের পাট তুলতে হবে। আর কোনো পুরুষ মানুষ নেই, মা আর শান্তিকে এখানে রেখে যাওয়া যায় না। বিষয় সম্পত্তি সবই এমনি এমনি পড়ে রইলো। ভবদেব সরকার যে-সব নতুন নতুন বাড়ি জমি কিনেছিলেন সে-সব তো ছাড়তে হলোই, তাঁদের নিজস্ব বসতবাড়ি ও

পুকুর বাগানের জন্যও খদ্দের পাওয়া গেল না। যা কিছুদিন পর এমনিই পাওয়া যাবে তা আর কে সাধ করে পয়সা দিয়ে কিনতে চাইবে। চাচাস্থানীয় কয়েকজন প্রবীণ মুসলমান প্রতিবেশী প্রতাপকে পরামর্শ দিলেন, একেবারে খালি বাড়ি ফেলে যেও না, একজন কারুকে অন্তত রেখে যাও! প্রতাপ হতাশভাবে মাথা নেড়েছিলেন। কে থাকবে? গ্রামের একটি ছেলের ওপর দেখাশুনোর ভার দিয়ে প্রতাপ চলে এলেন এবং কিছুদিন পরেই খবর পেলেন যে তাঁদের বাড়িটি সরকার অধিগ্রহণ করে কী একটা অফিস বসিয়েছে।

বিশ্বনাথ গুহও প্রতাপের সঙ্গে গিয়েছিলেন শ্বশুরের শ্রাদ্ধে। সেবারে তিনি বুঝলেন, তাঁকে সংসারের মায়ায় বাঁধা পড়তেই হবে এবার। স্ত্রী এবং শিশু কন্যাটিকে তিনি প্রতাপের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারেন না। ভবদেব সরকার মাসে মাসে বেশ কিছু টাকা হুণ্ডি মারফৎ কলকাতায় পাঠাতেন ছেলের কাছে। এবার থেকে তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতাপ বেশ অসুবিধেয় পড়বেন, শুধু মাইনের টাকায় তিনি এতবড় সংসার চালাবেন কী করে?

বিশ্বনাথের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, এই বয়েসে তিনি নতুন করে চাকরি খোঁজাখুঁজি করতে পারবেন না, অন্য কোনো যোগ্যতাও নেই, তাই তিনি স্ত্রী-কন্যাকে সঙ্গে এনে দেওঘরে একটা গানের ইস্কুল খুলেছেন।

কাশী-আগ্রা-লক্ষ্ণৌ-পুনার মতন দেওঘরের সঙ্গীত-কেন্দ্র হিসেবে কোনো খ্যাতি নেই। তবু এখানে আসতে হলো একটিই কারণে। ভবদেব সরকার অনেকদিন আগে দেওঘরে একটি ছোট একতলা বাড়ি কিনে রেখেছিলেন স্ত্রীর নামে। একসময়ে পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে যাওয়ার- একটা রেওয়াজ ছিল। পরিপূর্ণ সুখের দিনে ভবদেব সরকারও তাঁর সমগ্র পরিবার নিয়ে দু'তিনবার এসেছেন দেওঘরের এই বাড়িতে। তারপর বছর দশেক আর কেউ আসেনি, এমনি এমনি তালাবন্ধ পড়ে ছিল। মাথা গোঁজার একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় তো অন্তত পাওয়া যাবে, এই হিসেবে সেই বাড়ি সাফ-সুতরো করে বিশ্বনাথ সংসার পাতলেন।

প্রতাপের মা দিনকতক রইলেন কলকাতায় ছেলের বাড়িতে। কিন্তু কলকাতায় তাঁর মন টেকে না, তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। স্বামীর মৃত্যু তিনি অনেকটা সহ্য করে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু উন্মুক্ত প্রকৃতি থেকে বিচ্যুতি তিনি মানতে পারলেন না। তিনিও দেওঘরে এসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। শান্তি আর তিনি অনেকদিন একসঙ্গে ছিলেন, শান্তির মেয়েটি তাঁরই কোলে শুয়ে বড় হয়েছে, ওদের ছেড়ে থাকতেও তাঁর কষ্ট হচ্ছিল।

বিধবা মা ছেলের কাছেই থাকবেন, মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে আশ্রয় নিলে দেশাচারে বাধে, নিন্দে হয়। কিন্তু সুহাসিনী তো মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে যাচ্ছেন না, দেওঘরের বাড়িটি তাঁর নিজের নামে, তিনি নিজের বাড়িতে থাকবেন, এতে কোনো দোষ নেই।

প্রতাপদের টাঙ্গা সেই সুহাসিনীধামের সামনে এসে থামলো।

৩ ভবদেব মজুমদারের আমলে

ভবদেব মজুমদারের আমলে আত্মীয়-কুটুম, দাস-দাসী, আশ্রিতজন সবাইকেই পুজোর সময় নতুন শাড়ি-ধুতি-জামা দেওয়া হতো। ভবদেব যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁর আয় ছিল ছোটখাটো জমিদারের মতন, তিনি পারতেন। প্রতি বছর তিনি প্রতাপকে ফর্দ আর টাকা পাঠাতেন, ভবদেবের নজর ছিল উঁচু, তিনি সেরা জিনিস ছাড়া কারুকে কিছু দিতেন না, প্রতাপ বড়বাজার থেকে সেই সব কিনে নিয়ে যেতেন দেশের বাড়িতে।

ভবদেব নেই, সেই দেশও নেই, বাড়িও নেই, তবু প্রতাপ এখন পরিবারের প্রধান। সময় বদলেছে, পরিবেশ বদলেছে, তা হলেও পারিবারিক প্রথা হঠাৎ ভেঙে দেওয়া যায় না। শুধুমাত্র চাকরির আয় সম্বল, তা সত্ত্বেও প্রতাপকে এ বছরেও সবাইকে ঠিকঠাক সব দিতে হয়েছে। প্রতাপের পিসিরা থাকেন ভবানীপুরে, বড়দিরা বরানগরে। কানুর মামাদের বাড়ি সোদপুর, মমতার দাদা থাকেন তালতলায়, এই সব জায়গায় প্রতাপ নিজে যাননি, কানু আর পিকলুর হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন জিনিসপত্র। তাঁর বাবা লোককে দিয়ে সুখ পেতেন,

প্রতাপ অন্তরে অন্তরে গজরেছেন। সারা বছর যাদের সঙ্গে দেখা নেই, অন্য কোনো রকম সম্পর্ক নেই, তাদেরও বছরে একবার ধুতি-শাড়ি দিতে হবে কেন?

বাবার সঙ্গে প্রতাপের অনেক বিষয়েই অমিল। বাবা ছিলেন অনেকটা গোষ্ঠি অধিপতির মতন, এই গোষ্ঠির সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে ছিল তার ঝোঁক। ভবদেব দুটি বিবাহ করেছিলেন, দুটি শ্বশুরবাড়ি, তা ছাড়াও যৌবনে তিনি ঘুরে ঘুরে দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। মজুমদার পরিবারের একটি শাখা বিচ্ছিন্ন হয়ে বরিশালে বসতি স্থাপন করেছিল, অনেকদিন তাঁদের সঙ্গে কোনো চিঠিপত্রের লেনদেনও ছিল না। এক সময় ভবদেব লোকমুখে শুনলেন যে তাঁর সেই ঠাকুরদার ভাইয়ের বংশ নাকি হঠাৎ দুরবস্থায় পড়েছে, অমনি ভবদেব বরিশালে ছুটলেন তাঁদের উদ্ধার করতে। বরিশালের সেই মজুমদাররা এর পরে অনেক দিন খুব জ্বালাতন করেছিল। অভয়পদ নামে চোয়াড়ে চেহারার এক কাকা প্রায়ই আসতো টাকা চাইতে। প্রত্যেকবারেই এক একটি চমকপ্রদ অজুহাত। পুকুরের সব মাছ মরে যাচ্ছে, জল সেঁচে ফেলতে হবে। তার ছেলে ইস্কুল বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ভুল করে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ইত্যাদি। আসলে লোকটি নাকি জুয়াড়ি। ভবদেব প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু দিতেন। প্রতাপ বাবার মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে সাহস পেতেন না, তবু তাঁর মনে হতো বাবা অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

এই তো কিছুদিন আগে, ঠনঠনে কালী বাড়ির সামনে সেই অভয়পদকে প্রতাপ দেখতে পেয়েছিলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে, চটি খুলে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে চোখ বুজে প্রণাম করছিল। মুখে কিন্তু একটুও ভক্তি ভাব নেই, সেই পুরোনো জুয়াড়ির ভাব। তার ময়লা পাঞ্জাবির পকেট থেকে যে ছোট বইটি উঁকি মারছে, সেটি রেসের বই। অভয়পদ চোখ খোলার আগেই প্রতাপ দ্রুত সরে গিয়েছিলেন অন্য ফুটপাথে। দেখতে পেলেই বাড়ি ধাওয়া করতো নিশ্চিত। শুধু মাত্র ক্ষীণ রক্তের সম্পর্ক বা পারিবারিক যোগসূত্র আছে বলেই কারুর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে হবে, প্রতাপ এতে বিশ্বাস করেন না। প্রতাপ তাঁর আপন মামাকেই পছন্দ করেন না, পারতপক্ষে কথা বলেন না, কারণ তিনি মিথ্যেবাদী।

দেওঘরে আসার সময়েও নতুন ধুতি-শাড়ির বাণ্ডিল আনতে হয়েছে। প্রত্যেকের জন্য তো বটেই, তা ছাড়া অতিরিক্ত আধ ডজন। সুহাসিনী চিঠি লিখে আনতে বলেছিলেন। মা কোনোদিনই টাকা পয়সার ব্যাপারটা বোঝেন না। অবস্থা যে অনেক পাল্টে গেছে সে ব্যাপারেও তাঁর কোনো বোধ নেই। দেশের বাড়িতে তাঁর অনেক পুষ্যি ছিল, এখানেও ইতিমধ্যে কিছু পুষ্যি জুটেছে নাকি। প্রতাপ কোনোদিনই টাকা পয়সার ব্যাপারে হিসেবী নন, তিনি কৃপণ নন কোনো মতেই, তবু যে ইদানীং তাকে হাত আঁট করে থাকতে হয় সেজন্যই তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ।

দেওঘরে আসার প্রস্তুতির সময় থেকেই প্রতাপকে টাকা পয়সার চিন্তা করতে হচ্ছে। বড়বাজারের এক সাহাদের দোকানে তাঁর বাবার আমলের সাড়ে তিন হাজার টাকা পাওনা আছে, সে টাকা এখন তারা দিতে চাইছে না। প্রতাপের নিজস্ব সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছে। পিকলু কলেজে ভর্তি হয়েছে, এবার থেকে তার জন্য একটা বড় খরচ আছে। দেওঘরে গানের ইস্কুল খুলে বিশ্বনাথ গুহর উপার্জন যৎসামান্য, তাঁর কাছে প্রতাপ সপরিবারে গিয়ে উঠবেন, খরচপত্র সব প্রতাপেরই করা উচিত।

বিশ্বনাথ কিন্তু আয়োজন করে রেখেছেন তাঁর সাধ্যের চেয়ে অনেক বেশি।

বাড়িটি ছোট হলেও সংলগ্ন জমি আছে বেশ খানিকটা। এককালে বাগান ছিল, তার বিশেষ চিহ্ন এখন না থাকলেও কয়েকটি বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ ও আতা গাছ আছে। এক কোণে কেয়ার টেকার ভজন সিং-এর ঘর। এই ভজন সিংহের দুই বউ, তারা একই সঙ্গে থাকে। তার মধ্যে একটি বউ আবার নেপালী, সে বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার ও মধ্যবয়েসী। ভজন সিং কী করে যে এই নেপালী স্ত্রীটি জোগাড় করলো তা কে জানে। দুই পক্ষের দুটি করে ছেলেমেয়ে। ভবদেবের আমলে ভজন সিং-এর মাইনে ছিল আঠেরো টাকা, এখন তা বেড়ে পঁচিশ হয়েছে। এই টাকায় সে কী করে সংসার চালায় তা এক রীতিমতন রহস্য। অথচ খেয়ে-পরে তো বেশ আছে, ছেলেপুলেদের স্বাস্থ্যও খারাপ নয়। এ বাড়ি যতদিন খালি পড়েছিল ততদিন ভজন সিং মালিকের অনুমতি ছাড়াই প্রায়ই চেঞ্জারদের ভাড়া

দিত, সে খবর প্রতাপের কানে গেছে। কিন্তু মাঝখানের কয়েকটি বছর কলকাতার-ঢাকার ব্যাপার নিয়ে প্রতাপ এমন ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে এদিকে মনোযোগ দিতে পারেননি।

বাগানের একদিকে ভজন সিং-এর কোয়াটার চাচার বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে গোটা দশেক ডাগর চেহারার মোরগ ঘুরছে। ঐগুলি বিশ্বনাথের সম্পত্তি। প্রতাপদের দেশের বাড়িতে মুর্গী ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল, এখানেও সুহাসিনী এসে পড়ায় সেই নিয়ম স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বনাথ অনেকগুলি বছর পশ্চিমে কাটিয়েছেন, মুসলমান ওস্তাদদের সংস্পর্শে থেকেছেন, তাই তাঁর। খাদ্যরুচি অন্যরকম। গরু-ভেড়া-মুর্গী সবই চলে। প্রতাপ অবশ্য গো-মাংস কোনো দিন স্পর্শ। করেননি, তবে কুকুট মাংসে তাঁর আপত্তি নেই। বিশ্বনাথ তা জেনেই আগে থেকে অতগুলি। মোরগ কিনে রেখেছেন। মোরগ আর মুগীর মধ্যে বিশ্বনাথ নিজে আবার মুর্গী পছন্দ করেন না।

এ ছাড়া বিশ্বনাথ সঞ্চয় করে রেখেছেন পাঁচ সের অতি উৎকৃষ্ট ঘি, এক মণ দাদখানি চাল, মটর-মুসুরি-সোনামুগ ইত্যাদি নানা রকম ডাল, আধ মণ করে আলু ও পেঁয়াজ, এক বস্তা চিঁড়ে, অনেকগুলো পাটালি গুড়, আরও কত কী। তাঁর শ্যালক যাতে বাজার খরচা করতে না পারে সেই জন্যই বিশ্বনাথের এই বন্দোবস্ত। প্রথমদিন এসে এসব দেখেই প্রতাপ বুঝতে পারলেন তাঁর ছোড়দির দু' একখানি গয়না নিশ্চিত জলাঞ্জলি গেছে। বিশ্বনাথ যেমন পাগল, শান্তি আবার ততটাই নরম। বিয়ের পর থেকেই প্রায় মায়ের কাছে থেকেছেন বলে তাঁর সংসারবুদ্ধি হয়নি। বিশ্বনাথ আগেও তাঁর স্ত্রীর গয়না ভেঙেছেন, প্রতাপ জানেন। ভবিষ্যটা যে কী করে চলবে তা এঁরা দু জনেই বোঝে না। প্রতাপ মনে মনে ঠিক করে রাখলেন, ওস্তাদজীর সঙ্গে পরে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

একতলায় চারখানি কামরা, ছাদে একটি চিলেকোঠা আছে, সেখানে সুহাসিনী ঠাকুর-ঘর করেছেন। দেশ ছেড়ে আসবার সময় নারায়ণ শিলা সঙ্গে এনেছেন সুহাসিনী, এখানে নিত্য তার পুজোর ব্যবস্থা হয়েছে। এক দুবেজী এসে দু বেলা ফুল ছিটিয়ে যায়, তার মাস মাইনে আড়াই টাকা। বছর সাতেক আগে সুহাসিনী কাঠিয়াবাবার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, সকাল সন্ধ্যায় তাকে বেশ কিছুক্ষণ ঠাকুরের সামনে চুপ করে বসে থাকতে হয়। এরকম

বসে থাকাটা সুহাসিনীর পক্ষে সত্যিই খুব কষ্টকর। যত ছোটবেলা থেকে প্রতাপ মায়ের চেহারাটা মনে করতে পারেন, তাতে মনে পড়ে সুহাসিনীর স্বভাবটি দারুণ চঞ্চল। এক জায়গায় স্থির হয়ে পাঁচ মিনিটও বসতে পারেন না। কেউ হয়তো সুহাসিনীকে কোনো কথা বুঝিয়ে বলছে, তার মাঝখানেও সুহাসিনীর অন্য কথা মনে পড়ে যায়, অমনি তিনি উঠে চলে যান। এ জন্য তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। কতবার বকুনি খেয়েছেন। এত বয়েসেও তাঁর সেই স্বভাবটি যায়নি। এই রকম মানুষের পক্ষে ঠাকুরের সামনে চোখ বুজে বসে থাকা তো একটা শাস্তি। তা হলে কী দরকার ছিল মন্ত্র নেবার? একটা বয়েসে সব মহিলাই এ রকম মন্ত্র নেন, তাই সুহাসিনীও নিয়েছেন।

চুপ করে তিনি থাকতে পারেন না অবশ্য। প্রথম প্রথম তো দু' পাঁচ মিনিট পরেই ভুল করে উঠে পড়তেন, এখন চোখ বুজে বসে থাকলেও মুখ চলে। মাঝে মাঝেই বলে ওঠেন, ও শান্তি, ছাদে বড়ি শুকোতে দিয়েছি, দ্যাখ তো কাকে মুখ দিল নাকি? ওরে টুনি কোথায় গেল দ্যাখ, তার গলা শুনছি না কেন? ওরে বিশ্বনাথ বাজার যাচ্ছে নাকি, ওকে বল সন্ধব লবণ আনতে। এই সবই হলো সুহাসিনীর মন্ত্র।

সুহাসিনীর স্বভাবটি যেমন চপলতায় ভরা, তাঁর চোখে তাঁর ছেলে-মেয়েরাও এখনও যেন ছেলেমানুষ। প্রতাপের ডাক নাম খোকন। তিনি এখন লম্বা-চওড়া জোয়ান পুরুষ, তিন ছেলেমেয়ের বাবা, তবু সুহাসিনী প্রায়ই তাঁকে বলেন, ও খুকন, তুই আমার সামনে আইস্যা বয় তো একটু, তোর মাথায় হাত বুলাইয়া দেই। এত কাজ করস, কত রকম ভাবনা-চিন্তা, মাথা গরম হইয়া যায় না?

মা মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেনই, প্রতাপের অস্বস্তি লাগে, তাই দেখে পিকলু বাবুলরা হাসে। বিশ্বনাথ রঙ্গ করে বলেন, মা, আপনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন না কেন? আমার বুঝি মাথা গরম হয় না?

সুহাসিনী সরল ভাবে উত্তর দেন, তুমি তো কাজ করো না, তুমি তো গান গাও!

সুহাসিনীর কথা শুনে সবাই হেসে গড়াগড়ি যায়।

এবারে কলকাতা থেকে এসে পৌঁছোবার পর সুহাসিনী প্রতাপকেই প্রথমে বলেছিলেন, আহা রে, সারা রাইত ট্রেনে কইরা আইছস। বড় কষ্ট হইছে নারে?

বিশ্বনাথ বললেন, বাঃ, বেশ তো মা। আপনার ছেলের বউ এলো, নাতি-নাতনীরা এলো। তাদের কোনো কষ্ট হলো না, শুধু আপনার ছেলেরই একা কষ্ট হয়েছে!

সুহাসিনী বললেন, অগো তো মুখ শুকনা দেখি না, ভালোই তো দেখি, খুকনেরই তো দেখি চক্ষের নিচে কালি!

মমতা বললেন, মা, আপনার ছেলে যে শখ করে সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসেছে। এক ফোঁটা ঘুমায় নি!

এ কথা শুনে সুহাসিনী একেবারে আর্ত হয়ে পড়লেন। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। তাঁর সন্তান এক রাত্রি ঘুমোয় নি এরকম একটা মহা দুঃসংবাদ শোনার জন্য তাঁকে বেঁচে থাকতে হলো? তিনি বললেন, কও কি, বৌমা, তোমরা অরে ঘুমাইতে দাও নাই? এমনিতেই মাথায় : কত চিন্তা, কত কাম করে,...ওরে শান্তি, খুকনের জন্য চিনির সরবৎ কইরা দে? অ্যাখনি দে!

প্রতাপ দু হাত ছুঁড়ে বললেন, আঃ মা, তুমি কী যে করো! হঠাৎ আমি চিনির সরবৎ খেতে যাবো কেন? একটু চুপ করে বসো, অনেক কথা আছে।

সুহাসিনী তখন কোনো কথা শুনতে আগ্রহী নন, তিনি প্রতাপের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, খা, আগে একটু সরবৎ খাইয়া ল, তাতে মাথা ঠাণ্ডা হয়!

প্রতাপ বললেন, দিদি-জামাইবাবু আসেন নি, তুমি তাঁদের কথা একবারও জিজ্ঞেস করলে না?

শান্তি বললেন, খোকনরে দ্যাখলে মা আমাগো কথা ভুইল্যা যায়।

সুহাসিনী বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই শান্তিড়া বড় হিংসা-হিংসি করে। ছুটবেলা থাইক্যাই ও খুকনের লগে।

বিশ্বনাথ বললেন, তা তো একটু হিংসে করতেই পারে। আপনি আপনার ছেলেকে এত ভালোবাসেন যে আমারও হিংসে হয়।

মায়ের বিধবা বেশ প্রতাপের চোখে এখনও অভ্যস্ত হয়নি। নীল রঙের শাড়ীর দিকে সুহাসিনীর বেশী সুহাসিনীর বেশী ঝোঁক ছিল। প্রতাপের চোখে এখনও তাঁর মাতৃমূর্তি নীলবসনা। সুহাসিনী এখন পরে আছেন সাদা থান, তাঁর কপাল ও সিঁথি বড় বেশি সাদা। এই বয়েসেও সুহাসিনীর চুল পিঠ ছাড়িয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর সুহাসিনী ন্যাড়া হতে চেয়েছিলেন, প্রতাপ তীব্র আপত্তি করে তা আটকেছেন। প্রতাপ তাঁর ঠাকুমা ও বড় পিসিমার মাথায় কোনো দিন মেয়েলি চুল দেখেন নি। আগেকার কালে বিধবারা মাথা ন্যাড়া করতেন, তারপর আর চুল বাড়তে দিতেন না। কিন্তু প্রতাপ নারীদের মাথায় কদম ছাঁট চুল সহ্য করতে পারেন না।

মমতাকে এবং স্টেশান থেকে আসবার পথে বিশ্বনাথকেও শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মায়ের কাছে দিদি জামাইবাবুর না-আসার কারণটা যথা সম্ভব সামলে সুমলে বলতে হবে। বড় জামাইবাবুর চাকরি নেই শুনলে মা উতলা হয়ে পড়বেন। তিনি নিশ্চিত চাইবেন তাঁর বড় মেয়ে আর জামাইকে দেওঘরে নিজের কাছে এনে রাখতে। সেটা সম্ভব নয়। তাতে সংকট বাড়বে ছাড়া কমবে না। বড় জামাইবাবুর ম্যালেরিয়া এবং সামনেই তুতুলের পরীক্ষা, এই দুটিই ওদের না আসার কারণ হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। ওঁরা জানুয়ারি মাসে আসবেন।

বড় জামাইবাবুকে নিয়ে প্রতাপের একটা গোপন দুশ্চিন্তা চলছে। ওঁর যে শুধু চাকরি গেছে। তাই-ই নয়, বিপদটা তার চেয়েও বড়, ওঁর মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। এখানে আসবার দিন দশেক আগে সুপ্রীতি একদিন প্রতাপকে আলাদা ডেকে এই কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলেন। বাইরে থেকে এখনও বিশেষ কিছু বোঝা না গেলেও সুপ্রীতি

ঠিকই বুঝেছেন যে তাঁর স্বামী আর আগের মতন নেই। তাঁর অস্তিত্বের কেন্দ্রটা নড়ে গেছে কোনো ভাবে। প্রতাপও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, কিছুদিন ধরেই অসিতদা খুব কম কথা বলেন, প্রায় সর্বক্ষণ গুম হয়ে থাকেন, কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেও সহজে উত্তর দিতে চান না। অথচ কী হাসি খুশী, প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন অসিতদা।

সুহাসিনী বেশ স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিয়েছেন তাঁর বড় মেয়ে জামাইয়ের না-আসার কারণটা। শান্তি আর সুপ্রীতির চরিত্রের অনেক তফাত আছে, সুপ্রীতি খুবই বুদ্ধি ধরেন, মাথা ঠাণ্ডা, সব দিকে বিবেচনা আছে, সেই জন্যই সুপ্রীতির সংসার নিয়ে তাঁর মা বিশেষ দুশ্চিন্তা করেন না।

বেশ হৈ চৈ করে এখানে দিন কাটতে লাগলো। দু বছর পর পারিবারিক মিলন। দেশের বাড়িতে সেই প্রতি বছর পুজোর সময়ের যে আনন্দ তা তো আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তবু দেওঘরের পরিবেশটি বেশ মনোরম।

সকালবেলাতে বিশ্বনাথের গানের স্কুল বসে। বছরের অন্য সময়ের তুলনায় এই সময়টাতেই। বিশ্বনাথের ছাত্র ছাত্রী জোটে একটু বেশি। খানিকটা শীত পড়লেই যক্ষ্মা রুগীরা হাওয়া বদলের জন্য দুতিন মাস বাড়ি ভাড়া করে এখানে সপরিবারে থাকে। তাদের ছেলে মেয়েরা জুটে যায়। বিশ্বানাথের ইস্কুলে। বিশ্বনাথের আফশোস তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত জানেন না। ইদানীং ঐ গানের খুব চাহিদা। গার্জেনরা এসে বলেন, মাস্টারজী, দু তিন খানা রবীন্দ্র সঙ্গীত তুলিয়ে দিতে পারেন না? মেয়ের বিয়ের সময় আজকাল যে পাত্রপক্ষ রবীন্দ্র সঙ্গীত চায়!

বাইরের টানা বারান্দায় শুরু হয় ক্লাস। এখন ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা এগারো জন, মাইনে। প্রত্যেকের পাঁচ টাকা। শান্তি বলছিলেন, কেউ কেউ মাইনে না দিলেও বিশ্বনাথ কিছুতেই চাইবেন না। টাকা নিয়ে গান শেখাতে হচ্ছে বলে বিশ্বনাথের মনে এমনিতেই গ্লানি রয়ে গেছে।

মমতা জোর করে পিকলু, বাবলু, মুন্নিকেও জুড়ে দিয়েছেন গানের ক্লাসে। পিকলু তবু কথা শোনে, কিন্তু বাবলু- মুন্নি কিছুতেই বসতে চায় না, মমতা দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দেন। সবাই এক টানা গান ধরে :

এ রি মইকা সব সুখ দিও
দুধ পুত আওর ধন জন লছমী

একবার এ পর্যন্ত হলেই বিশ্বনাথ চেঁচিয়ে বলেন, আবার ধরো, এ রি মইকা...।

সুরটা প্রতাপের কানে লাগে। প্রথম দিন তিনি বিশ্বনাথকে বলেছিলেন,ওস্তাদজী, আপনি সক্কালবেলাতেই পূর্বী সুর গাওয়ান কেন ওদের? আশাবরী বা রামকেলি ধরালে হতো না?

বিশ্বনাথ হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, আরে শিশুদের আর সকাল-সন্ধে কী? ওদের তো যতক্ষণ জেগে থাকা, সেই সব সময়টাই উৎসব! তাই না? তাছাড়া তুমি লক্ষ্য করবে, ব্রাদার, অবরোহণের সুর বাচ্চাদের গলায় সহজে আসে, ভালো আসে।

ইস্কুল-পর্ব শেষ হলে ভজন সিং-এর কোয়াটারে মোরগ কাটা শুরু হয়। বিশ্বনাথ চুরুট টানতে টানতে নির্দেশ দেন। কাজটি সহজ নয়। প্রত্যেকদিনই একটা না একটা মোরগ বেড়া ডিঙ্গিয়ে পালায়। যে-মোরগটিকে কাটা হবে সেই কি টের পায়,নাকি যে পালায় তারই ওপর মৃত্যুদণ্ড পড়ে! ভজন সিং-এর ছেলেমেয়েরা আর পিকলু বাবলুরা সেই মোরগ ধরে আনার জন্য ছোটে। এই কাজটি বাবলু বেশ ভালো পারে, প্রায়ই তারই হাতে ধরা পড়ে মোরগটি।

কাটার কাজটি নেয় ভজন সিং-এর নেপালী বউটি। রান্নাও সেই করে, বেশ ভালো রান্নার হাত, তবে অসম্ভব ঝাল দেয়। প্রতাপের তাতে আপত্তি নেই, বিশ্বনাথেরও না, কিন্তু মমতা একটুও ঝাল মুখে ছোঁয়াতে পারেন না। ছেলেমেয়েদেরও ঝাল খেতে দিতে চান না মমতা, তাই নিয়ে রোজ এক কাণ্ড। নেপালী বউটি কিছুতেই ঝাল কমাবে না, আর ছেলেমেয়েরা মুর্গীর মাংস খাবেই। এই মাংসে একটা নিষিদ্ধ ব্যাপারের স্বাদ আছে, এ মাংস বাড়ির

মধ্যে ঢুকবে না, বাগানে বসে খেতে হবে। প্রত্যেকদিনই পিকনিক। পিকলুবাবলু খাওয়ার মাঝপথে উস-আস শব্দ করে, চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে, তবু খাওয়া ছাড়ে না।

একদিন মোরগ কাটা চলছে, এমন সময় সামনের গেট ঠেলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা প্রবেশ করলো। পুরুষটির ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মান্যগণ্য করার মত চেহারা, মহিলাটির একজন অকাল-প্রৌঢ়া, অন্যজন পরিণত যুবতী। অভ্যেসবশতু, প্রতাপ মহিলা দুটিকেই আগে ভালো করে লক্ষ্য করলেন। টুকটুকে লাল শাল জড়ানো যুবতীটির দিকে দু'এক পলক বেশি তাকিয়ে প্রতাপের ওষ্ঠে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠলো।

বিশ্বনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, ঐ তো, সত্যেনরা এসেছে। ব্রাদার, তুমি ওদের চেনো নাকি?

প্রতাপ বললেন, মনে হচ্ছে ওঁদের মধ্যে একজনকে চিনি। মেঘহীন আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে নির্মল রোদ, প্রতাপের চোখেরও কোনো দোষ নেই, তবু কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন চতুর্দিক ঝাঁপসা অন্ধকার মনে হলো প্রতাপের। কেন যেন একটা প্রবল ঝড়ের দৃশ্য মনে পড়ে গেল। সে রকম ঝড় প্রতাপ সারাজীবনে আর দেখেন। নি। অনেকদিন আগেকার কথা, তবু প্রতাপের স্পষ্ট মনে আছে, সেই ঝড় শেষের দিবাগত রাতেই বুলার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়েছিল।

৪ বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে তুতুলকে

বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে তুতুলকে ইস্কুলে পাঠিয়ে সুপ্রীতি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন গেটের সামনে। চোদ্দ বছর বয়েস হয়েছে তুতুলের, এখনো সে ফ্রক পরেই স্কুলে যায়। ঠিক এই বয়েসেই সুপ্রীতির বিয়ে হয়েছিল, অথচ তখন সুপ্রীতি তুতুলের মতন এত ছোট ছিলেন না। সব কিছু বোঝার মতন জ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

সুপ্রীতির বয়েস এখন চুয়াল্লিশ, কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য নিভাঁজ। তাঁর মনে প্রসন্নতা আছে, তাই আধকাংশ সময়েই তিনি সহাস্য থাকেন। তবে আজ সকাল থেকেই তিনি উদ্বিগ্ন, মুখে বার বার একটা ছায়া এসে পড়ছে।

তুতুল পথের বাঁকে মিলিয়ে যাবার পর সুপ্রীতি গেট বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে এলেন। সামনে ঢাকা বারান্দা, তারপর বসবার ঘর। এ ঘরের সোফা-সেটগুলোর স্প্রিং নষ্ট হয়ে গেছে, ঢাকনাগুলি বিবর্ণ, কোনোটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ছোবড়া। মেঝের কার্পেটটা শতচ্ছিন্ন, ওটাকে রাখার আর কোনো মানেই হয় না। কিন্তু এ ঘরের কোনো কিছুই পরিবর্তনের অধিকার সুপ্রীতির নেই।

ঘরের এক কোণে নোংরা জামা কাপড়ের স্তূপ, সেদিকে তাকিয়ে সুপ্রীতি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ডাকলেন, মানদা, মানদা!

ভেতরের উঠোনের খোলা কলতলায়, মানদা বাসনপত্তর ধুচ্ছিল, ডাক শুনে সে জল-হাতে এসে দাঁড়ালো। সুপ্রীতি কাপড়ের স্তূপটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, এগুলো এখানে কে রেখেছে?

মানদা বললো, আমি রাখিনি তো, ভূষণের মা ফেলে গেছে নির্ঘাৎ!

সুপ্রীতি বললেন, তাকে ডাকো!

ভূষণের মাকে ডেকে আনতে একটুক্ষণ দেরি হলো, সুপ্রীতি সেখানেই অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। আজ ভোরবেলাই একটা খারাপ খবর এসেছে। তাঁদের কাশীপুরের বাগানবাড়িটা বিক্রির জন্য সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, কাল মাঝ রাত্রে এক দঙ্গল রিফিউজি ঢুকে পড়েছে সেখানে। সে বাড়ির দারোয়ানকে নাকি তারা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল, কোনোক্রমে ছাড়া পেয়ে সে ছুটতে ছুটতে ভোরে এসে দুঃসংবাদ জানিয়েছে। এ বাড়ির বয়স্ক পুরুষরা সবাই গেছেন কাশীপুরে। কী হবে কে জানে! এদিকে তুতুলের সঙ্গে আজ বাড়ির কোনো একজনকে পাঠানো উচিত ছিল। কাল স্কুল থেকে

ফিরে তুতুল তাঁকে একটা চিঠি দেখিয়েছিল, একটা ছেলে রাস্তায় তুতুলের হাতে ঐ চিঠি গুঁজে দিয়েছে। ভুল বানান, খারাপ। চিঠি। এ পাড়াটাও দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুতুলের পরীক্ষা চলছে, আর দু'দিন মাত্র বাকি আছে। তাকে স্কুলে না পাঠাবারও উপায় নেই।

ভূষণের মা এসে বললো, কী বলছো, বউদি?

সুপ্রীতি বললেন, এইসব জামাকাপড় এখানে কে রেখেছে? তুমি?

ভূষণের মা কোনো জরুরী কাজ করছিল, এত সামান্য কারণে তাকে ডাকা হয়েছে বলে সে বেশ অবাক হয়ে বললো, ওগুনো তো কাঁচতে যাবে, ধোপা আসবে বলে আমি রেখিচি!

সুপ্রীতি বললেন, কাঁচতে যাবে, ভেতরের বারান্দায় রাখতে পারোনি? বসবার ঘরে নোংরা। কাপড় কেউ রাখে? বাইরের লোকজন যদি আসে?

ভূষণের মা বললো, বারান্দায় রাখলে আবার কার সঙ্গে মিশে যাবে, সব গুণে-গেঁথে রাখা আচে–

তার কথা মাঝপথে থামিয়ে সুপ্রীতি জোর দিয়ে বললেন, বাইরে নিয়ে যাও ওগুলো, আর কোনোদিন এখানে রাখবে না!

সুপ্রীতির বকুনিতে ঝাঁঝ নেই কিন্তু নিশ্চিত আদেশ আছে। ভূষণের মা অন্য তরফের ঝি হলেও সুপ্রীতির কথা অগ্রাহ্য করতে পারে না। এ বাড়িতে ঝি-চাকরদের তুই-তুকারি করাই। প্রথা। একমাত্র সুপ্রীতিই তার ব্যতিক্রম।

ইদানীং এই বসবার ঘর ব্যবহারই হয় খুব কম। এই বাড়ির সমস্ত পুরনো সৌষ্ঠবই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আদব-কায়দা বদলে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, তবু সুপ্রীতি যথাসাধ্য সব বজায় রাখতে চান। কার্পেট বদলাতে না হয় খরচ লাগে, তা বলে ঝি-চাকররাও সহবৎ ভুলে যাবে?

তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন তিনতলায়। দোতলায় দুই নারী কণ্ঠের ঝগড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, সুপ্রীতি সেদিকে কান দিলেন না। পুরুষরা বাড়িতে না থাকলেই মেয়েদের সময় কাটাবার প্রধান খেলা, জিভের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। সুপ্রীতি প্রথম প্রথম অবাক হতেন। এখন আর গ্রাহ্য করেন না। অনেক সময় তাঁর উদ্দেশেও দূর থেকে শর বর্ষণ হয়। কিন্তু কেউ সামনা-সামনি কিছু না বললে উত্তর দেন না সুপ্রীতি, সেই জন্য তাঁর আড়ালের ডাক নাম হয়েছে দেমাকী।

কাশীপুরে এতক্ষণ কী ঘটছে কে জানে! তাঁর স্বামী অসিতবরণকে সেখানে পাঠাবার ইচ্ছে ছিল না সুপ্রীতির, কিন্তু খুড়শ্বশুর জোর করে নিয়ে গেলেন। ব্যাপার অতি গুরুতর। এই বনেদী যৌথ পরিবারটি এখন নানান ঋণভারে জর্জর। শরিকে শরিকে মামলা শুরু হয়ে গেছে। বসত বাড়িটির মেরামত- প্রসাধন হয়নি অনেকদিন। কাশীপুরের সেভেন ট্যাঙ্কস লেনের তাঁদের সম্পত্তিটা অনেকদিন এমনিই পড়ে ছিল। সেটা বিক্রি করে টাকাটা সকলে ভাগাভাগি করে নেবার প্রস্তাবে মতের মিল হয়েছিল। এখন যদি সেখানে রিফিউজি বসে যায়, তাহলে তো আর সেটা বিক্রি হবে না! এক পাঞ্জাবী, কার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরির মালিক, ঐ জমি-পুকুরসমেত বাড়িটি কিনতে চেয়েছিল, এখন সে পিছিয়ে যাবে।

এক পুরুষ যদি আশাতিরিক্ত উপার্জন করে, তাহলে পরবর্তী দু'তিন পুরুষ তা ওড়ায়। পরিশ্রমের সম্পদ আলস্যে মিলিয়ে যায়। অসিতবরণের ঠাকুদার বাবা জানকীবল্লভ সরকার সাহেবদের বেনিয়ানগিরি করে কলকাতা শহরে বাড়ি-জমি কিনেছিলেন। ছোটখাটো পাতলা চেহারার মানুষ ছিলেন তিনি, সারা জীবন কৃচ্ছতা সাধন করে গেছেন, সামান্য সুতলি-দড়িটুকুও কখনো ফেলতেন না, পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে জমিয়ে রাখতেন। অর্থলোভ তাঁকে অর্থপিশাচ করে তুলেছিল। কেন এবং কার জন্য, কিসের জন্য যে তিনি বহু লোককে বঞ্চিত করে এই বিপুল সঞ্চয় রেখে যাচ্ছেন সে ব্যাপারে তাঁর মনে কখনো কোনো প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে সব সময় বোধহয় একটা বিপরীত শক্তি কাজ করে। শেষ জীবনে, জানকীবল্লভ সরকার যখন পক্ষাঘাতে পঙ্গু, তখন তাঁর নাকের ডগার ওপর দিয়েই তাঁর গুণধর পুত্র বাঈজী নাচ, পায়রা ওড়ানো, মোসাহেব

পোষার প্রতিযোগিতা দিয়ে টাকা উড়িয়েছে। পিতার বিলাস ব্যসনে অনাসক্তি সুদে-আসলে উসুল করে নিয়েছে তাঁর ছেলেরা।

জানকীবল্লভ চা ও পাটের দালালির ফার্ম খুলে গিয়েছিলেন, এক পুরুষেই তা উঠে যায়। তারপর থেকে এই পরিবারটির প্রধান আয় সম্পত্তি বিক্রি করা। খাস কলকাতায় তিনটি বাড়ি, ঢাকুরিয়ার জমি, ব্যারাকপুরের জমি, রাঁচীর জমি, বৈঠকখানা বাজারের অংশ, সব একে একে বিক্রি হয়ে যেতে লাগলো। এ তো বড় আরামের পেশা, পরিশ্রম নেই, অফিস যাওয়া নেই। মাথা ঘামানো নেই। শুধু কয়েকটি দলিলে উঁকিলের নির্দেশ মতন সই করলেই টাকা আসে।

অসিতবরণের বাবার আমল পর্যন্ত এই রকমভাবেই চলে এসেছে, কোনো কিছুই আটকায়নি। সম্পত্তি বিক্রি করা ছাড়াও তখনও পর্যন্ত বেশ কিছু কোম্পানির কাগজের সুদ আসতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেই সব কিছু কিছু কম্পানি ফেল পড়ে। ছোট ছোট ব্যাংকগুলির মড়ক শুরু হয়ে যায়।

কাশীপুরের বাগানবাড়িটিই ছিল এ পরিবারের শেষ ভরসা। ঐ প্রমোদ ভবনটি ছিল অসিতবরণের জ্যাঠামশাই বরদাকান্তর অতি প্রিয়। দেশ স্বাধীন হয়েছে, উনবিংশ শতাব্দীর রাতিনীতি যে এখন আর চলে না তা তিনি মানতে চাইতেন না, পঞ্চ ম-কার নিয়ে মচ্ছব তিনি ৩খনো চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গান্ধীজী যেদিন দিল্লিতে গুলি খেয়ে মারা গেলেন সেদিন সন্ধেবেলা সেই খবর পেয়ে বরদাকান্ত ঐ কাশীপুরের বাগানবাড়িতে একটি বিশাল পার্টি দিলেন। ঐ নেংটি পরা, রোগা টিং টিং-এ জাতির পিতাটিকে তিনি ঘোরতরভাবে অপছন্দ করতেন; গেঁধো, ঐ মা মুদির ছেলে ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতেন। অবশ্য কেন যে তাঁর এই বিরাগ তা বোঝা যেত না। সেদিনই মাঝরাতে মত্ত অবস্থায় দুটি বাজারে বারাঙ্গনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে হঠাৎ পুকুরে পড়ে তিনি মারা যান।

বরদাকান্তর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই সরকার পরিবারে পুরনো যুগের সমাপ্তি। তারপর আর হাতে খাঁটি ঘি-এর গন্ধও রইলো না, সবাই ডালডা জোটাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ঐ কাশীপুরের বাগানবাড়ি আর কেউ ব্যবহার করেনি, অপয়া বিবেচনায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। ঐদিকে জমির দাম কম বলে বিক্রির কথাও আগে মনে আসেনি। ইদানীং পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্তরা কলকাতার প্রান্তসীমাগুলিতে উইপোকার মতন ঢিবি গড়ে তুলছে। তাই জমির দামও তেজী হচ্ছে। পাঞ্জাবী কার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরির মালিকটি নিজের থেকেই খোঁজ-খবর করে ঐ বাড়িটি কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল মাস দু'এক আগে।

কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্তদের চেয়েও যে অনেক গুণ বেশি সংখ্যক নিঃস্ব উদ্বাস্তুরা আসছে, তারা যেখানে সেখানে তাঁবু গাড়ছে, পতিত জমি, ভুতুড়ে বাড়িগুলিতে তো বটেই, ধনীদের সাজানো-গোছানো প্রমোদ ভবনেও ঢুকে পড়ছে পঙ্গপালের মতন, সে সংবাদ প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে বের হয়, তবু কর্তাদের হুঁস হয়নি। ঐ বাড়িতে ভালো পাহারার ব্যবস্থা। করেননি। একটা মাত্র রোগা-পটকা ধূর্ত, ঠগ দারোয়ানের ওপর সব ছেড়ে রাখা ছিল। দারোয়ানটি মাঝে মাঝে কয়েক কাঁদি ডাব আর মৌসুমী আম-লিচু দিয়ে যেত। তাতেই খুশী ছিলেন সবাই।

সকালবেলা খবরটা শোনার পর সুপ্রীতি বুঝেছিলেন, ঝাঁপটাটা তাঁর ওপরেই পড়বে বেশি। দোতলার মহিলাদের বাক্যবাণ তাঁর প্রতি আরও বেশি করে বর্ষিত হবে। তিরিশ বছর আগে বিয়ে হলেও এখনো কেউ ভুলতে পারে নি যে, সুপ্রীতি বাঙাল বাড়ির মেয়ে। ঐ জবরদখলকারী, হাড়-হাভাতে, বদমাইশ রিফিউজি গুলো তো সুপ্রীতিরই জাত ভাই!

মালখানগরের সচ্ছল, গোষ্ঠী-অধিপতি ভবদেব মজুমদার তাঁর বড় মেয়ে সুপ্রীতির বিয়ে দিয়েছিলেন এক পশ্চিমবঙ্গীয় পরিবারে। প্রায় অভূতপূর্ব ঘটনা বলা যেতে পারে। সেই সময় ব্রাহ্ম বা বৃহৎ ধনী বংশ ছাড়া, সাধারণ হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বিবাহ খুব একটা সহজ স্বাভাবিক ছিল না। বাঙাল-ঘটি ভেদাভেদ ছিল হাসিঠাট্টার চেয়েও অনেক গভীরে। প্রায় দ্বিজাতিগত বিভেদের মতন। দেশ বিভাগের পরই বরং পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুরা প্রাথমিক তিক্ততা কাটিয়ে ওঠবার পর বুঝতে পারলো, প্রতিবেশী

মুসলমানদের সঙ্গে তাদের ব্যবহারিক অমিল ছিল যৎসামান্য, মিলই বেশি, প্রায় আত্মীয়ের মতন। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গীয়দের সঙ্গে তাদের মানসিক ব্যবধান অনেকখানি। দেশ বিভাগ হলো ধর্মের ভিত্তিতে, কিন্তু দেখা গেল ধর্ম কোনো বাধা নয়, আবার শুধু ধর্ম মানুষের মধ্যে মিলন ঘটাতেও পারে না।

অসিতবরণের বাবা উমাপতি সরকারের সঙ্গে ভবদেব মজুমদারের পরিচয় হয় শিলং পাহাড়ে। দু'জনেই সপরিবারে একই হোটেলে উঠেছিলেন। উমাপতি একদিন দেখলেন যে, ভবদেব একা লাউঞ্জে বসে দাবা খেলছেন। উমাপতিরও সাঙ্ঘাতিক দাবার নেশা, বিনা আলাপেই তিনি উল্টোদিকে বসে পড়লেন, শুরু হয়ে গেল খেলা, তারপর টানা চারদিন ধরে। সেই খেলা চললো, কেউ আর মাতই হয় না, খেলা শেষ হবে কী করে? দাবার খেলার যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে দু'জনেই দু'জনকে বেশ পছন্দ করে ফেললেন। অন্তরঙ্গতা এত দূর। গড়ালো যে, ভবদেব প্রায় জোর করে উমাপতি সরকারের পরিবারের সকলকে নিয়ে এলেন। মালখানগরে। উমাপতির সেই প্রথম পূর্ববঙ্গে আগমন। পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে তাঁর ভুল ধারণা ছিল, ভয়ের ভাব ছিল, তিনি জানতেন যে, ওসব হলো বিশ্রী জলকাদা ভরা জায়গা, আঁশটে গন্ধ, অধিবাসীদের মুখের ভাষা বর্ববসুলভ। ওখানকার লোকেরা কলকাতায় এসে সভ্য হয়। তিনি নিজে ওখানে গিয়ে দেখলেন দিব্যি পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি, চতুর্দিকে অজস্র ফল-পাকুড়, মানুষগুলি অতিথিপরায়ণ এবং নিজেদের মধ্যে এরা দুবোধ্য ভাষায় কথা বললেও বাইরের লোকের সঙ্গে মোটামুটি সাধারণ বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে জানে।

বিয়ের প্রস্তাবটা উমাপতিই দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁদের পরিবার যেমন পড়তির দিকে, ভবদেবের অবস্থা তেমনই এখন বর্ধিষ্ণু। এ বাড়িতে লেখাপড়ার চল আছে, এমন কি স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত বই পড়ে। তাঁর ছেলে অসিতবরণের বয়েস তখন উনিশ, গৌরবর্ণ, লম্বা-চওড়া যুবক, পারিবারিক রীতি অনুযায়ী সদ্য বখামিতে দীক্ষা নিয়েছে, এক কাকার প্ররোচনায় ইতিমধ্যেই একটি সোনার হাতঘড়ি গোপনে বিক্রি করেছে। উমাপতির নিজের চরিত্রও এমন কিছু গঙ্গাজলে ধোয়া পূত পবিত্র নয়, বউবাজারে তাঁর

একটি রক্ষিতা আছে সবাই জানে। তবু তিনি অনুভব করেছিলেন, নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে তাঁর ছেলেটিকে অন্য পথে চালনা করতে হবে। তাঁর এই একমাত্র বংশধরকে সংশোধন করার উপায় হলো বরানগরের বিষাক্ত পরিবেশ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা।

তিনি অসিতবরণকে ভর্তি করে দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভবদেবকে বললেন, ভাই, তোমার বড় কন্যাটিকে আমায় দাও!

লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না, এক্ষেত্রেও আলাপ-আলোচনা ও চিঠিপত্র চলেছিল প্রায় বছরখানেক ধরে। ইতিমধ্যে অসিতবরণ ঢাকার হস্টেল থেকে মাঝে মাঝেই চলে আসে মালখানগরে। যতই পড়ন্ত হোক তবু বনেদিবাড়ির ছেলেদের সাজ-পোশাকের একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, কথাবার্তা ও ব্যবহারে অন্য ধরনের মার্জিত ভাব থাকে, অসিতবরণেরও সেসব ছিল, তাছাড়া সে ছিল স্বভাব-লাজুক। এই রূপবান, নম্র যুবকটিকে সুহাসিনীর খুব পছন্দ হয়ে গেল। ভবদেব অভিজ্ঞ, বিষয়ী মানুষ, তিনি কলকাতায় এসে বরানগরের সরকার বাড়ির অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন, তখনও ও বাড়ির বাইরের ঠাট অনেকটা বজায় থাকলেও অন্তঃসারশূন্যতা ভবদেব ঠিকই টের পেয়ে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর আপত্তি ছিল, কিন্তু সুহাসিনীর উৎসাহে সেই আপত্তি ভেসে গেল।

সুহাসিনী আর ভবদেব দু'জনেই চান সবাইকে কাছাকাছি রাখতে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে পুরের বাড়ি পাঠানোতে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না, জাত কুল মিলিয়ে সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট। অসিতবরণও প্রায় ঘর-জামাই হয়েই রইলেন বছর পাঁচেক। দু'বারের চেষ্টায় বি-এ পরীক্ষাতেও পাস করলেন ঢাকা থেকে। তারপর উমাপতির অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাঁকে বরানগরে চলে আসতে হলো সম্পত্তির ভাগ নেবার জন্য। কিন্তু পুরনো সম্পত্তির ভাগ নেওয়াও সহজ কথা নয়, অধিকার রক্ষার জন্য সর্বক্ষণ জাঁকিয়ে বসে থাকতে হয়। তাই বসত বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকার আর উপায় রইলো না।

স্বামীর সংসারে এসে সুপ্রীতি প্রথম দিকে পদে পদে অবাক হয়েছেন। বিরাট যৌথ পরিবার, অসিতবরণের কাকা-জ্যাঠা-পিসিরা সবাই একই বাড়ির বিভিন্ন অংশে থাকেন, কিন্তু সবাই যেন সবার শত্রু। সামনাসামনি কলহ নেই কিন্তু আড়ালে প্রত্যেকে অপরের নামে নিন্দে করে। এবং সে নিন্দের মধ্যে ফুটে ওঠে নির্দয়তা। সুপ্রীতি এ রকম কখনো দেখেননি। তিনি আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে স্নেহ পেতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

সুপ্রীতি আরও দেখলেন, এ বাড়িতে পড়াশুনোয় কোনো গুরুত্বও নেই। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়, তাদের জন্য মাস্টারও রাখা হয়, কিন্তু তারা কী শিখছে, পাস করছে না ফেল করছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পট পট করে খারাপ ভাষা ব্যবহার করে, কেউ নিষেধ করে না তাদের। বড় ননদের ছেলে, যার বয়েস মাত্র এগারো, সে বাড়ির একটি ঝি-কে মাগী বলে সম্বোধন করছে অথচ তার মা নির্বিকার, এই দেখে-শুনে সুপ্রীতি শিউরে উঠেছিলেন!

বিয়ের পরই সুপ্রীতি একদিন তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার নামটা কে রেখেছিল?

অসিতবরণ বলেছিলেন, আমার দাদু। কেন, আমার নামটা খারাপ?

সুপ্রীতি বলেছিলেন, তোমার চেহারার সঙ্গে তো তোমার নামের কোনো মিলই নেই। অসিত মানে তো কালো। তুমি কি ছোটবেলায় কালো ছিলে?

অসিতবরণের গায়ের রং কাশ্মীরীদের মতন গৌর। কোনো কালো রঙের বালক পরবর্তী জীবনে এ রকম টকটকে ফর্সা হতে পারে না।

অসিতবরণ দারুণ অবাক হয়ে বলেছিলেন, অসিত মানে কালো? কে বললে তোমাকে? আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে,অসিতবরণ নিজে তো তার নামের অর্থ জানতোই না, এমনকি তাঁর বাবা কাকা-জ্যাঠাদের কারুরই কখনো মনে আসেনি যে, এই ছেলের ভুল অর্থে নাম রাখা হয়েছে।

এখানে এসে সুপ্রীতি বিশেষ যত্ন করে কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর কথার বাঙাল ভাষার টান মুছে ফেলেছিলেন। অবশ্য, গেসলুম, বলেছিলিস, করগে যা, মরগে যা এই ধরনের ভাষা শিখতে তাঁর দীর্ঘকাল লেগে গেছে। সামনে কুচি দিয়ে শাড়ী পরতে তিনি আগেই শিখে এসেছিলেন, চিনি দিয়ে রান্না ডাল আর ঝালবিহীন মাছের ঝোল খেতে তিনি অতি দ্রুত রপ্ত হয়ে। গেলেন, তবু বাঙাল বাড়ির মেয়ে, এই নাম তাঁর ঘোচেনি।

সুপ্রীতির প্রথম সন্তান হয়েছে বিয়ের দীর্ঘকাল পরে। এক সময় ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর ছেলে-মেয়ে হবে না, তাঁর ভাসুর অসিতবরণের আবার একটি বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে কিছুদিন মন কষাকষিতে সুপ্রীতি চলে গিয়েছিলেন বাবা-মায়ের কাছে। টানা আট মাস মালখানগরে থাকার সময় সেখানেই তুতুলের জন্ম হলো। অসিতবরণ। গিয়েছিলেন স্ত্রী কন্যাকে ফিরিয়ে আনতে।

সুপ্রীতি যে বাঁজা নন তা প্রমাণিত হলো বটে কিন্তু তুতুলকে এ বাড়িতে কেউ সানন্দে বরণ করে নেয়নি। অনেকেই প্রায় প্রকাশ্যে মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, আবার মেয়ে! এ বাড়িতে মেয়েদের বড় অবহেলা। মেয়েরাও মেয়েদের অপছন্দ করে, বরং তারাই বেশি অপছন্দ করে। অসিতবরণের কাকা-জ্যাঠাদেরও কোনো পুত্র সন্তান হয়নি, সকলেরই দু'তিনটি করে মেয়ে।। অথচ তাঁর পিসিদের ও এক বিধবা বোনের সব মিলিয়ে সাতটি ছেলে। সরকার পরিবারের। এখন বংশ রক্ষা করাই দায়।

সুপ্রীতির দ্বিতীয় সন্তানটি সাত দিনের বেশি বাঁচেনি। সেও মেয়ে ছিল, তাই তার অকালমৃত্যুতে কেউ শোক করেনি। রাগে-দুঃখে সেই সময়েই সুপ্রীতি চেয়েছিলেন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে।

সুপ্রীতি অনেকবার অসিতবরণকে বুঝিয়েছেন, এ বাড়িতে তোমার অংশ বিক্রি করে দিয়ে চলো আমরা কোনো ভাড়া বাড়িতে থাকি!

অসিতবরণ ততদিনে চাকরি নিয়েছেন, অনেকটা স্বাবলম্বী। তাঁর কর্মস্থল বেশ দূরে, বরানগর ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকতে তিনি খুব একটা অরাজি নন, কিন্তু বাড়ি নিয়ে মামলাই যে মিটতে চায় না, তার আগে তাঁর অংশ বিক্রি হবে কী করে? একবার ছেড়ে চলে গেলে কিছুই পাওয়া যাবে না।

সুপ্রীতি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি শূন্য। কাশীপুরের বাগানবাড়ি উদ্ধার করতে গিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। অসিতবরণের সেজো কাকা ঐসব ব্যাপারে খুব দক্ষ। কিন্তু অসিতবরণ যদি জড়িয়ে পড়েন, তিনি সামলাতে পারবেন না। কয়েক মাস হলো অসিতবরণ হঠাৎ বদলে গেছেন, তাঁর কথা ও ব্যবহার অসংলগ্ন। এই সময় প্রতাপ থাকলে তার সাহায্য নেওয়া যেত, কিন্তু প্রতাপ তো চলে গেছে দেওঘরে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। সুপ্রীতির যাওয়া হলো না.... .

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে স্বামীর চেয়ে মেয়ের জন্যই সুপ্রীতি বেশি চিন্তা করতে লাগলেন। তুতুল দেখতেই বড় হয়েছে, কিন্তু তার মনটা এখনো অতি সরল। এ বাড়ির অন্য ছেলে-মেয়েদের সংস্পর্শ থেকে তুতুলকে তিনি যত দূর সম্ভব আড়াল করে রেখেছেন। কাল তুতুল বাড়ি ফিরে চিঠিখানা সুপ্রীতিকে দিয়ে বলেছিল, মা, আমাকে এইসব কথা লিখেছে। কেন? আজ দারোয়ানকে বলে দেওয়া হয়েছে, সর্বক্ষণ যেন স্কুলের সামনে বসে থাকে। দারোয়ানটা আবার যা বোকা, তার ওপর আফিংখোর।

বিরলে ছাড়া সুপ্রীতি কখনো কাঁদেন না। আজ তাঁর চোখে জল। সম্ভব হলে সুপ্রীতি নিজেই আজ তুতুলের সঙ্গে স্কুলে গিয়ে বসে থাকতেন। কিন্তু এ বাড়ির বউদের তা করবার উপায় নেই। হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সুপ্রীতি বললেন, ঠাকুর, মেয়েটা যেন ভালোয় ভালোয় আজ পরীক্ষা দিয়ে ফিরে আসে। ঠাকুর, রক্ষা করো; আমার যে এখন দেখার আর কেউ নেই!

৫ দেশ বিভাগের পর দুটি নতুন দেশ

দেশ বিভাগের পর দুটি নতুন দেশেরই কর্ণধার হয়েছেন দুই বিলেতে শিক্ষিত ব্যারিস্টার। দু'জনেই পাক্কা সাহেব। সাহেব হবার পরীক্ষা শুধু সঠিক উচ্চারণের ইংরিজি ভাষণেই নয়, এক ধরনের আলাদা হাসিও রপ্ত করতে হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবিগুলি তুলনা করলেই বোঝা যায় যে নেহরু ও জিন্না বেশ কিছুদিন সেই বিলিতি হাসির প্রতিযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলেন। জিন্না অবশ্য নতুন রাষ্ট্রটির কর্তৃত্ব সুখ বেশিদিন ভোগ করতে পারলেন না, অকালে চলে গেলেন, নেহরু রয়ে গেলেন শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব করার জন্যই নয়, একজন বিশ্বনেতা হিসেবে স্বীকৃত পাবার আকাঙ্ক্ষায়।

বিলিতি ওয়েস্ট কোটের সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে, ওপরে সর্ট কলার লাগিয়ে জওহরলাল নেহরু একটি নতুন পোষাকের প্রবর্তন করলেন, যার নাম জওহর কোট। ঐ পোষাকটিই হলো নতুন ভারতের শাসন ব্যবস্থার প্রতীক। নামে স্বদেশী, বাকি সবটাই বিদেশের অনুকরণ। এ দেশের আশি ভাগ লোক নিরক্ষর, নিরন্ন, ভাগ্য-তাড়িত, কিন্তু সরকার চলতে লাগলো প্রাক্তন ইংরেজ-পদ্ধতিতে।

লড়াই করেছিল অনেকেই কিন্তু কংগ্রেসই ভারতের স্বাধীনতা এনেছে, এরকম বিদিত হয়ে গেল। গান্ধীজী দু-চারবার ক্ষীণভাবে বলেছিলেন, দেশের স্বাধীনতা আসার পর আর কংগ্রেস পার্টির অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই, ওটা তো ছিল সংগ্রামের জন্য একটি মিলিত প্ল্যাটফর্ম, এখন ঐ দলটি ভেঙে দেওয়া হোক, গড়ে উঠুক আলাদা রাজনৈতিক দল। গান্ধীজীর অন্যান্য আরও উচিত মন্ত্রণার মতন, এ-প্রস্তাবেও কেউ কর্ণপাত করেনি। যারা ক্ষমতায় এসেছে। তারা একখানা সারা দেশব্যাপী তৈরি দল, হাজার হাজার শাখা, কার্যালয়, আসবাবপত্তর ও টাকা পয়সার সুযোগ ছেড়ে দিতে চায়নি। গান্ধীজীর পরামর্শকে তারা বার্ধক্যের এলোমেলোমি বলে উড়িয়ে দিল। এমনকি কংগ্রেস দলের পতাকা ও জাতীয় পতাকার প্রায় হুবহু মিলের যে সুফল আছে অনেকখানি তা টের

পাওয়া গেল প্রথম সাধারণ নির্বাচনে। দেশের মানুষ কংগ্রেসকেই চেনে, বিরোধীপক্ষ তো কিছু নেই-ই বলতে গেলে।

পূর্ব ভারতের উদীয়মান কংগ্রেসী নেতা অতুল্য ঘোষ একদিন পার্টির কর্মীদের কাছে উদারভাবে বললেন, আরে বাবা, তোমরা কমুনিস্ট পার্টি ব্যান করার কথা কেন বলছো? সে তো ইচ্ছে করলেই করা যায়। ওরা থাক না! একটা অপোজিশান না থাকলে কী খেলা জমে?

রাজার চার পাশে যেমন মোসাহেবরা ঘিরে থাকে সেই রকমই কংগ্রেসী শাসকদের সঙ্গে জুটতে লাগলো ধনী, সুযোগ-সন্ধানী ও অর্থলোভীর দল। পণ্ডিত নেহরুর এটা পছন্দ নয় কিন্তু তান এদের ঝেড়ে ফেলতেও পারছেন না। যৌবনে তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন, এক সময় ঘোষণা করেছিলেন যে সময় এলেই তিনি কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবেন। সময় যখন এলো, কালোবাজার যখন সমস্ত আলো বাজারকে গ্রাস করে নিল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন ল্যাম্প পোস্টগুলো বোধহয় যথেষ্ট মজবুত নয়। ওদিকে আগে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

পণ্ডিত নেহরু গরিবদের সমব্যথী। হ্যাঁ,গরিব তো আছেই, তারাই দেশ জুড়ে, তাদের কথা চিন্তা করতে হবে, তাদের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা বানাতে হবে, জনসভায় তাদের কথা বলতে হবে, সে সব ঠিক আছে, কিন্তু সে সব শুধু দিনের বেলা। কিন্তু সন্ধের পরও গরিবদের চিন্তায় সময় কাটানো কি সম্ভবপর? তখন দু-একটা পার্টি, একটু নাচ, কিছু ফস্টিনস্টি, দু- একপেগ শেরি পান, বা পারিবারিক পরিবেশে সংস্কৃতি-চর্চা, ঘুমোবার আগে বিখ্যাত কবির দু-চার লাইন কবিতা পাঠ, এসব না হলে স্নায়ু ঠিক থাকবে কী করে?

এত বড় দেশ, এখানে এক বছর খরা, অন্য বছর বন্যা। কিংবা যে বছর অনাবৃষ্টি বা অতি বৃষ্টির ভয় থাকে না, সে বছরও এক অঞ্চলের তুলনায় অন্য অঞ্চল মার খায়। দু-চার লাখ চাষীর ফসল নষ্ট হওয়া নতুন কিছু ঘটনা নয়, বরং তা একঘেয়েমির পর্যায়ে চলে গেছে। প্রত্যেকবার এই সব চাষীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার বদলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে

চিন্তা করা অনেক বেশি জরুরি। একদা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহানুভূতি সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে। আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমা বানাচ্ছে জেনে তিনি। খুবই বিক্ষুব্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন দেশ বৃহত্তম খুনী হিসেবে জয়লাভ করেছে। এখন, শান্তির সময়েও কি তারা সারা পৃথিবীটাকে ধ্বংস করার কথা ভাবছে? পণ্ডিত নেহরু তার জোরালো প্রতিবাদ জানালেন, এই নিয়ে ভারতের সংসদে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটলো। চার মাস বাদেই অবশ্য সংবাদ এলো রাশিয়ায় প্রথম আণবিক বোমার পরীক্ষার। সেই বিস্ফোরণে কারাকোরাম মরুভূমির একটা পাহাড় উড়ে গেল। দুঃখিত, উদ্ভ্রান্ত জওহরলাল চুপ করে রইলেন।

অবিরাম উদ্বাস্তু আগমন নেহেরুর বিবেকে আর একটি কাঁটা। দেশ বিভাগের আলোচনার সময় তিনি দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেননি। একদিকে সব মুসলমান আর একদিকে হিন্দু, এ আবার হয় নাকি? এই বিংশ শতাব্দীতে! নেহেরু প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি অ্যাগনস্টিক, তিনি ঈশ্বর-উদাসীন। সেটাই তো বিশ্বনাগরিকের আধুনিকতা। সামান্য নেটিভদের মতন তিনি পুজো-ফুজো, নামাজ-আরাধনায় ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসী নন। কিন্তু পুরোনো ব্রিটিশ শাসকদের নীতি অনুসরণ করে তিনিও কোনো ধর্মীয় সংস্কার বা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচারের ব্যাপারে মাথা ঘামালেন না। যে-দেশে শতকরা নব্বই ভাগ লোক কুসংস্কার-তাড়িত, সামান্য বাইরের প্ররোচনাতেই ধর্মের নামে হাতিয়ার তুলে নেয়, কথায় কথায় রক্তের স্রোত বয়ে যায়, যারা ধর্মের কিছুই বোঝে না অথচ তারাই মারে অথবা মরে, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে রইলেন এমন একজন যিনি ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মচর্যাকে অরুচিকর বিবেচনায় আত্মশ্লাঘা বোধ করেন।

উদ্বাস্তু আগমনের ব্যাপারটাতেও পণ্ডিতজী বড় তিতিবিরক্ত হয়ে আছেন। পঞ্জাবের দিকটায়। প্রথম প্রথম কাটাকাটি, খুনোখুনি যা হবার তা হয়ে গেছে। ওদিক থেকে ট্রেন ভর্তি মৃতদেহ এলে তার প্রত্যুত্তরে এদিক থেকেও ট্রেন ভর্তি শব গেছে। মাউন্টব্যাটেনের আমলেই ওদিক থেকে যারা চলে আসবার এসেছে, এদিক থেকে যারা যাবার, গেছে।

কিন্তু বাংলার দিকে যে আগমন-নির্গমন কিছুতেই থামে না। পশ্চিম বাংলার ডাক্তারবাবু মুখ্যমন্ত্রী অনবরত বেশি টাকা চাইছেন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ছুতো করে।

এই বাঙালীরা সব সময়েই শিরঃপীড়া। তবু বড় বাঁচোয়া এই যে সুভাষবাবু বিমানের আগুনে পুড়ে মরেছেন কিংবা কোথাও নিরুদ্দেশে গেছেন, তাঁর পরে বাংলায় আর কোনো বড় জননেতা নেই। অগ্নিযুগের বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তা ভুলে গিয়ে এখন ফরাসী সাধনসঙ্গিনী নিয়ে পরমার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত, যাক নিশ্চিন্ত। সুভাষবাবু বেঁচে থাকলে অথবা চালু থাকলে এই সময় বড় ঝঞ্ঝাট করতেন। আটচল্লিশ সালের পর গান্ধীজী-বিহীন কংগ্রেসে সুভাষবাবু নিশ্চিত হতেন এক মূর্তিমান উপদ্রব। কে জানে, বাহান্ন সালের নির্বাচনের সময় সুভাষবাবু হঠাৎ উপস্থিত হলে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে হতো কি না। পঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারত সুভাষবাবুর বেশ ভক্ত।

এ বছরের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের নির্বাচনে ফজলুল হকের বিরাট জয়ের সংবাদে খণ্ডিত ভারতেও অনেকখানি আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। প্রাচীন বিশ্বাসযোগ্য এই মানুষটি আর যাই হোক সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি দেবেন না। ফজলুল হক মুসলিম লিগের সংস্পর্শে থাকতে, চাননি, বরং মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সহায়তায় সংযুক্ত বাংলায় মন্ত্রিসভা গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখন দিল্লির সিংহাসন নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, বাংলা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। ফজলুল হককে সমর্থন না জানিয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। বিস্ময় বিমূঢ় ফজলুল হক আইরিস নেতা পারনেলের মতন আহত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, ইউ হ্যাভ থ্রোন মি টু দ্য উৎস! তারই ফলাফল, ছেচল্লিশ সালে। কলকাতার পথে পথে রক্তস্রোত।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ফাটল ধরেছে, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ধূমায়িত হচ্ছে অসন্তোষ। পশ্চিমের জঙ্গী মনোভাব পূর্বের সংস্কৃতি-মনস্ক শিক্ষিত মানুষ মেনে নিতে পারে না। নিবার্চনে জয়লাভ করে ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানে অ-মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। দেশভাগের নামে বাঙালী জাতির মধ্যেও বিভেদ-রেখা টানায় তাঁর

ঘোরতর আপত্তি। ওপারে মুসলমান আর এপারের হিন্দুরা কেন পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাবে! ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, তিনি ভিসা ব্যবস্থা তুলে দেবেন। দুদিকের আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে অবাধ সাক্ষাৎ মোলাকাতের আর কোন অন্তরায় থাকবে না।

কিন্তু মাত্র এক মাস কাটতে না কাটতেই পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টায় আবার খঙ্গাঘাত হলো। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ কুদ্ধ হয়ে জানালেন ফজলুল হক দেশের শত্রু, ঐ লোকটা স্বায়ত্ত শাসনের কথা উচ্চারণ করেছে! ভেঙে দেওয়া হলো পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা, ফজলুল হক গৃহবন্দী হলেন। শেখ মুজিবর রহমান নামে এক তরুণ অগ্নিবর্ষী নেতা নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। সেনাপতি ইস্কান্দার মির্জার হাতে তুলে দেওয়া হলো সর্বময় কর্তৃত্ব।

বাঙালীর মিলন আরও সুদূর পরাহত হলো। ফজলুল হকের আশ্বাসে যে সাময়িক নিশ্চিন্ততার ভাব এসেছিল তা ঘুচে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লো আতঙ্ক। পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার প্রবাহিত হলো উদ্বাস্তুদের স্রোত।

এই লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ শিশু বৃদ্ধের মাথা গোঁজার জায়গা কোথায়? সবাই ধেয়ে আসে কলকাতার দিকে। লণ্ডনের অনুকরণে গড়া প্রাক্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই দ্বিতীয় নগরী, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্পন্ন; এর গায়ে আঘাত করতে লাগলো অবাঞ্ছিত অতিথিদের নোংরা হাত। শিয়ালদা স্টেশনের কোনো প্লাটফর্মে পা ফেলার জায়গা নেই। শুয়ে আছে মানুষ। ফুটপাথগুলি হাঁটার অযোগ্য হয়ে উঠলো, সেখানে গড়ে উঠছে মানুষের আস্তানা। তেতাল্লিশের দুর্ভেক্ষের সময় কলকাতা শহর নোংরা হতে শুরু করেছিল, এখন থেকে নোংরামিটাই হলো তার প্রধান চরিত্র। নগর কোতোয়াল বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণ কেউ এ ব্যাপারে মাথা ঘামালেন না।

রুশ বিপ্লবের পর ধনীদের প্রাসাদগুলি দখল করে নিয়েছিল প্রলেতারিয়েতরা, এ দেশে বিপ্লব হয়নি। বিপ্লবপন্থী কয়েকটি রাজনৈতিক দল আছে বটে কিন্তু তারাও হঠাৎ এত লক্ষ

লক্ষ প্রলেতারিয়েতদের কোন কাজে লাগাবে তা বুঝে উঠতে পারলো না। জেলখাটা, আদর্শবাদী তরুণেরা এই অরাজকতার মধ্যেই একটা খণ্ড প্রলয় বাধিয়ে দিতে উৎসাহী, কিন্তু প্রবীণ পোড়খাওয়া নেতাদের দৃষ্টি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের দিকে। এই লক্ষ লক্ষ মানুষই একদিন ভোটদাতা হবে। তখন এদের কাজে লাগবে। সুতরাং ওদের সুদূর আন্দামান বা দণ্ডকারণ্যে পাঠানো সমর্থন করা যায় না।

গত শতাব্দীর বেনিয়ান মুৎসুদ্দী ও উটকো জমিদারেরা হঠাৎ ধনী হয়ে আড়ম্বর বিলাসিতার অঙ্গ হিসেবে কলকাতার চতুর্দিকে অনেক বাগান বাড়ি নির্মাণ করেছিল। সেইসব প্রমোদ উদ্যানে যেমন ছিল বিলিতি কায়দায় অর্কিড হাউজ, ফার্ণ-গ্রোভ আবার তেমনই ছিল ঝাড়-লণ্ঠন সজ্জিত নাচঘর। সেইসব অনেক বাগানবাড়িরই এখন জীর্ণ দশা, যথার্থভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা মালিকদের নেই, অধিকাংশ বাড়িই শূন্য পড়ে থাকে। প্রকৃতিই শূন্যতা পছন্দ করে না, মানুষ কী করে পারবে। অরক্ষিত বাড়িগুলিতে নিরাশ্রয় মানুষেরা দল বেঁধে ঢুকে পড়তে শুরু করলো। সবক্ষেত্রে নিজেদের সাহসে কুলোয় নি, রুশ বিপ্লবের ভক্তদের ব্যক্তিগত প্ররোচনা ছিল কোথাও কোথাও।

যে-সব মালিক এখনো প্রভাবশালী ও তৎপর তারা স্থানীয় এম এল এ-দের হাত করে, পুলিশী সাহায্য নিয়ে ঝটিতি ঐ সব জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করে অন্য কোনো পতিত জমি বা মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ঠেলে দিয়ে এসেছে। কিন্তু বরানগরের সরকারদের সে সামর্থ্যও নেই।

অসিতবরণ তাঁর কাকাদের সঙ্গে যখন কাশীপুরের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছোলেন তখন। সেখানে রক্তপাত শুরু হয়ে গেছে।

প্রায় পাঁচ-সাত বছর এ বাড়ির কোনো ব্যবহার ছিল না, কর্তারা কেউ আসতেন না, সরকার বাড়ির ছেলেপুলেরা দু একবার শুধু পিকনিক করে গেছে। কর্তাদের এই ঔদাসীন্যের সুযোগ। নিয়ে এ বাড়ির দারোয়ান ভেতরের নাচ ঘরটি অন্যদের ভাড়া দিতে শুরু করেছিল। শৌখিন। ফুলবাবুরা চাঁদনী রাতে আসতে সুরা ও সাকীদের সঙ্গে নিয়ে।

দারোয়ানকে পাঁচ দশ টাকা বখশিস দিতে তাদের কার্পণ্য হবে কেন? একজন পুলিশ অফিসারও আসতেন মাঝে মাঝে। এ রকম আরও অনেকে।

বাহারী গ্রীল লাগানো, শক্ত তারের জাল দিয়ে ঘেরা অর্কিড হাউজে অনেকদিনই একটিও অর্কিড নেই, সেখানে খড়ের ছাউনি বিছিয়ে একটা বেশ ব্যবহারযোগ্য বড় ঘর করা হয়েছে, সাত আটজন অবিবাহিত কারখানার মজদুর সেখানে থাকে, তারা নিয়মিত ভাড়া দেয়, সেখানে রান্না। করে খায়, অনেকটা মেসবাড়ির মতন। তারা যে ভাড়া দেয় তা বাড়ির মালিক পায় কি পায় না। তা তাদের জানবার কথা নয়, এই ঘরের ওপর তাদের একটা অধিকার বর্তে গেছে।

গতকাল মাঝ রাত্রে হৈ হৈ করে যখন উদ্বাস্তুরা এই বাগানে ঢুকে পড়লো তখন ঐ মজদুরদের জনা চারেক গিয়েছিল নাইট ডিউটিতে। জনা চারেক গাঁজা খেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। প্রথমে তারা ভেবেছিল বুঝি ডাকাত পড়েছে।

জবর দখলকারীরা হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে তাদের শরীরের ওপরেই দাপাদাপি করতে লাগলো। তাতেই শুরু হলো সংঘর্ষ।

উদ্বাস্তুদের একজন নিজস্ব নেতা তৈরী হয়েছে, তার নাম হারীত মণ্ডল। এই রকম বাগানবাড়ি দখলে তার বেশ অভিজ্ঞতা জন্মে গেছে, সে-ই আগে থেকে গোপনে সন্ধান নিয়ে এক একটি দলকে ডেকে আনে।

রোগা, লম্বা চেহারার হারীত মণ্ডল, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, হাতে একটা বেঁটে লাঠি নিয়ে। ঘোরাতে ঘোরাতে আর নাচতে নাচতে চ্যাঁচাতে লাগলো, জাগা ছাড়বি না! জাগা ছাড়বি না! সব মাটিতে শুইয়া পড়! যে-যেখানে শুবি তার সেই জাগা!

অর্কিড হাউজের বাসিন্দা শ্রমিকরাও সহজে তাদের দখল ছাড়তে চায়নি, তাদের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হতে দেখে তারাও রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের ঐ উদ্দাম স্রোতের বিরুদ্ধে তাঁরা কতক্ষণ পারবে।

সেই চারজনকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে বাইরের রাস্তায়, দুজন গুরুতরভাবে আহত। একজনের বাঁ হাতটা উড়ে গেছে কোনো অস্ত্রের কোপে।

অসিতবরণরা এসে পৌঁছোবার আগেই অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে এখানে। শ্রমিকরা অবাঙালী, তাদের নির্যাতনের সংবাদ শুনে স্থানীয় একটি কারখানা থেকে ছুটে এসেছে অন্য অবাঙালী শ্রমিকেরা। তারা সবাই ষণ্ডা পালোয়ান। এদিকে হাড় জিরজিরে, বুভুক্ষু মরীয়া উদ্বাস্তুরাও লাঠি-সোঁটা, খন্তা-শাবল যে যা পেয়েছে হাতে নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। একটা বড় রকমের দাঙ্গা বাধবার উপক্রম।

থানা বেশি দূরে নয়, পুলিশকে তাড়াতাড়ি আসতে হয়েছে বাধ্য হয়েই। বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা। এর গুরুত্ব অন্যরকম। স্থানীয় এম এল এ-ও এসেছেন, কারণ এ তো সাধারণ জবর দখলের ব্যাপার নয়। তিনি দু পক্ষকেই বোঝাতে চাইছেন, কিন্তু চিৎকার হল্লায় কান পাতা দায়। উদ্বাস্তুরা বাঙাল ভাষায় কত রকম যে গালাগালি দিচ্ছে তা অনেকে বুঝতেই পারছে না।

বেলা বাড়ার আগে কাছাকাছি আর কয়েকটি জবর দখল বাগান বাড়ির বাসিন্দারা ধেয়ে এলো এই উদ্বাস্তুদের সমর্থনে। আবার হাতাহাতি, ইট ছোঁড়াছুঁড়ি হলো এক পর্ব, পুলিশ দুটি টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটালো।

অসিতবরণের সেজো কাকা জলদবরণ বদরাগী ধরনের মানুষ। তাঁর মাথায় বাবরি, গালের জুলপি ও গোঁফ পশ্চিমীদের ধরনে গালপাট্টা করা। জ্যাঠতুতো বোনের বর লক্ষ্মীকান্তও গোঁয়ার ধরনের। কাশীপুরের বাড়িটি বিক্রি করার সম্ভাবনায় তারা কয়েকদিন বেশ উৎফুল্ল ছিল, অকস্মাৎ একি উৎপাত। আসবার পথেই তাঁরা বরানগর থেকে কয়েকজন ষণ্ডামার্কা বাজারের গুণ্ডা সঙ্গে এনেছেন। এখানে এসে দেখলেন সেভাবে কিছু সুবিধে হবে না।

জলদবরণ কংগ্রেসী নেতাটিকে ডেকে নিজেদের পরিচয় দিলেন। মধ্যবয়স্ক, ছোটখাটো চেহারার নেতাটি ভোর রাত থেকে এই ঝঞ্ঝাট সামলাতে সামলাতে নাজেহাল হয়েছেন। তিনি খুবই ক্লান্ত ও বিরক্ত। পুলিশ হুট করে গুলি চালিয়ে দিলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনেক অবনতি হবে। এই মনে করেই তিনি স্থানত্যাগ করতে পারছেন না।

জলদবরণের দলটিকে দেখে চোখ কপালে তুলে তিনি বললেন, আপনারা আবার এর মধ্যে এসে পড়েছেন কেন? চলে যান, চলে যান!

এমনভাবে কারুর আদেশ শোনায় অভ্যস্ত নন জলদবরণ। কোনোদিন তিনি সকাল দশটার আগে ঘুম থেকে ওঠেন না। আজ তাঁকে সাড়ে সাতটার সময় ডেকে তোলা হয়েছে বলে তখন। থেকেই মেজাজ খারাপ। গত রাত্রির নেশা এখনো সম্পূর্ণ কাটেনি, চক্ষু রক্তাভ। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, সে কি মোয়াই, আমাদের নিজেদের বাড়ি, বাপ-পিতেমো কষ্ট করে বানিয়ে গ্যাছেন, সেখানে আমরা আসতে পারবো না? ঐ ভূতগুলো এসে দখল নেবে আর আমরা নো-হোয়্যার হয়ে যাবো?

কংগ্রেসী নেতাটি তাঁর বাহু ধরে টেনে পুলিশ ভ্যানের আড়ালে এসে দাঁড়ালেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, আপনাদের পরিচয় জানতে পারলে আরও হল্লা হবে। থানায় ডায়েরি করুন, তারপর কোর্টে কেস করুন, এখানে জোর খাটাবার চেষ্টা করবেন না।

সব জননেতার পাশেই অন্তত দু'তিনজন দেহরক্ষী থাকে। তাদের একজন বললো, আজকাল এদিকটাতে রিফিউজিদের ওপর হেভি সেন্টিমেন্ট। জোর করে হটাতে গেলে লাশ পড়ে যাবে। আপনাদের ওপরেই ফাস্টে অ্যাটাক হবে।

জলদবরণ বললেন, তা হলে আপনারা আছেন কী করতে? ভোটের সময় ভোট ভিক্ষে করতে আসেন, এদিকে ভিকিরির পাল জোর করে এসে বাড়ি দখল করবে, এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি?

তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগলো কিছুক্ষণ। অন্য এক কাকা চেষ্টা করতে লাগলো পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায় কি না। বাড়ির দুই জামাই সঙ্গে এসেছে। তাদের অভিমত এই যে, যা কিছু করার আজই করতে হবে। একবার ওদের গেড়ে বসতে দিলে আর সরানো যাবে না।

অসিতবরণ প্রথম থেকেই একটাও কথা বলেননি। গম্ভীর, উদাসীন মুখ। আদ্দির পাঞ্জাবী ও কোঁচানো ধুতি পরা অসিতবরণকে দেখলে অনেকেই চলচ্চিত্র অভিনেতা ছবি বিশ্বাস বলে ভুল করে, শরীরের গড়নে ও মুখের আদলে কিছুটা মিল আছে। অসিতবরণ কিছুদিন আগেও বেশ আমুদে, হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন, মাস ছয়েক ধরে কথাবার্তা প্রায় একেবারে বন্ধ করেছেন। তাঁকে আনা হয়েছে একজন প্রধান শরিক হিসেবে, যে-কোনো সিদ্ধান্তে তাঁর। মতামতের একটা মূল্য আছে। অথচ অসিতবরণ কোনো মন্তব্যই করেননি এ পর্যন্ত।

জলদবরণ কথা বলতে বলতে গলা চড়িয়ে ফেলতেই বেশ কিছু লোক এদিকে আকৃষ্ট হলো। নতুন গণ্ডগোলের সম্ভাবনায় পুলিশ নেমে পড়লো লাঠি হাতে। কংগ্রেসী নেতাটি। হাতজোড় করে জলদবরণকে বললেন, আপনারা আর এখানে দাঁড়াবেন না, প্লীজ, অনুরোধ করছি, আরও গোলমাল পাকাবেন না। আপনারা বরং বিধানবাবুর কাছে যান।

একটা ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি শুরু হতেই জলদবরণকে সদলবলে পশ্চাৎ অপসারণ করতে হলোই। তখুনি তাঁরা যাত্রা করলেন উঁকিল বাড়ির দিকে। অসিতবরণ যে সঙ্গে আসেননি তা। তাঁদের খেয়ালই হলো না।

অসিতবরণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তার ঘাড়টা একটু কাৎ হয়ে গেছে, চোখের প্রায় পলক পড়ছে না। এত রকম মানুষের কণ্ঠস্বর, এত উত্তেজনা কিছুই যেন টের পাচ্ছেন না তিনি, শুধু এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন বাড়িটির দিকে।

৬ ছাত্র বয়েসে প্রতাপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু

ছাত্র বয়েসে প্রতাপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল মামুন। প্রতাপের মতন সে-ও পড়তে এসেছিল কলকাতায়। ঢাকা অনেক কাছে হলেও উচ্চশিক্ষার জন্য সচ্ছল পরিবারের ছেলেদের কলকাতায় পাঠানোই রেওয়াজ ছিল তখন। অনেকটা বিলেত পাঠাবার আগের ধাপের মতন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে প্রতাপ এসে ভর্তি হয়েছিল শিয়ালদার কাছে রিপন কলেজে। প্রতাপের ইচ্ছে ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার, কিন্তু তাতে ভবদেব মজুমদারের সম্মতি ছিল না। ওঁদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি ছিল ঐ রিপন কলেজের গায়েই, সেখানেই প্রতাপের থাকার ব্যবস্থা। কলকাতার রাস্তায় কত রকম বিপদ-আপদ, যখন তখন ট্রাম-বাস ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে এসে পড়তে পারে। সুতরাং বাড়ির পাশে কলেজ পাওয়া তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।

প্রেসিডেন্সি কলেজে না পড়তে পারার দুঃখটা প্রতাপের মনের মধ্যে অনেকদিন রয়ে গিয়েছিল। শিয়ালদা থেকে দূরত্ব অতি সামান্য। প্রতাপ তো পরে কতবার হেঁটে হেঁটেই কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছে। তাছাড়া যে আত্মীয়ের বাড়িতে প্রথম ওঠা হয়েছিল, তিন মাসের বেশি সেখানে টেকা যায়নি। ওরা সকাল-বিকেলে জলখাবার দিত না। এক বিধবা মহিলা ছিলেন যেমন শুচিবায়ুগ্রস্ত তেমনি ঝগড়াটি, বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি পালা করে সারা দিন ধরে ঝগড়া চালিয়ে যেতেন। তাঁর গলার আওয়াজ শুনেই প্রতাপ ‘কাংস-বিনিন্দিত কণ্ঠ’ কথাটার মানে বুঝেছিল। অতিষ্ঠ হয়ে প্রতাপ সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক মেস বাড়িতে। কিন্তু তখন আর প্রেসিডেন্সি কলেজে ট্রান্সফার নেবার সময় ছিল না।

সেকেণ্ড ইয়ারে এসে মামুনের সঙ্গে সৌহার্দ্য হয় প্রতাপের। শ্যামলা রঙের বড়সড়ো চেহারা, মুখোনা চৌকো মতন, সেই বয়েসেই যথেষ্ট দাড়ি-গোঁফ উঠেছে। আপাতত

মামুনকে রুক্ষ স্বভাবের মনে হয়, তার মুখের ভাব কঠিন ও গম্ভীর, কিন্তু আসলে সে অতিমাত্রায় লাজুক। ক্লাসে এসে একেবারে লাস্ট বেঞ্চিতে সে বসে, প্রফেসারদের বক্তৃতার সময় সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সামনের দিকে, সহপাঠীদের সঙ্গে একটিও কথা বলে না। কমন রুমে কিংবা কলেজের সামনের ফুটপাথের আড্ডায় তাকে দেখতে পাওয়া যায় না কখনো। ক্লাস শেষ হলেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্লাসের ছেলেরা আড়ালে তার নাম দিয়েছিল মোল্লা।

প্রতাপ প্রথম থেকেই জনপ্রিয়। সহজাত ব্যক্তিত্বের জন্য সে যে-কোনো ছোট-খাটো দলের নেতার ভূমিকা পেয়ে যায়। বিশেষ কোনো চেষ্টা না করেই সে ম্যাগাজিন সাব কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে, কলেজের ফুটবল টিমেও সে স্থান পেয়েছে। তার বন্ধু বান্ধব অনেক।

ক্লাসে পাঁচজন মুসলমান সহপাঠী, তাদের মধ্যে দু'জনকে পোশাক দিয়েই চেনা যায়। তারা পরে চাপা পায়জামা ও কলিদার পাঞ্জাবি, মাথায় সাদা রঙের টুপী, থুতনিতে নূর। তারা বাংলা বলে না। সবচেয়ে চাকচিক্যময় চরিত্র লুৎফর রহমানের, তাকে দেখতে পাক্কা সাহেবের মতন, তীক্ষ্ণ ধারালো মুখ, সে থ্রি পীস সুট পরে এবং বাড়ির শোফার-চালিত অস্টিন গাড়িতে চেপে কলেজে আসে। পার্ক সাকাসের এক বনেদী ধনী পরিবারের সন্তান সে, কথাবার্তায় দারুণ তুখোড়, ডিবেট কমপিটিশানে তার সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারে না। এই ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র পরেশ মুখার্জিকে লুৎফর রহমানের তুলনায় অনেক ম্লান মনে হয়।

লুৎফরকে ক্লাসের সবাই চেনে কিন্তু তার সঙ্গে কারুর ঠিক বন্ধুত্ব হয় না। সহপাঠীদের সে যেন একটু অবজ্ঞার চোখে দেখে, কেউ ঠিক তার ঘনিষ্ঠতার যোগ্য নয়, রূপে-গুণে সে অন্যদের চেয়ে অনেকখানি দূরত্বে আছে। হয়তো সে বয়েসেও খানিকটা বড়, তার ভাবভঙ্গিও বড়দের মতন। মাঝে মাঝে সে কায়দা করে বাঁ হাতটা ঘুরিয়ে মুখের সামনে এনে কব্জীবাঁধা ঘড়ি দেখে। বলে, আজ নেকস্ট ক্লাসটা অ্যাটেণ্ড করতে পারছি না, আমাকে চলে যেতে হবে। আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

ধনীর দুলাল লুৎফর পার্ক সাকাস থেকে এত দূরের রিপন কলেজে পড়তে এসেছে কেন তার কারণ সে নিজেই জানিয়েছিল একদিন। এই কলেজে আছেন প্রফেসার বি ডি আইচ, তাঁর মতন ইংরিজি আর কেউ পড়াতে পারেন না, তাঁর কাছ থেকে খাঁটি ইংলিশ অ্যাকসেন্ট শেখবার জন্যই লুঙ্কর এত দূরের রিপন কলেজে এসেছে।

প্রফেসার বি ডি আইচের পড়ানো শুনলে প্রতাপের কিন্তু হাসি পেত। মানুষটি মধ্যবয়স্ক, চশমার লেন্স এত পুরু যে চোখ দেখা যায় না, মাথার চুল কাঁচা-পাকা ও অবিন্যস্ত, দাঁতে হলদে ছোপ। সারা বছরই তিনি কালো রঙের কোট প্যান্ট পরে আসেন, সে দুটির অবস্থাও জরাজীর্ণ। তিনি নাকি অক্সফোর্ডের ভালো ছাত্র ছিলেন, বিলেতে বহু বছর কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেহারা ও পোশাক দেখলে ফুটপাতের ম্যাজিশিয়ান মিঃ ফক্সের কথা মনে পড়ে। ক্লাসে তিনি পারতপক্ষে বাংলা শব্দ উচ্চারণ করেন না, তাঁর ইংরিজি শব্দগুলো শুনলে মনে হয় তিনি সাহেবদের ক্যারিকেচার করছেন। তাঁর ভাবভঙ্গিও অনেকটা নাটকীয়, রোলকলের খাতাটা হাতে নিয়ে তিনি 'বয়েজ' বলে প্রথমেই একটা হুংকার দেন, তারপর প্রায় এক মিনিট চুপ করে তাকিয়ে থাকেন সবার মুখের দিকে।

প্রথম দিনেই তিনি প্রতাপকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। রোলকলের সময় প্রতাপ 'ইয়েস স্যার' বলতেই তিনি প্রতাপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চিবোনো ইংরিজিতে বলেছিলেন, বৎস, তোমার দেশ কোথায় : পদ্মার ওপারে? অমন বীভৎস উচ্চারণে ইংরেজি ভাষার ক্ষতি করো না। বলল, ইয়াস সা-। প্রতাপ সংশোধন করে বলেছিল, ইয়েস সার। বি ডি আবার ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আরও খারাপ হচ্ছে, বলো, ঈয়াস সা-। এইরকম পাঁচ ছ'বার চললো, প্রতাপ বুঝতেই পারলো না, তার কোথায় ভুল হচ্ছে।

আর একদিন তিনি পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে গোটা ক্লাসকে ইংরিজি □□□□ শব্দটির উচ্চারণ শিখিয়ে ছিলেন। বাংলা ফুল আর ইংরিজি □□□□ এক নয়। ইংরিজি □□□□ বলতে গেলে দাঁতের সামনে দিয়ে অনেকখানি হাওয়া ছেড়ে দিতে হয়। সবাইকে তিনি একসঙ্গে বলাতে লাগলেন, ফুল! ফুল! দাঁতের সামনে দিয়ে হাওয়া

ছাড়ো! উহঁ ঠিক হচ্ছে না। আরও হাওয়া ছাড়ো! না, না, ফুল-ল নয়, ফুল! শেষ পর্যন্ত তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, সকলেই বড়জোর □□□□ পর্যন্ত বলতে পারে, একমাত্র লুৎফর রহমানই □□□□ মার্কস পাওয়ার যোগ্য।

এই বি ডি স্যার একদিন মামুনকে ক্লাস থেকে বার করে দিয়েছিলেন, কারণ মামুন কিছুতেই অতি সাধারণ □□□□ শব্দটি উচ্চারণ পরতে পারছিল না, সে বারবার বলছিল গ্যাট। মামুন তারপর থেকে আর কোনোদিন বি ডি স্যারের ক্লাসে আসেনি।

অনেকদিন পর প্রতাপ জেনেছিল যে বি ডি স্যারের পুরো নাম বামনদাস আইচ, তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ে ও অনেকগুলি পুষ্যি নিয়ে খুব অভাবের সংসার। তিনি লুৎফর রহমানের প্রাইভেট টিউটর। লুৎফরকে খুশী করবার জন্য তিনি প্রায়ই পরেশ আর বৈদ্যনাথ নামে দুটি ভালো ছাত্রকে হেনস্থা করতেন।

মামুনের আসল নাম সৈয়দ মোজাম্মেল হক। তার অন্য নামটি অনেকদিন পর্যন্ত জানা। যায়নি। ম্যাগাজিন প্রকাশ করার সময় যখন ছাত্রদের কাছ থেকে রচনা আহ্বান করা হয় তখন একটি দীর্ঘ কবিতা পাওয়া গেল যার তলায় কবির স্বাক্ষরের বদলে শুধু লেখা, মামুন, দ্বিতীয় বর্ষ বিজ্ঞান। ঐ নামের কোনো ছাত্রকে কেউ চেনে না। একদিন ক্লাস শেষ হবার পর প্রতাপ। অধ্যাপকের ডায়াসে উঠে জিজ্ঞেস করলো, সবাই শোনো, এই কবিতা কে পাঠিয়েছে। মামুন কে? কোনো উত্তর না পেয়ে সে কবিতাটি পড়তে শুরু করে দিল :

ভাঙিল না ঘুম ঘোর, পোহালো না রাতি
অজ্ঞান তিমিরে পড়ি আজও বঙ্গজাতি
জননীর খুন ধারা অশু হয়ে ঝরে
দুঃখীর আজান কেহ শুনে না অন্তরে।...

যদিও করুণ রসের কবিতা, তবু কৌতুক-প্রবণ যুবকেরা তা শুনে অট্টহাস্য শুরু করে দিল, প্রতাপের আর শেষ পর্যন্ত পড়াই হলো না। কেউ সেই রচনার পিতৃত্ব দাবিও করলো না।

প্রতাপ যদিও ম্যাগাজিন কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু সে সাহিত্যের বিশেষ ধার ধারে না। তার ঝোঁক খেলাধুলোর দিকে। সে কবিতার ভালো-মন্দ বোঝে না, সে শুধু চেয়েছিল। কবিকে খুঁজে বার করে দীর্ঘ কবিতাটিকে হেঁটে এক পাতার মতন করে দিতে অনুরোধ জানাবে।

বৈদ্যনাথ নামে আর একটি চালু ছাত্র বললো, দেখি, দেখি হাতের লেখাটা চেনা যায় কি না।

কাগজটা নিয়ে পড়ার পর সে বললো, হ্যাঁ, চিনি, এ তো মোল্লার হাতের লেখা! সে-ও কবি নাকি? হেঃ! কাজী নজরুল আজকাল সব মোসলমান ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছেন! সবাই কবি হতে চায়। কবি না কপি, ছিঁড়ে ফেলে দে!

সেদিন সন্ধেবেলা প্রতাপ বৈঠকখানাবাজার থেকে পাটালি গুড় আর মাখন কিনে ফিরছে, মুসলমান পাড়া লেনের কাছে সে মামুনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। এতদিন মামুনের সঙ্গে তার একটিও কথা হয় নি। এবারে মামুন নিজে থেকেই এগিয়ে এসে বললো, ভাই মজুমদার, তোমাকে একটা অনুরোধ করি। আমার কবিতাটি আমাকে ফিরৎ দাও। আমার কাছে কপি নাই। ও কবিতা ম্যাগাজিনে পাঠানো আমার ভুল হয়েছে। ও লেখা আমি সওগাত-এ পাঠাবো।

প্রতাপের বুকটা কেঁপে উঠেছিল। বৈদ্যনাথ যে তার কাছ থেকে লেখাটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে, এখন সে ফেরৎ দেবে কী করে? এই ছেলেটি বলছে, কপি রাখেনি। ছিঁড়ে ফেলাটা অন্যায় হয়েছে।

সে দোষ কাটাবার জন্য বললো, কেন ফেরৎ নেবে? ও কবিতা আমরাই ছাপাবো। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম যে কে লিখেছে!

মামুন বললো, না, না, তার দরকার নাই। ও কবিতা তোমাদের ভালো লাগবে না, তোমরা ঠাট্টা করছিলে...

হঠাৎ মামুন মুখটা ফিরিয়ে নিল, প্রতাপ অত্যাশ্চর্য হয়ে দেখলো যে মামুনের চোখে জল এসে গেছে।

প্রতাপ নিজে কবিতা লেখে না, একটা কবিতা ছাপানো বা না-ছাপানোয় একজন কবির কী যে আনন্দ বা মর্মবেদনা তা সে বুঝবে না। সামান্য একটা কবিতার ব্যাপার নিয়ে যে সৈয়দ মোজাম্মেল হক-এর মতন একজন বলবান যুবক কেঁদে ফেলতে পারে, তা সে কল্পনাই করতে পারে নি।

সে মামুনের কাঁধে হাত রেখে জোর দিয়ে বললো, আরে, তুমি এমন ভেঙে পড়ছো কেন? তোমার কবিতা আলবাৎ ছাপা হবে। আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট...তবে ঐ কবিতাটা বড় লম্বা, চার পাতা লেগে যাবে, তুমি যদি দেড়/দু পাতার মধ্যে আর একটা দিতে পারো-।

সেই থেকে মামুনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। মামুন কুমিল্লার ছেলে, এখানে তার বন্ধু-সাথী বিশেষ। কেউ নেই। লোকজনের মাঝখানে সে চুপচাপ থাকলেও প্রতাপের কাছে সে অনেক কথা বলে। তার অনেক স্বপ্ন আছে।

মামুনের কবি-পরিচিতি রটে যাওয়ায় এরপরে ক্লাসে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল তাকে। বিজ্ঞানের ছাত্রদের কবিতা লেখাটা যেন একটা অপরাধ! যদিও তাদের ইংরিজি বাংলা পড়তে হয়, কিন্তু ফিজিকস, কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিকসই তাদের আসল সাবজেক্ট। আর্টসের। ছাত্রদের সঙ্গে অনেক সময় তাদের ইংরিজি বাংলা কমবাইণ্ড ক্লাশ করতে হয়, তখন আর্টসের ছাত্ররা তাদের ইংরিজি বাংলা জ্ঞান নিয়ে ব্যঙ্গ করে। আর্টসের ছাত্রদের মধ্যে তিন চারজন গল্প কবিতা লেখে। সুবিমল নামে একটি ছেলে তো বেশ বিখ্যাত, তার তিনটি কবিতা ছাপা হয়েছে কল্লোল পত্রিকায়। এই সুবিমল আবার নজরুলের খুব ভক্ত। তার আর একজন আরাধ্য দেবতা হলো বুদ্ধদেব বসু নামে একজন তরুণ লেখক। সে প্রায়ই বলে, রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ, এখন। আধুনিকদের যুগ এসেছে!

সেই সুবিমল মামুনের কবিতার লাইন তুলে তুলে ছন্দের ভুল দেখায়। মামুনকে করুণার। পাত্র মনে করে সে উপদেশ দিয়ে বলে, ওহে, নজরুলের কবিতা আগে ভালো করে বুঝতে শেখো! কত বড় একখানা হৃদয় তাঁর। নজরুল শুধু হিন্দুর নয়, শুধু মুসলমানের নয়, তিনি এই নব্য বাংলার প্রধান মুখপাত্র। তিনি আমাদের যৌবনের ভাষা দিয়েছেন, বুঝলে? কিন্তু তাকে অনুকরণ করতে গেলেই তুমি ডুববে! তুমি মুসলমান বলেই যে নজরুলের অনুকরণ করবে তার কি কোনো মানে আছে? নজরুল রক্তের বদলে খুন শব্দটা ব্যবহার করেছেন বলে তোমাকেও করতে হবে?

এই সব তর্কের সময় প্রতাপ বিশেষ কিছু না বুঝেও মামুনের পক্ষ নেয়। তার কারণ সুবিমলের হামবড়া ভাবটা তার ভালো লাগে না। সুবিমলের চাঁছাছোলা উচ্চারণের কথাবার্তাও অনেকটা দূরত্ব এনে দেয়, সেই তুলনায় লাজুক স্বভাবের মামুনকে তার আপন মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত এমন হলো যে একটুক্ষণের জন্যও দুজনে দু'জনকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কলেজের পরেও দু'জনে একসঙ্গে ঘোরে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় বা থিয়েটার-বাইস্কোপ দেখতে যায়, অথবা পার্কে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকে। কী সুন্দর ছিল তখন কলকাতা শহর। রাস্তাগুলি ঝকঝকে তকতকে, দু'বেলা করপোরেশানের লোক সব রাস্তা ধুয়ে দিয়ে যায়। কোনো বাড়ির রং নষ্ট হয়ে গেলে বা অনেকদিন মেরামত না হলে বাড়ির মালিককে করপোরেশান নোটিশ দেয়। ট্রামগুলি ঘোট ঘোট স্টিমারের মতন, যেন জল কেটে এগিয়ে আসে। দুপুরের দিকে ফাঁকা ট্রামে ঘুরে বেড়ানোটাই একটা আনন্দের। দু' পাশের দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই জুড়িয়ে যায় চোখ।

একদিন ওরা দু'জনে মিলে 'ধ্রুব' নামে একটা বাইস্কোপ দেখতে গেল। তখন টকি চালু হয়ে। গেছে, বাইস্কোপের পাত্র-পাত্রীরা কথা বলে, গান গায়। ধুতি পরা নারদমুনি যে-ই গান গাইতে গাইতে ঢুকলো অমনি মামুন উত্তেজিত ভাবে বললো, নারদ কে সেজেছেন জানিস? উনি কাজী নজরুল ইসলাম!

প্রতাপ অবাক। কবি নজরুল যে বাইস্কোপেও পার্ট করেন তা তার জানা ছিল না, এর আগে সে নজরুলের গান শুনেছে বটে। বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল', এই গানখানি তো সকলের মুখে মুখে।

মামুন পর পর তিনবার দেখলো ঐ ধ্রুব বাইস্কোপ, তবু তার আশ মেটে না। সে বললো, প্রতাপ, একদিন নজরুলকে দেখতে যাবি, উনি তো এখন কলকাতাতেই আছেন শুনেছি। যাবি? আমার একা যেতে সাহস হয় না!

খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে কবি নজরুল এখন আছেন উনচল্লিশ নম্বর সীতারাম রোডে, তা ছাড়া তিনি 'কলগীতি' নামে একটি রেকর্ডের দোকানও খুলেছেন। ভেবে চিন্তে দোকানে দেখা করাই ঠিক হলো। কিন্তু পর পর চারদিন সেই দোকানে গিয়েও কোনো সুবিধে হলো না। দোকানে অন্য কর্মচারী বসে, কবি রোজ আসেন না। পঞ্চম দিনে আকস্মিক ভাবে সাক্ষাৎ। ওরা দু'জনে 'কলগীতি' থেকে রেকর্ড দেখে বেরিয়ে আসছে, এমন সময় বাইরে থামলো একটি বিরাট ক্রাইসলার গাড়ি, তার থেকে যিনি নামলেন তাঁকে দেখা মাত্র ওদের চিনতে ভুল হলো না।

হাবিলদার কবি এতদিনে বেশ মোটাসোটা, নাদুসনুদুস হয়েছেন, মাথায় বাবড়ি চুল, চোখ দুটি টানা টানা, মনে হয় সুমা লাগানো, মুখ ভর্তি পান। তাঁর পাঞ্জাবিটি কমলা রঙের, সেই রঙেরই একটা উড়ুনি কাঁধের ওপর ফেলা। কবি এই দুটি যুবককে দেখতে পেলেন না, দোকানে ঢুকে গেলেন।

প্রতাপ মামুনকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বললো, যা, কথা বল!

কিন্তু মামুনকে এখন রাজ্যের লজ্জা পেয়ে বসেছে, সে এগোতে পারছে না, সে বললো, প্রতাপ, তুই আগে কথা বল।

প্রতাপ কী কথা বলবে? সে তো কবিতা বিষয়ে কিছু জানে না। সে ঠেলতে লাগলো। মামুনকে, মামুনও কিছুতেই যাবে না। এই রকম যখন চলছে তখন নজরুল আবার বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে।

এবারে দু'জনে বসে পড়ে ঝুপঝুপ করে প্রণাম করলো তাঁর পায়ে হাত দিয়ে। কবি একটু যেন অন্যমনস্ক, তিনি প্রতাপের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে, মোতাহারের ব্যাটা না?

প্রতাপ বললো, আজ্ঞে না।

নজরুল উদাসীন ভাবে বললেন, ও। ভালো থাকো। ভালো থাকো।

তারপর উঠে গেলেন গাড়িতে।

প্রতাপ বললো, মামুন, তুই কী রে, এত কাছে পেয়েও কথা বললি না?

মামুন তখনও যেন উত্তেজনায় কাঁপছে। সে বাষ্পচ্ছন্ন গলায় বললো, প্রণাম করতে পেরেছি, এই তো ঢের!

খানিকদূর যাবার পর মামুন আবার বললো, প্রতাপ, এমন ভাবে একদিন কবিগুরুকে প্রণাম করে আসতে পারি না? সুবিমলরা যাই বলুক, রবীন্দ্রনাথই এখনো আমাদের কবি সম্রাট। জোড়াসাঁকো কত দূরে রে?

এর পরের কয়েকদিনে জোড়াসাঁকো যাওয়ার পথের সন্ধানও জেনে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কবিগুরুর দর্শন লাভের জন্য আর যাওয়া হলো না। ঝপ করে পূজোর ছুটি পড়ে গেল।

সুহাসিনী শপথ করে নিইয়েছিলেন, প্রতাপ প্রতি সপ্তাহে একখানি করে চিঠি লিখবে আর বছরে অন্তত তিনবার দেশের বাড়িতে যাবে। প্রতাপকে কলকাতায় পড়তে পাঠানোতে

সুহাসিনীর আপত্তি ছিল। তাঁর একমাত্র পুত্র, তাকে ছেড়ে তিনি বেশিদিন থাকতে পারেন না। প্রতাপেরও দেশের বাড়ির জন্য মন ছটফট করে। কিন্তু এবারে পূজাবকাশের দীর্ঘ এক মাস মামুনকে ছেড়ে থাকতে হবে, এই চিন্তাটাও বড় কষ্টকর। শেষ পর্যন্ত একটা রফা হলো।

ছাত্র আন্দোলনের জন্য এবার সাতদিন আগেই পূজোর ছুটি দেওয়া হয়েছে। প্রতাপ এই সাত দিন মামুনের সঙ্গে গিয়ে কুমিল্লায় তাদের গ্রামের বাড়িতে থাকতে পারে। আবার ছুটি শেষ হবার সাতদিন আগে মামুন চলে আসতে পারে প্রতাপদের বাড়ি মালখানগরে।

শিয়ালদা থেকে প্রতাপ আর মামুন এক সঙ্গেই ট্রেনে চেপে বসলো। কুমিল্লায় দায়ুদকান্দি থেকে মাইল পাঁচেক দূরে মামুনদের গ্রাম।

সময় তো দর্পণের মতন থেমে থাকে না, সময় নদীর স্রোতের মতন বয়ে চলে। তবু দর্পণের প্রতিবিম্বের মতন এক একটি ছবি সময়ের স্রোতের মধ্যেও স্থির হয়ে থাকে।

৭ মেঘনা নদী পার হয়ে দায়ুদকান্দি

মেঘনা নদী পার হয়ে দায়ুদকান্দির ফেরীঘাট থেকে হাঁটা পথ। প্রতীপের মনে আছে, কী সাংঘাতিক মেঘ ছিল সেদিন। আকাশ ও জল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নদীতে সমুদ্রের মতন ঢেউ, গয়না নৌকোর মাঝিরা গাজী গাজী রব তুলেছিল। প্রকৃত ঝড় শুরু হলো ফেরীঘাটে পৌঁছোবার

তখন দুপুর তিনটে, কিন্তু ঝড় এলো যেন এক রেলগাড়ি ভর্তি অন্ধকার নিয়ে। চৈত্র-বৈশাখ মাস হলেও কথা ছিল, আশ্বিনে এমন ঝড় যেন অবিশ্বাস্য! প্রতাপ আর মামুন দাঁড়ালো না, ছুটলো বাড়ির দিকে। মামুনের হাতে গোলাপ ফুল আঁকা টিনের সুটকেশ, প্রতাপের হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ। প্রতাপ তার বাকি জিনিসপত্র স্টিমারের এক সহযাত্রীর হাত দিয়ে ঢাকায়। এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেই দিনটির অভিজ্ঞতা কোনোদিন ভোলার নয়। ঝড় যে মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, তা বিশ্বাস করা সহজ নয়, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল তা অসম্ভব নয় মোটেই। মাঠের মধ্যে এসে প্রতাপ আর মামুন ঝড়ের ধাক্কায় পড়ে যাচ্ছিল বারবার। আকাশে মেঘের ডাক যেন মহাকালের গর্জন, আর বাতাস যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির হাত, ওদের চুলের মুঠো ধরে টানছে। প্রতাপ সত্যিকারের মৃত্যু ভয় পেয়েছিল সেদিন, বিশেষত সেই মুহূর্তটায়, যখন কিছু যেন একটা জীবন্ত জিনিস প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারলো তার মাথায়। সেটা ছিল একটা শঙ্খচিল, ঝড়ের দাপটে সে একটা গুলির মতন ছিটকে এসেছিল।

গাছতলায় দাঁড়াবার উপায় নেই, মড় মড় করে ভেঙে পড়ছে গাছ, ডালপালা উড়ে যাচ্ছে ওপর দিয়ে। বজ্রপাত হলে উঁচু গাছের ওপরই পড়বে তাই ওরা ফাঁকা মাঠের দিকে চলে যেতে চায়। আউস ধান কাটা হয়ে গেছে, শুকনো খড়ের গোড়া পায়ে বেঁধে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কায় ওরা দুজনে দু'জনের হাত শক্ত করে ধরে আছে, তবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। পারে না। বসে পড়লেও ঝড় ওদের ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়। সুটকেস আর ব্যাগ আগেই ফেলে দিতে হয়েছে, মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতেও ওরা পরস্পরকে ছাড়লো না।

তারপর এক সময় বৃষ্টি নামলো।

দু'জনেই শক্ত-সমর্থ যুবক, তবু সেই ঝড় যেন ওদের প্রাণশক্তি অনেকখানি নিঙড়ে বার করে নিয়েছিল। বৃষ্টির মধ্যেও অনেকক্ষণ ওরা উঠে দাঁড়াতে পারেনি। দু'জনে দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে, সেই দৃষ্টিতে পুনর্জীবন প্রাপ্তির আনন্দ।

বাড়ি পৌঁছোলো জলকাদা মেখে ভূত হয়ে। বৃষ্টি থামার পর ওরা ব্যাগ ও সুটকেস উদ্ধার করেছে, ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি বিশেষ; প্রতাপের ঘাড়ের কাছটা চিলের আঁচড়ে ছড়ে গেছে, মামুনের বাঁ পাটা একটু মচকেছে।

পুকুরঘাটে পা ধুতে ধুতে মামুন বললো, তোকে আগে বলিনি, আমার বাবা একটু কড়া ধরনের মানুষ, কথায় কোনো মিষ্টতা নেই। তুই যেন কিছু মনে করিস না। তবে আমার

আম্মুকে তোর খুব ভালো লাগবে। আমাদের বাড়িতে গোরু-গোস্ত ঢোকে না, সেদিক দিয়ে তোর চিন্তা নাই।

প্রতাপ বললো, তোদের বাড়িটা তো ভারি সুন্দর রে? ঠিক ছবির মতন।

মামুন বললো, অনেকগুলো ঘর আছে, তোকে যে ঘরটা দেবো, তাতে কী চমৎকার চাঁদের আলো আসে দেখিস। কাল তো পূর্ণিমা...ও হ্যাঁ, প্রতাপ, তুই আমার বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিস না।

–কেন? আমি যে কাজী নজরুলকে–

–কবিদের কোনো জাত নাই। কিন্তু আমার বাবা খুব কট্টর, উনি হিন্দুদের ছোঁয়া সহ্য। করেন না।

একটু হেসে মামুন আবার বললো, আমরা সৈয়দের বংশ তো, আমরা হিন্দুদের ছোট জাত মনে করি!

ঝড়ে এ বাড়ির একটি জম্বুরা গাছ উপড়ে পড়ে গেছে। গাছটি ফলে ভর্তি। কতকগুলি শিশু ফলগুলি ছেঁড়ার জন্য দাপাদাপি করছে সেখানে। প্রতাপদের বাড়িতেও অনেকগুলি ঐ গাছ। আছে। অত ফল কে খাবে! প্রতাপের মনে পড়লো, শৈশবে সে বড় বড় বাতাবি লেবু গাছ। থেকে পেড়ে ফুটবল খেলতো।

মামুনদের বাড়িটি সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো। একটি বেশ বড় চৌকো উঠোনের তিন দিকে সারি সারি ঘর। অন্য দিকটি খোলা, তার পাশেই আর একটি দীঘি। উঠোনের এক পাশে দুটি ধানের গোলা। ঘরগুলির মধ্যে দুটি মাত্র পাকা দালান, সামনে চওড়া বারান্দা, অন্য ঘরগুলি মাটি ও টিনের।

বারান্দাটিতে একজন শীর্ণ, দীর্ঘকায় মানুষ নামাজ পড়ছিলেন, মামুন আর প্রতাপ কাছাকাছি। আসতেই তাঁর নামাজ শেষ হলো, তিনি ঘাড় ফিরিয়ে দু'জনকে দেখে প্রতাপের দিকেই। কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

মামুন এগিয়ে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে কদমবুসি করে বললো, আব্বা, এ আমার সহপাঠী, কলেজে আমাকে অনেক সাহায্য করে, আমাদের গ্রাম দেখতে এসেছে।

সৈয়দ আবদুল হাকিমকে দেখলেই বোঝা যায় তাঁর আলাদা ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে। তাঁর চেহারায় বৈশিষ্ট্য নেই, তাঁর পোশাকও প্রায় সর্বক্ষণের জন্যই লুঙ্গি ও ফতুয়া, শুকনো মুখোনিতে বার্ধক্যের ছাপ পড়ে গেছে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব তাঁর চোখে। তাঁর চোখের মণি দুটি ঠিক কালো নয়, ধূসর বর্ণের, তিনি অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রখর এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

মামুনের কথা শুনে তিনি প্রসন্নভাবে বললেন, গ্রাম দ্যাখতে আইছো। আমাগো গ্রামে আর কী দ্যাখবা, চাইর দিকেই তো শুধু পানি...আসো, বসো। হিন্দুবাড়ির ছাওয়াল মনে হয়? শাকিন কোথায়?

প্রতাপ বললো, আজ্ঞে, আমাদের বাড়ি বিক্রমপুরে, মালখানগরে।

একটুক্ষণ ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে চিন্তা করে হাকিম সাহেব বললেন, মালখানগর? তুমি জাতিতে কায়স্থ? মালখানগর তো আরও সুন্দর জায়গা, আমি গেছি।

মামুন আর প্রতাপ যে এই প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এসে পৌঁছোলো সেজন্য তিনি কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতাপের বাড়ির খবর নিতে লাগলেন। প্রতাপের বাবার পরিচয়, পেশা, কত বিঘে ধান জমি এসবও তিনি জানতে চাইলেন। এদিকে প্রতাপ আর মামুনের গায়ে ভিজে পোশাক, এখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওদের শীত শীত লাগছে।

এক সময় মামুন বললো, আব্বা, আমরা কুর্তা বদলিয়ে আসি?

হাকিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বন্ধুটি থাকবে কোথায়?

মামুন বললো, পশ্চিমের শেষের ঘরখানায় শোবে। ঐ ঘরখানা ভালো, রাত্তিরে বাতাস আসে।

থুতনিতে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে সৈয়দ আবদুল হাকিম তাঁর ছেলের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তুই ভিতরে যা। ও আমার ঘরে পোশাক বদল করে নিক। এসো বাবা, এসো-।

তিনি প্রতাপকে নিয়ে এলেন পার্শ্ববর্তী পাকা ঘরটিতে। নিজে প্রতাপের ক্যাম্বিসের ব্যাগটি বয়ে এনে বললেন, দরজা বন্ধ করে লও, গামছা আছে তো সঙ্গে, না দেবো? আছে, তো মাথা মুছে লও ভালো করে, যা প্রয়োজন হবে চাইবে, কোনো সঙ্কোচ করো না...।

ঘরটিতে একটি পুরোনো আমলের পালঙ্ক, একটি মর্চে পরা লোহার সিন্দুক রয়েছে। সেই সিন্দুকের ওপর অনেকগুলি 'মোহাম্মদী' পত্রিকার কপি। এটি মামুনের বাবার নিজের শয়নকক্ষ, উনি কি প্রতাপকে এই ঘরে রাখতে চান? প্রতাপ ঠিক করলো, তাতে সে ঘোরতর আপত্তি জানাবে। ইটের দেয়ালের ঘরে থাকার তার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই, কলকাতায় তো সেরকম ঘরেই থাকতে হয়, গ্রামে এসে তার মাটির ঘরই পছন্দ। প্রতাপদের বাড়িটাও কিছুটা পাকা, কিছুটা কাঁচা, বাল্যকাল থেকেই সে তার এক পিসীমার সঙ্গে একটা কাঁচা ঘরেই শুয়েছে।

তাড়াতাড়ি ভিজে পোশাক পরিবর্তন করে প্রতাপ বাইরে বেরিয়ে এলো। ততক্ষণে বারান্দায় কয়েকটি জলচৌকি পাতা হয়েছে, মামুনের বাবা একটি জলচৌকিতে বসে হুঁকো টানছেন, প্রতাপকে দেখে বললেন, বসো, বাবা, বসো, মামুন আসতেছে।

বেশ কিছুক্ষণ তিনি নীরবে হুঁকো টেনে চললেন। নেমে এসেছে অকাল-সন্ধে, এ বাড়িতে এখনো বাতি জ্বলেনি, দূরের একটা ঘরে শোনা যাচ্ছে বাচ্চাদের কলকণ্ঠ, একজন কেউ কয়েকটি গরু ও বাছুর নিয়ে চলে গেল গোয়ালঘরের দিকে। প্রতাপদের বাড়িতে নতুন কেউ এলে বাড়ির অনেকেই এক সঙ্গে ভিড় করে তার কাছে আসে। এ বাড়িতে সেরকম প্রথা নেই দেখা যাচ্ছে।

একটু পরে একটি বালক এক কাঁসার বাটি ভর্তি মুড়ি, দুটি সবরি কলা ও গরম দুধ এনে রাখলো প্রতাপের সামনে। ক্ষণিকের জন্য হুঁকো টানা থামিয়ে হাকিম সাহেব বললেন, খাও বাবা, খাও, ক্ষুধা পেয়েছে নিশ্চয়, কত দূর থেকে এসেছো।

খিদে সত্যিই পেয়েছে, প্রতাপ লজ্জা করলো না, খেতে শুরু করে দিল। দুধে তার অভক্তি, বাড়িতে মা অনেক জোর করলেও সে দুধ খেতে চায় না, কিন্তু এখানে মামুনের বাবার সামনে সে আপত্তি জানাতে সাহস পেল না। ওঁকে সে কী বলে সম্বোধন করবে সেটা ভেবে পাচ্ছে না। চাচা বলা যায় না, কারণ উনি প্রতাপের বাবার চেয়ে বয়েসে ঢের বড়। মামুন বলেছিল। তারা আট ভাই-বোন, সে-ই সর্বকনিষ্ঠ। জ্যাঠামশাইকে এরা যেন কী বলে?

একটু পরে মামুনও একটা মুড়ির বাটি হাতে নিয়ে এলো, তার মুখ গম্ভীর, প্রতাপের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ফিরিয়ে নিল মুখ।

কোটা নামিয়ে রেখে সৈয়দ আবদুল হাকিম দু'বার কাশলেন। পাশে রাখা একটা ঘটি তুলে আলগোছে কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছলেন। তারপর প্রতাপের দিকে চাইতেই প্রতাপ বললো, জ্যাঠামশাই, আপনার ঘর...

প্রতাপকে থামিয়ে দিয়ে হাকিম সাহেব বললেন, শোনো, বাবা, তুমি আমার বাড়িতে মেহমান হয়ে এসেছো, তোমাকে একটা কথা বলতে আমার বড় কষ্ট লাগতেছে, তবু বলতেই হবে। আমার বাড়িতে কোনো হিন্দুরে আমি স্থান দিতে পারি না। আমার পিতার নিষেধ আছে। মামুনটা এ বৃত্তান্ত জানে না তাই তোমারে নিয়ে এসেছে। আমরা যেমন কোনো হিন্দু বাড়ির ত্রিসীমানায় রাত্রিবাস করি না, সেই রকম আমাদের বাড়িতেও ...

মামুন বললো, আব্বা!

হাকিম সাহেব বললেন, তুমি থামো! শোনো বাবা, প্রতাপ, তুমি মামুনের সহপাঠী, তুমি এখানে এসে পড়েছো, বাড়িতে অতিথি এলে ফিরিয়ে দেওয়াটা বড় খারাপ, কিন্তু পারিবারিক প্রথা তো অমান্য করতে পারি না। তা বলে তুমি পানিতে তো পড়োনি, তোমার ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই। পাশের গ্রামের সত্যসাধন চক্রবর্তী আছেন, অতি সজ্জন, আমরা এক সাথে জেলা ইস্কুলে পড়েছি, উনি দু ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। তাঁর বাড়িতে তুমি ভালোই থাকবে। আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাবো...

রাগে-অভিমানে প্রতাপের বুক উদ্বেল হয়ে উঠলো। সে মামুনের সঙ্গে থাকবে বলে এতদূর এসেছে, তার বদলে কোন্ এক অচেনা লোকের বাড়িতে তাকে আশ্রয় নিতে হবে? কেন, সে কি ভিখিরি নাকি? এতক্ষণে নিজের বাড়ি পৌঁছোলে তাকে ঘিরে হইচই পড়ে যেত। তার মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জোর করে কতরকম খাবার খাওয়াতেন, দিদিরা এসে জিজ্ঞেস করতো। কলকাতার খবর, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকতো। প্রত্যেকবার তার বাড়ি ফেরাই একটা উৎসবের মতন। আর এখানে।

প্রতাপ দপ করে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললো, আমি ফিরে যাচ্ছি।

মামুন সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরলো তার হাত। কাতরভাবে শুধু বললো, প্রতাপ, প্রতাপ!

প্রতাপ ঝটকা দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো। মাত্র দু'এক ঘন্টা আগে তারা দু'জনে ঝড়ের মুখে আত্মরক্ষার জন্য পরস্পরকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরে ছিল।

প্রতাপ রুক্ষভাবে বললো, ছাড় মামুন, আমি বাড়ি ফিরে যাবো!

মামুন বললো, এখন ফেরি বন্ধ হয়ে গেছে, এখন যাওয়া যাবে না।

প্রতাপ বললো, অন্য নৌকো দেখবো, যত টাকা লাগে লাগুক, না পেলে সাঁতরে আমি ভয় পাই নাকি!

হাকিম সাহেব শান্তভাবে তামাক টানছেন। এবারে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, শোনো বাবা, রাগ করো না, বুঝে দেখো। তোমাদের বাড়িতে হঠাৎ অন্য জাতের কোনো অতিথি এলে তোমার পিতা-মহাশয়ও হয়তো অসুবিধায় পড়তেন।

প্রতাপ জ্বলন্ত চোখে হাকিম সাহেবের দিকে তাকালো। সে প্রায় বলতে যাছিল, আমার বাবা মোটেই সংস্কারগ্রস্ত নন, সুলেমন চাচা নিয়মিত আমাদের বাড়িতে দাবা খেলতে আসেন, আজিজ চাচা একবার টানা সাতদিন ছিলেন আমাদের বাড়িতে...। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিল। পিতৃস্থানীয় কারুর মুখে মুখে কথা বলা স্বভাব নয় তার।

সে আবার জোর দিয়ে বললো, আমি ফিরে যাবো!

হাকিম সাহেব বললেন, না, না, তুমি ফিরে গেলে বড় দুঃখ পাবো! তোমার থাকার ভালো ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, সে বাড়ি মোটেই দূর নয়। সারাদিন তুমি এখানেই কাটাবে মামুনের সাথে, রাত্তিরটা শুধু শুতে যাবে সেখানে। ওরে, একটা হ্যারিকেন আন্।

প্রতাপ বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা দৌড় লাগালো। মামুনও ছুটলো তার পিছু পিছু। মামুনের বড় এক ভাই আনিসুল আড়ালে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, সে-ও এবার বেরিয়ে এলো। মামুন আর আনিসুল একটু দূরেই দু'দিক থেকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলো প্রতাপকে।

মামুন বললো, প্রতাপ, আমি ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা চাইছি, তোর পায়ে ধরছি।

আনিসুল বললো, ভাই, আমার আব্বা বড় জেদী, তাঁর ওপরে আমরা কথা বলতে সাহস পাই না। তুমি এমনভাবে যদি চলে যাও, তা হলে আমাদের দুঃখের শেষ থাকবে না। মামুনকে তো তুমি চেনো। ও বড় নরম, ও যে কী করবে তার ঠিক নাই। আজ রাত্তিরটা

অন্তত চক্রবর্তীদের ওখানে থাকো, তারপর কাল যদি যেতে চাও আমি নিজে গিয়ে তোমারে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

হাতে একটি হ্যারিকেন নিয়ে হাকিম সাহেবও সেখানে এসে গেলেন। ধীর স্বরে বললেন, বাবা প্রতাপ, তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি, তাতে আমারও দুঃখ হয়েছে। কিন্তু পিতার আজ্ঞা তো অগ্রাহ্য করতে পারি না। তোমার পিতা যদি কোনো নির্দেশ দেন, তুমি কি তা অমান্য করতে পারো?

প্রতাপ মনে মনে খুঁসতে ফুসতে বললো, আমার বাবা কোনো অন্যায় নির্দেশ দিলে তা আমি কোনোদিনই মানবো না!

মামুন আর আনিসুল তার দু হাত ধরে একপ্রকার টেনেই নিয়ে চললো তাকে। বাকি রাস্তা কেউ কোনো কথা বললো না। বৃষ্টির পর পথ একেবারে পিচ্ছিল। মেঘলা রাত, অদূরের কিছুই দেখা যায় না। কু-উক, কু—উক-ক শব্দে কী একটা অদৃশ্য রাত-পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে শুধু।

চক্রবর্তীদের বাড়ি বেশি দূর নয় ঠিকই। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া। গেল। বাড়ির মধ্যে একটা হ্যাঁজাক জ্বলছে। বাইরে থেকে হাকিম সাহেব ডাকলেন, সত্যদা, সত্যদা!

কে? বলে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ। ফর্সা, মাঝারি ধরনের উচ্চতা, শুধু ধুতি পরা, বুকে পৈতে। খড়ম খটখটিয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে রে? হাকিম নাকি রে?

হাকিম সাহেব বললেন, হ্যাঁ, সত্যদা। আপনার পূজো-আচ্চা সারা হয়ে গেছে? ব্যাঘাত করলাম না তো?

সত্যসাধন বললেন, না, না, আয়, ওপরে উঠে আয়। মামুন ফিরেছে বুঝি? সঙ্গে ওটি কে? ওরে ভোলা, একটা মাদুর নিয়ে আয়।

হাকিম সাহেব বললেন, আপনার বাড়িতে একজন অতিথি এনেছি।

সত্যসাধন চক্রবর্তীরও পাকা দালান। উঠোনে তুলসীর মঞ্চ, এক কোণে দেব-দেউল। তাঁর প্রসন্ন মুখোনিতে আর্থিক সচ্ছলতার ছাপ।

সামনের বাঁধানো চাতালে মাদুর পেতে বসা হলো। হাকিম সাহেব সংক্ষেপে প্রতাপের পরিচয় জানালেন। প্রতাপের মনের মধ্যে এখনো রাগ রয়ে গেছে বলে সে সত্যসাধন চক্রবর্তীকে প্রণাম করতে ভুলে গেল। সে তখনো চিন্তা করে যাচ্ছে যে আজ রাতটা কোনো মতে কাটিয়ে কালই সে মালখানগরে ফিরে যাবে।

হাকিম সাহেবের সঙ্গে সত্যসাধনের বেশ সৌহার্দ, হালকা তামাসার সুরে কথা বলতে লাগলেন দু'জনে। সত্যসাধন প্রতাপকে দেখে খুশী হয়েছেন। তিনি বললেন, বড় ভালো করেছিস হাকিম, ওকে এনেছিস, বাড়িতে আর দ্বিতীয় পুরুষ মানুষ নেই। তবু কথা বলার একজন লোক পাওয়া যাবে।

একটু পরেই হাকিম সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ অনেক ধকল গেছে, ওরা ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে এসেছে, এবার বিশ্রাম করুক। চলরে মামুন, আমরা যাই!

ওদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসার পর সত্যসাধন প্রতাপকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কথা কম কও বুঝি?

প্রতাপ নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। সে চেষ্টা করে ফ্যাকাসেভাবে হেসে বললো, আজ্ঞে না, এমন ঝড়ের মুখে পড়েছিলাম যে সারা শরীর ব্যথা হয়ে গেছে।

সত্যসাধন বললেন, খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। শোনো, তোমারে। আগেই একটা কথা বলে দেই। আমাদের বাড়িতে অতিথি আসা নতুন কিছু নয়। অতিথি

আসলে আমরা খুশী হই। তুমি নিজের বাড়ি মনে করে থাকবে এখানে। ছাদে একখানা ঘর আছে, সেখানে তুমি থাকবে, যদি পড়াশুনা করতে চাও, ব্যাঘাত হবে না।

এ বাড়িতে আর দ্বিতীয় কোনো পুরুষ মানুষ নেই, কথাটা একেবারে সঠিক নয়। সত্যসাধনের পিতা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁর বয়েস প্রায় নব্বই, তিনি শয্যার সঙ্গে সাঁটা এবং প্রায় বারহিত। সত্যসাধনের ছোট দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন বরিশালের বি এম কলেজের অধ্যাপক। আর একজন মুঙ্গেরে সরকারি কর্মচারি। সত্যসাধনের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে তিন মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে। এক পুত্র বিলেতের ম্যানচেষ্টারে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাঠরত, আর এক পুত্র জেলে। এই ছেলেটির নাম হিতব্রত, সে চট্টগ্রামে পড়াশুনা করতে গিয়ে সূর্য সেনের দলে ভিড়ে যায়। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। জালালাবাদ পাহাড়ে সে ধরা পড়ে আহত অবস্থায়। এখন সে সুস্থ শরীরে কারাদণ্ড ভোগ করছে।

প্রতাপের বাড়ির খবর জানার ফাঁকে ফাঁকে সত্যসাধন নিজের পারিবারিক ইতিহাসও জানিয়ে দিলেন। তাঁর ছেলে হিতব্রত যে স্বদেশী করতে গিয়ে জেল খাটছে, সেজন্য খুব একটা উদ্বিগ্ন বা শোকার্ত মনে হলো না তাঁকে।

এ বাড়িতে পর্দা প্রথা নেই। সত্যসাধন প্রতাপকে নিয়ে এলেন অন্দরমহলে। তাঁর স্ত্রী প্রতাপকে মুহূর্তে আপন করে নিলেন। সুরবালার কণ্ঠস্বরটি এমন কোমল যে মনে হয় তাঁর বুকে ক্রোধ-হিংসা জাতীয় উগ্র অনুভূতিগুলির বিন্দুমাত্র স্থান নেই। প্রতাপের মুখের সঙ্গে নাকি তাঁর ছেলে হিতুর খুব মিল আছে। সে কথা বলতে বলতে তিনি একবার চোখে আঁচল চাপা দিয়ে পরমুহূর্তেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, প্রতাপের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।

পুজোর ছুটিতে সত্যসাধনের প্রবাসী দুই ভাই-ই বাড়িতে আসবে। যে-ভাই মুঙ্গেরে থাকে, তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা বলে আগে থেকেই এখানে এসে রয়েছেন। তাঁর তিনটি ছেলেমেয়ে।

খাওয়ার সময় দেখা হলো সকলের সঙ্গে। চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি কিশোরী মেয়ে। ওদের পরিবেশন করছিল। সত্যসাধন পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এটি আমার মেজো।

ভায়ের মেয়ে, ওর নাম বুলা। ভালো গান করে। রবিবাবুর গান, কাজী সাহেবের গান বেশ। শিখেছে। কাল সকালে বুলা তোমাকে গান শুনাবে।

বুলা মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। সে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কলকাতায় কোথায় থাকেন? আমি দু'বার কলকাতায় গেছি। কলকাতা ভালো চিনি।

প্রতাপ আহমাস্ট স্ট্রিটে থাকে শুনে বুলা আবার বললো, আপনি রোজ গঙ্গায় স্নান করেন? আপনার বাড়ির কাছেই তো!

প্রতাপ ঠাট্টার সুরে বললেন, হ্যাঁ, পাশেই গঙ্গা। জানলা দিয়ে দেখা যায়!

বুলা বললো, বাবা বলেছেন, আমিও কলকাতার কলেজে পড়বো।

খাওয়া-দাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ গল্প হলো। তারপর প্রতাপকে যখন ওপরের ঘরে পাঠানো হবে তখন বুলা বললো, আপনি ছাদের ঘরে একা থাকবেন, ভূতের ভয় পাবেন না তো? আমাদের ছাদে কিন্তু ভূত আছে!

সত্যসাধন সস্নেহে ভর্ৎসনা করে বললেন, এই ছেমরি, তুই শুধু শুধু ওরে ভয় দ্যাখাস ক্যান রে?

বুলা চোখ বড় বড় করে বললো, সত্যি ভূত আছে, রোজ রাতে খড়মের শব্দ হয়!

সত্যসাধন বললেন, ওরে, আমিই তো সেই ভূত!

ভূতের জন্য নয়। এমনিতেই প্রতাপের সারা রাত ভালো করে ঘুম হলো না। তার মস্তিষ্ক উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে আছে। মাঝে মাঝেই তন্দ্রা ভেঙে যায় আর মনে পড়ে মামুনের বাবার কথাগুলো। তার জীবনে এরকম অপমানের অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। কত সাধ করে সে। মামুনের সঙ্গে এসেছিল, মামুনের সঙ্গে একঘরে থাকবে, শুয়ে শুয়ে গল্প করবে..মামুনের বাবা তাকে বাড়িতে স্থান দিলেন না?

প্রতাপের ঘুম ভাঙলো মামুনের ডাকে। মামুন একেবারে ছাদের ঘরে উঠে এসেছে। প্রতাপের গায়ে ঠ্যালা দিয়ে ঘুম ভাঙালো। তারপর বিছানায় বসে পড়ে প্রতাপের পিঠে হাত রেখে বললো, তুই এখনো রাগ করে আছিস, প্রতাপ? আমার আম্মা কাল কত রাত পর্যন্ত কেঁদেছেন তোর জন্য। সেই কান্না দেখলে তুই-ও চোখের পানি আটকাতে পারতিস না।

প্রতাপের বুকে এখনো অভিমান জমে আছে। সে মামুনের সঙ্গে তখনই কথা বলতে পারলো না। উঠে বসে চোখ রগড়াতে লাগলো। ভোর রাতে ঠাণ্ডা বাতাসে তার শীত শীত লাগছিল, সেই জন্য শরীর ভারী হয়েছে।

মামুন বললো, তোকে এখনো চা দেয়নি? আমি সাত-সকালে চলে এলাম, কারণ আমাদের বাড়িতে চায়ের পাট নেই, এ বাড়িতে চা হয়। আমিও একটু চা খাবো।

প্রতাপ এবারে জিজ্ঞেস করলো, মামুন, তোদের বাড়িতে যে কোনো হিন্দু থাকতে পারে না, তা তুই আগে জানতি না, না?

–সত্যি জানতুম না, বিশ্বাস কর।

–এখন জেনেছিস নিশ্চয়, তার কারণটা?

–হ্যাঁ, জেনেছি। আম্মার কাছে কাল রাতে শুনেছি।

–কী?

–তা তোর শোনার দরকার নাই।

–আমি শুনতে চাই।

–আমার দাদা, মানে আমার বাবার বাবা একবার সিলেটে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে খুব অপমানিত হয়েছিলেন। সেই বামুনবাড়ির বৈঠকখানায় তিনি বসেছিলেন বলে বামুন রেগে

চ্যাঁচামেচি করে তাঁকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বলেন। সে বাড়ির সব পানি ফেলে দেওয়া হয়, পানির কলসী পর্যন্ত ভেঙে ফেলে। সেই থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন...

-কবে কোন্ এক ব্রাহ্মণ তোর ঠাকুদাকে অপমান করেছে, তার ফলভোগ করতে হবে আমাকে?

-ওঁরা সব প্রাচীনপন্থী। আমার আব্বা কিন্তু তোকে পছন্দ করেছেন।

-অনেক বামুন তো কায়স্থদের হাতের ছোঁওয়াও খায় না! বামুনদের দোষের জন্য আমি কেন দায়ী হবো?

– প্রতাপ, তুই এখনো রেগে আছিস! এসব তো আমাদের ব্যাপার নয়!

– নবাব-বাদশাদের আমলে কত বামুনকায়েতকে জোর করে গোরুর মাংস খাইয়ে জাত মেরে দেওয়া হয়েছে। সেই সব আমরা মনে রাখবো? একজনের পাপে আর একজন শাস্তি পাবে?

প্রতাপের কণ্ঠস্বর ক্রমশ উচ্চগ্রামে চড়ছিল, এমন সময় বাইরে বুলার গলা শোনা গেল। সে চা চাই? চা? বলে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। তার এক হাতে দুটি কাপ,অন্য হাতে একটি চিনেমাটির চা-পাত্র। একটা গোলাপি ডুরে শাড়ী গাছ-কোমর করে পরা। এই সকালেই স্নান হয়ে গেছে বুলার, মাথার চুল ভিজে। চোখের পাতা গাঢ় কৃষ্ণ, গ্রামের গণ্ডি ছেড়ে সে বাইরের জগৎ অনেকখানি দেখেছে, তাই তার মুখে ভীতু-ভীতু লজ্জার ভাবটা নেই।

মামুনকে সে আগেই আসতে দেখেছে নিশ্চয়ই, তাই দুটি কাপ এনেছে। চা ঢালতে ঢালতে সে বললো, সকালবেলাতেই দুই বন্ধুতে কিসের তর্ক হচ্ছে? কাল রাত্তিরে ভূত দেখেছিলেন।

মামুন নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলো বুলার দিকে।

প্রতাপ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মেজাজ শান্ত করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, চা কে বানিয়েছে, তুমি?

বুলা বললো, আমি আর আমার মা ছাড়া এ বাড়িতে কেউ চা বানাতে জানেই না। কলকাতার চায়ের মতন হয়েছে?

প্রতাপ বললো, মন্দ না।

-আপনি ভূত দেখেছেন কি না, বলুন না। আমি কাল রাত্তিরেও ছাদের স্বপ্ন দেখেছি!

প্রতাপ বললো, ভূত-পেত্নী কেউ তো এলো না। মামুন, এই মেয়েটির নাম বুলা। পশ্চিমা মেয়ে, খুব টর টর করে কথা বলে।

বুলা বললো, আমার ভালো নাম গায়ত্রী চক্রবর্তী। মোটেই পশ্চিমা মেয়ে নই। মাত্র দু' বছর আগে মুঙ্গেরে গেছি!

মামুন বললো, অনেক ছোটবেলা দেখেছি ওকে, এখন চিনতেই পারিনি। তখন অন্য রকম ছিল। যেন শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি বেরিয়ে এসেছে!

বুলা তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে উঠলো। তারপর বললো, আপনি কী মজার কথা বলেন! আমি প্রজাপতি! ডানা মেলে উড়ে যাবো?

ছাদের পাশেই একটি পেয়ারা গাছ, এ দেশে পেয়ারাকে বলে গোইয়া। সেই গাছের বেশ কয়েকটি ডালপালা ঝুলে আছে ছাদের ওপর, তাতে পেয়ারা ফলেও আছে। হাত বাড়িয়েই পাওয়া যায়। পটাপট কয়েকটা পেয়ারা ছিঁড়ে এনে বুলা বললো, নিন, এই দিয়ে ব্রেক ফাস্ট শুরু করুন।

মামুন একটা পেয়ারায় কামড় দিয়ে বললো, বাঃ, বেশ মিষ্টি তো। তোমাদের বাড়ির গোইয়ার খুব সুনাম আছে।

প্রতাপ অবাক হলো। আকারে মোটামুটি বড় হলেও বেশ শক্ত, কষা কষা, এখনও ভালো করে স্বাদই আসে নি। এই পেয়ারাকে মামুন মিষ্টি বলছে? প্রতাপ নিজেরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, ধুৎ, এ খাওয়া যায় না। তুমি আমাদের আর এক কাপ করে চা খাওয়াবে?

বুলা আবার চা আনতে চলে গেল।

মামুন বললো, প্রতাপ, তুই আমাদের বাড়িতে আর একবার যাবি না? আমার আম্মা কিরে দিয়েছেন, তুই যদি একবার দেখা না করিস, খুব কষ্ট পাবেন।

প্রতাপ চুপ করে রইলো। নিজেকে সে ধর্ম-নিরপেক্ষ মনে করে বটে, তবু তার মনের মধ্যে কোথাও একটা হিন্দু-গরিমা আছে, সেখানে আঘাত লেগেছে। বাল্যকাল থেকেই সে দেখেছে যে মুসলমানরা হিন্দুদের কাছে বিনীত থাকে,উদার হিন্দুদেরও কথার সুরে ফুটে ওঠে। একটা পিঠ-চাপড়ানির ভাব। এই প্রথম সে শুনলো যে কোনো মুসলমানের বাড়িতে হিন্দুর স্থান নেই। কাল রাতে সে অন্তত পঁচিশ তিরিশবার মনে মনে বলেছে, সে জীবনে আর কখনো কোনো মুসলমানের বাড়িতে পা দেবে না! কিন্তু মামুন তো শুধু মুসলমান নয়, মামুন তার বন্ধু!

মামুন বললো, বুলাকেও নিয়ে যাবো তোর সাথে, সত্যজ্যাঠা আমাদের ওখানে প্রায়ই যান।

একটু পরেই বুলা আবার চা নিয়ে ফিরে এলো। দুটি কাপে চা ঢালার পর সে প্রতাপের দিকে চোখ পাকিয়ে বললো, আপনি আমাদের গাছের পেয়ারা ফেলে দিলেন? দাঁড়ান, আপনাকে আর একটা দিচ্ছি, গাছপাকা, ঐ যে উপরের ডালে, খেয়ে দেখবেন, একেবারে গুড়।

আচলটা কোমরে জড়িয়ে বুলা একটা ডাল বেয়ে উঠতে যেতেই সেই ডালটা এমন দুলে উঠলো যে প্রতাপ ভয় পেয়ে গেল। এই দস্যি মেয়েটা পড়ে যাবে নাকি! ওপরের ডালটা

বেশ সরু। প্রতাপ দৌড়ে এসে বুলার হাত চেপে ধরে বললো, এই, এই, নামো, তোমাকে উঠতে হবে না। আমি পেয়ারা খাবো না!

ইচ্ছে করে গাছের ডালটা আরও দোলাতে দোলাতে বুলা হেসে বললো, এই এই করছেন কেন? বললাম না, আমার নাম গায়ত্রী। আমি এর থেকে কত উঁচু আম গাছে উঠতে পারি।

সেই প্রথম প্রতাপ এক অনাত্মীয়া কিশোরীর শরীর স্পর্শ করেছিল।

মোট আট দিন সেইখানে থেকে গেল প্রতাপ। তারপর তাকে মালখানগরে ফিরতেই হবে। এর মধ্যে সত্যসাধনদের পরিবার এবং হাকিম সাহেবের পরিবারের সকলের সঙ্গে তার গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। দু জায়গাতেই তাকে প্রতিজ্ঞা করে যেতে হলো যে আবার আসবে।

মামুনের মা তাকে মাতৃস্নেহেরও অধিক কিছু দিয়ে একেবারে আপন করে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত হাকিম সাহেবকেও খারাপ লাগে নি প্রতাপের। তিনি কট্টর লীগপন্থী, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সে সব কিছু আনেন না। প্রতাপ আরও লক্ষ করেছিল, হাকিম সাহেব হিন্দুদের আচার-আচরণ, ধর্ম ও বেদ-পুরান সম্পর্কে যতখানি জানেন, অনেক শিক্ষিত হিন্দুই মুসলমানদের ধর্ম, রীতি-নীতি, কোরান-হাদিস সম্পর্কে তার সিকিভাগও খবর রাখে না।

দায়ুদ কান্দিতে নৌকোয় তুলে দিতে এসে একেবারে শেষ মুহূর্তে মামুন তার পাঞ্জাবির একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে বললো, একটা কবিতা...বাড়িতে গিয়ে পড়িস।

৮ মালখানগরে প্রতাপদের বাড়ির সামনে

মালখানগরে প্রতাপদের বাড়ির সামনে ও পিছনে ছিল দুটি পুষ্করিণী। সামনেরটি বেশ বড় এবং বারোয়ারি, পিছনেরটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং নিজস্ব। এই পুকুরটি চতুষ্কোণ, চারদিকে চারটি বাঁধানো ঘাট। একদিকে ধোপা ও নাপিতদের কয়েকটি ঘর, তারা মজুমদারদেরই প্রজা।

পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটি লৌহদণ্ড পোঁতা, তার মাথায় একটি হাত-জোড় করা গরুড় মূর্তি। বর্ষার সময় জল অনেক বেড়ে গেলেও ঐ মূর্তিটি ডোবে না। কেন যে পুকুরের মাঝখানে ঐ রকম একটা মূর্তি বসানো হয়েছিল তা আজ আর কেউ বলতে পারে না।

সেই পুকুরের একদিকে ঘন গাছপালার সারি। শৈশবে প্রতাপের মনে হতো, ঐ দিকটায় রয়েছে নিবিড় বন, ঘোর রহস্যময়। আসলে এটি একটি ফল-পাকুড়ের বাগান, তেমন সুসজ্জিত নয়, অনেক গাছই অযত্নবর্ধিত, প্রায় সাত বিঘে জমিতে ছড়ানো। আগাছা-পরগাছা পরিষ্কার করা হয় না বলে সে বাগানের কিছু কিছু অংশ বেশ দুর্গম। জাম-জামরুল পাখিতে খায়। আমগা মাটিতে পড়ে থাকে, মানুষ আসে না।

কৈশোরে অজানা-অচেনা সব কিছু সম্পর্কেই রোমাঞ্চবোধ থাকে। আবার সমস্ত অজানাকে জানার ইচ্ছেটাও জাগে। গা ছম ছম করলেও এগিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। গোঁফের রেখা ওঠার পর প্রতাপ একটা দা হাতে নিয়ে ঐ জঙ্গল-প্রতিম বাগানের মধ্যে অনেকবার গেছে, একবার দিনদুপুরে দুটি শেয়াল ও একটি গোসাপ দেখেও নিরস্ত হয়নি। ক্রমে ঐ বাগানের মধ্যে প্রতাপের একটা নিজস্ব, নিভৃত কুঞ্জ রচিত হয়েছে। আলোক লতায় সর্বাঙ্গ ছাওয়া একটি বড় ঝুপসি আম-গাছের নিচটা পরিষ্কার করে প্রতাপ মাঝে মাঝেই সতরঞ্চি আর বই খাতা নিয়ে টেড-এর মতন। এসে সেখানে একলা সময় কাটাতো।

সেই বাগানের মধ্যে একটা সরু খালও আছে। কিছু দূরের কোনো নদী থেকে সেই খালের মধ্যে দিয়ে জল এসে পুকুরে পড়ে। প্রতাপ সেই খালটিকে ঝরনা বলে ভাবতে ভালোবাসে। বাগানের মধ্যে কোনো একটা স্থান একটু উঁচু বলে সেখানে জল-পতনের উচ্ছ্বাস শোনা যায়। সম্প্রতি দু একদিন খুব বৃষ্টি হওয়ায় জল বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দায়ুদকান্দি থেকে ফেরবার দু'দিন পর প্রতাপ তার সেই বাগানের নিরালা জায়গাটিতে গেল দুপুরবেলা। তার কল্পিত ঝরনাটির পাশে দাঁড়িয়ে জলের শব্দ শুনতে শুনতে তার মনে পড়লো গায়ত্রীর কথা।

প্রতাপের বয়স তখন উনিশ। এর আগে অনাত্মীয়া কোনো রমণীর সঙ্গে তার মেলামেশা হয়নি। নারী-জাতি সম্পর্কে তার আলাদা কোনো কৌতূহলও জাগ্রত হয়নি। যদিও প্রায় এই বয়েসেই তখন অনেক ছেলের বিবাহ হয়ে যেত, বিশেষত বামুন বাড়ি ও মুসলমান বাড়ির ছেলেদের। মালখানগরে প্রতাপের যারা বাল্য খেলার সঙ্গী, তাদের মধ্যে কেউ কেউ চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েস থেকে নানাপ্রকার অসভ্য কথা শিখেছিল। লালাসিক্ত কণ্ঠে তারা স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলে প্রতাপ তাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে। সে ঐ আলোচনায় রস পায় না। তার চেয়ে খেলাধুলোর কথা তার অনেক বেশি পছন্দ। খেলাধুলোর কথার মধ্যে যারা হঠাৎ মেয়েদের প্রসঙ্গ টেনে আনে তাদের গাড়ল মনে হয় প্রতাপের। এইজন্য নগেন নামে এক বন্ধুকে একদিন সে থাপ্পড় মেরেছিল পর্যন্ত।

বুলা অর্থাৎ গায়ত্রীর সঙ্গে টানা আটদিন কাটিয়ে আসার পর প্রতাপ যেন নারী জাতিকে নতুন করে চিনলো। মা নয়, দিদি নয়, এ যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের প্রাণী, যার কথাবার্তা একেবারে অন্যরকম।

বুলাকে প্রথমে ঠিক পছন্দ করেনি প্রতাপ। বেশ ফাজিল ধরনের মেয়েটি। প্রতাপকে সে ভূতের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল প্রথম দিন থেকেই। এক রাত্তিরে সে সাদা কাপড়

মুড়ি দিয়ে প্রতাপের ঘরের জানলায় উঁকি মেরে নাকি সুরে বলেছিল, এঁই প্রঁতাঁপ... সত্যসাধন বলেছিলেন, এই মাইয়াটা আগের জন্মে নির্ঘাৎ জলদস্যু আছিল!

লাজুকতার লেশমাত্র নেই বুলার চরিত্রে, কথার মারপ্যাঁচে প্রায়ই সে প্রতাপ আর মামুনকে অস্বস্তিতে ফেলে দিত। মুঙ্গেরে আড়াই বছর কটিয়েই সে এত সাবলীল, পশ্চিমের মেয়েরা বুঝি এই রকম হয়! বয়েসে বছর চারেকের ছোট হয়েও সে সব বিষয়ে প্রতাপ আর মামুনের সমান সমান হতে চাইতো।

খালের জলের কলকল, ছলচ্ছল শব্দে প্রতাপ যেন গায়ত্রীর হাসির শব্দ শুনতে পেল। প্রতাপের মন-কেমন করে উঠলো। গায়ত্রীরা মুঙ্গেরে ফিরে যাবে, আর কি কোনোদিন দেখা হবে?

আমগাছ তলায় সতরঞ্চি বিছিয়ে বসার পর বই খুলেও প্রতাপ মনঃসংযোগ করতে পারলো না। বারবার গায়ত্রীর কথা মনে পড়ছে। দুষ্টু মেয়েটা কথায় কথায় হাসে। খোঁচা দিয়ে কথা বলে। তবু সে এত আপন হয়ে গেল কা করে?

গায়ত্রীর শাড়ী পরার ধরনটা আলুথালু ধরনের। সে নিজেই বলেছিল, মুঙ্গেরে সে এখনো ফ্রক পরে, বাড়িতে ঠাকুমার আপত্তি বলেই তাকে শাড়ী পরতে হয়। কিন্তু এখনো সেটা ঠিক আয়ত্ত হয়নি। শক্ত করে কোমরে আচল জড়িয়ে বাধলেও এক সময় আবার আলগা হয়ে যায়। এখন, এতদূর থেকে গায়ত্রার কথা চিন্তা করে প্রতাপের মনে হলো, গায়ত্রার শাড়া যেন সমুদ্রের ঢেউ- এর মতন।

বাড়িতে দুর্গা পুজোর আয়োজন শুরু হয়ে গেছে, আত্মীয়-স্বজনরা আসতে শুরু করেছে, অন্যান্য বছর প্রতাপ নানা কাজে, হৈ-চৈতে মেতে থাকে। এবার কী যে হলো তার, সে ফাঁক পেলেই বাগানে চলে যায়, গায়ত্রীর কথা ভাবে, তার সারা শরীরে উষ্ণতা জেগে ওঠে। মাঝে মাঝে সে উচ্চারণ করে, বুলা, বুলা! গায়ত্রী, গায়ত্রী! তার বুলা নামটাই বেশি পছন্দ হয়।

প্রতাপ ঠিক রোমান্টিক বা আত্মমগ্ন ধরনের ছেলে নয়। তখনও পর্যন্ত তার কোনো গোপন জগৎ ছিল না। বুলার জন্য তার এই যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে, একথা কারুকে বলার জন্য সে ছটফট করতে লাগলো। কিন্তু কাকে বলবে? মালখানগরের কোনো ছেলের সঙ্গেই তার খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নেই। কলকাতায় পড়তে যাবার পর একমাত্র মামুনের সঙ্গেই তার অন্তরঙ্গতা হয়েছে। মামুনকে বলা যায়, ছুটির শেষ দিকে মামুন এখানে আসবে কথা আছে, কিন্তু সে তো অনেক দেরি।

দুই দিদির মধ্যে সুপ্রীতির সঙ্গেই তার বেশি ভাব। পুজো উপলক্ষে সুপ্রীতি আর অসিতবরণও কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সুপ্রীতির কোনো ছেলে-মেয়ে হয়নি, তাই এখনো তাকে কিশোরীর মতন দেখায়। কিন্তু দারুণ কাজের মেয়ে সে। সুহাসিনী এই পরিবারের কত্রী হলেও চারদিক সামলাতে পারেন না, সুপ্রীতি এসে মায়ের কাছ থেকে সব ভার নিয়ে নেয়। বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর সুপ্রীতি আর অসিতবরণ এখানেই ছিলেন, ইদানীং সম্পত্তি দেখার জন্য অসিতবরণকে বরানগরে থেকে যেতে হচ্ছে।

একদিন দুপুরে সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর প্রতাপ সুপ্রীতিকে বললো, দিদি, আমার সঙ্গে ওপারের বাগানে যাবি? ওখানে আমি একটা সুন্দর জায়গা তৈরি করেছি।

সুপ্রীতি বললো, চল। দাঁড়া, আগে একটা পান খেয়ে আসি!

প্রতাপের পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। সুপ্রীতি পরে আছে একটা লালডুরে শাড়ী আর ঘটি হাতা ব্লাউজ। গ্রামের মেয়েদের মতন সে এখন আর সেমিজ পরে না। তার ঈষৎ কোঁকড়া ঘন কালো চুলে পিঠ ছেয়ে আছে। খালি পায়ে দুই ভাই বোন পুষ্করিণীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগলো।

সুপ্রীতি বললো, স্নান করার সময় বললি না কেন? অনেকদিন সাঁতার কেটে এ পারে আসিনি।

প্রতাপ বললো, এ পারের ঘাট দিয়ে ওঠা যায় না। বড় পিছল!

সুপ্রীতি বললো, খোকন, তোর মনে আছে?

প্রতাপ ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ!

অনেক দিন আগে, প্রতাপের তখন বছর দশেক বয়েস হবে, একটা ঘটনা ঘটেছিল। সন্ধেবেলা দেখা গিয়েছিল, পুকুরের এই পারের ঘাটলায় নীল শাড়ী পরা একজন স্ত্রীলোক বসে আছে। কে সে? প্রতাপদের বাড়ির কেউ নয়। ধোপা-নাপিতদের পাড়ার কেউ হতে পারে, কিন্তু তাদের তো নিজস্ব ঘাট আছে। সন্ধেবেলা কোনো স্ত্রীলোক ওখানে একা বসে থাকবে। কেন? এপার থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কে ওখানে? ওগো, তুমি কাদের বাড়ির বউ? কোনো উত্তর আসেনি। অনেক ডাকাডাকাতিতেও সাড়া পাওয়া যায়নি, অথচ বধূটি ঘোমটা টেনে চুপ করে বসে ছিল। শেষ পর্যন্ত বাড়ির কয়েকজন পুরুষ ওপারে গেল খোঁজ। করতে, তার মধ্যেই সে মিলিয়ে গেল। কেউ বলে সে জলে নেমে গিয়েছিল, কেউ বলে সে ছুটে চলে গিয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে। বাড়ির সকলের চোখের সামনে ঘটেছিল ঘটনাটি। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কে এবং কোথায় সে মিলিয়ে গেল, তা একটা রহস্যই রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। কোনো লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর থেকেই কেউ আর সাঁতার কেটে এই ঘাটে আসে না।

সুপ্রীতি বললো, খোকন, তুই একা একা এই জঙ্গলের মধ্যে পড়তে আসিস, তোর ভয় করে না!

প্রতাপ তখন তার সেই নিজস্ব ঝরনার কাছে উপস্থিত হয়েছে। তার বুক মুচড়ে উঠলো, সে সুপ্রীতির হাত চেপে ধরে বললো, দিদি, আমার একটা অসুখ হয়েছে।

সুপ্রীতি তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো প্রতাপের মুখের দিকে। সে খুবই বুদ্ধিমতী। কিছু একটা আঁচ করতে তার দেরি হলো না। সে বললো, এইখানে বোস। দায়ুদকান্দিতে কী কী হয়েছে সব খুলে বল তো।

প্রতাপ ঠিক গুছিয়ে বর্ণনা করতে পারে না। মামুনদের গ্রামে সে থাকতে গিয়েছিল, কিন্তু মামুনদের বাড়িতে তার স্থান হয়নি, পাকেচক্রে সত্যসাধন চক্রবর্তীর বাড়িতে তাকে অতিথি হতে। হলো। সেইখানে বুলার সঙ্গে পরিচয়। সে বড় অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, তার প্রত্যেকটি কথা ফিরে ফিরে আসছে। এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকলেও মনে হয় হঠাৎ যেন বুলা কোনো। গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারবে।

শুনতে শুনতে সুপ্রীতি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। তার মায়ের ভয় ছিল, প্রতাপ কলকাতায় পড়াশুনো করতে গিয়ে কোনো থিয়েটারের মেয়ের পাল্লায় না পড়ে। সুহাসিনীর। এক দূর সম্পর্কের মামা কলকাতায় এক থিয়েটারের অভিনেত্রী তথা বেশ্যার অন্নদাস হয়ে পড়েছিলেন নাকি! সেই থেকে সুহাসিনীর ধারণা কলকাতার রাস্তায় থিয়েটারে মেয়েরা ডাকিনী-যোগিনীর মতন ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রতাপের সে রকম কিছুই হলো না, সে বাঁধা পড়লো কুমিল্লার এক গ্রামের মেয়ের আঁচলে!

সুপ্রীতি বললো, থোকন, তুই যে দেখি মরেছিস একেবারে! ঠিক আছে, বাবাকে বলি সম্বন্ধ করতে। কী নাম বললি? চক্রবর্তী? ওমা, ছি ছি, কী কাণ্ড করেছিস তুই, খোকন? ওরা যে ব্রাহ্মণ? ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে না, জানিস না?

প্রতাপ বললো, না দিদি, আমি বিয়ের কথা বলছি না। আমি এখন বিয়ে করতে চাই না।

সুপ্রীতি বললো, বিয়ে করতে চাস না, তা হলে তুই একটা অবিবাহিত মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে গেলি কোন আক্কেলে? ছিঃ!

প্রতাপ অসহায়ভাবে বললো, আমি ইচ্ছে করে ভাব করিনি, সে নিজে থেকে কথা বলেছে।

–কথা বলেছে তো কী হয়েছে? তা বলে ভাব করতে হবে?

–সে আমাকে গান শুনিয়েছে। রবিবাবুর গান, ভালো গায়।

–বেশ মানলুম, গান শুনিয়েছে। গান শুনে মাথা নাড়বি। তা বলে বামুনবাড়ির মেয়ের সঙ্গে তুই ভাব করতে গেলি কেন? তুই তাকে ভাবের কথা বলেছিস কিছু?

–ওখানে থাকতে ওকে কিছুই বলিনি। কিন্তু এখন সব সময় মনে পড়ে ওর কথা। দিদি, আমি এখন কী করি?

–ও মা, অমন মুখ-চোখ করছিস কেন? পাগল হয়েছিস নাকি? ওসব কথা মনে রাখতে নেই। ঐ গ্রামে আর যাস না কোনোদিন।

–বুলার ঠাকুমা, তাঁকে আমি জেঠিমা বলেছি, বড় সুন্দর মানুষ, তাঁর কাছে যে কথা দিয়েছি আবার যাবো?

--ঐ মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাক। তারপর যাবি। তুই আমাদের বাড়ির একমাত্র ছেলে, তুই যদি একটা কিছু অন্যায় করে ফেলিস, তা হলে মা-বাবা কত দুঃখ পাবেন বল তো?

এরপর দু ঘণ্টা ধরে সুপ্রীতির সঙ্গে এই একই বিষয় নিয়ে বারবার কথা হতে লাগলো। প্রতাপ বুঝতে পেরেছে যে তার একটা ভুল হয়েছে, এক ব্রাহ্মণ কুমারীকে পছন্দ করা তার পক্ষে অসমীচীন কাজ। কিন্তু মন যে মানতে চায় না!

পরের দিন মা তাকে একটা কাগজ দিলেন। তার জামার পকেটে ছিল, কাঁচতে যাবার সময় পাওয়া গেছে, কাগজটা ভিজে গেছে খানিকটা। প্রতাপের মনে পড়লো, এটা মামুনের সেই কবিতা, সে ভুলেই গিয়েছিল এর কথা।

ভিজে গেলেও অক্ষরগুলো পড়া যায়। কবিতাটি প্রজাপতি বিষয়ে। প্রতাপ কাব্যরসের তেমন মর্ম বোঝে না, তবু কবিতাটির প্রেরণা কোথা থেকে এসেছে তা বুঝতে তার

অসুবিধে হলো না। জলের শব্দ শুনে প্রতাপের যার কথা মনে পড়ে, মামুনের কবিতার প্রজাপতিও সে।

কবিতাটি পড়ে প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলো। বুলাকে মামুনেরও খুব পছন্দ হয়েছে এবং সেই কথা জানাবার জন্যই সে প্রতাপের পকেটে শেষ মুহূর্তে কবিতাটা গুঁজে দিয়েছিল। এইবার প্রতাপের পক্ষে বুলাকে ভুলে যাওয়া সহজ হবে।

ছুটির শেষে মামুন মালখানগরে এলো না, চিঠি লিখে জানালো তার অসুবিধে আছে। প্রতাপ কলকাতায় এসেও বেশ কয়েকদিন মামুনকে দেখতে পেল না। মামুন যখন ফিরলো, তখন তার চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। বেশ রোগা হয়ে গেছে সে, পোষাক ময়লা, মাথার চুল বড় বড়, চোখ দুটি যেন জ্বলজ্বল করছে।- মামুনের জীবনে সত্যিই একটা বিপর্যয় ঘটেছে। মামুনের বাবা তাকে কিছু না জানিয়ে তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলেন, মামুন কিছুতেই সে বিয়েতে রাজি হয়নি। ও বাড়িতে মামুনের বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারে না। মামুনের মা ছেলের পক্ষ নিলেও সুবিধে মান। মামুনের বাবা সৈয়দ হাকিম সাহেব স্রেফ জানিয়ে দিয়েছেন যে মামুন তার কথার বাধ্য হলে তিনি আর ছেলের পড়ার খরচ চালাবেন না। মামুনের কলকাতায় পড়াশুনোই বন্ধ ম যাচ্ছিল, তবু সে জেদ করে চলে এসেছে। একটি পত্রিকা অফিসে সে পুফ রীডারের চাকরি সংগ্রহ করেছে, তাতেই অতিকষ্টে তাকে চালাতে হবে।

উত্তরটা প্রায় জানা থাকলেও প্রতাপ মামুনকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই বিয়ে করতে রাজি হলি না কেন?

প্রতাপের চোখের দিকে একদৃষ্টে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো মামুন। তারপর বললো, তুই-ই বল প্রতাপ, গায়ত্রীর মতন কোনো নারীকে দেখলে আর কোনো স্ত্রীলোককে জীবনসঙ্গিনী করতে ইচ্ছা হয়? জানি, আমি গায়ত্রীকে কোনোদিন পাবো না। কিন্তু গায়ত্রী যতদিন না ম ঘরে চলে যায়, ততদিন আমি বিয়ে-শাদী করতে পারবো না।

মামুন এ পর্যন্ত সাতান্নটি কবিতা লিখেছে গায়ত্রীকে নিয়ে। সেই সব কবিতাবলী নিয়ে সে "আশমানের প্রজাপতি" নামে পুস্তক ছাপতে চায়। প্রতাপ চলে আসার পর সে গায়ত্রীদের বাড়িতে দু দিন মাত্র গিয়েছিল, তারপর আর ভয়ে যায়নি। গায়ত্রীকে না দেখতে পেলেও সে দূর থেকে তার উদ্দেশে স্তুতি গাথা রচনা করে যাবে।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলো, কেন, ভয়ে দেখা করতে যাসনি কেন? সত্য জ্যাঠা কিছু আপত্তি করেছেন? তিনি তো সে রকম মানুষ নন!

মামুন বললো, না, না, সত্য জ্যাঠা দেবতুল্য মানুষ।

ওঁদের পরিবারের সকলেই মামুনকে পছন্দ করে। কিন্তু ঐ পল্লীর দুটি ছেলে একদিন মামুনের প্রতি ব্যাঁকা বাঁকা কথা বলেছিল।

প্রতাপ বললো, তাতেই তুই ভয় পেয়ে গেলি।

মামুন বললো, তুই জানিস না, ঢাকায় নজরুল ইসলাম প্রতিভা সোম নামে এক তরুণীকে গান শেখাতে যেতেন? কয়েকদিন খুব ঘন ঘন যেতে শুরু করেছিলেন, এক সন্ধেবেলা বনগাঁর হিন্দু ছেলেরা কবিকে ঘিরে ধরে মারতে গিয়েছিল।

একটু থেমে মামুন আবার বললো, আমি তো গান শেখাতে যেতাম না, আমি যেতাম গান শুনতে। আহা, কী মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর!

কয়েকদিন পর বুলার একটা চিঠি এলো প্রতাপের নামে। সে চিঠিতে প্রেমের কথা নেই, আছে অভিযোগ। প্রতাপ এবং মামুন কেন তাকে চিঠি লেখেনি? কলেজে পড়ে বলে বুঝি। তাদের খুব অহংকার?

প্রতাপ সে চিঠির কোনো উত্তর না দিয়ে মামুনের কয়েকটি কবিতা খামে ভরে পাঠিয়ে দিয়েছিল বুলার নামে। তারপর আর কোনো চিঠি আসেনি।

বছর আড়াই পরে বুলার স্মৃতি যখন কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে, তখন বুলার সঙ্গে আবার আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল।

প্রতাপ তখন ল কলেজের ছাত্র। বরানগরে দিদির বাড়িতে এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। সুপ্রীতি তখন পাকাঁপাকিভাবে শ্বশুরবাড়িতে এসে রয়েছে। প্রতাপকে সেখানে সপ্তাহে দুবার অন্তত আসতে হয়। অসিতদা শখ করে একটি মটোর গাড়ি কিনেছেন। এক একদিন তিনি নিজেই গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হন প্রতাপের মেসে। প্রতাপের সামনে থেকে বই সরিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ওহে সম্বন্ধী, অত আইন পড়ে তুমি কি প্রিভি কাউনসিলে যাবে নাকি? চলো, মেঘলা দিন পড়েছে, ক্যানিং টাউন ঘুরে আসি!

বরানগরের বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেরার পথে, বাগবাজারে বাস বদল করার সময় প্রতাপ হঠাৎ এক বালক কণ্ঠের ডাক শুনতে পেল, প্রতাপদা!

প্রতাপ মুখ ফিরিয়ে দেখলো, দেখামাত্র চিনতে পারলো বুলার ছোট ভাই রতনকে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বুলা, তাঁর পাশের প্রৌঢ় ব্যক্তিটি খুব সম্ভবত বুলার বাবা। রতন সোল্লাসে বললো, প্রতাপদা, আমরা এখন কলকাতায় থাকি!

বুলা নিজে থেকে প্রথমে কোনো কথা বলেনি। এখন আর তার শাড়ী অগোছালো নয়, চোখের দৃষ্টিতেও পূর্বেকার সেই চাঞ্চল্যমাখা দুষ্টুমি নেই। সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে প্রতাপের দিকে।

রতন পরিচয় করিয়ে দিতেই বুলার বাবা সত্যব্রত চক্রবর্তী বললেন, হ্যাঁ, তোমার কথা শুনেছি। সেবারে আমি পৌঁছোবার আগেই তুমি চলে গিয়েছিলে।

প্রতাপের প্রথমেই মনে পড়লো, বুলার দাদার কথা, যাঁকে সে চোখে দেখেনি। সে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, আপনার যে ভাইপো জেলে ছিলেন, হিতব্রত, তিনি কেমন আছেন?

মাটির দিকে চোখ করে সত্যব্রত বললেন, সে মারা গেছে। জেল থেকে পালাতে গিয়েছিল...আমার মা বলেছিলেন তোমার সঙ্গে হিতুর মুখের মিল আছে, তা খানিকটা আছে বটে–

এইবার বুলা বললো, আপনি ঠাকুমার কাছে কথা দিয়েছিলেন, প্রত্যেক বছর একবার করে যাবেন, কথা রাখেননি। কলকাতার লোকেরা এই রকম মিথ্যুক হয়।

সত্যব্রত বললেন, আহা, সব সময় কী যাওয়ার সুবিধে থাকে। এখন পড়াশুনোর চাপ।

প্রতাপ অনুতপ্ত বোধ করে চুপ করে রইলো।

সত্যব্রত একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে প্রতাপকে তুললেন জোর করে। ওঁরা যাবেন। ভবানীপুর। পথে বৌবাজারে প্রতাপকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। গাড়িতে কিন্তু বিশেষ কথা হলো না। হিতব্রতর মৃত্যু-সংবাদ প্রতাপকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। হঠাৎ হিতব্রতর কথাই বা তার মনে এলো কেন? সত্যসাধন তাঁর এই বিপ্লবী পুত্র সম্পর্কে বেশ গর্বিতই ছিলেন, এখন তাঁর মনের ভাব কী রকম? ভেঙে পড়েছেন খুব? আর সুরবালা? প্রতাপের সত্যিই ইচ্ছে করলো একবার। সরবালার সঙ্গে দেখা করতে। যদি তার মুখোনা সুরবালাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারে।

এর দিন সাতেক পরে বুলা একলা চলে এলো প্রতাপের মেসে। সত্যি সাহস আছে বুলার। কয়েকদিন ধরে ছাত্র বিক্ষোভ চলেছে, পথঘাট নিরাপদ নয়। প্রতাপদের মেসে স্ত্রীলোকেরা সাধারণত আসে না। সে রকম কোনো বিধিনিষেধ নেই অবশ্য। তবু বাড়িটিতে এত পুরুষ পুরুষ গন্ধ যে মহিলাদের যেন এখানে মানায় না। বুলা আগের দিন বাড়িটি চিনে গেছে। সোজা উঠে এলো দোতলায়। প্রতাপ খালি গায়ে বসে পড়াশুনো করছিল, তাড়াতাড়ি উঠে জামা পরে নিল। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ।

বুলা ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। সে উত্তেজনার বশে চলে এসেছে। এখন দুর্বল বোধ করছে।

একটু পরে মুখ তুলে সে জিজ্ঞেস করলো, আমি এসেছি বলে আপনি রাগ করেছেন?

প্রতাপ বললো, না, না!

সে ভাবলো, মামুন থাকলে কত খুশী হতো। মামুন এখনও গায়ত্রীর উদ্দেশে অনেক পদ্য লিখে যাচ্ছে। সে বুলা নামটা পছন্দ করে না। সে গায়ত্রী বলে। বাবার সঙ্গে অনেকটা মিটমাট হয়ে গেছে মামুনের, দেশের বাড়িতেও ফিরে গেছে দু একবার। অবশ্য গায়ত্রীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

মামুন এখানে নেই, সে মেদিনীপুরে কী একটা সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে গেছে।

বুলা কথা বলতে পারছে না দেখে প্রতাপ বললো, জানো বুলা, মামুন প্রায়ই তোমার কথা বলে। তুমি কি ওর "আশমানের প্রজাপতি" বইটি পড়েছো?

বুলার সেই ঝলমলে ভাবটা আজ নেই। সে ম্লান মুখে মাথা নাড়লো দু'দিকে।

প্রতাপ উঠে মামুনের কবিতা-পুস্তকটি খুঁজে এনে বুলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, পড়ে দ্যাখো, অনেক কিছু চেনা চেনা লাগবে। তোমাদের গ্রামের কথা আছে, তোমার কথাও আছে।

বুলা নিঃস্পৃহভাবে দু'একটি পাতা ওল্টালো, তারপর বইটি পাশে রেখে বললো, প্রতাপদা, আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?

প্রতাপ হালকা গলায় বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সাহায্য করবো। তুমি হঠাৎ আপনি আজ্ঞে করে কথা বলছো কেন, সেবারে তো তুমি তুমি বলতে আমাকে! তোমার কী হয়েছে, বলো?

-আপনি আমার চিঠির উত্তর দেননি!

–চিঠি, মানে, আমার ঠিক চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না, বাড়িতেও বিশেষ লিখি না!

–আপনি আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, তাই না?

–না, না, তোমার কথা কি ভোলা যায়? মামুনের সঙ্গে প্রায়ই তোমার বিষয়ে কথা হয়। তা গান খুব গাইতে, 'হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে...', মামুন এখনও সেই গানটা প্রায়ই গুণগুণ করে।

বুলা মুখ নীচু করে বসে রইলো। মামুনের প্রসঙ্গে সে কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছে না। সে একবারও মামুনের কোনো খবর জিজ্ঞেস করেনি। বুলার গালের এক পাশে রোদ এসে পড়েছে। তার হলুদ রঙের শাড়ীটি রোদ্দুরের সঙ্গে মিলে যায়।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী দরকার, সেটা বললে না?

–প্রতাপদা, আমি কলেজে পড়তে চাই!

–তুমি ম্যাট্রিক পাশ করে গেছো বুঝি? ওমা, এই কথাটাই এতক্ষণ বলোনি? এ তো দারুণ সুখবর। কেমন রেজাল্ট হলো?

–তেমন ভালো নয়। একটুর জন্য ফাস্ট ডিভিশান পাইনি।

–তাতে কী হয়েছে? এ বছর ফার্স্ট ডিভিশান খুব কম, মেয়েদের মধ্যে সেকেণ্ড ডিভিশানই বা ক'জন পায়? তুমি কলেজে পড়বে...ভর্তি হতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

হঠাৎ টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো বুলার চোখ দিয়ে। সে আর কোনো কথা বললো না।

প্রতাপ ঘাবড়ে গেল। এর মধ্যে আবার কাঁদবার কী আছে?

বারান্দা দিয়ে অন্য লোকজন যাচ্ছে, তারা যদি দেখে যে প্রতাপের সামনে বসে একটি তরুণী চোখের জল ফেলছে, তা হলে পরে তারা টিটকিরি দেবে।

খানিকটা অধৈর্যের সঙ্গে প্রতাপ বললো, কী হয়েছে, বুলা? এখানে তুমি এমন করলে তো মুশকিল। তুমি কলেজে পড়তে চাও, তাতে যদি আমি কোনো সাহায্য করতে পারি....

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বুলা বললো, আমার বাবা আমাকে আর পড়াতে চান না, আমার বিয়ে ঠিক করেছেন এক জায়গায়।

এবারে প্রতাপের চুপ করে থাকার পালা। বুলার বাড়িতে পড়াশুনোর ব্যাপারে আপত্তি থাকলে প্রতাপ আর কী করে সাহায্য করবে?

বুলা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, এ বিয়ে আমি করতে চাই না! কিছুতেই চাই না! আমি কলেজে পড়তে চাই! প্রতাপদা, তুমি আমার বাবাকে গিয়ে বলবে?

প্রতাপের বুকে গুড়গুড় শব্দ হতে লাগলো। এই প্রশ্নের মধ্যে কী যেন একটা ভয়ংকর ইঙ্গিত আছে।

সে বুলাকে ভালো করে দেখলো। আগের চেয়েও যেন অনেক বেশি সুশ্রী হয়েছে সে, চোখ দুটি গভীর। সে গুণবতী মেয়ে, তাদের বংশ ভালো, খুব ভালো পাত্রের সঙ্গেই তার বিয়ে হবার কথা।

শুকনো গলায় প্রতাপ বললো, আমি তোমার বাবাকে বলতে যাবো-তিনি আমার কথা শুনবেন কেন? তোমার অনেক আত্মীয়স্বজন...আমি তো...

প্রতাপের চোখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বুলা জিজ্ঞেস করলো, তুমি বলবে না? তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাও না?

সেদিন প্রতাপ বুলাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর বুলাকে বাসস্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে প্রতাপ বলেছিল, সে আগামীকালই বুলার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

কিন্তু প্রতাপ যায়নি। বুলার বাবাকে গিয়ে তার পক্ষ থেকে এই বিয়ে বন্ধ করতে বলার। একটাই অর্থ হয়। যে যুবক নিজে একজন পাণিপ্রার্থী, সে-ই এরকম কথা বলতে পারে। এ রকম প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া কী হবে তা প্রতাপ জানতেও চায় না। কলকাতা শহরে সেই তিরিশের দশকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে বিবাহ এমন কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়।

প্রতাপের পরিবার থেকে প্রবল আপত্তি হতো ঠিকই, তবু প্রতাপ তা অগ্রাহ্য করতে পারতো। কিন্তু আসল বাধা অন্য জায়গায়। প্রতাপ জানতো, মামুন বুলাকে তীব্র ভাবে ভালোবাসে। বুলার কথা বলতে গেলেই মামুনের কণ্ঠস্বর গদগদ হয়ে যায়। যদিও মামুন বুলাকে কোনোদিনই পাবে না। ততখানি সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর সাহস মামুনের নেই। তা ছাড়া মামুনের ভালোবাসা একতরফা, বুলার দিক থেকে মামুনের প্রতি সে ধরনের কোনো দুর্বলতা জন্মায়নি। মামুন প্রায়ই বলে, ব্রাহ্মণ কন্যা গায়ত্রী যত দিন না বিয়ে করে পরের ঘরে চলে যায়, ততদিন আমিও অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না।

সেই পরের ঘর মানে কি প্রতাপের সংসার হতে পারে? মামুন তাতে আরও বেশী আঘাত। পাবে। একটি মেয়ের জন্য প্রতাপ কিছুতেই তার বন্ধুর মনে আঘাত দিতে পারবে না।

কাপুরুষের মতন মেস ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রতাপ প্রায় দিন পনেরো বরানগরে দিদির বাড়িতে গিয়ে রইলো।

সুপ্রীতি এবং অসিতবরণ প্রায়ই প্রতাপকে মেসবাড়ি থেকে ছাড়িয়ে এনে বরানগরে নিজেদের কাছে রাখবার জন্য পেড়াপিড়ি করেছেন আগে। প্রতাপ রাজি হয় নি। এখন প্রতাপ নিজে থেকেই এসে দিনের পর দিন থেকে যাচ্ছে দেখে সুপ্রীতি অবাক হয়েছিলেন গোপনে গোপনে। প্রতাপও প্রথম কয়েকদিন দিদিকে কিছু বলেনি। কিন্তু তার অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল। তখন। সেই কষ্ট দুটি কারণে। নিজের কাপুরুষতার জন্য তার সর্ব অঙ্গে আলপিন

দংশন হচ্ছিল। অল্প বয়েস থেকেই প্রতাপ মিথ্যে কথা বলাটাকে ঘৃণা করে। বুলাকে সে মিথ্যে বলেছে। অথচ সেদিন ক্রন্দনশীলা বুলাকে আর কী বলেই বা বাড়িতে ফেরানো যেত?

তা ছাড়া প্রতাপ ভেবেছিল, বুলা নিজে কিছু না জানুক তবু সে মামুনের মনোনীতা, সেই জন্য প্রতাপ বুলা সম্পর্কে নিজের দুর্বলতা মুছে ফেলেছে। কিন্তু এখন তার বুকটা মুচড়ে মুচড়ে ফেটে যাবার উপক্রম। বুলার মতন মেয়ে নিজে থেকে তার কাছে এসেছিল, তবু বুলাকে সে। ফিরিয়ে দিল? বুলা একজন অন্য পুরুষের কাছে চলে যাবে? অথচ প্রতাপের সমস্ত শরীর-মন বুলার জন্য হাহাকার করছে। সে একবার মুখ ফুটে চাইলেই বুলা তার হতো, অথচ সে মুখ ফুটে চাইতে পারলো না, এই চিন্তাটাই তার পৌরুষে চাবুক কষাচ্ছে অনবরত। এক একবার ইচ্ছে করছে ছুটে যেতে বুলাদের বাড়িতে।

সুপ্রীতি শেষ পর্যন্ত জানতে পারলেন। সব কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বলেছিলেন, তুই ঠিকই করেছিস রে, খোকন। বুলাকে তুই বিয়ে করলে সে বিয়ে সুখের হতো না। দুই পক্ষের বাবা-মায়ের মানসিক কষ্টের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু তোর বন্ধু মামুনকে, তো তুই ছাড়তে পারতি না! মামুন তোর বাড়িতে এসে বুলার দিকে চেয়ে গোপনে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। তুই যা করেছিস, ঠিকই করেছিস। বুলার সাথে আর কোনো দিন দেখা করিস না। সময় সব ভুলিয়ে দেয়। বুলাও একদিন এসব কথা ভুলে যাবে, নিজের সংসার নিয়ে সুখে থাকবে!

কিন্তু বুলার সঙ্গে তার নিয়তির কোনো যোগাযোগ আছে। এরপরেও বুলার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে কয়েকবার। একবার দেশে ফেরার পথে স্টিমারে। বুলার সঙ্গে তার স্বামীও ছিলেন। তিনি বিলেত-ফেরত। সুপুরুষ ও ধনী। বুলাকে বেশ খুশী মনে হয়েছিল। যদিও প্রতাপকে দূর থেকে দেখে সে কোনো কথা বলেনি। তারপর আরেকবার, প্রতাপেরও তখন বিয়ে হয়ে গেছে মমতার সঙ্গে, উত্তর কলকাতায় নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে নতুন সংসার পেতেছে। পিকলু জন্মাবার আগে মমতা যখন বাপের বাড়ি গেছে, সেই সময় প্রতাপ একদিন দেখলো যে কাছেরই একটি বাড়ি থেকে বুলা অন্য দুটি সুসজ্জিতা মহিলার সঙ্গে

বেরুচ্ছে। এত কাছে যে বুলার সঙ্গে স্পষ্ট। চোখাচোখি হলো, বুলা থমকে দাঁড়ালো, বোধহয় কিছু বলতেও চেয়েছিল। কিন্তু বলা হয়নি। প্রতাপ সেখানে দাঁড়ায়নি।

সেই বাড়িটি কোনো অভিজাত পরিবারের। সেটাই বুলার শ্বশুরবাড়ি না স্বামী পক্ষের কোনো আত্মীয়ের, তা প্রতাপ ঠিক বুঝতে পারেনি। আরও দু'চারবার সে সেই বাড়িটির সামনে দিয়ে হেঁটেছে, কিন্তু বুলাকে আর দেখতে পায়নি। কিছুদিন পরেই প্রতাপকে অন্য কারণে বাড়ি বদল করে সে পাড়া থেকে চলে যেতে হয়।

এতদিন পরে বুলার সঙ্গে আবার দেখা, এই দেওঘরে। অন্য দু'জন নারী-পুরুষের সঙ্গে বুলা এসেছে তাদেরই বাড়িতে। বুলা কি এখনো রাগ করে আছে?

৯ সত্যেন ভাদুড়ীর গায়ের পাঞ্জাবী

সত্যেন ভাদুড়ীর গায়ের পাঞ্জাবীটি গিলে করা, ধুতিটি কোঁচানো, কাঁধের শালটির পাড় প্রায় এক বিঘৎ চওড়া এবং মুখে হরতনের গোলামের মতন পাকানো গোঁফ, হাতে একটি রূপো। বাঁধানো ছড়ি। এই সবই তাঁর বনেদীআনার সূচক। দেশবিভাগে তাঁরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হননি, জমি-জমা অনেক গেছে বটে, কিন্তু নারায়ণগঞ্জে তাঁদের যে বিশাল বাড়ি ছিল সেটি আইনসঙ্গতভাবে বদল করে কলকাতার উপকণ্ঠে টালিগঞ্জের দিকে এক মুসলমানের একটি বেশ বড় বাড়ি পেয়েছেন। পূর্ববঙ্গে তাঁদের পাটের ব্যবসা ছিল, সেই অভিজ্ঞতায় পশ্চিমবঙ্গেও একটি চটকলের অংশীদার হয়েছেন, মূলধনও যথেষ্ট সরাতে পেরেছিলেন। বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপায় এদিকে এসে বরং তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

সত্যেন ভাদুড়ীর গান বাজনার শখ আছে, সেই সূত্রে বিশ্বনাথ গুহের সঙ্গে পরিচয়। নন্দন। পাহাড়ের কাছে এরা একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে হাওয়া পরিবর্তনে এসেছেন। বাজারে যাওয়া-আসার পথে মাঝে মাঝেই তিনি বিশ্বনাথের কাছে আসেন গল্প-গুজব করতে।

দু'জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এ বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢুকে আজ বেশি মানুষজন দেখে থমকে গেলেন। বিশ্বনাথ এগিয়ে এসে বললেন, আসুন, আসুন, ক'দিন দেখিনি যেন?

সত্যেন ভাদুড়ী বললেন, একটু গিরিডি ঘুরে এলাম। শুনেছিলাম ওখানকার জল খুব ভালো, অ সত্যিই কিন্তু, খাবার হজম হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। আপনার বাড়িতে অতিথি এসেছে বুঝি? আমরা অসময়ে এসে পড়লাম...

বিশ্বনাথ বললেন, আরে কী যে বলেন! আমার বাড়িতে কোনো সময়ই অসময় নয়।

প্রতাপকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিয়ে সহাস্যে বললেন, এই দুনিয়াটাই শ্যালকে ভর্তি, তবে এটি আমার একমাত্র আপন শ্যালক। কলকাতায় জজিয়তি করেন।

সত্যেন ভাদুড়ী প্রতাপকে নমস্কার করে বললেন, আপনাদের মালখানগরে বাড়ি ছিল না? আমি গেছি সেখানে, নামকরা জায়গা!

দেশ-বিভাগ এখনো যেন বাস্তব হয়ে ওঠেনি। তাই ফেলে আসা গ্রাম-শহরের কথাও খুব। আপন আপন সুরে উচ্চারিত হয়, অন্যকথার আগে দেশের কথা চলে কিছুক্ষণ।

মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার প্রথা নেই। দুই নারী একটু পাশ ফিরে বাগানের গাছপালা নিরীক্ষণ করছেন। প্রতাপ আড়চোখে দেখতে লাগলেন গায়ত্রীকে। নিজের বয়েস বাড়ার কথা মানুষের মনে থাকে না, প্রতাপ গায়ত্রীর বয়েস বাড়াটাই লক্ষ্য করলেন। মাঝখানে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান, গায়ত্রীর অনেক বদল হয়েছে, কিন্তু মুখের আদলটা একই রকম, চিনতে কোনো অসুবিধে হয় না।

গায়ত্রী একবার একটু মুখ ফেরাতেই প্রতাপ বললেন, কেমন আছো, বুলা?

গায়ত্রী প্রতাপের চোখের দিকে স্থিরভাবে দৃষ্টিপাত করে রইলো। সে দৃষ্টির মর্ম বোঝা বড় শক্ত। সে কোনো উত্তর দিল না।

কথা থামিয়ে অবাকভাবে সত্যেন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ওকে চেনেন?

প্রতাপ সহাস্যে বললেন, হ্যাঁ। ছাত্র বয়েসে ওদের বাড়িতে গিয়ে ছিলাম একবার। ওর মা বাবা এত যত্ন করেছিলেন, তা কোনোদিন ভুলবো না। তবে আপনার শ্যালিকাটি বোধহয় আমায় এখন চিনতে পারছে না।

সত্যেন বললেন, আমার শ্যালিকা নয়।

প্রতাপ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল হয়েছে। গায়ত্রীর তো কোনো দিদি বা বোন ছিল না।

সত্যেন বললেন, ইনি সম্পর্কে আমার বৌদি, যদিও আমার স্ত্রীর চেয়ে বয়েসে ছোট। আমার খুড়তুতো ভাই নরেন আর আমি একেবারে পিঠোপিঠি, নরেন আমার চেয়ে মাত্র এগারো দিনের বড়। কোনোদিন আমি তাকে দাদা বলিনি অবশ্য। সেই নরেনের স্ত্রী।

একটু থেমে তিনি আর একটি তথ্য যোগ করলেন, নরেন এখন বিলেতে আছে।

বিশ্বনাথ বললেন, বারান্দায় উঠে আসুন। এই বাবলু, তোর শান্তিপিসিকে ডাক তো!

শান্তি এসে সত্যেনের স্ত্রী বিভাবতী আর গায়ত্রীকে নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে। পুরুষরা বারান্দায় চেয়ারে বসে রোদ্দুরে পা দিয়ে গল্প করতে লাগলেন। চা ও পাঁপড় ভাজা এলো। সত্যেন যে টাঙ্গায় এসেছেন, সেটা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেপুলেরা হুটোপাটি করছে। বাগানে। অলস ভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে বেলা।

সত্যেন ভাদুড়ী আগামীকাল সন্ধেবেলা সবাইকে নেমন্তন্ন করে গেলেন তাঁর বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়া, গানবাজনা হবে।

দুপুরবেলা প্রতাপ যখন ঘরে এসে দিবানিদ্রার উদ্যোগ করছেন তখন পান খাওয়া ঠোঁটে হাসি টিপে মমতা জিজ্ঞেস করলেন, এই তোমার সেই বুলা?

প্রতাপ স্ত্রীর কাছে বুলা-বৃত্তান্ত গোপন করেন নি। অনেক সময় মৃদু দাম্পত্য কলহে প্রতাপ রঙ্গ করে বলেছেন, আমাকে এরকম খোঁটা দিয়ে কথা বলছো? জানো, একজন ব্রাহ্মণ কন্যা নিজে সেধে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল! যেমন তার রূপ, তেমন ছিল তার গুণ!

মমতাও অনেক সময় ঠাট্টা করে বলেছেন, তুমি সব সময় আমার ওপর এত মেজাজ দেখাও। সেই বামুনের মেয়েকে বিয়ে করলে জব্দ হতে। সে শুনেছি একে সুন্দরী, তার ওপরে ভালো গান গায়, সে এত কিছু সহ্য করতো না!

মমতার খুব ইচ্ছে ছিল গায়ত্রী নাম্নী সেই মেয়েটিকে একবার দেখবার।

প্রতাপও হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলে? আমি কি বাড়িয়ে বলেছি কিছু?

মমতা একটা পাট করা শাড়ী অকারণে খুলে আবার পাট করতে করতে বললেন, তোমার বুলা তো কথাই বলতে চায় না। স্বামী বিলেতে থাকে বলে বুঝি খুব অহংকার? আমার ছোট কাকাও তো বিলেতে থাকেন। তার জন্য আমার ছোট কাকীর তো কোনোদিন অহংকার। দেখিনি!

প্রতাপ বললেন, অনেকদিন পর দেখা তো, বুলা বোধহয় আমাকে ঠিক চিনতে পারে নি।

মমতা ঝংকার দিয়ে বললেন, ঠিকই চিনেছে। তুমি সব সময় তার কথা ধ্যান করো, আর সে তোমাকে ভুলে যাবে? আমার দিকে কীরকম রাগ রাগ ভাব করে তাকাচ্ছিল!

প্রতাপ হা-হা করে হেসে উঠলেন।

একটু পরে তিনি ঘুমের ভান করে পাশবালিশটা জড়িয়ে নিলেন বটে, কিন্তু ঘুম এলো না। বুলার কথাই মনে পড়ছে। সেই প্রথম যৌবনের চমৎকার দিনগুলির স্মৃতি। সত্যেনের কাছে তিনি জেনেছেন যে সত্যসাধন আর সুরবালা এপারে চলে আসেন নি, তাঁরা রয়ে গেছেন কুমিল্লায় সেই বাড়িতেই। আর কেউ নেই, শুধু বুড়োবুড়ি। মরতে হয় তাঁরা

ওখানেই মরবেন। সুরবালা অত করে বলেছিলেন তবু আর কোনোদিন যাওয়া হলো না প্রতাপের।

মামুনের সঙ্গেও অনেকদিন যোগাযোগ নেই। মামুন পূর্ব পাকিস্তানে বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলি চালনায় চারজনের মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে পড়ে প্রতাপ শিউড়ে উঠেছিলেন। পরে নিহতদের নাম প্রকাশিত হলো কিন্তু সব আহতদের নাম জানা যায়নি। প্রতাপ একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন মামুনের নামে, তারও উত্তর আসেনি। কানাঘুষোয় শুনেছিলেন মামুন কারাবন্দী। এ বছর ফজলুল হক যে স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন তো মামুনের ছাড়া পাওয়ার কথা।

বাইরে একটা ঘুঘু ডাকছে। কলকাতার তুলনায় এই সব স্থান অনেক নির্জন, দুপুরবেলা গাড়ি ঘোড়াও চলে না। ঘুঘুর ডাকটি কী স্পষ্ট! মনে পড়ে যায় মালখানগরের দুপুরগুলোর কথা। শৈশব, কৈশোর। ঘুঘুর ডাকের মধ্যে ফুটে ওঠে একটা কথা : ঠাকুর গোপাল, ওঠো, ওঠো, ওঠো! ছেলেবেলায় এই রকম মনে হতো, এখনও সেই রকম শুনতে লাগে।

একটা সিগারেট ধরাবার জন্য পাশ ফিরতেই প্রতাপ দেখলেন মমতা এসে বসে আছেন জানলার ধারে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি শোবে না একটু?

মমতা বললেন, তোমার ঐ বুলা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেও আমি রাগ করি নি। বরং আমার দুঃখই হলো ওর জন্য। ওর একটা খারাপ খবর শুনেছো?

–কী?

–ওর স্বামী ওকে নেয় না।

মেয়েরা তাড়াতাড়ি অনেক কিছু জেনে যায়। সত্যেন ভাদুড়ীর সঙ্গে অতক্ষণ গল্প হলো, তিনি বুলা সম্পর্কে আর একটি কথাও উত্থাপন করেননি। প্রতাপ বুলার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

প্রতাপ উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার কাছে শুনলে?

মমতা বললেন, খেতে বসে ছোট ঠাকুরঝি বললেন সব কথা। বুলার বর বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার, তুমি জানতে?

-হ্যাঁ জানতুম। একবার দেখেছিও তাকে। খুলনা থেকে যাওয়ার পথে স্টিমারে। বুলাকে তখন তো খুব খুশী মনে হয়েছিল। ওর স্বামীটিকে দেখতে একেবারে সাহেবদের মতন।

-সাহেব না ছাই! আসলে একটি বিলিতি লাল মুলো! এখানে নাকি একদম প্র্যাকটিস জমাতে পারেনি, বাড়িতে বসে পায়ের ওপর পা দিয়ে আলস্য করতো। এদিকে গুণধরটি যে বিলেতে আগে একটা বিয়ে করে এসেছে সে কথা কারুকে জানায়নি। একদিন সেই মেম বউ এসে হাজির। সে একটা চাকরানী না ম্যাথরানী কিছু একটা হবে। আমার ছোটকাকা বলেছিলেন, বিলেতে গিয়ে আর তো কারুর সঙ্গে মেশার সুযোগ পায় না, ঐ। চাকরানী-ম্যাথরানী দেখলেই অনেক ছেলের মাথা ঘুরে যায়। আর টপ টপ বিয়ে করে ফ্যালে!

--ছোড়দি এসব কথা কার কাছে শুনেছে?

-ঐ সত্যেনবাবুর বউই বলেছে। উনিও নাকি বুলাকে তেমন একটা পছন্দ করেন না।

-মেম বউ এসে কী করলো?

-চ্যাঁচামেচি, ঝগড়া-ঝাঁটি, চুলোচুলি, শেষ পর্যন্ত কোর্ট কাছারি অবধি গড়িয়েছিল। সে বউ-এর নাকি দুটি বাচ্চা আছে। তার বিয়েটাই আগে, আর খ্রীষ্টান মতে বিয়ে হয়েছিল,

সে ছাড়বে কেন? নাকে দড়ি দিয়ে নরেন ভাদুড়ীকে সে টানতে টানতে আবার বিলেতে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে নরেন ভাদুড়ী আর কোনো চিঠিপত্রও লেখে না।

–এটা কতদিন আগেকার ঘটনা?

–দশ এগারো বছর আগেকার। বুলার একটা ছেলে আছে শুনলাম। মেয়েটা এখন না বিধবা না-সধবা। সেই ক্ষ্যান্তগদানী মেম না মরলে নাকি নরেন ভাদুড়ীর দেশে ফেরার উপায় নেই।

–কেন ফিরতে পারবে না? দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, এখন তো আমাদের ওপর ব্রিটিশ আইন খাটবে না। হিন্দু মতে দুটি বিয়ে অসিদ্ধ নয়।

–কী জানি!

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন দু'জনেই। তারপর মমতা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার খুব খারাপ লাগছে, না?

প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, খারাপ লাগবে না? একটি মেয়েকে ছোটবেলায় চিনতাম, মেয়েটার অনেক গুণ ছিল, তার একটা সুন্দর জীবন প্রাপ্য ছিল। একটা তঞ্চক তার জীবনটার সর্বনাশ করে দিল।

–তুমি যদি ওকে বিয়ে করতে তা হলে ওর এসব কিছুই হতো না। একটা সুন্দর জীবন। পেত, তুমিও সুখী হতে।

–আরে যাঃ! আমার সঙ্গে বিয়ের তো কোনো প্রশ্নই ওঠেনি।

–অসুবিধে ছিল বলেই তুমি ওকে বিয়ে করতে পারোনি। জাতের অমিল না থাকলে তুমি ওকেই বিয়ে করতে। আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় যে তুমি সুখী হয়েছে, সে কথা একবারও বলো না।

প্রতাপ উঠে এসে জানলা দিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেললেন, তারপর মমতার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, পাগল! আমি এখন তিন ছেলেমেয়ের বাবা, এখনও এইসব কথা! তুমি নাটক-নভেল পড়তে ভালোবাসো, নাটকনভেলে কে কাকে বিয়ে করলো না তাই নিয়ে হা-হুঁতাশ থাকে। আমি তো ওসব পড়ি না! আমার মনের মধ্যেও ওসব নেই। বুলাকে বিয়ে করার কথা আমি কোনোদিনই ভাবি নি। ওকে আমি পছন্দ করতাম ঠিকই। ছোট বোনের মতন দেখতাম বললে ভুল হবে, একটু অন্যরকমের ভালোলাগা। ব্যস সেইটুকুই, আর কিছু না। বাবা-মায়ের অমতে বিয়ে করা, একটা গোলমাল পাকানো, আলাদ থাকা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা যা করে, ওসব চিন্তা আমার মাথায় কোনোদিন আসেনি। ...আর তুমি?

প্রতাপ মমতার থুতনি ধরে মুখটা উঁচু করে বললেন, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নম!

প্রতাপ সচরাচর সত্যি কথা বলেন। এসবই তাঁর মনের কথা। কিন্তু মানুষের মন তো একানো অনড় পাথর নয়, তা বাষ্পময় বস্তুর মতন, ক্ষণে ক্ষণে তার বদল হতে পারে। পরদিন রাতেই প্রতাপের ভাবান্তর হলো।

ঠিক হয়েছিল যে সত্যেন ভাদুড়ীদের বাড়ির নেমন্তন্নতে বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া হবে না, মা বাড়িতেই থাকবে। কিন্তু পরদিন সন্ধেবেলা ও বাড়ি থেকে দু'খানা টাঙ্গা এসে উপস্থিত, পত্যেন ভাদুড়ী চিঠি পাঠিয়েছেন যে নিমন্ত্রণ সকলের। ছেলেমেয়েদের তো বটেই, এমনকি প্রপের মাকেও নিয়ে যেতে হবে। রাত্রে ফেরার ব্যবস্থাও তিনি করবেন।

চিঠি পড়ে বিশ্বনাথ বললেন, বড়লোকদের কায়দাই অন্য রকম। নেমন্তন্ন করলে যাওয়া-আসার ব্যবস্থাও ওদের। তা হলে কে কে যাবে?

কানু-পিকলুবাবলুর বেশ আপত্তি। ওরা নিজেরা খেলাধুলো নিয়ে থাকে, অচেনা বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে ওদের ইচ্ছে নেই। মমতা দু একবার বলায় পিকলু রাজি হয়ে গেল, বাবলু মুখ গোঁজ করে রইলো, আর কানু পালিয়ে পালিয়ে রইলো দূরে।

প্রতাপের মা সুহাসিনীর কিন্তু বেশ যাবার ইচ্ছে। তিনি বললেন, ওরে ছেলেরা, তোরা যেতে চাস না কেন? চল্। ওরা নারায়ণগঞ্জের লোক, খুব ভালো খাওয়াবে-দাওয়াবে।

সুহাসিনী ঠাকুরঘরে গিয়ে ঝটপট মন্ত্র পড়ে এসে একখানা গরদের শাড়ি পরে তৈরি হয়ে নিলেন। তাঁর তাড়নাতেই ছেলেরা বাধ্য হয়ে রাজি হলো যেতে।

নন্দন পাহাড়ের দিকটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। খানিকটা করে ব্যবধানে এক একটি বেশ বড় বাড়ি, সঙ্গে অনেকখানি বাগান। আজ সন্ধেবেলাতেই চাঁদ উঠেছে, এদিককার আকাশ অনেক বেশি নক্ষত্রময়, পাতলা ঝিরঝিরে শীতের বাতাস বইছে। এখানে আসার পর একদিনও সন্ধের পর বেড়াতে বেরুনো হয়নি, তাই ভালো লাগছে সকলেরই।

সত্যেন ভাদুড়ী কোনো জমিদারের বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, সামনের দিকে এত বড় বড় গাছপালা যে ভেতরের বাড়িটি রাস্তা থেকে দেখাই যায় না। মস্ত বড় লোহার গেট, তারপর লাল সুরকির টানা পথ। ভেতরের পোর্টিকোতে একটি পাঁচ শো পাওয়ারের বা জ্বলছে। সত্যেন নিজে বেরিয়ে এসে অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন। সুহাসিনীকে তিনি ভুল করে প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন, সুহাসিনী তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে বললেন, আরে করো কী, করো কী, তোমরা তো ব্রাহ্মণ।

সত্যেন হাত জোড় করে বললেন, মা, আপনি এসেছেন তাতে আমি যে কী খুশী হয়েছি। আমি অতি অল্প বয়েসে মাকে হারিয়েছি, মায়ের স্মৃতিই নেই, আপনাকে প্রথম দিন দেখার পরই আমার নিজের মায়ের মতন মনে হয়।

সুহাসিনী আশীর্বাদ করে বললেন, শতায়ু হও বাবা। ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক। এ বাড়িখানি তো বড় সুন্দর। তোমার নিজের নাকি?

সত্যেন বললেন, না। তবে, বাড়িটি আমাদেরও খুব পছন্দ হয়েছে। ভাবছি যদি কিনে রাখা যায়। আসুন, ভেতরে আসুন!

সামনের দিকে একটি বেশ বড় হল ঘর, তাতে ঝাড় লণ্ঠন বসানো। প্রতাপ আর বিশ্বনাথ সেই ঘরে বসলেন, অন্যরা অন্দর মহলে চলে গেল। এই ঘরটিতে কাপের্টের ওপর তাকিয়ে ছড়ানো, মাঝখানে একটি হারমোনিয়াম ও এস্রাজ। এক কোণে একজন তবলচি আড়ষ্টভাবে বসে আছে।

বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করলেন, হারমোনিয়াম জোগাড় করলেন কোথা থেকে? আগেরবার তো দেখিনি?

সত্যেন মুচকি হেসে বললেন, ইচ্ছে করলে সবই পাওয়া যায়। ভাড়া করার চেষ্টা করেছিলাম, না পেয়ে কিনেই ফেললাম ওটা।

বিশ্বনাথ বসে পড়ে হারমোনিয়ামটা বাজিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, কেনার আগে আমাকে একবার দেখালেই পারতেন। এটা বেশ বেসুরো।

সত্যেন বিস্মিতভাবে বললেন, সে কি! লোকটা যে বললো কলকাতা থেকে কোন্ মুসলমান গায়ক এসে এটাই ব্যবহার করেছিল? বিশ্বনাথ বললেন, সে কবে করেছিল কে জানে! যাই হোক, কাজ চলে যাবে।

সত্যেন বললেন, মেয়েদের আর বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। আমন একটু বেশিক্ষণ থাকবো, কী বলেন?

বিশ্বনাথ বললেন, সারা রাত হলেও আপত্তি নেই, কী বলো ব্রাদার?

গান বাজনা শুরু হবার আগে সত্যেন একটি সাদা ঘোড়া মাকা স্কচের বোতল ও গেলাশ আনালেন। গেলাসের সংখ্যা তিন। সত্যেন প্রতাপের মুখের দিকে তাকাতেই বিশ্বনাথ বললেন, আমার ব্রাদারটি আবার ও রসে বঞ্চিত। উনি সুর পছন্দ করেন, তার সঙ্গে আকার যোগ করলেই মুখ ফিরিয়ে নেন।

সত্যেন বললেন, আমরা...আমরা যদি খাই, তাতে আপত্তি নেই তো?

প্রতাপ দু'দিকে মাথা নাড়লেন। বিশ্বনাথ যে মাঝে মাঝে সুরা সেবন করেন তা তিনি আগেই জানেন। যারা গান বাজনার চর্চা করে তাদের বোধহয় ওসব লাগে। প্রতাপের কোনোদিন মদ স্পর্শ করার প্রবৃত্তি হয়নি। মুনসেফগিরি করার জন্য তাঁকে অনেক মফস্বলে ঘুরতে হয়েছে। কোনো কোনো জায়গা এমন সৃষ্টিছাড়া যে সন্ধের পর আর কিছুই করার থাকে না, এমনকি ব্যাডমিন্টন-টেনিস খেলারও ব্যবস্থা নেই, সেখানে তিনি তার সহকর্মী বা উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারদের মধ্যে মদ্যপানের চল দেখেছেন। প্রতাপ কখনো তাঁদের সঙ্গ পরিহার করেন নি। আবার অন্যদের শত অনুরোধেও গেলাস ধরেন নি।

মাঝে মাঝে বাড়ির ভেতর থেকে টুকটাক খাবার আসছে। এ বাড়িতে মনে হয় একটা প্রথা আছে, চাকরবাকরদের হাতে খাবার পাঠানো হয় না। খাবারের প্লেটগুলি নিয়ে আসছেন কখনো সত্যেনের স্ত্রী, কখনো বুলা।

প্রতাপ ঠিক করেছেন, বুলা নিজে থেকে কথা না বললে তিনি আর কিছু বলবেন না। সেটা ভালো দেখায় না।

আসর যখন বেশ জমে উঠেছে, সেই সময় বুলা একবার এলো কিছু মাছ ভাজা নিয়ে। একটি প্লেট সে প্রতাপের সামনে রাখলো। প্রতাপ বুলার মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলেন সেখানে কোনো বিষাদের চিহ্ন আছে কি না!

সত্যেন খপ করে বুলার হাত ধরে বললেন, বড় গিন্নি, এখানে একটু বসো না! গান শোনো!

তারপর মুখ তুলে তিনি বললেন, আমার বৌদিটি প্রায় আমার বড় গিন্নি, বুঝলেন! উনি কিন্তু ভালো গান করেন! আপনারা শুনলে মোহিত হয়ে যাবেন। শোনাও না তোমার একটা গান, ঐ যে সেই গানটা, রবি ঠাকুরের, মরি হায়, চলে যায়...

কথাগুলো শোনার সময় প্রতাপের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি। তিনি শুধু বুলার মুখটাই দেখছিলেন। বুলা অবশ্য গান শোনালো না, সেখানে দু'মিনিটের বেশি থাকলেও না।

একটু পরে, বিশ্বনাথ বিভোর হয়ে গান গেয়ে চলেছেন, সত্যেন বাজাচ্ছেন এস্রাজ, তখন সত্যেনের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রতাপ অনুভব করতে লাগলেন, সত্যেনকে তিনি পছন্দ করতে পারছেন না কিছুতেই! বুকটা ঈষায় জ্বলছে। এই চালিয়াৎ ধনী ব্যক্তিটি বুলার হাত ধরলো কেন? কেন বললো বড় গিন্নি! ও কি সেই রকমই ব্যবহার করে বুলার সঙ্গে?

বুলা তাঁর কেউ নয়, বুলার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই, তবু প্রতাপের মনে হলো বুলার ওপর তাঁর একটা অধিকার আছে।

১০ দুটো সাইকেল ভাড়া করা হয়েছে

দুটো সাইকেল ভাড়া করা হয়েছে, কানু আর পিকলু ত্রিকূট পাহাড়ে বেড়াতে যাবে। এ বিষয়ে বিশ্বনাথের সঙ্গে তাদের একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে আগেই। প্রতাপকে জানানো হবে না। কারণ প্রতাপ শুধু ওদের দু'জনকে অতদূর যেতে দিতে আপত্তি করতে পারেন, আর বাবলুকেও সঙ্গে নেওয়া হবে না, কারণ সে সাইকেল চালাতে জানে না।

বিশ্বনাথ খুব তাল দিয়েছেন ওদের। চোখ পাকিয়ে ফিস ফিস করে বলেছেন, তোরা খুব ভোরে উঠে চলে যাবি, বুঝলি! কাক-পক্ষীতেও যেন টের না পায়। পিকলু, তোর বাবাকে আমি পরে ঠিক ম্যানেজ করে দেবো। সে বেশি রাগারাগি করলে আমার হাতে একটা মোক্ষম যুক্তি আছে।

ক'দিন ধরেই বাড়ির সকলে মিলে টাঙ্গা ভাড়া করে ত্রিকূট আর তপোবন বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব উঠছিল, কিন্তু মমতার শরীরটা ভালো নেই বলে যাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু ছেলেদের অত ধৈর্য নেই, পাহাড়ের নাম শুনে তারা উতলা হয়ে উঠেছে।

বিশ্বনাথ শেষ রাতে অন্ধকার থাকতে থাকতেই ডেকে দিলেন কানু আর পিকলুকে। ওরা তৈরি হয়ে নিল চটপট। বিশ্বনাথ একটা ছোট চুবড়িতে পাঁউরুটি, মাখন, কলা আর গোটা দশেক পাড়া সাজিয়ে দিলেন, বয়েসকালের ছেলে, ওদের যখন-তখন খিদে পাবে।

যাত্রার ঠিক আগে বাবলু বাইরে বেরিয়ে এলো। ঘুম চোখেও সে ব্যাপারটা বুঝে নিল এক মুহূর্তে, দৌড়ে গিয়ে সে একটা সাইকেল চেপে ধরে রইলো শক্তভাবে। তাকে আর কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। বেশি জোর করতে গেলে সে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, না, আমি যাবো! আমি যাবো!

বিশ্বনাথ বললেন, এই রে, এবার তো সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। এই বিচ্ছুটা ছাড়বে না। কানু, তুই ডাল ক্যারি করতে পারবি না?

কানুর ভুরু কুঁচকে গেছে। অনেকখানি রাস্তা। তার তো প্রত্যেকদিন সাইকেল চালানো। অভ্যেস নেই। কিন্তু বাবলুটা যা জেদী ছেলে তাকে এড়ানো যে সম্ভব হবে না, তাও কানু বুঝে গেছে। সে ধমকের সুরে বললো, যা, সোয়েটার নিয়ে আয়।

পিকলু বললো, জুতোর সঙ্গে মোজা পরবি। না হলে তোকে নেবো না!

অন্যসময় বাবলু গরম জামা পরতে চায় না, আর জুতোর সঙ্গে কিছুতেই মোজা পরতে রাজি হয় না। এখন সব কিছুতেই রাজি। বিশ্বনাথ ওদের গেটের বাইরে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে। এলেন।

সকালে চা খাওয়ার সময় প্রতাপ ছেলেদের অনুপস্থিতি লক্ষ করলেন না। দু'দিন ধরে বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। বাগানে চেয়ার পেতে রোদ্দুরে বসে দু'তিন কাপ চা খেয়েও আশ মেটে না। তারপর প্রতাপ বাজার করতে বেরিয়ে পড়েন। রোজ রোজ মুর্গীর মাংস তাঁর রোচে না, একটু মাছ না হলে যেন ভাত খাওয়ার আনন্দটাই মাটি। প্রতাপ আবিষ্কার করেছেন যে বম্পাস টাউনে এক জায়গায় টাটকা মাছ বিক্রি হয়, তবে যেতে হয় সকাল নটার মধ্যে।

একটা বেশ ভালো কাতলা মাছ পেয়ে প্রতাপ প্রসন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু একটু পরেই তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল। ফেরার পথে তিনি দশ পয়সা দিয়ে একটি আনন্দবাজার কাগজ কিনলেন। আগের দিনের ডাক সংস্করণ। প্রথম পৃষ্ঠায় অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নিষ্ঠুর হাসিমাখা মুখের ছবি। রাশিয়ার উদ্দেশে তিনি কয়েকটি কটুক্তি বর্ষণ করেছেন। এক বছর আগে স্টালিন সাহেবের মৃত্যুর পর আইসেনহাওয়ার-চার্চিলের ধারণা হয়েছে যে এবার রাশিয়াকে বাগে পাওয়া গেছে। ঠাণ্ডা লড়াইটা এবার বুঝি গরম হয়ে উঠবে।

মূল খবরের চেয়েও পাতার নিচের দিকের কয়েকটি সংবাদে প্রতাপ বেশি আকৃষ্ট হলেন। ধানবাদের কাছে একটি ছোট জায়গায় বাঙালীদের সঙ্গে বিহারীদের মারামারি হয়েছে। বিহারে বাঙালী-বিরোধী মনোভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার পাশের খবরটিই পূর্ব পাকিস্তানের, সেটাও দাঙ্গার খবর। ফজলুল হক মন্ত্রী সভা পতনের পর ওদিকে ছোটখাটো দাঙ্গা লেগে থাকছে, দলে দলে হিন্দুরা সীমান্ত পার হয়ে চলে আসছে ভারতে। আর একটি ছোট থব কলকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে একটি বাগানবাড়ি উদ্বাস্তুরা জবরদখল করতে গেলে হাঙ্গামা হয়, পুলিশ উদ্বাস্তুদের ওপর গুলি চালিয়েছে।

প্রতাপের চোয়াল কঠিন হয়ে গেল, তিনি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

বাড়ি ফিরে তিনি দেখলেন বিশ্বনাথ প্রবল উৎসাহে গানের ইস্কুল চালাচ্ছেন। প্রত্যেক একই গান শুনতে প্রতাপের ভালো লাগে না, তিনি উঠে গেলেন ছাদে। খানিকক্ষণ গল্প করলেন মায়ের সঙ্গে।

বেলা বাড়ার পর প্রতাপ নিচে এসে দেখলেন বিশ্বনাথ আর মমতা ঠিক যেন একটি নাটকের দৃশ্য অভিনয় করছেন। মমতার মুখোনিতে দারুণ উদ্বেগ মাখা আর বিশ্বনাথের মুখে খানিকটা উদাসীনতা, খানিকটা কৌতুক। বিশ্বনাথের এক হাতে জ্বলন্ত চুরুট, অন্য হাত দিয়ে তিনি দাড়ি মুচড়োচ্ছেন।

মমতা স্বামীকে দেখে আর্তভাবে বললেন, বাবলু-পিকলুরা কোথায় গেল? সকাল থেকে দুধ খায় নি, কিছু খাবার খায় নি!

বিশ্বনাথ হাসিমুখে বললেন, গেছে কোথাও খেলতে। ওরা কি সর্বক্ষণ বাড়িতে বসে থাকতে পারে?

মমতা বললেন, তা বলে এতক্ষণ? ঘুম থেকে উঠে আমি তো ওদের দেখিইনি! বাবলুটা দুধ না খেয়ে থাকতেই পারে না!

বিশ্বনাথ উত্তর না দিয়ে চুরুট ফুঁকতে লাগলেন। প্রতাপের মনের মধ্যে খানিকটা উদ্বেগের সৃষ্টি হলেও তিনি স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে কোনো কথা বললেন না। তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললেন, আসবে, ওরা এসে পড়বে, তুমি ততক্ষণ আমাদের আর একটু চা খাওয়াতে পারো?

একটু পরে মমতা শান্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। শান্তি কী করে যেন জেনে ফেলেছেন যে ছেলেরা বেরিয়েছে ভাড়া করা সাইকেলে এবং বিশ্বনাথই তাদের উস্কানিদাতা।

ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যাওয়াতেও একটুও বিচলিত না হয়ে বিশ্বনাথ উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, আরে, এই ওরা একটু ত্রিকূট পাহাড়ের দিকে গেছে, কোনো চিন্তা নেই, সঙ্গে অনেক খাবার-দাবার নিয়ে গেছে!

দুই নারী এবারে বিশ্বনাথের উদ্দেশে প্রভূত অনুযোগ ও গঞ্জনা বর্ষণ করতে লাগলেন। বিশ্বনাথ মৃদু মৃদু হাসিমুখে প্রথমে কিছুক্ষণ শুনলেন, তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন, এই চুপ! মা শুনতে পেলে একটা হুলুস্থুলু বাঁধাবেন, তোমরা কি তাই চাও? ওদের বলে দিয়েছি বিকেল পাঁচটার মধ্যে ফিরবে, ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকো না!

এই কথায় কাজ হলো। একথা ঠিক যে সুহাসিনী জানতে পারলে এমনই হা-হুঁতাশ শুরু করবেন যে মনে হবে যেন ছেলে তিনটি মরেই গেছে। তখন সুহাসিনীকে সামলানোই

এক বিরাট সমস্যা হবে। মমতা ও শান্তি আরও একটুক্ষণ গুঞ্জন করে চলে গেলেন ভেতরে।

প্রতাপ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন, জেগে উঠলেন সহসা। তাঁর দুই ছেলে সকাল থেকে নিরুদ্দেশ, তবু তিনি এতক্ষণ ভাবছিলেন বুলার কথা। এখানে এসে এ পর্যন্ত বুলার সঙ্গে তাঁর একটিও বাক্য বিনিময় হয় নি, তবু যেন বুলার সঙ্গে তাঁর মনে মনে একটা সংলাপ চলছে, বুলা ঠিকই বুঝতে পারছে, প্রয়োজনের সময় বুলা প্রতাপের কাছে ডাক পাঠাবেন। প্রতাপকে দেখলেই যেন বুলার নাক আর কানের ডগা লাল হয়ে ওঠে।

প্রতাপ এবারে বিশ্বনাথকে বললেন, ওস্তাদজী, আপনি ছেলেগুলোকে অতদূর পাঠিয়ে দিলেন? আজকের কাগজ পড়েছেন?

বিশ্বনাথ বললেন, না, পড়িনি। কী আছে?

-বিহারে বাঙালীদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। বাঙালীরা যখন তখন মার খাচ্ছে! বিশ্বনাথ হা-হা করে হেসে বললেন, আরে দূর! ওরকম কত কী লেখে খবরের কাগজে আমাদের দেওঘরে ওসব কিছু হবে না!

প্রতাপ নিজের বাঁ দিকের জুলপি টানতে টানতে বললেন, কাগজে কিন্তু এরকম খবর প্রায়ই দেখছি। বিহারীরা বাঙালীদের সহ্য করতে পারছে না।

-শোনো, ব্রাদার, বাঙালী এখন কাদায় পড়েছে, সবাই তাকে লাথি মারবে! ঐ বঙ্গ-ভঙ্গটাই মেনে নেওয়া তোমাদের একটা গুরুতর ভুল হয়েছে। তখন এদিকটা চিন্তা করো নি?

-আরে, বঙ্গভঙ্গর জন্য কি আমি দায়ী নাকি! আমি মেনে নিয়েছি কে বললো?

-কথার কথা বলছি। এত লাখ লাখ উদ্বাস্তু, এর ভার কি পশ্চিমবঙ্গ একা নিতে পারবে? বিহার, আসাম, উড়িষ্যা এইসব প্রভিন্সে কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়বেই। তাই নিয়ে খানিকটা,

গণ্ডগোল তো শুরু হবেই এইসব জায়গায়। গণ্ডগোল, গণ্ডগোল, বুঝলে ব্রাদ্রার, এখন গণ্ডগোলই চলবে! পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের ভাগাবার চেষ্টা করেও কি সেখানকার বাঙালী মুসলমানরা সুখে আছে? ভাবগতিক দেখে তো মনে হচ্ছে, ওটাও একটা কলোনি, রাজ্যপাট যা কিছু চালাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা!

–এ বাংলারও বেশ কিছু মুসলমান রিফিউজি গেছে ওদিকে। তাদের তো ওরা দূর ছাই। করে না! আমাদের এদিকে, কাশীপুরে রিফিউজিদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। এই অসহায় মানুষগুলোকে থাকবার জায়গা দিতে পারছে না সরকার, তার ওপর আবার গুলি। চালাবে; ভাবলেই আমার রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে!

বিশ্বনাথ বেশিক্ষণ রাজনৈতিক আলোচনা বা তিক্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন। তিনি গুনগুন করে গান ধরলেন। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রতাপ বললেন, ওস্তাদজী, ছেলেগুলোকে অত দূর পাঠানো বোধ হয় ঠিক হয় নি। বাবলুটা ভীষণ দুরন্ত...

গান থামিয়ে বিশ্বনাথ প্রতাপের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, তুমি ঘোর সংসারী হয়ে পড়েছো!

প্রতাপ বললেন, স্বেচ্ছায় নয়। সংসারটা আমার কাঁধের ওপর চেপে বসেছে, বাবা চলে গেলেন, দেশের বাড়িটা চলে গেল...

–শোনো ব্রাদার, দেওঘরের এই বাড়িটা যখন কেনা হয়, তখন তোমার বয়েস কত ছিল? এই পিকলুরই বয়েসী হবে! সবাই মিলে এক সঙ্গে আসা হয়েছিল। এক দিন তুমি আর আমি

সাইকেলে ত্রিকূট পাহাড় বেড়াতে গেলাম মনে নেই? তোমার বাবাকে কিছু না জানিয়ে–

প্রতাপ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল!

–দিনকাল তো নিজের নিয়মে বদলাবেই। সময় কি থেমে থাকে? কিন্তু যে বয়েসের যা, তা তো চলবেই। ওরা একটু অ্যাডভেঞ্চার করতে গেছে, অত ঘাবড়াচ্ছো কেন?

.

বাবলুকে নিয়ে কানু একবার আছাড় খেয়েছে। আগে সে বাবলুকে পেছনের ক্যারিয়ারে নিয়েছিল, এবারে সামনের রডের ওপর বসালো, তাতে সুবিধে হয়। বাবলু অবিরাম বক বক করে যাচ্ছে।

কানু তার জন্ম থেকেই মামার বাড়িতে থাকতো বলে তাকে পিকলুবাবলুরা ছোটবেলায় দেখেনি বিশেষ। কানু তাদের কাছে নতুন মানুষ। ছিপছিপে চেহারা কানুর, বয়স্কদের সামনে সে প্রায় কোনো কথাই বলে না, বিনীত ভাব করে থাকে, আসলে সে বয়স্কদের শাসনের অধিকার একেবারেই অগ্রাহ্য করে মনে মনে।

বাবলু একবার জিজ্ঞেস করলো, কানু কাকা, তুমি তো আমার বাবার ভাই, তা হলে আমার। ঠাকুমা তোমার মা নয় কেন?

কানু বললো, তোর ঠাকুমা আমার বড় মা। আমার নিজের মা ছোট মা।

–তোমার নিজের মা কোথায়?

–স্বর্গে গেছেন।

বাবলু একবার আকাশের দিকে তাকালো। শীতের নির্মেঘ, নীল আকাশ। সেই আকাশের। এক প্রান্তে হেলান দিয়ে আছে দূরের গম্ভীর পাহাড়। বহু উঁচু দিয়ে দুটি চিল ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুৎবেগে।

–কানুকাকা, তোমার মাকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

–নাঃ।

বাবলু বেশ অবাক হয়ে যায়। কানুকাকার থেকে বাবা কত বড়, অথচ বাবার নিজের মা। আছে। কানুকাকার নেই। কিন্তু বাবা একদিন কানুকাকাকে মেরেছিল, তখন কানুকাকা চেঁচিয়ে কেঁদেছিল; ও মা, মা গো, তুমি আমায় কেন ফেলে রেখে গেলে!

--কানুকাকা, তোমার স্বর্গে যেতে ইচ্ছে করে না?

-এক থাপ্পড় খাবি এবার। কেন রে আমি এত তাড়াতাড়ি সেখানে যাবো?

-আমি একটু নামবো। আমার হিসি পেয়েছে।

-এই জন্য তোকে নিয়ে আসতে চাই নি!

পিকলু এগিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে থামালো কানু। তারপর একটা গাছতলায় নেমে সিগারেট ধরালো। কয়েকটা টান দিয়ে সেটা পিকলুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নে।

বাবলু বড় বড় চোখ করে দাদার দিকে তাকালো। পিকলু লজ্জিতভাবে ঘাড় নেড়ে বললো, না।

কানু বললো, নে না। এই ঠাণ্ডার মধ্যে ভালো লাগবে। এখন তুই কলেজে উঠেছিস, লজ্জা কী?

পিকলুর ফসা মুখোনি লাল হয়ে উঠেছে। প্রতুল নামে তার এক সহপাঠীর প্ররোচনায় এর মধ্যেই সে দু একবার সিগারেট টেনে দেখেছে, তার খারাপ লাগে নি। কিন্তু বাবলু জানে না। বাবলু নিঘাত মাকে বলে দেবে। সে কানুর কাছ থেকে সিগারেট নিল না।

পিকলু সামনের মেঘবর্ণ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। কয়েকটা বক উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের বুক লক্ষ করে। দূর থেকে কয়েকজন আদিবাসী রমণী হেঁটে আসছে, মাথায় মাটির হাঁড়ি নিয়ে। একটা কুকুর ছুটছে তাদের সামনে সামনে। হঠাৎ সব কিছু মিলিয়ে পিকলুর দারুণ ভালো লাগলো। এ রকম ভালো লাগার মুহূর্তে তার বুকটা একটু ব্যথা

ব্যথা করে। সে আপন মনে বলে উঠলো, সুন্দর তুমি এসেছিলে এই প্রাতে/অরুণ বরুণ পারিজাত লয়ে হাতে।

কানু জিজ্ঞেস করলো, পদ্যটা তুই নিজে বানালি?

পিকলু দু দিকে মাথা নাড়লো। কানুকাকাটা কিছু বোঝে না।

বাবলু বললো, দাদা সব সময় চয়নিকা বলে একটা পদ্যর বই পড়ে। এখানেও নিয়ে এসেছে। সেই বইটা।

পিকলু বললো, তোকেও তো, কতবার পড়তে বলি।

বাবলু বললো, এঃ! আমার ইস্কুলের পড়ার বই আছে, তার ওপরে আবার পদ্যর বই পড়বো কেন?

ওরা ত্রিকূট পাহাড়ের গোড়ায় এসে একটা ঝনা দেখতে পেয়ে খাবারদাবার খুলে বসেছে, তার একটু পরেই সেখানে একটি জিপ গাড়ি এসে থামলো। তার থেকে প্রথমে নামলেন, সত্যেন, তারপর তাঁর বাড়ির অন্য অনেকে।

পিকলুদের দেখতে পেয়ে সত্যেন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আর সবাই কোথায়?

পিকলু বললো, আর কেউ আসে নি।

ওরা তিনজনে মিলে দুটি সাইকেলে চেপে এসেছে শুনে সত্যেন এতখানি ভুরু তুললেন যেন যতা একটা মহা বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি নিজের স্ত্রী ও বুলাকে ডেকে বললেন, শোনো, শোনো, পিকলুরা এতখানি রাস্তা সাইকেলে এসেছে! কম দূর নাকি?

বুলা প্রথমে ওদের দেখেও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, এবারে কাছে এসে জিজ্ঞেস রলেন, পিকলু, তোমার মা আসেননি?

পিকলুর বদলে কানু উত্তর দিল, বৌদির জ্বর হয়েছে।

–কথার কথা বলছি। এত লাখ লাখ উদ্বাস্তু, এর ভার কি পশ্চিমবঙ্গ একা নিতে পারবে? বিহার, আসাম, উড়িষ্যা এইসব প্রভিন্সে কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়বেই। তাই নিয়ে খানিকটা গণ্ডগোল তো শুরু হবেই এইসব জায়গায়। গণ্ডগোল, গণ্ডগোল, বুঝলে ব্রাদ্রার, এখন গণ্ডগোলই চলবে! পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের ভাগাবার চেষ্টা করেও কি সেখানকার বাঙালী মুসলমানরা সুখে আছে? ভাবগতিক দেখে তো মনে হচ্ছে, ওটাও একটা কলোনি, রাজ্যপাট যা কিছু চালাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা!

–এ বাংলারও বেশ কিছু মুসলমান রিফিউজি গেছে ওদিকে। তাদের তো ওরা দূর ছাই করে না! আমাদের এদিকে, কাশীপুরে রিফিউজিদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। এই অসহায় মানুষগুলোকে থাকবার জায়গা দিতে পারছে না সরকার, তার ওপর আবার গুলি চালাবে; ভাবলেই আমার রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে!

বিশ্বনাথ বেশিক্ষণ রাজনৈতিক আলোচনা বা তিক্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন না। তিনি গুনগুন করে গান ধরলেন। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রতাপ বললেন, ওস্তাদজী, ছেলেগুলোকে অত দূর পাঠানো বোধ হয় ঠিক হয় নি। বাবলুটা ভীষণ দুরন্ত...

গান থামিয়ে বিশ্বনাথ প্রতাপের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, তুমি ঘোর সংসারী হয়ে পড়েছো!

প্রতাপ বললেন, স্বেচ্ছায় নয়। সংসারটা আমার কাঁধের ওপর চেপে বসেছে, বাবা চলে গেলেন, দেশের বাড়িটা চলে গেল...

–শোনো ব্রাদার, দেওঘরের এই বাড়িটা যখন কেনা হয়, তখন তোমার বয়েস কত ছিল? এই পিকলুরই বয়েসী হবে! সবাই মিলে এক সঙ্গে আসা হয়েছিল। এক দিন তুমি আর আমি। সাইকেলে ত্রিকূট পাহাড় বেড়াতে গেলাম মনে নেই? তোমার বাবাকে কিছু না জানিয়ে–

প্রতাপ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল!

–দিনকাল তো নিজের নিয়মে বদলাবেই। সময় কি থেমে থাকে? কিন্তু যে বয়েসের যা, তা তো চলবেই। ওরা একটু অ্যাডভেঞ্চার করতে গেছে, অত ঘাবড়াচ্ছো কেন?

.

বাবলুকে নিয়ে কানু একবার আছাড় খেয়েছে। আগে সে বাবলুকে পেছনের ক্যারিয়ারে। নিয়েছিল, এবারে সামনের রডের ওপর বসালো, তাতে সুবিধে হয়। বাবলু অবিরাম বক বক করে যাচ্ছে।

কানু তার জন্ম থেকেই মামার বাড়িতে থাকতো বলে তাকে পিকলু বাবলুরা ছোটবেলায় দেখেনি বিশেষ। কানু তাদের কাছে নতুন মানুষ। ছিপছিপে চেহারা কানুর, বয়স্কদের সামনে সে প্রায় কোনো কথাই বলে না, বিনীত ভাব করে থাকে, আসলে সে বয়স্কদের শাসনের অধিকার একেবারেই অগ্রাহ্য করে মনে মনে।

বাবলু একবার জিজ্ঞেস করলো, কানু কাকা, তুমি তো আমার বাবার ভাই, তা হলে আমার ঠাকুমা তোমার মা নয় কেন?

কানু বললো, তোর ঠাকুমা আমার বড় মা। আমার নিজের মা ছোট মা।

–তোমার নিজের মা কোথায়?

–স্বর্গে গেছেন।

বাবলু একবার আকাশের দিকে তাকালো। শীতের নির্মেঘ, নীল আকাশ। সেই আকাশে এক প্রান্তে হেলান দিয়ে আছে দূরের গম্ভীর পাহাড়। বহু উঁচু দিয়ে দুটি চিল ছুটে যাচ্ছে। বেগে।

–কানুকাকা, তোমার মাকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

–নাঃ।

বাবলু বেশ অবাক হয়ে যায়। কানুকাকার থেকে বাবা কত বড়, অথচ বাবার নিজের মা। আছে। কানুকাকার নেই। কিন্তু বাবা একদিন কানুকাকাকে মেরেছিল, তখন কানুকাকা চেঁচিয়ে কেঁদেছিল; ও মা, মা গো, তুমি আমায় কেন ফেলে রেখে গেলে!

–কানুকাকা, তোমার স্বর্গে যেতে ইচ্ছে করে না?

–এক থাপ্পড় খাবি এবার। কেন রে আমি এত তাড়াতাড়ি সেখানে যাবো?

–আমি একটু নামবো। আমার হিসি পেয়েছে।

–এই জন্য তোকে নিয়ে আসতে চাই নি!

পিকলু এগিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে থামালো কানু। তারপর একটা গাছতলায় নেমে সিগারেট ধরালো। কয়েকটা টান দিয়ে সেটা পিকলুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নে।

বাবলু বড় বড় চোখ করে দাদার দিকে তাকালো। পিকলু লজ্জিতভাবে ঘাড় নেড়ে বললো, না।

কানু বললো, নে না। এই ঠাণ্ডার মধ্যে ভালো লাগবে। এখন তুই কলেজে উঠেছিস, লজ্জা কী?

পিকলুর ফর্সা মুখোনি লাল হয়ে উঠেছে। প্রতুল নামে তার এক সহপাঠীর প্ররোচনায় এর মধ্যেই সে দু একবার সিগারেট টেনে দেখেছে, তার খারাপ লাগে নি। কিন্তু বাবলু জানে না। বাবলু নিঘাত মাকে বলে দেবে। সে কানুর কাছ থেকে সিগারেট নিল না।

পিকলু সামনের মেঘবর্ণ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। কয়েকটা বক উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের বুক লক্ষ করে। দূর থেকে কয়েকজন আদিবাসী রমণী হেঁটে আসছে, মাথায় মাটির হাঁড়ি নিয়ে। একটা কুকুর ছুটছে তাদের সামনে সামনে। হঠাৎ সব কিছু মিলিয়ে পিকলুর দারুণ ভালো লাগলো। এ রকম ভালো লাগার মুহূর্তে তার বুকটা একটু ব্যথা ব্যথা করে। সে আপন মনে বলে উঠলো, সুন্দর তুমি এসেছিলে এই প্রাতে/অরুণ বরুণ পারিজাত লয়ে হাতে।

কানু জিজ্ঞেস করলো, পদ্যটা তুই নিজে বানালি?

পিকলু দু দিকে মাথা নাড়লো। কানুকাকাটা কিছু বোঝে না।

বাবলু বললো, দাদা সব সময় চয়নিকা বলে একটা পদ্যর বই পড়ে। এখানেও নিয়ে এসেছে। সেই বইটা।

পিকলু বললো, তোকেও তো, কতবার পড়তে বলি।

বাবলু বললো, এঃ! আমার ইস্কুলের পড়ার বই আছে, তার ওপরে আবার পদ্যর বই পড়বো কেন?

ওরা ত্রিকূট পাহাড়ের গোড়ায় এসে একটা ঝনা দেখতে পেয়ে খাবারদাবার খুলে বসেছে, তার একটু পরেই সেখানে একটি জিপ গাড়ি এসে থামলো। তার থেকে প্রথমে নামলেন, সত্যেন, তারপর তাঁর বাড়ির অন্য অনেকে।

পিকলুদের দেখতে পেয়ে সত্যেন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আর সবাই কোথায়?

পিকলু বললো, আর কেউ আসে নি।

ওরা তিনজনে মিলে দুটি সাইকেলে চেপে এসেছে শুনে সত্যেন এতখানি ভুরু তুললেন যেন এটা একটা মহা বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি নিজের স্ত্রী ও বুলাকে ডেকে বললেন, শোনো, শোনো, পিকলুরা এতখানি রাস্তা সাইকেলে এসেছে! কম দূর নাকি?

বুলা প্রথমে ওদের দেখেও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, এবারে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, পিকলু, তোমার মা আসেননি?

পিকলুর বদলে কানু উত্তর দিল, বৌদির জ্বর হয়েছে।

সত্যেন বললেন, তা হলে তো আর গাইডের দরকার নেই। তোমরা খানিকটা ওপরে যাবে তো ওদের সঙ্গেই ঘুরে এসো। আমি বাপু ওপরে উঠছি না!

বিভাবতী বললেন, এই তো এখান থেকেই বেশ পাহাড় দেখা যায়। আর ওপরে ওঠার দরকার কী!

ওঁদের সঙ্গে নীনা আর কাজরী নামে দুটি কিশোরী আর মলয় নামে পিকলুর বয়েসী একটি ছেলে রয়েছে, তারা প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলো, না, না, আমরা ওপরে উঠবো, টপে যাবো!

দ্বিতীয় দলটির সঙ্গে অনেক ভালো ভালো খাবার আছে। জিলিপি, ডিম সেদ্ধ, লুচি-আলুর দম। সেই খাবারের ভাগ দেওয়া হলো পিকলুদের। কিছু খাবার টিফিন কেরিয়ারে সঙ্গে নেওয়া হলো, পাহাড়ের চূড়ায় বসে খাওয়া হবে।

বুলা পিকলুকে বললেন, আমি কিন্তু উপরে উঠতে চাই। আমাকে তোমরা নেবে তো?

পিকলু বললো, নিশ্চয়ই। আমি আপনার পাশে পাশে থাকবো।

কানু একটা ভোজালি এনেছে। সেটা দিয়ে সে একটা গাছের ডাল কেটে নিয়ে লাঠি বানালো। তারপর সেই লাঠি দিয়ে সামনের ঝোঁপঝাড়ের ওপর বাড়ি মারতে মারতে বললো, সবাই আমার পেছন পেছন চলে এসো।

বাবলু এই দ্বিতীয় দলটিকে গোড়া থেকেই অপছন্দ করেছে। তার সমবয়েসী কেউ নেই, সে জন্য তার সঙ্গে কেউ বিশেষ কথা বলছে না, আর মেয়েরা রয়েছে বলে ভালো করে পাহাড়ে চড়াও হবে না। নীনা আর কাজরী মাঝে মাঝেই কানে কানে কী সব বলছে আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে যেন। ঐ রকম করলে কী পাহাড়ে ওঠা যায়! কাজরী তো একবার পড়েই যাচ্ছিল পা পিছলে, এমন জোর উঃ করে চেঁচিয়ে উঠলো যে সবাই ভাবলো বুঝি অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে। কানু খানিকটা নেমে এসে কাজরীর হাত চেপে ধরে বললো, তুমি আমার সঙ্গে থাকো। মলয়, তুমি হাত ধরে থাকো নীনার।

ওরা কোনো বাঁধা পথ ধরেনি, তাই এক একটা পাথর ডিঙিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে বেশ। বুলা কিন্তু এখনো বেশ সাবলীল, তাঁর কোনো সাহায্যের দরকার হয় না। একবার একটা উঁচু পাথরের সামনে তিনি থমকে দাঁড়ালে পিকলু তাঁকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি হেসে বললেন, না, না, আমায় ধরতে হবে না। আমি চটি দুটো এখানে খুলে রেখে যাই বরং।

চটি খোলার সময় বুলার কালো রঙের শায়া দেখতে পাওয়া গেল একটুখানি। তারপর তিনি। বড় পাথরটায় ওঠবার জন্য পা তুললেন, তাঁর ফর্সা পায়ের গোড়ালির ওপর আরও খানিকটা বেরিয়ে পড়লো, সে দিক থেকে চট করে চোখ ফিরিয়ে নিল পিকলু। তার মাথা ঝিম ঝিম করছে।

বুলার দিকে এমনিতেই ভালো করে তাকাতে পারে না পিকলু। বুলা প্রায় তার মায়ের বয়েসী কিন্তু বুলাকে মা বা মাসিদের মতন একটুও মনে হয় না তার। বুলাকে সে বুলা মাসি বলেও ডাকে না, পারতপক্ষে কিছুই ডাকে না। বুলা তার সঙ্গে সস্নেহ মিষ্টি ব্যবহার করেন কিন্তু পিকলুর বুকটা ছমছম করে।

বুলা ওপরের পাথরটায় উঠে এসে বললেন, বাব্বাঃ! হাঁপিয়ে গেছি, পিকলু একটু দাঁড়াও!

তারপর মুখ তুলে চারদিক দেখে বললেন, কী সুন্দর, না? দ্যাখো, নিচের দিকে দ্যাখো, আমরা অনেকটা উঠে এসেছি।

কানুরা আরও উঁচুতে উঠে গেছে, তাদের গলার আওয়াজে টের পাওয়া যাচ্ছে। কাজরীর হাসির আওয়াজটা অনেকটা টিয়া পাখির ডাকের মতন। পিকলু শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি আর ওপরে উঠবেন?

বুলা বললেন, হ্যাঁ। এর মধ্যেই নামবো নাকি! এখানকার বাতাসে কী চমৎকার গন্ধ। জানো, পিকলু, এক জায়গায় দেখলুম কয়েকটা আমলকী গাছ। মাটিতে আমলকী পড়ে আছে। আমাদের দেশের বাড়িতে দুটো আমলকী গাছ ছিল।

আবার খানিকটা ওঠার পর বুলা দম নেবার জন্য পিকলুর কাঁধে হাত রাখলেন। পিকলুর দু কানের নিচের জায়গায় জ্বালা করতে লাগলো। শুধু তাই নয়, তার পুরুষাঙ্গ নড়াচড়া করতে শুরু করেছে। প্রথম যখন বুলা মাসি পাহাড়ে ওঠার কথা বললেন, তখনও এই রকম হয়েছিল। নীনা বা কাজরীকে দেখে তো এ রকম হয় না। পিকলু তখন মনে মনে চাইছিল বুলা মাসিই যেন তার সঙ্গে আসেন। এ রকম পরিপূর্ণ নারী সে আগে কখনো দেখেনি।

নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছে পিকলুর, খানিকটা ভয় ভয়ও করছে, যদি কেউ টের পেয়ে যায়, যদি বুলা মাসি বুঝতে পারেন যে পিকলুর মনটা খুব খারাপ। সে প্রায় ভূতগ্রস্তের মতন বিহ্বল মুখে বুলার দিকে তাকালো, বুলা অন্য দিকে চেয়ে আছেন, চোখাচোখি হলো না। পিকলুর ইচ্ছে করলো বুলা মাসিকে ছেড়ে দৌড়ে কোথাও চলে যেতে।

ওপর থেকে কানু ডাকলো, এই পিকলু, তোরা কোথায় গেলি রে? আমরা টপে উঠে এসেছি!

দূর থেকে মনে হয় একটিই পাহাড়, কিন্তু খানিকটা ওপরে এলে বোঝা যায় সমুদ্রের তরঙ্গের মতন, পাহাড়ের পর পাহাড়ের গুচ্ছ। একটা চূড়ায় উঠলেও দেখা যায় সামনে দেয়ালের মতন অন্য পাহাড় উঠে গেছে, আকাশ ছোঁয়া চূড়াগুলো অনেক দূরে।

বুলাকে নিয়ে পিকলু ওপরে উঠে আসা মাত্র কানু জিজ্ঞেস করলো, বাবলু কোথায়?

মলয় আর নীনা বললো, খানিকটা আগে দেখলাম দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে!

তিনজন পুরুষ তিনজন নারীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, বাবলুর কথা কেউ খেয়াল করেনি, বাবলু কারু সঙ্গে আসেওনি। কানু পিকলুকে বললো, আমি তো ভাবছি, বাবলু তোর সঙ্গেই আছে।

পিকলুও ভেবেছিল বাবলু আছে কানুকাকার সঙ্গে। তার সাঙ্ঘাতিক অপরাধ বোধ হলো। কী হবে? বাবলু যদি হারিয়ে যায়? যেরকম দুরন্ত ছেলে! সে চিৎকার করে ডেকে উঠলো, বাবলু! বাবলু!

সবাই মিলে এক সঙ্গে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দুশ্চিন্তায় বুলার মুখও শুকিয়ে গেছে। এত বড় পাহাড়ে বাবলুকে কোথায় খোঁজা হবে? পা পিছলে যদি কোনো খাদে পড়ে গিয়ে থাকে?

পিকলুর ক্ষীণ ধারণা, বাবলুটা দুষ্টুমি করে কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে, ইচ্ছে করে সাড়া দিচ্ছে না। সে এবারে চেঁচিয়ে বললো, বাবলু, আমরা ফিরে যাচ্ছি কিন্তু। সবাই চলে যাচ্ছি। এ পাহাড়ে ভাল্লুক আছে।

তাও কোনো সাড়া নেই।

কাজরী হঠাৎ আঙুল তুলে বললো, অই যে! ওখানে অই যে যাচ্ছে, কে? বাবলু না?

সেদিকে তাকিয়ে পিকলুর বুক হিম হয়ে গেল। পাশের পাহাড়টার গা বেয়ে বাঁদরের মতন, তরতর করে কেউ একজন উঠে যাচ্ছে। বাবলু বলে এমনিতে চেনার উপায় ছিল না, কিন্তু তার হলুদ সোয়েটারটা চকচক করছে রোদে।

সবাই এক সঙ্গে ডেকে উঠলো বাবলুর নাম ধরে। কিন্তু বাবলু এত দূরে আর উঁচুতে যে এই ডাক বোধ হয় সেখানে পৌঁছোবে না। এদের এত চিৎকারেও বাবলু একবারও পেছন ফিরে তাকালো না।

একটু পরে সে গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো ধ্বস্বাসে। বুলার চোখে জল ছল ছল করছে। এখান থেকে কারু পক্ষে দৌড়ে গিয়ে বাবলুকে ধরারও উপায় নেই।

এক সময় দেখা গেল, সেই দ্বিতীয় পাহাড়ের চূড়ায় একটা ছোট্ট স্প্রিংয়ের পুতুলের মতন বাবলু লাফাচ্ছে। বাবলু নিশ্চিত ওদের দেখতে পাচ্ছে না। সে নাচছে একা একা, মনের আনন্দে।

১১ দুপুরবেলা নানা গল্পের মধ্যে

দুপুরবেলা নানা গল্পের মধ্যে কার কোন্ কারণে কলকাতা শহরটা ভালো লাগে এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল, সুহাসিনী হঠাৎ বলে উঠলেন, কলকাতায় একটা খুব ভালো জিনিস পাওয়া যায়, বোতলের সোডার জল। ছিপি খুললেই ভুসভুস করে ওঠে, বড় উপকারী!

সবাই হেসে উঠেছিল। কলকাতার দই-রাবড়ি নয়, চিড়িয়াখানা-ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নয়, থিয়েটার বাইস্কোপ-রেডিও নয়, সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো সোডার বোতল?

সুহাসিনী অবাকভাবে ভুরু তুলে বলেছিলেন, তোরা হাসছিস? মালখানগরে থাকতে আমি বায়ুর চাপে মাঝে মাঝে বড় কষ্ট পেতাম। কোনো ওষুধেই উপশম হয় না। একবার

কলকাতায় এসে তাদের বাবা আমাকে এক বোতল সোডার জল খাওয়ালেন, ওমা, তারপর আর এক মাস আমার পেটে একটুও বায়ু হয়নি। গতবারেও তো কলকাতায় গিয়ে আমি পিকলুকে দিয়ে সোডার বোতল আনিয়েছি।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, দেওঘরে সোডা ওয়াটার পাওয়া যায় না?

বিশ্বনাথ বললেন, না, আমি খোঁজ করেছি। এখানে এসব জিনিসের চল নেই।

মমতা বললেন, আপনি এখন তো বায়ুতে কষ্ট পান। আমাদের লেখেননি কেন মা, আমরা কলকাতা থেকে কয়েকটা বোতল নিয়ে আসতাম?

প্রতাপ বললেন, বড় বড় রেল স্টেশনে পাওয়া যায়। দেওঘরে না থাকলেও জসিডিতে থাকতে পারে, ওটাতো একটা জংশন।

বিকেলবেলা প্রতাপ তাঁর মায়ের এই সামান্য সাধটুকু মেটাবার জন্য চলে গেলেন জসিডি। রেলের রেস্তোরাঁয় খোঁজ করে ঠিক পাওয়াও গেল, মোট তিনটি বোতল ছিল, প্রতাপ তিনটিই কিনে নিলেন। স্টেশনের বাইরে এসে আরও কিছু টুকটাক বাজার করলেন তিনি। এখানে বেশ ভালো সাইজের ফুল কপি পাওয়া যাচ্ছে, কলকাতার তুলনায় তো বটেই, দেওঘরের থেকেও। দাম সস্তা। বড় বড় আতা আর পেয়ারাও উঠেছে।

জিনিসপত্র দরদাম করতে করতে হঠাৎ এক সময় তিনি দেখতে পেলেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বনাথ। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কী ওস্তাদজী, আপনি আবার শুধু শুধু এলেন কেন? আমি বেশি কিছু কিনছি না তো।

বিশ্বনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। বাড়িতে ঠিক বলা যাবে না, তাই এখানে চলে এলাম।

প্রতাপ ভেতরে ভেতরে বেশ চমকে উঠলেন। মানুষ এই ভাবে কথা বলে টাকা ধার চাইবার সময়। কিন্তু বিশ্বনাথের আত্মসম্মানবোধ অতি তীব্র। প্রতাপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও খুব পরিষ্কার, কোনোরকম গোপনীয়তার স্থান নেই।

প্রতাপ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলতেই বিশ্বনাথ বললেন, এই বাজারের মধ্যে তো বলা যাবে না, চলল, একটু নিরিবিলিতে যাই। হেঁটে ফিরবে নাকি?

জসিডি থেকে দেওঘরের দূরত্ব বেশি নয়, অনায়াসেই হাঁটতে হাঁটতে ফেরা যেত, সন্ধ্যাটিও মনোরম; কিন্তু প্রতাপ এক ঝুড়ি আতা কিনে ফেলেছেন, তা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং একটা টাঙ্গা ডাকতে হলো।

টাঙ্গাতে উঠেও বিশ্বনাথ কোনো কথা বললেন না, আপন মনে চুরুট টানতে লাগলেন। প্রতাপ বেশ বিচলিত বোধ করছেন। কী এমন জরুরি কথা যা বিশ্বনাথ বলতে ইতস্তত করছেন? নিশ্চয়ই পারিবারিক কিছু। মা এখানে এসে রয়েছেন, তার জন্য কোনো জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে? ছোড়দির কোনো শক্ত রোগ হয়েছে? কিংবা বুলা, বুলার ব্যাপারে কিছু বলেছে সত্যেন? কী-ইবা বলার থাকতে পারে, বুলার সঙ্গে তো প্রতাপের একটা কথাও হয় না।

দারোয়া নদীর সেতুর ওপর এসে বিশ্বনাথ বললেন, এখানে একটু নামা যাক।

টাঙ্গাওয়ালাকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে বিশ্বনাথ জলের দিকে এগিয়ে গেলেন। সূর্য অস্ত যাবার পরও একটা চাপা আলো এখনও রয়ে গেছে আকাশে। দূরে ডিগরিয়া পাহাড়ের রেখা এখন কিছুটা অস্পষ্ট, শোনা যাচ্ছে একটা রেলের ইঞ্জিনের শব্দ।

নদীতে জল কম, কিন্তু এত পরিচ্ছন্ন যে আঁজলা তুলে পান করা যায়। নদীর ঠিক মাঝখানে জেগে থাকা একটা পাথরে কেউ বাংলায় তার প্রেয়সী বা মানসীর নাম লিখে রেখে গেছে।

বিশ্বনাথ চটি খুলে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বালি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, এই নদীটাও ফলগু নদীর মতন, জল শুকিয়ে গেলেও বালি খুঁড়লে জল পাওয়া যায়।

প্রতাপ বললেন, ওস্তাদজী, আমি আপনার জরুরি কথাটা শুনতে চাইছি।

বিশ্বনাথ প্রতাপের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, সব কথা কি যে-কোনো পরিবেশে, যে-কোনো সময়ে বলা যায়? তাই আমি সময় নিচ্ছি। প্রতাপ, একটা খুব খারাপ খবর আছে। তুমি শোনার জন্য তৈরি?

প্রতাপের মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল। ঝট করে তাঁর মনে হলো, বাবুল? পিকলু বা মুন্নি? বাবলুটাই বেশি দুরন্ত।

–কী হয়েছে? কী হয়েছে, বলুন!

বিশ্বনাথ প্রতাপের কাঁধে হাত রেখে বললেন, মনটাকে শক্ত করো, তোমার দায়িত্ব অনেক। বেড়ে গেল... অসিতদা মারা গেছেন!

– অ্যাঁ?

–তুমি চলে আসার একটু পরেই টেলিগ্রাম এলো, আমি গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলুম... বাড়ির আর কেউ জানে না তোমাকে আগে জানাবার জন্য...

বিশ্বনাথ পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বার করে দিলেন। টেলিগ্রামটা প্রতাপের নামে, পাঠিয়েছেন অসিতবরণের দাদা জলদবরণ। অতি সংক্ষিপ্ত বাতা, অসিতবরণ মাডারড, কাম অ্যাটওয়ান্স!

প্রতাপ চিৎকার করে উঠলেন, মাডারড?

বেশ কিছুক্ষণ দু জনে নিঝুমভাবে বসে রইলেন। আলোর শেষ চিহ্নটুকুও মিলিয়ে গেল। আকাশ থেকে। দু'জনে আর পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না।

প্রতাপ এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, চলুন, আমাকে এক্ষুনি কলকাতায় যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশ্বনাথ বললেন, ভোর সাড়ে চারটার সময় একটা ট্রেন আছে, জসিডিতে এসে ধরতে হবে, তার আগে কলকাতায় যাওয়ার আর কোনো ব্যবস্থা নেই। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

প্রতাপের বুকটা ভারি হয়ে গেছে। অসিতবরণকে তিনি পছন্দ করতেন কিন্তু এখন শুধু মনে পড়ছে দিদির মুখখানা। তিনি জানেন, শ্বশুরবাড়ির প্রতিকূল পরিবেশে এই বিপদের সময় দিদিকে সাহায্য করবে কে? বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মকদ্দমা চলছে, এর মধ্যে আবার অসিতদার চাকরি চলে গেছে, তবু অসিতদার বেঁচে থাকা না-থাকার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। এক্ষুনি দিদির পাশে গিয়ে প্রতাপের দাঁড়ানো দরকার।

বিশ্বনাথ বললেন, অসিতদা নিরীহ ভালো মানুষ, তাকে কে খুন করবে, প্রতাপ?

প্রতাপ রাগতভাবে বললেন, নিরীহ ভালো মানুষরা বুঝি খুন হয় না? অসিতদাকে তার নিজের বাড়ির লোক, এমনকি ওঁর দাদা, যে এই টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছে, সে তো একটা দুশ্চরিত্র, বদমাস, এরাই খুন করতে পারে সম্পত্তির জন্য। ওঁর অফিসের লোকজনরাও খুন করতে পারে!

–অফিসের লোক?

–অসিতদার চাকরি গেছে কেন জানেন? উনি সৎ ছিলেন বলে! উনি সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, সেখানে তো ঘুষের রাজত্ব। অসিতদা একটা ঘুষের র‍্যাকেট ধরে ফেলেছিলেন, ফুড মিনিস্টার প্রফুল্ল সেনের কাছে নোট পাঠাতে যাচ্ছিলেন। সেইসব ঘুষখোর কর্মচারীরা, তাদের মধ্যে দু'জন আবার জেলখাটা স্বদেশী, একটু আগে জানতে পেরে অসিতদার কাছ থেকে ফাঁইল কেড়ে নেয়। উল্টে তারা অসিতদার নামেই মিথ্যে

অভিযোগ চাপিয়ে দেয়। কথায় কথায় অসিতদাকে প্রাণের ভয় দেখাতো, বাধ্য হয়ে অসিতদাকে চাকরি ছাড়তে হয়। " আমি অসিতদাকে বলেছিলুম মামলা করতে, উনি সাহস পেলেন না, তারপর থেকেই তো ওঁর মাথায় গোলমাল দেখা দিল!

এতক্ষণ একটানা বলে গিয়ে প্রতাপ একটু থামলেন, তারপর আবার জোর দিয়ে বললেন, আমি জানি, অসিতদা কখনো ঘুষের টাকা ছুঁতেন না, শরীরে বনেদী বাড়ির রক্ত আছে তো! বিশ্বনাথ বললেন, মাথার গোলমাল...

-একদম কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অফিসের সেই দুষ্টচক্র ওঁকে শাসিয়েছিল, উনি চাকরি ছাড়ার পরেও মুখ খুললে ওরা দেখে নেবে! তাই উনি দিদির সঙ্গেও কথা বলতেন না। ওস্তাদজী, এখন দিদির কী হবে?

-চলো, আমরা কলকাতায় যাই।

বাড়ি ফিরে আসল খবরটা কারুকে জানানো হলো না। অসিতবরণের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর এসেছে, তাই প্রতাপকে যেতে হবে। প্রতাপ সকলকেই নিয়ে ফিরবেন কিনা সেই সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো। এক মাসের জন্য বেড়াতে আসা, সবে মাত্র এগারোদিন কেটেছে, তা। ছাড়া মমতার বেশ জ্বর। বিশ্বনাথও চলে গেলে এদিকে সকলকে সামলে রাখা মুশকিল হবে, তাই ঠিক হলো প্রতাপ একাই যাবেন।

বরানগরে দিদির শ্বশুরবাড়ির কথাই প্রতাপের মন জুড়ে আছে, সেখানে এতক্ষণ কী চলছে। কে জানে? বনেদী বাড়িগুলিতে যখন পচন ধরে তখন মাটির তলা থেকে যেন অসংখ্য কদাকার, কুৎসিত জিনিস ফুটে বেরোয়। ক্ষীয়মাণ বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ির সময় ভাই ভাইয়ের সঙ্গে, ভাইপো খুড়োর সঙ্গে, এমনকি ছেলে মায়ের সঙ্গে পরম শত্রুর মতন ব্যবহার। করে, প্রতাপ তাঁর নিজের আদালতেই এরকম অনেক মামলা দেখেছেন।

মানুষের মন বড় বিচিত্র। এরকম অবস্থার মধ্যেও প্রতাপের মাঝে মাঝে মনে পড়তে লাগলো বুলার কথা। যাবার আগে বুলার সঙ্গে একবার দেখা হবে না? বুলাও অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে, সে স্বামী পরিত্যক্তা, তার দেওরটি সুবিধের মানুষ নয়, এই সময় প্রতাপ তাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না? বুলা কোনো কথা বলেনি বটে, কিন্তু তার দৃষ্টির মধ্যে যেন সেরকম প্রত্যাশা ছিল।

প্রতাপের একবার তীব্র ইচ্ছে হলো, এই রাত্রেই একবার সত্যেনের বাড়ি গিয়ে বুলাকে তাঁর হঠাৎ কলকাতায় চলে যাওয়ার কারণটা জানিয়ে যেতে। বুলা যেন আবার ভুল না বোঝে। কিন্তু কোন্ ছুতোয় এখন সে বাড়িতে যাবেন প্রতাপ? সত্যেনের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি, ঠিক ঘোষিত না হলেও দু'জনেই দু'জনকে অপছন্দ করেছেন।

প্রতাপের যাওয়া হলো না সেখানে।

প্রতাপ যখন বরানগরে পৌঁছোলেন, ততক্ষণে অসিতবরণের শব দাহ হয়ে গেছে। সুপ্রীতি তাঁর মেয়েকে নিয়ে নিজের শয়নকক্ষে চুপ করে বসেছিলেন, তাঁর চোখে জল নেই, প্রতাপকে দেখেই তিনি উঠে এসে তাঁর হাত ধরে আবেগহীন কণ্ঠে বললেন, খোকন, এ বাড়িতে আমরা আর এক দণ্ড টিকতে পারবো না। তুই আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।

প্রতাপ বললেন, দিদি, আগে বসো। সব শুনি। কী হয়েছিল বলো তো?

সুপ্রীতি বললেন, মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে আমাদের। রিফিউজিরা তোর জামাইবাবুকে মেরে ফেলেছে।

অসিতবরণের ঠিক কী ভাবে মৃত্যু ঘটেছে, তার সঠিক কারণটা সুপ্রীতিও জানেন না, হয়তো কোনোদিনই আর জানা যাবে না। কাশীপুরে এদের বাগান বাড়িটি জবরদখল এবং তার উচ্ছেদের চেষ্টা নিয়ে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে।

প্রথম দিন অসিতবরণের অন্যান্য ভাইরা যখন সেই ঘটনাস্থল থেকে পশ্চাৎ-অপসরণ করেন, তখন মনোরোগী অসিতবরণ সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। ভিড়ের মধ্যে অনেকক্ষণ তাঁকে কেউ লক্ষ্যই করেনি।

তারপর অসিতবরণ উদ্বাস্তুদের প্রহরা ভেদ করে কী করে যে ভেতরে ঢুকে পড়লেন, সেটা একটা রহস্য। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ সুপুরুষ তিনি, খেতে না পাওয়া উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তাঁর চেহারার কোনো মিলই নেই, সুতরাং উদ্বাস্তুরা তাঁকে কেন নিজেদের লোক মনে করবে? তবুও, যেভাবেই হোক গোলমাল, ঠ্যালাঠেলির মধ্যে অসিতবরণ কোনো এক সময়ে ঢুকে পড়েছিলেন ভেতরে। সোজা চলে এসেছিলেন পাকা হলঘরে, যেটা এক সময় নাচঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

চৌকো চৌকো সাদা ও কালো মার্বেল বসানো সেই নাচঘর। খুব অল্প বয়েসে অসিতবরণ যখন এ বাড়িতে পিকনিক করতে আসতেন, তখন ঐ চৌখুপ্পি কাটা নাচঘরে তিনি ভাইবোনদের সঙ্গে এক্কা দোক্কা খেলতেন। হঠাৎ অসিতবরণ যেন ফিরে গিয়েছিলেন সেই বালক বেলায়, তিনি পকেট থেকে একটা এক আনি বার করে এক পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে এক্কা দোক্কা খেলতে শুরু করেন।

জবরদখলকারীরা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে প্রথমে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, তারপর তাকে মালিকপক্ষের একজন বলে চিনতে পারে।

এর পরের ঘটনা সম্পর্কে নানারকম মত আছে। কেউ বলে যে জবরদখলকারীরা তাঁকে বাঁশ দিয়ে পেটাতে শুরু করে। কেউ বলে যে, ঐ সুদর্শন, নিরীহ মতন মানুষটিকে দেখে কারুর মনেই হিংস্রতা জাগেনি, বরং বয়স্ক ব্যক্তিরা অসিতবরণের সামনে হাত জোড় করে বলেছিলেন, আপনি বাইরে চলে যান। আপনাকে অনুরোধ করছি, নইলে বিপদ হতে পারে। উদ্বাস্তুদের স্থানীয় নেতা হরীত মণ্ডলের বিবৃতি একটু অন্যরকম, তিনি বলেছেন যে, তিনি নিজে সেই সময়ে ওখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সব দেখেছেন। সেখানে কয়েকজন একটু ধাক্কাধাক্কি করেছিল ঠিকই, কিন্তু কেউ কোনো অস্ত্র দিয়ে

মারেনি, অসিতবরণের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ঐটুকু ধাক্কাতে কোনো মানুষ মরে না, নিশ্চয়ই ওনার হার্টে গোলমাল ছিল। একটু ধাক্কা খেয়েই উনি মাটিতে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলেন। তারপর ওঁর চোখ উল্টে গেল। জবরদখলকারীরা তখন অনেকে ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এসে ওঁর চোখমুখে ছিটিয়েছে, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে, উনি আর কোনো সাড়াশব্দ করেননি। ওঁর হাতে যে দুটি সোনার আংটি ছিল তা পর্যন্ত কেউ খুলে নেয়নি।

অসিতবরণের কাকা-ভাইপোরা অবশ্য এসব কিছু বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, আসতবরণকে মালিকপক্ষের একজন হিসেবে চিনতে পেরে বাঞ্চৎ রিফিউজিরা তাঁকে টেনে হিঁচড়ে ভেতরে নিয়ে যায়, তারপর সেখানে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। এই কাহিনী যতটা ভয়াবহ করা যায়, ততই জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। যে-কোনো প্রকারে বাড়িটা উদ্ধার করতেই হবে। পরদিন বরানগর থেকে বড় একটা দল গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে রিফিউজিদের ওপর, প্রচণ্ড মারামারি শুরু হয়ে যাবার পর পুলিশ এসে গুলি চালায়। একটি সাত বছরের বাচ্চা সমেত তিনজন উদ্বাস্তু সেই গুলিতে প্রাণ দিয়েছে।

বাড়িটা অবশ্য মুক্ত করা যায়নি। গুলি চালনার প্রতিবাদে বামপন্থী দলগুলি রিফিউজিদের পক্ষ নিয়েছে, গতকাল কাশীপুরে হরতাল হয়ে গেছে, বিধানসভাতেও এই প্রসঙ্গ নিয়ে ঝড়। উঠেছে।

দিদির মুখ থেকে কিছুটা শুনে আর খবরের কাগজের বিবরণগুলো পড়ে প্রতাপ গুম হয়ে বসে রইলেন। আসল ঘটনা যাই হোক, উদ্বাস্তুদের কারণেই অসিতবরণের প্রাণটা চলে গেছে। এর দায় তো প্রতাপদের ওপরেও খানিকটা বতাবেই।

প্রতাপ ক্ষীণভাবে জিজ্ঞেস করলেন, অসিতদার, হার্টের অসুখ ছিল?

সুপ্রীতি বললেন, জানি না। কখনো তো কিছু বলেনি।

জানলার কাছে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুতুল। একটা হলদে রঙের ফ্রক পরা, মাথার চুল এলোমেলো, চোখদুটি দেখলে মনে হয়, একটু আগে সে কান্না থামিয়েছে। প্রতাপের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে আবার ফুঁপিয়ে উঠলো।

আইনজ্ঞ হিসেবে প্রতাপের জানতে ইচ্ছে হলো যে অসিতবরণের দেহ পোস্ট মর্টেম করা হয়েছিল কিনা। কিন্তু খবরের কাগজগুলিতে সে কথার উল্লেখ নেই, দিদির কাছে এখন এই প্রশ্নটা করা ঠিক হবে না।

সুপ্রীতি একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাইরে একটা হুংকার শোনা গেল, কোথায়? সে এসেচে শুনলুম, কোথায় সে?

প্রতাপ তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন।

ধুতির ওপর একটা বেনিয়ান পরা, হাতে রূপো বাঁধানো ছড়ি, এই সন্ধেবেলাতেই জলদবরণের চক্ষুদুটি নেশায় রক্তিম, ক্রুভাবে তিনি প্রতাপের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অন্য সময় প্রতাপ জলদবরণকে গ্রাহ্যই করেন না। এ বাড়ির অন্য কারুর সঙ্গে তাঁর। বাক্যালাপ নেই, কিন্তু এখন জলদবরণের দৃষ্টির সামনে তিনি যেন কুঁকড়ে গেলেন। তিনি নিজেকে অকারণেই যেন অপরাধী বোধ করছেন।

জলদবরণ জিজ্ঞেস করলেন, এই যে, এসেচো তা হলে', সব শুনেছো?

প্রতাপ মুখ নিচু করে মাথা নাড়লেন।

জলদবরণ তাঁর বাজখাঁই গলায় আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী শুনেছো? হার্টের অসুখ? আমাদের বংশের কারুর কোনো দিন হার্টের অসুখ হয়নি। তোমার দিদি আমাদের নামে কান ভাঙাচি দিয়েছে তো? বলেনি যে আমরা ইচ্ছে করে ওকে ফেলে পালিয়ে এসেছিলুম!

প্রতাপ মৃদুভাবে বললেন, আজ্ঞে না!

–আলবাৎ বলেচে। বাড়ির সব্বাই শুনেচে। মায়ের পেটের ভাইপো, আমি তার আপন নয়, বউ আপন? আমি তাকে ঐ শেয়ালগুলোর মুখে ফেলে আসবো? আমাদের। সামনে থেকে ওকে জোর করে টেনে নিয়ে গ্যাচে, আমি বলিনি এই কথা! কী? আমি বলচি, আমার মুখের ওপর কেউ কথা বলতে পারবে?

প্রতাপ বললো, আজ্ঞে ওসব কথা এখন থাক বরং।

জলদবরণ মুখটা একটু অন্যদের দিকে ফিরিয়ে, যেন অনুপস্থিত দর্শকদের শোনাবার জন্য আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন, তোমরাই তো আমার ভাইপোকে মেরে ফেললে! সব শালা রিফিউজি এক জাত! বাঞ্চোৎ, গুখেকোর ব্যাটাগুলোকে পোঁদে লাথি মেরে পদ্মার পার করে দেবো! বেরোও, আমার বাড়ি থেকে বেরোও, দূর হয়ে যাও। হাতের ছড়িখানা তিনি ঘোরাতে লাগলেন শূন্যে।

১২ জেল থেকে ফেরার পর

জেল থেকে ফেরার পর মামুন কিছুদিনের জন্য নিরিবিলিতে পারিবারিক জীবন কাটাবেন ঠিক করলেন। ঢাকার বাসা ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে চলে এলেন মাদারিপুরের নিকটবর্তী এক গ্রামে। এখানে তিনি তাঁর এক চাচার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন।

মামুন কখনো দাড়ি রাখেননি, কিন্তু মাথায় বাবরি চুল। চেহারা ও পোশাকে তিনি নজরুল ইসলামের অনুকরণ করেছেন বরাবর, যদিও সে রকম কিছু কবিখ্যাতি তাঁর হয়নি। ছাত্রজীবনের শেষে কবিতা রচনার চেয়ে রাজনীতিতেই তিনি মেতে উঠেছিলেন বেশি। সেই সময়ে কলকাতা শহরে যে-কোনো শিক্ষিত মুসলমান যুবকের কাছে রাজনীতি ছিল এক অবধারিত আকর্ষণ। সেই রাজনীতি উপলক্ষ করেই প্রতাপের সঙ্গে তাঁর খানিকটা বিচ্ছেদ ঘটতে থাকে। তার আগে দু'জনে ছিলেন একেবারে হরিহর আত্মা, রিপন কলেজের ছেলেরা ঐ দুই বন্ধুকে ঠাট্টা করে বলতো তাল-বেতাল। প্রতাপ ল কলেজে ভর্তি হলে মামুনও ল পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি

হলো, পড়াশুনো ছেড়ে তিনি কৃষক-মজদুর প্রজা পার্টিতে যোগ দিয়ে পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজনীতিতে।

মাদারিপুরে গ্রামের বাড়িতে বসে মামুনের মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা। মাঝখানের পনেরো কুড়ি বছরে কত রকম উত্থান-পতন ঘটে গেল।

মামুনের বয়েস এখন চল্লিশ, তাঁকে ঐ নামে ডাকবার আর বিশেষ কেউ নেই। তাঁর পিতার ইন্তেকাল হয়েছে অনেক আগেই। তাঁর বড় ভাইয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতান্তর হয় বলে তিনি দায়ুদকান্দির সম্পত্তির ভাগ ছেড়ে দিয়ে মাদারিপুরে তাঁর অপুত্রক চাচার এই সম্পত্তিটি গ্রহণ করেছেন। এখানে তিনি অনেকটা অপরিচিত, এখানকার মানুষ তাঁকে চেনে সৈয়দ মোজাম্মেল হক নামে এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের একজন মাঝারি নেতা হিসেবে সমীহ করে। তিনি বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যও মজবুত, গায়ের রং অনেকটা কালোর দিকে। ঢাকায় একটা ঠাট্টা প্রচলিত আছে যে সৈয়দদের মধ্যে অনেক ভেজাল ঢুকে পড়েছে, যাদের গায়ের রং ফর্সা নয়, তাদের কোনো আরব রক্ত-সম্পর্ক নেই, তারা এফিডেবিট করা সৈয়দ। হিন্দুদের মধ্যেও যেমন বেঁটে বামুন আর কটা শুদুর সন্দেহজনক। মামুন নিজেও এ ব্যাপার নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক মস্করা করেছেন। গ্রামদেশে অবশ্য এসব বৃত্তান্তের প্রচলন নেই, তারা মামুনকে দূর থেকে দেখলেই সালাম জানায়, অনেকেই পারিবারিক সমস্যায় পরামর্শ নিতে আসে তাঁর কাছে।

মামুনের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়েছে বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই, তারপর তিনি ফিরোজাকে বিবাহ করেন। এই ফিরোজা ছিলেন তাঁরই এক বন্ধুর স্ত্রী, এই বন্ধুটি ছেচল্লিশের দাঙ্গায় নোয়াখালিতে নিহত হয়েছেন। অসহায় বন্ধুপত্নীকে আশ্রয় দিতে গিয়ে বিপত্নীক মামুন বুঝতে পারেন যে তাঁকে বিবাহ করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ফিরোজা তখন নিঃসন্তান ছিলেন। সহজেই রাজি হয়ে যান। গৃহিণী হিসেবে ফিরোজা এই ধরিত্রীর মতনই সর্বংসহা, তাঁর রান্নার হাত চমৎকার, রান্না ঘরে তিনি দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতে ভালোবাসেন। মামুনের আগের পক্ষের একটি পুত্র সন্তান আছে, এ পক্ষের দুটি কন্যা,

ফিরোজা তিনজনকেই সমান চোখে দেখেন, সেইজন্য সংসারের ব্যাপারে মামুন পুরোপুরি ভারমুক্ত।

বিকেলের দিকে মামুন হাঁটতে হাঁটতে আড়িয়েল খাঁ নদীর তীরে চলে আসেন। নদী নয়, নদ, এর প্রকৃতি অতি দুর্দান্ত। কার নামে এই নদীর নাম হয়েছিল কে জানে, হয়তো কোনো পীর বা ফকিরের নামে, কিন্তু কেমন যেন দস্যু দস্যু ধ্বনি আছে। এই নদী যখন তখন তীরভূমির ওপর দস্যুতা করে। হঠাৎ গেল গেল রব পড়ে যায়, ঝুপ ঝাঁপ শব্দ হয়, কিনারা থেকে অনেকখানি দূরে ফাটল ধরে, প্রায় চোখের নিমিষে সেখানে জলের ছলছল খেলা শুরু হয়ে যায়।

স্থানীয় লোকেরা নদীর এই চরিত্র জানে, তাই তারা নদীর ধারে খুব প্রয়োজন ছাড়া বেশি সময় কাটায় না, বিশেষত বর্ষাকালে। খরস্রোতের জিহ্বা ভূমির সঙ্গে মানুষকেও টেনে নিয়েছে এমন অনেক নজীর আছে। অন্যদের কাছে সাবধানবাণী শুনেও মামুন গ্রাহ্য করেন না, তিনি নদী প্রান্তে একটি বটগাছের তলায় এসে বসেন। খানিকটা বিপদের ঝুঁকি তাঁর ভালো লাগে। বটগাছটি খুবই প্রাচীন, এই গাছটি বহু ঘটনার সাক্ষী, অন্তত শ খানেক বছর সে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে। দুর্দান্ত আড়িয়েল খাঁ নদ এতদিন তাকে উদরসাৎ করতে পারেনি, সুতরাং ভয়ের কী আছে!

এখন ভরা বর্ষা, এই সময় নদী-নদগুলি দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। জলের কী চমৎকার স্বাস্থ্য। জলের কী সাবলীল খেলা। ইলিশ মাছ ধরা নৌকোগুলি এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওরা যেন জলস্রোতেরই অঙ্গ! মাঝে মাঝে যখন ওরা জাল তোলে তখন ইলিশের চকচকে রূপালি ঝিলিক চোখে পড়ে।

সন্ধের দিকে জেলে নৌকোগুলো ঘাটের কাছে এসে ভেড়ে, কেউ কেউ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, মাছ নিবেন নাকি, কত্তা? মামুন দু'দিকে মাথা নাড়েন। হাতে মাছ ঝুলিয়ে দু'মাইল হেঁটে বাড়ি ফেরার দৃশ্যটাই তাঁর ঘোর অপছন্দ। বস্তুত খাদ্যদ্রব্যের ওপর কোনো আসক্তিই তাঁর নেই। খিদে পেলে বাড়ির লোক খেতে দেবে, কী খাবার দেবে তা বাড়ির

লোকের চিন্তা, তাঁর নয়। মামুন বেশ কয়েকটি বছর গ্রামে গ্রামে কাটিয়েছেন, দু'বার জেল খেটেছেন, খাদ্যের বাছ-বিচার নেই বলেই সে রকম কষ্ট পাননি।

মামুনের সামনে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা-সঙ্কুল আবর্তে এতগুলো বছর কাটলো। এর পর কী? নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে মামুন নিজের জীবনের কথা ভাবেন। নদী যায় সমুদ্রের দিকে, মানুষের জীবন যায় মৃত্যুর দিকে। চল্লিশ বছরে পা দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে মামুন এখন মৃত্যুর কথা ভাবেন। সে মৃত্যু কত দূরে তিনি জানেন না। তাঁর আব্বা-চাচারা কেউই ষাট বাষট্টির বেশি বাঁচেননি, মামুনেরও যদি সেইরকম আয়ু হয় তা হলে মাঝখানের বছরগুলি তিনি কীভাবে কাটাবেন? রাজনীতি আর তাঁর মন টানছে না। তিনি তো আর ব্যক্তিগত স্বার্থে, ক্ষমতার লোভে রাজনীতির অন্দর মহলে প্রবেশ করেননি। উদ্দেশ্য ছিল অন্য। আবার, সাধারণ মামুলি মানুষের মতন বিনা উদ্দেশ্যে জীবন কাটানোও তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়!

নদীর ধারে বুড়ো বটগাছতলায় একা বসে থাকা সৈয়দ মোজাম্মেল হক ওরফে মামুনকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না, মানুষটি এখন কী গভীর সংকটের মধ্যে রয়েছেন। তাঁর দুঃখের অবধি নেই। এখন, এমনকি তিনি কবিতা রচনা করতেও অক্ষম। মাঝখানের কয়েক বছরের অনভ্যাসে কবিতার ভাষা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন বাকরুদ্ধ, পশ্চিম বাংলায় রবীন্দ্রোত্তর কবিতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, পূর্ব বাংলাতেও বাচ্চা কবিরা অন্য রকম ভাষায় লেখে। ঢাকাতে একদিন তো মোতাহার ভাই বলেছিলেন, আরে সৈয়দ, হইলো কী কও তো! এখনকার পোলাপানরা যা ল্যাখে তার কিছুই বুঝি না! বাংলা কবিতার এখন কোনো অভিভাবক নাই!

বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের এক ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন জে দাশগুপ্ত। দ্বিতীয়। মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে বরিশালে থাকবার সময় মামুনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। লাজুক, খামখেয়ালী ধরনের মানুষটি, জাতে ব্রাহ্ম, চেহারাটি অনেকটা খেয়া নৌকোর মাঝির মতন, সামনের সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি যে একজন কবি তা মামুন বুঝতেই পারেননি। পার্টিশানের পর ভদ্রলোক ভারতে চলে যান, শোনা

যায় সেখানে তিনি নাকি অর্থনৈতিক অসুবিধের মধ্যে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনিই যে প্রসিদ্ধ কবি জীবনানন্দ দাশ তা জানতে মামুনের অনেক দিন লেগে গিয়েছিল।

মামুন ঐ কবির দুটি কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করে পড়েছিলেন। ঝরা পালক' বইয়ের একটি কবিতার নাম হিন্দু-মুসলমান, তার প্রথম লাইনগুলি এই রকম :

মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে-পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘন্টা মিশিছে হরষে নমাজের সুরে সুরে!
আহ্নিক যেথা শুরু হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে,
মুয়াজ্জেনদের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে;
জপে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা-ঊষায় বেদবাণী যায় মিশে কোরানের স্বরে;
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা,-মিশে গেছে হেথা মশজিদ, মন্দির!

কবিতাটি পড়তে পড়তে মামুন চোখের জল সামলাতে পারেননি। তখন সাম্প্রদায়িকতা দিনে দিনে কালকেতুর মতন বাড়ছে, মামুন নিজেও তাতে সচেতনভাবে খানিকটা কণ্ঠ মিলিয়ে ছিলেন, হঠাৎ এই কবিতা তাঁর বুকে একটা ধাক্কা মারে। এমন মিলনের কথা আগে তো কেউ বলে নি। মামুন ততদিনে লাহোর কনফারেন্সে ঘোষিত পৃথক পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন এবং প্রচারে নেমেছিলেন। এই সময়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তবে কি সব ভুল? হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশে থাকতে পারে না? কেন পারবে না? মামুনের অনুতাপ বোধ হয়েছিল।

জীবনানন্দ দাশের ঐ কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের 'ভারত তীর্থ কবিতার একটি অক্ষম অনুকরণ তা মামুনের মনে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি গভীর ভাবের বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ নয়, মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। খেয়া পারাপারের মাঝির মতন চেহারার এই কবি হিন্দু-মুসলমানকে সার্থক ভাবে চিনেছেন, তাই তিনি লিখতে পেরেছেন :

এ ভারত ভূমি নহেক' তোমার, নহেক' আমার একা
হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছায়া,-মুসলমানের রেখা;...
...'কাফের', 'যবন' টুটিয়া গিয়াছে,-ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা,
মোলেম বিনা ভারত বিকল, বিফল হিন্দু বিনা...

মামুন অভিনন্দন জানিয়ে ঐ জীবনানন্দ দাশকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, এবং তাঁর ওপর একটি প্রবন্ধ লিখবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। জীবনানন্দের পরবর্তী কাব্য পুস্তকটি পড়ে তিনি হতবাক। এ কি একই লোকের লেখা? এর যে মাথা মুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না? অমন একজন অসাম্প্রদায়িক, মানবতা প্রেমিক কবি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেলেন নাকি? 'সাতটি তারার তিমির', যেমন বইয়ের নাম, তেমনই সব প্রলাপ! বইটিতে হিন্দুমুসলমান বিষয়ে একটি কবিতাও নেই! মাঝে মাঝে যে-সব মানুষের কথা বলা আছে, তারা কারা? কিছুই চেনা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী;...

যূথ কথাটা হাতিদের সম্পর্কে প্রযোজ্য, নারীরা কী করে যূথচারী হবে? ব্যাকরণের কী মা বাপ নেই? মোতাহার ভাই ঠিকই বলেছিলেন যে বাংলা কবিতার কোনো অভিভাবক নাই এখন। আগে কেউ একটি ভুল শব্দ প্রয়োগ করলে প্রধান প্রধান কবিরা আপত্তি জানাতেন। নিজস্ব মতামত দিতেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি আর সংস্কৃতি এই দুটি শব্দ নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য জানাননি? এই যে জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, 'চোখ আর চুলের সংকেতে মেধাবিনী', এর অর্থ কী? এ তো উন্মাদের বাক্যচ্ছটা! রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এরকম যথেচ্ছাচার প্রশ্রয় পেত? 'বিচিত্রা ভবনে মিটিং বসতো না? মামুন ঐ জীবনানন্দের কবিতা পড়া বন্ধ করে দিলেন, ঢাকায় একবার যুবলীগের একটি সভায় মোহম্মদ তোয়াহা, আলি আহাদের সামনে কোনো প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের উল্লেখ শুনে তিনি বলেছিলেন, ঐ

কবির কথা বাদ দাও, নিজেদের কারুর কথা বলো, পশ্চিম বাংলার এ কবি পলায়নবাদী। তাই শুনে একদল ছাত্র হৈ হৈ করে বলে উঠেছিল, মামুন ভাই, আপনি চুপ করুন, চুপ করুন! আপনারা ব্যাকডেটেড, আপনাদের যুগ শেষ! জীবনানন্দ শুধু পশ্চিম বাংলা বা পূর্ব বাংলার নন, তিনি আবহমানকালের বাংলার।

সেই সভায়, মামুন মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন। তিনি ব্যাকডেটেড? সব কটি প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত, যে-কোনো রকম বিপজ্জনক পদক্ষেপেই তিনি পিছ-পা হন না, তবু তাঁকে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা, যাঁদের আজকাল 'ছাত্র সমাজ' বলে অভিহিত করা হয়, তারা ব্যাকডেটেড বলে দিল? তার পর থেকে মামুনের কলমে আর কবিতা আসে না। কবিতা হচ্ছে। অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, শুধু স্মৃতির চর্বিত চর্বন তো নয়, এটুকু মামুন জানেন।

রাজনীতি আর নয়, কবিতাও নয়, তা হলে বাকি রইলো কী? মামুন উটপাখির মতন এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সময়ে সংসারে মুখ খুঁজতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও স্বস্তি পাচ্ছেন না। ফিরোজার অনেক গুণ আছে বটে, তবু তিনি বিরক্তিকর, পারতপক্ষে মামুন তাঁর সঙ্গে কথা বার্তা এড়িয়ে চলেন। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, কিন্তু গৃহিণীর সঙ্গেই যদি সময় কাটাতে ভালো না। লাগে, তা হলে আর সংসারে থাকার কোনো তাৎপর্য রইলো কী?

ফিরোজার প্রথম বিবাহের সময় নাম ছিল নাদেরা, মামুন সেই নাম বদল করে দেন। ফিরোজার অন্য অনেক গুণ থাকলেও তিনি বড় বেশি ধর্ম ধর্ম করেন, অনেকটা বাতিকগ্রস্তের মতন। কয়েকদিন আগে ঈদ উৎসব প্রতিপালিত হয়েছে, তার আগে ফিরোজার নিবন্ধে। মামুনকে প্রতিদিন রোজা রাখতে হয়েছে। মামুন নিষ্ঠার সঙ্গে সব কিছু করেছেন বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রতিবাদ ছিল। নামাজে বসার সময়েও মন যদি বিক্ষিপ্ত থাকে, তাহলে সে প্রার্থনার মূল্য কতটুকু? মামুনের পিতা মরহুম সৈয়দ আবদুল হাকিম শেষ জীবনে কট্টর ধর্মপন্থী হয়েছিলেন বলে মামুনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার ঠিক বিপরীত। মামুন ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হতে হতে প্রায় নাস্তিকতার প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। ছাত্র জীবনে অধিকাংশ বন্ধুই ছিল হিন্দু, তাদের প্রভাবও অনেকটা কাজ

করেছিল। হিন্দু যুবকেরা তখন বোলশেভিজম-এর দিকে। ঝুঁকেছে। নাস্তিক হওয়াই তাদের মধ্যে ফ্যাসান।

কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে মামুনের ঘোর ভাঙে। তখন তিনি বুঝেছিলেন। যে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে নাস্তিকতার কোনো স্থান নেই। একজন গোঁড়া মুসলমান। একজন গোঁড়া হিন্দুকে পছন্দ করতে পারেন, কিন্তু একজন নাস্তিক এদের চোখে ধ্বংসযোগ্য। নাস্তিকতা হলো বিশ্বাসের প্রতি অপমান! ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তার মধ্যে একজন নাস্তিকতা সমর্থকের স্থান থাকতে পারে না। গ্রামে ঘোরার সময় তিনি। কোরান-হাদিস পাঠ করতে লাগলেন মন দিয়ে, বক্তৃতার সময় কায়দা মাফিক উদ্ধৃতিও দিতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মনের গভীরে আর কোনো দিনই ধর্ম-বিশ্বাস প্রোথিত হয়নি।

ফিরোজার আর একটি দোষ তিনি গান-বাজনা একেবারে পছন্দ করেন না, বাড়িতে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজালেও তাঁর আপত্তি। হায়, মামুন বড় সাধ করে নাদেরার নাম বদল করে ফিরোজা রাখলেন, সেই ফিরোজাই কিনা সঙ্গীতের শত্রু। বিয়ের প্রথম দু'এক বছর সে রকম কিছু বোঝা যায়নি, পুরো সংসারের কত্রী হবার পর তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে, ইদানীং তাঁর শরীরে যত মেদ লাগছে, তত তাঁর মতামত সুদৃঢ় হচ্ছে। ঈষৎ স্থূলকায়া হলেও ফিরোজা বেশ রূপসী। চাঁপা ফুলের মতন গায়ের রং, টিকোলো নাকটি সোনার নাকছাবিতে বড় সুন্দর মানায়। ফিরোজার মেয়ে দুটিও হয়েছে ফুটফুটে, বাচ্চা হুরী পরীর মতন।

কবিতা রচনা বন্ধ হয়ে গেলেও মামুনের সঙ্গীত-প্রীতি এখনো তীব্র। তাঁর নিজের গলাতেও সুর আছে, গাইতে পারেন ভালোই। 'যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে', এই গানটি কোথাও শুনলে বা মামুন নিজে গাইলে অমনি মনে পড়ে যায় বুলা অর্থাৎ গায়ত্রীর কথা। দায়ুদকান্দিতে সত্যসাধন চক্রবর্তীর বাড়িতে সেই কিশোরীর কণ্ঠে প্রথম এই গানটি শুনেছিলেন, আজও সেই কণ্ঠস্বর কানে বাজে। এতগুলি বছর কেটে গেল তবু বুলার স্মৃতি অম্লান রয়ে গেছে। সেই স্মৃতির মধ্যে দুঃখ-জ্বালা নেই বরং তা মধুর। বুলার বিয়ে

হয়েছিল গ্রামের বাড়িতে, মামুনও সেই সময় গ্রামে উপস্থিত ছিলেন এবং নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নববধূর সাজে কী যে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল বুলাকে, চন্দনের ফোঁটা দেওয়া তার লজ্জারুণ মুখোনি যেন একটা স্বর্গীয় কুসুমের মতন। তার স্বামীটিও খুব রূপবান, দু'জনে যেন একেবারে রাজযোটক। বুলার হাতে মামুন যখন তার উপহারটি তুলে দিতে গিয়েছিল, তখন বুলা মুখ তুলে বলেছিল, এসেছেন মামুনদা!

কলকাতায় ফিরে মামুন প্রতাপের কাছে বুলার বিবাহের সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। শুনতে শুনতে প্রতাপ জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোর খুব কষ্ট হয়েছে, না রে মামুন? তুই কোন আক্কেলে ওর বিয়ে দেখতে গেলি?

মামুন অবাক হয়ে বলেছিলেন, কষ্ট? কেন একথা বললি? না তো, আমার বেশ আনন্দ হয়েছে। বুলার অমন ভালো বিয়ে হয়েছে। সেটা তো আনন্দের কথা!

প্রতাপ বলেছিলেন, তুই বুলাকে ভালোবেসেছিলি। তুই ওকে নিয়ে কবিতা লিখেছিস।

–আমি তো তাজমহল নিয়েও কবিতা লিখেছি। তা বলে কি তাজমহলে আমার বেডরুম বানাতে চাই? সুন্দরকে একটু দূরে রেখেই বন্দনা করা ভালো।

প্রতাপ কথাটা বোধহয় ঠিক ধরতে পারেননি। প্রতাপ কবিতার মর্ম বোঝেন না। তিনি। মুখটা অন্যপাশে ফিরিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

বুলারা এখন কোথায় আছে কে জানে! সুখে আছে নিশ্চয়ই।

স্মৃতির মুখচ্ছবিতে কালের মালিন্য লাগে না। বিয়ের পরেও বুলাকে মামুন আর একবার দেখেছিলেন। তখন বুলার বয়েস উনিশ কুড়ির বেশি নয়। বুলার সেই বয়েসের চেহারাই তাঁর মনশ্চক্ষে ভাসে। পশ্চিম বাংলার পত্রপত্রিকা দেখলে মামুন আগ্রহের সঙ্গে খুঁজে দেখেন তাতে ধুলার কোনো উল্লেখ আছে কি না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল গায়িকা হিসেবে বুলা একদিন বিখ্যাত হবেই। হয়তো বিয়ের পর সে আর গানের চর্চা রাখেনি, কিংবা

স্বামীর সঙ্গে বোধহয় থাকে পশ্চিমবাংলা ছাড়িয়ে আরও দূরে কোথাও! প্রতাপের সঙ্গে বেশ কিছুদিন মামুনের চিঠি পত্রে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু প্রতাপ কোনো চিঠিতে বুলার উল্লেখ করেননি।

তুলনামূলক বিচারে বুলার চেয়ে ফিরোজার, সৌন্দর্য কোনো অংশে কম নয়। রূপ-উপাসক মামুন এক রূপবতাঁকেই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেয়েছেন, কিন্তু সেই জীবনসঙ্গিনী তাঁর মর্ম-সহচরী হতে পারলো না। এ দুঃখ কারুকে জানাবার নয়! ফিরোজা একেবারেই ঘরোয়া, সংসারের চৌহদ্দির বাইরে তাঁর চোখ যায় না। এই সংসারের মধ্যে মামুন এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছেন। কিন্তু এর পর কোন পথে যাবেন?

অন্ধকার হয়ে এসেছে, গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উড়ছে জোনাকি। বাতাসে একটা বৃষ্টি বৃষ্টি সোঁদা গন্ধ। এক নৌকোর মাঝি হেঁকে হেঁকে ডাকছে যেন কাকে।

মামুন গুন গুন করে গান ধরলেন, ‘দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো.... ’ ।

১৩ বাগানে নতুন গোলাপ চারা

বাগানে নতুন গোলাপ চারা পোঁতবার জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটা সাপ বেরিয়েছে। মালি ও দারোয়ানেরা সাপটাকে পিটিয়ে মেরেছে সঙ্গে সঙ্গে, বাড়ির সবাই সেটাকে দেখতে এসে দাঁড়িয়েছে নিচের বড় বারান্দাটায়।

বেশ লম্বা একটা দাঁড়াস সাপ, শীতকালে ওরা এমনিতেই নেতিয়ে থাকে,একটা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, তাও বেচারি নিস্তার পেল না। ওকে মারবার জন্য বেশি বীরত্বেরও প্রয়োজন হয়নি। মালির কোনো ঘেন্নাপিত্তি নেই, সে মৃত সাপটাকে হাতে ধরে তুলে দেখাচ্ছে সেটা কত বড়।

সত্যেন বুলার দিকে ফিরে বললেন, আমাদের নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে একটা এই রকম বাস্তুসাপ ছিল, তোমার মনে আছে?

নারায়ণগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতে বুলা বেশি দিন থাকেন নি, ছুটির সময় কয়েকবার গিয়েছেন মাত্র, সেখানকার বিশেষ কিছু স্মৃতি নেই তাঁর। বিয়ের পর তাঁর স্বামী নরেন কলকাতাতেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। বুলা মুখটা ফিরিয়ে নিলেন, তাঁর গা শিরশির করছে ঐ মড়া সাপটাকে দেখে। না দেখাই উচিত ছিল।

বিভাবতী বললেন, এটা তো পুরুষ সাপ, এর নিশ্চয়ই জোড়াটা রয়ে গেছে। ওরে বাবা, সেটা তো এখন রেগে থাকবে। ছেলে-মেয়েরা বাগানে খেলা করে–

সত্যেন বললেন, এখন শীতকাল, ভয়ের কিছু নেই।

মালি-দারোয়ানদের দিকে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বললেন, অন্য সাপটা খুঁজে বার করো। যে পাবে তাকে আমি আরও দশ টাকা দেবো প্যাঁড়া খাবার জন্য!

তিনি যে ভয় পান না সেটা বোঝাবার জন্য সত্যেন নিজেই নেমে এলেন বাগানে এবং হাতের ছড়িটা দিয়ে পেটাতে লাগলেন ঝোঁপঝাড়। কলকাতায় বিভাবতীর শরীর সারছে না বলে তাঁরা এখানে তিন মাসের জন্য থাকতে এসেছেন। অযত্নে পড়ে থাকা বাড়িটিকে সাজাচ্ছেন নিজেদের পছন্দ মতন। এই বাড়িটা একেবারে কিনে ফেলার চিন্তাও সত্যেনের মাথায় ঘুরছে। বিভাবতাঁকে তাহলে এখানেই রাখা যায়, তিনিও মাঝে মাঝে এসে থেকে যাবেন। পাবনার এক প্রাক্তন জমিদার-পরিবার এ বাড়ির মালিক, তাদের অবস্থা এখন খুব পতনশীল, এত বড় বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতাই নেই তাদের। হাজার তিরিশেক টাকা দর দিলেই তারা লুফে নেবে মনে হয়।

মানুষের জীবনে সব দিক থেকে সুখ আসে না,। পশ্চিম বাংলায় এসে স্থায়ী হবার পর সত্যেনের আর্থিক সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি হয়েছে যথেষ্ট, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, টালিগঞ্জ সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির চেয়ারম্যান, অল বেঙ্গল মিউজিক

কনফারেন্সের একজন পেট্রন, ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার, কলকাতার উঁচু সমাজের মানুষেরা তাঁকে চেনে জানে; এহ সবই তাঁর অহমিকায় সুখ-প্রলেপ দেয়, কিন্তু তাঁর দাম্পত্য আনন্দ নেই। গত দশ বছর ধরে তাঁর স্ত্রী হাজার রকম রোগে ভুগছেন, সেই জন্য মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে উঠছে। গানবাজনার আসর কিংবা পার্টিতে যাওয়ার কোনো উৎসাহই নেই বিভাবতীর। স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করেন নি সত্যেন, চিকিৎসার চূড়ান্ত করেছেন, তবু তাঁর ঠিক যে কী অসুখ তা বোঝা. যায় না, চেহারাটা যেমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, সেই রকমই সব সময় মন-মরা ভাব।

সত্যেন পেছনে ফিরে বুলার দিকে হাতছানি দিয়ে বললেন, এদিকে শোনো। একটা জিনিস। দেখবে এসো।

বুলা আড়চোখে বিভাবতীর দিকে তাকালেন। সত্যেন ইদানীং এ রকম ব্যবহার শুরু করেছেন, স্ত্রীকে বাদ দিয়ে বুলাকে আলাদা করে প্রায়ই ডাকেন। সম্পর্কে দেওর। একটু ফাজলামি-মস্করা করার অধিকার তাঁর আছে ঠিকই, কিন্তু বিভাবতী যে এটা পছন্দ করেন না, তা বুলা বুঝতে পারেন।

বুলা বললেন, চলো দেখে আসি, ওখানে আবার কী!

বিভাবতী বললেন, তোমায় ডাকছে, তুমি যাও, আমার মাথার যন্তোন্না হচ্ছে।

বুলা বললেন, আমিও এখন স্নান করতে যাবো।

সেই কথাটা সত্যেনকে জানিয়ে বুলা পিছন ফিরতে গিয়ে দেখলেন সুরকি-ঢালা পথ দিয়ে হেঁটে আসছে পিকলু আর বাবলু। বিভাবতীর বোনপো মলয়ের সঙ্গে ওদের বেশ ভাব হয়েছে, এ বাড়িতে ওরা প্রায়ই আসে। বেশ সুন্দর ছেলে দুটি। ওদের দেখামাত্র বুলার নিজের ছেলের কথা মনে পড়লো। তাঁর ছেলের ডাকনাম বাপ্পা, আর তার ভালো নাম জ্যোতির্ময়। তার বয়েস এই বাবলু আর পিকলুর মাঝামাঝি, ক্লাস নাইনে পড়ে। সে

কিছুতেই দেওঘরে এলো না। জ্যোতির্ময় বয়েজ স্কাউটের মেম্বার, তাদের স্কুলের স্কাউট টিম এই সময়ে দার্জিলিং-এ এক্সকারশানে যাচ্ছে, জ্যোতির্ময় জেদ ধরে সেখানেই গেল।

জ্যোতির্ময়ের বাবা নেই বলে বাড়ির সবাই তাকে অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয় দেয়। বাচ্চা বয়েস থেকেই সে বুঝে গেছে যে, সে যা চাইবে তাতে কেউ না বলবে না। সেই জন্য সে যখন। তখন আবদার করে, ইচ্ছে করে জিনিসপত্র ভাঙে, বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তবু কোনো শাস্তি পায় না। বুলা বুঝেছিলেন, তাঁর ছেলের শিক্ষা ঠিক হচ্ছে না, তিনি নিজে একটু কঠোর হয়ে ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে ফল হলো উল্টো, ছেলে আর মায়ের কাছ ঘেঁষতে চায় না।

নরেন যখন বিলেতে ফিরে যান মেমস্ত্রীর কাছে, তখন জ্যোতির্ময়ের বয়েস আড়াই বছর। বাবাকে তার তেমন মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু সে জানে তার বাবা কোথায় আছেন। প্রায়ই সে বলে, স্কুল ফাঁইনাল পাশ করেই সে বিলেতে বাবার কাছে চলে যাবে। বুলা বুঝতে পেরেছেন, ছেলেকে আটকানো যাবে না। ঐ দেশটা বেড়াল-চোখো মেয়েতে গিগি করে। ওখান থেকে কি ছেলে আর ফিরে আসতে পারবে? বাবার কাছেই বা সে কী রকম ব্যবহার পাবে কে জানে! বিদেশিনী সৎ মা কি ওকে বাড়িতে স্থান দেবে? এই সব কথা ভাবলেই বুলার বুকের মধ্যে গুড় গুড় শব্দ হয়। সমস্ত দুনিয়াটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

বুলা হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, বাবলু, শোনো–

বাবলুর সাপ দেখাতেই বেশি আগ্রহ, সে সেখানে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললো, যাচ্ছি বুলামাসি।

পিকলু সাপটার দিকে এক নজর দেখে এগিয়ে এলো বুলার দিকে।

এই ছেলেটি বড় বেশি লাজুক, বুলা লক্ষ করেছেন যে, পিকলু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না, চোখ নিচু করে থাকে।

পিকলু বুলার পায় হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তিনি বললেন, আরে, আরে, রোজ রোজ দেখা হলেই প্রণাম করতে হবে নাকি!

পিকলু তবু বুলার পা স্পর্শ করলো।

পিকলুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বুলা জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়ির সব খবর ভালো তো!

তাদের বাড়ির অবস্থা এখন খুবই খারাপ, অসিতবরণের মৃত্যু সংবাদ কোনোক্রমে সুহাসিনীর কানে পৌঁছে গেছে, তারপর থেকে তিনি এত কান্নাকাটি করছেন যে, প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠেছেন, তাঁকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না, কিন্তু এই সব কথা বুলাকে জানাতে ইচ্ছে করলো না পিকলুর। দুঃখের খবর, খারাপ খবর কারুর কারুর সামনে এলে খুব অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। বুলার পা ছুঁয়েই পিকলুর সারা শরীরে একটা শিহরণ এসেছে। গরম হতে শুরু করেছে তার সব কটা আঙুলের ডগা।

সে ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

বাবা এখানে নেই বলে পিকলুবাবলুর স্বাধীনতা অনেক বেড়ে গেছে। আজ ভোরে দুই ভাই এসেছিল নন্দন পাহাড়ে, রাস্তা তাদের মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে। তখনও সূর্য ওঠেনি, আধো-অন্ধকারের মধ্যে দু-জনে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে উঠেছিল ওপরে। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে তারা সূর্যোদয় দেখলো। ঠাণ্ডা, নীল আলোর মধ্য থেকে যখন রক্তিম গোলকটি উঠে এলো, তখন হঠাৎ বুলা মাসির কথা মনে পড়েছিল পিকলুর। এই দৃশ্যটির সঙ্গে বুলা মাসির মুখের খুব মিল আছে। এ রকম মনে হওয়ায় পিকলু নিজেও খুব অবাক হয়েছিল। অন্য কেউ তো এই মিলটা দেখতে পাবে না, অথচ সে স্পষ্ট দেখছে।

পিকলু সাহস করে এখন বুলা মাসির মুখের দিকে তাকালো। হ্যাঁ মিল আছে, ভোরের ঠাণ্ডা নীল আলোর সঙ্গে, প্রথম সূর্য ওঠার সঙ্গে। এই কথাটা বুলা মাসিকে জানাতে খুব ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু কেউ যেন তার জিভ টেনে ধরেছে।

একটা কিছু তো বলতে হবে, তাই সে বললো, আমরা নন্দন পাহাড়ে সানরাইজ দেখতে গিয়েছিলাম। আপনি দেখেছেন কখনো?

বুলা ছেলেমানুষের মতন উৎসাহিত হয়ে বললেন, ওমা, কই না তো! তোমরা গেলে, যাবার সময় আমাদের ডেকে নিয়ে গেলে না কেন?

-আপনি যাবেন? কাল যদি আবার যাই?

-হ্যাঁ। ঠিক আসবে তো, আমি তা হলে তৈরি হয়ে থাকবো। তোমরা সেই সকালে বেরিয়েছে, তারপর আর বাড়ি ফেরোনি? নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে তোমাদের, ভেতরে এসে বসো।

ওদিকে বাগানের মধ্যে একটি অতসীগাছে সত্যেন একটা বেশ বড় মতন টিপ পোকা দেখতে পেয়েছেন, চকচকে সবুজ ধাতুর মতন তার গা, তার ওপরে নানা রঙের ফোঁটা। সেটা তিনি বুলাকে দেখাতে চান। তিনি আবার বুলাকে ডাকলেন।

বুলা এবার আর উপেক্ষা করতে না পেরে নেমে এলেন বাগানে। ততক্ষণে টিপ-পোকাটা উড়ে গেছে। সত্যেন বললেন, যাঃ, তুমি দেরি করলে.... .

তারপর কণ্ঠস্বর একটু নিচু করে বললেন, আমার জরুরি কাজ পড়েছে, দু এক দিনের মধ্যে কলকাতায় যেতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে ফিরবে?

বুলা জিজ্ঞেস করলেন, আর বিভা?

সত্যেন বললেন, ও তো বেশ কিছুদিন থাকবে। এখানকার জল খেয়ে উপকার হচ্ছে যখন।

বুলা বললেন, আমিও এখানেই থাকবো।

-তুমি আমার সঙ্গে চলো না কলকাতায়।

–না, আমার এখানেই ভালো লাগছে।

সত্যেন স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন বুলার দিকে। বুলা চোখ সরিয়ে নিলেন। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সত্যেনের কণ্ঠস্বর ইঙ্গিতময়। বুলা বুঝতে পারছেন যে, সত্যেন তাঁর জীবনে অশান্তি ডেকে আনছেন। তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

পিকলুর মনে হলো, আজকের সকালটি তার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান। কালকের সকালটি আরও ভালো হবে। কাল বুলা মাসি তার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছেন। কাল সে বাবলুকে আনবে না, একা আসবে। ঠাণ্ডা নীল আলোর মধ্যে রক্তিম সূর্যোদয় দেখে বুলা মাসি কি চিনতে পারবেন নিজেকে? সেটা জানার জন্যই তার তীব্র কৌতূহল। সে তৃষ্ণার্তের মতন তাকিয়ে রইলো বুলা মাসির দিকে।

বুলা বারান্দায় উঠে বললেন, তুমি একটু বসো পিকলু, ছোট ভাইকে ডাকো, আমি মলয়কে পাঠিয়ে দিচ্ছি!

ভেতরে চলে যেতে যেতে বুলার মনে হলো, তাঁর নিজের ছেলেটা যদি এই পিকলুর মতন হতো! কী নম্র আর বিনয়ী, গুরুজনদের দিকে চোখ তুলে কথা বলে না। পড়াশুনোতেও কত ভালো! তাঁর ছেলে জ্যোতির এই বয়েসেই কথার মধ্যে একটা চ্যাটাং চ্যাটাং ভাব আছে।

দোতলায় উঠে এসে বুলা নিনার হাত দিয়ে ছেলেদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আর নিচে নামলেন না। মনটা ক্রমেই বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে। সকালবেলাতেই একটা মরা সাপ দেখার কোনো মানে হয়?

মন খারাপের সময় বাথরুমটাই শ্রেষ্ঠ জায়গা। গরম জলে স্নান করা তাঁর অভ্যেস, এখন জল গরম করতে সময় লেগে যাবে, তিনি ঠাণ্ডা জলেই স্নান সেরে নেবার জন্য ঢুকে পড়লেন।

প্রথমে খানিকক্ষণ কাঁদলেন নিঃশব্দে। ঠিক যে দুঃখে তা নয়, অপমানবোধে। সত্যেন ও রকম ফিসফিসিয়ে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে তাঁকে কলকাতায় যাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?

অনেকদিন পর তাঁর স্বামী নরেনের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ঐ মুখ বুলা মনে রাখতে চান না, তবু ফিরে ফিরে আসে। সুশ্রী, প্রফুল্ল মুখচ্ছবি তাতে কোনো পাপের রেখা নেই। নরেনের সঙ্গে চার বছর বিবাহিত জীবনে একদিনের জন্যও বুলা স্বামীকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেননি। আশ্চর্য, কোনো মানুষ এমনভাবে তার জীবনের একটা অংশ গোপন রাখতে পারে? বুলার সঙ্গে তাঁর কত গল্প হয়েছে, প্রবাস জীবনের কত মজার মজার কাহিনী শুনিয়েছেন কিন্তু কখনো ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় নি যে বিলেতে নরেনের আর একটি স্ত্রী রয়েছে। ও পক্ষের দুটি ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের কথাও কি নরেনের মনে পড়তো না? তিনি কি ভেবেছিলেন যে, ইংরেজ স্ত্রীকে ঠকিয়ে নিজের দুটি সন্তানকেও তিনি চিরকালের মতন বিস্মৃত হতে পারবেন?

নরেনকে বুলার বাপের বাড়ির সবারই খুব পছন্দ হয়েছিল। তাঁর স্বভাবে বেশ একটা মিষ্টত্ব ছিল। দোষের মধ্যে ছিল তাঁর আলস্য। শুয়ে গড়িয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন, জীবিকা অর্জনের কোনো আগ্রহ ছিল না। অবশ্য পারিবারিক আয় ছিল যথেষ্ট, সংসারে কখনো টাকার টান পড়েনি। ডিটেকটিভ বই পড়তে পড়তে শেষ হলো না বলে সেদিন কোর্টে যাওয়া হলো না, এ রকম কোনো ব্যারিস্টারের কথা কেউ কখনো শুনেছে!

সেই মেম বউ এসে পড়ে যখন ঝাট বাধায় তখন বুলা বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। অনেকে বলে, সেটাই নাকি বুলার ভুল হয়েছিল, স্বামীর পাশটি আঁকড়ে থাকা উচিত ছিল, কিছুতেই স্বামীকে ছাড়া ঠিক হয়নি। কিন্তু তখন বিশ্বাসভঙ্গের আঘাত এমন সাঙ্ঘাতিক তীব্রভাবে লেগেছিল যে বুলা যে-কোনো মুহূর্তে আত্মহত্যা করে ফেলতে পারতেন। কলেজে পড়ার ইচ্ছে ছিল বলে বুলা প্রথমে বিয়ে করতে চান নি সে সময়, কিন্তু যখন বিয়ে হলোই, তখন তিনি স্বামীকে সমস্ত মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন, অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছেন নিজেকে স্বামীর যোগ্য করে তোলার। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষয়িত্রী রেখে

ইংরিজি উচ্চারণ শিখেছেন, কাঁটা চামচে খাওয়া অভ্যেস করেছেন। মন যদি ভেঙে যায় তবে স্বামীকে জোর করে আটকে রেখেই বা কী লাভ! নরেন যখন চলে যান, বুলার সঙ্গে একবার দেখাও করে যাননি, ওদেশে গিয়ে একটাও চিঠি লেখেননি। মাঝে মাঝে শুধু সত্যেনকে চিঠি লেখেন নিজের অংশের টাকা চেয়ে।

এগারো বছর হয়ে গেল, আর কেউ নরেনের আসার আশা করেন না। এর পর ফিরে এলেও কি বুলা তাঁকে গ্রহণ করতে পারবেন? যে ফিরে আসবে সে তো অন্য মানুষ, এগারো বছর আগে সে বুলার সমস্ত সাধ-স্বপ্ন ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।

বুলা সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া বন্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর মায়ের প্রবল আপত্তি। বুলা অবশ্য বলেছে আর এক বছর কেটে গেলে সে আর কিছুতেই মানবে না, শাস্ত্র অনুসারেই। ত দ্বাদশ বর্ষ নিরুদ্দিষ্টকে মৃত বলে গণ্য করা উচিত।

বুলার বাবার অকাল মৃত্যু হয়েছে, মা থাকেন ছোট ভাইয়ের সংসারে। অল্প বয়েসেই চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে বলে বুলার ছোট ভাই বিমান বেশি লেখাপড়া শিখতে পারেনি, তার চাকরিটাও ছোট। তার বাড়িতে গিয়ে বুলা দু-একদিনের বেশি থাকতে চান না। টালিগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতেই কিছুটা ভাগ পেয়েছেন, সে বাড়িতে সত্যেন ছাড়া আরও তিনজন ভাসুর-দেওরের পরিবার আছে, দূর সম্পর্কের আশ্রিতও বেশ কয়েকজন। পারিবারিক এস্টেট থেকে বুলা ও তার সন্তানের ভরণ-পোষণের খরচ দেওয়া হয়, বুলা নিজস্বভাবে তাঁর জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এদেশে পুরুষরক্ষী ছাড়া কোনো যুবতাঁকে কেউ নিরালায় থাকতে দেয় না।

সত্যেনের অন্য রকম মতিগতি দেখা যাচ্ছে অতি সম্প্রতি, এর আগে সত্যেন ব্যবসাপত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতেন, বুলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতো খুব কম। বুলার জীবনে প্রথম উপদ্রব ঘটাতে আসেন নরেনেরই এক বন্ধু ত্রিদিব, কলকাতার তিনি একজন অ্যাডভোকেট। নরেন যখন উত্তর কলকাতায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন, তখন সেখানে ত্রিদিব প্রায়ই আসতেন। বেশ রগুড়ে ধরনের মানুষ, খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে খুব শৌখিন,

প্রায়ই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে খাবারের প্যাকেট নিয়ে আসতেন বন্ধুর বাড়িতে। ত্রিদিব বিবাহিত কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে কোনোদিন দেখা যায়নি, তাঁদের বাড়িতে পর্দা প্রথা। এক একদিন আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতেন রাত এগারোটার পর। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, কলকাতা শহর প্রায় ফাঁকা, লাস্ট ট্রামে দু-তিন জনের বেশি যাত্রী থাকে না, ত্রিদিব তাতেও ভয় পেতেন না।

নরেন বিলেতে প্রথমা স্ত্রীর কাছে ফিরে যাওয়ায় ত্রিদিব মর্মাহত হয়েছিলেন। বুলাকে তিনি বোঝাতে লাগলেন যে, নরেনকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাকে শাস্তি দিতে হবে। অন্তত বিলিতি আইন অনুযায়ী তাকে খোরপোশ দিতে হবে। বুলা যে এসব কিছুতেই আগ্রহী নন ত্রিদিব তা শুনবেন না। ত্রিদিব নাছোড়বান্দা। এমন কি বুলাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিলেত যাবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

প্রথম দু-তিন বছর বুলা যখন বাবা-মায়ের কাছে থাকতেন, তখন ত্রিদিব সেখানে যেতেন মাঝে মাঝে। তারপর বুলা যখন টালিগঞ্জের বাড়িতে চলে এলেন, সেখানে ত্রিদিব আসতে লাগলেন রবিবার ছাড়া আর প্রত্যেকদিন। বুলার ছেলের জন্য তিনি আনেন নিত্য নতুন উপহার আর বুলার জন্য রাশি রাশি খাবার। সন্ধেবেলা এসে তিনি অনেকক্ষণ বসে থাকেন, প্রত্যেকদিন প্রায় একই ধরনের কথা। বুলাকে গান গাইবার জন্য ঝুলোঝুলি অনুরোধ। ক্রমে তাঁর আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে বুলাকে তিনি রক্ষিতা হিসেবে পেতে চান। জানবাজারে তাদের একটি বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে, সেখানে বুলা অনেক আরামে থাকতে পারবেন, সে গানবাজনাচর্চারও কোনো অসুবিধে হবে না। ত্রিদিব যে-ধরনের পরিবারের মানুষ সেখানে বাড়ির বউকে ঘরে বন্দী রেখে বাইরে একটি মেয়েমানুষ পোষ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বুলা প্রথম প্রথম বুঝতে পারেন নি। ত্রিদিবের পীড়াপীড়িতে একদিন দু-দিন গান শুনিয়েছেন মাত্র, অন্যদিন ভদ্রতা রক্ষা করেছেন শুধু। তার মধ্যেই তাঁর নামে কুৎসা রটে যায়। স্বামী চলে গেলেও বুলার শরীর ভাঙেনি, কোনো রকম একটানা রোগ হয়নি, এটা

যেন তাঁর অপরাধ। নারীর শরীরে যৌবন থাকলেই তা পুরুষের খাদ্য হবে, এটাই যেন নিয়ম।

ত্রিদিব একদিনই মাত্র বুলার কোমরে হাত রেখেছিলেন। এতগুলি বছরে বুলার সেইটুকুই মাত্র পরপুরুষ স্পর্শ। ত্রিদিবের মত আরও অনেক লোভী এসেছে, বুলা প্রত্যেককেই নিজের শরীরের থেকে অন্তত এক হাত দূরত্ব থাকতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কঠোরভাবে সংযম পালন করে চলেছেন, যদিও তাঁর বিশেষ কোনো ব্রত নেই। কোনো অহংকারও নেই, সংযমের জন্যই যেন সংযম। কেউ তাঁর শরীরটাকে লোভের সামগ্রী মনে করছে, এটা বুঝতে পারলেই বুলার বড় অপমান হয়।

সত্যেনের সঙ্গে এতদিন বেশ পরিষ্কার সম্পর্ক ছিল। বড় গিন্নি সম্বোধন করে মাঝে মাঝে কৌতুক করতেন, কিন্তু কখনো শালীনতার সীমারেখাঁটি লঙঘন করেন নি। দেওঘরে সত্যেন প্রায় জোর করেই নিয়ে এসেছেন বুলাকে। এসে বেশ ভালোই লাগছে তাঁর। কিন্তু এখানে এসে। সত্যেন প্রায়ই আড়ালে বুলার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন, যখন তখন হাত চেপে ধরেন। প্রত্যেক বারই বুলার কান্না পায়। বিভাবতী যে বুলার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠছেন দিন দিন, সে জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। মেয়েরা সব বুঝতে পারে।

দেওঘরে এসে প্রতাপদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কতদিন পর। প্রতাপদার ওপর কোনো রাগ বা অভিমান নেই বুলার। পরে বুলা চিন্তা করে বুঝতে পেরেছেন, প্রতাপদা সেদিন ঠিকই করেছিলেন। কলেজে পড়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বুলা সে সময় বিয়েটা ভাঙতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন প্রতাপদার পক্ষে তাঁর বাবাকে এসে সে বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। দুই পরিবারেই তা হলে অনেক গণ্ডগোল হতো।

রাগ নেই, অভিমান নেই তবু প্রতাপদার সঙ্গে কেন সহজ হতে পারছেন না তা বুলা নিজেই বুঝতে পারেন না। তাঁর মনে হয়, প্রতাপদার সঙ্গে খানিকটা দূরত্ব রেখে দেওয়াই ভালো, বেশি কাছে এলে প্রতাপদাও যদি ত্রিদিব. বা অন্যদের মতন হয়ে যান!

বাথরুমের জানলা দিয়ে দূরের একটা সবুজ মাঠ দেখা যায়। ওটা বাড়ির পেছন দিকে। ওদিকে কোনোদিন যাওয়া হয়নি। এই জানলা দিয়ে ঐ জায়গাটা সবুজ মখমল পাতা স্বর্গীয় উদ্যানের মতন মনে হয়। অনেক প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছে, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে এ রকম তিনটি ছাগলছানা লাফালাফি করছে সেখানে। অশ্রুসজল চোখে বুলা সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। ওখানে তিনি কোনো দিন যাবেন না ঠিক করলেন। এ রকম কিছু কিছু জায়গা দূরে থাকা ভালো।

১৪ ওপরতলায় নিজেদের অংশটায়

ওপরতলায় নিজেদের অংশটায় তালা বন্ধ করে মেয়ের হাত ধরে সুপ্রীতি নেমে এলেন নিচে। তাঁর শরীর সাংঘাতিক দুর্বল, তিনি গত কয়েকদিন ধরে খাওয়াদাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শরীর অশক্ত হলেও তাঁর মন শক্ত আছে, তাঁর চোখে জল নেই। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিয়েছেন। এক পা এক পা করে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, একবারও ফিরে তাকালেন না।

কেউ তাঁকে বিদায় জানাতে এলো না, তিনিও কারুর কাছে যাননি। বাড়ির সব মানুষ যে-যার ঘরে দরজা বন্ধ করে রয়েছে, গোটা বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ, এমনকি যে কাচ্চাবাচ্চাগুলো সর্বক্ষণ হৈ চৈ করে তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। যদিও সবাই জানে যে সেজো তরফের গিন্নি আজ বিদায় নিচ্ছেন।

নিচের দালানে এ বাড়ির ঝি-চাকরেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কারুর কারুর চক্ষু ছলছলে, এরা সুপ্রীতিকে ভক্তি করে। এরা এক এক করে মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে গড় করলো, সুপ্রীতি তাদের দুটি করে টাকা দিলেন, কোনো কথা বলতে পারলেন না।

বৈঠকখানা পেরিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে সুপ্রীতি একটু থমকে দাঁড়ালেন, কিছু যেন চিন্তা করলেন। তারপর ঈষৎ ধরা গলায় তিনি মেয়েকে বললেন, আমি হয়তো এ বাড়িতে আর কোনোদিন ফিরে আসবো না, কিন্তু এটা তোর বাবার বাড়ি, তুই আসবি।

তুতুলের মুখোনি এতদিন পর্যন্ত ছিল গোলগাল, গত কয়েকদিন ধরে সেই মুখ হয়ে গেছে ধারালো ও কৌণিক। তার শরীর ও মন ছিল নরম তুলতুলে, সেই জন্য তুতুল নামটি খুব মানানসই ছিল, ছোটবেলা থেকেই সবাই তার গাল টিপে আদর করে বলতো, মেয়েটা যেন ঠিক মোমের পুতুল। গত কয়েকদিন তার মনোজগতে যে দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে, তার কারণ শুধু তার বাবার মৃত্যু-ঘটনাই নয়। এতদিন পর্যন্ত সে ছিল একটা গল্পের বইয়ের জগতে, হঠাৎ যেন। এক ফুৎকারে সমস্ত রঙিন বুদবুদ উড়ে গেল, সে দেখতে পেল কদর্য, নিষ্ঠুর, খলতাপূর্ণ এমন সব দৃশ্য, যার নাম বাস্তব। তুতুলের বয়েস সবে চোদ্দ পেরিয়েছে, তার বয়েসী অন্য ছেলে মেয়েদের তুলনায় এই বাস্তব সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ছিল খুবই কম, তার মা তাকে পক্ষী মাতার মতন দুই ডানা মেলে সর্বক্ষণ আগলে রেখেছিলেন। এখন সে দেখতে পেল তার নিকট আত্মীয়দের লোভ, হিংসা, শঠতা, কানে শুনলো স্নেহ-মমতাহীন নিষ্ঠুর ভাষা।

মায়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে সে বেরিয়ে এলো গেটের বাইরে। বুড়ো দারোয়ানটি শুধু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো তাকে দেখে।

প্রতাপ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেননি, তাঁর আর্দালি দয়ারামকে ভেতরে পাঠিয়েছিলেন মাল-পত্র সব বুঝে আনবার জন্য। অসিতবরণের কাকা জলদবরণ ও ওঁদের এক জামাই প্রিয়লাল কুৎসিত ভাষায় তাঁকে অপমান করেছে, তারপরেও প্রতাপকে ও বাড়িতে ঢুকতে হলে লাঠালাঠি করতে হতো। ও বাড়ির সদর থেকে একটু দূরে একটা ট্যাক্সি ডেকে প্রতাপ বাইরে। দাঁড়িয়েছিলেন, দিদিকে দেখে তিনি একবার চক্ষু বুজলেন, দিদির বৈধব্যবেশ তিনি এখনো সহ্য করতে পারছেন না, তারপর চোখ মেলে তিনি ট্যাক্সির দরজা খুলে দিলেন।

সুপ্রীতির হাতে একটি কাপড়ের ব্যাগে দুটি চওড়া ভেলভেটের বাক্স, তার মধ্যে রয়েছে তাঁর। যাবতীয় গয়না ও কোম্পানির কাগজপত্র। ট্যাক্সি চলতে শুরু করার পর সুপ্রীতি সেই ব্যাগটি প্রতাপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, খোকন, তোর কাছে এগুলো রাখ।

ঠিক শোক-দুঃখ নয়, প্রতাপের মন একটা অন্যরকম চিন্তায় আক্রান্ত। অনেকসময় আনন্দ-বেদনা, উপভোগ-অনাসক্তির চেয়েও এই বিচারটাই বড় হয়ে ওঠে, ঠিক না ভুল? প্রতাপের মনে হচ্ছে তিনি একটা ভুলকে সায় দিয়ে নিজেও একটা বড় ভুল করতে যাচ্ছেন। অসিতবরণের মৃত্যুর পর সুপ্রীতির পক্ষে ও বাড়িতে টিকে থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছিল, অন্য শরিকরা সুপ্রীতিকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর কারণ তাতেই তাদের লাভ। ঐ রকম হিংস্র প্রতিকূলতার মধ্যে মেয়েকে নিয়ে সুপ্রীতি কখনো স্বস্তি বোধ করতে পারতেন না, তবু প্রতাপ অনুভব করছেন, দিদির এভাবে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসাটা ভুল হচ্ছে।

সারা পথ কোনো কথা হলো না।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামতেই প্রতাপের বাড়িওয়ালার স্ত্রী অতসী তিন তলা থেকে নেমে এসে সুপ্রীতির হাত ধরে বললেন, আসুন দিদি। তারপর তিনি তুতুলের থুতনিতে হাত ছুঁইয়ে। চুমু খেয়ে বললেন, এসো মা, এসো!

অতসীর কাছে প্রতাপ কৃতজ্ঞ। দেওঘর থেকে প্রাপ একা ফিরে আসার পর তিনি অনেক যত্ন করছেন। রোজ সকালে তিনি প্রতাপের জন্য চা-জলখাবার পাঠান, রাত্তিরেও রুটি-তরকারি পাঠিয়ে দেন। বাড়িওয়ালা জয়গোপাল দের সঙ্গে প্রতাপদের বরাবরই সদ্ভাব রয়েছে। জয়গোপাল দে-রা সুবর্ণ বণিক, ওঁরা কলকাতার আদি বাসিন্দা। জয়গোপাল কাপড়ের ব্যবসা করেন, প্রত্যেক বছর পূজোর সময় মমতাকে তিনি বিনা মূল্যে একটা শাড়ী পাঠাবেনই পাঠাবেন। বাড়িওয়ালা কর্তৃক কোনো ভাড়াটেকে এরকম উপহার প্রদানের ঘটনা নিশ্চিত দুর্লভ।

অতসী ও জয়গোপাল প্রতাপের কাছ থেকে তাঁর দিদির বাড়ির সব ব্যাপার শুনেছেন। অতসী দু'গেলাস লেবু-চিনির সরবৎ বানিয়ে রেখেছিলেন, দোতলায় এসে অতসী একটি গেলাস সুপ্রীতির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নিন দিদি, এটা এক চুমুকে খেয়ে নিন তো আগে। শুনলুম আপনি নাকি কিছুই খাচ্ছেন না? অমন করলে কী চলে! শরীরটা

রাখতে হবে তো। নিজের মেয়ের কথা ভাববেন নাকো? যারা যায় তারা তো চলেই যায়, যারা থাকে তাদের। কথাই বেশি করে ভাবতে হয়!

অতসীর মুখখানা বড় ভালোমানুষীতে মাখা। সুপ্রীতির সঙ্গে তিনি এমন সুরে কথা বলছেন যেন অনেককালের চেনা। কিছু কিছু মানুষ পারে অন্যকে এত সহজে আপন করে নিতে। বেশ কয়েকদিন পর একজন অনাত্মীয়ের মুখে এরকম কোমল কথা শুনে তুতুল তার মায়ের পিঠে মুখ গুঁজে হু-হুঁ করে কেঁদে উঠলো।

বিকেলে এলেন প্রতাপের বন্ধু বিমানবিহারী, তাঁর দুই ছোট ছোট মেয়ে অলি আর বুলিকে সঙ্গে নিয়ে। সুপ্রীতিকে বিমানবিহারীও দিদি বলেন, দু'একবার তিনি প্রতাপের সঙ্গে গেছেন বরানগরের বাড়িতে। অসিতবরণদের সঙ্গে বিমানবিহারীর একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও বেরিয়ে গিয়েছিল, তাঁর মায়ের দিক দিয়ে, কিন্তু বিমানবিহারী সে সম্পর্কের বিশেষ গুরুত্ব দেননি। বিমানবিহারী শৌখিন ধরনের মানুষ। প্রতাপেরই মতন তিনি বেছে বেছে লোকদের সঙ্গে মেশেন।

প্রথমে তিনি কথা বললেন তুতুলের সঙ্গে। তুতুলের ভালো নাম বহ্নিশিখা, তিনি ওকে ঐ। নামেই ডাকেন।

তিনি বললেন, শোনো বহ্নিশিখা, আমার বাবা যখন মারা যান, তখন আমার বয়েস চোদ্দ, ঠিক তোমারই বয়েসী ছিলুম। আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল তার দু' বছর আগে। তোমার বাবা ভারি সুন্দর মানুষ ছিলেন, তাঁর চলে যাওয়াটা একটা মস্ত বড় শূন্যতা, কিন্তু তোমার মা তো রয়েছেন!

এ বেলা তুতুলের চোখ মুখ অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। স্নান করে সে একটা শাড়ী পরেছে আজ। সে স্থির দৃষ্টিতে, বিমানবিহারীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

বিমানবিহারী আবার বললেন, বড় কোনো শোক পেলে মানুষের বয়েস বেড়ে যায়। তুমিও এখন থেকে আর ছোট রইলে না, বড় হয়ে গেলে। আমার বেলাতেও তাই হয়েছিল। প্রায় এক লাফে আমি অ্যাডাল্ট হয়ে গেসলুম।

অলি আর বুলি বাবার দু'পাশে লক্ষ্মী মেয়ের মতন বাবু হয়ে বসে আছে আর অবাক অবাক চোখ মেলে তুতুলকে দেখছে। বিমানবিহারী মেয়েদের বললেন, তোমরা এই দিদির সঙ্গে ভাব করো, আমি একটু পাশের ঘরে যাচ্ছি।

বিমানবিহারী সুপ্রীতির কাছে এসে মেঝেতে বসলেন। তাঁর ধুতি ও পাঞ্জাবি সব সময় ধপধপে ফসা থাকে, তাঁর পায়ের তলাতেও একটু দাগ থাকে না। তিনি কথা বলেন সুস্পষ্ট উচ্চারণে।

তিনি বললেন, দিদি, আমার স্ত্রী আসতে পারলেন না, কাল থেকে খুব জ্বর, বড্ড ফ্লু হচ্ছে এখন কলকাতায়।

সুপ্রীতি বললেন, না, না, তাতে কী হয়েছে!

–দিদি, আপনাকে আমি কোনো সান্ত্বনার কথা জানাবো না। আপনার যথেষ্ট মনের জোর

আমি জানি। কিন্তু আপনি ও বাড়ি ছেড়ে একেবারে চলে এলেন? এটা বোধহয় ঠিক করলেন না।

তিনি তাকালেন প্রতাপের দিকে। প্রতাপ জানতেন যে বিমানবিহারীও এই কথাই বলবেন। তাঁদের মনের গড়ন একরকম।

সুপ্রীতি বললেন, ও বাড়িতে আমি আর নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না।

–তবু যদি একটু কটা দিন দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে থাকতেন, তা হলে আবার বোধহয় ঠিক হয়ে যেত। বুঝলেন না। পজেশানই হচ্ছে মালিকানার পনেরো আনা। একবার বাড়ি ছেড়ে এলে ওরা কি আর বিষয়-সম্পত্তির ভাগ দেবে?

–না দেয় না দেবে। আমি চাই না ওদের টাকা পয়সা!

বিমানবিহারী আলতো ভাবে হেসে বললেন, অনেকেই এই কথা বলে। অনেকেই ভাবে টাকা পয়সা যেন একটা অপবিত্র জিনিস। কিন্তু দিদি, এ যুগে টাকা-পয়সাই হচ্ছে মানুষের জীবনের অশ্বশক্তি। এর অভাবে জীবনটা অচল হয়ে যেতে চায়।

সুপ্রীতি এবারে দৃঢ় ভাবে বললেন, বিমান, আমি হুট করে চলে আসি নি। ভেবে-চিন্তেই এসেছি। উনি চলে গেছেন, সেটা আমি মেনে নিয়েছি, আগে থেকেই এর জন্য একটু একটু তৈরি হয়ে ছিলাম। কিন্তু উনি নেই, তার পরেও ও বাড়িতে থাকা..তুমি জানো না ওখানকার পরিবেশ কী রকম! আমার বাবা পূর্ববঙ্গের। তাই ওরা কোনোদিনই আমাকে মেনে নিতে পারে নি। বিয়ের আগেই উনি আমাদের বাড়ি যেতেন বলে ওরা ভাবে যে আমার মা বাবা জোর করে।

–আমাদের বাড়িতেও তো পূর্ববঙ্গের মেয়ে এসেছে বউ হয়ে।

–সব বাড়ি তো এক রকম নয়। উনি রিফিউজিদের হাতে মারা গেলেন, ওঁদের বাড়ি উদ্ধার করা গেল না, সেই রাগে ওরা আমার ওপরে....। ওদের চোখে সব পূর্ববঙ্গের লোকই সমান-কী খারাপ ভাষা যে ব্যবহার করতো তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! ঐ পরিবেশে আমার মেয়ে মানুষ হোক, তা আমি কিছুতেই চাই না। এর জন্য যদি না খেয়েও থাকতে হয়, তাও ভালো!

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আমি খোকনের ঘাড়ের ওপর ভর করে চিরকাল থাকবো না। অন্য একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

প্রতাপ বললেন, দিদি। তুমি কি ভাবছো...

সুপ্রীতি প্রতাপের বাহু ছুঁয়ে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ব্যাকুল ভাবে বললেন, না রে, খোকন, আমি সে রকম কিছু ভাবি নি। আমি আর তুতুল তো তোর কাছেই থাকবো। বাবা বেঁচে থাকলে তিনি আমাদের আশ্রয় দিতেন না? বাবা নেই। তুই আছিস। দরকার হয় আমরা একবেলা খাবো। তবু ঐ অপমান সহ্য করে ওখানে থাকতে পারতাম না। আমি জানি। মমতা কোনোদিন আমাদের ফেলে দেবে না!

ওঠবার সময় বিমানবিহারী জিজ্ঞেস করলেন, প্রতাপ, তুমি তা হলে আবার বৈদ্যনাথধাম যাচ্ছো?

প্রতাপ বললেন, হ্যাঁ, সম্ভব হলে কালই। ফিরে এসে তোমায় খবর দেবো।

দেওঘর থেকে বিশ্বনাথ গুহ চিঠি পাঠিয়েছেন যে সুপ্রীতি আর তাঁর মেয়েকে যেন অবিলম্বে একবার সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সুহাসিনীকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। তিনি একেবারে পাগলের মতন হয়ে উঠেছেন। তিনি যখন তখন কলকাতায় চলে আসতে চান সুপ্রীতিকে দেখবার জন্য।

দিদি আর তুতুলকে দেওঘরে নিয়ে যেতে হবে ঠিকই, তবে সে'ব্যাপারে প্রতাপের মনের মধ্যে একটা বাধা আছে। ট্রেনের টিকিট কাটতে প্রতাপ দুদিন অহেতুক দেরি করলেন। দিদির সঙ্গে মায়ের যখন প্রথম দেখা হবে, তখনকার দৃশ্যটা কল্পনা করলেই প্রতাপের শরীর মন আড়ষ্ট হয়ে যায়। প্রতাপ কান্নাকাটির দৃশ্য সহ্য করতে পারেন না। মা সম্পর্কে প্রতাপের মনে একটা স্নেহের ভাব আছে, মা যেন একটা ছোট্ট মেয়ে, অবুঝ। মায়ের কোনো কষ্ট দেখলে তাঁর বুক মুচড়ে ওঠে।

তবু প্রতাপকে টিকিট কাটতেই হলো। এবং বৈদ্যনাথ ধাম স্টেশনে নামবার একটু আগে তিনি সুপ্রীতিকে বললেন, দিদি, তোমাকে কিন্তু এবারে শক্ত হতে হবে। তুমি তো মাকে জানো.... .

সুপ্রীতি বললেন, তুই তো দেখেছিস, আমি ভেঙে পড়ি নি। আমি মাকে দেখবো। খোকন, আমি ভাবছি, তুতুলের তো পরীক্ষা দেওয়া শেষ হলো না এবার, নতুন স্কুলে ভর্তি হতে হবে। তার আগে দু'এক মাস এখানে মায়ের কাছে থেকে গেলে কেমন হয়?

–তা থাকতে পারো।

–বিশ্বনাথের অসুবিধে হবে না? ওকে কি কিছু টাকা পয়সা দিলে ও নেবে?

–সে নিয়ে তুমি এখন চিন্তা করো না, দিদি।

–না রে, সেদিন বিমান বললো–টাকা পয়সার মূল্য আমিও বুঝি! দেখলাম তো, ঐ একটা জিনিসের জন্য মানুষে মানুষে সম্পর্ক কত খারাপ হয়ে যায়!

–তুমি ওস্তাদজীকে সে রকম ভেবো না। তুমি তো ওঁকে বেশি দেখে নি। আমি দেখেছি। উনি টাকা পয়সার কোনো চিন্তাই করেন না!

স্টেশনে নেমে তুতুলকে দেখে প্রতাপ অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। স্থান পরিবর্তনের একটা বিশেষ প্রভাব আছেই। এই কদিন তুতুল একেবারে গুম হয়ে থাকতো। এখানে এসে এই প্রথম তিনি তার মুখে হাসি দেখতে পেলেন। তুতুল বললো, মামু, আমি অনেকদিন আগে এখানে এসেছিলুম, স্টেশনটা ঠিক সেই রকমই আছে!

প্রতাপরা কোন ট্রেনে আসছেন তা বিশ্বনাথকে জানানো হয়নি, তাই স্টেশনে কেউ নেই। প্রতাপ বাইরে এসে একটা টাঙ্গা নিলেন। সুপ্রীতি বসেছেন একদিকে, আর একদিকে প্রতাপের পাশে তুতুল। তুতুল কী যেন বলছে, প্রতাপ মন দিয়ে শুনছেন না। সুপ্রীতি মুখ নিচু করে আছেন। হঠাৎ সুপ্রীতি ডান হাতটা বাড়িয়ে প্রতাপের বুকের ওপর রাখলেন। অদ্ভুত ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, মার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি! কতদিন পর আমরা সব ভাই-বোন এক সঙ্গে...।

প্রতাপের হৃদয় ঠিক একই সুরে বেজে উঠলো। দু জনের একই রকম স্মৃতি। অনেকদিন পর পারিবারিক মিলন। শেষ এরকম মিলন ঘটেছিল চার বছর আগে, মালখানগরে, আগে যা প্রতি বছরই ঘটতে পুজোর সময়। আকাশে সাদা সাদা মেঘ, শিউলি ঝরা সকাল, বাতাসে হালকা হালকা ভাব, নতুন পোশাকের স্পর্শ, মাঠে পাকা আউস ধানের গন্ধ। শেষের কয়েকটা বছর অসিতদা ব্যবস্থা করে রাখতেন, তিনি দিদিদের আর ছেলেপুলে সমেত মমতাদের নিয়ে চলে যেতেন কিছু আগে, প্রতাপ পুজোর কেনাকাটি করে যেতেন পরে। পুজোটা একটা উপলক্ষ মাত্র, প্রতাপ বা অসিতদা বা ওস্তাদজী কেউই পুজোর ধার ধারতেন না, পুজো মণ্ডপের ধারেও ঘেঁষতেন না বিশেষ, বিজয়া দশমীর দিন শান্তিজল নিতে যেতেন মাত্র। কিন্তু এই কটা দিন ধরে চলতো অবিচ্ছিন্ন আমোদ-প্রমোদ আর হৈ-হল্লা। কত হাসি, কত গান। একবার কালী পুজোর সময় সিদ্ধি খেয়ে অসিতদার তো অজ্ঞান হয়ে যাবার মতন অবস্থা, কিন্তু তাই দেখে অন্য সকলে হেসে একেবারে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। বাবা ছিলেন রাশভারি মানুষ, তিনি যাতে কিছু জানতে না পারেন, সেদিকে সকলের নজর থাকত, কিন্তু সেবারে বাবাও টের পেয়ে গেলেন। অত হাসির শব্দ শুনে খড়ম খটখটিয়ে এসে ভবদেব মজুমদার জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী ব্যাপার? কী ব্যাপার? কেউ কোনো উত্তর দেয় না, আবার সিদ্ধির ঝোঁকে হাসিও সামলাতে পারে না! মেজো বোন শান্তি বলছিল, বাবা দ্যাখো না, জামাইবাবু হি-হি-হি-হি। হাসি অনেক সময় সংক্রামক হয়, ভবদেব মজুমদার নিজেও এক সময় হাসতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে সেই সব আনন্দের দিনের ওপর যবনিকা পড়ে গেছে!

আবার এতদিন বাদে ভিন্ন দেশে, ভিন্ন পরিবেশে পারিবারিক মিলন। বাবা নেই, অসিতদা নেই, পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি জড়িত সেই বাড়ি, সেই পুকুর, আমবাগান কিছুই নেই। সেই ঢাকের আওয়াজ, সেই ধানের গন্ধ, সেই গ্রামীণ প্রতিবেশীদের পরিচিত মুখ, কিছুই নেই। আকাশ অবশ্য একই রকম।

সুহাসিনী ভবনের গেটের কাছে গাড়ি থামবার পর প্রতাপ তখনই ভেতরে গেলেন না। তিনি মায়ের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন। প্রথম শোক-প্রবাহটা কেটে যাক, তারপর তিনি

ভেতরে যাবেন, তিনি সেইজন্য বিশ্বনাথের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। টাঙ্গাটাকে ছাড়া হয়নি। কিন্তু সুহাসিনী তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে না দেখে থাকতে পারবেন কেন? ভেতর থেকে সুহাসিনী প্রতাপের নাম ধরে জোরে জোরে ডাকছেন শুনে তিনি তাড়াতাড়ি আবার টাঙ্গায় চড়ে বসে বললেন, ওস্তাদজী, আপনি মা-কে গিয়ে বলুন, কয়েকটা জরুরি কেনাকাটি আছে, আমি বাজার থেকে ঘুরে আসছি।

সুহাসিনীর সঙ্গে প্রতাপের দেখা হলো দুপুরবেলা। তিনি তখন কান্নাকাটি বন্ধ করেছেন। বরং তিনি অস্বাভাবিক রকমের শান্ত। একখানা কম্বলের আসনে বসে আছেন তিনি, তাঁকে ঘিরে রয়েছে বাড়ির আর সকলে।

প্রতাপকে দেখে তিনি খুব কাজের কথার ভঙ্গিতে বললেন, অ খুকন, বুড়ি তো শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, এখন ও থাকবে কোথায়? এখানে তো সকলে মিলে থাকা যাবে না, চলবেই বা কী করে? অ্যাঁ? তুই বল!

প্রতাপ বললেন, মা, তুমি ও নিয়ে চিন্তা করো না। দিদি কলকাতায় আমাদের সঙ্গে থাকবে, সে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

মমতা বললেন, হ্যাঁ, মা, দিদি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

সুহাসিনী বললেন, না, না, ওসব মোটেই কাজের কথা নয়। তোমরা কত দিক সামলাবা? কলকাতায় কী রকম খরচ আমি জানি না? খুকন, তুই ব্যবস্থা করে দে, আমরা দেশের বাড়িতে চলে যাই। সেখানে আমরা মায়ে-ঝিয়ে শান্তিতে থাকুম!

প্রতাপ বললেন, মা, আমাদের তো সেই দেশের বাড়ি আর নেই। এখন এটাই আমাদের দেশ। এটাই আমাদের বাড়ি!

সুহাসিনী গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, ক্যান? এই কথা ক'স ক্যান? তুই তো মালখানগরে বাড়ি বিক্রি করিস নাই! সে বাড়ি তো আছে! নিজেগো বাড়িতে আমরা

ফিরতে পারবো না? সেখানে আমাগো জমির ধান পাবো, গাছে ফল পাকুড় আছে, পুকুরে মাছ আছে, খেজুর গাছ কতগুলান, সেই রস বিক্রি করা যায়, আমাগো ভালো ভাবে চলে যাবে।

প্রতাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মা আবার আগের যুগে ফিরে গেছেন। প্রতাপ মালখানগরের বাড়ি বিক্রি করেন নি বটে, কিন্তু সেখানে আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। ভবদেব মজুমদার বেঁচে থাকতে তবু কিছু লোক তাঁকে ভয় বা সমীহ করতো। তাঁর মৃত্যুর পর মালখানগরের ঐ বাড়িতে দু'দুবার ডাকাতি হয়েছিল। মুখে রুমাল বাঁধা ছেলেদের গলার আওয়াজ শুনে তখন চিনতেও পারা গিয়েছিল বেশ। জিনিসপত্র সব নিয়ে যাবার সময় তারা বলেছিল, পরের বার এলে জানে মেরে দেবে। থানায় খবর দিয়ে কোনো ফল হয়নি। থানার ওসি বিদ্রূপের সুরে বলেছিলেন, আপনাগো ইন্ডিয়ায় বুঝি ডাকাতি হয় না? তবে চলে যান না সেখানে! পাকিস্তান সরকার তখন হিন্দু বিতাড়নে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিচ্ছে। বিহার ও পাঞ্জাব। থেকে আসা মুসলিম শরণার্থীদের জায়গা দিতে হবে তো। সুতরাং হিন্দুরা চলে যাক না পশ্চিম বাংলায়। মুসলিম লীগের প্ররোচনায় এক শ্রেণীর স্থানীয় মুসলমানও হিন্দুদের সম্পত্তি গ্রাস করার এই খেলায় বেশ মেতে উঠেছে।

প্রতাপ বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে অনুনয় করে বললেন, ওস্তাদজী, আপনি একটু মা-কে বুঝিয়ে বলুন।

বিশ্বনাথ বললেন, আমি তো অনেক বলেছি, উনি যদি শোনেন তো তোমার কথাই শুনবেন। তুমিই বলো।

প্রতাপ বললেন, মা, ওখান থেকে ওরা আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। ওখানে আর ফেরা যাবে না। তুমি মালখানগরের কথা ভুলে যাও!

১৫ ঐ ছেলেটা মুসলমান বুঝি

ওমা, ঐ ছেলেটা মুসলমান বুঝি? আমি তো ভেবেছিলুম ও বাঙালী!

জীবনে এই কথাটা অনেকবারই অনেক জায়গায় শুনতে হয়েছে মামুনকে, কিন্তু বিনয়ের মা যখন আচমকা বলে উঠেছিলেন, তখন বাক্যটি শেলের মতন মামুনের বুকে বিঁধেছিল। আজও সেই ক্ষত পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি।

আজ সকালে মাদারিপুর টাউন থেকে তিনটি নবীন যুবক এসেছিল মামুনের সঙ্গে দেখা করতে। তরতাজা, উৎসাহে ভরপুর মুখ, স্বপ্নমাখা চোখ। ওদের নাম সামসুল হুদা মণি, আবু সাদেক বাচ্চু আর হাশমী মোস্তাফা কামাল। ওরা 'নদী মাতৃক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে, সেই পত্রিকার একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যার জন্য ওরা মামুনের সাক্ষাৎকার ছাপতে চায়। তিন বছর আগে ভাষা আন্দোলন ও বিক্ষোভের সঙ্গে মামুন যে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, ঢাকায় সেই ভয়ঙ্কর, উত্তাল একুশে ফেব্রুয়ারির গুলি চালনার সময় তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী, এসব কী। করে যেন ওরা জেনে ফেলেছে।

প্রায় ঘণ্টা দু'এক ওদের সঙ্গে কাটালেন মামুন। নিজের জীবনের কথা বলার চেয়ে তিনি। ওদের জীবনের কথা জানতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। চমৎকার ছেলে তিনটি, মণি আর বাচ্চু সদ্য বি এ পাস করেছে, আর কামাল একটি স্কুলে শিক্ষকতা করে। ওদের চিন্তা খুব পরিচ্ছন্ন, এরাই তো নতুন দেশ গড়বে।

ওরা চলে যাবার পর হঠাৎই বিনয়ের মায়ের ঐ উক্তিটা মনে পড়লো। সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার ছাত্রজীবনের কথা।

বিনয়েন্দ্র সান্যালের সঙ্গে এক সময় বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল, ওদের বাড়িতে মামুন, প্রতাপ আরও অনেকে যেতেন আড্ডা দিতে। তিন তলার একটি ঘরে খুব ক্যারাম খেলা হতো। অনেক রকম! খাবার দাবার আসতো, বিনয়েন্দ্রদের বর্ধমানের দেশের বাড়ি থেকে আসতো নানা রকম ফল, বিনয়ের মা ছেলের বন্ধুদের পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। প্রতাপ-মামুনরা মেসে-হোস্টেলে থাকতেন, এরকম একটা বাড়ি বাড়ি পরিবেশের জন্য তাঁদের মধ্যে আকুলতা ছিল। মামুনের চেহারা, পোশাক, ভাষা এমনকি ডাকনামটা শুনেও বিনয়ের মা বুঝতে পারেন নি যে ঐ ছেলেটি মুসলমান। একদিন মামুন এক বাক্স সন্দেশ

নিয়ে গিয়ে বিনয়েন্দ্রকে বলেছিল, তোর মা-কে বল সবাইকে ভাগ করে দিতে, কাল আমাদের শবে বরাত পরব ছিল। তাই শুনেই বিনয়ের মা তাঁর দেবীপ্রতিমার মতন সুন্দর মুখোনিতে সুগভীর বিস্ময় ফুটিয়ে। বলেছিলেন, ওমা, ঐ ছেলেটা মুসলমান নাকি, আমি তো ভেবেছিলুম ও বাঙালী!

কথাটা শোনা মাত্র বিনয়ের মায়ের মুখখানাকে মনে হয়েছিল কালিমাচ্ছন্ন, বীভৎস। চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে মামুন তিক্ততার সঙ্গে মনে মনে বলেছিলেন, মুসলমানরা বাঙালী নয়, তা হলে বাঙালী কে? মুসলমানরা তা হলে ভারতীয়ও নয়, তারা শুধু মুসলমান!

বিনয়ের বাবা সুরেশ্বর সান্যাল ছিলেন কংগ্রেসের একজন মাঝারিগোছের নেতা। তাঁর বাড়িতেও এই রকম মনোভাব। সুতরাং সেই সময়ে জিন্না-নাজিমুদ্দিনেরা যে তারস্বরে বলছিলেন, কয়েকটি মুশলিম লেজুড় থাকলেও, ভারতীয় কংগ্রেস হচ্ছে আসলে হিন্দুদের পার্টি, সে কথা মামুন পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন নি।

বিনয়ের মা অবশ্য মামুনের ধর্ম-পরিচয় জানবার পর তাঁর জন্য চায়ের কাপ আলাদা করে দেননি। ব্যবহারে কোনো বৈষম্যও ঘটাননি। সেরকম অভিজ্ঞতা মামুনের হয়েছে অন্যত্র।

একবার উত্তর কলকাতায় একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন শুনতে গিয়ে সারা রাত জাগার পর মামুন আর প্রতাপ গিয়েছিলেন একটা কচুরি-সন্দেশের দোকানে নাস্তা করতে। দোকানে ঢুকেই বাঁ দিকের টেবিলে বসে থাকা মালিককে মামুন হালকাভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি মুসলমান, আমায় এখানে খেতে দেবেন তো? মালিকের কপালে চন্দনের তিলক, মাথায় একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট টিকি, মুখখানা আজও মনে আছে মামুনের, সেই মালিক ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বলেছিল, হ্যাঁ, ঠোঙায় খাবার দিচ্ছি, তবে জলের গেলাসে হাত দিও না ভাই, বাইরে। দাঁড়াও, আমি তোমায় হাতে জল ঢেলে দেবো।

অত সকালে কাছাকাছি আর কোনো দোকান খোলে নি, খিদেও পেয়েছিল খুব। খাবারের ঠোঙা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে প্রতাপ আর মামুন রাস্তায় করপোরেশনের কলে জল। খেয়েছিলেন। প্রতাপ জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুই নিজে থেকে ঐ কথা বলতে গেলি কেন? মামুন বলেছিলেন, আত্মপরিচয় গোপন করা কি সম্মানজনক?

আর একবার ঐ উত্তর কলকাতাতেই একটা খাবারের দোকানের সামনে ঝোলানো একটা বাঁধানো ফটো আর তার নিচে লেখা কিছু সগর্ব ঘোষণা দেখে মামুনের খটকা লেগেছিল। ফটোটি কিরানা ঘরানায় বিখ্যাত শিল্পী ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁর। ছবির তলায় লেখা, "সঙ্গীত সম্রাট আবদুল করিম খাঁ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া আমাদের দোকানে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং আমাদের সকল প্রকার খাদ্য আস্বাদন করিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।" সেই লেখা দেখে মামুনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, ওরা কি খাঁ সাহেবকে পানির গেলাস দিয়েছিল, না দেয় নি?

মামুনের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া প্রতাপ পছন্দ করেন নি। সত্য এবং মিথ্যা সম্পর্কে। প্রতাপের মনোভাব কঠোর। প্রতাপ ঘৃণার সঙ্গে নাক কুঁচকে বলেছিলেন, এঃ, রাজনীতির লোকগুলো যখন তখন মিথ্যে কথা বলে। আমার তো ওদের ধারকাছ মাড়াতে ইচ্ছে করে না। মামুন স্বীকার করেছিলেন যে রাজনীতির লোকদের মাঝে মাঝে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয় বটে, কিন্তু তা ঠিক মিথ্যে নয়, কূটনীতি।

উত্তরকালে লীগ মিনিস্ট্রির আমলে যখন বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছিল, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দুদের বঞ্চিত করে মুসলমানদের এক তরফাভাবে সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল তখন একদিন তীব্র কথা কাটাকাটি হয়েছিল প্রতাপের সঙ্গে মামুনের। কলকাতার উপকণ্ঠে একটি সরকারি কলেজে অধ্যাপক নিয়োগের অদ্ভুত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তর্ক শুরু হয়েছিল। সেই অধ্যাপকপদে প্রার্থী ছিল এম এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া একজন হিন্দু যুবক, তাকে সেই চাকরি না দিয়ে দেওয়া হলো থার্ড ক্লাস পাওয়া একজন মুসলমানকে। তা নিয়ে কাগজে কাগজে খুব হই-চই, কাউনসিলেও প্রশ্ন উঠেছিল। উত্তরে ঢাকার নবাব বংশের সন্তান খাজা নাজিমুদ্দিন বলেছিলেন, হ্যাঁ, জেনে শুনেই এটা করা হয়েছে।

ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে একজন মুশ্লিমকেই ঐ পোস্ট দিতে হবে, ফার্স্ট ক্লাস বা সেকেণ্ড ক্লাস পেলে তো ভালো কথা, নইলে থার্ড ক্লাসও চলবে।

প্রতাপ মামুনকে বলেছিলেন, তুই এইসব নোংরামিকেও সমর্থন করবি? এই সবের সঙ্গে তোর নাম যুক্ত রাখতে চাস?

মামুন বলেছিলেন, দ্যাখ প্রতাপ, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে, চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুরা অনেক কাল ধরে, অনেক রকম সুযোগ-সুবিধে পেয়েছে, এটা তো স্বীকার করবি? মুসলমানরা এতদিন কী পেয়েছে, বল? হিন্দু-মুসলমান সব রকম যোগ্যতায় সমান সমান না হলে মিলে মিশে থাকতে পারবে না। তারা এখন ধৈর্য ধরে মুসলমানদের খানিকটা এগিয়ে যেতে দে। এই রকম সময়ে দু'চারটে বাড়াবাড়ির ঘটনা তো ঘটবেই।

প্রতাপ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, আমি যে হিন্দু সে কথা আমার মনেই থাকে না, তোরাই এখন বারবার সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছিস!

তর্ক থামিয়ে প্রতাপের পিঠে চাপড় মেরে মামুন বলেছিলেন, তুই অত রেগে যাচ্ছিস কেন? দে, একটা সিগারেট দে!

প্রতাপের ওপরেও যে তখন সরকারিভাবে অবিচার করা হয়েছে, তা মামুন সে সময়ে ঘুণাক্ষরেও জানতেন না, জেনেছিলেন অনেক পরে। প্রতাপ তখন মুনসেফের চাকরি করছেন, প্রতাপের চেয়ে অনেক জুনিয়র একজন মুসলমান মুনসেফকে ভালো পোস্টিং দিয়ে প্রতাপকে ট্রান্সফার করা হয়েছে দূর মফস্বলে, জায়গাটা সবাই শাস্তির ট্রান্সফার হিসেবে গণ্য করে। প্রতাপ নিজের প্রসঙ্গ একবারও মামুনের কাছে উত্থাপন করেননি। মামুন তখন জানতে পারলে সরকারি উঁচু মহলে ধরাধরি করে নিশ্চয়ই প্রতাপের জন্য একটা ভালো পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। খোদ ফজলুল হকের সঙ্গেই মামুনের ভালো সম্পর্ক ছিল।

উনিশ শো সাঁইত্রিশ সালে বাংলা দেশের মুসলমানদের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। এসেছিল নতুন আশা ও উদ্দীপনার জোয়ার। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে জেগে উঠলো একটা অধিকার বোধ। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হলে নির্বাচন।

নতুন ধাঁচে গড়া বাংলার বিধানসভায় মোট সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হলো ২৫০ জন। তার মধ্যে মুসলমান সদস্য থাকবে ১১৭, ইংরেজ বাসিন্দা ১১, ব্যবসায়ী ১৯ (এর মধ্যেও আবার পনেরো-ষোলোটিই ইংরেজ), অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ৩, ভারতীয় খৃষ্টান ২, জমিদার শ্রেণী ৫, শ্রমিক ৮, বিশ্ববিদ্যালয় ২, নারী প্রতিনিধি ৫, এবং সাধারণ ৮২। এই সাধারণের মধ্যে রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পারসী ও ইহুদী, আবার এই সাধারণের মধ্যেও ৩০টি আসন সংরক্ষিত রইলো সিডিউল্ড কাস্টদের জন্য। অর্থাৎ বাঙালী বর্ণহিন্দুদের অধিকার সীমাবদ্ধ রইলো মোটামুটি ৫২টি আসনের মধ্যে।

ইংরেজ পরিকল্পিত এই কমুউনাল অ্যাওয়ার্ড যে বাংলার বর্ণ হিন্দুদের জব্দ করার জন্যই তৈরি হয়েছিল তা অত্যন্ত নগ্নভাবে স্পষ্ট। এমন ব্যবস্থা পাকা করা হলো যাতে ঐ হিন্দুরা কোনো ক্রমেই শাসনক্ষমতায় আসতে না পারে। এই হিন্দুরাই প্রথম পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। তারপর রাজনীতিতে দীক্ষিত হয়েছে, এরাই তুলেছে স্বাধীনতার দাবি। এদের মধ্য থেকেই এসেছে বিপ্লবীরা, বোমা-পিস্তলে সাহেবদের ঘায়েল করতে পিছু পা হয় নি। সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে এদেরই মুখ্য ভূমিকা। সাহিত্যে, সঙ্গীতে এরা অনবরত ছড়াচ্ছে স্বদেশী চেতনা, ওদের টিট করতে ইংরেজ সরকার বদ্ধপরিকর।

এই কমুন্যাল অ্যাওয়ার্ডে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধে পেয়ে মুসলমান সমাজ খুশী মনে চুপ করে গেল। শিক্ষিত, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরও ধারণা হলো যে অবহেলিত মুসলমান সমাজকে এগিয়ে আনার জন্য এখন এইরকম কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা পাওয়ার প্রয়োজন আছে। ক্রুদ্ধ হিন্দুরা তুলল বিক্ষোভের ঝড়। টাউন হলের সভায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসে এই অন্যায্য ভাগাভাগির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানালেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আমল থেকে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর ধারণা ছিল বাংলা দেশে

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হবে না কখনো, হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ইংরেজের মুখোমুখি হবে।

কিন্তু হাওয়া এখন অনেক বদলে গেছে। মুসলিম লীগের হয়ে জিন্না সাহেব প্রায় একাই লড়ে যাচ্ছেন কংগ্রেসের সঙ্গে। তিনি তাঁর চোদ্দ দফা দাবির মধ্যে জানালেন যে হিন্দুদের ওসব চাচামেচি চলবে না, সাম্প্রদায়িক বরাদ্দ যেরকম দেওয়া হয়েছে সেরকমই মেনে নিতে হবে, আর কোনো দরাদরির প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিধাগ্রস্ত কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতৃত্ব না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি নিয়ে নীরব।

হয়ে গেল সাঁইতিরিশ সালের নির্বাচন।

বাংলার মুসলমান কিন্তু তখনো পুরোপুরি লীগ-সমর্থক হয়নি। তারা তাদের বাঙালী-স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে চায়। মুশলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জনাব ফজলুক হক জিন্নার সঙ্গে মতবিরোধে তখন লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তিনি গড়েছেন কৃষক প্রজা দল, অসাধারণ। তাঁর জনপ্রিয়তা। মুশলিম লীগের সঙ্গে নয়, কংগ্রেসের সঙ্গেই তিনি হাত মেলাতে উৎসাহী। অন্যান্য অনেক মুসলমানও তখন মুশলিম লীগের বাইরে নানা উপদলের সঙ্গে যুক্ত।

ভোটের ফলাফলে দেখা গেল, কংগ্রেস ৪৮টি সাধারণ আসনে প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে ৪৩টি, তপশিলি ও শ্রমিক আসন থেকে আরও কিছু পেয়ে মোট ৫৪টি আসন। ফজলুল হকের কৃষক। প্রজা পার্টি পেয়েছে ৪৪টি আসন, মুশলিম লীগও প্রায় সমান সমান, অন্যান্য মুসলমানেরা এসেছেন নির্দল বা ছোট ছোট উপদলের সদস্য হয়ে।

কংগ্রেসের পক্ষে একা সরকার গড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোয়ালিশান গড়ার জন্য ফজলুল হক কংগ্রেসকে আহ্বান জানালেন। শরৎ বোসকে তিনি বললেন, লীগকে হঠিয়ে রাখার জন্য আসুন আমরা মিলে মিশে সরকার চালাই।

কিন্তু সর্বভারতীয় কংগ্রেস থেকে নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, যে-যে রাজ্যে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় নি, সেই সেই রাজ্যে কংগ্রেস অন্য কোনো দলের সঙ্গে আঁতাত করে শাসন-ক্ষমতা নেবে না। তার ফলে, ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলিতেই শুধু কংগ্রেসী শাসন প্রবর্তিত হলো। বাংলা-পাঞ্জাব-আসাম-সিন্ধু প্রদেশ সম্পর্কে যেন কেন্দ্রীয় নেতাদের কোনো মাথাব্যথাই নেই। মুসলমানদের মধ্যে আবার এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে কংগ্রেস আসলে হিন্দু পার্টি।

একাধিক বৈঠকের পরেও ব্যর্থ হলো শরৎ বোস-ফজলুল হকের আলোচনা। আহত চিত্তে ফজলুল হককে শেষ পর্যন্ত মুখ ফেরাতে হলো মুশলিম লীগের দিকে।

পটুয়াখালির এক নির্বাচনী সভায় ফজলুল হক নাজিমুদ্দিনের মুখের ওপর বলেছিলেন, তিনি কোনোদিন মিরজাফর আর ক্লাইভের বংশধরদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না। কিন্তু এখন বাধ্য হয়েই বাড়ালেন, শুধু হাত নয়, মুণ্ডুটাও। ফজলুল হক আগে থেকেই অবশ্য একজন উমিচাঁদকে পুষে রেখেছিলেন। মুসলমানদের দুটি দল কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুশলিম লীগের গলা জড়াজড়ি করিয়ে দেবার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন একজন হিন্দু। এই যুগের এই উমিচাঁদ হলেন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী এবং রাজনীতির পাশা খেলোয়াড় নলিনীরঞ্জন সরকার।

মামুনের মনে আছে সেই রাত্রিটার কথা। সার্কুলার রোডে নলিনীরঞ্জন সরকারের “রঞ্জনা। নামে প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে সেদিন সন্ধে থেকেই সাংবাদিক ও উৎসুক জনতার কি ভিড়! মামুনও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বাড়ির মধ্যে নলিনীবাবুর মধ্যস্থতায় লীগের নেতাদের সঙ্গে হক সাহেবের বৈঠক চলছে। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যায়, তখনও কী হয় কী হয় ভাব। সুযোগ বুঝে মুশলিম লীগ নিজেদের কোলে ঝোল টানবার জন্য প্যাঁচ কষছে।

একসময় দেখা গেল সহাস্য মুখে নেমে আসছেন লীগ পক্ষের খাজা নাজিমউদ্দীন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং গৃহস্বামীর সঙ্গে হক সাহেব। ঘোষণা করা হলো যে আলোচনা

ফলপ্রসূ হয়েছে, কৃষক প্রজা দল ও মুশলিম লীগ মোচায়, ইওরোপিয়ানদের সমর্থনে গঠিত হচ্ছে নতুন সরকার।

কিন্তু বাংলার প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? সেই আসনটা কী মুশলিম লীগ নিয়ে নিল? সেটা জানার জন্যই তো মামুনরা অতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। আবার ঘোষণা করা হলো, এই সংযুক্ত মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন আবুল কাসেম ফজলুল হক।

উল্লাসের জয়ধ্বনি ও নাচানাচি শুরু হয়ে গেল বাইরে। মান্নান নামে একজন সহকর্মী মামুনকে সামনে পেয়ে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, এইবার আমাদের দিন এসে গেছে! মুসলমানরা বাঙালী নয়? এইবার দ্যাখ শালারা, কারা আসল বাঙালী! কারা বাংলা দেশটা চালাবে!

সেই দিন সেই মুহূর্তে মান্নানের ঐরকম উচ্ছাসে মামুন কোনো দোষ খুঁজে পান নি, বরং তাঁর ভালোই লেগেছিল! আনন্দের আতিশয্যে সারা রাত তাঁদের ঘুম হয় নি।

নতুন বিধানসভায় কংগ্রেসীরা হলো বিরোধী দল অর্থাৎ বামপন্থী, সে দলের সদস্যরা বসলেন স্পীকারের বাঁ দিকে। কংগ্রেসীরা অনেকেই রাজনীতিতে পুরোনো এবং পরিচিত মুখ। কিন্তু সভার চেহারা খুলে দিলেন নতুন মুসলমান সদস্যরা।

‘নদীমাতৃক’ পত্রিকার জন্য ছেলেদের কাছে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মামুন একটা কথা বলতে ভুলে গেছেন। এখন মনে পড়লো। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালী মুসলমানরা বাহান্ন সালেই প্রথম আন্দোলন করেন নি, আটচল্লিশ সালে জিন্না সাহেবের মিটিং-এর ঘটনাও প্রথম নয়, তারও অনেক আগে, সেই সাঁইতিরিশ সালেই বাঙালী মুসলমানরা এই দাবি তুলেছিলেন।

সেই অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় নব নির্বাচিত মুসলমান সদস্যরাই ছিল প্রথম খাঁটি বাঙালী। এর আগে রাজনীতিতে আসতেন শুধু বড় বড় জমিদার, উঁকিল ব্যারিস্টার বা রায় বাহাদুর, খান বাহাদুররা। তাঁদের পোশাক হয় সাহেবী অথবা চোগা চাপকান। মুখের

ভাষা সব সময়েই ইংরেজি। কিন্তু গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিরা বিধান পরিষদে নিয়ে এলেন বাংলা ভাষা। লুঙ্গির ওপরে পাঞ্জাবি পরে আসতেও তাদের দ্বিধা নেই। পশ্চিম বাংলার দিকের মুসলমানরা তো ধুতিও পরেন নিয়মিত। তাঁরা তাঁদের বক্তব্য বাংলা ভাষায় পেশ করতে লাগলেন। তখন নিয়ম ছিল কোনো সদস্য বাংলায় বক্তৃতা করলে তা রেকর্ড করা হতো না, বক্তব্যের সারাংশ ইংরিজিতে তর্জমা করে দিতে হতো। তাই সই, তবু তাঁরা বাংলায় বলবেনই।

বাঙালী হিন্দু নেতারা ততদিনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ধরেছেন বটে কিন্তু বক্তৃতার সময় হংরিজির ফোয়ারা ছোটান। কে কী বললেন, সেটা যেন বড় কথা নয়, কে কত জোরালো ইংরজির তুবড়ি ছোটাতে পারেন সেটাই যেন গর্বের বিষয়। হিন্দু নেতাদের মধ্যে এরকম একটা ইনিমন্যতা ছিল যে সর্বসমক্ষে বাংলা বললে লোকে যদি ভাবে যে লোকটা ইংরিজি জানে না! শিক্ষিত মুসলমানদের ও বালাই নেই, যাঁরা ইংরেজিতে ভালো বলতে পারেন, যেমন খুলনার সদস্য জালালুদ্দিন হাসেমী ইংরেজি বাংলা দু'ভাষাতেই সমান ভালো বক্তা, তাঁরাও ইংরজি ছেড়ে প্রায়ই শুরু করতেন বাংলায়। স্বয়ং ফজলুল হক ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকের চেয়েই উঁচুতে, তিনি মাঝে মাঝেই ইংরিজির বদলে শুধু বাংলা নয়, একেবারে খাঁটি বরিশালী বাঙাল ভাষায় কথা বলতেও দ্বিধা করতেন না।

মাতৃভাষার সঙ্গে আত্মসম্মানের যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক সে কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার জানাবার চেষ্টা করলেও অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীই বোঝে নি। কিন্তু বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি সুরক্ষার টান তখন থেকেই জেগে উঠেছে।

আটচল্লিশ সালে ঢাকায় জিন্না সাহেবের সেই উর্দু চাপানো বক্তৃতার অনেক আগের একটা ঘটনা মামুনের মনে পড়ে। এটা বোধহয় এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেকেই জানে না। সেবারে বহরমপুরে মুশলিম কাউনসিলের প্রাদেশিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করতে এসেছিলেন জিন্না। গ্রাম বাংলা থেকে হাজার হাজার মুসলমান এসেছে কায়েদ-ই-আজম জিন্না সাহেবকে দেখবার জন্য। পোশাক-পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দায় খাঁটি সাহেব তিনি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কঠোর ভাবলেশহীন মুখ। সভাপতি হিসেবে তিনি সভার অনুষ্ঠানসূচী হাতে

তুলে নিলেন। প্রথমেই রয়েছে উদ্বোধনী সঙ্গীত, গাইবেন আব্বাসউদ্দীন। জিন্না নির্দেশ দিলেন, নো মিউজিক!

বিস্ময়ের ঘোর কাটাবার জন্য কয়েক মুহূর্ত সবাই স্তব্ধ হয়ে ছিল। তারপরেই শুরু হলো হই। হট্টগোল। আব্বাসউদ্দীনের গান হবে না। এ আবার কী রকম কথা? তা হলে সভা চলতেই দেওয়া হবে না। জিন্না বুঝতেই পারেন নি যে আব্বাসউদ্দীন নামে কে একটা লোক বাংলার মানুষের কাছে এতখানি জনপ্রিয়। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি রাজি হলেন। সভা শুরু হবার আগে আব্বাসউদ্দীন শোনালেন পর পর তিনখানা গান।

বাংলার মুশলিম লীগের দুই প্রধান নেতা নাজিমউদ্দীন এবং সোহরাওয়ার্দী অবশ্য ভালো করে বাংলায় কথাই বলতে পারেন না। সাহেবসুবো এবং অবাঙালী ব্যবসায়ী শ্রেণীদের সঙ্গেই তাঁদের দহরম মহরম। সাহেবরাই তখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুশলিম লীগকে খেলাচ্ছে। বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখে পাঞ্জাব ও সিন্ধু থেকে বড় বড় মুসলমান ব্যবসায়ীরা এসে ঘাঁটি গাড়ছে কলকাতায়, তাদের ব্যবসা ছড়িয়ে দিচ্ছে বাংলা দেশে। জিন্না সাহেবও কলকাতায় এলে ইস্পাহানি, আদমজী, হাজি দাউদ প্রমুখ অবাঙালী মুশলিম ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই ওঠাবসা করতেন। শক্তিশালী অবাঙালী মুসলমান গোষ্ঠী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরিকল্পনা তখন থেকেই আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে।

মামুন সেই সময় ইচ্ছে করলেই নির্বাচনে দাঁড়াবার টিকিট পেতেন, ফজলুল হকের খুব প্রিয় ছিলেন তিনি, কিন্তু কখনো তাঁর ক্ষমতার রাজনীতিতে প্রবেশ করার ইচ্ছে হয় নি। ফজলুল হকও তাঁকে অন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

ঝাউতলার বাড়িতে বসে একদিন স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ফজলুল হক সাহেব মামুনকে বলেছিলেন, জানোস তো, এন্ট্রান্স পরীক্ষায় আমি জেলার মধ্যে ফাস্ট হইছিলাম? কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসে দেখি একটাও মুসলমান সহপাঠী নাই, সব হিন্দু। গ্রামের ইস্কুলে মুসলমান ছিল কয়টা? আমাগো বাড়ি বরিশালের চাখার গ্রামে, সেখানকার কোনো ছেলে তখন ইস্কুলে যায় না। অথচ উল্টা দিকের গ্রাম

খলসেখোলা, সেখানে সবাই হিন্দু, সব বাড়ির পোলাপানেরা ইস্কুলে যায়। এরকম আর কতদিন চলবে? বুঝলি মামুন, মুসলমানের মধ্যে তুই একদিন স্যার সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল বা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতন মানুষও হয়তো খুঁজে পাবি, কিন্তু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দরকার একজন বিদ্যাসাগর। যিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে ইস্কুল খুলবেন, ছেলেমেয়েদের ডেকে ডেকে আনবেন। বিদ্যাসাগরের আমলে মুসলমান সমাজ কিছু সাড়া দেয় নাই, কিন্তু সেই ভুল সংশোধন করতে হবে তো! এখন বিদ্যাসাগরের মতন অত বড় মানুষ হয়তো চট করে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তোদের মতন শিক্ষিত ছেলেরা, তোরা গ্রামে যা, গ্রামে যা!

১৬ বন্যা হবার দরকার হয় না

বন্যা হবার দরকার হয় না, এমনিই প্রতি বছর এদিককার মাঠ-ঘাট জলে-জলাকার হয়ে যায়। বাড়ির উঠোনেও এক কোমর জল। রান্না ঘরে যেতে হয় জল ভেঙে। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যেতে হয় নৌকোয়, ধান খেতের ওপর দিয়েও নৌকো চলে।

মামুন একাই একটা ডিঙ্গি নৌকো নিয়ে চলেছেন পাশের গ্রামে। ছেলেবেলায় বেশ ভালোই পারতেন, তারপর অনেকদিন তাঁর নৌকো বাওয়ার অভ্যেস নেই। জোরে বৈঠা টানলেই নৌকো টলমল করে। ডুবে যাওয়ার ভয় নেই অবশ্য, অনেকদিন পর নৌকো চালাতে মামুন বেশ কৌতুক বোধ করছেন।

আদিগন্ত জল-দৃশ্য দেখে মনে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি আসে। জল মামুনের প্রিয়। ধানগাছগুলো জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লম্বা হয়ে উঠেছে, এই সব অঞ্চলে পাট গাছও খুব লম্বা হয়। জলের ওপর জেগে থাকা ধান গাছের ডগায় লাফালাফি করছে মসৃণ সবুজ রঙের কয়া (ঘাসফড়িং), ছোটবেলায় মামুনের এই কয়া ধরার খুব শখ ছিল। এক একটা কয়া বেশ বড় হয়। প্রায় এক আঙুলের সমান, অদ্ভুত বিস্ময়ভরা তাদের চোখ। এই কয়াগুলো শালিকের প্রিয় খাদ্য, তাই কিছু শালিকও ওড়াউড়ি করছে।

ধান খেতের জল বেশ স্বচ্ছ, নিচের দিকে তাকালে মাঝে মাঝেই পুঁটি মাছের রূপোলি ঝিলিক চোখে পড়ে। একবার চোখে পড়লো এক ঝাঁক চাপিলা মাছ। এই সময় পুকুরগুলো ভেসে যায় বলে ধান ক্ষেতের জলেও কই মাছ, শোল মাছ দেখতে পাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। মেঘের ডাক শুনলে কই মাছ ডাঙায় উঠে আসে, কানকো দিয়ে হাঁটে। অন্য সব মাছেদের মধ্যে শুধু কই মাছেরই যে কেন এই স্বভাব তা কে জানে। পরশু দিনও তো মামুনের মেয়েরা বৃষ্টির মধ্যে তিনটে কই মাছ কুড়িয়ে এনেছে পুকুর ধারের বাগান থেকে।

উল্টো দিক থেকে একটা নৌকো আসছে, তাতে দু'জন যুবক বসে আছে। মামুন ঠিক চিনতে পারলেন না, চশমা না পরলে তিনি দূরের জিনিস ভালো দেখতে পান না। সেই নৌকো থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো, মামুনভাই চল্লেন কোথায়?

মামুন উত্তর দিলেন, যাবো মহেশপুর। সিদ্দিকী সাহেবের জানাজায়।

কাছে আসতে মামুন চিনতে পারলেন। ছেলে দুটির নাম বাদল আর ফিরোজ। এই গ্রামেরই ছেলে, দুরন্তপনার জন্য ওদের নাম আছে। জাল নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছে। মামুনকে খালুই তুলে দেখালো, কুচো মাছ পেয়েছে অনেক, দুই-তিন সের তো হবেই।

বাদল বললো, ফিরতে ফিরতে আপনের সন্ধ্যা হয়ে যাবে যে। আকাশের অবস্থা দ্যাখছেন? পানি আরও বাড়বে।

মামুন আকাশের দিকে তাকালেন। ঈষাণ কোণ থেকে কালো মেঘ জমাট বেঁধে এগিয়ে আসছে। মামুন ছাতা আনেননি, জানাজায় উপস্থিত থাকবেন বলে পরিষ্কার পা-জামা ও ভালো পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। তবু তাঁর কোনো আশঙ্কা হলো না। আসুক না বৃষ্টি, তাতে কী হবে।

ফিরোজ বললো, মামুনভাই, মাছ নেবেন? আমাগো তো এতখানি লাগবো না। ন্যান, নৌকাটা লাগান একটু।

মামুন বললো, আরে না, না, আমি এখন মাছ-মোছ নিয়া কী করবো? তোমরা ধরছো, তোমরা খাও?

ফিরোজ তবু জোর করেই মামুনের নৌকোর খোলের মধ্যে কিছু মাছ দিয়ে দিল। ছোট ছোট ইচা মাছগুলো (চিংড়ি) এখনো জ্যান্ত, ছটছট করে লাফাচ্ছে।

বাদলের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, মামুনকে দেখেও ফেলে দেয়নি। মামুন অবশ্য তাতে কিছু মনে করেন না। আঠেরো বছর বয়েস হবার পর ছেলেরা বয়স্কদের সঙ্গে সমান সমান ব্যবহার করবে এটাই তো স্বাভাবিক। তবু তাঁর একটু চোখে লাগে। কিছুদিন আগেও এটা ছিল না। তাদের ছোটবেলায় তো গ্রামের গুরুজনদের সামনে এরকম ব্যবহার কল্পনাই করা যেত না।

বাদল জিজ্ঞেস করলো, মামুনভাই, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেরমেন সাহেবের সাথে আপনার তো খুব দোস্তি, যদি একটা কাজের কথা কইয়া দ্যান আমাগো জইন্য।

মামুন অবাক ভাবে ভুরু কোঁচকালেন। এখানকার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান কে? তিনি মাত্র কয়েক মাস হলো এসেছেন ফরিদপুরে, তিনি ওসব খোঁজও রাখেন না।

মামুন সে প্রশ্ন করতেই বাদল জানালো যে কয়েকদিন আগেই মাদারিপুরে লঞ্চ ঘাটার। সামনে তারা নুরুল হুদা সাহেবের সঙ্গে মামুনভাইকে গল্প করতে দেখেছে। উনিই তো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান।

নুরুল হুদার সঙ্গে মামুনের ছাত্র বয়েসে কিছুটা আলাপ ছিল, দীর্ঘদিন পরে আবার দেখা। নুরুল হুদাই মামুনকে ডেকে কথা বলেছিলেন। তিনি যে এখন উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি তা মামুন বোঝেননি। অবশ্য নুরুল হুদার কথাবার্তার মধ্যে একটা ভারিক্কী চাল তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। মামুন বাদলকে জিজ্ঞেস করলেন, নুরুল হুদা সাহেবকে কী বলতে হবে?

বাদল বললো, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে লোক নেবে। যদি আমাদের চাকরির জন্য একটু বলে দ্যান। আমরা দু'জনেই তো মেট্রিক পাস করে তিন বচ্ছর বসে আছি, কোনো কাজ পাই না।

ফিরোজ বললো, মামুনভাই, শহরের ছেলেরা সব চাকরি নিয়ে নেয়, গ্রামের ছেলেদের কেউ চাকরি দেয় না। আমাদের কথা কি কেউ ভাববে না? মামুনের হঠাৎ একটা নতুন উপলব্ধি হলো। এই দিকটা তিনি আগে চিন্তাই করেননি। ওদের দু'চারটি মামুলি স্তোক কথা শুনিয়ে তিনি আবার জলে বৈঠা ফেললেন।

এই জন্যই সেধে সেধে মাছ দেওয়া, চাকরির উমেদারি? ম্যাট্রিক পাস করে তিন বছর বসে আছে, গ্রামের মধ্যে দুরন্তপনা ও বৌ-ঝিদের জ্বালানো একঘেয়ে লাগছে, ওরা এখন কাজ চায়।

ফজলুল হকের নির্দেশে মামুন গ্রামে গ্রামে ইস্কুল খুলতে গিয়েছিলেন। এমনিতেও ইস্কুল খোলা হয়েছে অনেক। হিন্দুরা চলে যাবার পর মুসলমান ছাত্রই বেশি। সাধারণ মুসলমান পরিবারেও শিক্ষার বেশ চল হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে সেই শিক্ষার পরিণতি। গ্রামে গ্রামেও তৈরি হচ্ছে বেকারের দল।

এই যে ফিরোজ আর বাদল, ওদের খাওয়া-পরার যে তেমন কষ্ট আছে, তা বোধ হয় নয়। পরিবারের কিছু জমি জমা আছে, তা থেকে সম্বৎসরের খোরাকি ধানটা আসে, বাড়িতে হাঁস-মুর্গী পালে, দরকার হলে নিজেরাই খাল বিল থেকে মাছ ধরে আনে, তাতে চলে যায়। ওরা চাকরি চাইছে সমাজে একটা প্রতিষ্ঠার জন্য। চাকরিই যদি না পাবে তা হলে লেখাপড়া শিখলো কেন? এরকম ক্ষোভ ওদের মনে জাগতেই পারে। এ দেশে লেখাপড়া শেখে তো সবাই চাকরির জন্য। কেউ কি কখনো বলেছে যে, যে-মানুষ মাঠে ধান চাষ করবে, যে-মানুষ নদীতে মাছ ধরবে, যে-মানুষ খেজুরের রস জাল দিয়ে পাটালি গুড় বানাবে, তারও যে লেখা পড়া শেখার প্রয়োজন আছে, নিজের গণ্ডিটা ছাড়িয়ে গোটা দেশকে জানার প্রয়োজন যে তারও আছে, সে কথা তো কেউ বলে না! বরং চাষীর ছেলে,

তাঁতীর ছেলে লেখা পড়া শিখলে আর বাপ-পিতেমো'র পেশা নিতে চাইবে না, তারা শহরে এসে বাঁধা মাইনের চাকরির জন্য গুতোগুতি করবে।

চাকরি পাবেই বা তারা কী করে? সাহেবরা চলে গেছে, হিন্দুরাও অনেকে চলে গেছে, কিন্তু সেই সব চাকরি পেলো কারা? বড় বড় কাজ সবই তো নিয়ে নিচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা। কিছুদিন আগে মামুন একটি পত্রিকায় পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনামূলক আলোচনা পড়েছিলেন। সে এক হাস্যকর ব্যাপার। হিসেবটা উনিশ শো একান্ন সালের। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে ৪২ জনই পশ্চিম পাকিস্তানী, পূর্ব বাংলার একজনও নেই, জয়েন্ট সেক্রেটারি ওদের ২২ জন, পূর্ব বাংলার মাত্র ৮ জন, সেকশান অফিসার ওদের ৩২৫, এখানকার মাত্র ৫০ জন। নির্লজ্জতার চূড়ান্ত! সেনাবাহিনীতে বাঙালী প্রায় নেই-ই বলতে গেলে।

আজকের এই মেঘ-মেদুর অপরাহ্নে মামুনের আর ঐ সব কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

জলের ওপর নৌকো চলার সর সর শব্দ হচ্ছে। শব্দটি বড় মধুর লাগে। এখানে ওখানে শাপলা ফুল ফুটেছে। হলদেকালো ডোরা কাটা একটা বড় জল ঢোঁড়া সাপ হঠাৎ ডান দিকে ভেসে উঠলো। মামুন ইচ্ছে করলে সেটার মাথায় বৈঠার ঘা বসাতে পারতেন, কিন্তু মামুন মারলেন না। বিষ নেই, মানুষের ক্ষতি করে না, মেরে কী হবে! লম্বা শীতঘুম দেওয়ার আগে ওরা এই সময়টায় পেট ভরে খেয়ে নেয়। মাছ, সাপ, শালুক, সব মিলিয়ে একটা জল-জগৎ। এখন দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না যে শীতকালে এই জায়গাটা শুকনো মাঠ হয়ে যাবে, এখানে ছেলেপুলেরা খেলা করে।

ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে, বৃষ্টি নামার আর দেরি নেই। মেঘ ডাকছে, তবে বজ্র গর্জনে নয়, গুরু গুরু রবে, যেন মেঘেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে।

মহেশপুরের গাছপালা যেন কুয়াশার মধ্যে জেগে উঠলো। বড় বড় কয়েকটি তাল গাছ। দেখে গ্রামটি চেনা যায় দূর থেকে।

ঘাটে এসে ডিঙি বেঁধে মামুন ভালো করে পা ধুয়ে নিলেন। এখানে বর্ষাকালে জুতো পরার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মহেশপুর জায়গাটা একটু উঁচু, এখানে বাড়ির মধ্যে পানি যায় না।

বাবুল সিদ্দিকীর মৃত্যুটা তেমন দুঃখজনক নয়, তার জীবনটাই ছিল অভিশপ্ত। গত কয়েক বছর বাবুল সিদ্দিকী খুবই কষ্ট পাচ্ছিল, তার দুটি পায়েই গ্যাংগ্রিন ধরে গিয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত মৃত্যুই সব দিক থেকে শান্তির ব্যাপার। বাবুল সিদ্দিকীর সঙ্গে মামুনের কোনো হৃদ্যতা ছিল না, তার পারলৌকিক কাজে মামুন যোগ দিতে এসেছেন দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার খাতিরে।

বাবুল সিদ্দিকী অল্প বয়েসে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ইস্কুলের বদলে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল মাদ্রাসায়, সেই পড়াশুনো তার সহ্য হয়নি। বিনা টিকিটে স্টিমারে চেপে সে পৌঁছোয় খুলনায়। তার শরীরে তাগৎ ছিল, নিঃসম্বল অবস্থাতেও সে ভিক্ষে করার পাত্র নয়। খুলনায় একটা মুদি দোকানে সে একটা চাকরি জুটিয়ে ছিল, ক্রমে সেখানেই সে বিয়েশাদী করে সংসার পাতে এবং বছর পাঁচেকের মধ্যে নিজেই সে দোকানটির মালিক হয়ে যায়। একবার হাঁটা পথে খুলনা থেকে বাগেরহাট যাওয়ার সময় সে সস্ত্রীক ডাকাতের পাল্লায় পড়ে। তার স্ত্রীর আর সন্ধানই পাওয়া যায়নি, বাবুলও ডাকাতদের হাতে এমন প্রহৃত হয় যে তার বাঁ চক্ষুটি নষ্ট হয়ে যায়। খুলনায় তার পরিচিতরা তার প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিল বটে, সেই সঙ্গে তার নতুন নাম দিয়েছিল কানা বাবুল।

খুলনা থেকে বাবুল ভাগ্যান্বেষণে চলে গিয়েছিল কলকাতায়। সেখানে এন্টালি বাজারে সে একটি মুগীর দোকান খুলেছিল। কলকাতায় বাবুলের বেশ সমৃদ্ধি ঘটেছিল। বেলেঘাটায় সে একটি কাঠের বাড়ি বানায় এবং সেই সময়েই সে অনেককাল বাদে মাদারিপুরে দেশের বাড়িতে ফিরে অনেক খরচ পত্তর করে কলকাত্তাই আমীরী দেখিয়ে যায়। পাটিশানের পরেও বাবুল কলকাতা ছাড়েনি, তার দোকান থেকে তখন প্রতিদিন পঞ্চাশ-ষাট টাকা মুনাফা হয়। অন্য বাজারেও সে আর একটি দোকান খোলার কথা

ভাবছে। এন্টালি-মৌলালি রাজাবাজরে তো। তার মতন অনেকেই রয়ে গেছে। কলকাতায় দ্বিতীয়বার শাদী করেছিল বাবুল।

কিন্তু পঞ্চাশের দাঙ্গায় সে সর্বস্বান্ত হলো। তার বেলেঘাটার বাড়ি ও এন্টালির দোকান দুই-ই গেল। বাড়িটাতে যখন আগুন জ্বলছে, তখন কিছু জিনিসপত্র বাঁচাতে গিয়ে বাবুল কাঠের সিঁড়ি ভেঙে পড়ে যায়। তার দুটি পা-ই সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধ হয়।

ইসলামিয়া হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসার পর বাবুল সিদ্দিকী সপরিবারে কলকাতা ছেড়ে চলে আসে পূর্ব পাকিস্তানে। আসার পথে স্টিমারে বাবুলের তিনটি সন্তানের মধ্যে একটির মৃত্যু হয় কলেরায়। মাদারিপুরের যে বাড়ি ছেড়ে বাবুল একদিন পালিয়ে গিয়েছিলসেখানে বাধ্য হয়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় সে ফিরে এলো তিক্ততার প্রতিমূর্তি হয়ে। অনেক চিকিৎসাতেও তার পা দুটি সারে নি, পচন ধরে গেছে, ক্রাচে ভর দিয়ে কোনো মতে যাতায়াত করতো।

দুর্ভাগ্যের মতন বাবুলের চেহারাটাও ভয়াবহ হয়ে গিয়েছিল। একটা চোখ নেই, মুখে অযত্নবর্ধিত দাড়ি, বুকের খাঁচা প্রকট হয়ে উঠেছে, পা দুটিতে দুর্গন্ধ ক্ষত। সবাইকে সে বলতো, কলকাতার মানুষ তার এই অবস্থা করেছে। হিন্দুরা সবাই দুশমন। চোখের সামনে সে যেন সর্বক্ষণ দেখতে পায় হিন্দু গুণ্ডারা তার দোকান লুট করছে। তার বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, তার স্ত্রী-সন্তানদের খুন করতে আসছে।

বাবুল সিদ্দিকী প্রতিশোধ হিসেবে চাইতো পূর্ব বাংলা থেকে সমস্ত হিন্দুদের বিতাড়িত করতে। সে হিন্দু বলতো না, বলতো মালাউন। সে চিৎকার করে বলতো, মালাউনগো খেদাও। সব কটার ঘেটি ধরে পানিতে চুবাও!

মাদারিপুর অঞ্চলে এখনো বেশ কিছু হিন্দু রয়ে গেছে! বাবুল সিদ্দিকীর এরকম অনলবর্ষী ঘৃণার ফল সাঙ্ঘাতিক হতে পারে। মামুন প্রতিবাদ করতে গিয়েও সুবিধে করতে পারেননি। বাবুলের ভাষা অতি তীব্র, তার সমর্থকও জুটে গিয়েছিল বেশ। হিন্দুস্থানের হিন্দুদের দুশমনির জলজ্যান্ত উদাহরণ রয়েছে তাদের চোখের সামনে, সেই জন্য

অনেকেরই আবেগ তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই আবেগের সামনে মামুনের শান্ত কণ্ঠের যুক্তি ফুৎকারে উড়ে যায়।

কলকাতার এন্টালি বাজারে বাবুল সিদ্দিকীর মুর্গীর দোকানে মামুন একবারই গিয়েছিলেন। তখন বাবুল একজন পরিতৃপ্ত সংসারী মানুষ, বেশ তেল-চুকচুকে চেহারা, বেলেঘাটার বাড়িটা তখন সবে তৈরি হচ্ছে। মামুনকে এক জোড়া বেশ ডাগর চেহারার মুর্গী বেছে দিয়ে কিছুতেই দাম নেয়নি বাবুল। সেই মানুষটার অমন পরিণতি, তাকে কোনো সান্ত্বনা কি দেওয়া যায়?

দাঙ্গায় অনেক মুসলমান পরিবার ধ্বংস হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে। পার্টিশানের পর ওপার থেকে চলে এসেছে দলে দলে মুসলমান, কেউ কেউ জমি বিক্রি করতে পেরেছে, কেউ বিনিময় করেছে হিন্দুদের সঙ্গে, আবার অনেকে সে রকম সুযোগই পায়নি, সব কিছু ছেড়ে তড়িঘড়ি চলে। আসতে বাধ্য হয়েছে। যার যায় দুঃখটা তারই সবচেয়ে বেশি। এই সহসা বিপর্যয়ের জন্য তারা তো হিন্দুদের দায়ী করবেই। কেউ তাদের আসল কারণটা বোঝাতে সাহস করে না।

মামুন নিজে কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন ছেচল্লিশ সালের গোড়ার দিকে। তাই ডাইরেক্ট অ্যাকশানের ফলাফল হিসেবে কলকাতার পথে পথে রক্ত গঙ্গা আর মৃত মানুষের স্তূপ তাকে স্বচক্ষে দেখতে হয়নি। কিন্তু পঞ্চাশের দাঙ্গার সময় তিনি ছিলেন বরিশালের গ্রামাঞ্চলে। দাঙ্গার ভয়ংকর রূপ সেবারে তিনি খানিকটা দেখেছিলেন। গ্রাম থেকে তিনি নিজেও ভয় পেয়ে চলে আসেন শহরে। বরিশালের সেই দাঙ্গায় হিন্দুরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছিল। একটা স্টিমারের দৃশ্য মামুনের চোখের সামনে এখনো জ্বলজ্বল করে। এক স্টিমার ভর্তি হিন্দু নারী পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইণ্ডিয়ায়। তারা সকলে হাত-পা ছুঁড়ে আকুলি-বিকুলি হয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই মা কিংবা বাবা, ভাই বা বোনকে কিংবা সবাইকেই হারিয়েছে দাঙ্গায়, তারা চিরকালের মতন ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে তাদের ভিটে মাটি, তাদের পিতৃপুরুষের দেশ। কার দোষে? তাদের নিজেদের কোনো দোষ ছিল?

বুক-ভাঙা কান্না-ভর্তি একটা জাহাজ ছেড়ে চলে গেল বন্দর।

আর একবার মামুন বরিশাল থেকে স্টিমারে ঢাকা আসছিলেন। ডেকে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন পাশের লোকদের কথাবার্তা। দু'জন মোল্লা বেশ উচ্চকণ্ঠে মালাউনদের মুণ্ডপাত করছিল। এক সময় নদীর মাঝখানে দ্বীপের মতন একটা গ্রামের দিকে আঙুল দেখিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল, ঐ যে ঐ গ্রামটা, ঐ গ্রামে আর মাত্র তিন ঘর হিন্দু আছে। তারা চলে গেলেই আপদের শান্তি!

স্টিমার থেকেও দেখা যাচ্ছিল সেই গ্রামের মাঝখানে একটি মন্দিরের উঁচু চূড়া।

সেদিন মামুন বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভেবেছিলেন, এই জন্যই কি পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল? বাংলার মানচিত্রের মাঝখানে সীমা রেখা টেনে দিলেও বাঙালী জাতটাকে দু'ভাগ করে দেবার উদ্দেশ্য ছিল কী? এবং এই দু'ভাগ হয়ে গেল পরস্পরের শত্রু!

হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার ছিল, অনেক রকম সামাজিক বৈষম্য ছিল ঠিকই। আবার অনেক রকম মিলও তো ছিল। দীর্ঘকাল হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি থেকেছে, কোনো বিবাদ হয়নি, এমন দৃষ্টান্তও তো অনেক। মুসলমানের ছেলে হিন্দুর বাড়িতে সারাদিন কাটাচ্ছে। হিন্দুর ছেলে মুসলমান রমণীকে মা বলে ডাকছে, এরকম তো মামুন নিজেই দেখেছেন!

পাকিস্তানের জন্ম যেন একটা স্বপ্ন হঠাৎ বাস্তব হয়ে ওঠার মতন অবিশ্বাস্য। উনিশ শো চল্লিশ সালের লাহোর ঘোষণার সময় কেউ কি সত্যি সত্যি কল্পনাও করেছিল যে মাত্র সাত বছরের মধ্যে ভারতকে কেটে মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা দেশ পাওয়া যাবে? সেই সাত বছরের মধ্যে অসম্ভব দ্রুততায় ঘটে গেল সব আকস্মিক ঘটনা। সেই জন্যই পাকিস্তানের সঠিক রূপটি কী হবে তা চিন্তা করার সময়ও পাওয়া যায়নি। যে পাকিস্তান পাওয়া গেল তা কি সমস্ত মুসলমানদের পছন্দ হয়েছে? এমনকি জিন্না সাহেবরও পছন্দ হয়নি, তিনি প্রবল আক্ষেপ ও বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলন, এই পোকায় কাটা পাকিস্তান

নিয়ে আমি কী করবো? জিন্না কি পাকিস্তানকে পুরোপুরি ঐশ্লামিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন? আবার ইণ্ডিয়াতে রয়ে গেল যে কোটি কোটি মুসলমান, যারা পকিস্তান দাবির জন্য কণ্ঠ মিলিয়েছিল, তারা মনে করেনি যে তাদের মুসলমান ভাইরাই তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! তাদের তো সেই। হিন্দুদের তাঁবেই থাকতে হলো!

পাকিস্তানের জন্য বাঙালী মুসলমানদের দাবিই ছিল সবচেয়ে জোরালো। পাকিস্তানের সমর্থনে বাংলার মুসলমানরা দিয়েছিল শতকরা ছিয়ানব্বইটি ভোট, পাঞ্জাবীরা দিয়েছিল মাত্র উনপঞ্চাশটি। কিন্তু সেটা কোন্ পাকিস্তান? বাংলা বিভাগের মতন প্রস্তাব মামুনের মতন বুদ্ধিজীবী পাকিস্তান সমর্থকরা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি আগে। ছেচল্লিশ সালে যখন বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ড করার কথা প্রথম শোনা গেল তখন মামুনের মতন অনেকেরই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। কলকাতার মতন সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থানের ওপর বাঙালী মুসলমানদের অধিকার থাকবে না? বর্ধমানের শষ্য ভাণ্ডার,বীরভূমে রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন, চব্বিশ পরগনার ফুরফুরা শরীফ, মুর্শিদাবাদের নবাবী ঐতিহ্য, এই সব কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হবে? অখণ্ড বাংলা দেশকে বজায় রাখার জন্য তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেননি?

যাই হোক, তাড়াহুড়ো করে তো পাকিস্তানের পত্তন হয়ে গেল। পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এই পাঁচটি অঞ্চল নিয়ে গড়া হলো যে পাকিস্তান, তাতে বাঙালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, বাংলা ভাষাই গরিষ্ঠ সংখ্যকের ভাষা। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী পাকিস্তানের রাজধানী হওয়া উচিত ছিল ঢাকা শহর। এবং বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সর্বোচ্চ দাবিদার। কিংবা পাঁচটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হতে পারে। কিন্তু বিনা বিতর্কে রাজধানী হলো করাচি, পাকিস্তানের বড় কর্তারা সবাই প্রায় উর্দুভাষী এবং কোনোরকম যুক্তি ছাড়াই তাঁরা ধরে নিলেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। আট চলশ সালে ঢাকার এক সভায় জিন্না সাহেব সেই কথা স্বাভাবিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে গিয়ে যখন না, না, ধ্বনি শুনলেন, তখন তিনি নিশ্চিত বিস্মিত হয়েছিলেন।

জিন্না সাহেব আর যাই হোক সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। ওটা তাঁর রুচিতে বাধে। সোহরাওয়ার্দি ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে কলকাতায় বীভৎস হত্যাকাণ্ডের সূচনা করেছিলেন বলে ঐ লোকটিকে জিন্না পছন্দ করেননি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মদিনে জিন্না বলেছিলেন, আজ থেকে রাজনীতিতে মুসলমান আর মুসলমান নয়, হিন্দু আর হিন্দু নয়। সবাই মিলে এক মহান জাতি। পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য, জিন্না বেশিদিন বাঁচলেন না।

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং ভারত বিদ্বেষ ছড়াতে শুরু করলেন উজিরে আজম লিয়াকত আলী। ক্ষমতায় টিকে থাকতে গেলে দেশবাসীর সামনে সব সময় একটা জিগির তুলে রাখতে হয়, লিয়াকত আলী সেই জিগির তুললেন, ইসলাম বিপন্ন, ঐস্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে চাই সব মুসলমানের ঐক্য।

বিনয়েন্দ্রর মা মামুনকে যে কথাটি বলে অপমান করেছিলেন, অনেকদিন পর মামুন সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনলেন পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তাদের মুখে। বাংলা তো হিন্দুদের ভাষা। তুমি যদি খাঁটি বাঙালী হতে চাও তা হলে তুমি আর খাঁটি মুসলমান থাকবে না। শত শত মামুন স্বজাতির নেতাদের মুখে এই রকম কথা শুনে আবার অপমানে কুঁকড়ে গেলেন।

অনেকেই অবশ্য প্রথম প্রথম ইসলাম বিপন্ন, ঐস্লামিক রাষ্ট্র গঠনের জিগির বেশ পছন্দ করেছিল। বাঙালীত্ব ছেড়ে শুধু মুসলমান হতে তাদের আপত্তি ছিল না, উর্দুকে গ্রহণ করতেও আগ্রহী ছিল। কিন্তু ভেতো বাঙালী উর্দু বাৎচিৎ শিখলেও তো এক জীবনে উর্দু কালচারে রপ্ত হতে পারে না। নিজেদের সংস্কৃতি ছেড়ে এক জগাখিচুড়ি সংস্কৃতি নিয়ে তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের চোখে উপহাসের পাত্র হলো।

বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রকাশ্য রাজপথে বাংলা ভাষার দাবি মিছিলে যেদিন ছাত্র ও জনসাধারণের ওপর গুলি চলে, সেদিন মামুনের শেষ মোহটুকু ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি বুঝেছিলেন, শুধু ধর্মবন্ধনই এ যুগে একটি জাতির একাত্ম হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মুসলমানও মুসলমানকে মারে। মুসলমানও মুসলমানকে শোষণ করে। হিন্দু আধিপত্যের। আওতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পাকিস্তানের জন্ম, কিন্তু এখানেও দ্রুত

তৈরি হয়েছে শোষক শ্রেণী, এখানেও রয়েছে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত। আসলে শোষক ও অত্যাচারীদের কোনো জাত বা ধর্ম নেই, ওরা সব দেশেই এক।

বাঙালী মুসলমানদের ওপর গুলি চালিয়েছে পূর্ব বাংলার পুতুল সরকার। ক্ষমতা সবই পশ্চিমীদের দখলে। গুলির আঘাতের চেয়েও মর্মান্তিক ওদের শোষণ। পূর্ব বাংলায় যদি ওরা এক টাকা খরচ করে তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করে দশ টাকা। এখানে একজন চাকরি পায়, ওখানে পায় দশ জন। রপ্তানী হয় পূর্ববাংলা থেকে আমদানী হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।

প্রতাপ ঠাট্টা করে বলেছিলেন, হাত মে বিড়ি মু'মে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, এই শ্লোগান তো দিচ্ছে অবাঙালী বিড়িওয়ালারা। মামুন, তোরাও এদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিস? মামুন তখন বলেছিলেন, পাকিস্তান হওয়ার সত্যিই দরকার আছে রে। গরিব মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্যই সেটা দরকার। দেখিস, পাকিস্তান হয়ে যদি যায়, তাহলে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক অনেক ভালো হয়ে যাবে।

বাহান্ন সালে মামুনের প্রথম মনে হয়েছিল, এই কি সেই পাকিস্তান? এই বৈষম্যভরা পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কী? পূর্ব আর পশ্চিমে সৌহার্দ্য কী কোনোদিন সম্ভব?

একটা কান্নার রোল শুনে মামুন দ্রুত পা চালালেন।

বাবুল সিদ্দিকীর বাড়িতে গিয়ে শুনলেন শব যাত্রীরা একটু আগে রওনা হয়ে গেছে। আকাশে কালো মেঘ জমতে দেখে তারা আর দেরি করেনি। মহিলাদের কবর স্থানে যাওয়ার নিয়ম নেই, তাই তারা কান্নাকাটি করছে।

বাবুল সিদ্দিকীর মেয়ে দুটিকে চিনতে পারলেন মামুন। ওদের দেখে তাঁর নিজের মেয়েদের কথা মনে পড়লো। কে জানে কখন এক হ্যাঁচকা টানে তাঁকেও পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। তখন কী গতি হবে তাঁর মেয়ে দুটির? এই মেয়ে দু'টিরই বা কী হবে? ওদের দিকে তাকিয়ে মামুন বাৎসল্যের ব্যথা অনুভব করলেন।

দেরি করার উপায় নেই, মামুন ছুটলেন কবর স্থানের দিকে। একেবারে শেষের দিকে তিনি। ধরে ফেললেন শবযাত্রীদের। ঘাসে ভরা একটা পরিষ্কার জায়গায় উত্তর মুখ করে নামানো হলো লাশ। জেদ করে ক্রাচে ভর দিয়ে নৌকোয় উঠতে গিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে বাবুল সিদ্দিকীর। তার মুখোনি আরও বিকৃত হয়েছে কিনা তা দেখার উপায় নেই, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাফনে মোড়া।

শবযাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চিম মুখ করে মামুন জানাজা পড়তে শুরু করলেন। তাঁর চোখে জল এসে গেল। শত সহস্র বাবুল সিদ্দিকী আর বরিশালে দেখা সেই জাহাজ ভর্তি ক্রন্দনরত হিন্দু উদ্বাস্তুদের কথা কি চিন্তা করেছিল পাকিস্তানের প্রবক্তারা? ভারতের নেতারাই বা কী করেছিল? লক্ষ লক্ষ নিদোষ নিরীহ মানুষের অন্ন, ভূমি, ইজ্জৎ আর প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে খেলতে গড়ে উঠেছে ভারত আর পাকিস্তান, এই রকম অভিশপ্ত দুটি দেশের কি কোনো দিন মঙ্গল হতে পারে?।

নামাজের মন্ত্র পড়তে পড়তেও মামুন মনে মনে বাংলায় বলতে লাগলেন, বাবুল সিদ্দিকীর বিক্ষুব্ধ আত্মা যেন একদিন শান্তি পায়। কেয়ামতের পর ফেরেস্তারা যেন ওকে দয়া করেন।

১৭ কলকাতার তালতলা অঞ্চল

কলকাতার তালতলা অঞ্চলটি বেশ প্রাচীন, এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দারা কয়েক পুরুষ ধরেই এই শহরের নাগরিক। অনেকে বলে খাঁটি কলকাতার ভাষা এখনো শুধু তালতলাতেই শুনতে পাওয়া যায়। অন্যান্য জায়গায় ভেজাল ঢুকে গেছে, বাঙালদের উপদ্রবে। তালতলার লোকেরা ট্রামে বাসে ‘এই যে দাদা’র বদলে ‘এই যে দাদু’ সম্বোধন শুনলে বিরক্তিতে নাক কুঁচকোয়। তারা এখনো নুচি, নংকা ও নেবু, এই ধরনের উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ রেখেছে, ‘আদেখলের ঘটি হলো, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল’, কিংবা ‘অবিয়ন্তীর

ঠুনকো ব্যথা' কিংবা 'না বিইয়ে কানায়ের মা' এই ধরনের বর্ণাঢ্য প্রবাদ কথায় কথায় ব্যবহার করে।

শহরের পুরনো পল্লীর যা যা অনুষঙ্গ, অর্থাৎ বেশ্যালয়, মদের আখড়া, গুণ্ডা চক্র তাও রয়েছে কাছাকাছি। অবশ্য পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বসত বাড়িটিও অদূরে। তাঁর বাড়ির বিপরীত দিকে পরিচ্ছন্ন, সুরম্য ওয়েলিংটন স্কোয়ার উদ্যানটি সবরকম বিক্ষোভের পীঠস্থান। প্রায় প্রত্যেকদিন সেখানে ভিড়, হুড়োহুড়ি, ঠ্যালাঠেলি লেগেই আছে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও কিংবদন্তিতুল্য খ্যাতিমান চিকিৎসক বিধানবাবু সকালবেলা বিনা-ভিজিটে রুগী দেখেন, সেইজন্য ভোর থেকেই এসে ভিড় জমায় দূর-দূরান্তের রুগীরা, আবার ঐ ডাক্তারবাবুর কাছেই অন্য সময়ে অনেকে আসে স্বেচ্ছায় আহত বা নিহত হতে। একটু বেলা বাড়লেই শুরু হয়, ছাত্র সমাবেশ, শ্রমিক সমাবেশ ও বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলির মিছিল।

স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এসেছে, দেশকে এখন আর কেউ জননী মনে করে না, দেশ নিছক গ্রাসাচ্ছাদনের পটভূমি। স্বাধীনতার পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধ, ছাটাই ও নতুন চাকরির অভাব এবং ভোগ্যপণ্যের অনটনের জন্য ছাত্র ও যুব সমাজ জাতীয়তাবাদ ছেড়ে ইদানীং মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকেছে, ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টির ছাত্র ও যুব শাখা এখন বেশ শক্তিশালী। এইসব মিছিল-সমাবেশের ওপর প্রায়ই লাঠি-গুলি ও টিয়ার গ্যাস চলে। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে বর্তমান সরকার মাথায় রেখেছে বটে কিন্তু পুলিশ বাহিনীকে অহিংস হতে বলেনি, অন্যান্য অনেক কিছুর মতনই পুলিশ বাহিনীও চলছে পুরনো ব্রিটিশ কায়দায়। এই তো দু'এক বছর আগে ব্রিটিশ মালিকানাধীন ট্রাম কম্পানির ট্রামের ভাড়া মাত্র এক পয়সা বৃদ্ধির প্রতিবাদে এখানে কী তুমুল দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। টিয়ার গ্যাসের জ্বালায় স্থানীয় অধিবাসীরা দরজা-জানলা বন্ধ করেও নিষ্কৃতি পায়নি, অকারণে তাদের কাঁদতে হয়েছে। বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় এ পাড়ায় লোকদের বড় অশান্তি।

এই তালতলাতেই মমতার বাপের বাড়ি। মমতার বাবা-ঠাকুদারা খাঁটি পশ্চিমবঙ্গেরও নয়, পূর্ববঙ্গেরও নয়। যশোরে সাতক্ষিরার কাছে এককালে তাঁদের ছোটোখাটো একটি জমিদারি ছিল, মমতার ঠাকুর্দা এক পার্শী ভদ্রলোকের কাছ থেকে তালতলার একটি দোতলা বাড়ি কেনেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। ক্রমে জমিদারিটি হাতছাড়া হয়ে গেলেও সাতক্ষিরা শহরে তাঁদের একটি বাড়ি রয়ে গিয়েছিল এবং সেখানেও যাতায়াতে ছেদ পড়েনি।

এই বংশের ছেলেমেয়েরা গোড়া থেকেই কলকাতার স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখেছে, ছুটি কাটাতে গেছে সাতক্ষিরার বাড়িতে। তারা কথাবার্তা বলে কলকাতার ভাষায় কিন্তু বিয়ের সময়। তাদের পাত্রী ও পাত্র বেছে বেছে আনা হয়েছে পূর্ববঙ্গীয় ভালো বংশ থেকে। ফুটবল খেলার সময় তারা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক কিন্তু ইলিশের চেয়ে চিংড়ি মাছই তাদের বেশি পছন্দ। বোয়াল মাছ তাদের বাড়িতে ঢোকে না। দেশবিভাগের ফলে এই পরিবারটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, মূল্যবান জিনিসপত্র সবই সরিয়ে আনার সময় পাওয়া গিয়েছিল। সাতক্ষিরার বাড়িটিও এক আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সীমান্ত থেকে সাতক্ষিরা শহরটি বেশি দূরে নয়, বিনা পাসপোর্টেই ইছামতি নদী দিয়ে দুদিকের অনেক মানুষ যাওয়া আসা করে, নানারকম দ্রব্যও আসে-যায়।

মমতার বাবা-ঠাকুদারা অবশ্য কেউ এখন বেঁচে নেই। তাঁর দাদা ত্রিদিবই সংসারের কর্তা। সংসারটিও ছোট হয়ে এসেছে।

ত্রিদিবের স্ত্রী সুলেখা যাকে বলে ডাকসাইটে সুন্দরী। এ দেশে সুন্দরী বললে প্রথমেই ফর্সা রং বোঝায়। কিন্তু সুলেখার গাত্রবর্ণ পদ্মপাতার মতন। সুলেখার নাক, চোখ, ওষ্ঠরেখা কোনোটিই যে আলাদাভাবে নিখুঁত তা বলা যায় না। কিন্তু সুলেখার রূপের মধ্যে এমন একটা গভীর সুষমা আছে যেজন্য তার দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। এ যেন শিল্পের মতন। একটা কবিতা বা ছবি বা সঙ্গীত যে কেন ভালো বা রসোত্তীর্ণ তা কিছুতেই বুঝিয়ে বলা যায় না। নিখুঁত ব্যাকরণ বা নিখুঁত প্রয়োগ হলেও তো ঐ সব সবসময় মনোহরণ করে না। তার জন্য আলাদা কিছু লাগে।

বিয়ের আগে পর্যন্ত ত্রিদিব ছিলেন খুব পড়ুয়া মানুষ। সব পরীক্ষায় তিনি ফাস্ট হয়েছেন। যথাকালে তিনি তাঁর যোগ্য চাকরি পেয়েছেন, তবু পড়াশুনোর নেশা তাঁর ঘোচে নি। তিনি বিয়ে করেছেন অনেক দেরিতে। সুলেখার সঙ্গে বিয়ে হবার পর তিনি অনুভব করেন যে এতগুলি বছর তিনি শুধু বইয়ের পাতাতেই মুখ গুঁজে থেকেছেন, পৃথিবীর আর কোনো কিছু ভালোভাবে জানা হয় নি। সুন্দরের সংস্পর্শে এসে অন্যান্য সুন্দরের প্রতি তাঁর আকুতি জন্মায়। তিনি সঙ্গীত ও শিল্প-সাহিত্যের জন্য তৃষ্ণা বোধ করেন। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি প্রায় প্রতিদিনই কোনো সিনেমা, থিয়েটার বা গান বাজনার অনুষ্ঠানে যান।

বিয়ের সাত বছর পরেও ত্রিদিবের এই টান একটুও কমে নি। সুলেখার সাহচর্যেই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সময় কাটে, সুলেখা কোনোদিন যেতে না পারলে তিনি সিনেমা বা থিয়েটারের আগে থেকে কেটে রাখা টিকিট ছিঁড়ে ফেলে দেন।

সুলেখার এখনো কোনো সন্তানাদি হয় নি। জননী রূপের চেয়ে প্রেমিকা রূপটিই যেন তাঁকে বেশি মানায়। পুরুষের চোখে কোনো কোনো নারী চিরন্তন প্রেমিকা হয়েই থাকে। যেমন মহাভারতের দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর অবশ্য বেশ কয়েকটি ছেলেপুলে হয়েছিল কিন্তু তাদের উল্লেখ প্রায় উহ্যই রয়ে গেছে। অত্যন্ত সুকৌশলে মহাভারতের কাহিনীকার দ্রৌপদীর প্রেমিকা রূপটিই। উজ্জ্বল করে এঁকেছেন আগাগোড়া, এমনকি মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। সুলেখার মতন দ্রৌপদীও ফর্সা ছিলেন না।

ত্রিদিব নম্র ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ, ছোটখাটো চেহারা। সেই তুলনায় সুলেখা বেশ দীর্ঘকায়া, ত্রিদিবকে একটু ছাড়িয়ে যান। সুলেখা কিন্তু তাঁর রূপ সম্পর্কে অনবহিতা, তাঁর মনটি ঝর্নার জলের মতন। সেই মনের স্পর্শ ত্রিদিব ছাড়া আর কেউ পায়নি।

সুন্দরী স্ত্রীর জন্য ত্রিদিবকে প্রায়ই কিছু কিছু বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। মধু-সম্ভাবনাময় প্রস্ফুটিত ফুলের চারপাশে মৌমাছি, ভ্রমর, প্রজাপতি, ফড়িং, গুবরে পোকার মতন সুলেখার জন্যও বাড়িতে নানান লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। আত্মীয়, স্বজন, ক্ষীণ সূত্রের বন্ধুবান্ধব। ত্রিদিবের বিয়ের আগে তারা এ বাড়িতে আসতো না, এখন

আসে, এবং অনেকক্ষণ বসে থাকে। সুলেখা লেখাপড়া জানা মেয়ে, সে পদানশীনা নয়, বাইরের লোকজনের সামনে তার ব্যবহার খুবই সাবলীল। সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন ত্রিদিব ঠিকই বুঝতে পারেন যে এইসব লোকেরা চায় যতক্ষণ বেশি সম্ভব সুলেখার আঁচলের বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে। অথচ ত্রিদিব কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না। কারুকে চলে যেতে বলার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ত্রিদিব জানেন যে তাঁর ভগ্নীপতি প্রতাপও সন্ধের দিকে মাঝে মাঝে আসেন ঐ একই কারণে। প্রতাপ সুলেখাকে বিশেষ পছন্দ করেন এবং সেকথা তিনি নিজের মুখে অনেকবার স্বীকার করেছেন। প্রতাপ এখন বসেন শিয়ালদা কোর্টে, সেখান থেকে প্রায়ই তিনি শেষ বিকেলের দিকে আসেন শ্বশুর বাড়িতে চা খেতে। ত্রিদিবের বিয়ের আগে তিনি আসতেন। কদাচিৎ। প্রতাপ আর ত্রিদিব সববয়সী হলেও সম্পর্কের সূত্রে প্রতাপ ত্রিদিবকে দাদা বলে ডাকেন। সুলেখাকে অবশ্য নাম ধরেই ডাকেন প্রতাপ। প্রতাপের আসার সময় আর ত্রিদিবের অফিস থেকে ফেরার সময় প্রায় সমসময়। মাঝে মাঝেই দরজার কাছে দেখা হয়ে যায়, তখন প্রতাপ কৃত্রিম আফসোসের সুরে বলেন, ইস, দাদা, আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন? ভাবলাম কিছুক্ষণ সুলেখাকে একলা পাবো, ওর রূপসুধা উপভোগ করবো! সারাদিন খাটনির পর সুলেখার এক ঝলক হাসি দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।

ত্রিদিব তখন বলেন, মজুমদার সাহেব, আমার বোনটিকে অবজ্ঞা করবেন না। আমার বোনও যথেষ্ট সুন্দরী। আমি তো মনে করি আমার বউ-এর চেয়ে আমার বোন আরও বেশি সুন্দর।

প্রতাপ উত্তর দেন, কী যে বলেন! আপনার বোনকে অবজ্ঞা করি এমন বুকের পাটা কি আমার আছে? তবে, বউ তো হাতের পাঁচ। সেই যে রবি ঠাকুর কোন্ বইতে যেন লিখেছেন না, নিজের বউ হলো আসল টাকা, আর শ্যালিকারা হলো সুদ। তা আমার একটি মাত্র শ্যালিকা, সেই বিনতাকে আপনি বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে!

সেইজন্যই, মধুর অভাবে গুড়ের মতন আমি শ্যালিকার বদলে শালাজ-এর কাছে সুদ নিতে আসি।

এই বলে প্রতাপ হেসে ওঠেন হা-হা শব্দে। সে হাসিতে কোনো মালিন্য নেই।

প্রতাপ অবশ্য ইদানীং অনেকদিন আসছেন না। প্রতাপ বাড়ির সবাইকে নিয়ে দেওঘর। গিয়েছিলেন এবং তারপর প্রতাপদের পরিবারে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে সে সব ত্রিদিব জানেন।

প্রতাপ এলে ত্রিদিবের ভালো লাগে, বেশ আড্ডা জমে। মুশকিল হচ্ছে অন্যান্য অনেককে নিয়ে, যারা আসে অকারণে বা মিথ্যে ছুতোয়। ত্রিদিবের সঙ্গে অবান্তর কথা বলতে বলতেও যারা আড়চোখে সুলেখার দিকে চেয়ে থাকে। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ত্রিদিবের আপন মামা। এই বীরেশ্বর মামা একসময় সেনাবাহিনীতে লিউটেনান্ট কর্নেল ছিলেন, রিটায়ার করেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। ইনি চিরকুমার এবং চেহারাটি এখনো ছিপছিপে সুদর্শন। প্রৌঢ় অবিবাহিত পুরুষরা মনে করে পরস্ত্রীদের সঙ্গে মেলামেলায় তাদের একটা বিশেষ অধিকার বা দাবী আছে।

বীরেশ্বর মামা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইটালিতে ছিলেন বলে সাহেবী হাবভাব দেখান খুব। কথায় কথায় তিনি সুলেখাকে জড়িয়ে ধরেন, লোকজনের সামনেই সুলেখার গাল টিপে দেন, হঠাৎ হঠাৎ দুপুরবেলা এসে উপস্থিত হন। সুলেখা এই নিয়ে স্বামীর কাছে অনুযোগ করেন। বীরেশ্বর মামা কী যেন করেন, আমার ভালো লাগে না! ত্রিদিবকে অসহায়ভাবে চুপ করে থাকতে হয়। নিজের মামাকে তো বলা যায় না যে তুমি যখন তখন আমাদের বাড়িতে এসো না কিংবা আমার বউয়ের গায়ে হাত দিও না!

মাঝে মাঝে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে সন্ধেবেলা সুলেখাকে অসুস্থতার ভান করে শুয়ে থাকতে হয়, বসবার ঘরে ত্রিদিব অনাহূত অতিথিদের আপ্যায়ন করেন, যারা কেউই ত্রিদিবের সঙ্গে গল্প করার জন্য আসেনি।

সেদিন ত্রিদিব বিকেলবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন, ধর্মতলা স্ট্রিটে তাঁদের গাড়ি জ্যামে আটকে গেল। ওয়েলিংটন মোড়ের কাছে পুলিশ-জনতায় খণ্ডযুদ্ধ চলছে। এমনই অবস্থা যে গাড়িটা পেছন দিকে ঘুরিয়ে নেবারও উপায় নেই। গাড়িতে ত্রিদিবের আরও তিনজন সহকর্মী রয়েছে, অফিসের গাড়ি প্রত্যেককে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়। অসহ্য গুমট গরম, গাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগলো না, ত্রিদিব নেমে পড়লেন। এখান থেকে তিনি হেঁটেই যেতে পারবেন। ত্রিদিব ছাত্র বয়েসে শুধু পড়াশুনোই করেছেন, কোনোরকম আন্দোলন-টান্দোলনে যোগ দেন নি, মিছিলে যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। কিন্তু এ পাড়ার মানুষ হিসেবে তিনি এই রকম। গণ্ডগোল দেখতে অভ্যস্ত, তাই ভয় পান না। একদিকে পুলিশ লাঠি চালালেও অন্য দিক দিয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটে চলে যাওয়া যায়।

ওয়েলিংটনের মোড়টা পার হবার পর ত্রিদিব বুঝতে পারলেন আজকের হাঙ্গামাটা বেশ ব্যাপক। পুলিশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাড়া করছে আন্দোলনকারীদের, ওরাও ছুঁড়ছে ইট-পাটকেল।

ত্রিদিব ঠিক করলেন ক্রীক রো দিয়ে শর্ট কাট করবেন। খানিকটা যাওয়ার পর দেখলেন পেছন দিক থেকে একদল লোক ছুটে আসছে পুলিশের তাড়া খেয়ে। আবার উল্টো দিক থেকেও এদিকে আসছে একটা দল। এরা নতুন আক্রমণকারী না পলাতক তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লোকজনের চিৎকারের মধ্যে প্রবল ভয় আছে। ফট ফট করে দুটো শব্দ হলো, গুলি না টিয়ারগ্যাস বোঝা গেল না। অবস্থা সুবিধের নয়, ত্রিদিব তৎক্ষণাৎ মন ঠিক করে একটুখানি দৌড়ে গিয়ে ডান দিকের একটি বাড়ির সদর দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজাটা ভেজানো ছিল, খুলে যেতেই ত্রিদিব ঢুকে পড়লেন ভেতরে, ত্রিদিবের দেখাদেখি আরও তিন-চারজন লোক চলে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলা থেকে ক্রুদ্ধ গলায় একজন বলে উঠলো, কে রে? কে রে? কানাই বুঝি। দরজাটা বন্ধ করেনি? আঃ, আর পারা যায় না, উটকো লোক ঢুকে পড়েছে। যাও, বেরিয়ে যাও, নইলে আমি পুলিশ ডাকবো।

ত্রিদিবের বুকটা ধড়ফড় করছে, কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যাবে। বাড়ি ফেরার ব্যস্ততায় এই রকমভাবে এগিয়ে আসা ঠিক হয় নি। গাড়ির মধ্যে বসে। থাকাটাই নিরাপদ ছিল। গাড়ি-চড়া লোকদের পুলিশ মারে না।

ধুতিটাকে লুঙ্গি করে পরা, খালি-গা একজন প্রৌঢ় দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আদেশ দিল, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও সব, আমি দরজা বন্ধ করবো!

এ বাড়িটা ত্রিদিবের পিসতুতো বোন ইলার শ্বশুরবাড়ি। এক পাড়ার মধ্যে হলেও কুটুম্বদের বাড়িতে ত্রিদিবের বিশেষ যাতায়াত নেই। আজ এসেছেন বাধ্য হয়ে। লজ্জিতভাবে ত্রিদিব ইলার ভাসুরকে বললেন, হরেনদা, আমিও এসে পড়েছি, রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ!

ত্রিদিবকে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর বদল করে হরেনবাবু বললেন, আরে ত্রিদিব! তুমিও আজকাল পলিটিকস করছো নাকি? এসো, এসো, ওপরে উঠে এসো! আজ তো দুপুর থেকেই গণ্ডগোল।

অন্যদের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, এই যে ভাই, বলছি না বেরিয়ে যেতে! আমার বাড়িতে এসব চলবে না!

একজন লোক দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখে বললো, যাবো কী করে? বাইরে লাঠি চার্জ হচ্ছে।

হরেনবাবু বলেন, ওসব আমি জানি না! পুলিশের দিকে ইট মারার সময় মনে ছিল না? ওপর থেকে দেখছি তো সব!

একজন লোক মাথায় দু'হাত চেপে বসে পড়েছে। তার কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। রক্ত।

রক্ত-দর্শনে ত্রিদিবের মাথা ঝিম ঝিম করে। মানুষ যে মানুষকে মারে, এই তথ্যটা এখনো তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। তিনি ফিসফিস করে বললেন, হরেনদা, ঐ লোকটার মাথা ফেটে গেছে! একটু জল...

হরেনবাবু বললেন, না, না, আমার এখানে আমি এসব ঝামেলা রাখবো না। পুলিশ এলে আমাকেই তখন জবাবদিহি করতে হবে। এদের জানো না তুমি, কমুনিস্টরা এদের ক্ষ্যাপাচ্ছে! আমরা তিন পুরুষ ধরে কংগ্রেসের সাপোর্টার।

আজকের বিক্ষোভ যে কিসের দাবিতে ত্রিদিব সেটাই জানেন না এখনো। তিনি দেখলেন, আহত লোকটির অবস্থা ভালো নয়, মুখখানা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে আছে, কিন্তু কোনো শব্দ করছে না। অন্য লোকগুলি বোধহয় এর পরিচিত নয়, কারণ কোনো কথা বলছে না, প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

হরেনবাবু তর্জন গর্জন করলেও লোকগুলোকে ঠেলে বার করে দিতে পারবেন না তিনি। জানেন। সবাই ক্ষেপে আছে। তিনি ত্রিদিবকে বললেন, চলো, ওপরে চলো, কানাইকে বলছি দরজা বন্ধ করে দেবে।

ত্রিদিব তবু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

একজন লোক দরজাটা একটু খুলে মুখ বাড়িয়ে বললো, পরিষ্কার হয়ে গেছে!

সঙ্গে সঙ্গে তারা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেল। আহত লোকটি উঠে দাঁড়ালো আস্তে আস্তে। ত্রিদিব বললেন, আজ আর ওপরে যাবো না, আমিও যাই।

হরেনবাবু বললেন, আরে না, না, চলো, চা-টা খেয়ে যাবে। একটু বিশ্রাম করে যাও, তারপর তোমার সঙ্গে আমি একজন লোক দিয়ে পাঠাবো!

ত্রিদিব বললেন, তার দরকার হবে না। এই তো এখান থেকে এইটুকু। ফিরতে দেরি করলে বাড়ির সবাই চিন্তা করবে।

প্রায় জোর করেই বেরিয়ে এলেন ত্রিদিব। রাস্তাটা অদ্ভুত রকমের ফাঁকা হয়ে গেছে, একজনও লোক দেখা যাচ্ছে না। শুধু ছড়িয়ে আছে অনেক ছেঁড়া জুতো, ইট-পাটকেল, টিয়ার গ্যাসের সেল। দূরে চিৎকার ও বোমার শব্দ শোনা যাচ্ছে, অর্থাৎ হাঙ্গামা এখনও থামে নি, গড়িয়ে গেছে অন্যদিকে, খুব সম্ভবত গণেশ এভিনিউ-এর মোড়টায়।

দ্রুত পা-চালাতে গিয়েও ত্রিদিব থমকে দাঁড়ালেন। আহত লোকটি একটু একটু হাঁটছে আবার থেমে গিয়ে টলছে। এই অবস্থায় ও কোনো হাসপাতালে কি পৌঁছোতে পারবে? আবার যদি জনতা-পুলিশের যুদ্ধটা এদিকে চলে আসে তখন ও পালাবেই বা কী করে? এখন আর কোনো বাড়ির দরজা খুলবে না।

ত্রিদিবের মনে হলো তাঁর কিছু করা উচিত। কিন্তু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। নিজের। ঘেরা গণ্ডির বাইরের মানুষের সঙ্গে মেশেন নি তিনি, অপরিচিত কারুর সঙ্গে প্রথম কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন, মিছিলের লোকদের চরিত্র তিনি জানেন না।

একবার ভাবলেন, দরকার নেই এসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। আবার খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলেন, লোকটি এক জায়গায় বসে পড়েছে।

দৌড়ে ফিরে গিয়ে ত্রিদিব লোকটির একটি হাত ধরে বললেন, উঠুন, হাঁটতে পারবেন তো? আমার সঙ্গে আসুন, কাছেই আমার বাড়ি!

লোকটি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, দরকার নাই। আপনে যান! আমারে হেল্প করতে। হবে না!

লোকটির কণ্ঠস্বর রুক্ষ ধরনের। লম্বাটে চেহারা, চোয়াড়ে মুখ, তাতে তিন-চার দিনের ছিটেছিটে দাড়ি। তার মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে একটা চোখ প্রায় বুজে যাচ্ছে, হাত দিয়ে মুছে মুছেও সে রক্ত থামানো যাচ্ছে না।

ত্রিদিব জোর দিয়ে বললেন, এক্ষুনি আপনার রক্ত বন্ধ করা দরকার। চলুন, আসুন!

লোকটি আবার বললো, আমার জন্য ভাবতে হবে না। আপনে যান!

গণ্ডগোলের স্রোতটা আবার এই রাস্তার মুখে, পার্কের পাশে চলে এলো। এখন এখানে। থাকা নিরাপদ নয়। ত্রিদিব লোকটির কাঁধ ধরে টেনে বললেন, শিগগির উঠুন!

এবারে লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে ত্রিদিবের পাশে পাশে ছুটতে লাগলো। ডান দিকের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে আরও খানিকটা গিয়ে ত্রিদিব অবিলম্বে বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেলেন, লোকটির হাত ধরে বললেন, ভেতরে আসুন চটপট।

দুপুর থেকেই এ পাড়ায় উৎপাত হচ্ছে বলে আজ বাড়িতে কোনো অতিথি আসেনি। ড্রয়িং রুমের পাখা খুলে দিয়ে লোকটিকে সোফায় বসিয়ে ত্রিদিব বাড়ির ঝিকে বললেন, ওপর থেকে বৌদিকে ডেকে আনো তো তাড়াতাড়ি।

লোকটি প্রথম ঝোঁকে সোফায় বসে পড়লেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো মেঝেতে। তারপর বললো, আমার রক্তে আপনের ঘরবাড়ি অপবিত্র হইয়া যাবে। আমি ছোট লোক!

ত্রিদিব বললেন, না, না, ওসব কী কথা? আপনি উঠে বসুন!

লোকটি বললো, আমি শুইয়া পড়ি।

সুলেখা উৎকণ্ঠিত হয়েই ছিলেন। খবর পেয়ে নেমে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। ত্রিদিব তাকে সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটি জানাতেই সুলেখা নিপুণভাবে দায়িত্ব নিয়ে নিলেন সব কিছুর। তুলে। আর গরম জল আনিয়ে প্রথমে লোকটির মাথার ক্ষত পরিষ্কার করে দিলেন ভালোভাবে তারপর ডেট্রল ঢেলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন। এক কাপ গরম দুধ লোকটির মুখের কাছে বললেন, নিন, এটা খেয়ে নিন তো!

ত্রিদিবকে তিনি বললেন, আমার মনে হয় মাথায় স্টিচ করানো দরকার। এতে রক্ত বন্ধ না।

লোকটি এক চুমুকে দুধটা খেয়ে নিয়ে বললো, নাঃ, আর কিছু লাগবে না। এখন আছি। আমাগো খুব কড়া জান, বোঝলেন!

লোকটি উঠবার চেষ্টা করতেই ত্রিদিব বললেন, আরে, এত হুড়োহুড়ি করছেন কেন? বসুন, আমার চেনা একজন ডাক্তারকে খবর পাঠাচ্ছি, সে এসে দেখে দেবে!

লোকটি ত্রিদিবের চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো, আপনেরা আমার জন্য এত সব করবেন কেন? কইলাম না, আমি ছোট লোক, অতি ঘৃণ্য!

সুলেখা সরল বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, ছোটলোকতার মানে কী? নিচু জাত?

লোকটি বললো, নিচুস্য নিচু। একেবারে পায়ের তলায় থাকার মতন। আমরা হইলাম রিফুউজি। উদ্বাস্তু!

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করলেন, আজকের মিছিলটা বুঝি রেফিউজিদের ছিল?

লোকটি বললো, হ, সরকার আমাগো আন্দামানে যাবজ্জীবন নির্বাসনে পাঠাইতে চায়, কিংবা দণ্ডকারণ্যে রাইক্ষসদের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড। আমরা তো বাংগালী না, পুব বাঙ্গলার থিকা আমরা সাধ কইরা পলাইয়া আইছি তো, তাই পশ্চিম বাঙ্গলায় আমাগো ঠাঁই নাই। তাই আমরা একটু চ্যাঁচামেচি করতে আইছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। পুলিশ সেইজন্য ডাণ্ডা মারলো আমার মাথায়, দুই একজনের বোধহয় গুলিতেও পেট ফুটা করছে।

ত্রিদিব বললেন, কিন্তু অনেক স্কুল কলেজের ছাত্রদেরও দেখলাম এর মধ্যে রয়েছে!

লোকটি বললো, বামপন্থী পার্টিগুলা আমাগো সাপোর্ট করতাছে। ক্যান যে করতাছে তা জানি না! আপনেরাও বামপন্থী নাকি?

ত্রিদিব বললেন, আমরা কোনো পার্টিতে নেই।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কী?

লোকটি এতক্ষণ ভালো করে তাকায় নি সুলেখার দিকে। এবারে সে মুখ তুলে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো। তার তিক্ত কর্কশ কণ্ঠস্বরটি নরম করে অভিভূতের মতন বললো, আপনি দেবী, সাক্ষাৎ ভগবতী, আমার মতন একজন নগণ্য মানুষরে আপনে দয়া করছেন, আপনের কাছে মিথ্যা কমু না। আমার নাম হারীত মণ্ডল। হতভাইগ্য রিকুইজিদের আমি এক অপদার্থ নেতা।

নামটা একটু চেনা চেনা লাগলো ত্রিদিবের। আগে কোথাও শুনেছেন বা ছাপা দেখেছেন। খবরের কাগজে কী?

হারীত মণ্ডল হঠাৎ সুলেখার পায়ে হাত দিয়ে বললো, আপনে আমার মা। আপনে ইচ্ছা করলে আমাকে পুলিশে ধরাইয়া দিতে পারেন।

সঙ্কুচিতভাবে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে সুলেখা বললেন, আরে, আরে, ছি, ছি, ওসব কী বলছেন? আমরা আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে যাবো কেন?

হারীত মণ্ডল বললো, অন্য লোকের কাছে আমি আমার আসল নাম কই না। অনেকের ধারণা আমি একজন খুনী। কাশীপুরের যে-জবর দখল বাড়িতে আমরা রইছি এখন, সেই বাড়ির মালিকদের একজন ঐখানে মারা গেছেন হঠাৎ। অন্য মালিকরা রটাইয়া দিচ্ছে যে আমিই তারে খুন করছি।

ত্রিদিব আর সুলেখা পরস্পরের দিকে বাঙ্ময় চোখে তাকালেন।

১৮ বিমানবিহারীদের আদি বাড়ি

বিমানবিহারীদের আদি বাড়ি কৃষ্ণনগর। মস্ত বড় বংশ। এই বংশের অনেকে ছড়িয়ে আছেন সারা ভারতবর্ষে, কৃতিত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে উচ্চপদে আসীন। দুজন আই সি এস,

একজন রাষ্ট্রপতির চিকিৎসক, একজন সেনাবাহিনীর মেজর। ঠাকুরবাড়ির জামাই এবং সুসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গেও বিমানবিহারীদের আত্মীয়তা আছে।

বিমানবিহারীর ঠাকুদা কলকাতায় এসে ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ভবানীপুরের বাড়িটি তাঁর আমলেই কেনা। বিমানবিহারীর বাবার আমলে অবশ্য অবস্থা বেশ বেড়ে যায়, কারণ তিনি উপার্জনের বদলে অর্থ ব্যয়েই বেশি আমোদ পেতেন এবং শিশির ভাদুড়ীর দলে ভিড়ে থিয়েটারের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিছুদিন একটা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে থিয়েটারের ব্যবসা করতে গিয়ে ভরাডুবি হচ্ছিলেন প্রায়, তাঁর অকালমৃত্যুই পরিবারটিকে বাঁচিয়ে দেয়।

প্রতাপের মতন আইন পাস করে বিমানবিহারীও কিছুদিন চাকরিতে ঢুকেছিলেন, তারপর তা। ছেড়ে আদালতে প্র্যাকটিস করতে যান, সেটাও তাঁর পছন্দ হলো না, ঠিক মন বসলো না। পশারহীন উঁকিল সকলেরই করুণার পাত্র, বিমানবিহারীর যখন সেইরকম অবস্থা, তখন তাঁকে পথ দেখালেন তাঁর অন্য এক বন্ধু।

কোর্টের কাছেই ডি জে কিমার অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে একটি বিলিতি প্রচার-প্রতিষ্ঠানের অফিস, সেখানে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আছেন বিমানবিহারীর এক বন্ধু দিলীপকুমার গুপ্ত। আদালত ছেড়ে বিমানবিহারী প্রায়ই যেতেন সেই বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে। অফিসের কাজকর্ম ছাড়াও দিলীপকুমার তখন অন্য একটি কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। তিনি তাঁর বিদুষী শাশুড়ির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সিগনেট প্রেস নামে বাংলা বইয়ের একটি প্রকাশনালয় চালাচ্ছেন। অল্প দিনেই এই প্রকাশনালয়টির দারুণ সুনাম হয়েছে। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিৎ রায় নতুন ধরনের চমৎকার সব মলাট আঁকছেন বইগুলির। সে ডি জে কিমার অ্যাণ্ড কম্পানিতেই দিলীপকুমারের সহকর্মী সত্যজিৎ। দিলীপকুমারের কামরায় ঐ দীর্ঘকায় তরুণ যুবকটিকে বিমানবিহারী দেখেছেন কয়েকবার।

দিলীপকুমারের সংস্পর্শে কিছুদিন থেকে বিমানবিহারী বই ছাপার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হলেন। দু জনের বাড়িও কাছাকাছি, দিলীপকুমার থাকেন এলগিন রোডে, এক একদিন বিকেলে দু'জনে একই সঙ্গে বাড়ি ফেরেন। প্রেস, টাইপ, কাগজ, লে-আউট, বাঁধাই এই সব বিষয়ে কথা বলায় দিলীপকুমারের অনন্ত উৎসাহ। সেই উৎসাহ বিমানবিহারীর মধ্যেও সঞ্চারিত হলো, তিনিও বই ছাপার ব্যবসায়ে নামলেন।

তবে বিমানবিহারী বন্ধুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গেলেন না।

সিগনেট প্রেস থেকে গোড়ার দিকে জওহরলাল নেহরুর ইংরিজি রচনা প্রকাশিত হলেও পরের দিকে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের বাছা বাছা বই ছাপতেই মনোনিবেশ করেন। বিমানবিহারী। প্রকাশ করতে লাগলেন শুধু ইংরিজি টেকনিক্যাল বই। ওকালতি বিষয়ে তাঁর ঠাকুর্দার লেখা। একটি বই ছিল, অনেকদিনই সেটা আউট অফ প্রিন্ট, বিমানবিহারী প্রথমে সেই বইটির পুনর্মুদ্রণ করলেন। তারপর ক্রমশ ডাক্তারি, গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বই। সাফল্য এলো দ্রুত, বি চৌধুরী। পাবলিকেশন্স-এর বই শুধু সারা ভারতবর্ষে নয়, মিশর,ইন্দোচীনেও রপ্তানি হতে লাগলো। ইনঅরগানিক কেমিস্ট্রির একটি বই পাঠ্য হলো পাঁচটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সারা বাড়িতে বই বই গন্ধ। তিনতলা বাড়ি, প্রচুর জায়গা, একতলার ঘরগুলি সবই বইএর গুদাম। মাঝে মাঝে মিল থেকে কাগজ কিনেও স্টক করে রাখতে হয়। দোতলায় বিমানবিহারীর নিজস্ব বিরাট লাইব্রেরি। সেই লাইব্রেরির মধ্যে একটি ছোট খাট, বিছানা আছে, প্রায় রাত্তিরেই বিমানবিহারী সেখানেই ঘুমোন। সেই ঘরেই টেলিফোন। কোনো কোনো রাতে দেড়টা-দুটোর সময়েও টেলিফোন বাজে। সে রকম টেলিফোন হঠাৎ বাজলেও ভয়ের কিছু নেই, ধরে নিতে হবে দিলীপকুমার ডাকছেন। ঐ মানুষটি নিশাচর। অদম্য তাঁর কর্মশক্তি। কোনোদিনই নাকি রাত আড়াইটে তিনটের আগে ঘুমোত যান না।

এমন বই-পাগল মানুষ দেখা যায় না। মধ্যরাত্রির পর, চতুর্দিক যখন নিস্তব্ধ, তখনই তাঁর পাণ্ডুলিপি পাঠ, কপি সংশোধন, প্রফ সংশোধন বা ফরম্যাট সাজানোর চিন্তার প্রকৃষ্ট

সময়। কোনো ভালো লেখা পড়লে বা ভালো বই দেখলে তিনি তখনই উৎসাহিত হয়ে বিমানবিহারীকে জানাতে চান। তা যত রাত্তিরই হোক না। একদিন মাঝরাত্তিরে টেলিফোনে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, বিমান, বলো তো, নির্জনতার রং কী?

বিমানবিহারী এরকম প্রশ্ন শুনলে উত্তর দেন না, কারণ তিনি জানেন, প্রশ্নকারী নিজেই উত্তর দেবেন। তিনি শুধু মৃদু কৌতূহল প্রকাশ করেন।

দিলীপকুমার বললেন, এটা বলতে পারলে না? শোনো, ভগবান শুধু চুল আঁচড়াবার জন্যই কাঁধের ওপর মাথাটা দেননি, ওটার একটা অন্য রকম ব্যবহারও আছে। মাঝে মাঝে মাথার সেই ব্যবহারটাও করো। নির্জনতার রং নীল, আবার কী?

বিমানবিহারী বললেন, যথার্থ। ঠিক বলেছো! আমার মাথায় খেলেনি।

–তাহলে দুপুরের রং কী হবে?

–ইয়ে, সাদা বোধহয়!

–সাদা আবার রং নাকি? সাদাই যদি হতো, তাহলে কি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম? কোনোদিন কি তুমি দুপুর দ্যাখোনি? নাকি তুমি সব সময় সান গ্লাস পরে থাকো? এই একটা বাজে জিনিস, সান গ্লাস! আলো-অন্ধকার-রোদবৃষ্টি এগুলো মানুষের চোখের পক্ষে খুব স্বাভাবিক, তা না, সান গ্লাসে চোখ ঢেকে পৃথিবীটাকে অন্য রঙে দেখা।

–দিলীপ, আমি সানগ্লাস খুব কম পরি। তুমি অন্য দিকে চলে যাচ্ছো। দুপুরের রং কী? আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

–হলুদ। তাছাড়া আর কী? আমি ‘নীল নির্জন’ আর ‘দুরন্ত দুপুর’ নামে দুটি কবিতার বই ছাপছি। তুমি হলে এই দুটো বইয়ের মলাটে কী রং দিতে?

–আমি ছাপবো কবিতার বই? তোমার ভয়ে তো আমি বাংলা বই-ই ছাপি না! তুমি নাকি। এক একটা বই-এর মলাট পাঁচ-ছ'বার করে আঁকাও? আমি যা বই ছাপি তার জন্য মলাট আঁকাতেই হয় না!

আর একবার, বছর দু'এক আগে রাত দেড়টার সময় দিলীপকুমার টেলিফোনে এক চমকপ্রদ খবর দিয়েছিলেন। সেদিন বিমানবিহারী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ফোনের ঝনঝন ধ্বনিতে ঘুম ভাঙে।

গলার আওয়াজ শুনেই দিলীপকুমার ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তাই প্রথমেই বললেন, বিমান, ঘুমোচ্ছিলে বুঝি? মৃত্যুর পরে যখন চিত্রগুপ্তর কাছে যাবে, তখন তিনি বলবেন, তোমার মহাপাপ হচ্ছে এই যে তুমি অর্ধেকটা জীবন ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। অতই যদি ঘুম ভালোবাসো, তা হলে মানুষের বদলে পাথর হলেই তো পারতে!

–আজ আবার তোমার মাথায় নতুন কোন্ চিন্তার উদয় হলো?

–তুমি মানিকের ছবিটা দেখেছো?

ঘুম চোখে বিমানবিহারী বুঝতেই পারলেন না, কে মানিক, কিসের ছবি!

তিনি আলগাভাবে উত্তর দিলেন, বোধহয় দেখিনি!

দিলীপকুমার যেন সেই উত্তর শুনে শারীরিকভাবে আহত হয়ে আর্তস্বরে বললেন, বোধহয়? তার মানে কী? হয় দেখেছো, অথবা দেখোনি। আর ঐ ছবি দেখার পরেও তুমি যদি বোধহয় বলল, তাহলে আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি কি মানুষ? না পুরোপুরি পাথর?

এই সবই দিলীপকুমারের কৌতুক। তিনি গম্ভীর, ধমকের সুরে মস্করা করতে ভালোবাসেন।

বিমানবিহারী বললেন, দিলীপ, ঠিক ধরতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে বলো। কিসের ছবি?

তখনই তিনি জানলেন যে সত্যজিৎ নামে বিজ্ঞাপন অফিসের সেই তরুণ শিল্পীটিরই ডাকনাম মানিক এবং সে পথের পাঁচালি নামে একটি ফিলম তুলেছে, অনেক ঝকমারির পর সদ্য রিলিজ করেছে ফিলমটি।

বিমানবিহারীর সিনেমা-থিয়েটারের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। অল্প বয়েসে নিউ থিয়েটার্সের দু চারখানা ছবি দেখেছেন মাত্র। তা চেনাশুনো কেউ যদি একটা ফিল্ম বানিয়ে থাকে সেটা কোনো এক সময় দেখে নিলেই চলবে। এত ব্যস্ততা কিসের? সেই রকম একটা দায়সারা উত্তর দিতেই দিলীপকুমার আবার বললেন, কোনো এক সময়! তুমি বুঝতে পারছো না আমি কোন্ ছবির কথা বলছি? পথের পাঁচালি! এদেশে কেন, সারা পৃথিবীতে এরকম ফিল্ম আগে তৈরি হয়নি। দেরী করো না। শিগগির যাও, যাও, দেখে এসো!

বন্ধুর কথায় সেরকম গুরুত্ব না দিয়ে বিমানবিহারী হাসতে লাগলেন। রাত দেড়টার সময় তিনি কোথায় সিনেমা দেখতে যাবেন? দিলীপের যা কাণ্ড!

বিমানবিহারী অবশ্য পরের দিন বা পরের সপ্তাহেও ফিল্মটি দেখতে যাননি। গড়িমসি করতে লাগলেন, উপরোধে ঢোঁক গিলতে গেলে যেরকম হয়। দিলীপের কম্পানির একজন একটা শখের ফি তুলেছে, সেটা দেখার জন্য তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে তাঁর দ্বিধা হয়। তিনি কাজের মানুষ।

এর মধ্যে তাঁর বাড়ির লোকেরা দেখে এসেছে। দিলীপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে ছবিটি না-দেখার কৈফিয়ত দিতে হবে বলেই বিমানবিহারী এক শনিবার সন্ধেবেলা গেলেন খুব। কাছের একটি হলে। একা। দর্শক বেশি নেই, টিকিট রয়েছে অঢেল। ছবিটি যখন শেষ হয়ে গেল, অন্য দর্শকরা উঠে পড়েছে, তখনও তিনি বসে বসে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। এ অশ্রু শুধু কাহিনীর করুণ রসের জন্যই নয়। একটি মহৎ শিল্প প্রত্যক্ষ করার কারণে। বেশ কিছু বছর ধরে বাংলা দেশে শুধু দাঙ্গা-হাঙ্গামা, স্বার্থান্বেষীদের ঝগড়া,

রাজনৈতিক রেষারেষি এই সবই চলছিল! চতুর্দিকে ক্ষুদ্রতা আর অধঃপতনের সূচনা। বাঙালীর নিজস্ব কোনো কিছু নিয়েই গর্ব করার কিছু ছিল না। এতদিনে এই একটি হলো।

বিমানবিহারী কোনো রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে না থাকলেও দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। শুধু নিজের বা নিজের পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধিতেই তিনি সন্তুষ্ট নন। তাঁর প্রকাশনা ব্যবসা একটু দাঁড়িয়ে যাবার পর থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের বিনা মূল্যে বই দেন, প্রতি বছর দুজন রিসার্চ স্কলারকে জলপানি দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর প্রচুর ছোটখাটো দান আছে, সেকথা বাইরের কেউ জানে না। কেউ নতুন ধরনের কোনো যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের কথা বলে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি বিনা দ্বিধায় টাকা পয়সা দিয়ে দেন। এ ব্যাপারে প্রতারিতও হয়েছেন অনেকবার।

বিমানবিহারী বিয়ে করেছেন বেশ দেরিতে। তাঁর পুত্রসন্তান নেই, আছে দুটি কন্যা। তাঁর মা। বেঁচে আছেন, তাছাড়া রয়েছেন এক পিসিমা, তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে। কৃষ্ণনগর থেকেও কেউ কেউ এসে থেকে যায়। ছেলেমেয়েদের জন্য একজন গৃহশিক্ষক আছেন, তিনি আক্ষরিক অর্থেই গৃহশিক্ষক, থাকেন এ বাড়িতেই। বাল্যকাল থেকেই বিমানবিহারী লোকজনে জমজমাট বাড়ি দেখতে অভ্যস্ত।

একদিন রাত পৌনে একটায় বাজলো টেলিফোন। সেদিন বিমানবিহারীর সামান্য জ্বর হয়েছে। তিনি সেদিন শুয়েছেন তিনতলায় তাঁর স্ত্রীর ঘরে। ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। চাকর ওপরে এসে খবর দিতেই কল্যাণী বললেন, দিলীপবাবুকে বলে দাও যে বাবুর আজ অসুখ হয়েছে।

কিন্তু এর মধ্যে ঘুম ভেঙে গেছে বিমানবিহারীর। তিনি বললেন, না, না, ধরতে বলল। আমার এমন কিছু হয়নি, আমি আসছি।

নিচে এসে রিসিভার তুলে তিনি অবাক হলেন। দিলীপকুমারের পরিচিত রঙ্গমাখা কণ্ঠ নয়। অপারেটর বললো, মিঃ বি চৌধুরী? হোল্ড দ্য লাইন ...ট্রাঙ্ক কল ফর ইউ, ফ্রম লণ্ডন!

বিমানবিহারীর বুক কেঁপে উঠলো। নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ!

ভালো করে শোনা যাচ্ছে না, কয়েকবার হ্যালো হ্যালো ও নানারকম বিচিত্র শব্দের পর একজন বললো, দাদা, আমি মানু বলছি। মানু! সারাদিন ধরে তোমায় ধরার চেষ্টা করছি।

বিমানবিহারী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। লণ্ডন শুনেই তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল। তাঁর এই প্রবাসী ভাইটি সম্পর্কে তাঁকে গোপন দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয়। পারিবারিকভাবে তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও তবু তো নিজেরই ভাই।

বঙ্কুবিহারী পড়াশুনোয় ভালো ছাত্র ছিল, তাই উচ্চশিক্ষার্থে যখন সে বিলেতে যেতে চেয়েছিল, তার দাদা আপত্তি করেননি। কত ছেলেই তো বিলেত থেকে ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে আসে, এখানকার সমাজের চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বঙ্কুবিহারী লণ্ডনে যাবার দেড় বছরের মধ্যে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করে ফেলো এবং তার পড়াশুনো গোল্লায় গেল।

ছোট ছেলের ঐ রকম বিয়ের খবর শুনে মা শয্যাশায়ী হলেন। বউ নাকি থিয়েটারে কাজ করে। থিয়েটারের জগৎ সম্পর্কেই মায়ের প্রবল ঘৃণা আছে। তিনি বিমানবিহারীকে ডেকে বললেন, বীরু, তুই মানুকে লিখে দে, ও যদি ঐ বউকে ছেড়ে দিয়ে এক্ষুনি না ফিরে আসে, তাহলে আমি কোনোদিন আর ওর মুখ দেখতে চাই না।

কিন্তু বঙ্কুবিহারী তার বউকে ত্যাগ করেনি, সঙ্গে সঙ্গে ফিরেও আসেনি। সে সস্ত্রীক এসেছিল বছর চারেক আগে। সরাসরি বাড়িতে না এসে সে উঠেছিল এ্যাণ্ড হোটেলে।

মানুর বিদেশিনী বিয়ে করার ব্যাপারে বিমানবিহারীর নিজের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু তিনি মর্মাহত হলেন ছোট ভাই-এর স্বভাবের পরিবর্তন দেখে।

তাঁদের চৌধুরী পরিবারে বিলেত যাওয়াটা নতুন কিছু নয়। মেমবউও আগে দেখেছেন। বিমানবিহারীর এক মেম কাকিমা ছিলেন, তিনি অতি মধুর স্বভাবের মহিলা। তাঁর কাকাও

ছিলেন পুরোপুরি বাঙালী। কিন্তু মানু ফিরলো সাহেবদের একটি ক্যারিকেচার হয়ে, ইংরিজি ছাড়া কথা বলে না, সকলের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব। ওদিকে সে আবার বউ-এর ভয়ে সবসময় অস্থির। বউ যা বলে, সে সেই কথাটাই চারবার হ্যাঁ হ্যাঁ করে। স্বামী নয়, সে যেন বউয়ের মোসাহেব। আসল সাহেবরা কি এরকম বউয়ের আঁচল ধরা হয়? অবশ্য ইংরিজিতে হেন-পেন্ড হ্যাঁজব্যাণ্ড বলে একটা কথা আছে।

বঙ্কুবিহারী যখন বউকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল তখন তাঁর মেমবউয়ের মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। বিদেশিনীরা অনেকে পুরুষদের মতনই সিগারেট খায়, তা সবাই জানে। অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু বন্ধু কি তার স্ত্রীকে বোঝাতে পারতো না যে এ দেশে মায়েদের কাছে পুত্রবধূরা ঐভাবে যায় না? সে সাহসই তার নেই।

মা ছেলে বা বউয়ের সঙ্গে একটিও কথা বললেন না, একবার তাকালেন না পর্যন্ত। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বড় ছেলেকে উদ্দেশ করে বললেন, বীরু, মানুকে বলে দে, ওরা যেমন হোটেলে উঠেছে সেখানেই যেন থাকে। এ বাড়িতে তাদের জায়গা হবে না।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত তিক্ততায় পর্যবসিত হলো। মানু তার দাদার কাছে সম্পত্তির অংশ দাবি করে বসলো এবং শাসানি দিল মামলা-মোকদ্দমার। সে চায় ভবানীপুরের বাড়িটা বিক্রি করে অর্ধেক টাকা দেওয়া হোক তাকে। আগে সে সমীহ করতো দাদাকে, চোখ তুলে কথা বলতো না, এখন তার চক্ষুলজ্জার বালাই নেই।

নানা জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে টাকা সংগ্রহ করে বাড়িটাকে বাঁচিয়েছিলেন বিমানবিহারী। বাজার দর অনুযায়ী অর্ধেক টাকা পেয়েও মানু সন্তুষ্ট নয়, যেন শয়তান ভর করেছিল তার মাথায়, সে এই পরিবারটিকে ধ্বংস করে দিতে চায়। বিমানবিহারী যে বই-এর ব্যবসা করছেন, তাও নিশ্চয়ই শুরু হয়েছিল পৈতৃক টাকায়, সুতরাং ঐ ব্যবসায়েরও অংশ দিতে হবে মানুকে। তা ছাড়া কৃষ্ণনগরের সম্পত্তি আছে। তার আরও অনেক টাকা চাই।

শেষ পর্যন্ত হয়তো চরম কিছু ঘটে যেতে পারতো, কিন্তু তার আগে হঠাৎ মানুর স্ত্রীর টাইফয়েড হয়ে গেল। এ দেশের কোনো ডাক্তারের ওপর তার ভরসা নেই, সেই জন্য। হুড়োহুড়ি করে তারা ফিরে গেল ইংল্যাণ্ডে।

তারপর মানু আর কোনো চিঠিপত্রও দেয়নি। এতদিন পর গভীর রাতে তার টেলিফোন।

বিমানবিহারী বললেন, কী খবর, মানু? কেমন আছিস?

মানুর কণ্ঠস্বর বদলে গেছে, ঔদ্ধত্যের ভাব নেই, ইংরিজি বলছে না। সে যেন আগেকার মানু।

সে বললো, দাদা, আমরা ভালো আছি। এখন আমরা আয়ার্ল্যাণ্ডে থাকি। নতুন কাজ নিয়েছি, ব্যস্ত ছিলাম, তাই তোমাদের খবর নিতে পারিনি অনেকদিন। মা আছে? মা কেমন আছে?

–মা ভালো আছেন।

–বৌদি? ছেলেমেয়েরা? দাদা, তোমার ব্যবসা কেমন চলছে?

–সবই ঠিক আছে। তোর খবর বল।

–দাদা, আমি কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরতে চাই। আমার স্ত্রীর খুব ভারতবর্ষ দেখার ইচ্ছে। তোমার মত আছে?

–তুই দেশে ফিরবি, তাতে আমার অমত থাকবে কেন? নিশ্চয়ই আসবি। কবে আসছিস?

–জাহাজের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। বোম্বেতে নামবো। তাই আগে জানতে চাইলাম, তোমাদের কোনো অমত আছে কি না, তা হলে আর কলকাতায় যাবো না, কাশ্মীরের দিকে চলে। যাবো।

–কেন কলকাতায় আসবি না? নিশ্চয়ই আসবি।

–একবার মাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে।

–মায়ের বয়েস হয়ে গেছে, এখন অনেক নরম হয়েছেন, আমি বুঝিয়ে বলবো।

টেলিফোন ছাড়ার পর বিমানবিহারীর মনে একটা অশুভ চিন্তা এলো। আগেরবার মানুকে তিনি টাকাপয়সা দিয়েছিলেন, তার জন্য কোনো পাকা দলিল লিখিয়ে নেননি। সেই সময় পাওয়া যায়নি। টাকার একটা রশিদ সে দিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে এই বাড়ির ওপর তার অধিকার খারিজ হয়ে যায় না। মানু কি আবার টাকা আদায়ের মতলবে আসছে?

বিমানবিহারী এই চিন্তাটাকে আপাতত উড়িয়ে দিতে চাইলেন। হয়তো মানু সত্যিই আবার বদলে গেছে। তার কণ্ঠস্বরে কাতরতা ফুটে উঠছিল। রক্তের সম্পর্ক মানুষ সহজে অস্বীকার করতে পারে?

মানু যদি এ বাড়িতেই এসে উঠতে চায় সেই জন্য বিমানবিহারী দোতলার দুটি ঘর পরিষ্কার। করিয়ে রাখলেন, বাথরুম সারিয়ে, রং করালেন। কল্যাণীকে সব জানালেন, মা-কে কিছু বললেন না আপাতত।

দেড় মাস বাদে বউকে নিয়ে উপস্থিত হলো বঙ্কুবিহারী, ট্যাক্সিতে মালপত্র। বউ দেখে সবাই অবাক। এ তো আগের বউ জুডিথ নয়, অন্য একজন। এ বউও মেমসাহেব বটে, কিন্তু এর পরনে সিল্কের শাড়ি, কপালে লাল টিপ, পায়ে চটি। বঙ্কুবিহারী পরে আছে ধুতি-পাঞ্জাবি।

গাড়ি থেকে নেমে বিমানবিহারীর দিকে হাত দেখিয়ে বঙ্কুবিহারী বললো, লিজ, ইনি আমার দাদা।

হাত জোড় করে নম্র গলায়, ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে বাংলায় মেম বউ বললো, নমস্কার। ভালো আছেন?

১৯ পিকলু আর বাবলু এক স্কুলে পড়তো

আগে পিকলু আর বাবলু এক স্কুলে পড়তো, তাতে সুবিধে ছিল, দুই ভাই ফিরতে একসঙ্গে। এখন পিকলু কলেজে যায়, তাই বাবলুর জন্য মমতার প্রতিদিন দুশ্চিন্তা। সেন্ট্রাল এভিনিউ পার হয়ে আসতে হয়। অত বড় রাস্তা, এক মুহূর্তও গাড়ির বিরাম নেই। কিন্তু কে আনতে যাবে বাবলুকে? আগে কানুকে দিয়ে এইসব কাজ করানো হতো, এখন কানু চাকরি করে। বাবলুটা অসম্ভব দুরন্ত বলেই তো বেশি ভয়।

এ পাড়ারই সরকারদের বাড়ির একটি ছেলে শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে পড়তে যায়। সেবাড়ির একজন চাকর যায় ছেলেটাকে আনতে, তাই মমতা একদিন যেচে সেই ছেলেটির মায়ের সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন। ভদ্রমহিলা বেশ ভালো, তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুখীরাম তো যায়ই, ও আমার ছেলের সঙ্গে আপনার ছেলেকেও নিয়ে আসবে। এতে আর কী আছে!

কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও সুফল পাওয়া গেল না। বাবলু ক্লাস এইটে পড়ে। তার আত্মসম্মান জ্ঞান টনটনে হয়ে উঠছে, সে অন্য বাড়ির চাকরের হাত ধরে বাড়ি ফিরবে কেন? দুদিন পরেই বাবলু সরকারবাড়ির ছেলেটির সঙ্গে ঝগড়া করলো, তারপর তাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

স্কুল ছুটির পর বাবলু খানিকটা হেঁটে এসে সেন্ট্রাল এভিনিউ পেরিয়ে শ্যাম পার্কে ঢুকে পড়ে। এখানে বিভিন্ন ক্লাবের ছেলেরা খেলে, বাবলুকে তো তারা খেলতে নেবে না, তাই বাবলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখে আর মাঝে মাঝে দৌড়ে গিয়ে বল কুড়িয়ে এনে দেয়।

প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফেরে বাবলু। ক্ষিদে-পেটে অন্য কিছু খেতে পাওয়ার আগে বকুনি খায়। কিন্তু বকুনি বা মারও সে গ্রাহ্য করে না। একমাত্র সে ভয় পায় বাবাকে।

আদালত থেকে ফিরতে ফিরতে প্রতাপের সন্ধে হয়ে যায়। বাবলু ঠিক তার আগে ফিরে আসে। মমতা বা বাড়ির অন্য কেউ প্রতাপের কাছে বাবলুর নামে নালিশ করতে সাহস পান না। বাড়িতে প্রতাপ বড় কড়া হাকিম, তা ছাড়া এখানে আসামী পক্ষের উঁকিল নেই। তাই শাস্তি বড় গুরুতর হয়। এই বছরেই বাবলু বাবার কাছে দু'বার মার খেয়েছে।

আড়াইখানা মাত্র ঘর, এখন আর জায়গায় কুলোয় না, প্রতাপ নতুন বাড়ি খুঁজতে শুরু করেছেন। এখানে পঁচাশি টাকা ভাড়া দিতে হয়। বাড়ি ভাড়া ইদানীং যে-ভাবে হু-হুঁ করে বাড়ছে তাতে নতুন বাড়ি নিতে গেলেই অন্তত দ্বিগুণ টাকা দিতে হবে। এখন প্রতি পদে পদে টাকার চিন্তা।

একটা ঘর প্রতাপ-মমতার, আর একটা ঘরে সুপ্রীতি থাকেন তুতুলকে নিয়ে, ছোট ঘরটাতে কানু-পিকলুবাবলুর ঢালা বিছানা। বাইরের লোকজন এলে বসার জায়গা দেওয়া যায় না। কোনো কোনো দিন সকালে প্রতাপের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে তাঁকে ছেলেদের ঘরেই বসতে হয়, ছেলেরা তখন পড়া ছেড়ে উঠে যায়।

পিকলু আর তুতুল দু'জনেই পড়াশুনোয় খুব ভালো, সকলের মুখেই তাদের প্রশংসা। বাবলুর পড়াশুনোয় মন নেই, সব সময় তার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি ঘুরছে। দাদা আর ফুলদির থেকে আলদা হবার জন্যই যেন সে ইচ্ছে করে পরীক্ষায় ফেল করতে চায়। এবারেই অঙ্কে সে পেয়েছে আঠাশ আর ইংরিজিতে বত্রিশ, সেই জন্য তার প্রমোশন আটকে যাচ্ছিল, পিকলু হেড মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে বাবলুকে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু বাবার হাতে বাবলুর মার খাওয়া সে আটকাতে পারে নি।

পিকলু খুব চেষ্টা করে ছোট ভাইটার পড়াশুনোর দিকে মন ফেরাতে। ছুটির দিনে সে তাকে হোম টাস্ক দেয়। কিন্তু বাবলু দাদাকে ভয় পায় না, হঠাৎ হঠাৎ উঠে চলে যায়।

পিকলুর খেয়াল হতেই নিজের পড়া ছেড়ে উঠে পড়তে হয় বাবলুকে খুঁজতে, জোরে ডাকাডাকি করতে পারে না, বাবা শুনে ফেললে তিনি নিজেই জানতে চাইবেন বাবলু কোথায়। বাড়ির মধ্যে কোথাও দেখা যায় না বাবলুকে, বাড়ির সামনে রাস্তাতেও সে নেই, একটু এগিয়ে এসে পাশের বস্তির সামনে সে দেখতে পায় যে বাবলু ওখানকার ছেলেদের সঙ্গে ডাং-গুলি খেলছে।

মহা বিস্ময়ের সঙ্গে পিকলু ডাকে, বাবলু! তুই....

তার উত্তরে বাবলু হাসে।

রাত্তিরে আলো নিবিয়ে দেওয়ার পর পাশাপাশি শুয়ে ওদের তিনজনের নানারকম গল্প হয়। কানু শোনায় তার অফিসের গল্প। সম্প্রতি আগের চাকরি ছেড়ে সে একটা ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছে। যদিও তার চাকরিটা ক্লারিকাল, ক্যাশ-ঘরে ঢোকার কথা নয় তার, কিন্তু রোমহর্ষক কাহিনী বানাতে সে ওস্তাদ। শোভাবাজার রাজবাড়ির এক রানী একদিন নাকি এক ঘড়া মোহর নিয়ে এসেছেন ব্যাঙ্কে ভাঙাবার জন্য। কানুর ওপর সেই মোহর গুনবার ভার দিলেন। ম্যানেজারবাবু। সেই মোহর গুনতে গুনতে কানু দেখতে পেল এক একটা মোহরের গায়ে লেগে আছে রক্তের দাগ। সোনার ঘড়াটার গায়েও ছিটে ছিটে রক্ত শুকিয়ে আছে। মোহর-ভর্তি সোনার ঘড়া মাটিতে পুঁতে রাখার সময় একটা ছোট ছেলেকে মেরে তার দেহটাও একসঙ্গে পুঁতে রাখতো তো ওরা, যখ হয়ে পাহারা দেবার জন্য...।

এই কাহিনী শুনে পিকলু আর বাবলুর মনে দু'রকম প্রতিক্রিয়া হয়।

রাজবাড়ির রানীর চেহারাটা কল্পনা করতে চায় পিকলু। চাঁপাফুলের মতন গায়ের রং, নীল রেশমী শাড়ী পরা, মুখে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব, উদাসীনভাবে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। মুখখানা কার মতন? কার মতন? অনেকটা বুলা মাসির মতন নয়!

আর বাবলু ভাবে, শোভাবাজার রাজবাড়িটা একদিন সে দেখেছে। গেটের বাইরে দুটো সিংহ মূর্তি। তাদের স্কুল থেকে বেশি দূর নয়। একদিন টপ করে ঢুকে পড়তে হবে ঐ বাড়ির মধ্যে। নিশ্চয়ই ওখানে এখনো গুপ্তধন আছে।

পিকলু স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ে। প্রত্যেকদিন সে আট আনা হাত খরচ পায়। তাছাড়া, কোনো কোনোদিন যদি সে মমতাকে বলে, মা, আজ বসন্ত কেবিনে বন্ধুদের সিঙ্গাড়া খাওয়াতে হবে, কাল একটা বাজিতে হেরে গেছি, দুটো টাকা দাও, তাতে মমতা আপত্তি করেন না। বাবলুর হাত-খরচ দু'আনা মাত্র। তা দিয়ে সে ঘুড়ি কিনবে না আলু কাবলি খাবে? এখন আলু কাবলি চার পয়সা পাতা হয়ে গেছে। বাবলু এই জন্য দারুণ হিংসে করে দাদাকে। ইস্কুলের শেষ দুটো বছর যেন সে আর সহ্য করতে পারছে না। সে এখনই এক লাফে কলেজে গিয়ে স্বাধীন হতে চায়।

একদিন এক ক্লাস-ফ্রেণ্ডের দিদির বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গেল পিকলু, বলেই গিয়েছিল যে তার ফিরতে দেরি হবে, সে ফিরলো রাত সাড়ে দশটায়। ঘুম এসে গেলেও জোর করে চোখ খুলে বাবলু জেগে রইলো ততক্ষণ। বাড়ির কেউ সঙ্গে যায় নি, দাদা একলা গেছে, একলা ফিরবে। এ এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। মা বাবা-পিসিমা মুখে কোনো উদ্বেগ না দেখালেও গল্প করছেন পাশের ঘরে, পিকলু না ফেরা পর্যন্ত তাঁরা শুতে যাবেন না।

পিকলু অত রাতে ফিরলেও কেউ বকুনি দিলেন না। মা প্রায় হাসি মুখেই জিজ্ঞেস করলেন। হ্যাঁরে পিকলু, এত রাত হলো? কার সঙ্গে ফিরলি!

পিকলু বললো, অনেক দূরে যে। আমি ফাস্ট ব্যাচেই খেয়ে নিয়েছি, তারপর বাসে আসতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। আমার আর এক বন্ধু সঙ্গে ছিল, সে নেমে গেল বিডন স্ট্রিটে।

-সেও তো অনেক দূর। তারপর থেকে একলা এলি?

-মা, বাসে তো আরও অনেক লোক ছিল। একলা কী করে আসবো?

পিকলু জামা-প্যান্ট বদলে শুয়ে পড়ার পর বাবলু তার দাদার মুখে সিগারেটের গন্ধ পেল। ঠোঁট লাল। পানও খেয়েছে। সব বড়দের মতন। বাড়িতে সাহস পায় না, কিন্তু পিকলু বাইরে সিগারেট খায়, তা বাবলু জানে। কানু সিগারেট টানার জন্য ছাদে উঠে যায়।

কানু জিজ্ঞেস করলো, বিয়ে বাড়িতে গেলি, গোল্ড ফ্লেকের টিন আনিসনি!

পিকলু বললো, না তো! কী করে আনবো?

কানু বললো, আমি কোনো বিয়ে বাড়িতে গেলেই একটা পুরো টিন পকেটে ভরে ফেলি। অনেকগুলো থাকে তো, কেউ লক্ষ করে না।

পিকলু বললো, কত দূর গিয়েছিলুম জানো? সেই বালিগঞ্জ! কী সুন্দর জায়গা!

কানু অভিজ্ঞের ভাব দেখিয়ে বললো, আমি চিনি বালিগঞ্জ। বালিগঞ্জের কোথায় তোর বন্ধুর বাড়ি?

-রাসবিহারী এভিনিউ। কী চমৎকার রাস্তা! দু পাশে গাছ। ট্রাম চলে মাঝখান দিয়ে। রাস্তাটা পরিষ্কার তেল চকচকে, আর কত বড় বড় দোকান, কাঁচের শো-কেস দিয়ে ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। আর একটা কী জিনিস দেখলুম জানো, কানুদাদা, মেয়েরা চেন-বাঁধা কুকুর নিয়ে ওখানে একলা একলা বেড়াতে বেরোয়।

-হ্যাঁ, পাড়াটা ভালো। সেজদা তো বাড়ি বদলাবার কথা ভাবছে, বল না, ও পাড়ায় একটা বাড়ি নিতে।

-ওটা তো বড়লোকদের পাড়া। একটাও খালি গায়ে কিংবা নোংরা জামা পরা লোক দেখিনি।

বাবলু নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে। যেন কোনো রূপকথার জগতের কাহিনী। সে একবার মা বাবার সঙ্গে কালীঘাটে একটা নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল, অনেকদিন আগে, ভালো করে মনে। নেই, তাছাড়া ফেরার পথে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বালিগঞ্জ কি তার থেকেও দূরে?

সে তখনই ঠিক করে ফেলোে, একদিন সে একা একা বালিগঞ্জে বেড়াতে যাবে। বড় হওয়া। পর্যন্ত সে আর ধৈর্য রাখতে পারবে না। মেয়েরা চেনা বাঁধা কুকুর নিয়ে একলা একলা বেড়াতে বেরোয়? কী রকম কুকুর, তাকে দেখতেই হবে।

ক'দিনের টিফিনের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে সে এক টাকা করলো। তারপর একদিন কার জন্মদিনের জন্য যেন হাফ-হলিডে হতেই ভালো সুযোগ এসে গেল তার। বাড়ির কেউ তো জানে না যে আজ ছুটি হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে সে চলে এলো শ্যামবাজার। এখানে সে বালিগঞ্জ লেখা দোতলা বাস দেখেছে।

সেরকম একটা বাসে উঠে পড়লো বাবলু। ওপর তলায় উঠে একেবারে সামনে গিয়ে বসলো। হু-হুঁ করে হাওয়া দেয় এখানে। রাস্তার ধারের গাছের ডাল জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সামনের রাস্তাটা কত দূর পর্যন্ত দেখা যায়, যেন তেপান্তরের মাঠে চলে গেছে।

এক সময় কণ্ডাক্টর এসে বললো, খোকা, তোমার সঙ্গে কে আছে!

বাবলুর বুক কেঁপে উঠলো। এরা বুঝি তার মতন বয়েসি ছেলেদের একা যেতে দেয় না?

সে রকম নিয়ম নেই? এখন তাকে নামিয়ে দেবে বাস থেকে?

বাবলু কোনো উত্তর না দিয়ে শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলো।

কণ্ডাক্টর আবার জিজ্ঞেস করলো, তোমার টিকিট কে কাটবে?

এবারে বাবলু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললো, আমি! বালিগঞ্জ যাবো।

সে সব কটা খুচরো পয়সা এগিয়ে দিতে কণ্ডাক্টর তার থেকে তুলে নিল একটা সিকি।

বাবলুর পাশে বেশ হোমরা-চোমরা ধরনের বয়স্ক লোক বসেছেন। তিনি বাবলুর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, খোকা, তোমার নাম কী?

–শ্রীঅতীন মজুমদার।

–ইস্কুল থেকে ফিরছো, তুমি বালিগঞ্জ থেকে এতদূর পড়তে আসো? কেন, ওখানেও তো ভালো ভালো ইস্কুল আছে!

বাবলু চুপ করে রইলো।

–বালিগঞ্জে কোথায় থাকো?

–রাসবিহারী এভিনিউ।

–হ্যাঁ, রাসবিহারী এভিনিউ-এর কোন জায়গায়–ওটা তো অনেক বড় রাস্তা! দেশপ্রিয় পার্ক? ট্রায়ঙ্গুলার পার্ক?

বাবলু দ্বিতীয়টিতে মাথা নেড়ে দিল বিনা দ্বিধায়।

কথাবার্তা আর বেশি দূর এগোলো না। ভদ্রলোক সামনের দিকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, এ কী। আজ আবার কোন্ হাঙ্গামা শুরু হলো?

বাবলু দেখলো, রাস্তার মাঝখানে অনেক লোক দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাসটাকে থামাতে চাইছে। ড্রাইভার কিন্তু বাসটা থামালো না, পাশ কাটিয়ে এগোবার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড একটা হইচই উঠলো, বাসের গায়ে দুম দাম কিসের আঘাত পড়তে লাগলো। বাসটা তবু বেরিয়ে গেল। খুব টেনে।

বাবলুর পাশের ভদ্রলোক বললেন, যাক, খুব বাঁচোয়া! রোজ একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। আর পারা যায় না। এই গভর্নমেন্টও হয়েছে অপদার্থ।

বাসের সব যাত্রী এক সঙ্গে যোগ দিল রাজনৈতিক আলোচনায়।

বাবলু সে সব কিছু শুনছে না। সে চোখ ভরে দেখছে এসপ্লানেডের অপরূপ দৃশ্য। এ যেন সত্যিকারের সেই তেপান্তরের মাঠ। সবুজ ঘাসে ভরা। যত দূর চোখ যায়, আর কিছু নেই। এক পাশে কী সব প্রকাণ্ড বাড়ি। আর ঐ তো মনুমেন্ট!

এক একটা জিনিস চিনতে পারছে আর বাবলুর বুকটা ধক ধক করছে। কলম্বাস, ম্যাগেলান, ডঃ লিভিংস্টোনের মতন আবিষ্কারকদের তুলনায় বাবলুর রোমাঞ্চকর উত্তেজনা এখন কিছু মাত্র কম নয়। একটি সাড়ে তের বছর বয়স্ক কিশোরের চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে অচেনা জগৎ।

বাসটা আর বেশি দূর যেতে পারলো না। এলগিন রোডের কাছে ক্রুদ্ধ জনতা রাস্তার ওপর ব্যারিকেড বানিয়েছে। ট্রাম ভাড়া আন্দোলনের সময় কয়েকটি ট্রাম পোড়াবার পর এখন যে-কোনো আন্দোলনেই বিক্ষোভকারীরা ট্রামবাস পোড়াবার খেলায় মেতে ওঠে।

ওপরের সব লোক দুদ্দাড় করে কেন নেমে গেল, তা বুঝতে পারলো না বাবলু। কেউ তাকে ডাকলোও না। বাবলু বসেই রইলো। নিচে তুমুল গোলমাল হচ্ছে, এসব তার একটুও ভালো লাগছে না। এখনো নিশ্চয়ই বালিগঞ্জ আসেনি, একটিও মেয়েকে চেনবাঁধা কুকুর নিয়ে বেড়াতে দেখেনি সে।

বুম বুম করে দুটি বোমা ফাটার আওয়াজ ও বাসের গায়ে আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠতেই বাবলু বিপদের গন্ধ পেয়ে গেল। দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে সে। দেখলো শুধু ধোঁয়া। কিন্তু সে ভয় পেল না। গোঁয়ারের মতন সেই ধোঁয়ার মধ্য দিয়েই সে লাফিয়ে চলে এলো। তার গায়ে সামান্য আঁচ লেগেছে, আর বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি।

জ্বলন্ত বাস থেকে একটা ছেলেকে বেরিয়ে আসতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো অনেকে। কেউ বললো, এই খোকা, আর কে আছে? আর কেউ আছে? কেউ বললো, পালা, শিগগির পালা। তোকে পুলিশে ধরবে।

খানিকটা ছুটে আসবার পর তার খেয়াল হলো, যে তার স্কুলের সব বই-খাতা ফেলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ফিরলো। এইবারে তার সত্যিকারের ভয় করছে। বই-খাতা-নিয়ে সে বাড়ি যাবে কী করে?

জ্বলন্ত বাসটার কাছে বাবলু আর পৌঁছোতে পারলো না, এক পলায়নপর জনতার ঢেউ তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল অন্য দিকে। শোনা যাচ্ছে দমকলের ঘণ্টাধ্বনি, এক গাড়ি পুলিশও এসে পড়েছে।

একটা ঢেউ তাকে নিয়ে গেল পাশের রাস্তায়। তারপর আর একটা রাস্তায়। তারপর সে হয়ে গেল হারিয়ে যাওয়া ছেলে। ট্রামবাস-গাড়ি-ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে গেছে, এক একটা রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ চলছে পুলিশ-জনতায়, কী করে বাড়ি ফিরতে পারা যায় এখান থেকে, তা বাবলু জানে না। যাকেই সে জিজ্ঞেস করে বাগবাজারের কথা, সে-ই বলে, ওরে বাবা, সে তো অনেক দূর, আজ আর সেখানে যাবে কী করে?

বাবলু তবু হার স্বীকার করে না। মারামারির জায়গা থেকে সে অন্য দিকে ছুটে যায়, আবার রাস্তা হারিয়ে ফেলে, আবার রাস্তা খোঁজে। এক বেলাতেই সে যেন অনেক বড় হয়ে গেছে।

রাত প্রায় পৌনে আটটার সময় বাবলু বাড়ি পৌঁছোলো। স্কুলের বই-খাতা নেই, পায়ের চটি খুলে গেছে কোন্ সময়, জামার খানিকটা অংশ পোড়া, কিন্তু তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। অচেনা বিপদসঙ্কুল জায়গা থেকে সে একলা একলা ফিরে আসতে পেরেছে, এই জয়ের আনন্দ তার চোখে।

শহরের নানা অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে গোলমাল হয়েছে শুনে প্রতাপ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছেন, সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। তখনো বাবলু ফেরেনি। পাড়ার সরকারবাড়ির ছেলেটির কাছ থেকে খবর নিয়ে জানা গেল, স্কুলে সেদিন হাফ-ছুটি হয়েছে। অর্থাৎ বেলা দুটো

থেকে বাবলুর পাত্তা নেই। অথচ শ্যামবাজার বাগবাজার পাড়ায় তো কোনো গোলমাল হয়নি! তাহলে কী। সাঙ্ঘাতিক দুশ্চিন্তার কথা!

কানু আর পিকলু হাসপাতাল আর থানায় গিয়ে খবর নিয়েছে। প্রতাপ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন অনেকক্ষণ। তারপর স্কুল থেকে বাবলুর যে-পথ দিয়ে বাড়ি ফেরার কথা, সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছেন স্কুল পর্যন্ত, মাঝে মাঝে পাড়ার ছেলেদের জিজ্ঞেস করেছেন, সেদিন বাবলুর বয়েসী কোনো ছেলের অ্যাকসিডেন্টের খবর তারা জানে কি না।

বাবলু যখন ফিরলো তখনো কানু আর পিকলু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিল। ছোট ভাইকে ফিরতে দেখে পিকলু খুশী হবার বদলে শিউরে উঠলো।

বাবলুকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর মমতা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। সুপ্রীতি বললেন, ওকে হাত-মুখ ধুইয়ে আগে কিছু খেতে দাও। দেখেছো চোখ মুখের অবস্থা!

প্রতাপ বললেন, দাঁড়াও, আমি আগে ওর সঙ্গে কথা বলবো।

প্রতাপ বাবলুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতে যেতেই সুপ্রীতি বললেন, ওকি, দরজা বন্ধ করছিস কেন?

প্রতাপ বললেন, দিদি, এ ছেলে কুসঙ্গে পড়ে একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। তুমি আর মমতা আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওর সর্বনাশ করছে। আমাকে এখন বাধা দিও না।

সুপ্রীতি তবু দৃঢ়ভাবে বললেন, না, দরজা বন্ধ করতে পারবি না। আমি আর মমতাও থাকবো, আমরাও শুনবো!

দূরে দাঁড়িয়ে পিকলু সুপ্রীতির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলো। আজ মায়ের কথাও বাবা শুনতেন না। বাবলু যা কাণ্ড করেছে, এরকম আগে আর কখনো হয়নি। আজ বাবা রাগের চোটে যে কী করবেন তার ঠিক নেই। কলেজের বন্ধুরা বলে, বাঙালদের রাগ বেশী হয়!

বাবলুকে টেনে এনে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলি? বল, সত্যি করে বল!

সুপ্রীতি বললেন, খোকন, এখন থাক না। ছেলেটা আগে একটু জিরিয়ে নিক। নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছিল। ফিরে যে এসেছে এই-ই তো ভাগ্য!

প্রতাপ এবারে গর্জন করে বললেন, দিদি! এখন আমার ওপর কোনো কথা বলো না। একটু সরে দাঁড়াও! বাবলু, বল কোথায় গিয়েছিলি?

বাবলু মুখ গোঁজ করে নিরুত্তর রইলো। বাবার রাগ দেখেও তার ঠিক ভয় হচ্ছে না। বরং অভিমানে বুক ভরে যাচ্ছে। সে যে কীভাবে বাড়ি ফিরে এসেছে, তা কেন কেউ আগে জানতে, চাইছে না! তার চেয়ে মরে গেলে বেশ হতো!

প্রতাপের আরও তিনবার জিজ্ঞাসার উত্তরে বাবলু বললো, এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম।

--কেন না বলে বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলি? কোথায় সেই বন্ধুর বাড়ি?

বাবলু একদিকে হাত দেখিয়ে বললো, ঐদিকে।

-ঐদিকে মানে? কত দূরে? সে জায়গার নাম কী?

-জানি না।

-বইপত্তর কোথায় গেল। বল্! সত্যি কথা বল!

-হাত থেকে পড়ে গেছে।

-হারামজাদা ছেলে, হাত থেকে এমনি এমনি বইখাতা পড়ে যায়?

প্রতাপ প্রথম থাপ্পড়টা এত জোরে কষালেন যে বাবলুর মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। তারপর প্রতাপ লাফিয়ে এসে বাবলুর চুলের মুঠি চেপে ধরে হিংস্রভাবে বললেন, এরকম কুলাঙ্গার ছেলে। থাকার চেয়ে না-থাকা ভালো। আজ আমি একে শেষ করে দেবো।

সুপ্রীতি ও মমতা দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নেবার আগেই প্রতাপ মারতে মারতে বাবলুকে প্রায় আধমরা করে ফেললেন। মমতা এক সময় সরে গিয়ে বললেন, মারো, যত ইচ্ছে মারো, মেরে ফেলো ছেলেটাকে! সুপ্রীতি হাল ছাড়লেন না, বাবলুকে মারার জন্য প্রতাপ একটা ছড়ি তুলতে সুপ্রীতি বললেন, ওটা দিয়ে তুই আগে আমাকে মার।

সুপ্রীতি বাবলুকে নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তোয়ালে ভিজিয়ে গা-মুখ মুছে দিতে লাগলেন। বাবলুর হেঁচকি উঠছে অনবরত, চোখে এক ফোঁটা জল নেই, চোখ বোঁজা। কিন্তু পিকলু তার নিজের চোখের জল সামলাতে পারছে না। তুতুলও কাঁদছে। তুতুলের ধারণা, এত মার খেলে কেউ বাঁচে না।

সুপ্রীতি এক গেলাস দুধ বাবলুকে খাওয়াতে যেতেই সে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল। সে খাবে না। খাবে না তো কিছুতেই খাবে না। মা, পিসি, দাদা, দিদির হাজার কাকুতি-মিনতিতেও সে এক দানা খাদ্যও মুখে তুলো না। এমন জেদী ছেলে, দাঁতে দাঁত চেপে রইলো।

সে রাতে সুপ্রীতির ঘরেই শুইয়ে রাখা হলো বাবলুকে। নিজেদের ঘরের বিছানায় পিকলু ছটফট করছে, তার ঘুম আসছে না। বাবলুর কি হাড়-গোড় কিছু ভেঙে গেছে? ওর কি খুব কষ্ট হচ্ছে? মায়ের ওপরেই যেন তার বেশি রাগ। মমতা কিছু দিতে এলে সে দু'হাত ছুঁড়ে বাধা দেয়।

অনেক রাত, বোধহয় সাড়ে বারোটা-একটা হবে, মমতা নিজের ঘর থেকে উঠে এসে। সুপ্রীতির ঘরের দরজাটা ঠেলে খুললেন। বাবলুর বিছানার পাশে বসে পড়ে বললেন, বাবলু, তুই আমার কাছে আসবি না? তুই আমার কাছে আর কোনোদিন আসবি না?

মা বলে একটা আর্ত চিৎকার করে বাবলু উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো মমতার বুকে। তারপর ফোঁপাতে লাগলো।

পাশের ঘর থেকে পিকলু সব শুনতে পাচ্ছে। কানুও জেগে আছে। সে হাসতে হাসতে এই সময় বললো, কাল বাড়িতে মাংস আসবে। বাবলুটাকে কোনোদিন মারলেই সেজদা পরের দিন অনেক পয়সা খরচ করে। আমায় মারলে কিন্তু কিছু করে না!

পিকলু কাতরভাবে কানুর দিকে তাকালো। কানুকাকাটা কী নিষ্ঠুর। এই সময় ঐ কথাটা না বললে চলতো না?

পরদিন বাবলুকে স্কুলে পাঠানো হল না, তার সারা গায়ে ব্যথা। প্রতাপও আদালতে গেলেন না, শুয়ে শুয়ে শুধু খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন, যেন কতদিনের পুরোনো সব কাগজ তাঁর পড়া বাকি ছিল।

বিকেল চারটের সময় তিনি পোশাক পরে প্রস্তুত হয়ে বাবলুকে ডেকে বললেন, বাবলু, তুই চল আমার সঙ্গে!

মমতা অমনি শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ওকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

প্রতাপ গম্ভীরভাবে বললেন, তোমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাচ্ছি বলে তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি? আমি কি ওকে মেরে ফেলবো?

বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বড় রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি ধরলেন। ড্রাইভারকে বললেন, চলো গড়ের মাঠ।

অনেকক্ষণ পিতাপুত্রে একটিও কথা নেই। দু'জনে তাকিয়ে আছে দু'দিকে।

তারপর ট্যাক্সি ময়দানের কাছাকাছি আসবার পর প্রতাপ বললেন, বাবলু, কাল কোথায় গিয়েছিলি? বল আমাকে! তুই যতক্ষণ না বলবি ততক্ষণ আমার খুব কষ্ট হবে। আমি

আমার বাবার কাছে কোনোদিন মিথ্যে কথা বলিনি! তুই কোথায় গিয়েছিলি, বল, বাবলু! বল, কোথায় গিয়েছিলি, বাবলু, বল বল।

বাবলু তবু কোনো কথা বললো না। বাবার সঙ্গে সে সারাজীবনে আর কথা বলবে না ঠিক করেছে। বাবা তাকে মেরে ফেললেও সে মুখ খুলবে না!

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে প্রতাপ বাবলুর হাত শক্ত করে ধরে গম্ভীর ভাবে বললেন, চল আমার সঙ্গে!

যেন তিনি আদি বাইবেলের কোনো চরিত্রের মতন সন্তানকে পাহাড় শিখরে নিয়ে যাচ্ছেন বলি দেবার জন্য। আকাশে জমাট কালো মেঘ, অসময়ে নেমে আসছে অন্ধকার। ঘাসের ওপর দিয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটবার পর প্রতাপ একটা রেইনট্রি গাছের নীচে দাঁড়ালেন। বেশ কয়েক মুহূর্ত তীব্র ভাবে চেয়ে রইলেন ছেলের মুখের দিকে। অকস্মাৎ ধরা গলায় তিনি বললেন, বাবলু, তুই কি ভাবিস, তোকে মারলে আমার ভালো লাগে? বাবা-মাদের কত কষ্ট হয়, বড় হয়ে এক সময় বুঝবি! জানিস তো আমি মিথ্যে কথা সহ্য করতে পারি না, সত্যি কথা বললে রাগ করবো না, আমাকে সব সময় সত্যি কথা বলবি....কাল কী হয়েছিল, ঠিক করে বল...

বাবাকে হঠাৎ এ রকম নরম হয়ে যেতে দেখে বাবলু যেন খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল! বাবার এ রকম গলার আওয়াজ সে আগে কক্ষনো শোনে নি। সেও খুব দুর্বল হয়ে পড়লো, ফোঁপাতে ফোঁপাতে কাঁপা কাঁপা গলায় বললল, দাদা একা একা বালিগঞ্জে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল...তাই আমি বালিগঞ্জ দেখবার জন্য...বাসে আগুন লেগে গেল...

সন্তানের প্রতি দুর্বলতা প্রতাপ মমতা-সুপ্রীতিকে দেখাতে চান না বলেই বোধহয় প্রতাপ বাবলুকে নিয়ে এসেছেন এত দূরের ময়দানে। এখন এই নিরালায় কান্না সামলাতে সামলাতে তিনি পুত্রকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করতে লাগলেন।

২০ তুতুল বাগবাজারের একটি স্কুলে

তুতুল বাগবাজারের একটি স্কুলে ক্লাস টেন-এ ভর্তি হয়েছে। বাড়ি থেকে স্কুল বেশি দূরে নয়, সহজ রাস্তা, সে একাই যায়-আসে। স্কুল থেকে ফেরার পথে সে এক একদিন দুটি যুবককে দেখতে পায়, যারা পরস্পর ফিস ফিস করে কথা বলে, তুতুলের দিকে আড়চোখে তাকায়। পেছনে পেছনে অনেকটা পথ আসে। এরা বরানগরের ছেলে, তুতুল ওদের মুখ চেনে, ওদের মধ্যে যে বেশি লম্বা, ঠোঁটে সব সময় সিগারেট ঝুলে থাকে, সে একদিন বরানগরের স্কুল থেকে ফেরার সময় তুতুলের হাতে জোর করে একটা চিঠি গুঁজে দিয়েছিল।

ছেলেদুটিকে দেখলেই তুতুলের ভয় ভয় করে। কিন্তু বাড়িতে এসে মা-কে আর কিছু বলে না।

পড়াশুনো করতে তার ভালো লাগে, ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া সর্বক্ষণ তার হাতে বই। পিকলু বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরির মেম্বার হয়েছে, সে দুখানা করে বই আনে, তুতুল সেই বই পিকলুর কাছ থেকে কাড়াকাড়ি করে পড়ে। স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকেও সে পত্র-পত্রিকা পায়। বরানগরের বাড়িতে থাকার সময় কিছুদিন তার জন্য একজন বৃদ্ধ গানের মাস্টার রাখা হয়েছিল, দেওঘরে বিশ্বনাথ কয়েকদিন তুতুলকে সাধাতে গিয়ে বলেছিলেন, এ মেয়ের কিন্তু গান হবে। চর্চা করলে নাম হবে। কিন্তু এখন তুতুলের গানের পাট চুকে গেছে। বরানগরের বাড়ি ছাড়ার সময় হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসা হয় নি, এখানে তুতুল বাথরুমে মাঝে মাঝে গুন গুন করে শুধু।

শোবার ঘরেই জানলার পাশে একটা ছোট টেবিল, সেখানে বসে পড়াশুনা করে তুতুল। পাশের ঘরে পিকলু আর বাবলু প্রায়ই চ্যাঁচামেচি করে, তাছাড়া মাঝে মাঝেই চলে আসে বাইরের লোক, তাই তুতুলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা।

এই ঘরের সামনে গলি, উল্টোদিকেই একটি ছোট একতলা বাড়ি। সেই বাড়ির উঠোনে একটি আমগাছ আছে, গাছটির শাখা-প্রশাখা ঢেকে দিয়েছে অর্ধেক ছাদ।

গলি দিয়ে কতরকম ফেরিওয়ালা হেঁকে যায়, কে কখন আসবে তা তুতুলের মুখস্থ হয়ে। গেছে। সকালের দিকে আসে, মুড়ির চাক, চিড়ের চাক, ছোলার চাক চাই! তিলকুটো, চন্দ্রপুলি, শোন-পা-প-ড়ি! মাখন চাই, মাখন যে বলে তার গলা অনেকটা কীর্তন গায়ক কানাকেষ্টর মতন। দুপুরে আসে বাসনওয়ালীরা, তাদের এক একজনের গলায় এক এক রকম সুর, তাদের মধ্যে একটি লাল ফুলফুল ছাপ শাড়ী পরা বাসনওয়ালীকে কি সুন্দর দেখতে। একজন পুরুষ বাসনওয়ালাও আসে, সে খুব গেরেমভারি, তার পেছনে একটি মুটের মাথায়। থাকে পেতল-কাঁসার বাসনপত্র, আর সে নিজে একটা কাঁসি বাজাতে বাজাতে আসে। চুড়িওয়ালা ও শিল কাটাবে-এরাও দুপুরেই আসে। সন্ধের পর পকৌড়ি, মালাই বরফ, আর। বেলফুল চাই, বেল ফুল!

বরানগরে মস্ত বড় বাড়ি ছিল, সেখান থেকে রাস্তার প্রবাহিত জীবনের শব্দ-গন্ধ এমন পাওয়া যেত না।

সামনের একতলা বাড়িটার ছাদের ওপর ছাতার মতন মেলে থাকা আমগাছটায় কত রকম পাখি এসে বসে। আসে ঝাঁক ঝাঁক টিয়া পাখি। শালিক-চড়ুই-পায়রা তো আছেই। একদিন একটা বেশ বড় মতন খয়েরি-সাদা মেশানো ল্যাজ-ঝোলা পাখি এসে বসেছিল, তুতুল সে। পাখির নাম জানে না। আমগাছটার ডগার দিকে ডালে প্রায় আটকে থাকে একটা না একটা। ঘুড়ি। বৃষ্টির সময় গাছের ডালগুলো যেন প্রবল খুশীতে মাথা ঝাঁকাতে থাকে।

ঐ ছাদে, আমগাছের ছায়ায় প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকে একটি যুবক। পা-জামার ওপর গেঞ্জি পরা, মাথায় বড় বড় চুল, জুলফি দুটো কানের লতি পর্যন্ত নামানো। সে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তুতুলের জানলার দিকে। তুতুলের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে হাতছানি দিয়ে কী যেন বলতে চায়। তুতুল সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার মনটা খারাপ হয়ে যায়।

ঐ যুবকটির কথাও তুতুল মাকে বলেনি কিন্তু সুপ্রীতির ঠিক নজরে পড়ে গেল একদিন। সুপ্রীতি নিজে অনেকক্ষণ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাতেও সেই যুবকটি সরে গেল না, তার চক্ষুলজ্জা নেই, নিজেদের বাড়ির ছাদে সে ঘুরবে। তাতে কার কী বলার আছে?

সুপ্রীতির নির্দেশে এখন সেই জানলা বন্ধ রাখতে হয় তুতুলকে। এজন্য তার কান্না পেয়ে যায় মাঝে মাঝে। একটা জানলা আছে, তবু খোলা যাবে না। দিনের বেলা আলো জ্বেলে বই পড়তে হবে। যদি পিকলু এই টেবিলে বসে পড়াশুনো করতো, তাহলে কি জানলা বন্ধ রাখতে হতো?

তিনতলায় বাড়িওয়ালাদের কাছে অনেকগুলো বাঁধানো প্রবাসী পত্রিকা আছে, আর আছে বসুমতী সিরিজের কয়েকটা গ্রন্থাবলী। গল্পের বই-এর অনটন হলে তুতুল ওপর থেকে ঐ বই আনতে যায়। বাড়িওয়ালার স্ত্রী প্রথম দিন থেকেই ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন, তাঁর সঙ্গে গল্প করতেও ভাল লাগে।

কিন্তু সেখানেও একটা উপদ্রব আছে। অতসীর এক মামাতো ভাই হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে, প্রায়ই সে দুপুরের দিকে চলে আসে দিদির কাছে। তুতুল যেদিনই ওপরে যায় সেদিনই সে ঐ ছেলেটিকে অতসীর ঘরে শুয়ে থাকতে দেখে। ছেলেটি হস্টেলের জীবন সম্পর্কে নানা রকম মজার মজার গল্প বলে, খাট থেকে নেমে সে নানান অঙ্গভঙ্গি করে হস্টেল-সুপারের চরিত্র বোঝায়। শুনতে বেশ মজাই লাগে।

একদিন ঐ রকম গল্প হচ্ছে, হঠাৎ অতসী বললেন, এই রে, উনুনে দুধ চাপিয়ে এসেছি, তোর গল্প শুনতে শুনতে সব গেল বুঝি রে! বলেই তিনি দৌড়ে চলে গেলেন রান্না ঘরে।

আর সঙ্গে সঙ্গে মামাতো ভাইটি তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে বললো, দেখি তো তুতুল, তুমি কতটা লম্বা! সে তুতুলের কাঁধে হাত দিয়ে তার পাশে দাঁড় করাবার ছলে ইচ্ছে করে তুতুলের বুক ছুঁয়ে দিল।

তারপর থেকে আর তুতুল তিনতলায় যায় না।

এই সব কারণে, মাঝে মাঝেই মেয়ে হয়ে জন্মাবার জন্য তুতুলের ভীষণ রাগ হয়! সে ভাবে, ভগবান কেন এত স্বার্থপর? ভগবান নিজে পুরুষ বলেই মানুষের মধ্যে পুরুষদের অনেক বেশি সুবিধে দিয়ে মেয়েদের অনেক ব্যাপারে বঞ্চিত করেছেন। পিকলু তার থেকে মাত্র দেড় বছরের বড়, অথচ তার তুলনায় পিকলু কত স্বাধীন! তুতুল যতই মন দিয়ে পড়াশুনো করুক, তবু তাকে যত ব্যাঘাত সহ্য করতে হয়, পিকলুকে তো সে সব কিছুই সহ্য করতে হয় না!

বইতে মন বসাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে তুতুলের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে তুতুল বরানগরের সেই ছেলেদুটির সঙ্গে তার পিসতুতো দাদা শিবেনকে দেখতে পেল। বোস পাড়া লেনের মুখটায় দাঁড়িয়ে সে অন্য দু'জনের সঙ্গে সিগারেট টানতে টানতে গল্প করছে। বংশের ধারা অনুযায়ী শিবেনও কোনো কাজকর্ম করে না, পড়াশুনোয় মাঝপথে ইস্তফা দিয়েছে। তার চেহারা ও পোশাকে ঠিকই বোঝা যায় সে বনেদী বংশের ছেলে।

তুতুলের জন্য সে প্রতীক্ষা করছিল, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তুতুলকে দেখে এগিয়ে এসে সে অবাক হবার ভাণ করে বললো, আরে, তুতুল, তোরা এখেনে থাকিস নাকি? বরানগর থেকে চলে এলি, তারপর তো কোনো পাত্তাই নেই! মাইমা কেমন আছেন? তুই এত রোগা হয়ে গেলি কী করে র‍্যা?

উত্তরের অপেক্ষা না করে শিবেন নিজেই অনেক কথা বলে যায়। তারপর একবার জিজ্ঞেস করলো, তোরা কোন্ বাড়িতে থাকিস? চ, মাইমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

তার পরনে গিলে করা পাঞ্জাবি, গলায় পাউডার ও একটি সোনার চেইন, ধুতির কোঁচার ফুলটি রাস্তার ধুলো ঝাড় দিতে দিতে চলে। বাড়িতে এসে সে সুপ্রীতির পায়ে হাত দিয়ে

প্রণাম করে বললো, মাইমা, হঠাৎ চলে এলেন, আমাদের একটা খপরও পর্যন্ত দিলেন না। আমরা কি আপনার পর?

ছেলেটিকে দেখে খুশী হননি সুপ্রীতি। বরানগরের বাড়িতেও এই শিবেন যখন তখন এসে বসে থাকতো বিনা কারণে। এর মুখে শুধু কথার ফুলঝুরি। তবু আপন ননদের ছেলে, একেবারে হেলা-তুচ্ছ করা যায় না। তিনি বাবলুকে দিয়ে পাশের দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে। তাকে খেতে দিলেন, তার বাড়ির সবার খোঁজ- খবর নিলেন।

শিবেন বললো, এই বাড়িতে এসে রয়েছেন, মাইমা? স্যাঁতসেঁতে, ঘরে আলো ঢোকে না। বরোনগরের বাড়িতে আপনার মহোলটা এখনো খালি পড়ে রয়েছে, ফিরে চলুন না। মা বলছিলেন, আমাদের বংশে কেউ কোনোদিন ভাড়া বাড়িতে থাকেনিকো।

সুপ্রীতি বললেন, না, এখানেই বেশ আছি।

এক ঘণ্টা পরে সে উঠলো এবং পরদিন আবার এলো। এ বাড়িতে জায়গা কম, ঘরের মধ্যে একজন লোক বসে থাকলে বড় অসুবিধে হয়। তাছাড়া শিবেনের বাচালতা ধৈর্য ধরে শুনবে কে? সুপ্রীতি ওকে মিষ্টি আনিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে চলে যান, তুতুলকেই বসে থাকতে হয়।

তৃতীয় দিনে এসে বললো, মাইমা, তুতলকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবো?

সুপ্রীতি অবাক হয়ে বলেন, তুতুলকে তুমি নিয়ে যাবে? কোথায়?

শিবেন বললো, বেশি দূরে নয়, এই ঘণ্টাখানেক, মানে আমাদের বাড়িতেই, মা বলচিলেন, তুতুলকে অনেকদিন দেকিনি, একবার নিয়ে আয় না!

সুপ্রীতি তুতুলের দিকে তাকালেন। তার মুখ ঘোঁচ হয়ে গেছে। সে শিবেনদার সঙ্গে কোথাও যেতে চায় না।

সুপ্রীতি বললেন, তোমার মা-কেই একদিন এখানে নিয়ে এসো বরং। আমিও তোমার মা-কে অনেকদিন দেখিনি।

ক্রমে শিবেন একটি শিরঃপীড়া হয়ে দাঁড়ালো। সে কেন আসে, তা বোঝা যাচ্ছে না। অথচ সে আসে, বসে থাকে, পিকলুবাবলুর সঙ্গেও ভাব জমাবার চেষ্টা করে। পিকলু অতি ভদ্র ছেলে, সে শান্ত ভাবে শিবেনের সব কথা শোনে। কিন্তু তার মনোজগৎ শিবেনের চেয়ে সম্পূর্ণ। আলাদা। আর বাবলু শিবেনের দু একটা কথায় হুঁ-হাঁ করে পালিয়ে যায়, তার এখন ঘুড়ি ওড়াবার নেশা।

একদিন শিবেন এসে সুপ্রীতিকে বললো, মাইমা, আপনার সঙ্গে আমার একটা আর্জেন্ট কথা। আচে। তুতুল, তুই একটু বাইরে যা তো!

শিবেন এসে তুতুলের পড়ার টেবিলের চেয়ারটায় বসে। নিজেই বন্ধ জানলাটা খুলে দেয়। তারপর একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলে দোলাতে থাকে। তার পায়ের পাতা বেশ ফস, খুব যত্ন নিয়ে সে রোজ দেহশুদ্ধি করে বোঝা যায়।

সুপ্রীতি উৎসুক ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

শিবেন বললো, মাইমা, তুতুলের বিয়ে দেবেন? আমার চেনা খুব ভালো পাত্র আচে। নাম ডাকওয়ালা ফ্যামিলি, মাছের ভেড়ির মালিক, ছেলেটি দেখতেও সুন্দর। তুতুলের সঙ্গে মানাবে। ছেলেটি আমার বিশেষ বন্ধু।

এক হিসেবে সুপ্রীতি এই কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলেন। এতদিনে শিবেনের আগমনের কারণ জানা গেল। সে তার এক বন্ধুর বিয়ের ঘটকালি করতে চায়। তুতুলের জন্য যে এখন এরকম প্রস্তাব মাঝে মাঝে আসতে থাকবে, সে জন্য সুপ্রতি মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছেন। তুতুলের শরীরের গড়ন তার বাবার মতন, এখনই তাকে তার বয়েসের তুলনায় অনেক বড় দেখায়।

সুপ্রীতি খানিকটা আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, ছেলেটি কী করে?

শিবেন বললো, ঐ যে বললুম ওদের ভেড়ির বিজনেস, ও তাই-ই দেখে। ও লাইনে আজকাল ভালো পয়সা। আমিও তো ঐ লাইনেই যাবো ভাবচি। অলরেডি শুরু করে দিয়িচি।

-তোমার বন্ধু কতদূর পড়াশুনো করেছে?

-মাইমা, আপনারামানে... ইয়ে... আপনারা সব সময় বড্ড লেখাপড়া লেখাপড়া করেন! আজকালকার দিনে বি-এ এমএ পাশ করে কী হয়? বড় জোর একশো টাকার কেরানিগিরি জোটে। অনেক বি-এ পাশ ছেলে এদানি রিক্সা চালায়, বুঝলেন? আই হ্যাভ সীন ইন মাই ওউন আইজ! টাকা পয়সা রোজগার করাটাই আসল। ওরা এখনও তিন পুরুষ বসে বসে খেতে পারবে!

-ছেলে লেখাপড়া শেখে নি তাহলে!

– শিখবে না কেন, যথেষ্ট শিখেছে, ইংলিশে কথা বলতে পারে।

-শোনো শিবেন, তুমি যখন বলছো, তখন ছেলেটি নিশ্চয়ই ভালো। আর তুমি যে তুতুলের বিয়ের জন্য চিন্তা করেছো...

-বাঃ, করবো না, আমার আপন মামাতো বোন!

-সেই কথাই তো বলছি, তুমি যে ওর জন্য চিন্তা করেছে, তাতেই খুব ভালো লাগলো। কিন্তু আমি এখন তুতুলের বিয়ের কথা ভাবছি না। আগে অন্তত বি এ পাশটা করুক।

-মাইমা, ভুল করছেন, এরকম সুযোগ ছাড়বেন না। পাত্রপক্ষের কোনো দাবি-দাওয়া নেই, তুতুলকে দেখেই ওদের পছছন্দ হয়ে গ্যাচে খুব, সেইজন্যই-

-দেখে পছন্দ হয়েছে, মানে? তুতুলকে ওরা দেখলো কোথায়?

–দেখেছে, দেখেছে, মানে, যখন ও-বাড়িতে ছিলেন, সেইসময়ে।

–ওদের বলে দিও, তুতুলের এখনও বিয়ের বয়েস হয়নি।

–মাইমা, ডাগর মেয়েকে বেশিদিন বাড়িতে রাখতে নেই। এমন সুযোগ আর পাবেন না। ওরা তুতুলকে গয়নায় মুড়ে রাখবে।

–শিবেন, এ নিয়ে আর আমি কথা বলতে চাই না।

তারপর থেকে শিবেন এ বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল বটে কিন্তু সুপ্রীতি সন্ত্রস্ত হয়ে রইলেন। শিবেনের কথাবার্তার ভঙ্গি তার একদম ভালো লাগে নি। প্রতাপকে তিনি কিছু জানালেন না কিন্তু তুতুলকে বারবার সাবধান করে দিলেন, শিবেন যদি বলে, তুই ওর সঙ্গে কক্ষনো কোথাও যাবি না। ওদের বাড়িতেও যাবি না!

তুতুল বুঝতে পারে যে তাকে ঘিরে একটা অশান্তি ঘনিয়ে আসছে। তার শরীর যেমন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তেমনি তার হৃদয়ে উন্মেষ হয়েছে প্রেমের। একজন নয়, বেশ কয়েকজন পুরুষকে সে ভালোবাসে। তারা কেউ-ই জীবন্ত নয়, কয়েকটি উপন্যাসের চরিত্র এবং দু-তিনজন লেখক। রবীন্দ্রনাথের ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসটি সে সাত-আটবার পড়েছে, তার নায়ক অন্তুকে সে স্বপ্নেও দেখেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে দুজন আধুনিক লেখককে সে চিঠি লেখার কথা ভাবে। পিকলুদের কলেজে একদিন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন শুনে তার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করেছিল। ঐ সব লেখকদের রক্ত-মাংসের চেহারায় সত্যি সত্যি দেখা যায়?

তুতুল চায় তার নিজের ঘর, পড়ার টেবিল, ইস্কুল আর গল্পের বইয়ের মধ্যে সব সময় মগ্ন হয়ে থাকতে, তাকে যেন আর কোনো বিষয়ে কেউ বিরক্ত না করে। এমন কি কোথাও বেড়াতে যেতে বা থিয়েটার বাইস্কোপ দেখতেও তার বিশেষ উৎসাহ নেই।

সুপ্রীতি যা আশঙ্কা করেছিলেন, একদিন তাই-ই ঘটলো।

স্কুলের রাস্তায় বেশ কয়েকদিন বরানগরের সেই ছেলে দুটিকে বা শিবেনকে দেখতে পাওয়া যায় নি। একদিন খুব বৃষ্টি, দুপুরবেলায় আকস্মিক ঝমঝমানো বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে গেছে এক হাঁটু, এইরকম জল ভেঙে হাঁটার অভ্যেস নেই বলে তুতুল ছুটির পর বেরিয়ে একটা রিকশা নিল। একটু দূর যেতে না যেতেই হঠাৎ শিবেন কোথা থেকে উদয় হয়ে বললো, এই রিকশাওয়ালা, রোকো। তুতুল, তোর সঙ্গে আমি যাবো!

ওপরে উঠে বসেই সে রিকশাওয়ালাকে হুকুম দিল, এই, ডাহিনে যাও!

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, ওদিকে কোথায় যাবো? আমি বাড়ি যাচ্ছি!

শিবেন বললো, হ্যাঁ, বাড়িতে তো যাবিই। আমি কি তোকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি নাকি? একটুখানি শুধু ঘুরে যাবো।

তুতুল বিরক্ত-দুঃখিত ভাবে শিবেনের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বললো, দেরি হলে মা চিন্তা করবেন।

শিবেন বললো, বাদলার দিনে একটু দেরি হয়ই। আমি তোকে পৌঁছে দেবো। তোর চিন্তা কী?

আপন পিসতুতো দাদা রিকশায় চড়ে বসলে কোনো মেয়ে তো চিৎকার করে রাস্তার লোক ডাকে না। তুতুলের ক্ষেত্রে সে প্রশ্নই নেই, সে মরে যাবে, তবু চিৎকার করতে পারবে না। বৃষ্টির মধ্যে সে একটা চমৎকার কথা ভাবতে ভাবতে আসছিল, শিবেনদা সব নষ্ট করে দিল।

রিকশা এসে থামলো বৃন্দাবন পাল লেনের একটা বাগানওয়ালা বাড়ির গেটের সামনে। টিপি টিপি করে এখনো বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তার এখানটায় জল নেই, বৃষ্টির জন্যে পথে মানুষজন। কম। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বরানগরের সেই ছেলে দুটি।

রিকশা থেকে শিবেন তাদের মধ্যে একজনের দিকে হাত দেখিয়ে বললো, এ আমার বন্ধু সুদর্শন, তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

দুটি ছেলের মধ্যে যেটি গত বছর বরানগরে তুতুলের হাতে জোর করে চিঠি গুঁজে দিয়েছিল, সে চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে। সুদর্শন নামে যার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো, অল্প বয়েসে সে নিশ্চয়ই সুদর্শন বালক ছিল, বেশ লম্বা চেহারা, ফর্সা রং, মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল, সমুন্নত কপাল ও তীক্ষ্ণ নাক। কিন্তু এখন তার মুখে একটা চোয়াড়ে চোয়াড়ে ভাব, চোখ দুটি কুঁচকোনো, সামনের একটা দাঁত ক্ষয়ে গেছে! সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তুতুলের দিকে।

শিবেন বললো, দেখলি, নিয়ে আসতে পারলুম কি না। আমার বোন খুব ভালো মেয়ে, আমার কথা শোনে। চল, কোথাও বসে চা-টা খাওয়া যাক।

সুদর্শন চোখ না সরিয়ে বললো, চিত্রা সিনেমার কাছে আমার চেনা একটা দোকান আছে। ভালো ফিস ফ্রাই বানায়।

শিবেন বললো, চল, সেখানে চল। আর একটা রিকশা ডাকলেই হবে।

তুতুল বললো, আমি তো কোথাও যাবো না। আমি বাড়ি যাবো।

শিবেন বললো, আরে, বলেছি না, আমি তোকে নিজে পৌঁছে দেবো। আমি মাইমাকে বলে দেবো, তোর কোনো চিন্তা করতে হবে না। সুদর্শন অনেকদিন ধরে তোর সঙ্গে আলাপ করতে আর দুটো কথা বলতে চাইছে।

সুদর্শনকে সে বললো, এই, তুই তুতুলের সঙ্গে এটাতে উঠে পড়ে এগিয়ে যা। আমি আর হরে অন্য একটাতে যাচ্ছি।

তুতুল বললো, আমি যাবো না!

সে রিকশা থেকে নেমে পড়তে যেতেই শিবেন তার হাত চেপে ধরে বললো, বোস চুপ করে।

ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াতে তার ঠিক নেই, কিন্তু এই সময় হঠাৎ পিকলু এসে পড়লো সেখানে। সে তার এক বন্ধুর সঙ্গে ঐ রাস্তা দিয়েই ফিরছে কলেজ থেকে।

সে শিবেনকে দেখে নিরীহভাবে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী খবর, শিবেনা?

তুতুলকে রিকশায় বই-খাতা নিয়ে বসে থাকতে দেখে সে একটু বিস্মিত হলেও কোনো মন্তব্য করলো না।

শিবেনের সঙ্গে সুদর্শন ও হরির চোখে চোখে কিছু কথা হয়ে গেল। শিবেন সূক্ষ্ম ভাবে চোখের পলক ফেলে ও সামান্য মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিল জোর-জবরদস্তির লাইনে যাওয়া ঠিক হবে না।

সে হাসি মুখে পিকলুকে বললো, তুই এই রাস্তা দিয়ে কলেজ থেকে রোজ ফিরিস বুঝি? তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, আমার দুই বন্ধু, হরি আর সুদর্শন। এই সুদর্শনদের মাছের ভেড়ির ব্যবসা আছে। আমিও ওদের সঙ্গে ঐ ব্যবসায় নামচি, বুঝলি?

পিকলু কিছুই বুঝলো না। সে জানে যে খালি গায়ে, নেংটি পরা জেলেরা পুকুর নদী থেকে মাছ ধরে, সেই মাছ শহরের বাজারে আসে, বাহুতে রূপোর তাবিজ বাঁধা মাছওয়ালারা সেই মাছ বিক্রি করে। ভালো ভালো জামা-কাপড় পরা ভদ্র বাড়ির ছেলেদের যে সেই ব্যবসার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে, সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

সে শুকনো হেসে বললো, ও আচ্ছা!

পিকলুর সঙ্গের বন্ধুটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সে হাত নেড়ে বললো, আমি যাই রে!

শিবেন বললো, এ পিকলু, তুই যে বৃষ্টিতে একদম ভিজে গিয়েছিস। সর্দি লেগে যাবে যে! চল, কোথাও বসে গরম গরম চা খাই।

পিকলু এবারে তুতুলের দিকে তাকালো। পড়ে নিল তার চোখের ভাষা। সে বললো, না, আজ থাক, বাড়ি গিয়ে জামা-কাপড় ছাড়তে হবে।

শিবেন পিকলুর পিঠে হাত দিয়ে বললো, একটু এদিক পানে শোন। একটা প্রাইভেট কথা আচে।

পিকলুকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে সে বললো, শোন পিকলু, আমার ফ্রেন্ড এই যে সুদর্শন, খুব ভালো ফ্যামিলির ছেলে বুঝলি, ওর বাবা-মা চাইচেন ওর একটা বিয়ে না দিয়ে ব্যবসার পুরোপুরি ভার ওর হাতে দেবেন না। এখন মুশকিল হচ্ছে, কোনো মেয়েকেই সুদর্শনের পছন্দ হয় না। একমাত্র তুতুলকে দেখেই ওর খুব মনে ধরেছে। এখন এই বিয়েটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তুই ভালো ছেলে, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তুই ঠিক বুঝবি।

মাছের ভেড়ির ব্যবসার মতনই বিয়ে সম্পর্কেও পিকলুর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। বিয়ে তো বয়স্ক নারী-পুরুষদের ব্যাপার।

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেই সে বললো, যাঃ! তুতুলের বিয়ে এখন কী! এখনো ইস্কুলে পড়ছে। আগে লেখাপড়া শেষ করুক!

শিবেন অস্ফুটভাবে বললো, বাঙালের মরণ! খালি নেকাপড়া আর নেকাপড়া! ও মেয়ে হয়ে বি এ এম এ পাশ করে কী করবে, ডিগ্রি ধুয়ে জল খাবে? না আমাদের ফ্যামিলির মেয়ে চাকরি করতে যাবে?

পিকলু অসহায়ভাবে বললো, কিন্তু তুতুল তো এখনো বাচ্চা!

-ঐ বয়েসের মেয়ে দু ছেলের মা হয়ে যায়। শোন পিকলু, তুই হচ্ছিস ওর মামাতো দাদা আর আমি হচ্ছি পিসতুতো দাদা। কোন সম্পর্কটা বেশি? আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা হলো গে রক্তের সম্পর্ক। ঠিক কি না!

-তা তো বটেই!

-আমরা যা বলবো, তাই-ই হবে। সেই কথাটাই আজ বাড়ি গিয়ে মাইমাকে বুঝিয়ে বলবি!

সুদর্শন তুতুলের মুখ ও শরীর থেকে একবারও দৃষ্টি সরায় নি। কিন্তু আজ তাকে বিফল হয়ে ফিরতে হলো শিবেনের পরামর্শে। তুতুলকে ছেড়ে দেওয়া হলো পিকলুর সঙ্গে।

পিকলু সেই রিকশায় উঠে বসে খানিকটা যাবার পর জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার রে, তুতুল? তুই এখানে এলি কী করে? ঐ সুদর্শন বলে ছেলেটাকে তুই আগে চিনতিস?

তুতুল এবার পিকলুর কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে উঠলো।

পিকলু বললো, অ্যাই, বোকার মতন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদবি না তো! কী হয়েছে বল্!

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ তুলে সে বললো, বলছি। কিন্তু পিকলুদা, তুমি কথা দাও, মাকে কিংবা মামাকে কিছু বলবে না! ওঁদের এমনিতেই কত চিন্তা, আমি চাই না আমার জন্য ওঁদের চিন্তা বাড়ুক।

২১ সরকারি কর্মচারির চাকরি

সরকারি কর্মচারির চাকরি চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি। অফিসের ডিউটি আট ঘণ্টা হলেও বাকি সময়টায় অন্য কোনো বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত থাকা যায় না। প্রতাপ এই নিয়মটা অক্ষরে অক্ষরে মানেন। সন্ধের পর দু'একটি পার্ট টাইম চাকরির প্রস্তাব পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। অথচ প্রতাপের এখন টাকার টানাটানি চলছে।

প্রতাপদের সার্ভিসেই একজন খ্যাতনামা লোক আছেন, তাঁর নাম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রতাপের থেকে অনেক সিনিয়র তিনি। প্রতাপ একদিন এক চায়ের নিমন্ত্রণের আসরে অচিন্ত্যবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্যার, আপনি যে এত সব লেখেন-টেখেন, তাতে টাকা পান নিশ্চয়ই, এতে গভর্নমেন্টের অবজেকশান নেই?

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এককালে অশ্লীল গল্প-উপন্যাস লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, ইদানীং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক রসে ভরা জীবনী লিখছেন। তাঁর চোখে পুরু লেন্সের চশমা, কণ্ঠস্বর গমগমে। প্রতাপের প্রশ্ন শুনে তিনি ঈষৎ হাস্যে বললেন, আমার সহকর্মীরা আমার কোনো গল্প-উপন্যাস নিয়ে কিছু বলেন না, লিখে আমি কত টাকা পাই তা নিয়েই সকলের কৌতূহল!

প্রতাপ লজ্জা পেয়ে গেলেন। নভেল-নাটক পড়ার অভ্যেস নেই তাঁর। অচিন্ত্যবাবুর বিশেষ কোনো লেখা তিনি পড়েননি। একজন লেখকের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য রচনা সম্পর্কে আলোচনা করার বদলে শুধু টাকা পয়সা নিয়ে প্রশ্ন করা যে রুচিহীনতার পরিচায়ক তা তিনি সেই মুহূর্তে বুঝলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থী চোখে তাকালেন।

অচিন্ত্যকুমার বললেন, সরকারি কর্মচারির পক্ষে কোনো ক্রিয়েটিভ কাজে, যেমন গান গাওয়া, ছবি আঁকা বা সাহিত্য রচনা করার নিষেধ নেই। তবে পারমিশান নিতে হয়। এর থেকে টাকা রোজগার করলে ব্রিটিশ আমলে ফিফটি পারসেন্ট সরকারকে দিয়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল। অবশ্য অ্যাপিল করলে এক্সজেম্পশানও পাওয়া যেত। অন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? তিনি তো আমাদের থেকেও অনেক বড় সরকারি কর্মচারি, আই সি এস, তাঁকেও পারমিশান নিতে হয়েছে বোধহয়!

প্রতাপ একটু হতাশ হয়েছিলেন। সেরকম কোনো ক্রিয়েটিভ ফ্যাকাল্টি তাঁর নেই, সুতরাং চাকরির মাইনে ছাড়া আইনসঙ্গতভাবে উপার্জন বাড়াবার ক্ষমতাও নেই। এদিকে দেশের সম্পত্তি সব গেছে। উপরন্তু সংসারের বোঝা বেড়েছে।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি একটা উপায় বার করলেন। তাঁর বন্ধু বিমানবিহারী একটি পুস্তক প্রকাশনালয়ের মালিক। সেখান থেকে বিজ্ঞান, আইন, ডাক্তারি শাস্ত্রের বই-এর বাংলা অনুবাদ বেরুচ্ছে নিয়মিত। প্রতাপ নিজে বই লিখতে পারবেন না। কিন্তু ঐ সব বই-এর অনুবাদের কাজ করতে পারেন অনায়াসে। তিনি ইংরেজিটা ভালো জানেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে সংস্কৃততে লেটার পেয়েছিলেন। বাংলা লিখতে পারেন নির্ভুল বানানে। বিমানবিহারী এই প্রস্তাব শোনা মাত্র মহা বিস্ময়ের ভাণ করে বলেছিলেন, তুমি কী করে আমার মনের কথাটা জানলে? কদিন ধরে আমি এই কথাই ভাবছিলুম। ব্যবসা বড় হয়ে যাচ্ছে। সব দিক আমি সামলাতে পারছি না। তুমি সন্ধের দিকে এসে আমার অফিসের কাজকর্ম দেখে দাও!

প্রতাপ বলেছিলেন, না ভাই, সে কাজ নিতে পারবো না, সেটা বে-আইনি, তবে বই অনুবাদ করতে পারি।

যথারীতি বিভাগীয় অনুমতি নিয়ে প্রতাপ শুরু করলেন অনুবাদের কাজ। প্রথম প্রথম উৎসাহের চোটে লিখে ফেললেন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা, তারপর আর মন বসে না। অল্প বয়েস থেকেই যাদের লেখার ঝোঁক নেই, তাদের পক্ষে পরিণত বয়েসে যে-কোনো কিছুই পাতার পর পাতা লিখে যাওয়া একটা ভীতিকর ব্যাপার! অনেক সময় সামান্য চিঠিপত্র লিখতেই কলম সরে না, আলস্য লাগে। প্রতাপের অবশ্য আদালতের মামলার রায় লেখার অভ্যেস আছে। কিন্তু অধিকাংশ রায়ের বয়ানই ছক বাঁধা, তাছাড়া সেই রায় লেখা তো চাকরির অঙ্গ। অচিন্ত্যবাবু দীর্ঘকাল হাকিমী করেও কী করে অতগুলি বই লিখেছেন তা ভেবে প্রতাপ এখন হতবাক্ হয়ে যান।

বিকেলের দিকে আদালতের কাজ শেষ হবার সময়টাতেই প্রতাপের গায়ে যেন জ্বর আসে। বাড়ি ফিরেই অনুবাদকর্ম নিয়ে বসতে হবে। নিজেই এই কাজ নিয়েছেন, সুতরাং ছুটি নেবার উপায় নেই। তবু তিনি মাঝে মাঝে দেরি করে বাড়ি ফেরেন, নিজের কাছেই ফাঁকি মারার এই অছিলা খোঁজেন।

একদিন শিয়ালদা থেকে বেরিয়ে তিনি ভাবলেন, অনেকদিন সত্যেনদের খবর নেওয়া হয়নি, তালতলা ঘুরে আসা যাক। ফাঁইলপত্র দিয়ে আদালিকে তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। নিজে হাঁটতে শুরু করলেন মৌলালির দিকে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, প্রতাপের সঙ্গে ছাতা নেই, কিন্তু তাঁর ভালোই লাগছে। মনে বেশ একটা হালকা হালকা ভাব। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি এক প্যাকেট প্লেয়ার্স নাম্বার থ্রি কিনে ফেললেন দুম করে। ইদানীং খরচ কমাবার জন্য তিনি মেপোল ধরেছেন। কিন্তু ভালো সিগারেট খাওয়া তাঁর এক বিলাসিতা। ছাত্র বয়েসে তিনি প্রথম সিগারেট টানা শেখার সময় প্লেয়ার্স নাম্বার থ্রি কিনতেন, তখন তিনি ছিলেন মালখানগরের এক সচ্ছল পরিবারের সন্তান। মালখানগরের বোসেদের বাড়ির একটি ছেলেই তাঁকে প্রথম সিগারেট ধরায়।

সাদা রঙের চৌকো প্যাকেট, খোলার পর প্রতাপ প্রথমে ঘ্রাণ নিলেন। হ্যাঁ, বেশ টাটকা, এর গন্ধেই একটা মাদকতা আছে। একটা সিগারেট বার করে ধরাতেই প্রতাপ যেন ফিরে গেলেন ছাত্র বয়েসে।

বসবার ঘরে পাঁচ ছ'জন লোক, সেখানে বসে আছেন ত্রিদিব। সুলেখা নেই। লোকগুলি প্রতাপের অপরিচিত। তাই প্রতাপ একটু দ্বিধান্বিতভাবে দাঁড়ালেন দরজার কাছে।

ত্রিদিব বললেন, সুলেখার একটু জ্বর হয়েছে, আপনি যান, ওপরে যান। আমি একটু পরে আসছি।

প্রতাপ এ বাড়ির জামাই, সুতরাং বসবার ঘরে তাঁর বসরার কথা নয়। সুলেখার জ্বর হয়েছে শুনে তিনি যেন একটু অবাক হলেন। সুলেখার মতন নারীদের সঙ্গে যেন অসুখ-বিসুখের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে প্রতাপ নতুন রঙের গন্ধ পেলেন। দেয়ালগুলিতে সদ্য কলি ফেরানো হয়েছে। জানলা-দরজায় নতুন রঙ। প্রতাপ অনেকদিন এ বাড়িতে আসেননি।

এ বাড়িতে কয়েকজন আশ্রিত-পরিজন রয়েছে, তারা সবাই থাকে নিচের তলায়। দোতলাটি বলতে গেলে ফাঁকা। কয়েকটি ঘর তালাবন্ধ, তার মধ্যে একটি ঘর মমতার, সেখানে মমতার কুমারী জীবনের কিছু কিছু জিনিসপত্র এখনো রয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় প্রতাপ কিছুদিন এসে এখানে ছিলেন, তাঁর মেয়ে মুন্নির জন্মও হয়েছিল এখানে। শুধু মুন্নি কেন, পিকলুর জন্মের সময়েও তো মমতা এসে বাড়িতে ছিলেন, তখন মমতার মা বেঁচে। একমাত্র বাবলুর জন্ম হয়েছিল মালখানগরে।

দোতলায় এসে প্রতাপ একটা ঘরের সামনে এসে ডাকলেন, সুলেখা! সুলেখা!

একজন দাসী বেরিয়ে এসে বললো, ও জাঁইবাবু? অ বৌদি, বড়জাঁইবাবু এয়েচেন!

প্রতাপ বললেন, বৌদি শুয়ে আছেন নাকি?

দাসী বললো, হ্যাঁ। যান না!

প্রতাপ ভেতরে ঢুকবার আগেই সুলেখা দরজার কাছে এসে জোড়া ভুরু তুলে ক্লাসিক্যাল বিস্ময়ের ছবি হয়ে বললেন, ও, প্রতাপদা! কী আশ্চর্য! পথ ভুলে নাকি?

প্রতাপ চুপ করে কয়েক মুহূর্ত অপলক ভাবে চেয়ে রইলেন। তিনি গান গাইতে পারেন না। ছবি আঁকেন না। কবিতা রচনা করতে পারেন না, তবু সৌন্দর্যের তরঙ্গ তাঁর হৃদয়ে একটা আলোড়ন তোলে। সুলেখা কোনোরকম সাজগোজ করেননি। একটা গোলাপি ডুরে শাড়ি পরা, চুল খোলা পিঠের ওপর। চোখ দুটো ঈষৎ ছলছলে। তাঁর অস্তিত্বের মধ্যেই একটা মাধুর্য আছে।

প্রতাপ আস্তে আস্তে বললেন, তোমার জ্বর?

-সেই খবর পেয়েই এলেন নাকি? এই সব ক্ষেত্রে মিথ্যেটাই নিদোষ মধুর। প্রতাপ মাথা নেড়ে বললেন, কী করে যেন টের পেয়ে গেলাম!

এগিয়ে এসে তিনি সুলেখার কপালে হাত দিয়ে বললেন, কই, টেম্পারেচার নেই তো!

ঝনঝন করে হেসে সুলেখা বললেন, আপনি এলেন তো, অমনি কমে গেল বোধ হয়! আসুন, ভেতরে আসুন! আপনার দিদি কেমন আছেন? বাচ্চারা?

সবে মাত্র দেয়াল রং করা শেষ হয়েছে বলে ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র সব অগোছালো ভাবে ডাঁই করা। একটা হাতলওয়ালা চেয়ারের মিহি ধুলো ঝাড়ন দিয়ে পরিষ্কার করে সুলেখা বললেন, বসুন, এখানে বসুন! সত্যিই কাল আমার জ্বর এসেছিল। বোধ হয় এই ধুলোর জন্যই!!

প্রতাপ বললেন, এত সব ধুলোবালি তোমার সহ্য হবে কেন? গোটা বাড়িটাই রং করা হলো বুঝি?

সুলেখা বললেন, হ্যাঁ। অনেকদিন হয়নি তো। তাছাড়া বিনতারা আসছে জানেন তো? এখানেই থাকবে!

প্রতাপের ছোট শ্যালিকা বিনতা বিয়ের পর থেকেই ইন্দোরে আছে, অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। তার আসার খবরে প্রতাপ উৎফুল্ল হলেও পরের মুহূর্তেই যেন মনের মধ্যে একটা কাঁটা বোধ করলেন। বিনতার স্বামী খুব বড় চাকরি করে, তাছাড়া তাদের বর্ধমানে সম্পত্তি আছে। ত্রিদিবের অবস্থা বেশ ভালো, সেই তুলনায় প্রতাপেরই এখন টানাটানির সংসার। কয়েক বছর আগেও প্রতাপ যে-কোনো পারিবারিক সম্মিলনে অন্যদের একটা পয়সাও খরচ করতে দেননি। কিন্তু এখন আর তাঁর সে সামর্থ্য নেই। বিনতারা আসবে, তাদের জন্য নেমন্তন্ন, বেড়ানো, উপহার ... । প্রতাপ জোর করে মন থেকে এই চিন্তাটা মুছে দিলেন। আজ সন্ধেবেলা এসব কথা থাক।

সুলেখা বললেন, বিনতারা আসছে, আপনারাও ক'দিন এসে এখানে থাকুন না! বেশ মজা হবে!

প্রতাপ হাসলেন। শ্বশুরবাড়িতে এসে থাকার কি আর বয়েস আছে তাঁর? ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মমতাকে কয়েকদিনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

–তুমি বসো, সুলেখা। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি! তোমার কতাকে তো দেখলাম। খুব ব্যস্ত!

সুলেখা খাটের ওপর বসে পড়ে বললেন, আপনারা দেওঘরে গিসলেন, সেই গল্পই তো শোনা হলো না। অবশ্য পিকলু এসেছিল পরশুদিন...

প্রতাপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, পিকলু এসেছিল?

–হ্যাঁ। ও তো আসে মাঝে মাঝে। ওর মামার লাইব্রেরি ঘর থেকে বই নিয়ে যায়। ঠিক মামার মতনই ওর বই পড়ার নেশা, হয়েছে।

–আমি তো জানি না যে পিকলু আসে এখানে।

–জানবেন কী করে? ছেলের সঙ্গে কথা বলার সময় পান? শুনলুম, খুব নাকি ব্যস্ত আপনি আজকাল? পিকলু আসবে না কেন? বড় হয়েছে, ট্রামবাসে একা একা চলাফেরা করতে পারে! আপনি কী খাবেন?

–কিচ্ছু না!

–বা, কোর্ট থেকে আসছেন তো, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। বসুন, আমি আসছি!

–না, এখন যেও না! একটু বসো।

প্রতাপ পকেট থেকে প্যাকেটটি বার করে আর একটি সিগারেট ধরালেন। সুলেখার সঙ্গে যে বিশেষ কিছু কথা আছে তাঁর, তা নয়। এই সিগারেটটাই হচ্ছে ভালো মুডের প্রতীক, সুলেখার সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ ভালো সময় কাটাতে চান।

দাসীকে ডেকে সুলেখা চা-জলখাবার আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, প্রতাপদা, আমি যদি চাকরি করি, তাতে আপনার আপত্তি আছে?

–চাকরি, কী চাকরি?

–সারা দুপুর তো বাড়িতেই বসে থাকি। একলা একলা সময় কাটে না। খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখে দিলুম, তাতেই ওরা ডেকেছে। এখন ইচ্ছে করলেই জয়েন করতে পারি। ওকে কিন্তু এখনো কিছু বলিনি, চিঠিটা আজই এসেছে।

–কী চাকরি, সেটা বলো?

–বেথুন কলেজে, ইংরিজির লেকচারার।

আজ প্রতাপের মনে পড়লো, সুলেখা ইংরিজিতে খুব ভালো ছাত্রী ছিল। এম এ-তে ফাস্ট ক্লাস পেয়েছে, বিয়ের আগে তার বিলেতে গিয়ে আরও পড়বার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে আর যায়নি। রূপ ও গুণের এমন সমন্বয় দেখা যায় না।

এ দেশের মেয়েরা আজকাল লেখাপড়া শিখছে হঠাৎ বিধবা হলে বিপদে না পড়ার জন্য। স্বাভাবিক, সুখী বিবাহিত জীবন হলে লেখাপড়ার আর কোনো মূল্য নেই।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চাকরি করবে .....সে রকম দরকার তো কিছু নেই চাকরি করতে তোমার কষ্ট হবে না?

–কষ্ট আবার কী? ওয়েলিংটন থেকে এক ট্রামে যাবো। এক ট্রামে ফিরবো।

–তবু প্রত্যেকদিন যাওয়া–

–শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে সেটা ভালো নয়?

–ত্রিদিবদাকে এখনো জিজ্ঞেস করোনি?

–বললুম না, আজই চিঠি এসেছে। আপনি বলুন না, আপনার কী মত? আপনার আপত্তি আছে?

–আমার কেন আপত্তি থাকবে? আমার মত জিজ্ঞেস করলে আমি হ্যাঁ-ই বলবো, কলেজের চাকরি, হালকা কাজ, প্রায়ই ছুটিছাটা থাকে!

সুলেখার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খাট থেকে নেমে এসে প্রতাপের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি ঠিক যা ভাবি, আপনি সেইরকম। এই যে আপনি হ্যাঁ বললেন, এতে আমার সব দোনামোনা কেটে গেল। এবার ওকে বুঝিয়ে বলা মোটেই শক্ত হবে না।

প্রতাপ সুলেখার একটা হাত ধরে বললেন, ইস, আমার ইচ্ছে করছে তোমার ছাত্র হতে!

প্রতাপের মনটা খুশীতে ভরে গেছে। সুলেখা যে তাঁর মতামতকে এতখানি গুরুত্ব দিয়েছে, এতে তাঁর পৌরুষ উদ্দীপিত হয়। আজ তাঁর এখানে এসে পড়া আকস্মিক। কিন্তু প্রতাপের মনে হলো, নিয়তি নির্ধারিত। সুলেখার চাকরি নেওয়া একটা বড় ঘটনা–এতে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হলো।

চা-জলখাবার খেতে খেতে ঐ চাকরি বিষয়ে আরও খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন প্রতাপ। তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কোনো নারী এখনো চাকরি করে না। সুলেখা চাকরি করতে যাচ্ছে প্রয়োজনে নয় শখে, তবু এর মধ্যে যে একটা রীতি ভাঙার ব্যাপার আছে, সেটাই প্রতাপের পছন্দ হলো।

একটু বাদে বাইরে থেকে কে যেন একজন নাটকীয়ভাবে ডাকলো, মাগো, মা জননী!

প্রতাপ ভুরু কোঁচকালেন। সুলেখা উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, এ কী? আজ আবার এসব কী নিয়ে এসেছেন?

প্রতাপ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, একজন রুখু দাড়িওয়ালা, লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা চেহারার লোক হাতে এক ছড়া কলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা কী ফেরিওয়ালা? তা হলে সরাসরি ওপরে আসবে কী করে?

সুলেখা পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি হারীত মণ্ডল।

সেই নাম শুনে তৎক্ষণাৎ প্রতাপের মনে কোনো রেখাপাত করলো না। এই ফেরিওয়ালা শ্রেণীর লোকটি ঠিক এই মুহূর্তে বিঘ্ন ঘটাতে এসেছে বলে তিনি অপ্রসন্ন হলেন।

সুলেখা আবার বললেন, কী যে করেন আপনি, এতগুলো কলা নিয়ে এসেছেন কেন? হারীত মণ্ডল বললো, মা জননী, আমরা গরিব হইতে পারি, কিন্তু ভিখারী তো না? আমাগোও তো মাঝে মাঝে কিছু দিতে ইচ্ছা করে?

এই উটকো লোকটির মা জননী ডাক প্রতাপ খুবই অপছন্দ করলেন। সুলেখার প্রতি ঐ সম্বোধন যেন একেবারেই বেমানান। কিন্তু তিনি আপত্তি করতে পারলেন না, কারণ তাঁর মনে হলো, ঐ লোকটির প্রতি সুলেখার বেশ প্রশ্রয় আছে! এই উপদ্রব থেকে এখন সরে পড়াই ভালো।

প্রতাপ উঠে পড়ে বললেন, সুলেখা, আমি এখন চলি,বাড়িতে কাজ আছে। নিচে ত্রিদিবদার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি!

হারীত মণ্ডলের প্রতি ভূক্ষেপ মাত্র না করে প্রতাপ নেমে গেলেন নিচে।

বাড়ি ফিরে পোশাক বদলেই প্রতাপ বই-খাতা-কলম খুলে বসলেন। তাঁর কাজে নতুন উৎসাহ এসেছে। সুলেখাই আজকের প্রেরণা। ঐ যে সুলেখা তাঁর জীবনের একটা বড় ব্যাপারে প্রতাপের মতামতকে এতটা মূল্য দিয়েছেন, তাতেই প্রতাপের অহমিকা অনেক চাঙ্গা হয়ে গেছে। মমতাকে তিনি সংক্ষেপে বিনতা আসার খবর জানিয়েছেন, বাকি কথা

রাত্তিরে বিছানায় হবে। বিনতা আসছে বলেই প্রথম অনুবাদের কাজটা তাঁর তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার।

লিখতে লিখতে একটা ইংরিজি শব্দতে আটকে গেলেন প্রতাপ। অভিধান দেখা দরকার। তিনি উঠে এলেন পাশের ঘরে।

বাবলু আর পিকলুর সঙ্গে আজ মুন্নিও বসেছে, একটা টেবিলের তিন পাশে তারা পড়ছে তিন রকম পড়া। বাবলু বাবাকে দেখেই একটা বই লুকিয়ে ফেলো। মুন্নি খাতায় ছবি আঁকছিল। খাতা বন্ধ করলো। আর পিকলু মন দিয়ে অঙ্ক কষছিল। করেই যেতে লাগলো, খেয়াল করলো না বাবার উপস্থিতি।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, ইংলিশ ডিকশনারিটা কোথায় রে, পিকলু?

পিকলু মাথা তুলে বাবাকে দেখলো। যেন তার ঘোর কাটতে সময় লাগলো খানিকটা। তারপর সে অভিধানটা খুঁজে বাবাকে দেবার আগে বললো, তুমি কোন্ ওয়ার্ড খুঁজছো বাবা?

প্রতাপ বললেন, সোলেসিজম!

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, বানানটা বলো, আমি দেখে দিচ্ছি।

প্রতাপ হাতের কাগজ দেখে বললেন, এস ও এল ই সি আই এস এম!

পিকলু অভিধানের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এস আসবার আগেই বললো, ও, সোলইসিজম? ওর মানে হচ্ছে ব্যাকরণের ভুল। বা উল্টোপাল্টা ব্যবহার। এটা গ্রীক শব্দ, বাবা। সোলি বলে একটা জায়গা ছিল, সেখানে ভুল গ্রীক বলা হতো!

প্রতাপ চমৎকৃত হলেন পিকলুর দ্বিধাহীনভাব দেখে। একটা ইংরিজি শব্দের মানে তিনি জানেন না, তাঁর ছেলে জানে, এ তো হতেই পারে। কিন্তু অভিধান হাতে নিয়েও ঠিক পাতাটা খোলার আগে পিকলু কী রকম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বললো?

প্রতাপ অভিধানটা নিয়ে তবু মিলিয়ে দেখলেন, পিকলু ঠিকই বলেছে। পিকলু বিজ্ঞানের ছাত্র, তবু সে ইংরিজি ভাষা সম্পর্কেও এত জানে?

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, তুই এটা জানলি কী করে রে, পিকলু?

পিকলু বললো, আমি মাঝে মাঝেই এনসাইক্লোপিডিয়া পড়ি। আমার খুব ভালো লাগে।

প্রতাপ উচ্ছ্বাসপ্রবণ নন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে বাড়াবাড়ি করেন না কখনো। তবু আজ তিনি ভাবলেন, এ ছেলেটা জিনিয়াস! ভবিষ্যতে পিকলু সাঙ্ঘাতিক বড় একটা কিছু করবে!

২২ বঙ্কুবিহারীর স্ত্রী এলিজাবেথ

বঙ্কুবিহারীর স্ত্রী এলিজাবেথ হাটটে, সংক্ষেপে লিজ, একজন ভারত-প্রেমিকা। এই আইরিশ মেয়েটির পরিবার অনেক দিন থেকেই আয়াল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। লিজ-এর এক পিতৃব্য প্রখ্যাত বিপ্লবী ডি ভ্যালেরার সঙ্গে জেল খেটেছিলেন, জেল ভেঙে পলায়নকালে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। আয়াল্যান্ডের জাতীয়তাবাদীরা অনেকেই উগ্র ইংরেজ-বিরোধিতার কারণে ভারতের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন।

কবি ইয়েটস- এরও খুব ভক্ত লিজ। ইংরেজি ভাষার এই প্রধান কবি কেলটিক পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনেও নেতৃত্ব নিয়েছিলেন এবং আইরিশদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অহংকার দিয়েছেন। ইয়েটস-এর সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে আইরিশদের পরিচয় হয় এবং লিজ রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে এমনই মুগ্ধ হয় যে সে নিজের চেষ্টায় বাংলা শিখতে শুরু করে।

বন্ধুবিহারীর সঙ্গে লিজ-এর পরিচয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিবাহের প্রধান কারণ এই যে বন্ধুবিহারী একজন ভারতীয় এবং বাঙালী। এর আগে লিজ কোনো ভারতীয়কে চাক্ষুষ দেখেনি। ভারত তার কাছে এক স্বপ্নের দেশ এবং ভারতীয় মাত্রই পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতার ধারক।

বন্ধুবিহারী অবশ্য স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইতে রবীন্দ্রনাথের দু'একটি কবিতা ছাড়া আর কিছুই পড়েনি। বেদ-উপনিষদ আর গ্রীক ভাষা তার কাছে একই। অল্প বয়েসে বিলেতে যাবার পর থেকেই সে নিজের গা থেকে ভারতীয়ত্ব মুছে ফেলে প্রাণপণে ইংরেজদের অনুকরণ করতে চেয়েছে।কতরকম ভাষায় দৈনিক আবহাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে হয় তা সে জানে কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী জানে না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিষয়েও প্রায় কিছুই জানে না বলতে গেলে।

বন্ধুবিহারীর চেহারাটি সুন্দর, বনেদী বংশের ছাপ আছে। তার প্রথমা স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায় কারণ বন্ধু তার বিলাসব্যসনে পুরোপুরি তাল দিতে পারছিল না; তারপর সে বেশ কিছুদিন এদিক ওদিক ভাসতে ভাসতে একটা চাকরিসূত্রে ডাবলিনে গিয়ে পৌঁছোয়। প্রথম আলাপেই লিজ-এর উচ্ছ্বাস দেখে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল বেশ। লিজ তাকে দেখেছে মোহের অঞ্জন মাখা চোখে। ওদেশে বন্ধুবিহারী থেকে তার ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল হ্যারি, তাড়াতাড়ি সে আবার বন্ধু হয়ে গেল, লিজ শুনে বলেছিল কী সুইট স্যানসক্রিট নাম! যদিও লিজ সেই নামটি শেক্সপীয়ারের একটি চরিত্রের মতন ব্যাঙ্কো উচ্চারণ করে।

লিজ-এরও আগে একটি বিবাহ ছিল। সে ক্যাথলিক, তাদের সমাজে ডিভোর্স চালু নেই, তার আগের স্বামী সুবিধেমতন সময়ে মারা গেছে। লিজ বন্ধুর চেয়ে এক বছরের বড়। বন্ধু অবশ্য লিজকে শুধুমাত্র তার ভারত-প্রীতির জন্যই বিয়ে করতে রাজি হয় নি। লিজ-এর বাবা একজন সম্পন্ন আলু-চাষী, তাঁর পুত্র সন্তান নেই, তিনটি কন্যা। লিজ পিতৃ-সম্পত্তির ভাগ পাবে, মৃত স্বামীর জমি-জমাও সে পেয়েছে। সুতরাং বন্ধুর চোখে পত্নী

হিসেবে লিজ বেশ শাঁসালো। তবে বন্ধুর বন্ধুরা তাকে উপদেশ দিয়েছে, সব সময় বউ-এর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে যাবি, দেখিস সাবধান, একটু যেন এদিক ওদিক না হয়। আইরিশ মেয়েরা এমনিতে যতই নরম হোক আর সংস্কৃতিচর্চা করুক, কখন যে দপ করে জ্বলে উঠবে তার ঠিক নেই। আইরিশ। মেজাজ বলে কথা!

বন্ধু তার পত্নীকে মুগ্ধ করার জন্য নানারকম ভড়ং শিখেছে। সে সকাল-বিকেল ঘণ্টাখানেক ধরে আহ্নিক করে, সপ্তাহে একদিন নিরামিষ খায়, বিলেতে থাকতে শিব-দুর্গা বা কোনো হিন্দু ঠাকুর দেবতার ছবি জোগাড় করতে পারে নি কিন্তু গৌতম বুদ্ধের একটি ছবি পেয়ে সেটিকেই লকেটে পুরে গলায় ধারণ করে।

প্রথম দিন, এসেই সে বিমানবিহারীকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল, দাদা, তুগি গীতা। পড়েছো?

ছোট ভাই এবারে বিলেত থেকে বোম্বাইতে নেমে ধুতি-পাঞ্জাবী কিনে তা পরে কলকাতায় এসেছে বটে কিন্তু তার কাছ থেকে গীতা সম্পর্কে আগ্রহের কথা শুনবেন, এমনটি বিমানবিহারী কল্পনাও করেন নি।

তিনি আমতা আমতা ভাবে বললেন, না, সেরকমভাবে পড়িনি, পড়লেও বুঝি নি।

বন্ধু বললো, আমার বউ, বুঝলে গীতা-টিতা সম্পর্কে খুব ইন্টারেস্টেড! আমাকে প্রায়ই নানা কথা জিজ্ঞেস করে। আমি তো ওসব জানি না ছাই! একটা বামুন পন্ডিত জোগাড় করো, মোটামুটি আমাকে বুঝিয়ে দেবে। আর হ্যাঁ, রামায়ণ মহাভারতের ইংলিশ ট্রানশ্লেশন পাওয়া যায়? ও দুটোও পড়ে নিতে হবে আমাকে। শ্রীকৃষ্ণকে আমি অর্জুনের মামা বলেছিলুম, ও ঠিক ধরে ফেলেছে। ও বলে, শ্রীকৃষ্ণ নাকি অর্জুনের শালা?

বিমানবিহারী হাসতে লাগলেন। বউ-এর ঠেলায় পড়ে কাবু হয়ে গেছে তাঁর ভাই। কোনোদিন যে-সব বই সে ছুঁয়েও দেখে নি, এখন সেই রামায়ণ-মহাভারত পড়ে বউয়ের কাছে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে।

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্বটি মোটামুটি নির্বিঘ্নেই উৎরে গেছে। মায়ের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ লিজ-এরই বেশি ছিল। বিমানবিহারী আগে থেকেই মা-কে বুঝিয়ে এসেছিলেন যে এই নতুন বউ কিছু কিছু বাংলা জানে, স্বভাব মোটেই উগ্র নয়, অতি লক্ষ্মী মেয়ে ইত্যাদি। মা এখন প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকেন, হাঁপানিতে কাবু করে ফেলেছে, আগের মতন, আর তেজ নেই।

বন্ধু স্ত্রীকে নিয়ে মায়ের ঘরে এলো বাইরে জুতো খুলে রেখে, লি-এর ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট থাকার প্রশ্নই নেই কারণ সে একেবারেই সিগারেট খায় না। শাড়ি পরা মেম বউমার দিকে মা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। লিজ বাংলাতেই বললো, মা আপনার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে এসেছি। কিন্তু তার উচ্চারণের জন্য মা সে ভাষা একবর্ণও বুঝতে পারলেন না। লিজ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই মা আঁতকে উঠে বললেন, না, না, না, ওরে বারণ কর, আমাকে ছুঁতে বারণ কর!

মাকে পা গুটিয়ে দেখে নিতে লিজ হতভম্বভাবে স্বামীর দিকে তাকাতেই বন্ধু বললো, আমার মামার স্কিন ডিজিজ আছে, সেইজন্য টাচ্ করতে বারণ করছেন, তোমার ভালোর জন্যই। তুমি একটু ডিসটেন্স থেকে নমস্কার করো।

এরপর লিজ হাত জোড় করে নমস্কার জানাতে মা-ও প্রতিনমস্কার জানালেন। উপহার। হিসেবে লিজ কয়েকটি চকলেট বার এবং এক জোড়া দুল বার করতেই ফিক করে হেসে ফেললেন মা। তিনি ভাবলেন, ও দেশের বুড়ো ধাড়ী শাশুড়িরাও বুঝি চকলেট খায়? বিধবারা কানে দুল পরে? মায়ের সেই হাসিতেই পরিবেশ অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেল।

পরে মা বিমানবিহারীকে বলেছিলেন, ওরা এ বাড়িতে থাকতে চায় থাকুক, কিন্তু ঐ বউয়ের হাতের ছোঁয়া আমি খেতে পারবো না। ও যেন নিরিমিষ রান্নাঘরে না যায়। ওরা এঁটোকাঁটা মানে না...।

বিমানবিহারী বলেছিলেন, মা, এ বউ কিন্তু আমাদের আচার অনুষ্ঠান অনেক কিছু জানে।

মা উত্তর দিয়েছিলেন, দ্যাখ বীরু, আমরা আর ক'দিন? আমাদের মতন পুরোনোরা সব মরেঝরে গেলে, তারপর তোরা সব মেনে নিস।

প্রথম প্রথম এ দেশের সব কিছুই লিজ-এর পছন্দ। ভালো লাগাবার মতন মন নিয়েই সে এসেছে। পথঘাটের আবর্জনা, হিসির দুর্গন্ধ, মানুষের সরাসরি কৌতূহলী দৃষ্টি, ট্রামবাসের অমানুষিক ভিড়, অনাবশ্যক কোলাহল, এসব কিছুই তাকে দমিয়ে দিতে পারে না। যা কিছু সে দেখে সবই হাউ সুইট, কী চুন্ডোর, কী বালো! একমাত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে সে নাক সিটকে বললো, এঃ এটা কী? হোয়াট মনস্ট্রসিটি! পাথরের বিপুল অপচয়। আমি এটা দেখতে চাই না, আমি কালীঘাটের মন্দির দেখব।

ইংরেজ চলে যাবার পরেও সারা ভারত জুড়ে ইংরেজ-ভক্তির প্রাবল্য দেখে লিজ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়। তাদের আয়াল্যান্ডে তো এরকম নেই। কুচক্রী ইংরেজ ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করে দিয়ে গেছে, আয়াল্যাণ্ডেও ঠিক তাই। ইংরেজের সেই ভেদ-নীতির কথা মনে পড়লেই আইরিশ রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালেই স্বাধীন আয়াল্যাণ্ড কমনওয়েলথের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করেছে, কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এখনো কমনওয়েলথের জয়গান করেন।

ভারতীয়রা দার্শনিক বা উদাসীন বা ক্ষমাপরায়ণ, সেটা বুঝতে পারে লিজ, কিন্তু রেজ-চাটুকারিতার কারণ সে খুঁজে পায় না। এখানকার শিক্ষিত মানুষদের ভাব ভঙ্গি ইংরেজদের মতন। লিজ নিজে ভাঙা ভাঙা বাংলা বলার চেষ্টা করে কিন্তু তার সঙ্গে সবাই কথা বলে ইংরিজিতে। সে শ্বেতাঙ্গিনী বলেই যে তাকে বেশি খাতির করা হচ্ছে এটা সে টের পায়। যে-কোনো বাড়ির অন্দর মহলে গেলেই সে বাড়ির মেয়েরা তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলাবলি করে, কী ফর্সা! অথচ ভারতীয় মেয়েদের জলপাই রঙের গাত্রবর্ণ লিজের অনেক বেশি সুন্দর মনে হয়।

লিজ নিজেকে বারবার আইরিশ বলে পরিচয় দিলেও সবাই তাকে ইংরেজ বলেই ধরে নেয়। আয়াল্যাণ্ড সম্পর্কে এখানকার অনেকেরই প্রায় কিছুই ধারণা নেই, ইউনাইটেড

কিংডম ও আয়ার‍্যাণ্ড যে দুটি আলাদা স্বাধীন দেশ, তা এরা জানে না। কেউ কেউ অবশ্য জর্জ বার্নার্ড শ এবং সিস্টার নিবেদিতার নাম বলে, ঐ দুটি মাত্র আইরিশ নাম এ দেশে পরিচিত।

সিস্টার নিবেদিতা অর্থাৎ মিস মাগারেট নোবেল-এর নাম লিজ আগে শানে নি। এই মহিলাটির কোনো পরিচিতিই নেই তাঁর নিজের দেশে! এর জীবনী পড়ে লিজ অবাক হয়। অতদিন আগে তার দেশের একটি মেয়ে এত দূর দেশে এসে কত সব কাজ করে গেছে! নিবেদিতার কাহিনী জানার পর লিজ একদিন দেখতে গেল বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে সে যেন আবহমানকালের ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করে। সেই তুলনায় কলকাতা-নগরী যেন ব্রিটিশের পরিত্যক্ত এক আবর্জনার স্তূপ। কেউ সম্মার্জনী ধরে পুরোনো ক্লেদ ঝেটিয়ে ফেলে তাকে ভারতীয় রূপ দেবার চেষ্টা করে না।

লিজ একদিন তার স্বামীকে বললো, সে রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান দেখতে যাবে।

এসব ব্যাপারে বন্ধুর জ্ঞান ভাসা-ভাসা। সে বললো, টেগোরের জন্মস্থান, সে তো শান্তিনিকেতন, সেখানে খুব গরম। চলো ডার্লিং, তোমাকে দার্জিলিং নিয়ে যাবো। সেখানে ভালো ঠাণ্ডা পাবে।

বন্ধুর থেকে লিজ অনেক কিছু বেশি জানে। এ দেশে আসার পর থেকে সে স্বামীকে আস্তে আস্তে চিনতে শিখেছে। সে বললো, ঠাণ্ডা ভোগ করার জন্য কি আমি এ দেশে এসেছি? ডাবলিনে ঠাণ্ডা কিছু কম আছে? শান্তিনিকেতন তো কবির আশ্রম ছিল, কিন্তু কবি জন্মেছিলেন এই কলকাতা শহরেই। আমি সেই বাড়িটা দেখতে যেতে চাই।

বন্ধু তখন তার দাদাকে জিজ্ঞেস করলো, রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান কোথায়। বিমানবিহারী। বললেন, জোড়াসাঁকোতে, সেটা নর্থ ক্যালকাটায়, তিনি নিজেও সেখানে কোনোদিন যান নি। বন্ধু বললো, তাহলে কী করে সেখানে যাওয়া যায়? ট্যাক্সিওয়ালারা কি চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে? বিমানবিহারী বললেন, তাতে সন্দেহ আছে, কলকাতায় ট্যাক্সি-ড্রাইভার প্রায় সবাই পাঞ্জাবী বা বিহারী।

এই সব আলোচনা শুনে লিজ আরও অবাক হয়। অত বড় একজন কবি, এসিয়ার প্রথম নোবেল লরিয়েট, এই শহরে তিনি জন্মেছেন, অথচ এখানকার শিক্ষিত লোকেরা তাঁর বাড়ি কোথায় জানে না? বিয়ের পর লিজ বন্ধুর সঙ্গে মাস ছয়েক লন্ডনে এসে ছিল। সেখানে বন্ধুর যে-সব ভারতীয় বন্ধুদের সে দেখেছে, তারা তো প্রত্যেকেই একবার না একবার স্ট্র্যাটফোর্ড অন আভ-এ শেক্সপীয়ারের বাস্তুভিটে দেখতে ছুটেছে।

শেষ পর্যন্ত বিমানবিহারীর প্রকাশনালয়ের এক কর্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে পাঠানো হলো। চিৎপুরের কদর্য রাস্তা, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ঢোকার মুখে সরু গলিতে সারি সারি তোলা উনুনের ধোঁয়া, সামনের চত্বরে শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে দুটি ষাঁড়, এসব দেখে লিজ-এর মনটা বিমর্ষ হয়ে যায়। অতি মনোহর প্রাচীন বাড়িটির গায়ে কোথাও কোথাও দগদগে ঘায়ের মতন নতুন প্লাস্টার ও ক্যাটকেটে রং করা। সেই বিশেষ দিনটিতে আরও চারজন বিদেশী এসেছে সেই ঐতিহাসিক ভবনটি দেখতে কিন্তু ভারতীয় দর্শক আর একজনও নেই। কয়েকটি খালি-গায়ে বাচ্চা ছেলে তাদের ঘিরে ধরে ভিক্ষে চাইছে।

অলি আর বুলি সেদিন গিয়েছিল লিজ-এর সঙ্গে। এই দুটি মেয়েকে লিজ-এর খুব পছন্দ। প্রথম প্রথম লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে ওরা মেম কাকিমার সঙ্গে মিলতে পারত না, কিন্তু এখন বেশ সাবলীল। মেমকাকিমার সঙ্গে ইংরিজি বলতে হয় না, বরং তার মজার বাংলা কথা শুনে ওরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। এখন ওদের কাছেই লিজ বাংলা উচ্চারণ শেখে।

অলির বয়েস মাত্র এগারো হলেও রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা সে পড়েছে। ঠাকুরবাড়ির দোতলায় যে-ঘরটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন, সেই ঘরটিতে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ বলে ওঠে :

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের ‘ পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান

না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ...

লিজ ছাড়া অন্য বিদেশীরাও মুগ্ধ হয়ে শুনলো সেই আবৃত্তি। তারপর অলি চুপ করতেই লিজ তাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভিজিয়ে দিল তার গাল।

বঙ্কু সঙ্গে আসেনি, অফিসের কর্মচারিটি অপেক্ষা করছে ভাড়া করা ট্যাক্সিতে। নিচে নেমে এসে লিজ অলিকে বললো, চলো, আরও কোথাও যাই।

কোথায় যাওয়া যায় বলো তো?

অলি বললো, বাবলুদাদাদের বাড়ি যাবে?

-কে বাবলুদাদান

-বাবলুদাদা আমার বন্ধু। আর ও বাড়িতে মুন্নি আছে, সে বুলির বন্ধু।

-তোমাদের দু'জনেরই বন্ধু আছে যখন, তখন সেখানে তো যেতেই হয় একবার। কিন্তু এই দুপুরবেলা গেলে তোমাদের বন্ধুদের মা-বাবা কিছু মনে করবেন না তো?

বুলি বললো, না, কাকিমা সব সময়ে হাসে।

খানিক বাদে বাগবাজারে বাবলুদের বাড়ির সামনে থামলো ট্যাক্সি। সেই ট্যাক্সি থেকে লিজকে নামতে দেখেই ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল। হোক না শাড়ি পরা, তবু তো খাঁটি মেম। এ পাড়াতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানও চোখে পড়ে না।

গ্রীষ্মের ছুটি তাই বাবলু, পিকলু, তুতুল সবাই বাড়িতে আছে। প্রতাপ কলকাতার বাইরে গেছেন কী একটা কাজে। মমতা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেও খুব একটা ঘাবড়ালেন না, অল্প বয়েসে তিনি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটি স্কুলে খাঁটি ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর কাছে

পড়েছেন। তাঁর বাপের বাড়িতে একটা ইংরিজি আবহাওয়া ছিল, এখনো তিনি ইংরিজিতে কথা বলার কাজ চালিয়ে দিতে পারেন।

সুপ্রীতি গ্রামে লেখাপড়া করেছিলেন, তিনি ইংরিজি জানেন না, তিনি মেমকে আসতে দেখেই এস্তে রান্নাঘরে আশ্রয় নিলেন এবং সেখান থেকে মেয়ের মুখে বাংলা কথা শুনে তিনি ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হতে লাগলেন।

বাবলু-পিকলুদের ঘরটা এমনই লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে যে সেখানে কোনো বিশিষ্ট অতিথিকে বসানো যায় না। লিজকে আনা হলো মমতাদের শোবার ঘরে। মমতা অলি আর বুলির দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোরা আসবি, আগে থেকে খবর দিস নি কেন?

লিজ বললো, আমরা আপনাডেরকে চোকে ডিটে এশেসি!

মমতা লজ্জা পেয়ে বললেন, বেশ করেছেন, বেশ করেছেন, খুব খুশী হয়েছি। ইউ আর ওয়েলকাম। মোস্ট ওয়েলকাম। আমরা খুব খুশী হয়েছি।

মুশকিল এই যে এ মেয়ের সামনে বাংলায় কোনো গোপন কথা বলারও উপায় নেই। অলি-বুলিদের যে একজন মেমকাকিমা এসেছে, সে খবরই জানতেন না মমতা। তিনি ওদের জন্য মিষ্টি কিনে আনতে পাঠালেন বাবলুকে।

লিজ যে-কোনো বাড়িতে গেলেই সে পরিবারের প্রত্যেকের সম্পর্কে প্রশ্ন করে। কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, কে কোন কাজ করে বা কতদূর লেখাপড়া জানে। এই সব জানতেই তার কৌতূহল। তুতুলকে দেখার পর তার মাকেও ডেকে আনা হলো প্রায় জোর করে। সুপ্রীতিকেই কেন যেন বেশি পছন্দ হলো লিজ-এর। সুপ্রীতির সঙ্গে নাকি তার মায়ের মুখের খুব মিল।

এতটুকু একটা অ্যাপার্টমেন্ট-এ যে একটা যৌথ পরিবার থাকতে পারে, সেটাই লিজ-এর কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। চারটি ছেলেমেয়ের কেউ হস্টেলে থাকে না, বাড়িতে থেকে পড়ে। আর্থিক অনটন আছে তা বুঝতেই পারা যায়। কিন্তু এদের মধ্যে যে একটা চাপা সমবোধ আছে লিজ সেটাও টের পেল, কথায় বাতায় কোনো হীনমন্যতা নেই। লিজ জানে তার নিজের দেশের দরিদ্ররা কত রুক্ষ ও তাদের কথাবার্তা কী রকম অমার্জিত হয়। মনে মনে সে এই তুলনাটা করে নিল।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পিকলু। তার মুখে সদ্য দাড়ি-গোঁফের রোম রেখা উঠেছে, ঠিক পলিমাটির ওপরে নবীন তৃণের মতন। সে একাগ্রভাবে দেখছে লিজকে। তার যা বয়েস তাতে। সে কোনো অপরিচিতা নারীর সঙ্গে চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না, দৃষ্টিটা শরীরের নানা অংশে ঘোরে।

লিজ একবার পিকলুর দিকে মনোযোগ দিয়ে বললো, এবারে আমি এই যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে চাই। সব বাংলায় বলতে পারবো না, তোমার সঙ্গে আমি ইংরিজিতে কথা বলতে পারি?

পিকলু মাথা নেড়ে বললো, ইয়েস, ইউ ক্যান।

লিজ বললো, নবীন যুবক, এর পর তোমরাই তো ইন্ডিয়া নামে দেশটা চালাবে। তোমার কী মত, এই দেশটা পাশ্চাত্তের অনুকরণে যান্ত্রিক সভ্যতাকে বরণ করে নেবে না খাঁটি প্রাচ্য দেশীয় হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে?

পিকলু মাটির দিকে চোখ রেখে একটু চিন্তা করে ইংরিজিতে বললো, আমার তো মনে হয় এ দেশে সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি বর্জন করে মেষপালকদের যুগে ফিরে যাওয়া উচিত।

–মেষপালকদের যুগ? তার মানে?

–এ দেশে এত মানুষ। একজন মেষপালকই ভালো জানবে কী করে এতজনকে একসঙ্গে চালাতে হয়।

লিজ হাসতে গিয়েও থেমে গেল। ভুরু কুঁচকে বললো, এটা খুব একটা উজ্জ্বল চিন্তা নয়।

পিকলু বললো, আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, এ দেশের বড় বড় কলকারখানার দরকার নেই। মোটর গাড়ি কিংবা সেলাইকলের দরকার নেই। তার বদলে সারা দেশের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে। অসংখ্য টিউবওয়েল পুঁতে দেওয়া হোক, তাতে সব মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবে, সেই জল দিয়ে চাষ করতে পারবে। প্রত্যেক গ্রামে তাঁত বসানো থোক, তাতেই প্রয়োজনীয় জামাকাপড়। পাওয়া যাবে।

–তাতে তোমার দেশটা সারা পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাবে না?

–আমাদের এই সদ্য স্বাধীন দরিদ্র দেশ পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে গেলে এমনিতেই পারবে না, হোঁচট খেয়ে পড়বে। তার চেয়ে আলাদা হবার চেষ্টা করাই ভালো।

–তুমি বুঝি একজন কবি?

–না, না, সে সব কিছু না। এমনিই বললুম! বেলা প্রায় পৌনে একটা বাজে, এবারে উঠতে হয়। ভবানীপুরের বাড়িতে ওঁরা চিন্তা করবেন। অলি আর বুলিকে নিয়ে লিজ উঠে পড়লো, মমতা আর সুপ্রীতিকে অনেক ধন্যবাদ জানালো।

দরজার বাইরে বাবলুকে দেখে লিজ বললো, এই বুঝি ওলির বয়ফ্রেণ্ড? তুমি আমাদের সঙ্গে একটাও কথা বললে না কেন?

অলি বললো, এই বাবলুদা, তুমি কথা বললে না কেন কাকিমার সঙ্গে? জানো কাকিমা, বাবলুদাটা বড্ড রাগী!

লিজ বললো, তাই নাকি?

হাত বাড়িয়ে সে বাবলুর একটা হাত ধরে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কেমন আছো?

বাবলু গড় গড় করে বললো, অল রাইট, ভেরি গুড! হাউ আর ইউ!

লিজ হেসে ফেলে বললো, কী মিষ্টি গলা! ওলি, তোমার ছেলেবন্ধুকে যদি আমি একটা চুমু খাই তুমি কি তাতে রাগ করবে?

বলেই সে ফটাফট করে বাবলুর দু গালে দুটি চুম্বন এঁকে দিল। লজ্জায় কান লাল হয়ে গেল বাবলুর।

বাড়িতে একটি জলজ্যান্ত মেম আসা বেশ বড় একটা ঘটনা। দিনের পর দিন সেই আলোচনা চলে। তার হাসি, তার শাড়ি পরার ধরন, তার বাংলা উচ্চারণ, তার দু আঙুলে চিমটের মতন সন্দেশ তুলে খাওয়া। বাবলুর গালে সেই মেম চুমু খেয়েছে বলে তুতুল, পিকলু আর মুন্নি রোজ তাকে রাগায়। কানুও সেই সঙ্গে জুটেছে। কানু বলে মেমের খুব পছন্দ হয়েছে বাবলুকে, সে তাকে বিলেতে ধরে নিয়ে যাবে! বাবলু তাই শুনে সবাইকে মারতে যায়।

লিজ-এর সঙ্গে তর্ক করে পিকলুরও খুব উৎসাহ হয়েছে মেমের সঙ্গে আবার কথা বলার। প্রতাপ ফিরে আসার পর একদিন গেলেন ভবানীপুরের বাড়িতে, পিকলু গেল তাঁর সঙ্গে। বাবলুর সেদিন জ্বর, তার যাওয়া হলো না। তার বিষম রাগ হলো জ্বরের ওপর।

পিকলু ফিরে এসে রাত্তিরবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফিসফিস করে জানালো, বন্ধুকাকার সঙ্গে মোকাকিমার খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। তিনি একা একা তাজমহল দেখতে চলে গেছেন আজ সকালেই। এখানে আর ফিরবেন না।

বাবলু পাশ ফিরে শুয়ে একটিও কথা বললো না। জ্বরের ঘোরে তার খুব দুঃখ হলো, সারা জীবনে তার আর কোনো মেম দেখা হবে না।

২৩ একটা মোটরবাইক চেপে হাজির

একটা মোটরবাইক চেপে হাজির হলো আলতাফ। মাদারিপুর থেকে সে খোঁজ করতে করতে আসছে। মোটরবাইকের তেজী আওয়াজ কাঁপিয়ে দিচ্ছে দিগন্ত পর্যন্ত, একপাল কাচ্চাবাচ্চা ছুটে আসছে পেছন পেছন। শীতকাল বলেই গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছোবার রাস্তা পেয়েছে। তাও ঠেলে ঠেলে আনতে হয়েছে দু জায়গায়।

মামুনের বাড়ির উঠোনের কাছে শিশুবাহিনী সমেত মোটরবাইক এসে থামলো। আধুনিক যুদ্ধের সেনাপতির মতন চেহারা আলতাফের। ফসা রং, দাড়ি নেই, গোঁফ আছে, মাথায় ব্যাক ব্রাশ করা চুল। চোখে সান গ্লাস, গায়ে একটা চামড়ার কোট, দু হাতে দস্তানা।

মোটরবাইকের গর্জন থামিয়ে, হাত থেকে দস্তানা খুলে সে হাঁক দিল, মামুন ভাই! মামুন ভাই!

মামুন আগেই জানলা দিয়ে দেখেছেন এই অদ্ভুত আগন্তুককে। তিনি ঠিক আন্দাজ করতে পারছেন না যে লোকটি কিসের দূত। অবশ্য অশুভ আশঙ্কাটাই প্রথম মনে জাগে। দিনকাল ভালো নয়! কে কার নামে কখন কোথায় লাগিয়ে দেবে তার ঠিক নেই। কয়েকদিন আগেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নুরুল হুদা সাহেব বলছিলেন, মামুন, তুমি যে এখনো এত বেশি কলকাতার গল্প করো, সেটা কিন্তু অনেকে ভালো চোখে দেখবে না। কেউ কেউ ভাবতে পারে, এখনো তোমার মন পড়ে আছে ভারতে! কিংবা তুমি ভারতের দালাল!

স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের জন্মলগ্নের প্রায় পরে পরেই কাশ্মীর নিয়ে একটা বখেরার সৃষ্টি হয়ে আছে। তিক্ততা বাড়ছে ক্রমশই। যুদ্ধ উপলক্ষে সকলেরই দেশাত্মবোধ তীব্র হয়ে ওঠে। দেশাত্মবোধের অপর নাম ঘৃণা। ভাই-ভাই ঝগড়া করে বাড়ির মাঝখানে বেড়া তুললে তারা শত্রুর চেয়েও বেশি শত্রু হয়। ডাক শুনে মামুন বেরিয়ে এলেন এবং যুবকটিকে একেবারেই চিনতে পারলেন না।

যুবকটি সাড়ম্বরে কৃত্রিম গলায় বললো, সেলাম আলেকুম, মামুনভাই, শরীর-গতিক সব ভালো তো?

মামুন অনেকটা যান্ত্রিকভাবে উত্তর দিলেন, আলাইকুম আসেলাম! হ্যাঁ ভালো আছি। আপনি?

চোখ থেকে সান গ্লাস খুলে যুবকটি বললো, আমায় চিনতে পারলেন না? আমি আলতাফ। আলতাফ হোসেন!

অন্তত দু'জন আলতাফ হোসেনকে চেনেন মামুন। তার মধ্যে একজন আলতাফ তো খুবই প্রতিপত্তিশালী। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলায় নাজিমুদ্দিনের আমলে সরকারের প্রচার সচিব। এমনিতে শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষ, কিন্তু শরীরের প্রতিটি গাঁটে গাঁটে যেন সাম্প্রদায়িকতার বিষ জমে ছিল। সেই উদ্দেশ্যে তিনি যে-কোনো ঘটনাকেই ইচ্ছে মতন রূপ দিতে পারতেন। মামুন একবার সেই আলতাফ হোসেনকে বলেছিলেন...

নাঃ, আবার কলকাতার কথা মনে এসে যাচ্ছে। সে যাই হোক, এই মোটরবাইক-আরোহী আলতাফকে তিনি আগে কখনো দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। লোকটি এমন অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলছে, যেমন অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলতে পারে হয় কোনো পুলিশের গোয়েন্দা অথবা কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

মামুন বললেন, আসেন, আসেন, ভিতরে আসেন!

আলতাফ প্রথমে তার যানটিতে চাবি লাগালো। তারপর বললো, মনে তো হচ্ছে আপনি এখনো আমারে চিনতে পারেন নাই? আমার আব্বা রফিক আহমদ সরকারকে মনে আছে তো? দায়ুদকান্দিতে আপনাদের একেবারে প্রতিবেশী ছিলেন?

মামুন এবারে একেবারে পরিষ্কার বুঝে গেলেন। দায়ুদকান্দিতে ঐনামের কেউ ছিল না, প্রতিবেশী হলে মামুনের নিশ্চিত মনে থাকতো। এই লোকটি অন্য কোনো মতলোবে এসেছে।

বাড়ির দাওয়াতে মোড়া পেতে তিনি বসতে দিলেন আলতাফকে। এখন শেষ বিকেল, চা খাওয়ার সময়। অন্দরমহলে চায়ের কথা জানিয়ে দিয়ে মামুন জিজ্ঞেস করলেন, এখন আপনি। কোথা থেকে আসছেন? রাত্তিরটা এই গরিবের বাড়িতেই থাকেন।

আলতাফ বললো, আরে মামুন ভাই, আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন! আমি কত। ছোট, আপনার পোলার মতন। ভাবী কোথায়?

-আসছেন, চা বানিয়ে নিয়ে আসছেন।

-অনেকদিন আপনি ঢাকায় যাননি, তাই না মামুন ভাই? ঢাকায় আপনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল শেষবার মাকুশা মাজারের কাছে। সেখানকার ক্যাপিটাল প্রিন্টিং প্রেসে আপনি আড্ডা দিতে যেতেন না? আবদুল গণি হাজারী, সরদার জয়েনউদ্দীন এঁরা সব থাকতেন, আমিও ছিলাম। আপনি আমার সাথে কথাও বলেছেন!

-ও তাই নাকি? আমার তো মনে নাই!

মামুনের মনে হলো, এই লোকটি নানারকম কথা বার করতে চাইছে। এর কাছে যে-কোনো মন্তব্যই বিপজ্জনক। তবু, ভালো ব্যবহার করতেই হবে।

আলতাফ পকেট থেকে একটি পাঁচশো পঞ্চান্ন নম্বর সিগারেটের প্যাকেট বার করে মামুনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ন্যান!

মামুন বললেন, আমার চলে না।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, বিদেশী দামী সিগারেট, ওর সান গ্লাস, চামড়ার কোট, দস্তানা, ঐ মোটরবাইক, সবই বিদেশী! এই সবই বর্তমান পাকিস্তানী যুবকদের ভোগ্যবস্তু।

সিগারেটে টান দিয়ে আলতাফ বললো, এই গ্রামের ইস্কুলে আপনি পড়াচ্ছেন নাকি, মামুনভাই?

–নাঃ!

–তা হলে ঢাকা শহর ছেড়ে এখানে বসে আছেন কেন?

–এমনিই চুপচাপ বসে আছি।

–আপনার সন্ধান কী করে পাইলাম জানেন? নদীমাতৃক নামে একটি পত্রিকায় আপনে সাক্ষাৎকার দিছেন, না? সেইটা পড়লাম।

–ও।

–আপনি কয়েকটা বেশ ভালো কথা বলেছেন। আপনার সাথে আমার খুব প্রয়োজন। আপনাকে একবার টাঙ্গাইল যেতে হবে। আমার সাথেই চলেন।

–আমি টাঙ্গাইল যাবো? কেন?

–আগে আমার পরিচয়টা দিয়া লই। বায়ান্নর ছাত্র আন্দোলনে আমি ভালোই জুটছিলাম, অল্পের জন্য জেল খাঁটি নাই। তারপর বি এ পাশ করছি। কিন্তু চাকরিবাকরিতে মন বসে না। ঢাকা শহরের আড্ডাই আমারে খাইছে। বাড়ি থেকে টাকা পয়সা পেতাম, বুঝলেন। আমার আব্বা একটু মাঝে মধ্যে বকাবকি করলেও আমার মায় আমারে খুব ভালোবাসে। চলছিল বেশ। ভালোই। কিন্তু মা এখন একটা বায়না ধরেছেন। সেইজন্যই আপনার সাহায্য চাইতে ছুটে এসেছি।

মামুন মুখভঙ্গিতে যথাসাধ্য ভদ্রতার ভাব বজায় রাখবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই প্রলভ যুবকটির কাহিনী কেন তিনি শুনতে বাধ্য তা কে জানে! এর গল্পের মাথা-মুণ্ডুও তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

তিনি শুষ্কভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী সাহায্য করবো আমি?

-আমার মা এখন বলছেন, ওরে বকু, (বকু আমার ডাক নাম, বুঝলেন, শুধু আমার মা আমারে এই নামে ডাকে) মা বললেন, তুই শুধু শুধু আজরাইলডার মতন ঘুইরা বেড়াস, তুই বিয়া শাদী না করলে তোরে আমি আর টাকা দিমু না!

যেন এটা একটা হাসির কথা, আলতাফ প্রচণ্ড জোরে বাড়ি কাঁপিয়ে হেসে উঠলো হাহা শব্দে।

মামুনও কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বললেন, কিন্তু আমার তো কোনো বিবাহযোগ্য কন্যা নাই, আমি তোমারে কী ভাবে সাহায্য করবো বলো তো? আমার মেয়েরা নেহাতই ছোট ছোট।

-সে জানি, সে জানি! তাছাড়া, আপনার বিবাহযোগ্য কন্যা থাকলেও কোনো লাভ ছিল। বিয়ে করলে আমি একটি মাত্র মেয়েকেই বিয়ে করবো। মনে মনে তাকে ঠিক করা আছে। সেই ব্যাপারেই আপনার সাহায্য চাই।

-আর একটু বুঝিয়ে বলো!

-টাঙ্গাইলের উকিল সুকুমার বক্সী আপনার বন্ধু না? তিনি প্রায়ই আপনার কথা বলেন। সেই বক্সী বাড়ির মেয়ে পারুলকে আমি বিয়ে করতে চাই। আপনাকে গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

মামুন চুপ করে গেলেন। সুকুমার বক্সীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে বটে কিন্তু তা ঠিক বন্ধুত্বের পর্যায়ে পড়ে না। টাঙ্গাইলে ঐ বাড়িতে তিনি দু একবার গেছেন। সুকুমার বক্সী মানুষটি ভারি নিরস, মেপে মেপে হিসেব করে কথা বলে।

আলতাফ বললল, মামুনভাই, তা হলে যাচ্ছেন তো আমার সঙ্গে?

–তুমি এই জন্য এতদূরে আমার কাছে এসেছো? আমার পক্ষে এখন টাঙ্গাইল যাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া আমার অনুরোধই বা তাঁরা শুনবেন কেন! আজকাল ভিন্ন জাতের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাব-ভালোবাসার বিয়ে হচ্ছে, তা জানি। কিন্তু কোনো হিন্দু সম্বন্ধ করে কোনো মুসলমান ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবে, এতটা বোধহয় এখনো হয় নি!

আলতাফ চোখ নাচিয়ে গূঢ় ইঙ্গিত করে বললো, ভাব ভালোবাসা আছে, ভাব ভালোবাসা আছে! পারুলের মত আছে। কিন্তু ঐ গোঁয়ার উকিলটাই রাজি নয়। আমি ইচ্ছে করলে ঐ মেয়েকে বক্সীবাড়ি থেকে একদিন উঠিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারি, কিন্তু তখন আপনাদের মতন লিবারালরাই বলবেন, হিন্দুদের ওপর জবরদস্তি করা হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে! ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটে যাওয়াই ঠিক কি না?

–তুমি আমায় ঘটকালি করতে বলছো?

–অগত্যা, আর উপায় কী?

–আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

–আপনি একবার টাঙ্গাইল চলুন, আপনি একটু বুঝিয়ে বললেই হবে। ঐ বক্সী-উকিল আপনাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে!

–বললাম তো, আমার পক্ষে এটা সম্ভব না।

বাড়ির ভেতর থেকে একটি বাচ্চা মেয়ে চা নিয়ে এলো। সঙ্গে দুটি ডিম ভাজা।

আলতাফ বললো, ভাবী কোথায়? ভাবী এলেন না?

ফিরোজা বাইরের লোকের সামনে সচরাচর আসেন না। কিন্তু এই আগন্তুক সম্পর্কে তার কৌতূহল হয়েছে, তিনি ঘরের মধ্যে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। আলতাফের হাঁক-ডাকের চোটে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হলো।

আলতাফ যেন তাঁকে কতকাল ধরে চেনে। সে বললো, এই যে ভাবী, মামুনভাইকে একটু ছেড়ে দিতে হবে কয়েকটা দিনের জন্য। উনি আমার সঙ্গে টাঙ্গাইল যাবেন।

ফিরোজা আলতাফের প্রস্তাব সবই শুনেছেন। এরকম বিবাহ তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। তিনি বললেন, উনি তো এখন যেতে পারবেন না। এদিকে কাজ আছে।

আলতাফ ফিরোজার কঠিন কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব না দিয়ে বললো, কী আর এমন কাজ! চলেন চলেন, আপনিও সাথে চলেন, কটা দিন বেড়িয়ে আসবেন। টাঙ্গাইলে আমাদের একখানা বাড়ি আছে, সেখানে থাকবেন।

ফিরোজা বললেন, ধন্যবাদ। যখন আমাদের টাঙ্গাইল যাবার প্রয়োজন হবে, তখন আপনাকে নিশ্চয় জানাবো। এখন আমাদের যাওয়া হবে না।

আলতাফ ঘাড় ঘুরিয়ে উঠোনের দিকে দেখলো। কয়েকটা বাচ্চা এখনো তার মোটরবাইকটার গায়ে হাত বুলোচ্ছে। উল্টোদিকের ঘরগুলির জানলায় কয়েকটি উৎসুক মুখ। বিকেল প্রায় শেষ, লাল হয়ে এসেছে আকাশ। একপাল মুরগী ছুটোছুটি করছে এদিক সেদিক।

আলতাফ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মামুনভাই, একটু ঘরের মধ্যে চলেন তো, আপনার সাথে একটা প্রাইভেট কথা আছে।

মামুন ভাবলেন, এইবারই এসেছে চরম মুহূর্ত। এতক্ষণ আলতাফের কোনো কথাতেই সত্যের ধ্বনি ছিল না। সবই কেমন আলগা আলগা। এই প্রাইভেট কথাটাই খাঁটি শোনালো। এবারে সে গ্রেফতারি পরোয়ানা বার করবে নিশ্চিত। কিংবা রিভলভার

দেখাবে। কিন্তু কী দোষ করেছেন তিনি? ঐ ছোট্ট একটি পত্রিকায় ভাষা আন্দোলনের সম্পর্কে কথা বলাটাই অন্যায় হয়েছে?

ঘরের মধ্যে এসে আলতাফ গোপন কথার ভঙ্গিতে বললো, মামুন ভাই, আপনাকে টাঙ্গাইল যেতেই হবে। না বলবেন না!

বিপদ এলেও মামুন আত্ম-সম্ভ্রম হারাতে রাজি নন। তাঁকে এরা ভয় দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। জোর করে নিয়ে যেতে চায় তো যাক। মুসলিম লীগের কর্মীদের রাগ আছে তাঁর ওপর। এই ছেলেটিকেও মনে হচ্ছে সেই দলের।

তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, আমার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব নয়।

–আপনাকে মৌলানা ভাসানী ডেকে পাঠিয়েছেন!

নামটা শুনে চমকে উঠলেও মামুন ভাবান্তর দেখালেন না। এটা একটা টোপ মনে হচ্ছে।

–কেন, মৌলানা কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন হিন্দু মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়েতে ঘটকালি করতে?

–এই দেখুন তোয়াহা ভাই-এর একটা চিঠি।

চিঠিটা খুলে মামুন অবাক না হয়ে পারলেন না। ঘরের মধ্যে আলো কম, তিনি জানলার কাছে এসে চিঠিখানা পরীক্ষা করে দেখলেন। যুব লীগের প্যাড, হাতের লেখাও তাঁর চেনা।

আলতাফ বললো, মামুন ভাই, যুব লীগের একজন কর্মী। আপনি আমাকে আগে দেখেছেন, এখন হয়তো মনে করতে পারছেন না। টাঙ্গাইলে আমরা সবাই যাচ্ছি, মৌলানা ভাসানী আপনাকেও যেতে বলেছেন।

মামুন ভুরু কুঁচকে বললেন, আমি একজন সামান্য মানুষ, মৌলানার মতন অত বড় একজন নেতা আমাকে ডাকবেন কেন?

মৌলানা চাইছেন সব ছোট ছোট দলগুলিকে এক করে ভবিষ্যতের একটা কর্ম পদ্ধতি ঠিক করতে। আওয়ামি মুসলিম লীগ থেকে আপনার মতন বেশ বড় একটা ফ্যাকশান বেরিয়ে এসেছে, উনি তাদের সবাইকে আবার ডাকতে চান। আপনি শোনেন নি যে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটা বাদ দেবার প্রস্তাব উঠেছে?

–কই না, শুনিনি তো!

–আপনি গ্রামে বসে বসে ভেজিটেট করছেন, এসব জানবেন কী করে? ‘চলো যাই কাজে, মানব সমাজে’! চলুন, চলুন, বেরিয়ে পড়তে হবে।

–তা হলে তোমার ঐ বিয়ের ব্যাপারটা কী বলছিলে? আলতাফ আবার জোরে হেসে উঠলো মাথা দুলিয়ে। তারপর বললো, আমি একটু উল্টাপাল্টা কথা বলি। আপনাকে একটু টেস্ট করছিলাম মামুনভাই, আপনি কিন্তু হেরে গেছেন!

–এখনো বুঝলাম না!

–নদীমাতৃক পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অন্তর্বিবাহ চালু হওয়া উচিত। এরকম বিয়ে যত বেশি হবে ততই মঙ্গল। তা না হলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ কোনোদিন ঘুচবে না। বলেন নি একথা?

মামুন চুপ করে রইলেন।

–অথচ আমি যখন আপনাকে এইরকম একটা বিয়েতে ঘটকালি করতে বললাম, তখন আপনি পিছিয়ে গেলেন। অর্থাৎ কথা ও কাজে মিল নাই। মামুনভাই, মুখে আমরা যা প্রচার করবো, নিজের জীবনেও তো তা প্র্যাকটিস করতে হবে! তাই না?

মামুন কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। এই ছেলেটা তাকে একেবারে জব্দ করে দিয়েছে। প্রথম থেকেই একটা ভুল ধারণা করেছিলেন বলে এই ছেলেটি সম্পর্কে তাঁর মনে একটা প্রতিরোধের ভাব গড়ে উঠেছিল।

আলতাফ আবার বললো, আপনাকে প্রথমে মিথ্যা বলেছিলাম। আমাদের বাড়ি দায়ুদকান্দি নয়, টাঙ্গাইল। আপনি শুনে খুশি হবেন, আপনার বন্ধু সুকুমার বক্সীর বাড়ির আমি জামাই। পারুলের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে গত বৎসর।

মামুনের চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। এখন এই ছেলেটির সব কিছুই প্রশংসনীয় মনে হলো তাঁর কাছে। কী সুন্দর স্বাস্থ্য ছেলেটির, কী রকম সরল-তেজী মুখ, উৎসাহে-ভরপূর কণ্ঠস্বর।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এতক্ষণ একথা বলোনি কেন? বক্সীবাবু আপত্তি করেন নাই?

–মোটেই না। ও বাড়িতে আমার প্রত্যেকদিন জামাই- আদর।

–তোমার বাড়িতে?

–আমার মা কান্নাকাটি করেছিলেন, আমাকে দিব্যি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি বড় ছেলে তো, মাকে ভয় দেখালাম, তাহলে আমি করাচী চলে যাবো! এখন দুই ফ্যামিলিতে খুব ভাব।

–বাঃ, তুমি তো কামাল করেছো, আলতাফ।

–তা হলে আপনি যাচ্ছেন তো? মামুন ভাই!

–তুমি আমার খোঁজে এতদূর এসেছো, আমি এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি ভেবেছিলাম, সারা পৃথিবী আমাকে ভুলে গেছে।

–এরকম সেলফ-পিটি আপনাকে মানায় না, মামুন ভাই। আপনার কত বেশী অভিজ্ঞতা, আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করি।

এবার আর মামুন আবেগ দমন করতে পারলেন না, তিনি আলতাফকে জড়িয়ে ধরলেন।

আলতাফ তাঁর বাড়িতে রাত কাটাতে রাজি হলো না। মাদারীপুরে তার এক বন্ধু আছে, তার বাড়িতে ফিরে যাবার কথা দিয়ে এসেছে। পুরোপুরি অন্ধকার হবার আগেই সে মোটরবাইকে গর্জন তুলে ফিরে গেল।

রাত্রে আহারাদির পর মামুন কথাটা পাড়লেন ফিরোজার কাছে। তিনি দু-একদিনের মধ্যেই ঢাকা যেতে চান। সেখান থেকে টাঙ্গাইল যাবেন।

ফিরোজা বললেন, আপনি ঐ লোকের কথা শুনে টাঙ্গাইলে হিন্দু মেয়ের বিয়ে দিতে যাবেন?

মামুন হেসে বললেন, ও ছেলে আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকে নি। আগেই কাজ সেরে ফেলেছে।

ফিরোজা তাতেও খুশী হলেন না। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না, তবু আপনার ওসবের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। ও লোকের মুখ দেখেই মনে হয়, ওরা শুধু গোলমাল পাকাতে জানে।

-আমার কিন্তু মনে হলো, এই সব ছেলেরাই নতুন ভাবে দেশ গড়বে। একেবারে টগবগ করছে। প্রাণ খুলে হাসতে জানে। সে যাই হোক, আমি তো ওর জন্যে যাচ্ছি না, আমাকে মৌলানা ভাসানী ডেকে পাঠিয়েছেন।

ভাসানীর মতন অত বড় একজন নেতা তাঁকে স্মরণ করেছেন বলে মামুনের মনে বেশ একটু গর্বই হয়েছে কিন্তু ঐ নাম শুনে ফিরোজা বিচলিত হলেন না। তিনি রাগ রাগ ভাবে বললেন, তেনার আবার আপনেরে কী দরকার? আপনে আবার পার্টি করতে যাবেন নাকি?

মামুন মাথা দোলালেন। আলতাফ কী বলে গেল? ভেজিটেট! ঠিকই বলেছে, এখানে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে তাঁর যেন শিকড় গজিয়ে গেছে।

মামুন মনস্থির করে ফেলেছেন। ফিরোজাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে হবে। এখনই রাগিয়ে দিয়ে লাভ নেই। তিনি কথা ঘুরিয়ে ফিরোজার প্রশংসা শুরু করলেন হঠাৎ। তারপর তাঁকে আদর করতে করতে অনেকদিন বাদে মিলিত হলেন খুব উৎসাহের সঙ্গে। এই শীতের রাতেও ঘাম ঝরলো।

ফিরোজা ঘুমিয়ে পড়ায় মামুন গায়ে একটা চাঁদর জড়িয়ে চলে এলেন বাইরে। সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। শীতকালের পরিষ্কার আকাশ। শহরের একজন এসে তাঁকে ডেকে গেল, তাতেই তিনি নতুন করে কর্মচাঞ্চল্য অনুভব করছেন। যেন ফিরে এসেছে পৌরুষ। গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

এমনকি একটা কবিতার লাইনও মনে পড়ে গেল। বহুকাল পরে, আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকের মতন। লাইনটা বিড়বিড় করতে লাগলেন তিনি। এখনই লিখে না রাখলে হারিয়ে যেতে পারে। আবার তিনি কবিতা লিখবেন? আলতাফের মতন ছেলেরা সেই কবিতা পছন্দ করবে তো?

২৪ হারীত মণ্ডলকে নিয়ে ত্রিদিব

হারীত মণ্ডলকে নিয়ে ত্রিদিবকে ইদানীং বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে। সুলেখার প্রশ্রয় পেয়ে সে বাড়িতে যখন তখন এসে উপস্থিত হয়, সময়-অসময় মানে না, দরজা খোলা থাকলে ওপরে উঠে যায় সরাসরি। কথা বলায় কোনো শ্রান্তি নেই তার। রাজনীতি বিষয়ে সে অনর্গল উগ্র মন্তব্য করে অন্যদের চমকে দিতে ভালোবাসে।

পূর্ব বাংলার সঙ্গে ত্রিদিবদের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ হলেও রিফিউজিদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে। তা হলেও একজন রিফিউজি নেতা যখন তখন বাড়িতে এসে উপদ্রব করলে তা সহ্য করা শক্ত।

ত্রিদিব অবশ্য অতিশয় ভদ্র। কোনোদিনই সে মুখ ফুটে হারীত মণ্ডলকে নিষেধ করতে পারবে না। হারীত এমনিতে আসা-যাওয়া করলে ত্রিদিবের কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু

মুশকিল হচ্ছে অন্যান্য অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা বলার সময়েও হারীত এসে সেখানে। বসে, আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে, এবং এমন সব অদ্ভুত মতামত প্রকাশ করে যাতে কেউ কেউ অপমানিত বোধ করতে পারে। হারীতের চেহারা ও পোশাক ও কথা বলার ধরন অন্যান্য অতিথিদের চেয়ে এতই আলাদা যে তাঁরা অবাক হয়ে ত্রিদিবের দিকে তাকান।

তা ছাড়া ত্রিদিব জানতে পেরেছেন যে হারীত কাশীপুরের যে জবরদখল বাড়িটিতে থাকে, সে বাড়ির মালিক ছিলেন প্রতাপের দিদির স্বামী অসিতবরণ এবং সেই বাড়ি দখলের হাঙ্গামাতেই অসিতবরণ সেখানে মারা যান। প্রতাপ হারীতকে চিনতে পারলে নিশ্চিত মর্মাহত হবেন। যে ব্যক্তি তাঁর ভগ্নীপতির মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে দায়ী, সেই ব্যক্তিকে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে খাতির যত্ন পেতে দেখলে তাঁর পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

এই সমস্যার কথা বলতেই সুলেখা ব্যথিত বিস্ময়ের সঙ্গে বলে ওঠেন, ইস, ছি ছি ছি, অসিতদা কী ভালোলোক ছিলেন...এখন কী করা যায়?

ত্রিদিব বললেন, ঐ হারীত তোমাকে মা জননী, মা জননী বলে ডাকে।

-শুনলে আমার হাসি পায়!

-তুমি ওকে বারণ করতে পারবে? যাতে এ বাড়িতে আর না আসে?

–আমি? না, না তুমি বলে দাও, আমি যখন বাড়িতে থাকবো না।

শেষ পর্যন্ত আর বলা হয়ে ওঠে না। এরা দু'জনেই ভদ্রতার-শিকার!

ত্রিদিব মনে মনে ঠিক করে রাখলেন, এর পর প্রতাপ এলে তিনি তাঁর কাছে হারীত মণ্ডলের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে দেবেন। তারপর প্রতাপ যা ভালো বুঝবেন করবেন। কিন্তু প্রতাপ কয়েক সপ্তাহ হলো আর আসছেন না এদিকে।

এক সন্ধেবেলা নিচের বৈঠকখানা ঘরে ত্রিদিব গল্প করছেন কয়েকজনের সঙ্গে, চা পরিবেশন। করছেন সুলেখা। এই সময় হারীত এসে ঢুকলো সেখানে। এক কোণে নিজের স্থান করে নিল।

ইংল্যাণ্ড থেকে একটি থিয়েটার দল এসেছে কলকাতায়, তাদের তিনটি শেক্সপীয়ারের নাটক দেখতে ভিড় একেবারে আছড়ে পড়েছিল। এখানে আলোচনা হচ্ছে সেই নাটকগুলির। উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিষয়ে। হারীত মণ্ডলের এই সব বিষয় একেবারেই বোধগম্য হবার কথা নয়, তবু সে মন দিয়ে শোনে। তার কৌতূহলের শারীরিক লক্ষণ ফুটে ওঠে, মুখটা খানিকটা হাঁ হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টি স্থির, কানদুটি খরগোশের মতন বেশি লম্বা মনে হয়।

ত্রিদিব বললেন, রিচার্ড দা থার্ড আমাদের দেখা হলো না। শুনেছি ঐটাই সবচেয়ে ভালো–

সুলেখা বললেন, আমার খুব দেখার ইচ্ছে ছিল, তুমি তো টিকিট জোগাড় করতে পারলে!

ত্রিদিব বললেন, কী করবো বলো, যা লম্বা লাইন!

ত্রিদিবের এক বন্ধু বললেন, আমায় বললে পারতে, আমি ব্রিটিশ কাউনসিল থেকে ব্যবস্থা করে দিতে পারতুম। অবশ্য আমি লণ্ডনে লরেন্স অলিভিয়ারের প্রোডাকশন দেখে এসেছি, এটা ততটা ভালো নয়!

আর একজন বললেন, আশ্চর্য শহর এই কলকাতা! কদিন ধরে পাঁউরুটি পাওয়া যাচ্ছে না জানো তো, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে বিরাট লাইন দেখে এলুম। এই শহরের মানুষ পাঁউরুটির জন্যও লাইন দেয় আবার শেক্সপীয়ারের নাটকের জন্যেও লাইন দেয়!

অন্যরা হেসে উঠতেই সেই সুযোগ নিয়ে হারীত বললো, সত্যিই আইশ্চর্য শহর। শিয়ালদহ ইস্টিশানে রিফিউজি থিকথিক করত্যাছে, তারই মধ্য দিয়া হৈ হৈ করতে করতে বর্ন-ভোজন পার্টি যায়।

এরকম একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ এসে পড়ায় সবাই চুপ করে গেলেন। বস্তুত আলোচনার বিষয়। হিসেবে রিফিউজিদের সাবজেক্টটা এখন তেতো হয়ে গেছে। প্রথম দিকের খানিকটা সমভ্রাতৃত্ববোধ, খানিকটা বেদনা, খানিকটা উদাসীনতা কেটে গিয়ে এখন অনেকেই বিরক্তভাবে অনুভব করতে শুরু করেছে যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর অধ্যাসে সর্বনাশ হতে বসেছে কলকাতা শহরটার।

হারীত বললো, সার, আপনারা গুণী-জ্ঞানী মানুষ, আপনাগো কাছে জানতে চাই, এই যে। আমাদের মতন রিফিউজিদের জোর করে দণ্ডকের জঙ্গলে পাঠাইত্যাছে, এটা কী ঠিক হইতাছে?

ত্রিদিবের পাশে বসা তাঁর এক সুবেশ, সুপুরুষ বন্ধু এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমার তো মনে হয়, এটাই খুব ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। রিফিউজিদের দায়িত্ব শুধু পশ্চিমবাংলা নিতে যাবে কেন, এটা সারা ইন্ডিয়ার লায়াবিলিটি! পশ্চিমবাংলা এমনিতেই ওভার পপুলেটেড, তার ওপরে যদি লাখ লাখ রিফিউজি এখানে এসে গাদাগাদি করে তাতে লাভ কী হবে? চাকরিবাকার, জমি-জমার ভাগ নিয়ে মারামারি শুরু হবে, গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইকোনমিটাই ধ্বংস হয়ে যাবে! তার চেয়ে ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ওদের ছড়িয়ে দিলে সেখানে সেখানে বেঙ্গলি পকেট হবে, তাতে আমরাই লাভবান হবো!

অন্যরাও এই যুক্তিতে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

হারীত সেই সুবেশ ব্যক্তিটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, আপনি যখন এই কথা কইলেন, তখন আপনারে একটা কোশ্চেন করি। মনে করেন, আপনে কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে বিপদে পড়ে সাহায্য চাইতে গ্যালেন, সেই আত্মীয় যদি বলে, আমার বাড়িতে তো জায়গা হবে না, আমার বাড়ির পিছনের বাগানেও নেপালী আর বিহারীগো থাকতে দিছি, তুমি বাপু জঙ্গলে গিয়া বাঘ-সিংহের সাথে লড়াই কইর্যা ঘরবাড়ি বানায়া লও! তখন সেই কথা শুনে আপনের ক্যামন লাগতো?

বন্ধুটি বললেন, আপনার এই প্রশ্নটি বড় বেশি হাইপথেটিক্যাল। আমার এরকম ভাবে কারুর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কখনো কোনো কারণ ঘটে নি। সুতরাং এর রি-অ্যাকশানও আমি। বুঝতে পারবো না। তবে, দণ্ডকারণ্যে গিয়ে আপনাদের বাঘ-সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। কেন? সরকার আপনাদের জন্য নতুন টাউনশীপ বানাবে। দেখুন না, পাঞ্জাবীরা...।

–শোনেন সার, আর একটা কথা শোনেন। আমার একখান নিজস্ব বাড়ি আছিল, টিনের চালা, তিনখান কামরা। রান্না ঘর, গোয়াল ঘরও আছিল। এছাড়া, একটা ছোট পুকুর, আর একখান বড় শরিকী পুষ্করিণীর ভাগ পাইতাম, তেরো বিঘা ধান জমি, সম্বৎসরের মাছ-ভাতের কোনো চিন্তা ছিল না। এইসব কিছু বিনা দোষে পরিত্যাগ কইরা আমি চইলা আসতে বাধ্য হইলাম ক্যান? আপনাগো মতন শিক্ষিত মানুষদের জন্যই তো!

–আমাদের জন্য?

–আলবৎ! আপনি তো মোছলমান। আপনারাই তো পার্টিশান চাইছিলেন।

ত্রিদিবের এই বন্ধুটির নাম শাজাহান চৌধুরী। অত্যন্ত মার্জিত ও রুচিশীল স্বভাবের মানুষ। ওঁদের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা আছে, তা ছাড়া জলপাইগুড়ি জেলায় নিজস্ব চা বাগান আছে, বেশ কয়েক পুরুষের ধনী। শাজাহান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খুব ভক্ত, গুলাম আলি খাঁ, বিলায়েৎ খাঁর মতন ভারতবিখ্যাত কলাকারেরা তাঁদের বাড়িতে এসে ওঠেন মাঝে মাঝে।

ত্রিদিব তাঁর এই প্রাক্তন কলেজসহপাঠীর প্রভাবেই ইদানীং ঐসব গান বাজনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। সুলেখাও খুব পছন্দ করেন শাজাহানকে।

হারীত মণ্ডলের আকস্মিক কটুক্তিতে শাজাহানের গৌরবর্ণ মুখোনি আরক্তিম হয়ে গেল।

ত্রিদিব তাড়াতাড়ি বললেন, এসব আপনি কী বলছেন, হারীতবাবু? সব মুসলমানরাই পার্টিশানের জন্য দায়ী নাকি? এরকমভাবে আপনার কথা বলা উচিত নয়।

হারীত উদ্ধতভাবে বললো, সব মোছলমান দায়ী, সে কথা তো আমি বলি নাই! আমাগো আশপাশের গ্রামে যেসব গরিব মোছলমান আছিল, তারা তো অনেকেই বোঝে নাই পাকিস্তান কী বস্তু! তাগো সাথে আমাগো কোনো ঝগড়া কাজিয়া ছিল না। আমরা চইল্যা আসার সময় তাগো মইধ্যে কেউ কেউ কান্দছে। আমি কইছি শিক্ষিত মোছলমানগো কথা। তারাই তো পলিটিক্স কইরা দেশটার সর্বনাশ করলো। তারা পার্টিশান করাইলো আবার তাগো মইধ্যেই অনেকে ভারতে রইয়া দিব্যি গাড়ি হাঁকায়!

প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়ে শাজাহান চৌধুরী কঠোরভাবে বললেন, আপনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বা অধ্যাপক হুমায়ন কবিরের নাম শুনেছেন কি না জানি না। এরা সেই পার্টিশান বা পাকিস্তান আইডিয়া সমর্থন করেননি। আপনি যদি–

হারীত মণ্ডল উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত ছুঁড়ে বললেন, ঐসব পুতুলগো কথা বাদ দ্যান। আপনি নিজে সেসময় কী করছিলেন? আপনি প্রটেস্ট করছিলেন? আপনি থাকবেন কলকাতা শহরে আর আমাগো যাইতে হবে দণ্ডকারণ্যে? ক্যান?

সুলেখা মাঝখানে চলে এসে বললেন, ছি ছি ছি, হারীতবাবু, এসব কী বলছেন! আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? চলুন, আপনি ওপরে চলুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

সুলেখা কারুর অঙ্গ স্পর্শ করেন না, এখন তিনি হারীতের একটা হাত ধরে বললেন, চলুন!

অন্য কেউ এই তর্কস্থান থেকে হারীতকে সহজে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো না, কিন্তু। সুলেখার ধমকে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটুক্ষণ আড়ষ্ট নীরবতার পর ত্রিদিব লজ্জিতভাবে বললেন, ওর খানিকটা মাথার গোলমাল আছে। তুমি কিছু মনে করো না, শাজাহান!

ত্রিদিবের আর এক বন্ধু অমিতাভ বললেন, ওরা নিজস্ব বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, এখানেও কুকুর-বেড়ালের মতন তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, তাতে যদি কারুর মাথার গোলমাল হয়ে যায়, সেটা অস্বাভাবিক কিছু না!

শাজাহান চৌধুরীর মুখোনি পাথরের মূর্তির মতন স্থির।

ত্রিদিব অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছেন। তাঁর বাড়িতে এসে তাঁর কোনো বন্ধু অপমানিত হলো। এরকম আগে কখনো ঘটেনি। এখনই চাচামেচি করে হারীতকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে হয়তো শাজাহানকে খানিকটা তৃপ্ত করা যায়। কিন্তু চাচামেচি করাটাই যে ত্রিদিবের স্বভাবে নেই। তিনি ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হতে লাগলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘোর ভেঙে শাজাহান আপন মনে বললেন, টু নেশান থিয়োরি! ইণ্ডিয়ার লীডাররা যতই তা অস্বীকার করুক, সাধারণ মানুষের চামড়া কেটে একেবারে ভেতরে গেঁথে গেছে এই থিয়োরি। ভারতীয় হিন্দুরা আর কোনোদিন ভারতীয় মুসলমানদের বিশ্বাস করবে না!

ত্রিদিব বললেন, না, না, না, এটা তুমি কী বলছো? রেফিউজিরা হাই স্ট্রাং হয়ে আছে। ওদের মতামত উগ্র হতেই পারে এখন। কিন্তু আমাদের পুরো ব্যাপারটা হিস্টোরিক্যাল পারসপেকটিভে দেখতে হবে!

শাজাহান বললেন, রেফিউজিরা প্রত্যক্ষ সাফারার, তারা রাগে-দুঃখে নানারকম কথা বলতে পারে তা জানি। কিন্তু অন্যদেরও মনের কথা তাই। অমিতাভও তো এইমাত্র ওদেরই সমর্থন করে বললো।

অমিতাভ ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, না, না, আমি সে সেসে বলিনি। আমি বলতে চাইছিলুম, ওরা অসহায় অবস্থায় পড়েছে বলেই–

শাজাহান বললেন, আমি লক্ষ করেছি, যেখানে শুধু হিন্দুরা থাকে, সেখানে আমি হঠাৎ গিয়ে পড়লে তারা থেমে যায়। যেন তারা যে আলোচনা করছিল, সেটা আমার শোনা উচিত নয়। অপ্রস্তুত হয়ে তারা প্রসঙ্গ পাল্টায়। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই এরকম দেখেছি!

অমিতাভ বললেন, এটা তোমার একটা কমপ্লেক্স, ভাই! আমরা এমন কোনো কথা বলি না–

শাজাহান হাত তুলে বললেন, ওয়েট, ওয়েট। আমার কথা শেষ হয়নি। এর অন্যদিকও. আছে। আমাদের মুসলিম সমাজে প্রায়ই পাকিস্তানের প্রসঙ্গ ওঠে। প্রত্যেকেই মনে মনে পাকিস্তানের সাপোটার। অনেকেই ইস্ট পাকিস্তানে কিছু সম্পত্তি কিনে রাখার কথা ভাবে। কিন্তু কোনো হিন্দু সেখানে এসে পড়লে তারা এইসব কথা উচ্চারণও করবে না। সেই জন্যই বলছিলাম, টু নেশান থিয়োরি...

এই সময় সুলেখা হারীত মণ্ডলকে নিয়ে ঢুকলো। হারীত এগিয়ে এসে শাজাহান চৌধুরীর হাত জড়িয়ে ধরে নাটকীয়ভাবে বললো, আমারে ক্ষমা করেন, সার। আমি অন্যায় করছি। আমার মাথা গরম, পাগল-ছাগল মানুষ, কখন কী কই তার ঠিক নাই। আপনাগো কোনো দোষ নাই, আমরা রিফিউজি হইছি, সেটা আমাগো ভাগ্যের দোষ!

ব্যাপারটা সেদিনকার মতন মিটে গেলেও তার রেশ রয়ে গেল।

এর দু'দিন বাদেই ত্রিদিব সস্ত্রীক গেলেন শাজাহানের বাড়িতে। প্রায় তিন ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে এলেন। এবং পরের শনিবারের জন্য তিনি শাজাহান-পরিবারকেও নেমন্তন্ন করে এলেন তাঁর বাড়িতে সান্ধ্য আহারের জন্য।

এর মধ্যে প্রতাপ একদিন এসেছিলেন। ত্রিদিব আর সুলেখা হারীত মণ্ডলের সব ব্যাপারটা খুলে বলতে প্রতাপের মনে বিশেষ কিছু প্রতিক্রিয়া হলো না। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, লোকটাকে একদিন এখানে দেখেছিলাম বটে, তখন চিনতে পারিনি!.তা সে যদি এ বাড়িতে আসে, আমি আপত্তি করবো কেন?

ত্রিদিব বললেন, মজুমদার সাহেব, আমরা চাই, আপনি লোকটাকে একটু ধমকে দিন। যাতে সে এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে। আপনার জামাইবাবুর সম্পত্তি ওরা দখল করেছে

প্রতাপ বললেন, শুনুন, আপনাদের সঙ্গে আমার একটা বেসিক তফাত আছে। আপনারা ছিন্নমূল নন, কলকাতা শহরে অনেকদিন থেকেই আপনাদের শিকড় ছিল। কিন্তু আমি তো উদ্বাস্তু! নিজেদের সম্পত্তি ফেলে এসে এখানে ভাড়া বাড়িতে মাথা গুঁজে আছি। আবার ঐ রিফিউজিদের জন্যই আমার দিদি বিধবা হয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। দিদির শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি ওরা গ্রাস করেছে। তা হলেও কি আমি রিফিউজিদের বিরুদ্ধে যেতে পারি?

-ঐ হারীত মণ্ডলের নামে যদি একটা মামলা আসতো আপনার এজলাসে, আপনি কী করতেন?

-আমি আদালত থেকে লম্বা ছুটি নিতাম। আমার পক্ষে এখানে ন্যায় বিচার করা অসম্ভব।

চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটলো পরের শনিবার।

সেদিন বিকেল থেকেই হারীত মণ্ডল হাজির। সে এবাড়িতে এসে কোনো রকম সাহায্য চায় না, টাকা-পয়সা সাহায্যের সামান্য ইঙ্গিত করলেও জিভ কেটে প্রত্যাখ্যান করে।

খাদ্যদ্রব্যের প্রতিও তার আসক্তি নেই। অশোক বনে সীতার সামনে হাত জোড় করা হনুমানের ছবির মতন সে শুধু সুলেখার সামনে মেঝের ওপর বসে নানারকম গল্প শোনাতে ভালোবাসে। দারিদ্র্য, অবিচার, অত্যাচার, বুকের মধ্যে জমে থাকা ক্রোধ, এইসব কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে সে যেন এ বাড়িতে সুস্থ জীবনের, জীবন-সৌন্দর্যের খানিকটা ঝাঁপটা নিতে আসে।

এই শনিবার এসে সে প্রথম একটা দাবি জানালো। সে সুলেখাকে বললো, মা জননী, আজ রাত্তিরটা আপনাগো বাড়িতে আমারে থাকতে দেবেন? আজ কাশীপুরে যাওয়ার একটু অসুবিধা আছে আমার।

সুলেখা আমতা আমতা করে বললেন, আজ বাড়িতে কিছু লোকজন আসবে নেমন্তন্ন খেতে....

হারীত বললো, আমি চাকরদের ঘরে শুইয়া থাকবে। তাতে আমার কোনো অসুবিধা নাই!

এর পর আর না বলা যায় না। একজন মানুষ বাড়িতে আশ্রয় চাইছে। অবস্থার বিপাকে হারীত মণ্ডল এখন অতি দরিদ্র হলেও তার একটা ব্যক্তিত্ব আছে। যে-কোনো মানুষের চোখের দিকে সরাসরি চেয়ে কথা বলতে পারে। তাকে হেলাফেলা করা সহজ নয়। সুলেখা বললেন, শাজাহান সাহেবরা আসছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করবে না!

কথায় কথায় জিভ কাটা স্বভাব হারীতের। সেই রকম ভঙ্গি করে সে বললো, আরে না, না! মাপ চাইছি তো সেদিন। যদি চান তো আমি চৌধুরী সাহেবের পা টিপ্যা দিতে পারি।

সন্ধের পর একে একে আসতে লাগলেন অতিথিরা। শাজাহান চৌধুরী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। এলেন সাড়ে সাতটায়। তাঁর স্ত্রী চলে গেলেন ওপরে, পুরুষরা বৈঠকখানায় বসে গল্প-গুজব করতে লাগলেন। হারীত মাঝে মাঝে শাজাহান'সাহেবকে অ্যাসট্রে এগিয়ে দেয় কিংবা অনুরোধ করে, আপনি মাঝখানটায় এসে বসুন, এখানে বেশি বাতাস পাবেন। আইজ যা গরম পড়ছে!

আচ্ছা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় দুয়ারে করাঘাত। এ ডাক অন্যরকম, ঠিক অতিথিদের মতন নয়। ত্রিদিবের গৃহভৃত্য দু'জন অবাঞ্ছিত অতিথিকে দরজা খুলে বৈঠকখানায় নিয়ে এলো। দু'জন পুলিশ অফিসার।

একজন অফিসার বললেন, ত্রিদিববাবু কার নাম? আপনার এখানে হারীত মণ্ডল নামে কেউ–

তারপর হারীতের দিকে চোখ পড়তেই তিনি বললেন, ও এই তো! একেবারে জলজ্যান্ত হারীত মণ্ডল! চলুন!

ত্রিদিব বললেন, কী ব্যাপার? আপনারা

অফিসারটি বললেন, এই চিড়িয়াটিকে আমরা অনেকদিন ধরে খুঁজছি। একে আমরা অ্যারেস্ট করতে এসেছি।

হারীত মণ্ডল খুব একটা অবাক হয়েছে বলে মনে হয় না। মুখে ভয়ের চিহ্নও নেই। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

সে পুলিশ অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করলো, আমারে আপনারা একদিন না একদিন ধরবেন, তা জানতাম। কিন্তু কী করে জানলেন যে আইজ আমি এইখানে থাকবো?

পুলিশ অফিসারটি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ওহে, আমরাই লোককে প্রশ্ন করি। অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেবার অভ্যেস আমাদের নেই। এবার চলো। চক্রবর্তী, ওর হাতে গয়না পরিয়ে দাও!

অন্য অফিসারটি হারীতের হাতে হাতকড়া লাগালো। হারীত মুখ ফিরিয়ে শাজাহানের দিকে তাকিয়ে বললো, সার, আপনে আমারে ধরায় দিলেন? আর দুই চারটা দিন যদি সময় পাইতাম!

শাজাহানের মুখোনি বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমি ধরিয়ে দিয়েছি? ফর গডস্ সেক....

হারীতকে নিয়ে বেরিয়ে গেল পুলিশদ্বয়।

শাজাহান ত্রিদিবের হাত চেপে ধরে বললেন, তুমি বিশ্বাস করো! আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।

ত্রিদিব বললেন, আমি জানি! আমি জানি! সে প্রশ্নই ওঠে না!

শাজাহান আবার বললেন,পুলিশের সঙ্গে আমার কোনো কানেকশানই নেই...তা ছাড়া আমি জানতুমই না যে ও আজ এখানে...ত্রিদিব, তুমি ওয়ারেন্ট দেখতে চাইলে না কেন?

ত্রিদিব বললেন, ডোন্ট গেট আপসেট। পরে ভেবেচিন্তে একটা ব্যবস্থা করা যাবে, শাজাহান, প্লীজ, তুমি ওর কথায় গুরুত্ব দিও না।

সুলেখা খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন ওপর থেকে। তখন পুলিশ হারীতকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলছে। খালি পায়েই রাস্তায় চলে এসে সুলেখা প্রায় হাহাকার করে বললেন, একী, ওকে নিয়ে যাচ্ছেন? আমাদের বাড়ি থেকেও কিছু খায়নি, একটু দাঁড়ান, একটু সময় দিন....

বড় পুলিশ অফিসারটি মাথা থেকে টুপী খুলে নরম গলায় বললো, আমরা দুঃখিত, ম্যাডাম, আমাদের কিছু করার নেই। এর নামে ক্রিমিন্যাল কেস আছে।

সুলেখা অন্য দিকে মুখ ফেরালেন, তাঁর দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এলো। সেই দৃশ্য দেখে পুলিশ দু'জনও অনড় হয়ে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

হারীত মণ্ডল ধরা গলায় বললো, আপনি আমার মতন একটা নগইন্য মানুষের জন্য চক্ষের জল ফ্যাললেন? মা জননী, আমি ধন্য হইলাম। পুলিশে আর আমার কী করবে, বড় জোর ফাঁসী দেবে!

২৫ বাড়িতে অসময়ে কোনো অতিথি এসে

বাড়িতে অসময়ে কোনো অতিথি এসে পড়লে বাবলুকেই পাঠানো হয় পাড়ার দোকান থেকে মিষ্টি কিনে আনতে। এই দায়িত্বটা পেলেই খুব খুশী হয় বাবলু। কাজটা বেশ অর্থকরী। এক টাকার রসগোল্লা কিনলেই ষোলটার বদলে দেওয়া হয় সতেরোটা। অথবা যোলটা দিয়ে এক আনা দস্তুরী। সেটা সাধারণত চাকর বাকররাই পায়। বাবলু মিষ্টির দোকানের কাঁচের আলমারির ওপর টাকাটা রেখে বলে, ষোলোটা রসগোল্লা দেবেন! এইভাবে তার কিছু পয়সা জমে। তাকে অনেক টাকা জমাতে হবে তো, নইলে বড় হয়ে সে ঘুড়ির দোকান খুলবে কী করে?

দু পয়সায় একখানা ঘুড়ি, সেগুলো আধতে। একতে কিংবা দেড়তে ঘুড়ি বাবলু এখনো ঠিক সামলাতে পারে না, টানের সময় তার আঙুল কেটে যায়। বিশ্বকর্মা পুজোর আগে পাড়ার ছেলেরা যখন রাস্তার এক ল্যাম্পপোস্ট থেকে আর এক ল্যাম্পপোস্ট পর্যন্ত সুতোয় মাঞ্জা দেয়, তখন বাবলু জুটে যায় তাদের সঙ্গে। কিছু কাজ করে দিলে সে-ও খানিকটা মাঞ্জা পাবে। যেহেতু তার পয়সা নেই, সেই জন্য তাকে দেওয়া হয় সবচেয়ে বাজে কাজটি, হামানদিস্তেয় কাঁচ-গুড়ো করা। কাঁচও তাকেই জোগাড় করতে হবে। ভাঙা কাঁচ না পেলে বাবলু বাড়ি থেকে চুপি চুপি দুটি আস্ত কাঁচের গেলাস নিয়ে এসে অবলীলাক্রমে হামানদিস্তায় ফেলে দেয়।

পাড়ার ছেলেদের যে মোড়ল সেই পরেশদা এসে মাঝে মাঝে কাঁচের মিহিনত্ব পরীক্ষা করে, ঠিক মনোমতন না হলে সে বলে, এই বালে, ফাঁকি মারা হচ্ছে? বার্লি খাস নাকি, হাতে জোর নেই। এই বলেই সে একটি চাঁটি কষায় বাবলুর মাথায়।

পরেশদা অন্যান্য ছেলেদের যখন তখন চাঁটি মারতে ভালোবাসে, সেইজন্যই সে মোড়ল।

ঘুড়ি ওড়ানোতে বাবলু এখনো দক্ষ হতে পারে নি। খানিকটা দূরেই বোসদের বাড়ি। তাদের প্রকাণ্ড ছাত, সেখানে অনেকগুলো ভাই এক সঙ্গে হৈ হৈ করে ঘুড়ি ওড়ায়। বাবলু তার ঘুড়ি নিয়ে বাড়তে না বাড়তেই বোসদের টকটকে লাল রঙের দেড়তে ঘুড়ি ডাকাতের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাবলু লাট খেলবার সুযোগই পায় না, বোসদের ঘুড়ি গোঁত মারার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুড়ি কুচ্ করে কেটে যায়। রাগে-দুঃখে আফসোসে বাবলুর তখন হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে, চোখে জল এসে যায়, ওদিকে বোসদের ছাদে তখন ভোম মারা বলে বিকট জয়োল্লাস!

বোসদের উপদ্রবেই পরেশদারা পাড়া ছেড়ে ঘুড়ি ওড়াতে যায় শ্যাম পার্কে। বাবলুর সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই।

দিনে একখানার বেশি ঘুড়ি কেনার ক্ষমতা নেই বাবলুর। সেখান কেটে যাবার পর সে ম্লান মুখে বসে থাকে ছাদে। যতক্ষণ অন্ধকার না হয়, তার নিচে যেতে ইচ্ছে করে না। বড় হয়ে সে ঘুড়ির দোকান খুলবে, তখন তার আর ঘুড়ির অভাব থাকবে না, লাটাই ভর্তি ভর্তি মাঞ্জা, নাজির সাহেবের দোকান থেকে সে সব মাঞ্জা কিনে আনবে। তখন কে পারবে তার সঙ্গে? তার নিজস্ব নাম লেখা ঘুড়ি থাকবে, এক এক করে অন্য সমস্ত ঘুড়ি কেটে সে ফাঁকা করে দেবে আকাশ। আর কেউ থাকবে না, সে শুধু হবে আকাশের রাজা। দূর থেকে সবাই বলবে, ঐ যে উড়ছে অতীন মজুমদারের ঘুড়ি। বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লোকেরা বললে, হা, কলকাতা শহরের আকাশটা এখন অতীন মজুমদারের!

সেই দিনটা আসতে কত দেরি? বাবলুর আর ধৈর্য থাকে না। এখন তাকে ঘুড়ির অভাবে প্রায় বিকেলই বসে থাকতে হয়। মাঝখানে সে একটা আঁকশি বানিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ছুটে

ঘুড়ি ধরা শুরু করেছিল। আঁকশিটা হাতে নিয়ে ওপরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়। প্যাঁচের খেলা দেখতে দেখতে একটা ঘুড়ি কেটে গেলেই সেটাকে লক্ষ্য করে ছুট। এ কাজে অবশ্য প্রতিযোগিতা আছে খুব, পাশের বস্তির ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে ছোটে, তাদের অভিজ্ঞতা বেশি, বাবলুর চেয়ে ঢ্যাঙা ছেলেদের সুবিধেও বেশি। তবু মাঝে মাঝে তাতে দু একটা ঘুড়ি বাবলু পেয়ে যেত। একদিন বাবার চোখে পড়ে যাওয়াও তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। প্রতাপ কান মুচড়ে ধরে বলেছিলেন, ফের যদি তোকে রাস্তায় ঘুড়ির পেছনে ছুটতে দেখি, তা হলে তোকে বস্তিতেই থাকতে হবে, বাড়িতে ঢুকতে পারবি না!

ঘুড়ির পেছনে তাড়া করতে করতে বাবলু একদিন ঢুকে পড়েছিল একটা অচেনা বাড়িতে।

সে বাড়ির পেছনটায় একটা পাঁচিল ঘেরা অব্যবহৃত ছোট মাঠ, নানান রকম আগাছায় ভর্তি। অনেক ঘুড়ি গিয়ে সেই মাঠটাতেই পড়ে। সে বাড়িতে বাবলুদের বয়েসী কোনো ছেলে নেই, ঘুড়ি সম্পর্কে কারুর কোনো আগ্রহ নেই, তবু ঘুড়িগুলো ওখানেই যায় কেন? ঐ মাঠটা যেন ঘুড়ির কবরখানা!

একটা কালো অপূর্ব সুন্দর চাঁদিয়াল ঘুড়িকে সেই মাঠটায় পড়তে দেখে একদিন বাবলু আর লোভ সামলাতে পারেনি।

ঐ বাড়িটাতে কুকুর আছে, তিনতলায় মাঝে মাঝে ডাক শোনা যায়। সদর দরজটা খোলা। বাবলুর ভয় ভয় করে, কিন্তু কালো চাঁদিওয়ালটা যেন তাকে জাদু করেছে। কড়ি টানা, তেল চকচকে গা, ওরকম একটা ঘুড়ি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলেও ঘর আলো হয়ে যায়।

বাবলু ভাবলো, এক ছুটে ভেতরে গিয়েই নিয়ে আসবে, কেউ দেখবে না। দরজা দিয়ে ঢুকে বাবলু প্রথমে চোরের মতন দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। কুকুরটার কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, মানুষজনও কেউ নেই। একতলায় বোধহয় কেউ থাকে না।

ভেতরে একটা চাতাল, তারপর পেছন দিকের মাঠটায় যাওয়ার একটা দরজা, সেই দরজায়। তালা লাগানো, অনেক দিনের মর্চে পরা তালা। কিন্তু তার প্রায় পাশেই দেয়ালে

ইঁট ভেঙে ভেঙে মানুষ প্রমাণ গর্ত। অর্থাৎ জমিটির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক আছে, তাই দরজা তালা দিয়ে বন্ধ থাকে, গোপনে ব্যবহার হয়। বাবলুর কাছে এটা একটা মজার ব্যাপার মনে হলো, সে ঢুকে পড়লো সেই গর্ত দিয়ে।

মাঠটিতে বড় বড় ঘাস গজিয়ে গেছে, এখানে সেখানে রয়েছে কচু গাছ আর শ্যাওড়া, একটা দুটো পেয়ারা গাছও রয়েছে। ছেঁড়া জুতো, রক্তমাখা তুলো, ভাঙা পুতুল, সিগারেটের খালি প্যাকেট আর কত কী যে সেখানে রয়েছে তার ঠিক নেই।

মাঠটার শেষ প্রান্তে একটা পেয়ারা গাছে লটকানো কালো চাঁদিয়ালটাকে দেখতে পাচ্ছে বাবলু, তার বুক ধক ধক করছে, এতদিনে তার হাতে আসবে এই দুর্লভ উপহার। যাতে শব্দ না হয় সেইভাবে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে, আর কোনো দিকে তার মনোযোগ নেই।

পেয়ারা গাছের ডাল পর্যন্ত বাবলুর হাত যায় না, খুঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে, বাবলু চটিজুতো খুলে সবে পা দিয়েছে, এমন সময় যেন কোনো চুম্বক তার চোখের দৃষ্টি ডান পাশে ফেরালো, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো।

সেখানে সেই ঘাস জঙ্গলের মধ্যে ছেঁড়া মাদুরের ওপর বসে আছে একটি স্ত্রীলোক, মধ্যবয়সী, কালো শাড়ি পরা, তার হাতে তাস। স্ত্রীলোকটি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাবলুর দিকে।

দুপুর শেষ হয়ে এখনো বিকেল হয়নি, রোদ্দুরের রং গাঢ়, তার মধ্যে সেই অদ্ভুত রকম অবস্থায় বসে থাকা রমণীটিকে দেখে বাবলুর গলা শুকিয়ে গেল, বুকের মধ্যে জয়ঢাক পেটার শব্দ হতে লাগলো। সে মনে মনে বলতে লাগলো, রাম, রাম, রাম, রাম...

বেশ কয়েক মুহূর্ত সেখানে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর বাবলু আস্তে আস্তে বললো, আর করবো না, আর কোনোদিন করবো না!

রমণীটি কোনো কথা বললো না, শুধু চেয়ে রইলো।

পেয়ারা গাছের ডাল থেকে আপনা-আপনিই খসে পড়লো ঘুড়িটা। সেইটুকু শব্দেই বাবলু ভয় পেয়ে দারুণ চমকে উঠলো। ঘাড় ফিরিয়ে ঘুড়িটাকে দেখে বাবলুর লোভটা ফিরে এলেও সেটাকে তুলে নেবার সাহস পেল না।

সে এক পা এক পা করে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই স্ত্রীলোকটি কর্কশ গলায় বললো, এই! এদিকে আয়!

বাবলু হাত জোড় করে বললো, আমি আর কোনো দিন আসবো না, আর কোনোদিন এরকম করবো না।

স্ত্রীলোকটি হাত থেকে তাসগুলো ফেলে দিয়ে বললো, এই, আয়, এদিকে আয় বলছি!

আগাছার জঙ্গলে একা বসে থাকা একটি স্ত্রীলোককে বাবলু কিছুতেই রক্তমাংসের মানুষ বলে ধরে নিতে পারে না। কিন্তু এখনো তার বুক কাঁপতে থাকলেও প্রাথমিক ভয়টা ভেঙে গেছে, ডাক শুনে সে কাছে গেল না, এক ছুটে পালালোও না, খানিকটা দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালো।

স্ত্রীলোকটি আবার বললো, এই খোকা, আয়, আমার কাছে আয়, তোকে একটা জিনিস। দেবো! তুই কাদের বাড়ির ছেলে রে?

এইবার বাবলু লক্ষ করলো, মহিলাটির মুখখানা প্রায় ফর্সা হলেও তার গলার কাছটা মিশমিশে কালো, তার বাহুতে কালো পোড়া পোড়া ছাপ, তার চোখের মণি দুটো স্থির। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে তার বুক দুটি উঠছে আর নামছে।

বাবলু আর দাঁড়াতে পারলো না। উল্টো দিকে ফিরে বন্য প্রাণীর মতন একটা দৌড় লাগালো।

পাঁচিলের গর্ত দিয়ে চলে এসে, চাতালটা পেরিয়ে, বাইরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় সে ধাক্কা খেল একজন লোকের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, আমি কিছু করিনি। আমি...

লোকটি ভৃত্য শ্রেণীর, তার দু হাত ভর্তি জিনিসপত্র, নইলে সে বাবলুকে জড়িয়ে ধরতো। বাবলু মুহূর্তের মধ্যে সেটা বুঝতে পেরে, আবার দৌড় মারলো।

তারপর থেকে সে আর ঐ বাড়িটির পাশের রাস্তাটাতেই নিজে থেকে যায় না কখনো। দৈবাৎ বাবা-দাদার সঙ্গে যেতে হলেও সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে এবং বুকের মধ্যে টিপ টিপ শব্দটা নিজের কানে শুনতে পায়।

কিন্তু ঐ আগাছার জঙ্গলে বসে থাকা স্ত্রীলোকটির কথা তার প্রায়ই মনে পড়ে। সে কি সত্যিই মানুষ ছিল? কেউ কি ঐ রকম জায়গায় বসে একা একা তাস খেলে? সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে সেই নারীর মর্মভেদী দৃষ্টি। কেন সে আয় আয় বলে ডেকেছিল?

বাবলুর গোপনে পয়সা জমানোটা পিকলু একদিন জেনে ফেলো। তার ফলে বাবলুকে। বিপদে পড়তে হয় একদিন।

পাড়ার কচুরি রাধাবল্লভির দোকানে লেখা আছে, চিল হইতে সাবধান! বাবলু ঐ লেখার কোনো গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু একদিন আকাশের চিল তাকে দারুণ জব্দ করে দিল।

বাড়ি থেকে বাবলুকে পাঠানো হয়েছে দু টাকার রাধাবল্লভি কিনে আনতে। মস্ত বড় একটা শালপাতার ঠোঙা হয়েছে, তার তলার দিকে আলুর তরকারি, সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঝোল গড়িয়ে পড়ছে বলে বাবলু এক হাতে টিপে আছে সেই জায়গাটা। ওপরে ঘুড়ির আওয়াজ হলেই তার চোখ সে দিকে চলে যায়।

বোসদের বাড়ির লাল ঘুড়ি একটা পেটকাট্টাকে কাটবার জন্য পড়পড় শব্দে নেমে আসছে। ফলাফল দেখবার জন্য বাবলু সেদিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে, হঠাৎ রাস্তার অনেক লোক এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, এই, এই এই! গেল, গেল, গেল!

বাবলু কিছু বোঝবার আগেই রাধাবল্লভির ঠোঙাটা তার হাতছাড়া হয়ে গেছে, একটা চিল ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছে। সেই ঠোঙা থেকে টুপ টাপ করে রাধাবল্লভি খসে পড়ছে শূন্য থেকে, অন্য দুটি চিল সেগুলো লুফে নেবার চেষ্টা করছে, কোথা থেকে এসে গেছে এক ঝাঁক কাক।

কয়েকদিন আগেই বাবলু একটা শিকারের গল্পে পড়েছিল যে, বন্দুক তুলে রাখা সত্ত্বেও চোখের সামনে একটি খরগোশকে টপ করে তুলে নিয়ে একটা চিতাবাঘ লাফিয়ে পালিয়ে। যেতেই শিকারী রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের 'রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়িতে ইচ্ছা হইয়াছিল'। বাবলুর এখন ঠিক সেই রকম অবস্থা। এখন তার নিজের মাথার চুল ছিঁড়েই শাস্তি পাওয়া উচিত! সে কাল্পনিক বন্দুক তুলে চিলগুলোকে ঠিক টিপ করে পর পর তিনটি গুলিতে খতম করে দিল। সত্যি সত্যি সে একদিন বন্দুক কিনে কলকাতার আকাশ থেকে সব চিল নিশ্চিহ্ন করে দেবে। যখন এখানে একলা শুধু তার ঘুড়ি উড়বে, তখন একটা চিলকেও থাকতে দেওয়া হবে না।

কিন্তু বাড়িতে এসে তো বলতেই হবে। সামান্য চিলের কাছে এরকম পরাজয়ে তার মাথা। হেঁট হয়ে যাচ্ছে, অথচ উপায়ও তো নেই। মমতা এই দুর্ঘটনার কথা শুনে বাবলুকে বকলেন না, শুধু বললেন, থাক, আর তোকে যেতে হবে না, কানুকে পাঠাচ্ছি!

পিকলু এই ঘটনা শুনে কেমন কেমন চোখে যেন বাবলুর দিকে তাকালো।

সন্ধেবেলা পড়ার টেবিলে বসে পিকলু এক সময় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলে, বাবলু, তোর বইয়ের সুটকেসে একটা জদার কৌটো ঝনঝন করে কেন রে? তুই পয়সা কোথায় পেলি!

বাবলু চমকে মুখ তুলে বললো, তুমি আমার সুটকেসে হাত দিয়েছো কেন?

পিকলু বললো, একটা স্কেল খুঁজছিলাম। পয়সা পেলি কোথায়, সেটা বল!

–আমি জমিয়েছি!

–কোথা থেকে জমালি, অত পয়সা!

–যেখান থেকেই জমাই না কেন, তোমার তাতে কী?

–আজ বিকেলে সত্যি দু টাকার রাধাবল্লভি চিলে নিয়ে গেছে! ঠিক করে বল তো? কয়েক মুহূর্তের জন্য বাবলুর সমস্ত রোমকূপ খাড়া হয়ে গেল। দাদা কি ভেবেছে যে সে চিলের গল্প বানিয়ে বলে টাকাটা নিজে নিয়ে নিয়েছে? এ রকম কোনো কথা তো তার মাথাতেই। আসেনি!

দাদা যদি এই কথাটা বলে দেয়, তাহলে মা বাবা সবাই দাদার কথা বিশ্বাস করবে। দাদা ভালো ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, দাদা মিথ্যে কথা বলে না! মা আর পিসিমা যখন গঙ্গা স্নান করতে যায়, তখন দাদা সঙ্গে যায়, বাবলুকে নিয়ে যেতে সাহস পায় না, কারণ বাবলুর দায়িত্বজ্ঞান নেই। দাদাকেই সবাই ভালোবাসে, বাবলুকে কেউ ভালোবাসে না।

উঠে গিয়ে সুটকেস খুলে জদার কৌটোটা নিয়ে সে পিকলুর কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, তোমার যা ইচ্ছে গিয়ে বলো!

পিকলু হাসতে শুরু করে। ছোট ভাইয়ের নামে নালিশ করার কথা সে একবারও ভাবেনি।

সে বললো, কত জমিয়েছিস দেখি তো! মাঝে মাঝে আমাকে ধার দিস!

শীতকালে ঘুড়ি ওড়াবার পাট নেই। পাড়ার ছেলেরা তখন ডাংগুলি খেলে কিংবা ক্যাম্বিসের বলকে ফুটবল বানিয়ে পেটায়। ওরই মধ্য দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া চলে। কিছুদিন আগেই

সামনের বড় রাস্তায় একটি বাচ্চা মেয়ে লরি-চাপা পড়েছে বলে বাবলুর রাস্তায় খেলা নিষেধ।

কিন্তু ঘরের মধ্যে কিছুতেই বেশিক্ষণ বাবলুর মন টেকে না। পিকলু কিংবা তুতুলের মতন সর্বক্ষণ পড়ার বই কিংবা গল্পের বই মুখে করে বসে থাকার মতন ধৈর্য তার নেই। আর মুন্নিটা বড্ডই ছোট। বাবলুর খেলার কোনো সঙ্গী নেই।

নিষেধাজ্ঞা না মেনে সুড়ুৎ সড়াৎ করে বেরিয়ে যায় বাবলু। একটা জিনিস সে আবিষ্কার করেছে। ঠিক বাড়ির সামনের রাস্তায় না খেলে সে যদি পাশের বস্তিটায় খেলতে যায়, তাহলে বাড়ির কেউ দেখতে পাবে না। বস্তির ছেলেরা পয়সা দিয়ে কড়ি খেলে। এক আনায় দশটা কড়ি। চৌকো ঘর কেটে তার মধ্যে কড়ি ছড়িয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট কড়িটাকে দূর থেকে বাটখাড়া দিয়ে মারতে হবে। লাগলে জিৎ, না লাগলে হার। যার কড়ি ফুরিয়ে যায়, সে অন্যের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে কেনে।

বাবলুর বেশ নেশা লেগে গেল। সে মাঝে মাঝেই দু আনা, চার আনা জেতে। বস্তির ছেলেদের কাছ থেকে নতুন নতুন ভাষাও সে শিখছে।

একদিন বস্তির মধ্যে কী একটা মারামারি লাগতেই সব কড়ি-খেলুড়েরা দুদ্দাড় করে ছুটে পালালো। বাবলু বাড়ির দিকে দৌড়ে আসতে গিয়ে পড়ে গেল একেবারে প্রতাপের মুখোমুখি। তার এক হাতের মুঠোয় কড়ি, অন্য হাতে পয়সা।

প্রতাপ বাবলুর ঘাড় চেপে ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এলেন ওপরে। হঠাৎ রাগ এসে গেলে তিনি নিজেকে দমন করতে পারেন না।

শয়ন ঘরে এসে প্রতাপ বাবলুর চুলের মুঠি ধরে প্রথম গর্জন করতে যাবেন, এমন সময় মমতা দৃঢ়ভাবে বললেন, দাঁড়াও!

খাটের ওপর বসে মমতা বাবলুরই একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করছিলেন, সে সব রেখে নেমে এসে বললেন, ছেড়ে দাও ওকে! তুমি যখন তখন ছেলেটাকে বকবে আর মারবে? ওর সব সময় দোষ? আর কারুর কিছু দোষ নেই? ওর খেলতে ইচ্ছে করে, খেলবে কোথায়? এইটুকখানা ফ্ল্যাটের মধ্যে এতগুলো মানুষ। তুমি আমাদের এখানে বন্দী করে রেখেছে। সারা জীবনই কি এরকমভাবে কেটে যাবে?

বাবলুকে ছেড়ে দিয়ে প্রতাপ হতবাক হয়ে মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মমতার মুখোনি গনগনে লাল। এ যেন সর্বংসহা ধরিত্রীর সহসা অগ্নি-উদগীরণ! মমতা কখনো কোনো অভিযোগ জানান না। এখন বোঝা গেল, তার মনের মধ্যে অনেক তিক্ততা. জন্মেছে!

২৬ প্রতাপ সিগারেট খেতে খেতে

একবার প্রতাপ সিগারেট খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, জ্বলন্ত সিগারেট আস্তে আস্তে তোশকের তুলোর মধ্যে ঢুকে গিয়ে প্রায় দক্ষ হতে যাচ্ছিল। মুন্নি ছিল পাশেই শুয়ে, আঁচ লাগতে সে চেঁচিয়ে উঠতেই মমতা ছুটে এসেছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত বড় কোনো বিপদ হয়নি। তারপর থেকে প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করার পর শেষ সিগারেটটি তিনি হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে যাবেন।

এ বাড়িতে একটা বারান্দাও নেই, তাই ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে হয়। মমতার রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে আসতে সময় লাগে। অফিসের দিনে এই সময়টা ছাড়া মমতার সঙ্গে ভালো করে কথা বলার সুযোগই ঘটে না।

আজ সন্ধে থেকেই মুখ গম্ভীর, প্রতাপের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছেন মমতা। প্রতাপ সেইজন্য অস্বস্তিতে আছেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং জেদী পুরুষ হলেও স্ত্রীকে খানিকটা ভয় পান প্রতাপ। মমতা খুব কম চ্যাঁচামেচি করেন বলেই এই ভয়। মমতার

অভিমান এতই চাপা যে প্রতাপ অধিকাংশ সময় তা টেরই পান না। বিশেষ কোনো কারণ না ঘটলে বাইরে ফুটে ওঠে না মমতার রাগ।

পুরুষ সম্মুখ যুদ্ধে বিশ্বাস করে কিন্তু স্ত্রী জাতির রণনীতি সম্পূর্ণ পরোক্ষ। এতদিনের বিবাহিত জীবনে প্রতাপ এটা বুঝেছেন। মমতার মুখ ভার দেখে প্রতাপ চিন্তা করবেন, আজ বা দু'একদিনের মধ্যে তিনি কোন্ ভুল বা অন্যায় করে ফেলেছেন। কিন্তু মমতা শুরু করবেন। হয়তো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঁচ বছর আগের কোনো ঘটনা দিয়ে।

মমতা ইচ্ছে করে বেশি দেরি করছেন আজ। প্রতাপ এখন ঘুমিয়ে পড়লে সেটা আরও একটা অপরাধ হবে। সিগারেট বেড়ে যাচ্ছে। প্রতাপ দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন, একটু লুকিয়ে। রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে মমতা সুপ্রীতির সঙ্গে কী একটা গল্পে মেতে আছেন। দু'জনেই হাসছেন খুব। প্রতাপ কি ইচ্ছে করলে বেরিয়ে ওদের গল্পে যোগ দিতে পারেন না? প্রতাপ জানেন, তিনি ওখানে গিয়ে দাঁড়ালেই আজ মমতার গল্প থেমে যাবে।

মমতা যখন শয়ন ঘরে এলেন, প্রতাপ তখন বসে আছেন খাটে পা ঝুলিয়ে।

মমতা প্রতাপের দিকে তাকালেন না, কোনো কথা বললেন না, খাটের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে মুন্নির গায়ের চাঁদর টেনে দিলেন। এই শীতের মধ্যেও মুন্নি গায়ে চাপা রাখতে চায় না, ঠাণ্ডা লেগেছে তার, ক'দিন ধরে খুব কাশছে ঘুমের মধ্যে।

এই যে প্রতাপ এতক্ষণ জেগে থেকেও মুন্নির গায়ে চাপা আছে কি না সেটা লক্ষ করেন নি, মমতা প্রথমে এসে সেটাই বুঝিয়ে দিলেন।

তারপর মমতা ড্রেসিং টেবলের সামনে ফিরে এসে চিরুনি বসালেন চুলে।

তিনটি সন্তানের জননী হলেও মমতার শরীরটি এখনো তন্বী। তাঁর রূপের মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা আছে। তাঁর দৃষ্টি ও ওষ্ঠরেখায় রয়েছে সতোর নির্ভুল চিহ্ন। ঘন কালো চুল কোমর ছাড়িয়ে যায়।

মমতা এমন ভাবে প্রসাধন করছেন যেন ঘরে তিনি একা।

কিছুক্ষণ মমতার টুকিটাকি কাজকর্ম লক্ষ করার পর প্রতাপ আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কী হয়েছে বলো তো?

উত্তরটাও প্রতাপের জানাই ছিল।

মমতা মুখ না ফিরিয়েই বললেন, কী আবার হবে, কিচ্ছু হয় নি তো?

সরাসরি সমরে তো মেয়েরা আসবে না, তাদের আক্রমণ হবে অতর্কিতে।

–আমি কি কিছু গুরুতর দোষ করে ফেলেছি?

–না, তুমি কি দোষ করবে? তুমি তো কখনো দোষ করো না!

এ সম্পর্কে প্রতাপেরও বিশেষ দ্বিমত নেই। তাঁর অহমিকা বেশি, তিনি নিজের দোষ দেখতে পান না। কিংবা অন্য কেউ বললেও স্বীকার করতে চান না। তাঁর ধারণা, রাগের মাথায় তিনি কখনো কখনো কটু কথা বলে ফেলেন বটে, কিন্তু তাঁর মতন সব দিকে বিবেচনা আর ক'জনের আছে?

–তা হলে আমি শুয়ে পড়ি?

–হ্যাঁ, শোও, তোমাকে তো আমি জেগে থাকতে বলিনি!

প্রতাপের সত্যি ঘুম এসে গেছে, আজকের মতন কোর্ট অ্যাডজোন করে তিনি বালিশে মাথা রাখলেন। আলোটা ঠিক একেবারে সামনেই, তিনি হাত চাপা দিলেন চোখে।

একটুক্ষণের জন্য তন্দ্রা এলেও আবার ভেঙে গেল। মনের মধ্যে কী যেন একটা খচখচ করছে। মমতাকে সত্যি ভালোবাসেন প্রতাপ, কিন্তু সিনেমার নায়কদের মতন মুখে সেই

কথা বারবার বলে তিনি আদিখ্যেতা করতে পারেন না। কিন্তু কোনো কারণে মমতার মধ্যে অশান্তি দেখলে তিনি নিজেও স্বস্তি বোধ করেন না।

কিন্তু মমতার এই কথা না বলা প্রতিরক্ষা ব্যুহ তিনি ভাঙবেন কী করে? মমতা কোনো অভিযোগ জানালে তিনি উত্তর দিতে পারতেন।

হঠাৎ প্রতাপের একটা কথা মনে পড়ে গেল। তিনি উঠে বসে ব্যস্ত ভাবে বললেন, দিদি আজ যে বালাদুটো দিয়েছে, তুমি আলমারিতে তুলে রেখেছো? ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ারে ছিল!

প্রতাপ যে নিজেই মমতার হাতে একটা মারাত্মক অস্ত্র তুলে দিলেন তা তিনি বুঝলেন না। অথবা, মমতার নীরবতাই কি তাঁর মুখ দিয়ে এই সময়ে এই কথাটা বের করে আনলো?

এবারে মুখ ফিরিয়ে মমতা বললেন, তুমি দিদির গয়না হাত পেতে নিলে? ফিরিয়ে দিলে না কেন?

–পরে এক সময় দিয়ে দিলেই চলবে।

–তুমি এখন দিদির গয়না বিক্রি করে সংসার চালাবে? ছিঃ!

–তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? আমি দিদির গয়না বিক্রি করতে যাবো?

–তবে কেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিলে না?

–দিদি জোর করতে লাগলো। দিদি কী বলতে চায়, তুমি তো জানোই। তাই দিদি যাতে অন্যরকম কিছু না ভাবে–

সুপ্রীতি মেয়েকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন প্রায় এক বছর হয়ে গেল। অসিতবরণের সম্পত্তির ভাগ নিয়ে সবে মাত্র মামলা শুরু হয়েছে। বরানগরের বাড়িতে দিদির অংশটা দখল হয়ে গেছে, ওখানে আর ফিরে যাবার পথ নেই, দিদির সে ইচ্ছেও

নেই একটুও। সম্পত্তির ভাগ তাঁর আইনত প্রাপ্য ঠিকই। কিন্তু মামলা কত বছর চলবে তার ঠিক নেই।

ভাইয়ের সংসারে এসে থাকতে সুপ্রীতির সম্মানে লাগবারই কথা। তাঁর কিছু জমানো টাকা ছিল, এতদিন খরচ করেছেন মাঝে মাঝে। এখন নগদ ফুরিয়ে যাওয়ায় গয়নায় হাত পড়েছে। সুপ্রীতি অবশ্য সোজাসুজি গয়না বিক্রি করে টাকা দেওয়ার কথা বলেননি। পুরোনো ধাঁচের দু'খানি বালার একটিতে ফাটল ধরেছে, তাই ও-দুটি বিক্রি করে তিনি তুতুলের জন্য নতুন গয়না করিয়ে দিতে চান। তবে, এখনই নয়, সোনার দাম একটু কমলে। এখন সোনার দাম বেশ উঠেছে, এই সময় ঐ অকেজো বালা দুটি বিক্রি করে দেওয়াই ভালো।

সুপ্রীতি মুখে যা-ই বলুন, উদ্দেশ্যটা প্রতাপের কাছে স্পষ্ট। প্রস্তাবটা একেবারে প্রত্যাখ্যান। করলে সুপ্রীতি জোর করতেন, তাই প্রতাপ আপাতত কিছুদিনের জন্য বালাদুটো নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছেন। দু'চারদিন বাদে ফেরত দিলেই হবে।

মমতা বললেন, প্রথম থেকেই তোমার উচিত ছিল, তোমার মাইনের টাকা দিদির হাতে তুলে দেওয়া। দিদিকেই সংসার চালাতে বলতে পারতে।

কথাটা প্রতাপের বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হলো। দিদিই এ সংসারে বড়। সংসার চালাবার বুদ্ধিও যথেষ্ট, দিদিকেই এই সংসারের কর্তৃত্ব ভার দিলে ঠিক হতো। মমতা মাঝে মাঝে অবুঝের মতন বেশি খরচ করে ফেলেন। এই ব্যবস্থাটা প্রতাপের মাথায় আগে আসেনি কেন?

তিনি বললেন, তুমিও তো এ কথা আগে আমায় বলোনি।

–সামনের মাস থেকে তাই করো। দিদি বুঝেসুঝে চালাবেন!

এটা তো যুদ্ধ নয়, এ তো শান্তির সময় সীমান্ত আলোচনা। মমতা স্বেচ্ছায় অনেকখানি অংশ ছেড়ে দিতে চাইছেন। প্রতাপ এবার হৃষ্ট ভাবে পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, ঠিক আছে, সেই রকমই করা যাবে!

আলো নিবিয়ে মমতা এসে মুন্নির ওপাশে শুয়ে পড়ার পর প্রতাপ হাত বাড়িয়ে তাঁর গালটা ছুঁলেন। মমতা আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, আমি দাদার কাছে কয়েকদিন গিয়ে থাকবো ভাবছি।

– প্রতাপ বললেন, গত মাসে যখন বিনতা এসেছিল, তখনই তো গিয়ে থেকে এলে ক'দিন। আবার যাবে?

-হ্যাঁ।

প্রতাপ উদারভাবে বললেন, তা যেতে পারো। ছেলে-মেয়েদের এখন ছুটি আছে। কদিন থাকবে?

-সে আমি বুঝবো। আমার এখানে থাকার দরকার তো কিছু নেই, দিদিই সংসার। দেখবেন।

প্রতাপের মাথায় সব কিছু গুলিয়ে গেল। খুব ধারালো অস্ত্রের আঘাতটা টের পেতে খানিকটা সময় লেগে যায়। এতক্ষণ তবে মমতা যা বলছিলেন, তার কোনোটাই শান্তি প্রস্তাব নয়?

প্রতাপ আহতভাবে বললেন, তুমি এ কথা কেন বলছো, মমো?

মমতা চুপ।

প্রতাপ আবার হাত বাড়িয়ে মমতার গাল ছুঁতে গেলেন। স্পর্শের ভাষা দিয়ে তিনি মমতাকে। তাঁর আন্তরিকতা বোঝাতে চান।

মমতার গাল থেকে গড়িয়ে নামছে উষ্ণ অশ্রু।

–তোমার কী হয়েছে? আমায় বলো!

–কিছু হয়নি!

এইবার প্রতাপ একটু একটু বুঝলেন। এই সংসারটা মমতার নিজস্ব ছিল। স্বামী-পুত্র কন্যা নিয়ে সুখে-দুঃখে তিনি এটা এতদিন ধরে গড়ে তুলেছেন, এখন সেই সংসারের ভার চলে যাবে দিদির হাতে।

কিন্তু মমতা নিজেই তো এই প্রস্তাবটা দিলেন। মেয়েরা এক এক সময় মুখে যা বলে, মনের কথাটা হয় তার ঠিক উল্টো। এসব সব সময় পুরুষের বোঝার অসাধ্য!

প্রতাপ চটপট এ সংকটের মীমাংসা করে দিলেন।

তিনি বললেন, তোমার সংসার তোমারই থাকবে। আমার মাইনের টাকা এত কাল বাদে দিদির হাতে তুলে দিতে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না! যেমন চলছে সেই রকমই চলুক!

–মাইনের টাকাটা তুলে দেওয়াই বুঝি বড় কথা! তা না দিলেও তো...

–তার মানে?

–আমাকে সব সময় দিদির মতামত নিয়ে চলতে হয় না? ছেলেমেয়েরা সকালে কী খাবে না খাবে, সেটাও তো উনি ঠিক করে দেন।

আর একটা কঠিন অস্ত্রের আঘাত। প্রতাপ বেশ কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারলেন না।

দিদির উপস্থিতিটাও মমতার কাছে কষ্টকর? সেইজন্যই মমতা মাঝে মাঝেই বলছেন, এইটুকু ছোট ফ্ল্যাটে এতগুলো মানুষকে প্রতাপ বন্দী করে রেখেছেন। কয়েকদিন আগে বাবলুর খেলাধুলোর প্রসঙ্গেও বলেছিলেন।

দিদি তো গুরুজনের মতন পায়ের ওপর পা উঠিয়ে ভাইয়ের বউ-এর সেবার প্রত্যাশী নন। দিদি এই সংসারের জন্য অনেক খাটেন। বামুন দিদি অসুস্থ হলে রান্নার ভারও নিজেই নিয়ে নেন সুপ্রীতি। সেদিক থেকে বলবার কিছু নেই। কিন্তু সুপ্রীতির ব্যক্তিত্ব প্রবল, সেখানে মমতাকে সংকুচিত হয়ে থাকতে হয়, সব ব্যাপারে দিদির মতামত মমতা নিজে থেকেই জানতে চান, অথচ ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হন!

এই খানিক আগেই তো দিদির সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছিলেন মমতা। অথচ দিদিকে তাঁর এত অপছন্দ! তুতুলকেও তো মমতা নিজের ছেলেমেয়ের মতনই ভালোবাসেন। তা হলে?

সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, মমো, তুমি কী বলতে চাও?

মমতা বললেন, আমি তো তোমায় কিছু বলতে চাইনি?

প্রতাপের ইচ্ছে হলো তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, ওঃ। তোমরা কি কিছুতেই মন খুলে কথা বলতে পারো না?

তিনি চাপা রাগের সঙ্গে বললেন, মমো, তুমি এমন ব্যবহার করছো–দিদি, তুতুল, এরা যাবে কোথায়?

–চুপ করো, আস্তে কথা বলো!

–মমো, লক্ষ্মীটি এ রকম করো না! যে-রকম চলছে, সেই রকমই চলতে দাও! এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

–হ্যাঁ, যে রকম চলছে, সেই রকমই চলুক। তাতেই তোমার সুবিধে। বাড়িতে কী ঘটছে ঘটছে তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে বুলার কথা ধ্যান করতে পারবে।

প্রতাপ এবারে হাসবেন না রাগ করবেন তাও বুঝতে পারলেন না। বুলা? এ রকম অবাস্তব অভিযোগের কোনো মানে আছে? সেই দেওঘরে দেখা হয়েছিল অনেক দিন বাদে, তারপর আর বুলার কোনো খবর নেওয়া হয়নি। দু'একবার ক্ষীণ ইচ্ছে হয়েছিল টালিগঞ্জে বুলার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে একবার দেখা করার, কিন্তু বুলার বর্বর ধরনের দেওরটির কথা মনে পড়তেই তিনি গুটিয়ে গেছেন।

তবু যা হোক বুলা সম্পর্কে মমতার ঈষা তিনি কোনো না কোনো সময়ে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবেন, কিন্তু দিদির ব্যাপারটা অনেক গুরুতর। দিদিকে প্রতাপ নিজে নিয়ে এসেছেন এ বাড়িতে। তাছাড়া দিদি কোথায়ই বা যেতে পারতেন? তুতুলকে নিয়ে সুপ্রীতি আলাদা কোথাও বাড়ি ভাড়া করে থাকবেন, তা কি সম্ভব?

দিদি কি মমতার সঙ্গে সম্প্রতি কোনো খারাপ ব্যবহার করেছেন? না, তা হতেই পারে না। দিদির মধ্যে কোনো রকম ক্ষুদ্রর্তা নেই। তবু এক সংসারে দুই নারী। তাদের সম্পর্ক যাই-ই হোক না কেন, পাশাপাশি কিছুদিন থাকলে সংঘর্ষ বাঁধবেই। এই সংঘর্ষে বিজয়িনী কে হয়? মমতাকে খুশী করবার জন্য প্রতাপ সুপ্রীতিকে কী বলবেন?

প্রতাপ একটা অবর্ণনীয় কষ্ট বোধ করতে লাগলেন। তাঁর নিজের দিদি, সেই ছোটবেলা থেকে দিদি তাঁর বন্ধুর মতন, তারপর ছাত্র অবস্থায় কলকাতায় পড়তে এসে বরানগরে দিদি-জামাইবাবুর কাছে কত খাতির-যত্ন ভোগ করেছেন প্রতাপ। এখন দিদি অসহায় অবস্থায় পড়েছেন...

প্রতাপ মমতার হাত জড়িয়ে ধরে কাতর ভাবে বললেন, মমো, তুমি যদি অবুঝ হও..আচ্ছা আমি চেষ্টা করছি, শিগগিরই অন্য একটা বাড়ি ভাড়া করতে। অন্তত আর একখানা বেশি ঘর... মমতা বললেন, বাড়ি ভাড়া আরও বাড়লে, তুমি দিদির গয়না বিক্রি করবে।

–না, সে কথা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি যেমন করে পারি চালাবো!

–আমার মাথার দিব্যি রইলো, দিদির গয়না বিক্রি করার আগে তুমি যদি আমার সব গয়না বিক্রি না করো, তা হলে আমি সব ছুঁড়ে ফেলে দেবো!

–কোনো গয়নাই বিক্রি করতে হবে না।

–সারাদিন খেটেখুটে এসে তুমি আবার রাত জেগে বই অনুবাদ কবে? আমি তাই। চোখের সামনে দেখবো?

–তা হলে তুমি কী চাও? আঃ। আমি আর পারছি না! পারছি না!

প্রতাপ উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে দিলেন। তারপর আর কোনো কথা হলো না।

অনেকক্ষণ বাদে প্রতাপ সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ার পর মমতা মুন্নিকে ডিঙ্গিয়ে এসে শুলেন প্রতাপের পাশে। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন স্বামীর মাথায়।

একবার ঘুম ভেঙে মুখ ফিরিয়ে ঘোর লাগা চোখে প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, কী? মমতা বললেন, কিচ্ছু না। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। যেমন চলছে, সেই রকমই চলুক।

২৭ ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেল প্রতাপের

ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেল প্রতাপের। তিনি বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসলেন। একটি। নিষ্ঠুর দুঃস্বপ্ন দেখেছেন তিনি, তার রেশ এখনো লেগে আছে চোখে-মুখে।

সমুদ্র থেকে উত্থিত মহাসর্পের মতন প্রতাপ ক্রুর নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। পাশে শুয়ে। আছেন মমতা, মুন্নির বিছানাটা একটুখানি আলাদা, সে কখন যেন উঠে এসে মায়ের

বুকের কাছে জায়গা করে নিয়েছে। প্রতাপের নিঃশ্বাস যেন জননী ও কন্যাকে একসঙ্গে দগ্ধ করে দেবে।

কত সাধে, কত মমতায় মানুষ একটা নিজস্ব সংসার গড়ে তোলে। অজস্রের মধ্য থেকে সে নির্বাচন করে নেয় তার সঙ্গিনীকে, সর্বস্ব দেওয়া-নেওয়ার অঙ্গীকার হয়ে যায় মনে মনে। এক এক করে পুত্র-কন্যারা আসে, ছড়িয়ে যায় মায়াজাল, শীতের রোদ্দুরে পা দিয়ে আরাম করার মতন পুরুষ উপভোগ করে বন্দীত্বের সুখ।

আবার এক এক সময়, বাইরের কোনো আঘাতে নয়, সব চেয়ে আপন দুটি নারী-পুরুষের পারস্পরিক অবিশ্বাসে জ্বলে ওঠে আগুন। যেন পাশাপাশি দুটি গাছ সুপবনে মাথা দোলাচ্ছিল, বিনিময় করছিল সুখ-দুঃখের কথা, হঠাৎ তাদের সংঘর্ষে ফুলকি দিয়ে উঠলো দাবানল। তখন সব স্মৃতিই তুচ্ছ হয়ে যায়, সব কিছুই বিষবৎ মনে হয়।

প্রতাপ কিছুক্ষণ মমতা ও মুন্নির দিকে তাকিয়ে রইলেন, সে দৃষ্টিতে ভালোবাসা নেই, স্নেহ নেই।

বাঙালী মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়, কিন্তু মধ্য তিরিশেও মমতার যৌবন অটুট। তাঁর যে বড় বড় তিনটি সন্তান রয়েছে তা তাঁর শরীর দেখলে বোঝবার উপায় নেই। তিনি রোগা নন, আবার স্থূলত্বও তাঁকে স্পর্শ করে নি, নাকের দু'পাশে ভাঁজ এখনো চোখে পড়ে না। এই ঘুমন্ত নারী আজও দর্শনীয়া। কিন্তু প্রতাপ সে চোখে মমতাকে দেখলেন না, দুঃস্বপ্নের প্রভাবে তাঁর চোখ রাগে জ্বলছে।

বিছানা থেকে উঠে তিনি আলনা থেকে তাঁর পাঞ্জাবিটি তুলে নিয়ে মাথায় গলালেন, তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

ভালো করে আলো ফোটেনি, তবু পথে কিছু কিছু মানুষজন বেরিয়েছে। এ পাড়ার অনেকেই গঙ্গাস্নানে যায়, ব্রাহ্ম মুহূর্তে জলে দাঁড়িয়ে সূর্য-প্রণাম করে। জলখাবারের দোকানগুলিতেও উনুনে আগুন ধরানো শুরু হয়েছে, স্নান-ফেরত লোকেরা গরম

সিঙ্গাড়াকচুড়ি কিনে নিয়ে যায় বাড়িতে। করপোরেশনের ধাঙ্গড়রাও এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়।

প্রতাপ হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন গঙ্গার ধারে। চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁর মস্তিষ্ক জুড়োলো না, নদীর শোভা তাঁর মনকে হরণ করলো না। চরম অসুখী, উদ্ভ্রান্তের মতন তিনি চলতে লাগলেন অনির্দিষ্টের দিকে।

গ্রামের অভ্যেস অনুযায়ী প্রতাপ ছাত্র বয়েসে লুঙ্গি পরতেন। বিয়ের পরও কিছুদিন চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু মমতার লুঙ্গি পছন্দ নয়। মমতার বাপের বাড়ির কেউ কোনো দিন লুঙ্গি পরে না, তাই প্রতাপকেও তিনি লুঙ্গি ছাড়িয়ে পা-জামা ধরিয়েছেন। পা-জামাটা বাড়ির পোশাক, ধুতি না পরে প্রতাপ কখনো রাস্তায় বেরোন না, কিন্তু আজ তাঁর হুঁস নেই। চুলে চিরুনি দেননি, চোখের নিচে অসমাপ্ত ঘুমের কালো ছাপ।

চা খাওয়ার আগে প্রতাপ দিনের প্রথম সিগারেটটা ধরান না। আজ তিনি চলতে চলতে এক সময় পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজলেন। পেলেন না। রাত্তিরবেলা সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই থাকে বেড-সাইড টেলে। পকেটে অবশ্য টাকা রয়েছে কুড়ি পঁচিশটা।

শ্মশানের ধারে পান-বিড়ির দোকান প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে। চিতার আগুনের মতন ঐ দোকানদারদেরও ছুটি নেই। প্রতাপ হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছেন নিমতলার কাছে। এত ভোরেও এখানে বেশ ব্যস্ততা রয়েছে। একটি দোকানে দাঁড়িয়ে প্রতাপ সিগারেট কিনলেন। তারপর সিগারেটে কয়েকটা টান দেবার পর তাঁর মস্তিষ্ক সচল হল। সেই মুহূর্তে তিনি নির্বাসন দণ্ড দিলেন মমতাকে।

বিচিত্র এই দণ্ড। মমতাকে বনবাসে যেতে হবে না, এক চুলও স্থানচ্যুত হবে না। বিছানা, জানলার পদা, টবের ফুলগাছ, রান্নাঘর, পুত্র-কন্যা নিয়ে মমতা ঐখানেই থাকবেন, কিন্তু প্রতাপ আর ফিরবেন না। প্রতাপের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। কী করে সংসার চলবে, কোথা

থেকে টাকা আসবে, তা মমতা বুঝুক! পৃথিবীতে কিছুই থেমে থাকে না। আকস্মিক হৃদরোগে প্রতাপের মৃত্যু হলে মমতাকেই তো সব বুঝেসুঝে চালাতে হতো!

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবার পর প্রতাপের কপালের কুঞ্চন রেখা মুছে গেল। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সেইটুকু বাতাসে যেন উড়ে গেল তাঁর পশ্চাৎ-জীবন।

আদালতের হাকিমকে চলতে হয় লিখিত আইনের ছক বাঁধা পথে। কিন্তু প্রতাপের ব্যক্তিগত জীবন বে-আইনী, তিনি প্রায়ই যুক্তিহীন, জেদ-তাড়িত পথে যেতে চান। আর্থিক অনটন চিন্তার জগতে একপ্রকার ক্ষুদ্রতা এনে দেয়, সেটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। অথচ এই অবস্থা তাঁকে ইদানীং মেনে নিতে হচ্ছে। বাজারে মাছ কিনতে গেলে মাছ পছন্দ করার চেয়েও টাকার হিসেব করাটাই প্রধান হয়ে ওঠে, প্রতাপের তখন খুব ছোট মনে হয় নিজেকে। তাঁর ছেলে পিকলু কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে যেতে চেয়েছিল, জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রতাপের বড় প্রিয়, তবু প্রতাপ পিকলুকে যেতে দিতে পারেননি। শুধু তাই নয়, পিকলুর কাছে তাঁকে সামান্য মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে, এ জন্য প্রতাপ মরমে মরে গেছেন।

প্রতাপের থেকে আরও কত গরিব তোক তো আছে। দেশ বিভাগের ফলে কত শত-সহস্র পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে, শিয়ালদা স্টেশানে শুয়ে আছে কত জন, কত সাধারণ গৃহস্থ এপার বাংলায় এসে পথে পথে ভিক্ষে করে। কিন্তু প্রতাপকে এসব বোঝানো যাবে না। তাঁর স্বভাবের মধ্যেই গেঁথে আছে এক ধরনের আত্মম্ভরিতা, তিনি দাতা হবেন, কখনোই গ্রহীতা হতে পারবেন। না। অন্য কেউ তাঁর প্রতি সামান্য অনুকম্পা দেখালেই তাঁর গাত্রদাহ হয়।

মমতাকে তিনি যথার্থ ভালোবাসেন এবং তিনি মনে করেন সেই ভালোবাসাটাই যথেষ্ট। মমতার আর কোনো মতামত দেওয়ার অধিকার নেই, কেননা, প্রতাপ যা কিছু করবেন, সবই তো মমতার ভালোর জন্যই করবেন। মমতার শাড়ী কিংবা জানলার পর্দার রং অবশ্য মমতাই পছন্দ করবেন, কারণ প্রতাপ ওসব বোঝেন না, কিন্তু পিকলুকে পুরী

পাঠাবার বদলে একটা খাট তৈরি করা যে বেশি প্রয়োজনীয়, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার মমতাকে কে দিয়েছে? কাল রাত্তিরে সুপ্রীতির প্রসঙ্গ তুলে মমতা একেবারে মর্মাহত করে দিয়েছেন প্রতাপকে। ঘুমের মধ্যেও, দুঃস্বপ্নে, প্রতাপ যেন এক ভয়ংকর কালো রঙের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তাঁর দিদির সঙ্গে মমতা একসঙ্গে থাকতে চান না! তুতুলকে নিয়ে কোথায় চলে যাবেন দিদি? প্রতাপের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে কি তিনি তাঁর দিদিকে ঐ রকম কোনো কথা সামান্য ইঙ্গিতেও বলতে পারবেন?

মমতা যে এত বুদ্ধিমতী তা প্রতাপ আগে কোনোদিন টের পাননি। দিদির প্রসঙ্গ তুলে। খানিকক্ষণ অভিমানের ফোঁসফোঁসানির পর মমতা আবার নিজে থেকেই প্রতাপের গায়ে হাত। বুলিয়ে বলেছেন যে, থাক, কিছুই বদলাতে হবে না, মমতা এখনকার অবস্থাই মেনে নেবেন। অর্থাৎ, এখন থেকে, দিদির জন্য প্রতাপকে সব সময় মমতার দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে। প্রতাপকে প্রতি মুহূর্তে তোয়াজ করে বলতে হবে, মমো, তুমি আমার দিদির মনে দুঃখ দিও না, দিদি যেন কিছু টের না পায়!

সব চুলোয় যাক, দিদি আর তুতুলের যা-হয় তোক। মমতা তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যেমন করে পারুক সংসার চালাক। প্রতাপের আর কোনো দায়িত্ব নেই।

হন হন করে প্রতাপ হাঁটতে লাগলেন হাওড়া স্টেশানের দিকে। স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে লরি। চলাচল শুরু হয়ে গেছে। পাট গুদামগুলির পাশের সরু রাস্তাটা ধরলেন প্রতাপ। গঙ্গার ওপর। পাতলা কুয়াশা ছড়িয়ে আছে। শোনা যাচ্ছে কোনো কোনো পুণ্যার্থীর কম্পিত গলার গান। সারা গায়ে জবজবে সর্ষের তেল মেখে কুস্তি করছে কয়েকজন। ব্রীজের নিচে বসে গেছে ফুলের বাজার।

হাওড়া স্টেশনে এসে প্রতাপকে টিকিট ঘর খোলার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল।

প্রথমে তিনি ঠিক করলেন কাশীর টিকিট কাটবেন। যা সামান্য টাকা আছে তাতে আর বেশি দূর যাওয়া যায় না। কাশীতে অবশ্য প্রতাপের চেনা কেউ নেই। সেখানে গিয়ে কী করবেন তা জানেন না, তবু যেতে হবে।

পর পর দু' ভাঁড় চা ও আরও একটি সিগারেট খাবার পর প্রতাপের মাথা পরিষ্কার হল। স্টেশানের ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজে। বাড়িতে কেউ এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। মমতা ছ'টার আগে জাগেন না। প্রতাপ এখন বাড়ি ফিরে গেলে টেরই পাবেন না কেউ কিছু। কিন্তু প্রতাপের গোঁয়ার্তুমি এত সামান্য সময়ে কমে না। মমতাকে কিছু শিক্ষা দেবার জন্য তিনি। বদ্ধপরিকর।

যথা সময়ে কাশীর টিকিট কেটে তিনি প্ল্যাটফর্মে ঢুকে একটি বেঞ্চিতে বসলেন। সকালে কাশীর কোনো ট্রেন নেই, অন্য একটি ট্রেন মোগলসরাই-এর ওপর দিয়ে যাবে, তারও দেরি আছে।

চা খাওয়ার পর বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। স্টেশানের বাথরুমে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, মনে পড়লেই গা ঘিনঘিন করে ওঠে। শরীর কতকগুলো আরামে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, আবার মনের বিকার হলে সেই সব অভ্যেসও পরাস্ত হয়ে যায়। বেঞ্চে বসে প্রতাপ একটার পর একটা সিগারেট পোড়াতে লাগলেন।

পাশে যে আর একজন লোক এসে বসেছে, প্রতাপ বেশ কিছুক্ষণ তা খেয়ালই করেন নি। লোকটি প্রতাপের চেয়ে বয়েসে কিছুটা বড়, খাঁকি প্যান্ট ও নীল রঙের জামা পরা, রোদে-পোড়া তামাটে মুখ, মাথায় অল্প টাক, পায়ের কাছে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আর একটি লাঠি।

প্রতাপের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই লোকটি বললো, নমস্কার, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার দেশলাইটি একবার দেবেন?

দেশলাই নিয়ে লোকটি একটি বিড়ি ধরালো। দু হাতের তালুর মধ্যে বিড়িটি লুকিয়ে জ্বালাবার একটি বিশেষ কায়দা আছে। কয়েকবার ধোঁয়া ছাড়ার পর দেশলাইটি ফেরত দিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, মশায়ের কোথায় যাওয়া হবে? মেদিনীপুরের দিকে নাকি?

প্যান্ট-শার্ট পরিহিত হলেও লোকটির কথা বলার ভঙ্গি পুরোনো ঢঙের। অপরিচিত মানুষকে স্টাডি করা প্রতাপের একটি শখ হলেও এখন তিনি গল্প করার মেজাজে নেই। তিনি সংক্ষেপে বললেন, না।

কিন্তু ঐ লোকটি যেন কথা বলার কোনো সঙ্গী খুঁজছে। প্রতাপ অন্য দিকে মুখ ফেরালেও লোকটি বললো, মশায় কি মাঝে মাঝেই ট্রেনে যাতায়াত করেন? তা হলে আপনি টের পাবেন না। রেল ইস্টিশানের একটা কুচ্ছিৎ গন্ধ আছে। এই গন্ধের জ্বালায় সারা রাত ঘুমোতে পারিনি।

প্রতাপের কৌতূহল এবারে উসকে উঠলো। সারা রাত? শিয়ালদা স্টেশানের তুলনায় হাওড়া অনেক পরিষ্কার। এখানে রিফিউজিদের আস্তানা হয়নি। কুলি কামিন ছাড়া এই স্টেশানে তো রাত্রে কেউ শোয় না।

লোকটি আবার বললো, কাল পশ্চিম থেকে ফিরলুম তো। লাস্ট ট্রেন, এখানে এসে ভিড়লো রাত এগারোটার পর। তখন আর কোথায় যাই? কলকাতা শহরের কারুকে চিনি না। রাস্তাঘাটও ভালো মনে নেই, তাই শুয়ে রইলুম এখানেই।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, পশ্চিমের কোথায় থাকতেন?

লোকটি সে কথার উত্তর না দিয়ে হাসলো। বিড়িতে আবার টান দিয়ে বললো, কেউ একথা। জিজ্ঞেস করলে কী যে বলবো ভেবে পাই না। ওদিকে তো আমার ঘর বাসা বলতে কিছু ছিল না, সর্বক্ষণ ঠাঁইনাড়া। আজ এখানে তো কাল সেখানে। কানপুরে ট্রেনে চেপেছি, তাই বললুম যে আসছি পশ্চিম থেকে।

–কাজের জন্য ঘুরতে হত বুঝি?

–কাজ? আমি মশায় একেবারে অকাজের কাজী। সারা জীবন কোনো কাজই করলুম। না। গায়ে ফুঁ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি। কার্পাস তুলোর বীজ দেখেছেন? ঠিক সেই রকম। আমার

বাপ-মায়ের দেওয়া নাম হল মনোহর মাইতি, কিন্তু আমি নিজেই নিজের আর একটা নাম নিয়েছি। মুক্তানন্দ! কেমন নাম? হে-হে-হে!

প্রতাপ সকৌতূহলে চেয়ে রইলেন লোকটির মুখের দিকে।

মনোহর মাইতি ওরফে মুক্তানন্দ নিজের গালে হাত বুলোত লাগলো। যেন নিজেকে আদর করছে সে।

-বুঝলেন মশায়, মুখ ভর্তি দাড়ি ছিল আমার, আঠারো বছর দাড়ি কাটিনি। গত পশুদিনকে সব সাফ করলুম। আঠারো বছর পরে বাড়ি ফিরছি, অত দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল দেখলে কেউ আমাকে চিনতেই পারবে না। এমনিতেই পারবে কি না সন্দেহ। আচ্ছা, এ দেশে চালের দাম এখন কত? ট্রেনে আসতে আসতে শুনলুম, বাঙালীরা নাকি পাথর-মেশানো চাল কেনে আর ভাত খেতে খেতে দাঁত ভেঙে যায়!

প্রতাপ মনে মনে হিসেব করলেন। আঠারো বছর মানে, যুদ্ধের আগেকার কথা। এর মধ্যে বাঙালীর জীবনে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে, এই লোকটি তা কিছুই দেখেনি। সাধু-সন্ন্যাসী নাকি?

খানিকক্ষণ কথা বলার পর বোঝা গেল, সে সব কিছু নয়। লোকটির মধ্যে ধর্মভাব প্রবল নয়। এই মনোহর মাইতিকে যৌবন বয়েসে হিমালয় পাহাড় ডেকেছিল। সেই ডাক শুনে বাড়িঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ে। বিয়ে-থা করেনি অবশ্য। প্রথম কিছুদিন এক বন্ধু ছিল সঙ্গে। সেই বন্ধু মাস ছয়েক পর ফিরে আসে, কিন্তু মনোহর আর ফেরে নি।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাজকর্ম কিছুই করেননি, আপনার আহার জুটতো কী করে?

লোকটি বললো, বিশ্বাস করুন মশায়, এই আঠারো বছরে একটা পয়সা রোজগার করিনি, চেষ্টাও করিনি। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি, একথা যে সত্যি পাহাড়-পর্বতে

গেলে বোঝা যায়। দেখুন না, বেঁচে তো আছি। আমি যে-সব পাহাড়ে গেছি, তার কোনো কোনো জায়গায় পাহাড়ীরা এখনো পয়সার মুখ দেখেনি, তবু তারাও তো বেঁচে থাকে!

–কিন্তু তারা কাজ করে নিশ্চয়ই। খেতে ফসল ফলায়, পশু পালন করে।

–অনেকে আবার তাও করে না। প্রকৃতি তাদের দেয়। ধওলাগিরিতে একটা ঝোরা আছে, বুঝলেন, তার জল খেলে খিদেও মেটে, তেষ্টাও মেটে। বিশ্বাস করুন আমার কথা। তারপর ধরুন, ব্রহ্মকমল ফুলের নাম শুনেছেন? সে ফুলের দিকে একবার তাকালে সারা দিন খাওয়া-দাওয়ার কথা একবারও মনেও পড়ে না। ওখানে বাতাসে কিছু একটা আছে, বুঝলেন!

–আপনার দাড়ি-টাড়ি ছিল, সরল পাহাড়ীরা আপনাকে সাধু মনে করে ভিক্ষে দিত, এটাই। আসল কথা। না খেয়ে মানুষ বাঁচে না!

–হা-হা-হা! আপনি বিশ্বাস না করলে আমি কী করি বলুন? হ্যাঁ, দিয়েছে, পাহাড়ীরা খাবার দিয়েছে, ভিক্ষে নয়, ভালোবাসার দান। কখনো কিছু চাইনি। এই যে প্যান্টুলুন আর জামা দেখছেন, এক সাহেব দিয়েছে। এমনিই! আবার অনেক সময় নেংটি পরে থেকেছি, শীত লাগেনি। একবার টানা এক পক্ষকাল কিছু পাইনি, শুধু জল, তাতেও শরীর শুকিয়ে যায়নি। বেশ মজাসে ছিলুম।

–এত মজা ছেড়ে তা হলে ফিরে এলেন কেন এই নরককুণ্ডে! দেশটার অবস্থা কী হয়েছে তা তো জানেন না!

মায়া, বুঝলেন, সবই মায়া। ফিরে এলুম মায়ার টানে। গাধার গায়ে সিংহের চামড়া জড়ালেই কি আর সে সিংহ হয়? সাধু সেজেছিলুম, কিন্তু প্রকৃত সাধু হতে পারলুম কই? এতকাল পরে হঠাৎ মায়ের জন্য মন টানলো। সে বুড়ি বেঁচে আছে কি না জানি না। তবু একবার তাকে দেখতে ইচ্ছে হলো। আপনি দেশটাকে নরককুণ্ড বললেন কেন?

-ক'দিন থাকুন, তারপর বুঝবেন!

-হয়তো আপনি ঠিকই বলেছেন। পাহাড় থেকে নিচে নামা ইস্তক গরমে চিটপিট করছে। গা। খিদেও পাচ্ছে যখন-তখন। কাল রাতে এক পেট খেয়েছি, আজ এর মধ্যেই আবার পেট চনমনাচ্ছে! নরকের লোকদেরই কখনো খিদে মেটে না!

আরও একটু পরে লোকটি একটি অবাস্তব প্রস্তাব দিল।

মেদিনীপুরের ট্রেন এসে দাঁড়াতে লোকটি প্রতাপের দিকে কাতরভাবে চেয়ে বললো, আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। যেখানে যাচ্ছেন, কদিন পরে যাবেন। একা এতদিন পরে বাড়ি ফিরতে আমার ভয় ভয় করছে।

অচেনা একজন মানুষের সঙ্গে গিয়ে তার বাড়িতে আশ্রয় নেবার ব্যাপারটা প্রতাপ উড়িয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। এসব তাঁর ধাতুতে নেই। লোকটিকে তিনি তুলে দিলেন মেদিনীপুরের কামরায়।

প্রতাপের ট্রেন আর একটু পরে আসবে। আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসলেন। লোকটিকে তাঁর বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। এই দুনিয়ায় কত রকম মানুষ আছে। সবাই জীবনের প্রতিযোগিতায় নামে না। কেউ কেউ প্রথমেই দান ছেড়ে দেয়। সংসার থেকে যারা বিবাগী হয়ে যায়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ফিরেও আসে।

আঠারো বছর বাদে মেদিনীপুরের এক গ্রামে ফিরে গিয়ে লোকটি কী দেখবে? তবু তো ওর ফিরে যাবার একটা জায়গা আছে।

লোকটির দুটি কথা প্রতাপের মনের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরতে লাগলো। হিমালয়ে গেলে সত্যি খিদে দমন করা যায়? খিদের জন্যই তো সব! অন্তত এখানে তাই মনে হয়। হিমালয় থেকে কত নিচে এই বাংলা, তাই এখানে সর্বক্ষণ নরকবাসীদের মতন খিদের

হাহাকার! পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে কে না এখানে নরক দেখেছে! এখনই বা সেই অবস্থা কতটা পাল্টেছে? প্রতাপকে পালাতে হলে এখান থেকে অনেক দূরে পালাতে হবে।

পাহাড়ে পাহাড়ে অনির্বচনীয় সুখ পেয়েও লোকটা এতদিন পর ফিরে এলো মাকে দেখবার জন্য। মাতৃ-টান! কথাটা শোনার পর থেকে প্রতাপের মনে পড়ছে নিজের মায়ের কথা। মা যেন একটি শিশু। প্রতাপ সম্পর্কে কোনো দুঃসংবাদ শুনলে সুহাসিনী যে কী করবেন তার। কোনো ঠিক নেই।

কাশী নয়, প্রতাপকে আগে যেতে হবে দেওঘর।

২৮ কলকাতার ভদ্রলোকদের বাড়িতে ঝি-চাকর

কলকাতার ভদ্রলোকদের বাড়িতে ঝি-চাকররা আসে বস্তি থেকে। আগে প্রত্যেক যৌথ পরিবারেই একজন-দু'জন স্থায়ী রাঁধুনী বা দাস-দাসী থাকতো। অনেকে দেশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতো কাজের লোক। এখন যৌথ পরিবারগুলো ভাঙছে, ভাড়া বাড়ির দু' আড়াইখানা ঘরের ছোট সংসারে ঝি-চাকরদের শোওয়ার জায়গা দেওয়া যায় না, খাই খরচও অনেক পড়ে যায়, তাই এখন ঠিকে নোক রাখাই সুবিধেজনক। এই ঠিকে লোকদের চাহিদা মেটাতে আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে শহরের বস্তিগুলো। নগরপালকদের সেদিকে হুঁস নেই।

সম্প্রতি অবশ্য রিফিউজি কলোনিগুলি থেকেও ঝি-চাকরের যোগান হচ্ছে বেশ। এই রিফিউজিরা এক সময় নানারকম বৃত্তিতে নিযুক্ত স্বাধীন সংসারী ছিল, দেশান্তরী হয়ে ভিক্ষুক বা ঝি-চাকর হতে প্রথম প্রথম তাদের আত্মসম্মানে বেঁধেছে। কিন্তু খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। আস্তে আস্তে তাদের নামতে হলো পথে। যে-কোনো কাজ, যত কম মজুরিতেই হোক, তা আঁকড়ে ধরার জন্য এগিয়ে গেল শত-সহস্র হাত। পূজারী বামুনের ছেলে মোট

বইতে লাগলো বাজারে, চাষীর বউ হোটেলে বাসন মাজতে যায়। যুবতী মেয়েরা কেউ কেউ নার্সের কাজ করার নামে দুপুরে কলোনি থেকে বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাতে।

কলকাতার উত্তরে আর দক্ষিণে এখন শত শত জবরদখল কলোনি। তারা সকলে মিলে। সঙ্ঘবদ্ধ হলে একটা বড় রকমের শক্তিতে পরিণত হতে পারতো, কিন্তু সেরকম নেতৃত্ব দেবার কেউ নেই।

হারীত মন্ডল পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পর তার স্ত্রী পারুলবালাকে বাধ্য হয়ে কাজ নিতে হলো এক বাড়িতে। ঠিক ঝি-গিরি নয়, তিনটি বাচ্চাকে দেখাশুনো করা, এ দেশে বলে আয়ার কাজ। গৃহকত্রী বেশ সহৃদয়া, তিনি প্রায়ই হাঁপানিতে ভোগেন, শরীর খুবই দুর্বল, কিন্তু মুখের কথা খুব মিষ্টি। যখন তাঁর হাঁপানির টান কম থাকে তখন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পারুলবালার জীবনকাহিনী জানতে চান। শুধু কৌতূহল নয়, আন্তরিক সমবেদনার সুরও ফুটে ওঠে তাঁর কথায়। গৃহকত্রীর নাম প্রীতিলতা, তিনি কখনো পূর্ববঙ্গ দেখেননি।

পূর্বজন্মের স্মৃতির মতন পারুলবালা শুধু ফেলে আসা দেশের গল্পই শোনায়। জবর-দখল। কলোনির কথা শুনতে এদেশের অনেকেই পছন্দ করে না। তাছাড়া পারুলবালার স্বামী খুনের অভিযোগে জেল খাটছে, এ খবর জানাজানি হলে চাকরি থাকবে না হয়তো!

হারীত মণ্ডলের ছেলে-মেয়ে তিনটি। তার মধ্যে বড় ছেলে সুচরিতের মাথা খুব পরিষ্কার। খুব বাচ্চা বয়স থেকেই সে মুখে মুখে বেশ শক্ত শক্ত অঙ্ক কষে দিতে পারতো। কাশীপুরের একটি স্কুলে তাকে ভর্তি করানো হয়েছে এবং অ্যানুয়াল পরীক্ষায় সে থার্ড হয়েছে।

কিন্তু স্কুলটি জুনিয়র হাইস্কুল, ক্লাস এইটের বেশি নেই। সুচরিতকে এবারে বড় ইস্কুলে যেতে হবে। হারীত মণ্ডল পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পর পাড়ার একজন নেতাগোছের ব্যক্তি পারুলবালার কাছে সমবেদনা জানিয়ে সুচরিতকে নিজের বাড়িতে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল। অর্থাৎ বিনা মাইনেতে চাকরের কাজ। সুচরিত কিছুতেই যেতে চায়নি, সে আরও পড়তে চায়। কিন্তু নতুন ইস্কুলে যাওয়া মানেই ভর্তির টাকা, মাইনে, বইপত্র কেনার

খরচ। রিফিউজি ছাত্রদের জন্য সরকার কিছু কিছু বৃত্তির কথা ঘোষণা করেছেন বটে, কিন্তু চিঠিপত্র লিখে সেসব জোগাড় করা ঝঞ্ঝাটের কম কাজ নয়। জবরদখল কলোনির অনেকে এখনো বৈধ রিফিউজি। সার্টিফিকেটের কাগজই পায়নি!

স্কুলে যেতে পারছে না বলে সুচরিত কান্নাকাটি করে, সেই জন্য পারুলবালা একদিন সঙ্কুচিতভাবে তার মনিবপত্নীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানালো। প্রীতিলতার বয়েস কম হলেও পারুলবালা তাকে বৌদি বলে ডাকে।

প্রীতিলতার স্বামী অসমঞ্জ রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজির অধ্যাপক। কয়েকটি বাজার-চলতি স্কুল কলেজের নোট বই লিখে তিনি বেশ টাকাকড়ি করেছেন। নানান সভা-সমিতির সঙ্গেও যোগ আছে, বেশ ব্যস্ত মানুষ। ‘

প্রীতিলতার কাছে প্রস্তাবটি শুনে অসমঞ্জ রায় বললেন, দ্যাখো, রিফিউজিদের জন্য আমাদের পক্ষে যার যতটা সম্ভব সাহায্য করা উচিত, এটা আমি মানি। আমি সেরকম চেষ্টাও করেছি। কয়েকবার। কিন্তু ওরা বড্ড ঝামেলা করে। নির্মল বলে সেই ছেলেটাকে তো তুমিই জুটিয়েছিলে, মনে নেই।

প্রীতিলতা বললেন, হ্যাঁ, তার কী হয়েছে? সে তো চাকরি বাকরি পেয়ে ভালোই আছে শুনেছি?

অসমঞ্জ রায় বিরক্ত ভাবে বললেন, হ্যাঁ, সে তো ভালোই আছে। কিন্তু আমাদের বিজয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত! বিজয় আমাকে বলে, তুমি আমার গলায় এমন কাঁটা গেলালে

–কী করেছে নির্মল?

–খেতে পাচ্ছে না বলে তোমার পায়ে কেঁদে পড়েছিল। ছেলেটি দেখতে শুনতে ভালো, তুমি অমনি দয়ায় গলে জল হয়ে গেলে। কিন্তু ছেলেটি যে জাতে বামুন, তুমি তা জানতে?

–হ্যাঁ, জানতুম তো। বামুন হওয়ার দোষ কী হয়েছে?

–তুমি জানলেও সে কথা আমাকে বলোনি। ছেলেটি যে-কোনো একটা কাজ চেয়েছিল। লেখাপড়া তো ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। আমি বিজয়কে বলে ওর অফিসে ঢুকিয়ে দিলুম। মার্চেন্ট অফিস, মাইনে খারাপ নয়, পার্মানেন্ট হলে বোনাস পাবে...।

–ও তো পার্মানেন্ট হবার পর আমাদের এক বাক্স সন্দেশ দিয়ে গিয়েছিল।

–হ্যাঁ, পার্মানেন্ট হবার আগে মা-বেচারা সেজে ছিল, তারপরেই কুলোপানা চক্কর বার করেছে! এখন সব সময় ফোঁসফুঁসিয়ে ভয় দেখায়।

–তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে?

–আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে কেন? আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক? আমাকে দেখলে বিগলিতভাবে হাসে। কিন্তু বিজয়ের হাড় জ্বালাচ্ছে। ক্লাস সিক্স অবধি বিদ্যে, ও আর কী চাকরি পাবে, বিজয় ওকে বেয়ারার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। অফিসের বেয়ারারা কী করে, কাজ খুব হাল্কা। বসেই তো থাকে বেশিরভাগ সময়। মাঝে মাঝে ফাঁইলপত্তর আনতে হয়, বাবুদের জল-দেওয়া, টিফিন আনা, এই তো! তা তোমার ঐ নির্মল এখন বলে যে, ও বাবুদের এটো জলের গেলাস ধুতে পারবে না, কারণ ও ব্রাহ্মণ! বাবুদের জন্য টিফিন এনে দেবে। কিন্তু এ টেবিল থেকে এটো শালপাতা তুলবে না, চা এনে দেবে কিন্তু খালি কাপ নিয়ে যাবে না, কী আবদার বলো তো!

প্রীতিলতার ব্রাহ্মণদের বিষয়ে সংস্কার আছে। সহসা কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর বাপের বাড়িতে তিনি ব্রাহ্মণ অতিথিদের পা ধুইয়ে দিতে দেখেছেন ছেলেবেলায়। তাঁর মা এক বাচ্চা পুরুতের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন।

অসমঞ্জ রায় বললেন, ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল এক সময় লেখাপড়ার চর্চা করা। যে লেখাপড়া শেখেনি, সে আবার বামুন কিসে?

প্রীতিলতা বললেন, অফিসের লোকরাই বা কেমন! নিজেদের এঁটো গেলাস বা কাপ-ডিস নিজেরা ধুয়ে নিতে পারে না?

–দ্যাখো, এতকাল ধরে একটা ব্যবস্থা চলে আসছে, অফিসের বেয়ারারাই এসব কাজ করে। এখন এই সার্ভিস না পেলে কেরানিবাবুরা বিরক্ত হবেই। তারা বিজয়ের কাছে নালিশ করে।

–বিজয়বাবু তো নির্মলকে অন্য একটা কাজ দিলেই পারেন!

–কী কাজ দেবে? ঐ নির্মল আবার নাকি ইউনিয়নের পাণ্ডা হয়েছে, কমুনিস্টদের মতন কথাবার্তা বলে। একদিকে বামুন আর এক দিকে কমুনিস্ট, বোঝে ঠ্যালা! বিজয়ের হাড় ভাজাভাজা করে তুলেছে! আর কারুর জন্য আমি চাকরি জোগাড় করতে পারবো না। বিজয় বলেছে, এর পর থেকে ওর অফিসে আর বাঙালীই নেবে না।

–কিন্তু পারুলের ছেলে তো চাকরি চায় না, পড়াশুনো করতে চায়।

অসমঞ্জ রায় ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। যদিও ছুটির দিন তবু দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরই তাঁর বেরুবার কথা আছে। রেড ক্রসের মিটিং, তিনি আঞ্চলিক শাখার সভাপতি।

–পড়শুনো করতে চায় তো করুক। তার জন্য আমি কী করবো? সে কি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চায় নাকি?

–না, ইস্কুলের ছাত্র।

–টাকা চায়?

–না, ক্লাস নাইনে ভর্তি হবে, তোমার তো অনেক চেনাশুনো, তুমি যদি ফ্রি করে দিতে পারো, আর রিফিউজিদের জন্য কী সব টাকা পাওয়া যায়, যদি ব্যবস্থা করে দাও..

চোখ থেকে চশমাটা খুলে অসমঞ্জ রায় মুখ মুছলেন। তারপর বললেন, দ্যাখো, আমি লেখাপড়ার লাইনের মানুষ। কেউ যদি সত্যি সত্যি পড়াশুনো করতে চায়, আমি তাকে সবরকম সাহায্য করতে পারি। কিন্তু রিফিউজি কলোনিতে থেকে কতদূর লেখাপড়া হবে? আসলে ওরা কী চায়, ভালো করে বুঝে দ্যাখো। মনে তো হচ্ছে, ছেলেটিকে গছাতে চায় আমাদের বাড়িতে। কিন্তু আমি বাড়িতে পুরুষ চাকরও রাখতে চাই না।

অসমঞ্জ রায়ের এই কথা বলার কারণ আছে। পুরুষ চাকর সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা খুবই মন্দ। একবার একজন এ বাড়ি থেকে ঘড়ি-রেডিও সব চুরি করে পালিয়েছে। আর একবার। একজন জোয়ান ভৃত্যের সঙ্গে তাঁর বিধবা বোনের একটা অসৎ সম্পর্কের আভাস পাওয়া। গিয়েছিল। সেই বিধবা বোন এখনও এ বাড়িতেই থাকে, তার মাথায় ঈষৎ গণ্ডগোল আছে।

তবু প্রীতিলতার অনুরোধে তিনি পরদিন পারুলের ছেলের সঙ্গে একবার অন্তত কথা বলতে সম্মত হলেন।

সকালবেলা চা-জলখাবারের পর বসবার ঘরে শুরু হলো ইন্টারভিউ। পারুলবালা সুচরিতের হাত ধরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অসমঞ্জ রায় এই প্রথম তাঁর ছেলেমেয়ের আয়াকে দেখলেন ভালো করে। পারুলবালার শরীরে বা মুখে কোনো দৈন্যের ছাপ নেই, নিচু ঘরের স্ত্রীলোক মনে হয় না, তার দৃষ্টিতেই আত্মসম্মানবোধ স্পষ্ট। পরনের শাড়িখানা দু'এক জায়গায় সেলাই করা হলেও পরিষ্কার। অসমঞ্জ রায় যেন ঠিক এরকম ভাবেননি। সুচরিতের স্বাস্থ্য ভালো নয়, সে রোগা ও লম্বাটে, দেখলেই বোঝা যায় লাজুক স্বভাবের।

অসমঞ্জ রায় দু'জনকেই একটুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি পারুলবালাকে বললেন, ঠিক। আছে, বাছা, তুমি ভেতরে কাজে যাও, আমি শুধু তোমার ছেলের সঙ্গে কথা বলবো।

তারপর তিনি সুচরিতের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐ কোণে ঐ যে টেবিল-চেয়ার আছে, ওখানে বসো। দ্যাখো, ওখানে কাগজ-পেন্সিল আছে। আমি ডিকটেশন দিচ্ছি, লেখো?

তিনি হাতের স্টেটসম্যান পত্রিকাটি খুলে প্রথম সম্পাদকীয়র অর্ধেকটা শুতি লিখন দিলেন। তারপর বললেন, এটা ভালো করে পড়ে, বুঝে বাংলা অনুবাদ করে আমাকে দেখাও। কুড়ি। মিনিট সময়।

ঠিক কুড়ি মিনিট বাদে তিনি খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, কই দেখি!

সুচরিত তখনও কাটাকুটি করে লিখে যাচ্ছিল, তিনি উঠে এসে বললেন, যা হয়েছে সেটাই দেখাও!

স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়-লেখকগণ যদি একটি ক্লাস এইটের রিফিউজি বালকের পক্ষে সুবোধ্য ইংরিজি লেখে, তা হলে তাদের চাকরি যাবার কথা। অসমঞ্জ রায় ইচ্ছে করেই কঠিন পরীক্ষা নিচ্ছেন।

সুচরিত কোনো সাংঘাতিক প্রতিভাবান কিশোর নয়। ইংরিজির বদলে অঙ্কের পরীক্ষা নিলে সে বেশি স্বস্তি বোধ করতো। তার লেখায় অনেকগুলি বানান ভুল, বেশ কয়েকটি ইংরিজি শব্দের সে মানে বুঝতে পারেনি, তবু সে মোটামুটি একটা বাংলা অনুবাদ খাড়া করেছে।

অসমঞ্জ রায় চশমার ফাঁক দিয়ে ছেলেটিকে আবার দেখলেন ভালো করে। অনেক বছর ধরে তিনি ছাত্র চরাচ্ছেন, মুখ দেখলেই তিনি অনেকটা বুঝতে পারেন।

তিনি বললেন, ঠিক আছে, এতেই হবে। শোনো, তুমি যদি মন দিয়ে লেখাপড়া করতে চাও, আমার কাছ থেকে সবরকম সাহায্যই পাবে। একেবারে এম এ পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা করে। দেবো। আর যদি ফাঁকি মারো, তা হলে আমার কাছে কোনো দয়া নেই। এ দেশে

ঢের ঢের অপগণ্ড ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না। বুঝলে? মুখ নিচু করে আছো কেন? তাকাও আমার দিকে। রিফিউজি ছেলেদের বাঁচার একমাত্র উপায় এখানকার ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়ায় কমপিট করা–।

অসমঞ্জ রায়ের বক্তৃতার মাঝ পথে কয়েকজন বাইরের লোক এসে পড়লো। দু'জন পুরুষ, একজন মহিলা। তাদের দেখে অসমঞ্জ রায় স্পষ্টত খুশি হয়ে উঠলেন, চেয়ার ছেড়ে উঠে। দাঁড়িয়ে তিনি আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বললেন, আরে, এসো, এসো!

অতিথিদের তিনি পাশের সোফা-সেটটিতে বসিয়ে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। যুবতীটি হাতের একটি ফাঁইল খুলে বললো, আমরা দুটো নতুন প্রজেক্ট নিয়েছি, সেই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই..।

পুরুষ দু'জন প্যান্ট-শার্ট পরা, তাদের তুলনায় যুবতীটি বেশি সপ্রতিভ। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, সে-ই কথা বলছে বেশি, পুরুষ দু'জন হা হা করে যাচ্ছে। এরা স্থানীয় একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, আন্তজাতিক দু'একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে ধুবুলিয়া। উদ্বাস্তু শিবিরে হাতের কাজ শিক্ষা, তাঁত চালানো ইত্যাদি পরিকল্পনা চালু করতে চায়।

অসমঞ্জ রায় অবশ্য অন্য দুটি পুরুষের মতন এই উজ্জ্বল-আনো যুবতীটির সব কথা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেন না, তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, হ্যাঁ, ভেবে দেখতে হবে, সব দিক ভেবে দেখতে হবে, ওভারহেড খরচ কত হবে, সেটা ঠিক করতে হবে আগে, তারও আগে একবার সাইটে যেতে হবে।

যুবতীটি বললো, চলুন, আজই চলুন, এখনই বেরিয়ে পড়া যেতে পারে, আমাদের সঙ্গে জিপ আছে।

হুট করে কারুর কোনো কথায় রাজি হওয়া বোধ হয় অসমঞ্জ রায়ের স্বভাবে নেই। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আজ হবে না। তারপর চোখ বুজে একটু চিন্তা করে বললেন, পরশু হতে পারে।

অন্য যুবকদের একজন বললো, উইক ডেইজের মধ্যে গেলে আমাদের একটু অসুবিধে আছে।

যুবতীটি বললো, আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমি ফ্রি আছি।

অসমঞ্জ রায় বললেন, তা হলে চন্দ্রা, তুমি আর আমিই পরশু গিয়ে একবার দেখে আসি। ওরা হয় পরে যাবে।

ঢ্যাঙা বালকটি দাঁড়িয়ে আছে ঘরের এক কোণে। সুচরিতকে কেউ চলে যেতে বলেনি। তাকে কেউ লক্ষও করছে না। কিন্তু সুচরিত প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। চন্দ্রানাম্নী যুবতীটির মতন কোনো নারীকে সে আগে দেখেনি। চন্দ্রার পরনে একটা হালকা হলুদ শাড়ি, সেই রঙেরই ব্লাউজ, ব্লাউজের হাতায় জরির কাজ। সেই জরি যেন তার ফসা বাহু কামড়ে ধরে আছে। চন্দ্রার চুল খুব যত্ন করে বাঁধা। এক একজন নারীর শরীর যেন তার পোশাক থেকে খানিকটা উপছে বেরিয়ে আসে, চন্দ্রারও সেরকম। চন্দ্রার ঠোঁটে রং, সে সিগারেট খায়।

সুচরিত এ পর্যন্ত দেখে এসেছে যে পুরুষরা বড়, মেয়েরা ছোট। পুরুষরা দরকারি কথা বলে, মেয়েরা শোনে। মেয়েরা মাঝে মাঝেই ঝগড়া করে বটে, কিন্তু পুরুষদের মতন হুকুমের সুরে কথা বলতে জানে না। কিন্তু চন্দ্রা এখানে মধ্যমণি, সে কথা বলছে, অন্যরা শুনছে। অসমঞ্জ রায়ের মতন ইংরিজি জানা মানুষকেও সে মাঝে মাঝে আঙুল তুলে বোঝাচ্ছে কোনো কোনো কথা। ইংরিজি বলছে ফরফর করে। একবার সে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করতেই অসমঞ্জ রায়ের মতন রাসরি মানুষ নিজে দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিল! এক বালকের মনোজগতে এ এক সম্পূর্ণ নতুন চরিত্রের আবির্ভাব।

এক সময় অসমঞ্জ রায় তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, এই, ইয়ে, তোমার কী নাম যেন, ভেতরে গিয়ে বলো তো চার কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।

সুচরিত বাড়ির মধ্যে ঢুকে তার মাকে খুঁজে সেই কথা জানালো, তারপর আবার ঐ ঘরে ফিরে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলো দেয়াল ঘেঁষে। সে সব কিছু দেখতে ও শুনতে চায়।

চা-পান ও অন্যান্য কথাবার্তা শেষ করার পর ঐ তিনজন যখন বিদায় নিচ্ছে, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে অসমঞ্জ রায় বললেন, চন্দ্রা, একটু শোনো, ফাঁইলগুলো আমার কাছেই রেখে যাও, আমি এর মধ্যে ভালো করে পড়ে রাখব।

যুবক দু'জন বাইরে, চন্দ্রা আবার ঘরের মধ্যে এসে ফাঁইলগুলো খুলে কী সব বোঝালো।

অসমঞ্জ রায় চার কাঁধে হাত রেখে গাঢ় গলায় বললেন, তা হলে, পরশু?

চন্দ্রা মুখ তুলে, তার হাসিতে অনেকখানি কিরণ ছড়িয়ে বললো, হ্যাঁ, ঠিক রইলো...

এই সময় চন্দ্রা এক পলক দেখলো সুচরিতকে। গ্রাহ্য করলো না। বালক হলেও সুচরিত বুঝতে পারলো, সমাজ সেবা ছাড়াও এই দু'জন নারী-পুরুষের মধ্যে অন্য কোনো বন্ধন আছে।

ওরা চলে যাবার পর অসমঞ্জ রায় ফিরে এসে সোফায় বসে এক মনে সিগারেট টানতে লাগলেন। তিনি কোনো গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সুচরিতের কথা তাঁর মনে নেই। সুচরিতও নিজে থেকে কিছু বলতে পারছে না।

খানিকবাদে একটা কিছু শব্দ পেয়ে অসমঞ্জ রায় মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, এই, তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোর সঙ্গে তো কথা হয়ে গেছে?

সুচরিত ভয়ে ভয়ে বললো, আমি কোন্ ইস্কুলে পড়বো?

–ভর্তি করে দেবো, এ পাড়ায় যেটা ভালো স্কুল...

–কবে ভর্তি হবে?

–তোরা থাকিস কোথায়?

–কাশীপুরে, সেভেন ট্যাঙ্কস লেনের কাছে।

–ঠিক আছে, ওর কাছাকাছি কোনো স্কুল দেখতে হবে। তোর বাবা-বাবা আছে তো?

সুচরিত মাথা নাড়লো।

–কাল তোর বাবাকে পাঠিয়ে দিস। আমি সব লিখেটিখে দেবো!

সুচরিত কয়েক মুহূর্ত মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

–বললুম তো, তোর বাবাকে পাঠিয়ে দিস। এখন যা।

–বাবা আসতে পারবে না। বাবা এখানে নেই।

–তোর বাবা কোথায়? দেশেই থেকে গেছে?

–আমাকে যদি লিখে দ্যান, আমি নিজেই ভর্তি হতে পারবো!

–তোর বাবা কোথায়? এবারে মুখ তুলে সে অসম রায়ের দিকে সেজাসুজি তাকালো। তারপর বললো, আমার বাবার নাম হারীত মণ্ডল। সে এখন জেলে।

রিফিউজি কলোনিগুলির বাইরে হারীত মণ্ডল কোনো বিখ্যাত লোক নয়। সুচরিতের ধারণা, তার বাবার নাম খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, তাই সবাই নাম শুনেই চিনতে পারবে। কিন্তু অসমঞ্জ রায়ের মনে কোনো দাগ কাটলো না।

তিনি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে তারপর বললেন, তুই ভেতরে যা। তোর মাকে পাঠিয়ে দে।

পারুলবালাকে নিয়ে সুচরিত আবার ফিরে এলো। অসমঞ্জ রায় এবারে খানিকটা ধমক দিয়ে বললেন, শুধু তোর মাকে আসতে বলেছি! তুই যা, গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়া!

অসমঞ্জ রায়ের পত্নী অনেকদিন ধরে রুগ্না বলে তিনি যে-কোনো স্বাস্থ্যবতী রমণীর সর্বাঙ্গ চোখ বুলিয়ে দেখতে ভালোবাসেন। সেইভাবে পারুলবালাকে আবার দেখে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, শোনো বাছা, তোমার স্বামী যে জেল-খাটা আসামী তা আমরা জানতুম না। তোমার ছেলে যে এক কথায় তা স্বীকার করেছে, লুকোবার চেষ্টা করেনি, তাতে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু ছেলের মুখে তার বাপের পাপের কথা আমি শুনতে চাই না। তুমিই বলো, কী করেছে। তোমার স্বামী? চুরি, ডাকাতি?

পারুলবালা কোনো উত্তর দিতে পারলো না। হঠাৎ কান্না এসে বুজিয়ে দিল তার কণ্ঠস্বর। কিন্তু অন্যের সামনে কাঁদাও তার স্বভাব নয়। সে মুখটা ফিরিয়ে নিল একপাশে, তার শরীর কাঁপতে লাগলো।

২৯ প্রীতিলতার হাঁপানির টান বেড়েছে

প্রীতিলতার হাঁপানির টান বেড়েছে, ঘুমের ওষুধ খেয়েও রাত্তিরে তাঁর ঘুম আসছে না। অধ্যাপক অসমঞ্জ রায়ও রাত জেগে পড়াশুনো করছেন। ছেলেমেয়েরা অন্য ঘরে শোয়, অনেক রাত, এখন তারা কেউ জেগে নেই। মস্ত বড় পালঙ্কটার এক কোণে কুঁকড়ে রয়েছে প্রীতিলতার ছোট্ট শরীরটা, তাঁর পাশে বিরাট শূন্যতা।

শোওয়ার ঘরে একটা ছোট-টেবিল রয়েছে। প্রীতিলতার যাতে চোখে আলো না পড়ে সেইজন্য একটা টেল ল্যাম্প জ্বেলে নিয়েছেন অসমঞ্জ রায়। ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে এ বছর, সেই অনুযায়ী অসমঞ্জ রায়কেও তাঁর নোট বই পাল্টাতে

হবে, সীজন শুরু হতে আর দেরি নেই, তাই তাঁকে রাত জেগে কাজ করতে হচ্ছে। প্রকাশক তাড়া দিচ্ছে রোজ।

লিখতে লিখতে একবার তিনি তাকালেন স্ত্রীর দিকে। সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে প্রীতিলতার বুকে। পৃথিবীতে এত বাতাস তবু প্রীতিলতার নিঃশ্বাস নিতে এত কষ্ট। অনেক চিকিৎসা করেও কোনোই সুফল হয় নি, ইদানীং সাধু-ফকিরদের শেকড়বাকড়ের পরীক্ষা চলছে।

প্রীতিলতার গলা দিয়ে একটা কান্নার মতন শব্দ হতেই অসমঞ্জ রায় উঠে এসে দাঁড়ালেন মাথার কাছে। প্রীতিলতার চোখ দুটি বোজা, অল্প অল্প শীতেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অসমঞ্জ রায় ভাবলেন, প্রতি বোধহয় স্বপ্ন দেখছে।

একটুক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। যেন অনেকদিন পর নিজের স্ত্রীকে দেখছেন। শুকিয়ে কতটুকু হয়ে গেছে শরীরটা, যেন চেনাই যায় না। বিয়ের সময় যারা প্রীতিলতাকে দেখেছে যেমন স্বাস্থ্য, তেমনই প্রাণ-প্রাচুর্য অসমঞ্জ রায়ের চোখেও সেই ছবিটাই লেগে আছে, তিনি প্রীতিকে সেইভাবেই মনে রাখতে চান। হঠাৎ তিনি গভীর মমতাবোধ করলেন স্ত্রীর জন্য। তিনি তাঁর ডান হাতটা আস্তে আস্তে রাখলেন প্রীতির কপালে।

প্রীতিলতা চোখ তুলে তাকাতেই তিনি নরমভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কষ্ট হচ্ছে, প্রীতি? কোনো ওষুধ দেবো?

প্রীতিলতা নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন দু'দিকে।

হাঁপানির চিকিৎসা বড় বড় ডাক্তাররাই করতে পারে না, স্বামীর হাতের ছোঁয়ায় আর কী এমন উপকার হবে! তবু কাজ অসমাপ্ত রেখে অসমঞ্জ রায় বিছানার ধার ঘেঁষে বসলেন। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে সারাদিনে প্রীতির সঙ্গে ভালো করে একটা দুটো কথা বলারও সময় পাওয়া যায় না। অথচ প্রীতিলতার সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকেই অসমঞ্জ রায়ের সৌভাগ্য ফিরেছে। আগে তিনি ছিলেন শহরতলীর কলেজের সামান্য একজন লেকচারার, প্রীতির বাবাই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সুযোগ করে দেন। প্রীতির বাবা ছিলেন

কন্ট্রোলার। নোট বই-এর প্রথম প্রকাশকের সঙ্গেও যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই। তাছাড়া, প্রীতির কাছ থেকে পেয়েছেন সব ব্যাপারে উৎসাহ।

–ঘুম আসছে না? তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো, প্রীতি?

প্রীতিলতা কোনো কথা না বলে স্থির ভাবে চেয়ে রইলেন।

একটু বাদে দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে চোখ গেল, অসমঞ্জ রায় ভাবলেন, বারো মিনিট বসা হয়েছে, এবারে বোধহয় উঠে পড়া যায়। কত কাজ, আজ রাত্তিরের মধ্যে একটা পীস্ শেষ করতেই হবে। তিনি প্রীতির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

তিনি ওঠবার আগেই প্রীতি হাত তুলে তাঁর হাত থামিয়ে দিয়ে অস্ফুটভাবে বললেন, এবারে তুমি শুয়ে পড়ো!

অসমঞ্জ রায় ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললেন, ওরে বাবা, খাটতে খাটতে কাঁধ ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। দেখি যদি আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শেষ করা যায়!

প্রীতিলতা আস্তে আস্তে বললেন, আমি যদি তুমি হতাম, তা হলে বোধহয় এইরকমই করতাম।

অসমঞ্জ রায় কথাটা ঠিক শুনতে বা বুঝতে পারলেন না। টান বেশি বাড়লে প্রীতির গলার আওয়াজটা ফ্যাসফেসে হয়ে যায়। একটা কীরকম যেন মেশিন চলার মতন শব্দ বেরোয়। তিনি মাথাটা ঝুঁকিয়ে প্রীতির মুখের কাছে এনে জিজ্ঞেস করলেন, কী বললে?

প্রীতিলতা ঠিক ঐ কথাটাই বললেন আবার। এবারে অসমঞ্জ রায় শুনতে পেলেও বুঝতে পারলেন না। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। কিন্তু কৌতুকের হাসি ফুটে উঠলো প্রীতিলতার ঠোঁটে।

–তুমি কী বললে? এই রকম মানে কী রকম?

–আমি তোমার মতন একজন ব্যস্ত পুরুষ মানুষ হলে অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতাম না।

অসমঞ্জ রায় সঙ্গে সঙ্গে তীব্রভাবে আহত বোধ করলেন। আজই তিনি জরুরি কাজের মাঝখানে উঠে এসে প্রীতির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, প্রীতিকে একটু সেবা করতে চাইলেন, আর আজই প্রীতির মুখে এই কথা? প্রীতি না ডাকতেই তো তিনি এসেছিলেন।

অভিমানের সঙ্গে তিনি বললেন, আমি বুঝি তোমায় খুব অযত্ন করি? আমাকে নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বটে...

প্রীতিলতা তাঁর স্বামীর বাহু ছুঁয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, না, না, তুমি আর কী করবে? তুমি তো যথেষ্ট করেছে। আমি পুরুষ মানুষ হলে বোধহয় এতটাও পারতাম না।

–এখন আর কথা বলো না। ঘুমোও। কথা বললে তোমার কষ্ট হবে।

–কথা না বললেও আমার একইরকম কষ্ট হয়।

–আমি তো তোমার চিকিৎসার কোনোরকম ত্রুটি করিনি!

–তা তো জানিই। আমার এ রোগ সারবে না। বোধহয় কোনো পাপ-টাপ করেছিলাম।

–ধ্যাৎ! ওসব বাজে কথা। একেবারে না সারলেও যদি খুব নিয়মে থাকো, তাহলে কষ্টটা কম হবে। ঘুমই হচ্ছে এই রোগের আসল ওষুধ!

অসমঞ্জ রায় উঠে দাঁড়াতেই প্রীতিলতা কাতরভাবে বললেন, এই, শোনো! আর একটুখানি বসবে? তোমার কাজের খুব ক্ষতি হবে?

অসমঞ্জ রায় আবার বসে পড়ে, মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, ক্ষতি আবার কী, আজ না হয়। কাল হবে। জগৎ হারামজাদা বড্ড তাড়া দিচ্ছে।

কথা থামিয়ে তিনি ঝুঁকে পড়ে অনেকদিন বাদে প্রীতিলতাকে একটা চুম্বন দিলেন। প্রীতিলতার ঠোঁট ঠাণ্ডা। তাতেও নিরস্ত না হয়ে অসমঞ্জ রায় প্রীতিলতার বুকে এক হাত রেখে আর এক হাতে ব্লাউজের বোতাম খুলতে গেলেন। তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে কালি লেগে। আছে। এই অবস্থাতেও তাঁর খেয়াল হলো যে তাঁর পেনটা লিক করছে। ওটা বদলাতে হবে। নতুন দেশি ফাউন্টেন পেন উঠেছে, একেবারে অপদার্থ!

প্রীতিলতা বললেন, আজ শুয়ে শুয়ে যতসব অদ্ভুত কথা ভাবছিলাম। ধরো, আমি যদি পুরুষ মানুষ হতাম, আর তুমি হতে আমার বউ! আমি বেশ ব্যস্ত, অনেক লোক আমায় চেনে, অনেক লোক খাতির করে, আর তুমি একটা হাঁপানির রুগী, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিনই বিছানায় শুয়ে থাকো আর ঘ্যান ঘ্যান করো, তা হলে আমি তোমায় শুধু মিষ্টি কথা বলে সান্ত্বনা দিয়ে তারপর অন্য মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতাম। অন্য কোনো মেয়েকে বেশি কাছে পেতে চাইতাম!

অসমঞ্জ রায়ের যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও এই সময় বিবর্ণ হয়ে গেল তাঁর মুখ। একটু আগে ছিল অভিমান, এখন জ্বলে উঠলো রাগ। প্রীতি এমন ঘুরিয়ে কথা বলতে শিখলো কবে থেকে? টিরানি অব দা উইক! দুর্বলের নিষ্ঠুর অত্যাচার। মেয়েরা অতি দুর্বল হলেও জহ্লাদিনী। হতে পারে। প্রতি জানে যে অসমঞ্জ রায় এখন বেশি রেগে তাকে কঠোর কথা বলতে পারবেন, হঠাৎ একটা থাপ্পড় কষাতে পারবেন না!

–আমি বুঝি অন্য মেয়েদের সঙ্গে...আমি কি তোমার জন্য যতদূর সাধ্য...

–না, না, না, তুমি সেরকম কিছু করেছে, তা বলছি না। কিন্তু আমি বোধহয় করতাম। তুমি ভালো, আমি অতটা ভালো নই!

–প্রীতি, তুমি ঠিক কী বলতে চাও, খুলে বলো তো! এইসব কথা কেন তোমার মনে আসছে?

–বলবো? না, থাক, আজ থাক!

–কেন, বলবে না কেন? যদি কিছু সত্যি সন্দেহ হয়ে থাকে তোমার তাহলে খুলে বলো!

–না, সন্দেহ আমার হয়নি। শুধু একটা ব্যাপার আমার মনে লেগেছে। তুমি চন্দ্রাকে–

–ওঃ, চন্দ্রা? তাই বলো!

অসমঞ্জ রায় কৃত্রিম ভাবে এমন জোরে হেসে উঠলেন যে পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা জেগে থাকলে শুনতে পেত! তখনো প্রীতিলতার ঘুমন্ত স্তনে তাঁর হাত।

হাসতে হাসতে অসমঞ্জ রায় বললেন, চন্দ্রাকে নিয়ে তোমার সন্দেহ? ওকে তো আমি মাত্র কয়েকদিন ধরে চিনি, এখনো দু'সপ্তাহও হয় নি। ওরা একটা চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশান খুলেছে, তাতে জোর করে প্রেসিডেন্ট করেছে আমাকে। আমি হতে চাইনি, কিন্তু ওরা একেবারে নাছোড়বান্দা!

–চন্দ্রা মেয়েটি আমাদের বাড়িতে আসে, আমার সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দাওনি একবারও।

–ও মেয়েটা তো পাগলের মতন। ঝড়ের বেগে আসে, হুড় হুড় করে কথা বলে যায়, নিজেই বেশি বলে, তারপর কাজের কথা শেষ হলেই চলে যায় সঙ্গে সঙ্গে!

–যারা কাজ করে, তারা বুঝি অন্য কথা বলে না? আমি তো একদিন জানতাম, বাড়িতে কোনো মেয়ে এলে তারা ভেতরে এসে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে।

–ঐ চন্দ্রা তো অন্যরকম। ঠিক বাঙালীদের মতন নয়। আপকান্ট্রিতে কোথায় নাকি ছিল, আমি ঠিক জানি না, মানে, বাঙালী আদপ কায়দা জানে না।

–চন্দ্রা সিগারেট খায়!

–সে আজকাল হাই সোসাইটির অনেকেই...মানে বাঙালীদের চেয়ে অবাঙালীরা আরও এক কাঠি এগিয়ে আছে। গত বছর বোম্বোতে যে কনফারেন্সে গেলুম, তাতে দেখি যে বেশ কয়েকজন মহিলা ফুক ফুক করে সিগারেট টানছে সবার সামনে। একজন তো আমাদের ভাইস চ্যান্সেলারের মুখের ওপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে...

প্রীতিলতা এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন স্বামীর দিকে। মনে হয় তিনি কিছু শুনছেন না। তাঁর মুখখানা লালচে হয়ে গেছে। একটা কাশির দমক চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। মাঝে মাঝে নিশ্বাস নিচ্ছেন হাঁ করে। প্রীতিলতার স্বভাব অত্যন্ত নরম, পৃথিবীকে তিনি খারাপ চোখে দেখেন।

–চন্দ্রা মেয়েটি ভালো। তুমি ওর সঙ্গে মিশতে পারো।

কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন অসমঞ্জ রায়। আজ প্রীতির ব্যবহারে তিনি শুধু আহত নন, বিস্মিতও হচ্ছেন যথেষ্ট। আজ কী ভর করেছে প্রীতির ওপর?

–ও, তোমার বুঝি নিজস্ব স্পাই আছে। তুমি এর মধ্যেই চন্দ্রা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছো?

–বাঃ, বাড়িতে একটা মেয়ে আসছে, তার সম্পর্কে কৌতূহল হবে না? শুনলাম তো, মেয়েটা গরিবদের জন্য সত্যিই অনেক কিছু করে!

–তা অবশ্য তুমি ঠিকই শুনেছো। ঐসব নিয়েই মেতে আছে। বিয়ের দু'বছর পরেই বিয়ে ভেঙে গেছে, বাচ্চাকাচ্চা কিছু হয় নি, কিন্তু আর পাঁচটা মেয়ের মতন ঘরে বন্দী না থেকে ও কাজ নিয়ে সব কিছু ভুলে থাকতে চায়।

প্রীতি মাথাটা একটু উঁচু করে সরল ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, যে-সব মেয়েরা দেশের সেবা করে, তারা কি সিগারেট খায়? হাতকাটা ব্লাউজ পরে? ঠোঁটে লিপস্টিক মাখে?

অসমঞ্জ রায় কপাল ঘোঁচ করে বললেন, ওসব তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা কেন তা। নিয়ে মাথা ঘামাবো? চন্দ্রার সঙ্গে আমার অত্যন্ত ফর্মাল সম্পর্ক, শুধু কাজের কথা হয়, আমাকে। দিয়ে ফাঁইলপত্তর সই করাতে আসে। তবে যারা দেশের কাজ করবে তাদের যে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকতে হবে, তারই বা কী মানে আছে! বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ছবি দেখো নি? নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা, তাকে আমি একবার সামনাসামনি দেখেছি, সে অবশ্য লিপস্টিক মাখে না, কিন্তু শাড়ীটা....

-তোমাকে চন্দ্রাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করলো কেন? তোমার সঙ্গে আগে থেকে চেনা। ছিল?

-আমি আগে চন্দ্রাকে দেখিইনি কোনোদিন! ওরা নিজেরাই এসে বললো, আমি রেড ক্রসের সঙ্গে যুক্ত আছি বলেই বোধহয়...তাছাড়া আমি দাঙ্গার সময় রিলিফের অনেক কাজ করেছি।

-আমি চন্দ্রাকে একটা চিঠি লিখবো ভাবছি।

অসমঞ্জ রায়ের মাথায় আচমকা যেন একটা কোনো ভারি বস্তুর আঘাত লাগলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য দিশেহারা হয়ে গেলেন। রোগা, দুর্বল, অসহায় প্রীতিলতা আজ এ কি সাঙ্ঘাতিক খেলা শুরু করেছে?

-তুমি চন্দ্রাকে চিঠি লিখবে? কেন? প্রীতি, তোমার মাথায় কী ঢুকেছে বলো তো!

-তেমন কিছু নয়, বিশ্বাস করো! নিছক একটা কৌতূহল। আমি জানতে চাই, আজকের ঘটনাটা শুনলে চন্দ্রার মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়! তোমার সম্পর্কে ওর ভক্তি বাড়বে, না কমবে!

–আজকের ঘটনা? তার মানে! কোন্ ঘটনা?

–তুমি পারুলের ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলে। পারুলকেও চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে এককথায়। ছেলেটা পড়াশুনো করতে চেয়েছিল।

–আঃ, তোমাকে তো তখন বললুম, এ ছেলেটার বাপটা একটা খুনী! হারীত মণ্ডলের কেসটা আমিও কাগজে পড়েছি। এখন জেলে আছে। তোমাকে ওরা সে কথা আগে। জানিয়েছিল?

–বাপ খুনী হলে ছেলে বুঝি আর লেখাপড়া করতে পারবে না? সেরকম নিয়ম আছে কোনো? তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ে, তাদের সবারই বাবা কে কী করে না করে তোমরা যাচাই করে নাও?

–তুমি বড় অবুঝের মতন কথা বলছো, প্রীতি! শুধু সে জন্য নয়। ঐ হারীত মণ্ডল কাকে খুন করেছে জানো? আমাদের সমুর খুড় শ্বশুরকে!

–সমুর খুড় শ্বশুর?

–আমার মামাতো ভাই সমু বরানগরের সরকার বাড়ির মেয়ে বিয়ে করেছে তুমি জানো না? সমুর বউ ফুলটুসীর আপন কাকা অসিতবরণ সরকার খুন হয়েছেন তাঁদের কাশীপুরের বাগানবাড়িতে। তাই নিয়ে কত কাণ্ড হলো।

প্রীতিলতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ফেরালেন। কী যেন চিন্তা করলেন একটু। তারপর আপন মনে বললেন, খুনীর ছেলে! কী জানি! আমার তো বেশ পছন্দ হয়েছিল ছেলেটিকে..সমুর শ্বশুরবাড়িতে কী হয়েছে না হয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? আমরা কী সাতজন্মে সে বাড়িতে যাই?

–এ তুমি অদ্ভুত কথা বলছে, প্রীতি। সমুর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, আমার নিজের মামার সঙ্গে তো সম্পর্ক রাখতে হবে! মামার কুটুমকে যে খুন করেছে....

অসমঞ্জ রায় ঝপ করে উঠে দাঁড়ালেন। রাগে তাঁর মুখ গনগন করছে। এনাফ ইজ এনা! এবারে তাঁকে স্বামী হিসেবে, সংসারের অধিপতি হিসেবে চরম অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করতে গেলে কখনো শেষ হয় না।

টেবিলের কাছে এসে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, কোনো খুনীর বউকে আমি বাড়িতে স্থান দিতে পারবো না, এই আমার শেষ কথা! রিফিউজিদের মধ্যে কত ক্রিমিনাল তৈরি হচ্ছে তুমি জানো না! রিফিউজি বলেই যে দয়ায় গলে গিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে, সেটা একটা ইডিয়টিক ধারণা!

প্রীতিলতা তবু মিনমিন করে বললেন, আমাকে না জিজ্ঞেস করেই তুমি পারুলকে ছাড়িয়ে দিলে, আমার ছেলেমেয়েদের এখন কে দেখবে?

–কালই আমি অন্য আয়া জোগাড় করে আনবো। এখন ঘুমোও, কিংবা চুপ করে থাকো। আমাকে কাজ করতে দাও!

সিগারেট ধরিয়ে অসমঞ্জ রায় কলম হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু মাথা গরম হয়ে গেছে, লেখা আসবে না। এক দৃষ্টে তিনি তাকিয়ে আছেন কাগজের দিকে। প্রীতির বাবার সঙ্গে কালই দেখা করতে হবে। প্রীতি কিছু বলার আগেই অসমঞ্জ রায় তাঁকে সব কিছু বুঝিয়ে বলবেন। প্রীতির বাবাকে তিনি এখনো ভয় পান। প্রীতির বাবা একবার বলেছিলেন, প্রীতিকে নিয়ে পুরী কিংবা গোপালপুর যেতে। প্রীতির ভাই-বোনেরা যদি কেউ নিয়ে যায়, অসমঞ্জ রায় সব খরচ দিতে রাজি আছেন।

দেওয়াল-ঘড়ির শব্দতেই শুধু টের পাওয়া যাচ্ছে রাত্রির নিস্তব্ধতা। এই লেখা আজ আর শেষ হবে না। মুখ ফিরিয়ে তিনি একবার দেখলেন প্রীতিলতাকে। চোখ বোজা থাকলেও

ঘুমোয় নি, বোঝা যায়। বাতাসের তরঙ্গে টের পাওয়া যায়। শয্যাশায়িনী হলেও সব ব্যাপারে প্রীতির স্পষ্ট মতামত আছে। প্রীতি এত সহজে হার মেনে নেবে না। অসমঞ্জ রায় হঠাৎ যেন গলায় একটা বিপদের গন্ধ পেলেন।

আবার উঠে এসে তিনি গাঢ় গলায় বললেন, প্রীতি, তুমি যদি চাও, আমি চন্দ্রার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না। ওদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পোস্ট থেকে আমি রেজিগনেশান। দেবো। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর অত সময় বা উৎসাহও আমার নেই!

প্রীতি কোনো সাড়া শব্দ করলেন না।

সে রাতে ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেললেও পরদিনই অসমঞ্জ রায় মতবদল করলেন। চন্দ্রার সঙ্গে তাঁর বাইরে যাবার কথা আছে। সেই কথা তাঁকে রাখতেই হবে।

চন্দ্রাদের বাড়ির নিজস্ব গাড়ি আছে। সেই গাড়িতেই যাওয়া হলো ধুবুলিয়ার দিকে। সামনে ড্রাইভার, পেছনে শুধু চন্দ্রা আর অসমঞ্জ রায়। চন্দ্রার পরনে আজ একটা নীল-ডুরে তাঁতের শাড়ি, চোখে সানগ্লাস। গাড়িতে ওঠার পর থেকেই অসমঞ্জ রায়ের বুক ধক ধক করছে। পঁয়তাল্লিশ বছরের অভিজ্ঞ পুরুষ তিনি, কিন্তু এরকম আগে কখনো হয়নি। চন্দ্রার শরীরটি যেন অয়স্কান্ত মণি দিয়ে গড়া। চন্দ্রার মুখের থেকে তিনি চোখ ফেরাতে পারছেন না। কপালে যা থাকে থাক, চন্দ্রার কাছ থেকে তিনি কিছুতেই দূরে সরে যেতে পারবেন না।

চন্দ্রা আজ প্রায় কোনো কথাই বলছে না। মুখোনি রেখাহীন। অসমঞ্জ রায়ের প্রশ্নে শুধু হুঁ না করে যাচ্ছে। চন্দ্রা একবার একটা সিগারেট প্যাকেট বার করতেই অসমঞ্জ রায় দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে চন্দ্রার গাল ছুঁয়ে দিলেন ইচ্ছে করে। তারপর উঠতি যুবার মতন কাঁপা গলায় বললেন, চন্দ্রা, আজকের দিনটা কী সুন্দর!

চন্দ্রা মুখটা একটু সরিয়ে নিয়ে পাশ ফিরে বললো, মিঃ রায়, আপনাকে একটা কথা বলবো বলবো করছিলুম। আপনার স্ত্রী আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।

অসমঞ্জরায় সেই মুহূর্তে এই অসহায় হয়ে গেলেন যে কোনো কথাই বলতে পারলেন না।

চন্দ্রা আবার বললো, তিনি কী লিখেছেন, আপনি জানেন নিশ্চয়ই! আমি কাশীপুর কলোনিতে গিয়ে ছেলেটিকে খুঁজে বার করেছি। হি ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট বয়। আপনি তাকে কোনো সাহায্য না করে তাড়িয়ে দিলেন কী করে? আপনি আপনার স্ত্রীর কোনো মতামতেরও মূল্য দেন না? আই এগ্রি উইথ হার যে আপনি এটা খুব অন্যায় কাজ করেছেন।

-কিন্তু চন্দ্রা, তুমি জানো না, ঐ ছেলেটার বাবা একজন খুনী!

-হ্যাঁ জানি। সব শুনেছি! তাতে কী হয়েছে। খুন করেছে, বেশ করেছে! ওরা অসহায়, ওদের কেউ জায়গা দেবে না, ওরা জোর করে কেড়ে নেবে, এটাই তো স্বাভাবিক! এরকম আরও অনেক খুন করতে হবে, আগুন জ্বালাতে হবে! বাগানবাড়ি জবর দখল করা কোনো অপরাধ? অন্য দেশ হলে ঐ হারীত মণ্ডল বীরের সম্মান পেত!!

চোখ থেকে রোদ-চশমা খুলে চন্দ্রা তীব্র চোখে তাকালো অসমঞ্জ রায়ের দিকে।

৩০ ট্রেনে আসবার সময়ে

ট্রেনে আসবার সময়েই প্রতাপের ক্ষোভ-উষ্মা অনেকটা কমে গেছে, আস্তে আস্তে জেগে উঠেছে লজ্জা ও আত্ম-ধিক্কার। কারুকে কিছু না জানিয়ে ভোর বেলা গৃহ ত্যাগ করাটা তার পক্ষে খুবই ছেলেমানুষীর কাজ হয়েছে, এটা তাঁকে মানায় না। বুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্যর মতন তাঁর মনে তো সংসার সম্পর্কে মায়া-জ্ঞান জন্মায়নি। প্রতাপের মনে একছিটেও ধর্মভাব বা অধ্যাত্ম আকর্ষণ নেই, বরং যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে অহংকার আছে। কিন্তু বউয়ের ওপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে পালানোটা কোন্ যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায়?

প্রতাপ একবার ভেবেছিলেন বর্ধমানে নেমে পড়ে বাড়ি ফিরে যাবেন। আদালত দু'দিন ছুটি আছে, সেদিকে অসুবিধে নেই। ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে, মমতাকে কারণটা ব্যাখ্যা করতে হবে। কী বলবেন মমতাকে? তার উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই বর্ধমান পেরিয়ে গেল।

সব মানুষের মধ্যেই একটি একচক্ষু হরিণ আছে। জীবনে মাঝে মাঝে এমন এক একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন সেদিকে কানা চোখটি ফিরিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, অন্তত কিছুক্ষণের। জন্য। প্রতাপ নিজেকে বোঝালেন যে মাকে যখন দেখার ইচ্ছে হয়েছে, তখন দু'এক দিনের জন্য দেওঘর ঘুরে আসাটাই যুক্তিসংগত। খবর না পেয়ে মমতা দুশ্চিন্তা করবে, তা করুক, বুঝুক যে প্রতাপ না থাকলে সংসারের কী অবস্থা হয়!

কিন্তু প্রতাপ অনেকদিন বাদে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন অথচ সঙ্গে কোনো জিনিসপত্র নেই, এরই বা কী ব্যাখ্যা দেবেন? প্রত্যেকবার দেওঘরে যাওয়ার সময় প্রতাপ অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড়, কলকাতার দই, আমের আচার, হিং-এর বড়ি, কাসুন্দি ইত্যাদি নিয়ে যান। স্টেশান থেকে কিছু কিনে নেবেন? ফেরার ভাড়া বিশ্বনাথের কাছ থেকে চাইতে হবে। প্রতাপ একবার ভাবলেন, কয়েকটা সোডার বোতল কিনে নিয়ে যাবেন, মা। সোডা খেতে ভালোবাসেন। কিন্তু হাতে আর কিছু নেই। বেডিং না, সুটকেস না, শুধু কয়েকটা। সোডার বোতল, এই অবস্থায় দেওঘরে উপস্থিত হওয়া, দৃশ্যটা ভাবতে প্রতাপের নিজেরই হাসি। পেয়ে গেল। ওস্তাদজী খুব ক্ষেপাবেন এই জন্য!

সারা রাস্তা প্রতাপ শুধু চা খেয়ে কাটালেন।

দেওঘরে এসে পৌঁছোলেন সন্ধের পর, সুহাসিনী ধাম তখন নিঝুম। বাড়িতে কেউ নেই। বিশ্বনাথ গুহ গেছেন গানের টিউশানি করতে। ভজন সিং জানালো যে মাইজীরা সব গেছেন সৎসঙ্গের আশ্রমে গান শুনতে। প্রতাপ এক হিসেবে খুশীই হলেন। তাঁর অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা দেবার ব্যাপারটা যত দেরিতে হয় ততই যেন সুবিধের।

বারান্দায় বসে তিনি ভজন সিং-এর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

সম্প্রতি সুহাসিনী ধামে কিছু মেরামতের কাজ হয়েছে, সামনের ভাঙা গেটটি বদলে গেছে, বাগানটির শ্রী ফিরেছে। তাতে খানিকটা বিস্মিত বোধ করলেন প্রতাপ। মায়ের জন্য মাসে মাসে পঁচাত্তর টাকা করে পাঠান প্রতাপ, তবু তাঁর আশঙ্কা ছিল গানের ইস্কুল চালিয়ে বিশ্বনাথ গুহর যা সামান্য রোজগার, তাতে তিনি এ সংসার বেশিদিন চালাতে পারবেন না। কিন্তু চলছে তো ঠিকই। বাড়ি মেরামত হওয়া মানে সচ্ছলতার লক্ষণ। ওস্তাদজী তো তা হলে বেশ তালেবর মানুষ।

গেটের সামনে একটা টাঙ্গা এসে থামলো। প্রতাপ ভাবলেন, মা ফিরে এসেছেন। মাকে দেখে প্রথম কী কথাটা বলবেন তা প্রতাপ এখনো ঠিক করতে পারেননি। "মা, হঠাৎ তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হলো, তাই ছুটে এলাম?" এ রকম আবেগময় বাক্য প্রতাপের চরিত্রে একেবারে মানায় না। "মা, স্বপ্ন দেখলাম, তুমি খুব অসুস্থ, তাই দেখতে এলাম তোমাকে?" মিথ্যে কথা প্রতাপের মুখে একেবারেই আসে না। তার চেয়ে মুচকি হেসে, "হঠাৎ এসে পড়লাম" বলাই অনেক ভালো। মা তো প্রতাপকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেনই, বেশি কিছু জানতে চাইবেন না।

গেটটা খোলাই ছিল, আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে এলেন একজন মহিলা,সঙ্গে একটি বালক। কাছাকাছি আসতেই প্রতাপের বুকটা ধক করে উঠলো। বুলা! প্রতাপ যেন সহসা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। বুলা এখনো দেওঘরে? আবার এসেছে?

এ যেন অবিশ্বাস্য এক কাহিনীর মতন। প্রতাপের দেওঘরে আসার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না এ সময়ে, হঠাৎ এসে পড়েছেন, বাড়িতে কেউ নেই, প্রথমেই দেখা হলো বুলার সঙ্গে? বুলাকে দেখে প্রতাপ পুলকিত হলেন না, রোমাঞ্চ বোধ করলেন না। বরং যেন ভয় ছড়িয়ে পড়লো তাঁর সর্বাঙ্গে। হ্যাঁ, ভয় ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যায়। ভয় এবং অপরাধবোধ। একদিন না একদিন মমতা এই ঘটনা ঠিকই জানতে পারবেন। বুলা সম্পর্কে মমতার মনে

একটা ঈষার কাঁটা গভীর ভাবে বিধে আছে। অকারণ ঈর্ষা। এই ঘটনা শুনলে মমতা নিশ্চিত ভাববেন যে বুলার জন্যই প্রতাপ হঠাৎ কলকাতা থেকে ছুটে এসেছেন দেওঘরে। নির্জন বাড়িতে বুলার সঙ্গে সময়-যাপন।

তেজস্বী পুরুষ হিসেবে পরিচিত প্রতাপ মজুমদার যেন কুঁকড়ে খানিকটা ছোট হয়ে গেলেন সেই মুহূর্তে।

বুলার হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, এ বাড়িতে সে প্রায়ই আসে। যখন তখন। বুলা পরে আছে একটা নীল রঙের শাড়ি, তার চোখে এখন চশমা, হাতে একটা ছোট্ট মাটির হাঁড়ি। প্রতাপকে বিশ্বনাথ হিসেবে ধরে নিয়ে বরান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বুলা বললো, ওস্তাদজী, সারা বাড়ি এত চুপচাপ কেন? ভজন সিং! সামনের আলো জ্বালোনি?

প্রতাপ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

ভজন সিং উত্তর দিল, কলকত্তাসে বড় দাদাবাবু এসেছেন!

আগেরবার বুলা তাঁর সঙ্গে একটাও কথা বলেননি, সে কথা প্রতাপ ভুলবেন কী করে? তিনি নজে থেকে আর বুলাকে কিছু বলবেন না। বুলার জীবনে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। এইটাই সত্য। প্রতাপ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধরালেন।

মাটির হাঁড়িটা ভজন সিং-এর হাতে দিয়ে বুলা বললো, এটা ভেতরে রাখো। মাইজী কোথায়? নেই? তুমি আলো জ্বেলে দাও।

প্রতাপ মনে মনে ভাবলেন, বুলা তাঁর মায়ের জন্য মিষ্টি-ফিষ্টি কিছু একটা নিয়ে এসেছে। মা নেই জেনে সে এখন অনায়াসে ফিরে যেতে পারে। তাঁর কিছু বলার নেই।

ভজন সিং হাঁড়িটা নিয়ে ভেতরে চলে যাবার পরেও বুলা স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ। তারপর খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো, প্রতাপদা?

সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের মনে পড়লো, এই বাড়িতে, অনেকদিন পর প্রথম বুলার সঙ্গে দেখা হলে। তিনিও ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলেন বুলাকে। বুলা কোনো উত্তর দেয়নি।

প্রতাপও কোনো উত্তর না দিয়ে চোখ তুলে তাকালেন বুলার দিকে। অনেকদিন পর চার চক্ষের সোজাসুজি মিলন হলো।

বুলা আবার বললো, তোমার আসার কথা ছিল আজ, কিছু শুনিনি তো?

প্রতাপ বললেন, জানলে তুমি এই সময় নিশ্চয়ই আসতে না এ বাড়িতে। তুমি আমাকে সহ্য করতে পারো না, আমি জানি!

একটু কড়া ভাবে এই কথাগুলি বলে ফেলে প্রতাপ নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। কোনো প্রস্তুতি ছিল না। যেন তাঁর ওষ্ঠ দিয়ে এই কথা অন্য কেউ বলালো। এখন আর ফেরানো যায় না।

কথাগুলি শুনে বুলা চমকে গেল না, আহত হলো না, হাসলো। একটু সরে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ ট্রেনে এলে?

আগেরবারের তুলনায় বুলার ব্যবহার অনেক সহজ। তার কারণ কি, বাড়িতে আর কেউ নেই বলে? প্রতাপের এখনো মনে হচ্ছে, বুলা চলে গেলেই ভালো হয়। ওস্তাদজী এসে পড়লে এই প্রসঙ্গ নিয়ে পরে কত কী রসিকতা করবেন তার ঠিক নেই। মমতার কানে পৌঁছোবেই। অকারণ জটিলতা।

প্রতাপ এটাও বুঝলেন যে একটি নারীর প্রশ্নের উত্তরে চুপ করে বসে থাকা যায় না। মেয়েরা এরকম পারে। পুরুষরা পারে না। যদিও অনেক প্রশ্ন, অনেক উত্তরই অর্থহীন। তুমি কেমন আছো, এই প্রশ্নের কি কোনো উত্তর দেওয়া যায় এক কথায়? এখানে মাত্র দুটো-তিনটে ট্রেনই আসে, প্রতাপ কোন্ ট্রেনে এসেছেন তা অবান্তর। তিনি বুলার সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি করতে চাইলেন। যেন এই দেওঘরে দেখার আগে বুলার পূর্ব পরিচয়

কিছু নেই। প্রবাসে সদ্য চেনা এক মহিলা, তার সঙ্গে টুকটাক মামুলি দু'চারটে কথা তো সহজ ভাবে বলা যেতে পারে অনায়াসেই।

প্রতাপ বললেন, তুমি দেওঘরেই থাকো নাকি?

বুলা বললো, হ্যাঁ। তুমি যে গত এপ্রিল মাসে এখানে এসেছিলে, তখনও আমি ছিলাম এখানে।

এপ্রিল মাসে বিশ্বনাথ গুহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে প্রতাপ এসেছিলেন মাত্র দু'দিনের জন্য। অতি ব্যস্ততায় সময় কেটে গেছে। বুলার প্রসঙ্গ তখন এ বাড়িতে কেউ তোলেনি। বুলা জানতে প্রতাপের আসার খবর? ইচ্ছে করেই সে ঐ দু'দিন আসেনি এ বাড়িতে?

–তুমি কি এখানেই থেকে যাবে?

বুলার সঙ্গে যে ভৃত্যটি এসেছে তার দিকে ফিরে বুলা বললো, এই, তুই টাঙ্গায় গিয়ে বোস, দ্যাখ, ও আবার চলে না যায়। আমি এক্ষুনি আসছি!

তারপর প্রতাপের দিকে ফিরে বললো, তুমি ট্রেন জার্নি করে এসেছো, খাওয়া-দাওয়া হয়নি। নিশ্চয়ই। আমি প্যাঁড়া এনেছি, তার থেকে খাবে দুটো? খেয়ে দ্যাখো, খুব বেশি মিষ্টি নয়। জিভের স্বাদ যাবে না!

এই যে খুব বেশি মিষ্টি নয় বললো, এর মধ্যেই ঝলসে উঠলো পূর্ব পরিচয়ের স্মৃতি। প্রতাপ যে মিষ্টি পছন্দ করেন না বুলা তা মনে রেখেছে। কত কাল আগেকার কথা। সেই দায়ুদকান্দিতে, বুলার মা প্রতাপকে লেডিকেনি খাওয়ার জন্য ঝুলোলাঝুলি করেছিলেন, প্রতাপ একটার বেশি খাননি, হাত নেড়ে নেড়ে বলেছিলেন, বেশি মিষ্টি আমি খেতে পারি না, মিষ্টি খেলে আমার জিভ অসাড় হয়ে যায়!

প্রতাপ বললেন, পরে খাবো, এখন আমার খিদে নেই।

–তুমি আমাকে একবার বসতেও বললে না, প্রতাপদা?

এর মধ্যে কী এমন ঘটেছে যার জন্য বুলার এতখানি পরিবর্তন? শুধু সহজ, সাবলীল নয়, বুলা যেন খানিকটা প্রগলভা হয়ে উঠেছে আজ। তার ঠোঁটে চাপা হাসি।

প্রতাপের পাশে আর একটি বেতের চেয়ার। সেটাকে খানিকটা দূরে ঠেলে দিয়ে তিনি বললেন, বসো!

–নাঃ, আমি এখন যাই!

বসো! বুলা সে কথা শুনলো না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে ঘুরে তাকিয়ে বললো, তোমার মা আমায় খুব ভালোবাসেন...মাসিমার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে...

আর একটুখানি এগিয়ে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে সে বললো, বৌদি, তোমার ছেলেমেয়েরা সবাই ভালো আছে নিশ্চয়ই! আমি যাই।

প্রতাপ বুলার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমে তিনি চাইছিলেন, বুলা তাড়াতাড়ি চলে গেলেই ভালো হয়। তারপর তিনি যখন বুলাকে বসতে বললেন, তখন বুলা সে কথা শুনলো না।

বুলার টাঙ্গার আওয়াজটা মিলিয়ে যাবার পর একটা অদ্ভুত কঠিন নিস্তব্ধতা প্রতাপকে আঘাত করতে লাগলো। প্রতাপ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তিনি যেন আর একটুক্ষণও এখানে বসে থাকতে পারবেন না। এক্ষুনি স্টেশানে গিয়ে একটা ফেরার ট্রেন ধরলে কেমন হয়?

প্রতাপ উঠে দাঁড়াবার পর খেয়াল করলেন, তাঁর কাছে যথেষ্ট পয়সা নেই। পয়সা থাকলেই বা কী হতো, এই ভাবে এসে আবার চলে যাওয়া, এ তো প্রায় পাগলামির লক্ষণ। কিংবা, যে কেউ শুনলেই ভাববে, তিনি যেন শুধু বুলার সঙ্গে দেখা করার জন্যই এসেছিলেন। নিভৃতে বুলার সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে তা কেউ জানবে না।

নিজে থেকেই কথা বলা শুরু করে আবার হঠাৎ কেন চলে গেল বুলা? নাঃ, এসব কিছুতেই বোঝা যাবে না।

একটু পরেই এসে পৌঁছোলেন বিশ্বনাথ। সাইকেল থেকে নেমেই তিনি গান ধরলেন, ‘পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না, এ পৃথিবী ভালোবাসিতে জানে না, যেথা আছে শুধু ভালো বাসাবাসি, সেথা যেতে প্রাণ চায় মা!’

প্রতাপ বারান্দা থেকে নেমে এসে ডাকলেন, ওস্তাদজী!

বিশ্বনাথ প্রতাপকে দেখে খুব যেন বিস্মিত হলেন না। গান থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত অপলক চেয়ে থেকে তারপর এক মুখ হেসে বললেন, এই যে, ব্রাদার! তোমাকেই খুর দরকার ছিল এখন। তুমি না এসে পড়লে আমিই দু’চারদিনের মধ্যে কলকাতায় যেতাম!

প্রতাপই অবাক হয়ে বললেন, কেন? কী ব্যাপার?

বিশ্বনাথ বললেন, তেমন কিছু নয়। পরে শুনবে। আরে এসব তো আছেই। সংসার করতে গেলে কত কী-ই না সহ্য করতে হয়। সেই যে গান আছে না, লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়! শুনবে গানটা? মিশ্র সাহানায় আছে।

বিশ্বনাথ আবার গান ধরতেই প্রতাপ বুঝতে পারলেন, ওস্তাদজী বেশ খানিকটা নেশা করে এসেছেন। বাড়ির বাইরে এখানে সেখানে বিশ্বনাথ মাঝে মাঝে মদ্য পান করেন, তা জানেন প্রতাপ। কিন্তু এখন তিনি এই অবস্থায় বাড়িতেও ফিরছেন? মা আছেন জেনেও!

গান শেষ করার পর ওস্তাদজী বললেন, এরা সব ফেরেনি এখনো? তুমি কতক্ষণ বাইরে বসে আছো?

প্রতাপ বললেন, তাতে অসুবিধে কিছু হয়নি।

–সবাই আশ্রমে গেছেন। পাবনার অনুকূল ঠাকুর এখানে মস্ত বড় আশ্রম করেছেন, তোমার মা তোমার বোনকে নিয়ে প্রায়ই যান সেখানে।

–আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? গানের টিউশানি করছেন সন্ধেবেলা? বিশ্বনাথ অট্টহাসি করে উঠে বললেন, টিউশানি? না হে, তার চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার। কোর্ট সিঙ্গার হয়েছি! বিদূষকও বলতে পারো!

–তার মানে?

–জসিডিতে সেই যে মস্ত বড় গোলাপ বাগানওয়ালা বাড়িটি দেখেছিলে গতবার, মনে আছে? সেটা ঘোষেদের বাড়ি। ঐ ঘোষরা জমিদার। তা সেই জমিদারবাবুর টি বি হয়েছে। বলে সদলবলে এখানে এসে আছেন দু'মাস। তা টি বি হলে কী হয়। জমিদার বলে কথা! রোজ পারিষদ নিয়ে সভা সাজিয়ে বসেন। দু'খানা মেয়েছেলে এনেছেন কলকাতার সোনাগাছি। থেকে। তারা খ্যামটা নাচে, আমি গান গাই! নতুন নতুন গান শিখেছি। রসের গান। শুনবে?

–ছিঃ। ওস্তাদজী!

–আরে তুমি ছি ছি করলে কী হবে, পয়সা ভালো দেয়। মুড হলে হাত থেকে আংটি খুলে দেয়! এখন ব্যাটা বেশি দিন বাঁচলে হয়। যদি শিগগির শিগগির টেসে যায় তা হলেই দুধের বদলে চোনা। হে-হে-হে!

হাতের চুরুটটা নিবে গেছে, তবু সেটাই মাঝে মাঝে ঠোঁটে দিয়ে টানছেন বিশ্বনাথ। এই ক'মাসেই তাঁর চুল-দাড়িতে পাক ধরেছে বেশ। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো।

ঝপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে তিনি বললেন, কী অদ্ভুত ব্যাপার দ্যাখো! বড় লোকদের হয় টি বি! ওটা তো ইস্কুল মাস্টার আর ব্যর্থ প্রেমিকদের অসুখ ছিল এতদিন তাই না? এখন আমি এদিককার বড় বড় বাড়িগুলোতে লোকজন এলেই খোঁজ নিই টি

বি রুগী এসেছে কি না! এদিকে আমি দালাল লাগিয়ে রটিয়ে দিয়েছি যে গান বাজনা শুনলে টি বি রোগের উপকার হয়। তাই শাঁসালো মক্কেল এলেই আমার ডাক পড়ে। অনেকেই দেখছি সঙ্গে করে বাজারের মেয়েছেলে আনে।

প্রতাপের দুই ভুরু যুক্ত হয়ে গেছে। খানিক আগের দুর্বল ভাবটা কেটে গেছে একেবারে। বিশ্বনাথ সম্পর্কে ও বয়েসে তাঁর থেকে বড় হলেও প্রতাপ ধমকের সুরে বললেন, এসব কী। বলছেন, ওস্তাদজী? আপনি...আপনার গানকে এত নিচে নামিয়ে এনেছেন? আপনিই না বলেছিলেন যে আপনার গুরুজীর আদেশ আছে, আপনি গান কোনোদিন বিক্রি করবেন না? ছোট ছেলেমেয়েদের গান শেখান, ...সে আলাদা কথা! কিন্তু বড়লোকদের বাড়িতে গিয়ে সেখানে নষ্ট মেয়েমানুষেরা থাকে সেখানে আপনি...আমি এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে। পারছি না!

বিশ্বনাথ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে প্রতাপের কথা শুনলেন। তারপর সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বসলেন, ধুর! ওসব কথা ছাড়ো!

প্রতাপ তবু চাপ দিয়ে বললেন, ওস্তাদজী, আপনি কেন এইসব বললেন আমাকে? সত্যিই এই রকম করছেন?

–সংসার চালাতে গেলে মানুষকে প্রয়োজনে ওরাং ওটাং-এর মতন চার হাত-পায়ে ছুটতে হয়, হয় না?

–আপনি যে বলেছিলেন–

–আগে কী বলেছিলাম তা ধরে রাখলে চলে? আগেকার কত কিছু বদলে গেল না? কোথায় গেল তোমাদের মালখানগর? রূপকথা হয়ে গেছে, তাই না?

–তবু আমাদের অবস্থা এমন হয়নি যে এত নীচে নামতে হবে! নষ্ট মেয়েমানুষরা নাচবে আর আপনি সেখানে গান গাইবেন? আপনার এই অধঃপতন আমি সহ্য করতে পারবো না। এই সন্ধ্যেবেলা আপনি নেশা করে এসেছেন...

পর পর দুটি হেঁচকি তুলে বিশ্বনাথ একটুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, তুমি যাদের নষ্ট মেয়েছেলে বললে, তাদের দু'একজনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, তাদের তুলে আনা হয়েছে রিফিউজি কলোনি থেকে। তারা যেকারণে নষ্ট হয়েছে আমিও সেই কারণেই নষ্ট কিংবা ভ্রষ্ট যা-ই বলো। দারিদ্র্যের সবচেয়ে বড় দোষ কী জানো, দারিদ্রে মানুষের নৈতিক চরিত্রটাও পচে যায়। পভার্টি ডিজেনারেটস! ঐ যে নজরুল লিখেছেন, হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছো মহান। ওটা অতি বেঠিক কথা! বাকোয়াস!

কথা শেষ করে বিশ্বনাথ উঠে গেলেন ভেতরে। বাথরুমে জল পড়ার শব্দ হতে লাগলো। প্রতাপ গুম হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁকেও এখন প্রায়ই অর্থ সংকটের কথা চিন্তা করতে হয়, তবু দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ তিনি সহ্য করতে পারেন না।

একটু পরে তাঁর বুলার কথা মনে ফিরে এলো। বুলা অনেক বদলে গেছে, সে যেন কিছু বলতে চেয়েছিল। তবু সে চলে গেল নিজে থেকে।

বুলা যে এসেছিল সে কথা কি বিশ্বনাথকে জানাবার প্রয়োজন আছে? অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা, এটার উল্লেখ না করলে কি তা মিথ্যে ভাষণের পর্যায়ে পড়ে? কিছু না বলাটা কী করে মিথ্যে হয়? বুলা নিশ্চয়ই পরে আবার দেখা করতে আসবে মায়ের সঙ্গে। কিন্তু ঐ প্যাঁড়ার হাঁড়িটা? প্রতাপ ছাড়া আর কেউ যখন ছিল না, তখন বুলা এসেছিল, এটা গোপন করা যাবে না। এটা গোপন করার মতন এমন কী-ই বা ব্যাপার?

সুহাসিনীরা ফিরলেন একটু পরেই। পায়ে হেঁটে। প্রতাপ প্রথমেই সেটা লক্ষ করলেন। বুলা টাঙ্গাতে আসে যায়, টাঙ্গা দাঁড় করিয়ে রাখে, কিন্তু প্রতাপের মাকে হেঁটে যাতায়াত করতে হয় কেন? সৎসঙ্গের আশ্রম এখান থেকে বেশ দূর। মাকে পচাত্তর টাকা করে হাত খরচ

পাঠান প্রতাপ, খুব একটা কম টাকা নয়, তাতে মায়ের কুলোয় না? টাকাটা আরও বাড়ানো দরকার?

প্রতাপকে দেখে বালিকার মতন দৌড়ে এলেন সুহাসিনী। ব্যাকুল ভাবে বলতে লাগলেন, ও খুকন, কখন এলি, কতক্ষণ বসে আছিস, এ রাম রাম, কেন আমি গ্যালাম আজ আশ্রমে, ইস রে ছেলেটা কত কষ্ট কইরা আইছে...

প্রতাপের মাথাটা সুহাসিনী চেপে ধরলেন বুকে। অন্য সময় প্রতাপ প্রবল অস্বস্তিতে মাথাটা সরিয়ে নেন সঙ্গে সঙ্গে, আজ নিলেন না। মায়ের বুকে যেন তিনি পেলেন বাল্যকালের সৌরভ, মালখানগরের সেই আম-জাম-নারকোল গাছের বাতাস বিধৌত বাড়িতে কৈশোর বয়েসের সব রকম সুখ। প্রতাপ ভাবলেন, ঐ বয়েসটায় যদি ফিরে যাওয়া যেত, যখন টাকা পয়সার চিন্তা থাকে না...দিদির গয়না...মমতার দুঃখ...ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর চিন্তা...ওস্তাদজীর গান...মায়ের টাঙ্গার ভাড়া...। আঃ, যদি ফিরে যাওয়া যেত!

৩১ স্বাধীনতার কয়েক বছর পর

স্বাধীনতার কয়েক বছর পর ভারতের রাজ্যগুলির আলাদা আলাদা সীমানা যখন নতুন করে নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হলো, তখন একটা চমকপ্রদ প্রস্তাব এলো দিল্লি থেকে। পশ্চিম বাংলা নামে খণ্ডিত রাজ্যটির আর সীমানা চিহ্নিত করার দরকার নেই, পশ্চিম বাংলাকে মিশিয়ে দেওয়া হোক বিহারের সঙ্গে।

এই অভিনব প্রস্তাবটি যারই উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত হোক, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এর সমর্থক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ এর প্রবল প্রবক্তা এবং বাংলা ও বিহারেরদুই মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ আহ্লাদের সঙ্গে এই প্রস্তাব লুফে নিলেন। পশ্চিমবাংলা আর বিহার মিলেমিশে গেলে কত সুবিধে, দুটিতে মিলে একটি বেশ বড় আর শক্তিশালী রাজ্য হবে; বিহারে আছে খনিজ সম্পদ আর কাঁচামাল, পশ্চিম বাংলায়

আছে কলকারখানা আর বন্দর, একেবারে রাজযোটক! তা ছাড়া পাকিস্তান থেকে অনবরত উদ্বাস্তুর স্রোত আসছে, পঞ্চাশের দশকে সেই স্রোত হঠাৎ বেড়ে গেল, প্রতি মাসেই আসছে কুড়ি- পঁচিশ হাজার, সরকারি হিসেবে পঞ্চান্ন সালের মধ্যেই এদিকে চলে এসেছে ২৮ লক্ষেরও বেশি বাঙালি উদ্বাস্তু। এই বিপুল সংখ্যক অবাঞ্ছিত অতিথির গুরুভার পশ্চিমবাংলা একা সামলাবে কী করে? বিহার-বাংলা এক হলে সেই রাজ্যে উদ্বাস্তুদের স্থান করে দেওয়া সহজ হবে।

পশ্চিম বাংলার মানুষ কিন্তু এই প্রস্তাব শুনে হতবাক হয়ে গেল। প্রথমে বিস্ময়, তারপর ক্ষোভ, তারপর ক্রোধ। শহরের রাস্তায়, ট্রামে বাসে, চায়ের দোকানে সর্বত্র এক আলোচনা, বেঙ্গল-বিহার মাজার! ক্রমে শহর ছাড়িয়ে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়লো এই ক্ষোভ আর ক্রোধ। বাঙালিরা ভাবলো, তাদের বাঙালীত্ব মুছে দেবার জন্য এ এক কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্র! বিহার আয়তনে বড়, সেখানকার জনসংখ্যাও পশ্চিম বাংলার চেয়ে বেশি, বিহারের সঙ্গে মিশে গেলে বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যাবে।

পাকিস্তানে যেমন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে, তেমনি ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালাবার প্রয়াসও অব্যাহত। গোটা দক্ষিণ ভারত হিন্দিকে একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে মেনে নেবার বিরোধী, উন্নাসিক বাঙালিরা নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এতই গর্বিত যে অন্য কোনো ভাষাকে তারা গ্রাহ্যই করে না। হিন্দিভাষী বিহারের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলে বাঙালিদের নাকটা ভোঁতা করা যাবে।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী হলেও এই সময়ে পথেঘাটে লোকে প্রকাশ্যে : চিৎকার করে বলতে লাগলো, পশ্চিম বাংলাটা কি বিধান রায়ের বাপের সম্পত্তি?

চিকিৎসক হিসেবে প্রবাদতুল্য খ্যাতি পেয়েছেন বিধানচন্দ্র, রাজনীতিতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলায় বক্তৃতা দিতে গেলে তাঁর কথা আটকে যায়, অনবরত ইংরিজি শব্দ চলে আসে। তাঁর বাংলা জ্ঞান সম্পর্কে নানা রকম গুজব প্রচলিত আছে। শোনা যায়

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি একবার তারাদাস চ্যাটার্জি বলে সম্বোধন করেছিলেন, এবং তাঁকে তাঁর "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আর একবার, বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে তরুণ পরিচালক সত্যজিৎ রায় যখন অর্থাভাবে বিপদে পড়ে শুভার্থীদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছিলেন, তখন কোন্ দফতর থেকে টাকা দেওয়া যায় এই চিন্তা করতে করতে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, তাহলে রোড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট থেকে কিছু বরাদ্দ করে দাও।

আর একটি কাহিনী আরও কৌতুকপ্রদ। একবার তিনি দিল্লি থেকে বিমানে ফিরছেন কলকাতায়। নামবার সময় বিমানটি যখন কলকাতা নগরীর উপর দিয়ে ঘুরছে, তখন তিনি জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে তার দলবলকে বললেন, ওহে, লোকে যতই কলকাতার বদনাম করুক, কিন্তু দ্যাখো, এখনো শহরটা কত সুন্দর। সেই যে মাইকেল লিখে গেছেন না, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে..."

একজন অফিসার মিনমিন করে বললেন, স্যার ওটা মাইকেলের লেখা নয়, রবীন্দ্রনাথের...

বিধানবাবু অমনি চটে গিয়ে বললেন, সবই রবীন্দ্রনাথের? কেন, মাইকেল কি কিছু লেখেন নি?

হয়তো এ সবই নিছক গুজব, বিরোধীপক্ষের দুষ্টুমি-মেশানো রটনা, কিন্তু রসিকতার স্বাদ পেলে তা জনসাধারণের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়।

শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, শুধু বুদ্ধিজীবীরা নয়, শুধু শিক্ষক-ছাত্রমহল নয়, পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষও বাংলা-বিহার একীকরণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চলে গেল। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ। যে-সব পত্রপত্রিকা কংগ্রেসের সমর্থক ছিল, তারাও এই ব্যাপারে সরকারকে সমর্থন জানালো না। দিকে দিকে শুরু হয়ে গেল প্রতিবাদ আন্দোলন। চলতে লাগলো ধর-পাকড়।

এদিকে যখন এইসব চলছে, ওদিকে পাকিস্তানে তখন রচিত হচ্ছে নতুন শাসনতন্ত্র। এতদিন পাকিস্তানের বড় অংশটির নাম ছিল পূর্ব বাংলা, নতুন শাসনতন্ত্রে এই নাম মুছে দিয়ে নাম দেওয়া হলো পূর্ব পাকিস্তান। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানরা আর বাঙালি রইলো না, তারা হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানী। নতুন শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানকে ঘোষণা করা হলো ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে, সেখানে প্রযোজ্য হবে শরিয়তের আইন, মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রস্টানরা সেখানে হয়ে গেল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

পূর্ব বাংলা নামটা বিলুপ্ত হওয়াতেও সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা বা বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ কেউ আপত্তি জানালেন না। এককালের তেজস্বী নেতা ফজলুল হক সাহেব এখন পাকিস্তানের সরকার পক্ষের লোক, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ থেকে তিনি নিযুক্ত হলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর, তিনি এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের এই নতুন। পরিচয় নিঃশর্তে গ্রহণ করার আর একটি কারণ তারা এই উপলক্ষে একটি বড় উপহার পেয়েছে। বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন, শহীদের রক্তদান, প্রাণপণে উর্দু-বিরোধিতার সুফল পাওয়া গেছে, প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী ঘোষণা করেছেন যে নতুন সংবিধানে বাংলা ও উর্দু, এই দুটিই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই উপহারের বিনিময়ে অবশ্য স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি মুলতুবি রইলো।

পূর্ব বাংলার মানুষ বাংলা ভাষার দাবি আদায় করল ঠিকই, কিন্তু তাদের বাঙালিত্ব হারালো। বাঙালী শব্দটার মধ্যেই বড় হিন্দু হিন্দু গন্ধ! পশ্চিম পাকিস্তানীরা অন্তত তাই-ই মনে করে।

এদিকে পশ্চিম বাংলাকেও যদি বিহারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে পৃথিবী থেকে বাঙালি জাতটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত। বাংলাভাষা হয়তো আরও কিছুদিন টিকে থাকতো কিন্তু বাঙালি বলে কেউ আর নিজের পরিচয় দিতে পারতো না। দেশের নামেই তো মানুষের পরিচয়!

কিন্তু পশ্চিম বাংলা টিকে গেল কোনোক্রমে। মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরি! হাজার রকম সমস্যা কণ্টকিত পশ্চিম বাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের সদুপদেশ কিংবা বিধান রায়ের নির্দেশ মানতে রাজি হলো না। বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা দেখে সরকার পক্ষও পিছিয়ে গেলেন খানিকটা। বাঙালিদের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অনেক দিনের, জোর করে তাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। এই সময় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা যেন নিজের মৃত্যু দিয়ে সমাধানের পথ করে দিয়ে গেলেন। মেঘনাদ সাহা লোকসভার সদস্য ছিলেন, তাঁর শূন্য আসনে উপনির্বাচন হবে। নির্বাচনের ইস্যু হলো বেঙ্গল-বিহার মাজার। প্রবল পরাক্রমশালী কংগ্রেস দল সেই নির্বাচনে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হবার ফলে একেবারে ধামা চাপা পড়ে গেল ঐ প্রস্তাব। পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের বাঙালিত্ব আপাতত অটুট রইলো এবং ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব।

বাংলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ায় তার প্রভাব পড়লো লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য, অসহায়, মানুষের ওপর। যারা উদ্বাস্তু। রক্তবীজের ঝাড়ের মতন তাদের সংখ্যা অনবরত বাড়ছে। হঠাৎ এই সময়েই কেন যে নতুন করে আবার দলে দলে হিন্দু-বৌদ্ধরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসছে ভারতে, তার কোনো কারণ বোঝা যাচ্ছে না। ভারতীয় শাসনকর্তারা দারুণ উদ্বিগ্ন, পাকিস্তানের কোনো কোনো নেতা বলছেন, হিন্দুরা চলে যাচ্ছে ভাবাবেগের তাড়নায়। পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন নেতা হিন্দুদের নিরাপত্তার মৌখিক আশ্বাস দিয়ে বলছেন, তোমরা যেও, তোমরা থাকো। তবু তারা আসছে। পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে। নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে, জীবিকা ছেড়ে কোন্ তাড়নায় তারা চলে আসছে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে, তা তারাই জানে। নতুন দেশে তাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই, কেউ তাদের দিকে স্বাগতম বলে হাত বাড়িয়ে দেয় না, তারা এসে আশ্রয় নিচ্ছে রেল স্টেশনে, পথের ধারে, খয়রাতি তাঁবুতে, অর্ধাহার ও রোগ ভোগে ধুকছে; তবু তারা আসছে, দাবানলে তাড়া খাওয়া জন্তু-জানোয়ারের মতন নয়, পঙ্গপালের মতনও নয়, পরিত্যক্ত বাড়ির দেয়াল বেয়ে নেমে আসা পিঁপড়ের সারির মতন। ওরা ভূমিকম্পের কথা আগে থেকেই টের পায়।

এত উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় গাদাগাদি করে থাকবে কী করে? ওরা বাঙালি হলেও পশ্চিম। বাংলার মানুষ ওদের উপদ্রবে তিতিবিরক্ত। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য নতুন করে জায়গা। খোঁজাখুঁজি হতে লাগলো বিহারের চম্পারণে ও পূর্ণিয়ায়, উড়িষ্যা ও বিন্ধ্যপ্রদেশে। ওদের আর বাঙালি থাকবার দরকার নেই। ওরা কোনোক্রমে বাঁচুক।

"মহারাজা" নামে জাহাজে চাপিয়ে এক ব্যাচ উদ্বাস্তুকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কালাপানি পেরিয়ে আন্দামানের দ্বীপে।

এই রকম সময়ে জেল থেকে খালাস পেয়ে গেল হারীত মণ্ডল। তার নামে খুনের মামলা আদালতে টেকেনি। কিন্তু পুলিস তাকে পুরোপুরি ছাড়লো না। জেল গেট থেকে বেরুবার পরই পুলিস তাকে আবার ধরে নিয়ে এল লালবাজারে। কোনো একজন মন্ত্রীর নির্দেশে পুলিসের একজন বড় কর্তা তাকে একটি নিভৃত ঘরে বসিয়ে বললো, শোনো হে, তোমার বিরুদ্ধে কেস তুলে নেওয়া হয়েছে তোমার পরিবারের লোকজনের কথা বিবেচনা করে। তোমাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে এক শর্তে, সেটাও তোমার ভালর জন্যই। পনেরো দিনের মধ্যে তোমাকে এ রাজ্য ছেড়ে সপরিবারে চলে যেতে হবে। মধ্যপ্রদেশের ক্যাম্পে যাবে না আন্দামানে যাবে সেটা তুমি নিজে বেছে নাও। তুমি যে রিফিউজিদের খেপিয়েছে তারা যেন পশ্চিম বাংলা ছেড়ে বাইরে না যায়, তাতে তুমি তাদেরই ক্ষতি করছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যা সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে তার সুযোগ না নেওয়া যে কতবড় বোকামি তা বোঝো না? মনে থাকে যেন, ঠিক পনেরো দিন সময় দেওয়া হলো তোমাকে, এর মধ্যে তুমি কোথাও কোনো মিটিং করতে পারবে না। যদি করো–

কথা থামিয়ে পুলিসের কতটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো হারীত মণ্ডলের চোখের দিকে।

হারীত মণ্ডল নির্বোধ নয় মোটেই। পুলিসের কতার ঐ অসমাপ্ত বাক্য ও স্থির দৃষ্টির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন হুমকি আছে তা বুঝতে তার এক মুহূর্তও দেরি হলো না। খুনের মামলা চাপিয়ে পুলিস। তাকে জব্দ করতে পারেনি বটে কিন্তু অন্য অনেক ভাবে পুলিস তার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। এরপর কোনো মিছিলে বা সভায় সামান্য গণ্ডগোলের ছুতোয়

পুলিস সোজাসুজি তার মাথায় গুলি চালিয়ে খতম করে দেবে। সেজন্য পুলিসকে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

কিন্তু হারীত মণ্ডলের মাথার গড়নটাই এমন যে কারুর ধমক শুনে সে চট করে ভয় পায় না। এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনেও সে মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

গত সাত মাস জেলখানায় তার সঙ্গে ধোপা নাপিতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এখন তার মুখভর্তি দাড়ি, মাথার চুলে জট, তাতে আবার উকুন হয়েছে। উকুনগুলো মাথা বেয়ে দাড়িতেও নেমে আসে। ঘ্যাস ঘ্যাস করে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে সে বললো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো স্যার? আপনেগো বাড়ি কি যশোরে ছিল?

জাঁদরেল পুলিস কতাটি এই আকস্মিক প্রশ্ন শুনে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

হারীত মণ্ডল বললো, আপনার কথায় একটু যেন যশোরের টান আছে। ঠিক কিনা কন? তা যশোরের লোক হইলে আপনেও তো রিফুজি, স্যার? আপনেও রিফুজি, আমিও রিফুজি। আপনেরা কলকাতায় থাকবেন, আর আমরা কেন বিদেশে যামু?

পুলিশের কতাটি এবারে অনেকটা সামলে উঠে বললেন, তোমার কি এখানে কোনো থাকার জায়গা আছে? তুমি পরের বাড়ি জবরদখল করে আছে, সেটা বে-আইনী। সেইজন্যই সরকার তোমাদের অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন!

ও, তাইলে আমাগো মতন যারা গরিব, যারা নিচু জাত, যাগো এদেশে কোন আত্মীয়স্বজন নাই তাগোই আপনেরা বিদেশে পাঠাবেন। বোঝলাম। কিন্তু সে দেশে গিয়ে আমরা খাবো কী?

সরকার তোমাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করবেন। তোমাদের যার যা পেশা ছিল সেগুলো আবার কাজে লাগাবে!

হারীত মণ্ডল আবার হেসে ফেলল। যেন বেশ একটা মজার কথা শুনেছে। পাল্টা একটা রসিকতা করার ঝোঁকে সে বললো, স্যার, আমার পেশা ছিল–

পুলিসের কতটি তার কথা শেষ করতে না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, যা বলেছি, বুঝেছো আশা করি। মনে থাকে যেন, পনেরো দিন।

হ্যাঁ স্যার, মনে থাকবে, পনেরো দিন।

পুলিসের গাড়ি হারীত মণ্ডলকে পৌঁছে দিল কাশীপুর। কলোনির সব লোকজন তাকে দেখে ভিড় করে এলে সে দু'হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে বলতে লাগলো, না, না, এখন কোনো কথা না, এখন সবাই যাও, এখন দুইদিন আমি শুধু খাবো আর ঘুমাবো।

সত্যি সত্যি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে রইলো সে। তাকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পুলিসের হুমকি যে ফাঁকা নয় তা সে জানে। এখন তাকে ঘিরে এই কলোনিতে কোনো উত্তেজনা ছড়ালে সেই সুযোগে পুলিস তার ওপর প্রতিশোধ নেবে। পুলিসের সাজানো মামলা জজ সাহেবরা নামঞ্জুর করে দিলে পুলিস তা সহ্য করে না, একথা সে জেলখানাতেই অন্য আসামীদের কাছে শুনেছে।

পারুলবালার কাছে সে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলো। মুখে হাসি এনে সে বললো, জেলের খিচুরি খাইয়া প্যাটে চড়া পইড়া গ্যাছে। ছোট বউ, একটু মাছের ঝোল আর গরম ভাত খাওয়াইতে পারবি? পুঁটি মাছ, খইলসা মাছ যা হয়!

নিজের সংসারের খোঁজখবর নিল সে। এই সাতমাস নানরকম দুর্যোগের মধ্য দিয়ে কাটলেও শেষের দিকে একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে। তার ছেলে সুচরিত চন্দ্রা নামে একটি বড়লোক মহিলার নজরে পড়ে গেছে, সে মহিলা সুচরিতের লেখাপড়ার সব ভার নিয়ে নিয়েছেন এবং পারুলকেও একটি ভদ্রমতন কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন। আপাতত তাদের সংসার চালাবার দুশ্চিন্তা নেই।

হারীতের আবার হাসি পেল। সংসার! এই অস্থায়ী আস্তানাও আবার গোটাতে হবে। পারুলের চাকরি, ছেলের লেখাপড়া এ সব কিছুই আর কিছু না, নিবাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাকে। হারীত ভাবলো, জেল থেকে ছাড়া না পেলেই বরং ভাল ছিল, সে জেল খাটতো, কিন্তু পারুল তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে থেকে যেতে পারতো এখানে।

ভাত রান্না হবার আগেই সে পারুলকে একবার কাছে ডেকে একটানে তুলে আনলো বিছানায়। পায়ের ধাক্কায় বন্ধ করে দিল দরজা। তার ভাবগতিক দেখে পারুল ভয় পেয়ে গেলেও হারীত তাকে ছাড়লো না। তাদের চ্যাঁচার বেড়ার ঘর, পাশ দিয়ে লোকজন গেলে টের পাওয়া যায়, ঘোর দুপুরবেলা, যে-কেউ হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে, তবু হারীত বুভুক্ষুর মতন খেতে লাগলো পারুলের শরীর।

তারপর সে ঘুমোতে লাগলো পড়ে পড়ে। যেন অনেক দিনের জমা ঘুম সে পুষিয়ে নিচ্ছে। রান্না হয়ে গেছে, ভাত বাড়ার পরেও অনেক ঠ্যালাঠেলিতে সে আর উঠতে চায় না।

পরদিন হারীত তাদের কলোনির দু'জন লোককে ডেকে পাঠিয়ে গোপন শলাপরামর্শ করলো অনেকক্ষণ। হলধর অর ভূষণ নামে এই লোক দুটি হারীতের খুব অনুগত। হারীত তাদের বললো, শোন, আমার ফাঁসী হয়নি বটে, কিন্তু আমি দাগী হয়ে গেছি। তোরা এখন ধরে নে যে আমি আর নাই! আমি কিছু করতে গেলে আর প্রাণে বাঁচবো না। তোদেরও সামনে খুব বিপদ। উদ্বাস্তুদের বাইরে পাঠানো শুরু হয়ে গেছে, এখন এইসব বাড়ির মালিকরা সুযোগ নেবে, তোদের এখান থেকে উচ্ছেদ করে বনে-জঙ্গলে পাঠিয়ে দেবে। সুতরাং, তোদের এককাট্টা হয়ে থাকতে হবে সব সময়। তবু তোরা নিজেরা পারবি না। স্থানীয় কমুনিস্ট পার্টি আর ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ কর, তারা কংগ্রেস সরকারের এই পলিসির বিরুদ্ধে কথা বলে, তারা তোদের সাহায্য করতে পারবে।

হলধর আর ভূষণ হারীতের হাত চেপে ধরে বললো, কিন্তু হারীতদা, তুমি চলে যাবে কেন? আমরা থাকলে তুমিও থাকবে। তুমিই আমাদের এই সুন্দর জায়গার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমাদের প্রাণ থাকতে তোমাদের যেতে দেবো না।

হারীত বললো, আমি না থাকলে তবু তোদের টিকে থাকার আশা আছে। আমি থাকলে তোদের বিপদ আরও বাড়বে। নানান ছুতোয় পুলিস যখন তখন হামলা করবে। আমাকে যেতেই হবে!

পুলিসের কর্তার কাছে হারীত যে রসিকতা করতে গিয়েছিল, সেটা নিজের পেশা সম্পর্কে। তাকে আন্দামান কিংবা মধ্য প্রদেশের জঙ্গল বেছে নিতে বলা হয়েছে। পূর্ব বাংলায় হারীতের পেশা ছিল মূর্তি বানানো। জাতে তারা কুমোর। হারীত নিজে অবশ্য হাঁড়ি-কলসি বানায়নি কখনো, সে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মূর্তি গড়তো। আন্দামানের দ্বীপে কিংবা মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে সে তার এই পুরনো পেশা কী করে কাজে লাগাবে? কে তাকে পয়সা দেবে?

সমুদ্রের অভিজ্ঞতা নেই হারীতের, সে জঙ্গলেই যাওয়া ঠিক করলো।

এখান থেকে চলে যেতে হবে শুনে কান্নাকাটি শুরু করে দিল পারুলবালা। সে ধরে নিল, এটা তার স্বামীর আর একটা পাগলামি। জঙ্গলে গিয়ে সে নেতাগিরি করতে চায়। হারীত হাসতে হাসতে নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ওরে ছোট বৌ, এখানে থাকলে আমার। মাথাটাই থাকবে না। বিধবা হইয়া থাকতে রাজি আছোস তো ক! আবার আমি লাফালাফি শুরু করি!

হারীতের এ রকম লঘু ভঙ্গির জন্য তার কথা বিশ্বাস করে না পারুল। সে আরও কাঁদে।

এর মধ্যে এক বিকেলে তাদের অন্ধকার ঘরে চন্দ্রোদয় হলো। সুচরিতের কাছ থেকে চন্দ্রা এসেছে হারীতের সঙ্গে দেখা করতে। চন্দ্রা পরে এসেছে একটা গোলাপী সিল্কের শাড়ী, তার ওষ্ঠাধর রক্তিম, তার শরীরের বিলিতি সুবাসে ভরে গেল ঘর।

হারীত খাটে শুয়ে ছিল, তাড়াতাড়ি উঠে বসে সে বলতে লাগলো, কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ রকম কখনো করে। আমাকে ডেকে পাঠালেই তো আমি যেতাম। আপনি এই নোংরা কাদার মধ্যে–

চন্দ্রার সঙ্গে অসমঞ্জ রায় এবং আর একজন মহিলাও এসেছে। চন্দ্রা হারীতের খাটের এক কোণে বসে পড়ে কোনোরকম ভূমিকা না করেই বললো, আপনি নাকি চলে যেতে চাইছেন? আপনি পাগল হয়েছেন নাকি? না, না, কোনো মতেই আপনার যাওয়া চলবে না।

হারীত কোনো কথা না বলে চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক পলক। তার মনে পড়েগেল সুলেখার কথা। এর আগেও সুলেখার কথা তার অনেকবার মনে পড়েছে, কিন্তু সুলেখার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া হয়নি। তার ধারণা, এই কলোনি থেকে বেরুলেই তার পেছনে পুলিস লাগবে। হারীত ও বাড়িতে আবার যাওয়া-আসা করলে ত্রিদিব-সুলেখা ঝামেলায় পড়তে পারেন। জেলে থাকার সময় ত্রিদিব দু'বার দেখা করতে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে, উকিলের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু সুলেখার সঙ্গে দেখা হয়নি।

সুলেখার সঙ্গে চন্দ্রার অনেক অমিল। সুলেখা এ রকম উগ্র নন। সুলেখা না হাসলেও তাঁর মুখে যেন সব সময় স্নিগ্ধ হাসি ছড়ানো থাকে। সুলেখা খুব কম কথা বলেন, আর এই মহিলাকে দেখেই মনে হচ্ছে ইনি অন্যদের কথা বলতে দেবেন না।

অসমঞ্জ রায় বললেন, আপনার ছেলে ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে, পড়াশুনো ভালোই করছে, তাছাড়া আপনি তো নিদোষ হিসেবে ছাড়া পেয়ে গেছেন, আপনি এখন চলে যাবেন কেন?

হারীত বললো, সরকার আমাদের এই সব বাড়ি ছেড়ে দিতে বলছেন, আমাদের অন্য জায়গায় জায়গা দেবেন...

চন্দ্রা বললো, অন্য জায়গা মানে ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে? সেখানে আপনারা খাবেন কী? সরকারের কাছ থেকে ভিক্ষে নেবেন? না, না, বরং এই রকম বাড়ি বা জমি এদিকে আর যত আছে, সব দখল করে নিতে হবে। আপনারা দাবি ছাড়বেন না!

হারীত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার মনে পড়লো, পুলিস সাহেবের সেই তীব্র দৃষ্টি। তিনি পনেরো দিন সময় দিয়েছেন। নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখছেন হারীতের ওপর। নদিন কেটে গেছে!

দ্বিতীয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারীত বললল, না, দিদিমনি, আমার আর উপায় নাই, আমারে চলে যেতেই হবে!

চন্দ্রা বললো, কেন? কে বলেছে আপনি নিরুপায়। আমরা আছি না? আপনি কিসের ভয়ে চলে যাবেন?

পুলিসের ভয়ে।

পুলিস? পুলিস কী করবে? আমরা অ্যাসেম্বলি অভিযান করবো। এদেশে কি ডেমোক্রেসি নেই? পুলিস তো জনতার চাকর! আমরা আপনাকে প্রটেকশন দেবো, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?

অসমঞ্জ রায় বললেন, আপনার নামে তো আর কেস নেই!

হারীত বললো, পুলিশ আমাকে ছাড়বে না। আপনারা ভদ্দরলোক, আপনারা বড়লোক, পুলিশ আপনাদের ভয় পেতে পারে। কিন্তু আমরা মারা পড়বো, পুলিশ আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে। বাঁচতে হলে আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে।

চন্দ্রা বললো, ঠিক আছে, আপনি কিছুদিন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকুন, আপনার ফ্যামিলি নিয়ে। আপনাকে কোনো কিছু চিন্তা করতে হবে না। আমরা দরকার হলে দিল্লিতে গিয়ে...

যখন-তখন হারীতের হাসি পেয়ে যায়। এই সব ভাল ভাল ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা তাকে এখন সাহায্য করতে চাইছেন, এতে তার হাসি পাবে না? যদি এক বছর আগে আসতেন... থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে পাগলা কুকুরের মতন পিটিয়েছে, একজন পুলিসের দারোগা তার পেটে এমন লাথি মেরেছিল যে হারীতের কাপড় নষ্ট হয়ে

গিয়েছিল। এখন বড় দেরি হয়ে গেছে। বড়লোকদের বাড়ির এই মা-লক্ষ্মীটি হতভাগা রিফিউজিদের জন্য কেন এত দরদ দেখাচ্ছেন, তাই বা কে জানে!

ঘরের দরজার কাছে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। সুচরিত দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে ভর দিয়ে। হারীত তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলো। তারপর সুচরিতের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে সে বললো, ভুলু, তুই এখানে একা থাকতে পারবি? তুই থাক, লেখাপড়া শেখ, যদি কপালে থাকে আবার দেখা হবে।

তারপর চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে চোখ তুলে বললো, আপনারা তো সবাইকে রাখতে পারবেন না। সরকার উদ্বাস্তুদের বাইরে পাঠাতে শুরু করেছেন, অনেককেই যেতে হবে। তারা সেখানে কী করে থাকবে, কী খেয়ে বাঁচবে, তা কে দেখবে বলুন? আমি ওদের মধ্যে গিয়েই থাকতে চাই।

৩২ ঢাকার সেগুনবাগানে মামুনের এক দিদির বাড়ি

ঢাকার সেগুনবাগানে মামুনের এক দিদির বাড়ি। তাঁর দুলাভাই শামসুল আলম একজন সম্পন্ন উকিল। আলম সাহেব যেমন দিলদার তেমনই মজলিশী, তাঁর বাড়িতে গানবাজনা আর খাওয়া-দাওয়ার উৎসব লেগেই আছে। মাদারীপুর থেকে ঢাকা এসে মামুন উঠলেন তাঁর এই দিদির বাড়িতে। সঙ্গে তার সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে হেনাকে নিয়ে এসেছেন, এই মেয়েটি তাঁর বড় আদরের। ফিরোজাও প্রায় জোর করে হেনাকে স্বামীর সঙ্গে পাঠিয়েছেন। তিনি বুঝেছেন যে মামুন আবার রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠতে, অথবা জেল খাটতে যাচ্ছেন। সঙ্গে মেয়েটা থাকলে তবু হয়তো খানিকটা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করবেন।

মামুনের দিদি মালিহার মোট এগারোটি সন্তান, তাদের মধ্যে দু'জন অকালে প্রাণ হারিয়েছে। বাড়িটি যেন একটি বড় গাছ, যেখানে সব সময় শোনা যায় পাখিদের কলরব।

শিশুদের সংসর্গ মামুনের ভালো লাগে, ওদের সঙ্গে কৌতুকে মেতে উঠলে মনের মেঘ কেটে যায়।

প্রথম কিছুদিন মামুন বাড়িতে বসেই কাটালেন। আলতাফের পীড়াপিড়িতেও তিনি পার্টি মিটিং-এ যেতে চাইলেন না, আগে অবস্থাটা বুঝে নিতে চান। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পর প্রায় বছর চারেক তিনি রাজনীতি থেকে বিযুক্ত ছিলেন। রাজনীতি এমনই এক ব্যাপার যে একবার দূরে সরে গেলে ফাঁক ভরাট হয়ে যায়, ফিরে এসে নিজের জায়গাটা খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়। একসময় মামুন প্রথম সারিতে চেয়ার পেতেন, এখন তিনি তৃতীয় বা চতুর্থ সারিতে স্থান পাবেন কিনা তাও জানেন না।

এ বাড়িতে প্রায়ই গানবাজনার আসর বসে, সঙ্গীত-প্রিয় মামুন এখানে এসে দিন দিন যেন চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগলেন। ফিরোজার আপত্তির জন্য তাঁর নিজের বাড়িতে গানবাজনার চর্চা একেবারে প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

অনেক গণ্যমান্য মানুষও আসেন এখানে, যাঁদের সাহচর্য মামুনকে প্রেরণা দেয়। আসেন কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লা, গোবিন্দচন্দ্র দেব-এর মতন পণ্ডিতেরা।

মোতাহার ভাই-এর সঙ্গে মামুনের অনেক দিনের পরিচয়। তিনি এলেই কাজী নজরুলের গল্প শুরু হয়ে যায়। নজরুল যখন সৃষ্টিশীল, প্রাণবন্ত ছিলেন তখন এই মোতাহার হোসেনের বাড়িতে উঠেছেন একাধিকবার। নজরুল খুব ভালবাসতেন একে। আদর করে ডাকতেন মোতিহার।

নজরুল এখন জড়, বাক্যহীন বলেই তাঁর আগেকার কাহিনী শুনতে বেশি ভালো লাগে। কথায় কথায় মামুন একবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মোতাহার ভাই, কবি নজরুল ঠিক কবে, কোন্ জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেটা একটু বলেন তো! নানা লোকে নানা কথা বলে, কিন্তু আপনিই সবচেয়ে ভালো জানবেন!

মোতাহার সাহেব বললেন, সে সময়ে অবশ্য আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম না, তবে সবিস্তারে শুনেছি। ওঁর এক ছেলে, বুলবুল, সে মারা যাবার পর উনি কী রকম আঘাত পেয়েছিলেন জানো তো! সেই আঘাত উনি আর সামলাতে পারেননি।

মামুন বললেন, সে তো অনেক আগের কথা। তারপর উনি বহু বছর সুস্থ ছিলেন, সারা দেশে ঝটিকা সফর দিয়েছেন, কত গান লিখেছেন...

মোতাহার সাহেব বললেন, হ্যাঁ, তার পরেও দশ বারো বছর সুস্থ ছিলেন, কিন্তু সেই সময় আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠির বয়ান আমার স্পষ্ট মনে আছে। উনি লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বলতেন, দেখ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মত, কীট-এর মত খুব বড় একটা ট্রাজেডি আছে, তুই প্রস্তুত হ।"

–রবীন্দ্রনাথ কি কারুকে তুই বলতেন?

–কবিগুরু ঠিক ঐ ভাষায় বলেন নাই হয়তো। তিনি ঠিক কী ভেবে ঐ কথা বলেছিলেন, তাও জানি না, কিন্তু নজরুলের মনের মধ্যে একটা ট্রাজেডির আশঙ্কা সেই সময় থেকেই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। প্রায়ই বলতেন এরকম কথা। তারপর কবিগুরু মারা গেলেন উনিশশো একচল্লিশ সনের অগাস্টে আর পরের বছর জুলাই মাসে নির্বাক হয়ে গেলেন নজরুল।

–রেডিও স্টেশনে টক দিতে গিয়ে নাকি–

–আমি নৃপেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে সে দিনের বর্ণনা শুনেছি।

–নৃপেন্দ্রবাবু, মানে কোন্ নৃপেন্দ্রবাবু?

–কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। কবির খুব বন্ধু ছিলেন তিনি। তিনি তখন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেন। আর নজরুল তখন ফজলুল হক সাহেবের 'নবযুগ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। সেই নবযুগে নজরুল একটা লেখা লিখেছিলেন,

আমার সুন্দর! কী, অপরূপ লেখা! যদিও গদ্য, তবু সব লাইন আমার মনে আছে। "আমার সুন্দর প্রথমে এলেন গদ্য হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে...। আমার সুন্দর এলেন শোকসুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এলো নিবিড় স্নেহ-সুন্দর হয়ে...।" দ্যাখো, এই লেখাতে এতদিন পরেও সেই ছেলের কথা। ছেলের জন্য শোক!

-এই লেখাটার সঙ্গে তাঁর রোগের-

-এত সুন্দর একটা লেখা, এতেও নিন্দুকের গাত্রদাহ হয়? ঐ লেখাটাকে কুৎসিত কদর্য বিদ্রূপ করে সাপ্তাহিক 'কৃষক' পত্রিকায় একটা লেখা ছাপা হলো, তার নাম 'সুন্দরম'। নজরুল আগে লেখাটি দেখেন নি। জুলাই মাসের নয় তারিখে তিনি বেতার কেন্দ্রে গেছেন। সেদিন ছোটদের আসরে তাঁর একটা গল্প শুনাবার কথা। অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে একটু দেরি আছে, তিনি অপেক্ষা করছেন, সেখানে পড়েছিল ঐ 'কৃষক' পত্রিকাটা। সময় কাটানোর জন্য পাতা উল্টাতে উল্টাতে ঐ কুৎসিত লেখাটা তাঁর চোখে পড়লো। এটা পড়েই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর টক দিতে গিয়ে দু'চার কথা বলার পরেই তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গেল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি করে বাড়ি নিয়ে গেলেন তাঁকে...।

এই কাহিনী শুনতে শুনতে মামুনেরও যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। অতি কষ্টে আবেগ দমন করে তিনি ঝাঁঝালো গলায় বললেন, অত বড় একজন কবিকে কত অন্যায় আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে। কত নিন্দা, কত কুৎসা! ছি ছি ছি! কবিদের মন স্পর্শকাতর হয়, অন্যায় অপবাদ তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। আমাদের নিজের জাতের লোকেরাও তো তাঁকে কম দুঃখ দেয় নি!

মোতাহার সাহেব বললেন, আরে, প্রথম দিকে আমাদের নিজেদের জাতের লোকেরাই তো কবিকে আক্রমণ করেছে বেশি! মোসলেম দর্পণ কাগজে তাঁকে বলা হয়েছিল, 'ইসলাম-বৈরী মুসলমান কবি'। ইসলাম-দর্শন পত্রিকায় এক মুন্সী মোহাম্মদ লিখেছিল, "লোকটা মুসলমান না শয়তান?" তারপর "মোহাম্মদী" আর "সওগাত" কাগজের

ঝগড়ার কথা তো তোমরা জানো না। তখন তোমরা ছেলেমানুষ ছিলে। "মোহাম্মদী"তে আকরম খাঁ নজরুলকে কত গালিই না। দিয়েছেন। সেই জন্য আমরা ওঁকে বলতাম আক্রমণ খাঁ। নজরুল বলতেন, আক্রমিয়া মিঞা। সওগাত ছিল প্রগতিশীলদের কাগজ, নজরুল সেখানে 'চানাচুর' নামে একটা বিভাগ লিখতেন, কত মজা করে উত্তর দিতেন।

মামুন বললেন, আমি পুরোনো মোহাম্মদী ও সওগাতের ফাঁইল দেখেছি। মোতাহার ভাই, আপনি লক্ষ করেছেন, সেই সময় যারা নজরুলকে হীন আক্রমণ করেছিল, এখন দেখি, পূর্ব বাংলায় তারাই অনেকে নজরুলের জয়গান করে। নজরুলের জন্য তাদের কত দরদ! যত সব ভণ্ডামি!

মোতাহার সাহেব মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ জানি। দেখছি তো সব!

মামুন উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, এরাই এখন আবার নজরুলকে পাকিস্তানী কবি বানাতে চায়। নজরুলের কবিতায় মহাশ্মশান কেটে কবরস্থান বা গোরস্থান বসিয়ে দিচ্ছে। এটা আপনি সমর্থন করেন? আমাদের পূর্ব বাংলায় এখন ভাষার ওপর যে যথেচ্ছাচার হচ্ছে।

শামসুল আলম একপাশে বসে চুপচাপ শুনছিলেন সব। এবারে তিনি বললেন, আরে, মামুন মিঞা, তুমি বারবার পূর্ব বাংলা পূর্ব বাংলা কইতাছো ক্যান? পূর্ব বাংলা তো আর নাই। পূর্ব পাকিস্তান, এই বৎসর থিকা আমরা পূর্ব পাকিস্তানী। আর হিপোক্রিসিই তো আমাগো ন্যাশনাল প্যাস্টাইম!

মামুন তাঁর জামাইবাবুর দিকে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে। আস্তে বললেন, পূর্ব বাংলা না, পূর্ব পাকিস্তান। ঠিক! তবে এটা রপ্ত করতে আমার একটু সময় লাগবে! কথা ঘুরে যায় অন্যদিকে, অবধারিত ভাবে রাজনীতি এসে পড়ে।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব এলে অবশ্য রঙ্গরসের কথাই বেশি হয়। ছোট্টখাট্টো চেহারার মানুষটি। দেখলে বোঝাই যায় না, উনি অমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। আরবী, ফারসী যেমন

জানেন, তেমনই আবার সংস্কৃতে অগাধ জ্ঞান। ছেলেবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল সদানন্দ। এখনো সেই সদানন্দই আছেন।

শামসুল আলম-এর বড় মেয়ে বিলকিস, ডাকনাম মঞ্জু, সবে মাত্র সতেরো বছর বয়েস পূর্ণ। হয়েছে। মেয়েটি ভারি সুশ্রী। এমন কোমলতামাখা মুখ যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাকে দেখলেই শহীদুল্লাহ সাহেব বলেন, ও শামসুল, এ মেয়ে যে প্রায় অরক্ষণীয়া হতে চললো, এর বিয়ে দেবে না?

আলম সাহেব বলেন, আমার আর ওর মায়েরও তো তাই ইচ্ছে, কিন্তু ও যে আরও লেখাপড়া করতে চায়!

শহীদুল্লাহ সাহেব ভুরু নাচিয়ে বললেন, মেয়েদের কিঞ্চিৎ লিখনং পড়নং বিবাহেরি কারণং। বুঝলে না? অ্যাঁ?

মঞ্জু বেশ চটপট কথা বলতে পারে। সে শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললো, নানা, আপনি ঈদের নামাজে ইমাম হন, আবার কথায় কথায় সংস্কৃত বলেন কেন?

শহীদুল্লাহ সাহেব উঁচু গলায় হেসে বললেন, আমার কথা জানো না? অনেকে যে আমার নামটাই একসময় বদলে দিতে চেয়েছিল। বলিনারায়ণ! কী করে হলো জানো? শহীদ মানে বলি, আর আল্লাহ-নারায়ণ। সন্ধি করে হলো বলিনারায়ণ! তা থাক, আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছো কেন? তোমার জন্য পাত্র দেখি, অ্যাঁ?-

মামুন বললেন, মঞ্জু যদি পড়তে চায়, তাহলে পড়ান না কেন ওকে দুলাভাই!

আলম বললেন, পড়াতে তো আপত্তি নাই। কিন্তু মেয়ে বায়না ধরেছে যে সে কলকাতার কলেজে পড়বে!

কেন, কলকাতায় কেন? আমাদের ঢাকায় কি মেয়েদের কলেজ নাই? ভালো কলেজ আছে!

সে কথা বুঝায় কে বলল! তুমি পারো তত বুঝাও! কার কাছ থেকে যেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের নাম শুনেছে। সেইখানে ও ভর্তি হতে চায়। আমার এক ভাই তো থাকে কলকাতায়, পার্ক সার্কাসে বাড়ি আছে, সেইখানে থাকবে।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, মঞ্জু, তোর এত কলকাতায় গিয়ে পড়ার শখ কেন?

মঞ্জু সংক্ষেপে বললো, আমার ইচ্ছা করে।

মামুন বললেন, আমার মতে ঢাকায় পড়াই ভালো।

শহীদুল্লাহ্ সাহেব বললেন, কলকাতার কলেজগুলি কি আর আগের মত আছে?

আলম সাহেব বললেন, মেয়ের কথা শুনলে আপনারা তাজ্জব হয়ে যাবেন। ওরে আমি কলকাতায় নিয়ে গেছিলাম চুয়াল্লিশ সালে, তখন ওর বয়েস কত হবে, বড় জোর পাঁচ বছর। অথচ সেই সময়কার কথা নাকি ওর সব মনে আছে। পার্ক সাকাসে রাস্তার দুই ধারে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে, তাও তার মনে আছে! এ কখনো হয়!

মামুন বললেন, সে কলকাতা আর আগের মত নাই! শুনতে তো পাই খুব অপরিষ্কার, মানুষ এত বেড়েছে

আচ্ছা মঞ্জু, কলকাতায় তুই পড়তে গেলে, কোনো হিন্দুর ছেলে যদি তোকে বিয়ে করতে চায়?

আলম সাহেব সোসাহে হাসিমুখে বললেন, আমিও তো সেই কথা বলি! আমার মেয়ের এমন রূপ, ওকে দেখেই হিন্দু ছেলেদের মাথা ঘুরে যাবে। কেউ না কেউ ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে বিয়ে করে ফেলবেই, কী বলেন? তারপর, মঞ্জু, তুই চুলে সিন্দুর দিবি, হাতে লোহার চুড়ি পড়বি। রোজ সন্ধ্যাবেলা শঙ্খতে ফুঁ দিতে হবে, গঙ্গায় স্নান করতে করতে মন্ত্র পড়তে

হবে, মন্ত্র পড়ায় ভুল হইলেই মুখঝামটা খাবি শাশুড়ি ঠাকরুণের কাছে। তারপর কালীপূজার সময় মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে...

মঞ্জু ত্রস্তে বলে উঠলো, না, না!

তার মুখে আতঙ্কের ছাপ। তা দেখে সবাই হেসে উঠতেই মঞ্জু ছুটে পালিয়ে গেল ঘর। থেকে।

আলম সাহেব বললেন, ঐ কালী ঠাকুরের কথা শুনলেই মেয়ে ভয় পেয়ে যায়। মোতাহার ভাই এমন একখানা গল্প শুনিয়েছিলেন কালী মন্দির সম্পর্কে!

মামুন বললেন, কী গল্প, শুনি, শুনি!

মোতাহার সাহেব সেদিন উপস্থিত নেই, আলম সাহেবই শোনালেন কাহিনীটি।

মোতাহার হোসেন একসময় কলেজের প্রকটর ছিলেন। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি। গিয়ে তাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছিল তাঁর ডিউটির অন্তর্গত। সেই ব্যাপারেই একবার হয়েছিল তাঁর এক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। এসব পার্টিশনের অনেক আগেকার কথা। তাঁর একটি ছাত্র প্রায়ই বিনীত ভাবে প্রশ্ন করে, স্যার, একবার আমাদের ওখানে আসবেন না? 'ওখানে' মানে রমনার কালীবাড়ি, ছাত্রটির বাবা সেখানকার পুরোহিত। স্বাভাবিক কারণেই প্রকটরের সেখানে কখনো পদার্পণ ঘটেনি। ছাত্রটি গলবস্ত্র হয়ে অনুনয় করে, স্যার একদিন চলুন, গুরুমাকে, বাড়ির বাচ্চাদের নিয়ে আসুন, দেখে যাবেন।

মোতাহার সাহেব ছাত্রটিকে বললেন, তোমাদের মন্দিরে কি আমরা যেতে পারি? আমরা যে মুসলমান!

ছেলেটি জিভ কেটে বলেছিল, স্যার, আপনি আমার শিক্ষক, গুরুদেব। আমি নিজে আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, কোনো অসুবিধে হবে না!

মোতাহার হোসেনের এইসব ব্যাপারে খুব উৎসাহ। বাল্যকাল থেকেই তিনি হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। তার নিজের কোনো সংস্কার নেই। তাঁর স্ত্রী যেতে চান না, তবু তিনি বললেন, চলো, চলো। বাচ্চাদের নিয়ে চলো!

রেসকোর্সের মাঠে রমনা কালীবাড়িটি অনেক দিনের পুরোনো। অনেকে বলে, একসময়ে। সেখানে নরবলি হতো। মুসলমান ছেলেমেয়েরা সে কালীবাড়ির ধার-কাছ দিয়েও যায় না, দিনের বেলাতেই তাদের গা ছমছম করে। মোতাহার সাহেবের স্ত্রী তাঁর দুটি বাচ্চা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চললেন দুরুদুরু বুকে। মোতাহার সাহেব এবং তাঁর ছাত্রটি গল্প করতে করতে যাচ্ছে আগে আগে।

কালীবাড়ির কাছে পৌঁছে মোতাহার সাহেব রইলেন বাইরে, পুরুষদের সঙ্গে। তাঁর স্ত্রীকে বাচ্চাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ভেতরে। মন্দিরের ভেতরটা অন্ধকার, সেখানে জ্বলছে। একটা প্রদীপ। ওঁরা অবশ্য মন্দিরের মধ্যে গেলেন না, পাশের অন্দরমহলে দোতলায় পাত পেড়ে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, তার পাশ দিয়ে তাঁদের এনে বসানো হলো একটা খালি ঘরে। একটু পরে এক বিশাল কায় মহিলা এলেন ওঁদের সঙ্গে আলাপ করতে। তাঁর পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ী, কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর ল্যাপা, মুখখানা হাসি হাসি। প্রথমে তিনি বাচ্চা মেয়ে দুটিকে আদর করলেন, তারপর মোতাহার সাহেবের স্ত্রীর হাত ধরে সস্নেহে একথা সেকথা বলতে বলতে একসময় জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, মা, তোমরা কী জাত? ব্রাহ্মণ না কায়স্থ?

যেই শুনলেন মুসলমান, অমনি তাঁর চোখ কপালে উঠে গেল। সেই বিশালবপু নিয়ে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে লাগলেন, ওরে কী সর্বনাশ হলো! ম্লেচ্ছ এনে ঢুকিয়েছে মন্দিরে! হায়, হায়, কী হবে! মহাপাপে সবাই যে নির্বংশ হবো!

যারা খেতে বসেছিল তাদের সামনে থেকে পাতাগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, খাস নি, খাস নি! মহা পাপ হবে! সবাই পুকুরে স্নান করে আয়!

তারপর শুরু হয়ে গেল মহাগণ্ডগোল। একদল দুদ্দাড় করে নিচে নেমে যাচ্ছে, অন্য দল। উঠে আসছে ওপরে। এরই মাঝখানে এক অসহায় মহিলা তাঁর দুটি বাচ্চাকে নিয়ে বেরবার পথ। পাচ্ছেন না। মেয়ে দুটি ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

মামুন সর্বাঙ্গে কাঁটা হয়ে শুনছিলেন, এই পর্যন্ত শোনবার পর তিনি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর? ওদের কি মারধর করলো?

আলম সাহেব বললেন, না, সে সব কিছু হয়নি। সেই ছাত্রটিও শেষ পর্যন্ত ওদের বার করে নিয়ে আসে এবং নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেয় বাড়িতে। সে বারবার ক্ষমা চেয়েছিল গলবস্ত্র হয়ে। সে আগে থেকে সবাইকে জানিয়ে রাখলে বোধহয় এতটা হতো না! কিন্তু ঐ বাচ্চা মেয়ে দুটির কী অভিজ্ঞতা হলো বলো তো! কতদিন কেটে গেছে, এখনো সেই কথা ভাবলে তাদের গায়ে কাঁটা দেয়!

মামুন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। ঠিক এতটা না হলেও এর কাছাকাছি অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁরও আছে। আবার এর উল্টো অভিজ্ঞতাও হয়েছে, কিন্তু অল্প বয়েসের অপমানের কথাই সারাজীবনের মত দাগ কেটে যায়।

এ বাড়ির জানলা দিয়ে পাশাপাশি দুটি জনশূন্য বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। দরজা-জানলা ভাঙা। ও বাড়ির মানুষরা এদেশ ছেড়ে চলে গেছে। যেতে বাধ্য হয়েছে। হয়তো ওদের কোনো দোষ ছিল না, আবার একেবারে যে ছিল না তাও জোর দিয়ে বলা যায় না।

মাঝে মাঝে মামুন একা একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসেন। ঢাকা শহরের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। তাঁর যৌবনে দেখা ঢাকা শহর ছিল ছিমছাম, সুন্দর। এইসব এলাকাগুলো ছিল শান্ত, নির্জন। তখন কত পুকুর ছিল, ফাঁকা মাঠ ছিল, অবস্থাপন্ন লোকদের বাড়ির সামনে বড় বড় বাগান ছিল। পার্টিশানের পর অনেক হিন্দু ঢাকা শহর ছেড়ে সীমান্তের ওপারে চলে গেছে, তার বদলে নতুন লোক এসেছে পাঁচ গুণ বা তারও বেশি। কলকাতা থেকে এসেছে অনেকে, বিহার থেকে, আসাম থেকে এসেছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও দলে

দলে আসছে। কিছু বাড়ি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, কিছু বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে, আর পুকুর-মাঠ নিশ্চিহ্ন করে নিত্য নতুন বাড়ি উঠছে সব দিকে।

প্রেস ক্লাবের বাড়িটাতে ছিলেন অধ্যাপক সত্যেন বোস। হাতির পুলের কাছেই এক বাড়িতে থাকতেন মোহিতলাল মজুমদার। ঐ বাড়িতে ডঃ সুশোভন সরকার। পুরোনো স্মৃতি ছায়াছবির মতন ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

একদিন কবি জসিমুদ্দিনের বাড়িতে সারা সন্ধে আড্ডা দিয়ে ফেরবার পথে মামুন একটা ভাঙা বাড়ির সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। এর আগেও এই বাড়ির পাশ দিয়ে বেশ কয়েকবার গেছেন, তখন কিছু খেয়াল হয়নি, আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

এটাই রাজেন সর্বাধিকারীর বাড়ি নয়?

দেয়ালে পোড়া পোড়া দাগ, আগুন লেগেছিল, কোনো একসময় আগুন লাগানো হয়েছিল নিশ্চয়ই। বাড়িটার চেহারাই তাই পাল্টে গেছে। সদর দরজার দিকটাই ছিল অন্যরকম, সামনে ছিল অতসী ফুলগাছের ঝাড়। মোটাসোটা চেহারার ডাক্তারবাবু ধুতি আর ফতুয়া পরে ঐ বাগানে জল দিতে দিতেই অনেক সময় রুগীদের অসুখের বিবরণ শুনে নিদান দিতেন। রাজেন ডাক্তারের এক ছেলের নাম ছিল বিকু, ব্যাডমিন্টনে চাম্পিয়ন ছিল সে। মামুন তাঁর সঙ্গে অনেকদিন খেলেছেন। এই বাড়ির পেছনেই ছিল ব্যাডমিন্টন কোর্ট, সাদা প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা ছিপছিপে ঝকঝকে চেহারার বিকু সেখানে ছোট ছোট ছেলেদের ট্রেনিং দিত, এ বাড়ির মেয়েরাও ব্যাডমিন্টন খেলতো নিয়মিত, তাদের খেলা দেখতে ভিড় জমে যেত এখানে। একটি মেয়ের নাম ছিল মল্লিকা, সে ছিল লক্ষ্মী ট্যারা, সে মামুনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি হতো খুব। সব মনে পড়ে যাচ্ছে।

রাজেন ডাক্তার কি এখানেই মারা যান? বিকু, মল্লিকা:তাদের দীর্ঘশ্বাস কি এ বাড়ির আনাচে কানাচে রয়ে গেছে? বাড়িটা পুরোপুরি অন্ধকার নয়, ভেতরে কোথাও যেন মিটমিট করে জ্বলছে একটা প্রদীপ বা মোমবাতি। এখানে কেউ থাকে এখানে? মামুনের

একবার ইচ্ছে হলো সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখেন। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি তাঁর চেনা। কিন্তু মামুনের ভয় করলো।

এরপর বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা হারিয়ে ফেললেন মামুন। সব রাস্তাই যেন অন্ধকার অন্ধকার লাগে। যেন পুরো শহরটাই অতীতে ডুবে গেছে। রাস্তায় দু'একটি লোক চলাচল করছে, তাদের জিজ্ঞেস করবেন সেগুনবাগিচা কোন্ দিকে? মামুনের লজ্জা হলো, ঢাকা শহরটা তাঁর এত. চেনা, অথচ তিনি পথ চিনতে পারছেন না? একসময় টানা আড়াই বছর তিনি চাকরি করেছেন ঢাকায়।

শেষ পর্যন্ত কারুকে জিজ্ঞেস না করেই, অনেক পথ ঘুরে তিনি পৌঁছে গেলেন সেগুনবাগানে। দোতলায় হারমোনিয়ামের সুর আর গান শোনা যাচ্ছে। ওপরে এসে দেখলেন আজ বাইরের কোনো গায়ক বা আড্ডাধারী আসেনি, দুলাভাইও নেই সেখানে, আজ বসেছে অল্প বয়েসীদের আসর। মঞ্জু গান গাইছে হারমোনিয়াম বাজিয়ে, তার সামনে বসে আছে তারই কাছাকাছি বয়েসী আর তিনটি ছেলেমেয়ে।

দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মামুন একটুক্ষণ শুনলেন। মঞ্জু শুধু দেখতেই সুন্দর হয় নি, বেশ মিষ্টি গানের গলা তো! সে গাইছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে!"

মামুনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। দিনকাল কত তাড়াতাড়ি পাল্টে যাচ্ছে। বছর কুড়ি আগেও ঢাকায় এইসব পরিবার কত রক্ষণশীল ছিল! মঞ্জুর বয়েসী কোনো মেয়ে বেনী দুলিয়ে প্রেমের গান গাইছে, সামনে দুটি অপরিচিত যুবক, এ দৃশ্য তখন কল্পনাও করা যেত না। শিক্ষিত হিন্দুদের বাড়িতে, বিশেষত ব্রাহ্মদের বাড়িতে অবশ্য এসবের চল ছিল। তারা এখন নেই, নতুন কালের ছেলেমেয়েরা সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে। অচেনা একটি ছেলে মাঝে মাঝে গলা মেলাচ্ছে মঞ্জুর সঙ্গে।

ওরা হয়তো মামুনকে দেখে অস্বস্তিবোধ করবে, তবু মামুনের চলে যেতে পা সরলো না। একবার তার সঙ্গে মঞ্জুর চোখাচোখি হতেই মামুন অপ্রস্তুতের হাসি দিয়ে বললেন, আমি তোদের মধ্যে এসে বসতে পারি?

মঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে মামুনের হাত ধরে টেনে বললো, আসেন, আসেন। আপনিও তো। গান জানেন, আপনি আমাদের গান শোনাবেন।

এই যৌবনের সাহচর্যে মামুনের মন হালকা হয়ে গেল। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, অকারণ হাসি, এসব শুধু যৌবনেই সম্ভব।

অনেক গান হলো, মামুনও গাইলেন কয়েকখানা। অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে দু'জন শামসুল আলমের আত্মীয়। একজন তাঁর খুড়তুতো ভাইয়ের মেয়ে, আর একজন পিসিমার ছেলে। ওদের নাম নাজমা আর রশীদ। আর একটি ছেলের নাম পলাশ, সে রশীদের বন্ধু। ওরা সবাই এসেছে কলকাতা থেকে, কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মামুন বুঝে গেলেন মঞ্জুর কেন কলকাতার কলেজে গিয়ে পড়ার আগ্রহ। তিনি কবি মানুষ, মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক চট করে টের পেয়ে যান। মঞ্জুর সঙ্গে রশীদের সেইরকম একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে, দু'জনে দু'জনের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকায়।

মামুন ভাবলেন, আহা রে, ওরা যেন কষ্ট না পায়। এই বয়েসের কষ্টে বুক ভেঙে যায় একেবারে!

পলাশ নামের ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে কথায় কথায় পুরোনো পরিচয়ের সূত্র বেরিয়ে পড়লো। পলাশের বাবার নাম সুরঞ্জন ভাদুড়ী, তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন মামুন। নাজিমুদ্দিন রোডে কাজী আবদুল ওদুদের জোহরা মঞ্জিলের পাশেই ছিল ওঁদের বাড়ি। সে বাড়ির নাম ছিল শান্তি কুটির। কী গমগমে গানের গলা ছিল সুরঞ্জনবাবুর, একেবারে পঙ্কজ মল্লিককেও হার মানিয়ে দিতেন। এই বাড়িতেও তিনি আসতেন নিয়মিত।

খোঁজখবর নিয়ে জানলেন যে সুরঞ্জন ভাদুড়ীদের কোনো ট্রাজেডির শিকার হতে হয়নি, সময় মতন বাড়ি বদল করে চলে গেছেন। তাঁরা পেয়েছেন কলকাতার পার্ক সাকাসের একটি ভালো বাড়ি, রশীদদের বাড়ির কাছেই। সেই জন্যই রশীদের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব। রশীদরা। ঢাকায় আসছেন শুনে সুরঞ্জন ভাদুড়ী তাঁর ছেলেকে বলেছেন, যা, তুইও ঘুরে আয়। নিজের জন্মভূমিটা একবার দেখবি না?

পলাশ তাদের প্রাক্তন বাড়িতে রশীদদের সঙ্গে গিয়েছিল এর মধ্যে। সে বাড়ির বর্তমান মালিক তাকে খুব খুব খাতির যত্ন করেছেন, একেবারে অন্দর মহলে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন সব কিছু। খাইয়েছেন খুব। বর্তমান মালিকও তো একসময় কলকাতার লোক ছিলেন, তাই পলাশদের পেয়ে তিনি মেতে উঠেছিলেন পুরোনো গল্পে।

এসব কথা শুনে মামুনের খুব ভালো লাগলো। সুরঞ্জন ভাদুড়ী তাঁর প্রিয় গায়ক ছিলেন, এখন তিনি কলকাতায় বাংলা সিনেমায় সুর দেন। ছেলেটিরও গানের গলা বেশ।

একসময় মালিহা বেগম এসে খাওয়ার তাড়া দিলেন সকলকে। রশীদরা উঠেছে তাদের অন্য এক আত্মীয়ের বাড়িতে, আজ রাতে এখানে খেয়ে যাবে। একসঙ্গে খেতে বসলো সকলে। মামুনের দিদি নিজে রান্না করেছেন, তাঁর রান্নার হাত অপূর্ব।

প্রথমে বিরিয়ানি পাতে পড়তেই মামুন সংকীর্ণ চোখে পলাশের দিকে তাকালেন। এই বিরিয়ানির মধ্যে রয়েছে বড় গোস্ত। তাঁর হঠাৎ পুরোনো একদিনের কথা মনে পড়লো।

তিনি বললেন, আপা, পলাশকে বিরিয়ানি দিও না। ওর জন্য অন্য কিছু করো নি?

মালিহা হাতা দিয়ে বিরিয়ানি তুলতে গিয়েও অপ্রস্তুত হলেন।

রশীদ বললো, না, না, ঠিক আছে। ও খায়!

পলাশ বলল, বিফ বলছেন তো? আমি বিফ খাই। রশীদদের বাড়িতে কতবার খেয়েছি।

মামুন তাঁর দিদির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপা, তোমার মনে আছে?

মালিহা চোখ দিয়ে একটা ইসারা করলেন, যাতে মামুন ঐ সব প্রসঙ্গ এখন না তোলেন!

মামুন কিছু বললেন না, কিন্তু মনে পড়া তো আটকানো যায় না। এই পলাশের বাবা সুরঞ্জন ভাদুড়ী এ বাড়িতে কত এসেছেন, কত গান গেয়েছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু এ বাড়িতে কোনোদিন তাঁকে কোনো খাবার খাওয়ানো যায় নি। গোরুর মাংস তো দূরের কথা, সামান্য কোনো মিষ্টি বা এক গেলাস পানিও মুখে তোলেন নি কখনো। অন্যরা খাচ্ছে, সেই। সময় তাঁকে কিছু খাওয়াবার প্রস্তাব দিলেই হাত জোড় করে বলতেন, ঐটা মাপ করবেন। বামুনের ছেলে, আর কিছু না মানি, শুধু এইটুকু মানি, অন্যের বাড়িতে কিছু খাই না।

প্রত্যেকবার এই কথাটা শোনা মাত্র তাঁর গানের সুরের রেশ কেটে যেত!

মামুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, মাত্র একটা জেনারেশন। আর এক জেনারেশান আগে যদি এরকম মেলামেশা থাকতো, যদি খাদ্যের বাছবিচার কিংবা ছোঁওয়াছানির ব্যাপার না থাকতো, তা হলে সুরঞ্জন ভাদুড়ীর মতন মানুষদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হতো না।

এমনকি, তাহলে হয়তো পাকিস্তান, দেশ বিভাগের প্রশ্নই উঠতো না!

কারণটা খুব সামান্য মনে হয়, কিন্তু এই সব অনেক সামান্য কত বীজ থেকেই তো বিষবৃক্ষ জন্মায়। আস্তে আস্তে বাড়ে। অবিশ্বাস আর ভুল বোঝাবুঝির সার-পানি পেয়ে তা একদিন মহীরুহ হয়।

হাত গুটিয়ে, খাওয়া বন্ধ করে মামুন চেয়ে রইলেন এই নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের দিকে।

৩৩ বেশ তাড়াতাড়িই শীত পড়ে গেছে

বেশ তাড়াতাড়িই শীত পড়ে গেছে এবার। সকালের রোদ্দুর বড় মধুর লাগে। এ বাড়িতে কাবুল নামে একটা ছোঁকরা চাকর আছে, সে কোথা থেকে যেন প্রত্যেক ভোরবেলা জোগাড় করে আনে এক কলসী খেজুরের রস। কী ঠাণ্ডা আর সুস্বাদু সেই রস, এর তুলনায় কোথায় লাগে বোতলের মিষ্টি পানি!

কিন্তু মামুনের দিদির ছেলেমেয়েরা অনেকেই এই রস খেতে চায় না। তাদের নাকি কী রকম গন্ধ লাগে! মামুন শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়! ছেলেমেয়েগুলো একেবারে শহুরে হয়ে গেল! ওরা কোকা কোলার খুব ভক্ত। এই মার্কিন পানীয় একেবারে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। প্রথম প্রথম যখন আসে, তখন লোকে কত রকম ভাবেই না উচ্চারণ করতো এই নাম, খোকা কোলে, চোচা চুলা, কোচা খোলা, চোকা চোলা আরও কত কী! মামুন নিজে দু-এক বার খেয়ে দেখেছেন, এমন কিছু আহা মরি স্বাদ পান নি।

মার্কিন জিনিসপত্রে ছেয়ে যাচ্ছে দেশ। মার্কিনী সিনেমার প্রভাবে মার্কিনী ধাঁচে পোশাক-আসাক পরতে শুরু করেছে যুবক-যুবতীরা। গ্রামের নব্বই ভাগ মানুষ এখনো দু'বেলা খেতে পায় না, আর শহরের মানুষ বিদেশ থেকে আমদানি করা বিস্কুট দিয়ে চা খায়।

মামুনের মেয়ে হেনা অবশ্য রস ভালোবাসে। ফুটফুটে সুন্দর মুখোনি তার, সে মায়ের রং পেয়েছে, সবাই তার গাল টিপে আদর করে বলে, ঠিক পুতুলের মতন! এই কথাটা বারবার শুনতে শুনতে মামুন ভাবেন, বেশির ভাগ মানুষেরই কল্পনা শক্তি কত কম। সবাই 'পুতুলের মতন' বলে কেন, মানুষকে পুতুলের মতন দেখতে হলে কী সুন্দর বোঝায়?

এ বাড়িতে হেনার কাছাকাছি বয়েসের আরও ছেলেমেয়ে থাকলেও সে বেশির ভাগ সময় বাবার কাছ ঘেঁষে থাকে। রাত্তিরে বাবার সঙ্গেই শোয়। দিনের বেলা মামুন বাইরের ঘরে।

অন্যদের সঙ্গে গল্প করার সময়েও হেনা বারেবারেই একটা পড়ার বই নিয়ে ছুটে আসে, বলে, আব্ব, এই কথাটার মানে বলে দেন!

সকালবেলায় মামুন হেনা আর তার সমবয়েসী বাবলিকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন। হাঁটতে হাঁটতে চলে যান বেশ অনেকটা দূরে, ফেরেন রিকশাতে। ঢাকা শহরটাকে যেন তিনি নতুন করে চিনছেন।

একদিন সকালে মঞ্জু বললো, মামু, আমি একটু যাবো আপনার সাথে?

মামুন বললো, হ্যাঁ, চল না!

মঞ্জু বললো, আপনি তাহলে একটু আম্মুকে বলেন। আমি চাইলে আম্মু মত দেবে না।

মামুন দিদিকে জানিয়ে মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন। একটা আকাশী নীল শাড়ী পরেছে মঞ্জু, সেই রঙের ব্লাউজ, চোখে সূক্ষ্ম সুমা টানা, কপালে একটা লাল টিপ। প্রাতঃভ্রমণের পক্ষে একটু বেশিই সাজগোজ মনে হয়। মামুন মনে মনে হাসলেন। মঞ্জুর নিশ্চয়ই একটা কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। মামুনের দিদির বাড়ি অনেক ব্যাপারে প্রগতিশীল হলেও বাড়ির মেয়েদের এখনো একা রাস্তায় বেরুবার অনুমতি দেওয়া হয় না। কলকাতার রাস্তায় যেমন মেয়েদের হাঁটতে দেখা যায়, ঢাকায় এখনো সে রকম নয়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মামুন ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোন দিকে যাবো, বিলকিসবানু?

মঞ্জু কিছু বলার আগেই হেনা বললো, আব্ব, নদীর দিকে চলেন।।

বুড়ি গঙ্গার ঘাটে অনেক নৌকো বাঁধা থাকে, বড় বড় স্টিমার ভোঁ ছাড়ে, একদিন সেইসব দেখে হেনার খুব পছন্দ হয়েছিল।

মঞ্জু বললো, না, না, ওদিকে না, ধানমণ্ডির দিকে যাবো, ওদিকে সুন্দর সুন্দর বাগান আছে।

মামুন আবার মুচকি হাসলেন। তিনি ঠিকই ধরেছেন। শহীদ পলাশরা ঐ ধানমণ্ডিতেই এক বাড়িতে উঠেছে। গত তিন-চারদিন শহীদরা এদিকে আসে নি, এর মধ্যেই কিছু ঘটেছে নাকি? কাল সারাদিন দিদির মুখখানা ভার ভার দেখাচ্ছিল। কলকাতার ছেলেরা আবার বেশি। বাড়াবাড়ি করে ফেলে নি তো?

মামুন মঞ্জুকে তবু বললেন, কেন, চল না, নদীর দিকেই যাই!

মঞ্জু করুণ মুখ করে বললো, না মামু, ধানমণ্ডির দিকে গেলেই ভালো লাগবে, চলেন না, দেখবেন কত নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে।

–অতদূর হেঁটে যেতে পারবি, না রিকশা লাগবে?

–হেঁটেই যাবো!

মঞ্জু একা কখনো রাস্তায় না বেরুলেও সে রাস্তা চেনে। সে-ই পথ দেখিয়ে আগে আগে চললো।

এক সময় ঢাকায় ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা ছিল প্রচুর। টাঙ্গাচালক কুট্টিরা ছিল এক চতুর প্রজাতি। কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ছিল তাদের, অবশ্য তাদের অনেক রসিকতাও ফিরতে লোকের মুখে মুখে। স্বাধীনতার পর সেই কুট্টিরা দ্রুত অপসৃত হয়ে গেল, তাদের জায়গায় এসেছে সাইকেল রিকশা। রাস্তা একেবারে ভরে গেছে সাইকেল রিকশায়। এদের জন্য সহজে রাস্তা পার হওয়া যায় না। তবু কলকাতার মানুষ-টানা রিশার চেয়ে এই রিশা অনেক ভালো। মামুনের মনে আছে, তাঁর ছাত্র বয়েসে কলকাতার অধিকাংশ রিকশা টানতো বিহারী মুসলমানরা। মামুন কক্ষনো কলকাতায় রিকশা চাপতেন না!

মঞ্জু বেশি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে, সে আর ধৈর্য ধরতে পারছে না বোধহয়, মামুন এগিয়ে তার পাশে গেলেন। মঞ্জুর সরল মুখোনিতে ব্যগ্রতা আর অস্থিরতা মাখানো। তার চোখ দুটি ছুটন্ত হরিণীর মতন। ছুটন্ত হরিণীর চোখ কেমন হয় মামুন কখনো দেখেন নি, তবু এই উপমাটাই মনে পড়লো তাঁর। মঞ্জুর মুখের সঙ্গে হরিণীর মুখের একটু মিল আছে ঠিকই।

–কি রে, মঞ্জু, তুই এখনো কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়ার বায়না ধরে আছিস নাকি?

মঞ্জু তার টলটলে চোখ দুটি মামুনের দিকে ফিরিয়ে বললো, জী!

–তুই তো বড় জেদী মাইয়া দেখি! কেন, কলকাতার ওপরে তোর এত টান কেন?

–আমার ইচ্ছা করে।

মঞ্জুর ওপর মামুনের যথেষ্ট স্নেহ থাকলেও তিনি তার এই ইচ্ছেটা সমর্থন করতে পারছেন না। দেশ স্বাধীন হয়েছে, মুসলমানরা তাদের দাবি মতন পাকিস্তান পেয়েছে, এখন এখানকার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে বিদেশে যাবে কেন? এ দেশে কি ইস্কুল কলেজ নেই। উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে হয় তো সে আলাদা কথা! তবু, এ দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। ছেলেমেয়েদের সামান্য স্কুল-কলেজের লেখাপড়ার জন্যই পাঠাচ্ছে বিলেত-আমেরিকায়। ফরেন এক্সচেঞ্জের শ্রাদ্ধ হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানী বড়লোকরা তো পাঠাচ্ছেই, বাঙালীদেরও উৎসাহের কমতি নেই। মুখে বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য কত দরদ, কিন্তু নিজের সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবার জন্য একেবারে পাগল! যাদের বিলেত-আমেরিকায় পাঠাবার সামর্থ্য নেই, তারা ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছে ইণ্ডিয়ার পাবলিক স্কুলে, দার্জিলিং-এ, আজমীরে। মামুনের পরিচিত, আওয়ামি লীগের প্রথম সারির নেতা আতাউর রহমান খানই তো তাঁর দুই ছেলেকে পাঠিয়েছেন শিলং- এ।

মামুন গলায় অভিভাবকসুলভ গাম্ভীর্য এনে বললেন, না মামনি, যদি পড়তে চাও, তোমাকে ঢাকাতেই পড়তে হবে।

মঞ্জু বললো, আমি আরও কেন ঢাকায় পড়তে চাই না জানেন? এখানে থাকলে আমার পড়াই হবে না!

–কেন, ঢাকায় কি অন্য মেয়েরা পড়ছে না? কত মেয়ে এখান থেকে দুর্দান্ত রেজাল্ট করে বেরিয়েছে।

–আপনি আমাদের বাড়ির মানুষদের চেনেন না। যেদিন থেকে আমি শাড়ী পরতে শুরু করেছি, সেদিন থেকে আমার নানা-নানীরা আমার...

বলতে বলতে থেমে গেল মঞ্জু। লজ্জায় তার গালদুটিতে অরুণাভা এলো, আবার চোখের কোণেও যেন অশ্রু চিক চিক করলো।

মামুন তার মাথায় হাত রেখে বললেন, সবাই বিয়ের কথা বলেন তো? বিয়ের পরেও তো তুই লেখাপড়া করতে পারিস!

মঞ্জু মুখ ফিরিয়ে বললো, না!

মামুন একটু অবাক হয়ে গেলেন। মঞ্জু বিয়ে করতে চায় না? সতেরো বছর বয়েস হয়েছে, এই বয়েস থেকেই তো মেয়েরা বিয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। শহীদ বলে ছেলেটার সম্পর্কে ওর যে টান হয়েছে, সেটা কি অন্য কিছু?

পর মুহূর্তেই মামুন আত্মসমালোচনা করলেন। তিনিই বা কেন মঞ্জুর এক্ষুনি বিয়ে দিয়ে। দেওয়ার ব্যাপারটা সমর্থন করছেন? তিনি কি মনে মনে বুড়োটে হয়ে গেছেন! এই বয়েসী মেয়ের তো আরও কত রকম স্বপ্ন থাকতে পারে! মঞ্জুর নানা-নানীর দলের পক্ষ নেওয়া তো তাঁকে মানায় না!

ধানমণ্ডিতে এসে মঞ্জু ঠিক স্থির লক্ষ্যেই চললো। সোজা একটি বাড়ির সামনে এসে থেমে বললো, মামু, এইটা হোসেনচাচার বাড়ি। আপনি হোসেনচাচারে চেনেন না?

মামুন তাঁর জামাইবাবুর আত্মীয় শাখাওয়াত হোসেনকে একটু-আধটু চেনেন। মঞ্জুর কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, এখন এই বাড়ির মধ্যে যাওয়াই তাঁর কর্তব্য।

বাড়ির দরজার কাছে যাবার আগেই সে বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে একটি যুবক চেঁচিয়ে বললো, মঞ্জু এসো, এসো!

মামুনের বুকটা একবার ধক করে উঠলো। ছেলেটি শহীদ নয়, পলাশ। এত সকালে সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে! সে কি জানতো যে মঞ্জু আজ সকালে আসবে? আগে থেকে ওদের মধ্যে কথা হয়ে ছিল! শহীদ কোথায়? তিনি ভেবেছিলেন, শহীদের সঙ্গেই মঞ্জুর মনের আদান প্রদান হয়েছে! তা হলে কি মঞ্জুর মনের মানুষ শহীদ নয়, পলাশ? এই ছেলেটির গানের গলা। ভালো। এ সেদিন মঞ্জুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইছিল। মঞ্জু যদি এরকম একটা সাংঘাতিক ভুল করে বসে, তা হলে তার পরিণতি কী হবে?

আবার মামুন আত্মসমালোচনা করলেন। সত্যিই কি তিনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন? এতকাল তিনি নিজেকে মানবতাবাদী মনে করতেন, তাহলে তিনি শহীদ আর পলাশের মধ্যে তফাত করছেন কেন? দু'জনেই যুবক, দু'জনেরই মঞ্জুর প্রেমিক হবার যোগ্যতা আছে, তবু তিনি পলাশকে অপছন্দ করছেন, সে হিন্দু বলে?

মামুন নিজেই এর উত্তর তৈরি করে মনকে বোঝালেন, আমার পছন্দ-অপছন্দে তো কিছু আসে যায় না! মঞ্জুর মনের মানুষ যদি শহীদের বদলে পলাশ হয়, তা হলে দু'পক্ষেই অনেক গোলমালের সৃষ্টি হবে! মঞ্জু তা সহ্য করতে পারবে তো?

দরজা খুলে দিল পলাশ, কিন্তু সে একা নয়, শহীদকেও ডেকে এনেছে। যুবক দুটি মঞ্জুর দিকে নজর না দিয়ে মামুনকেই বেশি খাতির করে বললো, আসুন, মামুনমামা, আসুন।

মামুন তবু অস্বস্তি বোধ করলেন। শাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যৎসামান্য। বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে এরকম হুট করে তাঁর বাড়িতে এসে পড়া মামুনকে মানায় না।

বিশেষত এত সকালে। এখন এরা নিশ্চয়ই নাস্তা করে যেতে বলবেন। এই বয়েসে তিনি কি প্রেমের দূতিয়ালির ভূমিকা নিচ্ছেন?

শহীদ বললো, মামুনমামা, আমরা গোয়ালন্দ গিয়েছিলুম। দারুণ লাগলো।

পলাশ বললো, স্টিমারে করে রিভারজার্নি, একেবারে ফ্যান্টাস্টিক! আমার তো এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স আগে কোনোদিন হয় নি। মঞ্জুকে কত করে বললুম আমাদের সঙ্গে যেতে!

মামুন আড় চোখে তাকালেন মঞ্জুর দিকে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকিয়ে আছে শহীদের দিকে। একেবারে নিষ্পলক দৃষ্টি।

মামুনের আবার খটকা লাগলো। তবে কি একটু আগে তিনি ভুল বুঝেছিলেন? পলাশ যে-ভাবে দোতলার বারান্দা থেকে মঞ্জু মঞ্জু বলে চেঁচিয়ে উঠলো, এদিককার কোনো ছেলে কোনো অনাত্মীয় মেয়েকে ওরকমভাবে ডাকে না। পলাশের ঐ অতি-আগ্রহ, তা কি নিজের জন্য নয়, বন্ধুর জন্য?

মামুনকে বাইরের বসবার ঘরে বসিয়ে মঞ্জু চলে গেল অন্দরমহলে। দু'চার কথা বলে পলাশ আর শহীদও সরে পড়লো। হেনা আর বাবলি বসে রইলো মামুনের গা সেঁটে।

মামুন ওদের বললেন, যা, ভিতরে যা, দিদির সঙ্গে যা!

হেনা আর বাবলি যেতে চায় না। ওরা শিশু হলেও বুঝেছে যে মঞ্জু আপা এখন ওদের দিকে মনোযোগ দেবে না। অচেনা বাড়িতে ওরা আর কার কাছে যাবে?

একটু পরেই চটি ফটফটিয়ে শাখাওয়াত হোসেন এলেন সেই ঘরে। এককালে রোগা পাতলা ছিলেন, এখন বিরাট হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর একটা বেশ দামি শাল। হোটেলের ব্যবসায় তিনি রাতারাতি ধনী হয়েছেন, এতবড় বাড়ির মালিক হয়েছেন মাত্র দু'বছরের মধ্যে, জাপানী গাড়ি কিনেছেন।

মামুনকে সাদর সম্ভাষণ করে তিনি বললেন, কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য, আপনার মতন মানুষ পায়ের ধূলি দিয়েছেন আমার বাড়িতে! কী সংবাদ কন? আপনার কোন সেবায় লাগতে পারি?

সত্যিকারের অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়লেন মামুন। অসময়ে কারুর বাড়িতে এলে এটা ভাবাই তো স্বাভাবিক যে কোনো জরুরি কথা আছে। ওঁর সঙ্গে মামুনের এমন কিছু বন্ধুত্বও নেই যে বলবেন, এমনিই আপনার খবর নিতে এলাম। মঞ্জু তাঁকে সত্যি বিপদে ফেলে দিয়েছে।

আমতা আমতা করে মামুন বললেন, অনেকদিন পরে দেখা হলো। আপনার শরীর কেমন?

হোসেন সাহেব বললেন, পেচ্ছাপে একটু চিনি হয়েছে, তা ছাড়া এমনিতে ভালোই আছি। আপনি কেমন?

মামুন বললেন, আমার ব্লাড পেশার কিছুটা হাই। তবে ওষুধপত্তর কিছু খাই না। থানকুনি পাতার রস খাই। আপনিও খেয়ে দেখতে পারেন, ওতে শুগারও কমে।

হোসেন সাহেব সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন। এই সকালবেলা বাড়ি বয়ে মামুন কি এইসব আলোচনা করার জন্য এসেছেন?

মামুনও বুঝতে পারলেন, তাঁর বোকামি হচ্ছে। কিন্তু তিনি কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতন একটা নাম মনে পড়লো। আলতাফ! আলতাফের কাছে বেশ কয়েকবার তিনি শাখাওয়াত হোসেনের নাম শুনেছেন। আলতাফদের সঙ্গে এর কী যেন একটা পারিবারিক সম্পর্ক আছে। একে আলতাফ হোটেলওয়ালা হোসেন বলে উল্লেখ করেছিল।

মামুন এবারে খানিকটা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আলতাফের কাছে আপনার অনেক কথা শুনেছি।

কিন্তু এর ফল হলো বিপরীত। হোসেন সাহেবের ভুরু আরও কুঁচকে গেল। তিনি নীরস গলায় বললেন, আলতাফ মানে, আমার ভাইয়ের ব্যাটা আলতাফ? তারে আপনি চেনলেন ক্যামনে?

–সে মাদারিপুরে আমার বাড়িতে গিয়েছিল। খুব ভালো ছেলে।

–সেডারে তো আমি দুই চক্ষে দ্যাখতে পারি না। সে কী কইছে আমার সম্পর্কে?

–আপনার অনেক প্রশংসা করছিল।

–কিন্তু তার সাথে তো আমি কোনো সম্পর্ক রাখি না। আমার বাড়িতেও তারে আসতে মানা করছি।

–সে কি? কেন? আমার তো ছেলেটিকে বেশ পছন্দ হয়েছে।

–আপনি তা হলে ওদের ভালো করে চেনেন না। ওরা পাকিস্তানের দুশমন। ঐ সব মতিচ্ছন্ন ছেলেদের জেলে ভরে রাখা উচিত।

–কিন্তু আপনি ওদের পার্টি ফাণ্ডে মোটা চাঁদা দিয়েছেন শুনেছি। মাঝে মাঝেই দ্যান।

তা দেই, সে অন্য কথা। ব্যবসা করে খেতে হয়, তাই চান্দা দিতে হয়। আপনিও ওদের দলে আছেন নাকি? ওরা তো কমুনিস্ট!

মামুন দুর্বল ভাবে হেসে বললেন, না, এটা বোধহয় আপনি ঠিক বলছেন না। ওরা তো যুব লীগ করে।

হোসেন সাহেব জোর দিয়ে বললেন, শোনেন, আপনারে আমি বুঝয়ে বলি। বরিশালে কমুনিস্টদের স্থানীয় জনসাধারণ পিট্টি দিয়েছিল, সে কথা জানেন তো? এখন কমুনিস্টগুলা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে গেছে। ওদের মধ্যে অনেক হিন্দু আছে, তারাই আলতাফের মতন

বলদগুলারে ক্ষ্যাপায়। এখন ওরা তলে তলে সব আওয়ামী লীগের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওদের জন্যই তো আওয়ামি মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম কথাটা বাদ হয়ে গেল!

মামুন এবারেও ক্ষীণ আপত্তি করে বললেন, মৌলানা ভাসানী নিজেই তো ঐ প্রস্তাব করেছেন। আসলে ব্যাপার কী জানেন, মুসলিম লীগের সঙ্গেই তো আমাদের লড়তে হবে, তাই আওয়ামি দলেও মুসলিম নামটা থাকলে কনফিউশান হয়।

–শুধু এই জন্য?

–তা ছাড়া, দলটার একটা অসাম্প্রদায়িক চেহারা হলে সংখ্যালঘুদেরও দলে পাওয়া যাবে। দল আরও শক্তিশালী হবে।

–আমি আপনাকে বলি, শুনে রাখেন, ঐ বুড়া ভাসানীও একটা কমুনিস্ট!

মামুন একথায় হেসে উঠলেন। হোসেন সাহেবের মুখোনি কিন্তু অতি কঠোর হয়ে আছে। তিনি হাসির উত্তর না দিয়ে বললেন, ওদের হাতে পাওয়ার গেলে পাকিস্তানের সর্বনাশ হবে। যারা এখানে বসে সেকুলারিজমের কথা বলে তারা পাকিস্তানের দুশমন। পাটিশান হইল ক্যান? আবার কি আপনারা ইণ্ডিয়ার সাথে মার্জ করতে চান? সত্য করে বলেন তো!

–না, মোটেই তা চাই না! সে প্রশ্নই ওঠে না।

–তবে! তাইলে এইসব কথা ওঠে কী ভাবে? আপনারা বাঙালী বাঙালী রব তোলেন, শুনে আমার গা জ্বলে যায়। বাঙালী হয়ে এতকাল তো আমরা হিন্দুদের হাতে কচুপোড়া খেয়েছি। এখন আমাদের হতে হবে প্রকৃত পাকিস্তানী।

মামুন এমন তর্কের মধ্যে যেতে চান না। আলতাফের প্রসঙ্গ তুলে তো আরও বিপদ হলো! হোসেন সাহেবের মতন মানুষ তিনি আরও দেখেছেন। নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য হাতে পেয়ে যারা হঠাৎ বড়লোক হয়েছে, তারা এখন মুসলিম লীগের কট্টর সমর্থক।

কথা ঘোরাবার জন্য তিনি বললেন, আপনার বাড়িতে ইণ্ডিয়া থেকে গেস্ট এসেছে। দেখলাম।

হোসেন সাহেব বললেন, হ্যাঁ। কলকাতায় আমার কিছু প্রপার্টি আছে, ওরা দেখাশুনা করে।

–কলকাতায় গেছেন নাকি এর মধ্যে?

–গেছি দুই তিন বার।

–আমি স্বাধীনতার পর আর কলকাতায় যাই নাই। কেমন দেখলেন কলকাতার অবস্থা?

–খুব খারাপ। তারচেয়ে আমাদের ঢাকা শহর অনেক ভালো। দেখবেন, আর কিছুদিনের মধ্যে কলকাতা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে, আমাদের ঢাকার আরও উন্নতি হবে।

এরপর আবার মামুন কথা খুঁজে পেলেন না। কী ভাবে আলাপ চালিয়ে যাবেন বুঝতে পারছেন না।

হোসেন সাহেব কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি কাজের মানুষ, সুতরাং তিনি ধরেই নিয়েছেন যে মামুনও কোনো কাজের কথা বলার জন্যই এসেছেন।

তিনি মামুনের চোখে চোখ ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর বলেন?

মামুন ভাবলেন, এবারে আত্মসমর্পণ করাই ভালো। সত্যি কথাটা বলে ফেললেই অস্বস্তিমুক্ত হওয়া যায়।

তিনি বললেন, ভোরবেলা বেড়াতে বেড়াতে এইদিকে এসেছিলাম। আপনাদের এদিকে সুন্দর সুন্দর নতুন বাড়ি উঠেছে। আমার আপার মেয়ে মঞ্জু, তাকে চেনেন তো, সে বললো, একবার আপনার বাড়িতে কার সঙ্গে একটু দেখা করে যাবে, তাই আমিও...।

হোসেন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে কাঠিন্যের আবরণটা সরিয়ে ফেলে বললেন, এ তো আমার সৌভাগ্য! আপনি নিজে থেকে এসেছেন...কী খাবেন বলেন।

মামুন বললেন, এখন কিছু খাবো না, এক কাপ চা।

-সে কি, গরিবের বাড়িতে এসেছেন, সামান্য কিছু নাস্তা করবেন আমাদের সঙ্গে। এই ছোট মেয়েদুটিরে এখানে বসায়ে রেখেছেন কেন? ওদের দেখি মুখ শুকায়ে গেছে! এই আবদুল-

এর পর তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আপ্যায়নের জন্য। শুরু করে দিলেন হাঁক ডাক। হোসেন সাহেব ব্যস্ত মানুষ, একটু পরেই তাঁর বেরুবার কথা ছিল, কিন্তু অতিথি সৎকারের জন্য তিনি খানিকটা সময় নষ্ট করতেও দ্বিধা করলেন না।

প্রথমে একবার চা এলো। তারপর হোসেন সাহেব মামুনের সামনেই নামাজ পড়তে বসলেন। বিশেষ বিশেষ উৎসব ছাড়া মামুন প্রতিদিন নামাজ পড়েন না। এখন তিনি শাখাওয়াত হোসেনের ব্যক্তিত্বের সামনে একটু কাচুমাচু হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, এই অবস্থায় তাঁর চুপ করে বসে থাকা ভালো দেখায় না। তিনিও নামাজ পড়তে বসে গেলেন।

নাস্তা শেষ করার পর মঞ্জু এসে বললো, মামু, ওরা গাড়ি করে সোনার গাঁওয়ে যাচ্ছে। আমাকেও যেতে বলছে সাথে। আমি যাবো?

মামুন চমকে উঠলেন। মঞ্জু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছে না? এখন সোনার গাঁও গেলে ফিরতে অনেক দেরি হবে। দিদি যদি রাগ করেন? দিদির বাড়িতে কী নিয়ম তিনি জানেন না ঠিক। তিনি মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, দায়িত্ব তাঁর।

তিনি বললেন, না মামণি, এখন বাড়ি চলো। অন্যদিন যেও!

মঞ্জুর মুখখানা ম্লান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শহীদ বললো, কেন মামা, ও চলুক না আমাদের সঙ্গে। দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসবো।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ 'সোনার গাঁও যাবে কেন?

–এমনিই বেড়াতে যাবো। কাদের ভাই বলছেন, গাড়িটা পাওয়া যাবে। মঞ্জুকে আমরা বাড়ি পৌঁছে দেবো।

–আর কে কে যাবে?

–আমরা সবাই যাবো। নাদেরা যাবে, মনিরা যাবে...।

হোসেন সাহেব ওপরে উঠে গেছেন, অল্প বয়েসী ছেলেমেয়েরা মামুনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। মামুন আবার মঞ্জুকে দেখলেন।

তিনি একটু দৃঢ় হয়ে বললেন, না, বাড়িতে বলে আসা হয় নাই, মঞ্জুর না যাওয়াই ভালো।

পলাশ খুব সহজ সমাধানের ভঙ্গিতে বললো, আপনি তো বাড়িতে ফিরছেন। আপনি। বাড়িতে জানিয়ে দেবেন। আমাদের গাড়িতে মঞ্জুর জায়গা হয়ে যাবে!

ব্যাপারটা তো এত সহজ নয়। তাঁর দিদি-জামাইবাবু কী ভাবে এটা গ্রহণ করবেন, তা মামুন জানেন না।

মামুনের মনটা দু'ভাগ হয়ে গেল। একদিকে তিনি মঞ্জুর গুরুজনশ্রেণীর এবং অভিভাবক। অন্যদিকে তিনি কবি মামুন। কয়েকটি অল্প বয়েসী ছেলেমেয়ে এই চমৎকার শীতের সকালে গাড়ি চেপে হইচই করে বেড়াতে যাবে, কবি মামুন হিসেবে এতে তার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কী দোষ আছে এতে? খানিকটা বেহিসেবী উচ্ছলতাই তো যৌবনের স্বভাবধর্ম। আবার অভিভাবক হিসেবে তাঁর মনে হচ্ছে, বিবাহযোগ্যা মেয়েকে এরকম যখন তখন ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।

শহীদ আর পলাশরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলো বারবার। শেষ পর্যন্ত মামুন সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, যা। দিদিকে আমি বুঝিয়ে বলবো। হেনা আর বাবলিকেও সঙ্গে নিয়ে নে!

মঞ্জুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শহীদ আর পলাশ একসঙ্গে বলে উঠলো, হুররে! মঞ্জুর খুশী মুখ দেখে মামুন ভাবলেন, তিনি রাজি না হলে মেয়েটা সারা দিন মন-মরা। হয়ে থাকতো!

হেনা আর বাবলিকে সঙ্গে নিতে ওরা রাজি, কিন্তু হেনা তার বাবাকে ছেড়ে যেতে চায় না। বাবলি যাবে।

মেয়েকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন মামুন। হোসেন সাহেবের বাড়ির সামনে দুটি গাড়ি দাঁড়িয়ে। দুটিই হোসেন সাহেবের নাকি? হোটেলের ব্যবসায় খুব লাভ হয়। বর্তমান অবস্থায় হোসেন সাহেব অতি দ্রুত ধনাঢ্য হচ্ছেন, সুতরাং তিনি দেশের বর্তমান অবস্থাটাই বজায় রাখতে চাইবেন, এতে আর আশ্চর্য কী! তিনি কথায় কথায় জানিয়েছেন, খুব শিগগির তিনি করাচীতেও একটি হোটেল খুলবেন। পশ্চিম পাকিস্তানী অনেক সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর বেশ দহরম-মহরম আছে।

একটু দূরে এসে মামুন সাইকেল রিকশা ধরার জন্য দাঁড়ালেন। এখন অধিকাংশ রিকশাতেই সওয়ারি।

একবার তিনি পেছন ফিরে দেখলেন, হোসেন সাহেবের বাড়ির সামনে একটা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে গল্প করছে মঞ্জু আর পলাশ। শহীদ কাছাকাছি নেই। পলাশের কী একটা কথায় মঞ্জু হাসতে হাসতে সারা শরীরটা দোলাতে লাগলো।

শহীদ না পলাশ, কার দিকে বেশি ঝুঁকেছে মঞ্জু? সে কোনো বিপজ্জনক পথে পা বাড়াচ্ছে না তো! কলকাতায় যাওয়ার চিন্তাটা তার মাথা থেকে একেবারে ঘুচিয়ে দিতে হবে। ওরা এরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে হেসে হেসে গল্প করার বদলে গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসুক না।

শহীদের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ের প্রস্তাব দিলে কেমন হয়? শহীদ ছেলেটি বেশ। হ্যাঁ। বাড়ি ফিরেই দিদিকে বলতে হবে এই কথাটা। তা হলেই সব ব্যাপারটা সুষ্ঠু হবে। শহীদদের ব্যবসা আছে কলকাতায়, ইচ্ছে করলে সে এদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে এখানেও ব্যবসা শুরু করতে পারে।

সাইকেল রিকশা ডেকে উঠতে গিয়ে মামুন আবার হাসলেন আপন মনে। নিজের সম্পর্কেই খানিকটা বিদ্রূপের হাসি। হঠাৎ বিয়ের ঘটকালি করার জন্য তাঁর এত ঝোঁক হলো কেন তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন না।

৩৪ দেওঘরে প্রতাপকে থেকে যেতে হলো

দেওঘরে প্রতাপকে থেকে যেতে হলো পাঁচ দিন। পরদিন সকালেই অবশ্য একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মমতাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অবস্থানের কথা।

এবারে প্রতাপ এখানে চলে এসেছেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পার হবার পরেই তাঁর মনে হলো, নিয়তিই যেন টেনে এনেছে তাঁকে। তিনি যদি কিছু না জানতে পারতেন তা হলে আর কিছুদিনের মধ্যেই একটা বড় রকম বিপর্যয় ঘটে যেত।

প্রথম রাতেই বিশ্বনাথ গুহ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রতাপের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ যে একবার উঠে গিয়েছিলেন, আর শয়নঘর থেকে বেরুলেন না, খাওয়ার সময়েও এলেন না।

মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে শুতে চলে এসেছিলেন প্রতাপ। মায়ের সব গল্পই পুরোনো কালের। সেই মালখানগরের বাড়ি, সেখানকার বষা, শীত; সে বাড়ির বাগান, পুকুর, গোরুর বাচ্চা হওয়ার সময় একটা গোখরো সাপের সেই গোরুর বাঁট থেকে দুধ

খাওয়া, লক্ষ্মী পুজোর রাতে লক্ষ্মী প্যাঁচার আগমন, এই সবই প্রতাপ শুনেছেন অনেকবার, তবু মায়ের মুখে শুনতে ভালো লাগে। তবে মালখানগরের কুমড়ো যে এত বিখ্যাত তা প্রতাপ জানতেন না। দেওঘরে বেশ টাটকা তরিতরকারি পাওয়া যায়, কিন্তু কোনোটাতেই মা ঠিক মতন স্বাদ পান না। মালখানগরে মা যে কুমড়ো খেতেন, সে রকম মিষ্টি কুমড়ো নাকি ভূ-ভারতে আর কোথাও পাওয়া যায় না, কলকাতাতেও না, আর এই পাহাড়ী মাটির দেশে তো কথাই নেই। মালখানগরের বাড়ির গোয়ালঘর আর রান্নাঘরের খড়ের চালে কুমড়োলতা থাকতে প্রতি বছর, সেখানে পেল্লায় পেল্লায় সাইজের কুমড়ো ফলতো। প্রতাপ কুমড়ো পছন্দ করেন না, তাই। মালখানগরের বাড়ির কুমড়োর কথা তাঁর মনে নেই।

এ বাড়ির একখানা ঘর রাখা আছে প্রতাপদের জন্য। মমতা এ ঘরে কিছু কিছু জিনিস রেখে। গেছেন, বছরে একবার তো আসাই হয়। মা নাতি-নাতনীদের দেখতে চান। আগে এ বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না, এবারেই এসে প্রতাপ দেখছেন ঘরে ঘরে আলো, এমনকি মায়ের ঘরে একখানা পাখাও দেওয়া হয়েছে।

প্রতাপ সবেমাত্র শুয়েছেন, এমন সময় শান্তি এসে বললো, তোর ঘরে মশারি টানিয়ে দেয়নি, খোকন? মশার জ্বালায় যে শতচ্ছিদ্র হয়ে যাবি। একটু ওঠ, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

শান্তি প্রতাপের চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়। ছোড়দি বলে ডাকলেও প্রতাপ তাঁকে ছোট বোনের মতনই গণ্য করেন। দেশে থাকার সময় সুপ্রীতির সঙ্গেই বেশি ভাব ছিল প্রতাপের। শান্তি ছিল বড় বেশি মায়ের ন্যাওটা, সর্বক্ষণই প্রায় মায়ের ছায়া।

প্রতাপ আজ লক্ষ করলেন, শান্তির চেহারায় হঠাৎ যেন বয়েসের ছাপ পড়ে গেছে। মুখখানা ফ্যাকাসে, শরীরটা ঝরা ঝরা, শীতকালের পত্রমোচি গাছের মতন, কিন্তু মানুষের শরীরে তো প্রতি বছর শীতবসন্তের বিবর্তন হয় না। শান্তির তুলনায় সুপ্রীতির শরীর অনেক দৃঢ় আছে। এমনকি মাকেও এখনো বুড়ি মনে হয় না।

মশারি টানানো হয়ে যাবার পর শান্তি প্রতাপের দিকে ফিরে বললেন, সারাদিন ট্রেনে। এসেছিস, অনেক ধকল গেছে, তোর ঘুম পেয়েছে নারে খোকন?

প্রতাপ বললেন, না ঘুম পায়নি! তোর কী হয়েছে রে, ছোড়দি?

শান্তি ক্লান্তভাবে চোখ তুলে বললেন, কেন কী হবে?

প্রতাপ বললেন, তোকে, ইয়ে, এমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

শান্তি একটা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে বললেন, না, না,আমার কিছু হয়নি। তুই ভালো আছিস তো?

তোরা সব ভালো আছিস তো?

প্রতাপ মাথা নাড়লেন।

-তোর যদি ঘুম না পেয়ে থাকে, তুই একবার আয় না আমাদের ঘরে।

প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। ওস্তাদজী কেমন আছেন একবার দেখে আসা উচিত ছিল, মায়ের সঙ্গে কথায় কথায় আর খেয়াল ছিল না।

দরজা পর্যন্ত গিয়েও প্রতাপ ফিরে এসে বেড সাইড টেবল থেকে সিগারেট-দেশলাই তুলে নিলেন। বাইরে এলেই তাঁর সিগারেট খাওয়া বেড়ে যায়।

শান্তির ঘরে আলো নেবানো ছিল, শান্তি সুইচ টিপে জ্বালালো। একটা বেশ বড় খাটের একপাশে কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন বিশ্বনাথ গুহ। যে পা-জামা পাঞ্জাবি পরে তিনি সন্ধেবেলা বাইরে থেকে এসেছিলেন, সেগুলোই পরে আছেন। নেভানো চুরুটটা বিছানার ওপরেই রাখা। নাক দিয়ে ফিচ ফিচ শব্দ হচ্ছে। ঠোঁটের পাশে একটুখানি লালার দাগ।

শান্তির মেয়ে টুনটুনির বয়েস হয়েছে এগারো, সে দিদিমার সঙ্গে ঘুমোয়। বেশির ভাগ সময়ই সে দিদিমার কাছে থাকে। এ ঘরে তার জামাকাপড় বা বইপত্র কোনো কিছুরই চিহ্ন নেই। এটা একেবারেই স্বামী-স্ত্রীর ঘর। সব কিছুই এলোমেলো। দেওয়ালের এক কোণে দাঁড় করানো রয়েছে একটা তানপুরা, তার মাথায় অতি বেমানান ভাবে ঝুলছে একটা ল্যাঙোট। প্রতাপ সেদিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

শান্তি বললেন, খোকন, তুই ওকে ডাক।

প্রতাপ বললেন, ঘুমোচ্ছেন যখন, থাক না!

প্রতাপ এগিয়ে গিয়ে বিশ্বনাথের কপালে হাত রাখলেন। মানুষের বড় বড় অসুখের সঙ্গে জ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই, তবু শরীর খারাপের কথা শুনলে সবাই কপালে হাত দিয়ে দেখে।

বিশ্বনাথের কপাল ঠিক স্বাভাবিক ঠাণ্ডা নয়, সামান্য একটু ছ্যাঁকছেকে ভাব। সেটা এমন কিছু না। কিন্তু বিশ্বনাথের মুখের কাছাকাছি আসতেই প্রতাপ একটা দুর্গন্ধ পেলেন। প্রতাপ নিজে মদ না খেলেও মদের গন্ধ চেনেন, কিন্তু এ যেন অন্যরকম।

প্রতাপ সোজা হয়ে দাঁড়াতেই শান্তি বললেন, খোকন, তুই ওকে ডেকে তোল, তোর সামনে আমি ওকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

প্রতাপ তাঁর ছোড়দিকে এক ধমক দিয়ে বললেন, মানুষটা ঘুমোচ্ছে। এখন ডেকে কী হবে? আমি তো কাল সকালে আছিই, তখন কথা হবে।

প্রতাপ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কলকাতায় প্রতাপ মাতালদের সংসর্গ বিশেষ করেন না, কচিৎ কখনো রাস্তায়ঘাটে অচেনা মাতাল দেখতে পান। কিন্তু চাকরি জীবনে টানা বারো বছর যখন বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে বদলি হয়েছেন তখন নিজেরই সমপর্যায়ের কিছু কিছু অফিসারকে বিভিন্ন সময়ে মাতলামি করতে দেখেছেন। একবার এক এস ডি পি ও

তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁধের ওপর বমি করে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনাটা মনে পড়লেই প্রতাপ নিজের গায়ে বমির গন্ধ পান। তিনি বুঝতে পারলেন, ওস্তাদজীর আজকের শরীর খারাপ মাতালের শরীর খারাপ, তাঁর ঘুম মাতালের ঘুম।

বাইরের বারান্দায় এসে প্রতাপ একটা সিগারেট ধরালেন। শান্তি তাঁর পেছন পেছন এসে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে।

একটু বাদে শান্তি বললেন, দ্যাখ খোকন, এখানকার চাঁদটা কত সাদা! আর কত বড়! মালখানগরে আমরা কি কোনোদিন এত পরিষ্কার চাঁদ দেখেছি?

প্রতাপ এই কথায় বেশ বিস্মিত হলেন। শান্তির রুগ্ন চেহারা আর বিরস মুখ দেখে তিনি। আশঙ্কা করছিলেন, ছোড়দি তাঁকে নানা রকম অনুযোগ শোনাবেন! জীবন যাদের কাছে আর উপভোগ্য নয়, তারা অন্যের জীবন-উপভোগও পছন্দ করে না। শান্তির মুখে চাঁদ সম্পর্কে কথা খুবই অপ্রত্যাশিত।

এখানে বেশ শীত পড়েছে। কলকারখানা নেই বলে এদিককার আকাশ অমলিন, শীতকালে আরও বেশি ঝকঝকে থাকে। এত তারা, যেন আকাশে দেওয়ালি, কিংবা তার চেয়েও বেশি, আলোর বিকিরণে ছেয়ে আছে আকাশ, তার মাঝখানে চাঁদ একটা রুপোর থালা, জার্মান সিলভার বললে আরও উপযুক্ত হয়।

প্রতাপ সচরাচর চাঁদ দেখেন না, এখন এগিয়ে এসে দেখলেন। অনেকদিন পর দুই ভাইবোন। পাশাপাশি। শান্তি বরাবরই প্রতাপকে খোকন বলে ডাকেন, কিন্তু শান্তির কোনো ডাক নাম নেই।

প্রতাপ বললেন, জানিস ছোড়দি, মমতা মাঝে মাঝেই ছাদে উঠে যায় রাত্তিরে, একা একা।

শান্তি বললেন, মমতা বড় ভালো মেয়ে। তুই ওকে কষ্ট দিস না। তুই মমতাকে সঙ্গে আনলি না কেন এবার? ঝগড়া হয়েছে?

প্রতাপ উত্তর দেবার আগেই শান্তি বললেন, খোকন, চুপ করে শোন! কিছু শুনতে পাচ্ছিস?

শ্রবণেন্দ্রিয় তো মনকেই অনুসরণ করে। একবার চাঁদ, একবার মমতার প্রসঙ্গ উঠতে প্রতাপের মন দূরে চলে গিয়েছিল, কাছাকাছি কোনো ব্যাপারে খেয়াল ছিল না। তিনি কিছু শুনতে পাননি। এবারে কান খাড়া করে প্রথমে তিনি শুনতে পেলেন একটি টাঙ্গার চলে যাওয়ার শব্দ, তারপর একজন মানুষের গলার দমকা কাশি। দ্বিতীয় শব্দটি খুব কাছেই।

শান্তি বললেন, খোকন, তুই আর একবার আমার ঘরে আয়!

সেখানে ফিরে গিয়ে প্রতাপ দেখলেন, ঘুমের মধ্যেই কেশে চলেছেন বিশ্বনাথ, তাঁর মুখ দিয়ে লালা বা থুতু গড়াচ্ছে। সেই থুতুর মধ্যে থকথকে রক্ত।

প্রতাপ ভয় পেয়ে শান্তির দিকে ঘুরে তাকালেন, কিন্তু শান্তির মুখে কোনো রকম ভয় বা অভিমানের চিহ্ন নেই। নিরুত্তাপ গলায় শান্তি বললেন, ওর আর বেশিদিন নেই, বুঝলি খোকন, ওর এবার যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে!

প্রতাপ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে, ছোড়দি? তুই একথা বলছিস কেন?

-ও তো আর থাকতে চায় না! যাক, যেতে চায় যাক। আমি আর শুধু শুধু ওকে কেন আটকাবো?

মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে দেখলে শুধু একটা রোগের কথাই মনে পড়ে। প্রতাপ ভয় পেলেন। বিশ্বনাথ এখানে ধনী টি বি রুগীদের বাড়িতে নিয়মিত গান শোনাতে যান, সেটাই তাঁর জীবিকা। সেই সংস্পর্শে তাঁরও ঐ রোগ ধরা খুবই সম্ভব। এ তো রাজরোগ, এর চিকিৎসায় অনেক খরচ!

শান্তির হাবভাব দেখেও প্রতাপ অবাক হয়ে গেলেন। শান্তি বরাবরই ভীতু ভীতু ধরনের, সামান্য কারণেই বিচলিত হয়ে ওঠেন। এখন এমন ঠাণ্ডা গলায় কথা বলছেন কী করে?

–কতদিন ধরে এরকম হয়েছে? ডাক্তার দেখাসনি?

শান্তি একটা কাঠের আলমারির পাল্লা খুলে বললেন, দ্যাখ, এই ওর ওষুধ।

প্রতাপের ভুরু কুঁচকে গেল। আলমারির একটা তাক ভর্তি কতকগুলো বড় বড় নোংরা নোংরা বোতল। প্রথমে মনে হলো কেরোসিনের বোতল, কিন্তু আলমারিতে কেউ কেরোসিনের বোতল সাজিয়ে রাখে না, প্রতাপ বুঝতে পারলেন ওগুলো দেশি মদের।

শান্তি বললেন, এইগুলোই ওর ওষুধ, বাইরে থেকে খেয়ে আসে, আবার রাত্তিরে ঘরে বসে বসেও খায়।

–তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে, ছোড়দি? তুই এইসব ওঁকে খেতে দিচ্ছিস? এখন ওর পক্ষে এ তো বিষ!

–আমি কী করবো বল?

–তুই কী করবি মানে? তুই আটকাতে পারিস না?

–তুই বুঝতে পারছিস না, খোকন, ও সব নিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে।

বিশ্বনাথের মুখ দিয়ে আর একবার কাশির দমক উঠতেই প্রতাপ কাছে গিয়ে তাঁর বুকে হাত দিয়ে ডাকলেন, ওস্তাদজী! ওস্তাদজী!

কয়েকবার ডাকাডাকির পর বিশ্বনাথ জড়িত গলায় বললেন, অ্যাঁ? কেন বিরক্ত করছো?

তারপর ঘোলাটে চোখ মেলে বললেন, চতুর্দিকে মাছি উড়ছে ভনভন করে। সব পচা জিনিস! মানুষের শরীরও পচে গেছে!

প্রতাপ বুঝলেন এখন কথা বলে লাভ নেই, বিশ্বনাথ পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত।

শান্তিকে তিনি আদেশ দিলেন, মুখটা মুছিয়ে দে! কাল সকালে আমি দেখছি!

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে প্রতাপ আবার মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মা জানে?

শান্তি বললো, মা সবই জানে!

বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ বদলায় ঠিকই, কিন্তু তাঁর মায়ের স্বভাবের এতখানি পরিবর্তন একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হলো প্রতাপের। সুহাসিনী বরাবরই শিশুর মতন, সব সময় উতলা হয়ে থাকেন, তাঁর নিজের পারিবারিক গণ্ডির প্রত্যেকের ভালোমন্দের প্রতি সব সময় তাঁর মনোযোগ, যেন সেটাই তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য। সুহাসিনীর মাথায় বুদ্ধির বদলে সবটাই আবেগ, এরকমই প্রতাপ দেখে এসেছেন বরাবর। মা বিচলিত হয়ে পড়বেন বলে তাঁর কাছে অনেক ছোটখাটো দুর্যোগের কথা লুকিয়ে যান।

সেই সুহাসিনী তাঁর জামাইয়ের এমন অবস্থার কথা জেনেও একবারও তা উল্লেখ করলেন না। প্রতাপের কাছে? বরং আগের তুলনায় আজ যেন তিনি বড় বেশি শান্ত হয়ে ছিলেন। অতীতের। কথা, পূর্ব বাংলার সেই সুখের দিনগুলির কথা বলতে বলতে তিনি একেবারে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর চোখ বুজে এসেছিল। যেন তিনি পুরোপুরি অতীতে ফিরে গেছেন, বর্তমানটা তার কাছে একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে। তাই কোনো অভিযোগ নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই। এরকম হয়? প্রতাপ ধাঁধায় পড়ে গেলেন।

সে রাতে তাঁর ঘুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে লাগলো বার বার।

সেইজন্যই পরদিন তাঁর ঘুম ভাঙতে দেরি হলো। বিশ্বনাথ বেরিয়ে গেছেন তার মধ্যে। প্রতাপ বাজারে গেলেন তাঁকে খুঁজতে। দেখা পেলেন না। রেলস্টেশনেও নেই। দু'চারটি

বাঙালি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করেও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। বিশ্বনাথ গুহকে এখানে অনেকেই চেনে, কিন্তু কেউ তাঁকে দেখেনি।

সন্ধের পর বিশ্বনাথ ফিরলেন পুরোপুরি মাতাল হয়ে। রাস্তা থেকেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইতে গাইতে ঢুকলেন গেট ঠেলে, তাঁর ধুতিটা আলগা হয়ে গেছে, কোমরের কাছে ধরে আছেন মুঠো করে, মুখে চুরুটের বদলে আদিবাসীদের লম্বা বিড়ি, কাঁচা তামাকে মাঝে মাঝে পট। পট শব্দ হচ্ছে আর আগুনের ফুলকি উড়ে এসে পড়ছে তাঁর লম্বা দাড়িতে।

প্রতাপ এগিয়ে এসে বিশ্বনাথের হাত ধরে কঠোরভাবে বললেন, এসব কী হচ্ছে ওস্তাদজী? সারাদিন কোথায় ছিলেন?

ঝটকা দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে বিশ্বনাথ কর্কশ চিৎকার করে উঠলেন, চোপ শালা! তুই আমার হাত ধরবার কে রে?

সুহাসিনী আর শান্তি বসেছিলেন বারান্দায়, তাঁরা উঠে চলে গেলেন ভেতরে।

প্রতাপ নিথরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি খুব জোর আঘাত পেয়েছেন। খারাপ কথা, বর্বরদের মতন ভাষা তিনি সহ্য করতে পারেন না। বিশ্বনাথ গুহ বরাবরই মার্জিত স্বভাবের মানুষ। তাঁর কথাবার্তা সব সময়ই উঁচু তারে বাঁধা থাকে।

ধুতিটা সম্পূর্ণভাবে খুলে আবার পরলেন বিশ্বনাথ। তারপর টলতে টলতে গিয়ে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে ফিকফিকিয়ে হাসতে লাগলেন প্রতাপের দিকে চেয়ে।

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে তিনি প্রতাপকে বললেন, কী ব্রাদার, রাগ করলে নাকি? অন্য কারুকে তো শালা বলিনি, তুমি আমার একমাত্র অরিজিন্যাল শালা, তোমাকে শালা বলেছি, তাতে রাগের কী আছে?

এক মুহূর্ত আগে প্রতাপ ঠিক করেছিলেম যে বিশ্বনাথের সঙ্গে তিনি জীবনে আর কখনো বাক্যালাপ করবেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে মত পাল্টাতে হলো, মায়ের জন্য, ছোড়দির জন্য।

বিশ্বনাথ আবার বললেন, এসো ব্রাদার, আমার পাশে এসে বসো। কী বকুনি দেবে দাও!

প্রতাপ কাছে এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বললেন, আপনি কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন?

বিশ্বনাথ চোখ বুজে মাথা নাড়লেন দুদিকে। তারপর কাশলেন কয়েকবার। তারপর বললেন, কী হবে ডাক্তার দেখিয়ে? ডাক্তার যা বলবে তা তো জানা কথা!

–ডাক্তার না দেখালে অসুখের চিকিৎসা হবে কী করে?

–চিকিৎসা তো আমি নিজেই করছি। আমার চুরুট ফুরিয়ে গেছে, তোমার একটা সিগারেট দাও তো!

–আপনার এত কাশি, এই সময় সিগারেট খাওয়া উচিত নয়।

বিশ্বনাথ এবার জোরে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, গম্ভীর গলায় বড়বাবু বড়বাবু ভাব করে কথা বলার অভ্যেসটা আর তোমার গেল না! সব সময় যেন ভারডিক্ট দিচ্ছো। আরে, এটা তোমার আদালত না কি? আমি তোমার আসামী?

–ওস্তাদজী, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, জীবনটা নিয়ে আপনি কী করতে চাইছেন।

–আমি আর জীবন নিয়ে কী করবো, জীবনই আমায় নিয়ে খেলাচ্ছে। তবে, এ খেলা বোধহয় আর বেশিদিন...ঠিক কতদিন জানতে পারলে সুবিধে হতো।

–কাশির অসুখ, চিকিৎসা করলেই সারিয়ে ফেলা যায়।

–টি বি কথাটা উচ্চারণ করতে লজ্জা পাচ্ছো? প্রত্যেক দিন ঘুষঘুষে জ্বর, কাশি, তার সঙ্গে রক্ত...লক্ষণ সব মিলে যাচ্ছে। কী বলো? এর চিকিৎসা কী তাও সবাই জানে। ইঞ্জেকশান ফিঞ্জেকশান তো আছেই, তাছাড়া ভালো খাওয়া-দাওয়া, পরিপূর্ণ বিশ্রাম, হা-হা-হা-হা!

এই সময় মা আর ছোড়দি কাছাকাছি থাকলে কথা বলার সুবিধে হতো। প্রতাপ চেঁচিয়ে ডাকলেন, ছোড়দি, ছোড়দি!!

শান্তি কাছেই ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন বারান্দায়।

বিশ্বনাথ মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রীকে দেখে সুর করে বললেন, এইবারে প্রধান সাক্ষী হাজির! কিন্তু আসামী ভাগলবা!

বিশ্বনাথ চট করে ওঠার চেষ্টা করে ঘুরে পড়ে গেলেন। কিন্তু কারুকে ধরে তোলার সুযোগ দিয়ে নিজেই আবার উঠে দৌড়ে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

শান্তি আর প্রতাপ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর প্রতাপ বললেন, কাল ওঁকে বেরুতে দিস না। আমাকে ডাকিস। আমি কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো।

পরদিন সকালে বিশ্বনাথ পালালেন না। ভোর থেকে গলা সাধতে লাগলেন। নিজের ঘর থেকে শুনে প্রতাপ বুঝতে পারলেন, ওস্তাদজীর গলা অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তারসপ্তকে ঠিক পর্দা লাগছে না, মীড়ের কাজ করতে গেলেই কেশে ফেলছেন।

প্রতাপ তৈরি হয়ে নিলেন। কিন্তু ডাক্তার দেখাতে হলে টাকা লাগবে। প্রতাপের কাছে কিছু নেই। বাড়ি থেকে আসার সময় কেন বেশকিছু টাকা সঙ্গে আনেননি, সেকথা ভেবে প্রতাপের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো। ওস্তাদজীর এখন এই অবস্থা, তার কাছ থেকে এখন কিছুতেই টাকা চাইতে পারবেন না প্রতাপ।

মাকে খুঁজতে খুঁজতে প্রতাপ ওপরের ঠাকুর ঘরে চলে এলেন। সুহাসিনী জপে বসেছেন। পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অন্য সময়ে ছেলের উপস্থিতি টের পেলেই সুহাসিনী জপের মন্ত্র-ট ভুলে গিয়ে কথা বলতে শুরু করতেন। আজ তিনি নিমগ্ন।

সুহাসিনী মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম সারার পর প্রতাপ বললেন, মা, জামাইবাবুকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবো..আমি এবার সঙ্গে টাকা আনতে ভুলে গেছি...তোমার কাছে কিছু জমানো টাকা আছে? আমি কলকাতায় ফিরেই পাঠিয়ে দেবো।

সুহাসিনী মুখে কিছু বললেন না। ঠাকুরের মূর্তির পাশ থেকে কড়ি বসানো লাল রঙের লক্ষ্মীর ঝাঁপিটি তুলে এনে দিলেন প্রতাপের হাতে।

প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন, এটাই গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সুহাসিনীর খরচার হাত। কোনোদিন টাকা জমানো স্বভাব নয় তার। মাঝে মাঝে এই লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে আট আনা একটাকা ফেলে রাখেন। সব মুদ্রাগুলিতেই সিঁদুর মাখানো। লক্ষ্মীর ঝাঁপিটি উপুড় করে প্রতাপ মুদ্রাগুলো গুণলেন। সব মিলিয়ে একশো তেইশ টাকা, এর মধ্যে টাক মাথা পঞ্চম জর্জের মুখ আঁকা রূপোর মুদ্রাও রয়েছে কয়েকটা।

প্রতাপ মায়ের দিকে তাকালেন। সুহাসিনী বললেন, যা ঘুরে আয়।

হঠাৎ প্রতাপের কান্না পেয়ে গেল। তার মায়ের এই শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন ভাব তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। একটি দুরন্ত শিশু সব খেলাধুলো ভুলে গিয়ে মাটিতে চুপ করে শুয়ে আছে–এই দৃশ্য দেখলে যেমন লাগে! মা কি আর কোনোদিনও আগের মতন হবেন না?

মুখ ফিরিয়ে প্রতাপ দ্রুত নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে।

বিশ্বনাথ প্রতাপের সঙ্গে বেরুতে আপত্তি করলেন না। পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি পরলেন। তার হাতে চুরুট নেই। সিগারেটও চাইলেন না প্রতাপের কাছে। টাঙ্গায় উঠে বললেন, বম্পাস টাউনে ডাক্তার দুবের কাছে চলো, তার সঙ্গে আমার চেনা আছে। ভালো ডাক্তার।

খানিক দূর যাবার পর বিশ্বনাথ বললেন, ব্রাদার, ডাক্তারের কাছে যাবার আগে চলো কোথাও। বসে ভালো করে চা খাই। বাড়িতে বসে তো সব কথা বলা যায় না, তোমাকে আমার প্ল্যান-প্রোগ্রামটা জানানো দরকার।।

প্রতাপ বললেন, আগে ডাক্তারের কাছে ঘুরে আসি। তারপর আপনার কথা শোনা যাবে।

বিশ্বনাথ প্রতাপের পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, খুব রেগে আছো, আমার ওপর, তাই না? আমরা সবাই মিলে তোমার কাঁধে যদি ভূত হয়ে চাপি, তখন সহ্য করতে পারবে? আজকাল কাঁধে ভূত চাপার চেয়েও আত্মীয়-স্বজন চাপা অনেক বেশি ডেঞ্জারাস! ধরো, ডাক্তার স্পষ্ট রায় দিল যে আমার আর কোনো কাজ-কর্ম করা চলবে না। তখন আমার সংসারটাকে খাওয়াবে। কে? তুমি? তোমার কাঁধ কতখানি চওড়া? সামান্য মাইনের টাকা তো ভরসা!

প্রতাপ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

বিশ্বনাথ আবার বললেন, যৌবনকালটা গান-বাজনার চর্চা করে কাটিয়েছি, জীবিকা অর্জনের জন্য কিছু শিখিনি। গানবাজনাকে কমার্শিয়ালাইজড করতে গেলেও টেকনিক লাগে, সে যোগ্যতা আমার নেই, এই বয়েসে আর পেরে উঠবো না। আমরা ছিলাম ল্যান্ডেড জেন্ট্রি, হঠাৎ ডিক্লাসড হয়ে গেছি, তার মূল্য দিতে হবে না? নিজস্ব বাড়ি ছিল। জমি-জায়গা ছিল, তার থেকে আয় ছিল, সেই ভরসাতেই জীবনটাকে গঠন করতে চেয়েছিলাম যৌবন কালে। সব মানুষ কী আর জীবিকার ধান্ধায় ঘুরবে, কিছু কিছু মানুষ তো উৎকট খেয়াল নিয়েও থাকবে। এখন সেসব নেই, হঠাৎ সব খুইয়ে জীবন যুদ্ধে নেমে পড়লে পিরবো কেন? আমাদের মতন কিছু কিছু মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে! এটাকে নিয়তি বলতে পারো।

প্রতাপ বললেন, তা বলে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে না?

বিশ্বনাথ মৃদু হেসে বললেন, শুধু বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয়, বাঁচার একটা ডিগনিটি থাকা দরকার তো। আমি অশক্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবো, তুমি আমার ওষুধ কিনে দেবে, আমার বউ-মেয়েকে তুমি খাওয়াবে, পরাবে, এরকম একটা অপমানের অবস্থার মধ্যে তুমি আমাকে ফেলতে চাও? আমি কী প্ল্যান করেছি, সেটা শোনো। এখন আমি প্রাণপণে রোজগার বাড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছি, সে যেমন করেই হোক। বাড়িটাতে আরও দুখানা ঘর বাড়াবো। আমি হঠাৎ মরে গেলে, ঐ বাড়ির একটা পোরশান ভাড়া দিয়েও তোমার মা আর ছোড়দির কোনোক্রমে চলে যাবে। আমার মেয়েটা বড় হলে তুমি ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দিও। আর যে-কটা দিন বাঁচি আমাকে নিজের মতন বাঁচতে দাও।

–নিজের মতন বাঁচা মানে প্রত্যেকদিন মাতাল হওয়া?

–মদ খেলে শরীরটা কিছুক্ষণ চাঙ্গা থাকে। ধরে নাও, ওটাই আমার ওষুধ। তাছাড়া নেশা করলে আজেবাজে কাজকর্ম করার গ্লানি ধুয়ে যায়। আমি যা করছি, ভেবেচিন্তেই করছি।

প্রতাপ একটুক্ষণ চুপ করে থাকতে বিশ্বনাথ বললেন, তা হলেই বুঝলে, ডাক্তারখানায় গিয়ে কোনো লাভ নেই। টাঙ্গাটাকে অন্যদিকে যেতে বলি?

প্রতাপ এবার দৃঢ় গলায় বললেন, না, আমি আপনার যুক্তি মানি না। এরকম ভাবে হাল ছেড়ে দেওয়া কাপুরুষতা। দরকার হলে ঐ বাড়ি বিক্রি করেও আপনার চিকিৎসা করাতে হবে। আমার যদি গুরুতর কোনো অসুখ হতো, আপনি সব দিয়ে আমাকে সাহায্য করতেন না?

ডাক্তারের কাছে গিয়ে যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তার চেয়েও খারাপ কথা শোনা গেল। ডাক্তার দুবে টি বি বিশেষজ্ঞ, এ তল্লাটে অনেক টি বি রোগী আসে, তিনি মুখ দেখে

রোগীর অবস্থা বলে দিতে পারেন। থুতু, রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে এসব করাতে হবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশ্বনাথকে দেখেই তিনি ধমক দিয়ে বললেন, এত দেরি করে এসেছেন?

ডাক্তারখানা থেকে বেরুবার পর বিশ্বনাথই প্রতাপকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কী ব্রাদার, মন খারাপ করছো কেন? আমি সহজে যাচ্ছি না, আরও দু-এক বছর ফাঁইট করতে পারবো মনে হয়। চলো, যেখানে গেলে তোমার মন ভালো হবে সেখানে যাই। বুলার সঙ্গে দেখা করবে!

প্রতাপ একটু জোরে বলে উঠলেন, বুলা?

–হ্যাঁ, সে তো এখানেই আছে।

–জানি। তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু এখন আমি বুলার বাড়িতে যেতে চাই না। বাজারে চলুন, আপনার ওষুধ-পত্তরগুলো কিনতে হবে।

–আরে ওষুধ পরে কিনলেও হবে। জানি, তোমার টাকা দিয়ে আমার জন্য কিছু ওষুধপত্তর কিনে না দিলে তোমার শান্তি হবে না। ঠিক আছে, সেইসব ওষুধ খাবো। কিন্তু এখন চলো। বুলার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা যাক। তাকে আমার রোগের বিষয়ে যেন কিছু বলো না! বিশ্বনাথ প্রায় জোর করেই প্রতাপকে নিয়ে গেলেন বুলাদের বাড়িতে।

৩৫ মোহনবাগান লেনে চন্দ্রাদের বাড়ি

মোহনবাগান লেনে চন্দ্রাদের বাড়ির উঠোনে একটি চাঁপা ফুলের গাছ আছে। বারোমাসই সে গাছে ফুল ফোটে। চন্দ্রা বলে, এই গাছটার নাম উর্বশী-চাঁপা। গেট দিয়ে ঢুকে সেই গাছটার তলা দিয়ে যাবার সময় কয়েক মুহূর্ত থেমে যান অসমঞ্জ রায়। তাঁর নাকে আসে একটা অন্যরকম জীবনের ঘ্রাণ।

এই বাড়ির খুব কাছেই, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের পুতুল-দারোয়ান সাজানো দত্তদের বাড়িতে একটি ইংরেজি অনার্সের ছাত্রকে সপ্তাহে দু'দিন পড়াতে আসেন তিনি। সাড়ে আটটার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি বাড়ি ফিরতে পারেন না, চন্দ্রাদের বাড়ি তাঁকে চুম্বকের মতন টানে।

কোনো অনাত্মীয়া মহিলার বাড়িতে রাত সাড়ে আটটার সময় যাওয়ার কথা তিনি আগে ভাবতেই পারতেন না। তাঁর এতদিনকার পরিমণ্ডলে এটা ছিল অস্বাভাবিক। কিন্তু চন্দ্রাদের বাড়িটা আলাদা ধরনের, ওখানে যেতে কোনো বাধা নেই।

চন্দ্রার বাবা বহুদিন ছিলেন দেরাদুনে, ভারত সরকারের জরিপ বিভাগে উচ্চ চাকরি করতেন। চন্দ্রার জন্মও সেখানে। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর চন্দ্রার বাবা আনন্দমোহন চক্রবর্তী দেরাদুনেই একটি ব্যবসা শুরু করে পুরোপুরি প্রবাসী বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। চন্দ্রা আর তার দিদি অলকা এই দু'জনেরই বিয়ে হয় এলাহাবাদে। চন্দ্রার দাদা আদিত্য থাকে অমৃতসরে, তার শ্বশুর বাড়ি এবং চাকুরিস্থল দুটোই সেখানে। তবু কোনো কারণে আনন্দমোহন হঠাৎ দেরাদুনের পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় মোহনবাগান লেনের এই পুরোনো বাড়িটি কিনেছেন। অবশ্য কলকাতায় তিনি নিছক অবসর জীবন যাপন করতে আসেন নি, শ্যামবাজারের মোড়ে একটি বড় ওষুধের দোকান চালু করে দু বছরের মধ্যেই সেটিকে। স্বর্ণপ্রসবী করে তুলতে পেরেছেন।

চন্দ্রা কেন এলাহাবাদে তার স্বামীর কাছে থাকে না, তা অসমঞ্জ রায় এখনো জানেন না। চন্দ্রার জীবনের ঐ অংশটা রহস্যাবৃত, খোলাখুলি কোনোদিন জিজ্ঞেসও করতে পারেন নি। তিনি। একদিন তাঁদের সমিতির একটি ছেলে বলেছিল, এলাহাবাদে কোন বাড়িতে আপনার বিয়ে হয়েছে চন্দ্রাদি? এলাহাবাদে আমার মামার বাড়ি, আমি ছোট বেলা অনেক দিন থেকেছি। সেখানে। কোনো উত্তর না দিয়ে চন্দ্রা সেই ছেলেটির চোখের দিকে সরাসরি কয়েক মুহূর্ত। তাকিয়ে থেকে বলেছিল, এলাহাবাদের কথা থাক, এখানকার কাজের কথা বলো।

চন্দ্রাদের বাড়ির অনেকের কথাতেই এখনো প্রবাসী টান রেয়ে গেছে। বাক্যের শেষে একটা করে হচ্ছে বা হচ্ছেন যোগ করে দেয়। যেমন, উনি আমার পিসেমশাই হন, না বলে বলবে ইনি আমার পিসেমশাই হচ্ছেন। লেখাপড়াকে এরা বলে পড়ালেখা। চন্দ্রার বাবা যখন-তখন বলেন, কোনো কথা নেই! অর্থাৎ বুঝতে হবে তিনি বলতে চান, কোই বাৎ নেহি! চন্দ্রার মা ঝি-চাকরদের বকাঝকা করার সময় বেশরম, বেহুঁস, বেহুদা-এই সব শব্দগুলো অনর্গল। ব্যবহার করে যান।

কিন্তু চন্দ্রার কথায় কোনো টান নেই, কোনো মুদ্রাদোষও নেই। প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, দু'এক বছরের মধ্যেই এখানকার ভাষা রপ্ত করে নিয়েছে। আগে সে নাকি ভালো করে বাংলা। পড়তেই পারতো না, এখন বাংলায় চমৎকার চিঠি লেখে।

চন্দ্রাদের বাড়িটি পুরোনো, ঘরের সংখ্যা অনেক। কোনো কোনো ঘরে এখনো কোনো আসবাব নেই। প্রবাস থেকে এই পরিবারের চেনাজানা মানুষরা কোনো কাজে কলকাতায় এলে এখন আর হোটেলে ওঠে না, এ বাড়িতেই এসে থাকে। অসমঞ্জ রায় তাই এ বাড়িতে প্রায়ই নতুন নতুন মানুষ দেখতে পান।

ব্যাডমিন্টন খেলার খুব শখ চন্দ্রার, এখন শীতকাল শুরু হয়েছে, এখন প্রত্যেক সন্ধেবেলা সে মানিকতলার একটি ক্লাবে খেলতে যায়। দু'একটি কমপিটিশানেও সে ট্রফি পেয়েছে। এক সময় নাকি চন্দ্রা ভালো নাচতেও পারতো, অনেক জায়গায় মঞ্চে নেচেছে, দৈবাৎ সে রকম একটি ছবি দেখে ফেলেছিলেন অসমঞ্জ, কিন্তু চন্দ্রা এখন আর নাচের উল্লেখ পছন্দ করে না। তার শরীরের গড়নটি এখনো নর্তকীর মতন। এই রকম একটি মেয়েকে সমাজ সেবার কাজ নিয়ে বেশি মাতামাতি করতে দেখলে বিস্ময়ই জাগে। অসমঞ্জ এখনো চন্দ্রার চরিত্রটি বুঝতে পারেন না।

হারীত মণ্ডলের ছেলে সুচরিতকে নিজের বাড়িতেই আশ্রয় দিয়েছে চন্দ্রা। কাছাকাছি টাউন স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। সে একটা নিজস্ব ঘর পেয়েছে। হারীত মণ্ডল

তার স্ত্রী ও অন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেছে বাংলার বাইরে। তাকে আটকে রাখা যায় নি।

চাঁপা ফুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে অসমঞ্জ তাকালেন দোতলায় দক্ষিণের ঘরটির দিকে। ঐটি চন্দ্রার নিজস্ব ঘর। সেখানে আলো জ্বলছে। তা হলে চন্দ্রা নিশ্চয়ই ব্যাডমিন্টন খেলা শেষ করে ফিরেছে। চাকর-বাকরদের ডেকে খবর দেবার কোনো প্রথা নেই এখানে, অসমঞ্জ সোজা উঠে এলেন দোতলায়। চন্দ্রার ঘরের দরজার একটা পাল্লা ভেজানো। সেখানে দাঁড়িয়ে অসমঞ্জ দেখলেন একটা টেবিলের দু'পাশে বসে আছে চন্দ্রা আর একজন যুবক। দু'জনের মাথা খুব কাছাকাছি, নিবিড় মনোযোগ দিয়ে তারা দেখছে টেবিলের ওপর বেছানো একটা বড় কাগজ।

অসমঞ্জের বুকটা মুচড়ে উঠলো এই দৃশ্য দেখে। ঐ যুবকটি চন্দ্রার কাছে প্রায়ই আসে। ওর নাম অপূর্ব বর্মণ, ভালো ব্যাডমিন্টন খেলে, মিক্সড ডাবলসে চন্দ্রার পার্টনার হয়। অসমঞ্জ বরাবরই পড়ুয়া মানুষ, খেলাধুলো প্রায় কিছুই করেন নি জীবনে। খেলোয়াড় জাতীয় মানুষদের সম্পর্কে তাঁর মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে। তাঁর ধারণা, যারা বেশি শরীর চর্চা করে তাদের মাথা মোটা হয়। চন্দ্রা শখ করে ব্যাডমিন্টন খেলে, সেটা ঠিক আছে, সে সময় সে যে-কোনো একজনকে পার্টনার হিসেবে বেছে নিতে পারে, কিন্তু ঐ সব খেলোয়াড়দের বাড়িতে ডেকে এনে নিভৃতে গল্প করার কোনো মানে হয় না। চন্দ্রার বুদ্ধির স্তর অনেক উঁচু, ওদের সঙ্গে চন্দ্রা কী বিষয়ে কথা বলবে?

অসমঞ্জ বললেন, আসতে পারি?

চন্দ্রা চোখ তুলে অসমঞ্জকে দেখা মাত্র যেন তার মুখোনি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সে বললো, আসুন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলুম। আপনাকে আমার খুব দরকার।

এই হাসি, এরকম কথা শোনার জন্যই তো এ বাড়িতে আসা। অসমঞ্জর বুকের জ্বালা অনেকটা মিলিয়ে গেল।

অপূর্ব বর্মণের সঙ্গে এর আগে দুবার আলাপ করিয়ে দিয়েছে চন্দ্রা, কিন্তু সে কথা তার মনে নেই। আজ আবার বললো, আলাপ আছে? আমার বন্ধু অপূর্ব বর্মণ, আর ইনি ডক্টর অসমঞ্জ রায়, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ইংলিশের লেকচারার, আমাদের সমিতির প্রেসিডেন্ট।

অপূর্ব বর্মণ বললো, আমার বোনের কাছে আপনার কথা শুনেছি। আমার বোন ইংলিশ নিয়ে এম-এ পড়ছে, আপনার ছাত্রী।

চন্দ্রা উঠে আর একটা চেয়ার টেনে এনে বললো, বসুন, এই প্ল্যানটা দেখুন।

টেবিলের ওপর নীল রঙের কাগজটি কোনো বাড়ির নকশা। অসমঞ্জ তার ওপর একবার দৃষ্টি দিলেন। এই সব বিষয়ে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই।

চন্দ্রা বললো, ডেস্টিটিউট মেয়েদের জন্য আমরা যে হোম তৈরি করতে যাচ্ছি, এটা সেই বাড়ির প্ল্যান। অপূর্ব এটা তৈরি করে দিয়েছে। অপূর্ব একজন আর্কিটেক্ট।

অসমঞ্জ একবার পাশ-চোখে অপূর্বকে দেখলেন। এই লোকটা খেলোয়াড় আবার আকিটেক্টও? আর্কিটেক্ট হতে গেলে তো বুদ্ধি লাগে! এমন হতে পারে যে ওদের ফার্ম আছে, সেখানকার অন্য কেউ নকশাটা করে দিয়েছে।

চন্দ্রা নক্সাটার ওপর আঙুল বুলিয়ে বললো, এই দেখুন, এই হলগুলো হবে ডর্মিটরি টাইপ, এটা কিচেন, এই দুটো ওয়ার্কশপ...

কাগজের গায়ে কয়েকটি রেখা দেখে একটা বাড়ি কল্পনা করা অসমঞ্জ রায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু তিনি আঙুল ফেলে বললেন, আর এই জায়গাটা! এটা কী?

চন্দ্রার আঙুলের সঙ্গে অসমঞ্জ নিজের আঙুল ছুঁয়ে দিলেন ইচ্ছে করে। এতে তাঁর শরীরের মধ্যে ঝনঝন শব্দ হয়, তাঁর বয়েস কমতে থাকে। চন্দ্রা কিন্তু আঙুল সরিয়ে নেয় না, তার

শরীরের ঝনঝন শব্দ হয় কি না তা বোঝবার কোনো উপায় নেই, সে মন দিয়ে কথা বলে যায়।

নকশাটি সম্পর্কে আরও উৎসাহী হয়ে অসমঞ্জ তার মুখোনি এগিয়ে আনেন অনেকটা। চন্দ্রার গালের সঙ্গে তাঁর গালের আধ ইঞ্চি ফাঁক। একবার কি ছুঁয়ে যাবে, না যাবে না? ইচ্ছে করে ছুঁইয়ে দিলে চন্দ্রা বুঝতে পারবে? বুঝতে পারলেও কি বিরক্ত হবে?

টেবিলের ওপর থেকে একটা পেন্সিল পড়ে গেল, অপূর্ব নিচু হয়ে সেটা তুলতে যেতেই অসমঞ্জ অতি সূক্ষ্মভাবে চন্দ্রার গালটা ছুঁয়ে দিলেন। তাঁর বয়েস অনেকখানি কমে গেল।

চন্দ্রা মুখটা সরিয়ে নিয়ে অসমঞ্জর দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে রইলো কয়েক পলক। অসমঞ্জর বুক কাঁপছে, চন্দ্রা রাগ করে নি, বিরক্ত হয় নি, তার ঠোঁটে হাসি।

চন্দ্রা বললো, অপূর্ব এই প্ল্যানটা বিনা পয়সায় করে দিয়েছে!

চন্দ্রার মুখের হাসির সঙ্গে এই কথাটার কোনো মিল নেই বলে অসমঞ্জ আবার একটু ক্ষুণ্ন হলেন। তিনি নীরসভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কত এস্টিমেট?

অপূর্ব বললো, জমি বাদ দিয়ে এক লাখ পঁয়তিরিশ হাজার।

–এত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?

চন্দ্রা বললো, ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। পাতিপুকুরে জমি তো পাওয়াই যাচ্ছে!

অসমঞ্জ বললেন, পাওয়া যাচ্ছে মানে এখনো তো রেজিস্ট্রি হয়নি। শুধু মুখের কথা।

চন্দ্রা দুষ্টু দুষ্টু ভাব করে বললো, ও আমি যোগেন দত্তর মাথায় হাত বুলিয়ে ঠিক আদায় করে ফেলবো।

চন্দ্রা হাতের এমন একটা ভঙ্গি করলো যেন সে আক্ষরিক অর্থেই সেই ঝানু ব্যবসায়ীটির মাথায় হাত বুলোবে।

অপূর্ব বললো, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই সব কাজে ভালো গ্র্যান্ট দেয়। আমি দিল্লি যাচ্ছি, আপনারা যদি আমার হাতে একটা অ্যাপ্লিকেশন দেন, আমি খানিকটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে আসতে পারি।

চন্দ্রা বললো, শুধু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক নয়, তোমাকে আরও অনেক কিছু করতে হবে।

তারপরেই সে অসমঞ্জর দিকে তাকিয়ে বললো, আজ কী বার? মঙ্গলবার, তাই না? আজ আপনার এ পাড়ায় টিউশানি ছিল তাই এসেছেন। কেন, অন্যদিন বুঝি শুধু আমার বাড়িতেই আসতে পারেন না?

অসমঞ্জ বললেন, তুমি চাইলে প্রত্যেক দিন।

চন্দ্রা একটু চিন্তা করে বললো, সুচরিত ছেলেটা কী রকম লেখাপড়া করছে সে খবরও তো নেন না। আমি কয়েকদিন নিয়ে বসেছি, দেখলুম যে ও ইংরিজিতে কাঁচা। আপনি মাঝে মাঝে এসে ওকে ইংরিজিটা পড়িয়ে দিন!

চন্দ্রা তাঁকে ঘন ঘন এ বাড়িতে আসতে বলায় অসমঞ্জ যেমন খুশী হয়ে উঠেছিলেন, তার পরের কথাটায় মনটা আবার বিগড়ে গেল।

তবু সুচরিতকে তিনি পড়াতে রাজি হলেন। একদিন সুচরিত আর তার মাকে তিনি নিজের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে জন্য তার মনে কোনো গ্লানি হলো না। তিনি ওরকম করেছিলেন বলেই তো ছেলেটার কপাল খুলে গৈল। চন্দ্রার নজরে পড়ায় ছেলেটা এখন রাজার হালে আছে। ফ্রি খাওয়া-দাওয়া, আর এরকম একখানা ঘর। সুচরিতকে পড়াবার বিনিময়ে। অসমঞ্জ কোনো টাকা পাবেন না বটে, কিন্তু প্রত্যেকদিন চন্দ্রাকে একবার অন্তত

ছোঁয়া তো যাবে! কথা বলতে বলতে চার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলে ও সরে যায় না।

যোগেন দত্তর সঙ্গে চন্দ্রার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অসমঞ্জই। বড়বাজারের এই ব্যবসায়ীটির মেয়েকে তিনি চার বছর পড়িয়েছেন। যোগেন দত্তর অনেক টাকা, একবার তিনি একটি খুনের মামলায় পড়েছিলেন, টাকার জোরেই মুক্তি পেয়েছিলেন সেবার। সম্প্রতি তাঁর মনে কিছুটা বৈরাগ্য ভাব এসেছে, পুণ্য অর্জনের জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে তাঁর পাতিপুকুরের জলা জমিটা দান করতে চান। সে খবর শোনা মাত্র চন্দ্রা লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনকে সাহায্য করার অনেক লোক আছে। ঐ জমিটা তার প্রজেক্টের জন্য চাই।

বিডন স্ট্রিটের মোড়ের কাছটায় যেখানে ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যান্ড, সেখানে চাপা কলের সামনে একটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ পাগলিনীকে দেখে চোখ বুজে ফেলেছিল চন্দ্রা। কলকাতার রাস্তায় এই দৃশ্য এমন কিছু অভিনব নয়।

বড় বড় বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে অনেক ভিখিরি পরিবার আশ্রয় নিয়ে থাকে। সেখানেই তাদের আহার-নিদ্রা-মৈথুন আর জন্ম-মৃত্যুর চক্র আবর্তিত হয়। দিনের বেলায় তারা তবু একটু আব্রু রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু পাগলদের তো সে ভঁসও থাকবার কথা নয়। পাগল তো অনেক আছেই, ইদানীং যেন পাগলিনীর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন মুখ চোখে পড়ে। অসমঞ্জও পাগলিনীদের এই সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ করেছেন। খুব সম্ভবত, এরা সবাই ধর্ষিতা নারী। প্রতিদিন যে উদ্বাস্তুদের স্রোত আসছে, তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু যুবতী মেয়ে তো ধর্ষিতা হবেই। পাগল হয়ে গেলে ক্যাম্পেও এদের জায়গা হয় না।

অসমঞ্জ রায় আর চন্দ্রা তখন একটা ট্যাক্সিতে বসে ছিলেন, সামনের রাস্তায় জ্যাম। উলঙ্গ নারীটিকে দেখে চোখ বুজে চন্দ্রা প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, রাস্তা দিয়ে এত লোকজন যাচ্ছে, স্কটিশ চার্চ কলেজ, বেথুন কলেজের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে, তাদের কারুর

কোনো হুস নেই? এই মেয়েটির জন্য কেউ কিছু করতে পারে না? নারীত্বের এতখানি অপমান...

সেই দিন থেকেই চন্দ্রা রাস্তার মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দেবার জন্য পরিকল্পনা করতে শুরু করে। তারই প্রথম পদক্ষেপ এই মহিলা-আবাস স্থাপন।

যোগেন দত্ত জমিটা দিতে এখনো খানিকটা তা-নানা-না করছেন তার কারণ তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, এই রকম কাজে জমি দিলে পুণ্য হয় কি না। রামকৃষ্ণ মিশনকে জমি দিলে পুণ্য একেবারে বাঁধা। চন্দ্রা তবু নাছোড়বান্দা, ইদানীং কয়েকটা দিন সে যোগেন দত্তর সঙ্গে সব সময় লেগে আছে।

চন্দ্রাকে এক কথায় না-ও বলতে পারছেন না আবার চন্দ্রা সম্পর্কে পুরোপুরি মনস্থিরও। করতে পারছেন না যোগেন দত্ত। চন্দ্রার মুখে কোনো ধর্মের কথা নেই, ঠাকুর-দেবতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাবও নেই। রাস্তা থেকে পাগল ছাগল তুলে এনে রাখবার জন্য একটা বাড়ি বানাতে চায় মেয়েটা, যোগেন দত্তর মতে, এটাও ঐ মেয়েটার একটা পাগলামি। তবে চন্দ্রাকে তাঁর পছন্দ হয়েছে।

একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে বিকেলে বাড়ি ফিরে অসমঞ্জ দেখলেন, তাঁর শয়নকক্ষে প্রীতিলতার বিছানার পাশে একটি চেয়ারে বসে আছে চন্দ্রা। দু'জনের হাতেই চায়ের কাপ, এমনভাবে হেসে হেসে গল্প করছে যেন দু'জনের কতদিনের চেনা।

অসমঞ্জ শুধু চমকে গেলেন না, ভয় পেয়ে গেলেন। প্রীতি আজকাল অদ্ভুতভাবে কথা বলে। তার মন যে কোন্ বিচিত্র গতিতে চলে তা অসমঞ্জ বুঝতে পারছেন না। চন্দ্রা সম্পর্কে প্রীতির মনে প্রবল ঈর্ষা আছে, অথচ কখনো কোনো প্রসঙ্গে চন্দ্রার নাম উঠলেই প্রতি তার দারুণ প্রশংসা করে। চন্দ্রার মতন এমন মেয়ে নাকি সে আর দেখেনি। তবু নিজের স্বামীর সঙ্গে চন্দ্রার বেশি ঘনিষ্ঠতা কি সে মেনে নেবে? চন্দ্রাকে সে একবার চিঠি লিখেছিল।

চন্দ্রার সামনে জামাটা খোলা ঠিক হবে না ভেবে তিনি জামাটা খুলতে গিয়েও খুললেন না। উদাসীন ভাব দেখিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, কী খবর, চন্দ্রা, ভালো তো?

চন্দ্রা সব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয় না। তার ঠোঁটে চায়ের কাপ।

প্রীতির দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আজ কেমন আছো?

প্রীতিলতাও উত্তর না দিয়ে হাসলেন। যেন কোনো একটা বিশেষ আলোচনার মধ্যে অসমঞ্জ এসে পড়ায় ওরা দু'জনেই কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে অসমঞ্জ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হতেই চন্দ্রা বললো, আমি আপনার জন্যেই বসে আছি। আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

এ কথা শুনে অসমঞ্জ সুখের চেয়েও স্বস্তি বোধ করলেন বেশি। চন্দ্রার বাড়িতে যে তিনি প্রায় প্রত্যেক সন্ধেবেলা যান তা প্রীতি জানেন না। চন্দ্রাও নিশ্চয়ই সে কথা জানিয়ে দেয় নি। চন্দ্রার বাড়িতে তিনি গতকালও গিয়েছিলেন। আজ. চন্দ্রা তাঁর সঙ্গে জরুরি কথা বলার জন্য বসে আছে, সুতরাং প্রীতি নিশ্চয়ই ধরে নেবে যে চন্দ্রার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি অনেক দিন।

তিনি চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার তো সব খবরই জরুরি। এটা কী?

চন্দ্রা তার চোখ-মুখে রং মশাল জ্বেলে বললো, যোগেন দত্ত রাজি হয়েছে! আজ সকালেই রাজি করিয়েছি! ইজট ইঁট সামথিং?

অসমঞ্জ ঔদাসীন্যের ভাবটা বজায় রেখে বললেন, ও রকম তো সে মুখে আগেও বলেছে। হ্যাঁজ হি সাইন্ড দা ডীড?

চন্দ্রা বললো, কাল সই করবে। আমাকে দুটো শর্ত দিয়েছে। পুরুত ডেকে জমিতে পুজো করে তারপর দলিলটা তুলে দেবে আমাদের হাতে। আর দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানটি হবে ওঁর মায়ের নামে। এতে আমাদের আপত্তি করার কী আছে? আমাদের কাজ হলেই হলো।

–হ্যাঁ, এতে আপত্তি করার কিছু নেই।

–কাল সকালে জমি-পুজো হবে। সেই সময় আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

অসমঞ্জ ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, কাল? কাল তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার অন্য কাজ আছে।

–সে কি, আপনি না গেলে চলবে কেন? আপনি প্রেসিডেন্ট, আপনি তো দলিলটা নেবেন আমাদের পক্ষ থেকে।

–সে তুমি নিলেও চলবে। কিংবা, অন্য কোনো দিন করতে বলো!

–আবার অন্যদিন হলে যদি বুড়ো মত বদলে ফেলে? পুরুতকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে, কাল নাকি ভালো দিন।

–কিন্তু কাল যে আমার বিশেষ কাজ আছে, কাল যাই কী করে?

চন্দ্রা জোর দিয়ে বললো, যতই কাজ থাক, আপনাকে যেতেই হবে। সকাল এগারোটায়। প্রীতি জিজ্ঞেস করলেন, কাল তোমার কী কাজ?

–বাঃ, কাল তোমার মামাদের সঙ্গে চন্দননগরে যাবার কথা নয়?

প্রীতি হাঁফ ছেড়ে বললেন, ও তোমার না গেলেও চলবে। মেজোমামাকে সকালে খবর পাঠিয়ে দেবো। তার থেকে এটা অনেক বেশি জরুরি। চন্দ্রার কাছ থেকে শুনছিলুম কত কষ্টে ও বুড়োটাকে রাজি করিয়েছে।

অসমঞ্জ এবারে একটা যথার্থ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রীতি বুঝুক যে চন্দ্রার যে-কোনো প্রস্তাবেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হন না। কাল তিনি চন্দ্রার সঙ্গে যাবেন প্রীতিরই অনুরোধে।

চন্দ্রা আজ একটা গোলাপি রঙের শাড়ি পরেছে। এই রংটা চন্দ্রার বেশি পছন্দ। চন্দ্রার মুখেও একটা গোলাপি আভা। সিঁথিতে সে সিঁদুর দেয় না, তার কপালে একটা লাল টিপ।

চন্দ্রার মুখটা দেখেই তাকে এক্ষুনি একবার ছুঁতে ইচ্ছে হলো অসমঞ্জর। চন্দ্রা উঠে দাঁড়িয়েছে। তাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে অন্তত দুবার ছুঁতে চান অসমঞ্জ।

কিন্তু প্রীতিলতাও নেমে পড়লেন খাট থেকে।

অসমঞ্জ হা-হা করে উঠে বললেন, তুমি নামছো কেন? তুমি শুয়ে থাকো। আমি ওকে পৌঁছে দিচ্ছি।

প্রীতি বললেন, আমি আজ বেশ ভালো আছি। আমি একটু নিচে যাবো।

অসমঞ্জর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাহলে আর তার যাবার দরকার নেই, তবু তিনি চন্দ্রার শরীরের গন্ধ পাবার জন্য ওদের সঙ্গে নামলেন সিঁড়ি দিয়ে, একটু দূরত্ব রেখে।

চন্দ্র চলে যাবার পর তিনি বসবার ঘরে এসে একটা পত্রিকা খুলে মন বসাবার চেষ্টা করলেন। এক্ষুনি তিনি প্রীতির সঙ্গে কোনো কথা বলতে চান না, তা হলে তাঁর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার প্রকাশ পেতে পারে। পত্রিকাটিতে মুখ আড়াল করে তিনি আত্মসমালোচনা করতে। লাগলেন, কেন চন্দ্রাকে শুধু স্পর্শ করার জন্য তাঁর এই ব্যাকুলতা? এ যেন নিছক পাগলামির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। আগে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে লেখাপড়ার কাজ করতেন, এখন প্রায় প্রত্যেকটি সন্ধে চন্দ্রার বাড়িতে কাটে, শুধু তাকে দেখবার জন্য, তাকে একটু ছোঁয়ার জন্য। উদ্বাস্তু ত্রাণ, অনাথ আশ্রম স্থাপন এই সব বিষয়ে তাঁর সত্যিকারের কোনো

উৎসাহ নেই, তিনি তো আর ইলেকশনে দাঁড়াতে চান না! শুধু চন্দ্রার জন্যই তিনি এসব নিয়ে মেতেছেন এবং ক্রমশই বেশি করে জড়িয়ে পড়ছেন।

অসমঞ্জ ঠিক করলেন, এবারে একটু সাবধান হতে হবে। চন্দ্রার মতন মেয়ে সমাজসেবা নিয়ে কেন এত মাতামাতি করছে তা বোঝা দুঃসাধ্য। এরকম অ্যাকমপ্লিসড মহিলারা তো হাই সোসাইটিতে ঘোরাফেরা করে। চন্দ্রা রূপসী তো বটেই, তা ছাড়া, বাড়ির অবস্থা বেশ ভালো, ইংরিজিও বলে চমৎকার। সে কেন গরিব-দুঃখী আর পাগলদের জন্য জীবনটা খরচ করবে? কয়েক বছর আগে পরিচালক দেবকী বসু তাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ফিল্মটি তৈরি করার সময় চন্দ্রাকে নাকি পার্ট দিতে চেয়েছিলেন, এ কথা অসমঞ্জ চন্দ্রার বাবার মুখ থেকে শুনেছেন। চন্দ্রা রাজি হয়নি। চন্দ্রার বাবাও তো অদ্ভুত, তাঁর মেয়ে স্বামীর ঘর করে না, এখানে ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়ায়, তবু তিনি কোনো বাধা দেন না!

এরা অন্য রকম মানুষ, অসমঞ্জর সঙ্গে মিলবে না।

পরদিন সকালে চন্দ্রা তাদের বাড়ির গাড়ি নিয়ে এলো অসমঞ্জকে তুলে নিতে। পেছনের সীটে বসেই তিনি চন্দ্রার ডান হাতটা নিজের দু'হাতে তুলে নিলেন। এতটা সাহস তিনি আগে কোনো দিন দেখান নি। চন্দ্রা কোনো আপত্তি করলো না, হাত ছাড়িয়ে নিল না। উত্তেজনায় সে ছটফট করছে। অসমঞ্জের দিকে ঘুরে বসে সে বললো, আজই জমিটা আমাদের হয়ে যাচ্ছে, দারুণ না! আপনি অবিশ্বাস করেছিলেন। দেখুন না, এর পরে সব টাকাই আমি তুলে ফেলবো। ঐ বুড়োর মায়ের নাম দিয়ে আরও টাকা আদায় করবো ওর কাছ থেকে।

অসমঞ্জ কোনো কথা মন দিয়ে শুনছেন না, চন্দ্রার হাতটা জোর করে চেপে ধরে আছেন, তাঁর শরীরের মধ্যে ঝনঝন শব্দ হয়েই চলেছে।

গাড়ি চললো আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে। সেখান থেকে যোগেন দত্তকে তুলে নিতে হবে। যোগেন দত্তর নিজস্ব গাড়ি আছে একাধিক, তবু তিনি চন্দ্রার গাড়িতে গিয়ে পয়সা বাঁচাতে চান। চন্দ্রাও তাঁকে চোখের আড়াল করতে চায় না যেন।

বাড়ির সামনেই তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যোগেন দত্ত। বিশাল তাঁর বন্ধু। আজ জমি পুজোর ব্যাপার আছে বলেই বোধ হয় একটা গরদের পাঞ্জাবি পরেছেন, ঘাড়ে মুগার চাঁদর। কপালে চন্দনের ফোঁটা। এক গাল হাসি দিয়ে তিনি দু'জনকে অভ্যর্থনা করলেন, তারপর অসমঞ্জকে বললেন, এই যে মাস্টারবাবু, কী মেয়ে একটা জুটিয়েছেন, একেবারে ছিনে জোঁক। শেষ পর্যন্ত জমিটা আদায় করে ছাড়লো!

অসমঞ্জ বললেন, সৎ কাজেই তো লাগবে! আপনার অনেক আছে।

যোগেন দত্ত বললেন, আমি সামনের সীটে বসতে পারি না, আমার গন্ধ লাগে!

পেছনের সীটে তিনজন বসাই স্বাভাবিক, কিন্তু যোগেন দত্তর শরীরের আয়তনের জন্য আঁটাআঁটি হবে। চন্দ্রা অসমঞ্জকে বললো, আপনি সামনে গিয়ে বসুন!

অসমঞ্জর মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। এখন চার পাশ থেকে উঠে যেতে ইচ্ছে করছে না তাঁর। তবু তিনি নামলেন।

গাড়ি ছাড়বার পর যোগেন দত্ত চন্দ্রাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তা থেকে তুমি যে পাগলদের ধরে এনে রাখবে, তাদের সামলাবে কে?

চন্দ্রা বললো, আপনাকেও আসতে হবে মাঝে মাঝে। আপনার মায়ের নামে প্রতিষ্ঠান হচ্ছে।

--ওরে বাবা, পাগলদের আমি বড্ড ভয় পাই!

-মেলোমশাই, আমাদের বাড়ির প্ল্যানটা দেখবেন?

যোগেন দত্ত অট্টহাসি করে বললেন, মেলোমশাই! অ্যাঁ? তুমি মাসি পেলে কোথায়? আমার তো পত্নী বিয়োগ হয়েছে পাঁচ বছর আগে!

–তা হলে কী বলে ডাকবো আপনাকে? মিঃ দত্ত বলতে আমার ভালো লাগে না!

–তা হলে দাদা বলো! বড়বাজারে সবাই আমায় দাদা বলেই ডাকে।

–দেখবেন প্ল্যানটা?

–দেখি।

চন্দ্রা তার কোলের ওপর নকশাটা বিছিয়ে ধরলো, কাছ ঘেঁষে এগিয়ে এলো যোগেন দত্ত। অসমঞ্জ পেছন দিকে ঘুরে বসলেন। কিন্তু তাঁর দিকে ওরা মনোযোগ দিচ্ছে না, চন্দ্রা আর যোগেন দত্ত কথা বলে যাচ্ছে।

হঠাৎ অসমঞ্জ লক্ষ করলেন, যোগেন দত্ত একেবারে চন্দ্রার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে। পড়েছে, তার একটা হাত চন্দ্রার উরুতে। চন্দ্রা সরে বসছে না? সে যেন টেরই পাচ্ছে না! কিন্তু কোনো মেয়ে কি টের না পেয়ে পারে? এক টুকরো জলা জমির জন্য চন্দ্রা এই খুনে, কালোবাজারি লম্পটটার স্পর্শ সহ্য করছে? এ কোথায় নেমে যাচ্ছে চন্দ্রা?

অসমঞ্জর মাথায় আগুন জ্বলতে লাগলো।

৩৬ মোটর বাইকের গর্জনে পাড়া কাঁপিয়ে

মোটর বাইকের গর্জনে পাড়া কাঁপিয়ে সকালবেলা উপস্থিত হলো আলতাফ। দরজার সামনে সে গলা খুলে ডাকলো, মামুন ভাই! মামুন ভাই!

সদরে কলিং বেল আছে, আলতাফের তা মনে থাকে না, প্রত্যেকবারই এসে সে ঐ রকম। হাঁক পাড়ে। একটুক্ষণও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা তার স্বভাবে নেই, সব সময়েই সে জীবনী

শক্তিতে টগবগ করছে। আলতাফ এলেই আশপাশের বাড়ির জানলা খুলে যায়, অন্তঃপুরিকারা লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখে। দেখবার মতনই চেহারা তার। ছ' ফুটের মতন লম্বা, মাথায় বাবড়ি চুল, এমন চওড়া কাঁধ ও শক্ত কবজীওয়ালা পুরুষ বাঙালীদের মধ্যে বেশি দেখা যায় না। গায়ের রংও পরিষ্কার। তার পোশাকের আড়ম্বর আছে, ঢাকার শীত এমন কিছু বেশি নয়, তবু সে পরেছে একটা জমকালো উইন্ডচিটার। তাকে যেন মিলিটারির সেনাপতি হিসেবেই মানাতো। অবশ্য তার চোখে-মুখে এখনো যেন রয়ে গেছে কৈশোরের সারল্য।

সকালবেলা এ বাড়ির আবহাওয়া বড় গুমোট ছিল, আলতাফ এসে পড়ায় মামুন খুশীই হলেন।

শহীদ, পলাশ, নাদেরারা আজ ভোরেই এসে বিদায় নিয়ে গেছে, ওরা ফিরে যাচ্ছে কলকাতায়। তারপর থেকেই মঞ্জুর কী কান্না! তাকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। অবুঝের মতন সে বারবার বলছে যে সেও কলকাতায় যাবে।

আলম সাহেব আর মালিহা বেগম দু'জনেই বেশ বিরক্ত হয়েছেন মঞ্জুর ওপর। মেয়েকে তাঁরা খুবই ভালবাসেন, কিন্তু মেয়ের এ কী বেহায়াপনা! প্রথমে সস্নেহ ভর্ৎসনা, তারপর মৃদু তিরস্কার, তারপর রীতিমতন বকুনি বর্ষিত হচ্ছে মঞ্জুর ওপর। খোসমেজাজী আলম সাহেব পর্যন্ত একসময় কটুভাবে বলে ফেললেন, লাই দিলেই মাথায় ওঠে। এইজন্যেই বাপ-দাদারা মাইয়া মানুষদের কড়া শাসনে রাখতেন!

মামুন দু'দিকেই সামলাবার চেষ্টা করছিলেন। মঞ্জুর কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনোর জন্য বায়না ধরা তাঁরও পছন্দ হয়নি, কিন্তু মঞ্জুর তরুণী হৃদয় অন্য যে কারণে উদ্বেল হয়ে উঠেছে সেটা তিনি বোঝেন। এ দেশের মেয়েদের সারা জীবনই কাঁদতে হয়। তবে কোনো কোনো বিশেষ কারণের জন্য কান্না লুকিয়ে রাখতে হয় অন্যদের কাছ থেকে, সে দুঃখ শুধু নিজের, চোখে জল আসে বিরলে, নিরালায়। মঞ্জু এখনও বড় ছেলেমানুষ রয়ে গেছে, কান্না লুকোতে শেখেনি।

শহীদের সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ের প্রস্তাব সরাসরি উত্থাপন না করা হলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। শহীদ বুদ্ধিমান ছেলে, সে বুঝতে পেরেও উৎসাহ দেখায়নি। কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় এসে থাকার তার একটুও ইচ্ছে নেই। কলকাতায় তাদের বড় ব্যবসা, উত্তর বাংলায় জলপাইগুড়ি জেলায় তাদের চা বাগানের সম্পত্তি আছে, সেসব ছেড়ে আসার প্রশ্নই ওঠে না। ঢাকা শহরটি সুন্দর হলেও কলকাতার তুলনায় মফঃস্বল মনে হয় তার কাছে। অবশ্য মঞ্জু যদি কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনো করতে চায়, তাহলে সে সবরকম সাহায্য করতে রাজি আছে।

মালিহা বেগম আগে থেকেই জেদ ধরে আছেন যে মেয়ের বিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে আর কোথাও দেবেন না, এমনকি লন্ডনের পাত্র পেলেও না।

সুতরাং বিয়ের প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেছে। একা একা এত বড় মেয়েকে কলকাতায় পড়তে পাঠাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ওরা যখন বিদায় নেয়, তখন মঞ্জু শহীদের বদলে পলাশের সামনে দাঁড়িয়েই প্রথম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। পলাশেরও ছলছল করে উঠেছিল চোখ। মামুন সে দৃশ্য দেখেছেন, কিন্তু তার কোনো অন্য অর্থ তিনি মাথায় আনতে চান না।

একসময় মঞ্জুর মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বলেছিলেন, তুই কাঁদিস না, মামণি, তোরে আমি কলকাতায় বেড়াতে নিয়ে যাবো। আমি কথা দিতেছি।

মঞ্জু তাতেও প্রবোধ মানেনি।

আলতাফ এসে যখন বৈঠকখানায় ঢুকলো, তখনও মঞ্জু হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদছে। আলতাফকে দেখে সে ঝড়ের মতন ছুটে বেরিয়ে গেল।

আলতাফ ঘাড় ঘুরিয়ে বিস্মিত চোখে মঞ্জুকে দেখলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, ঐ মেয়েটির চক্ষু লাল, কেউ বকেছে বুঝি? কী হয়েছে?

মামুন বললেন, এমন কিছু হয় নাই। মেয়েলি ব্যাপার, তুমি বুঝবে না।

আলতাফ তবু ভুরু কুঁচকে রইলো একটুক্ষণ। আপন মনেই বললো, মানুষ যে অন্যকে কেন কাঁদায়? অন্যকে কষ্ট দিয়ে কী যে আনন্দ পায় মানুষ!

মামুন বললেন, বসো আলতাফ। তারপর খবর-টবর কী?

আলতাফ ঝপাস করে একটা চেয়ারে বসে বললো, আমার একটা মত কী জানেন। মামুন-ভাই, যে-সব বাপ-মায়েরা ছেলেমেয়েদের বেশি বকাবকি করে, সরকারের উচিত তাদের ফাইন করা!

মামুন কাষ্ঠহাসি দিয়ে বললেন, এদেশের সরকার তো আমাদের জান্ মালের সব ক্ষমতাই নিয়ে রেখেছে, এরপর কি চাও, সরকার আমাদের পরিবারের মধ্যে এসেও মাথা গলাবে!

আলতাফের গায়ে যেন বিছুটি লেগেছে, এইভাবে ছটফটিয়ে উঠে সে বললো, না না, না, এই সরকার না, এই সরকার না! ভবিষ্যতে যখন আমাদের নিজেদের আদর্শ সরকার গড়া হবে, তখনকার কথা বলছি। তা এই মেয়েটি কাঁদছিল কেন বলেন না! কী হয়েছে?

–আরে, তোমার এত কৌতূহল কেন? ওর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে কিনা। তুমি তো আগেই বিয়ে করে বসে আছো, নইলে তোমার মতন পাত্র পেলে আমরা এক্ষুনি বিয়ে দিতাম!

আলতাফ লজ্জা পেয়ে বললো, হায় আল্লা, আমি ছাড়া কি আর পাত্র নাই? আমার ছোট ভাইটাই তো রয়েছে, সে ল্যাখাপড়ায় আমার থেকে চার গুণ ভালো! যদি বলেন তো সম্বন্ধ। করতে পারি।

–এখন কয়েকটা দিন যাক! পরে আমি দুলাভাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করবো। এখন কাজের কথা বলো!

–আপনি তৈরি তো মামুনভাই? আজ দুপুরেই আমরা টাঙ্গাইল রওনা হবো।

–আজ দুপুরেই? এত তাড়াতাড়ি কিসের?

–পর্শু থেকে কনফারেন্স আরম্ভ! আপনি আমার সঙ্গে মোটর সাইকেলে যাবেন!

–মোটর সাইকেলে? না বাপু, সে আমি পারবো না!

–চিন্তা করবেন না, মামুনভাই। দেখবেন, একেবারে পক্ষীরাজের মতন উড়ায়ে নিয়ে যাবো আপনাকে।

–কিন্তু আমার মেয়েটাও যে আমার সঙ্গে যাবে!

–তাকেও নিয়ে নেবো সামনে বসিয়ে। অসুবিধা কিছু নাই! মামুন তবু রাজি হলেন না। মোটর সাইকেলে যেতে যে তিনি ভয় পান তা নয়। তাঁর সঙ্গে যারা একসঙ্গে রাজনীতিতে নেমেছিল, তারা অনেকেই এখন মাঝারি শ্রেণীর নেতা হয়ে পার্টির জিপ গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। অনেকের নিজস্ব গাড়ি হয়েছে। মামুনের সেসবের প্রতি লোভ নেই বটে, কিন্তু তাহলেও একজন সাধারণ পার্টি কর্মীর মোটর সাইকেলের পেছনে চেপে তিনি যেতে পারবেন না। তিনি নিজের পয়সায় বাসে চেপে যাবেন। আজ নয়, আগামীকাল।

আলতাফ বেশ নিরাশ হলো মামুনের কথা শুনে। সে মামুনকে নিয়ে যাবার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে চলে এসেছে।

মামুন বললেন, মওলানা ভাসানী তো মস্ত বড় সম্মেলন করছেন শুনতে পেলাম। ইত্তেফাক কাগজে খুব লেখালেখি হচ্ছে। দেশে এখন দুর্ভিক্ষ চলছে। কত মানুষ মরছে অনাহারে, এই সময় এত জাঁকজমক করা কি ভালো?

আলতাফ বললো, প্রয়েজন আছে। প্রয়োজন আছে। আপনি গেলেই বুঝবেন। আমাদের দলের যে কতখানি শক্তি তা পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাটাদের দেখানো দরকার!

মামুন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আলতাফ, তুমি যে বললে ভবিষ্যতে তোমাদের নিজেদের সরকার গড়া হবে, কেন, এখনই তো তোমাদের দল পাওয়ারে এসেছে।

আলতাফ অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, ফুঃ! নির্বাচন হলো না, প্রেসিডেন্টের ধামাধরা সরকার গড়া হলো, ওরা... মাফ করবেন মামুনভাই, একটা খারাপ কথা মুখে এসে যাচ্ছিল!

মামুন ঈষৎ ব্যঙ্গের সঙ্গে বললেন, তোমার মনের ভাবটা তো বুঝতে পারছি না। তুমি আওয়ামী লীগের জন্য এত খাটছো, এখন তো তোমার আহ্লাদে থাকার কথা। তোমাদের নেতা সোহরাওয়ার্দি সাহেব এখন কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিত্ব করছে, ফজলুল হক সাহেব গভর্নর। বাঙালীদের তো এখন জয়জয়কার। এমনকি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীজা, সেও নাকি বাঙালী, এতদিন সেকথা জানতাম না, হক সাহেব তাকে বাঙালী বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ওঁর শরীরে নাকি রয়েল ব্লাড আছে!

–ব্যাটা মীরজাফরের বংশধর! শোনেন মামুন ভাই, এই জোড়াতালি দেওয়া সরকার নিয়ে কোনো কাজের কাজ হয় না। প্রেসিডেন্টের বদখেয়াল হলে একটা লাথথি মেরে এই সরকার উল্টে দেবে। আমরা কি স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার এখনো পেয়েছি?

–আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সম্মেলন ডেকে কোন্ মুখে এখন সরকারের সমালোচনা করবেন? নিজেদেরই তো–

–সরকার আর পার্টি কি এক? শেখ মুজিবর রহমান তাড়াহুড়ো করে এই সরকার মেনে নিলেন। আমি আপনাকে বলে রাখছি, মিলিয়ে নেবেন, এ সরকারের আয়ু আর বেশিদিন নাই!

মামুন এক দৃষ্টিতে আলতাফের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর বললেন, কয়েকদিন আগে তোমার এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছিলাম, ঐ যিনি

হোটেলের ব্যবসা করেন। তোমার ওপর তাঁর খুব রাগ দেখলাম। তাঁর ধারণা, তুমি কমুনিস্ট। এখন মনে হচ্ছে, তাঁর ধারণাটা বোধহয় খুব ভুল নয়।

আলতাফ সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে হেসে উঠে বললো, আরে, ওর কথা বাদ দেন। ও শুধু টাকা দিয়ে মানুষকে চেনে।

মামুন বললেন, বামপন্থীরা এখন মওলানা ভাসানীর চার পাশে এসে ভিড়ছে, এ তো আমিও বুঝতে পারছি। কেন বলো তো?

প্রয়োজনে প্রগতিশীল কিংবা বামপন্থীদেরও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়। এটা তো খুব স্বাভাবিক, তাই না? মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী এইসব প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে এখন আমাদের এককাট্টা হয়ে লড়তে হবে। এটাই তো সঠিক স্ট্র্যাটেজি!

হঠাৎ কিছু যেন কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আলতাফ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি তাহলে আজ যাচ্ছেন না? আমি এখন চলি। কাল সকালে বাস স্ট্যান্ডে দেখা হবে। আপনাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে আমি রওনা হবো!

পরদিনও আলতাফ এক অদ্ভুত কাণ্ড করলো। মামুনদের বাসে তুলে দিল বটে কিন্তু সঙ্গ ছাড়লো না। মোটর সাইকেলে সে অনেক আগেই পৌঁছে যেতে পারতো, কিন্তু সে প্রায় চলতে লাগলো বাসের সঙ্গে সঙ্গে। মাঝে মাঝে সে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার হঠাৎ সে চলন্ত বাসের পাশাপাশি চলে এসে হাত নাড়ে। যেন সে মামুনের বডি গার্ড।

মামুনের মেয়ে হেনা এতে বেশ মজা পাচ্ছে। জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে সে আলতাফকে দেখার চেষ্টা করে, দেখতে পেলেই হেসে ওঠে খলখলিয়ে। বাচ্চাদের সঙ্গে বেশ সহজে ভাব জমাতে পারে আলতাফ, হেনাকে আনন্দ দেবার জন্য নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করছে সে।

মঞ্জুকেও সঙ্গে এনেছেন মামুন। বাড়িতে থাকলে সে মা বাবার কাছে আরও বকুনি খেত, কয়েকদিন বাইরে ঘুরে এলে তার মন ভাল হতে পারে। অসুবিধের কিছু নেই, টাঙ্গাইল শহরে আলম সাহেবের নিজের বাড়ি আছে, তাঁর এক চাচা সপরিবারে থাকেন সেখানে।

প্রথম প্রথম মঞ্জু মুখ ভার করেছিল। আলতাফের কাণ্ডকারখানা দেখে সেও না হেসে পারলো না। আলতাফের মাথায় আজ একটা টুপি, তাতে সে একটা কচুরিপানার ফুল গুঁজেছে।

মাঝপথে ধামরাইতে বাস থামতেই আলতাফ বললো, নেমে আসেন মামুনভাই, এখানে একটু চা খাওয়া যাক।

মঞ্জু বসে রইলো নিজের সীটে। মামুন হেনাকে নিয়ে নামলেন। আলতাফ আগে থেকেই চায়ের অর্ডার দিয়ে রেখেছে। এক কাপ চা ও দুটি বিস্কুট নিয়ে আলতাফ বাসের জানলার কাছে গিয়ে মঞ্জুকে বললো, এই নাও! তুমি কাঁদছিলে কেন গতকাল?

মঞ্জু কোনো উত্তর দিল না।

আলতাফ বললো, মেয়েরা কি শুধু কাঁদতে জানে, আর কিছু পারে না? তুমি নেমে এসো, তোমার সাথে আমার কথা আছে!

আলতাফের ব্যবহারে আর একবার মুগ্ধ হলেন মামুন। এই বয়েসী কোনো যুবককে কোনো অচেনা সদ্য যুবতীর সঙ্গে এমন সহজ সাবলীল ভাবে কথা বলতে তিনি আগে দেখেননি। তিনি বললেন, বাস এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে, তুই নেমে আয় মঞ্জু।

মঞ্জু আস্তে আস্তে নেমে এসে মুখ নিচু করে দাঁড়ালো। সে পরে আছে একটা আকাশী নীল শাড়ী। তার ওপর একটি লাল কল্‌কা দেওয়া সাদা শাল। ঈষৎ বিষাদাচ্ছন্ন মুখোনি তার এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

আলতাফ জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কী?

মঞ্জু মুখ নিচু করেই নীরব রইলো, মামুন বললেন, ওর ভালো নাম বিলকিস, ডাক নাম মঞ্জু।

আলতাফ বললো, ও বুঝি শুধু কাঁদতে জানে, কথা বলতে পারে না?

তারপর সে হেনার গাল টিপে বললো, কী রে হেনা, তোর এই আপাটা বুঝি বোবা?

হেনা বললো, না, বোবা না, ভাল গান করে!

-কথা বলে না, শুধু গান করে?

আলতাফ নাছোড়বান্দা, মঞ্জুকে শেষ পর্যন্ত কথা বলতেই হলো। চাও খেল।

আলতাফ বললো, তুমি গান করো, তুমি এই কনফারেন্সের সংস্কৃতি উৎসবে গান গাইবে?

অনেক জায়গা থেকে আর্টিস্ট আসছে, কলকাতা থেকেও আসছে। বলো, তা হলে ব্যবস্থা করে দিই!

মঞ্জু মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না, না, না, আমি গান গাইতে পারবো না।

-তুমি তা হলে ভলান্টিয়ার হও। আমাদের মেয়ে ভলান্টিয়ার দরকার।

-আমি যে ওসব কিছুই জানি না।

-তোমাকে শিখিয়ে দেওয়া হবে।

মামুন বললেন, হ্যাঁ, ওকে নিয়ে যাবো কনফারেন্সে। ও গানবাজনা ভালবাসে, সেসব তো শুনতে পারবে।

বাসের ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে, আবার উঠে পড়লেন মামুনরা।

টাঙ্গাইলে পৌঁছে মামুনকে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো। হেনাকে আর মঞ্জুকে তিনি পৌঁছে দিলেন আলম সাহেবের বাড়িতে, তারপর আলতাফের সঙ্গে তিনি চলে এলেন পার্টি অফিসে।

সমস্ত জেলা থেকে এসেছে ডেলিগেট, মামুনের অনেক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কনফারেন্সের সাফল্য নিয়ে সকলের মধ্যেই একটা উত্তেজনার ভাব। মওলানা যে সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছেন, তার প্রধান আলোচ্য বিষয় দুটি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন।

দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। নতুন সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবির স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। এই দাবি আদায়ের জন্য জোরদার আন্দোলন দরকার ঠিকই। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি বদলের প্রসঙ্গ এখানে তোলা কি সমীচীন হবে? মার্কিন সামরিক জোটের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে পাকিস্তান, মওলানা ভাসানী এর ঘোর বিরোধী। তিনি চান পাকিস্তান ঐ সামরিক জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসুক, আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল কর্মীরা তাঁকে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু এই আওয়ামী লীগেরই নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দি এখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তিনি যে মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন, সেই মঞ্চ থেকেই সরকারি পররাষ্ট্র নীতির বিরোধিতা করা যায় কী?

বিভিন্ন অঞ্চলের নেতা ও ডেলিগেটদের সঙ্গে কথা বলে মামুন বুঝতে পারলেন, এর মধ্যেই এই দুটি বিষয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা দিয়েছে। তর্কাতর্কিতে মাঝে মাঝেই কণ্ঠস্বর উঠে যাচ্ছে উচ্চগ্রামে।

ইত্তেফাক পত্রিকার বিশালদেহী সম্পাদক মানিক মিঞা বাইরের পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কয়েকজনের সঙ্গে। মানিক মিঞা যখন দেশ বিভাগের আগে কলকাতায় মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারি ছিলেন, সেই সময় থেকে মামুন তাঁকে চেনেন। তাঁর মতন অনেকেই এখন মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। মানিক

মিঞার সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্য মামুন এগিয়ে যেতেই তাঁর বরিশালের বন্ধু বদ্রু শেখ তাঁর হাত ধরে টেনে বললেন, আরে মামুন যে! এতদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে?

এই কয়েক বছরে মামুনের চেহারার বিশেষ পরিবর্তন না হলেও বদু শেখের বপু অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছ। আগে তাঁর মুখে ছিল দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, এখন পরিষ্কার করে কামানো। আগে তার পোশাক ছিল কুর্তা পাজামা, এখন প্যান্ট-কোট। চিনতে মামুনেরই অসুবিধে হলো প্রথমে।

কুশল বিনিময়ের পর পরস্পরের বর্তমান অবস্থার খবরাখবর জানাজানি হলো। মামুন কিছুই করেন না শুনে খুব আশ্চর্য হলেন বদ্রু শেখ। তিনি এক সময় হোল টাইম রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। এখন ব্যবসা করছেন। তাঁর হাসি খুশী ভাব দেখে মনে হলো, ব্যবসা বেশ ভালই চলছে!

দুই বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে এসে বসলেন আদালত প্রাঙ্গণে এক চায়ের দোকানে। সন্ধে হয়ে এসেছে, শীত পড়ছে জাঁকিয়ে। আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। পথে পথে সেরকমই অচেনা মানুষের স্রোত। এই ছোট শহরটিতে হঠাৎ বিপুল জনসমাগম হয়েছে।

খানিকক্ষণ পুরোনো কালের সুখ দুঃখের গল্প হল। পটুয়াখালিতে বন্দুদের বাড়িতে বেশ কয়েক মাস কাটিয়েছেন মামুন, বদ্রর মা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর হাতে তৈরি পাটিসাপ্টা পিঠের স্বাদ এখনো যেন মুখে লেগে আছে। বদ্রুদের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না, তবু তারই মধ্যে সব দিক গুছিয়ে কী সুন্দর রান্না করে খাওয়াতেন তিনি।

এক সময় বদ্রু শেখ জিজ্ঞেস করলেন, কী মামুন, এখানে এসে কী রকম বুঝছো? মামুন বললেন, আমি তো ভাই একটু হকচকিয়ে গেছি। শুনেছিলাম তো সবাইকে একসঙ্গে মেলাবার জন্য ডাকা হয়েছে এই সম্মেলন। কিন্তু এসে দেখছি অনেক দলাদলি। কেউ বলছে এক্ষুনি নিবাচন চাই। কেউ বলছে, এখন আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা, এখন নির্বাচনের দরকার কী?

বদ্রু বললো, দেখোই না আরও কত কী হয়! পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নেই ফাটাফাটি হবে। সোহরাওয়ার্দি মার্কিন জোট ছাড়তে চান না, মওলানা ভাসানী তাঁকে যতই ধমকান তাতে কোনো কাজ হবে না।

–আমিও তো তাই বুঝছি!

তুমি আর একটা কথা শোনোনি? প্রধানমন্ত্রী হবার পরই সোহরাওয়ার্দি সাহেব বলতে শুরু করেছেন যে আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের দাবিও তো আটানব্বই ভাগই মেনে নেওয়া হয়েছে।

–সে কি? আমরা কী পেয়েছি?

হে হে হে হে! ক্ষমতায় গেলে সবারই সুর পালটে যায়। সোহরাওয়ার্দি সাহেব প্রাদেশিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে সর্ব পাকিস্তান রাজনীতির চূড়ায় উঠতে চেয়েছিলেন। এখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি ভাবলেন সব পাওয়া হয়ে গেল। এখন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতের পুতুল হয়ে নাচছেন। ওদের সুরে সুর মিলিয়ে গাইছেন। শতকরা আটানব্বই ভাগ পাওয়া হয়ে গেছে, আর কী চাই!

আমি তো কিছুই বুঝতে পরছি না, বদু। এই সম্মেলনে তা হলে কী প্রস্তাব নেবো আমরা?

আমার তো ধারণা, কাল একটা মস্তবড় নাটকীয় কিছু ঘটবে! বুড়ো ভাসানী ভেলকি দেখাবে! তুমি শেখ মুজিবকে চেনো?

ভাষা আন্দোলনের সময় পরিচয় হয়েছিল। সে তো স্বায়ত্ত শাসনের একজন জোরালো দাবিদার ছিল।

দেখো, এখন সেও সুর পালটাবে! সেও ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে তো, তাই সে সোহরাওয়ার্দির দিকেই বেশি ঝুঁকেছে।

আমি তো জানতাম সে মওলানা ভাসানীর ভাবশিষ্য। তাঁর কাছ থেকেই সে রাজনীতি শিখেছে।

সে তো মাঠে-ঘাটের রাজনীতি। এখন উনি শ্রেণী বদল করছেন। একটু হেসে বদ্রু শেখ বললেন, আমিও অবশ্য সোহ্রাওয়ার্দি সাহেবের পক্ষেই আছি এখন। কেন জানো? করাচীর তখতে বসে উনি ব্যবসায়ী শ্রেণীকে মদত্ দিচ্ছেন, আমরাও তো তার ছিটেফোঁটা কিছু পাবো!

এই সময় আলতাফ সঙ্গে অন্য একটি ছেলেকে নিয়ে হাজির হলো সেখানে। সে বললো, মামুন ভাই, আপনি কখন গায়েব হয়ে গেলেন? আমি খুঁজে খুঁজে মরছি আপনাকে। ভারত থেকে অনেক কবি সাহিত্যিক এসেছেন কালচারাল ডেলিগেশানে। তাদের সঙ্গে আলাপ করবেন না?

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, কে কে এসেছেন?

আলতাফ বললো, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল আরও জানি কে কে। সবার নাম জানি না। আপনি নিশ্চয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনেন, আমার সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন?

তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি কখনো। তবে আমাদের কম বন্ধু আছে। তোমাদের প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ আসেন নি? তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল একবার।

জীবনানন্দ দাশ মারা গেছেন আপনি জানেন না? এক বছর হয়ে গেল!

সে কি! শুনিনি তো! বেশি বয়েস তো হয় নাই তাঁর।

কলকাতায় ট্রামে চাপা পড়েছেন। আপনার কলকাতার শহরটা কী, একজন কবিকে ট্রাম চাপা দিয়ে মেরে ফেললো?

–আমার কলকাতা শহর, হুঃ!

বদ্রু শেখ বললেন, পাটিশানের সময় কলকাতা শহরটা আমরা পাবো না শুনে তুমি খুব মুষড়ে পড়েছিলে! কলকাতার জন্য আমারও মন-কেমন করে এক এক সময়!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মামুন আলতাফের পাশের ছেলেটির দিকে তাকালেন। ছেলেটিকে লাজুক বলে মনে হয়, কিন্তু মুখে একটা প্রতিভার দীপ্তি আছে। এক নজর দেখলেই বোঝা যায়, এ ছেলেটি সাধারণের চেয়ে অন্যরকম।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলেটি কে?

আলতাফ বললো, এই আমার ছোট ভাই, যার কথা কাল আপনাকে বলেছিলাম, এর নাম বাবুল। সারা দিন রাত দৈত্যের মতন অঙ্ক কষে!

মামুন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা সবাই চলো, আমি যে বাসায় উঠেছি, সেখানে চলো!

পরদিন সকালে মামুন হাঁটা পথেই যাত্রা করলেন কাগমারির দিকে। টাঙ্গাইল শহর থেকে দু মাইল দূরে কাগমারি। সেখানে সন্তোষের রাজাদের বিশাল পরিত্যক্ত প্রাসাদে মওলানা ভাসানী সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। অনেক দূর থেকেই স্থাপন করা হয়েছে একটির পর একটি তোরণ। সেগুলি চমৎকার ভাবে সাজানো।

ফেব্রুয়ারি মাসের সকাল। ঝকঝকে রোদ উঠলেও ফিনফিন করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, পথে অফুরন্ত মানুষ। শুধু পাটি সদস্যরাই নয়, গ্রাম গ্রামান্তর থেকে দলে দলে মানুষ যাচ্ছে, যেন একটা মেলা দেখতে।

হেনা আর মঞ্জুকে দু'পাশে নিয়েছেন মামুন। আলতাফ কাল রাতেই এখানে চলে এসেছে। তার ভাই বাবুলকে তিনি চোখ দিয়ে খুঁজতে লাগলেন ভিড়ের মধ্যে। কাল অল্প কিছুক্ষণের পরিচয়েই ছেলেটিকে দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে তাঁর!

মঞ্জুর মুখের ম্লান ভাবটা আজ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। সে উৎসাহের সঙ্গে এক একটি তোরণ দেখে দেখে নাম পড়ছে। বিশ্বের কত বিখ্যাত মানুষের নামে যে তোরণ আর ফেস্টুন সাজানো হয়েছে তার যেন ইয়ত্তা নেই। কায়েদে-এ-আজম, ইকবাল, গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ফজলুল হক, রবীন্দ্রনাথ, লেনিন, লিঙ্কন, শেক্সপীয়ার, নেতাজী সুভাষ, সূর্য সেন...।কাগমারি সম্মেলনে যেন আওয়ামি লীগ শুধু অসাম্প্রদায়িক নয়, বিশ্বমানবিক ভাব প্রচার করতে চাইছে।

একটু আগে আগে মানিক মিঞা-যাচ্ছেন সদলবলে। মামুন এগিয়ে গেলেন তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। মানিক মিঞার সঙ্গে সম্প্রতি কোনো কোনো ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর মনান্তর হয়েছে। তিনি ভুরু তুলে অনেকখানি বিস্ময়ের সঙ্গে খানিকটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ মিশিয়ে বললেন, কী এলাহী কাণ্ড কারখানা দেখেছেন? কী আলিশান আয়োজন!

মহারাজার বাড়ির কাছাকাছি এক জায়গায় একটা ভাঙা সাইনবোর্ড পড়ে আছে, তাতে লেখা 'বিধানচন্দ্র গেট'। মামুন জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী ব্যাপার?

মানিক মিঞা বললেন, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের নামেও একটা গেট করা হয়েছিল, পরে পার্টি ওয়াকারদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে।

সম্মেলনের রাজনৈতিক অধিবেশন শুরু হবার পরই মামুন বুঝতে পারলেন, বেসুরো বাজছে। বড় বড় নেতাদের বক্তৃতায় কোনো মিল নেই। ভাসানীপন্থীরা চরম কঠোর ভাষায় আক্রমণ করছেন পাকিস্তানী সরকারি নীতির। আবার সোহরাওয়ার্দির পক্ষ সমর্থন করছেন সরকারি নীতির।

বিরোধ তুঙ্গে পৌঁছালো স্বয়ং মওলানা ভাসানীর বক্তৃতায়। তিনি মেঠো ভাষায় দারুণ কঠিন কঠিন কথা শোনাতে পারেন। অনেক অঙ্গভঙ্গিও করেন।

মার্কিন সমরজোট সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি সোহরাওয়ার্দির দিকে আঙুল দেখিয়ে শোনালেন, ওরা আমাদের ছেলেদের বোমার আঘাতে গুঁড়িয়ে দেবে, তা আমি হতে দেবো না। আমি জান দিয়ে যুদ্ধজোটের বিরোধিতা করবো। কেউ যদি আমাকে দিয়ে জোর করে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি মানিয়ে নিতে চান, তাহলে আমি কবরে এক পা দিয়ে চিৎকার করে বলবো, না, না, না, আমি ঐ সর্বনাশা যুদ্ধজোটকে সমর্থন করি না!

অনেকে চিৎকার করে সমর্থন জানালেও, মামুনের পাশে বসা একজন আপন মনে বলে উঠলো, কমুনিস্ট! ভারতের দালাল!

বক্তৃতায় শেষের অংশ আরও সাংঘাতিক। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন তুলে তিনি সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিদেশী শোষকদের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বললেন, যদি পূর্ব বংলায় তোমরা তোমাদের শোষণ চালিয়ে যাও, যদি পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তা হলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, তোমরা আমাদের কাছ থেকে একটা কথাই শুনে রাখো, 'আচ্ছালাম আলায়কুম'-তুমি তোমার পথে যাও, আমরা আমাদের পথে যাবো!

আলতাফ লাফিয়ে উঠে পাগলের মতন চিৎকার করতে লাগলো, মার হাব্বা! মার হাব্বা! এই তো চাই! এই তো চাই!

ঘুরে সে মামুনের হাত চেপে ধরে পাগলের মতন জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বললো, শুনলেন, মামুন ভাই, শুনলেন? ফাইন্যাল কথা!

মামুন কিন্তু শিউড়ে উঠেছেন এই সব কথা শুনে। মওলানার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এ তো বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির! এতো কষ্টের, এতো সাধের, এতো রক্ত-অশ্রু বর্ষণ করে পাওয়া গেছে যে পাকিস্তান মওলানা তা ভেঙে দিতে চান? মাত্র দশ বছর বয়েস হয়েছে

এই নতুন রাষ্ট্রে, অনেক ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু তাকে ভেঙে ফেলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

না, মামুন কিছুতেই মওলানার এই চরম পন্থা মেনে নিতে পারবেন না! তিনি আলতাফের। কাছ থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

৩৭ অল ওয়েভ রেডিও

তিনতলায় বাড়িওয়ালাদের একটি অল ওয়েভ রেডিও আছে। এক বাড়িতে রেডিও থাকলে তা সারা পাড়ার লোক শোনে। গাড়ি, বাড়ি, রেডিও, টেলিফোন, এই চারটে জিনিস যাদের আছে তাদের কলকাতার মানুষ বড়লোক হিসেবে গণ্য করে। দোতলার ভাড়াটেদের এর কোনোটাই নেই, তারা নিম্ন মধ্যবিত্ত, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে নিম্ন মধ্যবিত্তের মানসিকতা এখনও তারা আয়ত্ত করে নিতে পারেনি। পূর্ব স্মৃতি এখনও জ্বল জ্বল করে, তাতে দুঃখ বাড়ে।

মালখানগরে প্রতাপদের যে বাড়ি ও জমি-জমা ছিল, দেশ বিভাগ না হলে, স্বাভাবিক অবস্থায় সেই সব বিক্রি করে তাঁরা কলকাতায় বাগানবাড়ি কিনতে পারতেন। প্রতাপের বাবা এক সময় একটি স্টিমার কিনেছিলেন। সুপ্রীতিরও স্বামীর গাড়ি ছিল এক সময়ে, বরানগরের বিশাল বাড়ি ছেড়ে তাঁরা চলে এসেছেন বেশীদিন আগে নয়। এখন সবাই মিলে ভাড়া করা একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে গাদাগাদি করে রয়েছেন বটে, কিন্তু চোখ মুখ থেকে আভিজাত্যের ছাপ মিলিয়ে যায়নি। এই জন্য পাড়ার লোকরা তাঁদের অহংকারী মনে করে, আড়ালে টিটকিরি দেয়।

প্রতাপদের রেডিও নেই। এখন সব দিকে খরচ সঙ্কোচের প্রয়াস চলছে, এর মধ্যে কোনোরকম বিলাসিতার প্রশ্ন ওঠে না। মমতা একবার রেডিও কেনার মৃদু দাবি তুলেছিলেন কিন্তু ছেলে মেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষতি হবে এই অজুহাতে প্রতাপ সে দাবি নাকচ করে দিয়েছেন।

যে বাড়িতে রেডিও আছে সে বাড়িতে প্রতি শুক্রবার নাটক শোনার জন্য পাড়ার মেয়েরা ভিড় করে আসে। বাড়িওয়ালার বউ অতসী দু'একবার মমতা আর সুপ্রীতিকে ডেকেছেন, কিন্তু তুচ্ছ ছুতোনাতা দেখিয়ে ওঁরা যাননি। অন্যের বাড়িতে রেডিও শুনতে যাওয়া ওঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, এই-ই ওঁদের অহংকার। অন্য বাড়ির গৃহিণীরা ওঁদের নাম করে মুখ বেঁকিয়ে হাসেন।

পিকলু-বাবলু-তুতুলরাও ওপরে রেডিও শুনতে যায় না, কিন্তু নিচ থেকেই শুনে শুনে ওদের। সব প্রোগ্রাম মুখস্থ। ঘড়ি দেখার দরকার হয় না, সকালবেলার অনুষ্ঠান শেষের বাজনা বাজলেই ওরা স্কুল-কলেজে যাবার প্রস্তুতি শুরু করে দেয়, একজন অন্যদের আগে স্নানের ঘরের দিকে দৌড় মারে।

অন্যের রেডিও শোনার কষ্ট অনেক। রুচি পার্থক্য যখন-তখন বুকে ধাক্কা দেয়।

অতসী ফুল ভলমে রেডিও চালান, দোতলা থেকে শুনতে কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর অতসীর বড় রাগ। তাঁর মতে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে শুধু প্যানপাননি কিংবা ঘুমিয়ে পড়া গান। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু হলেই তিনি দুম্ করে বন্ধ করে দ্যান। দোতলা থেকে তুতুলের মনে হয় যেন রেডিওটা কঁকিয়ে উঠে, দুঃখের আর্তনাদ করে থেমে গেল!

ইদানীং তুতুল রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে তার মনোজগৎ আবিষ্কার করতে শুরু করেছে। এক একটা নতুন নতুন গান শোনে আর তার মনে হয়, এ তো অবিকল তার মনের কথা। একদিন সুচিত্রা মিত্র গাইছেন, "কী সুর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে। কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কী ধুন মাগি–তাকাই কেন পথের পানে.." এ গান তুতুল আগে কোনোদিন শোনেনি। সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে সে প্রত্যেকটা লাইন যেন এক অলৌকিক উপহারের মতন শরীর ভরে নিচ্ছে। এত ভালো লাগা, যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠছে হৃদয়।

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল রেডিও। আর কোনোদিন মনে হয়নি, কিন্তু আজ তুতুলের ইচ্ছে করলো দৌড়ে ওপরে গিয়ে অতসীকে মিনতি করে বলে, কাকীমা, রেডিওটা আবার খুলুন, এই গানটা শেষ অবধি শুনতে দিন! কাকীমা, আপনার পায়ে পড়ি–

কিন্তু তুতুল মনে মনেই শুধু বললো এ কথা। ওপরে গেল না। ইদানীং সে ওপরে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। অতসীর ভাই রূপেন হোস্টেল ছেড়ে এখন এ বাড়িতে থাকে। তুতুলকে দেখলেই কিছু না কিছু অসভ্যতা করার চেষ্টা করে সে। রূপেনের কথাবার্তা বেশ মজার হলেও স্বভাব ভালো নয়।

গানটির বাকি অংশ শোনা হলো না বলে যন্ত্রণায় তুতুলের মনটা কুঁকড়ে যেতে লাগলো। সুচিত্রা মিত্র এখনও গানটি গেয়ে যাচ্ছেন, শুধু ওপরের রেডিও যন্ত্রটা বন্ধ বলে তুতুল সেই গান শোনা থেকে বঞ্চিত হলো।

পিকলু কোথায় যেন গিয়েছিল, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তুতুলকে দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিস কেন, কী হয়েছে?

গানের জন্য এতখানি কষ্ট তুতুল আগে কোনোদিন পায়নি। সে যে কাঁদছে, তা সে নিজেই জানে না। সে পিকলুর কথায় উত্তর দিতে পারলো না।

পিকলু কাছে এসে তুতুলের কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, এই, কী হয়েছে রে তোর?

তুতুল ঘুরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা রাখলো পিকলুর বুকে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই আবার সে দৌড়ে ফ্ল্যাটের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো বাথরুমে।

পিকলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তুতুলের জন্য তার কষ্ট হয়। কিন্তু ও মেয়ে হয়ে জন্মেছে, কীই বা করা যাবে! ভেতরে এসে পিকলু কারুকে জিজ্ঞেস করলো না তুতুল কেন কাঁদছিল। অবশ্য বেশিক্ষণ তুতুলের কথা তার মাথাতেও রইলো না, তার অন্য অনেক চিন্তা আছে।

শিবেন আর তার দলবলের উপদ্রবে তুতুলের ইস্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা তুতুলকে রাস্তায় রোজ বিরক্ত করা শুরু করেছিল। এমন কি একদিন তুতুলকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বরানগরে। অবশ্য ওরা তুতুলের ওপর কোনো শারীরিক অত্যাচার করেনি, কারণ শিবেনের বন্ধু সুদর্শন তুতুলকে বিয়ে করতে চায়, নিছক ফুর্তি করতে চায়নি। এমন কি ওদের দলের একজন তুতুলের হাত চেপে ধরেছিল বলে সুদর্শন নাকি এক থাপ্পড় কষিয়ে ছিল সেই বন্ধুকে। সেই ঘটনাটি প্রতাপের কানে গিয়েছিল তো বটেই, এমন কি থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করলেও টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছে তুতুল। পরীক্ষার সময় পিকলু রোজ তার সঙ্গে গেছে এবং সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এখন সে বাড়িতে বন্দিনী।

বাড়ি বদলাবার জন্য খোঁজাখুঁজি চলছে চতুর্দিকে।

বিয়ের পর প্রতাপ যখন প্রথম বাসা ভাড়া নিয়ে সংসার পাতেন, তখন কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় বহু বাড়িতে 'টু লেট' সাইনবোর্ড ঝুলতো। বাড়িওয়ালারা হবু-ভাড়াটেদের খাতির করতো, দু'পাঁচ টাকা ভাড়া কমিয়ে দিত এক কথায়। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। শহরের কোনো বাড়িই খালি থাকে না। বাড়িওয়ালারা ভাড়াটেদের ইন্টারভিউ নেয়, ভাড়া কমাবার প্রস্তাব শুনলে ঠোঁট উল্টে বলে, আপনি বস্তিতে চেষ্টা করুন, ও ভাড়ায় পাকা বাড়িতে থাকা যায় না। ভাড়াটে যদি পূর্ববঙ্গের লোক হয়, তা হলে বাড়িওয়ালারা ব্যঙ্গ করে বলে, আপনারা ওখানে জমিদার ছিলেন নিশ্চয়ই? বাঙালরা সবাই নাকি জমিদার? হে-হে-হে-হে! তা জমিদার হয়ে কি আমাদের এই কুঁড়ে ঘরে আপনাদের মন টিকবে?

প্রতাপদের অবশ্য বর্তমান বাড়িওয়ালার দিক থেকে কোনো সমস্যাই নেই। অতসী আর। তাঁর স্বামী দু'জনেই খুব ভালো মানুষ। গত বছর প্রতাপ নিজে থেকেই দশ টাকা ভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব দিলে অতসীর স্বামী জিভ কেটে বলেছিলেন, ছি ছি ছি, আমি কি কোনোদিন আপনাদের ভাড়া নিয়ে কোনো কথা বলিচি! আপনারা বিশিষ্ট সজ্জন, আমাদের বাড়িতে আচেন, এই তো আমাদের কত ভাগ্যি!

এ বাড়ি ছাড়তে গেলে মমতাদের বেশ কষ্টই হবে। বাজার-হাট কাছেই, অনেকগুলো ট্রামবাসের রুট। মমতা আর সুপ্রীতির গঙ্গাস্নানের অভ্যেস হয়ে গেছে, প্রায়ই যান। বাগবাজারের ঘাটে, অন্য পাড়ায় চলে গেলে এই সুবিধেগুলো পাওয়া যাবে না।

তবু বাড়ি বদলাতে হবে এই পাড়াটার জন্যই। বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ছিনতাই, গুণ্ডামি, বদমায়েসি। একটু রাত হলেই শোনা যায় হুল্লোড়-চিৎকার। পচে যাওয়া বনেদী বাড়িগুলোর অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেরা ছোট ছোট মাস্তানি দল গড়ে পরস্পরের সঙ্গে স্পর্ধা করে।

তুতুলের ষোল বছর বয়েসেই মনে হয় পূর্ণ যৌবন এসেছে, এমন তার শরীর। কিন্তু তার মনে এখনো পুরোপুরি কৈশোরের সারল্য। সে এখনো পৃথিবীর অনেক কিছুই জানে না কিন্তু দু'একটা ব্যাপার বাধ্য হয়েই বুঝেছে। হরিণীর প্রধান শত্রু যে তার নিজেরই শরীরের মাংস তা যেমন হরিণীরা ঠিকই বুঝে যায়। তুতুল বাড়ি থেকে বাইরে বেরোয় না, এমন কি ছাদেও যায়। এখন তার একমাত্র বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।

গল্প উপন্যাসের চেয়ে সে কবিতা পড়তেই বেশি ভালোবাসে। গল্প-উপন্যাসের বই বেশি। পাওয়া যায় না, গল্প-উপন্যাস বার বার পড়াও যায় না। কিন্তু কবিতা তাকে পাগল করে দেয়। এই বন্দী-জীবনে রবীন্দ্রনাথ যেন তাকে দুখানি ডানা জুড়ে দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ যেন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান এক অজ্ঞাতপূর্ব আনন্দময় জগতের দিকে।

কিছুদিন আগেও তুতুল পিকলুর পাশাপাশি বসে এক সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তো। পিকলুই তার টিউশানির টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছে সঞ্চয়িতা। পিকলু চমৎকার আবৃত্তি করে, তার স্মৃতিশক্তিও দারুণ। একদিন সে তুতুলকে বলেছিল, তুই আমাকে যে-কোনো কথা বল, কিংবা প্রশ্ন কর, আমি উত্তর দেবো রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সারা জীবনের জন্য ভাষা দিয়ে দিয়েছেন। তুতুল পরীক্ষা করে দেখেছিল, পিকলু সত্যি বলতে পারে। এমন কি একদিন মমতা বলেছিলেন, 'ওরে,

“তোরা সব খেতে আয়! তৎক্ষণাৎ উত্তরে পিকলু বলেছিল, “কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি, আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি!” তুতুলের সন্দেহ হয়েছিল, এই লাইন দুটো রবীন্দ্রনাথের নয়, পিকলু সেই মুহূর্তে নিজে নিজে বানালো। কিন্তু পিকলু বই খুলে দেখিয়ে দিল, সত্যি, ঐ লাইন দুটো আছে ‘কালমৃগয়া’ গীতিনাট্যে।

কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর পিকলু বদলাতে শুরু করে। আগে তার বিশেষ বন্ধু ছিল না। বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকতো। এখন কলেজের ছুটির পরেও সে বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে অনেকক্ষণ সময় কাটায়।

একদিন পিকলুর মুখে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য শুনে তুতুল শিউরে উঠেছিল। এর থেকে পিকলু তার গালে ঠাস করে একটা চড় কষালেও সে বেশি আহত বোধ। করতো না। সেদিন তুতুল সদ্য একটা নতুন গান শুনে আনন্দে উচ্ছল হয়ে বলতে এসেছিল, পিকলুদা, এই গানটা জানো, “খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে..”? পিকলু মন দিয়ে কী সব লিখছিল খাতায়, হঠাৎ মুখ তুলে প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলেছিল, দূর দূর, ঐ সব লাইন শুনলে আমার গা জ্বলে যায়! বাহির আর ভিতর, আলো আর কালো, রূপ আর অরূপ, ভাঙা আর গড়া, কূল আর অকূল, ঐ দাড়িওয়ালা বুড়োর কবিতায় এর একটা থাকলে বাকিটা থাকবেই। খালি কনট্রাস্ট! খালি কনট্রাস্ট! এতে কখনো কবিতা হয়? দুই আর দুয়ে চারের মতন!

শুনে তুতুলের গায়ে যেন আগুনের ছ্যাকা লেগেছিল। পিকলুর মুখে এমন পাষণ্ডের মতন কথা, যে-পিকলু কিছুদিন আগেও সারা সকাল অনর্গল রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্ত বলে যেত!

এরপর থেকে প্রায়ই তুতুলের সঙ্গে পিকলুর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তর্ক লাগে। পিকলুই গলার জোরে জিতে যায়।

পিকলুর গুরু এখন জীবনানন্দ দাশ। তুতুল ওঁর কবিতা বুঝতে পারে না। কয়েকবার সে পিকলুকে অনুরোধ করেছে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ে বুঝিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু

পিকলুর সময় নেই। পিকলু তার হাত খরচের পয়সা জমিয়ে 'কবিতা', 'কৃত্তিবাস', 'শতভিষা' এই সব নামের ছোট ছোট পত্রিকা কিনে আনে। সেগুলিতে শুধুই আধুনিক কবিতা ছাপা হয়। তুতুল ঐ পত্রিকাগুলো পড়বার চেষ্টা করেও কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি, সে একা একা আবার ফিরে গেছে রবীন্দ্রনাথের কাছে।

আজকাল পিকলুর দু'একজন বন্ধু বাড়িতেও আসে। প্রতাপ যখন থাকেন না। ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে সিগারেট খায়, তুমুল তর্ক করে। সে তর্ক সাহিত্য বিষয়ে নয়, অধিকাংশ দিনই রাজনীতি বিষয়ে। পাশের ঘরে বসে তুতুল সব শুনতে পায়। সে বুঝতে পারে যে পিকলু তাদের কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে।

প্রথম প্রথম পিকলু তার বন্ধুদের সঙ্গে তুতুলের আলাপ করিয়ে দিয়ে তাকেও বসতে বলতো। তিনজন বন্ধুই বেশি আসে। সুকেশ চক্রবর্তী, আলমগীর রহমান আর বিকাশ দাশগুপ্ত। এদের মধ্যে সুকেশ আর আলমগীর যখন তখন জওহরলাল নেহরুর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে, তাদের মতে ভারতের সব দুরবস্থার জন্য নেহরু পরিবারই দায়ী, সেই সঙ্গে গান্ধী। ওরা দু'জন চীনের কোন্ এক নেতার খুব ভক্ত, চীনের পথ অনুসরণ করলে ভারতে নাকি আর এমন গরিব থাকতো না। বরুণ একটু চুপচাপ স্বভাবের, সে কবিতা লেখে।

প্রথম দু'একদিন তুতুল ঐ ঘরে বসেছিল ওদের সঙ্গে, এখন তাকে ডাকলেও সে যায় না। পিকলু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, এই, তুই কি পদানশীন নাকি? আমার বন্ধুরা এলে তুই আসিস না কেন?

তুতুল বলেছিল, আমার ওদের ভালো লাগে না!

পিকলু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুদের নিয়ে সে এখন মত্ত। তার ধারণা তার বন্ধুদের মতন উজ্জ্বল যুবক কলকাতা শহরে আর নেই। তাদেরও পছন্দ হয় না তুতুলের? এ মেয়েটা কী, বোকা না জড়ভরত? পিকলু ঠোঁট উল্টে বলেছিল, তোর কিস্যু হবে না! ঐ শিবেনদার বন্ধুর সঙ্গেই তোর বিয়ে দিতে বলবো পিসিমণিকে। মাছের ভেড়ির মালিকের ঘর করবি, সারা গা দিয়ে মাছ মাছ গন্ধ বেরুবে!

তুতুল কিছু কৃত্রিম কথা বলেনি। পিকলুর বন্ধুরা দেখতে শুনতে কেউ খারাপ নয়। পড়াশুনাতেও ভালো নিশ্চয়ই, নইলে পিকলুর বন্ধু হবে কেন, তা ছাড়া তাদের কথাবার্তা শুনেও বোঝা যায়। তবু, তুতুলের মনে হয়, ওদের থেকে পিকলু অনেকখানি আলাদা। পিকলু অনেক উঁচুতে উঠে বসে আছে। তার মুখে যেন ফুটে থাকে একটা জ্যোতি, তার প্রতিটি কথার সঙ্গে লেগে থাকে প্রবল আত্মবিশ্বাস, কোনো বিষয়েই পুরোপুরি না জেনে সে কিছু বলে না, এমনই তার চরিত্রের সারল্য যে সে কখনো খোঁচা মারে না কারুকে। তর্ক বিভিন্ন দিকে বাঁক নিলে এক এক সময় সে বলে ওঠে, ভাই, এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না, কিছু মন্তব্যও করতে পারবো না। তখন মনে হয়, তার মতন সত্যবাদী ও জ্ঞানী আর কেউ নেই।

অন্যদের মাঝখানে পিকলুকে দেখলেই তুতুল তার দাদার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারে। সে তখন মুগ্ধভাবে চেয়ে থাকে পিকলুর দিকে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পিকলুর মতামতে আহত হলেও তুতুল জানে, পিকলুর সঙ্গে আর কারুর তুলনা চলে না। দিন দিন এই ধারণাটা তার মধ্যে বদ্ধমূল হচ্ছে।

ইস্কুলে যেতে হয় না, বাড়ির বাইরে যাওয়া হয় না বলে তুতুল তার সাজ পোশাকেরও কোনো যত্ন নেয় না। ফ্রক পরা সে ছেড়ে দিয়েছে, বাড়িতে কোনোরকমে একটা শাড়ী গায়ে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু পিকলুর বন্ধুরা এলে সে শাড়ী ঠিকঠাক করে নেয়, চুল আঁচড়ায়। পিকলুদের ঘরে সে যাবে না, তবুও। পাশের ঘরে তিন-চারটি যুবক রয়েছে এই সচেতনতাই যেন তার যুবতী সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। দুপুরবেলা মমতা ও সুপ্রীতি দু'জনেই একটু ঘুমিয়ে নেন। বন্ধুদের বসিয়ে রেখে পিকলু এক একদিন এ ঘরে এসে ফিসফিস করে বলে, এই তুতুল, আমাদের একটু চা করে দিতে পারবি?

তুতুল প্রথমে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়।

পিকলু তখন তার পিঠে হাত রেখে অনুনয় করে বলে, প্লীজ, দে একটু। বাইরের দোকান থেকে চা আনালে খারাপ দেখাবে!

ঐ যে পিঠের ওপর হাত রাখা, ঐ টুকুর জন্যই সারা শরীর দিয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে তুতুল। তার অস্তিত্বে একটা আনন্দের কোলাহল পড়ে যায়। পিকলু তার দাদা, তা হোক, তবু পিকলুর স্পর্শে সে এমন কিছু পায় যা সে এ পর্যন্ত আর অন্য কিছুতে পায়নি। ওপরতলায় অতসী কাকীমার ভাই রূপেন যখন কোনো কোনো দিন জোর করে তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেছে, তখন তুতুলের শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। শিবেনদার বন্ধু সুদর্শন যখন তাকে ছুঁতে চেয়েছে। তখনও তুতুল যেন অশুচি স্পর্শ পেয়েছে। পিকলুর বন্ধু সুকেশও কেমন যেন অদ্ভুত চোখে দু'একবার তাকিয়েছে তুতুলের মুখের দিকে, তাতে তুতুলের একটুও ভালো লাগেনি। কিন্তু পিকলু যখন কোনো অনুরোধ জানাবার জন্য তার পিঠে হাত দেয়, তখন আবেশে তুতুলের চোখ বুজে আসে।

তুতুল চা বানিয়ে দেয় বটে কিন্তু মুন্নিকে ডেকে চায়ের ট্রে তার হাতে পাঠায়। মাত্র আট বছর বয়েস হলেও মুন্নি এসব কাজ বেশ ভালো পারে। দাদার বন্ধুরা আদর করে মুন্নির গাল। টিপে দেয়।

পিকলু তাকে পদানশীন বলে ঠাট্টা করলেও তুতুল ও ঘরে যেতে পারে না। পিকলু যদি বন্ধুদের সামনে কোনো কারণে তার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে তাও সে সইতে পারবে না।

পিকলুর সব ভালো, শুধু কেন সে রবীন্দ্রনাথের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? তুতুলের খুব ইচ্ছে করে ওকে আবার ফিরিয়ে আনতে। তুতুলের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি, সুপ্রীতি যখন তখন বলেন, তুই পিকলুর কাছ থেকে পড়া বুঝে নে না। কিন্তু তুতুল তাতে গা করে না। তার পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কারুর কাছ থেকে সাহায্য নেবার দরকার নেই। কিন্তু পিকলু যদি আগেকার মতন তার পাশে বসে এক বই থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তো, তাতেই তার মন এমন ভালো হয়ে যেত যে পরীক্ষার পড়ার উৎসাহ আসতো অনেক বেশি। কিন্তু পিকলু আজকাল রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেই বলে, ডেটেড! ডেটেড! বৈষ্ণব পদাবলী, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ওসব বুড়োবুড়িদের জন্য! আমাদের দেশের মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়, তুই-ও ষোলো প্লাসেই...!

একদিন পিকলু স্নান করছে বাথরুমে, তুতুল টিনের দরজায় দুম দুম করে ঘা মারতে লাগলো।

সুপ্রীতি তা দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, ও কী করছিস? তোর এত তাড়া কিসের? দাঁড়া, ছেলেটাকে স্নান শেষ করতে দে!

তুতুল অভিমানের ঝাঁঝ মেশানো গলায় বললো, ও কেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে?

সুপ্রীতি ভেতরের ব্যাপারটা জানেন না। পিকলুর গানের গলা ভালো। বাথরুমে সে প্রায়ই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গায়। ইদানীং সে আই পি টি এর গানই বেশি করে। আজ সে গাইছে, "হে নিরুপমা, গানে যদি লাগে বিস্বর তান, করিয়ো ক্ষমা...। "

সুপ্রীতি ভাবলেন যেন গাওয়ার সঙ্গে দেরি করার সম্পর্ক আছে। তিনি তবু পিকলুর পক্ষ নিয়ে মেয়েকে বললেন, ছেলেটা তো এইমাত্র ঢুকলো, তুই যা, একটু পড়াশুনো করে আয়।

তুতুল স্নান করতে আসেনি, পড়ার টেবিল থেকেই উঠে এসেছে, হাতে তার বই। সে। খানিকটা পাগলাটে গলায় বললো, না, ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারবে না! কেন গাইবে!

আবার সে ধাক্কা মারতে লাগলো দরজায়।

খালি গায়ে, শুধু একটা তোয়ালে-পরা অবস্থায় পিকলু দরজা খুলে ভুরু তুলে বললো, কী হয়েছে? তার মুখভর্তি সাবানের ফেনা, সবে দাড়ি কামাতে শুরু করেছিল।

তুতুল বললো, তুমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছো, তোমার লজ্জা করে না! পিকলু হাসতে হাসতে সুপ্রীতিকে বললো, ও পিসিমণি, দ্যাখো, রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন তোমার মেয়ের একার সম্পত্তি! আমরা গাইলেও দোষ!

তুতুল বিস্ফারিতভাবে কয়েক পলক চেয়ে রইলো পিকলুর দিকে, তারপর দৌড়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

ছোট ফ্ল্যাট, পিকলুবাবলুরা অধিকাংশ সময়েই খালি গায়ে থাকে, তুতুল কতবার ওদের সেই অবস্থায় দেখেছে। কিন্তু আজ, বাথরুমের বন্ধ দরজা খুলে পিকলু যে শুধু তোয়ালে পরে বেরিয়ে এলো, তা দেখে অদ্ভুত এক শিহরন হলো তুতুলের শরীরে। বন্ধ বাথরুম মানেই গোপনীয়তা, হঠাৎ সেই দরজা খুলে যেন দেখা গেল একজন অচেনা পুরুষ মানুষকে। এ যেন তার ভাই নয়। অন্য কেউ! তুতুলের সারা শরীর এখনো কাঁপছে! কী যে হচ্ছে তার তা অন্য কারুকে বলে বোঝানো যাবে না।

স্নান সেরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পিকলু তুতুলের পড়ার টেবিলের কাছে এসে বললো, এই, তুই যাবি তো যা! আমার হয়ে গেছে!

রাজ্যের লজ্জা এসে এখন জুড়ে বসেছে তুতুলের ওপর, সে পিলুর দিকে তাকাতে পারছে না, সে মুখ নিচু করে রইলো।

-কী রে যাবি না! অত তাড়া দিচ্ছিলি কেন?

-তাড়া তো দিইনি! তুমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিলে, তাই অবাক হয়েছিলুম!

-কেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া কী অপরাধ?

-কেন, তুমিই তো বলো, রবীন্দ্রনাথের লেখা শুধু বুড়ো বুড়ি আর আমাদের মতন বোকাদের জন্য। নিরুপমা নামে কোনো মেয়ের সঙ্গে বুঝি চেনা হয়েছে?

পিকলু অট্টহাস্য করে উঠলো।

দু'দিন বাদে পিকলু কলেজ থেকে ফিরে এসে তুতুলকে বললো, এই, মহাজাতি সদনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা কনফারেন্স আছে, তুই শুনতে যাবি? আমি দুটো কার্ড পেয়েছি।

তুই দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকিস, এটা মোটেও ভালো নয়। এতে পড়াশুনো মাথায় ঢোকে না।

তুতুলের পরীক্ষার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। এই সময়ে কি গান শুনে একটা সন্ধে নষ্ট করা চলে? এ জন্য সুপ্রীতি-মমতা তো বটেই, প্রতাপের কাছ থেকেও অনুমতি নেবার প্রয়োজন আছে।

কেউ-ই আপত্তি করলেন না। পিকলু এ বাড়ির হীরের টুকরো ছেলে। যেমন তার পড়াশুনোয় মেধা, তেমনই তার সবদিকে সুবিবেচনা। সবাই জানে, আর কয়েক বছরের মধ্যে পিকলু এম এ পাশ করার পরই এ সংসারের ভাগ্য ফিরে যাবে। খুব বড় কোনো চাকরি তার জন্য বাঁধা। পরীক্ষার আগে গানের জলসা শুনতে যাওয়া উচিত কিনা তা পিকলুই তো ভালো বুঝবে।

সেদিন সন্ধেবেলা ওরা যখন বেরুতে যাবে তখন একটা কাণ্ড ঘটলো। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে ফেললো বাবলু। প্রতাপ তখনও ফেরেননি। পিকলুকেই যেতে হলো ছোট ভাইকে নিয়ে ডাক্তারখানায়, তিনটে স্টিচ হলো বাবলুর মাথায়। এক ঘণ্টা কেটে গেল এই সব করতেই। এরপর আর জলসায় যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

মমতা তবু বললেন, মেয়েটা সেজে-গুঁজে মন খারাপ করে বসে আছে, তুই ওকে নিয়ে যা পিকলু! এখনো গেলে অদ্ধেকটা শুনতে পারবি!

এত দেরির জন্য হেমন্ত আর কণিকার গান শোনা হলো না। সুচিত্রা মিত্র গাইছেন তখন। একটা গান শেষ করে আর একটি গান সদ্য ধরেছেন তিনি, সেই সময় ঢুকলো পিকলু আর তুতুল। সুচিত্রা মিত্রের গান শোনা মাত্র সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হলো তুতুলের। এই সেই গান, “কি সুর বাজে, আমার প্রাণে, আমিই জানি, মনই জানে...।” এই গান কয়েক লাইন শোনার পর রেডিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই গান পুরোটা না শুনলে তার জীবনটাই অসমাপ্ত থাকতো!

তুতুলের মনে হলো, পিকলু কি দৈবজ্ঞ? এই বিশেষ গানটা শোনার জন্যই কি সে তুতুলকে নিয়ে এসেছে? কিংবা, সুচিত্রা মিত্র কি ইচ্ছে করেই এই মুহূর্তে ঐ গানটি ধরলেন? তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি ষোলো বছরের মেয়ে ঐ গানটি শোনার জন্য কতটা কাতর হয়ে ছিল?

পিকলু কিন্তু তুতুলের পাশে বসলো না। এই জলসার উদ্যোক্তারা তার পরিচিত। সাধারণত উদ্যোক্তারা নিজেরা কিছু দেখে না, শোনে না, তারা বাইরে দাঁড়িয়ে চা-সিগারেট খায়, গল্প করে। পিকলু চলে গেল সেদিকে। তুতুল সতৃষ্ণ চোখে বার বার খুঁজতে লাগলো পিকলুকে। পিকলু তার পাশে থাকলে সে অনেক বেশি উপভোগ করতে পারতো।

শেষের দিকে নাচের অনুষ্ঠান আছে, তার আগে পাঁচ মিনিট বিরতি। সেই সময়ে পিকলু এসে বললো, তুতুল, এবারে বাড়ি চল। নাচ দেখে কী করবি! শেষ হতে হতে অনেক দেরি। হয়ে যাবে।

তুতুল বিনা প্রতিবাদে উঠে এলো। মহাজাতি সদন থেকে বেরিয়ে যখন তারা রাস্তা পেরিয়ে বাস স্টপের দিকে যাচ্ছে তখন তুতুল পিলুর হাত ধরে কাতরভাবে বললো, আমি..আমার এখন বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না।

গভীরভাবে অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে পিকলু বললো, বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না মানে?

কোথায় যাবি?

দু'দিকে মাথা নেড়ে তুতুল বললো, জানি না! কতদিন বাদে বেরিয়েছি। তুমি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো।

পিকলুর বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। তুতুলের এরকম গলার আওয়াজ সে যেন আগে শোনেনি। এই মুহূর্তে তার খেয়াল হলো তুতুল যেন হঠাৎ কিশোরীর বদলে যুবতী হয়ে উঠেছে। এমন গাঢ় স্বরে তুতুল আগে কথা বলতো না তার সঙ্গে।

সে একটু দিশাহারা হয়ে বললো, বাড়ি যাবো না, তা হলে কোথায় যাবো এখন?

৩৮ কানু যে ব্যাঙ্কে কাজ করে

কানু যে ব্যাঙ্কে কাজ করে, হঠাৎ একদিন সকালে সেই ব্যাঙ্কের বন্ধ দরজা আর খুললো না। সাড়ে দশটা বেজে গেছে, কর্মচারিরা, গ্রাহকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে, কিন্তু ম্যানেজারের দেখা নেই। মালিক পক্ষের এক ছেলে এই শাখাটির ম্যানেজার। বড় লোকের ছেলের ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছে একথা কারুর মনে আসে না। বরং প্রথম থেকেই যে অশুভ সন্দেহটি মনে জাগে, একটু বেলা বাড়তেই তা সমর্থিত হয়। খবর এসে পৌঁছোয় যে সেই ব্যাঙ্কের আরও দুটি শাখারও ঐ একই অবস্থা। অর্থাৎ ব্যাঙ্কটির গণেশ উল্টেছে, মালিকপক্ষ পলাতক।

অনেক লোক সামনের ফুটপাথে বসে পড়লো মাথায় হাত দিয়ে। একজন বৃদ্ধ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলতে লাগলেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল, আমার সর্বস্ব চলে গেল, পরশু আমার মেয়ের বিয়ে। ওরে বাবা, এখন আমি কী করি! আমি ট্রাম লাইনে গলা দেবো! তিনি সত্যিই ছুটে গিয়ে ট্রাম লাইনে শুয়ে পড়তেই কয়েকজন জোর করে তুলে আনলো তাঁকে, আর কয়েকজন চেষ্টা করলো ব্যাঙ্কের লোহার কোলাপসিল গেট ভেঙে ফেলার, তার মধ্যেই এসে পড়লো পুলিশ।

স্বাধীনতার পর পরই ছোটছোটো ব্যাঙ্কগুলিতে মড়ক লেগে যায় যেন। পারিবারিক মালিকানার এই সব ব্যাঙ্ক কোন্ রহস্যময় কারণে যে যখন তখন লালবাতি জ্বালে তা আর জানা যায় না শেষ পর্যন্ত। বাজারে গুজব ছড়ায় নানারকম, কেউ বলে সাধারণ মানুষের জমানো টাকায় মালিকরা ফাটকা খেলে, কেউ কেউ নাকি স্বচক্ষে দেখেছে

ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভেঙে মালিকের কোনো বখাটে ছেলেকে রেসের মাঠে কাপ্তেনি করতে, কোনো সিনেমার অভিনেত্রী নাকি বিনা অ্যাকাউন্টে যখন তখন টাকা তুলে নিয়ে যায়, ইত্যাদি। সাধারণ মধ্যবিত্তের কল্পনা এর চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত পৌঁছোয় না। অন্তরালের কাহিনী হয়তো এর চেয়ে অনেক বেশি জটিল। ব্যাঙ্কগুলির ওপর সরকারি খবরদারিও শিথিলতার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। এক একটা ব্যাঙ্কের পতন হয় আর অমনি তিন চারটি আত্মহত্যার ঘটনা বেরোয় খবরের কাগজে। তারা কেউ সদ্য অবসরপ্রাপ্ত স্কুল মাস্টার, কেউ ছোট কারখানার মালিক, কেউ বা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। কে কোথায় বসে কিসের কলকাঠি নাড়ছে তা কিছুই না জেনে এই অকস্মাৎ-রিক্ত মানুষগুলো প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে।

কানুর চাকরিটি গেল। প্রতি মাসে মাইনে পেয়ে সে পুরো টাকাটাই তুলে দিত তার দাদার হাতে, প্রতাপ তার থেকে অর্ধেক টাকা ফিরিয়ে দিতেন কানুর হাত খরচের জন্য।

শোনা যায়, বিপদ কখনো একলা আসে না, সব সময় তার একটি বা দুটি সঙ্গী থাকে। কানুর ব্যাঙ্কেই প্রতাপের অ্যাকাউন্ট ছিল, তাতে বেশি টাকা ছিল না অবশ্য, মাত্র সাড়ে চার শো টাকা। সেটা তো গেলই, কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার ঐ ব্যাঙ্কেই প্রতাপ তাঁর দিদি সুপ্রীতির গয়নাগুলো জমা রেখেছিলেন।

সংসার খরচের জন্য সুপ্রীতি মাসে মাসেই একটি দুটি গয়না দিতেন প্রতাপকে। এ সম্পর্কে তাঁর মুখের ওপর কোনো কথাই চলতো না। প্রতাপ সে গয়না একটাও বিক্রি করেননি, নানাভাবে উপার্জন বাড়িয়ে ও খরচ কমিয়ে তিনি সংসার চালাচ্ছিলেন, যথাসময়ে সুপ্রীতিকে তাঁর গয়নাগুলি ফেরত দেবার কথা ভেবে রেখেছিলেন। সেই গয়নাগুলিও যে মারা যাবে তা প্রতাপ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। ব্যাঙ্কের তহবিল তছরুপ হতে পারে, ভুল লগ্নীতে সব টাকা জলে যেতে পারে, কিন্তু গ্রাহকদের নিজস্ব লকার-এ রাখা গয়নাগাঁটি বা শেয়ারের কাগজপত্র লোপাট হবে কী করে? আদালত থেকে প্রতিনিধি বসানো হয়েছে, একদিন না একদিন লকার খুলে যার যার জিনিসপত্র ফেরত দেওয়া হবে নিশ্চিত।

নিজের কোনো ব্যাপারে প্রতাপ অন্য কারুকে ধরাধরি করা পছন্দ করেন না। কিন্তু এবারে বাধ্য হয়েই তাঁকে তাঁর বন্ধু বিমানবিহারীর শরণাপন্ন হতে হলো। বিমানবিহারীরা কলকাতায় কয়েক পুরুষের অধিবাসী,তেমন ধনী বা বনেদী না হলেও সম্ভ্রান্ত। প্রতাপরা বহিরাগত, তাঁদের তুলনায় বিমানবিহারীদের কয়েকটি অতিরিক্ত সুবিধে আছে, এদিককার ওপর মহলের অনেকের সঙ্গেই তাঁদের মুখ চেনা বা লতায় পাতায় সম্পর্ক আছে। যেমন, একদিন স্যার পি এল মিটার সম্পর্কে কী কথা উঠতেই বিমানবিহারী বলেছিলেন, হ্যাঁ, ওঁদের চিনি, ওঁর স্ত্রী তো ভুলি মাসি, আমার ছোট মাসির সঙ্গে পড়তো! সেইরকমই পশ্চিমবাংলার বর্তমান এক ক্ষমতাশালী মন্ত্রী বিমানবিহারীর কাছে জটাদা, মেম্বার বোর্ড অফ রেভিনিউ হচ্ছেন বিমানবিহারীর রাঙাকাকা, ইত্যাদি।- সব শুনে বিমানবিহারী গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর বন্ধু প্রতাপকে মিথ্যে স্তোক দিতে পারেন না। তিনি জানেন, একটা ব্যাঙ্ক উল্টে দেবার আগে তার মালিকরা, অন্যদের ঠকাবার জন্যই হোক বা নিজেদের বাঁচাবার জন্যই হোক, কোনো পন্থা নিতেই দ্বিধা করে না। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে আর কোনো নৈতিকতার মূল্য নেই। লকার খুলে সব কিছু সাফ করে দেবার ঘটনা যে আগেও ঘটেছে তা তিনি জানেন।

তবু তিনি ছোটাছুটি করলেন অনেক। আদালত থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধির সঙ্গে একটা যোগাযোগের সূত্র খুঁজে বার করে তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়ে কথা বললেন একদিন। কিছুই লাভ। হলো না। অফিসের চেয়ার টেবিল ছাড়া আর প্রায় কোনো সম্পত্তিই নেই ব্যাঙ্কের। নতুন বাংলা ব্যাঙ্কের মালিক সব দোষ স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করেছেন আদালতে। তাঁর খুব বেশি শাস্তি হলে দশ বারো বছরের জেল হবে। জালিয়াতি-জোচ্চুরির জন্য ফাঁসী হয় না কারুর। অন্যের দোষে সর্বস্বান্ত হয়ে যে তিন চারজন আত্মহত্যা করে, সেই পাপের জন্য কেউ কিছু দণ্ড পায় না কোনো ধর্মাধিকরণে।

মানবিহারী বললেন, প্রতাপ, তোমার ঐ ব্যাঙ্কের মালিক কিন্তু তোমার দেশেরই লোক!

প্রতাপ হঠাৎ জ্বলে উঠে বললেন, আমারই দেশের লোক মানে?

বিমানবিহারী বললেন, নতুন বাংলা ব্যাঙ্কের মালিক তত তোমাদের ঢাকা জেলার লোক শুনলুম।

প্রতাপ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তার মানে, তুমি কী বলতে চাও? দেশ ভাগের আগে গোটা বাংলা দেশটা তোমারও দেশ ছিল না? দশ বছর কেটে গেছে, এখনো তোমরা আমাদের ওপারের লোক বলে মনে করো!

বিমানবিহারী প্রসঙ্গটা লঘু করতে চেয়েছিলেন, প্রতাপের যে এরকম তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে তা তিনি কল্পনাও করেননি। পূর্ব বাংলা থেকে যারা এসেছে তারা যে এখনো তাদের আলাদা আইডেনটিটি বজায় রাখতে চায়, তা তো প্রত্যেকদিনই দেখা যাচ্ছে পথেঘাটে। এখন তারা ভারতের নাগরিক হলেও যে-কোনো কথা প্রসঙ্গে বলে, আমাদের বাড়ি ঢাকা জেলায় বা ফরিদপুর বা চট্টগ্রামে। এমনকি তারা অতীত ক্রিয়াপদও ব্যবহার করে না। প্রতাপও এর ব্যতিক্রম নন। এখন প্রতাপ খুব বেশি স্পর্শকাতর হয়ে আছেন। কয়েকখানা গয়না হারাবার আঘাতে যে প্রতাপ এতখানি আহত হয়ে পড়বেন তা বিমানবিহারী বুঝতে পারেননি। অবশ্য, যার যায় সেই ঠিক বোঝে।

প্রতাপ এতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছেন তার কারণ, গয়নাগুলো তাঁর দিদির, তাঁর স্ত্রীর নয়। মমতার অধিকাংশ গয়নাই রাখা আছে তাঁর বাপের বাড়ির সিন্দুকে। বারবার ভাড়া বাড়িতে বাসা বদল, তাই মমতা নিজের কাছে দামি কিছু রাখেন না। দিদির গয়নাগুলি যে প্রতাপ সত্যিই বিক্রি করেননি, এখন তা তিনি কী করে বোঝাবেন? দিদিকে সব কথা খুলে বললে কি তিনি বিশ্বাস করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু বলা কি সহজ? যে ব্যর্থতার জন্য প্রতাপ নিজে দায়ি নন, সেকথা বলার মধ্যে যে কতখানি গ্লানি, তা কি অন্য কেউ বুঝবে? অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতাপের হাত এক একবার মুষ্টিবদ্ধ হয়, আবার তাঁর নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে।

চাকরি যাওয়ার জন্য কানুকে বিশেষ বিচলিত দেখা গেল না। ইদানীং সে বাড়ির বাইরেই বেশির ভাগ সময় কাটায়। পিকলু বাবলুর সঙ্গে এক ঘরে শুতে হয় তাকে, ওদের এখন

পড়াশুনোর খুব চাপ, তাই কানু রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরে না। প্রতাপকে সে ভয় পায়, তাই পারতপক্ষে দাদার মুখোমুখি আসতে চায় না। প্রতাপও আজকাল নানা ব্যাপারে খুব ব্যস্ত।

পরের মাসের পয়লা তারিখে কানু প্রতাপের ঘরে এলো। প্রতাপ তখন বই অনুবাদে নিমগ্ন, কানু তাঁর পায়ের কাছে দুটি একশো টাকার নোট রেখে বললো, দাদা, এই টাকাটা রইলো।

প্রতাপ অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তুই টাকা কোথায় পেলি?

কানু অবনত মস্তকে সলজ্জভাবে বললো, আমি কিছু টাকা জমিয়েছিলাম।

প্রতাপ কানুকে আপাদমস্তক দেখলেন। সাজসজ্জার বেশ বাহার হয়েছে তার। আগে সে মোটা ধুতির ওপর হাফ শার্ট পরতো, এখন মলের পাঞ্জাবি, ফাইন ধুতিটা বোধহয় ফিলে কম্পানির। চুলে সিঁথি কাটেনি, উল্টে আঁচড়েছে। বাঁ হাতে একটি পলা বসানো আংটি। কটা টাকাই বা মাইনে পেত কানু, তার আদ্ধেক দিয়ে পোশাকের বাবুগিরি, যাতায়াত ভাড়া, হাতখরচ করেও টাকা জমিয়েছে? তাহলে তো বেশ গোছানো স্বভাব হয়েছে বলতে হবে।

প্রতাপ বললেন, ও টাকা দিতে হবে না, তোর কাছেই রাখ।

কানু তবু বললো, না, আমার কাছে আরও আছে।

প্রতাপ বললেন, বলছি তো, তোর কাছেই রাখ। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছিস? সামনের রবিবার তোকে একজনের কাছে যেতে হবে, মার্টিন বার্ন কম্পানিতে একটা চাকরির কথা বলেছে–

কানু টাকাটা তুলে নিয়ে বিনীত ভাবে বললো, সেজদা, আমি ব্যবসা করবো ভাবছি!

ভদ্রলোক শ্রেণীর বাঙালীরা ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা ধরেই নিয়েছে ওটা অন্য প্রদেশীয়দের ব্যাপার। এদেশে ব্যবসা শব্দটির সঙ্গে ইদানীং ঘুষ, কালোবাজার, ধরাধরি, মিথ্যেকথা, লোক ঠকানো ইত্যাদি ব্যাপারগুলো জড়িয়ে গেছে, সুতরাং ভদ্রলোকরা এসবের থেকে নাক কুঁচকে দূরে থাকতে চায়।

ভাইয়ের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে প্রতাপ বললেন, ব্যবসা করবি! ব্যবসা করা সোজা নাকি, ক্যাপিটাল পাবি কোথায়?

আমার একজন চেনা লোক, সে দেবে বলেছে। আমাকে শুধু খাটতে হবে।

ওরকম অনেকেই বলে! মাটিন বার্নের চাকরিটা হয়ে যেতে পারে, আমি চিঠি লিখে দেবো, তুই কেষ্টবাবুর সঙ্গে দেখা করবি এই রবিবারে। কিংবা আমিই তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

তারপর প্রতাপ আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

কেষ্টবাবু নামের ব্যক্তিটি শিয়ালদা কোর্টের এক পেশকারের জ্যাঠতুতো দাদা। পেশকারবাবুটি নিজে থেকেই প্রতাপকে বলেছিলেন, স্যার, আপনার ভাইয়ের চাকরি গেছে। শুনলুম। আমার এক দাদা মাটিন বার্নে আছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করলে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার দাদা অনেককে চাকরি দিয়েছেন। আমি বলে রাখবো, আপনি যদি একটা চিঠি দিয়ে আপনার ভাইকে পাঠিয়ে দেন...

কেষ্টবাবুর বাড়ি তিলজলায়। ঠিকানা খুঁজে বার করতে বেশ বেগ পেতে হলো কানুকে।। দোতলা বাড়ি, তার মধ্যে একতলাটি বেশ পুরনো, তার ছাদে বেখাপ্পা ভাবে দুটি নতুন ঘর তোলা হয়েছে। তার একদিকের দেয়াল থেকে বেরিয়ে আছে লোহার শিক, অর্থাৎ ওদিকে আরও বাড়াবার পরিকল্পনা আছে। এ বাড়ির পাশে একটা বড় গাছ ছিল, আজই কেটে ফেলা হয়েছে সেটাকে। একজন কাঠুরে টুকরো করছে সেই গাছের গুঁড়িটাকে, একরাশ লোক ভিড় করে দেখছে সেই দৃশ্য।

কেষ্টবাবু খুব রোগা আর লম্বা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে একটা নস্যি রঙের ব্যাপার জড়ানো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনি গাছ কাটার তদারকি করছিলেন, কানুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে পড়ে তিনি বললেন, একটু দাঁড়াও বাবা, আগে এই কাজটা সেরে নিই।

একতলার একটি ঘরে কয়েকটি মেয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে একসঙ্গে গান গাইছে, সেখানে রয়েছে গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা একজন নির্দেশক, বোধহয় প্রস্তুতি চলছে কোনো ফাংশানের। কানুর বিশেষ লজ্জা টজ্জা নেই, সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলো। মেয়ে তিনটির বয়েস ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে, চেহারায় তেমন চাকচিক্য নেই, কানুর পছন্দ হল না। আজকাল কানুর এই একটা অভ্যেস হয়েছে, রাস্তাঘাটে অচেনা মেয়েদের দেখলেই মনে মনে ভেবে নেয়, চলবে কি চলবে না। দু'একজনকে সে মনে মনে নিজের পাশে দাঁড় করায়।

একটু পরে কেষ্টবাবু এসে বললেন, চলো।

তিনি তাকে নিয়ে এলেন দোতলার ছাদে। নতুন ঘরগুলোর পাশে এক জায়গায় সিমেন্ট-সুরকি জমা করা আছে, তারই একধারে রয়েছে দুটি টিনের চেয়ার। সেখানে বসলো দু'জনে।

শীত এখনো ফুরিয়ে যায়নি একেবারে। সকালের রোদ মন্দ লাগে না। বাড়িটার পাশেই একটা পানা পুকুর, মাথার ওপরে অনেকগুলো কাক ওড়াউড়ি করে কা কা করছে রাগত ভাবে। খুব সম্ভবত ভূপাতিত গাছটিতে তাদের বাসা ছিল।

কেষ্টবাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হাকিমবাবুর ভাই? কী নাম?

কানু বললো, জয়দেব সরকার।

লেখাপড়া কদ্দূর?

আই-এ প্লাকড।

টাইপ, শর্টহ্যান্ড জানা আছে?

টাইপ জানি।

স্পীড কত?

কানুর একটু মজা লাগলো। মার্টিন বার্ন কম্পানির চাকরির ইন্টারভিউ হচ্ছে এই ছাদে বসে, সিমেন্ট-সুরকির পাশে? এই বিড়ি-ফোঁকা, সিঁড়িঙ্গে চেহারার লোকটা ঐ কম্পানির অফিসার নাকি?

রোগা চেহারা হলেও কেষ্টবাবুর বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে, কানুকে তিনি দেখছেন তীক্ষ্ণ নজরে। কানুর যোগ্যতা সম্পর্কে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করে তিনি সন্তুষ্ট হলেন মনে হলো, হাঁটু নাচাতে নাচাতে বললেন, ঠিক আছে, ওতেই চলবে। হয়ে যাবে, একটা পোস্ট খালি হবে সামনের মাসে, মাইনে সব মিলিয়ে দুশো দশ টাকা। ঠিক আছে?

কানু মাথা নেড়ে বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কত টাকা এনেছো সঙ্গে?

কানু এ প্রশ্নের মানে বুঝতে পারলো না। প্রতাপ টাকার কথা তো কিছু বলেননি। চাকরির দরখাস্তের সঙ্গে অনেক জায়গায় পোস্টাল অর্ডার দিতে হয়। কানুর কাছে পনেরো-ষোলো টাকা আছে, তাতে হয়ে যাওয়া উচিত।

কানু পকেট থেকে সেই টাকা বার করতেই কেষ্টবাবু গলা ঝুঁকিয়ে দেখে একগাল হাসলেন। তারপর বললেন, আমি শনিপুজোর চাঁদা চাইছি না। আমার ভাই বলে দেয়নি কিছু?

কানু দু'দিকে মাথা নাড়লো।

এ বাজারে কিছু খচা না করলে চাকরি হয়? বারো দু'গুণে চব্বিশ শো আর বারো দশকে একশো কুড়ি, ইয়ে, মোট আড়াই হাজারই ধরো। ঐ টাকাটা জমা দিতে হবে আগে।

কোথায় জমা দেবো?

আমাকেই দেবে। তা বলে ভেবো না, পুরোটাই আমি একা নেবো, আরও পাঁচজন দের্তার মাথায় সিন্নি চড়াতে হয়। তোমাদের বাড়ি কোথায় ছিল?

একটুও দ্বিধা না করে কানু বললো, মুর্শিদাবাদ।

কানু আজকাল চালাক হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছে, সব জায়গায় নিজেদের বাঙাল পরিচয়টা জানিয়ে দিলে সুবিধে হয় না। কেষ্টবাবুর কথা শুনেই সে বুঝেছে, উনি এদিককার লোক।

কেষ্টবাবু বললেন, আমি মেদিনীপুরের ছেলেদের একটু ফেবার করি। ব্রিটিশ আমলে মেদিনীপুরে কত অত্যাচার হয়েছে, এখন আমি এই শালা ব্রিটিশ কোম্পানিতে যত পারি মেদিনীপুরের ছেলে ঢোকাই। তা ঠিক আছে, তুমি হাকিম সাহেবের ভাই, তোমারও দু' হাজার দিলেই চলবে। সাত দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করো, দেরি হলে মুশকিল, আরও অনেক ক্যান্ডিডেট ঘোরাঘুরি করছে।

একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে এসে কেষ্টবাবুকে এক গেলাস চা দিয়ে পাশেই। একা-দোক্কা খেলতে লাগলো আপন মনে। কেষ্টবাবু চায়ে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে ঐ কথাই রইলো?

অর্থাৎ ইন্টারভিউ শেষ। কানু উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, দরখাস্তটা কি রেখে যাবো?

কেষ্টবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, না, না, শুধু দরখাস্ত নিয়ে আমি কী করবো? সামনের রোববারের মধ্যে টাকাটা আর ওটা নিয়ে এসো একসঙ্গে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কানু ভাবলো, সেজদা নিজেই কানুকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসবার কথা বলোছলেন একবার। সকালে বাড়িতে লোক এসে পড়ায় তিনি বেরুতে পারেননি। সেজদা এলে বেশ মজা হতো, টাকার কথাটা শুনলে সেজদার মুখের চেহারাটা নিশ্চয়ই হতো দেখবার মতন। তিনি এই সিঁড়িঙ্গে লোকটার সঙ্গে মারামারি শুরু করে দিতেন কি না কে জানে! ন্যায়-নীতি নিয়ে সেজদার বাড়াবাড়ির শেষ নেই। লুটেপুটে খাওয়ার যুগ এসেছে, এখন যে লব শুধু বইয়ের পাতায় লেখা থাকে, তা সেজদা কিছুতেই বুঝবে না!

কানু একটুখানি এগোতেই উল্টো দিক থেকে আসা তারই বয়েসী একটি যুবক এক টুকরো, কাগজ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, দাদা, এই ঠিকানাটা কোন্ দিকে হবে বলতে পারেন।

কানু দেখলো সেটা কেষ্টবাবুরই নাম-ঠিকানা। সে মনে মনে হাসলো। আর একজন এসে গেছে এর মধ্যেই। এ ছেলেটার বাড়ি মেদিনীপুরে নাকি, তাহলে এরই চান্স বেশি।

বাড়ি ফিরে টাকার অঙ্কটা আর কমালো না কানু, পুরো আড়াই হাজারের কাহিনীটাই শোনালো প্রতাপকে। প্রতাপ কয়েক মুহূর্ত যেন হতবাক হয়ে গেলেন। অসহায়, বেকার ছেলেদের চাকরি দেবার বিনিময়ে কেউ মোটা টাকা ঘুষ চাইতে পারে, এরকম ব্যাপার যেন তাঁর কল্পনার অতীত।

রাগের চোটে প্রতাপ চিৎকার করে বলে উঠলেন, ঐ লোকটাকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেবো। আমার পেশকার... সেও কিছু বলেনি। তার এত সাহস...।

কানু মনে মনে ভাবলো, সেজদা কোন্ যুগে পড়ে আছে? ঘরে বসে গলাবাজি করলে কেউ পুছবে? মফস্বল শহরে তবু সাব জজদের খানিকটা খাতির আছে, কলকাতায় কেউ পাত্তাও দেবে না। ঐ পেশকারের রোজগারই বোধহয় সেজদার চেয়ে বেশি।

চ্যাঁচামেচি শুনে সুপ্রীতি, এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

কানুর কাছে সব কথা শুনে সুপ্রীতি বললেন, আড়াই হাজার টাকা, সে তো অনেক টাকা, কিছু কম করবে না? ঐ কম্পানির চাকরি তো ভালো শুনেছি।

প্রতাপ বললো, কক্ষনো না, আমি এক পয়সা দেবো না। ঐ লোকটাকে আমি জেলের ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়বো।

কানু তক্ষুনি ঠিক করে ফেললো, সেজদা যদি আর কারুর কাছে চাকরির জন্য চিঠি দিয়ে পাঠায়, তাহলে সে আর যাবে না, চিঠি ছিঁড়ে ফেলে একই গল্প শোনাবে।

কয়েকদিন পর দুপুরবেলা খেতে বসে থালার পাশে মাংসের বাটি দেখে প্রতাপ ভুরু কোঁচকালেন। সপ্তাহের মাঝখানে একটা ছুটির দিন। মাসে একদিন মাত্র মাংস হয়, প্রথম রবিবার।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, মাংস কে আনলো?

সুপ্রীতি বললো, কানু এনেছে। ও তো আজকাল প্রায়ই বাজার করে দেয়?

প্রতাপ খুশি হলেন না। কানুর ধরন-ধারণ তাঁর ঠিক পছন্দ নয়। সব সময় কিছু যেন একটা গোপন করে যাওয়ার ভাব আছে ওর মধ্যে। ও পয়সা পাচ্ছে কোথা থেকে? প্রতাপ সংকল্প করলেন, এরপর থেকে তিনি কানুর ওপর নজর রাখবেন।

কানু আগেই খেয়ে বেরিয়ে গেছে, পিকলু আর বাবলু খেতে বসেছে প্রতাপের সঙ্গে। ওরা মাংস ভালোবাসে। বাবলু বললো, পিসিমনি, তুমি দাদাকে নলি হাড় দিয়েছে, আমাকে দাওনি। আমায় আর একটা মাংসের আলু দাও!

প্রতাপ খাওয়া থামিয়ে চেয়ে রইলেন সন্তানদের দিকে। তাঁর হঠাৎ বুক ব্যথা করতে লাগলো। সামান্য মাংসও তিনি নিয়মিত খাওয়াতে পারেন না ছেলেমেয়েদের। তাঁদের বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রতিদিন জোড়া পাঁঠা বলি হতো। তা ছাড়াও ভবদেব মজুমদার মাঝে মাঝেই বাড়িতে পাঁঠা কাটিয়ে সেই মাংস বিলি করতেন গ্রামের চেনাশুনো পরিবারে।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে প্রতাপ দেখলেন দরজার পাশেই ফাঁকা জায়গাটুকুতে কয়েকটা বড় বড় বাণ্ডিল। দেখে মনে হয় কাপড়ের। এগুলো এলো কোত্থেকে?

মমতা বললেন, ওগুলো কানুর ব্যবসার জিনিস। সে নাকি এরকম বাণ্ডিল প্রায়ই আনে। ঘরের মধ্যে আরও অনেকগুলো আছে, সব ধরেনি বলেই বাইরে কয়েকটা রেখেছে, কাল সকালেই সরিয়ে নেবে।

কানু তখন বাড়িতে নেই, তাই তার সঙ্গে কথা বলা গেল না। মমতার কাছেই শুনলেন যে কানু রীতিমতন ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে, ভালই চলছে নিশ্চয়ই, সে যখন তখন বেশ পয়সা। খরচ করে। বাবলু অর পিকলুকে দুটো জামা কিনে দিয়েছে। মমতা আর সুপ্রীতিকেও শাড়ি দিতে চেয়েছিল, ওঁরা নেননি, কানুর ব্যবসার আর একটু উন্নতি হলে নেবেন বলেছেন।

কাপড়ের ব্যবসা শুনলেই মনে পড়ে কাপড়ের দোকান। প্রতাপ ভাবলেন, তাঁর ভাই কাপড়ের দোকান খুলেছে? দোকান খুলতে অনেক টাকা লাগে, কাপড়ের ফিরিওয়ালা হয়েছে নাকি কানু?

প্রতাপ নিজের কাজে মন দিলেন। তাঁর বেশি রাত করে খাওয়া অভ্যেস। তখন খোঁজ নিয়ে জানলেন, কানু এর মধ্যে এসে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাথরুমে আঁচাতে এসে প্রতাপ দেখলেন একটা নতুন তাক তৈরি হয়েছে সেখানে, তার ওপরে একটা পাউডারের কৌটো, দু একটা স্নো-পমেটমের শিশি, দাড়ি কামানোর সাবান। এসব আবার কোথা থেকে এলো? নিশ্চয়ই কানুই এসব কিনে এনেছে।

রাত জেগে প্রতাপ বই পড়তে লাগলেন, কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁর মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো। বাড়িতে এতগুলো কাপড়ের বাণ্ডিল, এ সম্পর্কে কিছুতেই তিনি মন থেকে খটকা দূর করতে পারলেন না।

এক সময় তিনি বই মুড়ে রেখে বাইরে এসে একটা কাপড়ের বাণ্ডিল খুলে ফেললেন। সবই শাড়ি, দামি নয়। সাদা খোল, সরু লাল বা হলদে পাড়। আর একটা বাণ্ডিল খুললেন, তাতেও ঠিক একই শাড়ি।

প্রতাপ এগিয়ে এসে ছেলেদের ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললেন। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেখলেন, দুটো দেয়ালের পাশে একই রকম অনেকগুলো বাণ্ডিল রয়েছে। এক ঘরে তিনজন থাকে, এমনিতেই ঠাসাঠাসি হয়, এর মধ্যে আবার এত মালপত্র এনে ভরার আগে কানু একবার তাঁর অনুমতি নেবার প্রয়োজনও বোধ করেনি?

কানুকে ডাকবার আগেই সে চোখ মেলে তাকালো।

আঙুলের ইসারায় প্রতাপ ডাকলেন, এই, একবার উঠে আয় তো!

যে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়েছিল, সেটাই জড়িয়ে উঠে এলো কানু। প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, এসব কী?

কানু বললো, কাপড়। আমি ব্যবসা করছি, আমাদের ওখানে রাখার জায়গা নেই।

ওখানে মানে? দোকান খুলেছিস?

না, আমাদের গোডাউন।

আমাদের মানে কী?

আমার পার্টনার আছে একজন। সে অনেকদিন ধরে কাপড়ের লাইনে আছে। আমরা মিল থেকে কাপড় ডেলিভারি নিয়ে দোকানে দোকানে সাপ্লাই দিই!

এগুলো সরকারি কন্ট্রোলের শাড়ি, তাই না?

হয়তো দুএকবার চোখের পাতা কাঁপলো, তাহলেও কানু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, হ্যাঁ।

প্রতাপ বললেন, সরকারের যারা পারমিট হোল্ডার, তারাই শুধু ন্যায্য দামের দোকানে এইসব শাড়ি বিক্রি করে। তোদের পারমিট আছে?

এবারেও কানু সঙ্গে সঙ্গে বললো, হ্যাঁ।

প্রতাপ হাত বাড়িয়ে বললেন, কোথায় দেখি সেই পারমিট?

আমার কাছে নেই, আমার পার্টনারের কাছে আছে।

তার কাছে একটা কপিও রাখিসনি? আজ রাতে যদি পুলিশ এসে বলে এই কাপড়ের পারমিট কোথায় দেখাও? তাহলে?

কানু এবারে কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

প্রতাপ খপ করে কানুর একটা কান ধরে বললেন, হারামজাদা, এই জন্যই তুই এই ব্যবসার কথা আমাকে আগে বলিসনি, তাই না? চুরির ব্যবসা ধরেছিস? জুতিয়ে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেবো!

বাপ-ঠাকুদাদের মতনই প্রতাপ উত্তেজিত হয়ে গেলে গলার আওয়াজ নিচু রাখতে পারেন না। রাত্রি কি দিন তা খেয়াল থাকে না। কানু এর পরেও কোনো কথা বললো না, তাতে প্রতাপের রাগ আরও চড়ে গেল। কানটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, আমি সরকারি চাকরি করি, তুই আমার মুখে চুনকালি দিতে চাস? এত তোর টাকার লোভ!

ছেলেরা তো জেগে উঠেছেই, মমতা আর সুপ্রীতিও বাইরে চলে এসেছেন। সুপ্রীতি কাছে। এগিয়ে এসে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, ও কী করছিস, খোকন? এত বড় ছেলের কান ধরতে আছে? ছেড়ে দে!

রাগের সময় প্রতাপ স্ত্রী বা দিদিকেও গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু আজ সুপ্রীতি এসে তাঁর হাত ধরতেই তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। গয়নাগুলো নষ্ট হবার পর প্রতাপ দিদির সামনে একটু কাচুমাচু হয়ে যান। মমতার কাছেও তিনি একটু অপরাধী হয়ে আছেন। সেই যে একদিন রাগ করে ভোরবেলা গৃহত্যাগ করে তিনি দেওঘর চলে গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে মমতা এখনও কোনো খোঁটা দেননি, নিশ্চিত জমা রেখেছেন ভবিষ্যতের জন্য। সুপ্রীতি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে, কানু?

কানু এবারে ভালোমানুষ সেজে নিরীহভাবে বললো, বলছি যে এই কাপড়ের জন্য পারমিট আছে আমার পার্টনার গুপীবাবুর কাছে, সেজদা সেকথা বিশ্বাস করছে না। কাল সকালেই এনে দিতে পারি।

প্রতাপ গর্জন করে উঠে বললেন, মিথ্যে কথা!

সুপ্রীতি বললেন, তুই সব না জেনেশুনেই এরকম রাগারাগি করছিস কেন, খোকন? কাল সকালেই তো কাগজ এনে দেবে বলছে। ছেলেটা চাকরি বাকরি কিছুই তো পেল না, ব্যবসা করে যদি দুটো পয়সা রোজগার করে তাতে দোষের কী আছে?

দিদি, তোমরা বুঝতে পারবে না! এটা চুরির ব্যবসা। এই সব কাপড় গরিবদের কাছে কম দামে বিক্রির জন্য। তাই নিয়ে অনেকে কালোবাজারি করে। একবার একজনের নামে মামলাও হয়ে গেছে।

কানু মিষ্টি গলায় বললো, আমাদের পুলিশ কিছু করতে পারবে না। আমাদের কাগজপত্র সব। ঠিকঠাক করা আছে!

তাহলে এ বাড়িতে এগুলো এনে লুকিয়ে রেখেছিস কেন?

কাল সকালেই নিয়ে যাবো।

সুপ্রীতি বললেন, খোকন, তুই বড় মাথা গরম করছিস। এখন শুতে যা! ওর জন্য একটা। চাকরি তো জোগাড় করে দিতে পারলি না!

প্রতাপের ইচ্ছে করছিল লাথি মেরে মেরে কাপড়ের বাণ্ডিলগুলো বাড়ির বাইরে ফেলে দিতে। তিনি বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন। সবাই মিলে যেন তাঁকে অসহায় করে দিচ্ছে।

পরদিন প্রতাপ জাগবার আগেই কানু সব মালপত্র সরিয়ে ফেললো কিন্তু কাগজপত্র এনে দাদাকে দেখালো না। প্রতাপের সামনে থেকে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। প্রতাপ মমতাকে হুকুম দিয়ে দিলেন, কানুর কাছ থেকে সংসার খরচের জন্য যেনএকটা টাকাও না নেওয়া হয়। পিকলু-বাবলুর জন্য সে কোনো জিনিস কিনে দিলে ফেরত দিতে হবে তৎক্ষণাৎ! আর বাথরুমে স্নো পাউডার কার জন্য! এ বাড়িতে থেকে কানুর ওসব বাবুগিরি চলবে না!

দু'দিন বাদেই কানু এসে জানালো, মিজাপুর স্ট্রিটে সে একখানা ঘর ভাড়া করেছে। তার কাজের সুবিধের জন্য এখন থেকে সে সেখানেই থাকবে। এখানেও তো তার জন্য পিকলু-বাবলুদের অনেক অসুবিধে হয়! প্রতাপ হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বললেন না, গুম হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

৩৯ কলেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে

কলেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেই পিকলু দেখলো হেদো পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার দুই ভাই-বোন। পিকলু শুধু চমকে গেল না, অস্বস্তি বোধ করলো। তার এখন বন্ধুদের সঙ্গে বসন্ত কেবিনে গিয়ে আড্ডা মারার কথা। বসন্ত কেবিনের একেবারে কোণের দিকের একটা টেবিল তাদের জন্য নির্দিষ্ট, সেখানে তাদের সাহিত্য বাসর হয়।

বাড়ির জগৎ আর বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। কলেজে কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গে থাকার সময় হঠাৎ বাড়ির কেউ এসে পড়লে কেমন যেন অবান্তর লাগে। প্রতাপ একদিন এই কলেজে ইংরিজির অধ্যাপক মহীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্লাস রুমের বাইরে, সেদিন বাবাকেও খুব সাধারণ মনে হচ্ছিল পিকলুর। আজও বাবুলু আর তুতুলকে দেখে প্রথমেই ভাবলো, এরা এখানে বেমানান। এরা কেন এসেছে? তার পরেই তার বুকটা কেঁপে উঠলো। বাড়িতে কারুর কোনো বিপদ ঘটেনি তো? ওরা তাকে খবর দেবার জন্য ছুটে এসেছে?

বাবলুর সদ্য গলা ভাঙতে শুরু করেছে। সে খসখসে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, দাদা!

পিকলু তার বন্ধুদের বললো, তোরা যা, আমি একটু পরে আসছি! সে প্রায় ছুটে এলো। রাস্তার অন্য দিকে।

না, বাড়িতে কারুর কোনো বিপদ ঘটেনি। দুই ভাইবোন এসেছে দাদাকে চমকে দিতে। বুদ্ধিটা অবশ্য তুতুলেরই। তার পরীক্ষা হয়ে গেছে, বাড়িতে একটাও বই নেই পড়ার মতন। কিছুতেই তার সময় কাটে না। বাবলুরও আজ স্কুল ছুটি। মমতা আর সুপ্রীতি ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখতে গেছেন, ছবি বিশ্বাসের কোনো ফিল্ম এলে সুপ্রীতির দেখা চাই-ই। তুতুলকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তুতুল রাজি হয়নি। ওঁরা রিকশা ছাড়া যাওয়া-আসা করেন না, ওঁদের সঙ্গে গেলে তুতুলকে মা কিংবা মামিমার কোলে বসতে হয়, সেটাই তার বিচ্ছিরি লাগে। ওরা সিনেমায় চলে যাবার পর বাবলুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তুতুল।

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, তোরা কী করে জানলি, আমার কখন ছুটি হবে?

তুতুল উত্তর না দিয়ে হাসলো। বাবলু বললো, দিদিটা কিছু জানে না, আমরা এক ঘণ্টা ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

পিকলু ভুরু কুঁচকে বললো, হঠাৎ তোদের এই উটকো বুদ্ধি চাপলো কেন? আমি তো এখন বাড়ি ফিরতে পারবো না। আমার কাজ আছে। চল, তোদের বাসে তুলে দিই!

তুতুল আবদারের সুরে বললো, না, আমরা এখন যাবো না!

বাবলু বললো, দাদা, তোমাদের কলেজের ভেতরে আমাদের নিয়ে চলো একটু! আমি দেখবো!

পিকলু বললো, বাচ্চাদের কলেজের ভেতরে যেতে দেয় না!

তুতুল বললো, আহা, বাচ্চা মানে কী? আমার রেজাল্ট বেরুলে আমিও তো এই কলেজে ভর্তি হবো!

বাবলু বললো, আমিও এখানে পড়বো! বাবলুর থুতনিটা ধরে নেড়ে দিয়ে পিকলু বললো, তোর যা পড়াশুনোর ছিরি, তোকে আর কলেজ পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে না। দ্যাখ, স্কুলটাই টপকাতে পারিস কি না!

তারপর সে তুতুলকে বললো, তুই পাশ করলে তোকে ভর্তি করে দেবো বেথুন কলেজে।

তুতুল জোর দিয়ে বললো, না, আমি এখানে পড়বো!

পিকলু বললো, আমি আর স্কটিশে থাকছি না, থার্ড ইয়ারে প্রেসিডেন্সিতে চলে যাচ্ছি।

তুতুল বললো, আমিও বুঝি প্রেসিডেন্সিতে যেতে পারি না?

বাবলু জিজ্ঞেস করলো, আমাদের তুমি কলেজের ভেতরটা দেখাবে না?

তুতুল পরে এসেছে হলুদ রঙের শাড়ি। খোলা চুল সন্ধেবেলার জলপ্রপাতের মতন ছড়িয়ে আছে পিঠে। ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েদের তুলনায় তাকে বড়ই দেখায়। বাবলু ক্লাস নাইনে পড়লেও তার চেহারাও তেমন ছোটখাটো নয়।

গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বাবলু জিজ্ঞেস করলো, দাদা, তোমাদের কলেজে সাহেব আছে?

এতক্ষণে পিকলুর মুখে হাসি ফুটলো। সে খপ করে ছোট ভাইয়ের হাত চেপে ধরে বললো, হ্যাঁ আছে, আমাদের প্রিন্সিপালই তো সাহেব। চল, তোকে নিয়ে যাচ্ছি, তোকে ইংরিজিতে কথা বলতে হবে!

বাবলুর মুখ শুকিয়ে গেছে। সে বললো, থাক, আমি কলেজ দেখবো না।

পিকলু বললো, কেন? এই যে বললি, চল, আগে তো প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছ থেকে পারমিশান নিতে হবে!

তুতুল একা একাই এগিয়ে গেছে অনেকটা। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর স্কুলের বালিকা নেই। তার চলায় একটা ছন্দ এসেছে। পিকলু ওদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো কমনরুম, লাইব্রেরি, কেমিস্ট্রি লৈবরেটরি। বাবলু চুপ হয়ে গেছে। কেন যে তার এত সাহেব ভীতি, তা বোঝা যায় না। কটা সাহেবই বা সে দেখেছে? বাবার কাছে পরাধীন আমলের গল্প শুনেছে কিছু কিছু।

কলেজের বাড়িটা কত বড়, কত ঘর, তবু এর মাঝখান দিয়ে সচ্ছন্দ, সাবলীল ভাবে ঘুরছে পিকলু। যেন এটা তার নিজের জায়গা। এটাই বেশি আশ্চর্য করলো বাবলুকে। নিজেদের বাড়ি ছাড়া অন্য কোনো বাড়িতে গেলে সবাই একটু আড়ষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কলেজটা আপন। করে নেওয়া যায়? বাইরের এই বড় জগটা একবার হাতছানি দিল বাবলুকে। কিন্তু মুশকিল এই, এখানে আসতে গেলে বড় বেশি বই পড়তে হয়। সেটাই যে তার ভাল লাগে না।

কলেজ সফর সাঙ্গ হবার পর বাইরে এসে তুতুল বললো, তুমি বলেছিলে হেদোতে ভালো ঘুগনি পাওয়া যায়? আমাদের খাওয়াও!

পিকলু বললো, আমার বন্ধুরা আমার জন্যে ওয়েট করে আছে, জরুরী কথা আছে ওদের সঙ্গে!

বসন্ত কেবিনে? তাহলে সেখানেই আমরা যাই?

বন্ধুদের কাছে ভাই-বোনদের নিয়ে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু একা তুতুল থাকলে তবু কথা ছিল, বাবলুকে তত নেওয়া চলেই না। অগত্যা পিকলু ওদের নিয়ে গেল ঘুগনি খাওয়াতে।

হেদোর জলে সাঁতার কাটছে অনেকে। একদিকে মেয়েদের সাঁতারের কমপিটিশান হচ্ছে, সেখানে প্রচুর দর্শকের ভিড়। ওরাও দাঁড়িয়ে দেখলো খানিকক্ষণ। তুতুল আর বাবলু সাঁতার জানে না। পিকলু ছেলেবেলায় গ্রামে গিয়ে একটু একটু সাঁতার শিখেছিল, তারপর অনেক বছর প্র্যাকটিস নেই। মা আর পিসিমা মাঝে মাঝে গঙ্গা স্নান করতে যান, পিকলুকে যেতে হয় সঙ্গে। মেয়েদের ঘাট আর পুরুষদের ঘাট আলাদা, পিকলুর একা একা জলে নামতে ইচ্ছে করে না। প্রতাপ মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেন, তাঁর ছেলেমেয়েরা কেউ সাঁতার শিখলো না।

বিকেলের রোদ পড়ে ঝকঝক করছে জল। কিশোরী মেয়েদের দাপাদাপিতে এই জলাশয়টি যেন খুশী হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেবার জন্য চিৎকার করছে লোকেরা। দৃশ্যটি তুতুলের বড় সুন্দর লাগলো। বাড়ির বাইরের জীবনের এই প্রাণোচ্ছলতা তো সে বিশেষ দেখার। সুযোগ পায় না।

সে লাজুক ভাবে বললো, আমাদের বাড়ির কাছে যদি এরকম একটা পুকুর থাকতো, তাহলে আমিও সাঁতার শিখতাম।

পিকলু বললো, আমাদের দেশের বাড়িটা থাকলে আমরা সবাই এমনি এমনিই সাঁতার শিখে যেতাম। ওখানে পাঁচ বছরের বাচ্চাও সাঁতার জানে।

দেশের বাড়ির কথা তুতুলের ক্ষীণ মনে থাকলেও বাবলুর একটুও মনে নেই। সে বললো, আমি গঙ্গায় সাঁতার কাটবো!

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, পিকলুদা, মামাবাড়ির বড় উঠোনটায় একদিন একজন একটা মস্ত বড় সাপ গেঁথে রেখেছিল, তোমার মনে আছে?

পিকলু ভুরু কুঁচকে বললো, সাপ গেঁথে রেখেছিল? তার মানে?

তুতুল বললো, সেই যে একজন মাঠ থেকে একটা বড় সাপ ধরে এনেছিল দেখাবার জন্য? উঠোনের মাঝখানে সেটাকে বর্শা দিয়ে গেঁথে দেয়। সাপটা তখনও বেঁচে, ফোঁস ফোঁস করছিল অনকেক্ষণ!

পিকলু এবারে এসে বললো, তোর মনে আছে বুঝি? তুই দেখেছিলি?

তুতুল বললো, হ্যাঁ। স্পষ্ট মনে আছে!

তুই তা হলে জাতিস্মর!

কেন, তোমার মনে নেই? বাড়িতে গিয়ে মামিমাকে জিজ্ঞেস করে দেখো!

পিকলু তবু হাসতে লাগলো। ঘটনাটা বাবলু-তুতুলের জন্মের আগে। পিকলুরই তখন মাত্র দেড় বছর বয়েস। প্রথম বাচ্চা নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর মমতার সেই প্রথম সাপ দেখার অভিজ্ঞতা হল। মালখানগরের বাড়ির মাঝি মৈনুদ্দিন রান্নাঘরের পেছনের ছাইগাদায় একটা বিরাট শঙ্খচূড় সাপ দেখতে পেয়ে ল্যাজায় গেঁথে এনে ছিল শহুরে বউদিকে দেখাবার জন্য। সেই অবস্থাতেও সাপটা ফণা তুলে মাথা দোলাতে লাগলো। তা দেখে মায়া হয়েছিল মমতার, তিনি বলেছিলেন, আচ্ছা, ওকে ছেড়ে দাও। মমতার কাছেই সেই গল্প শুনেছে ছেলেমেয়েরা। অদূর অতীত কালের গল্প কয়েকবার শুনতে শুনতে মনের মধ্যে তলিয়ে যায়, তারপর একসময় মনে হয়, আমি নিজেই সেটা দেখেছি!

পিকলুর হাসি দেখে তুতুল রেগে গেল, সে হাঁটতে লাগলো উল্টো দিকে।

পিকলু কাছে এসে বললো, এবার তোরা যা! পাঁচটা প্রায় বাজে!

তুতুল দু দিকে মাথা নেড়ে দৃঢ়ভাবে বললো, না, আমি বাড়ি যাবো না!

বাবলু এতে মজা পাচ্ছে। সে প্রায় রোজই কোনো না কোনো কারণে বকুনি খায়। আজ তার শান্ত-শিষ্ট দিদিটি দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্য বকুনি খাবে। সে ষড়যন্ত্রের সুরে ফিসফিস করে বললো, দিদি, কানুকাকার বাড়ি যাবে?

তুতুল উৎসাহিত হয়ে বললো, হ্যাঁ, তাই চল, পিকলুদা, চলো!

মীজাপুরে কানু যে ঘরটি ভাড়া নিয়েছে সেই জায়গাটি ওদের বেশ পছন্দ হয়েছে। কানু নতুন সংসার পাতবার পর মমতা আর সুপ্রীতি দু'তিনদিন গিয়ে তার ঘর গুছিয়ে দিয়ে এসেছেন। কানু সঙ্গে কিছু নিয়ে যেতে চায়নি, মমতা জোর করে তাকে দিয়েছেন তোশক, বালিশ, কম্বল, সুজনি। এবং রান্নার জিনিসপত্র। কানু একটা খাট কিনে ফেলেছে। জানলায় নতুন পর্দা লাগিয়েছে। একটা চারতলা বাড়ির চিলে কোঠাটা ভাড়া নিয়েছে কানু, সামনে খোলা ছাদ। সেই ছাদ থেকে কলকাতার অনেকখানি দেখা যায়, হাওড়া ব্রীজ তো স্পষ্ট! সামনের রাস্তাটা দিয়ে অজস্র মানুষ যায় আর নানারকম শব্দ। একতলায় একটা দফতরিখানায় বই। বাঁধাই হয়, ডাঁই করা থাকে কত বই। মুটেরা ঝাঁকায় ভর্তি করে সেই বই নিয়ে যায়। আর এক। পাশে একটা বড় মুদির দোকান। প্রায়ই বিকেলের দিকে একটি বিরাট মোটা ষাঁড় এসে দাঁড়ায় সেই দোকানের সামনে। অতবড় হাতির মতন ষাঁড়টার কিন্তু একটা পা খোঁড়া, সে পা টেনে টেনে হাঁটে। ষাঁড়টি এসে দাঁড়ালেই মুদিখানার মালিক নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে কর্মচারিদের হুকুম করেন, অ্যাই, এক পো ছোলা দে! ষাঁড়টি নিচু হয়ে ছোলা খায় আর মুদিখানার মালিক তার গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দেন।

এই সব দৃশ্যই বাবলু-তুতুলদের কাছে নতুন।

সেই ভবানীপুরে বিমান বিহারীদের বাড়িতে ন'মাসে ছ'মাসে একবার যাওয়া হয়, তাছাড়া ওদের আর প্রায় কোনো যাবার জায়গাই নেই। কানুর বাড়িটা একটা নতুন জায়গা হলো। কানু বাগবাজারের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে বলে ওদের একটুও দুঃখ হয়নি।

পিকলু বললো, কানুকাকার বাড়ি। আবার উল্টোদিকে বাসের ভাড়া লাগবে... আমার কাছে অত পয়সা নেই।।

বাবলু বললো, আমরা হেঁটে যাবো!

পিকলু আরও কিছু আপত্তি করতে যাচ্ছিল, তুতুল গাঢ় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পিকলু এইরকম দৃষ্টি দেখলে অস্বস্তি বোধ করে। এরকম দৃষ্টির মধ্যে তুতুলের যেন অনেক কিছু দাবি থাকে।

হেদোর একপাশ দিয়ে বেরিয়ে শর্টকাটে বিবেকানন্দ রোড। সেখান থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিট। দু'পাশে লোহা-লক্কড়ের দোকান। ফুটপাথের ওপর ছড়ানো রয়েছে লোহার শিক। বাবলু-পিকলু কোনোদিন এ পথে আসেনি।

পিকলু বললো, এই রাস্তাটা এখন এরকম দেখছিস, এককালে এখানে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর থাকতেন। ঘোড়ার গাড়ি চেপে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন।

তুতুল বললো, তুমি তো ওঁদের দেখেছো, তাই না? এমন ভাবে বলছো!

পিকলু বললো, বই পড়লেই সব কিছু দেখা যায়। তুই এতটা হাঁটতে পারবি, তুতুল?

তুতুল বললো, যদি না পারি, তুমি আমাদের ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে যাবে।

বাবলু বললো, দাদা, তুমি আমাদের ফুচকা খাওয়াও। ঐ দ্যাখো ফুচকাওয়ালা!

পিকলু পকেটে হাত দিল। মাসের শেষ, টিউশনি থেকে তার হাত খরচের টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ভাই-বোনকে নিয়ে সে বেড়াতে বেরিয়েছে, সামান্য ঘুগনি ছাড়া আর

কিছু খাওয়াতে পারেনি। মানিকতলায় ভাল কচুড়ি-জিলিপি পাওয়া যায়, চোখের সামনে দিয়ে খালি ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে!

শুধু ফুচকা নয়, বাবলু দইবড়া, রসবড়াও খেল। তার যেন একেবারে রাক্ষুসে খিদে। পকেটের সব খুচরো পয়সা শেষ করে ফেললো পিকলু। ঝালে তার ঠোঁট জ্বলে যাচ্ছে। বাবলুটা ঠিক বাবার মতন ঝাল খেতে পারে, পিকলুর সহ্য হয় না।

তুতুল সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। সরল রাস্তাটির অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, দুপাশের বাড়িগুলো যেন উদগ্রীব হয়ে আছে। কী যেন একটা টানছে তুতুলকে।

একটা গেটওয়ালা বড় বাড়ি দেখে পিকলু বললো, এইটা অনেকটা তোদের বরানগরের বাড়ির মতন না? তুতুল, ঐ বাড়িটার জন্য তোর মন কেমন করে?

তুতুল মুখে কোনো উত্তর দিল না, দু'দিকে মাথা নাড়লো। খুব ভালো লাগার অনুভূতি যখন হয়, তখন তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

সিটি কলেজ, সেন্ট পল্স কলেজ ছাড়িয়ে এসে পিকলু বললো, বাবা এইখানে কোনো একটা মেস বাড়িতে থাকতেন, কলেজে পড়ার সময়। তখন বাবার বয়েস আমারই মতন।

বাবলু জিজ্ঞেস করলো, তখন মা কোথায় থাকতো?

দূর বোকা! বাবার তখন বিয়ে হয়েছে নাকি? বললুম না, আমার মতন বয়েস!

মা তখন কোথাও ছিল না?

মা তখন মামা বাড়িতে তুতুলের চেয়েও একটা ছোট মেয়ে হয়ে ছিল! তখন তো আমাদের মা ছিল না। বাবা যদি অন্য একজনকে বিয়ে করতো, তা হলে মা আমাদের মা হতোই না!

বাবলু একটু চিন্তা করে বললো, আর মা যদি অন্য একজনকে বিয়ে করতো, তাহলে আমাদের অন্য বাবা হতো?

সশব্দে পিকলু আর তুতুল হেসে উঠলো একসঙ্গে। বিবাহ ও জন্মরহস্য এরা দু'জনে অনেকটা জেনে ফেলেছে, বাবলু এখনো জ্ঞানের সেই সীমায় পৌঁছোয় নি। এই বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার হলেই তার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায়। মেয়েরা বুকের জামা খুলে ফেললে তখন সেদিকে ছেলেদের তাকাতে নেই, তাকালে মেয়েরা বলে, অসভ্য! অলি একদিন বলেছিল তাকে। কী যে দোষ হয়েছিল, তা বাবলু বুঝতে পারেনি।

ওদের হাসি শুনে লজ্জিত হয়ে কথা ঘোরাবার জন্য বাবলু জিজ্ঞেস করলো, বাবা কোন্ বাড়িটাতে থাকতো?

পিকলু বললো, তা জানি না। বাবার কাছে শুনেছি, আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটা মেস বাড়ি... এই তো এখানে দু'তিনটে রয়েছে, এর যে-কোনো একটা হতে পারে।

তারপর তুতুলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, কী রকম অদ্ভুত ব্যাপার, তাইনা? এক সময়। বাবা আমার বয়েসী, এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, তখন আমরা কোথাও ছিলুম না, আমরা নাও জন্মাতে পারতুম, এখন আমরা এই পথে হাঁটছি।

তুতুল তার বাঁ হাতটা একবার রাখলো নিজের বুকের মাঝখানে।

এইভাবে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যেতে লাগলো ওরা তিনজনে। তিনটি নবীন হৃদয়, সব কিছুতেই ওদের বিস্ময়, ওদের সামনে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা জীবন।

কানুর বাড়িতে গিয়ে ওরা তাকে পেল না। ঘর তালাবন্ধ। সে একা মানুষ, চাবি সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। তাতে কিন্তু একটুও দুঃখিত হলো না ওরা। এই যে বেড়াতে বেড়াতে এতখানি আসা হলো, এটাই তো আনন্দের।

পিকলু বললো, ভালোই হলো, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, কানুকাকা থাকলে আরও দেরি হয়ে যেত। এতক্ষণে সিনেমা থেকে মা আর পিসিমনি বাড়ি ফিরে এসেছে!

ফেরার সময় ওরা বাস ধরার জন্য এলো কলেজ স্ট্রিটে। গোলদিঘির ভেতর দিয়ে এসে, সনেট হলের লম্বা লম্বা থামগুলো দেখিয়ে পিকলু বললো, এইটা ইউনিভার্সিটি, জানিস তো?

তুতুল আর পিকলু দু'জনেই মাথা নাড়লো, এই পথটা তাদের অচেনা নয়, বাবা-মাদের সঙ্গে এই পথ দিয়ে কয়েকবার যাতায়াত করেছে তারা। পিকলু হঠাৎ আঙুল তুলে বললো, একদিন আমি এই ইউনিভার্সিটিটা জয় করবো!

তুতুল বললো, তার মানে?

পিকলু বললো, আমি ঠিক করেছি, আমি অন্য কোনো চাকরি করবো না। আমি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার হবো। তারপর আমাদের দেশের এডুকেশন পলিসিটাই বদলে দেবো!

পরের রবিবার বিকেল বেলায় তুতুলকে নিয়ে পিকলু এলো তালতলায় মামার বাড়িতে। বাবলুকেও আনতে চেয়েছিল, কিন্তু বাবলু ঘুড়ি ওড়ানো ছেড়ে আসতে চায়নি।

ত্রিদিবের নিজস্ব লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা প্রচুর। পিকলু প্রায়ই সেখানে পড়তে আসে। পিকলুর পড়ার আগ্রহ দেখে ত্রিদিব তাকে তাঁর লাইব্রেরি ব্যবহার করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

সুলেখা খুব খুশী হলেন দু'জনকে দেখে। তুতুলের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, ইস, এই মেয়েটা দেখতে কী সুন্দর হয়েছে!

তুতুল খুব লজ্জা পেয়ে গেল। তার চোখে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বলতে সুলেখাই। অন্য যেকোনো নারীকে কখনো ভালো লাগলে তার সঙ্গে সে মনে মনে সুলেখার তুলনা করে। নিজেকে সে। একটুও সুন্দর মনে করে না।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ কলেজে পড়বে, তুতুল? বেথুনে এসোনা। আমাদের আর্টস ডিপার্টমেন্ট খুব ভালো।

পিকলু হাসতে হাসতে বললো, আগে কী রকম রেজাল্ট করে দেখুন!

সুলেখা বললেন, তোর যে বড় গর্ব হয়েছে রে পিকলু!

বাড়িটি বেশ নিস্তব্ধ। ছুটির দিনের বিকেলে এ বাড়িতে এলে পিকলু বসবার ঘর ভর্তি দেখেছে, আজ একেবারে শুনশান। ত্রিদিবও বাড়িতে নেই।

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, মামাবাবু কোথায়?

সুলেখা একটু রক্তিম ভাবে হাসলেন। আজ তাঁদের বিবাহবার্ষিকী, এই দিনটিতে তাঁরা কোনো অনুষ্ঠান করেন না, কলকাতার বাইরে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যান দু'জনে। কিন্তু এবারে তাদের বন্ধু শাজাহান সাহেব কী করে যেন তারিখটা জেনে ফেলেছেন, তাই চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। ত্রিদিব একটা সেকেন্ড হ্যাঁন্ড গাড়ি কিনেছেন কিছুদিন আগে। গাড়িটার সেফে একটু গোলমাল করছে, ত্রিদিব সেটা ঠিক করিয়ে আনতে গেছেন। ত্রিদিব এসে পড়লেই সুলেখাকে বেরুতে হবে। এদিকে পিকলুর সঙ্গে তুতুল এসেছে, এই মেয়েটি এর আগে কোনোদিন এ বাড়িতে আসেনি। আজ ওদের ফেলে চলে যাওয়াটাই ভাল দেখায় না, অথচ যেতেই হবে, শাজাহান সাহেব অভিমানী ধরনের মানুষ।

তুতুলকে দেখে হঠাৎ হারীত মন্ডলের কথা মনে পড়লো সুলেখার।

তিনি অপ্রস্তুত অবস্থাটা লুকোতে পারলেন না, ওদের বসিয়ে রেখে জল খাবারের ব্যবস্থা। করতে উঠে গেলেন। ত্রিদিবের গাড়ির শব্দ শোনা গেল একটু বাদেই।

সুলেখা ফিরে এসে বললেন, পিকলু, তুই তো পড়াশুনো করতে এসেছিস। তুতুল কী। করবে? আমরা একটু বেরুবো, বুঝলি? তুই পড়াশুনো কর, আমরা তুতুলকে নিয়ে যাই, ঘণ্টা দু'একের মধ্যেই ফিরে আসবো!

তুতুল জলে-পড়া মানুষের মতন মুখ করে বললো, আমি কোথায় যাবো?

আমাদের এক বন্ধুর বাড়ি। চলো না, তোমার ভাল লাগবে!

তুতুল অসহায় ভাবে পিকলুর দিকে তাকিয়ে বললো, আমি যাবো না, আমি এখানেই থাকবো।

অচেনা বাড়িতে যেতে তুতুলের ভালো লাগবে না, এটা পিকলুও বোঝে। সে বললো, ও থাক এখানে। গল্পের বই-টই পড়বে। তোমাদের ফিরতে দেরি হবে?

ওরা দু'জনে চলে এলো লাইব্রেরি ঘরে। একটু পরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন সুলেখা। আজ তিনি কিছুটা সাজগোজ করেছেন। একটা লাল সিল্কের শাড়ি, গলা থেকে ঝুলছে একটা লম্বা সোনার হার। দুটি তরুণ-তরুণীরই মনে হলো, সুলেখা মানবী নয়, দেবী। তাঁর মুখের মধুর হাসিটির কোনো তুলনা নেই।

একটা চাবি দেখিয়ে সুলেখা বললেন, এটা রেখে যাচ্ছি। সিঁড়ির গেটটা টানা রইলো। যদি আমাদের ফিরতে দেরি হয়, কিংবা তোরা ততক্ষণ না থাকিস, তাহলে ঐ গেটে তালা দিয়ে চাবিটা লেটার বক্সে ফেলে দিয়ে যাস, কেমন?

পিকলু বললো, আচ্ছা!

সুলেখা আবার লজ্জিত ভাবে বললেন, আমাদের চলে যেতে হচ্ছে, চা-টা যদি খেতে চাস, লজ্জা করবি না, নিচে ঠাকুর আছে, তাকে বলিস!

লাইব্রেরি ঘরটি প্রকাণ্ড। সমস্ত দেয়াল-জোড়া বইয়ের র‍্যাক। একটা ছোট মই আছে, তা দিয়ে ওপরের দিককার বই পড়তে হয়। একদিকের দেয়ালে একটি রবি বর্মার আঁকা রাবণ কর্তৃক জটায়ু বধের ছবি।

ঘরের মাঝখানে একটি বড় টেবিল ও গোটা চারেক চেয়ার। সাদা কাগজের প্যাড ও কয়েক রকমের কলম-পেন্সিল সাজানো আছে টেবিলের ওপর। পিকলু এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার দুটি ভল্যুম নামিয়ে এনে একটা চেয়ারে বসলো। সে বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও তার জ্ঞানের তৃষ্ণা অসীম। সে সব বিষয়ে জানতে চায়।

প্রথমেই বই না খুলে সে তুতুলের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হেসে বললো, বাড়িতে কেউ নেই, এখন অনায়াসে সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। তুতুল, একটা জানলা খুলে দেতো!

সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে বললো, কত বই দেখেছিস?

তুতুল কোনো কথা বললো না, শুধু মাথা নাড়লো।

আমি এখানে এলেই বিখ্যাত সব মনীষীদের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। বই মানে কি জানিস? বই হচ্ছে অভিজ্ঞতা। এতকাল ধরে মানুষের জ্ঞানের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা বইয়ের পাতায় লিখে রাখা হয়েছে আমাদের জন্য। ভবিষ্যতেও যারা আসবে, তাদের জন্য আমাদেরও কিছু রেখে যেতে হবে।

তুতুল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিলুর দিকে।

তুই কী পড়বি, তুতুল? কিছু ইংরিজি উপন্যাস আছে, দ্যাখ যদি কোনোটা পছন্দ হয়। কিংবা, ঐ দিকটাতে আছে ছবির বই।

তুতুল জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

এই পাড়াটা এমনিতেই নির্জন, তাদের বাগবাজারের মতন গমগমে নয়। বাড়িটাতেও কোনো শব্দ নেই। সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়। খানিক বাদে মুখ ফিরিয়ে তুতুল দেখলো পিকলু গভীর অধ্যয়নে ডুবে আছে। মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে কাগজে। সে যেন এখন এই ঘরের মধ্যে উপস্থিত নেই।

গভীর কষ্টে বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে তুতুলের। দারুণ অপরাধবোধে সে যেন মরমে মরে যাচ্ছে। পিকলু তার দাদা, অথচ পিকলুর প্রতি তীব্র ভালোবাসা সে কিছুতেই সরিয়ে দিতে পারছে না। তার ইচ্ছে করছে, পিকলু বইপত্র রেখে শুধু তার সঙ্গে কথা বলুক, তার পিঠে হাত দিয়ে আদর করুক। এখানে এখন দেখতে আসার কেউ নেই, এখানে পিকলু তাকে একেবারে আপন করে নিতে পারতো!

এই চিন্তাটাও অন্যায় তা তুতুল জানে। পিকলু কত ভালো, তার এসব কথা মনে আসে না। মনটা ফেরাবার জন্য তুতুল একটা ছবির বই খুলে দেখতে লাগলো। তার আলো কম লাগছে। পিকলু এত কম আলোতে পড়ছে কী করে? ওখানে একটা টেল ল্যাম্প আছে সেটা জ্বালার কথাও মনে পড়েনি বাবুর।

টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে তুতুল জ্বেলে দিল আলোটা।

যেন ঘোর ভেঙে মুখ তুলে পিকলু বলল, অ্যাঁ? ও, থ্যাঙ্ক ইউ!

হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো তুতুল।

পিকলু অবাক হয়ে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তুতুলের হাত ধরে বললো, এই, তোর কী হলো? কাঁদছিস কেন? খারাপ লাগছে?

তুতুল মাথা নেড়ে বললো, না। তারপর পিকলুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, কিছু হয়নি। চোখ মুছে সে দূরে সরে গেল।

৪০ দেওঘরে এসে উপস্থিত হলেন সত্যেন

কোনো খবর না দিয়েই দেওঘরে এসে উপস্থিত হলেন সত্যেন। মার্চ মাস ফুরোতে না ফুরোতেই হঠাৎ কিটকিটে গরম পড়ে গেছে। আকাশে শ্লেট রঙের মেঘ, তাদের কোনো নড়া-চড়া নেই। শীতের ফুলগুলি ঝরে গেছে, বসন্তের ফুল ভালো করে ফুটলো না।

গেটের সামনে ঘোড়ার গাড়ি থামার শব্দ শুনে দোতলার জানলা দিয়ে বুলা দেখলেন গাড়ি থেকে সত্যেনের সঙ্গে নামছে তাঁর ছেলে বাপ্পা। এই গরমের মধ্যেও সে পরে আছে নীল রঙের কোট-প্যান্ট, গলায় টাই। তার হাতে নতুন ঘড়ি। সে ওপরের দিকে তাকিয়ে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ গলায় ডেকে উঠলো, মা!

বুলা দৌড়ে নিচে চলে এলেন।

সত্যেন যখনই আসেন একরাশ জিনিসপত্র আনেন সঙ্গে। দেওঘরে এই বাড়িটি কেনার পর থেকে তিনি এটিকে নতুনভাবে সাজাচ্ছেন। একজন গোমস্তা রেখেছেন এখানে, এ বাড়ির পেছন দিকের জমিটাও কেনার ইচ্ছে আছে তাঁর। নারায়ণগঞ্জের সম্পত্তি হারিয়ে তিনি এখানে নতুন করে সম্পত্তি তৈরি করতে চান।

গাড়ি থেকে আর একটি অল্পবয়েসী রমণীও নামলো, তার পরনে সাদা শাড়ী। সত্যেন তার পিঠে হাত দিয়ে নিয়ে এলেন ভেতরে।

বাপ্পা বললো, মা, সিনিয়র কেমব্রিজের রেজাল্ট বেরিয়েছে, তুমি শুনেছো?

বুলার বুকের মধ্যে একবার ধক্ করে উঠলো। উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, বেরিয়েছে? বাপ্পা মুচকি হেসে বললো, আমার কী রেজাল্ট হয়েছে বলো তো? আমি ফেল করেছি।

সত্যেন অট্টহাসি করে উঠে বললেন, ও-রকম বলিস নারে, বাপ্পা! তোর মা হার্টফেল করবে! বড়গিন্নি, তোমার ছেলে দারুন রেজাল্ট করেছে! বুলার চোখে জল এসে যাচ্ছিল প্রায়। তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন।

এই সব পরিবারের ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষা পাশের খবর জানিয়ে বাবা-মাকে প্রণাম করে। বাপ্পাকে তা শেখানো হয়নি, সে কোটের পকেট থেকে একটা চিউইংগাম বার করে মুখে পুরে দিল।

ছেলে বড় হয়েছে, আগের মতন আর তাকে যখন তখন বুকে জড়িয়ে ধরা যায় না, তবু বুলা এখন বাপ্পার মাথাটা টেনে নিয়ে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, সত্যি বলছিস, বাপ্পা? আমার কী দারুণ ভয় হয়েছিল!

বাপ্পা মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বললো, এবার তুমি আমায় কী দেবে বলো? আমি যা চাইবো তাই-ই দেবে?

বুলা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, তুই কী চাস বল?

বাপ্পা বললো, প্রমিস?

বুলা বললেন, হ্যাঁ, তুই যা চাস!

বাপ্পা এবারে সগর্বে বললো, আই ওয়ান্ট টু গো টু ইউ কে, ফর ফারদার স্টাডিজ!

সত্যেন বললেন, আরে ওসব কথা পরে হবে! বাপ্পা, আগে সব জিনিসপত্র নামাবার ব্যবস্থা কর।

তারপর বুলার দিকে তাকিয়ে পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, একে বোধ হয় তুমি চেনো না। বিভার খুড়তুতো বোন নিরু, ওকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। নিরু, ইনি আমার বৌদি, প্রণাম করো!

মেয়েটি বিধবা, বয়েস চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়, গায়ের রং মাজা মাজা, চোখ মুখে শহরের পালিশ পড়েনি। বিভার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। বুলা তাকে নিয়ে এলেন ভেতরে।

সত্যেন এলেই বাড়ি সরগরম হয়ে যায়। সত্যেন হাঁক-ডাক দিয়ে তোক খাটাতে। ভালোবাসেন। বাউন্ডারি ওয়াল কোথায় একটু ভেঙেছে, বাগানে কোথায় আগাছা জন্মেছে, কোন্ গাছের যত্ন নেওয়া হয়নি এই সব তিনি তদন্ত করতে লাগলেন আর গোমস্তা, মালি, দারোয়ানরা তটস্থ হয়ে ঘুরতে লাগলো তাঁর পেছনে পেছনে।

নিরুর জন্য একটা ঘর ঠিক করে দিয়ে বাপ্পাকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন বুলা। তারপর বললেন, এই গরমের মধ্যে কোট টাই কী করে পরে আছিস রে, বাপ্পা? খুলে ফেল!

বাপ্পার মুখে বিনবিনে ঘাম ফুটে উঠেছে, তবু সে কোট খুললো না। কায়দা করে হাতটা ঘুরিয়ে একবার ঘড়ি দেখলো, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের গিটে হাত দিয়ে বললো, এই স্যুটটা মহাম্মদ আলির দোকান থেকে করালুম, তোমার পছন্দ হয়েছে, মা?

ছেলের চেহারায় অবিকল তাঁর স্বামীর আদল। বাপ্পা হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেছে। 'স্যুট করালুম' এরকম বড়রাই বলে। গত এক বছর হোস্টেলে থেকে তার ব্যবহার বদলে গেছে। অনেকটা, অনেক উন্নতিও হয়েছে, না হলে পরীক্ষায় ভালো ফল করলো কী করে?

–হ্যাঁরে, বাপ্পা, তোর কবে রেজাল্ট বেরুলো? আমাকে টেলিগ্রাম করিস নি কেন?

–রেজাল্ট তো বেরিয়েছে পশু। কাকামণি বললেন, এখানে আসবেন, তাই আমিও চলে এলুম।

-কোটটা অন্তত খোল বাপ্পা, তোকে দেখে আমারই গরম লাগছে।

-মা, তুমি কিন্তু প্রমিস করেছো!

-তুই সত্যি সত্যি বিলেত যাবি নাকি? যাঃ! তুই যে বলেছিলি, খড়গপুরে পড়বি?

-ম্যানচেস্টারে পড়বো। মা, আই রোট আ লেটার টু ড্যাড। অ্যান্ড হি রিপ্লায়েড। তুমি দেখবে চিঠিখানা?

বুলা স্থিরভাবে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাপ্পা তার কোটের অন্দর-পকেট থেকে সাবধানে বার করলো একটি খাম। তার মধ্যে পাতলা কাগজে টাইপ করা চিঠি। প্রবাসী পিতা তাঁর পুত্রকে চিঠি লিখেছেন ইংরিজিতে।

বুলা চিঠিখানা হাতে নিয়ে চলে এলেন জানলার ধারে। শুধু আলোর জন্যই নয়, ছেলের কাছ থেকে তিনি মুখটা আড়াল করতে চান। বাপ্পার চিঠির উত্তরে নরেন জানিয়েছেন যে বাপ্পার বিলেতে আসার ব্যাপারে তাঁর কোনো আপত্তি নেই, তিনি কলেজে ভর্তি করে দেবার ব্যবস্থা করবেন। কলেজে যাবার আগে সে কিছুদিন বাবার কাছেই থাকতে পারে। বিলেতে আসার প্রস্তুতি হিসেবে কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, হাতঘড়ি পরা অভ্যেস করতে হবে। বিলেতে সব কাজ চলে ঘড়ির কাঁটায়। প্রত্যেকটা মিনিটের দাম আছে সেখানে। ঘুম কমাতে হবে। দিনের বেলা ঘুমোনো ভারতীয়দের বিচ্ছিরি অভ্যেস, এখানে তা একেবারেই চলবে না। চটিপরা চলবে না, সব সময় মোজা ও ফিতে লাগানো জুতো পরতে হবে...

চিঠিটি দু পৃষ্ঠার। তার মধ্যে নরেন বিষয় সম্পত্তির কথাও কিছু লিখেছেন। সত্যেনের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা আনাতে হবে কোন্ কোন্ খাতে, তারও উল্লেখ আছে। রয়েছে বিভিন্ন জাহাজ কম্পানির নাম, তার মধ্যে ইটালিয়ান লাইনারের খাবার-দাবার ভালো ইত্যাদি।

একবারও বুলার নামের উল্লেখ নেই কোথাও।

কিন্তু বুলার চোখে জল এলো না, হাত কাঁপলো না। শুধু ছেলের কথাই তাঁর মন জুড়ে রইলো। বাপ্পা চলে যাবে। কলকাতায় টালিগঞ্জের বাড়িতে বিভার সঙ্গে মানিয়ে থাকতে পারছিলেন না বলে বুলা দেওঘরের বাড়িটাতে এসে রয়েছেন। এখানে তাঁর ভালোই লাগে, কখনো খুব একা-একা বোধ হয়নি, কিন্তু এখন যেন বুকটা ভীষণ খালি খালি লাগতে লাগলো।

বাপ্পা বললো, প্যাসেজ মানি কাকামণি দিয়ে দেবে বলেছে। কন্ডিশান হলো তোমার কনসেন্ট। তুমি তো কনসেন্ট দিয়েই দিয়েছে।

বুলা নিঃশব্দে ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। একটা মাত্র ছেলে, সেও যেন তাঁর আপন নয়।

বাপ্পা প্যান্ট-কোট বা জুতো-মোজা কিছুই ছাড়লো না, চলে গেল নিচে। বুলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন একই জায়গায়।

নরেনের চিঠিখানা টেবিল থেকে উড়ে গিয়ে পড়লো মেঝেতে। বুলা তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। স্বামীর সম্পর্কে তাঁর রাগ বা দুঃখ কিছুই হলো না। নরেন যে চিঠিতে একবারও বুলার নাম উল্লেখ করেননি, তাতে বোঝা যায় লোকটির এখনো কিছুটা চক্ষুলজ্জা আছে। বাপ্পা বিলেত যাবেই, সেই বিদেশ-বিভুইতে ছেলেটা একা গিয়ে পড়বে না, তার বাবা তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন, তাতে তো বুলার খুশী হবার কথা।

এক সময় বুলার মনে পড়লো, বাড়িতে একটি নতুন মেয়ে এসেছে, তার দেখাশুনো করা উচিত।

নিরুকে দেখেই বুলার একটু খটকা লেগেছিল। মেয়েটির চোখ মুখে, পোশাকে, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু আছে, যাতে বোঝা যায় সে এই পরিমণ্ডলের বাইরের মানুষ। সত্যেনের স্ত্রী বিভাবতী বেশ ধনী পরিবার থেকে এসেছে, তার কোনো খুড়তুতো বোন

এরকম হওয়া যেন মানায় না। হয়তো আপন নয়, দূর সম্পর্কের, কিন্তু সেরকম কোনো বোনকে সত্যেনের সঙ্গে দেওঘরে পাঠানোও তো অস্বাভাবিক।

মেয়েটি বিধবা। নারায়ণগঞ্জের সাম্প্রতিক দাঙ্গায় তাদের ঘর পুড়েছে, এক ভাসুরের সঙ্গে এসে উঠেছিল খড়দায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে, তাদের অবস্থা মোটেই ভালো নয়, সেখান থেকে বিভাবতাঁকে একখানা চিঠি লেখা হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জের লোকের কোনো বিপদের কথা শুনলেই সত্যেন উদারভাবে সাহায্য করেন। নিরুর ভাসুরকে তিনি পাটকলে একটি চাকরি করে দিয়েছেন, নিরুকে এনে রেখেছেন নিজেদের বাড়িতে। বিভাবতীই সত্যেনের পরিচর্যার জন্য তাকে পাঠিয়েছেন এখানে।

মেয়েটির প্রতি মমতা হলো বুলার। নদীর ধারের পলিমাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ পড়বার আগে যে একরকম মসৃণতা থাকে, ওর মুখে সেইরকম ভাব। চোখ দুটিতে ভয়মাখানো সারল্য। দেশে ওদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, খড়দায় যে কয়েক মাস ছিল, খুবই লাঞ্ছনার মধ্যে কেটেছে, তারপর এক ধনী পরিবারে আশ্রয় পেয়ে অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে। কেউ একটু ভালো ব্যবহার করলেই ধন্য বোধ করে!

মানুষকে তার নিজের পরিবেশ থেকে উপড়ে নিয়ে এলে তার জীবনটা মলিন হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলে স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল ভাব। নারায়ণগঞ্জের সামান্য বাড়ির উঠোনেও এই মেয়েটি নিশ্চয়ই ছুটে ছুটে বেড়াতো, এর বয়েস তো বেশি নয়, কিন্তু এখানে মেয়েটি প্রথম থেকেই জড়োসড়ো হয়ে আছে, মুখোনি আড়ষ্ট, বুলাকে সে যেন খানিকটা সন্দেহের চোখে দেখছে।

দোতলায় একটি মাত্র স্নানের ঘর, বুলা নিজে সেটা ব্যবহার করেন, নিরুকে তিনি সেখানেই স্নান করে নিতে বললেন। তাকে দিলেন নিজের একটি শাড়ী ও সাবান। তারপর তাকে সারা বাড়ি ঘুরিয়ে ওপরের ছাদে এনে দেখালেন দূরের ডিগরিয়া পাহাড়। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আগে পাহাড় দেখেছো?

নিরু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, না।

বুলা বললেন, এই জায়গাটা খুব সুন্দর। তুমি আর কলকাতায় গিয়ে কী করবে, এখানেই। থাকো!

পাহাড় সম্পর্কে নিরুর খুব একটা আগ্রহ দেখা গেল না। সে জিজ্ঞেস করলো, এই বাড়িখান বুঝি আপনের? এত বড় দালানকোঠা, আর কোনো মানুষ থাকে না?

বুলা বললেন, বাড়িখানা তোমার জামাইবাবুর। তবে বেশির ভাগ সময় আমি একাই এখানে থাকি।

এই সময় নিচ থেকে সত্যেন ডাকলেন, নিরু, নিরু!

ওরা দু'জনে নেমে এলো নিচে। সত্যেন একতলায় উঠোনে একটা জলচৌকি পেতে বসেছেন, খালি গা, ধুতিটা উরু পর্যন্ত তোলা। এখানে এলে সত্যেন উঠোনে বসে তোলা জলে স্নান করেন। বাড়ির কোনো চাকর প্রথমে তেল মাখিয়ে তারপর জল ঢেলে দেয়। কলকাতায় এসব চলে না। কলকাতায় থাকার সময় সত্যেন অতি ছিমছাম ভদ্রলোক, কিন্তু দেওঘরে এসে তিনি প্রাক্তন নারায়ণগঞ্জের বাড়ির প্রথা চালাতে চান।

আজ সত্যেন উদারভাবে বললেন, নিরু, আমায় গায়ে তেল মাখিয়ে দাও তো!

পুরুষদের স্নানের দৃশ্য বুলার পছন্দ হয় না, তিনি উপরে উঠে যাচ্ছিলেন, সত্যেন বললেন, বড়গিন্নি, দাঁড়াও না, তোমার সঙ্গে তো ভালো করে কথাই হলো না!

বুলা বললেন, না, যাই, দেখি বাপ্পাটা চান করলো কি না। ও তো সহজে চান করতেই চায় না!

দোতলায় এসে বুলা দেখলেন, বারান্দায় একটা আয়না টানিয়ে বাপ্পা একটা শেভিংসেট খুলে দাড়ি কামাতে শুরু করেছে। গায়ের কোটটা সে খুলেছে অবশ্য, কিন্তু জুতোমোজা এখনো ছাড়েনি।

হঠাৎ বুলার হাসি পেল। বাপ্পাকে তিনি আগে কখনো দাড়ি কামাতে দেখেননি। কবে ওর দাড়ি হলো? বছর চারেক আগেও তিনি বাপ্পাকে জোর করে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে দিয়েছেন। সাবান মাখতে ওর খুব আপত্তি, বুলা ওর মুখে সাবান দিলেই চেঁচিয়ে উঠতো, চোখ। জ্বালা করছে, চোখ জ্বালা করছে। মা, ছেড়ে দাও!

সেই ছেলে এখন দাড়ি কামাচ্ছে নিজে নিজে। পাশ থেকে ওকে অবিকল নরেনের মতন দেখায়।

বুলা জিজ্ঞেস করলেন, তুই কবে থেকে শুরু করলি রে, বাপ্পা? কে তোকে শেখালো? বাপ্পা মুখ ফিরিয়ে বললো, এই নিয়ে থার্ড বার। নিজে নিজে শিখেছি। আচ্ছা মা, কাকামণি ওরকম খালিগায়ে চান করে কেন?

–তোদের বিলেতের লোকেরা বুঝি জামা কাপড় পরে চান করে?

–আই মিন, হোয়াই ডাজনট হি ইউজ দা বাথরুম!

–তুই বুঝি আমার সঙ্গেও ইংরিজি বলা প্র্যাকটিস করছিস?

–মা, তুমি ম্যাট্রিকুলেশনে পাশ করেছিলে, তোমার ইংরিজি বোঝা উচিত।

–সে কবেকার কথা, এখন কি আর মনে আছে? তাছাড়া, বুঝি বা না বুঝি, বাবা-মায়ের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতে নেই।

–বাবা, আমার বাবা কি বাংলা বুঝতে পারে?

–বিলেতে গিয়ে তুই-ও বুঝি বাংলা ভুলে যাবি? আমাকেও ভুলে যাবি?

–ভ্যাট! পড়াশুনো শেষ করার পর হোয়েন আই উইল গেট আ জব, তখন আমি তোমাকেও নিয়ে যাবো ইংল্যান্ডে।

একটা তোয়ালে নিয়ে বাপ্পার মুখটা মুছে দিতে দিতে বুলা বললেন, আমি মরতে ও দেশে গেছি আর কি! লেখাপড়া শেষ হলেই তুই ফিরে আসবি এ দেশে। সেই কথা না দিলে আমি, তোকে যেতেই দেবো না!

বাপ্পা দৃঢ়ভাবে বললো, অফ কোর্স আমি ফিরে আসবো। তুমি কি ভেবেছো, আমি ও-দেশে সেটুল করবো? কক্ষনো না!

–এই তো লক্ষ্মী ছেলে, চল বাপ্পা, এইবার চান করে নিবি!

সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পা তিন-চার বছর আগেকার কিশোর হয়ে গিয়ে কাকুতিভরা গলায় বললো, মা, প্লীজ, আজ চান করবো না। আজ ছেড়ে দাও!

–ও কি, এতখানি রেলের রাস্তা এলি, চান করবি না,? তোর গায়ের গন্ধে যে ভূত পালাবে?

–এখন না, তা হলে বিকেলবেলা।

আগেকার দিনের মতন বুলা ছেলেকে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বাথরুমে। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বুলা একটুখানি শুয়েছেন, বাপ্পা গেছে কোথায় টো-টো করে ঘুরতে, নিরু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্নান গলায় বললো, একটা পান!

বুলা বললেন, তুমি পান খাবে? সাজতে জানো তো? ঐ যে মীটসেফের মধ্যে পানের বাটা : আছে, তুমি সেজে নাও। নিরু বললো, কিসের মধ্যে আছে?

–মীটসেফ।

–সেটা কী?

এই তারের জাল ও কাঠের তৈরি জিনিসগুলি অতি সাধারণ, প্রত্যেক বাড়িতেই থাকে, নিরু সেটাও চেনে না! বুলা উঠে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ যে ছোট আলমারির মতন দেখছো, ওটা খোলো, নিজে সেজে নাও।

নিরু বললো, আমার জন্য নয়, উনি পান চেয়েছেন!

বুলার এবার মনে পড়লো যে খাওয়ার পর সত্যেনকে একটি পান সেজে দেওয়া তাঁর নিজের দায়িত্বের মধ্যেই ছিল। সত্যেন কলকাতা থেকে আসবার সময় প্রত্যেকবার ভালো পান নিয়ে আসেন। বুলা নিজের হাতে তাকে পান সেজে দেন।

এবারে বুলা সেটা ভুলে গেছেন। সত্যেনের ঐভাবে খালি গায়ে উঠোনে বসে নিরুকে দিয়ে তেল মাখানোর ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হয়নি। সত্যেন আগে এরকম ছিলেন না, দিন দিন তাঁর স্বভাবে কিছু কিছু কর্কশ দিক ফুটে বেরুচ্ছে।

নিরুর হাতের সাজা পান হয়তো সত্যেনের মনোমতন হবে না, তাই বুলা নিজেই খাট থেকে নেমে এসে দুটি পান সেজে দিলেন।

একটু পরেই নিরু ফিরে এসে বললেন, উনি আমার হাতের পান খাবেন না। আপনেরে দিতে বললেন।

বুলা আবার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। হাতে করে পান পাঠানোটা ঠিক হয়নি। কাঁসার রেকাবিতে সাজিয়ে, সঙ্গে কিছু মশলা, চুন আর বোঁটা দিয়ে পরিপাটি করে দেওয়া উচিত ছিল।

বুলা এবারে সেরকমভাবেই সাজিয়ে বললেন, এবার নিয়ে যাও!

নিরু ম্লানভাবে বললেন, আপনেরে যেতে বলছেন। রাগ করতেছেন আমার ওপর।

বুলা একটু বিরক্ত হলেন। সত্যেনের কোনোরকম বিসদৃশ অভিপ্রায় মানতে তিনি বাধ্য নন, এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন অনেকবার। পান পাঠাবার যখন তোক আছে, তখন বুলাকে যেতে হবে কেন?

কিন্তু নিরুর সামনে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, চলো!

সত্যেন, তাঁর নিজের ঘরের খাটে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বুলাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, ভাত খাওয়ার পর তোমার হাতের সাজা পান পাইনি, তাই সিগারেটেও স্বাদ পাচ্ছি না! এসো বড়গিন্নি, একটুখানি বসো এখানে।

এই বড়গিন্নি ডাকটাও বুলার কাছে অরুচিকর লাগে, কিন্তু সত্যেন কিছুতেই তাঁকে বৌদি বলবেন না। বুলার নাম ধরে ডাকলেও বুলার আপত্তি ছিল না।

বুলা বললেন, এখন বসবো না। ট্রেন জার্নি করে এসেছেন, ঘুমিয়ে নিন, বিকেলবেলা কথা হবে।

–বসো না। আমার ঘুম পায়নি। বাপ্পার সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে না?

নিরু দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠের ওপারে, সত্যেন তার দিকে ভুরুর ইসারা করে বললেন, তুমি এখন যাও!

নিরু চলে যাবার পর সত্যেন সকৌতুক মুখ ভঙ্গি করে বললেন, স্পাই! বুঝলে বড়গিন্নি, বিভা ওকে স্পাই হিসেবে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছে।

বুলা ভুরু কুঁচকে বললেন, ছিঃ, বিভা সম্পর্কে ওরুমভাবে বলছেন কেন? মেয়েটির সব কথা শুনলুমু, বেশ ভালো মেয়ে। সরল।

–তুমিও সরল, কিছু বুঝতে পারো না। বিভা তোমাকে সন্দেহ করে। আমি এখানে এলেই বিভা মনে করে আমি তোমার সঙ্গে ইয়ে করতে আসছি!

অকারণে হা-হা করে হেসে উঠলেন সত্যেন।

সত্যেনের কথাটা হয়তো একবারে মিথ্যে নয়। বুলা সম্পর্কে বিভার বিদ্বেষ দিন দিন বাড়ছে। তার স্পষ্ট কোনো কারণ নেই। বুলা অনেক চেষ্টা করেছেন বিভার মন পাবার, কিছু কাজ হয়নি। বিভার চোখের আড়ালে থাকার জন্যই তো বুলা চলে এসেছেন এখানে।

হাসি থামিয়ে সত্যেন বললেন, হায় রে, তুমি যে আমাকে পাত্তাই দাও না, তা বিভা কিছুতেই বুঝবে না। তোমায় আমি কত তোষামোদ করি, তবু তোমার মন পাই না।

বুলা বললেন, আমার বোধ হয় মন বলে কিছু নেই।

–আছে, আছে, বড়গিন্নি, আমি সব টের পাই। তোমার মন বাঁধা আছে অন্য জায়গায়। আমি যখন এখানে থাকি না, তখন প্রতাপ মজুমদার নামে সেই লোকটা প্রায়ই দেখা করতে আসে তোমার কাছে।

–তার মানে?

–আমি কীরকম খবর রাখি বলো?

হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলো ক্রোধ। সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল তার শিখা। এমন রাগ বুলার বহু দিন হয়নি। বুলা মুখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে যেন কিছু খুঁজতে লাগলেন। কোনো ভারি জিনিস দিয়ে তিনি যেন সত্যেনের মুখে আঘাত করে চিরকালের মতন তার বাকশক্তি শেষ করে দিতে চান।

সত্যেনের অনুপস্থিতিতে প্রতাপদা একবারই মাত্র এসেছিলেন এ বাড়িতে, মাস তিনেক আগে, বিশ্বনাথ গুহ'র সঙ্গে। বিশেষ কিছুই কথা হয়নি। প্রতাপদা সম্পর্কে অনেক কিছু কথা জমে আছে তাঁর বুকের মধ্যে, কিন্তু দেখা হলেই কীরকম যেন জিভ আটকে যায়। কিছুতেই কিছু বলা হয় না। প্রতাপদাও চুপ করে থাকেন। সেদিন এসে বিশ্বনাথ গুহই বকবক করেছেন, প্রতাপদা বসেছিলেন শুকনো মুখে। প্রতাপদার শরীর খারাপ কি না সে

কথা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে পারেননি বুলা। সারা জীবনে হয়তো কোনোদিনই আর প্রতাপদার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যাবে না।

সেই প্রতাপদা সম্পর্কে এরকম অপবাদ?

বুলা তাঁর ক্রোধের দাহ শুধু নিজের শরীরেই রেখে বললেন, ছিঃ!

বুলা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সত্যেন বলে উঠলেন, আচ্ছা, পরে আবার কথা হবে। তুমি একটু নিরুকে পাঠিয়ে দাও তো, বড়গিন্নি। গা-হাত-পায় বড় ব্যথা হয়েছে, নিরু একটু টিপে দেবে!

৪১ পাতিপুকুরের বাড়ির ভিত তৈরির কাজ

পাতিপুকুরের বাড়ির ভিত তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে, রোজ সকালে চন্দ্রার সেখানে যাওয়া চাই। যদিও তার করার কিছুই নেই। যোগেন দত্তর চেনা কন্ট্রাক্টর বাড়ি তৈরির ভার নিয়েছে, সেই লোকটিই জোগাড়ে-মিস্তিরিদের খাটাচ্ছে, তবু চন্দ্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটি কাটা দেখতে দারুণ উত্তেজনা বোধ করে। বাড়ি নয়, যেন ওখানে তার স্বপ্ন তৈরি হচ্ছে।

জলা জমিটার জল সেঁচে ফেলা হয়েছে, মাটি কেটে দুরমুশের কাজ চলছে। চন্দ্রা অতি উৎসাহে নিজেই একবার মাটি কাটার সময় হাত লাগাতে গিয়েছিল। কন্ট্রাক্টর বাবুটি তাকে বাধা দিয়ে বলেছে, অমন করবেন না, ওতে কাজের চেয়ে অকাজ বেশি হবে। এখানে ভিড় জমে। যাবে, আমার মিস্তিরিরা হাসবে।

চন্দ্রা ঐ লোকটির যুক্তি ঠিক ধরতে পারেনি, কিন্তু নিরস্ত হয়েছে। কন্ট্রাক্টরবাবুটি নিজে ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চন্দ্রা দাঁড়িয়ে থাকে রোদে। দু'জনে মিলে মাটি সরাবার কাজে খানিকটা সাহায্য করলে তো কাজ তাড়াতাড়ি হতে পারে।

যেদিন প্রথম ইটের গাঁথনির কাজ শুরু হলো সেদিন চন্দ্রা দ্বারিক ঘোষের মিষ্টির দোকান থেকে মস্ত বড় এক হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে নিয়ে এলো মিস্তিরি-মজুরদের জন্য। সেদিন কন্ট্রাক্টর সুখেন দাস চটে গেল রীতিমতন। চন্দ্রাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেশ ধমকের সুরে বললো, আপনি এসব কী শুরু করেছেন! একটা বাড়ি তৈরি করা ছেলেখেলার কাজ নয়। আপনি আমার লোকজনদের কাজ নষ্ট করে দিচ্ছেন। আপনার রোজ রোজ আসবার দরকারটাই বা কী?

কারুর বকুনি শুনে সহজে মেনে নেবার পাত্রী নয় চন্দ্রা। সে বললো, আমার বাড়ি তৈরি হচ্ছে, আমি আসবো না মানে? কীরকম কাজ হচ্ছে, তা দেখবো না?

সুখেন দাস বললো, কী দেখবেন? আপনি এ কাজ কিছু বোঝেন? পাঁচ ইঞ্চি আর দশ ইঞ্চি দেওয়ালের তফাৎ ধরতে পারবেন! তাও একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় দেখুন, কিন্তু মিস্তিরিদের সঙ্গে কথা বলা, তাদের রসগোল্লা খাওয়ানো, এসব কী?

লোকটির ব্যবহারে উত্তরোত্তর বিস্মিত হয়ে চন্দ্রা বললো, কেন, একদিন ওদের মিষ্টি খাওয়ালে দোষের কী আছে?

সুখেন দাস বললো, এর পর অন্য যেখানে কাজ করতে যাবো, প্রথম যেদিন সিমেন্ট মেশাবে সেদিনই ওরা মিষ্টি খেতে চাইবে। তখন আপনি খাওয়াবেন? তাছাড়া, আপনারা বুঝবেন না, ওরা ছাতুখাওয়া মানুষ, একদিন আপনি রসগোল্লা খাওয়ালে সারাদিন ধরে সেই গন্ধ শুকবে। এরকম করলে কাজ ঢিলে হবে বলে দিচ্ছি।

চন্দ্রার সঙ্গে রতন নামে তাদের সমিতির আর একটি ছেলেও এসেছে সেদিন। রতন বললো, উনি ঠিকই বলছেন চন্দ্রাদি, মিস্তিরিদের লাই দিলেই ফাঁকি মারে। ওদের সব সময় টাইটের ওপর রাখতে হয়।

রতনের হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি। তার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে মিষ্টিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। বাড়ি তৈরির কাজে দেরি হয়ে যাবে শুনেই চন্দ্রা একটু দমে গেছে। সে অসহায় ভাবে বললো, ওদের নাম করে এনেছি, এখন না দেওয়াটা...

সুখেন দাস বললো, ঠিক আছে, এনেছেন যখন, দিয়ে দিন আজকের মতন। ওরাও দেখে ফেলেছে। কিন্তু এমনটি আর করবেন না। আপনার এদিক পানে এখন আর আসবার দরকার নেই, আমার বড্ড ডিসটার্ব হচ্ছে। সামনের মাসে ছাদ ঢালাইয়ের পর না হয় দেখতে আসবেন!

কৈশোর আসার পর চন্দ্রা প্রায় এরকম কোনো পুরুষমানুষকে দেখেইনি, যে তার সঙ্গ পছন্দ করে না। এই লোকটা তাকে আসতে বারণ করছে? মাল-মশলা কিছু ভেজাল দিয়ে টাকা। মারার মতলব আছে নাকি? অবশ্য টাকা দিচ্ছে যোগেন দত্ত, সে অতি ঝানু লোক, সে ঠিক বুঝে নেবে। এই কন্ট্রাক্টরকে যোগেন দত্তই তো নিয়োগ করেছে। এরা এখানে কিছু এদিক-ওদিক করলেও চন্দ্রা তা ধরতে পারবে না। কাজ যে চলছে, সেটা দেখতেই তার ভালো লাগে, সেইজন্যই এখানে আসা।

সুখেন দাসের গোলগাল, নিরীহ চেহারা। এই ক'দিনের মধ্যে একবারও সে সরাসরি তো দূরে থাক চোরাচোখেও চন্দ্রার রূপ লাবণ্য দেখার চেষ্টা করেনি। চন্দ্রার সঙ্গে সে কথা বলে চাঁছাছোলা ভাষায়। সামান্য একটু গদগদ ভাবও কখনো ফুটে ওঠে নি। এরকম মানুষও তা হলে আছে? সুখেন দাস সম্পর্কে চন্দ্রা বেশ কৌতূহল বোধ করে। এই কাজটা হয়ে যাক, তারপর চন্দ্রা একদিন সুখেন দাসের বাড়ি যাবে।

মিষ্টি সুখেন দাসের হাত দিয়েই বিলি করা হলো। সে নিজে একটাও খেল না, চন্দ্রা ও রতনের অনেক অনুরোধেও না। তার ডায়াবিটিস নেই, মিষ্টি খাওয়াতেও কোনো আপত্তি নেই, শুধু রসগোল্লাটাই সে গত বছর পুরীতে জগন্নাথের কাছে উৎসর্গ করে এসেছে।

চন্দ্রার বিস্ময়ের আর কোনো সীমা থাকে না। পুরীতে সে যায়নি কখনো। শুনেছে যে সেখানকার মন্দিরের জগন্নাথ মূর্তিটি কাঠের তৈরি, তার দুটো হাতই নেই। ইট-লোহা-সিমেন্ট নিয়ে যার কারবার, সেইরকম একটি মানুষ ঐ হস্তহীন দারুমূর্তির কাছে সারা জীবনের মতন রসগোল্লা উৎসর্গ করে আসে কিসের তাগিদে? মানুষ কত বিচিত্র! মাত্র পনেরো টাকা দিয়ে এক হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে কত কী জানা যায়। যারা ছাতু খায়, তাদের একদিন রসগোল্লা খাওয়ালে কাজের ক্ষতি হয়!

রতনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চন্দ্রা চলে এলো বাস রাস্তায়। এই যশোর রোডের দু ধারে এক সময় ধনীদের বাগানবাড়ি ছিল। নিশ্চয়ই রাস্তাটাও সুন্দর ছিল এক সময়। এখন সবদিকে নোংরা নোংরা ভাব। রাস্তার পাশের নালা থেকে পাঁক তুলে রাস্তার ওপরেই রাখা হয়েছে, কোনো গাড়ি এসে ঐ পাঁক পরিষ্কার করে নিয়ে যাবে না, বৃষ্টির জলে ধুয়ে আবার নালাতেই জমা হবে। সেই দুর্গন্ধ পাঁকের পাশেই বসে একজন লোক বিক্রি করছে তেলেভাজা বেগুনি-ফুলুরি। ভন ভন করে উড়ছে নীল ডুমো ডুমো মাছি।

কলকাতার মানুষদের এখন এই দৃশ্য গা-সহা। চন্দ্রা বহুদিন প্রবাসে কাটিয়েছে বলে এই নোংরামি দেখতে এখনো পর্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তার কষ্ট হয়।

জীবনের প্রথম সাতাশটি বছর চন্দ্রা অন্যান্য অনেক মেয়ের মতনই ছিল আত্মকেন্দ্রিক। নিজের লেখাপড়া, রূপচর্চা, পুরুষের স্তুতি, খেলা, গানবাজনা এইসব নিয়েই কাটিয়েছে। নিজের পারিবারিক গণ্ডি ও চেনাশুনো মানুষদের ছোট্ট জগৎটিতে সে ছিল সুখী। বিয়ের পর প্রথম দুটি বছর যেন কেটে গেছে চোখের এক নিমেষে। তৃতীয় বছরটি হঠাৎ অহেতুক লম্বা হয়ে যায়। চন্দ্রার জীবনে এতদিন পর্যন্ত কোনো কাঁটা বা কাঁকর ছিল না, তাই সে

বাইরের জগৎটার দিকেও তেমন ভাবে চায়নি। কিন্তু তার বিয়ের চতুর্থ বছরটা আর কোনোক্রমেই কাটতে চাইলো না, তার আগেই সে বেরিয়ে এলো।

হয়তো নিজের জীবনের অসংশোধনীয় কোনো ব্যথাকে চাপা দেবার জন্যই চন্দ্রা অন্যদের। দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য এত মেতে উঠেছে। কিন্তু তার সব কিছুই অন্যদের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের জীবনে কোনোরকম নাটকীয়তা পছন্দ করে না। চোখের সামনে বড়রকম অন্যায় ঘটতে দেখলেও তারা পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। নিজের স্বার্থে সরাসরি আঘাত না লাগলে কেউ মুখ খুলতে চায় না। সেইজন্যই চন্দ্রার অনেক ব্যবহার তাদের দৃষ্টিকটু। লাগে। রাস্তার কোনো নগ্ন পাগলিনীকে দেখে চন্দ্রা যখন চলন্ত গাড়ি থামিয়ে, পাশের দোকান। থেকে একটা শাড়ি কিনে সেই পাগলিনীকে দিতে যায়, তখন তার সঙ্গীদের মনে হয়, এটা যেন। সিনেমা সিনেমা ব্যাপার, যেন চন্দ্রার দ্যাখানেপনা। কেউ কেউ বলেছে, ওকে ঐ কাপড়টা দিয়ে। কী লাভ হলো? একটু বাদেই তো আর একজন কেউ কেড়ে নেবে!

অন্যদের যুক্তি চন্দ্রা ঠিক বুঝতে পারে না, সে অনেকখানিই ইমপালসিভ। চোখের সামনে একটা কিছু দেখলেই সেই মুহূর্তেই তার একটা কিছু করা চাই। চন্দ্রার বাবা চন্দ্রার সব ব্যাপারেই প্রশ্রয় দেন, তিনিও দু-একটি ব্যাপারের পর চন্দ্রাকে বলেছেন, একটু দেখে শুনে চলিস, দু' দিনেই তো সব মানুষের মন পাল্টে দেওয়া যায় না। হুট করে সমাজটাকেও বদলে দেওয়া যায় না।

অন্যদের মতামত চন্দ্রা বিশেষ গ্রাহ্য না করলেও সে তার বাবাকে মানে। বাবার কথা শুনেই সে আজকাল একটু একটু থমকে যায়। নইলে, তার স্বপ্নের প্রমিলা আশ্রমের যে বাড়ি তৈরি। হচ্ছে, সেজন্য সে নিজে মাটি কাটা থেকে সবরকম শ্রমদান করবে ঠিক করেছিল, ঐ কন্ট্রাক্টর সুখেন দাসের কথায় কি সে নিবৃত্ত হতো? কিন্তু সে নিজে মাটি কাটা শুরু করলে নাকি সেখানে রাস্তায় লোকের ভিড় জমে যাবে, তাতে কাজের ক্ষতি হবে, এই যুক্তি শুনেই সে থমকে গেছে। আজকে মজুরদের রসগোল্লা খাওয়ানোর

ব্যাপারেও আপত্তি ওঠায় সে বেশ দুঃখ পেয়েছে। মনে। লোকগুলো অত খাটছে, ওদের একটু উৎসাহ দেবার দরকার নেই?

দুর্গন্ধ পাঁকের পাশে বসে যে লোকটি তোলা উনুনে কড়াই চাপিয়ে বেগুনি ফুলুরি ভাজছে তার দিকে একটুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রা। তারপর সে রতনকে কাতরভাবে বললল, আচ্ছা, ঐ লোকটা কি একটু দূরে সরে বসতে পারে না?

রতন ঐ লোকটিকে লক্ষই করেনি, সে বাসের জন্য তাকিয়েছিল। সে বললো, কোন্ লোকটা?

চন্দ্রা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললো, ঐ লোকটাকে যদি আমি গিয়ে বলি, তুমি অন্তত এই ফুটপাথে এসে বসো, সেটা কি...থাক, আমার বলার দরকার নেই, রতন, তুমি গিয়ে বলো!

রতন এরকম অনুরোধ কখনো শোনেনি। রাস্তার ফেরিওয়ালা-হকাররা পুলিসদেরই গ্রাহ্য। করে না, সাধারণ মানুষের কথা শুনবে কেন? শ্যামবাজার বাজারের কাছে অত ব্যস্ত রাস্তায়। খুচরো সবজিওয়ালারা বাজার ছেড়ে, ফুটপাথ ছাপিয়ে, রাস্তার অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে, কেউ কিছু বলে না।

রতন চন্দ্রার কথাটা একটু বিবেচনা করে তারপর বললো, আপনি বা আমি বললেও ঐ লোকটা শুনবে না। কেন জানেন, চন্দ্রাদি? ঐ খানে বাস স্টপ তো, অনেক লোক এসে দাঁড়ায়, তা ছাড়া গলির মোড়, ওখানে খদ্দের বেশি পাবে।

চন্দ্রা কাতরভাবে বললো, কিন্তু নর্দমা থেকে মাছি উড়ে উড়ে বসছে ওর খাবারে...এটুকুও কেউ বোঝে না!

রতন হেসে বললো, সব সহ্য হয়ে গেছে, বুঝলেন! ঐ খাবার খেয়েও আমাদের দেশের লোক বেঁচে থাকে।

–বেঁচে থাকে, কিন্তু কী ভাবে বেঁচে থাকে? ঐ যে কটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে, ওদের দ্যাখো। পেট মোটা, হাত-পা সরু সরু,

একটা বাস এসে গেছে। রতন বললো, উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন!

এই রাস্তায় কয়েকটি প্রাইভেট বাস চলে। সব সময় ভিড়। মাঝপথে উঠলে বসবার জায়গা পাবার কোনো প্রশ্নই নেই। মেয়েদের জন্য দুটি আলাদা সিট থাকে গেটের কাছেই, মেয়েদের ওঠা-নামায় সুবিধের জন্য। কিছু পুরুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে ওখানেই, ভেতরে জায়গা থাকলেও। একটি লোক খুব সূক্ষ্মভাবে এক পা এক পা সরে এসে চন্দ্রার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তার মুখটা অন্যদিকে কিন্তু হাত দিয়ে সে চন্দ্রার শরীরে একটু একটু চাপ দিচ্ছে।

এসব তো চন্দ্রাকে প্রতিদিনই সহ্য করতে হয়। বাড়ির গাড়ি নিয়ে সে বিশেষ বেরোয় না, তার বাবার কাজে লাগে, চন্দ্রা বাসে-ট্রামে ঘোরা ফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন দু'জন লোক দু'দিক থেকে চেপে ধরে, একটু নড়াচড়াও করা যায় না। কেউ কেউ শুধু গায়ে হাত দিয়েই খুশী হয় না, গোপন অঙ্গ ছুঁতে চায়।

রতন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। চন্দ্রা পাশের লোকটিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা মাঝারি বয়েসী ভদ্রলোক। বেশ হৃষ্ট ধরনের মুখ, দেখলে মনে হয় বিবাহিত এবং সংসারী। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে লোকটি তার একটি হাত চন্দ্রার নিতম্বে রেখেছে।

চন্দ্রার ঠিক রাগ হচ্ছে না, বরং কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। আজকাল সব মানুষেরই ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে করে। এই লোকটি নিজের বাড়িতে কী রকম? স্ত্রীর সঙ্গে ভাব আছে না রোজ খিটিমিটি হয়? এই লোকটি কি অফিসে ঘুষ নেয়? নিজের ছেলেমেয়েদের আদর করে? অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে, কিংবা সোনাগাছিতে যায়? এর বাড়িতে গিয়ে এর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে খুব সাধ হলো চন্দ্রার। কিংবা, এখন যদি

লোকটাকে বলা যায় চলুন, আমরা একসঙ্গে নামি, কোনো পার্কে গিয়ে প্রেম করি, তা হলে সেটাকে কি খুব নাটকীয় মনে। হবে?

লোকটি তার হাতটা একটু একটু করে এগিয়ে আনছে চন্দ্রার কোমরের দিকে। চন্দ্রা লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, একটু সরুন, এবারে আমাকে নামতে হবে। আপনিও নামবেন?

রমণীজাতির প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ভঙ্গিতে লোকটি তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বিনীতভাবে বললো, হ্যাঁ, এই তো, যান।

নেমে গিয়ে চন্দ্রা একটু অপেক্ষা করলো, সেই লোকটিও নামে কিনা দেখবার জন্য। লোকটি মুখ ঝুঁকিয়ে জানলা দিয়ে চার দিকে তাকিয়ে আছে।

রতনের বাড়ি কাছেই, সে ডান দিকে বেঁকে যাবে। বিদায় নেবার আগে সে বললো, চন্দ্রাদি, আমাদের ফাণ্ডে যা টাকা আছে, তাতে বড়জোর ছাদ ঢালাই পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু তারপর জানলা-দরজা বসানো, প্লাস্টারিং এই সবের জন্য আরও তো অনেক লাগবে।

চন্দ্রা বললো, তা তো লাগবেই।

–অসমঞ্জদা বলছিলেন, আর একটা সিনেমার চ্যারিটি শো যদি অ্যারেঞ্জ করা যায়। চন্দ্রা বললো, আবার সিনেমা শো?

এই প্রমীলা আশ্রম তৈরির জন্য বহু জায়গা থেকে চাঁদা তোলা হয়েছে। শ্রী সিনেমা হলের গালকের সঙ্গে অসমঞ্জ রায়ের ভাব আছে, তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ওখানে একটি চ্যারিটি শো-এর। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে চন্দ্রাকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। পুরোনো একটা বাংলা ফিল্ম, তার টিকিট বিক্রি হতে চায় না, চেনাশুনো লোকদের কাছে গিয়ে গছাতে হয়। কেউ কেউ চন্দ্রাকে বলেছে, সকালবেলা সিনেমা দেখতে যাওয়ার

আমাদের সময় কোথায়? টিকিটের দাম কত বলো, আমরা এমনি দিয়ে দিচ্ছি। সে কথা শুনে চন্দ্রার অপমান লেগেছে।

সে বললো, না, আর সিনেমা নয়, এবারে অন্য কোনো উপায় ভাবতে হবে।

বাড়ি ফিরেই চন্দ্রার আবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

দোতলার বারান্দায় একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সুচরিত, তার হাতে একটা ঝুল ঝাড়ু। চন্দ্রার মা তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। বাড়িটা পুরোনো আমলের, সিলিং অনেক উঁচু, কাঠের কড়ি বরগা। ওপরের দিকে কোণে কোণে মাকড়সার জাল জমেছে।

চন্দ্রা দপ করে জ্বলে উঠে বললো, মা, তুমি ছেলেটাকে দিয়ে এই সব কাজ করাচ্ছো? ও কি এ বাড়ির চাকর?

চন্দ্রার মা একটু থতোমতো খেয়ে বললেন, আমার অতদূরে হাত যায় না, তাই আমি ওকে। ডেকে

–কেন, এ বাড়িতে আর কাজের লোক নেই? ও পড়াশুনো ছেড়ে এই কাজ করবে?

–কতক্ষণই বা লাগবে? ও স্নান করতে যাচ্ছিল, তাই আমি বললুম। বাড়িটা কীরকম নোংরা হয়ে আছে।

–ওর দু'দিন বাদে পরীক্ষা...এই সুচরিত, নাম, তুই নাম ওখান থেকে! তুই খবরদার এসব কাজ করবি না! পরীক্ষায় যদি ভালো রেজাল্ট করতে না পারিস, তা হলে কী হবে মনে আছে। তো?

দ্রুত পায়ে চন্দ্রা চলে এলো নিজের ঘরে। হ্যাঁণ্ড ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল খাটের ওপর, তারপর বাথরুমে বেসিনের কাছে গিয়ে জল দিতে লাগলো চোখে মুখে।

সেখান থেকে বাইরে এসে দেখলো মা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। চন্দ্রাকে দেখে তিনি দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

চন্দ্রার মা হিমানীর বয়েস ষাট পেরিয়ে গেলেও শরীরের বাঁধুনি ঠিক আছে। মাথার চুল পাকেনি খুব বেশি, অতিরিক্ত সিঁদুর ব্যবহারে সিঁথিটা চওড়া হয়ে গেছে অনেকখানি। চন্দ্রার সঙ্গে তার মুখের মিল নেই, হিমানীর মুখোনি গোল ধরনের ও ভরাট।

অল্প বয়েস থেকেই চন্দ্রা তার বাবার বেশি আদরের, মায়ের পক্ষপাতিত্ব দাদাদের ওপর বেশি। ইদানীং মায়ের সঙ্গে তার প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। মায়ের ভাবভঙ্গি দেখে চন্দ্রা যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো।

মা খাটের ওপর বসে চন্দ্রার দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর সম্পূর্ণ। অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, সামনের মাসে শিবানীর বিয়ে, তুই শুনেছিস?

চন্দ্রা ভোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছিল, তোয়ালেটা না সরিয়েই বললো, তাই নাকি? শুনিনি। তো। তুমি কী করে জানলে?

হিমানী বললেন, আমাকে চিঠি লিখেছে শিবানী। তোকেও লিখেছে তার মধ্যে। মুখ থেকে তোয়ালেটা সরা!

চন্দ্রা খুব স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললো, কাকে বিয়ে করছে শিবানী?

-সে কথা লেখেনি। শো, সামনের মাসের বারো তারিখ, সেই সময় তুই আবার কোনো কাজ টাজ রাখিস না। আমরা সবাই এলাহাবাদ যাব ঠিক করেছি।

-কিন্তু এখন যে আমাদের প্রমীলা সমিতির বাড়ি উঠছে, এখন আমাকে এখানে না থাকলে তো চলবে না!

-বাড়ি উঠছে তো কী হয়েছে। তুই না থাকলে কি বাড়ি তৈরি বন্ধ হয়ে যাবে?

–টাকা পয়সা জোগাড় করতে হচ্ছে।

–তা বলে শিবানীর বিয়েতে তুই যাবি না? বলছিস কি ছোটু? তুই না গেলে শিবানী:-তোর কী হয়েছে বল তো? তুই ঘরের খেয়ে বনের ঊইস তাড়াবি আর বাড়িতে এসে আমাদের ওপর বকাবকি করবি?

চন্দ্রা এবার বুঝতে পারলো, মা কোন্‌দিক থেকে তাকে প্যাঁচে ফেলতে চাইছেন। শিবানী চন্দ্রার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ওরা একসঙ্গে পড়াশুনো করেছে, শিবানী চন্দ্রাদের দেরাদুনের বাড়িতে এসে থেকে গেছে অনেকদিন। শিবানীর সূত্রেই বিমানের সঙ্গে হিমানীদের পরিচয়। চন্দ্রা নিজেই পছন্দ করে বিমানকে বিয়ে করেছিল। তারপর কেন বিমানের সঙ্গে চন্দ্রার তীব্র মনোমালিন্য হলো, কেন চন্দ্রা ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে এলো তা চন্দ্রার বাবা-মা এখনো ভালো, করে জানেন না। আনন্দমোহন চন্দ্রাকে জোর করে ফেরৎ পাঠাবার কথা উচ্চারণ করেননি একবারও। কিন্তু এবার? বিমানের সঙ্গে যাই-ই হোক না কেন, শিবানীর সঙ্গে তো ঝগড়া হয়নি। চন্দ্রার। এখন শিবানীর বিয়েতে সে যাবে না কেন?

চন্দ্রা একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মায়ের দিকে।

হিমানী আবার বললেন, শিবানী আর ওর দিদি-জামাইবাবু এ মাসের পঁচিশ তারিখে কলকাতায় আসছে বিয়ের বাজার করতে। আমি লিখে দিচ্ছি, ওরা এই বাড়িতেই থাকবে। কী বলিস?

চন্দ্রা দু'দিকে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ, সেই তো ভালো।

–তোকেও যেতে হবে এলাহাবাদ। দেখিস, শিবানী তোকে ছাড়বে না। এখান থেকেই। সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবে।

–ঠিক আছে, ওরা আসুক।

-তোদের সমিতির বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তা আর কেউ দেখবার নেই? তুই একাই সব কিছু করছিস নাকি?

-মা, তুমি যে বললে আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি, তার মানে, আমি কিছু রোজগার করি না, তোমাদের টাকা খরচ করি।

-আমি রোজগারের কথা বলিনি মোটেই! তোর বাবা তো ওষুধের দোকানটায় তোর নামেও শেয়ার রেখেছেন।

-কিন্তু সেটাও তো আমার রোজগার নয়। ঠিক আছে, আমি এবারে একটা কাজটাজ খুঁজছি।

-তুই সব কথায় একটা ব্যাঁকাবাঁকা মানে করিস কেন বল তো ছোটু? এটা মনে রাখবি, তুই নিজেই যে সব কিছু ভালো বুঝিস তা নয়। তুই যে এক্ষুনি ঐ একটা বাইরের ছেলের সামনে আমায় ওরকম মুখ ঝামটা দিলি, সেটা কি ঠিক হলো? একটা অজাত-বেজাতের ছেলেকে একেবারে দোতলায় এনে তুলেছিস।...

-মা, তুমি, তুমি আমাকে জাতের কথা বলছো? বাবা আমাদের কোনোদিন এসব শেখাননি। তুমি যদি এরকম বলো, তা হলে আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো! ও নিচু জাত বলেই তুমি ওকে চাকরের মতন খাটাচ্ছো!

-শোনো মেয়ের কথা! আমার কথা শেষ পর্যন্ত না শুনেই...আমি বলছিলুম, অজাত-বেজাতের ছেলেকে তুই দোতলায় এনে তুললেও আমি কি কোনো আপত্তি করেছি? বাড়ির ছেলের মতনই দেখি। তোর দাদা বুঝি কোনোদিন বাড়ির ঝুল ঝাড়েনি? তোর বাবাকেও তো কতদিন বলেছি। আর ওকে বললেই দোষ?

-ওর এখন পরীক্ষা!

–পরীক্ষা বলেই কি সারাক্ষণ বই মুখে করে রাখবে? নাবে-খাবে না? ও কাজটা করতে কতক্ষণই বা লাগতো? তুই কিন্তু ছেলেটাকে বড় বেশি আস্কারা দিচ্ছিস! এ জগতে কারুকেই এমনি এমনি কিছু দিতে নেই। বিনিময়ে কিছু নিতে হয়, তাহলে সম্পর্কটা ভালো থাকে। ও ছেলে কেমন বিগড়ে গেছে, তুই তো কিছু খবর রাখিস না? একদিন দেখি দারোয়ানদের সঙ্গে বসে বিড়ি খাচ্ছে!

–কে, সুচরিত?

–হ্যাঁ, তোর ঐ পুষ্যিপুত্তুর। কাল তো আরও এক কাণ্ড হয়েছে। দারোয়ানের হাতে ও এক চড় খেয়েছে। দারোয়ানের কোনো দোষ তো আমি দেখি না। চাঁপা গাছটার কাছে একটা মই আছে না, দারোয়ান ঐ সুচরিতকে বলেছিল, মইটা বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে। তা শুনে বাবুর কী চোটপাট! সে দারোয়ানকে বললো, আমি কেন নিয়ে যাবো, আমি কি চাকর? বোঝো! তুই আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়েছিস! ওকে খেতে পরতে দেওয়া হয়েছে, ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে, তার বদলে ও কি বাড়ির কোনো কাজই করবে না? তুই বল!

মায়ের কাছে যুক্তিবাণে হেরে গিয়ে চন্দ্রার চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। মায়ের এইসব কথায় সে প্রতিবাদ করতে পারছে না। তবু একটা প্রতিবাদ জানানোর জন্য সে ফস করে একটা সিগারেট ধরালো।

৪২ কানুর বাড়ির ছাদের আলসেতে

কানুর বাড়ির ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিকলু। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। নিজের বাড়িতে সিগারেট খাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। বসন্ত কেবিন বা বন্ধুদের আচ্ছায় প্রচুর ধোঁয়া ওড়ে বটে কিন্তু রাস্তা দিয়ে একলা হাঁটার সময় পিকলু সিগারেট ধরাতে লজ্জা পায়। হঠাৎ বাড়ির কেউ দেখে ফেলবে সেই আশঙ্কায় নয়, যে-

কোনো অচেনা বয়স্ক লোকের সামনেও সে সঙ্কোচ বোধ করে। কানুর ঘরটা সারা দুপুর খালি পড়ে থাকে, এখানে মাঝে মাঝে এসে শুয়ে থাকে পিকলু।

এখন কানুর সঙ্গে দু'জন লোক দেখা করতে এসেছে, কী সব দরকারি কাজের কথা হচ্ছে ওদের, পিকলু তাই অপেক্ষা করছে বাইরে। নিচের রাস্তায় অবিশ্রান্ত গোলমাল, গাড়ির হর্ন, রিশার হর্ন, ফেরিওয়ালাদের চ্যাঁচামেচি, পিকলু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আকাশ। বিকেলের দিকে প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে কয়েকদিন। আজও আকাশ মেঘে মেঘে প্রায় কালো। মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে একটু একটু নীল দেখা যাচ্ছে যেন এখনও, পিকলু সেই মেঘের আকার নিয়ে খেলা খেলছে মনে মনে। কোথাও দুর্গ, কোথাও পাহাড়, কোথাও সমুদ্রের ঢেউ। মেঘ জমলে আকাশ নিচু হয়ে আসে। নীলাকাশের বিপুল সুদূরের কথা কখন মনে আসে না, মনে হয় যেন মাথার ওপর আর একটা পৃথিবী।

এই আকাশের কোথাও কি আছে স্বর্গ? পিকলু কিছুদিন আগেও ঠাকুর দেবতাদের মূর্তি বা ছবি দেখলে প্রণাম করতো, কলেজে বিজ্ঞান পড়তে এসে সে যুক্তিবাদী ও নাস্তিক হয়েছে। কিন্তু সমস্ত বিশ্ব ভুবনে মানুষ একেবারে নিঃসঙ্গ এ কথা মানতে চায় না তার মন। মানুষ যা দেখেনি তা কল্পনা করতে পারে না। তা হলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আকাশনিবাসী দেব-দেবী বা এঞ্জেল বা ফেরেস্তা, এই সব কল্পনা এলো কী করে? এককালে হয়তো অন্য গ্রহের মানুষ মাঝে মাঝে দেবদূত হয়ে নেমে আসতো পৃথিবীতে, এখন তারা পথ ভুলে গেছে?

কানুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নোক দুটি। ধুতির ওপর হাফ শার্ট পরা, দু জনেরই মুখে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, লোক দুটির ভাবভঙ্গি পিকলুর ঠিক পছন্দ হয় না, কানুকাকা এতক্ষণ ধরে কী। এত কথা বলে এদের সঙ্গে!

লোক দুটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার পর পিকলু জিজ্ঞেস করলো, কানুকাকা, এরা কারা?

কানু বললো, আমার বিজনেসের এজেন্ট। আয়, ঘরের মধ্যে আয়।

খাটের ওপর নতুন একটা সুজনি পাতা। ছোট একটা টেবিল আর দুটো চেয়ারও কিনেছে কান। টেবিলের ওপর একটা বেশ দামি চেহারার রেডিও। রেডিওটা দেখেই পিকলুর চোখ আনন্দ আর বিস্ময়ে চকচক করে উঠলো। কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কবে কিনলে, কানুকাকা?

কানু উৎফুল্ল ভাবে বললো, আজই দুপুরে নিয়ে এলাম। অল-ওয়েভ, বুঝলি? পৃথিবীর যে-কোনো দেশ পাওয়া যায়, বিলেত, আমেরিকা...এই, এই, হাত দিস না!

পিকলু তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললো, একটু চালাও, শুনি।

–দাঁড়া, আগে এরিয়াল টাঙাতে হবে। ঘরে প্লাগ পয়েন্ট করতে হবে, আমার এক বন্ধু সব করে দেবে বলেছে। দুদিন পরে এসে শুনবিতুতুলকে নিয়ে আসিস, ওর তো খুব রেডিও শোনার শখ।।

–তুমি হোল্ডার, তার-টার কিনে আনো, আমি প্লাগ পয়েন্ট করে দিচ্ছি।

–না, না, ইলেকট্রিকের জিনিসে না জেনেশুনে হাত দিতে নেই। আমি ইলেকট্রিশিয়ান নিয়ে আসবো। তুই চা খাবি, পিকলু?

পিকলু মাথা হেলালো।

কানু দু বেলাই হোটেলে খায়। শিয়ালদার দিকে একটু এগোলেই অনেক হোটেল আছে। চায়ের জন্য ছাদ থেকেই হাঁক দিলে রাস্তার উল্টোদিকের দোকান থেকে একটা ছোঁকরা চা দিয়ে যায়, প্রথম প্রথম সেই ব্যবস্থাই ছিল, এখন কানু ঘরেই চায়ের সরঞ্জাম রেখেছে।

খাটের তলা থেকে কানু টেনে বার করলো একটা স্পিরিট স্টোভ, একটা কল্ডে মিল্কের কৌটো, আর দুটো গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের টিনের কৌটোয় চা আর চিনি, একটা সসপ্যান। কুঁজো থেকে খানিকটা জল সসপ্যানে ঢেলে কানু জিজ্ঞেস করলো, তুই স্টোভ জ্বালতে জানিস?

পিকলু হেসে বললো, না। আমাদের বাড়িতে তো স্টোভ নেই!

-শিখে নে। সবই শিখে রাখতে হয়। ভগবান না করুন, আমার মতন তোকেও যদি কোনোদিন একলা থাকতে হয়...

পিকলু কানুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো।

কানু সেই দৃষ্টির মর্ম বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সুর পাল্টে বললো, না, না, তোর বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তা বলছি না। আমি চলে এসেছি আমার ব্যবসার সুবিধে হবে বলে।

-কানুকাকা, মা কালকেও বলছিল কানুর এখানে খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট। রোজ রোজ হোটেলে খাওয়া মোটেই ভালো নয়। কানু রোজ দু' বেলা এখানে এসে খেয়ে গেলেই তো পারে। তুই ওকে বলবি...

-সে কথা হচ্ছে না। খেতে তো যাবোই মাঝে মাঝে। আমি জানি, আমি সারা জীবন বেকার থাকলেও সেজদা আমাকে কোনোদিন তাড়িয়ে দিত না। আমি বলছিলাম, কখন কী অবস্থা হয়, বলা তো যায় না। ধর, যদি তোকে কখনো বাইরে পড়াশুনো করতে গিয়ে মেসে-হস্টেলে থাকতে হয়!

স্টোভটা পাম্প করে তারপর দেশলাই জ্বালাতেই শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগলো। নীল রঙের শওন। সসপ্যানটা চাপিয়ে দিয়ে কানু বললো, এই দ্যাখ না, আমার কাছে যখন তখন ব্যবসার বাইরের লোক আসে, ও বাড়িতে থাকলে অসুবিধে হতো না! তোদেরই পড়াশুনোর ক্ষতি হতো। তবে এই একখানা ঘরেও আমার কুলোবে না। শিগগিরই দু' কামরার একটা ফ্ল্যাট হবে। সেখানে রান্নার ব্যবস্থাও রাখবো। বড়দি সেখানে মাঝে মাঝে এসে থাকতেও পারবে, বড়দির কাছ থেকে রান্নাটা শিখে নেবো।

–পিসিমণির কাছ থেকে তুমি রান্না শিখলে আমরাও মাঝে মাঝে তোমার রান্না খেতে আসবো। পিসিমণি কী দারুণ রাঁধে!

–তোর মা-ও ভালো রাঁধে।

–মার থেকেও পিসিমণির রান্না ভালো। এক এক সময় আমার দুঃখ হয়, পিসিমণিরা কী বিরাট বাড়িতে থাকতেন, আমরা মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম বেশ, এখন পিসিমণিকে কত কষ্ট করে থাকতে হয়, তুতুল: বেচারি ইচ্ছে মতন বাড়ি থেকে বেরুতে পারে না..।

–মালখানগরে আমাদেরও বিরাট বাড়ি ছিল, পিকলু। তোর নিশ্চয়ই মনে নেই। বাড়ি ভরা লোকজন, আমরা কোনেদিন নিজের হাতে এক গেলাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খাইনি।

–হ্যাঁ, আমার মনে আছে একটু একটু। উঠোনটাই তো মস্ত বড় ছিল।

–আমি বুঝতে পারি, সেজদার কেন মেজাজটা প্রায়ই খিঁচড়ে থাকে। এত কষ্ট করে থাকেনি তো কখনো। হ্যাঁ রে, সেজদা এর মধ্যে বাবলুকে আবার মেরেছে? এখন আমি নেই, এখন রাগের কোপটা বেশি পড়বে বাবলুর ওপর। তুই তো সেজদার ফেভারিট ছেলে, তোর গায়ে সেজদা কোনোদিন হাত তুলবে না।

–সত্যি, বাবার ঐ একটা দোষ, রাগলে জ্ঞান থাকে না।

–তা বলে ভাবিস না, সেজদা যে আমায় মারতো, তার জন্য আমি মনে কোনো ঝাঁঝ পুষে রেখেছি। সেজদার মনটা যে ভালো তা তো আমি জানিই। তবে কি, এই সব মানুষ নিজেরাই বেশি দুঃখ পায়। আমি বাবা ঠিক করে ফেলেছি, যেমন ভাবেই হোক, অনেক টাকা পয়সা আমাকে রোজগার করতেই হবে। বড়লোক আমি হবোই। এই যে রিফিউজি বলে সবাই আমাদের দূর দূর ছাই ছাই করে, এটা আমার সহ্য হয় না। এদেশের লোক কথায় কথায়। আমাদের ঠাট্টা করে বলে, কী, ইস্ট বেঙ্গলে তোমার বাপের কত বড়

জমিদারি ছিল? ফেলে এলে কেন? তোকে তোর কলেজের বন্ধুরা বাঙাল বলে ঠোঁট ওল্টায় না?

–নাঃ, সেরকম কেউ করে না, তবে, দু একজন আছে।

–তুই পাস-টাস করে দাঁড়ালে সেজদার কাঁধের বোঝা অনেকটা কমবে। তুই মন দিয়ে পড়াশুনো কর, পিকলু। তুই নাকি টিউশানি করছিস? ওটা ছেড়ে দে, তোর যা হাত খরচ লাগে আমি দেবো। তোর ওপর আমাদের অনেক ভরসা।

জল গরম হয়ে গেছে, তাতে চা ফেলে দিয়ে ঢাকনা চাপা দিল কানু। কাপ নেই, গেলাসে খেতে হবে, চিনির কৌটোটা খুলে দেখা গেল তার মধ্যে থিক থিক করছে পিঁপড়ে। কৌটোটা মাটিতে ঠুকে ঠুকে কিছু পিঁপড়ে তাড়ানো হলেও তবু সব যায় না।

কানু চামচে করে দু চারটে পিঁপড়ে শুদ্ধ চিনি তুলে বললো, ওতে কিছু হবে না। পিঁপড়ে খাওয়া ভালো, সাঁতার শেখা যায়। তোরা তত সাঁতার-ফাতার শিখলি না। আমার গরম লাগলে আমি রাত্তিরের দিকে কলেজ স্কোয়ারে নেমে এক পাক সাঁতার কেটে আসি। মালিদের মাঝে মাঝে দু চার আনা ঘুষ দিই, কিছু বলে না।

কানুর এই রকম জীবনযাপন বেশ পছন্দ হয় পিকলুর। কানুকাকা সম্পূর্ণ স্বাধীন, যা খুশী করতে পারে। মা-বাবাকে পিকলু খুব ভালোবাসলেও সম্পূর্ণ একলা একলা জীবন কাটাবার এই ছবি তাকে মুগ্ধ করে।

চায়ের স্বাদটাও অপূর্ব লাগলো। একটু ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ আছে বটে তবু এমন চা'যেন পিকলু কোনোদিন খায়নি আগে।

গেলাস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কানু বললো, তোর গরম লাগছে না? এবার একটা পাখা কিনতে হবে। চল, বাইরে দাঁড়িয়ে চা-টা খাই।

কানুকাকা রেডিও কিনেছে, এই বাড়ি ছেড়ে অন্য বড় ফ্ল্যাটে উঠে যাবার কথা ভাবছে, গরম লাগলেই ফ্যান কেনার কথা ভাবে। প্রত্যেকবার এখানে এলেই একটা না একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ে। ব্যবসা করলে এত তাড়াতাড়ি টাকা রোজগার করা যায়? পিকলু ব্যবসার ব্যাপারটা তেমন বোঝে না, তবে এটা সে বোঝে যে যে-কোনো কাজেই উন্নতি করতে গেলে বুদ্ধি লাগে, কানুকাকার তো তা হলে বেশ বুদ্ধি আছে। কানুকাকা লেখাপড়ায় ভালো ছিল না, তা হলে দেখা যাচ্ছে লেখাপড়ার সঙ্গে বুদ্ধির সব সময় সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

আকাশে মেঘ অনেক গাঢ় হয়ে এসেছে। এর পর যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। অদ্ভুত একটা নরম আলো হয়েছে এখন।

কার্নিসের পাশে এসে কানু বললো, পিকলু, ঐ হলদে রঙের বাড়িটার ছাদের দিকে দ্যাখ। ঐ যে, যে বাড়ির পাঁচিলে দুটো কাপড় শুকোচ্ছে। দেখতে পাচ্ছিস?

সেদিকে তাকিয়ে পিকলু শুধু লজ্জা পেল না, একটু শঙ্কিতও বোধ করলো। মীজাপুরের এই বাড়িতে এসে কানুকাকার চরিত্রে একটা নতুন জিনিস যোগ হয়েছে, প্রায়ই বেশ অসভ্য কথা বলে। জিভে কোনো আড় নেই, অবলীলাক্রমে বলে যায়। তা হলে নিশ্চয়ই নতুন শেখেনি, আগেও বাড়ির বাইরে বলতো। পিকলু খারাপ কথা, আদিরসের শ্ল্যাং একেবারে সহ্য করতে পারে না। তার বন্ধুদের ছোট গোষ্ঠীর মধ্যেও এ ব্যাপারে কড়া নিয়ম আছে। বন্ধুদের মধ্যে একজনই শুধু কথায় কথায় বাঞ্চোৎ, মাজাকি, বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবো, এই সব বলতো। এখন রুল জারি করা হয়েছে যে সে ঐ রকম কিছু একটা বলে ফেললেই তাকে এক কাপ চায়ের দাম ফাইন দিতে হবে। বাবলু পাশের বস্তির ছেলেদের কাছে শিখে বাড়িতে একদিন শালা বলেছিল বলে পিকলু তার কান মুলে দিয়েছিল। কিন্তু কানুকাকাকে তো সেরকম ভাবে শাসন করা যায় না।

কানু আঙুল তুলে বললো, দুটো মেয়ে ঘুরছে, একজন ফ্রক পরা, আর একজন নীল শাড়ি, ঐ দ্যাখ দ্যাখ, এদিকেই তাকিয়েছে, ওদের মধ্যে কোন বেশি সুন্দরী বল্ তো?

পিকলুর মনে হলো, দুটি মেয়েকেই দেখতে তুতুলের মতন। তুতুলের কথা মনে পড়া মাত্র। সে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বললো, জানি না।

কানু বললো, দু জনের প্রায় কাছাকাছি বয়েস হলেও ওরা কিন্তু দুই বোন নয়। ঐ ফ্রক পরা মেয়েটা হচ্ছে শাড়ি পরা মেয়েটির মাসি। হে-হে-হে-হে! সত্যি বলছি! বিকেলবেলা ছাদে দাঁড়ালেই ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। তুই হিড়িক দেওয়া কাকে বলে জানিস? ভেবেছিলুম, মেয়ে দুটোর সঙ্গে কিছুদিন একটু হিড়িক দেবো। কিন্তু ওমা, তার আগেই একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

চায়ের গেলাসটা নামিয়ে রেখে কানু পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললো, তুই চার্মিনার খাস কেন, ওতে ঠোঁট কালো হয়ে যায়। দেখবি, পরে মেয়েরা তোকে পাত্তা দেবে না। ভালো সিগারেট খাবি, এই নে, প্যাকেটটা তোর কাছেই রাখ।

দু জনে দুটি সিগারেট ধরাবার পর কানু বললো, একদিন এই পাড়ার এক ভদ্রলোক নিজে যেচে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলো। এ কথা সে কথার পর বুঝলুম, ভদ্রলোক ঐ নীল শাড়ি পরা মেয়েটির বাপ। ভদ্রলোকের মোট পাঁচ মেয়ে, এর আগে চার-চারটি মেয়ের বিয়ে, দিয়ে প্রায় ফৌত হয়ে গেছে, এখন ঐ পাঁচ নম্বর মেয়েটিকে ঘাড় থেকে নামাতে চায়। আমার সম্পর্কে সেই জন্য ইন্টারেস্টেড। আমি ঘাড়টি হেলালেই বিয়ের শানাই বাজতে পারে, বুঝলি?

–মেয়েটি লেখাপড়া করে না?

কানু দরাজ গলায় হেসে উঠে বললো, জানতুম, তুই ঠিক এই কথাটা জিজ্ঞেস করবি। কোন বংশের ছেলে তা দেখতে হবে তো! আরে, আমি নিজে আই এ ফেল। আমি কি আর এম এ, বি এ পাস মেয়ে বিয়ে করতে পারবো? ঐ মেয়েটা ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছে, ও-ই যথেষ্ট।

–কানুকাকা, তুমি এর মধ্যেই বিয়ে করবে?

–এর মধ্যে কী বলছিস, আমার বয়েস প্রায় থার্টি হতে চললো। হ্যাঁ, আমি বিয়ে করবো ঠিক করে ফেলেছি, সেটা আজ হোক বা ছ' মাস বাদেই হোক। একা থাকতে আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আমি আমার বংশের ধারা মেইনটেইন করতে চাই। হুট করে অন্যের কথায় নেচে উঠে একটা বেজাতের মেয়েকে বিয়ে করা, ওসব আমার দ্বারা হবে না। আমার মাথার ওপর দাদা-বৌদি আছে, বড় দিদি আছে, তাদের মত না পেলে কিছু হবে না, সে কথা আমি বলে দিয়েছি ভদ্রলোককে। এ ছাড়া আমি খোঁজ নিয়েছি, ওরা আমাদের পাল্টি ঘর। ওরা হলো ঘোষ, না, না, গয়লা নয়, গয়লা নয়, কায়স্থ। ওরা ঘটি, সেটা একদিক থেকে ভালোই, আমি ঘটিদের সমাজে ঢুকতে চাই। আমি মনে মনে ঠিক করেই রেখেছি, ঘটিদের বাড়ির কোনো মেয়েকে বিয়ে করবো, করিচি, খেয়িচি, এলুম, গেসলুম এই রকম কথা বলবো, কোনো শালা যাতে আমাকে আর বাঙাল বলে হ্যাঁটা না করতে পারে।

কানুকে আজ কথায় পেয়েছে, সে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। পিকলু আবার হলুদ বাড়িটার দিকে আড় চোখে তাকালো। মেয়ে দুটি বোধ হয় ভেতরের কথা জানে, তারাও ঘুরতে ঘুরতে। এদিকে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। পিকলুর এখনো মনে হচ্ছে মেয়ে দুটিকেই দেখতে তুতুলের মতন।

কানু বললো, এখন কোশ্চেন হচ্ছে, কোন্ মেয়েটিকে? আমার ওই ফ্রক পরা মেয়েটিকেই বেশি পছন্দ। ফ্রক পরা বলে ভাবিস না বাচ্চা, মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। ভদ্রলোক চায় তার নিজের মেয়েকে আগে পার করতে।

পিকলু দুঃখিত স্বরে বললো, কানুকাকা–

–কী রে, কী বলছিস?

–মেয়েরা কি বিড়ালের বাচ্চা যে তুমি পার করার কথা বলছো?

–ওঃ হো-হো, তুই তো আবার...এই রকমই হয়, আর একটু বড় হলে বুঝবি। থাক, আমি আপাতত সেটুল করেছি, শাড়ি পরা মেয়েটি হলেও আপত্তি নেই, ওর ফ্রক পরা মাসি তো ঐ বাড়িতেই থাকবে, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে হিড়িক মারা যাবে। গাছেরও খাবো, তলারও কুড়োবো। হে-হে-হে-হে।

হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি আসায় ওরা চলে এলো ঘরের মধ্যে। পিকলু জুতো-মোজা খুলে রেখেছিল, সেগুলো পরে নিয়ে বললো, কানুকাকা, এবারে আমি চলি। অলরেডি দেরি হয়ে গেছে।

–এই বৃষ্টির মধ্যে যাবি কী করে। একটু বসে যা। শোন পিকলু, সেজদার সামনে দাঁড়াতে আমার সাহস হয় না। তোকেই তোর বাবার কাছে আমার বিয়ের প্রসঙ্গটা পাড়তে হবে।

–আমি? বাবাকে আমি বলবো?

–তুই সেজদাকে যা বলবি সেজদা তাই-ই শুনবে। তুই তো সেজদার নয়নের মণি! যাকগে, তুই যদি সরাসরি না বলতে পারিস তোর মায়ের গ্লু দিয়ে বল। আমি মাস ছয়েকের মধ্যেই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতে চাই। ওরা সোনাদানা মোটামুটি দেবে, বিয়ের খরচাপাতিও দেবে।

–তা হলে শিগগিরই আমাদের একটা কাকিমা হচ্ছে?

–শুধু কাকিমা কেন রে, দু' চার বছরের মধ্যেই দেখবি খুড়তুতো ভাই-বোন। আমি ঠিক করে রেখেছি, বিয়ের পরে পরেই দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে। ব্যাস, তার বেশি আর চাই না!

বৃষ্টি পুরোপুরি থামবার আগেই পিকলু বেরিয়ে পড়লো সেখান থেকে। এতক্ষণ ধরে কানুকাকার বিয়ে সম্পর্কে কথাবার্তা তার মনকে বেশ নাড়া দিয়েছে। পৃথিবীর যেকোনো নারীকেই সে শূন্যের ওপর একটা সিংহাসনে বসিয়ে দেখতে চায়। কোনো রমণীর

একটুখানি হাসি, একবার পাশ ফিরে তাকানো, হঠাৎ কথা বলতে বলতে থেমে যাওয়া, এই সবই যেন দারুণ দুর্লভ কিছু পাওয়ার মতন। আর কানুকাকার কাছে মেয়েরা যেন জল-ভাতের মতন অতি সাধারণ। এখনো বিয়ের কোনো ঠিকই নেই, এর মধ্যেই দু তিনটি ছেলেমেয়ের কথা ভাবছে। শেষের এই কথাটাতেই পিকলু যেন প্রায় শারীরিকভাবে ব্যথা পেয়েছে।

শিবেনের সেই বন্ধু এখনো তুতুলকে বিয়ে করার আশা ছাড়েনি। থানায় খবর দেবার পর ওদের উপদ্রব খানিকটা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু দূর থেকে এখনো ওদের উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা যায়। তুতুলকে একলা বেরুতে দেওয়া হয় না বাড়ি থেকে। তুতুল,কলেজে ভর্তি হবার আগে ঐ বাড়ি বদল করতেই হবে।

সারা রাস্তা তুতুলের কথাই ভাবতে ভাবতে এলো পিকলু।

বাড়ি ফিরে সে মমতাকে ডেকে বললো, মা, কানুকাকা আজ তোমাদের একটা কথা বলতে বলেছে।

মমতা বাধা দিয়ে বললেন, তুই কানুর কাছে বুঝি রোজই যাওয়া শুরু করেছিস? তোর বাবা শুনে একদিন রাগ করছিল। কানুর কোনো জিনিস-টিনিস দিলে নিবি না।

-আহা, শোনোই না কথাটা। কানুকাকা বিয়ে করতে চায়।

-অ্যাঁ? এর মধ্যেই বিয়ে করবে? সবে তো ব্যবসা শুরু করেছে, দু চার বছর না গেলে কি। ব্যবসার কিছু বোঝা যায়? কোথায় বিয়ে করছে?

-ও বাড়ির, কাছেই মেয়ের বাবা এসে কানুকাকার কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন। মমতা তাড়াতাড়ি ডেকে আনলেন সুপ্রীতিকে। সুপ্রীতি কিন্তু সব শুনে খুশীই হলেন। তিনি বললেন, তা হলে তো বলতে হবে ছেলেটার সুবুদ্ধি হয়েছে। বয়েস কালের ছেলে, ওরকম

একলা একলা থাকা মোটেই ভালো নয়। মতিচ্ছন্ন হতে তো আর দেরি লাগে না। মেয়েটির বয়েস কত, বাড়ির অবস্থা কী রকম? মেয়ে একবস্ত্রে আসছে না তো?

কানুর মুখ থেকে পিকলু যা শুনেছে সবই খুলে বললো, শুধু সে যে ছাদ থেকে মেয়েটিকে দেখেছে তা জানাতে তার লজ্জা করলো। সুপ্রীতি বললেন, তা হলে তো খোকনকে আজই জানাতে হয়। এ সব কাজে দেরি না করাই ভালো।

পিকলু এই সন্ধেবেলাতেও একবার স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢুকে গেল। এই রকমভাবে বিয়ের আলোচনা করায় তার কেমন যেন নোংরা নোংরা লাগছে। বাথরুমের কল খুলে দিয়ে সে আবার কল্পনায় দেখতে পেল শূন্যে সিংহাসন-আরূঢ়া এক দেবীকে, মুখোনি ঈষৎ ফিরিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে, সেই মুখ কিন্তু তুতুলের নয়, অচেনা, রহস্যমাখা, সেই মুখ তার কাছে সমস্ত নারী জাতির প্রতীক।

প্রতাপ বাড়ি ফেরার পর মমতা আর সুপ্রীতির ডেলিগেশন গেল তাঁর কাছে। প্রতাপ চুপ করে সব শুনলেন, তারপর উদাসীন ভাবে বললেন, সে বিয়ে করতে চায়, ভালো কথা।

করুক। আমাদের মতামতে কী আসে যায়! সে তো এখন স্বাধীন।

সুপ্রীতি বললেন, না রে খোকন, কানু ছেলে খারাপ নয়। আমাদের খুব মানে। সে কন্যেপক্ষকে বলেছে, আমার দাদা-বৌদি আছে, বড় দিদি আছে, তাদের মতামত ছাড়া কিছু হবে না। পিকলুকে ডাকবো, সব শুনবি?

প্রতাপ হাত তুলে বললেন, না, ওকে ডাকার দরকার নেই। কানু পিকলুর সঙ্গে এই সব বিষয়ে আলোচনা করে, তাও আমার পছন্দ নয়। কেন, সে নিজে এসে বলতে পারলো না?

–আসবে, দু একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আসবে। ও তো মাঝে মাঝেই দুপুরের দিকে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যায়।

–কানুর মামারাই তো আছে, তাদের কাছে গেলেই পারে। তারাই ব্যবস্থা করবে।

–এ তুই কী বলছিস, খোকন? বিয়ের চিঠিতে তো তোর নাম থাকবে। মামাদের নামে কখনো বিয়ে হয়? তা হলে কানুকে খবর পাঠাই, পাত্রীর বাবা এসে একদিন তোর সঙ্গে দেখা করুক?

শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিলেন প্রতাপ।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে তিনি মমতাকে বললেন, কানুর মামাদের তোমার মনে আছে।

মমতা বললেন, সেই কবে শিউলির বিয়েতে একবার গিয়েছিলাম। তারপর তো আর...মা কলকাতায় এলেও তো ওঁরা কেউ দেখা করতে আসেন না।

প্রতাপ বললেন, আমি গত সপ্তাহে নিজেই একবার মেজোমামার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওঁর হাঁটুতে খুব বাত, হাঁটা চলা করতে পারেন না প্রায়। উনি বললেন, কানু ওঁদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখে না। আমি কানুর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েছিলুম, ওঁরা কোনো আগ্রহ দেখালেন না। ওঁরা কোনো দায়িত্ব নিতে চান না।

--কানু তো কোনোদিনই মামাদের তেমন পছন্দ করে না। ঐ মেজোমামার বউ নাকি এক সময় কানুকে খুব কষ্ট দিয়েছে।

–তবু ওঁরা কানুর নিজের মামা। কানু আমার কোনো কথা গ্রাহ্য করে না, ইচ্ছে মতন যা খুশী করছে, তা হলে আমি ওর বিয়ের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবো কেন?

–কানু আলাদা হয়ে গেছে বলে তুমি এত রাগ করছো কেন? ও যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেটাই তো ভালো। ওর বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসারী করা তোমারই দায়িত্ব।

দায়িত্ব, হুঁ।

প্রতাপ উঠে বসে আর একটা সিগারেট ধরাতে গেলেন। মমতা বললেন, তুমি আজকাল বড্ড বেশি সিগারেট খাচ্ছো। একটু কমাও। রাত্রে তোমার কাশি হয়।

প্রতাপ তবু সিগারেট ধরালেন। তারপর গোঁজ মুখে বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যখন দায়িত্বের কথা বলছে, তখন ওর বিয়ের ব্যাপারে আমার যেটুকু সাধ্য তা আমি করবো। কিন্তু। একটা কথা তোমাদের আগে থেকেই বলে রাখছি। কানুকে যদি হঠাৎ কখনো পুলিসে ধরে তখন কিন্তু আমি ওকে ছাড়াতে যাবো না। তখন তোমরা আমাকে অনুরোধ করো না।

৪৩ পাড়ার কয়েকটি ছেলে ধরাধরি করে

পাড়ার কয়েকটি ছেলে ধরাধরি করে সুচরিতকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। স্কুল থেকে টিফিনে বেরিয়ে সে সিকদার বাগানের ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতে শুরু করেছিল। ঐ পাড়ার কিছু ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা ছেলে এখনো স্কুলে পড়ে, তারা নিয়মিত দাড়ি গোঁফ কামায়, ফেল করে এক ক্লাসে দু বছর থাকে। অন্য ছেলেরা ভয়ে তাদের কাছ ঘেঁষে না, সুচরিত তাদের সঙ্গে পারবে কেন? তা ছাড়া, সুচরিত নাকি ফস করে পকেট থেকে একটা ছুরি বার করেছিল। তাই দেখে তিন-চারটি ছেলে একসঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, হাত মুচড়ে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে বেধড়ক পেটায়। ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়নি, সুচরিত ঐ ছেলেগুলোর হাত থেকে কোনোক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়েছে।

চন্দ্রা বাড়িতে নেই। তাঁর বাবা আনন্দমোহন তক্ষুনি নিজের গাড়িতে সুচরিতকে নিয়ে গেলেন আর জি কর হাসপাতালে। তিনি একটি বড় ওষুধের দোকানের মালিক বলে

অনেক ডাক্তারই তাঁকে চেনে, এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে তিনি বিশেষ খাতির পেলেন। সুচরিতের আঘাত সেরকম গুরুতর নয়, সারা-শরীর কেটে ছিঁড়ে গেছে, দুটি দাঁত ভেঙেছে আর বাঁ পায়ের গোড়ালির হাড়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে। উৎকণ্ঠিত আনন্দমোহন অনেকক্ষণ পর সহজ নিঃশ্বাস ফেললেন। সুচরিতের অবস্থা দেখে তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। অন্যের ছেলেকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, হঠাৎ যদি চরম কিছু হয়ে যেত, তা হলে ওর বাবা-মায়ের কাছে কী করে জানানো হতো সেই খবর!

সুচরিত অবশ্য একবারও জ্ঞান হারায় নি, যন্ত্রণায় গুঙিয়েছে একটু একটু, কিন্তু আনন্দমোহন বা ডাক্তার-নার্সদের কোনো জিজ্ঞাসারই উত্তর দেয় নি। একজন হাউস সার্জন তো বলেই উঠলো একবার, ও, ছেলে বটে একখানা! সেই কালু গুণ্ডাকে দেখেছিলুম, পেটের নাড়িভুড়ি হাতে চেপে ধরেছিল, আর এই দেখছি!

হাসপাতালে রেখে লাভ নেই, ড্রেসিং ও ব্যাণ্ডেজের পর আনন্দমোহন সুচরিতকে বাড়িতেই নিয়ে এলেন সন্ধেবেলা। ফেরার সময় সুচরিতকে আর শুইয়ে আনতে হলো না, সে বসে রইলো প্যাট প্যাট করে চোখ মেলে তাকিয়ে। আনন্দমোহন সামান্য রসিকতা করে বললেন, এবার থেকে তোকে আমি কালুগুণ্ডা বলে ডাকবো! পকেটে ছুরি রেখেছিলি কেন, অ্যাঁ?

সুচরিত কোনো উত্তর দিল না।

আনন্দমোহন আবার বললেন, আর যদি এক ইঞ্চি বেশি চলে যেতিস গাড়ির তলায় তাহলে তোকে এতক্ষণে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে শ্মশানে নিয়ে যেতে হতো।

সুচরিত এবারও কিছু না বলে চোখ নিচু করলো।

চন্দ্রা এখনো ফেরে নি। আনন্দমোহন আজ আর দোকানে গেলেন না। তাঁর নিজেরও শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। হাসপাতালের পরিবেশ তাঁর সহ্য হয় না। চন্দ্রার মা গজগজ

করছেন, মেয়ের সব রকম পাগলামিতে বাপের প্রশ্রয়ের জন্য কথা শোনাচ্ছেন বিধিয়ে বিধিয়ে, আনন্দমোহনের মুখে যে একটা রুণ ছাপ পড়েছে তা তিনি এখন লক্ষ করছেন না। বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে আনন্দমোহন ভাবলেন, এবারে একটা উইল করাতে হবে, আর দেরি করা বোধ হয় ঠিক নয়।

চন্দ্রা কোনদিন কখন ফেরে তার ঠিক নেই। আনন্দমোহনের ঝিমুনি আসছে, তবু তিনি বিছানার ধারের জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই জানলা দিয়ে সদর পর্যন্ত দেখা যায়।

প্রায় সাড়ে ন'টার সময় গেটের সামনে একটি ট্যাক্সি থামলো। কেউ চন্দ্রাকে পৌঁছে দিতে এসেছে, ট্যাক্সি থেকে নেমেও চন্দ্রা কথা বললো একটুক্ষণ। আনন্দমোহন স্ত্রীকে বললেন, মেয়েটাকে আগেই কিছু বলতে যেও না, আগে এসে হাত-মুখ ধুক, জামাকাপড় ছাড়ুক, তারপর যা বলার আমিই বলবো!

চন্দ্রার মা জানলার দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐ দ্যাখো!

চন্দ্রা দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলছে। তারপরই সে ছুটে এলো বাড়ির দিকে। দারোয়ানই যা বলার বলে দিয়েছে।

আনন্দমোহন খাট থেকে নেমে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন। চন্দ্রার চোখ মুখের অবস্থা এমনই যে সে যেন মৃত্যুশয্যায় সুচরিতকে শেষ দেখা দেখতে পাবে কি না এই অনিশ্চয়তা নিয়ে আসছে। তার পরনে একটা পাতলা ফিনফিনে সিল্কের শাড়ি, বিশেষ সাজগোজ করে সে আজ কোথাও গিয়েছিল।

আনন্দমোহন বললেন, তুই বেশি ব্যস্ত হসনি, খুকী। সুচরিত ভালো আছে। আমি নিজে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলুম।

–বাবা, ও বাঁচবে তো?

–আমি তো বলছি, ও ভালো আছে। পার্মানেন্ট ড্যামেজ কিছু হয় নি। এখন ঘুমোচ্ছে। চন্দ্রা তার বাবাকে বিশ্বাস করে। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সুচরিতের ঘরের দিকে একবার তাকালো। তারপর বললো, ওকে পাড়ার ছেলেরা সাংঘাতিক মেরেছে, তোমরা পুলিসে খবর দাও নি?

চন্দ্রার মা বললেন, পুলিসে খবর দিলে পুলিস তো আমাদেরই এসে হয়রান করবে। তোর ঐ গুণধরই তো ছুরি দিয়ে অন্যদের মারতে গিয়েছিল। দিন দিন গুণ্ডা হচ্ছে, তুই কিছু দেখিস না!

চন্দ্রা অস্ফুট গলায় বললো, ছুরি? তারপর সে বাবার দিকে তাকালো। আনন্দমোহন তাঁর স্ত্রীর কথার কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

চন্দ্রা হঠাৎ কেঁদে ফেললো। সে সুচরিতকে আর দেখতে গেল না, দৌড়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

বিছানায় আছড়ে পড়ে সে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। চন্দ্রার ভাবপ্রবণতা ইদানীং প্রায়ই অতিরিক্ত হয়ে উঠছে। সে যেন সব সময়ই কিছু না কিছুর সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে এবং কোনোটাতেই সে হার সহ্য করতে পারবে না। আজ এক্ষুনি যেন তার বড় রকমের একটা হার হয়েছে।

রিফিউজি কলোনি থেকে সে সুচরিতকে নিজের বাড়িতে এনে আশ্রয় দিয়েছিল প্রায় জেদ করে। হারীত মণ্ডল তার স্ত্রী ও অন্য পুত্র কন্যাদের নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে বাংলার বাইরে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে। সুচরিত পড়াশুনো করতে চেয়েছিল। সে ছিল শান্ত, লাজুক স্বভাবের ছেলে, সে যে কখনো কারুর সঙ্গে মারামারি করতে পারে ভাবাই যায় নি। তার পকেটে ছুরি?

এখন সবাই এসে চন্দ্রাকে বলবে, দেখলে, দেখলে, আমরা আগেই বলেছিলুম না!

কেউ বলবে, খুনীর ছেলে কখনো লেখাপড়া শিখতে পারে? কেউ বলবে, জলবিছুটির চারা। গোলাপ বাগানে এনে পুঁতলে কি তাতে গোলাপ ফোটে? অসমঞ্জ রায় শ্লেষের সঙ্গে বলবেন, আমি সেই জন্যই তো প্রথম থেকেই পাত্তা দিইনি, তুমি তখন আমার কথা শুনতে চাইলে না, এখন বুঝলে তো?

সবাই বলবে, চন্দ্রা, তুমি হেরে গেছো, তোমার সিদ্ধান্ত ভুল।

খানিক বাদে দরজাটা সামান্য ঠেলে আনন্দমোহন বাইরে থেকে ডাকলেন, খুকী!

চন্দ্রা উঠে বসে চোখ মুছলো। তার মনে পড়লো অন্য কথা। কয়েক দিন ধরে তার মা বাবা। তার সম্পর্কে বেশি উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছেন। দু তিনদিনের মধ্যেই এলাহাবাদ থেকে এসে পড়ছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, তার স্বামীর বোনের বিয়ে উপলক্ষে চন্দ্রাকে এলাহাবাদ পাঠাবার ব্যাপারে সবাই খুব উৎসাহী। ঐদিকে চন্দ্রার আর একটা লড়াই ঘনিয়ে এসেছে। এতদিন বাবা কিছুই বলেন নি, এখন বাবাও চলে গেছেন অন্যদিকে?

আনন্দমোহন বললেন, তুই ছেলেটাকে একবার দেখতে গেলি না? নিজের চোখে দেখলে বুঝতি ওর তেমন সীরিয়াস কিছু হয় নি।

চন্দ্রা তীব্র চোখে চেয়ে বললো, বাবা, ও সত্যিই পাড়ার ছেলেদের ছুরি মারতে গিয়েছিল? আনন্দমোহন বললেন, তাই তো শুনলুম। বোধ হয় পেন্সিলকাটা ছুরি!

–বাবা, আমি আর ওর মুখ দেখতে চাই না! তোমরা ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও, যা খুশী করো!

আনন্দমাহন ক্ষীণ হেসে বললেন, পাগল! ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা উঠছে কিসে? কেউ কিছু বলেছে?

–না, আমি ওকে রাখতে চাই না। ওকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও!

–কী বলছিস পাগলের মতন! ওকে কোথায় তাড়িয়ে দেবো? ওর কি কোনো যাবার জায়গা আছে? ওর বাবা-মা যে কোথায় গেল, কোন ক্যাম্পে আছে তা কিছুই জানা গেল না। একটা চিঠিও দেয় নি এতদিনে।

–ও সব কিছু জানি না আমি। ও যেখানে খুশী চলে যাক।

–এই তো তোর পাগলামি। সব কিছুই ঝোঁকের মাথায় করিস। ছেলেটাকে যখন হুট করে নিয়ে এলি তখনও সব দিক ভেবে দেখিস নি। এখন আবার বলছিস ওকে চলে যেতে। মানুষের জীবন নিয়ে কি এরকম ছিনিমিনি খেলা যায়?

–বাবা, ওকে এনে আমি কি ভুল করেছিলুম? তখন তুমি কিছু বলো নি তো?

–ভুল কি ঠিক তা আমি জানি না। একটা ছেলেকে লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিস, তাতে আমি আপত্তি করবো কেন? এ বাড়িতে জায়গার অভাব নেই, একটা ছেলে থাকবে-খাবে, এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু ও আগে বাবা-মাকে ছেড়ে কখনো থাকেনি, এ বাড়িতে ওর বয়েসী কেউ নেই, ওর দিকে কারুর তো একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার। তুই বেশির ভাগ সময়ই বাড়িতে থাকিস না, আমিও সময় পাই না। কদিন আগে দেখি ছাদের সিঁড়িতে বসে আছে, মুখখানা যেন ছাই-মাখা, বাবা-মায়েদের কোনো খবর পায় না তো!

–ওসব ছিচকাঁদুনেনা আমি দু'চক্ষে সহ্য করতে পারি না। ওর মতন বয়েসের অনেক ছেলেকে আরও কত কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হয়, অনেক বেশি স্ট্রাগল করতে হয়। ওর বাবা কাওয়ার্ড, তাকে আমি এখানে জোর করে থেকে যেতে বলেছিলুম, থাকে নি!

–ওরকম বললে কী হয়। তাদের ভালো-মন্দ তারা নিজেরাই বেশি বুঝবে। তুই চাস, সারা পৃথিবীটাই তোর মত অনুসারে চলুক। খুকী, তুই লেখাপড়া শিখেছিস, এখনো বুঝতে শিখলি না যে সংসারটা চলে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার ওপর।

–সংসার মানে? মা তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে, তুমি আমাকে বলতে এসেছো যে আমার উচিত স্বামীর সংসারে ফিরে যাওয়া। তার সঙ্গে আমার মনের মিল থাক বা নাই-ই থাক আমাকে সব মেনে নিতে হবে। কারণ আমি পুরুষ নই, মেয়ে!

আনন্দমোহন এবার জোরে হেসে বললেন, না, আমি সে কথা বলতে আসি নি। তোর মা আমাকে অনেক কিছুই শেখাতে চায় কিন্তু আমি সব শিখতে পারি না যে! আমি বলতে এসেছি, তুই ছেলেটাকে একবার দেখে আয়। এ বাড়িতে তোকেই তো ও সব থেকে আপন বলে জানে। ও জেগে আছে, বোধ হয় তুই ওকে কিছু বলবি সেই জন্যই।

চন্দ্রা চোখ বুজলো। তার মুখ কুঁকড়ে গেল অভিমানের যন্ত্রণায়। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না, আমি আর ওকে দেখতে চাই না!

আনন্দমোহন তার পিঠে মৃদু ঠেলা মেরে বললেন, ছেলেমানুষী করিস না! যা ওঠ তো! বাড়িতে একটা ছেলে পা ভেঙে পড়ে আছে

চন্দ্রাকে যেতেই হলো। আনন্দমোহন চন্দ্রাকে সুচরিতের ঘর পর্যন্ত নিয়ে এলেন কিন্তু নিজে ভেতরে ঢুকলেন না।

সুচরিত জেগে আছে ঠিকই। সে চেয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে।

চন্দ্রা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখলো। সুচরিতের সারা শরীরেই প্রায় আয়োডিনের দাগ, কয়েক জায়গায় স্টিকিং প্লাস্টার, বাঁ পায়ে ব্যাণ্ডেজ। মুখের রং যেন নীলচে হয়ে গেছে।

একটা চেয়ার টেনে তার মাথার কাছে এসে বসে চন্দ্রা প্রথমেই বললো, তোর পকেটে ছুরি ছিল? এটা সত্যি না মিথ্যে? বল, আগে বল। ছুরি ছিল কি না?

চন্দ্রার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে সুচরিত বললো, হ্যাঁ, ছিল।

–কোথায় পেলি ছুরি? কে দিয়েছে?

–আমি কিনেছি।

–তুই কিনেছিস? কে তোকে পয়সা দিল?

–কেউ দেয়নি, আমি রাস্তায় পনেরো টাকা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

–রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পেয়ে তুই ছুরি কিনেছিস? কেন? লোককে মারবি বলে?

–হ্যাঁ। ঐ সিকদারবাগানের তিনটে ছেলে আমায় রোজ মারে।

–তোকে রোজ মারে? তুই সে কথা আমাদের আগে বলিস নি কেন? তুই ওদের পাড়ায় যাস কেন?

–ওরা আমাদের ইস্কুলে পড়ে।

–ইস্কুলে পড়ে, তবু তোকে রোজ মারে? কেন, তোকে মারবে কেন?

–ওরা দেখলেই আমার মাথায় চাঁটি মারে। আমার বাপ তুলে গালাগালি দেয়।

–তুই কিছু করিস না, তোকে এমনি এমনি মারে আর গালাগাল দেয়?

–আমি একদিন হাসছিলাম, আমার বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলাম, ওদের একজন এসে আমার গালে এক চড় মেরে খারাপ খারাপ কথা বলতে লাগলো।

–কী বললো?

সুচরিতের মুখের দুটো কাঁচা দাঁত আজ ভেঙে গেছে, রক্তপাত এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বিছানার পাশে খানিকটা তুলো রাখা আছে, তাই দিয়ে সে মাঝে মাঝে কষ মুছছে। এখন সে আরেকবার রক্ত মুছলো।

চন্দ্রা সেই রক্তের দৃশ্য গ্রাহ্য না করে মাথাটা ঝুঁকিয়ে এনে আবার জিজ্ঞেস করলো, কী। খারাপ কথা বলে? বল্! আমি শুনতে চাই।

সুচরিত মুখখানা বিকৃত করে বললো, শালা, বাঙালের বাচ্ছা, দাঁত কেলিয়ে হাসছিস যে বড়? পোঁদে লাথি মেরে বাপের নাম খগেন করে দেবো! খাল খিচে বৃন্দাবন করে দেবো!

এই সব গালিগালাজের মর্ম বোঝার মতন বাংলা জ্ঞান নেই চন্দ্রার। শুধু বাঙাল শব্দটা কানে লাগলো তার। সে একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, শুধু বাঙাল বলে তোকে মারে? তোদের ক্লাসে, তোদের ইস্কুলে কি আর কোনো পূর্ববঙ্গের ছেলে পড়ে না?

–হ্যাঁ, অনেক পড়ে। আমাদের ক্লাসেই দশ-বারোজন পড়ে।

–তাদেরও ওরা মারে?

–না।

–তোকে মারলে অন্য পূর্ববঙ্গের ছেলেরা প্রতিবাদ করে না? তোকে সাহায্য করে না?

–না।

–সাহায্য করে না? তাহলে ঐ বদ ছেলেরা বেছে বেছে তোকেই শুধু মারে কেন?

–আমি একদিন ওদের সঙ্গে বাটখাড়া খেলে সাড়ে চার টাকা জিতেছিলুম।

–বাটখাড়া খেলা আবার কী খেলা?

–চৌকো ঘর কেটে তার মধ্যে খুচরো পয়সা রেখে দূর থেকে বাটখাড়া দিয়ে মারতে হয়।

--পয়সা দিয়ে খেলা?

–হ্যাঁ।

–স্কুলের ছেলে স্কুলের মধ্যে পয়সা দিয়ে এই সব খেলা হয়?

–স্কুলের মধ্যে নয়। পাশের বস্তির সামনে যে মাঠটা...

–তুই সেই খেলা খেলতে যাস?

–মোটে তিনদিন খেলেছি। প্রথম দু'দিন হেরেছিলাম, পর দিন জিতে আমার পয়সা উসুল করে আর খেলিনি। ওরা আমাকে পয়সা ফেরত দিতে বলেছিল। জেতা পয়সা কেন আমি ফেরত দেবো?

চন্দ্রা সোজা হয়ে বসে আঁচল দিয়ে মুখ মুছলো। তার মুখে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির চিহ্ন নেই। রাগের আঁচ ফুটে বেরুচ্ছে তার চামড়ার তলা থেকে।

সে বললো, তোকে মেরেছে, বেশ করেছে! তুই পয়সা নিয়ে জুয়া খেলতে যাস বখাটে ছেলেদের সঙ্গে। তোকে দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। তোকে এই জন্য আমি এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিলুম? জঙ্গলে গিয়ে জংলি হয়ে থাকাই তোর উচিত ছিল। গাধা, কেউ যদি দল। বেঁধে তোর ওপর অত্যাচার করতে আসে, তুই মারামারি করে তাদের সঙ্গে জিততে পারবি? একটা পচা ছুরি দিয়ে কেউ... উফ্, তুই যে এত বোকা তা আমি ধারণাই করি নি। জিততে হয় বুদ্ধি দিয়ে। লেখাপড়া শিখে তুই যদি ওদের ছাড়িয়ে যেতে পারিস, সেটাই হবে আসল জেতা!

সুচরিত দৃঢ়ভাবে বললো, আমি আর লেখাপড়া করবো না।

–বাঃ বাঃ, বেশ, বেশ! একদিন অসমঞ্জ রায়ের কাছে গিয়ে লেখাপড়া শেখার জন্য কাঁদাকাটি করেছিলি না? এর মধ্যেই সে শখ মিটে গেছে?

–আমি ঐ ইস্কুলে আর কোনোদিন যাবো না। ওরা আমার নাম বদলে দিয়েছে। ওরা আমাকে বলে সুচরিত চাঁড়াল। আমি চাঁড়ালের ছেলে। ওরা বলে আমার বাবা মানুষ খুন করেছিল, তাই গভর্নমেন্ট আমার বাবাকে এখান থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

–এসব কথা ওরা জানলো কী করে?

–আমার বাবা কোনো মানুষ খুন করে নি। আমরা চাঁড়াল নই, আমরা মণ্ডল। আমি ঐ শালাদের দেখে নেবো।

আবার সুচরিতের মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো, সে তুলো দিয়ে মুছলো।

আনন্দমোহন বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন সবই, তিনি এবারে ঢুকে এলেন ভেতরে। কাছে এসে বললেন, চন্দ্রা, আজ আর থাক, ছেলেটাকে আর বেশি কথা বলাস নি। স্কুলের ছেলে, তারাও কী রকম নিষ্ঠুর হয়! বেঙ্গলের কী অবস্থা হলো! এখনো স্কুলের ছেলেরা বাঙাল, চাঁড়াল। এই সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে?

চন্দ্রা মুখ তুলে আস্তে আস্তে বললো, বাবা, চাঁড়াল কী?

আনন্দমোহন বললেন, ওসব কথা এখন থাক। ছেলেটাকে এখন ঘুমোতে দে। ওকে খানিকটা সিডেটিভ দেওয়া হয়েছে, তবু এখনো যে ঘুমোয় নি, সেটাই আশ্চর্য!

সুচরিতকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খুব ব্যথা করছে নাকি?

সুচরিত কোনো উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরলো। যেন সে চন্দ্রা ছাড়া আর কারুর কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবে না।

আনন্দমোহন চন্দ্রাকে বাইরে নিয়ে এসে বললেন, ছেলেটার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, এই বয়েসে, সেটা কিন্তু কম কথা নয়। ক'টা দিন যাক, ওর রাগটা একটু কমুক, শরীরটা একটু সুস্থ। হোক, তারপর ওকে অন্য কোনো স্কুলে ট্র্যানফার করিয়ে দিলেই হবে।

চন্দ্রা বললো, বাবা, আমার আর কিছু ভালো লাগছে না।

আনন্দমোহন বললেন, এবারে তুইও ক'টা দিন বিশ্রাম নে। তোদের সেই আশ্রমের বাড়ি তৈরির জন্য তো হন্যে হয়ে ছুটছিস ক'দিন ধরে।

-সে বাড়ি তৈরির কাজ এখন বন্ধ আছে।

-কেন?

-টাকা নেই। যোগেন দত্ত যা টাকা দেবে বলেছিল, এখন আর দিচ্ছে না। আচ্ছা বলো ভা, একটা লোক, সমাজে বাস করে, সংসার চালায়, ব্যবসাট্যাবসা করে, অথচ কথা দিয়ে কথা রাখে না? এটা সহ্য করা যায়?

-এরকম আছে অনেক লোক। তুই আর একা কত করবি? চ্যারিটেবল কাজে মাঝে মাঝে একটু-আধটু বাধা পড়েই। কেউই এত তাড়াতাড়ি একটা বাড়ি উঠিয়ে ফেলতে পারে না। ক'টা দিন, যাক না, একটু বৃষ্টিতে ভিজুক, তাতে ভিত্ শক্ত হয়।

-ঐ যোগেন দত্তকে আমি ছাড়বো না। ওর কাছ থেকে আমি টাকা আদায় করবোই।

এরপর দু'দিন চন্দ্রা বাড়ি থেকে বেরুলো না একবারও। সে কোনো কঠিন সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। সুচরিতকে সে একবার দুবার দেখতে যায়, বাকি সময়টা নিজের ঘরে বই নিয়ে বসে থাকে। এর মধ্যে এক সময় গেট দিয়ে অসমঞ্জ রায়কে আসতে দেখে সে ঝি-কে দিয়ে বলে পাঠালো যে তার মাথা ধরেছে, সে কারুর সঙ্গে দেখা করবে না।

চন্দ্রা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না, বাইরের লোকদেরও প্রশ্রয় দিচ্ছে না দেখে খুশী হলেন তার মা। মেয়ে তাঁর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে চায় না, তবু তিনি তো মা, তিনি মেয়ের মনের গড়নটা খানিকটা বোঝেন। চন্দ্রা কোনো শক্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার আগে এরকম একা একা সময় কাটায়। এরকম তিনি আগেও কয়েকবার দেখেছেন। শিবানীর বিয়েতে চন্দ্রাকে এলাহাবাদে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে অন্য কোনো বাড়িতে থাকার প্রশ্নই ওঠে

না, তাকে উঠতেই হবে শ্বশুরবাড়িতে। তার স্বামীর সঙ্গে কী নিয়ে তার ঝগড়া হয়েছিল তা কেউ জানে না, কিন্তু তার স্বামীকে কেউ খারাপ ছেলে বলতে পারবে না। মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকলে ভুল-বোঝাবুঝি বাড়ে। এবারে চন্দ্রা তার স্বামীর কত কাছাকাছি যাচ্ছে অনেকদিন বাদে, এবারে ওদের মনের জট খুলে যাওয়া খুবই সম্ভব।

শনিবার এলাহাবাদ থেকে শিবানী আর তার দিদি-জামাইবাবু আসছেন কলকাতায়। হাওড়া স্টেশান থেকে তাঁদের নিয়ে আসার কথা। চন্দ্রার মা সেই জন্য আনন্দমোহনের কাছ থেকে বাড়ির গাড়ি চেয়ে রেখেছেন।

দুপুরবেলা তিনি চন্দ্রাকে বললেন, খুকী তৈরি হয়ে নে। হাওড়া স্টেশানে যাবি তো!

চন্দ্রা বললো, আমি তো যেতে পারবো না, মা। আমার আজ বিকেলে জরুরি কাজ আছে!

মা অবাক হয়ে বললেন, শিবানী আসছে, তুই আনতে যাবি না? তোর কী এমন জরুরি কাজ?

চন্দ্রা ঠাণ্ডাভাবে বললো, যোগেন দত্তর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ডায়মন্ডহারবার যেতে হবে।

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, ডায়মন্ডহারবার? সে তো অনেক দূর? শিবানী তোকে দেখতে না পেলে কী ভাববে বল্ তো? না, না, ওখানে আজ যেতে হবে না। বাদ দে তো! চল, হাওড়ায় চল আমার সঙ্গে।

চন্দ্রা তবু বললো, শিবানীর সঙ্গে দেখা তো হবেই। আমার কাজটা খুব জরুরি; অন্যদিন গেলে হবে না। আমার যদি বেশি রাত হয় ফিরতে, শিবানীকে শুয়ে পড়তে বলল। তোমারও জেগে থাকার দরকার নেই।

মা এবার কঠোরভাবে বললেন, তুই ঐ যোগেন দত্ত নামের লোকটার সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার। যাবি, সেখানে আবার কী কাজ? এরকমভাবে যাওয়া, লোকে শুনলে কী বলবে? এই সময় শিবানীরা আসছে, এখন অন্তত...

মাকে থামিয়ে দিয়ে চন্দ্রা বললো, আমি কী করছি, তা আমি ভালো করেই বুঝি, মা। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

৪৪ আর্মানিটোলার পিকচার প্যালেস

আর্মানিটোলার পিকচার প্যালেস থেকে মামুন ফিরে এলেন ভাঙা মন নিয়ে। যা সব ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে তিনি কিছুতেই নিজেকে মেলাতে পারছেন না।

মাদারিপুর থেকে চলে আসার পর মামুন এই কয়েকমাস ঢাকাতেই আছেন। তিনি আলাদা একটা বাসা ভাড়া করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দিদি কিছুতেই তাতে রাজি হননি। সেগুনবাগিচার বাড়িটা মস্ত বড়, বেশ কয়েকটা ঘর খালিই পড়ে থাকে, তবু তাঁর ভাই পয়সা খরচ করে আলাদা বাসায় থাকবে একথা মালিহা বেগম কানেই তুলতে চান না।

মামুন এখন পরিপূর্ণ বেকারও নন। টাঙ্গাইলে সেই সম্মেলনের সময় মানিক মিঞার সঙ্গে পুরোনো আলাপটা ঝালিয়ে নেবার পর তিনি মানিক মিঞার কাছ থেকে ইত্তেফাক পত্রিকায় যোগ দেবার প্রস্তাব পান। মামুন অবশ্য চাকরি নিতে সম্মত হননি, তবে প্রতি সপ্তাহে একটি করে কলাম লিখছেন, প্রায় প্রতি সন্ধেবেলাতেই তিনি ইত্তেফাক অফিসে আড্ডা দিতে যান। তাঁর আর একজন পুরনো দোস্ত জনাব আবুল মনসুর আহমদের প্রভাবে তিনি আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন।

তাঁর মেয়ে হেনা এমনই বাবার ভক্ত যে সে-ও ফিরে যেতে চায় নি দেশের বাড়িতে, মামুন তাকে ভর্তি করে দিয়েছেন ঢাকার একটি ইস্কুলে। মাঝে অবশ্য দু'বার মামুন ঘুরে এসেছেন মাদারিপুর, তাঁর স্ত্রী ফিরোজাকে অতিকষ্টে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে এখন ঢাকা ছেড়ে চলে আসতে কিছুতেই তাঁর মন চাইছে না। পাকিস্তানের এখন একটা সন্ধিক্ষণ

চলছে বলা যায়। এই সময়ে তিনি ঘটনার কেন্দ্র থেকে দূরে থাকতে চান না। ফিরোজা বেগম নিজে ঢাকায় আসতে চান না, বড় শহর তাঁর পছন্দ নয়, নিজের সংসার ছেড়ে অন্যের সংসারে অতিথি হয়ে থাকা তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না। তাঁর বাগান করার শখ, নিজের তত্ত্বাবধানে পোঁতা বেগুন, টমাটো ও শশাগাছগুলির ফলাফল না দেখে তিনি কোথাও নড়তে চান না। তা ছাড়া, মামুন জানেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দিদির কোনো দিন বনিবনা হয়নি। মামুনও মনে মনে কিছুদিনের জন্য সাংসারিক জীবন থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন।

সেগুনবাগিচার এই বাড়িটিতে মামুনের প্রধান আনন্দের উৎস হলো মঞ্জু। মামুনের স্ত্রী গান-বাজনা পছন্দ করেন না, আর এ বাড়িতে সব সময়ই যেন আবহাওয়াতে সুর ভাসছে। তাঁর ভগ্নীপতি আলম সাহেব মজলিসি মানুষ, বাইরে থেকে গায়ক বাজনাদারদের তিনি প্রায়ই ডেকে আনেন, তা ছাড়া নিজের সন্তানদের গান-বাজনা শেখাবার ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট উদার। মঞ্জু মেয়েটার যেন সত্তায় মিশে আছে সঙ্গীত। যখন তখন সে গান গেয়ে ওঠে। অনেক সময় সে অন্যের কথার উত্তর দেয় গানের লাইন দিয়ে।

মামুন তাঁর নিজের জীবন বা সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো চিন্তা করেন না। যা হবার তা তা হবেই, এইরকম একটা দার্শনিকসুলভ মনোভাব আছে তাঁর। অবশ্য তাঁর খাওয়া-পরার সমস্যা নেই, জমি-জমা থেকে বৎসরের খোরাকিটা ঠিকই জুটে যাবে। কিন্তু তিনি প্রায়ই চিন্তা করেন দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। দেশের ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিতের হাতে ফেলে দেওয়া যায় না। দেশের মানুষকেই দেশের ভবিষ্যৎ গড়তে হয়। এই ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য স্বপ্ন দেখতে হয়, সকলের স্বপ্ন দেখতে হয় না, সকলের স্বপ্ন এক হয় না, তাই নিয়েই যত বিপত্তি।

বাইরের জগতের ব্যাপার-স্যাপার দেখে যখন মামুনের খুব মন খারাপ লাগে তখন তিনি দু'তিনদিন আর বাড়ি থেকে বেরোন না। তখন তিনি মঞ্জুকে অনবরত অনুরোধ করেন, গান শোনা, মামণি গান শোনা আমাকে!

মঞ্জুকে দেখে, মঞ্জুর গান শুনে মামুনের অনেক দিন বাদে কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয়েছে। লিখেছেনও দু'তিনটে, কোথাও ছাপতে দেননি। মঞ্জুকে দেখে তাঁর ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে যায়, ছাত্র বয়েসে তাঁর প্রেরণাদাত্রী, দায়ুদকান্দির সেই গায়ত্রী ওরফে বুলার কথা। বুলার বন্দনা স্তোত্রেই তাঁর 'আশমানী প্রজাপতি' নামে প্রথম কাব্যপুস্তকটি ভরা। সে কথা বোধহয় আর কেউ জানে না, এমনকি বুলাও জানে না। বুলাকে তিনি তার বিয়ের পর একবারও দেখেন নি, সেইজন্যই বুলার অষ্টাদশী তরুণী মূর্তিটি তাঁর চোখে জেগে আছে। বুলা এখন কোথায় আছে, কে জানে। মামুনের সেই সময়কার বন্ধু প্রতাপের সঙ্গেও আর যোগাযোগ নেই।

বুলার সঙ্গে মঞ্জুর অবশ্য তুলনা চলে না। মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও বুলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ছিল প্রেমের। কোনোরকম প্রতিদানের আশা না করেও মামুন বুলাকে ভালোবেসেছিলেন। আর মঞ্জু তাঁর দিদির মেয়ে, তাঁর কন্যাসমা। তবু মঞ্জুর যৌবন-চাঞ্চল্য, তার সারল্যের সৌন্দর্য, গান গাওয়ার সময় তার আত্মনিবেদনের রূপ, এসব যখন মামুন দেখেন, তখন তিনি মঞ্জুর গুরুজন থাকেন না, তখন তিনি দেখেন একজন কবি হিসেবে। এই অনুভূতি তাঁর একান্ত নিজস্ব, সব গোপনের চেয়েও অতি গোপন।

শহীদ আর পলাশ নামে কলকাতার দুটি ছোঁকরা এসে মঞ্জুর জীবনে একটা ঝড় বইয়ে। দিয়েছিল। ওরা চলে যাবার পর মঞ্জু যখন তখন কান্নায় ভেঙে পড়তো। বাবা-মায়ের কাছে তখন খুব বকুনি খেয়েছে মঞ্জু। মামুন তখন অতিশয় স্নেহে ও যত্নে মঞ্জুর হৃদয়ের শুশ্রূষা করেছেন। এখন সে অনেকটা সামলে উঠেছে। প্রথম কয়েকমাস তো কলকাতায় যাবার জন্য খুব বায়না ধরেছিল, এখন আর সে কথাও বলে না। মামুন অবশ্য কোনো এক সময় ওকে কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন।

এ বাড়ির তিনতলায় একটি মাত্র ঘর, বাদবাকি ছাদ। সেই ঘরে মামুনের আস্তানা। সম্প্রতি তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই বয়েসে আর নতুন কিছু করা যায় না। কিন্তু ইত্তেফাক কাগজে লেখা শুরু করা ও আওয়ামী লীগে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার পর তিনি যেন আবার নতুন করে কর্মচাঞ্চল্য অনুভব করছেন।

মামুনের অগোছালো স্বভাবের জন্য মঞ্জু প্রায়ই এসে তাঁকে বকুনি দেয়। মামুন তাতে মজা। পান। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বকুনি দেবার লোক কমে আসছে। এক সময় মামুন তাঁর। বাবাকে খুব ভয় পেতেন। তাঁর বাবার ইন্তেকাল হয়েছে অনেকদিন। কলকাতায় থাকার সময় মামুন ভয় ও ভক্তি সম্ভ্রম করতেন ফজলুল হককে। সেই ফজলুল হক এখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর, তাঁর আগেকার ব্যাঘ্রবিক্রম আর নেই। বয়েসের ভারে পীড়িত, কেমন যেন জরঙ্গব অবস্থা। মামুন একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। ফজলুল হক মামুনকে ঠিক যেন চিনতেই পারলেন না। অথচ এই ফজলুল হকের কথাতেই মামুন নিজের কেরিয়ার নষ্ট করে। পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে ইস্কুল খোলার কাজ নিয়ে জীবনের মূল্যবান কয়েকটি বৎসর ব্যয় করেছেন। আর মামুন ভয় পেতেন তাঁর এক পিসিমাকে, তিনিও আর বেঁচে নেই। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মামুনের ঠিক মনের মিল না হলেও তাঁকে তিনি ভয় পান না। ফিরোজা বেগম বকাবকি করেন না, যেদিন যেদিন অসদ্ভাব হয়, সেদিন সেদিন তিনি কথা বন্ধ করে দেন, মামুন তাতে স্বস্তি বোধ করেন।

এখন বয়েস হচ্ছে, মামুন বুঝতে পারেন, এখন থেকে ছোটরাই তাঁকে বকুনি দেবে।

মঞ্জু যখন তখন তিনতলার ঘরে এসে বলবে, মামু, তোমাকে নিয়ে পারি না! আবার তুমি। মাটিতে সিগারেটের টুকরো ফেলেছো! তোমাকে তিন তিনখানা ছাইদান দিয়েছি!

মামুন মঞ্জুকে দিয়ে কাজ করাতে ভালোবাসেন। তিনি হেসে বলেন, কাল রাতে ঘুমাতে পারি নাই, তোরা তো খোঁজও রাখিস না। ঐ দ্যাখ, দরজার ধারের পেরেকটা খসে গেছে, কাল মশারি টাঙাতে পারি নাই!

মঞ্জু কলকণ্ঠে বলে ওঠে, তুমি বিনা-মশারিতে শুয়ে রইলে? হায় আল্লা, তুমি যে কী, একটা পেরেক ঠুকতেও জানো না। তুমি শুধু কাগজের ওপর কলম ঘষতে জানো!

পেরেক ঠোকার জন্য মঞ্জু একটা হাতুড়ি বা ইঁট খোঁজে, তা না পেয়ে সে তার দাদীর পান হেঁচার হামানদিস্তা নিয়ে আসে। পুরোনো গর্তে পেরেকটি ঠিকঠাক বসাবার জন্য সে

মনপ্রাণ একাগ্র করে ফেলে। কৃত্রিম বিরক্তিতে মামুন দু'কানে হাত চাপা দিয়ে বলে ওঠেন, উঃ, আর না, আর না! কর্কশ শব্দ আমি সহ্য করতে পারি না। দিলি তো মুডটা মাটি করে। নে, হয়েছে, এবার একটা গান শোনা তো!

কাজ সাঙ্গ করার পর মঞ্জু বলে, মামু, তোমার মতন গান-পাগল আমি আর দেখি নাই। আমার জানা সব কয়টা গানই তো তোমার পঞ্চাশবার শোনা হয়ে গেছে!

মামুন বলেন, ওরে, ভালো গান পঞ্চাশ কেন,একশোবার শুনলেও পুরানো হয় না। তুই ঐ গানটা কর তো, পুরানো সেই দিনের কথা সেও কি ভোলা যায়..

মঞ্জু কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মামুনের দিকে। তার মুখে মৌসুমী মেঘের মতন অকস্মাৎ একটা ছায়া পড়ে। সে আস্তে আস্তে বলে, জানো মামু, আমার কলেজের কয়েকটা মেয়ে বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গাইলে নাকি গুনাহ্ হয়। উনি ইণ্ডিয়ার কবি,। বিধর্মী।

মামুন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কলেজের মেয়েরাও আজকাল এই কথা বলে নাকি? আমি কিছু কিছু সরকারি কর্মচারীর মুখে এই ধরনের কথা শুনেছি। কলেজের ছেলে-মেয়েরাও যদি এরকম কথা বলতে শুরু করে তা হলে বুঝতে হবে এ দেশের খুবই দুর্দিন আসছে। তা তোর নিজের কী মনে হয়?

-আমি অতশত বুঝি না। আমার ভালো লাগে।

-শোন, কবিতা, গান এসব হলো অন্তরের জিনিস। এ সবের ওপর কোনো ফতোয়া জারি করা যায় না। যার যেটা ভালো লাগে সে তাই-ই করবে। তুই ধর তো গানটা!

মঞ্জুকে বেশি সাধাসাধি করতে হয় না। সে সারা ঘর ঘুরতে ঘুরতে গানটা গাইতে থাকে। চক্ষু দুটি বোজা, শরীরটা একটু একটু দোলে। দুটি হাত বুকের কাছে জোড় করা। তার পরনে একটা জাফরানি রঙের শাড়ি, তার অঙ্গটি বেতসলতার মতন, বাতাসে ফুরফুর

করে উড়ছে তার চুল। মামুন শ্রবণ ও দর্শন সমান সমান করে চেয়ে রইলেন তার দিকে। প্রকৃতির কী অপার রহস্য, এই মেয়েটাকে তিনি প্রায় জন্মাতে দেখেছেন বলা যায়, হামাগুড়ির বয়েসে বড় ছিচকাঁদুনে ছিল, দেখতেও ভালো ছিল না, সবাই বলতো বাপের মতন মুখ হয়েছে, তারপর ধীরে ধীরে বড় হলো, আর পাঁচটা মেয়ের মতনই ফ্রক পরে ইস্কুলে যেত, আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। হঠাৎ যৌবনে পা দিয়ে তার কী অসাধারণ পরিবর্তন। সর্বক্ষণ ঝলমল করে, তার হাসি সুন্দর, তার কথা বলার ভঙ্গি সুন্দর, তার হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত কী সুন্দর! সে যখন ঘরে ঢোকে, এক ঝলক বসন্ত বাতাস নিয়ে আসে।

এই মেয়েটিকে কোন্ একটা পরের বাড়ির ছেলে একদিন নিয়ে চলে যাবে।

মঞ্জুর কণ্ঠস্বর বেশ খোলামেলা, তবে এখনো সে নিজস্ব স্টাইলটি খুঁজে পায় নি। এখন সে পশ্চিম বাংলার শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের অনুকরণ করছে কিছুটা। উচ্চারণ পরিষ্কার, প্রতিটা শব্দের ওপর আলাদা আলাদা ঝোঁক। কলিম শরাফীর কাছে কিছুদিন তালিম নিলে এ মেয়ে উঁচুদরের শিল্পী হতে পারবে।

গানটি শেষ হওয়া মাত্র মামুন অন্যমনস্ক ভাবে তাঁর খাতাটা খুলে লিখলেন, ‘অতীব সুন্দর কিছু দেখি যদি বক্ষে ব্যথা জাগে...’। এই লাইনটা লেখার পর তিনি দ্বিতীয় লাইনটির চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেলেন। মঞ্জুকে যে তার গান শুনে কিছু একটা বলা উচিত, সে কথা মনেই রইলো।

মঞ্জু একটুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, মামু, কী লিখছো?

সঙ্গে সঙ্গে ঘোর ভেঙে গেল, মামুন লজ্জা পেয়ে গেলেন। খাতাটা বন্ধ করে বললেন, কিছু না। এই লাইনটা যে তিনি মঞ্জুকে দেখেই লিখলেন তা নয়, হঠাৎ এরকম এক একটা অনুভূতি আসে, গানটা শুনতে শুনতে তাঁর বুকে একটা ব্যথার ভাব জেগেছিল। কিন্তু এরকম একটা লাইন যেন নিজের ভাগ্নীকে দেখানো যায় না, তিনি আবার বললেন, কিছু না।

মঞ্জু তাঁর পাশে বসে পড়ে বললো, তবু আমি দেখবো। তুমি মধ্যে মধ্যেই কী সব লেখো? গান লেখো বুঝি?

মামুন খাতাটা পেছনে লুকিয়ে বললেন, আরে না রে, ওতে সব প্রাইভেট কথা লিখে রাখি, ছোটদের দেখতে নাই।

-ইস আমি বুঝি ছোট?

কথা ঘোরাবার জন্য মামুন জিজ্ঞেস করলেন, হারে, বাবুল আর এসেছিল? তোরে অঙ্ক দেখায় দেবার কথা বলেছিলাম না ওকে?

মুঞ্জু মাথা নেড়ে বললো, মোটেই আমি তার কাছে অঙ্ক শিখবো না! সে মোটে কথাই বলতে পারে না!

আলতাফের ভাই বাবুলকে মামুনের খুব পছন্দ। ছেলেটি খুব লাজুক ঠিকই। কিন্তু পড়াশুনোয় খুব মাথা, একেবারে হীরের টুকরো ছেলে। মঞ্জুর সঙ্গে ভালো মানাবে। তিনি মঞ্জুর চুলে হাত দিয়ে বললেন, বাবুলের সঙ্গে তোর ভাব হয় নাই! চমৎকার ছেলে!

মঞ্জু বললো, সে মোটে কথাই বলে না। তার সাথে আমার ভাব করতে বয়ে গেছে!

মামুন হাসতে হাসতে মঞ্জুর পিঠে একটা চাপড় মেরে বললেন, আঁ, কী বললি, 'বয়ে গেছে'? তুই যে শহীদ-পলাশদের সঙ্গে কয়েকদিন মিশেই কলকাত্তাইয়াদের মতন কথা বলতে শিখেছিস!

নিচতলা থেকে কে মঞ্জুর নাম ধরে ডাকলো, মঞ্জু চলে গেল।

মামুন ভাবতে লাগলেন বাবুল আর আলতাফের কথা। আলতাফই তাঁকে স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে টেনে এনেছে, আলতাফের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আলতাফ আজকাল তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। আলতাফ মামুনকে ফুথেষ্ট প্রগতিশীল মনে করে না। একদিন

আলতাফ তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিল, কী মামুন ভাই, আপনি আওয়ামী লীগের মুরুব্বিদের ধরে মন্ত্রিত্বের গদি চান নাকি?

আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙন আসন্ন। সেদিন পিকচার প্যালেসের অধিবেশনের শেষেই। মামুন সেটা বুঝে গেছেন। মওলানা ভাসানী পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে একেবারে জিদ ধরে আছেন। আওয়ামী লীগের নেতা সোহরাওয়ার্দি এখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তিনি আমেরিকার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার নীতি সমর্থন করবেনই, অথচ সেই আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ভাসানী সাহেব প্রকাশ্যেই এই নীতির নিন্দা করছেন। ভাসানী সাহেবের মনোভাবটাই সব সময় সরকার বিরোধী, এখন তাঁর নিজের দল সরকার হাতে পেয়েছে, তবু তিনি সরকার-বিরোধিতা ছাড়তে পারছেন না। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। আগামী নির্বাচনের কথা ভেবে আওয়ামী লীগের এখন সরকারে থাকাই উচিত, মামুনও এটা মনে করেন, কিন্তু মওলানা ও তাঁর সমর্থকরা এটা কিছুতেই বুঝবেন না। দু'পক্ষে নিন্দা-মন্দ, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেছে। সেদিন পিকচার প্যালেসের ভোটাভুটিতে মওলানার হার হলো, তবু মওলানা সেই ভোটের ফলাফলকে মিথ্যা বললেন।

আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকাটাও মামুন ঠিক বুঝতে পারছেন না। এই তরুণ নেতাটি সংগঠনের কাজ ভালো জানে, খাঁটি দেশপ্রেমিক যে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু বড্ড মাথা গরম। নিজের মতটাই চেঁচিয়ে জাহির করে, অন্যের কথা শুনতে চায় না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সঙ্গে তার স্পষ্ট মনোমালিন্য সবাই টের পেয়ে গেছে। ভাসানীপন্থীদেরও অনেককে সে খেপিয়ে রেখেছে। সে তত চেষ্টা করতে পারতো সোহরাওয়ার্দি আর ভাসানীর মধ্যে একটা আপস সমঝোতার ব্যবস্থা করতে, তা নয়, সে যেন ভাসানীকে ঠেলে দিচ্ছে আরও দূরে।

মামুন যা ভেবেছিলেন, কয়েকদিন পর তাই-ই হলো। মওলানা ভাসানী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন। রূপমহল সিনেমা হলে তিনি আলাদা একটি সম্মেলন ডাকলেন।

মামুন ভাসানীর দলে গেলেন না। তিনি আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী দল হিসেবে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী। কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের মোকাবিলা করতে আওয়ামী লীগই সক্ষম, দেশের মানুষ এখনো আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা রাখে।

তবু মামুন ভাসানী সাহেবের বক্তব্য শোনার জন্য গেলেন রূপমহল সিনেমা হলে।

ভাসানী সাহেব সমস্ত প্রগতিশীল দলগুলিকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির সমর্থকদের ডাক দিয়েছেন। ভিড় মন্দ হয় নি। বামপন্থীরা সবাই এসে জুটেছে। মামুন এদের অনেককেই একটু একটু চেনেন। ফজল আলী মন্টু নামে একজন লোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। কথাগুলো মামুন শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু তিনি জানেন, ঐ লোকটি সোহরাওয়ার্দি সাহেবকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কাগমারি সম্মেলনের পর ঐ লোকটি অভিযোগ করেছিল, ছাপ্পান্নর সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি আটানব্বই ভাগ মেনে নেওয়া হয়েছে, এই কথা ঘোষণা করে সোহরাওয়ার্দি বাঙালী জাতির প্রতি শত্রুতা করেছেন!

মামুন এদিক ওদিক তাকিয়ে আলতাফ আর তার ভাই বাবুলকে খুঁজতে লাগলেন। মতের অমিল হলেও এই দুটি ছেলের ওপর তাঁর বড় টান জন্মে গেছে। তিনি ওদের দেখতে পেলেন না।

সিনেমা হলের বাইরেও ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বহু লোক। এরা ভেতরে যেতে চায় না, এরা বোধহয় মজা দেখতে এসেছে। এত বড় শক্তিশালী আওয়ামী লীগ দলটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে, এতে মুসলিম লীগের সমর্থকরা, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা তো মজা পাবেই। মওলানা ভাসানীর দল কতটা ভারি হয় তার ওপর নির্ভর করছে কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দি সরকারের পতন হবে কি না।

বেশ কিছু পুলিশও দাঁড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। গেটের দিকে এগোতে এগোতে মামুন টের পেলেন, কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। যেন হঠাৎ একটা কিছু ঘটবে। ইস, এখনো

কী মওলানা ভাসানীকে বোঝানো যায় না, দল ভাঙবেন না, দল ভাঙবেন না! আলাপ-আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলুন!

মামুন একবার ভাবলেম, তাঁর কী রূপমহল সিনেমার মধ্যে ঢোকা ঠিক হবে? যদি কেউ ভাবে তিনি এই নতুন দলে যোগ দিতে এসেছেন? যদি অত্যুৎসাহী ছেলে-ছোঁকরারা তাঁকে চিনতে পেরে টানাটানি করে মঞ্চে উঠিয়ে দেয়? না, তিনি এই বিভেদের রাজনীতিতে নিজেকে জড়াতে চান না। যদিও তাঁর কষ্ট হচ্ছে খুব।

তিনি বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। মাইক দেওয়া হয়েছে, এখান থেকেই বক্তৃতা শোনা যাবে।

তিনি আগেই জেনেছেন যে এই নতুন দলের নাম হবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, সংক্ষেপে ন্যাপ। এই দল নতুন কী কী প্রোগ্রাম নেয় সেটাই তাঁর জানার কৌতূহল।

সিনেমা হলের মধ্যে সভার কাজ শুরু হতে না হতেই হঠাৎ বাইরে একটা তুমুল সোরগোল উঠলো। কয়েকখানা ট্রাক হুড়মুড়িয়ে এসে থামলো, সেগুলি থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামলো তরুণ ছেলের দল, হাতে তাদের লাঠি। ট্রাকগুলির পেছনেও দৌড়ে আসছে অনেক লোক। দৌড়োতে দৌড়াতে তারা বড় বড় ইঁট ছুঁড়ছে।

প্রায় চোখের নিমেষেই স্থানটি রণক্ষেত্র হয়ে গেল। মাথা বাঁচাবার জন্য মামুন দৌড় লাগালেন। কারা এই মিটিং ভাঙতে এলো? মুসলিম লীগের সাপোর্টাররা? তাদের এখনো এতটা ক্ষমতা আছে? যারা মারামারি করতে এসেছে, তারা প্রায় সবাই অল্প বয়েসী, দেখে মনে হয় ছাত্র, ছাত্রদের মধ্যে ওদের এত জনপ্রিয়তা?

কিছু দূরে গিয়ে মামুন থামলেন। ইঁট ছোঁড়া সমান ভাবে চলছে। লাঠি দিয়ে পেটাবার দমাদম শব্দ হচ্ছে। মামুন কান পেতে শ্লোগানগুলো শোনার চেষ্টা করলেন। চিৎকার-চাচামেচিতে কিছুই প্রায় বোঝা যাচ্ছে না, তবু মামুনের খটকা লাগলো। পুলিশ নিষ্ক্রিয় কেন? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন পুলিশ দিব্যি হাত গুটিয়ে রয়েছে। তাহলে কি তাদের ওপর

নির্দেশ আছে আক্রমণকারীদের বাধা না দেবার? কেন্দ্রে এবং রাজ্যে এখন আওয়ামী লীগ। সরকার!

মামুন দেখতে পেলেন একটা ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে তাঁর বরিশালের বন্ধু বদ্রু শেখ। এবারে তিনি আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগের যুবকর্মীকে চিনতে পারলেন।

মামুন আবার ফিরে এগোতে লাগলেন সেই ট্রাকের দিকে। কোনোরকমে অন্যদের ঠেলেঠুলে তিনি উঠে পড়লেন ট্রাকের ওপর, বদ্রুর হাত চেপে ধরে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, এসব কী হচ্ছে পাগলামি! এই বদ্রু, বদ্রু!

বদ্রু শেখ সত্যিই পাগলের মতন গলা ফুলিয়ে চিৎকার করতে করতে লাফাচ্ছিল, মামুনের ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গিয়ে বললো, তুমিও এসেছো? বেশ করেছো, মারো শালাদের!

রাগে জ্বলে উঠে মামুন বললেন, তুই এইসব ছেলেগুলারে ক্ষেপিয়েছিস? মাত্র কয়দিন আগে যারা ছিল আমাগো ভাই ও বন্ধু, তাদের মারতে এসেছিস?

বদ্রু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, বাদ দে, ওসব কথা বাদ দে! ভাই-বন্ধু না ছাই! ওরা। বিশ্বাসঘাতক! ওরা রাষ্ট্রের শত্রু! ওদের এই পার্টি ফর্ম করতে আমরা দিমু না কিছুতেই দিমু!

মামুন বদ্রুকে ঠেলতে ঠেলতে এক কোণায় নিয়ে গিয়ে বললেন, তোকে এই ফোপর দালালি করতে কে বলেছে? আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে কী এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে? আমি কাউন্সিলের মেম্বার, তুই কে? আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক পার্টি, আমরা গুণ্ডামির প্রশ্রয়। দিই না।

বদু বললো, ওসব কথা এখন রাখো তো মামুন সাহেব! যেমন করে হোক ওদের আটকাতেই হবে। ওদের পিছনে জনগণকে লেলিয়ে দেবো। এই মওলানা ভাসানীটিকে তো চেনো নাই, উনি হচ্ছেন....

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে-কোনো মানুষকে অন্যদের চোখে হেয় কিংবা ঘৃণ্য করতে গেলে তিনটি বিশেষণই যথেষ্ট। সেই তিন বিশেষণ হচ্ছে, ইসলামের শত্রু, পাকিস্তানের শত্রু এবং ভারতের দালাল! মাত্র কিছুদিন আগেও যিনি ছিলেন তাঁদের পার্টির শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট, সেই মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বদ্রু শেখ অবিকল সেই তিনটি বিশেষণই প্রয়োগ করলো।

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলেন মামুন। তাঁর অবস্থা দেখে হেসে উঠলো বদ্রু শেখ। তারপর মামুনের কাঁধ চাপড়ে বললো, তুমি ঠাণ্ডা ধাতের মানুষ, তুমি এসবে মাথা গলাইয়ো না। বাড়ি গিয়া ঘুমাও!

তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে মামুন বললেন, তোমার এত উৎসাহ কেন? সোহরাওয়ার্দি মিনিস্ট্রি ফল করলে তোমার মতন ব্যবসায়ীদের মুশকিল হবে, তাই যেমন করে তোক টিকিয়ে রাখতে চাও!

বদ্রু শেখ জোর দিয়ে বললো, আলবাৎ! আমাদের লীডার এখন পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার, শিল্প মন্ত্রী আবুল মনসুর আমাদের নিজস্ব লোক, আমরা এখন নতুন নতুন লাইসেন্স পাইতে আছি, এখন যদি কেউ দুশমনি করতে আসে–

–ব্যবসায়ীদের স্বার্থ আর দেশের মানুষের স্বার্থ তাইলে এক? তার জন্য গণতন্ত্ররে যদি বলি দিতে হয়–

–গণতন্ত্ররে কে বলি দিচ্ছে?

–এই যে পুলিশ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর গুণ্ডামি করে একটা পার্টি কনভেনশন ভাঙা হচ্ছে?

মামুন লরি থেকে নামতে উদ্যত হয়ে বললেন, তোমাদের এসব বাঁদরামো আমি সহ্য করবো। আমাদের পার্টির একটা ইমেজ আছে। আমি সেক্রেটারি শেখ মুজিবর রহমানকে এখনি টেলিফোন করতেছি...

বদ্রু শেখ মামুনের হাত ধরে টেনে বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে সব শুইন্যা লও! আরে শেখ মুজিবই তো আমাগো পাঠাইছে। আমি নিজের দুই দুইটা ট্রাক দিছি তাঁর কথায়। তিনিই তো ইউনিভার্সিটি আর ছাত্র ডরমিটারিগুলা থেকে ছাত্রদের জুটাইতে কইছেন।

মামুনের মুখখানা মুহূর্তে যেন কালিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি আর কথা বলতে পারলেন না।

বদ্রু শেখ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললো, কাম ফতে! দ্যাখো, অরা পলাইতে আছে। কাল পল্টন ময়দানে অরা প্রকাশ্য সম্মেলন করবে, সেখানে আরও জোর পিট্টি দেবো! মামুন ভাই, এয়ারে কয় রাজনীতি!

মামুন এবারে দূরে দেখতে পেলেন আলতাফকে। সে একটি আহত ছেলেকে পাঁজা কোলা। করে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির কপালে রক্ত, কে ও, বাবুল নাকি? আলতাফ একবার তাকালো এদিকে। সে কি মামুনকে দেখতে পেয়েছে, এই পাথর-ছোঁড়া, হামলাকারীদের ট্রাকে? মামুন দু'হাতে নিজের মুখ চাপা দিলেন।

৪৫ পাড়াটির নাম বাগবাজার

পাড়াটির নাম বাগবাজার হলেও দৈনিক বাজারের জন্য যেতে হয় শ্যামবাজারে। ছুটিছাটার দিন হলে প্রতাপ আর একটু উজিয়ে চলে যান হাতিবাগানে। ওখানে মাছ ভালো পাওয়া যায়, বিশেষত জ্যান্ত মাছ।

মাছের বাজারে প্রতাপ বেশ কিছুক্ষণ ঘুরতে ভালোবাসেন। কেনার চেয়েও দেখাতেই বেশি আনন্দ। জ্যান্ত ট্যাংরা, ছটফট করে লাফানো চিংড়ি, কালা মাছের মুখ খোলা আর বন্ধ হওয়া মাছের দেশের মানুষদের এ দৃশ্য তো প্রিয় হবেই। মালখানগরে নিজেদের বাড়ির

পুকুরে প্রতাপ বড়শী দিয়ে অনেক মাছ ধরেছেন একসময়। কালা নয়, প্রতাপদের পুকুরে যে-মাছটা বেশি ছিল তার নাম কালবোস। ভারি মিষ্টি স্বাদ। আর সোনালি রঙের ট্যাংরা। এদেশে যার নাম পোনা মাছ, ওদেশে তার নাম নলা। একবার সিরাজগঞ্জে গিয়ে প্রতাপ যে রুই মাছ খেয়েছিলেন সে রকম রুইমাছের স্বাদ আর বহুদিন পাননি। আর একটা সুস্বাদু মাছ হচ্ছে বলসে। তা তো কলকাতার বাজারে ওঠেই না প্রায়। তবে, একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, এদিককার চিংড়ি মাছের স্বাদ অনেক ভালো। সেইজন্যই এদিকে অনেকে এখনো বলে, 'বাঙাল, চিংড়ি মাছের কাঙাল।'

প্রতাপ নিজে থেকে মাছের দর জিজ্ঞেস করেন না আগে। অন্য খদ্দেরদের পাশে দাঁড়িয়ে মাছওয়ালার সঙ্গে তাদের দরাদরি শোনেন। একটু ভালো মাছ হলেই প্রতাপদের মতন ক্রেতাদের সাধ্যের বাইরে চলে যায়। প্রতাপ প্রাণে ধরে বরফ দেওয়া মাছ কিনতে পারেন না। অল্প-স্বল্পও কিনতে পারেন না। কেউ কেউ অনায়াসে আধ পো বা এক পো মাছ দিতে বলে। ঢাকার কোনো মাছওয়ালা হলে শুনিয়ে দিত, বাবুর বাড়িতে আইজ যজ্ঞ নাকি?

মাছের দাম দিন দিনই বাড়ছে। গত সপ্তাহে ছিল তিন টাকা সের, এ সপ্তাহে সাড়ে তিন! আজ ছুটির দিন বলে বড় সাইজের জ্যান্ত ট্যাংরা চাইছে চার টাকা! অবিশ্বাস্য ব্যাপার! চার। টাকা দিয়ে কে মাছ কিনে খাবে? কালো কালো ট্যাংরাগুলো, দেখলেই বোঝা যায় ডিম ভর্তি পেট, এই মাছ প্রতাপের খুব প্রিয়। কিন্তু প্রতাপের বাজারের বাজেটই তিন টাকা। সুপ্রীতিকে বাদ দিয়ে প্রতাপের বাড়িতে মাছ খাবার লোক ছ'জন, ঐ মাছ অন্তত এক সের কেনা উচিত। এখন সব দিক হিসেব করে চালাতে হচ্ছে, প্রতাপের বাজেট বাড়াবার উপায় নেই।

মাছের বাজারে এরকম আগুন লাগার কারণ পাকিস্তান থেকে হঠাৎ মাছ আসা বন্ধ হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলায় নদী-খাল-বিল কম, মাছও কম। বিহার-উড়িষ্যা থেকে মাছ এনেও কলকাতার মৎস্য ক্ষুধা মেটানো যাচ্ছে না। কলকাতায় শুধু যে জনসংখ্যা বেড়েছে তাই-ই নয়। মাছ-খোর বাঙালের সংখ্যা অনেক গুণ বেড়েছে। পূর্ব বাংলা থেকে যত মানুষ

চলে এসেছে, তাদের কথা ভেবেই তো পূর্বপাকিস্তান থেকে রোজ কিছু মাছ পাঠানো উচিত। অথচ প্রতাপ খবরের কাগজে পড়েছেন, বরফের অভাবে খুলনায় অনেক মণ ইলিশ মাছ পচে যাচ্ছে, কোনো কোনো দিন চার পয়সা, ছ'পয়সা সেরে ইলিশ বিক্রি হচ্ছে সেখানে। বঞ্চিত হচ্ছে সেখানকার জেলে সম্প্রদায়।

কলকাতার বাজারে মাছের তুলনায় মাংস সস্তা। পাঁঠার মাংস এখনো তিন টাকা। কিন্তু মাংস তো মাছের মতন এক দু'টুকরো খাওয়া যায় না। প্রতাপদের যৌবনে বড় জামবাটি ভর্তি মাংস দেওয়া হতো এক একজনকে, কবজি ডুবিয়ে খাওয়া হতো। তাঁর ছেলেমেয়েদের এখন উঠতি বয়েস, তারা দু'টুকরো মাংস খাওয়ার পর থালা চাটবে, এ দৃশ্য প্রতাপ সহ্য করতে পারেন না।

একজনের কাছে একটা বোয়াল মাছ রয়েছে। গায়ের চকচকে ভাবটা দেখেই বোঝা যায়। মাছটা টাটকা, ওজন হবে সের খানেক। বোয়ালের দামও সস্তা। এক টাকা বারো আনা করে চাইছে, একটু চেপে ধরলে দেড়টাকায় দেবে। কিন্তু মমতা বোয়াল মাছ খান না। সেই দেখাদেখি ছোট মেয়েটাও খায় না। ওদের নাকি বোয়াল মাছে কী রকম গন্ধ লাগে। তাহলে ওদের জন্য আমার অন্য মাছ কিনতে হয়। শুধু বোয়াল নয়, মমতা বেলে মাছ, শোল মাছ, চিতল মাছ এসব খান না। বান মাছ দেখলে তো তাঁর ঘেন্না হয়, ওগুলো নাকি সাপের মতন।

প্রতাপের পকেটে একটা দশ টাকার নোট আছে বটে কিন্তু খরচ না বাড়াতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বোয়াল মাছের কাছ থেকে সরে গিয়ে, ডিমভরা ট্যাংরা মাছগুলোর দিকে কয়েকবার তারিফ করা চোখে তাকিয়ে তিনি পার্শে মাছ কেনাই ঠিক করলেন। সবে মাত্র তিনি সেই মাছওয়ালার সামনে দাঁড়িয়েছেন, পেছন থেকে একজন বললো, মজুমদারদা, কেমন আছেন?

প্রতাপ মুখ ফিরিয়ে দেখলেন ধুতির ওপর গিলে করা পাঞ্জাবিপরা একজন বেঁটে খাটো মোটাসোটা মানুষ তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। প্রতাপ প্রথমে চিনতে পারলেন না। লোকটির

মুখটি হাসিমাখা, বেশ পরিতৃপ্ত ধরনের মুখ, চেহারায় আর্থিক সাচ্ছল্যের ছাপ আছে। লোকটি বাজার করতে এসেছে ঠিকই। কিন্তু হাতে কোনো থলি বা চুবড়ি নেই, তার পেছনে ভৃত্যশ্রেণীর একজন লোক একটা ধামা মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতায় পুরোনো লোকদের এরকম চাকর সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে আসাই প্রথা।

লোকটির একটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, তাই দেখেই প্রতাপের মনে পড়ে গেল। বিমানবিহারীর বাড়িতে লোকটিকে দু'একবার দেখেছেন, প্রতাপের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। কিসের যেন ব্যবসা আছে।

প্রতাপও হাসির উত্তর দিয়ে বললেন, কী খবর? আপনি এদিকেই থাকেন নাকি?

লোকটি বললো, আমার বাড়ি তো এই গ্রে স্ট্রিটে। আপনি তো দাদা থাকেন বাগবাজারে, তাই না? হঠাৎ এদিকে? প্রতাপ বললেন, এলাম আপনাদের বাজারে, যদি ভালো মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু যা দাম!

এবারে প্রতাপের মনে পড়লো, লোকটির নাম জগৎপতি দত্ত। হ্যাঁ, ঠিক জগৎপতিই বটে, ঐ নাম নিয়ে বিমানবিহারী কী যেন একটা রসিকতাও করেছিলেন। জগৎপতি দত্তদের কয়েক পুরুষের কাগজের ব্যবসা।

প্রতাপের কথা শুনে জগৎপতি মহা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আর বলবেন না! ব্যাটারা গলা কাটবে একেবারে! পাকা রুই বলে কি না চার টাকা চার আনা? কেউ কখনো শুনেছে এরকম? এরপর আর বাঙালীকে মাছ খেতে হবে না, আঁশ ধোয়া জল খেয়েই সাধ মেটাতে হবে, বুঝলেন?

মাছওয়ালাটি এই আলোচনা শুনতে পেয়েছে। তার এখন অন্য খদ্দের নেই। সেইজন্য সে। আলোচনায় যোগ দেবার জন্য বললো, শুধু আমাদের দোষ দিচ্ছেন? আলুর দাম কত উঠেছে বলুন? ন'আনা সের আলু! আর পটল, অন্য বছরে এই সময় ছাগলেও খেতে চায়

না, সেই পটল দশ আনা? চালের মন ধাঁ ধাঁ করে সাতাশ টাকায় চড়ে বসলো। আমাদেরও পেটে খেয়ে বাঁচতে হবে তো!

জগৎপতি মাছওয়ালাটির দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললো, তোদেরই তো এখন পোয়া বারো। চেহারায় কী রকম চেকনাই হয়েছে। হাতে তিনখানা আংটি! একদিকে ওজনে মারবি, আবার দামও হাঁকবি যাচ্ছেতাই।।

জগৎপতিরা এই সব মাছওয়ালা শ্রেণীর লোকদের অনায়াসে তুই বলে সম্বোধন করেন। প্রতাপ এমন পারেন না। নিজের পরিবারের বাইরে তিনি কারুকেই তুই বলেন না।

জগৎপতি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই পার্শে মাছ কিনছেন নাকি? এ ব্যাটা কত করে চাইছে?

মাছওয়ালা বললো, মোট তিন পোয়া আছে। সব ল্যান তো আড়াই টাকা দরে দিয়ে দেবো!

জগৎপতি এক ধমক দিয়ে বললেন, মাছি বসছে, এর দর আড়াই টাকা? মজুমদারদাদা, কিনবেন না, এগুলো কিনবেন না। ওদিকটায় একজনের কাছে ভালো পাবদা আছে, সাড়ে তিন করে দিচ্ছে, চলুন আমি কিনিয়ে দিচ্ছি। এ বাজারে তো সব ব্যাটা মাছওলা আমার চেনা!

প্রতাপের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জগৎপতি তাঁকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে এক সের পাবদা মাছ কেনালেন। প্রতাপের বাজেট ছাড়িয়ে গেল। চক্ষুলজ্জায় তিনি আপত্তি করতে পারলেন না। তাছাড়া পাবদা মাছ তাঁর মাটি মাটি লাগে। এ মাছগুলো দেখতে নরম-সরম হলেও ওজন আছে বেশ। এক সেরে উঠলো মোটে আটটা। তা ছাড়া, পাবদা মাছ প্রতাপের পছন্দের মাছ নয়! এই একটা মাছ যাতে মাছের গন্ধ নেই।

জগৎপাত জিজ্ঞেস করলেন, দাদা, আপনি এই ফিটিস্থ আগস্ট কী করছেন? খুব ব্যস্ত, অনেক মিটিং-এ যেতে হবে?

প্রতাপ হেসে বললেন, না না, আমার আবার মিটিং কিসের?

–আপনারা হাকিম মানুষ, আপনাদের কত লোক ডাকে!

প্রতাপ আবার হাসলেন। মফস্বলে যখন পোস্টিং ছিল, তখন অনেকে মানতো ঠিকই। স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলনের জন্য তাঁকেই ডাকা হতো। কিন্তু কলকাতায় কেউ গ্রাহ্য করে না।

জগৎপতি বললো, আপনি ঐ দিন ফ্রি আছেন? তবে আমাদের সঙ্গে চলুন না। বিমানদাও যাচ্ছেন।

–কোথায়?

–বারুইপুরে এই গরিবের একখানা ছোট বাড়ি আছে, ছুটির দিনটায় দু'চারজন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে যাবো ঠিক করিছি। চলুন না, খারাপ লাগবে না, পুকুরের মাছ খাওয়াতে পিরবো আশা করি।

প্রতাপ এড়িয়ে যাবার জন্য বললেন, ঠিক আছে, আমি বিমানের সঙ্গে কথা বলবো।

জগৎপতি একগাল হেসে বললেন, কথা বলার আর কী আছে? মাঝখানে তো আর তিনটে মাত্র দিন। আপনি সকাল সাড়ে আটটায় শেয়ালদা সাউথ স্টেশনে চলে আসুন! প্রতাপ বললেন, আচ্ছা দেখি!

–আর দেখাদেখির কিছু নেই। আপনাকে কিন্তু কাউন্ট করছি। আমি বিমানদাদাকে আগেই আপনাকে ইনফ্লুড করার কথা বলেছিলুম, বিশ্বাস করুন। আটটা পঞ্চাশের ট্রেন, ফেইল না হয়!

জগৎপতি বিদায় নেবার পর প্রতাপ বাকি বাজার সারতে লাগলেন। ইচ্ছে মতন মাছ কিনতে পারেননি বলে তাঁর মুখখানা গোমড়া হয়ে গেছে। একজন তরকারিওয়ালার সঙ্গে তিনি প্রায় ঝগড়া করে ফেলছিলেন। একেই তো সব জিনিসের দাম বেশি, তার ওপর খুচরো পয়সা দেবার সময়েও ওরা ঠকাচ্ছে। কয়েক মাস আগে নয়া-পয়সা চালু হয়েছে। টাকা-আনা-পাইয়ের বদলে একশো নয়া পয়সায় একটাকা। এখনো আনি-দুয়ানি চলছে, নয়া পয়সাও চলছে। পুরনো পয়সার বদলে নতুন খুচরো দিতে গিয়ে সব দোকানদারই কম দেয়।

মেজাজ গরম করতে গিয়ে প্রতাপ শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। সামান্য দু'একটা পয়সার জন্য বকাবকি করা কি তাঁর মানায়? তিনি এত নীচে নেমে যাচ্ছেন? প্রতাপ নিজেকেই ধমক দিলেন। তারপর আলুওয়ালার কাছ থেকে খুচরো পয়সা ফেরৎ না নিয়েই হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বাজার থেকে।

পরদিন বিমানবিহারীর একজন কর্মচারী একখানা চিঠি নিয়ে এলো। ১৫ অগাস্ট জগৎপতি দত্তের বারুইপুরের বাড়িতে পিকনিকে যাওয়ার জন্য তিনি প্রতাপকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাদেরও নেমন্তন্ন।

মমতার ক'দিন ধরে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, তিনি যেতে রাজি হলেন না। পিকলু আর বাবলু দু'জনেই পাড়ার ক্লাবের ফাংকশনের সঙ্গে জড়িত। তুতুল আর মুন্নিকে অন্তত নিয়ে যেতে চাইলেন প্রতাপ, তুতুলও অনিচ্ছা প্রকাশ করলো!

১৫ই আগাস্ট খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল সকলের। প্রভাত ফেরী বেরিয়েছে বিভিন্ন ক্লাব থেকে। শুধু গান নয়, তার সঙ্গে আছে বিউল ও কেব্ল ড্রাম। একটার পর একটা মিছিল। আসছে।

প্রতাপ তৈরী হয়ে নিয়ে মুন্নির হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন সাতটার মধ্যে। ট্রাম বাসে যাওয়া অনিশ্চিত, আজ শিয়ালদা পর্যন্ত হেঁটেই যেতে হবে। মুন্নি একটা লাল রঙের ফ্রক

পরেছে, তার পিসিমণি এটা বানিয়ে দিয়েছেন। সুপ্রীতির শেলাই-ফোঁড়াইয়ের যথেষ্ট জ্ঞান আছে। প্রতাপকেও নিজের হাতে একটা পাঞ্জাবি বানিয়ে দিয়েছেন এবারের জন্মদিনে।

মুন্নি এখন স্কুলে যাচ্ছে, কিন্তু তার মুখে আঙুল দেওয়া রোগটি এখনো যায়নি। মমতা আজ বারবার বলে দিয়েছেন বাইরের লোকজনদের মাঝখানে সে যেন ওরকম অসভ্যতা না করে। প্রতাপকেও তা সর্বক্ষণ নজর রাখতে হবে।

রাস্তার মোড়ে বানানো হয়েছে তোরণ। চতুর্দিকে ঝুলছে কাগজের মালা। অনেক বাড়ির ছাদে ওড়ানো হয়েছে জাতীয় পতাকা, প্রতাপের বাড়িওয়ালাও বাদ যায়নি। এ বছরের উৎসবের জাঁকজমক অনেক বেশী। শুধু স্বাধীনতার দশম বৎসর তো নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের একশো বছর পূর্তি। ১৭৫৭-তে পলাশী যুদ্ধে বাংলার পতন, ১৮৫৭-তে সিপাহী বিপ্লব, তারপর এই ১৯৫৭; অনেকে ভেবেছিল এ বছরও সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটবে! এ পর্যন্ত তো কিছুই দেখা গেল না! অবশ্য গুজব ছড়িয়েছে নানারকম। অনেকেই বলাবলি করছিল, নেতাজী সুভাষ বোস তিব্বতে তাঁবু গেড়ে আছেন, এই বছরই তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবার ভারতে ঢুকবেন, তারপর হিন্দুস্থান-পাকিস্তান এক করে দেবেন। তাঁকে সবাই মানবে।

প্রতাপ অবশ্য এ গুজব একটুও বিশ্বাস করেননি। সুভাষ বোস যদি বেঁচেও থাকেন, তাহলে তিনি সৈন্যবাহিনী পাবেন কোথায়? আই এন এর সবাই তো আত্মসমর্পণ করেছিল। যুদ্ধ চলার সময় জওহরলাল বলেছিলেন, সুভাষ বোস যদি বিদেশী সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতে পা দেন তাহলে তিনি নিজে তলোয়ার নিয়ে তাঁর মোকাবিলা করবেন। এখন যদি সুভাষবাবু সত্যিই কোনো সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসেন তাহলে কী বলবেন জওহরলাল? তিনি কি সহ্য করতে পারবেন তাঁর এই প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে?

বহু বাড়ির ছাদ ও বারান্দায় তো জাতীয় পতাকা উড়ছেই, রাস্তায় অনেক লোক হাতে একটা করে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে ঘুরছে। মুন্নি বললে, বাবা, আমাকে একটা ফ্ল্যাগ কিনে দাও!

প্রতাপকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হলো না, শ্যামবাজারের মোড়ে আসবার আগেই একদল ছেলে তাঁর আর মুন্নির জামায় আলপিন দিয়ে দুটি পতাকা আঁকা ব্যাজ লাগিয়ে দিয়ে বললো, একটা টাকা দিন স্যার!

ব্যাজগুলোর দাম দু'আনার বেশী নয়। এই সুযোগে কেউ কেউ ব্যবসাও শুরু করে দিয়েছে। বিনা আপত্তিতে প্রতাপ টাকাটা দিয়ে দিলেন। আর এক টাকা দিয়ে মুন্নির জন্য একটা পতাকা আঁকা গ্যাস বেলুনও কিনলেন। বেলুনের সুতোটা বেঁধে দিলেন মুন্নির বাঁ হাতে। স্বাধীনতা না উড়ে চলে যায়!

স্বাধীনতা! প্রতাপদের যৌবনের স্বপ্নের স্বাধীনতা! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি যখন বোঝা গিয়েছিল ইংরেজ জিতুক বা হারুক, এবারে সত্যিই ভারতের স্বাধীনতা আসবে। তখন কী সাংঘাতিক উত্তেজনায় দিন গেছে। স্বাধীনতা শব্দটি শুনলেই রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠতো। যেন স্বাধীনতা এদেশে সোনার দিন এনে দেবে।

স্বাধীনতার পর অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়, তা সবাই জানে। দেশের মানুষ অনেক রকম ত্যাগ স্বীকার না করলে একটা নতুন দেশের স্বাধীনতা মজবুত হয় না। কিন্তু ত্যাগ স্বীকার করছে কারা? শুধু গরিবরা। যারা ধনী, তারা অনেকেই আরও ধনী হচ্ছে, রাজনীতির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তৈরি হচ্ছে একদল নতুন ধনী সম্প্রদায়। একটা উটকো দালাল শ্রেণী, তাদের ধরন বারণই অসহ্য। এই দশ বছর ধরে পণ্ডিত নেহেরু ভারতে টিকিয়ে রেখেছেন গণতন্ত্র। এই তাঁর গর্ব। শুধু ভোটের গণতন্ত্র! সারা দেশ জুড়ে অভাব-অনটন। চতুর্দিকে ধর্মঘটের হুমকি। এই মাসেই তো সর্বভারতীয় সরকারি কর্মচারী ধর্মঘটের প্রস্তাব কোনো রকমে ধামা চাপা দেওয়া হলো। ডাক ও তার কর্মীরা ধর্মঘটে প্রায় নেমেই পড়েছিল, তোষামোদ করে থামানো হয়েছে। এদের বেলায় তোষামোদ, কিন্তু দিল্লীতে ঝাড়ুদারদের ধর্মঘটে নেহরুর নাকের ডগার ওপর রেহ গুলি চালালো পুলিশ। সরকারী হিসেবেই মারা গেছে দু'জন, বেসরকারী হিসেবে কতজন কে জানে? যেখানে গান্ধীজী নিহত হয়েছিলেন সেখানেই আবার গুলি খেয়ে মরলো তাঁর প্রিয় হরিজনরা!

–বাবা, ওটা কী ঠাকুর?

মুন্নির কথা শুনে প্রতাপ ধাতস্থ হলেন। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আজ এই সব তিক্তকথা মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই ভালো।

একটা বেশ বড় ক্লাবের মিছিল বেরিয়েছে। সাদা পোশাক পরা নানা বয়েসী ছেলে-মেয়েরা ধীরতালে হাঁটছে দু'সারিতে, গান গাইতে গাইতে। অবশ্য ড্রাম-বিউগলের ধুন্ধুমারে গান শোনাই যাচ্ছে না। কিন্তু ফুটফুটে মুখগুলি দেখতে ভালো লাগে। কার্ডবোর্ড কেটে গান্ধীজীর একটা বড় মূর্তি বানিয়ে মাঝখান দিয়ে নিয়ে চলেছে একটা ঠেলা গাড়িতে চাপিয়ে। মুন্নি ওটাকেই ঠাকুর ভেবেছে। হ্যাঁ ঠাকুরই বটে, গান্ধী ঠাকুর, জাতির পিতা! প্রত্যেক সরকারী অফিসে, স্কুল-কলেজে গান্ধীজীর রং করা ছবি ঝোলে। এমনকি আদালতে, বাররুমেও। কিন্তু গান্ধীজীকে ভুলে গেছে সবাই, তার নীতিটিতি সব গোল্লায় গেছে। অহিংসার কথা শুনলেই সবাই হাসে। গান্ধী টুপি পরা মন্ত্রীরা প্রথম প্রথম সব বক্তৃতাতেই একবার করে গদগদ স্বরে গান্ধীজীর নাম। উচ্চারণ করতেন, এখন তাও বন্ধ। পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে জেদাজেদি করে সমরাস্ত্র বাড়িয়ে চলেছেন।

--ঠাকুর না রে, উনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

–নমো করবো?

প্রতাপ একটু দ্বিধা করলেন। মেয়েকে তিনি কী শেখাবেন? গান্ধীজীর মূর্তিকে প্রণাম করবার তিনি কোনো যুক্তি খুঁজে পান না। কিন্তু বাচ্চা মেয়ে, ওদের জগৎটা অন্যরকম।

এর পর যে মিছিলটা এলো, তাতে গান্ধীজীর মূর্তি নেই, কিন্তু ছেলেমেয়েরা অনেকগুলি বড় বড় ছবি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই ফরোয়ার্ড ব্লকের। ছবিগুলি সুভাষ বোস, ধীলন, শা-নওয়াজ খান, লছমী বাঈ এই সব আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের। এই মিছিল দেখে রাস্তার দু'পাশের লোক হাততালি দিয়ে উঠলো। বাঙালীরা কোনোদিন যুদ্ধ করেনি, কিন্তু যুদ্ধের গল্প ভালোবাসে। আজকাল সুভাষবাবুর ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছবি

দেখাই যায় না। সবই মিলিটারি পোশাক পরা চেহারা। সুভাষবাবু সম্পর্কে মাঝে মাঝেই যেসব গুজব ছড়ায়, তার কোনোটাতেই তাঁর একা ফিরে আসার কথা নেই। তিনি আসবেন সামরিকবাহিনীর প্রধান হয়ে!

মানিকতলা পর্যন্ত হেঁটে আসার পর প্রতাপ বুঝতে পারলেন মুন্নি ক্লান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সে বাবার কোলেও চড়বে না। বাস দেখা যাচ্ছে না একটাও কিন্তু ট্রাম বেরিয়েছে, কচ্ছপ গতিতে চলছে। প্রতাপ একটা ট্রামে চেপে বসলেন। হাতে অনেক সময় আছে।

মুন্নি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মিছিল দেখতে দেখতে বললো, বাবা, স্বাধীনতা দিবসে গাড়িতে চড়লে কি পাপ হয়? সবাই যে হেঁটে যাচ্ছে!

প্রতাপ বললেন, না রে! ওরা তো মিছিল করে যাচ্ছে, আমরা অন্য জায়গায় যাচ্ছি।

মুন্নি আবার জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বাবা, ওরা হাঁটতে হাঁটতে কত দূরে যাবে? স্বাধীনতা কোথায় আছে?

প্রতাপের পাশে একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন, এইবার মোশাই আপনার মেয়ে একখানা সুকঠিন প্রশ্ন করেছে। উত্তর দিন!

প্রতাপও হাসলেন।

বৃদ্ধটি মুন্নির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, ভারী মিষ্টি মেয়ে। মা, সারা জীবন ধরেই স্বাধীনতা খুঁজতে হয়। সহজে তো পাওয়া যায় না!

শিয়ালদায় নেমে প্রতাপ দেখলেন প্রধান গেটের কাছেই জগৎপতি দাঁড়িয়ে আছেন একটি ছোট দল নিয়ে। প্রতাপকে দেখে উনি হৈ হৈ করে স্বাগত জানালেন। তারপর বললেন, ঐখেনে ছায়াতে গিয়ে দাঁড়ান, বিমানদারাও এসে গেছেন।

বিমানবিহারীর সঙ্গে এসেছে অলি আর বুলি। মুন্নি ওদের দেখে ছুটে গেল। অলি জিজ্ঞেস করলো, পিকলুদা বাবলুদা আসেনি? কেন? এমা, ভাল্লাগে না, আমরা তো ওখানে আর কারুকে চিনি না!

বিমানবিহারী আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, মেঘ মেঘ করেছে, বৃষ্টি হলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে!

প্রতাপ বললেন, এ বছর তো বৃষ্টি হলোই না ভালো করে। হোক, বৃষ্টি হোক। বিমানবিহারী হেসে বললেন, তা বলে আজকের দিনটাতেই হতে হবে কেন? আজ সব ছেলে-মেয়েরা উৎসব করছে, আমরা পিকনিক যাচ্ছি...

একটি চা-ওয়ালা সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, চা খাবে নাকি? ওহে, দাও তো–

বিমানবিহারী সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, আমি না, আমি না, ওরে বাবা, এই চা! গুড় দিয়েছে, কতক্ষণ ধরে ফুটিয়েছে ঠিক নেই, জিভের স্বাদ নষ্ট করে দেবে!

প্রতাপ বললেন, আমার জিভ পুরু, আমার এতেই চলবে।

মাটির খুরিতে পেতলের কলসী থেকে ঢালা চা দু'বার নিলেন প্রতাপ। তারপর সিগারেট ধরিয়ে গল্প করতে লাগলেন বন্ধুর সঙ্গে।

কিন্তু এখানে এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়াবার উপায় আছে? অসম্ভব ভিখিরির উপদ্রব। বুড়ো, বুড়ি, বাচ্চা ভিখিরী। নাছোড়বান্দা সব। বিমানবিহারীদের মাঝে মাঝেই সরে দাঁড়াতে হয়। স্টেশন চত্বরটাতে যেমন নোংরা, তেমন দুর্গন্ধ। ভেতরের সব প্ল্যাটফর্মে উদ্বাস্তুদের স্থায়ী আস্তানা, এখন অনেকে বাইরেও উপছে এসেছে। এদিকে ওদিকে ছেঁড়া চটের তাঁবু। তার মধ্যেই চলেছে মানুষের সংসার।

বিমানবিহারী ছাপাখানার গল্প শুরু করেছেন। পূজোর আগেই তাঁর পাঁচখানা বই প্রকাশ করার কথা, কিন্তু তাঁর প্রেসের কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছে। অকটোবর-নভেম্বরের মধ্যে বই বাজারে ছাড়তে না পারলে তিনি টেক্সট বুক সিলেকশন কমিটিতে ধরাতে পারবেন না, সেইজন্য তিনি উদ্বিগ্ন। এই রকম মেঘলা দিনে ছাপা ভালো হয়। তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার গুপ্ত বলেন, কবিরা যেমন আকাশের মেঘ দেখে কবিতা লেখে, সেইরকম কবিতার বই ছাপার জন্যও আকাশে মেঘের অপেক্ষা করতে হয়।

একটি বুড়ি ভিখিরী অনেকক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছে। প্রতাপ এক সময় চমকে উঠলেন। কালুর মা নয়? মালখানগরে কালুর মা ছিল অনেকগুলি বাড়ির বাঁধা ধাইমা। প্রতাপও কালুর মা'র হাতে জন্মেছেন। সেই কালুর মা এখানে ভিক্ষে করছে? পরক্ষণেই প্রতাপ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। কালুর মায়ের এতদিন বেঁচে থাকার কথা নয়। তবু তিনি বুড়িকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি কোথায় ছিল।

ঘোলাটে চোখ তুলে বুড়ি বললো, বাড়ির কথা আর জিগাইও না, বাবা! কুনোদিন যে আমাগো বাড়ি আছিল, তা যেন নিজেরই আর বিশ্বাস হয় না!

প্রতাপ একটা দশ নয়া দিলেন। এ সে নয়, তবু এই বুড়ির চেহারা অবিকল কালুর মায়ের মতন।

বিমানবিহারী এখনো ছাপাখানার কথা বলে যাচ্ছেন, প্রতাপ সে দিকে মন দিতে পারছেন না। তিনি দেখছেন রিফিউজিদের তাঁবু। তাঁর আর বিমানবিহারীর দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ হবেই। কলকাতার মানুষদের রিফিউজি দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে। সহানুভূতি শুকিয়ে গেছে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। একটানা দশ বছর ধরে সহানুভূতি টিকিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু প্রতাপ এখনো এদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন।

তিনি অস্ফুটভাবে বললেন, দেশ বিভাগের দশ বছর পূর্ণ হয়ে গেল, এখনো রিফিউজিদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারলো না দেশের সরকার। এই স্বাধীনতার মূল্য কী?

বিমানবিহারী এবারে এদিকে মনোযোগ ফিরিয়ে বললেন, দশ বছরের স্বাধীনতা তো নিতান্ত শিশু, এর মধ্যে কতটুকুই বা করা সম্ভব বলো। সমস্যা তো হাজারটা।

তারপর আশপাশের তাঁবুগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন,এরা সবাই কিন্তু ইস্ট পাকিস্তানের রিফিউজি নয়, বুঝলে। শুনেছি, সুন্দরবন অঞ্চলে এ বছর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলছে- সেখানকার মানুষ হাজারে হাজারে কলকাতায় চলে আসছে। এরপর রাস্তাঘাট সব ভরে যাবে।

প্রতাপ বললেন, সুন্দরবন থেকে যারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে কলকাতায় আশ্রয় নিতে আসে, তারাও রিফিউজি!

ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, কুড়িবাইশ জনের একটি দল ট্রেনে উঠলো। বারুইপুরে পৌঁছে দেখা গেল জগৎপতি দত্ত অতি বিনয় করেছিলেন। এখানে তাঁর প্রচুর সম্পত্তি। একটি বেশ ছড়ানো পাকা বাড়ি, দু'দিকে ঘেরা বারান্দা, সামনে চওড়া উঠোন, তারপর বাগান, একধারে একটি পুকুর সেটিকে দীঘি বলা যায়। সে বাড়ীতে পৌঁছানো মাত্র ফল-মিষ্টি-মাছভাজা দিয়ে এমন জলখাবার দেওয়া হলো যে দুপুরের খাওয়াটা কী পরিমাণ হবে তা অনায়াসে বোঝা যায়।

ছেলেমেয়েদের খুব মজা, এতখানি ফাঁকা জায়গা তো কলকাতায় পাওয়া যায় না। উঠোনের এক কোণে একটা সবেদা গাছ, মুন্নি ঐ গাছ আগে দেখেনি। সে জিজ্ঞেস করলো, বাবা, ক্যাম্বিসের বলের মতোন ঐগুলো কী? উঠোনের আর এক কোণে বড় বড় বঁটিতে কাটা হচ্ছে পুকুর থেকে ধরা রুই কালা, একটা প্রায় চার-পাঁচ সের ওজনের রুই এখনো লাফাচ্ছে, অত। বড় মাছও মুন্নি দেখে নি কখনো, সে ভয় পেয়ে বাবার হাত চেপে ধরলো।

পুকুরঘাটে একটা নৌকো বাঁধা আছে। অলিবুলি বায়না ধরলো সেই নৌকো চাপবে। সবাই এক সঙ্গে না না করে উঠলো। জগৎপতির ছেলে করুণাসিন্ধু বললো, আমাদের হারান থাকলে তবু নিয়ে যেতে পারতো ওদের, সে ভালো নৌকো চালায়, কিন্তু হারানের জ্বর।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, বৈঠা আছে? তা হলে মাঝির দরকার নেই, আমিই চালাতে পারবো।

করুণাসিন্ধু জিজ্ঞেস করলো, আপনি বুঝি রোয়িং জানেন?

প্রতাপ হেসে বললেন, না, আমি কোনো সুইমিং ক্লাবে রোয়িং শিখিনি, তবে নদী-নালার। দেশের মানুষ তো। নৌকো চালাতে জানি।

বৈঠা নিয়ে তিনি নৌকোয় উঠে বাচ্চাদের ডেকে বললেন, আয়, তোদের ঘুরিয়ে নিয়ে। আসি।

বিমানবিহারীর মুখ শুকিয়ে গেছে। আদালতের একজন হাকিম নৌকো চালাবেন, একথা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রতাপ বিমানবিহারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয় নেই, বাচ্চাদের দায়িত্ব আমার। তুমিও আসবে নাকি!

বিমানবিহারী সাঁতার জানেন না, তিনি নৌকোয় উঠতে রাজি হলেন না।

প্রতাপ মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, যুদ্ধের পরের বছর দেশে গিয়ে তিনি শেষবার নৌকো চালিয়েছিলেন। এগারো বছর আগে। বৈঠা জলে ফেলে তিনি বুঝতে পারলেন, কিছুই ভোলেন নি। তিনি অনায়াসে চলে এলেন মাঝপুকুরে। বেশ স্বচ্ছ জল, এদিকে ওদিকে ফুটকাটা দেখে মনে হয় অনেক মাছ আছে। প্রতাপদের বাড়ির দীঘিটাও এইরকম সাইজই হবে। তবে তার একদিকে ঘন জঙ্গল ছিল, এখানে বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে, প্রতাপদের দীঘির পাড়ে সেই ঘন জঙ্গল কি এখনো আছে?

অলিবুলিরা একটুও ভয় পায়নি, তারা হাসছে খলখলিয়ে। প্রতাপ ফিরতে চাইলেও তারা রাজি নয়। তারা সমস্বরে বলছে, আর একটু, আর একটু। দূরে ঘাটের কাছে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অনেক দর্শক।

দুপুরের খাওয়ার আয়োজন দেখে সত্যি চক্ষু চড়কগাছ হবার উপক্রম। প্রত্যেকের জন্য বড় কাঁসার থালা, সেই থালা ঘিরে সাতখানা বাটি। এত বাসনপত্র আছে এদের? এত খাওয়া কি। মানুষে খেতে পারে? জগৎপতি খাওয়াতে খুব ভালোবাসেন, মাঝে মাঝেই নাকি কলকাতা। থেকে এরকম বন্ধুবান্ধবের দল নিয়ে আসেন।

বিমানবিহারী স্বল্পাহারী মানুষ, তিনি প্রায় কিছুই খাচ্ছেন না, জগৎপতি জোর করছেন তাঁকে। সামনে বসে বলছেন, দাদা, খান, খান, একদিন তো, কলকাতায় খেয়ে কিছু সুখ আছে? সবই তো বাসি কিংবাভেজাল। এরকম টাটকা জিনিস পাবেন কোথায়? জানেন দাদা, যা যা খাচ্ছেন, তার একটা জিনিসও কেনা নয়। সব আমার নিজের বাড়ির। আমার নিজের খেতের চাল, বাড়ির গরুর দুধের ঘি, আলু-পটল-বেগুন সবই আমার বাগানে হয়, নিজের পুকুরের মাছ...

তারপর তিনি প্রতাপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দাদা, খাচ্ছেন তো?

প্রতাপ উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর গলা হঠাৎ আটকে গেছে, চোখ জ্বালা করছে। নিজেকে তিনি সামলাবার চেষ্টা করছেন অতি কষ্টে। এ কী ছেলেমানুষী করছেন তিনি, বাস্তবকে মেনে নিতে পারছেন না? ইতিহাসকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হয়। এত লোকের সামনে তিনি কেঁদে ফেলবেন নাকি?

কথা না বলে প্রতাপ শুধু দু'বার মাথা নাড়লেন। তারপর জগৎপতি কী যে বলে যেতে লাগলেন, তিনি আর তা শুনতে পেলেন না। তাঁর মনে পড়ছে মায়ের কথা। দেওঘরে মা একেবারে নিষ্প্রাণ, শীতল হয়ে গেছেন। অথচ মাত্র এক দশক আগে, তাঁর মা এইরকমভাবে সবাইকে কত উৎসাহ করে খাওয়াতেন, অবিকল এইরকম একটি বাড়ি, নিজেদের খেতের চাল, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ, বাড়িতে তৈরি ঘি....

আজ স্বাধীনতার দিনে জগৎপতি দত্ত বন্ধু-বান্ধবকে খাইয়ে আনন্দ করছেন। স্বাধীনতার মূল্য এক একজনের কাছে এক একরকম!

৪৬ একটা নড়বড়ে কাঠের টেবিল

একটা নড়বড়ে কাঠের টেবিল, তার ওপরে সাজানো নানা রঙের ওষুধের শিশি। হাতলহীন চেয়ারে বসা মধ্যবয়স্ক ডাক্তারবাবুটির কপালে চন্দনের তিলক, বিরল-কেশ মাথায় একটি টিকি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি। ডাক্তারবাবুটিকে পুজুরী বামুন হিসেবেই যেন বেশি মানাতো। তাঁর সামনে রুগীদের লম্বা লাইন।

টেবিলের একপাশে একটি প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে আছে হারীত মন্ডল। একটা ঠেঙো ধুতি পরা, খালি গা, বুকে কাঁচা-পাকা চুল, গালে খরখরে দাড়ি। তার ঠোঁটের মিটিমিটি হাসিটি ঠিক আছে, সে একটা বিড়ি টানছে বেশ আরাম করে।

প্রত্যেক রুগীরই প্রায় একই রকম ঘ্যানঘেনে অভিযোগ, ডাক্তারবাবুটি মন দিয়ে শুনছেন না কিছুই, কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, শিশি কিংবা বোতল এনেছো তো? যারা শিশি বা বোতল সঙ্গে এনেছে, তারা বিনা পয়সায় ওষুধ পাবে। যারা আনেনি, তাদের চার আনা দিয়ে শিশি কিনতে হবে। সমস্ত রুগীরা এই দু'ভাগে ভাগ করা। যাদের শিশি নেই, তাদের অনেকের কাছে চার আনা পয়সাও নেই, সুতরাং তাদের অসুখের বিবরণ শুনেও কোনো লাভ নেই। বিনা পয়সার ওষুধ হলেও ডাক্তারবাবু তো রুগীদের গলায় তা ঢেলে ঢেলে দিতে পারেন না।

কম্পাউন্ডার একটি দশ-এগারো বুছরের ছেলে। এই কলোনি থেকেই চালাক চতুর বলে, তাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। অসুখ অনুযায়ী ডাক্তারবাবু তাকে বলেন, লাল! সে বড় বোতল থেকে ঠিক মাপ করে লাল ওষুধ ঢেলে দেয় রোগীর শিশিতে।

শেষ রোগীটি একটি শিশু, বছর চারেক বয়স, জ্বরে মুখখানা নীল হয়ে গেছে, তার মা কাঁদছে হাউ হাউ করে। কারণ সেই স্ত্রীলোকটির শিশিও নেই, চার আনা পয়সাও নেই। এই চ্যাঁচার বেড়া দেওয়া ঘরখানির বাইরেই একটি লোক ঝুড়ি ভর্তি খালি শিশি-বোতল নিয়ে বিক্রির জন্য বসে আছে, সে এবার উঠি-উঠি করছে।

স্ত্রীলোকটি অবুঝের মতন শুধুই কাঁদছে, যেতে চাইছে না কিছুতে। ডাক্তারবাবু বিরক্তি-হতাশায় দু'হাত ছুঁড়ে বললেন, শিশি না থাকলে আমি কিসে ওষুধ দেবো?

হারীত মন্ডল বললো, আপনার ঐ বড় শিশি তো দুই একটা খালি হইছে, তারই একটা দিয়ে দ্যান না!

ডাক্তারবাবু চোখ গরম করে হারীত মন্ডলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার স্টক থেকে খালি বোতল দেবো? ওতে আবার কাল নতুন মিক্সচার ভরতে হবে না? তা ছাড়া, একজনকে দিলে আর রক্ষে আছে? কাল আর পাঁচজন এসে আবার কেঁদে পড়বে না? বলবে, 'অরে দিছেন, আমারে ক্যান দেবেন না?'

ডাক্তারবাবু শেষ কথাটি এমন মুখভঙ্গি করে বললেন যে, হারীত মন্ডল না হেসে পারলো না। সে বললো, তা ঠিক! পাকিস্তান থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসার সময় বুদ্ধি করে অন্তত দু' দেশটা খালি শিশি-বোতল আনা উচিত ছিল।

তারপর সে স্ত্রীলোটিকে বললো, ও নিমাইয়ের মা, শুধু শুধু কেন্দে কী হবে? দ্যাখতে আছো তো ডাক্তারবাবুর কোনো উপায় নাই! বরং এস্টেশনের কাছে গিয়া ভিক্ষা মাইগা দ্যাখো চাইর আনা পয়সা পাও কি না!

হারীত মন্ডলের কথা শুনে স্ত্রীলোকটি কান্না থামালো। হারীত মন্ডলকে শোনাবার জন্যই সে। সম্ভবত বেশি করে কাঁদছিল। হারীত মন্ডল তাদের নেতা, সে ভরসা না দিলে আর কোন উপায় নেই।

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল, ডাক্তারবাবু এবার তাকে ডেকে বললেন, দাঁড়াও বাছা! এত জ্বর বাছাটার–

পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি সিকি বার করে দিয়ে রাগতভাবে বললেন, এই নাও, শিশি। কিনে আনো। এ কথা যেন আর কারুকে বলো না। তা হলে আমি ফতুর হয়ে যাবো!

তারপর তিনি তাঁর কম্পাউন্ডারের দিকে ফিরে বললেন, হলুদ!

স্ত্রীলোকটি বিদায় নেবার পর ডাক্তারবাবু একটি কাঁচি সিগারেটের প্যাকেট বার করে হারীত মন্ডলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, চলবে?

হারীত মন্ডল মাথা নেড়ে বললো, না, ওয়াতে আমি স্বাদ পাই না। আমার বিড়িই ভালো।

আর একটি বিড়ি ধরিয়ে সে গল্প করার ভঙ্গিতে বললো, আগে দেখতাম, ডাক্তারবাবুরা রুগী। পরীক্ষা করে তারপর পেরেসক্রিপশন ল্যাখতেন। এই দেশে আপনারা বুঝি পেরেসক্রিপশান ল্যাখেন না? নিয়ম পাল্টাইয়া গ্যাছে?

ডাক্তারটির নাম হরিসাধন চক্রবর্তী, লোকে বলে হরি ডাক্তার। এই অঞ্চলেরই মানুষ। তাঁর বাবা ছিলেন কবিরাজ, ইনি এল এম এফ। তাঁর মুখে সবসময় একটা রাগ রাগ ভাব, জোর দিয়ে, বকুনির সুরে কথা বলেন কিন্তু মানুষটি কঠোর নন্।

হারীত মন্ডলের কথা শুনে তিনি চোখ সরু করে তাকালেন। এই লোকটিকে তিনি যতই দেখছেন ততই অবাক হচ্ছেন। এই লোকটি স্থানীয় রিফিউজি কলোনির নেতা কিন্তু কখনো একে তিনি জঙ্গিভাব নিয়ে লাফ-ঝাঁপ, চ্যাঁচামেচি করতে দেখেননি। হাসি হাসি মুখে এমনভাবে অন্তর টিপ্পুনি দিয়ে কথা বলে যাতে বোঝা যায় লোকটি অনেক কিছু জানে। কিন্তু এই ধরনের মানুষ কলোনির মধ্যে এত কষ্ট সহ্য করে থাকবে কেন, এরা তো অনায়াসেই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা জীবন যাপন করতে পারে।

ডাক্তার বললেন, প্রেসক্রিপশান লিখে কী হাতি' ঘোড়া হবে? শুধু শুধু কাগজ নষ্ট। বাইরে থেকে ওষুধ কেনার কোনো ক্ষমতা আছে এদের?

হারীত মন্ডল সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মেনে নিয়ে বললো, তা ঠিক। তারপর সে ওষুধের বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো, লাল ওষুধ হইলো প্যাট ব্যথার, হইল্‌দা ওষুধ জ্বরের, সবুজ ওষুধটা মাথা ঘোরা আর গায়ে বেদনা-কাটাকুটির, আর ঐ খয়েরি রঙের

ওষুধটা আমাশা-পাতলা পায়খানা .... ঠিক হয় নাই? দ্যাখেন, বসে বসে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তবে দুই একবার দ্যাখলাম, আপনি মাথা ঘোরা কিংবা পেট ব্যথার রুগীরেও লাল ওষুধ দিলেন।

–তা হতেই পারে না!

–লাল ওষুধটা বেশি আছে, তাই ওটাই বেশি দিতেছিলেন! ডাক্তারবাবু, আমি একটু আপনের ওষুধ খেয়ে দেখবো?

–আপনি ওষুধ খাবেন কেন, আপনার আবার কী হয়েছে?

–কী জানি ভিতরে ভিতরে কত কী হয়ে বসে আছে। ওষুধ যখন আছে, তখন একটু খেয়ে লই।

তারপর হারীত কম্পাউন্ডার ছেলেটির দিকে আঙুল তুলে বললো, এই ছ্যামরা, দে তো, একটু লাল ওষুধ আমার গলায় ঢেলে দে।

ছেলেটি হারীত মন্ডলের হুকুম তামিল করলো সঙ্গে সঙ্গে। হারীত জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললো, বাঃ, বেশ স্বোয়াদ আছে। জোরালো ওষুধ! এবারে সবুজটা একটু দে তো!

ডাক্তারবাবু হা-হা করে উঠে বললেন, এ কী করছেন? আর দরকার নেই। ওতেই যথেষ্ট হয়েছে!

হারীত একগাল হেসে বললো, খাই না, আর একটু খাই। আমাদের পন্ডিতমশাই বলতেন, অধিকন্তু ন দোষায়। আপনে শোনেননি কথাটা। এই ছামরা দে!

এক এক করে প্রত্যেকটি বোতলেরই ওষুধ চেখে দেখলো হারীত। ডাক্তারবাবু এতক্ষণে বুঝে গেছেন ওর মতলোব। লোকটির যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

হারীত মণ্ডল চোখ টিপে বললো, সব কটারই স্বোয়াদ এক। কোনো ব্যাসকম নাই!

ডাক্তারবাবু বললেন, আমি কী করবো? আমার যা বাজেট সেই অনুযায়ীই তো চালাতে হবে। সরকার আপনাদের জন্য পয়সা খরচ করতে যদি না চায়–

–তা বলে আপনি ডাক্তার হয়ে জেনেশুনে এই বোকা আর গরিব মানুষগুলোকে ধোঁকা দিচ্ছেন।

–আমার যতদূর সাধ্য তো আমি করছি। এটা একটা জেনারাল মিক্সচার, সবরকম অসুখেই কিছু কিছু কাজ হয়। ওদের বিশ্বাস জন্মাবার জন্য আমি আলাদা আলাদা রঙ করে দিয়েছি। এতে উপকার যেটুকু হবার তা হবে, কিন্তু ক্ষতি কিছু হবে না!

–আপনি মানুষ খারাপ না, আপনারে আমি দোষ দিই না। কিন্তু একইভাবে কতদিন চলবে? প্রত্যেক সপ্তাহে দুই তিনজন মারা যাইত্যাছে। আমাগো ঘরগুলা দ্যাখছেন? গরু-ছাগলেও অত খারাপ জাগায় থাকে না!

–দেখে আর কী করবো বলুন! এই দেখুন না, আমার এই ডিসপেনসারির চাল ফুটো হয়ে গেছে। বৃষ্টির সময় জল পড়ে। রিলিফ ডিপার্টমেন্টে চিঠি লিখে লিখেও কোনো উত্তর পাই না। শুনুন হারীতবাবু, আপনাকে একটা স্পষ্ট কথা বলি। এই ক্যাম্পের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সরকার এই ক্যাম্পের জন্য আর কিছু করবে না! আপনারা বাংলার বাইরে যেতে রাজি হচ্ছেন না কেন?

–কে বললো রাজি হই নাই?

ডাক্তারবাবু তাঁর টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা খবরের কাগজ বার করলেন। প্রথম পৃষ্ঠায়ই। একটা হেডলাইনের ওপর আঙুল রেখে বললেন, এই দেখুন, পালামেন্টে প্রায় প্রত্যেকদিনই আপনাদের ব্যাপার নিয়ে ফাটাফাটি হচ্ছে। পুনবাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না

স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ-আসাম-ত্রিপুরা ওভার স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, এখানে আর রিফিউজিদের ঠাঁই দেওয়া অসম্ভব।

হারীত বললো, তার মানে? ঐ যে ওভার কী কইলেন?

-ওর মানে, ইয়ে, টায় টায় ভর্তি, মানে জনসংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে, এখন। রিফিউজিদের বাইরে সেক্স করাতে হবে।

-তা বেশ তো!

-কিন্তু বিরোধীরা আপত্তি তুলেছে। কমুনিস্ট পার্টির নেতা সাধন গুপ্ত দাবি তুলেছেন, উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গেই থাকতে চায়। সুন্দরবন অঞ্চল ডেভেলাপ করে সেখানে তাদের থাকতে দিতে হবে।

-ঐ সাধনগুপ্ত বাবু নিজে কি একজন রিফিউজি!

-তা জানি না।

-ঐ মেহেরচাঁদ খান্না বাবু কোন্ জাত?

-জাত মানে? বামুন-কায়স্থ ...আমি ঐ সব নিয়ে মাথা ঘামাই না।

-সে কথা কইতেছি না। খান্না তো বাঙালী হয় না। উনি কি তাহলে পাঞ্জাবী? দ্যাখেন, রিফিউজিদের মধ্যেও তো অনেক জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান আছে। বাঙালী আর পাঞ্জাবীদেরই সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ হইছে। রিফিউজিরাই রিফিউজিদের দুঃখ বেশি বুঝবে। তাই আমি কইতে চাই, কোনো বাঙালী বা পাঞ্জাবী জ্ঞানী গুণী রিফিউজিরেই পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত করা উচিত কি না?

-তা কেন হবে? কংগ্রেস দলের যে-কেউ মানে, রিফিউজিরা গোটা ইন্ডিয়ারই লায়াবিলিটি।।

–মানে? ঐ লায়া কী কইলেন?

–লায়াবিলিটি ...মানে....দায়িত্ব। তাদের পুনর্বাসন করা আমাদের কর্তব্য!

খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে হারীত মন্ডল অন্যান্য খবরের ওপর একবার চোখ বুলালো। তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলো, এড়া আপনার পড়া হইয়া গ্যাছে? আমি নিতে পারি?

ডাক্তারবাবু বললেন, হ্যাঁ নিন না।

হারীত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, মুখ মানুষ, অনেক কিছুই জানি না। আপনি তো অনেক কিছু জানেন। একটা জিনিস কইতে পারেন? অনেক মুসলমানও তো ইন্ডিয়া থেকে পাকিস্তানে চলে গেছে, তাই না? সেখানেও কি তারা রিফিউজি? এইরকম ক্যাম্পে থাকে? সবাই দূরছাই করে?

ডাক্তারবাবু বললেন, তা আমি জানি না। সেরকম কোনো খবর আমি দেখিনি।

–খবর নাই মানেই ঘটে নাই। অরা মুসলমানগো জইন্যে পাকিস্তান বানাইছে। সুতরাং মুসলমানরা আশ্রয় নিতে গেলে অরা তাদের থাকতে দেবে। এ তো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু ইন্ডিয়া তো হিন্দুদের জন্য বানানো হয় নাই! লাখ লাখ হিন্দু রিফিউজি আইলে তাদের নিয়া কী করা হবে পার্টিশনের সময় সে কথাও আপনারা ভাবেন নাই।

–ওসব পুরোনো কথা বাদ দিন তো। বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশি পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছে। এইটুকু পশ্চিমবাংলার মধ্যে সবাই গাদাগাদি করে থাকলে সবাইকেই কষ্ট সহ্য করতে হবে। এখন আমাদের সীমানা বাড়ানো দরকার। বাংলার বাইরে যদি বাঙালীদের জন্য আলাদা জায়গা পাওয়া যায়, তাতে আমাদের সকলেরই তো লাভ। এতে আপনারা আপত্তি করেন কেন?

–কোনো আপত্তি নাই। অনেকেই এই কথা বলে, আমিও এই যুক্তি সমর্থন করি। কোথায় আমাগো পাঠাবেন, ব্যবস্থা করেন।

–জানেন, দন্ডকারণ্য জায়গাটার এলাকা পশ্চিমবাংলার চেয়েও বড়। প্লেন থেকে সার্ভে করে দেখা হয়েছে।

–কেন, এরোপ্লেন কেন? সার্ভের লোকজন বুঝি মাটিতে নামতে ভয় পায়? সাপ-বিছা টিছা আছে?

–আহা-হা, আপনি সবসময় একটা অন্য ফ্যাকড়া তোলেন। আগে প্লেন থেকে সার্ভে করতে হয়, তারপর রাস্তাটাস্তা বানিয়ে ....এতবড় একটা জায়গা পেলে আপনাদের অবস্থা পাল্টে যাবে। জমি-জমা পাবেন, চাষবাস করতে পারবেন ....এখানে শুধু শুধু সরকারের হাত-তোলা ভিখিরি হয়ে পড়ে আছেন।

–আমি তো দুই পায়ে খাড়া। পাঠাইয়া দ্যান না আমারে জঙ্গলে। আমি নিজের হাতে জঙ্গল কেটে বসতি বানাবো!

ডাক্তারবাবু একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এবার চলি। সব রুগীকে যে একই ওষুধ দিই, একথা আবার যেন বলে দেবেন না সবাইকে। এর একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট আছে।

হারীত মন্ডলও উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুর হাত ধরে মিনতি করে বললো, দয়া করে আর একটু বসুন। আর দশ মিনিট। আর একজন রুগীরে আপনার চিকিৎসা করতে হবে।

তারপর সে কম্পাউন্ডার ছেলেটিকে বললো, এই ছ্যামরা, তুই যা, বাড়ি যা!

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন আবার একজন রুগী দেখতে হবে? কে?

–একটু বসুন। আমি তারে নিয়ে আসতেছি!

হারীত মন্ডল বেরিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগলো। তার বিড়ি ফুরিয়ে গেছে, প্রথমে সে কিনলো এক আনার বিড়ি। তারপর গেল নিজের বাড়ির দিকে।

বাড়ি মানে একটি লম্বা গুদাম ঘর। রানাঘাটের কাছে এই ফাঁকা জায়গাটিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনী অনেকগুলি গুদামঘর বানিয়েছিল। এখন সেখানে ছাব্বিশ হাজার উদ্বাস্তু এনে ভরে রাখা হয়েছে। এর নাম কুপার্স ক্যাম্প।

পুলিশের দাবড়ানি খেয়ে হারীত মন্ডল সপরিবারে কাশীপুরের সেই কলোনি ছেড়ে চলে এসেছিল, তার ধারণা ছিল তাকে পাঠানো হবে অনেক দূরে। কিন্তু দন্ডকারণ্যের সেটেলমেন্ট এখনো পরিকল্পনার পর্যায়ে আছে, তাই তাকে এই কুপার্স ক্যাম্পে এনে তোলা হয়েছে। এখনো পুলিশের নজর আছে তার ওপর। স্থানীয় থানায় তাকে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়। সে কোনো প্রকাশ্য মিটিং করতে সাহস পায় না।

বড় বড় গুদামঘরগুলিতে একসঙ্গে অনেকগুলি করে রিফিউজি পরিবার থাকে। প্রথম প্রথম তারা চট, হোগলা বা ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে আলাদা আব্রু রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাচ্চাদের হুটোপাটিতে তা যখন-তখন খুলে পড়ে যায়, ছিঁড়ে যায়। এখন চক্ষুলজ্জা ঘুচে গেছে। বিনা আব্রুতেই বিভিন্ন পরিবার তাদের সংসারধর্ম পালন করে চলেছে।

এই ক্যাম্প ছাড়াও কাছাকাছি রয়েছে একটি মহিলা শিবির, আর একটি রূপশ্রী পল্লী শিবির। মহিলা শিবিরে রাখা হয় যে সব নারীর অন্য কোন আত্মীয়স্বজন নেই বা পথে মারা গেছে, কিংবা যে-সব ধর্ষিতা নারী তাদের পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছে, তাদের। সম্প্রতি এই মহিলা শিবিরের ওপর নানারকম হামলা চলছে। এককালে এখানে টিনের বেড়া দেওয়া ছিল। সেইসব টিন খুলে খুলে নিয়ে গেছে চোরেরা। তাদের চেয়েও বড় চোরেরা প্রকাশ্যেই ভেতরে ঢুকে। বাছাই করা মেয়েদের নিয়ে যেতে চায়। একটা বেশ ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। এমনকি এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তুদের মধ্যেই দলাদলি, মারামারি শুরু হয়ে গেছে।

হারীত মন্ডল জানে যে উদ্বাস্তুদের একতা নষ্ট হলে তারা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যারা তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে চায় তারা এখনো ভয় পায় উদ্বাস্তুদের প্রবল জনসংখ্যাকে। হারীত ওদের প্রাণপণে তাই-ই বোঝাবার চেষ্টা করে।

হারীত যে এখানে এসে রয়েছে তা সে কলকাতায় কারুকে জানায়নি। তার স্ত্রী কতবার তাকে অনুরোধ করেছে একটা অন্তত পোষ্টকার্ড লিখে তাদের ছেলে সুচরিতের খবরাখবর। নিতে। হারীত তাতে রাজি নয়। তাদের একটা ছেলে অন্তত লেখাপড়া শিখুক, বড় হোক। সুচরিত ভালো হাতে পড়েছে, সে বেঁচে যাবে। তাকে আর কোনোক্রমেই হারীত এই দুর্দশার মধ্যে টেনে আনতে চায় না। অদৃষ্টে যদি থাকে তাহলে আবার কোন না কোনদিন ছেলের সঙ্গে। দেখা হবে।

নিজেদের গুদাম ঘরটিতে ঢুকে হারীত তার বিছানার কাছে গেল। এখানে রয়েছে কয়েকটি কাঠের পুতুল। কুমোরবাড়ির ছেলে হারীত অল্প বয়েস থেকেই নানারকম মূর্তি গড়তে-শিখেছিল। এখানকার মাটি ভালো নয়, তাতে ভালো মূর্তি হয় না। কিন্তু এখানে পেয়ারা গাছ আছে প্রচুর, সে গাছের কাঠ দিয়ে সে পুতুল বানায়, হাটবারে নিজের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে সেই পুতুল বিক্রি করে। বিক্রি হয় মোটামুটি, এর থেকে তার দুচার পয়সা রোজগার হয়।

একটি বেশ বড় পুতুল বেছে নিল হারীত। তারপর গুদামঘরের এককোণে শুয়ে থাকা। একটি মেয়েকে ডেকে বললো, এই গোলাপী, গোলাপী ওঠ!

এই গরমের মধ্যেও মেয়েটি কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। হারীত একটানে কাঁথাটা সরিয়ে দেখলো মেয়েটি উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। মেয়েটির বয়স আঠারো-উনিশের বেশি। নয়, পিঠের ওপর এক রাশ চুল, পরনে একটা শতচ্ছিন্ন লাল-ডুরে শাড়ি। ছেঁড়া হলেও শাড়িটি। পরিষ্কার।

দুঃখী মানুষের কান্না হারীত অনেক দেখেছে। কান্না দেখতে দেখতে মানুষের বুক পাথর হয়ে যায়। এই মেয়েটির কান্না দেখেও হারীতের কণ্ঠস্বর একটুও কোমল হল না। সে ধমক দিয়ে বললো, এই ছেমরী, ওঠ তো! সময় নাই বেশি!

জোর করে হাত ধরে টেনে সে অনিচ্ছুক মেয়েটিকে দাঁড় করালো, আবার বকুনি দিয়ে। বললো, মুখখানা মোছ! এ যেন একেবারে শ্মশানকালী!

মেয়েটির গায়ের রং কালো, কিন্তু তার মুখে একটা উজ্জ্বল শ্রী আছে। সেখ দুটি গভীর। তার ঘাড়ের ওপর একটা বড় কাটা দাগ, কোনো ধারালো অস্ত্রের কোপ পড়েছিল সেখানে, এখনো ভালো করে শুকোয়নি।

গুদামঘরের এখানে ওখানে আরও অনেকে শুয়ে আছে। এরা দিনের বেলাতেও শুয়ে। থাকে। কারুর কোনো কাজ নেই। সরকারি ডোলে কোনোরকমে খাওয়াটা জুটে যায়। হারীতের কথাবার্তা শুনে কেউ কোনো মন্তব্য করলো না, হারীতের স্ত্রী ঘরের মধ্যে নেই।

গোলাপীকে নিয়ে হারীত চলে এলো বাইরে, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেও হারীত গোলাপীর হাত ধরে নিয়ে চললো। একবার গোলাপী থেমে যেতেই হারীত তাকে একটা মদ চড় কষিয়ে বললো, আবার? ডাক্তারবাবু চইলা যাবেন দেরি হইলে।

ডিসপেনসারির মধ্যে ঢুকে হারতি দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ডাক্তারবাবুকে বললো, এর নাম গোলাপী। নাম শুনেছেন আশা করি।

ডাক্তারবাবু বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। হ্যাঁ, তিনি নাম শুনেছেন। গত মাসে উদ্বাস্তুদের নিজেদের মধ্যেই একটা খন্ডযুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, গোলাপী নামের একটি মেয়ে ছিল তার নায়িকা। দু'একটি পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছিল।

হারীত তার হাতের পুতুলটা এগিয়ে দিয়ে বললো, ডাক্তারবাবু, আপনারে তো আমি ফি দিতে পারবো না। এই পুতুলটা ন্যান, আপনার ঘর সাজাবেন।

ডাক্তার পুতুলটি দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। একেবারে পাকা হাতের কাজ। তাঁর খানিকটা শিল্পের বোধ আছে, তিনি দেখেই বুঝলেন, গ্রাম্য হাট-বাজারে যে-সব পুতুল দেখা যায়, সেগুলির সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলে না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কে বানিয়েছে? আপনি?

হারীত গা মুচড়ে বললো, এই আর কী, কিছু তো কাজ-কাম নাই, তাই একটু টুকটাক যা পারি–

ডাক্তারবাবু পুতুলটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। একটি মেয়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তি, মুখোনিতে ভারি সারল্য মাখা।

হারীত বললো, দ্যাখেন তো, ঐ পুতুলের মুখের সাথে এই মেয়েটির মুখের কোনো মিল পান কি না। অরে দেখেই বানাইছিলাম।

ডাক্তারবাবু চোখ তুলে গোলাপীকে দেখলেন। গোলাপীর কান্না-মাখা মুখের সঙ্গে এই পুতুলের কোনো মিল খুঁজে পেলেন না।

হারীত বললো, এ আমার মেয়ে। আপন নয় অবশ্য। ওর বাবারে আমি চিনতাম, সে কলেরায় মরেছে। ওর মায়ের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই, সেই দ্যাশ ছাড়ার সময় থেকেই, বুঝলেন। অনাথা মেয়ে বলে যাতে ওরে মহিলা শিবিরে ভরে না দেয়, তাই আমি ওরে আমার কন্যা পরিচয় দিয়ে নিজের কাছে রেখেছি।

গোলাপীর সর্বাঙ্গে নজর বুলিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, বাকিটা আর বলতে হবে না, বুঝেছি। কিন্তু মন্ডলমশাই, এর চিকিৎসা করার ক্ষমতা আমার নেই।

হারীত বললো, না, শোনেন, বাকিটা শোনেন। আপনি তো জানেন, আমাগো গুদামঘরগুলিতে সকলে মিলে কী রকমভাবে থাকি। ছেলেমেয়েগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে, তারা পাশাপাশি শোয়। পাটখড়ি আর আগুন কাছাকাছি আনলে কী রকম পট

পট চড় শব্দ হয় শোনেন নাই? উঠতি বয়সের পোলা-মাইয়ারা সেইরকম আগুন আর পাটখড়ি। ভাবলাম কোনোরকমে নমো নমো করে মেয়েটার বিয়া দিয়ে দিই। তিন নম্বর ওয়ার্ডের একটি ছেলেরে কোনরকমে রাজি করাইছিলাম। তার পরেই হইলো কী, রূপশ্রী কলোনির একটি হেলেরও খুব পছন্দ নাকি গোলাপীকে। সে কথা সে আগে বলে নাই। এই নিয়েই তো তিন নম্বর ওয়ার্ড আর রূপশ্রী কলোনির ছেলেগো মধ্যে কাজিয়া। রাগের চোটে একজন এই গোলাপীর কান্ধে কোপ মেরেছিল, এই দ্যাখেন!

ডাক্তারবাবুটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, এখন মেয়েটির এই অবস্থা করলো কে?

হারাত বললো, জানি না। আমি অরে জিজ্ঞাসাও করি নাই। কাকে দোষ দেবব বলেন? ওর পোয়াতী হবার জন্য আসল দায়ী কে জানেন? দায়ী হলো শনি, উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে যে শনি আমাগো উপর ভর করেছে।

–এখন এই অবস্থায় ওর তো আর বিয়ে হবে না। কে বিয়ে করবে?

–কেউ না সব বীরপুঙ্গব এবারে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। আর অন্য সকলে এই মেয়েটারে আর ওর পেটের টারে মেরে ফেলতে চাইবে। তাই...! এখন ডাক্তারবাবু, আপনার দ্বারস্থ হয়েছি, এখন দেখেন আপনি বাঁচাইতে পারেন কি না!

গোলাপী মাটির দিকে মুখ করে আছে, হাত দুটি বুকের কাছে মুঠি করা, তার দন্ডায়মান মূর্তিটিকে নিষ্প্রাণ মনে করা যেত, যদি না তার দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়াতো।

ডাক্তারবাবুও মুখ নিচু করে বললেন, আমি আর কী করি বলুন! আমার কতটুকু সাধ্য আছে?

হারীত চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, তা হলে ওকে পাঠিয়ে দেবো মহিলা শিবিরে? মেয়েটা দ্যাখতে শুনতে খারাপ না, খুব শিগগিরি চালান হয়ে যাবে কইলকাতায়। তারপর বিক্রি হয়ে যাবে মাংসের বাজারে।

ডাক্তারবাবু উষ্ণ হয়ে বললেন, আরে না, না, ছি ছি, আপনি জেনেশুনে একাজ করবেন? আপনি না ওদের নেতা?

হারীতও গলা চড়িয়ে বললো, আর না হলে কী করবো কন? আমি ওকে নিজের মেয়ের। মতন দেখি, আমি তো অরে বিয়া করতে পারি না! তবে অরে আপনি কিছু বিষ দ্যান, যাতে বিনা যন্ত্রণায় মরতে পারে!

দু'জন পুরুষ পরস্পরের দিকে তীব্র চোখে তাকালো। যেন পরস্পরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দু'জনেই অসহায়, তাই এত ক্রোধ। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এক আর্ত নারী, যাকে উদ্ধার করতে চায় দু'জনেই, কিন্তু সামর্থ্য নেই।

ডাক্তারবাবুই আগে চোখ পাকিয়ে বললেন, আপনি এক কাজ করুন। এই মেয়েটিকে নিয়ে, আপনার পরিবার নিয়ে চরবেতিয়া চলে যান। উড়িষ্যার চরবেতিয়ায় ক্যাম্প আছে। আমি রেকমেন্ড করে দিলে কাল-পরশুই আপনারা চলে যেতে পারবেন। উড়িষ্যার মানুষজন ভালো, ভদ্র, নম্র। সেখানে মেয়েটির যা হোক একটা পরিচয় দেবেন। নতুন জায়গা, কোনো অসুবিধে হবে না আশা করি। বলুন, যাবেন? হারীত মন্ডল এতক্ষণ বাদে আবার হাসলো, পকেট থেকে বিড়ি বার করে বললো, চরবেতিয়া, হ্যাঁ নাম শুনেছি, তা মন্দ কী! নতুন জায়গায় গিয়েই দ্যাখা যাক। আমাদের পন্ডিতমশাই বলতেন, চরৈবেতি, চরৈবেতি! সে কথাটার মানে মনে নাই, বোধহয় চরবেতিয়ায় আমার নিয়তি আমায় নিয়ে যাবে, সে কথাই তিনি আগে থেকে টের পেয়ে গেছিলেন, তাই না?

৪৭ আগের দিনই খবর দিয়ে

আগের দিনই খবর দিয়ে রেখেছিলেন, বেলা একটার সময় ত্রিদিব গাড়ি নিয়ে এসে তুলে নিলেন মমতাদের। এক গাড়িতে আটজন, তাও তো সুপ্রীতি কিছুতেই আসতে চাইলেন না; ত্রিদিব অবশ্য বারবার সুপ্রীতিকে বলেছিলেন, ওর মধ্যেই কোনো রকমে জায়গা হয়ে যাবে। প্রতাপও শেষ মুহূর্তে থেকে যেতে চাইছিলেন, ত্রিদিব প্রায় জোর করেই প্রতাপকে নিজের পাশে। বসালেন। মুন্নিকে বসতে হলো মায়ের কোলে, বাবলু কিছুতেই কারুর কোলে বসবে না, উপরন্তু তাকে জানলার ধার ছেড়ে দিতে হবে। ইডেন গার্ডেনে বিরাট মেলা ও প্রদর্শনী হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী উপলক্ষে, ত্রিদিব সবাইকে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে।

গাড়ি চলার পর দেখা গেল, খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না, সবাই মোটামুটি সেট করে গেছে, তখন প্রতাপ বললেন, তা হলে দিদিকেও নিয়ে গেলে হত না? আর একজনও ঠিক এঁটে যাবে। দিদি একলা একলা বাড়িতে পড়ে থাকবে?

ত্রিদিব বললেন, হ্যাঁ, জায়গা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু উনি যে আসতে চাইছেন না।

প্রতাপ সুলেখাকে বললেন, সুলেখা তুমি গিয়ে একটু বলো। তোমার কথা দিদি ঠেলতে পারবেন না।

আবার গাড়ি ব্যাক করে আনা হলো। সুলেখার সঙ্গে মমতাও উঠে গেলেন ওপরে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুপ্রীতিকে নিয়ে এলেন। সুপ্রীতি লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললেন, আমি বুড়ি হয়ে গেছি, আমার কী আর ওসব দেখার বয়েস আছে! আমায় নিয়ে টানাটানি কেন।

ত্রিদিব বললেন, দিদি, আপনি মোটেই বুড়ি হননি। আপনি না গেলে আমাদের সবারই খুব খারাপ লাগতো।

সুপ্রীতি ওঠার ফলে তুতুলের পাশে বসা পিকলুকে সে জায়গা ছেড়ে নেমে গিয়ে বসতে হলো সামনের সীটে।

প্রতাপ ঘাড় ঘুরিয়ে সুলেখাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করে দিদিকে এত তাড়াতাড়ি রাজি করালে?

সুলেখা মিষ্টি হেসে বললেন, খুব সোজা। গিয়ে বললুম, আপনি না গেলে আমরা দু'জনেও যাবো না!

সুপ্রীতি সঙ্কুচিত হয়ে যতদূর কম জায়গা নিয়ে বসার চেষ্টা করতে করতে বললেন, একসঙ্গে এত লোক একটা গাড়িতে উঠলে পুলিসে ধরে না?

ছেলেমেয়েরা সবাই হেসে উঠলো।

প্রতাপ বললেন, দিদি, তোমার মনে নেই, একবার অসিতদার গাড়িতে আমরা কতজন মিলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম? বাবা-মা এসেছিলেন সেবার...

ছেলেমেয়েরা পুরানো কথায় আগ্রহী নয়। বাবলু জিজ্ঞেস করলো, দাদা, ইডেন গার্ডেন মানে স্বর্গের বাগান, তাই না?

পিকলু বললো, হ্যাঁ, সেখানে আদম আর ইভ থাকতো। সেখানে শয়তান ইভকে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইয়েছিল।

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, শয়তান স্বর্গের বাগানে গেল কী করে? শয়তানের তো নরকে থাকার কথা।

পিকলু বললো, এ ক্রিশ্চিয়ানদের শয়তান। আমাদের তো এই রকম কোনো শয়তান নেই। অরিজিন্যাল সিন-এর ব্যাপারটাও আমাদের নেই।

বাবলু বললো, জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইয়ে শয়তান তো ভালোই করেছিল। না হলে মেয়েরা চিরকাল বোকা থেকে যেত!

মুন্নি বললো, আমি ঐখানে গিয়ে গেয়ান বিরিক্ষের ফল খাবো!

এবারে বড়রাও হেসে উঠলো, বাবলু তার ছোট বোনের মাথায় আলতো চাঁটি মেরে বললো, দূর পাগলি! এই ইডেন সেই ইডেন নয়! আমরা কি স্বর্গে যাচ্ছি নাকি?

প্রতাপ বললেন, আমাদের ছেলেবেলায় ইডেন গার্ডেন খুব সুন্দর, সাজানো জায়গা ছিল। ৩ সাহেব-মেম যেত, প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা গোরাদের ব্যাণ্ড বাজতো। বর্মা থেকে একটা তো প্যাগোডা তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে। এখন কী অবস্থা কে জানে, অনেকদিন তো যাই নি!

ত্রিদিব বললেন, এখনও বেশ ভালো আছে। মজুমদার সাহেব, সিগারেট আছে নাকি, দিন তো একটা খাই।

ত্রিদিব স্টিয়ারিং-এর ওপর এক হাত রেখে সিগারেট ধরালেন। বাবলু মুগ্ধভাবে চেয়ে রইলো সেদিকে। তার মামাবাবু এক হাতে গাড়ি চালাতে পারেন! সে নিজে দু হাত ছেড়ে সাইকেল চালাতে শিখেছে, বড় হয়ে সে দু হাত ছেড়ে মটরগাড়ি চালাবে!

সেন্ট্রাল এভিনিউতে কিসের যেন একটা মিছিল, দারুণ জ্যাম হয়ে আছে, গাড়ি এগোতেই চাইছে না। ছোটদের আর ধৈর্য থাকছে না। সুলেখার কথা মতন ত্রিদিব ডান দিকে গিরীশ পার্কের পাশ দিয়ে বেঁকে মশলাপট্টি ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে এসে পড়লেন। অদূরে হাওড়া ব্রীজ দেখেই বাবলুর বুকটা ধক করে উঠলো। দুপুরের রোদে ঝকমক করছে যেন একটা রূপোলি পাহাড়। ঐ পাহাড়ের চূড়ায় আছে সুদূরের হাতছানি।

মহিলা তিনজন গঙ্গানদী দেখে প্রণাম করলেন হাত তুলে। সুপ্রীতি বললেন, এইবার একবার দেওঘর যাবো, কতদিন মাকে দেখি না। আমরা এই যে মেলা দেখতে যাচ্ছি, মা

এই সব দেখলে কত খুশী হয়, একেবারে ছেলেমানুষের মতন এটা কিনতে চায়, ওটা কিনতে চায়..

মা যে ইদানীং কত বদলে গেছেন, তা সুপ্রীতি বা মমতারা জানেন না। প্রতাপ কিছু বললেন, চুপ করে রইলেন।

মমতা বললেন, আমরা বাড়ি বদলাবার পর মাকে কিছুদিন কলকাতায় এনে রাখতে হবে।

স্ট্র্যান্ড রোড ধরে বড় বড় লরি ও ঠ্যালা গাড়ির পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে ত্রিদিবের গাড়ি এক সময়ে এসে থামলো ইডেন গার্ডেনের সামনে। টিকিট কেটে ভেতরে ঢোকার পর বাচ্চারা তো বটেই, মমতা সুপ্রীতিরাও বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন খানিকটা। এত বিশাল মেলা বা প্রদর্শনী ওঁরাও আগে কখনো দেখেননি। কতগুলি মণ্ডপ, কত রকমারি দোকান, কত জিনিসপত্র, কত খাবার, কত রং। এর মধ্যে তো মানুষ দিশাহারা হয়ে যাবে। মানুষের ভিড়ও প্রচুর। এখানে কেউ হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর হবে।

দলটির নেতৃত্ব নিলেন প্রতাপ। সবাই একসঙ্গে কাছাকাছি থেকে এগোতে লাগলেন। কোনো দোকানের সামনে থামা হলেও মিনিট পাঁচেক বাদেই তিনি হাঁক দিচ্ছেন, এবারে চলো। এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়ালে চলবে না, অনেক কিছু দেখার আছে! বাবলু দু একবার এদিক। ওদিক দৌড় মারবার চেষ্টা করলেও প্রতাপ তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন তার ওপরে, পিকলুকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠাচ্ছেন তাকে ধরে আনতে।

মাঝে মাঝেই জল। তাতে ভাসছে ছোটো ছোটো রঙিন নৌকো। বড় বড় গাছের নিচে অনেক বেলুন ঝুলিয়ে এয়ার গান দিয়ে চাঁদমারির খেলা চলছে। ঠিক মাঝখানের বেলুনটি ফাটাতে পারলে একটা বড় টর্চলাইট পুরস্কার। বাবলু-পিকলুরা সেখানে দশটা পয়সা নষ্ট। করলো, বাবলু আরও পয়সা চাইলে প্রতাপ গম্ভীর ভাবে বললেন, আর নয়!

এক জায়গায় জলের ওপর একটা রেস্টুরেন্ট, নাম স্বপনপুরী। নানা রঙের আলো দিয়ে। সেটি সাজানো। সেটি আবার একটু একটু ঘুরছে। একে ভাসমান দোকান, তায় আবার

নিজে নিজে ঘুরন্ত, তা দেখে ওদের মুগ্ধতার সীমা থাকে না। সুপ্রীতি দু তিনবার জিজ্ঞেস করলেন, কী। করে করলো, অ্যাঁ? পিকলু তার বিজ্ঞান-পড়া বুদ্ধি দিয়ে বোঝাতে লাগলো।

সুলেখা ত্রিদিবকে বললেন, তুমি আমাদের ওখানে খাওয়াবে?

ত্রিদিব বললেন, হ্যাঁ, খাওয়াতে পারি। কিন্তু এখন তো কারুর খিদে পায়নি, সব দেখে টেখে ফেরার সময় খাবো বরং।

এই সব সময়ে প্রতাপেরই সমস্ত খরচ করা অভ্যেস। এই সব হোটেল-টোটেলে এতজন মিলে খেতে কত টাকা লাগবে কে জানে! অনেকদিন প্রতাপ হোটেল-রেস্টুরেন্টে ঢোকেন নি। তিনি আজ সঙ্গে বেশি টাকা আনেননি, মমতার কাছে কিছু আছে কী? তিনি মমতার দিকে তাকালেন। মমতা ঠিক বুঝতে পেরেছেন, তিনি সামান্য হেসে মাথাটা অতি সূক্ষ্মভাবে নাড়লেন, তারপরই আবার গল্প করতে লাগলেন সুলেখার সঙ্গে।

ত্রিদিব বললেন, পিকলুরা বরং আলাদা ঘুরে ঘুরে দেখুক। সব সময় বড়দের সঙ্গে থাকতে ওদের ভালো লাগবে কেন?

পিকলু এই কথাটা শোনা মাত্র ত্রিদিবের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করলো। মনে মনে সে। এটাই চাইছিল, কিন্তু বাবার সামনে বলার সাহস পাচ্ছিল না।

প্রতাপ বললেন, ওরা আলাদা যাবে, কিন্তু বাবলুটা যে অতি অবাধ্য, ওকে সামলাবে কে?

মমতা ত্রিদিবকে সমর্থন করে বললেন, না, ওরা আলাদাই যাক। ওরা ওদের মতন দেখুক। বাবলু যদি হারিয়ে যায় তা হলে আমরা আর ওকে খুঁজবো না, ও বাড়িতে ফিরতেও পারবে না। ও এখানে কোনো চায়ের দোকানে বেয়ারার কাজ করবে, সেই বেশ হবে!

বাবলু বললো, হ্যাঁ, আমি ঠিক রাস্তা চিনে বাড়ি যেতে পারবো।

সুপ্রীতি বাবলুর চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, এই দস্যিটা সব পারে! কিন্তু তুই যদি আজ হারিয়ে যাস, তাহলে আমিও আজ আর বাড়ি যাবো না। আমাকেও আর কেউ খুঁজে পাবে না!

ঠিক হলো যে, দু ঘণ্টা বাদে পিকলুবাবলুরা সেই স্বপনপুরীর কাছে ফিরে আসবে। ত্রিদিব নিজের ঘড়িটা খুলে পরিয়ে দিলেন পিকলুর হাতে।

মুন্নিকে তার আপত্তি সত্ত্বেও নিজের কাছে রাখলেন মমতা। প্রতাপ পিকলুর হাতে পাঁচটা টাকা দিলেন ওদের খরচের জন্য। পরের মুহূর্তেই পিকলুবাবলু-তুতুল অদৃশ্য হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

প্রতাপ সুলেখাকে বললেন, এবারে তুমি যাতে হারিয়ে না যাও, সেটার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে আমাকে। বাবলুর পরেই তোমাকে নিয়ে আমাদের বেশি ভয়। সুলেখা ভূভঙ্গি করে হেসে বললেন, আ-হা-হা-হা!

একথাও ঠিক কাছাকাছি মানুষজনেরা সুলেখাকে বার বার ঘুরে ঘুরে দেখছে। সুলেখার রূপ শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও চোখ টানে। সুপ্রীতি বা মমতাও মোটেই অসুন্দর নন, মমতাকে দেখে বোঝাই যায় না তাঁর পিকলুর মতন বড় ছেলে আছে, কিন্তু সুলেখার রূপের ধরনটাই অন্যরকম। অথচ সুলেখা কিছুই সাজগোজ করেননি, মাথার চুল শ্যাম্পু করা, একটা খোঁপাও বাঁধেননি আজ।

সুলেখার প্রতি অন্য লোকদের এই আকর্ষণ ত্রিদিব গ্রাহ্য করছেন না, তার গা-সহা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রতাপ ঈষা বোধ করছেন। পাশ দিয়ে যাবার সময় কেউ যাতে ইচ্ছে করে সুলেখার শরীর ছুঁয়ে না যায় সেইজন্য প্রতাপ সুলেখাকে প্রায় পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছেন, ভিড় এড়িয়ে তিনি তাঁর দলটিকে নিয়ে চলেছেন জলের ধার দিয়ে।

মমতা বললেন, আমাকে একটা বঁটি কিনতে হবে। এখানে পাওয়া যাবে না?

সুপ্রীতি বললেন, হ্যাঁ, আমাদের বঁটিটার একেবারে ধার নষ্ট হয়ে গেছে।

সুলেখা বললেন, না, প্লীজ, এখান থেকে বঁটি কিনো না।

মমতা বললেন, কেন?

সুলেখা বললেন, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি, এখান থেকে কোনো কাজের জিনিস কেনা মানায় না! তুমি একটা বঁটি হাতে নিয়ে ঘুরবে নাকি?

প্রতাপ ব্যঙ্গ করে বললেন, শুধু বঁটি? কেন, ঝাঁটা কিনতে হবে না?

মমতা স্বামীর দিকে তাকালেন। বিবাহিত পুরুষরা অন্য সুন্দরী মেয়েদের সামনে নিজের স্ত্রীকে ছোটখাটো খোঁটা দিয়ে আনন্দ পায়।

মমতা বললেন, আসলে আমার কী কেনার ইচ্ছে শুনলে তোমরা কেউ বিশ্বাস করবে না। হাসবে!

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করলেন, কী?

সামনের একটা দোকানের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে মমতা বললেন, একটা কার্পেট। বেশ পুরু হবে, ডিজাইন করা থাকবে। একটা কার্পেট-পাতা ঘরে থাকার খুব শখ আমার।

সবাই কয়েক মুহূর্ত চুপ হয়ে গেলেন। একটা সাধারণ ভাড়া বাড়িতে যে থাকে, তার কার্পেটের শখ সত্যিই অবিশ্বাস্য। সুপ্রীতি স্বেচ্ছায় যে বাড়ি ছেড়ে এসেছেন, তাঁর শ্বশুরবাড়িতে নিজের ঘরে লাল কার্পেট পাতা ছিল।

মমতা আবার বললেন, একদিন আমি আমার দু একটা গয়না বিক্রি করেও একখানা কার্পেট। কিনবোবা।

বিষয়টাকে লঘু করার জন্য সুলেখা বললেন, তখন তো তোমার ঘরে ঢুকতেই আমাদের ভয় করবে। যেসব বাড়িতে কার্পেট পাতা থাকে, সেসব বাড়ির লোকেরা এমন করে যেন পা দিয়ে খুব অন্যায় করে ফেলেছি। জুতো খুলতে ভুলে গেলে তো আর রক্ষা নেই!

এই সময় একজন লোক কোথা থেকে এসে বললো, আরে ত্রিদিবদা, আপনারা কখন এলেন? দূর থেকে আপনাদের দেখলুম।

লোকটি কথা বলছে ত্রিদিবের সঙ্গে কিন্তু চেয়ে আছে সুলেখার দিকে। লোকটি সামান্য মুখ চেনা, ত্রিদিব তার নাম করতে পারলেন না বলে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারলেন না। লোকটি কিন্তু ওঁদের সঙ্গে সেঁটে রইলো এবং অনর্গল কথা বলতে লাগলো। প্রতাপ স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন, কিন্তু ত্রিদিবের চেনা লোককে তো তিনি ধমকে চলে যেতে বলতে পারেন না?

সুলেখা একটি চানাচুরের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, এই দ্যাখো, সেই ভবানীপুরের চানাচুর, খুব নাম করা। কিনবে?

সবার জন্য এক এক ঠোঙা চানাচুর কেনা হলো। সঙ্গের সেই উটকো লোকটা দাম দেবার চেষ্টা করতেই সুযোগ পেয়ে প্রতাপ রুঢ় ভাবে তাকে বললেন, আপনি পয়সা বার করছেন কেন?

লোকটির কাছ থেকে আলাদা হবার জন্য একটু পরে সুলেখা, মমতা আর সুপ্রীতি উঠে বসলেন নাগরদোলায়। পুরুষদের কেউ চাপবেন না। তিন নারী যেন বালিকা বয়েসে ফিরে। গিয়ে খানিকটা ভয়-মেশানো খুশিতে হাসতে লাগলেন খুব।

পিকলুবাবলু-তুতুল ঘুরে ঘুরে দেখছে একটার পর একটা মণ্ডপ। পিকলু বিজ্ঞানের ছাত্র। হলেও ইতিহাস সম্পর্কে সে খুব আগ্রহী। পড়েছেও অনেক। যেখানে সিরাজউদ্দৌলার বষা, তলোয়ার, বন্দুক রাখা আছে, সেই মণ্ডপে ঢুকে সে তার ভাই বোনকে শোনাতে লাগলো পলাশী যুদ্ধের কলঙ্ক কাহিনী। তুতুল মুগ্ধ হয়ে শোনে, কিন্তু বাবলুর অত

ইতিহাস-জ্ঞান সঞ্চয়নের ধৈর্য নেই, সে এটা সেটা হাত দিয়ে দেখতে চায় আর রক্ষকদের বকুনি খায়। সিরাজউদ্দৌলার। বশটা ছুঁয়ে সে বললো, উরিব্বাস, কত লম্বা! দাদা, সিরাজ নবাব কত লম্বা ছিল, এত বড় বশা। নিয়ে যুদ্ধ করতে পারতো!

পিকলু বললো, এই বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করতো না, এটা অনেকটা ডেকরেটিভ, বুঝলি, হয়তো সিংহাসনের পাশে সাজানো থাকতো, জুতোর দোকানে দেখিস না, এক একটা কী রকম পেলাম পেল্লায় জুতো থাকে! ভবিষ্যতের কেউ তোর মতন হয়তো সেই একখানা জুতো দেখে ভাববে, এখনকার কালে অত বড় পা-ওয়ালা মানুষ ছিল!

তুতুল বললো, এই কামানটা কিন্তু বেশ ছোট। এর থেকে অনেক বড় কামান দেখলাম স জায়গায়।

পিকলু বললো, এটা ইংরেজদের কামান। নবাবী কামান ঢাউস ঢাউস ছিল, কিন্তু ইংরেজদের কামান ছোট হলেও বেশি এফেকটিভ। চট করে মুখ ঘোরাতে পারতো, ক্যারি করার সুবিধে ছিল। সিরাজউদ্দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ জয় করে এই রকম কয়েকটা কামান কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ততল বললো, পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করতো–

পিকলু বললো, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস হয়তো অন্য রকম হতো! এক একটা সামান্য সামান্য ঘটনায় ইতিহাসের নিয়তি বদলে যায়।

ইদানীং নির্মলেন্দু লাহিড়ীর রেকর্ড করা সিরাজউদ্দৌলা নাটকটি খুব জনপ্রিয়। রেডিওতে প্রায়ই বাজে। সরস্বতী পুজো, দুর্গা পুজোয় মাইকে বাজে। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর কাঁপা কাঁপা গলায় সংলাপ শুনতে শুনতে অনেকের মুখস্থ। বাবলু সেই নাটকেরই সংলাপ চেঁচিয়ে বলে উঠলো, বাংলা বিহার উড়িষ্যার হে মহান অধিপতি, তোমায় তো ভুলিনি জনাব? তারই পুরস্কার কি এই কণ্টক মুকুট? তারই পুরস্কার কি এই ছিন্ন পাদুকা!

বাবলুর রিনরিনে কণ্ঠস্বর শুনে অনেকে ঘুরে তাকালো, কেউ বললেন, বাঃ, খোকা, আর একটু বলো তো!

পিকলু লজ্জা পেয়ে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

আর একটি মণ্ডপে রয়েছে নন্দকুমার ও রামমোহন রায়ের পাগড়ি, চোগা- চাপকান। তা ছাড়া রয়েছে রামমোহনের চুল, পৈতে ও নিজের হাতে লেখা চিঠি। পিকলু রামমোহনের খুব ভক্ত, সে প্রায়ই বলে রামমোহন হচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ, তাঁর জন্যই আমরা পশ্চিম দুনিয়াকে চিনতে শিখেছি, একালের জ্ঞান-বিজ্ঞান...

বাবলু দৌড়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়, একবার সে আইসক্রিম কেনার জন্য দাদার কাছ থেকে পয়সা চাইতে আসে, আর একবার সে বাদাম কিনে এনে দাদা আর দিদিকে দেয়। খানিকবাদে এসে দেখে যে পিকলু তখনও মন দিয়ে রামমোহনের একটা পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করছে, সে পিকলুর হাত ধরে টানাটানি করে বলে, দাদা, চলো, অন্য কোথাও চলো।

পিকলু ঐ রকমই আর একটি মণ্ডপে ঢোকে, যেখানে রয়েছে বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। বিদ্যাসাগরের দুধ খাওয়ার বাটি, দোয়াতদানি। রামকৃষ্ণের ছাতা, একটা খঙ্গ।

এটাও বাবলুর পছন্দ হয় না। সে বললো, দাদা, ঐ দিকে চলো না, ওখানে রানা প্রতাপের সব জিনিস আছে।

পিকলু বললো, দাঁড়া, একটু পরে যাবো।

বাবলুর এই সব বাজে বাজে জিনিস দেখার ধৈর্য নেই। সে একাই চলে গেল রানা প্রতাপের মণ্ডপে। বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণকে সে ভালো করে চেনে না। কিন্তু ইস্কুলের বইতে

পড়া রানা প্রতাপের কাহিনী তাকে চঞ্চল করে। বইতে একটা ছবি আছে, রানা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ দূর থেকে ডাকছে, হো নীল ঘোড়াকা সওয়ার!

রানা প্রতাপের বর্ম, তলোয়ার, পাগড়ির দিকে মুগ্ধ ভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে বাবলু মনে মনে একটি নীল ঘোড়ার সওয়ার হয়ে যায়। সে যেন সত্যিই শুনতে পায় টগবগ টগবগ ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ।

অন্য মণ্ডপে তুতুল পিকলুকে জিজ্ঞেস করে, রামকৃষ্ণ এই খাঁড়াটা নিয়ে কী করতেন?

পিকলু বললো, তুই সেই গল্পটা জানিস না? রামকৃষ্ণ মা কালীকে স্বচক্ষে দেখার জন্য ডেকে ডেকে পাগল হচ্ছিলেন। দেখা দাও, দেখা দাও বলে আর্তনাদ করতেন। তারপর সত্যিই বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, এরকম টেমপোরারি ইনস্যানিটি হতে পারে। কিছুতেই যখন দেখা পাচ্ছেন না, তখন মা কালীর হাত থেকে খাঁড়াটা খুলে নিয়ে বলেছিলেন, মা, দেখা দিবি না, তা হলে আমি তোর সামনেই আত্মঘাতী হবো। নিজের গলাটা যখন কাটতে গেলেন, তখন মা কালী নাকি সশরীরে এসে তাঁর হাত চেপে ধরেছিলেন।

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, সত্যি মা কালী এসেছিলেন?

পিকলু অবজ্ঞার সঙ্গে হেসে বললো, সত্যি সত্যি মাকালী বলে কিছু আছে নাকি? তুই-ও যেমন! নিশ্চয়ই হ্যাঁলুসিনেশান জাতীয় কিছু ব্যাপার? আর এদিকে দ্যাখ কী কনট্রাস্ট। বিদ্যাসাগরও রামকৃষ্ণের সমসাময়িক, তিনিও তো গ্রাম্য মানুষের ছেলে, কিন্তু তিনি বলতেন ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার সময় নেই, আমার অনেক কাজ। তিনি তখন গ্রামে গ্রামে ছেলেমেয়েদের জন্য ইস্কুল খোলা, বিধবা বিবাহ এইসব নিয়ে ব্যস্ত। বাঙালী মেয়েরা যে আজ লেখাপড়া শিখতে পারছে তা বিদ্যাসাগরের জন্যই। কিন্তু এখনকার বাঙালী মেয়েরা রামকৃষ্ণেরই পুজো করে, তুই ক'জনের বাড়িতে বিদ্যাসাগরের ছবি বাঁধানো দেখেছিস?

একটু পরে বাবলু এসে আবদার ধরলো, সে সার্কাস দেখবে।

সার্কাস, মানে মাঝারি আকারের একটা তাঁবু, তার বাইরে সবললামহর্ষক ছবি আঁকা বিজ্ঞাপন। কাটা মুণ্ড কথা বলে, তলার দিকটা মাছের মতন-ওপরের দিকে একটি সুন্দরী মেয়ে, মটর সাইকেল আরোহীর মরণকূপে ঝাঁপ ইত্যাদি। আট আনা করে টিকিট। পিকলু পয়সা হিসেব করে দেখলো যাওয়া যেতে পারে।

তুতুল কাতরভাবে বললো, আমার ওসব দেখতে ইচ্ছে করছে না।

কিন্তু বাবলুর জিদ সে দেখবেই দেখবে। তখন একটা টিকিট কেটে বাবলুকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ভেতরে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের শো, ভাঙার পর বাবলু দাঁড়িয়ে থাকবে গেটের কাছে।

তুতুল বললো, অনেকটা তো সময়। চলো, আমরা ততক্ষণ একটু ঘুরে আসি।

দু'জনে হাঁটতে লাগলো মন্থর ভাবে। আর একটি মণ্ডপ দেখে পিকলু জিজ্ঞেস করলো, এটার মধ্যে যাবি?

তুতুল বললো, বাইরেই ভালো লাগছে। একটু হাঁটি।

পিকলু আবার খানিকটা বাদাম কিনলো, তারপর বাদাম ভাঙতে ভাঙতে হাঁটতে লাগলো, দু'জনেই নিঃশব্দ। অন্য বহু লোক কথা বলছে, মাইকে নানারকম আওয়াজ, হারানো নাম ঘোষণা, এর মধ্যে ওদের কথা বলার দরকার নেই। তুতুল আজ পরে এসেছে গোলাপি রঙের। একটা শাড়ি, গলায় একটা কাঁচের মালা। কপালে টিপ। পিকলু পরে আছে সাদা জামা, সাদা। প্যান্ট। সে জামার বুকের বোতাম লাগায় না। তার মাথার চুল এলোমেলো।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে এলো বুকটা নির্জন জায়গায়। এত ভিড়ের কাছাকাছিই যে এমন। নির্জন জায়গা থাকতে পারে, যেন বিশ্বাসই করা যায় না। কয়েকটা পাশাপাশি বড় গাছ,

তারপরে খানিকটা জমি সবুজ মখমলের মতন ঘাসে ঢাকা। কয়েকটা তাঁবুর পেছন দিক, তাই। এদিকে কেউ আসছে না।

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, এখানে ঘাসের ওপর একটু বসবে?

পিকলু বসে পড়ে বাদামের ঠোঙাটা ঘাসের ওপর রাখলো। তারপর বললো, জায়গাটা এত পরিষ্কার, ওঠার সময় বাদামের খেলাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাবো।

দু'জনে শেষ করতে লাগলো বাদাম। পিকলু দু'বার ঘড়ি দেখলো। হাতে নতুন ঘড়ি উঠলে সব সময় সেই দিকেই মন থাকে।

তুতুল বললো, এত ঘড়ি দেখছো কেন? এখনো অনেক সময় বাকি আছে!

পিকলু বললো, বাবলুটাকে তো বিশ্বাস নেই। যদি একটু আগে শেষ হয়ে যায়, অমনি কোথায় যে চলে যাবে!

-পিকলুদা, আমি একটা কথা বলবো?

-বল!

কিন্তু তুতুল আর কিছু বললো না। হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে চেয়ে রইলো মাটির দিকে।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে পিকলু জিজ্ঞেস করলো, কী বলবি, বল!

ততুল মুখ তুললো। বড় বড় পল্লব মেলে প্রগাঢ় ভাবে তাকিয়ে রইলো পিকলুর দিকে। তার দু চোখের কোণে সামান্য জল চিকচিক করছে। সে বললো, আমি তোমাকে কী বলতে চাই, তুমি তা জানো না? তুমি বুঝতে পারো না!

পিকলু মুখটা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বললো, হ্যাঁ, পারি।

-কী বলো তো!

–তা মুখে বলার দরকার নেই।

–আমার কী হয়েছে জানি না। আমি আজকাল সর্বক্ষণ তোমার কথা ভাবি। তোমাকে খানিকক্ষণ না দেখলেই আমার মন ছটফট করে। আমি কাছে আছি, অথচ তুমি যদি অন্যদের সঙ্গে বেশি কথা বলো, তা হলে খুব কষ্ট হয় আমার। কেন এরকম হচ্ছে। আমি নিজেকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি...

পিকলু চুপ করে রইলো।

–তুমি আমাকে খারাপ মেয়ে মনে করো, তাই না? আমি তোমাকে ভালোবাসি। এটা অন্যায় আমি জানি...।

পিকলু তুতুলের একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের মুঠোয় রাখলো, তারপর নরম ভাবে বললো, না, ভালোবাসা অন্যায় নয়। আমিও তোকে ভালোবাসি। কিন্তু একজন নারী একজন পুরুষকে কিংবা একজন পুরুষ একজন নারীকে যেভাবে ভালোবাসে, এ ভালোবাসা সেরকম নয়।

–তুমি...তুমি অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসো?

পিকলু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার দৃষ্টি চলে গেল দূরে। সে একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে দাঁতে দিয়ে বললো, উঁ?

–পিকলুদা, তুমি অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসো?

–নাঃ।

–তুমি কবিতা লেখো, আমি দেখেছি।

–কী করে দেখলি?

–টেবিলের ওপর তোমার খাতা পড়ে থাকে...একটা পত্রিকায় দেখলাম তোমার একটা কবিতা ছাপাও হয়েছে, মনে হলো কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলা–

–ওসব কাল্পনিক। নারী, নয়, নারীত্বের প্রতি....

–আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

–কী বললি, কিসের অপেক্ষা?

–আমি তোমার কাছে এখন কিছু চাইবো না। আমি তোমাকে একটুও জ্বালাতন করবো না। তুমি যতদিন বলবে, আমি ততদিন অপেক্ষা করবো। কিন্তু তুমি শুধু আমার থাকবে, তুমি অন্য কারুর কাছে চলে যাবে না। তুমি কথা দাও!

পিকলু তুতুলের হাতটা ছেড়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। বেশ কয়েক শুত। তারপর পরিষ্কার গলায় বললো, এসব কথা আমাকে বলিস না। আমি কোনো বন্ধন সহ্য করতে পারি না। তাছাড়া, তুতুল, আমি তোকে ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি, সেই গলাবাসার মধ্যে স্নেহ, মমতা, এই সব মিশে আছে। কিন্তু প্রেম নয়। আমি তোর প্রেমিক হতে পারবো না। সেরকম চিন্তা আমার মাথাতেই আসে না।

তুল মাথা ঝুঁকিয়ে ব্যাকুল ভাবে বলতে গেল, কিন্তু পিকলুদা, আমি যে–

পিকলু তার মুখে নিজের হাত চাপা দিয়ে বললো, চুপ, ঐসব কথা আর নয়!

পর ওরা চুপ করেই বসে রইলো। তুতুলের কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়লো সবুজ ঘাসগুলিকে সারবান করার জন্য। পিকলু একটা সিগারেট পোড়ালো। বাদামের খেলাগুলো সে তুলতে লাগলো যত্ন করে।

বাতাসে খসে পড়লো কয়েকটি গাছের পাতা।

৪৮ নতুন বাড়ি ঠিক হলো কালীঘাটে

অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত নতুন বাড়ি ঠিক হলো কালীঘাটে। শহরের একেবারে উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণে। ছোট একটি একতলা বাড়ি, খুবই পুরোনো যদিও, কিন্তু আর কোনো ভাড়াটে নেই, এটা একটা মস্ত বড় সুবিধে। বাড়ির মালিক একজন অবসরপ্রাপ্ত উকিল, বিমানবিহারীর পরিচিত, তিনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই বাজারে ভাড়াও বেশ সস্তাই বলতে হবে, দুশো পনেরো টাকা। বাগবাজারের ফ্ল্যাটটির ভাড়া ছিল অবশ্য পঁচাশি টাকা, আড়াই গুণ বেড়ে গেল, কিন্তু এখন বাড়ি বদল করতে হলে এই গচ্চা দিতেই হবে। সুপ্রীতি ও মমতার বাড়ি পছন্দ হয়েছে। বাড়ির মালিক অবসরপ্রাপ্ত উকিল বলেই প্রতাপ এ বাড়ি নিতে সম্মত হয়েছেন, আদালতের হাকিম হিসেবে কোনো প্র্যাকটিসিং উকিলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তিনি নীতিসঙ্গত মনে করেন না।

দু' মাসের ভাড়া অগ্রিম জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চৈত্র মাসে বাড়ি বদল করতে নেই বলে এখনও একটা মাস বাগবাজারেই থাকতে হবে। কিছু কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওখানে। পিকলুবাবলুদের খুব মজা, এখন তাদের দুটো বাড়ি। মাঝে মাঝে বাসে চেপে ওরা কালীঘাটের বাড়িতে চলে আসে, দুপুর-বিকেল কাটিয়ে ফিরে আসে সন্ধের সময়। এখান থেকে বিমানবিহারীদের বাড়ি বেশি দূর নয়, অলি বুলিরাও খেলা করতে আসে তাদের সঙ্গে। বাড়িটি খুব পুরোনো হলেও দেয়ালগুলি সদ্য চুনকাম করা হয়েছে বলে নতুন নতুন গন্ধ,। বাবলুর শুধু একটাই দুঃখ, এ বাড়িতে ছাদ নেই। একতলা বাড়ি, ছাদের সিঁড়ি তৈরি হয়নি। বাবলু অবশ্য দেখে রেখেছে, পাশের একটা পাঁচিলের ওপর উঠে তারপর রেইন পাইপ বেয়ে ওঠা যায় ছাদে। এ পাড়ায় অনেক ঘুড়ি ওড়ে, তাদের ছাদে কোনো কাটা ঘুড়ি এসে পড়লে সে কি এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?

শিবেন এবং তার দলবলের সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়া হচ্ছে বলে সুপ্রীতি বেশ। খুশী। ভাসুরদের সঙ্গে তাঁর মামলা চলছে সম্পত্তির ভাগ নিয়ে। বরানগরের বাড়ির খানিকটা অংশ ভাড়া দেওয়া হয়েছে, আদালতের ইনজাংশানে সুপ্রীতি সেই ভাড়ার কিছুটা

ভাগ পাচ্ছেন। কাশীপুরের যে বাগান বাড়িটা উদ্বাস্তুরা জবরদখল করে আছে তার জন্যও সরকারের কাছ থেকে কমপেসেশান পাওয়া যাবে শোনা যাচ্ছে, সেই টাকার ভাগও যাতে তিনি পান তার চেষ্টা চলছে। প্রতাপকে এখন তিনি নিয়মিত সংসার খরচ হিসেবে কিছু দিতে পারবেন।

কালীঘাট জায়গাটা আগে যতখানি সুদূর মনে হতো, এখন বাগবাজার থেকে কয়েকবার বাসে যাওয়া-আসার পর ততটা দূর মনে হয় না। দোতলা বাসে চড়ে চমৎকার ভ্রমণ, তারপর একটা ফাঁকা বাড়ি, নিজস্ব বাড়ি, বাথরুম শুকনো খটখটে, রান্নাঘরে উনুন নেই, কেমন যেন অদ্ভুত লাগে বাবলুর। খালি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে মুখের পাশে দু হাত দিয়ে টার্জনের মতন। আ-ও-ও বলে চিৎকার করে প্রতিধ্বনি শোনার চেষ্টা করে।

পিকলুর ইচ্ছে ছিল সে একা ঐ বাড়িটাতে থাকবে এই চৈত্র মাসটা। সামনেই তার একটা পরীক্ষা আছে, ওখানে পড়াশুনোর সুবিধে হবে। কিন্তু প্রতাপ রাজি হননি। ওখানে সে খাওয়াদাওয়া করবে কোথায়? বার বার যাতায়াত করতে শুধু শুধু বাস ভাড়া খরচ হবে। একদিন তো এই বাড়িতেই পড়াশুনো হচ্ছিল, আর এখন এই কটা দিনের জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে? চৈত্র মাসে বাড়ির ছেলে বাইরে থাকবে, এটা সুপ্রীতিরও ইচ্ছে নয়।

পিকলুর সত্যিই পড়াশুনোয় মন বসছে না। একবার যাবার নাম উঠে গেছে বলে এ বাড়িতে সব সময়েই কেমন যেন একটা চঞ্চলতা। যেন রেলের প্ল্যাটফর্মের ওয়েটিং রুম। একদিন একজন চেনা লোকের একটা ভ্যান পাওয়া গিয়েছিল বলে প্রতাপ একটা কাঠের আলমারি আর দুটো খাট পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেয়াল থেকে নামানো হয়ে গেছে ছবিগুলো। কী রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

পিকলুর মন বসে না, সে পড়ার টেবিল ছেড়ে বার বার উঠে উঠে যায়। কখনো ফিজিক্সের অঙ্ক কষার বদলে সে সেই খাতাতেই কবিতা লিখতে শুরু করে। বাড়ি বদলের মতন তার মনের মধ্যেও যেন বড় রকমের একটা বদল আসছে। এরকম ছটফটানি তার আগে কখনো ছিল না। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির প্রতি তার সত্যিকারের ভালোবাসা আছে, সে শুধু

গেলবার জন্য পড়ার বই পড়ে না, আবিষ্কারের মতন ভেতরে ঢুকে যায়। কিন্তু এখন পরীক্ষার আগে তার মাথায় শুধু কবিতার লাইন আসছে কেন?

বুদ্ধদেব বসু তার একটা কবিতা মনোনীত করে চিঠি দিয়েছেন। আর একটি কবিতায় তিনি সবুজ কালি দিয়ে কিছু কাটাকুটি করে মন্তব্য লিখেছেন যে শব্দ ব্যবহার সঠিক হয়নি, নিজের অনুভূতি থেকে শব্দগুলো আসেনি। অথচ এই দ্বিতীয় কবিতাটাই পিকলুর বেশি পছন্দ ছিল। 'কবিতা পত্রিকায় তার প্রথম লেখা ছাপা হবে বলে সব সময় ভেতরে ভেতরে যেমন একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু পছন্দ করেননি বলে তার খানিকটা ক্ষোভ এবং সংশয়ও বাষ্পের মতন ঘোরাফেরা করছে বুকের মধ্যে।

দুপুরবেলা সুপ্রীতিরা বাজারে বেরুলেন কানুর সঙ্গে। নতুন বাড়ি সাজাবার জন্য কিছু কেনাকাটি করা দরকার। যেমন সব কটা দরজার জন্য পাপোষ, উনুন পাতার শিক, জানলার পদাগুলো ছিঁড়ে গেছে, নতুন পর্দার কাপড় চাই। এ বাড়ির বেড়ানো বাথরুমের মগটা নতুন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায় না। এতদিন বেশ চলে যাচ্ছিল, তবু বাড়ি বদল করতে হলেই কিছু জিনিস ফেলে দিতে হয়, কিছু নতুন আনতে হয়।

প্রতাপকে নিয়ে বাজার করতে যাওয়া এক বিড়ম্বনা। প্রতাপের ধৈর্য নেই, একটু বাদেই তাড়া দিতে শুরু করেন, তাতে পছন্দ মতন কিছুই কেনা যায় না। আজ কানুকে পাওয়া গেছে, সুবিধে হয়েছে। বাড়ি বদলের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করছে কানু। তার বিয়েও ঠিক হয়ে গেছে, কালীঘাটের নতুন বাড়িতে গিয়ে ওখানেই তার বিয়ে হবে।

সুপ্রীতি-মমতার সঙ্গে তুতুলও এসেছে। মোড়ের মাথায় এসে সবাই দাঁড়ালো, কানু তাদের ট্যাক্সি করে বড়বাজারে নিয়ে যাবে। হঠাৎ সুপ্রীতি বললেন, এই যাঃ, আমরা সবাই চলে এলাম, মুন্নিবাবলু ইস্কুল থেকে ফিরলে ওদের খাবার দেবে কে? বাবলুটা তো খাবার না পেলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে!

মমতা লজ্জা পেয়ে গেলেন। এই কথাটা তাঁর আগে মনে পড়েনি। সত্যিই তো, এভাবে যাওয়া চলে না। তিনি বললেন, দিদি, আমি তা হলে থাকি, আপনিই গিয়ে কিনে আনুন!

সুপ্রীতি বললেন, তা হয় নাকি? তুমি না গেলে সব জিনিস পছন্দ করবে কে? তোমরা ঘুরে এসো কানুর সঙ্গে, আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি।

এ প্রস্তাবটাও বাস্তব নয়। মজুমদার পরিবারে এখনও সুপ্রীতিই কত্রী। খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তাঁর মত না নিয়ে কিছু করা যায় না। মমতা একা বাজার করে আনলে সুপ্রীতি নিশ্চিত কিছু খুঁত ধরবেন।

দু'জনেই তাকালেন তুতুলের দিকে। মমতা জিজ্ঞেস করলেন, তুতুল তুই যাবি? সুপ্রীতি লেন, হ্যাঁ, তুতুল তুই থাক, তুই বাজারে ঘুরে কী করবি?

গত সামান্যই দূরত্ব, তবু কানু গিয়ে তুতুলকে পৌঁছে দিয়ে এলো বাড়ি পর্যন্ত। পাড়ার কিছু ছেলে রকে আড্ডা দিচ্ছে, ওদের নজর ভালো না।

দোতলায় উঠে এসে তুতুল দরজা ঠক্ ঠক্ করলো। একটু পরে দরজা খুলে দিল পিকলু। তার এক হাতে একটা কলম। সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী রে, তুই ফিরে এলি?

উত্তরটা শোনার জন্য অপেক্ষা না করেই অন্যমনস্কের মতন পিকলু আবার দ্রুত ফিরে গেল পড়ার টেবিলে।

তুতুল নিজেদের ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে খুব গরম, তবু পাখা খোলবার কথা তার মনে পড়লো না। তার চোখ দুটি স্থির। বাড়িতে পিকলুদা ছাড়া আর কেউ নেই, সেজন্য বাতাস যেন ভারি লাগছে।

সেদিন সেই ইডেন গার্ডেনের স্বদেশী মেলা দেখতে যাওয়ার পর সে আর পিকলুর দিকে ভালো করে তাকাতে পারে না। পিকলু তার বুক ভেঙে দিয়েছে, একা থাকলেই তার এখন কান্না পায়। আজ মায়েদের সঙ্গে বড়বাজারে যাওয়া তার পক্ষে অনেক ভালো ছিল!

পিকলু অবশ্য তার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারের চেষ্টা করে। যেন সেদিন ইডেন গার্ডেনে কিছুই হয়নি। পিকলু যেন এক ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে তুতুলের একটা স্বপ্ন। সে পৃথিবীর অনেক বড় বড় ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করে, সামান্য একটি পিসতুতো বোনের হৃদয় দৌর্বল্য নিয়ে মাথা ঘামাবার তার সময় নেই।

তুতুল বিছানায় শুয়ে পড়লো না, বই নিয়ে বসলো না, সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ঐ এক জায়গায়। ঘরের মাঝখানে। তার মনে পড়ছে শুধু একটাই কথা। পাশের ঘরে রয়েছে। পিকলুদা, সে আর কিছুতেই আগের মতন পিকলুদার পাশে বসে পড়ে গল্প করতে পারবে না। যে তার সবচেয়ে আপন, সে-ই আজ সবচেয়ে দূরে সরে গেছে।

পাশের ঘরটা নিস্তব্ধ, পিকলুর সামান্য নড়াচড়ার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। গলি দিয়ে ঠন্ ঠন্ করে কাঁসার বাটি বাজিয়ে হেঁকে যাচ্ছে একজন বাসনওয়ালা। পাশের বাড়ির রেডিওর এরিয়ালে বসে ডাকছে একটা চিল।

কত ক্ষণ, বোধ হয় এক ঘণ্টা কেটে গেছে, তুতুল এখনো বসেনি, তবে ঘরের মাঝখান থেকে সরে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে। তার চোখ দুটি স্থির। পিকলুদার সঙ্গে সে আর কোনোদিন স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারবে না? পিকলুদা তাকে খারাপ মেয়ে ভেবেছে, তাকে উপদেশ দেবার ছলে ধমকেছে। এর পরেও আর এক বাড়িতে থাকা যায়? এর চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো নয়?

তুতুল একবার ঘরের ছাদের কড়িবগার দিকে তাকালো। পাখা টাঙাবার হুকের মতন আর একটা হুক খালি আছে, একপাশে ঝুলছে। চেয়ারের ওপরে দাঁড়ালে ওটায় হাত পাওয়া যায়। কিংবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে, যেদিকে দু চোখ যায়....যদি কোনো দুষ্টু লোক ধরে, কী আর হবে, মেরে ফেলবে বড় জোর!

পিকলু এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো, জিজ্ঞেস করলো, কী করছিস রে তুতুল?

পিকলু পরে আছে ধুতি আর হাতকাটা গেঞ্জি। মাথার বড় বড় চুলগুলো অবিন্যস্ত। বাড়ি থেকে বেরুতে না হলে সে প্রায়ই স্নান করেও চুল আঁচড়ায় না। তার মুখের রঙ তামাটে হলেও তার কাঁধ ও বাহু বেশ ফর্সা। তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

পিকলুকে দেখে তুতুল কেঁপে উঠলেও কোনো উত্তর দিল না।

পিকলু এগিয়ে এসে বললো, তুই ওরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

মুখ নিচু করে তুতুল বললো, চা করে দেবো?

পিকলু বললো, না। তারপর সে একেবারে পুতুলের মুখোমুখি দাঁড়ালো। ডান হাতেম একটা আঙুল দিয়ে তুতুলের থুতনিটা উঁচু করে তুলে বললো, মানুষের জীবনে সবচেয়ে শক্ত জিনিস কী জানিস? অন্য মানুষদের ঠিক মতন চেনা। দ্যাখ না, তুই আর আমি কত কাছাকাছি, অথচ দু'জনে দু'জনকে চিনি না।

পিকলু এবারে তুতুলের গালে নরম করে হাত বুলিয়ে বললো, তুই কী সুন্দর, তুতুল। তোর মতন সুন্দর মেয়ে আমি আর কারুকেই দেখিনি। ছোটবেলায় এক সময় বুলা মাসিকে আমার খুব ভালো লেগেছিল...।

হঠাৎ থেমে গিয়ে সে একটুক্ষণ তুতুলের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর কণ্ঠস্বর বদলে বললো, তোর সঙ্গে আমার খুব দরকার আছে। সেদিন ইডেন গার্ডেনে তুই যা বলেছিলি, সব ভুলে যা। ওসব মনে রাখতে নেই। মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে প্রেম, সে ভারি গোলমেলে ব্যাপার। তাছাড়া তোকে আমি সেইভাবে দেখি না। তুই আমি ভাই-বোন হলেও আমরা বন্ধু হতে পারি। রাইট? তুই বুদ্ধিমতী মেয়ে, তুই ঠিক বুঝবি। বন্ধুর যদি কখনো বিপদ হয়, কিংবা হঠাৎ কোনো কিছুর খুব দরকার হয়, তা হলে অন্য বন্ধু সাহায্য করে, ঠিক কি না? তোর যে-কোনো দরকারে আমি সাহায্য করবো। আমার কাছে কখনো কিছু লুকোবি না।

তুতুল এখনও নির্বাক।

–আমি এখন তোর কাছে একটা সাহায্য চাই, তুতুল।

পিকলু ঘরটার চারদিকে দ্রুত চোখ বোলালো। সুপ্রীতি একটা সেলাই মেশিন কিনেছেন, সেলাই করার জন্য তিনি একটা অনুচ্চ জলচৌকিতে বসেন। তুতুল পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে জলচৌকিটা নিয়ে এলো দেয়ালের কাছে। তারপর তুতুলের হাত ধরে বললো, তুই এর ওপর উঠে দাঁড়া।

তুতুলের যেন নিজস্ব কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই। সে পা তুললো জলচৌকিটার ওপর। পিকলু কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধভাবে চেয়ে রইলো তার দিকে।

তুতুল পরেছে একটা নীল রঙের ব্লাউজ, তার শাড়িটাও নীল-সাদা ডুরে। খোলা চুলে একটা রিবন্ বাঁধা। ঠোঁটে একটু ক্রিম মাখা ছাড়া তুতুল আর কোনো প্রসাধন করে না।

পিকলু বললো, মনে কর, এই একটা বেদীর ওপর তুই দাঁড়িয়ে আছিস। পৃথিবীর একমাত্র নারী। আর কেউ নেই। আমিও কেউ না। পাহাড়, গাছপালা, নদী, কাঠবেড়ালী এরা যে-চোখে নারীকে দেখে, আমি সেইভাবে তোকে দেখবো।

পিকলু তুতুলের শাড়ির আঁচলটা ধরে বুক থেকে নামিয়ে দিতে যেতেই তুতুল মাঝপথে সেটা ধরে ফেলে বললো, এ কী!

তুতুলের গলায় এক পৃথিবী ভরা বিস্ময়।

পিকলু একটু দুর্বলভাবে হেসে বললো, ঐ যে বললুম, বুঝতে পারলি না? আমি তোকে দেখতে চাই। তুই জামাকাপড় খুলে ফেলবি, আমি শুধু দেখবো একবার।

তুতুল এক পৃথিবী-ভরা ঘৃণা নিয়ে বললো, ছিঃ!

পিকলু বললো আমি এখনো কোনো বাস্তব জীবনের নারীকে চিনি না, তার শারীরিক রূপের আভজ্ঞতা আমার নেই, সেইজন্যই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন যে আমার শব্দ ব্যবহার ঠিক হয় না। নারার বর্ণনার সময় আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে লিখি না, অন্যদের লেখা থেকে শব্দ ধার কার-আমার চোখে তুই-ই সবচেয়ে সুন্দর, তুতুল, আমার সবচেয়ে কাছের, আমি তোকে আজ পুরোপুরি একবার দেখবো, মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ পর্যন্ত....

দু'হাতে কান চাপা দিয়ে তুতুল বলে উঠলো, চুপ করো, প্লিজ, চুপ করো!

এবার পিকলু অবাক হলো। সে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক কথাটা বলেছে আর তুতুল তা বুঝতে পারছে না! আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য সে বললো, আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা নই, দ্যাটস সেট্‌লড! আমরা এখন ভাইবোনও নই। আমরা বন্ধু। একজন বন্ধু আর একজন বন্ধুর কাছে সাহায্য চাইছে। আমি কোনোদিন কোনো নারীকে দেখিনি। আই মীন, ছবি দেখেছি, অ্যানাটমিক্যালিও জানি, তবু রক্তমাংসের কোনো নারীকে পরিপূর্ণভাবে দেখা, তার যে অনুভূতি, সেটা আমার নেই বলেই আমি ঠিক লিখতে পারি না। শব্দগুলো আমার উপলব্ধি থেকে আসে না-প্লীজ, তুতুল, একবার মাত্র। দু মিনিটের জন্য...

বিস্ময় আর ঘৃণার সঙ্গে মিশে গেল ব্যথা। তুতুল বললো, ছিঃ, পিকলুদা, তুমি আমাকে এই কথা বলতে পারলে?

পিকলু সরলভাবে আহত হয়ে বললো, তুই আমাকে ভুল বুঝছিস না কি? এর মধ্যে খারাপ তো কিছু নেই। বলছি তো, প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপার নয়-

-প্লিজ, পিকলুদা, তুমি চুপ করো!

-শোন, আমি দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। আমি তোকে ছোঁব না। আই প্রমিজ। তা হলে তো দোষের কিছু নেই? শুধু একবার তোর শরীরের সম্পূর্ণ রূপ দেখবো...

পিকলু পিছিয়ে গেল কয়েক পা। আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়ালো তুতুল। তার চোখে এখন ঝকঝক করছে একরকম দীপ্তি। নরম হাতের আঙুল তুলে সে দৃঢ় গলায় বললো, পিকলুদা, যাও, তোমার ঘরে যাও, পড়তে বসো!

পিকলু আরও কিছু বলতে গেলে তুতুল আবার বললো, যাও! ও ঘরে যাও!

ইডেন গার্ডেনে পিকলু যেভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তার থেকে তুতুলের প্রত্যাখ্যান হলো অনেক বেশি কঠোর। পিকলু চলে যাবার পর সে উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগলো।

একটু পরেই সে জলচৌকি থেকে নেমে খাটে বসে পড়ে দুই জানুর মধ্যে মুখ নিয়ে ফুঁপিয়ে খুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

মিনিট দশেক বাদেই ফিরে এলো পিকলু। তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ উদ্ভ্রান্ত। চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে, গেঞ্জি ভিজে গেছে ঘামে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে খসখসে গলায় বললো, তুতুল, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। আই বীহেভড় লাইক এ ক্যাড, লাইক এ ব্লাডি ফুল

তুতুল মুখ তুললো না।

পিকলু আবার বললো, তুতুল, আমি অন্যায় করেছি। আমি ক্ষমা চাইছি তোর কাছে।

তুতুল তবুও কিছু বললো না, পিকলু ফিরে গেল নিজের ঘরে।

দু' তিন মিনিট পরেই আবার ফিরে এলো সে। কিন্তু দরজার কাছেই দাঁড়ানো, ঢুকলো না ঘরের মধ্যে। এবারে তার কণ্ঠস্বর ফেটে ফেটে গেছে। সে বললো, তুতুল, সত্যিই আমি খুব অন্যায় করেছি। তোকে অপমান করেছি। আর কোনোদিন এরকম হবে না।

তুতুল তবু মুখ তুললো না।

পিকলু এবারে ব্যাকুলভাবে মিনতি করে বললো, তুতুল, তুই কি কিছু বলবি না?

তুতুল মুখ না তুলেই বললো, এখন আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। প্লিজ, তুমি পড়তে যাও। পড়া নষ্ট করো না!

পিকলু নিজের টেবিলে ফিরে এলেও পড়ার বইয়ের দিকে তাকালোই না। প্রবলভাবে নাচাতে লাগলো দু হাঁটু। তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, কিন্তু সে তো কাঁদতে পারবে না তুতুলের মতন।

আবার কয়েক মিনিট বাদে সে তুতুলকে কিছু বলবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই বাইরের দরজায় দুম দুম শব্দ হলো। বাবলু-মুন্নিরা এসে গেছে।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পরদিন কিন্তু অনেকটা হালকা হয়ে গেল তুতুলের মন। পিকলুর ওপর তার ঘৃণা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র রাগও নেই। পিকলুর মাথায় হঠাৎ একটা পাগলামি চেপেছিল, কিন্তু কত ভালো ছেলে সে, একবারও তো তুতুলের ওপর জোর করতে আসেনি।

দু'জনেই দু'জনকে দু'রকমভাবে প্রত্যাখ্যাত করায় যেন সব সমান সমান হয়ে গেছে। তুতুল আবার পিকলুর সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারবে। সে আবার তার আগেকার পিকলুদা হবে। এখন কয়েকদিন পিকলুর আড়ষ্ট থাকার পালা, নতুন বাড়িতে গিয়ে তুতুল নিজে থেকেই ওর সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করে নেবে।

ভালো দিন দেখা হয়েছে, পরশুই পাকাঁপাকি ছেড়ে দেওয়া হবে এই বাগবাজারের বাড়ি। দুপুরের দিকে সুপ্রীতি বললেন, শেষবারের মতন একবার গঙ্গাস্নান করে আসা হবে না? গঙ্গার ধার থেকে চলে যেতে হলে স্নান সেরে নিতে হয়।

কালীঘাটের বাড়ির কাছেও আদিগঙ্গা আছে বটে, কিন্তু সেই শীর্ণ, মুমূর্ষ নদী দেখলে স্নান করার ভক্তি হয় না।

মমতাও রাজি। কিন্তু কে নিয়ে যাবে? পিকলুই বরাবর নিয়ে যায়। পিকলুর সামনেই পরীক্ষা, সে সর্বক্ষণ পড়ার টেবিলে থাকে, তার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বাবলু-মুন্নির এখানকার স্কুলের ইতি হয়ে গেছে। শেষ কয়েকদিন বাবলু প্রাণপণে ঘুড়ি ওড়াবার সাধ মিটিয়ে নিচ্ছে। সকাল নেই, দুপুর নেই, বিকেল নেই, সর্বক্ষণ সে ছাদে। গায়ের রঙ পুড়ে গেছে, চোখ দুটো পাকা করমচার মতন লাল।

কোনোক্রমে বাবলুকে ধরে মমতা বললেন, বাবলু, আমাদের সঙ্গে একটু গঙ্গার ঘাটে যাবি?

বাবলু চেঁচিয়ে উঠে বললো, ওরে বাবা রে, আমার এখন সময় নেই। কেন, দাদা যাক না!

মমতা ফিসফিস করে বললেন, দাদার এখন পরীক্ষা না? সেইজন্যই তো তোকে বলছি!

আমি পারবো না, বলেই বাবলু দৌড়ে ছাদে চলে গেল। তা হলে আর যাওয়া হয় না। মমতা-সুপ্রীতি এখনো একলা কোথাও বেরোন না!

শেষ চেষ্টা করার জন্য সুপ্রীতি এবার বাবলুকে ডাকিয়ে আনলেন। বাবলু তাঁর কথা শোনে। ব্যক্তিত্ব খাঁটিয়ে সুপ্রীতি বললেন, বাবলু, তুই একটু চল আমাদের সঙ্গে। একবার গঙ্গায় যাওয়ার মানত করে তারপর না গেলে পাপ হয়। তুই চল, তোকে ঘুড়ি কেনার জন্য একটা সিকি দেবো!

বাবলু বললো, আমার পয়সা চাই না। আমার অনেক ঘুড়ি আছে! আগে তো সব সময় দাদাকে নিয়ে যেতে!

পড়ার টেবিল থেকে পিকলু সব শুনতে পাচ্ছে। সে উঠে এসে বললো, চলো, আমি নিয়ে যাচ্ছি। চটপট তৈরি হয়ে নাও!

সুপ্রীতি অপ্রস্তুতভাবে বললেন, তুই পড়া নষ্ট করে যাবি কেন? তা হলে থাক বরং, আমরা যাবো না।

পিকলু বললো, আমি সঙ্গে বই নিচ্ছি, ওখানে বসে পড়বো। চলো, আর দেরি কোরো না।

মমতা বাবলুর দিকে রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, অসভ্য ছেলে, দাদা পড়াশুনো ফেলে যেতে চাইছে, আর তোর ঘুড়ি ওড়ানোটাই বড় হলো? এরপর কিছু চেয়ে দেখিস, তোকে কিছু দেবো না।

বাবলু এই ভর্ৎসনা গায়েই মাখলো না, সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

গঙ্গার ঘাটে যেমন পুণ্য-সঞ্চয়ের জন্য অনেক মানুষ আসে, তেমনি যারা পুণ্যের পরোয়া করে না, সেইসব বহু ছিচকে চোর ও ফেরেববাজরাও ঘুরঘুর করে। ওপরে জামাকাপড়, জুতো, তোয়ালা-গামছা রেখে গেলেই যখন তখন উধাও হয়ে যায়। সেই জন্যও সঙ্গে একজনকে আনা দরকার।

বাগবাজার ঘাটে একটা বটগাছের গোড়ায় মা আর পিসির শাড়ি-গামছা পাহারা দিতে বসে রইলো পিকলু। সঙ্গে সে একটা বই এনেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা পরীক্ষার পড়ার বই নয়। সেটি একটি চটি কবিতার বই, নাম, ‘সাতটি তারার তিমির’। পরীক্ষার আগে পিকলুর কখনো টেনশন হয় না। এবং পরীক্ষার দু একদিন আগে সে টেক্সট বই পড়া কমিয়ে কবিতার বই পড়ে, গান শোনে। তাতে তার মাথা পরিষ্কার হয়। এবারে অবশ্য তার মাথা উত্তেজনার বাষ্পে ভরা, তুতুলের কাছে সে অন্যায় করেছে, তাতে তাকে অপমান করেছে, একথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কোনো মেয়েকে ভালো না বাসলে কি শুধু তার শরীর দেখতে চাওয়া যায়? পিকলুর এরকম ভুল হলে কী করে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুষ্কোণ নামে একটা ছোট উপন্যাস সে পড়েছিল, তাতেও তো এই কথাই আছে।

মাথার ওপর গনগন করছে বৈশাখের রোদ, বটগাছের ছত্রছায়া ভেদ করেও তা জাফরি কাটার মতন নিচে এসে পড়েছে। গঙ্গার ঘাটে আজ বেশ ভিড়। বড় চ্যাঁচামেচি হচ্ছে। চারদিকে। বড় বড় পাটের নৌকো এসেছে আজ। বাগবাজারের খালের মুখ খুলে দেওয়া হয়েছে, আরও নৌকো আসছে। কালো-কেলো, রোগা-রোগা ছেলেরা জল দাপাচ্ছে একটা বয়া-কে ঘিরে।

পিকলু এই সবের দিকে একবার অলস দৃষ্টি বুলিয়ে বইটা খুলে বসলো। একটি কবিতার নাম ঘোড়া। 'আমরা যাইনি মরে আজো-তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়/ মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;/ প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন-এখনও ঘাসের লোভে চরে/ পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর' পরে।...

পিকলু প্রতিটি শব্দ মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলো। প্রথম লাইনে 'তবু' কথাটা কেন? 'আমরা যাইনি মরে' তার সঙ্গে 'কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়' এর তো কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তবে কি যাইনি মরের সঙ্গে দৃশ্যের জন্মের কনট্রাস্ট? মহীনের ঘোড়াগুলি-মহীন কে? কারুর নাম? কোনো ঐতিহাসিক রেফারেন্স আছে? চেক করতে হবে! ধ্বনি হিসেবে অবশ্য অদ্ভুত ভালো। পৃথিবীর সঙ্গে ডাইনামোর উপমা, এটা একেবারে অপূর্ব! একেবারে অরিজিনাল। পৃথিবীর পেটের মধ্যেও অনেক নাড়িভুড়ি আছে। কত তার, যন্ত্রপাতি, খনি, ধাতু, লাভা...তাছাড়া পৃথিবী ঘোরে!

'বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে...'। পিকলু চোখ বুজে ভাবে, এরকম লাইন। লিখতে পারলে যে কোনো মানুষ ধন্য হয়ে যেত! বিষণ্ণ খড়ের শব্দ-বিষণ্ণ খড়ের শব্দ...তুতুল একদিন বলেছিল, পিকলুদা, তুমি আমাকে জীবনানন্দ দাশের কবিতা বুঝিয়ে দেবে? আমি বুঝতে পারি না...। আর কোনোদিন কি তুতুল এ কথা বলবে? মেয়েটার মনে বড় দুঃখ দেওয়া। হয়েছে। এমন সরল, পবিত্র মন মেয়েটার...।

হঠাৎ 'দাদা' ডাক শুনে পিকলু দারুণ চমকে উঠলো।

তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বাবলু। ধুলোমাখা খালি পা, সারা গা ঘামে ভিজে জবজবে। দেখলেই বোঝা যায় সারা পথ দৌড়ে দৌড়ে এসেছে।

এই দুরন্ত ছোট ভাইটার ওপর পিকলু কখনো রাগ করতে পারে না। পিকলু নিজে ছেলেবেলা থেকেই বহিরঙ্গে শান্ত, তার যত কিছু উদ্দামতা সবই নিভৃত কল্পনায়। বাবলুর সব রকম দুষ্টুমি, একগুয়েমি সে সমর্থন করে কারণ তারও মনের মধ্যে ঐরকম একটা রূপ আছে, কিন্তু বাইরে নেই।

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, কি রে, তুই?

বাবলু বললো, তুমি এবার বাড়ি যাও। আমি মা-পিসিমণির জামাকাপড় দেখছি!

পিকলু হেসে বললো, হঠাৎ তোর এরকম সুমতি হলো? বৃষ্টি নামেনি তো, ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ হয়ে গেল কেন?

বাবলু তার পাশে বসে পড়ে বললো, তুমি যাও না! তোমার পরীক্ষা! আমি এবার দেখছি।

–তুই একলা একলা এলি কী করে?

–আমি বুঝি আসতে পারি না? আমি সব রাস্তা চিনি। তোমরা যখন থাকো না, দুপুরবেলা আমি একা একা কত নতুন নতুন রাস্তায় যাই।

–বাবলু, ওরকম দুপুরে টো টো করে ঘুরিস না। ছেলেধরা একদিন ধরে নিয়ে যাবে, তখন বুঝবি!

–ছেলেধরারা ধরে নিয়ে গিয়ে কী করে?

–চোখ অন্ধ করে দেয়। তখন আর বাড়ি চিনতে পারবি না। ওরা তোকে দিয়ে ভিক্ষে করাবে। রাস্তায় কত অন্ধ ভিখিরি থাকে দেখিস না?

–ইস, আমাকে ধরা অত সহজ নয়। দাদা, আমাকে একদিন ডায়মণ্ড হারবার নিয়ে যাবে? অলিবুলিরা গিয়েছিল, সব সময় সেই গল্প করে।

–আচ্ছা, পরীক্ষার পর নিয়ে যাবো একদিন। তুতুল আর মুন্নিও সঙ্গে যেতে পারে। ট্রেনে করে যাবো। ওখানে অনেকে পিকনিক করতে যায়।

–আচ্ছা দাদা, তুমি কবে চাকরি করবে?

--কেন রে, হঠাৎ চাকরির কথা? আমি চাকরি করলে তোর কী লাভ হবে?

–মা একদিন বাবাকে বলছিল, তুমি তো আমায় কিছু দিলে না? পিকলু যখন চাকরি করবে, তখন সে নিশ্চয়ই আমাকে একটা অলওয়েভ রেডিও কিনে দেবে। কত লোক রেডিও'র নাটক শোনে...

–আমার চাকরি করতে এখনও ঢের দেরি আছে। তবে ছোটখাটো একটা রেডিও কিনে ফেলা যায়, দেখি, পরীক্ষার পরে একটা ভালো টিউশানি পাবার কথা আছে।

–তোমার পরীক্ষা, তুমি পড়তে যাও, পড়তে যাও। সেইজন্যই তো আমি এলাম।

–ভ্যাট! মা-পিসিমণি তো একটু বাদেই উঠে আসবে। একসঙ্গে ফিরবো।

বাবলু পিকলুর ভোলা বইটাতে একবার উঁকি মেরেই মুখ সরিয়ে নিল। কবিতা দেখলেই তার অভক্তি হয়। বোধহয় দাদার পরীক্ষাতে এগুলোও লাগে।

সে চঞ্চলভাবে মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে বললো, দাদা, তুমি সিগ্রেট খাচ্ছো না?

পিকলু দু'দিকে মাথা নাড়লো।

বাবলু ঝকঝকে কচি দাঁতে হেসে বললো, তোমার কাছে নেই বুঝি? পয়সা দাও, আমি কিনে এনে দিচ্ছি!

পিকলু বললো, এক চাঁটি খাবি। তোর মতন ছোট ছেলে কিনতে গেলে দোকানদার দেবেই না!

বাবলু জোর দিয়ে বললো, হ্যাঁ দেবে! পয়সা দাও!

পিকলু বললো, কেন রে, তোর এত শখ কেন? তুই খেতে চাস নাকি?

বাবলু এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকার পাত্র নয়। সে কিছু একটা করতে চায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মা আর পিসিমণি কোন্ ঘাটে গেছে?

পিকলু উত্তর দিল না। 'সাতটি তারার তিমির' তার চোখ টানছে। সে আবার ফিরে গেল কবিতায়। বাবলু ছুটে গেল কোনো একটা দিকে।

খানিকবাদে গেল-গেল, ধর-ধর, ডুবে মলো-ডুবে মলো ইত্যাকার চিৎকারে পিকলুর ঘোর লো। ঘাটশুদ্ধ লোকজন শোরগোল করছে, কেউ একজন ডুবে যাচ্ছে। পিকলুর প্রথমেই মনে পড়লো বাবলুর কথা। তার ভাইটার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। বাবলু সাঁতার জানে না। হাতের বইটা নামিয়ে রেখে পিকলু ছুটে গেল জলের দিকে।

কয়েক মিনিট বাদেই সুপ্রীতি আর মমতা মেয়েদের ঘাট থেকে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে উঠে এলেন ওপরে। কিসের যেন চিৎকার-চেঁচামেচি হচ্ছে, ওঁরা কান দেননি। মেয়েদের। ঘাটের পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিলে পিকলু এসে শুকনো কাপড়-গামছা দিয়ে যায়, ওঁরা ভেতরেই শাড়ি পাল্টে নেন, বরাবরের নিয়ম এই। আজ ওরা পিকলুকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু পিকলু যেখানে বসে ছিল সেখানে তাঁদের শাড়ি পড়ে আছে।

একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রতিদিন এই ঘাটে আসে এবং নিজের মনে মনে জোরে জোরে কথা বলে, সকলেই চেনে তাকে। সেই বৃদ্ধাটি ওঁদের পাশ দিয়ে বলতে বলতে গেল, আ মাগো মা, কী অলুক্ষুনে কথা! দু দুটো ছেলে এক সঙ্গে ডুবে মলো! মা গঙ্গার এ কী আক্কেল! ঘোর কলি, ঘোর কলি, না হলে এমন হয়?

সুপ্রীতি-মমতা ঐ বৃদ্ধার কথা গায়ে মাখলেন না। দুটি ছেলে জলে ডুবেছে শুনে ওঁরা কিছুটা ব্যথিত বোধ করলেন, কিন্তু কিছু পাড়ার ছেলে জলে দাপাদাপি করে বিরক্তি উৎপাদন করে প্রায়ই, তাদেরই কেউ হবে ভাবলেন ওঁরা।

সুপ্রীতি জিজ্ঞেস করলেন, পিকলু গেল কোথায়?

মমতা বললেন, কী যেন হয়েছে ওদিকে, বোধহয় তাই দেখতে গেছে!

যেহেতু সুপ্রীতি বয়েসে বড় এবং বিধবা তাই শরীর সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা কম থাকার কথা। শাড়ি-গামছাগুলো দেখা যাচ্ছে, রাস্তাটা পেরিয়ে অনায়াসে নিয়ে আসা যায়। সুপ্রীতি বুকের কাছে দু'হাত জোড় করে প্রায় দৌড়ে সেগুলো নিয়ে এলেন।

মমতার সঙ্গে তিনি মেয়েদের ঘাটে আবার ফিরে যাবেন, এমন সময় একটা রোগা-লম্বা ছেলে দৌড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললো, ও মাসিমা, শিগগির আসুন! আপনাদের দুটো ছেলে জলে ডুবে গেছে! আসুন, আসুন!

সুপ্রীতি ভুরু কুঁচকে মমতার দিকে তাকালেন। এই ছেলেটিকে তাঁরা চেনেন না। এ কাদের কথা বলছে? দুটো ছেলে মানে কাদের না কাদের ছেলে। তাঁদের সঙ্গে এসেছে একা পিকলু, সে অতি শান্ত ছেলে, সে জলে নামেই না। যদি বা নামে, পিকলু সাঁতার জানে।

ছেলেটি তবু হিস্টিরিয়া রোগীর মতন চ্যাঁচাতে লাগলো, শিগগির আসুন! পিকলু আর বাবলু, আমি চিনি, আমি ও পাড়ার, ওরা আপনাদেরই বাড়ির ছেলে তো, শিগগির দেখবেন আসুন!

নাম দুটি বিদ্যুৎ তরঙ্গের কাজ করলো। ভিজে শাড়ি গায়েই সমস্ত লাজলজ্জা ভুলে সুপ্রীতি আর মমতা সেই ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন।

সমস্ত ভিড় দু'ফাঁক হয়ে গেল। যেন সবাই জানে। গোলমাল স্তব্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। ওঁরা দু'জনে ঘাটের প্রান্তে এসে দেখলেন, এক পলক দেখেই চিনলেন, পাশাপাশি শোয়ানো রয়েছে পিকলু আর বাবলুকে। দু'জনেরই চক্ষু বোজা।

সুপ্রীতির মাথাটা ঘুরে গেল। তবু প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে তিনি দেখলেন, মমতা হাঁটু দুমড়ে পড়ে যাচ্ছেন মাটিতে। সুপ্রীতি তাঁকে ধরবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ধরলেন শুধু শূন্যতা। তারপর নিজেকে খাড়া রাখবার জন্য পাশে যাকে পেলেন তাকেই জড়িয়ে ধরলেন দু' হাতে। যাকে ধরলেন, সে মানুষ না গাছ সে বোধও তাঁর নেই। তিনি পাগলের মতন বলতে লাগলেন, না, না, না, না...।

নদী বয়ে চলেছে আপন মনে, স্টিমার যাচ্ছে ভেঁপু বাজিয়ে, গরম বাতাস ছুটোছুটি করছে গাছের মাথায়। পৃথিবীতে কোথাও কিছু থেমে নেই।

॥ সূচনা পর্ব সমাপ্ত ॥

যৌবন পর্ব

১ টানা তিন দিন বৃষ্টির পর

টানা তিন দিন বৃষ্টির পর আজ আকাশ সবে মাত্র পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। এখনো সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু দুপুরের আলো প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। পাতলা পাতলা মেঘ ঈশান কোণ ছেড়ে যাচ্ছে নৈঋতে। বাতাস এখন সংযত।

এই ক'দিন বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইছিল প্রায় সারাক্ষণ। ঝড়ের সময়, যখন গাছ পালার চূড়াগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে, ডালপালাগুলো অসহায় ভাবে নাচতে থাকে, তখন পাখিরা কোথায় যায় কে জানে। কিংবা কী খায়? এখন বেরিয়ে এসেছে ঝাঁক ঝাঁক পাখি, গাঙশালিক, ছাতারে, চিল, চড়ুই, কাক, কিন্তু তাদের ডাক শুনে মনে হয় না তারা ক্ষুধার্ত। এই বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতিতে এখন মনে হয় সব কিছুই নির্মল, সকলেই সুখী।

নৌকোর ছই-এর বাইরে বসে আছে তরুণ অধ্যাপক বাবুল চৌধুরী। তার পরনে কুর্তা-পায়জামা, হাতে একটি ছোট বায়নোকুলার। নদীর ধারে ঝোঁপ ঝাড় দেখলেই সে চোখে বায়নোকুলারটি লাগিয়ে নতুন কোনো পাখি আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। অবশ্য তার বায়নোকুলারটি প্রায় খেলনাজাতীয়। ফিক্সড ফোকাস, তবু পাখি দেখায় তার অদম্য উৎসাহ। একটা তিতির বা ডাহুক দেখতে পেলেই সে চেঁচিয়ে ওঠে, মঞ্জু, মঞ্জু দেখে যাও!

নদীটির নাম ইছামতী, বহরে বেশি বড় না হলেও খরস্রোতা। এই বর্ষায় সে একেবারে রঙ্গিনী হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ভাঙ্গা গাছের ডাল কিংবা কোনো বাড়ির ছাউনির গুচ্ছ গুচ্ছ খড়, তাতেই বোঝা যায়, অনেক কিছু ভাঙতে জানে এই নদী।

স্টিমার সার্ভিস থাকলেও নৌকো-যাত্রাই বাবুল চৌধুরীর পছন্দ। ধীরে-সুস্থে দেখতে দেখতে যাওয়া হবে। তাড়া তো কিছু নেই, তার কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। যাওয়ার দিনটি আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল, সৌভাগ্যবশত যথাসময়ে বৃষ্টি থামলো। নৌকাতেই রান্নার ব্যবস্থা আছে, একটু আগেই খিচুড়ি আর ডিম ভাজা খাওয়া হয়েছে। ইচ্ছে করলে অবশ্য কোনো গঞ্জে বাজারে থামিয়েও খেয়ে নেওয়া যায়।

বায়নোকুলার ঘুরিয়ে পাখি দেখার চেষ্টা করতে করতে বাবুল চৌধুরী হঠাৎ একটা শুশুক দেখতে পেল। মাঝ নদীতে একবার হুস করে মাথা তুলেই আবার ডুবে গেল পরমুহূর্তে। বাবুল চৌধুরী এ রকমভাবে আগে কখনো শুশুক দেখেনি। তার ধারণা ছিল, শুশুক দেখতে সিমেন্টের বস্তার মতন। এখন যেন মনে হলো মানুষের মুখের আদল। সে চেঁচিয়ে উঠলো, মঞ্জু, দেখবে এসো মঞ্জু! মঞ্জু!

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ছই-এর দু'পাশে পা ঝুলিয়ে আব্রু রক্ষা করা হয়েছে। বাবুল চৌধুরী সরে এসে এক পাশের পদা তুলে মুখ বাড়ালো ভেতরে। মঞ্জু ওরফে বিলকিস বেগম তখন তার ছ'মাসের শিশু। সন্তানকে স্তন্য পান করাচ্ছে, বাবলুকে দেখে সলজ্জ ভুভঙ্গি করলো, শরীরটা মুচড়ে আড়াল করলো তার খোলা বুক।

বাবুল চৌধুরী মুগ্ধভাবে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললো, ম্যাডোনা! ইস, আমি যদি ছবি আঁকতে পারতাম।

শিশুটি বেশ স্বাস্থ্যবান, গোল গোল হাত, তার পানাহারের মধ্যে বিঘ্ন ঘটায় সে আপত্তিসূচক ঊউ শব্দ করলো।

বাবুল বললো, নদীতে একটা শুশুক দেখলাম। তুমি ওকে নিয়ে বাইরে এসো না!

মঞ্জ মাথা নেড়ে বললো, আমি অনেক শুশুক দেখেছি! আপনি দ্যাখেন গিয়া।

বাবুল এখনও পিতৃত্বে অভ্যস্ত হয়নি। ছ'মাসের বাচ্চা সামলানোতে অনেক ঝাট। তার মতে বাচ্চাকে যত বেশি ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়, ততই মঙ্গল। নিজের সন্তানের হাসি মুখ। দেখতে তার ভালো লাগে, কিন্তু কান্না শুনলেই পালাতে ইচ্ছে করে। তার তরুণী বধূর মাতৃত্বের রূপটি তার কাছে একেবারে নতুন, ছেলেকে কোলে নিলেই মঞ্জুর মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যায়, সেই মুখশ্রী উপভোগ করতে করতে বাবুলের আশ মেটে না।

প্রকৃতি দেখা ছেড়ে বাবুল তার স্ত্রীর পাশ ঘেঁষে এসে বসলো।

ছই-য়ের ভেতরটি আধো-অন্ধকার। একটি ছোট জানালা আছে, তা দিয়ে শুধু জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, আর শোনা যায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

একটা নীল রঙের শাড়ী পরে আছে মঞ্জু, তার কপালে একটা লাল টিপ। তার মুখমণ্ডলে একটা পাতলা বিষণ্ণতার ছায়া।

একটু পরেই শিশুটির চোখ জড়িয়ে এলো ঘুমে। মঞ্জু তাকে সাবধানে শুইয়ে দিল অয়েল ক্লথ পাতা বিছানায়। তারপর ব্লাউজের বোতাম টিপে আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে বললো, আপনে একটু শুইয়া লবেন? ঘুম পাইছে?

বাবুল তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বললো, পাগল, এমন সুন্দর দুপুরটা ঘুমিয়ে নষ্ট করবো? চলো বাইরে গিয়ে বসি।

বলতে বলতেই সে মঞ্জুর ডান কানের লতির নিচে মৃদু চুম্বন দিল। মঞ্জু কৃত্রিম কোপে বললো, বাইরে মাঝিগুলার সামনে আপনে এই রকম দুষ্টামি করবেন?

বাবুল বললো, না, না কিছু করবো না। শুধু গল্প করবো। কী সুন্দর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আলো হয়েছে, দেখে চক্ষু একেবারে জুড়িয়ে যায়।

মঞ্জু বললো, আপনি যান, আমি একটু পরে আসতেছি। বাবুল আরও দু'তিন জায়গায় চুম্বন দিয়ে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

নৌকো চলছে নদীর এক ধার ঘেঁষে। উজান ঠেলে যাওয়া, একজন মাঝি হাল ধরে আছে, আর একজন তীর দিয়ে গুণ টেনে চলেছে।

হালের মাঝিটির মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি, মধ্যবয়স্ক, শরীরটি বেশ মজবুত। মুখোনি দেখলেই মনে হয়, মাঝি হবার জন্যই যেন সে জন্মেছে। যখনই কেউ নৌকোর মাঝির

ছবি আঁকে, ঠিক এই রকম একটা চেহারাই আঁকে। তার গায়ের রং ঠিক কালো নয়, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে তার চামড়া এমন একটা বর্ণ নিয়েছে যার কোনো নাম নেই।

মাঝিটির নাম তাহেরউদ্দিন, সে স্বল্পভাষী। বাবুল তার সঙ্গে দু'একবার আলাপ জমাবার চেষ্টা করেও বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। নৌকো এখন যেখান দিয়ে চলছে, তার ডান পাশেই একটি বেশ বর্ধিষ্ণু জনপদ। অনেক বড় বড় পাকাবাড়ি চোখে পড়ে।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, তাহের ভাই, এই জায়গাটার নাম কী? মাঝি উত্তর দিল, কলাকোপা।

–অনেক দালান-কোঠা দেখতাছি। হিন্দুগো গ্রাম বুঝি?

–এই সব বাড়িতে এখনও মানুষজন থাকে?

–হ।

–কী জানি, হে আমি কইতে পারবো না।

–এদিকে সাহাবাবুরা খুব ধনী আছিল, তারাই বানাইছে বুঝি?

–আমি জানি না, কত্তা!

এইরকম ভাবে আর কথাবার্তা চালানো যায় না। বাবুল তাকিয়ে দেখলো কলাকোপার দু'তলা, তিনতলা বাড়িগুলির অধিকাংশই জানলা-দরজা বন্ধ। একটি বাড়ির সামনের বাগান থেকে বাঁধানো ঘাট নেমে এসেছে নদীতে, ঘাটের সিঁড়ির দু'পাশে বেশ চওড়া বসবার জায়গা। বাড়ির মালিক শৌখিন ছিল বোঝা যায়। ঘাটটি এখন জনশূন্য।

বাবুল আবার তাহেরুদ্দিনের দিকে ফিরে তাকালো। এই লোকটি এত কম কথা বলে কেন? বাবুল লক্ষ করেছে, আজকাল কেউই যেন প্রকাশ্যে কোনোরকম আলোচনাই চালাতে চায় না। উনিশশো আটান্ন সালের সাতই অক্টোবরের পর থেকে সমস্ত জাতির

যেন কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। জেনারেল আইয়ুবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীজা সারা পাকিস্তানে গণতন্ত্র বাতিল করে দিয়ে সামরিক আইন জারি করলো, তার কুড়িদিন পর ইস্কান্দর মীজাও বিতাড়িত হলো দেশ থেকে। আইয়ুব খাঁনই এখন সর্বেসর্বা। এই চার পাঁচ বছরে শুধু ধড়পাকড়ের রাজত্ব চলছে, কে কখন কোথায় গ্রেফতার হবে তার ঠিক নেই। সমস্ত রাজনৈতিক দল এখন নিষিদ্ধ। নেতারা কারারুদ্ধ। ছোটখাটো সরকারী কর্মচারিরাই এখন হম্বিতম্বা করে, কারুর ওপর ব্যক্তিগত রাগ থাকলে তাকে দেশদ্রোহী কিংবা চোরাকারবারি আখ্যা দিয়ে জেলে ভরে দেয়। মতলেববাজরাও এই সুযোগে এর ওর নামে লাগায়, নিরীহ মানুষেরা মুখে কুলুপ বন্ধ করে থাকে।

বাবুল ভাবলো, এই যে মাঝিটি, স্বৈরতন্ত্র বা সামরিক শাসনের প্রভাব কি এরও ওপর পড়েছে? চাষী, মাঝি, জেলে জোলা যারা সমাজের দরবারে নিম্নস্তরের মানুষ, রাজা বদল বা রাজনীতি বদলে কি তাদের কিছু আসে যায়? শুধু লুঙ্গি পরা, খালি গায়ে এই যে তাহেরুদ্দিনের চেহারা, ব্রিটিশ আমলে বা তারও আগেকার মোগল আমলে এখানকার একজন নৌকোর মাঝির চেহারা তো ঠিক একই রকম ছিল, কিছুই বদলায়নি। এর আগেকার চোদ্দ পুরুষ যেমন লেখাপড়া শেখেনি, তাহেরুদ্দিনেরও তেমনি অক্ষর জ্ঞান নেই, খবরের কাগজে কী লেখা হয় সে জানে না। আগেকার প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সঙ্গে এখনকার গভর্নর মোনেম খানের শাসনের যে কী তফাৎ, তা কি ও বোঝে? ওর জীবনযাত্রার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়েছে? আগেও ছিল দিনের পর দিন শুধু অন্নচিন্তা, এখনও তাই।

পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে মঞ্জু হাতছানি দিয়ে বাবুলকে ডাকলো কাছে। বাবুল মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিতে সে ফিসফিস করে বললো, চলেন, ঐ ধারে গিয়ে বসি!

দু'জনে নৌকোর অন্য দিকটার গলুই-এর কাছে বসলো, এখানে এখন কোনো মাঝি নেই। গুণটানা নৌকোর গতি অতি ধীর। আর কিছুক্ষণ পর বুড়িগঙ্গায় পড়লে পালে বাতাস লাগবে।

বাবুলের ঠোঁটে অল্প অল্প হাসি। পুরুষ মানুষ হিসেবে বাবুল বড় বেশি ফর্সা। তার ওষ্ঠাধর লালচে রঙের। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি রং লাগিয়েছে। বাবুলের কথা বলার ভঙ্গিও খুব মৃদু ও নম্র, কারুর কারুর মনে হতে পারে মেয়েলি।

অবশ্য যারা তাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনে, শুধু তারাই জানে যে যখন কোনো বিষয়ে জেদ ধরে তখন এই নরম-সরল যুবকটিই কী সাংঘাতিক কঠিন হতে পারে। যেমন, বাবুল পড়াশোনায় দারুণ ভালো ছাত্র ছিল, কোনো পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়নি, তার ঘনিষ্ঠ জনেরা সবাই আশা করেছিল, সে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যাবে। পূর্ব পাকিস্তানের মেধাবী ছেলেদের পক্ষে এখন অনেক সুযোগ উন্মুক্ত রয়েছে হয়েছে, ঐ চাকরি নিলে পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে আর চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু বাবুল সেদিকে গেল না।

সে বিদেশে চলে যেতে পারতো। তার বাপ মায়ের পয়সা আছে। তা ছাড়া স্কলারশীপ সে পেতই, তার তুলনায় অনেক নিরেশ ছাত্র হুড়হুড় করে ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় চলে যাচ্ছে, বাবুল যেতে রাজি হলো না। বিদেশে না যাক সে ঢাকায় বসেও রিসার্চ করতে পারতো, কিংবা চাকরি করার ইচ্ছে হলেও ঢাকাতে তার চাকরির অভাব হতো না। সকলকে অবাক করে সে মফঃস্বলের একটা কলেজে অধ্যাপনা করতে চলে গেল। মঞ্জুকে বিয়ে করার পর সে সংসার পেতেছে এক গ্রামে। মঞ্জুর বাবা-মা এবং বাবুলের বাবা-মা দু'পক্ষই দারুণ হতাশ। ঐ দু'পক্ষের আদেশ, উপদেশ, অনুরোধে বাবুল কর্ণপাত করেনি। মঞ্জু আপত্তি করেনি, এইটাই ছিল তার প্রধান জোর।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, আপনে হাসতেছেন কেন?

বাবুল বললো, আমার মাঝে মধ্যে এক একটা বড় মজার ব্যাপার চোখে পড়ে। এই যে আমাগো মাঝি তাহিরুদ্দিন, তোমার কি মনে হয় না, আমাদের বাপ-দাদাদের আমলে ঐ মানুষটাই নৌকা চালিয়েছিল? আমার ঠাকুদার বাবা নাকি ঢাকায় এসেছিলেন পাবনা থেকে।

তেনাকেও এনেছিল ঐ লোকটাই। তোমরাও ওর নৌকায় চাপো নাই?

মঞ্জু বললো, কী অদ্ভুত কথা! ও কি ভূত-প্রেত নাকি? বাবুল বললো, তা নয়। ও হলো, চিরকালের মাঝি। তবে আমাদের অল্প বয়েসে দেখেছি, মাঝিরা আমাদের সঙ্গে কত রকম গল্প করেছে, কত কেচ্ছা শুনিয়েছে, কিন্তু এখন ও যেন বোবা সেজে আছে!

–সকলের কি আর সব দিন কথা বলার মতন মেজাজ-মর্জি থাকে?

–তিন দিন ঝড় বৃষ্টির পর আজ রোদ উঠলো, তবু ওর মুখে হাসি ফুটলো না?

–তিন তিনটা দিন যে ওদের নষ্ট হয়ে গেল? সেই ক্ষতির কথাই ভাবতেছে বোধ হয়।

–অধিকাংশ মানুষই পুরনো দিনের কথা বেশি ভাবে, সামনের দিনটার কথা ভাবে না। তাই না?

–কী জানি!

–মঞ্জু, তুমিও পুরনো দিনের কথা বেশি ভাবো?

–আমি? কই না তো! ছেলের জন্য আমি কোনো কথা ভাবার সময় পাই? আপনি খোকার নাম ঠিক করলেন না?

–তোমার আব্বা-আম্মা তো দু'তিনটা নাম রেখেছেন।

–আপনের আব্বা আম্মাও চার-পাঁচটা নাম লিখে পাঠিয়েছেন। এতগুলা নামের মধ্যে। কোন্টা রাখা হবে আপনে ঠিক করে দ্যান।

–ওর কোনোটাই রাখা হবে না।

–বারে বা, ছেলের কোনো নাম থাকবে না?

–কেন, এত তাড়াতাড়ির কী আছে? তোমার ছেলে কি আইজকালের মধ্যে ইস্কুলে ভর্তি হবে নাকি?

মঞ্জু হঠাৎ কান খাড়া করে ছই- এর দিকে তাকালো। বাচ্চা জেগে উঠলো নাকি, কান্নার শব্দ আসছে? না, সেরকম কিছুই না, শুধু শোনা যাচ্ছে জলের সরসর শব্দ।

পাশ দিয়ে একটা নৌকো চলে গেল, সেটা মানুষজনে ভর্তি। খেয়ার নৌকো বোধ হয়। পুরুষরা সবাই চক্ষু দিয়ে লেহন করতে লাগলো মঞ্জুর শরীর। শুধু সুন্দর বলে নয়, তার মুখ চোখে, তার কাপড় পরার ধরনে একটা শহুরে ছাপ আছে। যে জন্য গ্রামের মানুষ বারবার তাকায়।

এই রকম দৃষ্টির সামনে মঞ্জু এখনো সহজ হতে পারে না। তার লজ্জা লাগে। মানুষ ভরা আরও একটা নৌকো আসছে। মঞ্জু তার স্বামীর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে বললো, আমি ভিতরে যাই, আপনে বসেন!

বাবুল ঠিকই বুঝলো মঞ্জু কেন ভেতরে চলে যেতে চায়। সে ঝুঁকে পড়ে খপ করে মঞ্জুর হাত চেপে ধরে বললো, না না বসো, বসো।

বাইরের লোকজনের দৃষ্টির সামনে স্বামী তার হাত চেপে ধরেছে, এই শরমে মঞ্জু ঠিক যেন একটা ধরা পড়ে যাওয়া অপ্সরার মতন ছটফটিয়ে বললো, ছাড়েন, ছাড়েন, কী করেন কী?

বাবুল বায়নোকুলারটি মঞ্জুর চোখের সামনে এনে বললো, ঐ দ্যাখো, এক ঝাঁক বক যাচ্ছে, ভালো করে দ্যাখো। মানুষ দেখার চেয়ে বক দেখা অনেক ভালো।

পাশের নৌকোটির কৌতূহলী মানুষদের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে রইলো বাবুল। তারপর সেই নৌকোটি অপসৃত হলে সে বললো, মঞ্জু তুমি একটা বিপ্লব করবে?

সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে বায়নাকুলারটি নামিয়ে নিল মঞ্জু। তার দৃষ্টিতে ঘনিয়ে এলো শঙ্কা। বিপ্লব কথাটার এখন নানা রকম অর্থ। আইয়ুব খান যখন মার্শাল ল জারি করলো, তখন সব খবরের কাগজে লেখা হলো এটাই একটা বিপ্লব। রাজনৈতিক নেতারা দলাদলি আর স্বজনপোষণ আর দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে দেশটাকে জাহান্নমে পাঠাচ্ছিল, প্রধান সেনাপতি এসে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দেশটাকে বাঁচালেন। কিন্তু অনেকেই তখন বাড়িতে দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকতো। আবার বিয়ের পর পর কিছু দিন মঞ্জু যখন ঢাকায় ছিল, তখন বাবুলের বন্ধুরা এসে প্রায়ই আড্ডার শেষ দিকে বলতো, চীনের ধাঁচের একটা বিপ্লব না ঘটালে এ দেশের মুক্তি নেই। বাবুলের সেই সব বন্ধুরা ছিল কী রকম যেন তিরিক্ষি মেজাজের, মঞ্জুর পছন্দ হতো না। বাবুলের মাথার চুলের মধ্যে একটা কাটা দাগ আছে, কোথায় জানি পলিটিকস করতে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছিল। সেটা নাকি বিপ্লবের প্রস্তুতি। বাবুল গ্রামের কলেজে চাকরি নেওয়ায় খুশী হয়েছিল মঞ্জু। ঐ সব বন্ধুদের থেকে তো দূরে থাকা যাবে!

মঞ্জু ত্রাসের সঙ্গে বললো, কী কইলেন? ঐ মতলোবেই বুঝি আপনি আবার ঢাকায় ফিরতে চাইলেন?

বাবুল হা-হা করে হেসে উঠে বললো, তুমি ভয় পাইলা নাকি? এটা একটা ঘরোয়া বিপ্লব। তোমার মা তোমার বাবার সাথে আপনি আইজ্ঞে করে কথা বলেন, ঠিক তো? আমার মা-ও আমার বাবাকে আপনি আইজ্ঞে করেন। তুমি এই রীতিটা ভেঙে দাও, তুমি এখন থেকে আমাকে তুমি বলবে!

মঞ্জু লজ্জায় মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল।

বাবুল তার থুতনি ধরে গাঢ় স্বরে বললো, শুধু শুধু বিছানায় না, শুধু বন্ধ ঘরের মইধ্যে না, সক্কলের সামনে। বাবা-মায়ের সামনে। নাও, এখন থেকেই শুরু করো, স্টার্ট। বলল, ওগো প্রাণনাথ...

বাবুলের কৌতুক ও উচ্ছলতার সঙ্গে সুর মেলাতে পারলো না মঞ্জু। সে হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে খানিকটা বিষাদাচ্ছন্ন গলায় বললো, আমরা তো স্বরূপনগরে বেশ ছিলাম, আপনে ঢাকায় ফেরার জন্য এত ব্যস্ত হইলেন কেন?

–আবার আপনি? তুমি বলো?

–আমরা কেন ঢাকায় যাচ্ছি?

–আরে, মাসের পর মাস কলেজ বন্ধ, ওখানে বসে থেকে কী করব?

–ঢাকায় গিয়েই বা কী করবেন?

–বাঃ, ঢাকায় কত চেনাশুনো মানুষ, তোমার আব্বা-আম্মা, এদের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করে না তোমার? তোমার মামুন মামাও জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন খবর পেয়েছি, তাঁর সঙ্গেও দেখা হবে!

–আমি স্বরূপ নগরেই ভালো ছিলাম।

–কিন্তু কলেজের মায়না না পেলে খাওয়া-পরা চলবে কী করে?

–আপনে কথা দ্যান যে ঢাকায় গিয়ে আবার ঐ সব ঝাটের মধ্যে জড়াবেন না?

–ঝঞ্ঝাট আবার কী? পাকিস্তানে পলিটিক্স শেষ হয়ে গেছে। মাছ কেন মরে জানো? বঁড়শির টোপ দেখে মুখ খোলে বলে। এদেশে এখন মুখ খুললেই মরণ।

নদীতীর এখন নির্জন। কেউ মাছ ধরছে না, কেউ স্নান করছে না। দুপাশে ঝোঁপঝাড়। বিকেলের সূর্য যেন অনেকদিন পর কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে এসে সৌজন্যের হাসি হাসছেন। কাছেই একটা মাছরাঙা পাখি তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠলো।

বাবুল হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নিবিড় কণ্ঠে বললো, মঞ্জু, আমার হাতটা ধরো।

কেউ দেখবার নেই বলেই মঞ্জু নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে স্বামীর ডান হাতের আঙুল ছুঁলো।

বাবুল বললো, এবারে বলল, কথা দাও! বলো, এই কথাটা বলো, কথা দাও।

মঞ্জু বললো, কথা দাও।

বাবুল উফুল্লভাবে বললো, একটা ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখা উচিত ছিল। একটা ঐতিহাসিক দৃশ্য। জানো মঞ্জু, আমার বড় ভাই আলতাফ ভাই হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে, তুমি তো দেখেছো ভাবীকে, সেই ভাবীও আলতাফ ভাইকে আপনি-আপনি করে কথা বলে। সুতরাং, আমাদের ফ্যামিলিতে তুমিই প্রথম!

মঞ্জু বললো, কিন্তু, তোমার গা ছুঁয়ে বলো তুমি সত্যিই কথা দিলে তো?

বাবুল দু'চোখে ঝিলিক দিয়ে বললো, কথা দিতে পারি, যদি তুমি এখন আমাকে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুতে দাও।

মঞ্জু ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই বাবুল তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললো, বসো বসো, যেও না। জানি অতখানি একদিনে সত্য হবে না।

নৌকোর পাটাতনের ওপর এমনিই গা এলিয়ে দিয়ে বাবুল বললো, দ্যাখো দুদিকে কত সবুজের সারি। কত রকম গাছপালা, নামও জানি না। নদীর দু'ধারে মাঝে মাঝে মানুষজন দেখা যাচ্ছে, তাদের দেখে কী মনে হয় তারা খুব অসুখী? মনে হয় না, জীবন চলছে জীবনের নিয়মে। মাশাল ল, প্রেসিডেন্টস রুল হ্যাঁন ত্যান হাবিজাবি। এসব কিছুরই যেন এই নদীর ধারে কোনো মূল্য নাই। এই যে নৌকাটা শান্তভাবে পানির ওপর দিয়ে চলেছে, আমাদের দেশটাও যদি এইভাবে চলতো?

মঞ্জু বললো, তোমরা দেশ নিয়ে এত চিন্তা করো, সব কথার মধ্যে দেশের কথা টেনে আনো কেন?

বাবুল বেশ তারিফ করা চোখে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললো, এটা তুমি খুব দামি কথা বলেছো মঞ্জু। যে-সব দেশ বেশ সলিড, একটা পাকাঁপোক্ত গভর্নিং সিস্টেম আছে, সে সব দেশে লোকেরা দেশ নিয়ে সব সময় এত মাথা ঘামায় না। আমরা উরোপ-আমেরিকার যেসব গল্প-উপন্যাস পড়ি তার মধ্যে থাকে শুধু মানুষের কথা। দেশ কোথায়? এমন কি ইন্ডিয়া থেকে, পশ্চিম বাঙলা থেকে যে সব বইপত্র আসে, মাঝে মাঝে তো পড়ে দেখি, প্রেম-ভালোবাসার গল্পই বেশী দেখি, দেশ নিয়ে তো মাথা ব্যথা চোখে পড়ে না। শুধু আমরাই কেন সব সময়ে দেশের কথা টেনে আনি?

–আপনেরা এই নিয়ে তর্ক করতে ভালোবাসেন।

–আপনি নয়, তুমি! ঠিক বলেছো, আমরা এই নিয়ে তর্ক করতে ভালোবাসি। কাজের কাজ কিছুই করি না। আসলে, ব্যাপার কী জানো, আমাদের দেশটা তো নতুন। হঠাৎ লটারির টাকা পাওয়ার মতন আমরা পাকিস্তান পেয়ে গেছি। তাই সর্বক্ষণ সেই কথাটা আমাদের মনে জুড়ে আছে। জানো তো, কোনো পরিবারে হঠাৎ লটারির টাকা এসে গেলে ভাইয়ে ভাইয়ে কাজিয়া লেগে যায়, আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা।

মঞ্জু বায়নোকুলারটা তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে বললো, কই, আপনি আমাকে শুশুক দেখালেন না?

–তুমি আবার আপনি বলছো বলে সব শুশুক ডুব মেরে আছে। বিলকিস বেগম, তোমারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি? তোমার মুখে হাসি নাই কেন?

–এমনি এমনি হাসবো নাকি? বাবুল এবারে সুর করে গেয়ে উঠলো :

বিরহিনী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল
কজেতে ফুটেছে কাঁটা পঞ্চবানের হুল!...

মঞ্জু ভালো গান জানে, আর বাবুলের গলায় একেবারেই সুর নেই। বাবুলের গান গাওয়ার চেষ্টা দেখে সে না হেসে পারলো না। বাবুলের মুখে সে আগে কখনো গান শোনেনি।

–এ আবার কী গানের ছিরি। এই গান আপনে...তুমি কোথায় শিখলে?

–আমাদের বাড়িতে আবদুল নামে একজন চাকর ছিল, অনেক দিন আগে। সে আমাদের অনেক গান শুনাতো। আরও কয়েকটা লাইন মনে আছে, শুনবে?

সায়েরে গিয়েছে স্বামী হাবুলি আঁধার করে
পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।
ও মানিকপির...
মুখ ঘামেছে বুক ঘামেছে বিবির ভেসে যাচ্ছে হিয়ে
খসম্ যদি থাকতো কাছে রে পুঁচত নুমাল দিয়ে।

হাসির তরঙ্গে মঞ্জুর সারা শরীর দুলতে লাগলো। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও সে হাসি থামাতে পারে না। হাত তুলে সে বাবুলকে চুপ করতে ইঙ্গিত জানালো, ও দিকের মাঝি শুনতে পেলে কী ভাববে?

নিজের বেসুরো সঙ্গীত থামিয়ে বাবুল বললো, এইবারে তুমি একটা গান করো!

মঞ্জু প্রবলভাবে মাথা নাড়লো। বিকেলবেলা নৌকোর ওপর বসে বে-শরমের মতন গান গাইবার কথা সে চিন্তাই করতে পারে না। পাশ দিয়ে আবার যখন তখন যাত্রী-বোঝাই নৌকো যাচ্ছে। নদীর একদিকের তীরে দেখা যাচ্ছে মানুষজন। একটা অশথ গাছ তলায় উবু হয়ে গোল হয়ে বসে আছে কিছু মানুষ। নদীতে কলসী ভাসিয়ে সাঁতার কাটছে দুটি বালিকা। দূর থেকে ভেসে আসছে মগরেবের আজানের সুমিষ্ট ধ্বনি, পাখিরা ঝাঁক বেঁধে বেঁধে কুলায় ফিরছে।

বাবুল হেলান দেওয়া অবস্থায় থেকে মঞ্জুর উরুতে হাত রেখে মিনতি করে বললো, বড় ভালো লাগছে, শুনাও একটা গান।

মঞ্জু তার স্বামীর হাতের ওপর হাত রেখে বললো, যাঃ! কী যে বলেন। এখন আমি গান গাইতে পারবো না। আমার লজ্জা করে।

বাবুল বললো, তুমি আমার দিকে ফিরে বসো। যদি চাও তো মাথায় ঘোমটা টেনে দাও, তারপর খুব ছোট গলায়, গুনগুন করে একটা গান ধরো। শুধু আমি শুনবো আর নদী শুনবে।

মঞ্জু বড় বড় চোখ মেলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো স্বামীর দিকে। তারপর বললো, গান গাইতে পারি, তুমি সত্যি কথা দাও, ঢাকায় গিয়ে তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে মেতে উঠবে না?

মিটিং করতে গিয়ে মাথা ফাটাবে না?

বাবুল বললো, না, আমি আর কোথাও যাব না। তোমাকে নিয়ে আর খোকাকে নিয়েই। মেতে থাকবো। তুমিই এখন আমার পৃথিবী। আঃ, দ্যাখো, আকাশের রং কী সুন্দর হয়েছে। নদীর দু'ধার কী শান্ত আমেজ মাখা। এখন কি মনে হয় কোথাও কোনো দুঃখ আছে? নদীর ওপর নৌকায় করে যাওয়ার মতন যদি জীবনটা হতো! আঃ, জীবনটা যদি এরকম হতো!

কে নদী থেকে এক আঁজলা জল তুলে সে বললো, দ্যাখো, কী পরিষ্কার পানি। আকাশের ছায়া পড়েছে। সত্যি মঞ্জু, জীবনটা যদি এরকম হতো!

২ শেষ পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা

দ্বারভাঙা বিল্ডিং-এ শেষ পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা। অতীনের হাতের কলম সময়ের চেয়েও দ্রুত দৌড়োচ্ছে। মাথা তুলে সে একবার দেখে নিল, দু'একজন খাতা জমা দেবার জন্য উঠে পড়েছে, এইবার বুঝি ঘণ্টা বাজবে। হলঘরে কোনো ঘড়ি নেই, তবু কোথাও যেন অদৃশ্য টক টক টক টক শব্দ হচ্ছে। অতীনের একটা প্রশ্নের এখনো প্রায় অর্ধেকটা বাকি, মুখ চোখ তার রাগে কঠিন হয়ে এলো, তারপর তার সম্পূর্ণ আত্মা যেন ভর করলো ডান হাতের আঙুলের ডগায়।

ঘণ্টা বাজবার পরও অতীন লিখে যাচ্ছিল, ইনভিজিলেটার এসে তার পাশে দাঁড়াতেই সে খাতাটা মুড়ে তার হাতে তুলে দিল বিনা প্রতিবাদে, মুখ তুললো না। ইনভিজিলেটার চলে যাবার পরেও সে কয়েক মুহূর্ত বসে রইলো স্থির হয়ে, তারপর বিচারক যেমন কারুকে ফাঁসিরদণ্ড দেবার পর তাঁর কলমের নিবটা ভোঁতা করে দেন, অতীনও তার কলমটা মুঠোয় চেপে ধরে ঠিক ছুরির মতন ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল হাই বেঞ্চে।

তার পাশের ছেলেটি চোখ বড় বড় করে বললো, এ কী রে, কলমের ওপর রাগ করছিস কেন? সব লিখতে পারলি না?

অতীন বললো, ধ্যাৎতেরিকা!

এই কলমটা থেকে ঠিক মতন কালি বেরুচ্ছিল না, লিখতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল অতীনের।

হল থেকে বেরিয়ে আসবার পর সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করলো, কী রে, কেমন দিলি?

অতীন ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বললো, ফার্স্ট ক্লাস পাবো ঠিকই, সে আর এমন বেশি কথা কী আছে!

সিদ্ধার্থ হেসে উঠলো। অতীনের কথা বলার ধরনই এই রকম। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া যেন কিছুই না, রাস্তা থেকে একটা খোলাম কুচি কুড়িয়ে নেবার মতন।

ওদের আর দু'জন বন্ধু, কৌশিক আর রবি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন পত্র হাতে নিয়ে পরস্পরের উত্তর মেলাচ্ছিল, অতীনকে দেখে ওদের একজন বললো, এই অতীন শোন্, তুই পাঁচ নম্বরটা...

অতীন বাঁ হাত নেড়ে ধমক দিয়ে বললো, রাখ্, রাখ্, হয়ে গেছে, এখন আবার ও নিয়ে মাথা ঘামানো!

নিজের প্রশ্নপত্রটা সে অপ্রয়োজনীয় দাদের মলমের হ্যাণ্ডবিলের মতন গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। তারপর তরতর করে নেমে গেল নিচে।

রাস্তায় বৃষ্টি পড়ছে ছোট ছোট ফোঁটায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই বৃষ্টি পড়ছে নিশ্চয়ই, কেননা রাস্তার রং এখন কালো, পদাতিকের সংখ্যা বেশ কম। গত তিন ঘণ্টায় অতীন একবারও জানলার বাইরে কী ঘটছে লক্ষ করেনি।

অতীনের চোখ দুটো ঢুকে গেছে কোটরে, নাকটা যেন বেশি খাড়া দেখাচ্ছে, মুখমণ্ডলে রাত্রি জাগরণের অবসাদের ময়লা ছাপ। মাথার চুলে নাপিতের কাঁচি পড়েনি অনেকদিন। তার জামার বুকের বোতাম খোলা, গ্রীষ্মকালে সে গেঞ্জি পরে না, দেখা যাচ্ছে তার পাঁজরার হাড়। সারা বছরের ফাঁকিবাজ অতীন ঠিক পরীক্ষার আগের দেড় মাস পাগলের মতন পড়াশুনো করে স্বাস্থ্য ক্ষয় করেছে।

সিদ্ধার্থ তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুই কি এখন বাড়ি ফিরে যাবি নাকি?

অতীন বললো, নাঃ! চল, খেলা দেখতে যাই, মোহনবাগান-মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেল আছে।

সিদ্ধার্থ বললো, ধ্যাৎ, সে খেলা এতক্ষণে আদ্ধেক হয়ে গেছে। তাছাড়া টিকিট পাবি কী করে! চল, সিনেমা দেখতে যাই, মেট্রোতে লরেন্স অলিভিয়ারের 'হ্যামলেট' এসেছে।

–সোর্ড ফাইটিং আছে?

–কী জানি, গল্পটা আমি জানি না, আমার দাদা বলেছে খুব ভালো ছবি।

–তোর দাদা বলেছে, ভালো? তা হলে আমার ভালো লাগবে না। তোর দাদা তো হেভি ইনটেলেকচুয়াল! বড় বড় রাইটারদের গল্প নিয়ে সিনেমা খুব বোরিং হয়। নিউ এমপায়ারে গ্যারি কুপারের কী একটা ওয়েস্টার্ন এসেছে না? চল, সেটা দেখি!

–আমি গ্যারি কুপারের উচ্চারণ বুঝতে পারি না রে, অতীন!

পেছন থেকে কৌশিক এসে অতীনের কাঁধে হাত রেখে বললো, এই, সিনেমা দেখতে যাবি? আমি দেখাবো?

–কোনটায় যাচ্ছিস।

–হ্যামলেট! অনেকদিন পর লরেন্স অলিভিয়ারের ছবিটা আবার এসেছে।

অতীন বললো, হ্যামলেটের দেখছি হেভি ডিমান্ড! তুই গল্পটা জানিস।

কৌশিক বললো, টু বী অর নট টু বী, দ্যাট ইজ দা কোয়েশ্চেন? এটা শুনিসনি কখনো আগে? কিংবা, দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ, হোরেশিও, দ্যান আর ড্রেট অফ ইন ইয়োর ফিলসফি...।

অতীন কৌশিকের থুতনিটা ধরে বললো, মান্তু, মান্তু! তুই আর্টস পড়লি না কেন রে?

ওরা রাস্তা পার হয়ে বিপরীত দিকে এলো এবং চলন্ত ট্রামের পাশ দিয়ে ছুটতে লাগলো, সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করলো, কোন ক্লাসে উঠবো? অতীন বললো, সেকেন্ড ক্লাস!

একটু দূরেই ট্রাম স্টপ, তবু ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লো।

মেট্রো সিনেমার পেছনের দিকের রাস্তাটার ডাক নাম মেট্রো গলি। ফ্রন্ট স্টলের সবচেয়ে কম দামি টিকিটের জন্য এখানে লাইন পড়ে। কিছুকাল আগেও এই টিকিটের দাম ছিল সাড়ে ছ' আনা, তারপর হলো দশ আনা। নয়া পয়সার আমলে দু এক বছরের মধ্যেই বেড়ে গিয়ে হয়েছে এক টাকা কুড়ি পয়সা। আজ এই লাইনে বেশ ভিড়। বৃষ্টির মধ্যেও এত লোক জুটেছে।

অন্যরা লাইনে দাঁড়ালো, অতীন সামনের তেলেভাজার দোকানটা থেকে আট আনার আলুর বড়া কিনলো! তার দারুণ খিদে পেয়েছে। কৌশিক টিকিট কাটার পয়সা দেবে, সুতরাং অতীনের আট আনা খরচ করতে কোনো অসুবিধে নেই। এরকম সুস্বাদু আলুর বড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। এত ছোট ছোট আলু এরা কোথা থেকে জোগাড় করে?

শাল পাতার ঠোঙাটা নিয়ে অতীন ফিরে এলো বন্ধুদের কাছে। কাউন্টার খুলে গেছে, ময়াল সাপের মতন লাইনটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে!

রবি বললো, এই মাইরি, যত টিকিট তার চেয়ে তোক বেশি। আমরা টিকিট পাবো না!

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করলো, তুই কী করে বুঝলি?

রবি বললো, আমি জানি, এই রেলিংটার পেছনে দাঁড়ালে আর কাউন্টার পর্যন্ত পৌঁছোনো যায় না। ঐ দ্যাখ, মনীশ, সুজয় ওরা আগে থেকে দাঁড়িয়েছে।

ওদের ব্যাচের অনেক ছেলেই এসেছে হ্যামলেট দেখতে। কয়েকজন অতীনের মুখ চেনা। সে হাত নেড়ে দু'একজনকে সম্বোধনও জানিয়েছে।

কৌশিক বললো, আমি দেখাবো বলেছি, চল, মেইন গেটে যাই, বেশি দামের টিকিট কাটবো!

অতীন কৌশিকের দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর একটা মুখভঙ্গি করলো। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বললো, বাঞ্চোৎ, তোর বেশি বেশি পয়সা, তাই না? ইয়ে ফুট ফুট কুট কুট করছে? দ্যাখ, কী করে এখানে টিকিট ম্যানেজ করি!

অতীন প্যান্টের পকেট থেকে একটা নীল রুমাল বার করে গলায় বাঁধলো। অমনি তাকে দেখতে লাগলো বেলেঘাটার গুণ্ডাদের মতন। সে বললো, আমাদের আজ পরীক্ষা শেষ হয়েছে, আজ আমাদের সিনেমা দেখার ফাস্ট প্রেফারেন্স। এত ফালতু লোক ভিড় করেছে কেন?

অতীন সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই রবি বললো, ও শালা ঠিক ম্যানেজ করবে।

সিদ্ধার্থ বললো, অতীনটা একটা চিজ। শালা ভগবান একটার বেশি দুটো গড়েনি!

কৌশিক ভীতু ভীতু গলায় বললো, ও মারামারি করবে নাকি?

রবি বললো, দ্যাখ না কী হয়!

অতীন লাইনের একেবারে ডগায় পৌঁছে চেঁচিয়ে উঠলো, এ কী, এ কী, ডাবল লাইন কেন? এই যে দাদা, আপনি কোথায় ঢুকছেন? এ কী নেমন্তন্ন বাড়ি নাকি যে পরে এসেও আগে বসবে? আমরা কী ঘাসে মুখ দেবার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি? সিঙ্গল লাইন, সিঙ্গল লাইন!

অতীনের রোগা চেহারা হলেও কণ্ঠস্বরটি জোরালো, আত্মপ্রত্যয়ে সুগোল। সে তার চেয়ে বড়সড়ো চেহারার দু'চারটি ছেলেকে জোর করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

একটু পরেই দেখা গেল কাউন্টারের সামনে শুরু হয়ে গেছে ঠ্যালাঠেলি, চিৎকার, হট্টগোল। তারপর চড়-চাপাটি, ঘুষোঘুষি, জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি। অতীন কিন্তু সেই মারামারির মধ্যে নেই। সে পিছিয়ে বন্ধুদের কাছে এসে বললো, এবারে রা কর! সবাই মিলে

একসঙ্গে হৈ হৈ করে সামনের দিকে এগো, ওদের হটিয়ে দে! সবাই এক সঙ্গে, ওয়ান, টু থ্রি...।

অতীনের পদ্ধতিটা কার্যকর হলো, ওরা চার বন্ধুই টিকিট পেয়ে জালের খাঁচায় ঢুকল।

অতীন কৌশিককে বললো, দেখলি, তোর কত পয়সা বাঁচিয়ে দিলুম!

কৌশিক বললো, আমার বেশি পয়সা খচা করতে আপত্তি ছিল না। এটা ভালো ছবি, ভালোভাবে দেখা যেত!

অতীন বললো, তোর সেই পয়সায় আমাদের আইসক্রিম খাওয়াবি!

সিদ্ধার্থ বললো, আইসক্রিম না, ইন্টারভ্যালে ম্যাটন প্যাটিজ খাবো। তুই আলুর বড়া খাইয়ে খিদেটা আরও বাড়িয়ে দিলিরে, অতীন!

রবি বললো, মাটন প্যাটিজ কী বলছিস, যা খিদে পেয়েছে, মনে হচ্ছে আমি এখন একটা আস্তো দোতলা বাড়ি খেয়ে ফেলতে পারি।

অতীন বলো, সিনেমাটা যদি খারাপ হয় তা হলে আমি কৌশিককেই খেয়ে ফেলবো!

কৌশিক চোখ বড় বড় করে বললো, তুই কী বলছিস, অতীন? শেক্সপীয়ারের বেস্ট লেখা, হ্যামলেট; অ্যাকটিং করছেন লরেন্স অলিভিয়ার, জিন সিম...।

অতীন অসীম বিরক্তির সঙ্গে বললো, সেক্সপীয়ার মারাচ্ছিস কেন রে তখন থেকে? জিজ্ঞেস করছি না, সিনেমাটা কেমন?

সিদ্ধার্থ বললো, আমি পোস্টার দেখলুম, সোর্ড ফাইটিং আছে!

কৌশিক তার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে এমন একটা ভাব করলো যেন সে হঠাৎ অচেনা কোনো দেশে ঘোর অরণ্যের মধ্যে একলা এসে পড়েছে। তার মুখে অল্প অল্প দাড়ি,

চোখে সোনালি ফ্রেমের গোল চশমা। অন্যরা প্যান্ট পরা, সে পরেছে ধুতি আর হাফ শার্ট। অন্যদের তুলনায় তার মুখে এখনও সারল্য বেশি, সে পৃথিবীটা কম চেনে, যেটুকু চেনে তাও বইয়ের পৃষ্ঠায়।

ফ্রন্ট স্টলে সীট নাম্বার নেই, কিছুক্ষণ সবাইকে খাঁচায় আটকে রাখার পর ছবি আরম্ভ হবার একটু আগে দরজা খুলে দেয়, সবাই হুড়মুড়িয়ে ছুটে ভালো জায়গা দখল করতে যায়। ফ্রন্ট স্টলে মেয়েদের তো টিকিট দেওয়াই হয় না, বুড়ো লোকরাও আসতে ভয় পায়।

কয়েকটি আগামী ছবির ট্রেইলার দেখাবার পর মূল ছবি শুরু হলো। রবি বললো, এই রে ভূতের গল্প নাকি? সিদ্ধার্থ বললো, হিস্টরিক্যাল, কস্টিউম দেখছিস না?

কৌশিক বললো, তুই কী রে, সিদ্ধার্থ? শেকীয়ার চারশো বছর আগে যা লিখেছেন তা সবই তো হিস্টোরিক্যাল হবে!

তৃতীয় দৃশ্যে ওফেলিয়াকে দেখা যেতেই অতীন তার জিভের তলায় দু' আঙুল দিয়ে হু-ই-ই শব্দে প্রচণ্ড জোরে একটা সিটি দিল। যে-কোনো ইংরিজি ছবিতে সুন্দরী নায়িকার আবির্ভাব সে এইভাবে অভ্যর্থনা জানায়। তার ধ্বনি শুনে কাছাকাছি আরও কয়েকজন সিটি দিয়ে উঠলো।

কৌশিক কাতরভাবে অতীনের একটা হাত চেপে ধরে বললো, ওরকম করিস না, প্লীজ। মন দিয়ে ডায়ালগগুলো শোন, তোর ভালো লাগবে!

অতীন বললো, ধুস! ডায়ালগ কে শোনে। আই লাভ অ্যাকশান! ডুয়েল...

-একটু ধৈর্য ধর, অনেক অ্যাকশান আছে।

খানিক বাদে বিরতির আলো জ্বলে উঠতেই রবি উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালো। এই সময়ে উঁচু ক্লাসের দর্শকদের মধ্য থেকে ভালো ভালো মেয়েদের দেখে নিতে হয়। চোখ বুলিয়ে নিয়ে রবি বললো, চল, সিগারেট খেয়ে আসি।

সে কৌশিকের হাত ধরে টানতেই কৌশিক বললো, আমি সিগারেট খাই না।

–আজকে একটা খাবি চল।

–না, আমি সিগারেট খাবো না। তুই যা না!

সে কৌশিকের হাত ধরে টানাটানি করতে অতীন বাধা দিয়ে বললো, এই ওকে জোর করিস না। এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে!

অতীন নিজেও সিগারেট খেতে গেল না দেখে কৌশিক অবাক হলো। তার ধারণা সব ব্যাপারেই অতীন তার সব বন্ধুদের গুরু।

অতীন ঘেঁকে বললো, এই রবি, বাদাম কিনে আনিস! তারপর সে কৌশিকের দিকে ফিরে চোখ পাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, হ্যাঁরে হ্যাঁরে, তুই নাকি কাল, সাদাকে বলেছিলি লাল?

কৌশিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো, অ্যাঁ? কী? আমি কী বলেছি?

অতীন একই ভঙ্গিতে আবার বললো, আর, তোদের পাড়ার বেড়ালগুলো, শুনছি নাকি বেজায় হুলো?

পাশ থেকে সিদ্ধার্থ হেসে উঠলো হো হো করে। কৌশিকের মুখখানা ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে।

অতীন কৌশিকের জুলপি ধরে টেনে বললো, শালা, তুই তখন থেকে আমাদের ইংরিজির জ্ঞান দিচ্ছিস, বাংলা কিছু জানিস না?আকৌশিক বললো, ছাড়, লাগছে! আমরা তো জামসেদপুরে থাকতুম, তাই বেশি বাংলা বই পড়িনি!

–তোদের জামসেদপুরে বুঝি শেক্সপীয়ারের চাষ হয়? ওটা শিখলি কী করে?

–তোর মেজাজটা আজ এত খারাপ কেন রে, অতীন? পরীক্ষা খারাপ হয়েছে?

–আমি কোনোদিন পরীক্ষা খারাপ দিই না।

–তোদের হ্যামলেটের গল্পটা সংক্ষেপে বলে দেবো, তা হলে বুঝতে সুবিধে হবে। অতীন বিচিত্রভাবে হাসলো। তারপর আবৃত্তি করলো, 'সো টেল হিম উইথ দা অকারেন্টস, মোর অ্যান্ড লেস, হুইচ হ্যাভ সলিসিটেড।'

বুকে দুটো হাত রেখে নাটকীয় ভঙ্গিতে এরপর 'দা রেস্ট ইজ সাইলেন্স' উচ্চারণ করেই সে মৃত্যুর ভান করে ঢলে পড়লো।

কৌশিক স্তম্ভিতভাবে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। সে এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

–তুই জানিস? তুই পড়েছিস?

অতীন উদাসীনভাবে বললো, না, পড়িনি, শুনে শুনে শিখেছি। আমার দাদা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তো! শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি করে সবাই মরে যাবে, আমার এরকম গপ্পো ভালো লাগে না। সিদ্ধার্থ বললো, তুই শালা জেনেশুনে এতক্ষণ মাজাকি করছিলি আমাদের সঙ্গে?

অতীন তাকে এক ধমক দিয়ে বললো, চুপ বে! তারপর সে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো, তুই একটা জিনিস নিবি?

–কী?

–হাতটা দে। কৌশিকের ডান হাতের পাঞ্জাটা নিয়ে বাচ্চাদের কান্না থামাবার জন্য মা-ঠাকুমারা যেমন দুধ দেবো, ভাত দেবো, নাড়ু দেবো বলেন, সেইভাবে কাল্পনিক কিছু দিল তিনবার। তারপর বললো, নে, এবারে হাত মুঠো কর। তোকে দিয়ে দিলাম।

–কী দিচ্ছিস কী, অতীন?

–আমার থেকে ভালো রেজাল্ট। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আমি হবো না, তুই হতে পারিস, যদি দীপংকর তোকে বীট না করে। তুই আমার থেকে পাঁচ-ছ নম্বর বেশি পেয়ে যাবি।

–অতীন, তুই জানিস, তোর সঙ্গে আমার কোনো কমপিটিশান নেই! আমি বলছি, আমার থেকে তুই ভালো রেজাল্ট করবি।

–বলছি তো, তুই আমার থেকে পাঁচ-ছ নম্বর বেশি পাবি। আমি লাস্ট কোয়েশ্চেনটা শেষ করতে পারিনি। কেন জানিস, আমার কলমটার জন্য। মাঝে মাঝে কালি বেরুচ্ছিল না, লিখতে দেরি হয়ে গেল!

কৌশিক ভুরু কপালে তুলে বললো, কলমের জন্য? আমার কাছে তিন তিনটে কলম, তুই। চাইলি না কেন?

সিদ্ধার্থ বললো, আমার কাছেও স্পেয়ারেবল কলম ছিল!

অতীন চুপ করে গিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

–তুই কলম চাইলি না কেন, অতীন?

–কলমটা আমাকে একটা মেয়ে দিয়েছে। সে রিকোয়েস্ট করেছিল যেন তার কলমেই আমি পরীক্ষা দিই!

–তুই এত সেন্টিমেন্টাল? একটা মেয়ে তোকে একটা বাজে কলম দিয়েছে বলে তুই পরীক্ষা খারাপ করবি?

–আসলে ঠিক তা নয়। তোদের কাছ থেকে কলম চাইবার কথা আমার মনেই পড়ে নি! এমন রাগ হচ্ছিল মেয়েটার ওপর!

সিদ্ধার্থ বললো, অতীনটা মাইরি একেবারে পিকিউলিয়ার! মেয়েটা কে রে? আমি দেখেছি?

সঙ্গে সঙ্গে মুড় পাল্টে অতীন বললো, হ্যাঁ, দেখবি না কেন? তোর নিজের মাসি রে, ঐ শম্পা–

সিদ্ধার্থ বললো, ভ্যাট, গুল মারবার আর জায়গা পাসনি? আমার মাসি তোর থেকে পাঁচ বছরের বড়।

অতীন আপন মনে হাসতে লাগলো।

রবি ফিরে এলো দু ঠোঙা বাদাম ভাজা নিয়ে। ফিস ফিস করে বললো, বাইরে গোলমাল হচ্ছে। কটা ছেলে এসে বলছে, তাদের জোর করে লাইন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তার দেখে নেবে! অতীন, তোকে ওরা চিনে রাখেনি তো?

অতীন অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, চিনে রাখলেও বয়ে গেল। আমার গায়ে হাত দেবার সাহস করবে, এমন কোন শুয়ারের বাচ্চা আছে, দেখবো!

সিদ্ধার্থ বললো, আমাদের কেমিস্ট্রির অনেক ছেলে আছে এখানে। দরকার হলে সবাইকে ডাকবো।

এরপর সিনেমা শুরু হতে সবাই চুপ হয়ে গেল।

শেষ দৃশ্যে লিয়ারটিস ও হ্যামলেটের দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় রবি হঠাৎ উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, কে হারবে?

কৌশিক বললো, দু'জনেই।

অতীন আবার বললো, দা রেস্ট ইজ সাইলেন্স!

হল ছেড়ে বেরুবার মুখে সিদ্ধার্থ বললো, ভালো ছবি, তবে আজকের দিনে এরকম একটা দুঃখের ছবি কোনো মানে হয় না। কৌশিকটার জন্যই তো। এর চেয়ে নিউ এম্পায়ারের ছবিটা...

কৌশিকের চোখ ছলছল করছে এখনো। মধ্যে কয়েকবার সে রুমাল ব্যবহার করেছে। সে বললো, ট্রাজেডি হলেও মহৎ ট্রাজেডি দেখলে আপনি মনটা ভালো হয়ে যায়।

রবি বললো, তুই ফ্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাঁদছিলিস শেষ দিকটায়!

–কান্নাতে তো মনটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়। আমার ভালো লাগে।

অতীন চুপ করে হাঁটছিল, এক সময় সে কৌশিকের কাঁধে হাত রেখে বললো, তুই যে বললি, দু'জনেই হেরে গেছে, তুই ভুল বলেছিস। আসলে জিতেছে হ্যামলেট। কেউ কেউ মরে গিয়েও জিতে যায়।

যারা টিকিট পায়নি, সেই বিক্ষুব্ধ ছেলেরা কেউ নেই বাইরে, আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকে না তাদের।

রবি বললো, এখন কী করবি, বাড়ি যাবি? মোটে সাড়ে আটটা বাজে।

সিদ্ধার্থ বললো, মোটে কী রে? আর বেশি দেরি হলে বকুনি খাবো।

রবি বললো, বড্ড খিদে পেয়েছে কৌশিক, তোর তো অনেক পয়সা বেঁচে গেল, অনাদির মোগলাই পরোটা খাওয়াবি?

কৌশিক মাথা নাড়লো। কিন্তু সিদ্ধার্থ আর থাকতে পারবে না। সে দৌড়ে উঠে পড়লো একটা দোতলা বাসে।

বৃষ্টি এখনো থামেনি, ছিপ ছিপ শব্দ হচ্ছে রাস্তায়। প্রায় বর্ষা এসে গেল। কিন্তু চৌরঙ্গি জনবিরল নয়। অনেকে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। রাত্তিরের দিকে এ পাড়ায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারী-পুরুষ অনেক চোখে পড়ে। দু'একটি সুন্দরী রমণী সম্পর্কে মন্তব্য করতে করতে ওরা এসে ঢুকলো রেস্তোরাঁয়।

খাবারের অর্ডার দেবার পর রবি জিজ্ঞেস করলো, কাল কী করা হবে?

কৌশিক বললো, তোরা আমাদের বাড়িতে চলে আয়।

কৌশিকদের বাড়িটা বড়, তার আলাদা ঘর, সঙ্গে মস্ত বারান্দা। কৌশিকদের বাড়িতেই আড্ডা মারার সুবিধে।।

রবি বললো, পরীক্ষার পর কত কী করবো ভেবেছিলাম, এখন একটাও মনে পড়ছে না।

কৌশিক বললো, কোথাও বাইরে বেড়াতে গেলে হয়, মধুপুরে আমাদের একটা বাড়ি আছে, যাবি?

রবি বললো, গেলে হয়! এই অতীন, তুই চুপ করে আছিস কেন? চল, মধুপুরে যাই।

অতীন বললো, আমি এখন বলতে পারছি না। আমার টিউশানি আছে না?

কৌশিক বললো, পরীক্ষা খারাপ হয়েছে বলে তোর এখনো মন খারাপ লাগছে?

অতীন ঝাঁঝিয়ে উঠে বললো, কে বললো, পরীক্ষা খারাপ হয়েছে? ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া নিয়ে কথা, কেউ আটকাতে পারবে না। পরীক্ষা চুকে গেছে, খবদার আমার সামনে আর ও কথা উচ্চারণ করবি না!

রবি বললো, বাপ রে! বাবুর মেজাজ বোঝা শক্ত! তুই এম এস সি পড়বি না অন্য লাইনে যাবি?

-কিছু ঠিক নেই!

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বেরুবার পর অতীনের ইচ্ছে ছিল আরও খানিকটা ঘুরে বেড়ানোর। কিন্তু এবারে কৌশিক আর রবিও রাজি নয়। পরীক্ষা হয়ে গেলেও দশটার পর বাড়ি ফেরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া বৃষ্টি পড়ছে, এর মধ্যে কোথাই বা ঘোরা যাবে।

একই বাসে চেপে অতীনই আগে নামলো কালীঘাটে। এখন বৃষ্টি বেশ জোরে জোরে পড়ছে তবু সে হাঁটতে লাগলো আস্তে আস্তে। তার মুখখানা বিষণ্ণ। আজ পরীক্ষা দিতে দিতে সর্বক্ষণ মনে পড়ছিল তার দাদার কথা। দাদা বি এস-সি পরীক্ষা দিতে পারেনি।

বেছে বেছে এমন একটা সিনেমায় যাওয়া হলো, সেখানেও নতুন করে দাদার কথাই মনে পড়তে লাগলো। হ্যামলেটের চরিত্রের সঙ্গে তার দাদার যেন দারুণ মিল। এমনকি লরেন্স অলিভিয়ের-এর মুখোনিও যেন ঠিক তার দাদার মতন।

দূর থেকে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, তবু অতীনের বাড়ি ফিরতে হচ্ছে করছে না। প্রায় দিনই এরকম হয়। সপ্তাহে তিন দিন সে টিউশানি সেরে বাড়ি ফেরে রাত ন'টার পর। কাছাকাছি এসে তার আর পা চলতে চায় না। বাড়িতে ঢুকলেই তার কাঁধে যেন একটা বোঝা চেপে বসে।

সিনেমা হল থেকে বেরুবার সময় সে কৌশিককে যা বলেছিল, সেটাই অতীন এখন মনে মনে আবার বললো, কেউ কেউ মরে গেলেও জিতে যায়।

তার সঙ্গে সে এখন যোগ করলো, যেমন আমার দাদা!

৩ দুপুরবেলা প্রবল ঝড় হয়ে গেছে

দুপুরবেলা প্রবল ঝড় হয়ে গেছে, তারপর বাতাসের বেগ কমলে শুরু হয়েছে বৃষ্টি অশ্রান্ত, একটানা। আস্তে আস্তে জল জমছে রাস্তায়। অলি জানলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে অনেকক্ষণ ধরে। খুব জোর ছাঁট, ভেতরে জল আসছে। ভিজে যাচ্ছে অলির শাড়ি, তবু তার ভূক্ষেপ নেই। বৃষ্টির সময় ঘরের সব জানলা বন্ধ করে রাখতে তার ভালো লাগে না। এমনকি কাঁচের পাল্লার মধ্য দিয়েও বাইরের বৃষ্টি দেখলে সাধ মেটে না। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ, গায়ে তার স্পর্শ পাওয়া চাই।

অলির ঠোঁট নড়ছে না, গুনগুন স্বরও শোনা যাচ্ছে না। শুধু তার মাথাটা দুলছে। অর্থাৎ তার শরীরের মধ্যে ঘুরছে একটা গান। গত দু' বছরে হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠেছে সে। আগে শাড়ি পরতেই চাইতো না। এখন মায়ের বকুনিতে শাড়ি পরতেই হয়। আজ বিকেলে সে চুল বাঁধেনি, তার নীলরঙের শাড়ির আঁচলটা কাঁধের কাছে মাঝে মাঝে উড়ছে, যেন সেটা জীবন্ত।

রাস্তায় মানুষজন খুবই কম, যারা বাধ্য হয়ে বেরিয়েছে, তারা ছাতা চেপে ধরে গোড়ালি-ডোবা জলে পা ফেলছে শালিকের মতন। মোড়ের মাথায় একটা ষাঁড় অনেকক্ষণ থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ভিজছে। সাইকেল চেপে গায়ে বর্ষাতি জড়ানো একজন মানুষ মোড় দিয়ে বেঁকে আসতে লাগলো এই বাড়ির দিকে অলির মাথার দুলুনি বন্ধ হয়ে গেল। মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু অলি চিনতে পেরেছে।

সাইকেলটা তাদের গেটের সামনে থামতেই অলি সরে এলো জানলার কাছ থেকে।

অলি বুলির গানের মাস্টারমশাই গগন ঘোষ ঝড়বৃষ্টি-ভূমিকম্প হলেও একদিনও কামাই করেন না। গেটের ভেতরে ঢুকে সাইকেলে তালা লাগিয়ে তিনি বর্ষাতিটা গা থেকে খুলে ভাঁজ করলেন। তারপর উঠে এলেন দোতলায়। লাইব্রেরি ঘরের পাশের ঘরটি এখন মেয়েদের পড়বার ঘর। সিঁড়িতে বিমানবিহারীর নিজস্ব ভৃত্য জগদীশ তাঁকে দেখতে পেয়ে সে-ঘরের দরজা খুলে দিল। তিনতলার দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে বললো, অ দিদিমুনি, তোমাদের ম্যাস্টারবাবু এয়েচেন।

লাইব্রেরি ঘরে বিমানবিহারী একটি আইনের বই-এর পাণ্ডুলিপি সংশোধন করছিলেন জগদীশের গলা শুনে তিনি ভুরু কোঁচকালেন। কতবার তিনি জগদীশকে বলেছেন, এভাবে চ্যাঁচামেচি না করে ওপরে গিয়ে খবর দিতে, তা ও কিছুতে মনে রাখবে না। জগদীশ আর একবার গলা ছাড়তেই তিনি ধমক দিলেন, অ্যাই জগদীশ!

অলির ঘরের দরজা বন্ধ। সে ঠোঁট কামড়ে ধরে মনের জোর আনতে চাইছে। বাইরে থেকে জগদীশ ডাকতেই সে বলে উঠলো, আজ আমি শিখবো না। আমার শরীর ভালো নেই, তুই মাস্টারমশাইকে বলে দে!

বলে ফেলেই সে অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করলো। একবার যখন বলা হয়ে গেছে, তখন এটাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে। কয়েক সপ্তাহ ধরেই সে একথা ভাবছিল, বাবার ভয়ে বলতে পারেনি।

জগদীশ তবু দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললো, নেকাপড়ার মাস্টার নয় গো, গানের ম্যাস্টার এয়েচে।

-হ্যাঁ বুঝেছি। তুই গিয়ে বল, আজ আমি যাবো না।

-তা হলে ছোটদিদিমুনি?

–মায়ের ঘরে গিয়ে দ্যাখ! জগদীশ চলে গেলেও অলি জানে, এবার তার মা আসবেন। আজ অলির মন ভালো নেই! কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। এমনকি মায়ের সঙ্গেও না।

দরজার খিলটা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

এই ঘরটা তার নিজস্ব। এই ঘরটা তার বড় প্রিয়। কিছুদিন আগেও তার ছোট বোন বুলি এই ঘরে তার সঙ্গে শুতো, এখন বুলিরও আলাদা ঘর হয়েছে। পড়ার টেবিলটা ঘরের এক কোণে। আগে বারান্দার দিকে জানলার পাশে ছিল। কিন্তু তাতে যখন তখন হাওয়ায় বই- পত্র উড়ে যায়। এঘরে জামাকাপড় রাখা হয় না। সেসব মায়ের ঘরে। এ-ঘরে একটা আলনাও নেই। সব কটা দেওয়ালে অনেক রকম ছবি, সবই প্রাকৃতিক দৃশ্য। বিলতি ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে কেটে নিয়ে সেলো টেপ দিয়ে আঁটা। নতুন একটা ভালো ছবি পেলেই অলি পুরোনো ছবি বদলে দেয়।

একটু পরেই বুলি এসে বললো, এই দিদি, গানের স্যার এসেছেন, তুই যাবি না?

বুলি এখনো লম্বা হবার বয়েসটায় পৌঁছোয়নি। এখনো তার চেহারাটা ফর্সা, গোলগাল পুতুলের মতন। মাথার চুল কোঁকড়া।

অলি মুখ তুলে বললো, না। আমি গান শিখবো না। আর কোনোদিন গান শিখবো না। বুলি অনেকখানি চোখ মেলে বললো, আর গান শিখবিই না! কেন? এতক্ষণ মনে পড়েনি। এইমাত্র অলির একটি কথা মনে এসে গেল। চমৎকার যুক্তি। এর পর আর বাবা-মাও আপত্তি করতে পারবেন না।

–আমার গান হবে না। আমি সেতার শিখবো।

–এই মাস্টার মশাই কি সেতার জানেন?

–অন্য মাস্টার মশাইয়ের কাছে শিখবো।

বুলি একটু চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। দিদি কি তার চেয়ে বেশি বেশি কিছু পেয়ে যাচ্ছে? গান ভালো না সেতার ভালো? দিদি যখন চাইছে, তখন সেতারই নিশ্চয়ই ভালো। সুতরাং সে ঘোষণা করলো, আমিও সেতার শিখবো!

–তুই তা হলে বাবাকে বল সে কথা।

–এই মাস্টার মশাই-এর কী হবে?

–জগদীশকে দিয়ে চা-বিস্কুট পাঠিয়ে দে!

একটা কিছু নতুনত্ব হবে এই ভেবে বুলি দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অলির আবার ইচ্ছে হলো, উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে। সে এখন শুধু বৃষ্টির শব্দ শুনবে।

কিন্তু মনে মনে সে জানে, এত সহজে গগন ঘোষকে বিদায় করা যাবে না। এরকম দুর্যোগের মধ্যেও তিনি এসেছেন। শুধু এই কারণেই তিনি বিমানবিহারীর কাছ থেকে সহানুভূতি আদায় করে নেবেন।

গানের মাস্টারটিকে অলির পছন্দ হয়নি। কেন যে তার অপছন্দ তার কোনো কারণ সে নিজেকেই বোঝাতে পারে না। কিছুদিন আগে একজন প্রাইভেট টিউটর অলিকে ইংরিজি পড়াতেন, তিনি নস্যি নিতেন। তার আঙুলে সব সময় নস্যি লেগে থাকতো, নস্যির গন্ধ নাকে এলেই অলির গা গুলিয়ে উঠতো। গগন ঘোষ নস্যি নেন না। গগন ঘোষের চেহারাও খারাপ নয়। গরমকালেও তিনি সিল্কের জামা পরেন। গান শেখান, খুব মন দিয়ে, অলি বা বুলি বারবার ভুল করলেও তিনি রাগ করেন না। হারমোনিয়াম বাজান খুব ভালো। বাবার অফিসের কভার ডিজাইনার সুকুমারবাবুর মতন গগন ঘোষ কোনোদিন অলির কাঁধ ধরে স্নেহ দেখাবার ছলে বুকের কাছে টেনে আনার চেষ্টা করেননি। সেরকম কোনো দোষই নেই, তবু অলির কিছুতেই ইচ্ছে করে না এই গানের স্যারের কাছে গান শিখতে।

এর সামনে বসে থাকতেই তার ভালো লাগে না। তবে কি গগন ঘোষের চোখের দৃষ্টিতে কোনো দোষ আছে?

অলির এরকম হয়। এক একজন মানুষকে সে হঠাৎ অপছন্দ করতে শুরু করে। কোনো যুক্তি সে দেখাতে পারবে না। স্রেফ তার শরীরের মধ্যে একটা অস্বস্তি হতে শুরু করে।

বৃষ্টির শব্দ যেন সেতারের ঝালার বাজনা। এখন চুপ করে শুয়ে শুয়ে যদি সেই শব্দ শোনা যেত!

একটু বাদেই বুলি ফিরে এসে বললো, দিদি, ওঠ, তোকে বাবা ডাকছে নিচে।

বাবাকে মেয়েরা ঠিক ভয় পায় না। বিমানবিহারী সন্তানদের উগ্রভাবে কখনো বকেন না। বাইরের লোকদের কাছে রাসভারি হলেও বিমানবিহারী বাড়িতে পারিবারিক গল্পের সময়, কিংবা খাওয়ার টেবিলে অনেক রকম ঠাট্টা ইয়ার্কি করেন। বাবার কাছে মেয়েরা সরাসরি আব্দার জানাতেও পারে।

কিন্তু বাবা ডেকে পাঠালে না-যাওয়া চলে না। অলির' যে এখন কিছুতেই যেতে ইচ্ছে করছে না? এখন দোতলায় নামতে ইচ্ছে করছে না। গগন ঘোষের সামনে যেতে ইচ্ছে করছে না? কেন সে গানের বদলে সেতার শিখতে চায় সে কথা বাবাকে বোঝাতেও ইচ্ছে করছে না।

তার এই অনিচ্ছেগুলোর কেউ মূল্য দেবে না? এখন অলি নিচে গিয়ে ঐ সব কাজগুলো করলে সারা সন্ধে তার মন খারাপ থাকবে।

অলি উঠে দাঁড়িয়ে শাড়িটা গুছিয়ে নিল গায়ে। চুলে চিরুনি বুলিয়ে নিয়ে বললো, চল্। যেন সে একটা খুব নোংরা জল ভরা পুকুরে নামতে যাচ্ছে এইভাবে অলি নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে।

বাবা কী বলবেন তা অলি আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারছে। বাবা বলবেন, আজ যখন মাস্টারমশাই এসে পড়েছেন, আজ তোরা গান শেখ, এর পরে আমি ওঁর সঙ্গে সেতার বিষয়ে আলোচনা করবো।

পাশের ঘরে গগন ঘোষ হারমোনিয়াম খুলে প্যাঁ পো শুরু করে দিয়েছেন। অলি প্রথমে গেল লাইব্রেরি ঘরে। বাবার কাছে।

বিমানবিহারী মুখ তুলে অলিকে দেখলেন, এক লহমায় তিনি বুঝে গেলেন মেয়ের আজ মেজাজটি ঠিক নেই। তিনি হাল্কা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই নাকি গানের বদলে সেতার শিখবি বলেছিস?

অলি দৃঢ়ভাবে বললো, হ্যাঁ। গান আমার হবে না।

–বেশ তো। সেতারই শুরু কর তা হলে। শোন, তুই এখন কোনো কাজ করছিস?

–না।

–তুই আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি? এই ম্যানসক্রিপটা বসে বসে পড়। অনেক বানান ভুল আছে। দ্যাখ সেগুলো ঠিক করতে পারিস কি না! আমার আজ কাজ করতে ভালো লাগছে না। আমি গগনবাবুর কাছে একটা গান তুলে নিই বরং।

অলি প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। বাবা গান শিখবে? বাবাকে সে আগে কখনো গুনগুন করতে শুনেছে বটে, কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের কাছে গিয়ে বাবা গান তুলবে? এই বৃষ্টি বাদলার মধ্যে গগন ঘোষ এসেছেন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া ভালো দেখায় না, শুধু এই জন্য?

বিমানবিহারী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুই আমার জায়গাটায় বোস। আস্তে আস্তে তোকেও তো কাজ শিখতে হবে। যে বানানটা সন্দেহ হবে, ডিকশনারি দেখে নিবি!

সবেমাত্র আই-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। অলি সাতষট্টি পারসেন্ট নম্বর পেয়েছে। ইংরিজিতে সে খুবই ভালো। পাণ্ডুলিপির বানান সংশোধন করার যোগ্যতা সে অর্জন করেছে।

গগন ঘোষের সামনে যাওয়ার চেয়ে এই কাজটা তার ঢের বেশি পছন্দ হলো। কিন্তু বাবা গান শিখতে বসবেন ভেবেই হেসে ফেললো সে।

বিমানবিহারীও মুচকি হেসে বললেন, দ্যাখ না, এরপর তোর মাকে কী রকম চমকে দেবো।

বিমানবিহারী পাশের ঘরে চলে গেলেন, একটু পরে অলি সত্যিই শুনতে পেল গগন ঘোষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাবা গাইছেন, জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ!

অলি পাণ্ডুলিপি পাঠে মন দিল। তার মন-খারাপ ভাবটা যেন একটা কালো বাদুড়ের মতন বুকের মধ্যে ঘাপটি মেরে ছিল। হঠাৎ উড়ে গেল ঝটপটিয়ে।

বিমানবিহারীর টেবিলের ওপর একটা বেল আছে। জগদীশকে ডাকবার জন্য তিনি ঐ বেল বাজান। অলি যখন তার বাবার টেবিলে বসেছে, সে-ও ঐ বেল ব্যবহার করবে।

জগদীশ আসতেই অলি পাণ্ডুলিপি থেকে চোখ না সরিয়ে বললো, আমার জন্য এককাপ কফি নিয়ে আয়!

জগদীশ অবাক হয়ে বললো, কফি? বিকেল হয়েছে, এখন তো দুধ খাবে তুমি!

অলি ধমক দিয়ে বললো, না দুধ খাবো না। তোকে কফি আনতে বলছি না।

তখনই অলি ঠিক করলো, এখন থেকে সে আর কোনোদিনই বিকেলে দুধ খাবে না।

এ ঘরের সব জানলা বন্ধ। চতুর্দিকে বইয়ের আলমারি, তা ছাড়া মেঝেতেও এখানে সেখানে অনেক বই প করা আছে। বৃষ্টির ছাঁট এলে বই নষ্ট হয়ে যাবে। তবু অলির ইচ্ছে

করলো একটা জানলা খুলতে। সে উঠে দাঁড়াতেই দরজার কাছ থেকে প্রশ্ন এলো, এই, কাকাবাবু কোথায়?

অলি ফিরে তাকিয়ে দেখলো, সর্বাঙ্গ জবজবে অবস্থায় ভিজে এসে দাঁড়িয়েছে অতীন। তার মুখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। গেঞ্জির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে একটা খবরের কাগজে মোড়া বড় প্যাকেট বার করলো। কয়েক পরত ভিজে কাগজ ছাড়িয়ে দেখে নিল ভেতরের মোড়কটি শুকই রয়েছে।

শুধু ভিজে পায়ের ছাপ নয়, ঘরের মধ্যে একটা জলরেখা টেনে এগিয়ে এলো অতীন। অলি তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বললো, এই, কী হচ্ছে। সব ভিজে যাবে না? যাও, বাথরুমে যাও। মাথা মুছে এসো।

এই ঘর-সংলগ্ন একটা ছোট বাথরুম আছে। অতীন হাতের প্যাকেটটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল সেখানে।

অলির মুখে পাতলা হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। এরকম বৃষ্টিভেজা মানুষ দেখতে তার ভালো লাগে। যারা ছাতা কিংবা রেইন কোটও ব্যবহার করে না। গত বর্ষায় কৃষ্ণনগরে গিয়ে অলি এই রকম প্রাণ ভরে ভিজেছিল। তাদের কৃষ্ণনগরের বাড়ির পেছনে বাগান রয়েছে একটা। ছোট পুকুরও আছে। সেখানে যা খুশী করা যায়। কলকাতায় এই রকম বৃষ্টির মধ্যে সে রাস্তায় বেরুবার অনুমতি পাবে না। এমনকি ছাদে উঠে যে ভিজবে তারও উপায় নেই। তাদের বাড়ির পাশেই আর একটা উঁচু বাড়ি উঠেছে। সে বাড়ি থেকে তাদের ছাদটা একেবারে নগ্নভাবে দেখা যায়।

অতীন যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানকার জমা জলটুকুর দিকে সে তাকিয়ে রইলো। সে বাইরে যায়নি। বৃষ্টিই যেন সশরীরে চলে এসেছে ঘরের মধ্যে।

বাথরুমে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে অতীন তার জামাটাও খুলে নিঙরে নিল। তারপর জামাটা টাঙিয়ে দিল দরজার ছিটকানিতে। গেঞ্জিটা চলনসই অবস্থায় আছে। প্যান্টটা

খোলবার তো কোনো উপায় নেই। সেই অবস্থায় বেরিয়ে এসে সে বললো, এই অলি, এক কাপ চা খাওয়াতে পারবি? পাশের ঘরে গাঁক গাঁক করে কে চ্যাঁচাচ্ছে রে?

অলি বললো, চুপ, চুপ!

–কেন, কী হয়েছে?

–ওরকম অসভ্যের মতন কথা বলল না। বাবা গান শিখছে।

অতীন অট্টহাস্য করে উঠলো। তারপর মাথার ওপর একটা আঙুল ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাকাবাবু গান শিখছেন? হেড অফিসে গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?

–চুপ করো বলছি না!

টেবিলের ওপর রাখা প্যাকেটটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অতীন বললো, বাবা ঐটা পাঠিয়েছে। কাকাবাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিলো, কতক্ষণ ঐ রকম চ্যাঁচামেচি চলবে?

অলি চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে বললো, কী দরকার আমাকে বলতে পারো। আমি এখন বাবার হয়ে অফিশিয়েট করছি।

অতীন একথা শুনে বিস্ময় বা অবজ্ঞা না দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললো, ঠিক আছে। সাতশো পঞ্চাশ টাকার একটা ভাউচার পেমেন্ট বাকি আছে। সেটা দিয়ে দে!

টাকার কথা শুনে অলি একটু ঘাবড়ে গেলেও হার মানলো না। গলার আওয়াজ এক রকম রেগে বললো, সে টাকা তো তোমাকে দেওয়া যাবে না। প্রতাপকাকার সই লাগবে। তাছাড়া তোমাকে টাকা দিলে তুমি হারিয়ে ফেলবে।

জগদীশ এই সময় কফি নিয়ে ঢুকতেই অলি বলল, ওটা বাবলুদাকে দে। আমার জন্যে আর এক কাপ কফি নিয়ে আয়।

জগদীশ ঝাঁঝালো আপত্তি জানিয়ে বললো, একসঙ্গে বলো না কেন? আবার জল গরম করতে হবে।

অতীন কাপটা তুলে নিয়ে বললো, তোদের বাড়িতে বুঝি শুধু চা কফি দেওয়া হয়? বিস্কুট-ফিস্কুট রাখিস না?

অলি হুকুমের সুরে বললো, জগদীশ, আর এক কাপ কফি নিয়ে আয়, বিস্কুট নিয়ে আয়। বাবলুদা, ওমলেট খাবে?

অতীন চোখ বড় বড় করে বললো, তোদের বাড়ির ওমলেট? জগদীশ তা হলে এখন জগুবাবুর বাজারে গিয়ে হাঁস কিনবে, সেই হাঁস ডিম পাড়বে, তারপর সেই ডিমে ওমলেট ভাজা হবে। এসেই এক কাপ গরম কফি পেয়ে গেছি, এই আমার বাপের ভাগ্যি!

জগদীশ বললো, বাড়িতে ডিম নেই, মামলেট হবেনিকো!

অতীন মাথা হেলিয়ে বললো, দেখলি তো? আজব বাড়ি ভাই তোদের! একদিন এসে দেখি সদর দরজা খোলা, সেখানে কেউ নেই। দোতলায় এসে দেখি কেউ নেই, তিনতলায় উঠে ডাকাডাকি করলুম। তাও কারুর সাড়া শব্দ পাই না। চোরেরা এসে তোদের সব কিছু চুরি করে নিয়ে যায় না কেন?

জগদীশ দাঁত বার করে বললো, গত হপ্তাতেই তো একদিন চুরি হয়ে গেল। একতলার গুদাম থেকে ছাপা ফর্মা...

অলি বললো, বাবাকে বলবো, এবারে কৃষ্ণনগরে গেলে জগদীশটাকে রেখে আসতে। এই গাঁইয়াটাকে দিয়ে কোনো কাজই হয় না! তুই কফি আনবি আমার জন্য। না দাঁড়িয়ে থাকবি?

অতীন ধোঁয়া-ওঠা কফি শেষ করে দিল কয়েক চুমুকে। তার শরীর শির শির করছে। অনেকখানি রাস্তা দৌড়ে এসেছে সে। বাবা তাকে পাঠিয়েছিলেন সকালবেলা। এক বন্ধুর বাড়িতে সে কাটিয়ে এসেছে সারা দুপুর।

কাপটা নামিয়ে রেখেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলি! ওটা দিয়ে দিস কাকাবাবুকে।

–তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

–কোনো দরকার নেই। উনি দেখলেই বুঝবেন।

–তুমি এই বৃষ্টির মধ্যে আবার যাচ্ছো? গেঞ্জি পরেই চলে যাবে নাকি?

--কেন, গেঞ্জি পরে রাস্তায় বেরুতে অসুবিধের কী আছে?

–কী তোমার এমন জরুরি কাজ যে এক্ষুনি যেতেই হবে?

অতীন ঘুরে অলির দিকে তাকালো। সত্যিই তার এমন কিছু ব্যস্ততা নেই। কিন্তু পাশের ঘরের হারমোনিয়ামের আওয়াজ ও পুরুষ কণ্ঠ তার কানকে পীড়া দিচ্ছে। কাকাবাবুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তার বাবা এই রকম চেঁচিয়ে গান গাইছে, এটা অতীন কল্পনাই করতে পারে না।

–ঐ গানের মাস্টারটা তোকে আজ ছেড়ে দিয়েছে যে? তুই গান শিখছিস না?

–না, আমি আর ওঁর কাছে কোনোদিন গান শিখবো না!

অতীন খুশী হয়ে হাসলো। ঐ গানের মাস্টারটাকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। অলি এতদিনে তা বুঝেছে?

অলি বললো, আমার বাবার একটা জামা দেবো? তোমার গায়ে লেগে যেতে পারে।

–চল, অলি, তোর ওপরের ঘরটায় যাই। এই ঘরে বই-এর ভ্যাপসা গন্ধ আমার বিচ্ছিরি লাগে। সব সময় চোখের সামনে বই দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

–ঠিক আছে, চলো, ওপরে চলো।

অলির ঘরে খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো অতীন। খুব নরম হয়ে এসেছে বিকেলের আলো। জমা-জলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বলে রাস্তার গাড়িগুলির আওয়াজও বেশ মন্থর। কিন্তু অতীনের মাথার মধ্যে ছটফট করছে একটা গোপন বাসনা।

অলি একটা জামা নিয়ে এলো তার বাবার।

অতীন সেটা হাতে নিয়েই বললো, খুব পুরোনো, ছেঁড়া খোঁড়া একটা জামা এনেছিস, তাই না? দোল খেলার জন্য তুলে রাখা হয়েছিল?

অলি বললো, কী অসভ্য! মোটেই ঘেঁড়া নয়। আলমারি খুলে সামনে যেটা পেয়েছি, সেটাই নিয়ে এসেছি।

–তোর বাবার জামা আমি পরবো না। তোর কাছ থেকে আর কিচ্ছু আমি নেবো না।

অতীন আবার দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই অলি তার হাত চেপে ধরে বললো, কেন, কী হয়েছে? আমি কী দোষ করলুম।

অতীন রাগ রাগ চোখে তাকালো অলির দিকে। অলির শরীরে ও স্বভাবে যে স্নিগ্ধতা ও সারল্য আছে এখন সে তা ভাঙতে চাইছে। এরকম ইচ্ছে তার আগে কখনো হয়নি।

সে বললো, তুই কী ক্ষতি করেছিস জানিস? আমাকে একটা কলম দিয়েছিলি, একটা বিচ্ছিরি কলম, কালি বেরোয় না, সেটা দিয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়ে...

বিস্ময়ে, ব্যথায়, অপমানে অলির মুখখানা নীল হয়ে গেল। একটা কলম সে অতীনকে দিয়েছিল ঠিকই, তবে নিজে থেকে দিতে চায়নি। অতীনই জোর করে নিয়েছিল বলতে গেলে।

অলি একদিন অতীনকে দুটি জিনিস দেখিয়েছিল। একটি কলম আর একটা হাতঘড়ি। কমলটা দিয়েছিলেন তার বাবা আর ঘড়িটা ব্যাঙ্গালোর থেকে তার এক মামা এনেছিলেন। অতীনকে সেই ঘড়ি আর কলমটা দেখিয়ে গর্বের সঙ্গে অলি বলেছিল, দ্যাখো বাবলুদা, আমাদের দেশে এখন কত ভালো ভালো জিনিস তৈরি হচ্ছে। এই ঘড়িটাও দিশি, কলমটাও দিশি! বিলিতি ঘড়ির চেয়ে এই ঘড়িটা কোনো অংশে খারাপ নয়। আর কলমটা দিয়ে লিখে দ্যাখো–

অতীন কলমটা খুলে একটা কাগজে ঘষতে ঘষতে বলেছিল, মন্দ না। আমি একটা জাপানি কলম কিনবো ভাবছিলাম, এটার দাম কত রে?

অলি বলেছিল, তুমি এটা নিয়ে কয়েকদিন লিখে দেখতে পারো।

অতীন অমনি কলমটা পকেটে ভরে বলেছিল, তুই আমাকে দিয়ে দিলি? তা হলে এটা দিয়েই আমি পরীক্ষা দেবো!

অলি এখন চরম দুঃখিত স্বরে বললো, আমার জন্য তোমার পরীক্ষা খারাপ হয়েছে?

অতীন হুংকার দিয়ে বললো, হ্যাঁ।

তারপরেই এরকম ধমকের সঙ্গে কোনো রকম মিল না রেখে সে অলিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, আমি তোকে খেয়ে ফেলবো! আমি তোকে একদম খেয়ে ফেলবো আজ!

অলি প্রথমে দারুণ অবাক হয়ে গেল। বাবলুদা তো এরকম কক্ষনো করেনি আগে। বরং বাবলুদা দু'চারটে চড়-চাপড় মারে মাঝে মাঝে, মাথার চুল টেনে এলো করে দেয়, আদর তো করে না। বি এস-সি পরীক্ষা দিয়েই বদলে গেল?

বিস্ময়ের সঙ্গে মিশে থাকে লজ্জা। হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লো ভয়। বাবলুদা তাকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছে। না, না, না, এ ভাবে নয়, এ ভাবে হতে পারে না। জীবনের প্রথম চুম্বনের কথা অলি কল্পনা করেছে মাঝে মাঝে। নদীর ধারে, জ্যোৎস্না রাতে, কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথা থেমে যাবে, বাবলুদা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে অনেকক্ষণ, তারপর...। তার বদলে এই রকম?

দারুণ ভয় পেয়ে অলি কান্না কান্না গলায় বললো, এ কী বাবলুদা, না, না, আমায় ছেড়ে দাও, একটা কথা শোনো–

অতীন বললো, চুপ, কোনো কথা নয়!

অলি প্রাণপণে তার ঠোঁট সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, ছাড়ো, ছাড়ো, কী হচ্ছে। কী পাগলামি করছো, দরজা খোলা আছে, এক্ষুনি জগদীশ কফি নিয়ে আসবে...

অতীনের বুকের ভেতরটা খুশীতে হা-হা করে উঠলো। দরজা খোলা, শুধু এই জন্যই অলির আপত্তি? কেউ আসবে না, কেউ আসবে না, পৃথিবীতে কারুর সাহস নেই এখন তাকে বাধা দেওয়ার।

সে অলিকে দেওয়ালের কাছে টেনে এনে তার নরম, তুলোর মতন ওষ্ঠ নিয়ে মাতামাতি করতে লাগলো। তার একটা হাত ঘুরতে লাগলো ঘুঘু পাখির মতন অলির বুকে। অলির তীব্র, কান্নামেশানো না, না, সে শুনতে পাচ্ছে না। এক সময় সে দু হাতে অলির কোমর জড়িয়ে উঁচুতে তুলে তার নগ্ন নাভিতে চেপে ধরলো তার গরম জিভ।

সে ভাঙছে। সে অলির স্নিগ্ধতা ও সারল্য ভাঙছে, সে চাইছে ঝড় ও অগ্নিবৃষ্টি।

৪ বাড়ির সামনে যে গেট ছিল

বাড়ির সামনে যে গেট ছিল সেটি আর নেই। কবে ভেঙে গেছে, তারপর আর মেরামতের প্রশ্ন ওঠেনি। ভজন সিংকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, দুটি বউ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে ফিরে গেছে গাঁয়ের বাড়িতে। এখনো মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে। সুহাসিনীর জন্য খানিকটা ঘি কিংবা কিছু আতা-পেয়ারা উপহার আনে।

একতলাটা এখন পুরোপুরিই ভাড়া, দুটি রেল-পরিবার থাকে সেখানে। তাদের মধ্যে সর্বক্ষণ জল নিয়ে, ময়লা ফেলা নিয়ে, ছেলেমেয়েদের অবাধ্যতা নিয়ে ঝগড়া চলে। ওপর তলায় পাঁচ ইঞ্চি দেয়াল গেঁথে দুটি ঘর বানানো হয়েছে কোনোক্রমে, সেই দুটি ঘরে বিশ্বনাথ গুহ তাঁর স্ত্রী-কন্যা-শাশুড়িকে নিয়ে থাকেন।

বিশ্বনাথ এত রোগা হয়ে গেছেন যে তাঁকে হঠাৎ দেখে চেনাই শক্ত। ক্ষয় রোগ তাঁকে ছাড়েনি। তবু তিনি বেঁচে আছেন, বলতে গেলে, সম্পূর্ণ মনের জোরে। মাঝে মাঝে জোড়াতালি দিয়ে চিকিৎসা হয়েছে, কিন্তু এই রোগে ওষুধ পত্রের চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয় হলো পরিপূর্ণ বিশ্রাম এবং নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু বিশ্বনাথ গুহ সেসব কিছু মানেননি, খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে তাঁর বাছ-বিচার নেই, আর বিছানায় শুয়ে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। সর্বক্ষণ টো টো করে ঘুরে বেড়ান। শুধু বাড়ি ভাড়ার টাকায় সংসার খরচ কুলোয় না, তাঁকে অন্য রোজগারের ধান্দায় থাকতে হয়।

তবে, গায়ক বিশ্বনাথ গুহর কণ্ঠ থেকে গান চির বিদায় নিয়েছে। গানের ইস্কুলটি তিনি তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ তাঁর গলায় এখন সুর তো দূরের কথা, তাঁর কথাই এখন ভালো করে বোঝা যায় না। কাশির প্রকোপে তাঁর কণ্ঠস্বর ফ্যাসফেসে হয়ে গেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর তেজ নষ্ট হয়নি, রসিকতা-জ্ঞানটি অক্ষুণ্ণ আছে। হেসে ওঠেন যখন-তখন।

ট্রেনের সময় অনুযায়ী স্টেশানে বসে থাকাই এখন বিশ্বনাথের প্রধান কাজ। মুখের দাড়ি অধিকাংশই পেকে গেছে, মাথার চুলও প্রায় সাদা, গায়ের মোটা পাঞ্জাবিটা বিশেষ সাবানের ছোঁয়া পায় না। ইদানীং টায়ার কাটা অতি শস্তায় চটি বেরিয়েছে, সেই চটিই পায় দেন। স্টেশানের অনেকেই তাঁকে চেনে, তবে আগের মতন আর কেউ খাতির করে না। খাতির করার মতন চেহারা বা পোশাকও তাঁর নেই, শুধু একজন বুড়ো চাওয়ালা তাঁকে অর্ধেক দামে চা দেয়।

সত্যিই বিশ্বনাথকে দেখে আর বোঝবার উপায় নেই যে এককালে এই মানুষটিই কলেজের পড়াশুনো ছেড়ে গান বাজনা শেখার ঝোঁকে লক্ষ্ণৌ-আগ্রা ঘুরে বেড়িয়েছেন। টানা সাত-আট বছর তালিম নিয়েছেন সঙ্গীত-সম্রাট স্বয়ং ফৈয়াজ খানের কাছ থেকে। মোটামুটি বেশ সমৃদ্ধ পরিবারের সন্তান ছিলেন বিশ্বনাথ, জীবনের অনেকগুলি বছর অর্থচিন্তা করতে হয়নি। এক ধরনের মানুষ থাকে, যারা নিজের জন্য কক্ষনো কিছু চায় না, অন্যদের সবসময় কিছু দিতে চায়, অনেক সময় সাধ্যের অতিরিক্তও, বিশ্বনাথ ছিলেন সেই দলের। এখন অবস্থাটা উল্টে গেছে।

আমাদের দেশের সব মানুষ এখনো আপনি, তুমি, তুই-তে ভাগ করা। অচেনা মানুষকেও অনায়াসে তুমি বা তুই বলা চলে তার পোশাকের দৈন্য কিংবা খালি পা দেখে। বিশ্বনাথকে অনেকেই আজকাল তুমি শ্রেণীর মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। ট্রেনের যাত্রীরা তাঁকে দীন উমেদার বলে গণ্য করলে তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। বিশ্বনাথ এই জন্য মাঝে মাঝেই কথার মধ্যে ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন। এই একটা ভালো ওষুধ আছে। ইংরিজি শুনলেই সবাই আবার আপনি বলতে শুরু করে।

ইদানীং দেওঘরে যাত্রীর সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। এই শহরের স্থায়ী বাসিন্দাও বেড়েছে। ভ্রমণবিলাসী বা স্বাস্থ্য-উদ্ধারকারীরা আগে শুধু দুগা পুজোর মরশুমে এবং শীতকালেই আসতো। এখন গ্রীষ্ম বর্ষাতেও যাত্রীর বিরাম নেই। সেই তুলনায় খালি বাড়ির সংখ্যা কমেছে, ধর্মশালাগুলিতে জায়গা হয় না।

আগে শুধু বিশ্বনাথের মন্দিরে পুজো দেবার জন্য তীর্থযাত্রীরা আসতো, এখন সৎসঙ্গের অশ্রমের শিষ্যরাও আসে। আসে মোহনানন্দ মহারাজের শিষ্যরা। একসময় শুধু বৈদ্যনাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের একাধিপত্য ছিল এই শহরে, এখন তাদের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে, সেই জন্য পাণ্ডা সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ। তাদের সঙ্গে সৎসঙ্গীদের সংঘর্ষও হয়ে গেছে কয়েকবার।

বিশ্বনাথ খুব সতর্কভাবে পাণ্ডা সম্প্রদায় ও সৎসঙ্গীদের থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখেন। ঐ দুই দলেরই কেউ কখনো তাঁকে ধমক টমক দিতে এলে তিনি একেবারে বিনয়ের অবতার হয়ে যান, প্রয়োজনে তাদের পা ধরতেও দ্বিধা করেন না। আত্মরক্ষার তাগিদেই তিনি এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যান না, তিনি জানেন, এদের মার তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

কয়েকটি বড় বড় বাড়ির দারোয়ান ও মালিকের সঙ্গে বিশ্বনাথের গোপন চুক্তি আছে। বাড়ির মালিকরা বছরে একবার দুবার আসে, অন্য সময়ে বাড়ি খালি পড়ে থাকে। অনেক মালিক ভাড়া দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। টি বি রুগীরা এসে বাড়ি বিষাক্ত করে দিয়ে যাবে, এইটাই প্রধান ভয়। কেয়ার টেকার বা দারোয়ানরা এই সব বাড়ি খুব গোপনে ভাড়া দেয়। সেই ব্যাপারে তারা বিশ্বনাথের ওপরে নির্ভর করে। বিশ্বনাথ এমন ভাড়াটে জোগাড় করে আনবেন যারা সাত দিন-দশ দিনের বেশি থাকবে না। তাছাড়া বিশ্বনাথ এই সব কটি বাড়ির মালিকদের ও পরিবারের প্রধান লোকজনের মুখ চেনেন। তারা হঠাৎ কেউ এসে পড়ল কি না তাও বিশ্বনাথ স্টেশানে বসে বুঝতে পারবেন। এই কাজের জন্য তাঁর আধা-আধি বখরা।

বিশ্বনাথ ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। যাদের দেখে মনে হয় তীর্থযাত্রী কিংবা সৎসঙ্গের শিষ্য, তাদের প্রতি তিনি লোভ করেন না। নব দম্পতি কিংবা কলেজের ছাত্রদের দলই তাঁর বেশি পছন্দ। আজকাল ছাত্ররা প্রায়ই দল বেঁধে আসে।

পছন্দসই পার্টি দেখলে বিশ্বনাথ পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বার করে মেলে ধরেন বুকের কাছে। তাতে মোটামোটা অক্ষরে লেখা থাকে, উত্তম বাড়ি ভাড়া, সব রকম

আরামের ব্যবস্থা আছে, দৈনিক বা সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত। কাগজের উল্টোপিঠে ঐ বক্তব্যই ইংরেজিতে লেখা। ঐ কাগজ দেখে কেউ কেউ এগিয়ে আসে, দরাদরি হয়, বিশ্বনাথ তাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তারপরেও প্রতিদিন তাদের খোঁজ খবর করেন। মাসে এরকম দু'তিনবার খদ্দের জোটে, আয় নেহাত মন্দ হয় না।

চার পাঁচজন ছাত্রের একটি দল বিশ্বনাথের বুকের ঐ কাগজ দেখে থমকে দাঁড়ালো। একজন অন্যদের বললে, ধর্মশালায় যাবার আগে এটা ট্রাই করবি নাকি?

ওদের একজন বললো, না, না! বাইরে চল আগে! স্টেশানের টাউটের পাল্লায় পড়লে অনেক পয়সা খসাবে।

বিশ্বনাথ তাঁর কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে ঐ দলের একজনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তিনি বুঝে গেছেন যে জালে শিকার পড়েছে।

একজন যুবক বন্ধুদের বললো, কথা বলে দেখাই যাক না! ধর্মশালা পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই তো কিছু!

সে এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলো, কোঠী-ভাড়া হ্যায়? কিৎসা ভাড়া?

প্রতিদিন ট্রেনের যাত্রীদের দেখে দেখে বিশ্বনাথ অভিজ্ঞ হয়ে গেছেন, দেখেই চিনতে পারেন, তারা কোথাকার লোক, কোন্ ভাষাভাষী। অবশ্য এই শহরে বাঙালী ভ্রমণকারীর সংখ্যাই বেশি।

তিনি বললেন, প্রাইভেট হাউস। ভেরি রিজনেবল রেন্ট, আপনাদের পছন্দ হবে।

বিশ্বনাথের মুখে ইংরিজি ও বাঙলা দু'রকম শব্দ শুনে যুবকটির মুখের চেহারা একটু বদলালো। বন্ধুদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কত দূরে বাড়ি?...

বিশ্বনাথ হেসে বললেন, বেশ দূর আছে। শহরের ঘিঞ্জি থেকে অনেকটা দূরে। নিরিবিলি জায়গায়, সঙ্গে বাগান আছে, চমৎকার ভিউ পাবেন...

–কত ভাড়া?

–আপনারা ক'দিন থাকবেন?

–এই তিন-চার দিন। আমাদের দু'টো ঘর চাই।

–তাহলে পার রুম তিরিশ টাকা করে পড়বে পার ডে! যুবকদের দলের অন্য একজন চেঁচিয়ে বলে উঠলো, ওরে বাপরে, একেবারে গলাকাটা! চ, চ, ধর্মশালাতে ঠিক ব্যবস্থা করে নেবো!

আর একজন বললো, আমি শুনিছি, এখানে হোটেলের ঘর ভাড়াও দশ বারো টাকার বেশি না!

বিশ্বনাথ সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলিয়ে বললেন, তা ঠিকই শুনেছেন। দশ টাকা ভাড়ায় হোটেলের ঘর পেতে পারেন এখানে। যদি খালি থাকে। কোনো না কোনো ধর্মশালাতেও জায়গা পেয়ে যাবেন। খুব ভিড় নেই এখন।

এই পদ্ধতিটা খুব কার্যকর। খদ্দেরের কাছে কাকুতি-মিনতি না করে এমন ভাব বজায় রাখা যে তোমরা আমার খদ্দের হবার যোগ্য নও!

চলে যেতে উদ্যত হয়েও যুবক দলটি থমকে দাঁড়ালো। লালচে রঙের গেঞ্জি পরা তাদের মুখপাত্রটি রুক্ষ ভাবে জিজ্ঞেস করলো, হোটেলের ঘর ভাড়া যদি দশ টাকা হয়, তাহলে আপনার ঘরের রেট এত বেশি কেন?

–হোটেলের ঘর এই অ্যাতটুকু, পায়রার খোপের মতন। বাজারের পাশে, সব সময় হৈ হট্টগোল। আর ধর্মশালার বাথরুম অতি নোংরা, সেখানে মাছ-মাংস খেতে পারবেন না।

–তা বলে থার্টি রুপিজ পার ডে, এটা টু মাচ্!

–তাহলে হোটেলেই যান। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু বাঁ দিকে গেলেই হোটেল দেখতে পাবেন। যদি ওপর তলার ঘর পান, খুব খারাপ হবে না। বেরুবার সময় দরজায় সব সময় তালা লাগাতে ভুলবেন না। নিজস্ব তালা থাকলে ভালো হয়।

বিশ্বনাথ এগিয়ে যান অন্যদিকে। যুবকের দল পরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে। নতুন জায়গায় এসে একজন বাঙালীকে হাত ছাড়া করতে চায় না তারা।

মুখপাত্রটি চেঁচিয়ে ডাকলো। এই যে দাদা শুনুন।

বিশ্বনাথ উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন, তিনি জানতেন যে ওরা ডাকবেই। মানব চরিত্র তাঁর চেনা হয়ে গেছে ভালো করে।

ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, কী!

–চলুন, আপনার বাড়িটা দেখে আসি আগে।

–বাড়ি দেখলে আপনাদের পছন্দ হবে ঠিকই, সে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। তবে আপনাদের বাজেট যদি কম থাকে, তা হলে হোটেলেই থাকুন। সব কিছু কাছাকাছির মধ্যে পেয়ে যাবেন।

–আমরা দু'চারদিনের জন্য বেড়াতে এসেছি, ভালো জায়গাতেই থাকতে চাই। কিন্তু আপনি ভাড়াটা বেশি চাইছেন।

–সাতদিনের জন্য নিন, অনেক রেট কমে যাবে। এক সপ্তাহ দেড়শো টাকা।

–উইকলি দেড়শো আর ডেইলি তিরিশ টাকা? এটা কোন্ হিসেবে হলো?

–কম দিনের জন্য নিলে আমাদেরই ক্ষতি। মনে করুন, আপনি দু'তিন দিনের জন্য ভাড়া নিলেন। কালই একটা পার্টি এসে বললো, আমার সাত দিন, কি দশদিনের জন্য চাই। তখন তো তাকে দিতে পারবো না। ফিরিয়ে দিতে হবে!

–শুনুন দাদা, আমাদের দু'খানা ঘর চাই। মোট তিনদিন থাকবো। সব মিলিয়ে টোটাল একশো টাকা দেবো। রাজি থাকেন তো বলুন!

বিশ্বনাথ যুবকটির দিকে সোজা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চেহারার কিছুই অবশিষ্ট নেই, কণ্ঠস্বর ভাঙা, পোশাকে দৈন্য প্রকট, তবু শুধু চোখের দৃষ্টিতে যতটা ব্যক্তিত্ব আনা যায়, ততটা প্রয়োগ করে তিনি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, না। আমি দরাদরি করি না!

অন্য একজন বললো, আমরা গোটা বাড়িটা পাবো। অন্য কেউ ডিসটার্ব করবে না?

–ফাঁকা বাড়ি, মস্ত বড় বাগান, ডিসটার্ব করার কেউ নেই।

–তা হলে আমরা এক শো কুড়ি পর্যন্ত দিতে পারি।

বিশ্বনাথ ভেতরে ভেতরে কাঁপছিলেন। এক শো কুড়ি কেন। তিনি শুধু পঞ্চাশ টাকাতেই রাজি ছিলেন। দারোয়ানদের সঙ্গে সেইরকমই চুক্তি আছে, যেদিন যা পাওয়া যায়! তবু তিনি এই কায়দাটা সব সময় পরীক্ষা করে দেখতে চান। নিজে থেকে দাম কমান না, খদ্দেরকে দিয়েই বলাতে চান, তাতে তারা ছোট হয়ে যায়। দু'চার বার এই কায়দাটা ব্যর্থ হয়। যারা প্রকৃত কৃপণ কিংবা ভালো বাড়িতে থাকতে অভ্যস্ত নয়, তারা মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাটে।

উদারতার ভাব দেখিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, ঠিক আছে, চলুন! বাঙালীর ছেলে, হঠাৎ এসে পড়েছেন... আপনাদের উচিত ছিল আগে থেকে জায়গা ঠিক করে আসা... অনেক সময় কোনো জায়গাই খালি পাওয়া যায় না।

আজকের দিনে ষাট টাকা রোজগার হলো এজন্য বিশ্বনাথ বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন : গত আট দশদিন একটাও পার্টি পাওয়া যায়নি। আজ ভালো টাকা পাওয়া গেছে। ষাট টাকা, কম নয়!

এককালের গায়ক বিশ্বনাথ গুহ। যিনি কোনোদিন গানের বিনিময়ে পয়সা নেবেন না ঠিক। করেছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ভাড়ার দালালিতে এতটা দক্ষতা অর্জন করে পুলকিত।

স্টেশানের বাইরে এসে বিশ্বনাথ দু'খানা টাঙ্গা ভাড়া করলেন। সব টাঙ্গাওয়ালা তাঁর পরিচিত। এদের সঙ্গেও তাঁর কমিশনের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকের কাছ থেকে তিনি আট আনা করে পাবেন।

লাল গেঞ্জি পরা দলপতিটির সঙ্গে এক টাঙ্গায় উঠলেন বিশ্বনাথ। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়লো এরা ঠিক সাধারণ ছাত্র নয়, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়ছে, আর্টিকেল ক্লার্ক হিসেবে একটি ফার্মের সঙ্গে যুক্ত আছে। সুতরাং অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল।

লাল গেঞ্জিপরা যুবকটির নাম অজয়। সে দেওঘরে জিনিস পত্রের দাম বিষয়ে কিছু জেনে নেবার পর জিজ্ঞেস করলো, আমরা ওখানে খাবো কোথায়? রান্না করে দেবার লোক পাওয়া যাবে?

–হ্যাঁ, মালি তার বৌ নিয়ে থাকে। তাকে জিনিসপত্র কিনে দিলে রান্না করে দেবে। ভালো রাঁধে।

–কী রকম চুরি করবে?

–আপনাদের ঘর খোলা রেখে যাবেন, রেডিও, ঘড়ি এসব থাকলেও কেউ ছোঁবে না। ওরা এসব চুরি করতে জানে না। তবে যদি মুর্গি রান্না করতে দ্যান, তার দু'এক টুকরো কি ছেলেমেয়েকে খাওয়াবে না?

–সে কথা বলছি না! বাজার করতে দিলে মারবে না? জানেন, গত বছর আমরা ঘাটশিলায় গেসলুম। এক ব্যাটা মালি ছিল, তাকে দশ টাকার নোট দিয়ে সিগারেট কিনতে পাঠালে কক্ষনো পয়সা ফেরৎ দিত না।

–আপনারা দু'চারদিনের জন্য আমোদ করতে এসেছেন, আপনারা একটু বেশি বেশি খর্চা করবেন, সেটা স্বাভাবিক। এখানকার গরিব লোকেরা তো তার থেকে দু'চারপয়সা মারবেই।

–দু'চার পয়সা কী বলছেন মশাই! পাঁচ-দশ টাকা তো বখশিসই দিই। তবু এ যে পুকুর চুরি।

–আপনাদের একটা টিপস দিয়ে দিচ্ছি। মালিকে চাল-ডাল, মুর্গি-টুর্গি কিনে দিয়ে রান্না করতে বলার সময় বলবেন, বেশি করে চাল নিও, তোমরাও আমাদের সঙ্গে খাবে! দেখবেন, ওরা তাতে কত খুশী হয়। আপনারা নিজে থেকেই দিলে ওরা আর চুরি করবে না।

–সে না হয় খারে আমাদের সঙ্গে, ঠিক আছে। এখানে মুর্গি কোথায় শস্তায় পাওয়া যায়? বাজার থেকে নিয়ে যাবো?

–মালির কাছেই মুর্গি আছে, আজকের মতন চলে যাবে। তারপর গাঁয়ের দিকে ঘুরতে যাবেন তো, ওখানে শস্তায় ভালো জিনিস পাবেন। দশ টাকা বারো টাকা জোড়া।

বাড়ি দেখে যুবকদলের পছন্দ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিশ্বনাথ কিছুই বাড়িয়ে বলেননি। এটা লাহাদের বাড়ি, কলকাতায় তাদের রঙের বড় কারবার। বাড়িটি সাজাতে তারা কার্পণ্য করেনি। সামনে-পিছনে বাগান, সবটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাগানে বসলে ডিগরিয়া পাহাড়ের চূড়া দেখতে পাওয়া যায়।

মালিকে ডেকে বিশ্বনাথ সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন। এই সব বাড়ির মালিরাই নিজেদের কাছে চা-চিনি, ডিম, চাল-ডাল ইত্যাদি স্টকে রাখে। বাইরে থেকে এসেই সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে, তক্ষুনি চা ও খাবার-টাবার চায়, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলে খুশী হয়। প্রথম দিন অনেকে বাজারে যেতে চায় না।

বাথরুমে জল তুলিয়ে দেবার ব্যবস্থাও সম্পন্ন হবার পর বিশ্বনাথ বললেন, এবারে আমি চলি? সব ঠিক আছে তো?

অজয় তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় বললো, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, ভালো বাড়িতে এনেছেন, থ্যাংক ইউ, তবে ইয়ে... একটা ব্যাপার মানে আমরা ড্রিংকস আনতে ভুলে গেছি, এদিকে পাওয়া যাবে?

-দেশি না বিলিতি?

-বীয়ার, আপাতত কয়েক বোতল বীয়ার, যা গরম দেখছি এখানে...

-হ্যাঁ, বীয়ার পাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়। আসবার সময় যদি বলতেন...যেখানে একবার টাঙ্গা থামিয়ে সিগারেট কিনলেন, তার খুব কাছে। গেলেই দেখতে পাবেন।

অজয় অন্যদিকে ফিরে গলা তুলে বললো, এই হেমেন, পাওয়া যাবে বলছে, চল তাতে আমাতে যাই!

হেমেন নামক যুবকটি ততক্ষণে জামা-প্যান্ট ছেড়ে শুধু একটি জাঙ্গিয়া পরে বাগানে একটি মর্মর নারী মূর্তির কাছে শুয়ে আছে। সে চেঁচিয়ে বললো, আমার এখন বেরুতে ইচ্ছে করছে না। ঐ বুড়োটাকেই বল না এনে দেবে!

অজয় বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বললো, আপনি... মানে... মালিটাকে পাঠালে এনে দিতে পারবে না?

বিশ্বনাথ বললেন, মালি তো এখন জল তুলবে। দিন, আমাকেই টাকা দিন, আমি এনে দিচ্ছি।

মালির কাছ থেকে একটা থলি আর সাইকেলটা ধার নিলেন বিশ্বনাথ। মদ কিনে আনার প্রস্তাবে তিনি অসন্তুষ্ট হননি। মদের দোকানের সঙ্গেও তাঁর কমিশনের ব্যবস্থা। এক শো টাকায় দু' টাকা। পাশাপাশি দুটি মদের দোকানের একটির প্রতি বিশ্বনাথের পক্ষপাতিত্ব। এরা বারো বোতল বীয়ারের অর্ডার দিয়েছে, বিশ্বনাথের এক বোতল ফ্রি হয়ে যাবে।

দুপুর বারোটায় চড়া রোদ। শরীরের এই অবস্থায় বিশ্বনাথের সাইকেল চালানো নিষেধ। কিন্তু গাড়ি ভাড়ার জন্য কিছু খরচ করতে বিশ্বনাথের সব সময় গায়ে লাগে। বিশ্বনাথের দৃঢ় ধারণা, তিনি সহজে মরবেন না। মেয়েটা বড় হচ্ছে, তার বিয়ে দিতে হবে। সুপূর্ণার একটা বিয়ে দিতে পারলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তারপর তিনি পৃথিবী ছাড়লেও তাঁর বউ ও শাশুড়ী, এই দুই বিধবার চলে যাবে ঐ বাড়ি ভাড়ার টাকায়। অবশ্য যদি ঠিক মতন আদায় হয়।

এরা তো তবু তাঁকে দিয়ে মদ আনাচ্ছে। কোনো কোনো পার্টি এসে মেয়েছেলে জোগাড় করে দেবারও ইঙ্গিত দেয়। বিশ্বনাথ অবশ্য এখনো অতটা নিচে নামেননি। তা-না-না-না-করে সরে পড়েন। সেইজন্যই তিনি পারতপক্ষে সন্ধের পর এই সব লোকদের কাছে আসেন না। অন্ধকার হলেই এদের মধ্যে ঐ প্রবৃত্তি জাগে।

ঘামে ভিজে গেল বিশ্বনাথের জামা। মদের দোকানে পৌঁছেই তিনি চলে গেলেন কাউন্টারের পেছনে। একটা বীয়ারের বোতল চেয়ে নিয়ে ছিপি খুলে দারুণ তৃষ্ণার্তের মতন পান করতে লাগলেন ঢক ঢক করে। দোকানের মালিক সিংজীকে বললেন, ভালো পার্টি এসেছে। আরও অনেক বোতল যাবে। বালুরাম মালি যে-মাল নিতে আসবে, তার কমিশান। কিন্তু আমার নামে হবে!

বোতলগুলো থলেতে ভরে তিনি সাইকেলে ঝোলালেন। তিনি কখনো ক্যাশ মেমো নিতে ভোলেন না। দোকানের মালিক ক্যাশ মেমোতেই দাম বাড়িয়ে লিখে দেয়। ফেরার পথে বিশ্বনাথ খানিকটা বরফও নিয়ে নিলেন।

বোতলগুলো পৌঁছে দেবার পর বিশ্বনাথ অজয়কে বললেন, এবারে সব ঠিক আছে তো? তা হলে আমি যাই?

বিশ্বনাথ বুদ্ধি করে বরফও এনেছেন দেখে অজয় প্রকৃতই খুশী হয়েছে। ব্যবস্থাপনা চমৎকার। মানি ব্যাগ খুলে সে একটা পাঁচ টাকার নোট তুলে বললো, আপনি এটা নিন!

মালিটা কাছেই দাঁড়িয়ে। বিশ্বনাথ সাধারণত ওর সামনে কারুর কাছ থেকে টাকা নেন না। বখশিস টখশিস ওরই প্রাপ্য। কিন্তু পাঁচ টাকার লোভ সামলানো যায় না। তিনি ভাবলেন, নাচতে নেমে আর ঘোমটা টেনে কী হবে?

হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে তিনি বললেন, থ্যাংক ইউ!

বাড়ি ফেরার সময় বিশ্বনাথ একটা বেশ বড় দেখে লাউ কিনলেন। সুহাসিনী লাউ ভালোবাসেন। মেথি ফোঁড়ন দিয়ে একটা লাউ-সুক্তো তিনি রাঁধেনও চমৎকার।

আজকাল অবশ্য সুহাসিনী রান্না করতে চান না একেবারেই। শান্তিই সব কিছু করে। সুহাসিনী গত কয়েক বছর ধরে একেবারে পাথর হয়ে গেছেন, মুখ দিয়ে কথা বেরুতেই চায় না। অমন ছটফটে মানুষ ছিলেন, এখন ঠাকুর ঘরে বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিশ্বনাথ লক্ষ্য করে দেখেছেন, তাঁর চোখ দিয়ে জলও গড়ায় না, চোখ শুকনো।

বিশ্বনাথ বাড়ি পৌঁছোতে পৌঁছোতে হাঁফিয়ে গেলেন। কাশি এলো দু'একবার। এইসময় কাশির দমক এলে দু'তিন দিন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না। যে করেই হোক চাঙ্গা থাকতেই হবে, এই ছেলেগুলোর কাছ থেকে আরও কিছু পয়সা পাওয়া যাবে।

তেল মেখে স্নান করতে হবে ভালো করে। গরম তেল বুকে মালিশ করলে আরাম হয়। তাঁর মেয়ে তেল মাখিয়ে দেয়।

ওপরে এসে বিশ্বনাথ একবার উঁকি দিলেন ঠাকুর ঘরে। সুহাসিনী যথারীতি সেখানে বসা। এখন তাঁর হাতে লাউটা তুলে দেওয়া যাবে না। রান্না ঘরে ঢুকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খুকী। কোথায়?

শান্তি বললেন, কী জানি। এক ঘণ্টা আগে তো হঠাৎ বেরিয়ে গেল! আজকাল আমার কোনো কথা শোনে না!

সুপূর্ণ কোনো ক্রমে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। তারপর আর তার পড়াশুনো হলো না। সে কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়তে চেয়েছিল, তাকে পাঠানো হয়নি। সে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকতে চায় না। মেয়েটা খুব পাড়া-বেড়ানি হয়েছে। কিন্তু শরীরে তার যৌবন এসেছে, এরকম ভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। শান্তি তাকে শাসন করতে পারেন না। বিশ্বনাথ বাড়ি থাকেন না অধিকাংশ সময়।

হাঁপাতে হাঁপাতে বিশ্বনাথ বসে পড়ে ভাবলেন, আজ তিনি মেয়েকে আচ্ছা মতন বকুনি দেবেন।

কিন্তু একটু পরেই সুপূণা যখন ফিরে এলো, বিশ্বনাথ কিছু বলতে পারলেন না। তখন কথা বলতেই তাঁর কষ্ট হচ্ছে।

পাতলা হিলহিলে চেহারা, তার গায়ের রং শ্যামলা। মাথার চুল খোলা।

সুপূর্ণার হাতে একটা চিঠি। রাস্তায় পিওনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। চিঠিখানা প্রতাপের। বিশ্বনাথের এখন যেন চিঠি পড়ারও ক্ষমতা নেই। তিনি ফিসফিস করে বললেন, খোল। কী লিখেছে জোরে জোরে পড়।

শান্তি বললেন, দাঁড়াও, মাকে ডাকি। মা-ও শুনবেন।

বিশ্বনাথ দাবড়ানি দিয়ে বললেন, আঃ, ভালো-মন্দ কী লিখেছে আগে শুনে নি। আগেই মাকে ডাকার কী দরকার! গত মাসে তোমার ভাই টাকা পাঠায় নি। সে ভেবেছে কি, আমাদের সংসার চলবে কী করে?

সুপূর্ণার ডাক নাম টুনটুনি, তার স্বভাবটি ঐ পাখির মতনই ছটফটে। বাংলা সে ভালো পড়তে পারে না, বিশেষত হাতের লেখা। সে থেমে থেমে একটা একটা শব্দ উচ্চারণ করে পড়তে লাগলো।

বিশ্বনাথের বুকটা হাপড়ের মতন উঠছে নামছে। নিশ্বাস ফেলতে পারছেন না ভালো করে। এ বাড়িতে চিঠি কদাচিৎ আসে, প্রতাপরাও আসা অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। চিঠি এলেই বিশ্বনাথের মনে হয়, একটা কিছু দারুণ খবর থাকবে।

প্রথম দিকের সাধারণ কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে বিশ্বনাথ বললেন, আসল কথাটা কী লিখেছে, দ্যাখ না!

মাত্র দু' পাতার চিঠি, তাও পুরোটা শোনা হলো না বিশ্বনাথের। এক বোতল বীয়ারের নেশাতেই তার ঘুম এসে গেল, তিনি নাক ডাকতে লাগলেন।

৫ বাবুল বুঝতে পারেনি

বাবুল বুঝতে পারেনি, কত বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সে সস্ত্রীক বেরিয়েছিল নৌকো যাত্রায়। দু-তিন দিন ঝড় বৃষ্টির পর একদিনের জন্য সাময়িকভাবে আবহাওয়া শান্ত হলেও আকাশে আবার জমেছিল লাল মেঘ। ঢাকা পৌঁছোবার আগেই উঠলো ঝড়।

যেন ঝড় নয়, প্রলয়ের নাচ। দুনিয়া অন্ধকার, চতুর্দিকে প্রচণ্ড গতির শব্দ। তীরে ভেড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছু হলো না, তার আগেই উল্টে গেল তাদের নৌকো। এইটুকুই সৌভাগ্যের বিষয় যে কূল খুব দূরে ছিল না, বাবুল ও মঞ্জু দু'জনেই সাঁতার জানে,

কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে গেল, কিন্তু সঙ্গে করে আনা বাক্স-প্যাঁটরায় সাজানো তাদের অস্থায়ী সংসার ভেসে গেল জলে। মঞ্জু তার ছোট গয়নার বাক্সটিও সামলাতে পারেনি, কারণ সে সর্বক্ষণ তার শিশু সন্তানকে দু হাতে উঁচু করে ধরেছিল।

নিঃস্ব অবস্থায়, সিক্ত বসনে ওরা ধানমণ্ডির বাড়িতে এসে শুনলো যে বেতারে ঘোষণা করা হয়েছে, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশালে ঝড়ের তাণ্ডবে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে, মানুষই নাকি মরেছে দশ-বিশ হাজার। কত হাজার পরিবার যে নিরাশ্রয় তার ইয়ত্তা নেই, চতুর্দিকে ভাসছে লাশ।

মঞ্জু হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আল্লার কাছে মোনাজাত করতে লাগলো। পরম করুণাময় আল্লা যে তার সন্তানটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এজন্যই সে ধন্য।

ধানমণ্ডির বাড়িতে বাবুলের বাবা-মা উপস্থিত নেই, তাঁরা কয়েকদিনের জন্য গেছেন টাঙ্গাইল। বাবুলরা কোনো খবর দিয়ে আসেনি। বাবুলের বড় ভাই আলতাফ জার্মানি থেকে সদ্য ফিরেছে, সে আছে এখানে। বাবুল-মঞ্জুকে নিরাপদে পৌঁছোতে দেখে সে খুশী হলেও চিন্তিত হয়ে পড়লো বাবা-মায়ের জন্য। টাঙ্গাইলের কোনো খবর নেই। টেলিফোনে কানেকশান পাওয়া যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত রাত দশটায় আলতাফ আর বাবুল দু ভাই মিলেই গেল স্থানীয় থানায়, সেখানে তাদের মতন আরও অনেক উদ্বিগ্ন মানুষ এসে ভিড় করেছে। ঢাকা শহরে চাকরি ব্যবসায়ের সূত্রে যারা থাকে তাদের অনেকেরই এখনো নাড়ির যোগ আছে গ্রামের সঙ্গে। থানায় ওয়্যারলেসে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ করে খবর আনানো হচ্ছে। তাতে জানা গেল টাঙ্গাইলে বিশেষ কিছু ঘটেনি, সেখানে হতাহতের কোনো সংবাদ নেই।

বঙ্গোপসাগরের ঝড় প্রায় প্রত্যেক বছরই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার না একবার প্রবলভাবে। হানা দেয়। তবে কলকাতা বা ঢাকার গায়ে তেমন ঝাপ্টা লাগে না, মূল আঘাতটা পড়ে এদিকে চট্টগ্রাম, ওদিকে মেদিনীপুরে। দু-এক দিনের মধ্যেই জানা গেল,

এবারে ঝড়ের মূল আঘাত পড়েছে চট্টগ্রাম-নোয়াখালিতে, ওদিকে মেদিনীপুর নিষ্কৃতি পেলেও ত্রিপুরার বহু ঘরবাড়ি উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

সরকারি হিসেব মতন পূর্ব পাকিস্তানে নিহতের সংখ্যা ১৬ হাজার, বেসরকারি মতে ২৫ থেকে ৫০ হাজারের মধ্যে। এই বিরাট বিপর্যয়ের তুলনায় সরকারি সাহায্যের প্রায় কিছুই উদ্যোগ নেই। গভর্নর মোনেম খাঁ প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কাছে ওয়াদা করে এসেছেন বে-আদব বাঙালীদের তিনি দমন করবেন, বাঙালীদের জীবন রক্ষার কোনো দায় নেই তাঁর। তিনি নিজে যে বাঙালী সেই পরিচয়টাও গা থেকে ঘষে তুলে ফেলতে চান।

পৃথিবীর সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের খবর ও ছবি ছাপা হবার ফলে ঘটনার সাত দিন পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব করাচি থেকে উড়ে এলেন ঢাকায়। একবার না এলে ভালো দেখায় না। কিছুদিন আগে সামরিক শাসন তুলে দিয়ে তিনি সংবিধান সম্মত রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। তাঁর নিজেরই তৈরি সংবিধান, তাঁর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা।

রাজনৈতিক দলগুলি সব ছত্রভঙ্গ। উনিশশো আটান্নর সেই কালরাত্রির পর দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পার্টি অফিসগুলি তালাবন্ধ করে, কাগজপত্র পুড়িয়ে, নেতাদের সব জেলে ভরে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে পাকিস্তানে আর কোনোদিন রাজনৈতিক দলগুলি মাথা তুলতে না পারে। সামরিক শাসনের অত্যাচারে কেউ কোনো আন্দোলন করতেও সাহস পায়নি। সরকার থেকে প্রচার করা হতে লাগলো যে রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, মন্ত্রীদের স্বজন-পোষণ ও অকর্মণ্যতার জন্যই দেশের এই দুরবস্থা। দোকানদারদের ওপর জোর-জুলুম করে কমানো হলো জিনিসপত্রের দাম। বন্ধ করে দেওয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তায় রাস্তায় আর মিছিল নেই, যখন তখন পুলিস-জনতায় খণ্ডযুদ্ধ নেই, সাধারণ লোকরা অনেকেই ভাবলো, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পরের খেয়োখেয়ি, যখন তখন মন্ত্রিসভার পতন, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, এ সবের হাত থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেছে, তা হলে মিলিটারিই তো ঠিক মতন দেশ চালাতে পারে দেখা যাচ্ছে। তিক্ত

বুদ্ধিজীবীরা ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে ভাবলো, এ দেশ গণতন্ত্র পাওয়ার যোগ্যই নয়!

কয়েক বছরের মধ্যেই কিন্তু মনোভাব বদলে গেল রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খাঁর। তিনি নিজের পছন্দ মতন সংবিধান চালু করেছেন, তাতে তাঁর সুবিধে মতন নিবাচন ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু নির্বাচন করতে গেলে তো কয়েকটা দল লাগে। প্রথমে তিনি বেসিক ডেমোক্রেসির নামে একটা দলহীন নির্বাচন করলেন, সেটা বিশেষ সুবিধের হলো না, হাসাহাসি করতে লাগলো সবাই। তখন তিনি বললেন, দল চাই, পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলি সব গেল কোথায়? আগেকার নেতাদের জেল থেকে মুক্তি দাও, আবার দলাদলি করতে বলো!

আইয়ুব নিজেও চাইলেন একটা সরকারি দল গড়তে। তাঁকেও তো নিবার্চনে দাঁড়াতে হবে, একটা দলীয় টিকিট চাই। একেবারে নতুন দল গড়ার অনেক ঝামেলা, তাই তাঁর সহকারীরা পরামর্শ দিল পুরোনো মুসলিম লীগটাকেই কজা করে নেওয়া হোক। পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে মুসলিম লীগ নামটি অঙ্গাঙ্গী জড়িত। যদিও চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে দারুণভাবে হেরে গিয়ে সেই মুসলিম লীগ বর্তমানে একেবারে ধরাশায়ী। তবুও, ধর্মীয় উন্মাদনা জাগাবার প্রয়োজন হলে ঐ নামটি কাজে লাগানো যাবে। তাই আইয়ুব ঐ দলের একটি অংশ দখল করে নিয়ে তার নতুন নাম দিলেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ।

পূর্ব পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই বারবার উত্তাল হয়ে উঠে সরকার কাঁপিয়ে দিয়েছে, এবারে তারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। গভর্নর মোনেম খাঁ গোপন পথে প্রচুর টাকা খরচ করে ও দালাল লাগিয়ে ছাত্রদের মধ্যেও নতুন একটি সরকারি পার্টি তৈরি করালেন। এর নাম ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশান। এই পার্টির ছেলেরা ফেল করলেও পাস করে যাবে, এরা কোনো সহপাঠীর পেটে ছুরি বসালেও এদের কোনো শাস্তি হবে না, কোন্ হস্টেলে কোন্ ছাত্রেরা জায়গা পাবে তা এরাই ঠিক করবে, অধ্যাপকরা এদের হুকুম শুনতে বাধ্য, কবে কবে স্কুল-কলেজ খোলা থাকবে বা বন্ধ হবে, তাও এরাই বলে দেবে। যে ছাত্র অতি উত্তম সরকার-ভক্তি দেখাবে সে এক হাজার টাকা পর্যন্ত জলপানি পাবে। সুতরাং এই নতুন ছাত্র পার্টিতে সদস্য কম হলো না।

জেল থেকে বেরিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন সোহরাওয়ার্দি এক নতুন চাল চাললেন আইয়ুবের ওপর। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, শরীর অশক্ত, তবু মনোবল প্রচণ্ড। আইয়ুব রাজনৈতিক দলগুলিকে পুনর্জীবন দিতে আগ্রহী। সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব দিলেন,কোনো রাজনৈতিক দলেরই আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন নেই।

আওয়ামি লীগ থেকে মৌলানা ভাসানী তাঁর দলবল সমেত বেরিয়ে গিয়ে ন্যাপ নামে পার্টি গঠন করায় আওয়ামি লীগ দুর্বল হয়ে গেছে। বস্তুত ন্যাপের জন্যই কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দি মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে এবং সামরিক শাসক আইয়ুবের ক্ষমতায় আসার পথ সুগম হয়েছে। এখন আওয়ামি লীগ একা আইয়ুবের শক্তির সঙ্গে যুঝতে পারবে না। মৌলানা ভাসানীর দলকেও বেশি শক্তিশালী হতে দেওয়া যায় না।

ভাসানীর দলও অবশ্য তেমন শক্তিশালী নেই, কারণ বামপন্থীদের মধ্যেও ভাঙন এসেছে। চীন ও ভারতের সীমান্ত সংঘর্ষ হঠাৎ যুদ্ধের রূপ নেবার পর সারা পৃথিবীতেই বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী চিন্তায় একটা রদবদল শুরু হয়ে যায়। প্রাক্তন ভারতবর্ষ ভেঙে দুটি রাষ্ট্র তৈরি হবার ফলে আমেরিকা গাঁটছড়া বাঁধে পাকিস্তানের সঙ্গে, আর ইণ্ডিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত দেশ ও চীনের গলায় গলায় বন্ধুত্ব। জোট-নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করলেও ভারতের মাথাটা হেলে থাকে সমাজবাদী ব্লকের দিকে। হিন্দী-চীনী ভাই ভাই রব আকাশে বাতাসে মুখরিত হয়েছে, চৌ-এন-লাই ভারতবর্ষে এসে নিজেও ঐ ধ্বনি তুলেছেন। তারপরে এক সময় হঠাৎ ম্যাকমোহন লাইনের ব্যাখ্যা নিয়ে একেবারে যুদ্ধ বেঁধে গেল, অপ্রস্তুত, হঠকারী ভারত মেনে নিল অসম্মানজনক পরাজয়। চীনা সৈন্য ভারতের অভ্যন্তরে অনেকখানি ঢুকে পড়ে যেন বলতে চাইলো, দ্যাখ তোদের গালে থাপ্পড় মারতে পারি কি না! তারপর সত্যি সত্যি থাপ্পড় না মেরে শুধু একটু চুন কালি মাখিয়ে সেই সৈন্যবাহিনী আবার স্বেচ্ছায় ফিরে গেল নিজেদের নির্ধারিত সীমান্তের ওপারে।

শত্রুর যে শত্রু, সে আমার বন্ধু, এই প্রতিষ্ঠিত নীতিতে বিশ্বাস করে পাকিস্তান এই সময় মার্কিন বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে কুঁকলো চীনের দিকে। আমেরিকাও চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতকে

সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে, ভবিষ্যৎ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এখন সে ভারতকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করতে চায়। ওদিকে সোভিয়েত দেশ আর চীনের মধ্যে আদর্শগত ফাটল ধরেছে, তাই চীন-ভারত যুদ্ধে সোভিয়েত দেশ ভারতের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেনি। ভারতের এখন বেশ আদুরে ছেলের মতন অবস্থা, আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই মহাশক্তির কাছ থেকেই গরম গরম উপহার পাচ্ছে। সুতরাং চীন এই অবস্থায় পাকিস্তানের বন্ধুত্বের হাতকে স্বাগত জানালো। থাক না পাকিস্তানে স্বৈরাচারী সামরিক শাসন, তবু চীনের একটা বন্ধু তো চাই। তা ছাড়া, চীনের এখন বাসনা পাকিস্তানের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

পাকিস্তান সরকার ও চীনের বন্ধুত্বের সূচনায় পাকিস্তানের উগ্র বামপন্থীরা উল্লসিত হলো। তারা চীনের সমর্থক, এতকাল তারা পাকিস্তানের সামরিক শাসনের তীব্র বিরোধিতা করলেও এখন তারা হয়ে পড়লো সরকার সমর্থক। চীনের সঙ্গে যার ভাব, সে তো চীনাপন্থীদের শত্রু হতে পারে না। এই সব বামপন্থীরা মৌলানা ভাসানীর ন্যাপের ছত্রছায়াতেই সমবেত হয়েছিল, এবারে তাদের মধ্যেও দেখা দিল দুটি ভাগ।

কোন একটি দল এককভাবে আইয়ুব খানের সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিততে পারবে না বলেই সোহরাওয়ার্দি সব দলের পৃথক অস্তিত্ব বিলোপ করে যুক্তফ্রন্ট গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। অনেক দল থাকলেই অনেক নেতা। একটি মাত্র দল হলে তার সর্বাধিনায়ক একজনই হবে, সেই সর্বাধিনায়ক তিনি ছাড়া আর কে? একথাও তো ঠিক, পাকিস্তানের দুই অংশেই তাঁর পরিচিতি সবচেয়ে বেশি, তিনি পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিতে কখনো খুব জোর দেননি বলে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের কাছেও তিনি গ্রহণযোগ্য। আইয়ুবের বদলে যদি কেন্দ্রের ক্ষমতার শিখরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আর কারুকে বসাতে হয়, তাহলে সোহরাওয়ার্দির চেয়ে যোগ্যতর আর কেউ নেই। পূর্ব পাকিস্তানের আর কোনো নেতাকে পশ্চিমীরা মানবে না।

এই যুক্তফ্রন্ট গড়ার প্রস্তাবে মৌলানা ভাসানী মন থেকে সায় দিতে পারলেন না। তিনি পোড়খাওয়া, অভিজ্ঞ রাজনীতিক, তিনি সোহরাওয়ার্দির আসল চালটা বুঝতে পেরেছেন। এটা তাঁকে ছাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দির অনেক উঁচুতে উঠে যাওয়ার প্রয়াস। কিন্তু সর্বদলের সমন্বয় ব্যাপারটা আদর্শ হিসেবে শুনতে খুব ভালো, চুয়ান্ন সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জিতেছিল, মাত্র ন' বছর আগেকার কথা, দেশবাসীর নিশ্চিত মনে আছে। এখন এই যুক্ত দল গঠনের বিরোধিতা করলে অনেকেই তাঁকে ক্ষুদ্র স্বার্থের কারবারি মনে করবে, তাই মৌলানা ভাসানী গররাজি হয়েও প্রস্তাবটি মেনে নিলেন।

আওয়ামী লীগকে পুনর্জীবিত না করে যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শেখ মুজিবর রহমানেরও মনঃপূত নয়। আওয়ামী লীগই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তাছাড়া যুক্তফ্রন্ট গড়তে গেলে নুরুল আমীন, নাজিমুদ্দিনের মতন মানুষদের সঙ্গেও হাত মেলাতে হয়। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময়ে এই নুরুল আমীনের আদেশেই ছাত্রদের ওপর গুলি চলেছিল। আর নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতার তো শেষ নেই। বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকলেও শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রস্তাব একেবারে নস্যাৎ করে দিতে পারলেন না, কারণ মৌলানা ভাসানী পৃথক দল গড়ার পরে সোহরাওয়ার্দিকেই তিনি লীডার বলে মানেন। তাছাড়া আওয়ামী লীগের আর প্রধান দুই নেতা আতাউর রহমান খান এবং আবুল মনসুর আহমদ, এঁরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে, এঁরা সোহরাওয়ার্দির নীতির প্রবল সমর্থক। ইত্তেফাকের সম্পাদক মানিক মিঞাও ঐ পক্ষে। শেখ মুজিবও নিমরাজি হলেন, গড়া হলো দলহীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। কিন্তু কাজের কাজ বিশেষ এগোল না, যখন তখন মতবিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মওলানা ভাসানী কাকে যেন বললেন, ঐডা হইল নাথিং ডুয়িং ফ্রন্ট!

এই দলের সমর্থনে পাকিস্তানের দু'দিকেই দিনের পর দিন প্রচার অভিযান চালাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন সোহরাওয়ার্দি। রাজশাহীতে সভা শেষ করেই রাত্রি দশটায় আত্রাই, সেখান থেকে গাড়িতে করে শান্তাহারে রাত একটায় মিটিং, তারপর ভোর চারটেয় আবার পার্বতীপুর। এর পর তিনি একটু বিশ্রাম নিতে গেলেন। বাইরে তখনও গোলমাল চলছে,

একজন কেউ হেঁকে বললো, ওহে, নেতা এই মাত্র শুয়েছেন, একটু ঘুমাতে দাও, তোমরাও ঘুমায়ে নাও! জানলার বাইরে থেকে একজন বললো, না আর ঘুমাবো না। একবার ঘুমায়েই সব হারিয়েছি। গণতন্ত্র ফিরায়ে না আনা পর্যন্ত ঘুমাবো না!

কথাটা শুনেই সোহরাওয়ার্দি উঠে পড়ে জানলা দিয়ে মুখ বার করে বললেন, ঠিক বলেছো। এই উঠে পড়লাম, আর ঘুমাবো না!

কিন্তু সোহরাওয়ার্দির বয়েস সত্তর পেরিয়ে গেছে। এতটা ধকল সইবে কেন। অসুস্থ হয়ে পড়ে তিনি চিকিৎসার জন্য কিছুদিনের জন্য চলে গেলেন বিদেশে। যাবার আগে তিনি তাঁর দলের সেক্রেটারিকে ডেকে বলে গেলেন, মাথা গরম করে কিছু করে বসো না। আমি ফিরে আসি, তারপর যদি অন্য কিছু করতে হয় তো ভেবে দেখা যাবে!

সোহরাওয়ার্দি আর ফিরলেন না। ডিসেম্বরের শীতে আচম্বিতে দুঃসংবাদ এলো, বেইরুতের এক হোটেলে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে।

সোহরাওয়ার্দির অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজনই থাকে করাচি ও লাহোরে, যারা অনেকে বাংলা বলতেই পারে না। সেই হিসেবে তিনি হয়তো পুরোপুরি বাঙালী ছিলেন না, যদিও বাংলার মাটির সঙ্গে তাঁর যোগ অবিচ্ছেদ্য। সোহরাওয়ার্দি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম স্রষ্টা। অবশ্য তিনি চেয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তান হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারা জীবন লড়াই করে গেলেন। পারিবারিক অধিকারে তাঁর আত্মীয়েরা চাইলো পশ্চিম পাকিস্তানেই তাঁকে দাফন করা হোক। কিন্তু ভালোবাসার দাবি অনেক বড়। সেই দাবিতে তাঁর লাশ আনা হলো ঢাকায়। এক বিশাল জনসমুদ্র চোখের জলের ধারায় তাঁর প্রাণশূন্য দেহকে অভ্যর্থনা জানালো বিমানবন্দরে। তারপর ‘ঘোড় দৌড় ময়দানে পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশে হলো তাঁর জানাজা।

তাঁর কবরের জায়গা নিয়ে হঠাৎ শুরু হয়ে গেল মতবিরোধ। কিছুদিন আগেই শের-এ বাংলা ফজলুল হকের দেহান্ত হয়েছে, তাঁর কবরের পাশেই সোহরাওয়ার্দির কবর থাকা সবদিক থেকেই সমীচীন। কিন্তু একজন আপত্তি তুললো, ফজলুল হকের সঙ্গে

সোহরাওয়ার্দির কোনোদিন মতের মিল হয়নি, তা হলে এখন দু'জনে কাছাকাছি থাকবেন কী করে? দু'জনের আত্মাই, যদি অশান্ত হয়ে ওঠে? শান্ত, গম্ভীর, শোকের পরিবেশ লোকজনের চ্যাঁচামেচিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে মুরুব্বিরা ঠিক করলেন, তাহলে কিছুটা দূরত্ব রাখা হোক। ফিতে দিয়ে মেপে ফজলুল হকের কবরের থেকে প্রায় একশো হাত দূরত্বে ভূগর্ভে নামিয়ে দেওয়া হলো সোহরাওয়ার্দির মরদেহ।

মৃত্যুর পরেও দুই নেতা যদি পাশাপাশি না থাকতে পারেন তাহলে জীবিত অবস্থায় অন্যান্য নেতারা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবেন কী করে? মরহুম সোহরাওয়ার্দির শোককাল কাটতে কাটতেই তাঁর স্বপ্নের যুক্ত দল ভাঙতে শুরু করে দিল। তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে বলেছিলেন, তিনি ফিরে না-আসা পর্যন্ত যেন আলাদা আলাদা ভাবে রাজনৈতিক দলগুলিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা না হয়। তিনি ফিরে না আসুন, তাঁর লাশ তো এসেছে। শেখ মুজিবুর রহমান তড়িঘড়ি নিজের বাসভবনে প্রাক্তন আওয়ামি লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডাকলেন। এবারে তিনি আতাউর রহমান বা আবুল মনসুরের প্রতিবাদ বা নির্লিপ্ততার তোয়াক্কা করলেন না, তাঁরা উপস্থিত না হলেও ক্ষতি নেই। প্রথমে সোহরাওয়ার্দির রুহের মাগফেরাত প্রার্থনা করা হলো। তারপরেই সোহরাওয়ার্দির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। যুক্ত দল থাকুক বা না থাকুক, আওয়ামি লীগকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ পৃথকভাবে চালানো হবে, কারণ একটি সুসংগঠিত দল ছাড়া কোনো আন্দোলন চালানো যায় না। তুমুল হর্ষধ্বনির ও জিন্দাবাদ পুকারে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। এবারে শেখ মুজিবুর রহমান হলেন আওয়ামি লীগের একচ্ছত্র নেতা।

মৌলানা ভাসানীও তক্কে তক্কে ছিলেন। তিনি যুক্তদল ভাঙার অপবাদের বোঝাটা পুরোপুরি নিজের কাঁধে নিতে চাননি। শেখ মুজিবকে তিনি ভালোভাবেই চেনেন, তিনি অপেক্ষা করছিলেন। আওয়ামি লীগ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার পরেই তিনি ন্যাপকে চাঙ্গা করে তুললেন।

এখন এঁরা নিজের নিজের পার্টিকে সংগঠিত করে তোলার কাজে ব্যস্ত। এখন খণ্ড প্রলয়ে বিপর্যস্ত মানুষের সাহায্য ও ত্রাণে এগিয়ে আসার সময় কোথায় তাঁদের? বছরখানেক

আগেই। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেছে। এরকম একতরফা, নৃশংস দাঙ্গা পাকিস্তানেও আগে কখনো হয়নি, সেই সময় বড় বড় নেতারা শান্তি কমিটি গড়েছেন, রিলিফের ব্যবস্থা করেছেন যথাসাধ্য। প্রত্যেক বছর এরকম কী করে করা যায়? মানুষ তো মরবেই, এদেশে অকাল মৃত্যুই অধিকাংশ মানুষের নিয়তি।

অবশ্য, বেশি উদারতা দেখিয়ে আইয়ুব যদি হঠাৎ জনপ্রিয়তা আদায় করে ফেলেন তবে তা রোখার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেদিকেও রাজনৈতিক নেতারা চোখ রেখেছেন। এ বছর না হোক, তার পরের বছর, কিংবা তারও পরের বছর নির্বাচন তো হবেই, তখন এই সব প্রশ্ন উঠবে। তাই একটি-দুটি রিলিফের জন্য মিছিল বেরুতে লাগলো রাস্তায়।

আলতাফ অনেকদিন দেশছাড়া, সে অনেক কিছুই জানে না। সকালবেলা বাবুল তার বড় ভাইকে এই সব বৃত্তান্ত শোনাচ্ছিল।

আওয়ামি লীগ ভেঙে ন্যাপ গড়ার সময় যে হাঙ্গামা হয় তাতে গ্রেফতার হয়েছিল আলতাফ। ছাড়া পেয়েছিল অবশ্য আড়াই মাসের মধ্যেই। কিন্তু জেলের জীবন আলতাফের একেবারেই সহ্য হয়নি। সে কাপুরুষ নয় মোটেই, কিন্তু আরাম পরায়ণ। সে সারাদিন যুদ্ধ করতে রাজি আছে, যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতেও সে পিছু-পা নয়, তবে বেঁচে থাকলে সে সন্ধেবেলা ভালো সিগারেট টানতে চায়, রাত্তিরে সে নরম বিছানায় ঘুমোত চায়। জেলের খাবার খেয়ে সে রক্ত-আমাশায় প্রায় মরতে বসেছিল। সুতরাং আটান্ন সালে যখন আইয়ুব সামরিক শাসন জারি করেন তখনই সে আবার গ্রেফতার হবার ভয়ে দেশত্যাগী হয়। সবচেয়ে সহজ পালিয়ে যাবার জায়গা হলো পশ্চিম জার্মানি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সে দেশের শুধু বয়স্ক পুরুষরাই নয়, কিশোররা পর্যন্ত নিহত হয়েছে অসংখ্য, তাই এখন জার্মানিতে মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা ঢের কম। কাজের লোকের খুব অভাব। আলতাফের মতন একজন সুস্বাস্থ্যবান যুবককে পেলে তারা যে লুফে নেবে এ তো জানা কথা। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আলতাফের মতন হাজারে হাজারে যুবক কাজের সন্ধানে ছুটে গেছে জার্মানিতে।

এই ক'বছরে বেশ পরিবর্তন হয়েছে আলতাফের। আগে সে ছিল দারুণ ছটফটে, যখন তখন হেসে উঠতো খুব জোরে। তার কথাবার্তায় এমন একটা জেদী ভাব ছিল যে এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত সে আর অন্য কিছু চিন্তা করতে চায় না। এখন সে অনেক শান্ত হয়েছে, অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে সে এখন বেশি মগ্ন। তার চেহারাও আগের মতন সুন্দর নেই, কোমরটি স্ফীত হয়েছে অনেকখানি, জার্মান গোরুর উত্তম মাংস ও অঢেল বীয়ার তাকে উপহার দিয়েছে মেদ।

আলতাফ ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলো, তুই এখন কোন্ পার্টি করস? এখনও মুজাফফর সাহেবের সাথে লেগে আছিস নাকি?

বাবুল দু হাত তুলে লঘু কণ্ঠে বললো, আমি এখন আর কোনো পাট্টি পুটির মধ্যে নাই। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা! বিয়ে করেছি, একটা বাচ্ছা হয়েছে।

আলতাফ বললো, হ্যাঁ, তোর এখন কিছুদিন মন দিয়ে সংসার ধর্ম পালন করাই উচিত। মঞ্জু তো এখনো ভালো করে সামলায়ে উঠতে পারে নাই। সেদিন যখন এলি মেয়েটার মুখের অবস্থা দেখে আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম। বড় বাঁচা বেঁচে গেছিস! খোকাটার যে কিছু হয় নাই।

-মঞ্জুর খুব মনের জোর। দেখতে নরম সরম হইলে কী হয়।

-কত টাকার গয়না ছিল সঙ্গে?

-ও কথা বাদ দাও। যা গেছে তা তো গেছেই। আমার বিবিও তা নিয়ে কান্নাকাটি করেনি। সব গয়নার চেয়েও ছেলেটার জীবনের দাম বেশি।

-বাবুল, তুই কি ঐ গ্রামের কলেজেই মাস্টারি করবি নাকি?

–তা ছাড়া আর কী করি! শহরে থাকলেই বিপদ, পুরানো বন্ধুরা টানাটানি করবে। মঞ্জুও ঢাকায় থাকতে চায় না।

–তুই জার্মানিতে চলে আয়। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। তুই ভালো কাজ পেয়ে যাবি।

প্রস্তাবটা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে, হেসে উঠে বাবুল বললো, আমি বিদেশে যাবো? কী যে বলো? আমি হইলাম অকর্মার চেঁকি। ছেলে-পড়ানো ছাড়া আর কিছুই পারি না। বিদেশে সব সময় জুতা-মুজা পরে থাকতে হয়, মুজা পরলেই আমার পায়ে ফোস্কা পড়ে।

আলতাফ তার কাঁধে চাপড় মেরে বললো, আরে দূর, কী পোলাপানের মতন কথা বলিস। ওসব অভ্যাস হয়ে যায়। শোন, বিদেশে গেলে চক্ষু খুলে যায় অনেকখানি। বিদেশে থেকে দেশের কাজ করা যায় ভালো করে। আমি তো সেখানে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছি, এখান থেকে পাটের ব্যাগ নিয়ে যাবো, এখানকার লোকেরা ভালো পয়সা পাবে...।

বাবুল বললো, ব্যবসা? ওরে বাপ রে, ওসব আমার মাথাতেই ঢোকে না! ভাইয়া, আমার পক্ষে মাস্টারিই ভালো!

আলতাফ ঈষৎ ধিক্কারের সুরে বললো, ব্যবসা ছাড়া বাঙ্গালীর উন্নতির আর কোনো পথ নাই! বাঙ্গালী শুধু পলিটিক্স আর মাস্টারি করতেই জানে। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা সব ব্যবসা কজা করে নিয়ে আমাগো পোঙা মেরে দিচ্ছে। আমি তোরে কই, শুনে রাখ বাবুল, এখন ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়াই হবে তোর আমার মতন বাঙালীর বেস্ট পলিটিক্স।

একটা রিলিফের মিছিল ওদের বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। দুর্গতদের জন্য চাঁদা ও পুরোনো কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করা হচ্ছে। দুই ভাই কথা থামিয়ে এগিয়ে গেল দরজার কাছে।

টাকা-পয়সার ব্যাপারে আলতাফ বরাবরই উদার। এখন বিদেশে থেকে তার অবস্থা অনেক সচ্ছল হয়েছে। কুতার পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে গুনে গুনে তিনশো

টাকা বার করে, তার থেকে আবার একশো টাকা কমিয়ে দুশো টাকা দিয়ে দিল রিলিফ ফাণ্ডে।

ওপর তলায় একটি শিশুকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো বাবুল। তার ছেলে কাঁদছে। মঞ্জু কি কাছে নেই? সে দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। তার ছেলে তো এমন তীব্রভাবে চেঁচিয়ে কাঁদে না!

দূরে কোথায় দশ-বিশ হাজার লোক মরেছে তার থেকেও নিজের সন্তানের বিপদ-আপদের চিন্তা অনেক বড় হয়ে ওঠে। বাবুল এখন দেশের অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। রাজনীতিতে ঢুকতে চায় না, সে চায় মঞ্জুকে নিয়ে, তার সন্তানকে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকতে। মঞ্জু যদি দুঃখ পায়, মঞ্জু যদি কাঁদে তা হলে গোটা দুনিয়াটাই বাবুলের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। সে মঞ্জুকে সুখী করবে, সে তার সন্তানকে দুধে-ভাতে রাখবে। পৃথিবীর এখন তার সংসারের বাইরে অপেক্ষা করুক।

৬ খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছেন প্রতাপ

অনেকক্ষণ ধরে খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছেন প্রতাপ। কিংবা পড়া শেষ হয়ে গেছে, তবু চেয়ে আছেন কাগজের দিকে। আনন্দবাজারে ব্যানার হেড লাইন : পূর্ব পাকিস্তানে খণ্ড প্রলয়। তার নিচে গোটা গোটা অক্ষরে বিভিন্ন জেলায় মৃত্যু ও ক্ষয়-ক্ষতির বর্ণনা। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, খুলনা এই সব নামগুলি শুনলে বা ছাপার অক্ষরে দেখলে প্রতাপের মনে এখনও রোমাঞ্চ জাগে, ছবি ভেসে ওঠে। কতদিন হয়ে গেল, প্রায় বছর পনেরো, তবু ছবিগুলি মোছে না, বরং যেন গাঢ়তর হয়ে উঠছে দিন দিন।

তাঁর ছেলে মেয়েদের মনে এই সব নাম একটুও দাগ কাটে না। বাবলু, মুন্নিরাও সকালে কাগজ পড়েছে, এ বিষয়ে একটা কথাও বলেনি, তুতুলের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। অবশ্য ওরা কতটুকুই বা দেখেছে নিজের দেশ, ওদের কিছুই মনে থাকবার কথা নয়। ওদের তুলনায় পিকলু বরং বেশি দেখেছিল, এস প্রায়ই বলতো...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতাপ জানলার দিকে তাকালেন। অসহ্য গ্রীষ্মের দুপুর, তবু রাস্তায় লোক চলাচলের বিরাম নেই। রাত্তিরে ঘণ্টা তিন চার বাদ দিলে এ শহরের রাস্তায় সব সময়ই মানুষ। জানলার পদাটা গুটিয়ে গেছে এক পাশে, বাইরের লোক ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে যাচ্ছে। পদাটা ঠিক করে দেবার জন্য প্রতাপ উঠলেন, চেয়ার ছেড়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। জানলার কাছে।

সকালে তিনি কালীঘাট বাজারে গিয়েছিলেন, কয়েকজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলো, কই কেউ তো একবারও বললো না ঝড়ের কথা? সব কাগজেই আজ এটাই প্রধান খবর। সবাই ভুলে যাচ্ছে? পনেরো-ষোলো বছর আগে হলে কলকতায় একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যেত, অনেকেই শিয়ালদায় ছুটতো দেশের বাড়ি ঘর ও আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নেবার জন্য। একটা রাজনৈতিক সীমারেখা টানায় এতখানি মানবিক তফাৎ হয়ে গেল? বাংলার ওপাশে হাজার হাজার মানুষ মরলেও এপাশে আমরা নির্বিকার থাকবো, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার একটুও পরিবর্তন হবে না? ওদিকের ওরাও কি এ পাশের বাঙালীদের জন্য মাথা ঘামায় না?

গেরুয়া আলখাল্লা পরা একটি সাধু প্রতাপকে দেখে থমকে দাঁড়ালো, শিরা ওঠা হাত তুলে বললে, জয় হোক বাবা!

লোকটির মাথায় একটি বেশ দর্শনীয় জট। তৈরি হতে অনেকদিন সময় লেগেছে। প্রতাপ বললেন, নমস্কার!

সাধু গম্ভীর ভাবে বললো, তুমি যা নিয়ে চিন্তা করছে, তার সমাধান হয়ে যাবে। একটু সময় লাগবে, এক মাস কি দেড়মাস। শুধু শুধু চিন্তা করে শরীর খারাপ করো না। দ্যাখো, কালস্রোত কারুর জন্য থেমে থাকে না।

প্রতাপ হাসলেন। লোকটি বয়েসে হয়তো তার চেয়ে ছোটই হবে, বড় জোর সমবয়েসী, গায়ে একটা আলখাল্লা চাপিয়েই সে প্রতাপকে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করার অধিকার পেয়ে গেছে?

প্রতাপ মোটামুটি ভদ্রভাবেই বললেন, আপনি অযাচিত ভাবে আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। আমি আপনাকে কোনো পয়সা দেবো না।

সাধুটি বললো, আমি তো বাবা পয়সার জন্য তোমাকে দেখে থামিনি। তোমার কপালে একটা অমঙ্গল চিহ্ন দেখলাম...

-সে জন্য শান্তি-স্বঘন করা দরকার? কিংবা আপনি তাবিজ বা মাদুলি বেচবেন?

-না, না, সেসব কিছু না। আমি মানুষের মঙ্গলের জন্য একটা মহাযজ্ঞ করবো, তুমি যদি খানিকটা ঘি দাও, তোমার পুণ্য হবে। কুগ্রহ কেটে যাবে।

প্রতাপ হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার করে বললেন, তুমি দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। যত সব আপদ! সমাজের পরগাছা! সরে যাও এখান থেকে! নইলে

সেই চিৎকার শুনে মমতা ছুটে এলেন পাশের ঘর থেকে।

ধমক খেয়ে সাধুটি দমবার পাত্র নয়। সে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলে যাচ্ছে। মমতাকে দেখে বলে উঠলো, মা আমি মানুষের ভালো ছাড়া মন্দ করি না। দেখলাম কপালে অমঙ্গল চিহ্ন।

প্রতাপ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মমতা জোর করে টেনে আনলেন তাঁকে। তারপর জানলা বন্ধ করে দিলেন।

রাগের চোটে প্রতাপ হাঁপাচ্ছেন। তখনও বলে চলেছেন, এত সাহস, আমাকে ভয় দেখিয়ে ঘি আদায় করতে চায়? লোকে খাবার পাতে ঘি পায় না, আর ওর যজ্ঞের জন্য

মমতা বললেন, তা বলে এ রকম মাথা গরম করতে হবে। তোমার নিশ্চয়ই প্রেসার আবার বেড়েছে।

–না, আমার প্রেসার ঠিক আছে। এ রকম অন্যায় কথা শুনলে কার না রক্ত গরম হয়ে যায়?

–মাপ করুন, আমরা কিছু দেবো না, বলে জানলা বন্ধ করে দিলেই হতো!

–কেন এই গরমের মধ্যে জানলা বন্ধ করবো। তুমি জানলা খুলে দাও!

করপোরেশনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে উনিও যা খুশী বলতে পারেন, তা তুমি আটকাতে পারো না।

–না, লোকের বাড়ির জানলার দিকে তাকিয়ে যা খুশী বলার অধিকার কারুর নেই। এ জন্য প্রসিকিউট করা যায়।

–একটা কথা সত্যি করে বললো তো! আসলে কার ওপরে তোমার রাগ হয়েছে? বরাবর দেখেছি, একজনের ওপরে রাগ হলে তুমি অন্য কারুর ওপরে চোটপাট করো।

–ওর কথা শুনেই আমার মাথা গরম হয়ে গেল!

মমতা নরম করে হাসলেন। তারপর প্রতাপের চোখে চোখ রেখে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, উহুঃ! আজকাল তুমি সব সময়ই রেগে থাকো। আজ কার ওপর রাগ হয়েছে, আমার ওপর!

প্রতাপ সংযত হয়ে বললেন, না, তোমার ওপর রাগ করবো কেন?

পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ভরে তিনি সিগারেটের প্যাকেট-দেশলাই বার করলেন। দেশলাই-এর কাঠি রয়েছে মাত্র একটি, সেটাও জ্বালতে গিয়ে ভেঙে গেল। মুখ তুলে তিনি বললেন, মমো, একটা দেশলাই এনে দেবে?

মমতা বললেন, তুমি ওঘরে চলো না। তুমি কি বাইরের ঘরেই বসে থাকবে নাকি সারা দুপুর?

এই ঘরখানায় পিকলুর থাকার কথা ছিল। কালীঘাটে বাড়ি দেখার সময় পিকলু নিজে পছন্দ করে এই ঘরখানা চেয়েছিল। সে অবশ্য এখানে এক রাত্রিও বাস করে যেতে পারেনি। এখন এটাকে বাইরের ঘর বা বৈঠকখানা করা হয়েছে। কিছুদিন এঘরের দেয়ালে পিকলুর একটা ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, প্রতাপ নিজেই একদিন ছবিটা খুলে নিয়েছেন।

তুতুল আর মুন্নি একঘরে থাকে, ওদের ঘরে রেডিওতে কী যেন একটা নাটক হচ্ছে। বাবলু বাড়ি নেই, পরীক্ষা হয়ে গেছে এখন খাওয়া আর ঘুমোবার সময় ছাড়া তাকে এক মিনিটও বাড়িতে দেখা যায় না। অবশ্য দু'বেলা সে দুটি টিউশানিও করে।

শোওয়ার ঘরে এসে একটা সিগারেট টানতে টানতে প্রতাপের মনটা আবার উধাও হয়ে গেল।... চোখের পাতায় এলো তন্দ্রা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া...পটুয়াখালি...দায়ুদকান্দি...এইসব জায়গাগুলি যেন ধু ধু জলময়, একটাও মানুষ নেই, ফিনফিনে বাতাস বইছে জলের ওপর দিয়ে...সব বাড়ি-ঘরই কি তুফানে উড়ে গেছে। ঢাকা জেলার কিছু হয়েছে কি না কাগজে লেখেনি... মালখানগরে প্রতাপদের বাড়িটা ছিল বেশ উঁচুতে, কোনোদিন উঠোন পর্যন্ত জল আসতো না...পটুয়াখালিতে ছিল প্রতাপের মামাবাড়ি...বাবা মায়ের সঙ্গে সেখানে যাওয়ার স্মৃতি...বরিশাল শহরে একটা হোটেলে ভাত খাওয়া, তারপর নৌকোয় পটুয়াখালির দিকে.কী সুন্দর জায়গা পটুয়াখালি-মানুষজনের ব্যবহার কত আন্তরিক...আবু তালেব নামে একজন ইস্কুল মাস্টার বাবাকে কত খাতির করলেন...সেই পটুয়াখালি কি ঝড়বৃষ্টিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? প্রতাপের ইচ্ছে হলো এক্ষুনি একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসতে...

-কী ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? আঙুল পুড়ে যাবে যে!

মমতার হাতে একটা লম্বা কাঁচের গ্লাস ভর্তি ঘোলাটে পানীয়। প্রতাপ সিগরেটের শেষ অংশটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে বললেন, ওটা কী?

মমতা বললেন, মিছরি দিয়ে আম পোড়ার সরবৎ, দ্যাখো তো কেমন হয়েছে?

প্রতাপ গেলাসটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আজ এত খাতির যে?

–এমনি আজ বানাতে ইচ্ছে হলো। যা গরম পড়েছে ক'দিন!

প্রতাপ এক চুমুক দিয়ে বললেন, মিষ্টির বদলে নোনতা হলে বেশি ভালো লাগতো। কাঁচা আমের সঙ্গে মিষ্টিটা ঠিক যায় না।

–মিছরি দিয়ে খেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। এক চুমুকে খেয়ে নাও!

–এই গরমে আমরা কাঁচা আম মাখা খেতাম। আমপোড়া সরবতের চল ছিল না আমাদের ওদিকে। কাঁচা আম মাখা হতো কী করে জানো? আমের খোসা ছোলা হতো ঝিনুক দিয়ে। ঐ ঝিনুক পাওয়া যেত আমাদের পুকুরেই। ঝিনুকের খোলার মাঝখানটা ঘষে নিলে যে ফুটো হতো, সেটা দারুণ ধার। সেই ঝিনুক দিয়ে আমের চোকলা ছাড়িয়ে সরু সরু করে কেটে নুন মেখে রাখা হতো খানিকক্ষণ। তারপর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মেখে...এই দ্যাখো, দ্যাখো, বলতে বলতে এখনো আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে!

–আচ্ছা, ঐ রকম আম মাখা করে দেবো একদিন। ঝিনুক দিয়ে হবে না, বঁটি দিয়ে...

–সে আম মাখা তো আমরা বাড়িতে বসে খেতাম না। বাগানে, গাছের ছায়ায় বসে।

–এখন ঐ রকম আম মাখা খেতে গেলে তোমার দাঁত টকে যাবে!

–কী জানি! আমাদের ছেলে মেয়েরা কেউ ঐ সব স্বাদই পেল না। ওরা কেউ কাঁচা আম খায় না, না?

–গ্রামের খাবার আর শহরের খাবার কি এক হয়? ওরা তো ঝড়ের সময় গাছ থেকে টপ টপ করে আম খসে পড়তে দেখেনি!

–তুমিও তো দ্যাখোনি, মমো? তুমি আর কতদিনই বা ওদিকে ছিলে! আজ কাগজে দেখেছো, ঝড় বৃষ্টিতে কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়েছে। ওদিকে?

–দেখলাম তো! কাল রেডিওতেও বলেছে। আহারে, কত মানুষের সংসার তছনছ হয়ে গেল। আচ্ছা, এখান থেকে যদি কেউ সাহায্য করার জন্য জিনিসপত্তর নিয়ে ওদিকে যেতে চায় এখন, ওরা কি যেতে দেবে?

–থাক, ওসব কথা!

–শোনো, একটা কথা বলবো? তুমি কিছুদিনের জন্য বাইরে কোনো জায়গা থেকে ঘুরে এসো। চার পাঁচ বছর কোথাও যাওয়া হয়নি। তুমি সব সময় গম্ভীর গম্ভীর হয়ে থাকো, যখন তখন রেগে ওঠো, আমার এটা ভালো লাগে না। তোমার একটু চেইঞ্জ দরকার।

–আগে প্রত্যেক বছর সবাইকে নিয়ে বাইরে যেতাম একবার করে।

–সবাইকে নিয়ে যেতে অনেক খরচ। তুমি একা ঘুরে এসো। দেওঘরে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসবে? অবশ্য ওখানে যা গরম এখন!

–কাল ওস্তাদজীর চিঠি এসেছে, তুমি পড়েছো?

–হ্যাঁ পড়লুম তো। লিখেছেন তো সবাই খুব ভালো আছেন। মা রোজ মোহনানন্দ মহারাজের আশ্রমে ভজন গান শুনতে যাচ্ছেন। রোজ বাড়ি থেকে বেরোন যখন, তার মানে শরীর ভালো আছে। ওস্তাদজীও নাকি এই শীতে বাড়ির বাগানে পেঁয়াজকলির চাষ করেছিলেন, অনেক লাভ হয়েছে, এবারে কাঁচা লঙ্কার চাষ করবেন। ঐ শরীর নিয়ে এসব করা কী ভালো? তবে আমার মনে হয়, ওনার টি বি হয়নি। তুমি কী বলো।

–কী জানি!

–ব্রঙ্কাইটিস হলেও কশির সঙ্গে রক্ত পড়তে পারে। টি বি-তে কি এতদিন...তবে ঐ শরীর নিয়ে বাগানের কাজ টাজ করা কি ঠিক হচ্ছে?

–নিজের ভালো উনি কি নিজে বুঝবেন না? ঐ নিয়েই আনন্দে আছেন যখন।

–মাকে কিছুদিন কলকতায় নিয়ে এসে রাখবে।

–লিখেছিলাম তো, মা আসতে চাননি।

–তুমি বরং একটু পুরীতে ঘুরে এসো। কিংবা, দীঘায় নাকি আজকাল থাকার জায়গা হয়েছে। অনেকেই যাচ্ছে।

–হঠাৎ ওসব জায়গায় যেতে যাবো কেন একলা একলা? তোমার বুঝি যেতে ইচ্ছে হয়েছে?

–না! আমি গেলে বাড়িসুষ্ঠু সবাইকেই নিয়ে যেতে হয়!

মমতা কাছে এসে প্রতাপের চুলের মধ্যে হাত রেখে বললেন, তুমি এবারে একটু ঘুমিয়ে নাও। ছুটির দিনে একটু বিশ্রাম নিলে...।

দরজাটা ভেজানো। এখন হঠাৎ কেউ এঘরে ঢুকবে না। মুন্নি বড় হয়ে গেছে, সেও এখন দরজা ভোজানো দেখলে বাইরে থেকে মা বলে ডাকে।

প্রতাপ মমতার কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে গাঢ় স্বরে বললেন, মমো!

মমতা অমনি কান্নায় ভেঙে পড়ে লুটিয়ে পড়লেন প্রতাপের বুকে।

পিকলুর মৃত্যুর পর মমতাই সব চেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছিলেন। হয়তো কার্যকারণের কোনো সম্পর্ক নেই, সেই সময়েই মমতা সাঙ্ঘাতিক বিকোলাই রোগে আক্রান্ত হয়ে

শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন প্রায় এক বছর। তাঁর চিকিৎসার জন্য জলের মতন টাকা খরচ হয়েছে, ভাঙতে হয়েছে মমতার অনেকগুলি গয়না।

পিকলু প্রতাপের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, কিন্তু প্রতাপ তেমন ভাবে ভাঙেননি। একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা,তবে এ জন্য তো কারুকে দায়ী করা যায় না! সে যদি রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়তো, তা হলেও গাড়ির চালককে দোষ দেওয়া যেতে পারতো, কিন্তু গঙ্গানদীর নামে তো অভিযোগ আনা যায় না।

মমতা অবশ্য শোকের তীব্রতার প্রথম দিকে বাবলুর নামে দোষারোপ করেছিলেন। এমনকি একদিন মমতা বাবলুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথা দেয়ালে ঠুকে দিতে দিতে পাগলাটে গলায় বলেছিলেন, শয়তান, এই ছেলেটা শয়তন, এর জন্যেই আমার পিকলু চলে গেল! মা গঙ্গা তোকে নিল না কেন, তোকে নিলে আমি বাঁচতাম!

মায়েরাই ঝোঁকের মাথায় এ রকম কথা বলতে পারে। মায়ের অভিশাপ সন্তানের গায়ে লাগে না। ঐ রকম বলার কিছু পরেই মমতা আবার বাবলুকে এত আদর করেছিলেন, এত আদিখ্যেতা করেছিলেন তাকে নিয়ে যে বাবলু অস্বস্তিতে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই রাত্রেই প্রতাপ দেখেছিলেন, বাবলু তার মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলছে!

প্রতাপ অবশ্য কোনোদিন বাবলুর ওপর দোষারোপ করেননি। দুরন্ত ছেলে বাবলু, সে সাঁতার জানে না, তবু জলে নেমেছিল। পিকলু মোটামুটি সাঁতার জানতো, সে ভাইকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল, কিন্তু একটা বয়ায় মাথায় ধাক্কা লেগে তার প্রাণটা চলে যায়। কী বলা যাবে একে। নিয়তি ছাড়া? যা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাই-ই নিয়তি বলে চালানো যায়।

সেই শোক প্রতাপ আর মমতাকে অনেক কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। পিকলুকে অনেকেই ভালোবাসতো, অনেকেই খুব আঘাত পেয়েছে, কিন্তু এই শোক যেন প্রতাপ আর মমতার মধ্যে একটা অদৃশ্য সেতু নির্মাণ করে দিয়েছে। তা এতই ব্যক্তিগত যে অন্য কেউ বুঝবে

না। মুখে কিছু বলার দরকার নেই, অনেক লোকের মাঝখানে হয়তো অন্য কথাবার্তা চলছে, শুধু প্রতাপ বা মমতা পরস্পরের দিকে একবার তাকালেই শুধু ঐ দু'জনই জানবেন যে তাঁদের বুকের মধ্যে হু-হুঁ কান্না, এবং দু'জনেই দু'জনকে নিঃশব্দে বলছেন, শান্ত হও, শান্ত হও!

প্রতাপের জীবন ধারা বদলে গেছে অনেকটা। আগে তিনি আদালত থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সুলেখা-ত্রিদিবদের সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা করতেন। এখন প্রতিদিন সোজা বাড়ি ফিরে আসেন। বুলার কথা আগে যখন তখন মনে পড়তো, বুলার জন্য এমন এক গোপন জ্বালা অনুভব করতেন যা মমতাকে বলা যায় না। এখনো বুলার কথা চকিতে দু'একবার মনে পড়ে বটে, কিন্তু বুলার মুখটা তিনি আর মনে করতে পারেন না। বহুকাল আগে দেখা বুলার। জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমার মুখ মনে আছে, এমনকি বুলার দেওর ঐ দুশ্চরিত্র সত্যেনটার মুখও তিনি স্পষ্ট দেখতে পান, অথচ বুলার মুখ ঝাঁপসা হয়ে গেছে। পিকলুর মৃত্যুর সঙ্গে বুলার মুখ। অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার যে কী সম্পর্ক কে জানে!

অনেকদিন বাদে প্রতাপ মমতার কান্না ভেজা মুখোনি তুলে তাঁর ওষ্ঠে চুম্বন করলেন।

শরীরের গুপ্ত আগুন যে কখন দপ করে জ্বলে ওঠে তার ঠিক নেই। মমতা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে এলেন। মধ্যবয়স্ক গৃহস্থের মতন দুপুরবেলার শয্যায় নিয়ম মাফিক আধো-উত্তাপময় মিলনের বদলে প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে মমতাকে পাঁজকোলা করে কোলে তুলে নিলেন। তিনি দীর্ঘকায় শক্তিশালী পুরুষ, সেই তুলনায় মমতা কোমল, হালকা। মমতাকে নিয়ে দোলাতে দোলাতে প্রতাপ বললেন, মমো, তোমার মনে আছে, সেই যুদ্ধের সময়, কলকতায় যখন বোমা পড়ে?

মমতা কৃত্রিম ত্রাসে বললেন, আরে আরে, ছাড়ো, ছাড়ো।

–আগে বলো, তোমার মনে আছে কি না?

–না, মনে নেই। কী হয়েছিল সে সময়ে!

–সত্যি, তোমার মনে নেই?

–তুমি বলো!

–আমরা সেই সময় উত্তর কলকতায় নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে থাকতুম। সাইরেন বাজলো, এরকম তো প্রায়ই বাজতো, কিন্তু জাপানীরা সত্যিই কলকাতায় বোমা ফেলবে কেউ তো ভাবেনি। সেদিন কিন্তু সত্যিই বোমা পড়লো। খিদিরপুরে, হাতিবাগানে...আমাদের বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা দুম দুম করে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলো, আমাদের একতলায় থাকার জন্য বলতে এসেছিল, কিন্তু আমরা দরজা খুলতে পারিনি...তখন আমরা কী করছিলুম?

–জানি না যাও!

–উই ওয়্যার মেকিং লাভ! যুদ্ধ-টুদ্ধ, বোমা- টোমা কিছু আসে যায় না, আমরা তখন...

–এই ছাড়ো, ছাড়ো, প্লীজ।

–তারপর আর একবার, সেটা ফর্টি সিক্স না ফটি সেভেন আমরা স্টিমারে যাচ্ছিলাম ঢাকা– তখনও তো আমি অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে, আমরা ক্যাবিন প্যাসেঞ্জার ছিলাম, কিন্তু আরও একটা লোক ছিল সেই ক্যাবিনে, সে ব্যাটা কিছুতেই বাইরে যায় না, কত রকম ইঙ্গিত করি, সে আবার তোমার দিকে হ্যাংলার মতন তাকাচ্ছিল, তারপর মাদারিপুরে সে ইলিশমাছের নৌকো দেখতে যেই একবার বাইরে গেল অমনি আমরা দরজার ছিটকিনি তুলে দিলাম।

–তুমি লোকটার সঙ্গে বড্ড খারাপ ব্যবহার করেছিলে।

–মনে আছে, মনে আছে!

মমতার শরীরের চামড়া ফেটে ফেটে বেরিয়ে আসছে আগুন। প্রতাপ তাঁকে এবার খাটে শুইয়ে দিয়ে বললেন, কতদিন হয়ে গেল। মমো, আমি তোমাকে এখনো ঠিক সেই রকম ভালোবাসি। আমি তোমাকে এখনো সেইভাবে চাই!

তফাত শুধু এই যে প্রতাপ যে সময়ের কথা বলছেন, তখন প্রতাপ নিজে খুলে দিতেন মমতার শাড়ি। অতিরিক্ত ব্রীড়ায় মমতা নিজের ব্লাউজও খুলতে চাইতেন না। এখন বহু ব্যবহারে ওসব রোমাঞ্চ চলে গেছে। মমতা নিজেই পটপট করে ব্লাউজের ক্লিপ খুললেন। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন নিজের বুকের দিকে। তাঁর স্তন দুটি এখনও পীনোন্নত বলা যায়। চোখ তুলে দেখলেন। প্রতাপও চেয়ে আছেন তাঁর চোখে চোখ মিলিয়ে। শাড়িটি ভাঁজ করে রাখলেন খাটের মাথায়। তারপর প্রতাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, পাখাটা একটু জোর করে দাও না!

পাখার রেগুলেটার খুঁজতে গিয়ে প্রতাপ অন্ধ হয়ে গেলেন। দিনের বেলা, দরজা-জানলা বন্ধ করা সত্ত্বেও ঘরের মধ্যে যথেষ্ট আলো আছে, তবু প্রতাপ কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। যেন একটা অন্ধকার অরণ্যে তিনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন।

এ অনুভূতি কয়েক মুহূর্তের মাত্র। তারপরেই তিনি তাঁর পাঞ্জাবি ও পাজামা খুলে ফেলে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। প্রায় দৌড়ে গিয়ে বসে পড়লেন ঘরের এক কোণে।

মমতা জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো তোমার? প্রতাপ অদ্ভুত পাগলটে গলায় বললেন, মমো, এদিকে এসো, শিগগির এদিকে এসো–

মমতা খাট থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী?

প্রতাপ বললেন, আজ খাটে শুয়ে নয়। মেঝেতে, মনে করো, এটা ঘর নয়, এটা একটা নদীর ধার, আমরা শুয়ে আছি কাদামাটির মধ্যে, মাথার ওপরে খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা কিছুই গ্রাহ্য করছি না।

নারীর শরীর একবার জ্বলে উঠলে আর দেরি সয় না। মমতা শুয়ে পড়লেন প্রতাপের পাশে। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা চুকে যাবার পর দু'জনে কয়েক মিনিট নীরবে শুয়ে রইলেন পাশাপাশি। তারপর মমতা উঠে সায়া, শাড়ী, ব্লাউজ পরে নিয়ে দরজা খুলে চলে গেলেন বাথরুমে। প্রতাপের এখন আর একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু উঠে গিয়ে আনতে ইচ্ছে করছে না। তিনি ঘরের দেয়াল দেখতে লাগলেন। এই বাড়িটা ভালো নয়, সব ঘরে ড্যাম্প, দেয়ালে প্লাস্টার ফুলে গেছে কোথাও কোথাও। বাড়ি পাল্টালে ভালো হয়, কিন্তু প্রতাপের আর উদ্যম নেই। যা চলছে চলুক। কে আর বাড়ি খোঁজাখুঁজি করে।

মমতা জল-মাখা মুখে ফিরে এসে বললেন, এই, তুমি উঠবে না?

প্রতাপ হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, মমো, এসো আজ দুপুরটা আমরা মেঝেতেই শুয়ে থাকি!

মমতা ভুভঙ্গি করে বললেন, বয়েস হচ্ছে, খেয়াল থাকে না বুঝি?

প্রতাপ হেসে বললেন, সত্যিই খেয়াল থাকে না। বয়েস হচ্ছে, তাই না? এখন এসব মানায়। না! মমো, আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক আগের মতন ভালোবাসি।

-হঠাৎ আজ তোমার কী হয়েছে বলো তো? ভালোবাসার কথা তো আগে কখনো মুখে বলতে না?

-আমি মুখে বললে তোমার খারাপ লাগে?

-মুখে ওসব কথা বলার দরকার নেই। আমি সব বুঝি। যাদের মনে মনে ভয় আছে, তারাই ঐ সব কথা মুখে শুনতে চায় বারবার।

-আমিই ভুল করি, মমো। তুমি আমার থেকে অনেক সলিড!

-এবারে ওঠো, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

-তুমি আগে আমাকে একটা ভিজে তোয়ালে এনে দাও। আর সিগারেট দেশলাইটা এগিয়ে দাও। আর একটুক্ষণ থাকি। এখান থেকে উঠলেই ভালো লাগাটুকু শেষ হয়ে যাবে।

-পাখাটা কী রকম শব্দ করছে দেখেছো? স্পীড বাড়ালেই এরকম হয়। এবার অয়েলিং করাতে হবে। এই, তুমি দেওঘরে তোমার মায়ের জন্য একটা পাখা কিনে দেবে বলেছিলে না?

-কেন, ওস্তাদজী মাকে একটা পাখা কিনে দিতে পারে না? পুরো বাড়িটা ভোগ করছে। একতলায় ভাড়া পাচ্ছে।

-ওরকম ভাবে বলো না। কতইবা বাড়ি ভাড়া পান? তাছাড়া একজন ভাড়াটে নাকি ছ'মাস ধরে কিছু দেয় না। শান্তি ঠাকুরঝি একবার লিখেছিল মনে নেই?

-তা আমি কী করবো, আমার হাতে এখন আর টাকা নেই। বিমানবিহারীর কাছে অনেক ধার রয়ে গেছে!

-তা বললে তো চলবে না। আমাদের এই পাখাটাও বোধ হয় বদলানো দরকার, এই গরমে...আমার একটা বালা ভেঙে গেছে, ওটা আমি কোনোদিন পরবো না। ওটা বিক্রি করে দাও। তোমার দিদির গয়না তুমি না ভাঙতে পারো। আমার গয়না বিক্রি করতে তো দোষ নেই!

প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন। এখন আর নদীর ধার নয়, এটা ঘোর সংসার। একটু আগেকার চরম ভালো লাগার পরেই এই ধরনের কথাবাতা তাঁর সহ্য হলো না। এখন বিছানায় উঠে ঘুমিয়ে পড়াই ভালো।

দু'জনের মনেই হঠাৎ পিকলুর স্মৃতি দপ করে জ্বলে উঠেছিল। সেই জ্বালা, সেই শোক ভোলবার জন্যই এত সব। অন্য কিছু, অন্য কথা।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে পাশ ফিরতেই আবার পিকলুর মুখখানা ফিরে এলো। বয়ায় যখন মাথাটা ধাক্কা লাগে, তখন কত কষ্ট পেয়েছিল ছেলেটা, তবু সে নিজের ছোট ভাইকে ধরে ছিল উঁচু করে, তাকে ডুবতে দেয়নি...।

৭ পাতিপুকুর স্টপে বাস থেকে নেমে

পাতিপুকুর স্টপে বাস থেকে নেমে অসমঞ্জ রায় রাস্তা পার হবার আগে একবার থমকে দাঁড়ালেন। একটা কথা তাঁর আগেই মনে পড়া উচিত ছিল। প্রমীলা আশ্রমে খালি হাতে যাওয়া ভালো দেখায় না। এদিকে মিষ্টির দোকান কোথায় পাওয়া যাবে? আগে মনে পড়লে তিনি শ্যামবাজার থেকে ভালো মিষ্টি নিয়ে আসতে পারতেন।

খানিকটা হেঁটে একটা ছোট দোকান পেলেন, সে-দোকানে মোট বাইশটা কড়া পাকের সন্দেশ রয়েছে, সবগুলিই কিনে ফেললেন তিনি। এক হাতে সেই বাক্স, অন্য হাতে কোঁচাটা তুলে ধরে হাঁটতে লাগলেন, রাস্তায় চিটচিটে কাদা রয়েছে।

মেঘলা আকাশে সন্ধে নেমে এসেছে আগে আগে। প্রমীলা, আশ্রমের গেটের আলোটা দূর থেকে দেখা যায়। নিয়নবাতি দিয়ে আশ্রমের নাম লেখা হয়েছে গত মাসে। আশ্রমের বেশ উন্নতি হচ্ছে দিন দিন। নেপালী দারোয়ান রাখা হয়েছে দু'জন। গ্লোব নাসারি বিনা পয়সায় দেবদারু গাছ লাগিয়ে দিয়েছে কয়েক সারি।

যোগেন দত্তর মায়ের নামে এই আশ্রমের নাম রাখার শর্ত ছিল, তাই-ই হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যোগেন দত্তর মায়ের নাম প্রমীলা। সুতরাং অর্থের অসঙ্গতি হয়নি, বরং নামটি বেশ মানানসই হয়েছে।

রাস্তা থেকে পাগলিনীদের ধরে আনার ইচ্ছেটা পরিত্যাগ করতে হয়েছে চন্দ্রাকে। তাতে আইনের বাধা আছে। উন্মাদ আশ্রম বা লুনাটিক অ্যাসাইলাম খুলতে হলে সরকারের অনেক নিয়ম কানুন মানতে হয়। কে পাগল আর কে পাগল নয়, তা প্রমাণ সাপেক্ষ। যাকে তাকে পাগল বলে ধরে রাখা যায় না, এমনকি যে-নারী রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে ঘোরে, তাকেও না।

আপাতত দুঃস্থ, সহায় সম্বলহীন, অসহায় মেয়েদের আশ্রয় দেওয়া হয় এখানে।

এক সময় এই অঞ্চলটা ছিল জন বিরল, এখন উপনিবেশ গড়ে উঠছে দ্রুত। ধনীদের বাগান বাড়ি গুলো টুকরো টুকরো প্লটে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কাদের যেন একটা বেশ বড় বাড়ির গেটের মাথায় ছিল একটি নহবৎখানা, সেখানেও আশ্রয় নিয়েছে একটি পরিবার, ভেঁড়া কাঁথা ঝোলে, প্রায় শানাইয়ের মতনই তীব্র স্বরে শোনা যায় দু'একটি শিশুর গলায় কান্না। নহবৎখানার নিচটায় হয়েছে মটোর গাড়ি সারানোর খুদে কারখানা। যে-যেখানে পারে বাড়ি তুলছে, কলকাতা শহর ডাল-পালা মেলে এগিয়ে আসছে।

প্রমীলা আশ্রমের গেট দিয়ে ঢুকলেই সামনে একটি বাঁধানো চাতাল ও মন্দির। সেই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেত পাথরের মূর্তি। মাত্র পঁচাত্তর-আশি বছর আগেও যে মানুষটি জীবিত ছিলেন, এখন তাঁকে পুজো করা হচ্ছে দেবতাজ্ঞানে। প্রতি সন্ধেবেলা আরতি হয়, ভক্ত আসে প্রচুর, শুধু স্থানীয় নয়, দূর দূর থেকেও।

জুতো খুলে রেখে, চাতালে উপবিষ্ট নর-নারীদের এক পাশ দিয়ে এগিয়ে অসমঞ্জ মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে মূর্তির পায়ের কাছে সন্দেশের বাক্সটি রাখলেন। একবার তাকিয়ে দেখলেন চন্দ্রার দিকে। সিল্কের গেরুয়া পরা চন্দ্রা চোখ বুজে আছে, যেন ধ্যান-বিভোর। অসমঞ্জ ভাবলেন, তিনি যে পয়সা খরচ করে মিষ্টি আনলেন সেটা চন্দ্রা জানবে না? তা হলে আনার কী মানে হয়? এখানে আরও অনেকে ভোগ দিয়েছে, তার মধ্যে অসমঞ্জর বাক্সটা মিশে যাবে। চন্দ্রাকে এখন ডাকার উপায় নেই, তাই তিনি ডান পাশে

বসা আর একটি নারীকে উদ্দেশ্য করে বেশ জোরে বললেন, এটা এখানে রাখি? বাক্সর মুখটা খুলে দিতে হবে?

মেয়েটি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল যে তার দরকার নেই।

সেখান থেকে নেমে অসমঞ্জ চাতালের ভক্তদের মধ্যে ফিরে গেলেন না, বাঁ দিকের অফিস ঘরে একটা চেয়ারে বসলেন। তিনি এই আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি, তার আসন আলাদা জায়গায়। তবে তিনিও হাত জোড় করে চোখ বুজে কীর্তন গানের তালে তালে দোলাতে লাগলেন মাথা। এখানে ধূমপান নিষেধ, সন্ধ্যারতির সময় কথা বলাও চলে না।

এই অফিস ঘর থেকে মন্দিরের অভ্যন্তর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অসমঞ্জ চন্দ্রাকে দেখতে পাচ্ছেন না, মাঝখানে একজন মোটা সোটা মহিলা দাঁড়িয়ে আড়াল করে আছেন। উনি এই আশ্রমের সুপার, ওঁর নাম কুমুদিনী, কিন্তু এই আশ্রমের সকলেই যে আড়ালে ওঁকে বাঘিনী বলে ডাকে তা অসমঞ্জও জানেন। প্রকৃতি ওঁকে পুরুষ হিসেবে গড়তে গিয়েও মুহূর্তের ভুলে নারী করে পাঠিয়েছেন। একদিন উনি নাকি এ পাড়ার দুটি রসস্থ ছোঁকরাকে তেড়ে গিয়েছিলেন লাঠি হাতে নিয়ে।

অসমঞ্জ মাঝে মাঝে চোখ পিটপিট করে চন্দ্রাকে দেখতে চাইছেন। কিন্তু ঐ পাহাড়টি না সরলে কোনো লাভ নেই। কতক্ষণ চলবে? অসমঞ্জ মন দিয়ে গানটা শোনার চেষ্টা করলেন। শেষ গানটি তিনি চেনেন, সেটি হলো, “কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।- তাঁর রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যাঁর হাতে মরণ বাঁচন।” এখন অন্য গান হচ্ছে।

চন্দ্রার সঙ্গে প্রথম আলাপের দু’এক বছরের মধ্যে অসমঞ্জ কোনোদিন তার গলায় গান শোনেন নি। এখন সে এইসব কীর্তন টির্তন দিব্যি গায়। সত্যিই কি অলৌকিক কিছু ভর করেছে তার ওপর? অসমঞ্জ পুরোপুরি নাস্তিক নন, নিজের জীবনে ধর্মচর্চা না করলেও অবিশ্বাস করতে ভয় পান। চন্দ্রার কথা বলার ধরন, চোখের দৃষ্টি এমন ভাবে বদলে গেছে

যে মাঝে মাঝে চন্দ্রাকেও তাঁর ভয় হয়। আবার এক এক সময় মনে হয়, চন্দ্রা যেন ইচ্ছে করে কোনো উদ্দেশ্যে এই ছদ্মবেশ ধরে আছে।

যোগেন দত্তর সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবারে বেড়াতে গিয়েছিল চন্দ্রা। কী ঘটেছিল সেখানে? ডায়মণ্ড হারবার যাবার কথা অসমঞ্জ আগে থেকে কিছুই জানতেন না, শোনার পর তাঁর মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ অধ্যাপক হলেও অসম রায়ের মতন মানুষও বোধহয় কখনো কখনো মানুষ খুন করতে পারে। ক্রাইম অফ প্যাশান। অন্য কেউ চন্দ্রার। গায়ে হাত ছুঁইয়েছে এরকম চিন্তা করলেই অসমঞ্জ প্রায় পাগলের মত হয়ে ওঠেন!

ডায়মণ্ড হারবার থেকে চন্দ্রা: ফিরে এসেছিল রাত পৌনে দুটোয়। এবং সে যোগেন দত্তর নামে কোনো অভিযোগ করে নি। কোনো মানসিক বিপর্যয়ও লক্ষ করা যায় নি। কিন্তু সেই ঘটনার সাত দিনের মধ্যেই সে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে নিয়ে সন্ন্যাসিনী হতে চেয়েছিল।

কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিলেই সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হওয়া যায় না কিংবা গেরুয়া ধারণ করার অনুমতি পাওয়া যায় না, তার আগে কয়েকটা স্তর পেরিয়ে আসতে হয়। চন্দ্রার অত ধৈর্য নেই। দু'দিন পরে সে বেলঘরিয়ায় শিবানন্দ স্বামীর কাছে আবার দীক্ষা নিয়ে স্বেচ্ছায় গেরুয়া ধারণ করেছে। মাথার চুল হেঁটে ফেলেছে ছোট ছোট করে। বেলঘরিয়ার সেই আশ্রমে সে থেকে এসেছে তিন মাস।

চন্দ্রার বাবার সঙ্গে 'অসমঞ্জর আলোচনা হয়েছিল এ ব্যাপারে।

আনন্দমোহন বলেছিলেন, চন্দ্রার তো এলাহাবাদে যাবার কথা ছিল শিবানীর বিয়েতে, এইভাবে ও এলাহাবাদে যাওয়াটা এড়িয়ে গেল।

চন্দ্রার এলাহাবাদ পর্বটাও অসমঞ্জ প্রায় কিছুই জানেন না। কী যেন একটা রহস্য আছে। এলাবাদের প্রসঙ্গ উঠলেই চন্দ্রা চটে উঠতো।

আনন্দমোহনকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, চন্দ্রা যেতে চায় না কেন এলাহাবাদ?

আনন্দমোহনও সরাসরি উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, যেতে ও চায় না, সে জন্য আমি ওকে জোর করি না। কিন্তু ওর মা জোর করে পাঠাতে চায়। আমার এই মেয়েটা ছেলেবেলা থেকেই বড্ড জেদী।

–তা বলে মন্ত্র নেওয়া, গেরুয়া পরা, এসব নিয়ে ছেলেমানুষী করা কি ঠিক?

–আমি বাবা বলেই কি ফতোয়া দিতে পারি, ওর জীবনের কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। অ্যাডাল্ট ছেলেমেয়ে, শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছে, ওরাই ঠিক করে নেবে কী ভাবে জীবনটা কাটাবে। কেন, আপনার কী মনে হয়, একবার গেরুয়া ধারণ করে তারপর কিছুদিন বাদে ফের গেরুয়া ছেড়ে বেনারসী শাড়ী পরা অন্যায়?

অসমঞ্জ অবাক হন। তিনি লেখাপড়া জানা মানুষ। আধুনিক যুক্তিবাদ তাঁর অজানা নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের কোনো বাবা শ্রেণীর মানুষের মুখে এরকম কথা শুনবেন, তিনি আশা করেন নি। তাও নিজের মেয়ে সম্পর্কে? অন্যদের ব্যাপারে ভাসা ভাসা আদর্শবাদের কথা বলা সহজ, কিন্তু নিজের ছেলে মেয়েদের বেলায়...

অসমঞ্জ আধুনিক যুক্তিবাদের কথা বইয়ের পৃষ্ঠায় পড়লেও তাঁর নিজের জীবন চর্যায় অনেক সংস্কার রয়ে গেছে। ছেলেখেলার মতন একবার গেরুয়া ধারণ করে সন্ন্যাসিনী হয়ে আবার কয়েক মাস বাদে সিল্কের শাড়ী পরে টেনিস খেলতে যাওয়া এবং সিগারেট টানতে টানতে পরপুরুষের গায়ে ঢলে পড়া, তাঁর মতে এটা ধর্মীয় ব্যভিচার, এটা পাপ। তাঁর ধারণা, চন্দ্রা ঠিক এই ব্যাপারটাই করবে।

আনন্দমোহনকে তিনি খানিকটা মাস্টারি ধরনে বলেছিলেন, আপনি আপনার মেয়েকে বড় বেশি আদর দিয়েছেন। কিছু কিছু ভ্যালুজ তো মানতেই হয়!

আনন্দমোহনকে যতটা সরল ও আপন ভোলা মনে হয়, তিনি আসলে ততটা নন নিশ্চয়ই। তা হলে আর শ্যামবাজারের মতন পাড়ায় অতবড় ওষুধের দোকান চালাচ্ছেন কী করে?

অসমঞ্জর ঐ কথা শুনে আনন্দমোহন বলেছিলেন, হ্যাঁ, বাড়ির সবচেয়ে ছোট মেয়ে। আদরটা বেশিই পেয়েছে। তাতে ক্ষতি কিছু হয়েছে কী? চন্দ্রা কোনোদিন নিন্দনীয় কিছু কাজ করেনি।সেইজন্যই তো রাত নটাতেও ওর কোনো পুরুষ বন্ধু দেখা করতে এলে আমরা কিছু মনে করি না। আমার মেয়েকে তো আমি চিনি!

অসমঞ্জর মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। মিষ্টি মিষ্টি সুরে আনন্দমোহন তাঁকেই ঘুরিয়ে থাপ্পড় মারলেন। অসমঞ্জই তো প্রায়ই টিউশানি সেরে রাত ন'টার পর 'চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন।

টাকার অভাবে প্রমীলা সমিতির বাড়ি তৈরির কাজ কিছুদিন বন্ধ ছিল। তিন মাস পরে চন্দ্রা বেলঘরিয়ার আশ্রম থেকে ফিরে পুরোপুরি আবার সেইকাজে লাগলো। বাবার বাড়ি ছেড়ে সে ঠাঁই নিল প্রমীলা আশ্রমের সেই অসমাপ্ত বাড়িতে, তার নাম হলো চন্দ্রামা, তার কথার লব্জ হলো, 'তিনি রবি, আমি চন্দ্র, তিনি আলো, আমি মুকুর, তিনি সাগর, আমি নদী, তিনি স্রষ্টা, আমি সৃষ্টি, তিনি বিভু আমি ভূ।'

অতিশয় সরল ও বহু ব্যবহৃত এই সব কথাই অধ্যাত্ম দর্শন নামে এখনো চলে। চন্দ্রামার চেলা জুটতে দেরি হলো না। সে এক রূপসী যোগিনী, এর অতিরিক্ত আকর্ষণ তো আছেই, শুধু পুরুষরা নয়, মহিলারাও সুন্দরী সন্ন্যাসিনী দেখে আকৃষ্ট হয়। সেই যোগেন দত্তই আবার ফিরে দিতে লাগলো টাকা। আরও দাতা জুটিয়ে আনলো সে, সেই টাকায় সম্পূর্ণ হলো আশ্রম বাড়ি। তৈরি হলো মন্দির। এ দেশে মন্দির-মশজিদ গড়ার জন্য কখনো টাকার অভাব হয় না। যোগেন দত্তর মায়ের নামেই সংস্থার নাম হয়েছে কিন্তু অনেকেরই মুখে মুখে এর নাম শুধু চন্দ্রামা'র আশ্রম! চন্দ্রার অনুরোধেই যোগেন দত্ত এই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হয়েছে। অসমঞ্জ ভাবেন, তা হলে কি ডায়মণ্ড হারবারে যোগেন দত্ত চন্দ্রার প্রতি কোনো অসমীচীন আচরণ করে নি? তবে চন্দ্রা ডায়মণ্ড হারবার বেড়াতে গেল কেন

ওর সঙ্গে, গভীর রাতে ফিরে এসে কদিন পরই সে কেন ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী হতে চাইলো?

অসমঞ্জ ধরেই রেখেছিলেন, চন্দ্রার এই হুজুগ বেশিদিন টিকবে না। চন্দ্রা খেলাধূলা করতে, নাচতে, বেড়াতে ভালোবাসে, আগে সে সিগারেট খেত খুব, বীয়ার কিংবা জিন পানে আসক্তি ছিল, সমাজসেবা বা নিরাশ্রয় মেয়েদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা তার একটা শখ মাত্র, সে শুধু ঐ শখের জন্য তার ব্যক্তিগত জীবন-উপভোগ বাদ দিতে পারবে না।

তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারেও অসম্ভব সন্দেহ হয়েছিল। অপূর্ব বর্মণ নামে একজন আর্কিটেক্টের সঙ্গে চার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে ছোঁকরা সময়ে অসময়ে ঘুরঘুর করতো চন্দ্রার আশেপাশে। সে অতি সুপুরুষ এবং কাজকর্মের ব্যাপারেও সার্থক। সন্ন্যাসিনী হবার পরেও চন্দ্রা ঐ অপূর্ব বর্মনকেই ডাকলো তার বাড়ি সম্পূর্ণ করবার জন্য। অপূর্ব বর্মণ এজন্য টাকাকড়ি কিছু পায় নি, তবু সে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে গেছে এখানে। চন্দ্রা না হয় সন্ন্যাসী হয়েছে, অপূর্ব বর্মণ তো সাধু হয়নি, তা হলে তার কিসের টান? শুধু ঐ অপূর্ব বর্মণের ওপর নজর রাখবার জন্যই অসমঞ্জ নিজের প্রচুর কাজ নষ্ট করে এখানে এসে পড়ে থাকতেন। না, এতদিনেও তিনি ওদের মধ্যে কোনো গোপন লীলাখেলা আবিষ্কার করতে পারেন নি।

ঐ অপূর্ব বর্মণ লোকটি, ইংরেজিতে যাকে বলে একটি এনিগমা। ওর কোনো দোষ ধরতে পারেন নি অসমঞ্জ, তবু ওকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। ও যে এ পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনো অন্যায় করেনি, সেটাই যেন একটা প্রচণ্ড অন্যায়। একটা সুস্থ, সবল, যুবক, সে কী চায়? সে কিছুই চায় না, তবু আসে? অপূর্ব বর্মণ যেন একেবারে ভদ্রতার প্রতিমূর্তি, তার মুখের বাঁধানো হাসিটি দেখলেই অসমঞ্জর শরীর রি-রি করে! সে কোনোদিন অসমঞ্জর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি, সেটাও তার একটা অপরাধ, সে এতবড় শয়তান যে অসমঞ্জকে খারাপ ব্যবহারের উত্তর দেবার সুযোগ পর্যন্ত দিচ্ছে না।

এই পাতিপুকুর আশ্রমে চন্দ্রার জনপ্রিয়তা হঠাৎ বাড়িয়ে দেন চন্দ্রার বাবা আনন্দমোহন স্বয়ং।

বছর দুয়েক ঘোরবার পর, অসমঞ্জ তখনও পর্যন্ত আশা ছাড়েন নি চন্দ্রার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার, সেই সময় একদিন বিকেলের প্রার্থনা সভায় দেখা গেল আনন্দমোহন বসে আছেন চাতালের ভক্তদের মধ্যে। সেই দিনটি ছিল শনিবার, চন্দ্রার উপদেশ দেবার দিন। আনন্দমোহন এসে পরিচয় দেন নি চন্দ্রার বাবা হিসেবে, চন্দ্রাও নিশ্চয়ই বাবাকে দেখতে পেয়েছিল, তবু তাঁর প্রতি কিছু আলাদা মনোযোগ দেয়নি বা পিতৃ সম্বোধনও করে নি। তাহলেও বিদ্যুতের মতন কথাটা রটে গিয়েছিল। চন্দ্রামার বাবা এসেছেন মেয়ের উপদেশ শুনতে! চন্দ্রা মা'র কী অলৌকিক শক্তি, তিনি নিজের পিতাকেও ভক্ত বানিয়েছেন।

সেদিন অসমঞ্জ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু ঘটনাটা শুনেই তাঁর মনে হয়েছিল, এটা একটা পাবলিসিটি স্টান্ট! বাবা আর মেয়ের ষড়যন্ত্র! অসমঞ্জ রীতিমতন বিরক্ত হয়েছিলেন। ওষুধের দোকান থেকে তো যথেষ্ট লাভ হয়,আনন্দমোহন কি তবে প্রমীলা আশ্রম থেকেও কিছু বাগাবার তালে আছেন নাকি?

শ্যামবাজারের দোকানে ওষুধ কেনার ছলে একদিন গিয়ে অসমঞ্জ আনন্দমোহনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শুনলাম নাকি আপনি নিজেই এখন আপনার মেয়ের ভক্ত হয়েছেন?

মাথা ভর্তি পাকাচুল সমেত সেই বৃদ্ধ সরল বিস্ময়ে ভুরু তুলে বলেছিলেন, ও আর আমার মেয়ে নয়, অসমঞ্জবাবু! ওর ওপর কিছু ভর করেছে। আমি নিছক পরীক্ষা করবার জন্য গিয়েছিলাম একদিন, বুঝলেন। ভেবেছিলাম, শুনি না ও লোকদের কী বলে! শুনতে গিয়ে আমি তো, কী বলবো আপনাকে, একেবারে অভিভূত। এসব ও কোথায় শিখলো? চন্দ্রা তো কোনোদিন দর্শন পড়ে নি। কত সাধারণ কথা ও কত গভীরভাবে বলে! তারপর থেকে ইচ্ছে করে রোজ শুনতে যাই!

–আপনার তা হলে ধারণা যে আপনার মেয়ে সত্যি সন্ন্যাসিনী হয়ে গেল, আর ফিরবে না?

–আপনার কি ধারণা, অসমঞ্জবাবু?

–সত্যি কথা বলবো, আমি মনে করি, এই সব ভড়ং আপনার মেয়ে বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে না! ও মেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া!

আনন্দমোহন দুঃখিত স্বরে, পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে শুনিয়েছিলেন, আপনিই একদিন আমায় বলেছিলেন, একবার গেরুয়া ধারণ করে তারপর আবার ছেড়ে আসা পাপ। আমার মেয়ে তা হলে পাপীয়সী হবে? কী জানি, কী আছে ভবিতব্য!

অসমঞ্জ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক উত্তর দিতে পারেন নি। হ্যাঁ। তিনি মনে করেন, একবার গেরুয়া ধারণ করে আবার তা ছেড়ে দেওয়াটা পাপ। অথচ, তিনি চান চন্দ্রা ঐ সব ভড়ং ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক।

অসমঞ্জ প্রমিলা আশ্রমের সঙ্গে সব সংশ্রব চুকিয়ে দিতে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা অধিকাংশই বামপন্থার দিকে ঝুঁকেছেন। কংগ্রেস শাসনের প্রতি সারা পশ্চিম বাংলা বীতশ্রদ্ধ। বিধান রায় তবু শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন, এখন প্রফুল্ল সেনের আমলে দিন দিন বিশৃঙ্খলা বাড়ছে। ওদিকে কেন্দ্রেও চীনের সঙ্গে হঠকারীর মতন যুদ্ধ বাধিয়ে তারপর শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের পর ম্লান হয়ে গেছেন জওহরলাল নেহরু, তাঁর স্বাস্থ্যও ভালো নয়। বামপন্থীরা চীন-ভারত যুদ্ধসূচনার পুরো দায়িত্বটা চাপিয়ে দিয়েছে ভারত সরকারের কাঁধে। অসমঞ্জ রায় মনেপ্রাণে পুরোপুরি বামপন্থী নন, তবে তিনি সবসময়ই হাওয়ার স্রোতের অনুকূলে, তাই তিনি গলা মিলিয়েছেন বামপন্থীদের সঙ্গে, ওদের সমর্থন পেয়ে তিনি সিন্ডিকেটের নির্বাচনে জিতেছেন। এখন তাঁর পক্ষে কোনো ধর্মীয় সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রাখা সমুচিত নয়।

কিন্তু অসমঞ্জ অসহায়। চন্দ্রাকে ছেড়ে দূরে চলে যাবার সাধ্য তাঁর নেই। দুতিনদিন চন্দ্রাকে দেখলেই জীবনটা বিস্বাদ মনে হয়। চন্দ্রা তাঁকে অবহেলা করলেও তাঁর উপায় নেই।

সন্ন্যাসিনী হবার আগে বরং কিছুদিন অসমঞ্জর প্রতি চন্দ্রা বেশ বিরাগ দেখিয়েছিল। অসমঞ্জের চেয়েও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ছিল চন্দ্রার বেশি ভাব। কিন্তু একবার গেরুয়া ধারণ করার পর চন্দ্রার ব্যবহার আবার বদলে গেছে, চন্দ্রাই তো বারবার অনুরোধ করেছে অসমঞ্জকে এই প্রমিলা আশ্রম ট্রাস্টের সদস্য হতে। আশ্রম চালাবার ব্যাপারে চন্দ্রা তাঁর পরামর্শ চায় যখন তখন।

চন্দ্রা কি জানে না অসমঞ্জ কী চান চন্দ্রার কাছ থেকে? না জানার তো কথা নয়!

অসমঞ্জ চান চন্দ্রার স্পর্শ। তিনি চান ওকে বুকে জড়াতে। কল্পনায় যখন তিনি সেই দৃশ্যটা ভাবেন, তখন তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। চন্দ্রাকে পাওয়ার বিনিময়ে তিনি নিজের স্ত্রী-পুত্র-সংসার, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি, সামাজিক প্রতিপত্তি সব কিছু পরিত্যাগ করতে রাজি আছেন। দিন দিন তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাটা বাড়ছে।

আগে যে-কোনো ছুতোয় অসমঞ্জ চন্দ্রাকে একটু-আধটু ছুঁয়ে দিতেন। এখন তাঁকে সব সময় একটু দূরত্ব রাখতে হয়। সন্ন্যাসিনীকে স্পর্শ করার সাহস তাঁর নেই। চন্দ্রা কারুকে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করারও অনুমতি দেয় না। অথচ দিনের পর দিন কী সুন্দর হচ্ছে চন্দ্রা!

অসমঞ্জ মাঝে মাঝেই ভাবেন বোমা মেরে যদি এইসব আশ্রম টাশ্রম একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া যেত! এদেশে সংসার পরিত্যক্ত হাজার হাজার মেয়ে পথে পথে ঘুরছে, তার মধ্যে মাত্র পনেরো-ষোলোটি মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে সমাজের কী উন্নতি হবে? এসব হচ্ছে দেশোদ্ধারের বিলাসিতা!

অসমঞ্জ মনে মনে সর্বক্ষণ বলতে চান, ফিরে এসো, চন্দ্রা, ফিরে এসো, তোমার আগেকার জীবনে এসো, আমরা একসঙ্গে আবার গাড়ি চেপে রিফিউজি কলোনিতে

যাবো, তোমার সঙ্গে আমি তাল মেলাবো, দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের জন্য ইস্কুল খোলার জন্য আমি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে আমার প্রভাব খাটাবো, কিন্তু আশ্রম-টাম এসব কী?

অসমঞ্জ হঠাৎ খেয়াল করলেন, এবার 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়...' গান হচ্ছে, কুমুদিনী সরে দাঁড়ানোতে চন্দ্রাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চন্দ্রার চক্ষু দুটি এখনও বোঁজা, আস্তে আস্তে দুলছে তার মাথাটা। অসমঞ্জের দৃষ্টিপথ থেকে আর সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল, আর কারুকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিও না, তিনি শুধু দেখছেন চন্দ্রার মুখমণ্ডল। তাঁর হৃদয় কাতরভাবে বলে উঠলো, ফিরে এসো, চন্দ্রা, ফিরে এসো!

প্রার্থনা শেষ হবার পরেও প্রসাদ বিলি করতে খানিকক্ষণ সময় লাগবে। অসমঞ্জ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে হাতছানি দিয়ে এক রমণীকে ডাকলেন। এর নাম কিরণ, খুবই শুকনো ও বিমর্ষ চেহারা, একে তুলে আনা হয়েছিল শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে। এর বেশ মাথা খারাপ ছিল। আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি একজন নাম করা ডাক্তার, তাঁর নাম বিজন ব্যানার্জি, তিনি সপ্তাহে দু'দিন এখানে চিকিৎসা করেন। ডঃ বিজন ব্যানার্জির চেষ্টায় কিরণ অনেকখানি সুস্থ হলেও পুরোপুরি সারেনি, সে প্রায় কারুর সঙ্গেই কথাবার্তা বলতে চায় না, তার অতীতের কথাও জানায় না। তবে কিরণ রান্না করে ভালো, তার ওপর রান্নাঘরের ভার দেওয়া হয়েছে, সেটা সে বেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করে।

কিরণ কাছে আসতেই অসমঞ্জ বললেন, কেমন আছো, কিরণ? এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে?

কিরণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়াতেই অসমঞ্জর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাজারে চিনি পাওয়া যাচ্ছে না। এখন যে-কোনো বাড়িতে গেলেই চিনির আলোচনা। সরকার লোক দেখানোভাবে ১৫ জন চিনির কালোবাজারিকে গ্রেফতার করেছে, তাতে কিছুই সুরাহা হয় নি। গোপন- বাজার থেকে যদি বা একটু চিনি সংগ্রহ করা যায়, তার দামও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। প্রতি কিলো দেড় টাকা! ট্রামে বাসে লোকজন

বলাবলি করে, প্রফুল্ল সেন এবারে বাঙালীর চা-খাওয়ার অভ্যেস ছাড়াবে! আরে ধুর, ধুর, গুড় দিয়ে কী চা খাওয়া যায়?

অসমঞ্জ আবার কিরণকে ডেকে বললেন, শোনো, কিরণ, চা খাওয়াবে তো বললে, তোমাদের চিনি আছে?

কিরণ দু'দিকে মাথা নাড়লো।

–তা হলে যে চা আনতে যাচ্ছিলে?

কিরণ নির্বাকভাবে গোল গোল চোখ মেলে অসমঞ্জের দিকে তাকিয়ে রইলো।

–গুড়ের চা খাওয়াতে চাইছিলে নাকি?

আর একটি মেয়ে এদিকে এসে বললো, আমরা তো এখানে গুড়ের চা-ই খাই।

অসমঞ্জ বললেন, থাক, আমার জন্য চা আনতে হবে না।

তাঁর মাথায় একটা চিন্তা এলো। যোগেন দত্তর বড়বাজারে অনেক প্রতিপত্তি, সে আশ্রমের জন্য চিনি জোগাড় করে দিতে পারে না? অসমঞ্জর কিন্তু একটা সোর্স আছে। ফুড ডিপার্টমেন্টের এক কত্তার ছেলে তাঁর ছাত্র, সে দশ কিলো চিনি ভেট পাঠিয়েছে অসমঞ্জর বাড়িতে। সেই ছেলেটির বাবাকে ধরে এই আশ্রমের জন্য কিছু চিনি বরাদ্দ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে ন্যায়সঙ্গতভাবেই।

এ প্রসঙ্গ কিরণদের সঙ্গে আলোচনা করার কোনো মানে হয় না। চন্দ্রাকে বলতে হবে, চন্দ্রা নিশ্চয়ই খুশী হবে। সন্ন্যাসিনী হয়েও চন্দ্রা চা-খাওয়া ছাড়েনি, এটা অসমঞ্জ লক্ষ করেছেন।

কিরণের পাশে এখন যে-মেয়েটি দাঁড়িয়ে, তার নাম সুধা। সে যেন কিরণের ইন্টারপ্রেটার। কোনো প্রশ্ন শুনেও কিরণ চুপ করে থাকলে সে উত্তর জুগিয়ে দেয়। সুধা

মেয়েটি বেশ চটপটে, তার ওপর প্রতিদিনের বাজার খরচের হিসেব রাখার ভার। অসমঞ্জ তার সঙ্গে দৈনন্দিন কাঁচা বাজার বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি নিজে কক্ষণো বাজারে যান না, তাঁর নিজের সংসারে। কোনদিন কতটা আলু-পটল-মাছ আসে সে খবরও তিনি রাখেন না, কিন্তু ট্রাস্টি হিসেবে এখানকার খরচপত্তরের তত্ত্বাবধান করতে হয় তাঁকে। দৈনন্দিন যে টাকা এখানে বরাদ্দ, তা দিয়ে আর কুলোচ্ছে না। বাজারে এখন আগুন লেগেছে। সামান্য যে আলু, তাও এখন বেয়াল্লিশ পয়সা কিলো। মানুষ খাবে কী?

সুধা বললো, দাদা, আমাদের এখানে কলারপাতায় খাওয়ার ব্যবস্থা তুলে দিন। টিনের বা অ্যালুমুনিয়ামের থালা কিনে দিন বরং, তাতে পয়সার সাশ্রয় হবে!

অসমঞ্জ বললেন, কেন? কলার পাতায় খাওয়াই তো ভালো, বাসনপত্র মাজাঘষার ঝামেলা নেই।

–আপনি ব্যবস্থা করুন, প্রত্যেকে যার যার বাসন মেজে নেবে। এখন এক বান্ডিল কলাপাতার জন্য রোজ কুড়ি নয়া করে লাগছে!

–কলাপাতার বান্ডিল কুড়ি নয়া করে?

–বিয়ের দিন থাকলে পঁচিশ নয়া নেয়। বলেন, এইটা একটা বাজে খরচ না? অসমঞ্জ মাথা নাড়লেন। এর পরের মিটিং-এ এই কথাটা তুলতে হবে।

একটু বাদে ভেতরে এলো চন্দ্রা। তার গেরুয়া বসনের আঁচল গলায় জড়ানো। কপালে একটা বড় লাল টিপ। ঠোঁটে মধুমাখা স্মিত হাসি। তার শরীরে কোনো অলংকার নেই তবু সে যেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী। ডান হাতে ঝুলছে একটা রুদ্রাক্ষের মালা।

–কেমন আছো, অসমঞ্জ? তুমি গত শনিবার এলে না?

–হ্যাঁ, আসতে পারিনি। চন্দ্রা, তোমার সঙ্গে আমার দু'একটা কথা আছে।

--এসো। দালানে গিয়ে বসি।

অসমঞ্জ কেঁপে উঠলেন ভেতরে ভেতরে। চন্দ্রা এর আগে কোনোদিন তাঁকে তুমি বলে সম্বোধন করে নি।

চন্দ্রা বললো, আজ আমার আবার চোখ খুলে গেল। সব মানুষই নারায়ণ। তবু মানুষে আর নারায়ণে ভেদ রাখি কেন? অসমঞ্জ, আজ আমি তোমার মধ্যেও নারায়ণকে দেখতে পেলাম।

অসমঞ্জ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন, চন্দ্রার গায়ে গেরুয়া নেই, কপালে ঐ বিশ্রী লাল টিপটা নেই, আগেকার মতন চন্দ্রার পরনে একটা হালকা নীল শাড়ী, তার গলায় চন্দ্রহার, হাতে সিগারেট, সে যেন দু'হাত বাড়িয়ে অসমঞ্জকে নিজের বুকে নেবার জন্য ডাকছে, এসো, এসো!

৮ গাড়ি ভাড়া করেছে আলতাফ

কোথা থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করেছে আলতাফ। সে সাইকেল রিকশা চাপে না, তার বিশ্রী লাগে। নতুন ঝকমকে টয়োটা গাড়ি, সঙ্গে উর্দি পরা ড্রাইভার। বাবুলও বেরুচ্ছিল, আলতাফ বললো, চল, কোথায় যাবি, তোরে নামায়ে দেবো।

এই গরমেও আলতাফের পরনে থ্রী পিস্ সুট, গলায় চওড়া টাই, চোখে সান গ্লাস। সে ওয়েস্টকোটের পকেটে দু আঙুল রেখে কায়দা করে কথা বলে। তার পায়ের জুতো জোড়া দেখলেই বোঝা যায় ঐ জুতোর দামে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো চাষী পরিবারের ছ' মাসের সংসার খরচ চলে যেতে পারে। বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট খুলে সে উদার ভাবে বিলোয়, নিজের সিগারেটটা আধখানা ফুরোবার আগেই সে ফেলে দেয় অবহেলায়। আগেও সে শৌখিন প্রকৃতির ছিল, এখন জার্মানি-প্রবাসী হয়ে, উপার্জনের সচ্ছলতায় অমিতব্যয়ী বিলাসী হয়েছে।

দুই ভাইয়ের চেহারা ও স্বভাবে অনেক অমিল। আলতাফ ইদানীং হৃষ্টপুষ্টের চেয়েও কিছু বেশি, বাবুল রোগা-পাতলা। আলতাফ প্রগল্ভ, বাবুল লাজুক ও মিতভাষী, আলতাফ সম্ভোগপরায়ণ, বাবুল ব্যক্তিগত সাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে উদাসীন।

গাড়িতে উঠে আলতাফ বললো, উরে ব্বাইশ রে, কী গরম পড়ছে রে! তারপর সে সাহেবী কায়দায় টাইয়ের গিটে একবার অন্যমনস্ক ভাবে হাত ছোঁয়ালো। ছোট ভাইয়ের দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমি মিজান ভাইয়ের বাড়িতে বীয়ার খেতে যাবো, তুই আসবি নাকি আমার সাথে?

বাবুল যে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে একথা আলতাফকে সে অন্তত চারবার জানিয়েছে, কিন্তু আলতাফের তা মনে থাকে না। সে ঘাড় নেড়ে বললো, না, আমার অন্য জায়গায় কাজ আছে।

বাকি রাস্তা আলতাফ নিজের মনে অনেক কথা বলে গেল, বাবুল নীরব শ্রোতা। এলিফ্যান্ট রোডের মোড়ে নেমে পড়তে চাইল বাবুল।

আলতাফ জিজ্ঞেস করলো, এখানে কার বাসায় যাবি? উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বাবুল বললো, আছে একজন, তুমি চেনো না!

নেমে পড়ে বাবুল একটা কাঁসার বাসনের শো রুমের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের জিনিসপত্র দেখতে লাগলো অলসভাবে। যেন তার কোথাও যাবার তাড়া নেই। ঠিক অবিশ্বাস নয়, সে তার বড় ভাইকে এড়িয়ে চলতে চায়। আলতাফের ভোগবাদী দর্শন তার বড় ভুল মনে হয়।

একটু পরে রাস্তার কয়েক বাঁক ঘুরে সে একটি বাড়ির কলিং বেল-এ ডান হাতের অনামিকা ছোঁয়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটা কুকুরের হিংস্র ঘেউ ঘেউ ডাক ভেসে এলো। বাবুল হাসলো ঠোঁট টিপে। প্যাটার্ন ঠিক মিলে যাচ্ছে। উনিশ শো আটান্নোর সেই সামরিক আইন জারি, কয়েকদিন পরেই ইস্কান্দার মিজার নিবাচন, তারপর সবাই ভেবেছিল এদেশে আর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কোনো আশা নেই। যাদের রাজনীতির সঙ্গে কিছুমাত্র সংশ্রব ছিল তারা যখন তখন গ্রেফতারের ভয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালাবার ব্যবস্থা রেখেছে এবং বাড়িতে কুকুর পুষে সম্মুখ দরজায় বসিয়েছে। ইদানীং ঢাকা শহরে কুকুরের ডাক আগের তুলনায় অনেক বেশি শোনা যায়।

কেউ একজন প্রথমে কুকুরটাকে বাঁধলো, কোনো উপায়ে দরজার বাইরের আগন্তুককে দেখে নিয়ে তারপর দরজা খুললো।

পায়জামা ও গেঞ্জি পরা একজন ত্রিশোর্ধ যুবক অনেকখানি ভুরু তুলে নাটকীয় ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, আরে, বাবুল মিঞা! কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ যে মেঘ না চাইতেই পানি! তুমি বিশ্বাস করবা না, আমরা এতক্ষণ তোমার কথাই বলতেছিলাম! বাবুল সামান্য হেসে বললো, কী খবর পল্টনভাই? সব ঠিকঠাক আছে?

যুবকটি বাবুলের কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, বাবুল আমার বাবুল রে! তোরে পাইলে যাইতাম আমি কাবুল রে! এতদিন কোথায় ছিলি? বিয়ে-শাদী করে শালা একেবারে ভাগলবা! আমরা কি তোর কেউ না?

বাতাসে গন্ধ পেয়ে বাবুল ঐ পল্টন নামের লোকটির এতখানি উচ্ছ্বাস ও আতিশয্যের কারণ বুঝতে পারলো। পরিষ্কার জিনের গন্ধ। বেলা বারোটা এখনও বাজেনি, এর মধ্যেই পল্টন মাতাল হয়ে গেছে!

পল্টন তাকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল।

পল্টন ওরফে আবুল হোসেনদের বাড়ি ছিল পশ্চিম বাংলায়। ওর বাবা সরকারি চাকরি করতেন বর্ধমানে, পার্টিশানের সময় অপশান দিয়ে তিনি সপরিবারে ঢাকা চলে আসেন।

চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তিনি একটা বইয়ের দোকান ও প্রেস খোলেন বাংলা বাজারে, আবুল হোসেন এখন সেই ব্যবসা চালায়। এই দোকানের পেছনের একটা ছোট ঘরে প্রতিদিন বিকেল থেকে জমতো এক প্রচণ্ড আড্ডা, ছাত্র জীবনের শেষে বাবুলও তাতে যোগ দিয়েছিল। বন্ধু বান্ধবরা সবাই আবুল হোসেনকে পল্টন নামেই ডাকে। ঐ নাম তার বাপ-মায়ের দেওয়া নয়, রোগা-লম্বা চেহারার জন্য আগে তাকে বলা হতো তালপাতার সেপাই, তখন তাদের বাড়ি ছিল পুরানা পল্টনে, সেই থেকে পল্টন। বন্ধু বান্ধবদের আদর-আপ্যায়নে পল্টন অত্যন্ত উদার।

বইয়ের দোকানের সেই আড্ডাখানায় অবধারিতভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল রাজনীতি, এক সময় কয়েকজন আড্ডাধারী রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তার ফলে পল্টন ছ'মাসের জন্য। জেল খেটে এসেছে।

আজ ছুটির দিন ছিল, তাই আড্ডা বসেছে বাড়িতে। সামনের দিকের দুতিনখানা ঘর পেরিয়ে একেবারে শয়ন কক্ষে। মস্ত বড় পালঙ্কের ওপর পুরু গদির বিছানা পাতা, তার কোণে কোণে বসেছে পাঁচ ছ'জন, মাঝখানে ছড়ানো তাস, তিন চারটে অ্যাশট্রে ভর্তি সিগারেটের টুকরো, পাশের একটা টুলের ওপর রাখা কয়েকটি বীয়ার ও একটি লন্ডন ড্রাই জিনের বোতল, প্রত্যেকের হাতে হাতে গ্লাস।

বাবুল দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালো। দৃশ্যটি তার পরিচিত, শুধু ঢাকা শহর নয়, মফঃস্বলেও অনেক বাড়িতে ইদানীং এ দৃশ্য দেখা যায়।

সাত-আট বছর আগে পল্টনের দোকানে বা বাড়ির আড্ডায় মদ ছিল না, তাস ছিল না। কাপের পর কাপ চা আসতো, সঙ্গে পেঁয়াজি ও কাবাব, আর সিগারেট ছিল অফুরন্ত। তখন কথা বলাটাই ছিল প্রধান নেশা।

আটান্ন সালে সমস্ত রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ হবার পর এবং যখন তখন জেলে যাওয়ার আশঙ্কায় যখন অনেকের মন আচ্ছন্ন, তখন সময় কাটাবার উপায় হিসেবে

আসে সুরা। ঢাকা শহরে এখন হাত বাড়ালেই মদ পাওয়া যায়, গরিব লোকেরাও কেরোসিন আনতে যায় বিলিতি মদের বোতলে।

পুলিসের নজর এড়াবার জন্য বাবুল যেমন মফঃস্বলে চাকরি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তেমনি যারা ঢাকা শহরে রয়ে গেল, তারা অনেকেই আত্মগোপন করলো মদের নেশায় ও তাস খেলায়, সহজে কেউ রাজনীতির আলোচনা করে না, কেন না, দেয়ালেরও কান আছে। প্রচুর লোক এখন ইনফর্মার হয়েছে, কে যে শত্রু, আর কে যে বন্ধু বোঝা দায়।

ছ'জন তাসের জুয়াড়ীদের মধ্যে বাবুল চারজনকেই চেনে আগে থেকে। জহির, বাচ্চু, মণিলাল, বসির। খেলার নেশায় সবাই গম্ভীর। অপরিচিত দু'জনের মধ্যে একজনের মুখে জঙ্গলের মতন দাড়ি, মাথায় টুপি।

পল্টন বললো, দ্যাখো দ্যাখো কে এসেছে দ্যাখো। আর একটা পুরানো পাপী।

সবাই মুখ তুলে তাকালো। মণিলাল হাত তুলে বললো, আরে বাবুল চৌধুরী যে, আদাব, আদাব!

তারপর সে অন্যদের বললো, বাবুল চৌধুরী আইয়া পড়ছে, এখন খেলা ছাড়ান দাও, ওর খবর শুনি।

বসির বললো, দাঁড়াও, এই রাউণ্ডটা শেষ করো। আমি ভাই প্রচুর হারছি। বাবুল, খেলবি নাকি?

বাবুল স্মিত হেসে মাথা নাড়লো, সে কোনো রকম তাস খেলাই জানে না।

পল্টন একটা খালি গেলাস তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী খাবি, জিন না বীয়ার?

বাবুল মদ্যপানও করে না, কিন্তু সে কথা প্রথমেই বললে এরা হই হই করে উঠবে, তাই বললো, আগে শুধু পানি খাবো, যা গরম!

মণিলাল নিজের পাশের জায়গাটা চাপড়ে বললো, আসো বাবুল, এইখানে বসো। বাবুল জিজ্ঞেস করলো, মণিদা, তোমার ব্যবসাপত্তর কেমন চলছে?

মণিলাল বললো, ভালো। আমার তাসটা একটু ছুঁইয়া দাও তো, যদি লাক ফেরে। ঐ জহিরটা ডাকাইতের মতন জেততে আছে।

দাড়িওয়ালা, টুপি মাথায় লোকটি মুখ তুলে বললো, কী রে, বাবুল, ঢাকায় ফিরলি কবে?

কণ্ঠস্বর শুনে বাবুল চমকে উঠে বললো, আরে, কামাল? কী সাজ করেছিস? আমি তো চিনতেই পারিনি। ভাবলাম বুঝি কোন্ এক মোল্লার পো এসে বসেছে!

কামাল বললো, হ্যাঁ মোল্লাই সেজেছি। কোন্ পাড়ায় আছি জানিস না তো! আমার বাসার লোকেরা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে!

–কেন, কী হয়েছে?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কামাল তার পাশের লোকটিকে দেখিয়ে বললো, তুই বোধহয় এরে চিনিস না। ইনি ইউসুফ সাহেব, মীরপুরে থাকেন।

ইউসুফ বেশ গোলগাল, গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় চুল লালচে রঙের, চোখে ঈষৎ রঙীন চশমা। সে হাত তুলে বললো, আস্সালাম আলাইকুম।

পল্টন বললো, ইউসুফ সাহেব আমারই মতন এক মোহাজের। ওঁর বাড়ি ছিল বিহারের ভাগলপুর জেলায়!

বসির বললো, মোহাজের কী রে ব্যাটা! বল্ রিফিউজি! ঐ কথাটা বুঝি বলতে খারাপ লাগে?

বাবুল ইউসুফের দিকে তাকিয়ে আলাইকুম'আস্সালামজানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপ ক আয়া?

দু'তিনজন সমস্বরে বললো, আরে এ বাংলা জানে, বাংলা জানে!

ইউসুফ বললো, আমি এসেছি গত বছর। কাশ্মীরে হজরত বাল চুরি হবার পর যে দাঙ্গা হলো, তখন আর থাকা গেল না।

কামাল বললো, কাশ্মীরের রসুলুল্লাহের পবিত্র কেশ কে বা কারা চুরি করলো, আর তার জন্য বিহারে হাজার হাজার মানুষ মরলো।।

বসির বললো, সত্যিই কি রসুলুল্লাহের পবিত্র কেশ সেখানে ছিল? সত্যি কেউ চুরি করেছিল? তাও তো কেউ জানে না! শুধু একটা গুজবের জন্য ইন্ডিয়ায় মরলো কত নিরীহ লোক!

পল্টন বললো, আর এখানে কী হয়েছিল? ঢাকায়, নারায়ণগঞ্জে? এখানে যা হয়েছে সেটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও নয়, একতরফা খুন। আমি নিজের চোখে কত দেখেছি, ভাবলেও এখনো বমি আসে। গড় অঞ্চলের আদিবাসীরা, সে বেচারিরা কাশ্মীরের নামও শোনেনি

জহির মণিলালের পিঠে এক চাপড় মেরে হাসতে হাসতে বললো, এই মণিটা গত বছর বড় বাঁচা বেঁচে গেছে! ব্যাটার কাছে আমার অনেক টাকা ধার। আমি ওরে হাতের কাছে পাইলে সেই সুযোগে বিসমিল্লাহ্ আল্লাহ আকবর বলে কোরবানি করে দিতাম।

মণিলাল হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, ভাই ওসব কথা বাদ দাও! খ্যালতে চাও তো খ্যালো, না হয় অইন্য কথা কও!

কামাল বললো, ঐ কাশ্মীর হইলো ইন্ডিয়া-পাকিস্তান দুই দেশেরই গলার কাঁটা! মণিলাল রাগের সঙ্গে বললো, আবার ঐসব কথা!

পল্টন ঘরের সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর বাবুলকে জিজ্ঞেস করলো, তুই গত বছর সেই সময় কোথায় ছিলি?

বাবুল উত্তর দিল, বরিশালে। সেখানে বিশেষ কিছু হয়নি। হাওয়া গরম হয়েছিল বটে খানিকটা, স্থানীয় লোকরা আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন ছড়াতে দেয়নি।

পল্টন বললো, তুই বোধ হয় জানিস না, জহির সেই সময় অনেক কাজ করেছে। ওর চেষ্টায় বেঁচে গেছে শত শত মানুষ। মণিলাল ওর বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল এক মাস।

জহির বললো, আরে ধ্যাৎ, আমার বাসায় কে কইলো তোরে, আমার এক মামার বাসায়। সেখানে আমি যাওয়ার চান্স পাই নাই। নইলে সত্যিই সেই মওকায় আমার সব ধার কাটান কুটিন করে ফেলতাম! এই শালার সাথে তাস খেলতে বসলেই আমি হারি।

মণিলাল বললো, আজ তুই জেতোস!

জহির বললো, ঐ জন্যই তো তুই তখন থেকে খেলা ভণ্ডুল করার সুযোগ খুঁজছিস! শালা কায়স্থর কুটিল বুদ্ধি!

পল্টন বললো, গেলাস খালি কেন, গেলাস খালি কেন?

এর পর কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ রেখে ব্যক্তিগত খবরাখবর বিনিময় হলো। বাবুলকে দেখে সবাই খুশী। বাবুল কম কথা বলে, কিন্তু এক একজনের উপস্থিতির মধ্যেই একটা মনোরঞ্জনের ব্যাপার থাকে, বাবুলকে সেই কারণে সবাই ভালোবাসে।

এক সময় কামাল বললো, জানিস বাবুল, ইউসুফ সাহেব ভাল বাংলা গান জানে। বাবুল কৌতূহলী হয়ে তাকাতেই ইউসুফ লাজুকভাবে বললো, আমি ভাগলপুরের বাংগালীদের ইস্কুলে কিছুদিন পড়ালিখা করেছিলাম। তখন দু'চারটা রবীন্দর সঙ্গীত শিখেছি। সব গানের কথা মনে থাকে না।

–এই পল্টন, তোর বাড়িতে গীতবিতান নেই?

–আছে, কিন্তু ইউসুফ বাংলা পড়তে জানে না। একদিন দেখি কি, উর্দু হরফে রবীন্দ্রসঙ্গীত সামনে রেখেছে, তাই দেখে দেখে গাইছে। ইউসুফ, তোমার পকেটে সেই কাগজ নেই?

ইউসুফ মাথা নেড়ে বললো, আজ তো সঙ্গে আনিনি, আর একদিন শুনাবো! কামাল তবু পীড়াপীড়ি করে বললো, দু'চার লাইন গাও! যেটুকু মনে আছে!

শেষ পর্যন্ত ইউসুফ রাজি হয়ে চোখ বুজে খানিকক্ষণ সুর ভাঁজলো। তার কণ্ঠস্বর শুনলেই বোঝা যায় ক্লাসিকাল ট্রেনিং আছে। তারপর সে যে-গানটি শুরু করলো তা শুনে একই সঙ্গে চমকিত ও পুলকিত হলো বাবুল। "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ সখা বন্ধু হে আমার...।" গানটি বাবুলের খুবই প্রিয়।

গানটি শুনতে শুনতে বাবুলের একটা নতুন উপলব্ধি হলো।

ভারত থেকে অনেক মুসলমান চলে এসেছে এদিকে, এই সব রিফিউজিরা পূর্ব পাকিস্তানে নানান সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বিহার থেকে যারা এসেছে, তাদের সম্পর্কে স্থানীয় মানুষদের মনোভাব মোটেই ভাল নয়। এই বিহারীরা বাঙালীদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে না, এদের সমমর্মিতা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে, এরা উর্দু ভাষার পক্ষে, বাংলাভাষী মুসলমানদের এরা খানিকটা কম মুসলমান মনে করে, বাঙালীদের প্রতি এদের যেন অবজ্ঞার ভাব আছে।

বিহারী মুসলমান শুনলে বাবুলের মনেও একটা বিরাগ ভাব জন্মায়। সে মনে মনে বলে, অতই যদি উর্দু ভাষা-প্রীতি আর কট্টর ইসলামী হতে চাও, তাহলে তোমরা ঢাকায় এলে কেন? লাহোরে বা করাচীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেই পারতে!

কিন্তু আজ বাবুল একজন বিহারী মুসলমানকে দেখছো, যে উর্দু হরফে লিখে বাংলা গান গায়। রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে সে, কণ্ঠে কী দরদ! ·

সব মানুষকেই তার জাতি-পরিচয় বা ধর্মীয় পরিচয়ে বিচার করা কত ভুল! বাবুল নিজেকে সব রকম সংস্কারমুক্ত মনে করে, কিন্তু তারও তো এরকম ভুল হয়।

কথা না ভুলে গিয়ে পুরোপুরিই গানটা সুন্দর ভাবে গাইলো ইউসুফ। বাবুল তৎক্ষণাৎ অনুরোধ করলো, আর একটা...

ইউসুফের মেজাজ এসে গেছে, সে এবার ধরলো, "পুরানো সেই দিনের কথা ...সেও কি ভোলা যায়..."

ইউসুফের গান শুনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে পল্টনের স্ত্রী নীলা। বাবুল হাতছানি দিয়ে বললো, ভাবী, আসুন, এখানে এসে বসুন।

নীলা কলকাতার মেয়ে, এখনো পূর্ব বাংলার ভাষা একটুও বলতে পারে না। পল্টনও ভালো মতন পারে না, কিন্তু চেষ্টা করে। নীলার সে চেষ্টাও নেই। সে বরং মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, তোমাদের বাঙালদের ভাষা বাপু আমি বুঝি না!

নীলার পাশে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে বাবুল লজ্জা পেয়ে গেল। এই মেয়েটি নীলার ছোট বোন, এর নাম দিলারা। এই দিলারার সঙ্গে বাবুলের বিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। পল্টন দিলারার সঙ্গে বাবুলের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তো বটেই, একবার সবাই মিলে এক সঙ্গে পিকনিকে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাবুল ততদিনে মঞ্জুকে দেখে ফেলেছে। মঞ্জুই জুড়ে আছে তার ধ্যান জ্ঞান।

দিলারার অবশ্য বিয়ে হয়ে গেছে এতদিনে। তার ব্যবহারে কোনো আড়ষ্টতা নেই। নীলার সঙ্গে এসে সেও বসলো বিছানার এক ধারে।

মহিলাদের প্রতি সম্ভ্রম দেখাবার জন্য অন্য সবাই মদের গেলাস নামিয়ে রাখলো, একমাত্র পল্টন ছাড়া। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে গান শুনে একটু

একটু দুলছে। বাবুল আগে জানতো, পল্টন খুব একটা গানের ভক্ত নয়। বেশিক্ষণ গানটান চললে সে অধৈর্য হয়ে উঠতো। এখন কি তার স্বভাব বদলেছে?

নীলা আর দিলারা বসেছে একেবারে বাবুলের মুখোমুখি। বাবুল সামনের দিকে চোখ তুলতে পারছে না, দিলারার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে ফিরিয়ে নিচ্ছে চোখ। দিলারার মুখের গড়ন অনেকটা পানপাতার মতন, মাথার চুল কোঁকড়া, চোখদুটি ঢলঢলে। সে কিন্তু বেশ সপ্রতিভ, এক সময় সে নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছেন বাবুলভাই? মঞ্জুভাবীকে নিয়ে এলেন না কেন?

বাবুল অস্পষ্ট ভাবে বললো, না, ও আসতে পারতো না, ছেলের একটু জ্বর।

পল্টন বললো, তোর ছেলে হয়েছে বুঝি? সে কথা আমাদের বলিসনি এতক্ষণ? খাওয়াবি না আমাদের?

কামাল বললো, জিন তো ফুরিয়ে গেছে। বাবুলকে দিয়ে আর একটা বোতল আনাও!

গান থেমে গেছে। নীলা উঠে দাঁড়িয়ে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো, তোমরা আরও খাবে? এবার বন্ধ করো!

পল্টন বললো, এর মধ্যেই কী? তোমার রান্না হয়েছে?

জহির জিজ্ঞেস করলো, কী রান্না করেছেন ভাবী? শুঁটকি মাছ হয়েছে নাকি? তাহলে এখন নিয়া আসেন, একটু চাঁট হিসাবে খাই!

নীলা কলকাতার মেয়ে হলেও এখানে এসে চমৎকার শুঁটকি মাছ রান্না করতে শিখেছে, জহিরের বাড়ি চট্টগ্রামে, সেও সার্টিফিকেট দিয়েছে।

নীলা দু প্লেট খুঁটকি মাছ নিয়ে এলো, একটা চিংড়ির, অন্যটা বম্বে ডাকের। পল্টন খাটের তলা থেকে আর একটা নতুন জিনের বোতল বার করে সগর্বে দেখালো। মণিলাল-

জহিররা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললো, সাবাস মিঞা! আরে পল্টন তো দেখছি খুব রিসোর্সফুল!

এবারে বাবুলকেও ঢেলে দেওয়া হলো একটা গেলাসে। বাবুলের গোঁড়ামি নেই, কিন্তু মদে সে বিশেষ স্বাদ পায় না। অনেকখানি সোড়া ঢেলে একটুখানি জিভে ছুঁইয়ে সে সরিয়ে রাখলো গেলাসটা।

রুটি ছিঁড়ে খানিকটা শুঁটকি মাছ মাখিয়ে মুখে ভরে দিয়ে জহির দু'চোখ ঘোরাতে লাগলো। তারপর বললো, অমৃত! অমৃত! নীলা ভাবী, তোমার জবাব নেই!

বাবুলও খানিকটা শুঁটকি মাছ খেয়ে দেখলো। হ্যাঁ, অমৃতই বটে। তবে অমৃতের স্বাদ মিষ্টি না টক না তীব্র ঝাল তা কোনো বইতে লেখা নেই। এত ঝাল বাবুলের সহ্য হয় না। বাবুলদের বাড়িতে এই সব রান্নার চল নেই।

ইউসুফ বিহারের মানুষ, সে জানে না শুঁটকি খেতে। অন্যরা হই হই করে দীক্ষা দিতে লাগলো তাকে। তিন চারজন বেশ মাতাল হয়ে গেছে, পল্টনই সব চেয়ে বেশি। ইউসুফের মুখের সামনে বীয়ারের গেলাস ধরে সে বলতে লাগলো, ঝাল লেগেছে, তাতে কী, বীয়ার খাও, বীয়ার খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

এই সুযোগে উঠে পড়লো বাবুল। তাকে বাড়ি ফিরতে হবে, মঞ্জু বসে থাকবে। বাবুলের সঙ্গে সঙ্গে কামালও বেরিয়ে এলো জোর করে। দু'জনে হাঁটতে লাগলো বড় রাস্তার দিকে।

কামাল বেশ শক্ত ধরনের মানুষ, তার একটুও নেশা হয়নি। বাংলা বাজারে বইয়ের দোকানের আড্ডায় কামাল ছিল প্রধান তাত্ত্বিক, কথায় কথায় উদ্ধৃতি দিত নানা বই থেকে।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, তুই এরকম পোশাক করেছিস কেন বললি না তো!

কামাল বললো, তুই শুনিসনি, আমার বাবা গত বছর প্রচণ্ড মার খেয়ে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গেছেন!

–কেন, মার খেয়েছিলেন কেন? কারা মেরেছিল?

–উনি দাঙ্গা থামাতে গিয়েছিলেন। তুই জানিস না বোধ হয় আমার বাবা সত্যিই এক মৌলবীর সন্তান, কিন্তু এখনকার মৌলবীদের সঙ্গে ওনার মেলে না। আমাদের পাড়াটা হয়েছে জামাতে ইসলামীদের আড্ডা।

–তুই এখন কাজকর্ম কী করিস?

–সিনেমা লাইনে গেছি, ডায়লগ-স্ক্রিপ্ট লিখি।

–বাংলা সিনেমা! এগুলি তো একেবারে অগ্রাহ্য!

–কিন্তু এটাই সবচেয়ে নিরাপদ লাইন। আর কিছু করে খেতে হবে তো। পয়সা মন্দ দেয় না!

বাবুল হাসতে লাগলো। কামালের মতন পড়ুয়া মানুষ, মার্কসবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে কথায় কথায় তর্ক তুলতো, সে প্যানপেনে প্রেমের গল্প মার্কা নিকৃষ্ট বাংলা ছবির সংলাপ লিখছে, এটা যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

কামাল একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকটা দুঃখের সঙ্গে বললো, জানিস বাবুল, আত্মগোপন করতে গিয়ে কিছুদিন পর অনেকে আত্মপরিচয়টাই ভুলে যায়। আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা। পলিটিকস করা যখন নিষিদ্ধ হয়ে গেল, তখন মিলিটারির ভয়ে অনেকেই অন্য লাইনে চলে গেল। পল্টনের মতন কেউ কেউ মজে গেল মদ-ভঙের নেশায়। কিন্তু এইভাবে তো দেশটা চলতে পারে না। কিন্তু অবস্থার তো আবার বদল হয়েছে, এখন আবার কিছু একটা করার সময় এসেছে, তবু অনেকেই মজে আছে নেশায়। আর বার হতে পারছে না। আজকের আড্ডাটা দেখে তোর কী মনে হলো?

কামালের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবুল খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে বললো, এখন আবার সময় এসেছে বুঝি?

কামাল বললো, কেন, তুই বুঝতে পারছিস না? আকাশে মেঘ গুরুগুরু করছে, আবার একটা বড় ঝড় আসবে, আমরা যদি সেই ঝড়ের সুযোগ না নিতে পারি...

বাবুল উদাসীন ভাবে বললো, না, আমি তো সেরকম কিছু বুঝতে পারছি না! আমি এখন আর বুঝতেও চাই না!

৯ প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট দিয়ে

প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে বকুল গাছের নিচে দাঁড়ালো অলি। চারটে বেজে গেছে, তাদের বাড়ির গাড়ি এখনও আসেনি। অলির কাছে পয়সা আছে, সে অনায়াসে বাসে চড়ে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু গাড়িটা আসবার কথা, যদি জ্যামে আটকে গিয়ে থাকে তা হলে এরপর এসে ড্রাইভার কী করবে, বুঝতেই পারবে না। তাদের ড্রাইভার মন্মথর বুদ্ধি বড় কম, সে অলিকে না পেয়ে হয়তো এখানেই সারা সন্ধে বসে থাকবে।

শ্যামবাজারের দিক থেকে একটা মিছিল আসছে। মিছিলটা কাছে এসে পড়লে আর রাস্তা পার হওয়া যাবে না।

তার পাশে আর তিনটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো। মালবিকা, নাসিম আর বর্ষা, এরা তিনজনেই হিস্ট্রি অনার্সের। মালবিকা থাকে ভবানীপুরের দিকে, মাঝে মাঝে অলির সঙ্গে ফেরে। সে জিজ্ঞেস করলো, অলি, এক্ষুনি বাড়ি যাবি? আমরা কফি হাউসে একটু কফি খেতে যাচ্ছি।

অলি ভাবছিল সে কোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে বাড়িতে ফোন করবে কি না। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার অনেক প্রকাশকই তার বাবার চেনা, অলিদের বাড়িতেও অনেকেই আসেন। কফি হাউসে যাবার প্রস্তাব শুনে অলি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

ওরা প্রায় দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে এলো মিছিলটা আসবার আগেই। একটা পুলিসের গাড়ি জোরে হর্ন বাজাতে বাজাতে আসছে উল্টো দিক থেকে।

সিঁড়ির মুখে ইসমাইলের সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটি ছেলে, ওরাও প্রেসিডেন্সির, সায়েন্সের ছাত্র, মুখ চেনা। একজন মুখ ফিরিয়ে আলটা মন্তব্য করলো, এসপ্লানেডে লাঠি চার্জ হচ্ছে। আজ আর বাড়ি ফেরা হবে না।

মালবিকারা কান দিল না ওদের কথায়। অলি ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় কাঁপছে। ওপরে কি বাবলুদা থাকবে? বাবলুদা তো প্রায়ই কফি হাউসে আড্ডা মারতে আসে। অলি আজ নিয়ে মাত্র তৃতীয়বার এলো কফি হাউসে, এখানকার চাচামেচি ও সিগারেটের ধোঁয়া তার পছন্দ হয় না।

বাবলুর সঙ্গে অলির দেড় মাস দেখা হয়নি। সেদিন সেই ঝড়বাদলার দিনে বাবলু অলিকে খুব কাঁদিয়েছিল। আচম্বিতে বাবলু অলির শরীর নিয়ে খেলা করতে শুরু করে, অলির তা একটুও ভালো লাগেনি, চোরের মতন হুড়োহুড়ি করে ওরকম আদর অলির একটুও পছন্দ নয়। তার কাছে প্রেম একটা পবিত্র ব্যাপার, সে মনে মনে স্বপ্ন দেখতো, একদিন কোনো প্রিন্স চার্মিং তার হাতে আলতো করে ঠোঁট চুঁইয়ে বলবে, তোমার জন্য যদি আমি অপেক্ষা করতে চাই, তুমি কি তার অনুমতি দেবে?

অলি কোনোক্রমে বাবলুর আলিঙ্গন ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, ছিঃ, ছিঃ, বাবলুদা, তুমি এরকম? তুমি আর কোনোদিন আমাদের বাড়িতে এসো না!

বাবলু বিশেষ পাত্তা দেয়নি, হাসছিল। অলি দ্বিতীয়বার ঐ একই কথা বলায় বাবলু বলেছিল, এ বাড়িতে আসবো কি না আসবো, সে সম্পর্কে তুই বলার কে রে? এটা তোর বাড়ি? এটা কাকাবাবুর বাড়ি, আমার যখন খুশী আসবো!

অলি বলেছিল, আমার সঙ্গে তুমি আর কখনো দেখা করার চেষ্টা করো না! বাবলু অলির মাথায় একটা ছোট্ট চাঁটি মেরে বলেছিল, এতে কাঁদবার কী আছে? এমন কিছু করা হয়নি। তুই কি কচি খুকি নাকি?

তারপর সে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সে বুলির সঙ্গে হাল্কাভাবে দু'একটা ইয়ার্কি করে গেল।

কিন্তু সে আর সত্যিই আসেনি একবারও তারপর। আগে সে সপ্তাহে অন্তত দু'তিনদিন তার বাবার প্রফ বা পাণ্ডুলিপি পৌঁছে দেবার জন্য আসতো বিমানবিহারীর কাছে, সে জন্যও এলো না। বাবলু যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেদিন অলি অনেকক্ষণ কেঁদেছিল, বুকের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য কষ্ট সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সেই চমৎকার বৃষ্টির দিনের ভালো লাগা, তার ওপরে পড়েছিল কালো কালির ছাপ। রাগের চেয়েও বেশি অভিমান হয়েছিল বাবলুর ওপর, সে বন্ধুত্বের মূল্য দিতে জানে না?

এরপর দেখা হলে সে বাবলুর সঙ্গে নিছক ভদ্রতার সম্পর্ক রাখবে ঠিক করেছিল। কিন্তু সে আর এলোই না? এটাও অলির কাছে অবিশ্বাস্য লাগে, এরকম যেন বাবলুর চরিত্রের সঙ্গে মানায় না।

কোনোক্রমে সাতটা দিন পার হবার পর অলিই বাবলুর জন্য ছটফট করেছে। অন্তত ঝগড়া করার জন্যও তার বাবলুকে দরকার। কিন্তু কোথায় বাবলু? সে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। অলিদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই তার যাতায়াতের পথ, প্রত্যেক বিকেলবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকেও অলি তাকে একবারও দেখতে পায়নি।

বাবলুদের বাড়ি বেশি দূরে নয়, অলি ইচ্ছে করলেই যেতে পারে। আগে তো তারা দুই বোনে বাড়ির একজন কাজের লোককে সঙ্গে নিয়ে কতবার গেছে। কিন্তু সেদিনের পর

অলি কেন যেন বাবলুদের বাড়িতে যেতে সাহস পায় না। ওকে তো বিশ্বাস নেই, হঠাৎ সকলের সামনে কী বলে দেবে কে জানে!

কফি হাউসে বাবলু আসে, কিন্তু অলি একা একা কফি হাউসে বাবলুকে খোঁজার জন্য আসার কথা ভাবতে পারে না। বাবলু সম্পর্কে তার মনের মধ্যে একটা ভয়ও ঢুকে গেছে।

দোতলায় উঠে মালবিকা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় বসবি?

বর্ষা বললো, ওপরে, আরও ওপরে, এই জায়গাটা বিচ্ছিরি!

দোতলায় কফির দাম একটু কম। এখানে সব টেবিল জুড়ে বসে থাকে আড্ডাধারীরা, কেউ কেউ দুপুর তিনটেয় বসে, রাত আটটার আগে ওঠে না। তিন কাপ কফি পাঁচজনে ভাগ করে খায়। কলকাতার একমাত্র এই কফি হাউসেই ফরাসী নিয়ম, এখানে কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিছু অডার না দিয়ে চেয়ার দখল করে বসে থাকলেও বেয়ারারা তাকে উঠে যেতে বলার সাহস পায় না।

তিনতলার ব্যালকনিতে খরচ সামান্য বেশি, মেয়েরা সাধারণত এখানেই আসে। এখানে সহজে টেবিল ফাঁকা পাওয়া যায় না, চেয়ার টেনে নিয়ে অন্যের টেবিলে বসে পড়ার প্রথা আছে। আজ কিন্তু দু'তিনটি টেবিল খালি। কয়েকটি ছেলে জানলার পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে রাস্তায়।

ওরা চারজনে একটা টেবিলে বসলো। মালবিকা আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বললো, আমার মাটন ওমলেট খেতে ইচ্ছে করছে। জানিস, বাড়িতে এটা বানাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখানকার মতন স্বাদ হয় না।

বর্ষা জিজ্ঞেস করলো, দুধ দিয়েছিলি?

-দুধ?

–ডিমটা ফ্যাটাবার সময় কয়েক ফোঁটা দুধ দিতে হয়। তাতে ওমলেটটা বড় হয়ে ফুলে যায় আর নরম হয়।

–ওমা, সেটা জানতুম না।

–আমাদের বাড়িতে আসিস একদিন, করে দেখিয়ে দেবো!

মালবিকা সবার দিকে তাকিয়ে বললো, তাহলে চারটে মাটন ওমলেট বলি?

নাসিম ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বললো, কিন্তু ভাই, উই উইল গো ডাচ্।

বর্ষা বললো, ডেফিনিটলি!

প্রত্যেকেই ছোট ছোট পার্স খুলে দুটি করে টাকা বার করে রাখলো টেবিলের ওপর। নাসিম। বললো, আমি পরে কোল্ড কফি খাবো।

জানলার ধারের ছেলেগুলি কী যেন দেখে হৈ হৈ করে ছুটে গেল নিচে।

অলি টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে দোতলার দিকে তাকালো। সিঁড়ির ডান পাশের কয়েকটি টেবিল ছাড়া আর অনেকখানিই দেখা যায়। তার কোনো টেবিলেই বাবলু নেই। বাবলুর এক বন্ধু কৌশিককে চিনতে পারলো অলি, কৌশিক তার দিকে তাকালো একবার। বাবলু এলে ঐ টেবিলে বসাটাই স্বাভাবিক ছিল। কৌশিকদের টেবিলে কিসের যেন উত্তেজিত তর্ক হচ্ছে।

বর্ষা জিজ্ঞেস করলো, তুই কাকে খুঁজছিস রে, অলি?

টেবিলে ফিরে এসে অলি বললো, তুই চিনবি না। আচ্ছা, বাইরে এত গোলমাল হচ্ছে কেন?

মালবিকা বললো, ঐ যে কী একটা মিছিল এলো দেখলি না? আর পারা যায় না, রোজই মিছিল আর মিছিল।

পাশের টেবিলে বসে আছে তিনটি ছেলে, ওদের অচেনা। তাদের একজন হঠাৎ উঠে এসে বললো, এক্সকিউজ মি, আপনাদের কার কাছে কলম আছে? একটু দেবেন?

'আপনাদের' বললেও ছেলেটি হাত বাড়িয়েছে নাসিমের দিকে। এই চার কন্যার মধ্যে নাসিমই সবচেয়ে দর্শনীয়া। সে খানদানি মুসলমান বংশের মেয়ে, তার গায়ের রং দুধে-আলতা। অন্য তিনজনের তুলনায় সে বেশি লম্বা।

নাসিম কলমটা এগিয়ে দিল। ছেলেটি নিজের বাঁ-হাতের তালুতে একটুকরো কাগজ রেখে খস খস করে কিছু লিখে কলমটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ!

অন্য তিনজন মুখ লুকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। সবাই জানে, এই কলম চাওয়াটা আর কিছুই না, একটু আলাপ করার ছুতো। ওরা সম্পূর্ণ গম্ভীর না থাকলে হয়তো ছেলেটি আরও কিছু বলতো। কিংবা, ঐ ছেলেটি তার বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলেছে, দ্যাখ, ঐ ফর্সা মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে পারি কি না।

নিচের তলায় কারা যেন হুড়োহুড়ি, দৌড়োদৌড়ি করছে, একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হলো। পাশের টেবিলের ছেলে তিনটি উঠে গিয়ে দেখলো উঁকি দিয়ে, কিন্তু এই চার কন্যার কোনো কৌতূহল নেই।

মাটন ওমলেট সত্যি বেশ উপাদেয়। ওদের খিদেও পেয়েছিল। পয়সার হিসেব করে দেখা গেল, ওরা সিঙ্গ-এর বদলে ডাবল ডিমের অডার দিলেও পারতো। এরপর কফি। প্রথম চুমুক দিয়ে নাসিম জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, 'পরফিরিয়াজ লাভার' কবিতাটা ব্রাউনিং-এর লেখা, তাই না?

অলি মাথা নাড়লো।

নাসিম আবার জিজ্ঞেস করলো, কবিতাটা ভালো মনে পড়ছে না, পরফিরিয়াকে তার প্রেমিক গলা টিপে মেরে ফেললো, তাই না?

অলি বললো, গলা টিপে নয়, পরফিরিয়ারই চুল জড়িয়ে।

-কেন মেরেছিল? একটু বলো না। অলি ইংলিশ অনার্সের ছাত্রী, তাকে ওরা মাঝে মাঝে এই সব প্রশ্ন করে।

অলি মৃদু গলায় কবিতাটা বর্ণনা করতে লাগলো, মালবিকা একটু অন্যমনস্ক, সে শুনছে না। বর্ষা তার ভোলা চুলে আঙুল চালাচ্ছে। বর্ষা কখনো চুলে খোঁপা করে না, ঐরকম আঙুল চালানো স্বভাবের জন্য তার চুল সব সময় উস্কোখুস্কো দেখায়। সে কোনোরকম প্রসাধনই করে না। দিনের পর দিন একটা শাড়ি পরে কলেজে আসতেও তার লজ্জা নেই। বর্ষার বাবা মারা গেছেন কিছুদিন আগে, তার বাড়ির অবস্থা সচ্ছল নয়।

বর্ষা হঠাৎ মন্তব্য করলো, অদ্ভুত কবিতা। শুধু শুধু মেয়েটাকে মেরে ফেললো? পুরুষরা এইরকমই লেখে। ওথেলো ডেসডিমোনাকে মেরে ফেললো কী একটা তুচ্ছ সন্দেহ করে!

অলি থেমে গেল।

বর্ষা আবার জিজ্ঞেস করলো, নাসিম, হঠাৎ তোর এই কবিতাটার কথা মনে পড়লো কেন?

নাসিম দুঃখিত স্বরে বললো, আমার এক বোন, আমার ফুফার মেয়ে, এলাহাবাদে থাকতো, সে হঠাৎ আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু তাকে একজন ভালোবাসতো খুব!

বাইরে রাস্তায় পর পর দুটি বোমা পড়ার প্রচণ্ড শব্দ হলো।

বর্ষা বললো, সেই লোকটা তোর বোনকে মেরে ফেলেছে?

মালবিকা বললো, এই, বোমা টোমা পড়ছে, কী করে যে বাড়ি যাবো?

বর্ষা বললো, ওসব একটু বাদে থেমে যাবে! বোস্ না! নাসিম কী বলছে শোন।

নাসিম বললো, আমার বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে সুখী ছিল না, আমি জানতাম, আমাকে চিঠি লিখতে প্রায়ই, ঐ যে আর একজনের কথা বললাম, সে-ও আমার দূর সম্পর্কের ভাই হয়।

-তাহলে তার সঙ্গেই বিয়ে হলো না কেন? তোদের তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিয়ে হয়।

-আমার সেই ভাইয়ের একবার টি বি হয়েছিল।

হুড়মুড় করে লোক ঢুকে আসছে দোতলায়। দড়াম দড়াম করে জানলা বন্ধ হবার শব্দ হচ্ছে। কৌশিক দৌড়ে তিনতলায় উঠে এসে ওদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, বাইরে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে, আর আপনারা এখানে নিশ্চিন্তভাবে গল্প করছেন?

বর্ষা মুখখানা কঠোর করে বললো, আপনি?

অলি বললো, এর নাম কৌশিক, আমি চিনি। কী হচ্ছে বাইরে?

কৌশিক বললো, আপনারা সত্যি অদ্ভুত। শুনতে পাচ্ছেন না? পুলিস গুলি চালাচ্ছে।

নাসিম সরলভাবে জিজ্ঞেস করলো, কখন থামবে?

কৌশিক বললো, পুলিস কি আমাকে জিজ্ঞেস করে গুলি চালাচ্ছে? শিয়ালদার দিক থেকে আর একটা মিছিল আসছে, এরপর আর আপনারা বাড়ি ফিরতে পারবেন না!

মালবিকা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এই, চল চল।

রাস্তায় আবার দুটি বোমা ফাটলো। ধুপ ধুপ শব্দে টিয়ার গ্যাস সেল ফাটার আওয়াজ। তারই মধ্যে মুহুর্মুহু ইনক্লাব জিন্দাবাদ শ্লোগান।

মালবিকা কৌশিককে জিজ্ঞেস করলো, পুলিস কেন গুলি চালাচ্ছে? কিসের মিছিল?

কৌশিক বললো, কিছুই খবর রাখেন না? ক'দিন ধরে খাদ্য আন্দোলন চলছে জানেন না?

বর্ষা বললো, আপনি অত ধমকে ধমকে কথা বলছেন কেন? কাগজে সবই পড়েছি। কিন্তু সে আন্দোলন তো মফস্বলে, কৃষ্ণনগর না কোথায় যেন হচ্ছিল!

কৌশিক অলির দিকে তাকিয়ে বললো, সামনের দিকে বেরুবার উপায় নেই। পেছন দিকে একটা রাস্তা আছে, সেদিক দিয়ে আমি বার করে দিতে পারি। যেতে চান তো চলুন। এরপর যদি আরও গণ্ডগোল বাড়ে...

অলি বললো, আপনি অতীন মজুমদারকে দেখেছেন?

কৌশিক বললো, হ্যাঁ, অতীন একবার এসেছিল দুপুরে, তারপর আর দেখছি না। বোধ হয়। ও মিছিলে গেছে।

-মিছিলে?

-দেরি করবার সময় নেই। যাবেন তো চলুন।

অন্য কোনো টেবিলে এখন আর কেউ নেই। নিচে বিরাট কলরব। ওরা দৌড়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। দোতলায় এসে কৌশিক ওদের বাঁ-পাশের একটা গলি পথে নিয়ে এলো। এর দু'পাশে বইয়ের গুদাম। পুরোনো কাগজ আর আঠার গন্ধ। গ্যামাক্সিন আর মরা আরশোলার গন্ধে দম আটকে আসে।

গলিটা ক্রমশ ঘুটঘুঁটে অন্ধকার হয়ে আসছে। কৌশিক এগিয়ে যাচ্ছে সামনে সামনে, মেয়েরা হোঁচট খাচ্ছে বার বার। ঝলমলে আলোকিত কফি হাউসের বাড়িটার মধ্যেই যে এরকম একটা এঁদো-অন্ধকার গলি থাকতে পারে তা ওরা কেউ কল্পনাই করতে পারেনি।

মেয়েদের মধ্যে একজন হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল একবার, সে চেঁচিয়ে উঠতেই কৌশিক বললো, আস্তে! শুনতে পেলে সবাই এদিক দিয়ে ছুটে আসবে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সে নাসিমের হাত চেপে ধরে জোরালো ফিসফিসানিতে বললো, আমার সঙ্গে আসুন!

একগুচ্ছ বালিকার পরিত্রাতার ভূমিকায় নেমে পড়ে কৌশিক বেশ উত্তেজিত সাহসী হয়ে উঠেছে। বুকের মধ্যে সে বোধ করছে একটা অতিরিক্ত বলিষ্ঠতা।

গলিটা এক প্রান্তে এসে আর একটা সিঁড়ির সঙ্গে মিশেছে। সে সিঁড়িটাও অন্ধকার, ইদানীং ব্যবহারই হয় না মনে হয়। অলি সিঁড়িটা দেখে বুঝতে পারলো, এককালে এটা এ বাড়ির মেথরদের ব্যবহারের সিঁড়ি ছিল। অলিদের বাড়িতেও এরকম আছে।

কোনোরকমে নিচে এসে আরও কয়েকটা দোকান ঘরের পেছন দিক দিয়ে দৌড়ে তারা এসে পড়লো মহাত্মা গান্ধী রোডে। এদিকের মিছিল এখনো এসে পৌঁছোয়নি, পুলিস কর্ডন করে রেখেছে দু'দিকের রাস্তা, সেখানটা ধোঁয়ায় ভরা। একটু দূরেই কোথাও বোমার আওয়াজ হচ্ছে ঘন ঘন।

কৌশিক বললো, কফি হাউসের দোতলা থেকে বোমা ছুঁড়ছে, আপনারা আর একটুক্ষণ থাকলে আর দেখতে হতো না!

মেয়ে চারটি নির্বাক হয়ে গেছে। বছর দু'এক কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় এমন বোমাবাজি আর পুলিসের লাঠি-গুলি চলেনি। সেই জন্য অলি মালবিকাদের এই সব ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। তারা কলেজ করতে আসে, বাড়ি চলে যায়। এইরকম দৃশ্য আগে দেখেনি। খবরের কাগজে মিছিল, আন্দোলন, বোমা-গুলি চালনার খবর তারা দেখে, সব সময় মন দিয়ে পড়েও না, ওসব যেন অন্য জগতের ব্যাপার, তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। একটু আগে তারা ব্রাউনিং-এর একটি প্রণয় গাথার সঙ্গে একটি সত্য ঘটনা মেলাচ্ছিল, জানলার বাইরে কী হচ্ছে তাতে গুরুত্ব দেয়নি।

মালবিকা বললো, কী করে বাড়ি যাবো?

কৌশিক ধমক দিয়ে বললো, আমি না ডাকলে তো আপনারা এখনো বসে বসে গল্পই করতেন। তাহলে বাড়ির বদলে হাসপাতালে যেতে হতো।

সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকজন পুলিস দপদপিয়ে ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক। মূল গোলমালটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির দিকে, বোমার শব্দের বিরাম নেই।

টিয়ার গ্যাসে ছলছল করছে ওদের চোখ। অলির শাড়ির আঁচলে জড়িয়ে গেছে অনেকখানি মাকড়সার জাল।

বর্ষার বাড়ি কাছেই, ঠনঠনের দিকে। সে রাস্তা পার হতে চায়। কৌশিক বললো, সবাই রাস্তা পার হয়ে চলুন, পেছন দিকেই গোলমালটা বেশি। মাথার ওপর হাত তুলুন!

আরও কিছু কিছু লোক রাস্তা পার হচ্ছে, সকলেরই মাথার ওপর হাত তোলা। ওরাও সেইরকম করলেও পুলিসের পক্ষ থেকে কী যেন ধমক দিয়ে বলা হলো তাদের। অলি চোখ বুজে ফেললো। বাবলুদা মিছিলে গেছে? বাবলুদাও পুলিসের দিকে বোমা ছোঁড়ে? কিছুই আশ্চর্য না! বাবলুদা একদিন গর্ব করে বলেছিল, আমি সহজে মরবো না, জানিস! দেখলি না, আমি গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আমি মরলুম না, মরে গেল আমার দাদা!

রাস্তাটা পার হয়ে এসেই বর্ষা সাহস ফিরে পেল। চুলে আঙুল চালিয়ে সে বললো, আমি এবার দৌড়েই বাড়ি চলে যেতে পারবো। তোরা কি করবি? আমার বাড়িতে আসবি?

মালবিকা বললো, না, না, আমাকে যেমন করে তোক বাড়ি ফিরতেই হবে। মা দারুন চিন্তা করবে।

কৌশিক বললো, বাদবাকি আপনারা সব সাউথে? শিয়ালদার দিকে চলুন, ওখানে ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে।

বর্ষা ঢুকে গেল একটা গলির মধ্যে, ওরা এগোলো শিয়ালদার অভিমুখে। বেশি দূর যাওয়া গেল না, ওদিক থেকেও একটা মিছিল আসছে এতক্ষণে। হঠাৎ ছুটতে লাগলো সবাই, পুলিসের কর্ডন ভেঙে গেল, আবার লাঠি চার্জ, ইঁট পাথরের বৃষ্টি।

একটা মানুষের ঢেউতে ধাক্কা খেয়ে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অলি দেখলো, সে কিছু অচেনা লোকের সঙ্গে দৌড়োচ্ছে, আর কোনো উপায়ও নেই, স্রোতের বিরুদ্ধে ফেরা যাবে না।

বেশ কিছু দূরে এসে সেই স্রোতের বেগটা কমে গেল। অলি দেখলো সে একটা পোস্ট অফিসের কাছে চলে এসেছে। এই জায়গাটা তার চেনা নয়, মালবিকা, নাসিম, কৌশিককে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ওরা কি একসঙ্গে আছে, না প্রত্যেকেই আলাদা হয়ে গেছে। অলি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি ওরা তাকে খুঁজে নিতে আসবে?

টিয়ার গ্যাসের জ্বালা তো আছেই, তা ছাড়া প্রচণ্ড অভিমানে অলির কান্না এসে গেল। বাবলুদা কেন আজ কফি হাউসে ছিল না? বাবলুদা থাকলে সে এরকমভাবে হারিয়ে যেতে পারতো?

১০ কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস

কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে বারো জন, সেই তালিকায় অতীন মজুমদারের নাম সবার শেষে। এতে তার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের মধ্যে দুরকম প্রতিক্রিয়া হলো। কোনোক্রমে হলেও সে যে একটা ফাস্ট ক্লাস পেয়ে গেছে তাতেই অনেকে অবাক। কুলেজে সে প্রায়ই ডুব দিত, তার স্বভাবটাই ফাঁকিবাজ ধরনের, শেষের দিকে দু'তিন মাস রাত জেগে সে এরকম একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললো? আবার সিদ্ধার্থ, রবির মতন কয়েকজন অন্ধ ভক্ত আছে, তাদের ধারণা, অতীন একটি জিনিয়াস, সে ফার্স্ট ক্লাস ফাস্ট হতে পারতো অনায়াসে, ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছে।

বাড়িতে অবশ্য সবাই বেশ খুশী। সুপ্রীতি কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দিয়ে এলেন, তিনি বাবলুর নামে মানত করেছিলেন। এবাড়ি থেকে মন্দির বেশ কাছে, তিনি একাই যাতায়াত করতে পারেন। যাবার সময় তিনি মমতাকে ডেকেছিলেন, মমতা একটা তুচ্ছ অজুহাতে এড়িয়ে গেছেন। ইদানীং মমতার ব্যবহার বোঝা খুব শক্ত। এক এক সময় মমতার চোখে এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যেন তাঁর জীবনে সুপ্রীতিই তাঁর প্রধান শত্রু। পিকলুর মৃত্যুর জন্য পরোক্ষে সুপ্রীতিই বুঝি দায়ী! কোনো যুক্তি আছে কি এরকম চিন্তার? পিকলু বাবলু-মুন্নিকে সুপ্রীতি কোনোদিন নিজের সন্তানের চেয়ে একটুও কম করে দেখেননি। বরং পিকলুর প্রতিই তার ভালোবাসা ছিল একটু অন্যায্য রকমের বেশি।

মমতা সব সময় এরকম ব্যবহার করলে অবশ্য এ বাড়িতে আর একসঙ্গে থাকা চলতোই। কিন্তু মমতার ব্যবহার মাঝে মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ বদলে যায়। কোনো কারণে একবার সুপ্রীতিকে আঘাত দিয়ে কথা বললে কয়েকদিন বাদেই সেটা সুধরে নেবার চেষ্টা করেন, খাতির করেন বেশি বেশি। তাতেও সুপ্রীতির অস্বস্তি বোধ হয়। আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন সুপ্রীতি। এ বাড়িতে আসার পর স্বাভাবিক ভাবেই সংসারের কত্রীত্ব তাঁকেই নিতে হয়েছিল, কিন্তু এখন তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন। সংসারের সব রকম কাজে সাহায্য করেন ঠিকই, কিন্তু কবে নুন ফুরোবে, কবে চিনি আনতে হবে, সে হিসেব তিনি আর রাখেন না। তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন, তুতুল পড়াশুনো শেষ করলে তারপর সে বিয়ে করুক বা চাকরি করুক যাই-ই হোক, তখন সুপ্রীতি দেওঘরে মায়ের কাছে গিয়ে থাকবেন।

কালীঘাট থেকে পুজোর প্রসাদ নিয়ে ফেরার সময় সুপ্রীতি দেখলেন, বসবার ঘরে বাবলু রয়েছে তার দু'জন বন্ধুর সঙ্গে। সুপ্রীতি তখনই প্রসাদটা দিতে গিয়েও থমকে গেলেন। মমতার হাত দিয়ে দেওয়ানোই ভালো।

তিনি ভেতরে এসে বললেন, মমো, বাবলুকে ডেকে এই প্রসাদটা মাথায় ছুঁইয়ে দাও। ঠাকুরকে ডেকেছি, ঠাকুর আমাদের মুখ রক্ষা করেছেন।

মমতা অন্যমনস্কভাবে বললেন, ঐ তাকের ওপর রাখুন, ও আসুক ভেতরে, তখন দেবো।

সুপ্রীতি বললেন, তোমরাও নাও।

কিন্তু মমতা সে কথা যেন শুনতে পেলেন না, চলে গেলেন রান্না ঘরের দিকে।

সুপ্রীতির পরনে একটা কালো নরুণ পাড় সাদা শাড়ী। চেহারাটা ইদানীং এত রোগা হয়ে গেছে যে মুখখানা খুব ছোট্ট দেখায়। তাঁর কথায় ও ব্যবহারে যে ব্যক্তিত্বের জোর ছিল তা যেন আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেছে কোথায়। এখন তিনি সব সময় সঙ্কুচিত হয়ে থাকেন। রবারের চটি জুতো জোড়া খুলে বাথরুমে পা ধুয়ে তিনি নিজের খাটে এসে মহাভারত খুলে বসলেন। আজকাল তাঁর খুব বই পড়ার নেশা হয়েছে, অন্য কোনো বই না থাকলে মহাভারতই পড়তে থাকেন যে-কোনো জায়গায়।

একটু পরে বাবলু ভেতরে এসে চেঁচিয়ে বললো, মা রান্না হয়েছে? আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে বেরুবো!

মমতা বললেন, একটু দেরি আছে। চান করে নে আগে!

বাবলু বললো, আজ আর চান করবো না। যা রান্না হয়েছে, দিয়ে দাও, খিদে পেয়ে গেছে খুব।

মমতা মৃদু তাড়না দিয়ে বললেন, এই গরমের মধ্যে চান করবি না কী রে? তোর গায়ের গন্ধে ভূতও পালাবে এবারে। যা, মাথায় একটু জল দিয়ে আয়।

মমতা প্রায় ঠেলতে ঠেলতে বাবলুকে বাথরুমে পাঠালেন। ভেতরে ঢুকেও বাবলু চেঁচিয়ে উঠলো, চান করবো যে, জল কোথায়? মোটে দেড় বালতি জল ধরে রাখা আছে দেখছি। কলে জল নেই।

মহাভারতের পৃষ্ঠা থেকে চোখ সরিয়ে সুপ্রীতি নিজের ঘরে বসে সব শুনছেন। এ বাড়িতে জলের খুব কষ্ট। বাড়িওয়ালা উঠে যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছে। কিছুদিন ধরে প্রতাপের শরীরটা বেশ খারাপ, মাঝে মাঝেই জ্বর হয়, নতুন বাড়ি খোঁজ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় দিনই রাস্তার কল থেকে ভারি দিয়ে জল আনাতে হয়।

কিন্তু সুপ্রীতির মনে খচখচ করছে একটা কথা। মমতা বাবলুকে প্রসাদ দিল না। পুজোর প্রসাদ কি ফেলে রাখতে হয়? ভাত খাওয়ার পরে প্রসাদ খেতে নেই। ছেলেটার খিদে পেয়েছে, এখনই তো গোটা দু'এক সন্দেশ খেয়ে নিলে পারতো।

তুতুল, মুন্নিরা কেউ বাড়িতে নেই, তিনটের সময় আবার জল এসে যাবে, বাবলু ঐ দেড় বালতি জলের মধ্যে এক বালতি দিয়ে স্নান সেরে নিলে পারতো, তা না করে সে রাস্তার কল থেকে জল আনতে গেল। সুপ্রীতি ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন। আজকের দিনেও ছেলেটাকে না খাটালে হতো না? অতি দুরন্ত, অবাধ্য ছেলে ছিল বাবলু, তাকে নিয়ে কত ভয় ছিল, অথচ সে পরীক্ষায় এত ভালো ফল করেছে, আজ সে বেশি বেশি আদর পাবার যোগ্য।

আগেকার দিন হলে সুপ্রীতি উঠে গিয়ে বাবলুকে জল আনতে নিষেধ করতেন। মমতাকে একটু বকতেন। নিজের হাতে প্রসাদ তুলে দিতেন বাড়ির সবাইকে। কিন্তু এখন তাঁর সব ব্যাপারেই যেন দ্বিধা। তিনি আবার মন দিলেন মহাভারতের পাতায়।

খানিকবাদে তাঁর মনে একটা অন্য রকমের ভয় এলো। বাবলুর নামে তিনি পুজো দিয়ে এসেছেন, সেই প্রসাদ ছেলেটাকে না খাওয়ালে ওর অকল্যাণ হবে না? মমতা ভুলে গেলেও তাঁর মনে করিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি মহাভারতখানা মুড়ে রেখে খাট থেকে নামলেন।

বাইরে থেকে জল এনে কোনোরকমে কাক স্নান সেরে বাবলু খাওয়ার টেবিলে এসে বসেছে। মমতা তাকে ভাত বেড়ে দিচ্ছেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত ভাবে সুপ্রীতি বললেন, মমো, ওকে প্রসাদ দিলে না?

মমতা বললেন, ও বাবলু, ঐ যে বারান্দার তাকে প্রসাদ আছে, একটু খেয়ে নে তো! মানত করা প্রসাদ গুরুজনদের কারুকে নিজের হাতে দিতে হয়। সুপ্রীতি বাবলুর নামে পুজো দিয়েছেন বলেই কি মমতা ঐ প্রসাদ সম্পর্কে কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছেন না?

বাবলু উঠে গিয়ে শালপাতার ঠোঙাটা খুলে টপ করে একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিয়ে বললো, বাঃ, খেতে ভালো তো! পিসিমণি, কোন দোকান থেকে কিনেছো?

সুপ্রীতি আস্তে বললেন, ঐ তো মন্দিরের পাশেই...আগেই খেয়ে ফেললি? কপালে একবার ছোঁয়াতে হয়!

-তা হলে আর একটা খাই?

আর একটি সন্দেশ নিয়ে বাবলু সাড়ম্বরে কপালে ও মাথার চুলে ছুঁইয়ে গলার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলো, কিসের প্রসাদ?

সুপ্রীতি বললেন, তোর নামে পুজো দিয়েছি। তুই ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল। করেছিস!

বাবলু সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললো, আমরা খেটে খুটে ভালো রেজাল্ট করবো, আর পুজো পাবে মা কালী! বেশ মজা! পুরুতরা নিশ্চয়ই এর থেকে হা সন্দেশ মেরে দিয়েছে!

বাবলুর এ ধরনের কথাবার্তায় সুপ্রীতি দুঃখিত হলেন না, ছেলেমানুষরা এরকম বলেই। তিনি বরং খুশী হলেন বাবলু আরও একটি সন্দেশ খেয়ে নিল বলে।

মমতা বাবলুর সামনে ভাতের থালা ধরে দিয়ে বললেন, আগেই অত মিষ্টি খেলে ভাত খাবি কী করে? এবারে ওটা সরিয়ে রাখ।

রান্না ঘরটা লম্বা ধরনের। তারই এক পাশে খাবারের টেবিল পাতা। পুরোনো আমলের বাড়ি, দিনের বেলাতেও এ ঘরে আলো জ্বালতে হয়। দেয়ালে নোনা ধরে গেছে,

একপাশের প্লাস্টার খসে খসে পড়ে মাঝে মাঝে, বাড়িওয়ালা সারাবে না। গরমকালে এই ঘরে বসে খাওয়ার সময় খুব ঘামতে হয়।

ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বাবলু অকস্মাৎ বোমা ফাটার মতন একটি চমকপ্রদ কথা ঘোষণা করলো।

মা ও পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো, আমি আর পড়াশুনো করবো না। এবারে আমি চাকরি করবো!

মমতা আর সুপ্রীতি দু'জনেই একসঙ্গে বললেন, কী?

বাবলুর যা বলার তাতে বলা হয়েই গেছে, সে মিটিমিটি হাসছে।

মমতা বললেন, কী বলছিস পাগলের মতন কথা? তুই আর পড়বি না?

বাবলু বললো, নাঃ! কী হবে এম এসসি পড়ে? আমার আর পড়াশুনো করতে ভালো লাগে না!

মমতা দু'চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, কী সর্বনাশের কথা বলছিস, বাবলু? এত ভালো রেজাল্ট করে কেউ পড়াশুনো ছেড়ে দেয়?

বাবলু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, আমি এমন কিছু ভালো রেজাল্ট করিনি, মা! ডজনখানেক ছেলে-মেয়ে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। প্রত্যেক বছর এরকম ডজন ডজন ফার্স্ট ক্লাস পায়, তারা তাদের বংশের মুখ কতটা উজ্জ্বল করে তা আমি জানি না, তবে তারা কেউ রাজা-উজির হয় না, ভিড়ে হারিয়ে যায়।

সুপ্রীতি মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলেন, তোর এম এসসি পড়তে ভালো লাগে না, অন্য কিছু পড়তে চাস?

বাবলু ঠোঁট উল্টে বললো, অন্য কিছু পড়েই বা কী হবে। পড়াশুনো তো চাকরির জন্য। চাকরির বাজারে এম এসসি যা, বি এসসিও তাই! আমি তো মাস্টারি করতে যাচ্ছি না।

মমতা বললেন, শোনো ছেলের কথা! আমরা যেন আর কিছু বুঝি না। এম এসসি বি এসসি যদি সমানই হবে, তাহলে এত ছেলে এম এসসি পড়তে যায় কেন?

–যাদের বাড়ির অনেক টাকা আছে তারা পড়তে যায়। যারা থোকা সেজে অনেকদিন ছাত্র থাকতে চায় তারা এম এসসি পড়ে, পি এইচ ডি করে, হায়ার স্টাডিজের জন্য বিদেশে যায়। আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমার অন্য কাজ আছে।

–তোর অন্য কাজ আছে মানে?

–মানে, পড়াশুনো ছাড়াও মানুষের আরও অনেক কিছু করবার থাকতে পারে। তা ছাড়া, আমি চাকরি নিয়ে টাকা রোজগার করতে চাই।

–টাকা দিয়ে কী হবে?

–তুমি অদ্ভুত কথা বলছেছা, মা। টাকা দিয়ে কী হবে? টাকার দরকার নেই? আমাদের সংসারের জন্য টাকার দরকার নেই?

–দ্যাখ বাবলু, তুই বড্ড পাকা হয়েছিস! তোমাকে এর মধ্যেই কেউ টাকা পয়সা নিয়ে মাথা ঘামাতে বলেনি। তোমার বাবার যত কষ্টই হোক তোমাদের পড়াশুনোর খরচ কি কখনো আটকেছে? তোমার বাবা চান তুমি শেষ পর্যন্ত পড়াশুনো চালিয়ে যাবে, পিএইচ ডি করবে।

সুপ্রীতি চাইছেন এই কথা কাটাকাটি থামিয়ে দিয়ে অন্য কোনো একটা প্রসঙ্গ শুরু করতে। কিন্তু তিনি সুযোগ পাচ্ছেন না। এবারে তিনি মুখ তুলে দেখলেন, মমতা তাঁর দিকে জ্বলন্ত। চোখে চেয়ে রয়েছে। মমতা কি বলতে চায় যে মা ও ছেলের ঝগড়ার সময় সুপ্রীতির

সেখানে থাকার দরকার নেই? কিন্তু সেখান থেকে চলে যেতে সুপ্রীতির পা সরলো না। বাবলুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি তিনি উদাসীন থাকতে পারেন?

বাবলু ঘাড় গুঁজে খেয়ে যেতে লাগলো।

সুপ্রীতি এবারে নরম ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, বাবলু, তোর যারা বন্ধু, যারা এ বাড়িতে আসে টাসে, তারা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবে না?

বাবলু বললো, দু'একজন পড়বে, দু'একজন অন্য লাইনে যাবে। একজন তার বাবার কারখানায় জয়েন করবে।

-তুই তা হলে একা হঠাৎ চাকরির কথা ভাবলি কেন?

সুপ্রীতিকে থামিয়ে দিয়ে মমতা বাবলুকে ধমক দিয়ে বললেন, আজ এত সাত তাড়াতাড়ি যাচ্ছিস কোথায়? মামা-মাইমাকে প্রণাম করে এসেছিস? ভবানীপুরের কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করবি আজ বিকেলেই। উনি কতবার খোঁজ নিয়েছেন তোর রেজাল্ট বেরুলো কি না।

বাবলু বললো, আর একটু ডাল দাও!

-ইউনিভার্সিটির ফর্ম দিতে শুরু করেছে না? আজই ফর্ম নিয়ে আসবি।

-ফর্ম এনে কী হবে? আমি এম এসসি পড়বো না বললুম তো!

-পড়বি না মানে? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? শোন্, তোর বাবা বলেছেন–

বাবলু হঠাৎ জ্বলে উঠে চিৎকার করে বললো, শোনো মা, বাবা কী চান তা আমি জানি। তুমি কি চাও তাও আমি জানি। তোমরা সবাই চাও আমি যেন দাদার মতন হই! দাদা ভালো ছেলে ছিল, দাদা জিনিয়াস ছিল, সবার কথা মেনে চলতে পারতো! কিন্তু আমি দাদার মতন জিনিয়াস নই! আমি প্রত্যেকটা পরীক্ষা দিই আর তোমরা সবাই হাঁ করে

তাকিয়ে থাকো, আমার রেজাল্ট দাদার মতন হয় কি না দেখার জন্য। ওঃ, আমি আর পারছি না! আমি দাদার মতন নই! আমি অর্ডিনারি। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও!

মমতা হতবাক হয়ে বাবলুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে তাঁর চোখ জলে ভরে গেল। এখনও পিকলুর কোনো প্রসঙ্গ উঠলে তিনি নিজেকে সামলাতে পারেন না। আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে তিনি দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সুপ্রীতিও স্তব্ধ হয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর বাবলুর কাছে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, ছিঃ, বাবলু, মায়ের মনে ওরকম আঘাত দিয়ে কথা বলতে আছে?

বাবলু গলার স্বর একটুও না বদলে বললো, কিছু তো আঘাত দিতে চাইনি, যা সত্যি কথা তাই বলেছি। তোমরা কেউ আমার দিকটা দেখতে চাও না কেন?

-নিশ্চয়ই তোর দিকটা দেখবো। তা বলে আজকের দিনে হুট করে ওরকম একটা কথা বললি?

-আজকের দিনটার স্পেশাল ব্যাপার কী আছে?

-আজ তোর রেজাল্ট বেরিয়েছে, কত আনন্দের কথা

-হুঁঃ! তা আমাকে কেউ আর কিছু খেতে টেতে দেবে না নাকি? এই ডাল-ভাত খেয়েই উঠে যাবো।

-বোস, আমি দিচ্ছি!

মমতা কড়াইতে ছোট ছোট চিঁড়ি মাছ ভাজার জন্য চাপিয়ে ছিলেন, এতক্ষণ এই উত্তেজনার মধ্যে সেদিকে আর নজর দেননি। চিঁড়িগুলো লাল হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো পোড়েনি। সুপ্রীতি কড়াই নামিয়ে চিংড়ি কটা বাবলুর থালায় তুলে দিলেন।

আজ কী কী রান্না হয়েছে তিনি জানেন না। কিছুদিন আগে পুরোনো রাঁধুনী বামুনদিদি বিদায় নিয়ে দেশের বাড়ি চলে যাবার পর আর রান্নার লোক রাখা হয়নি। দিনের বেলার রান্না মমতা একাই করেন আজকাল। সন্ধেবেলার নিরামিষ রান্নার ভার সুপ্রীতির ওপর, এখন কোনো কোনোদিন তুতুলও রান্নায় সাহায্য করে।

বাটিগুলোর ঢাকনা উল্টে উল্টে দেখলেন সুপ্রীতি। আর একটা কুমড়োর তরকারি রয়েছে। বাবলু একেবারেই কুমড়ো খেতে চায় না সেইজন্যই মমতা তাকে ঐ তরকারি দেননি। মাছের ঝোল তো নেই? ঐ ছোট ছোট চিড়িগুলো ছাড়া আর কোনো মাছ রান্না হয়নি? অবশ্য আজকে মাসের আঠাশ তারিখ।

বাবলুকে তিনি আরও একটু ডাল ও ভাত দিলেন। সে এক মনে খেয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা মিষ্টি দই ভালোবাসে, আজকের দিনে ওর জন্যে একটু দই এনে রাখলে হতো।

ওর এম এসসি পড়ার প্রসঙ্গ তিনি আর ভয়ে তুললেন না। এমন কি এই যে বাবলুকে তিনি এখন যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন এতেও তাঁর একটু ভয় ভয় করছে, এজন্য আবার মমতা চটে যাবে না তো! মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি বলে একটা বক্রোক্তি আছে, মাসির বদলে অনায়াসে পিসি করা যেতে পারে।

তিনি আবার বাবলুর পিঠে হাত রেখে অনুনয়ের স্বরে বললেন, খেয়ে উঠে মায়ের পাশে গিয়ে একটু বোস। মা মনে দুঃখ পেয়েছে, তুই গিয়ে একটু ভালো করে কথা বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাবলু ঘাড়টা বেঁকিয়ে সুপ্রীতির দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো, কোনো কথা বললো না। মুখ থেকে তার রাগের জ্বলজ্বলে ভাবটা চলে গেছে।

কিন্তু আঁচাবার পর সে আর একটুও দেরি করলো না। একটা জামা মাথায় গলিয়ে হুড়ুম ধাড়ুম করে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

১১ রেল লাইনের ধারে

রেল লাইনের ধারে একটা ভাঙা পাঁচিলের ওপর দুপাশে দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে বসে বাদাম খাচ্ছে সুচরিত। জায়গাটা একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। সামনেই ঢাকুরিয়া লেক, সেখানে কিছু কিছু আলোর ব্যবস্থা থাকলেও একটু রাত হতেই কায়দা করে নিবিয়ে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে শুধু চোখে পড়ে দু'একটা গাড়ির হেড লাইট। আকাশে আজ চাঁদ নেই।

সুচরিতকে তার নাম ধরে আর কেউ ডাকে না এখন। সে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, তাই তার নাম, ল্যাঙা। সে ভালো করে হাঁটতে পারে না বটে কিন্তু দৌড়োয় হরিণের মতন। রোগা ছিপছিপে শরীর, বেশ লম্বা হয়েছে সে। তার দুই সহচরের নাম লেটো আর মুঙ্গি, ওদের আর কোনো ভালো নাম থাকতে নেই, কোনো পদবীরও দরকার নেই। নামের বদলে অর্থহীন একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। ওরা সরু ঘেরের প্যান্ট পরে, গায়ে রঙীন গেঞ্জি, মুঙ্গির বাঁ হাতে মোটা লোহার বালা, লেটো গলায় একটা রুমাল বাঁধতে ভালোবাসে।

বাদাম শেষ করার পর সুচরিত মুঙ্গিকে বললো, দে, একটা সিগ্রেট দে।

সিগারেট ধরাবার পর লেটো বললো, এবারে অ্যাকশানে যাই?

সুচরিত বললো, আর একটু দাঁড়া। কটা বাজলো?

একমাত্র লেটোর হাতেই ঘড়ি আছে। সে দেশলাই জ্বেলে দেখে নিয়ে বললো, পৌনে আটটা।

সুচরিত বললো, আর একটু লোকজন কমুক।

সারাদিন অসহ্য গুমোট গরম গেছে, আকাশ মেঘলা হলেও দুতিনদিন বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। সন্ধের পর থেকে হু-হুঁ করে আসছে বঙ্গোপসাগরের হাওয়া, অনেকেই বাড়ি ছেড়ে এই কৃত্রিম হ্রদের কিনারে সেই হাওয়া খেতে এসেছে।

এই শহরে তরুণ-তরুণীদের গোপনে দেখা করে মুখোমুখি বসে কিছুক্ষণ হৃদয়-বিনিময় করার জন্য জায়গা পাওয়া খুবই দুর্লভ। মানুষের পায়ের দাপাদাপিতে সব নিভৃত স্থান তছনছ হয়ে গেছে। এই লেকের পাড়ে পাড়ে সন্ধের পর অন্ধকারে ব্যাকুল যুবক-যুবতীরা কোনো রকমে এখানে সেখানে জায়গা খুঁজে নেয়। কিন্তু একটুও সুস্থির হয়ে বসবার উপায় নেই। একজন আর একজনের কাঁধে হাত রেখেছে কি রাখেনি অমনি মাটি খুঁড়ে উঠে আসবে কোনো ভিখিরি বালক। লেকের ধারে প্রেম করতে এলে সঙ্গে অনেক খুচরো পয়সা নিয়ে আসতে হয়। একটি ভিখিরি বালক পয়সা পেয়ে চলে গেলেই আর একজন আসবে। তারপর আসবে ফেরিওয়লা, বাদাম, চকলেট এমনকি ধূপকাঠিও কিনতে হবে, না কিনলে ওরা ঘনিষ্ঠ জড়াজড়ির সুযোগ দেবে না।

তবে সব কিছুরই নির্দিষ্ট সময় আছে। আটটা-সাড়ে আটটা বেজে গেলে যখন লোকজন কমতে থাকে, তখন ভিখিরি-ফেরিওয়ালারাও দূরে সরে যায়, তখন আসে সুচরিতের দল।

বড় গাছের নিচের মনোরম অন্ধকারে পুরোনো কালের একটা কামানের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে একটি বলিষ্ঠ যুবক ও এক তন্বী। ওরা শারীরিক উষ্ণতা বিনিময় করছে না, কোনো গভীর সঙ্কট নিয়ে আলোচনায় এমনই তন্ময় যে কখন যে একটি ছায়ার মতন প্রাণী তাদের ঘিরে ধরেছে তা খেয়ালই করেনি।

লেটো ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বালাতেই যুবকটি উঠে দাঁড়ালো।

সুচরিত জিজ্ঞেস করলো, দাদা, কটা বাজে?

যুবকটি উদ্ধত ভাবে বললো, যটাই বাজুক না কেন!

সুচরিত বললো, আহা রাগ করছেন কেন? আপনার হাতে ঘড়ি রয়েছে তো, তাই জিজ্ঞেস করছি কটা বাজে?

যুবকটি এবারে বাঁ হাত তুলে বললো, আটটা কুড়ি।

সুচরিত বললো, উঁহু, এত কম তো হবার কথা নয়। আপনার ঘড়ি ঠিক আছে? মনে হচ্ছে গোলমাল আছে! দেখি ঘড়িটা একটু দিন তো!

মুঙ্গি ছেলেটির ঘড়িশুধু হাতটা চেপে ধরতেই সুচরিত ধমক দিয়ে বললো, এই এই, গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন? দাদা ভদ্দরলোক, নিজে থেকেই খুলে দেবেন।

যুবকটি ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, আপনারা ভেবেছেন কী? এখানে গুণ্ডামি করতে এসেছেন? পুলিস ডাকবো!

সুচরিত সপ্রশংস দৃষ্টিতে যুবকটির দিকে তাকালো। এর বেশ সাহস আছে স্বীকার করতে হবে। অনেকেরই গলা শুকিয়ে যায়, তো-তো করে। সে মেয়েটির দিকে একবার তাকালো। ভালো বাড়ির মেয়ে, বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়।

সুচরিত হাসি মুখে বললো, পুলিস ডাকতে চান, ডাকুন! আমরা কিন্তু এখান থেকে নড়ছি না।

যুবকটি এদিক ওদিক তাকালো। কাছাকাছি আরও যে কয়েকটি যুগল বসে ছিল, কখন তারা উঠে গেছে। সে বিমর্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার গায়ের জোর আছে, কিন্তু মনের জোর কমে যাচ্ছে। তার ধারণা, পুলিশ ডাকলেই তাদের দু'জনকে সারা রাত থানায় কাটাতে হবে, পরের দিন খবরের কাগজে নাম ছাপা হয়ে যাবে দু'জনের।

সে ঘড়িটা খুলে দিল সুচরিতের হাতে।

লেটো নাকি সুরে আদুরে গলায় বললো, ওকে ঘড়ি দিলেন, আর আমায় কিছু দিলেন না? দশ-বিশটা টাকা দিন অন্তত!

যুবকটি গম্ভীরভাবে বললো, আমার কাছে টাকা নেই।

লেটো বললো, আপনার কাছে না থাকে, দিদিমণির কাছে আছে নিশ্চয়ই! ঐ তো ব্যাগ। রয়েছে।

লেটো ঝুঁকে মেয়েটির হাত ব্যাগটা নিতে যেতেই যুবকটি আর রাগ সামলাতে পারলো না, লেটোকে এক হাতে ঠেলে দিয়ে অন্য হাতে ঠাস করে এক চড় কষালো।

সঙ্গে সঙ্গে মুঙ্গি একটা ছুরি খুলে যুবকটির মুখের সামনে ধরলো।

সব কিছুই আগে থেকে নিখুঁত ভাবে মহড়া দেওয়া। এমনি এমনি এসব কাজ হয় না, বুদ্ধি খরচ করতে হয়। অনেক ছেলে মেয়েই তো এসে বসে, তাদের মধ্য থেকে বেছে নিতে হয় দু'একজনকে, তাদের ওপর ওয়াচ রাখতে হয়। তারপর ঠিক টাইমিংটা বেছে নেওয়াই হল আসল কথা। এই সব শিকারদের কাছ থেকে ধরা বাঁধা দু'তিন রকম ব্যবহারই আশা করা যায়। মেয়েটির মাথায় সিঁদুর না থাকলে কোনো ছেলেই পুলিস ডাকতে সাহস পায় না, বরং পুলিসের নামে ভয় পায়। আর, গায়ে হাত তুলতে সাহস পায় খুব কম ছেলেই।

সঙ্গে ছুরি ছোরা থাকলেও সুচরিত সহজে রক্তারক্তি পছন্দ করে না। মুঙ্গিকে শেখানো আছে, সে শুধু লম্বা ছুরিটা মুখের সামনে তুলবে, আর কিছু না।

সে মুঙ্গিকে নকল ধমক দিয়ে বললো, অ্যাই, আ্যাই ছুরি তুলছিস কেন? দাদার মাথা গরম হয়ে গেছে বলে একটা চড় মেরেছে, তা বলে তুই ছুরি দেখাবি? সরে আয়!

তারপর সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার কাছে যদি কিছু টাকা থাকে তো দিয়ে দিন না। কেন ঝাট বাড়াচ্ছেন?

মেয়েটি তার ব্যাগ খুলতে যেতেই যুবকটি একটি বোকামি করলো। সে বললো, তুমি দিও না, আমি দিচ্ছি!

এর ফলে দু'জনকেই টাকা দিতে হলো। সব শুদ্ধ পঁয়তিরিশ। মন্দ না।

যাবার আগে চরিত একটু ইয়ার্কি করার লোভ সামলাতে পারে না। সে যুবকটির কাঁধ চাপড়ে বললো, দাদা, এ জায়গাটা ভালো নয়, আর বেশি দেরি করবেন না। বাড়ি যান। এসব জায়গায় ঘড়ি হাতে দিয়ে আসেন কেন?

একটু দূরে সরে গিয়ে ওরা তিনজন একসঙ্গে হাসতে থাকে। শোনা যায় মেয়েটির কান্নার ফোঁপানি।

এক রাতে একটার বেশি কেস করতে নেই। তা হলে বদনাম রটে যাবে, ভয়ে আর ছেলেমেয়েরা সন্ধের পর বসবে না। অতি লোভে যে তাঁতি নষ্ট হয় তা সুচরিতরা জানে।

যা পাওয়া গেল তার সবটাই রোজগার নয়, এরও অনেক ভাগ আছে। লিলি পুলের ধারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন কনস্টেবল। একজন অনুচ্চ স্বরে ডাকলো, আরে এ ল্যাংড়া, ইধার আ, শুন শুন্!

সুচরিত বললো আসছি রে বাবা, আসছি। পালিয়ে যাচ্ছি নাকি?

ওরা তিনজন জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে এগিয়ে এসে পুলিস দু'জনকেও সিগারেট দিল। দু'জনেই সিগারেট দুটি রেখে দিল পকেটে। একজন য় বললো, পুরা চাহি শ' রূপিয়া!

সুচরিত বললো, একশো টাকা? পাগল হয়েছে নাকি সেপাইজী? এখানে সব ফালতু পার্টি আসে, পকেটে দশ-পাঁচ টাকার বেশি থাকেই না।

-ঘড়ি কটা পেলি?

-একটা।

–সাচ্ বলছিস?

–তোমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলে কোনো লাভ আছে?

মিথ্যে-সত্যি যাই-ই হোক, সেপাইরা ওদের মুখের কোনো কথাই বিশ্বাস করে না। ওদের একজন সুচরিতদের সমস্ত শরীর থাবড়ে থাবড়ে খুঁজে দেখলো। এমনকি ওদের পুরুষাঙ্গ ধরে নাড়াচাড়া করে কৌতুক করলো খানিকটা।

অন্যজন জিজ্ঞেস করলো, কী ঘড়ি পেয়েছিস? বিলাইতি?

সুচরিত বললো, আরে নাঃ! আজকাল তো সব দেখছি রদ্দি মার্কা দিশি ঘড়ি। কিংবা সস্তার জাপানী মাল!

কিন্তু সেপাইটি সহজে ভোলে না। সে পকেট থেকে একটা কেরোসিন-লাইটার বার করে জ্বেলে ঘড়িটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে অভিজ্ঞের মতন অভিমত দেয়, এ খাঁটি বিলাইতি আছে।

সুচরিত সঙ্গে সঙ্গে বললো, খুব পুরোনো। অন্তত থার্ড হ্যাণ্ড!

সেপাইটি ঘড়িটা তাকে ফেরত দিয়ে বললো, দে পঁচাশ রূপিয়া!

সুচরিত বললো, পঞ্চাশ? হে-হে-হে, পেয়েছিই মোটে তিরিশ-পঁয়তিরিশ।

–ঘড়ি বেচে অনেক পাবি।

–এ ঘড়ির বিশ পঁচিশের বেশি দাম পাওয়া যাবে না।

–হামার সঙ্গে দিল্লাগি করছিস?

–শোনো সেপাইজী, আমাদেরও পড়তা পোষাতে হবে? এখনও দ্যাখো গিয়ে বড় লেকের ওপাশটায় দু'তিনখানা গাড়ি আছে। সেখানে বাবুরা মাল খাচ্ছে আর মাগীদের সঙ্গে চুমোচুমি জড়াজড়ি করছে। সেখানে গিয়ে টাকা চাও না!

–তুই আগে দে!

শেষ পর্যন্ত কুড়ি টাকায় রফা হলো। লেটো আর মুঙ্গি প্রায় চুপচাপ ছিল এতক্ষণ! পুলিসের সঙ্গে দরাদরি করতে সুচরিত একেবারে নাম্বার ওয়ান। পুলিসরাও ওকে পছন্দ করে।

পুলিসের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর ওদের নিজেদের মধ্যে বখরা ভাগ হয়ে গেল। ঘড়িটা মুঙ্গি কিনে নিল পঞ্চাশ টাকায়। সে প্যান্টটা খুলে ফেলে ল্যাঙ্গোটের ভেতর থেকে বার করলো টাকা। সেপাইটি যে এই টাকাটার খোঁজ পায়নি, এটা তার পরম ভাগ্য। সেপাইটি আসলে সুচরিতকেই তল্লাশ করেছে মন দিয়ে।

মুঙ্গি পঞ্চাশ টাকায় ঘড়িটা কিনে নিল, এরপর ওটা বিক্রি করে যত বেশি লাভ করতে পারবে, সেটা তার নিজস্ব। তিনজনের বখরা সমান সমান নয়। দলপতি হিসেবে সুচরিত পায় অর্ধেক, বাকি দু'জন এক চতুর্থাংশ করে। এরপর সুচরিত নিজের টাকায় ওদের মাল খাওয়ার প্রস্তাব দিল।

পঞ্চাননতলা বস্তি থেকে কেনা হলো দু'বোতল চোলাই। তিনটে ভাঁড় জোগাড় করে ওরা বসে গেল রেল লাইনের ধারে। দু'তিন ঢোঁক দেবার পর লেটো বললো, গুরু, আমাদের লেকে আরও একটা পার্টি ঘুরছে। দু'তিনটে কেস হয়ে গেছে, মুড়িওয়ালা ধনাদা খবর দিল।

সুচরিত মাথা নেড়ে বললো, আমিও টের পেয়েছি। কোথাকার দল বল তো? এই পঞ্চাননতলার?

লেটো বললো, মনে হচ্ছে যাদবপুরের। ক'টা ফচকে ফচকে ছোঁড়া। দেবো একদিন চড়িয়ে?

মুঙ্গি বললো, এ শালারা যাদবপুরের রিফিউজি পার্টি। এই হারামীর বাচ্চা রিফিউজিগুলো উইপোকার মতোন সব জায়গায় ঢুকে পড়ছে! তবে লেকে আমাদের কাজে বখরা করলে আমি শালাদের পেটে চাকু চালাবো!

সুচরিত মুঙ্গির ওপর রাগ করলো না। এরা তার পূর্ব পরিচয় জানে না। সুচরিতের উচ্চারণেও কোনো টান নেই। সে যে কাশীপুরের কলোনিতে এক সময় ছিল, তা তার প্রায় মনেই পড়ে না। মা বাবার কথাও মনে পড়ে না। তবে একদিনের জন্যও সে ভোলেনি চন্দ্রাকে।

লেটো বললো, গুরু, ওদের কালকেই ঝাড় দেবো?

সুচরিত বললো, নাঃ, এবার ওদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে, বুঝলি? আমাদের এআর পোষাচ্ছে না। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ। আজ কটা টাকা হলো বল?

মুঙ্গি জিজ্ঞেস করলো, অন্য লাইনে যাবে?

ওদের সামনে দিয়ে খুব ধীর গতিতে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে। সেদিকে আঙুল তুলে সুচরিত জিজ্ঞেস করলো, এই লাইনটা কেমন?

মুঙ্গি বললো, আমাকে বড় তাজু একবার জিজ্ঞেস করেছেলো, আমি হ্যাঁ-না কিছু বলিনি।

লেটো বললো, বড় তাজুটা মহা হারামি, যখন তখন ঝুটি নেড়ে দেয়। ওর আণ্ডারে কাজ করতে গেলে মুখ বুজে থাকতে হবে।

সুচরিত বললো, সেই তো মুশকিল, এ লাইনে ঢুকতে গেলে কারুর না কারুর আণ্ডারে থাকতে হবে। সেটাই যে আমি পারি না।

–তা হলে একটা অন্য লাইন দ্যাখো।

–দেখছি, দেখছি!

আস্তে আস্তে রাত ঘন হয়, শব্দ লুপ্ত হতে থাকে, ওদের নেশা জমে। লেটো আরও এক বোতল চোলাই কেনার জন্য ঝুলোঝুলি করলেও সুচরিত রাজি হয় না। তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। তার বাড়ির টান আছে।

লেকের মধ্যে যেখানে যুদ্ধের সময় সামরিক হাসপাতাল ছিল সেখানে এখন অনেকগুলি রিফিউজি পরিবার জবর দখল করে বসে আছে। এই তো কিছুদিন আগে চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ওদের উচ্ছেদ করার একটা চেষ্টা হয়েছিল। ছেলেমেয়ে বুড়ো সবাই এককাট্টা হয়ে পুলিসের লাঠির সামনে দাঁড়াতে শেষ পর্যন্ত পুলিস হঠে যায়।

ইদানীং আবার নতুন করে উচ্ছেদের হুজুগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন নাকি ক'দিন

আগে এদিক দিয়ে যেতে যেতে বলেছেন, আরে ছি ছি, লেকটাকে একেবারে বস্তি বানিয়ে ফেলেছে? রিফিউজিদের এত আবদার সহ্য করা হবে না!

অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীকে কে যেতে দেখেছে বা তাঁর এই উক্তি কে নিজের কানে শুনেছে তার কোনো ঠিক নেই, কিন্তু এই গুজবটা কলোনির প্রত্যেকের মুখে মুখে ঘুরছে। কেউ কেউ ঘরের মধ্যে লাঠি, সোঁটা জমা করছে।

এই কলোনির একখানা ঘরে থাকে সুচরিত। ঘরখানা তার নিজস্ব নয়। বিপিন নামে একজন মোটর-মেকানিকের কাজ করে, সুচরিতও কিছুদিন একটা গ্যারাজে ওয়েল্ডিং-এর কাজ শিখেছিল, সেই সূত্রে বিপিনের সঙ্গে তার পরিচয়। খাওয়া থাকার জন্য সে বিপিনকে মাসে একশো টাকা দেয়। সুচরিত ভাত খেতে ভালোবাসে, রাস্তার দোকানের খাওয়া তার পছন্দ নয়।

যত রাতেই ফিরুক, সুচরিতের জন্য ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে। বিপিনের স্ত্রীকে সে বড়দি বলে ডাকে। সুচরিতের কোনো কালেই কোনো দিদি ছিল না, তবু বৌদির বদলে বড়দি ডাকটা কেন তার প্রথম মনে এসেছে কে জানে!

এই বড়দির মোটা সোটা আলুথালু চেহারা, পাঁচটি সন্তানের জননী। দুটি সন্তান মারা গেছে, বড় ছেলেটি জেল খাটছে। সে ট্রেনে পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।

সুচরিত ফেরার আগেই বিপিনের সংসারে ঘুমিয়ে পড়ে সবাই। কেরোসিনের খুব অনটন বলে বেশিক্ষণ ওরা কুপি বা হ্যারিকেন জ্বালে না। সুচরিতের ঘরে মোম রাখা থাকে। অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে আন্দাজে আন্দাজে সে মোম খুঁজে নিয়ে জ্বালালো। তারপর রান্না ঘরে এসে খেতে বসলো।

পাশের ঘরটি পুরোপুরি অন্ধকার হলেও বড়দি ঘুমোয়নি। সে বললো, এই ল্যাঙা, কড়াইতে দ্যাখ ডিমের ঝোল আছে। ভাত সবটুক নিস, রাখতে হবে না।

সুচরিত বললো, আচ্ছা!

মন দিয়ে সে খাওয়া শেষ করলো। ভাত, পুঁইশাকের তরকারি, আলুর খোসা ভাজা আর অনেকখানি ঝোলের মধ্যে আধখানা ডিম। ঝোলের স্বাদটা বড় অপূর্ব। ঐ ঝোলের জন্যই সবটা ভাত খেয়ে ফেললো সুচরিত।

বাইরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে সে চটপট করে মেজে নিল নিজের থালা-গেলাস। এসব কাজ সকালে ভালো লাগে না।

সব শেষ করে নিজের ঘরের বিছানা মেলেও সে শুয়ে পড়লো না। একটা সিগারেট জ্বেলে বসে রইলো। এখন প্রতীক্ষার প্রত্যেক দিনই এরকম হয়, নেশা করে এলেও সুচরিত খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ জেগে থাকে। কোনো কোনোদিন বড়দি উঠে আসে তার ঘরে।

দিনের বেলা বড়দিকে দেখে বিশ্বাস করাই শক্ত যে তার ঐ শরীরের মধ্যে এতখানি লোভ আছে। দিনের বেলা সারাক্ষণ সে তার অতি দুরন্ত দুটি ছেলেমেয়েকে সামলাতেই ব্যতিব্যস্ত থাকে। তাছাড়া, উপরি রোজগারের জন্য সে ঠোঙা বানায়। দরজার সামনে সে পা ছড়িয়ে বসে মেশিনের মতন দু'হাতে ঠোঙা বানিয়ে যায়। তার স্বামী বিপিন নিরীহ ধরনের মানুষ। কোনোরকমে যে মাথার ওপরে একটা চাল জুটেছে আর দু'বেলা খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে, তাতেই সে সন্তুষ্ট। সন্ধের পরই সে ঘুমোয়, ঘুমের মধ্যে তার জোরে জোরে নাক ডাকে।

কাপড় চোপড়ের খসখস শব্দ হতেই সুচরিত উৎকর্ণ হলো। আজ বড়দি আসছে। দুঘরের মাঝখানে রান্না ঘর। বাইরের দিক দিয়ে ঢোকার একটা দরজা আছে সুচরিতের ঘরে। উঠোন দিয়ে ঘুরে এসে সেই দরজা প্রায় পুরোটা জুড়ে দাঁড়ালো বড়দি। তারপর আঙুল দিয়ে মোমবাতিটা দেখালো।

সুচরিত ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিতেই বড়দি তার বিছানার ওপর চলে এসে সুচরিতের গায়ে চেপে ধরলো নিজের বুক। বড়দির গায়ে শুধু একটা শাড়ী জড়ানো। সে নিজেই সুচরিতের একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের উরুর ওপর রাখে।

প্রত্যেকবার এই সময়ে সুচরিতের মনে পড়ে চন্দ্রার কথা। বড়দিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সে চন্দ্রার মুখখানা দেখতে পায় অন্ধকারের মধ্যে।

১২ টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে সুলেখা তাকালো ত্রিদিবের দিকে। বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে ত্রিদিব গভীর মনোযোগ দিয়ে চার্চিলের আত্মজীবনী পড়ছেন। রাত এখন পৌনে বারোটা, এত রাতে কে টেলিফোন করলো তা জানার আগ্রহ নেই ত্রিদিবের। পাছে দু'একটা কথা কানে চলে যায় তাই কি তিনি পাশ ফিরেছেন দেয়ালের দিকে? সুলেখা স্বামীর দিকে

একদৃষ্টে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার মাথার মধ্যে পাতলা পাতলা ছায়ার মতন নানারকম চিন্তা ঘুরে যেতে লাগলো।

একটু বাদে সুলেখা শাড়ি ছেড়ে একটা পাতলা রাত পোশাক পরে নিল। আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সে নিজের মুখ দেখে নিজেই নিচু করলো চোখ। তার মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ সে কিছুতেই লুকোতে পারছে না। মুখে ক্রিম মেখে সে এসে দাঁড়ালো জানলার কাছে। কলকাতা শহর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। এখনও রাস্তা দিয়ে মানুষজন যাচ্ছে। তিন চারজন যুবক গল্প করছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, তাদের মধ্যে একজন হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ছে প্রায়, অন্য একজন হাততালি দিচ্ছে। সুলেখা জানলার কাঁচ খোলেনি, তাকে রাস্তা থেকে দেখা যাবে না।

সুলেখা আর একবার মুখ ফেরালো। না ডাকলে বোধ হয় ত্রিদিব সারা রাতই বই পড়ে যাবে।

খাটের কাছে এসে সে বললো, রাতুল ফোন করেছিল।

বই থেকে চোখ না সরিয়ে ত্রিদিব বললো, ও।

এতই ভদ্র সে যে কিছুতেই জিজ্ঞেস করবে না, এত রাতে রাতুল কেন ফোন করেছিল কিংবা কী তার বক্তব্য। ত্রিদিবের এই ভদ্রতার শীতলতা এক এক সময় সুলেখার অসহনীয় লাগে। স্বামীর চরিত্র সে জানে, তবু তার মুখে যাতনার রেখাপাত হয়। রাতুল ত্রিদিবেরই বন্ধু, তবু সে টেলিফোনে ত্রিদিবকে ডাকেনি।

–আলো জ্বালা থাকবে?

–উঁ? হ্যাঁ। নিবিয়ে দিতেও পারো।

–তুমি কী বললে, হ্যাঁ, না না?

–তোমার অসুবিধে হলে আলো নিবিয়ে দাও। সুলেখা বিছানার ওপর এসে স্বামীর বাহুতে থুতনি ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি এখানে, না চার্চিলের সঙ্গে লাহোর বা কাবুলে ঘুরছো?

ত্রিদিব হেসে বললো, থাক, আর পড়বো না। খুব ইন্টারেস্টিং। লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু ইংরিজিটা ভারি সুন্দর লেখে।

সুলেখা নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো, রাতুল তোমার কতদিনের বন্ধু?

–অনেক দিনের। মানে আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়েছে।

–ইস্কুলে একসঙ্গে পড়লেই কি সবাই বন্ধু হয়?

–না, তার কোনো মানে নেই। ছেলেবেলার কত বন্ধু তো হারিয়ে গেছে। কারুকে কারুকে হঠাৎ দেখলেও চিনতে পারি না।

–বন্ধুত্ব কাকে বলে? পুরুষ মানুষদের পরস্পরের প্রতি এক ধরনের ভালোবাসাই তো বন্ধুত্ব?

–হ্যাঁ, তা বলতে পারো। তুমি তো থ্রি কমরেডস পড়েছো, সুলেখা। ঐ হচ্ছে বন্ধুত্ব। কোস্টার নামে ছেলেটি, সে তার বন্ধুর প্রেমিকার চিকিৎসা করাবার জন্য, কী যেন নাম মেয়েটির? প্যাট্রিশিয়া...তার জন্য নিজের অত ফেভারিট গাড়িটা বিক্রি করে দিল।

–হ্যাঁ, থ্রি কমরেডস আমি পড়েছি। রাতুল তোমার বন্ধু নয়। থ্রি কমরেডস-এর মতন বন্ধু তোমার একজনও নেই।

ত্রিদিব চিৎ হয়ে সুলেখার মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে তার কানের লতির নিচে আঙুল দিয়ে আদর করতে করতে বললো, সেরকম বন্ধু নেই, দোষটা বোধ হয় আমার। আমি খুব খোলাখুলি কারুর সঙ্গে মিশতে পারি না। আমি কোনোদিন কোনো ছেলের কাঁধ ধরে

হাঁটিনি...ছেলেরা যেমন হাসতে হাসতে একজন আর একজনের পিঠ চাপড়ে দেয়, সেরকমও করিনি কখনো...আমার ঠিক আসে না... তবে রাতুলের সঙ্গে অনেক দিনের চেনা, মাঝখানে। কয়েক বছর বম্বেতে ছিল...রাতুল, শাজাহান, অমর্ত, নিরুপম এদের তো আমি বন্ধু বলেই মনে করি, অনেকটা রুচিতে মেলে, কথা বলতে ভালো লাগে...

–এরা কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারে কখনো?

–না, না, ক্ষতি করবে কেন? তাছাড়া এদের সঙ্গে তো কোনোরকম স্বার্থের সম্পর্ক নেই। শাজাহান অবশ্য বড় পয়সা খরচ করে আমাদের জন্য, প্রতিদান দেবার সুযোগ দেয় না।

–তবু ওরা কেউ তোমার বন্ধু নয়।

–এ কথা বলছো কেন? তুমি ওদের পছন্দ করো না?

–শোনো, তোমার একজনই বন্ধু আছে। তার নাম সুলেখা।

–সে কথা আর বলতে? তুমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

–কিন্তু তুমি আমায় সব সময় সাহায্য করো না। আমি কখনো কোনো অসুবিধেয় পড়লে তুমি বাচ্চা ছেলের মতন দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো।

–যাঃ, কী বলছো! আমি তোমায় সাহায্য করি না?

–তোমার ছোট কাকা যখন আমাকে ভীষণ বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছিলেন, তুমি আমায় সাহায্য করেছিলে?

–ওঃ, ছোট কাকার ঐরকম স্বভাব. আমি জানতুম তুমি ঠিক সামলে নিতে পারবে।

–তবু তুমি নিজে মুখ ফুটে কিছু বলবে না।

–নিজের কাকাকে কি রূঢ় কথা বলা যায়?

–তা হলে যাকে তুমি বন্ধু বলে মনে করো, কিন্তু আসলে সে বন্ধু নয়, সেরকম কারুকে যদি কিছু বলতে হয়?

একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ আসছে বুঝতে পেরে ত্রিদিব হাই তুললেন। তিনি যে শুধু কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না তাই-ই নয়, তিনি কারুর সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতেও চান না। পৃথিবীটা যেন শুধু তাঁর রুচি অনুযায়ী চলবে।

সুলেখার ঘাড়ে ছোট একটি চুমু দিয়ে বললেন, ঘুম পেয়ে গেছে। কাল তো খুব ভোরে উঠতে হবে। লতুদের ট্রেন সাড়ে ছ'টায় না? তোমাকে হাওড়া স্টেশান যেতে হবে না। আমি একাই যাবো।

সুলেখা হাসলো। এই নিয়ে চারবার সে ত্রিদিবকে একটা বিষয় জানাবার চেষ্টা করছে, প্রত্যেকবারই ত্রিদিব এড়িয়ে যাচ্ছে। ত্রিদিব নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জানে। কিন্তু কিছুতেই তা নিয়ে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না।

আর একটা হাই তুলে ত্রিদিব আবার বললেন, প্রত্যেকদিন ঘুম আসার আগে আমার মনে হয়, আমার কী দারুণ সৌভাগ্য যে তোমার মতন একটি বউ পেয়েছি। অন্য কোনো মেয়ের পাল্লায় যদি পড়তুম, যে চাচামেচি করে ঝগড়া করে কিংবা পরনিন্দা-পরচর্চা করে, তা হলে কী হতো বলো তো? তা হলে বোধ হয় আমি আত্মহত্যা করতুম।

ঘুমের ভাণ নয়, একটু পরে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন ত্রিদিব।

সুলেখার চোখে ঘুম নেই। কাল এ বাড়িতে অনেক লোকজন আসবে। ত্রিদিবের ছোট বোনের স্বামী বদলি হয়ে আসছে কলকাতায়, এখনো তারা কোনো বাড়ি পায়নি, কিছুদিন থাকবে এখানে। ওদের দুটি ছেলে-মেয়ে। সুলেখা লোকজন ভালোবাসে, ওদের জন্য ঘর-টর সাজিয়ে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওরা আসছে বলে আর একটা কারণে সুলেখা খুশী, তা হলে রাতুল আর যখন-তখন আসতে পারবে না এখানে।

কোথায় যেন একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে, সুলেখা কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। প্রায় সদ্যোজাত শিশুর মতন গলার আওয়াজ। কয়েকদিন ধরেই মাঝ রাতে সুলেখা শুনতে পাচ্ছে। এই কান্না। তার সন্দেহ হয়, সে কি সত্যিকারের কোনো বাচ্চার কান্না শুনছে, না এটা তার মনের বিভ্রম? আশেপাশের কোনো বাড়িতে নতুন একটি শিশু তো জন্মাতেই পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা নেই সুলেখাদের, এরকম কোনো খবর সে শোনেনি। কাল বাড়ির ঝি-কে জিজ্ঞেস করতে হবে। ওরা ঠিক জানবে।

সুলেখার কোনো সন্তান হয়নি, অনেক বছরের বিবাহিত জীবন হয়ে গেল, এখন অন্যরা তাকে প্রশ্ন করে। সুলেখার মা আর বৌদি তো এই নিয়ে তাকে এখন বেশ জ্বালাতন করতে শুরু করেছেন। শুধু ত্রিদিব কিছুই বলেন না। সুলেখার নিজস্ব কোনো অভাব বোধ ছিল না এতদিন, অন্যদের কথা শুনতে শুনতে এখন মনে হয়, অন্তত একটি সন্তান থাকলে বেশ হতো। প্রতাপ একদিন সুলেখাকে ইঙ্গিত করেছিলেন, ত্রিদিবের উচিত ডাক্তার দেখানো। সুলেখা জানে, তারও উচিত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া, কারণ তার নিজেরও বন্ধ্যাত্ব থাকতে পারে। কিন্তু ত্রিদিব নিজে কিছু না বললে এ সম্পর্কে সুলেখার মুখ ফুটে কিছু বলতে লজ্জা করে। যদি ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে ত্রিদিবেরই কিছু খুঁত আছে, তা হলে তারপরেও কি ত্রিদিবের সঙ্গে তার সম্পর্ক এরকম ভালো থাকবে?

সুলেখা বুকের ওপর দুটি হাত এমনভাবে রাখলো যেন সে তার অজাত সন্তানকে আদর করছে। আবার শোনা গেল সেই শিশু কণ্ঠের ক্ষীণ কান্না।

রাতুল তাকে ঠিক এই জায়গাটাতে ধরেছে।

বিয়ের পর সুলেখা রাতুলকে বেশি দেখেনি। সে চাকরি নিয়ে বম্বেতে থাকতো। দু'একবার মাত্র এসেছে এ বাড়িতে। বম্বেতে রাতুলের স্ত্রী হঠাৎ গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়, ওদের একটি ছেলে এখন মানুষ হচ্ছে মামা বাড়িতে। সেই ঘটনার কিছুদিন পর রাতুল বম্বের পাট উঠিয়ে দিয়ে চলে আসে কলকাতায়। সে-ও প্রায় বছর চারেক হয়ে গেল।

স্ত্রীকে সে ভালোবাসতো খুব, বছর তিনেক সে কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারতো না ভালোভাবে। তার বন্ধুরা তাকে বাড়িতে ডেকে ডেকে এনে সান্ত্বনা দিতে চাইতো।

রাতুলের সুন্দর স্বাস্থ্য, টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে তার নাম ছিল এক সময়। তার গানের গলাও চমৎকার। সে একা একা একটা মস্ত বড় ফ্ল্যাটে থাকে, তাই ইদানীং তার বন্ধুরা, বিশেষ করে বন্ধু পত্নীরা তাকে বলছে, আপনার আবার বিয়ে করা উচিত। সুলেখারও খুব মায়া লাগতো রাতুলকে দেখে, একদিন সে-ও বলেছিল, সত্যি, এবারে আপনার আবার বিয়ে করা দরকার। একলা একলা সারা জীবন কাটাবেন কী করে? আমার তো ভাবলেই যেন কেমন লাগে।

কথাটা শুনে রাতুল এক দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল সুলেখার মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল, আমি বিয়ে করতে পারি...তোমাকে।

এটা একটা ঠাট্টা হতে পারতো। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে এরকম ঠাট্টা চলতে পারে। কিন্তু কথাটা বলার সময় রাতুল একটুও হাসেনি, তার চোখের দৃষ্টি ছিল গাঢ়। এরকম দৃষ্টির সামনে সুলেখা অস্বস্তি বোধ করে। কৈশোর বয়েস থেকেই সে পুরুষ মানুষদের বাসনাময় দৃষ্টি দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু রাতুলের তাকানো সেরকমও নয়, দেখলে ভয় লাগে। এ বাড়িতে ত্রিদিবের সঙ্গে পরিচয় বা আত্মীয়তার সূত্রে যারা প্রায় প্রতিদিনই আড্ডা দিতে আসে তাদের সঙ্গে সুলেখা শুধু হাস্য-পরিহাসের সম্পর্ক রাখে, বই-সিনেমা-থিয়েটার-গান বাজনা নিয়ে কথা বলে, তার বেশি কিছু না। সে কারুর ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি দিতেও চায় না। তবু কেন যে হঠাৎ সেদিন রাতুলকে ঐ কথাটা বলতে গেল!

কয়েকদিন বাদেই রাতুল জানালো যে সে অনেকদিন ধরেই সুলেখাকে ভালোবাসে, কথাটা এতদিন মুখ ফুটে বলেনি, সে সুলেখাকে বিয়ে করতে চায়, সুলেখা ছাড়া আর কোনো মেয়েকেই সে বিয়ে করবে না।

এরকম কথা পুরোপুরি শুনতেই চায়নি সুলেখা, তার শরীর অস্থির লাগছিল, কিন্তু রাতুল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ধীর গম্ভীর গলায় সবটা তাকে না শুনিয়ে ছাড়েনি। সেদিন সুলেখা

খুবই কাতর বোধ করেছিল। মানুষ এরকমভাবে ভালোবাসার কথা বলে কী করে? এ কী ধরনের ভালোবাসা? সুলেখা তো কোনোদিন রাতুলকে সামান্যতম প্রশ্রয়ও দেয়নি। দু'জন মানুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলো না, হৃদয়সংবাদ বিনিময় হলো না, শুধু শুধু একজন ভালোবেসে ফেললো। তাও একজন বন্ধুর স্ত্রীকে? একজন মানুষ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রীকে বলতে পারে, তুমি তোমার স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে বিয়ে করো?

ত্রিদিবের সমান না হলেও সুলেখারও খুব বই পড়ার নেশা। কাব্য-সাহিত্যে সে অনেক একতরফা প্রেমের কাহিনী পড়েছে, কিন্তু সুলেখা মনে করে ঐ সব পুরুষ রচিত কাহিনীর নায়িকারা অধিকাংশই প্রতীক। বিয়াত্রিচে কি মানবী না দান্তের সরস্বতী? ঐ সব নারীদের সঙ্গে কবি-লেখকদের মিলন হয়, অনেক নরক পেরিয়ে যাবার পর, স্বর্গে।

রাতুলের মুখে এ কথা শুনেও তাকে ঘৃণা করা যায় না, তার কারণ মানুষ হিসেবে সে অতি ভদ্র ও মার্জিত, তার ব্যবহারে কখনো রুচিহীনতা প্রকাশ পায় না, সে কোনোদিন সুলেখাকে শারীরিকভাবে জোর করার চেষ্টা করেনি। ভালোবাসার কথা না বলেও অনেকেই সুলেখাকে নানাভাবে ছুঁয়ে দেবার চেষ্টা করে, রাতুল সেরকম: না মোটেই।

রাতুল দ্বিতীয় দিন ঐ একই কথা বলতে এলে সুলেখা হাসি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাতুল তাতে ভোলে না। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চায় যে সুলেখা ছাড়া আর কারুকেই সে বিয়ে করতে পারবে না।

এরকম কথায় আবার সুলেখার ওপর একটা দায়িত্ব বর্তে যায়। তার জন্য একটা লোক সারা জীবন নিঃসঙ্গ থেকে যাবে কেন? তাতে সুলেখার মনেও একটা অপরাধ বোধ থেকে যাবে না?

ত্রিদিব যখন বাড়িতে থাকে না তখনও রাতুল আসে। সুলেখা কিছুতেই তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারে না। বলতে পারে না, আপনি আর আসবেন না!

একদিন সুলেখা রাতুলকে বললো, আপনি এরকম পাগলামি করছেন কেন? আপনি একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না, আমি তো আমার স্বামীকে খুবই ভালোবাসি। আমাদের মধ্যে কখনো কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়নি।

রাতুল সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, তুমি ত্রিদিবকে ভালোবাসো, তা আমি জানি না? আমাকে বিয়ে করার পরেও, তুমি ত্রিদিবকে ভালোবাসবে। আমি যেমন মনিকাকে এখনো ভালোবাসি। তাকে তো ভুলে যাইনি।

এটা রাতুলের একটা অদ্ভুত যুক্তি। মৃত ও জীবিত মানুষের মধ্যে একটা তফাৎ থাকবে না? কিন্তু উত্তরটা সুলেখা মুখে আনতে পারেনি। রাতুলের মৃত স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা তাকে মানায় না। রাতুল আবার বলেছিল, শোনো সুলেখা, ত্রিদিব তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে। তোমরা দশ বারো বছর সুখের বিবাহিত জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু ত্রিদিব কোনোদিনই তোমাকে সন্তান উপহার দিতে পারবে না। সে জন্য এক সময় তোমার মধ্যে একটা তিক্ততা আসবেই। বরং আমাকে বিয়ে করার পরও ত্রিদিব তোমার বন্ধু থাকতে পারবে।

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল সুলেখা। ত্রিদিব কোনোদিন সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না এ কথা রাতুল কী করে জানলো? কেন এত জোর দিয়ে বললো? রাতুল তো আর ডাক্তার নয়। কিংবা, ত্রিদিব কখনো কি গোপনে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছে, তখন রাতুল সঙ্গে ছিল? ত্রিদিব তো সুলেখাকে লুকিয়ে কোনো কাজ করে না। এই একটা ব্যাপার সে সুলেখার কাছে গোপন করে গেছে? সুলেখা মুখ ফুটে এ কথা ত্রিদিবকে জিজ্ঞেস করতেও পারে না। যদি সত্যি হয়! না, না, সেরকম সত্য সুলেখা সহ্য করবে কী করে?

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাতুল যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে। সে আর দেরি করতে চায় না। সে

যেন ধরেই নিয়েছে সুলেখার সঙ্গে তার বিয়ে হবেই। সে যখন তখন আসে কিংবা ফোন করে, ত্রিদিবকে অগ্রাহ্য করে সুলেখার সঙ্গে কথা বলে। সে যেন ত্রিদিবকে জানিয়ে দিতেই

চায় তার উদ্দেশ্যটা। যেন ত্রিদিব একবার জেনে ফেললে, প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলেই সব কিছুর সুরাহা হয়ে যাবে। কিন্তু ত্রিদিব উদাসীন।

সুলেখা মন শক্ত করে রাতুলকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করার কথা ভাবতে গিয়েই টের পেল তার মনের মধ্যে কখন একটা দ্বিধা এসে ঢুকে বসে আছে। রাতুলকে একেবারে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই। এর আগে অন্য কোনো পুরুষ মানুষ সম্পর্কে তার এরকম হয়নি। এখনো যে ত্রিদিবের প্রতি তার ভালোবাসা একটুও কমেছে তা নয়, ত্রিদিবকে ছেড়ে যাবার কথা সে চিন্তাও করে না, কিন্তু রাতুল আর আসবে না, সে আঘাত পেয়ে নিজের বাড়িতে একা একা মুষড়ে থাকবে, এ কথা ভাবতেও তার কষ্ট হয়।

নিজের মনের এরকম দুর্বলতা টের পেয়ে সুলেখা শিউড়ে উঠেছিল। এরকম জটিলতা সে সহ্য করতে পারবে না। ত্রিদিবের সঙ্গে সে এতগুলি বছর চমৎকার কাটিয়েছে, বাকি জীবনটাও সুন্দরভাবে কাটাতে চায়, তার সন্তানের প্রয়োজন নেই। ত্রিদিব নিজে কিছু ব্যবস্থা করে না কেন? সব সমস্যা সমাধানের ভার সে স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দেবে? সে যদি রাতুলকে বলতো, তুই আমার বউকে আর বিরক্ত করতে আসিস না...

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠতেই দারুণ চমকে উঠলো সুলেখা। বুকের মধ্যে দুম দুম শব্দ হতে লাগলো, পাগল হয়ে গেল নাকি মানুষটা? এত রাতে আবার কেউ ফোন করে?

সুলেখার উচিত ছিল ফোনটা নামিয়ে রাখা। কিংবা, এখনও তো সে সাড়া না দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে পারে। এরকম তীব্র ঝনঝন আওয়াজেও ত্রিদিবের ঘুম ভাঙেনি? সে জেগে উঠে ধরুক, তারপর যা খুশী বলুক।

টেলিফোনটা বাজতেই লাগলো। এক সময় সুলেখা পাশ ফিরে রিসিভার তুলে দুঃখী গলায় বললো, ছিঃ এটা কী হচ্ছে? কত রাত হয়েছে জানেন না?

রাতুল বললো, কিছুতেই ঘুম আসছে না। সুলেখা, তুমি আজ বিকেলে শাজাহানের সঙ্গে অতক্ষণ হেসে হেসে গল্প করলে, আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলোনি, তাতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আগে কখনো শাজাহানকে ঈষা করতুম না, কিন্তু আজ

–এসব কথা এখন না বললেই নয়?

–আমার যে মাথার মধ্যে এইসবই ঘুরছে, চোখ বুজলেও তোমাকেই দেখতে পাচ্ছি। আমি কোনোদিন ঘুমের ওষুধ খাই না। সুলেখা, তুমি আমার সঙ্গে একটু ভালোভাবে কথা বলো, তাহলে আমার ঘুম আসবে।

–এই তো বলছি। মাথা ঠাণ্ডা করে ঘুমিয়ে পড়ুন। কিংবা চোখ বুজে দু'তিনশোটা ভেড়া গুনতে থাকুন, ঘুম এসে যাবে ঠিক।

–ঠাট্টা করো না। সুলেখা, এবারে তুমি মন ঠিক করে ফেলো। দু'একদিনের মধ্যেই সুলেখা রিসিভারটা কানের কাছ থেকে একটু সরিয়ে নিয়ে চুপ করে রইলো। আপন মনে কথা বলে যেতে লাগলো রাতুল। একটু পরে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে সে ডাকতে লাগলো, সুলেখা, শুনতে পাচ্ছো না? সুলেখা, সুলেখা।

সুলেখা এবারে বললো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি।

–ঠিক করে ফেলেছো? বাঃ, গুড! গুড! কবে বলবে ত্রিদিবকে, কালই?

–হ্যাঁ, কালই। এবারে ঘুমোন। গুড নাইট।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে সুলেখা আলো জ্বাললো। ত্রিদিব কি সব শুনেও ঘুমের ভান করে আছে? অবশ্য ত্রিদিবের গাঢ় ঘুম। তার কপালে প্রশান্ত ভাব, একটা হাত বুকের ওপর রাখা।

খাট থেকে নেমে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো সুলেখা। সামনের দেয়ালের ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠায় শুধু সাদা মেঘের ছবি। যেন ঐ ছবিটাই এখন তার খুবই দরকার, এইভাবে সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুলেখা। একটু পরে সে চলে এলো জানলার কাছে। রাস্তা এখন একেবারে নির্জন, টুপটাপ টুপটাপ শব্দ হচ্ছে মৃদু বৃষ্টির। গভীর রাত্তিরে এইরকম একলা একলা বৃষ্টিপাতের দৃশ্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত মায়া আছে।

জানলার পাল্লাটা খুলে বাইরে হাত বাড়ালো সুলেখা। আস্তে আস্তে তার হাত ভিজে গেল বৃষ্টির জলে। তারপর সেই জলে সে ধুয়ে ফেলতে লাগলো তার নিঃশব্দ চোখের জল।

১৩ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মামুন দেখতে পেলেন সদর দরজা ঠেলে ঢুকছে একটি দম্পতি। মামুন থমকে দাঁড়ালেন, এই প্রৌঢ় বয়েসেও তাঁর বুক কেঁপে উঠলো। মঞ্জু এসেছে।

কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে এসেছে মঞ্জু, তার বুকে তার শিশু সন্তান। তার স্বামীর পরনে সাদা কুর্তা-পাজামা। মামুন জানতেন যে মঞ্জুরা ঢাকায় ফিরেছে গত মাসের প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে, কিন্তু এ পর্যন্ত মঞ্জু তাঁর সঙ্গে দেখা করেনি।

মঞ্জু বাচ্চা মেয়ের মতন চেঁচিয়ে উঠলো, মামুন মামা। তুমি বাইরে যাচ্ছিলে নাকি? মামুন বললেন, না। এসো।

মঞ্জ তার ছেলেকে স্বামীর কোলে দিয়ে দৌড়ে উঠে এসে মামুনের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করলো। বাবুল চৌধুরী অবশ্য তা করলো না। তার দু হাত জোড়া এই ছল করে হাসিমুখে বললো, কেমন আছেন, মামুনভাই?

মঞ্জু অভিযোগের সুরে বললো, তুমি এখানে বাসা নিয়েছো, আমারে জানাও নাই কেন?

অনেকদিন পর শহরের রাজনীতির স্বাদ পেয়ে মামুন আর গ্রামে ফিরে যেতে পারেননি। বড় বোনের বাড়িতেও বেশিদিন আতিথ্য নিয়ে থাকা যায় না, তাই মামুন পুরানা পল্টনে আলাদা বাসা ভাড়া নিয়েছেন। ফিরোজা বেগম গ্রাম ছেড়ে আসতে চাননি, এই নিয়ে মতান্তর, মন কষাকষি চলেছে কিছুদিন ধরে। কিন্তু এই এক জায়গায় মামুন বজায় রেখেছেন তাঁর জেদ। ফিরোজা বেগম মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকেন, যদিও সর্বক্ষণ তাঁর মন পড়ে থাকে মাদারিপুরে।

বাইরের লোকজনের গলার আওয়াজ শুনে মামুনের মেয়ে হেনা বেরিয়ে এলো বাইরে। নতুন বর্ষায় পুঁইডগার মতন সে ফনফনিয়ে লম্বা হয়ে উঠছে। মঞ্জু তাকে দেখে চোখ বড় বড় করে বললো, এটা কে, হেনা নাকি? উরি ব্রাইস রে! কত্ত বড় হইয়া গ্যাছে মাইয়াডা!

মামুন দেখছেন মঞ্জুকে। কত বদলে গেছে মঞ্জু। তার শরীরে সেই হিলহিলে ছটফটে ভাবটা একটুও নেই। তার ভুরুতে সব সময় মাখা থাকতো যে সরল বিস্ময়, তা কোথায় গেল? ঢাকায় পা দিয়েই সে মামুনের সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটে আসেনি। সে রকম আগ্রহ থাকলে সে তার মায়ের কাছ থেকে মামুনের এই বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করতে পারতো না?

বসবার ঘরটি সংক্ষেপে সাজানো। এক পাশে একটি চৌকির ওপর সুজনি পাতা, বাইরের কোনো অতিথি এলে ওখানেই শুতে দেওয়া হয়। আর কিছু বেতের চেয়ার, একটি নিচু টেবিল যার ওপরে দাবার ছক আঁকা। এই দাবা খেলাটা মামুনের নতুন নেশা। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবার পর এতে বেশ ভালো সময় কাটে। এই একটি মাত্র খেলা, যাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দ থাকা যায়।

ফিরোজা বাইরের লোকের সামনে বেরোন না। কিন্তু এরা তো বাইরের লোক নয়, মামুন দু'তিনবার স্ত্রীর নামে হাঁক দিলেন, তবু কোনো সাড়া শব্দ নেই। ফিরোজা বেগম একবার উঁকি মেরে দেখেই বাথরুমে ঢুকে বসে আছেন। তিনি অতিমাত্রায় রূপ সচেতন। নিজের

তেলতেলে মুখ কিংবা রান্না করার শাড়ি পরা চেহারা তিনি কারুকে দেখাতে চান না। হেনার হাত ধরে মঞ্জু চলে গেল অন্দর মহলে।

বাবুল বললো, মামুনভাই, আজকাল তো আপনি খবরের কাগজে খুব লিখছেন। আপনার লেখাগুলি সব পড়ি।

মামুন বললেন, হ্যাঁ, আগে ছিলাম কবি, এখন হয়ে উঠেছি ঝানু সাংবাদিক।

--কেন, কবিতা আর লেখেন না?

-নাঃ! আমার কবিতা কেউ চায়ও না, আমারও লিখতে ইচ্ছে করে না। তাও খবরের কাগজে কলম ধরেছিলাম রাজনৈতিক অ্যানালিসিস লিখবো বলে, এখন সেনসরশীপের ধাক্কায় 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে জীবনের বিকাশ' জাতীয় এলেবেলে জিনিস লিখি। লেখাটাই জীবিকা হয়ে গেছে যে।

-আবার তো ইলেকশন হবে হবে বলে একটা রব শোনা যাচ্ছে।

-হলেও সেটা বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি ছাড়া আর কিছু হবে না। ফ্রন্ট ভেঙে গেল, কোনো দল কি একা একা পারবে সরকারি পার্টির সঙ্গে? আইয়ুব খান যথেষ্ট পপুলার। এদেশের মানুষ এখনো গণতন্ত্রের মূল্য বোঝে না।

-আমি তো গ্রামে থাকি, আমি দেখেছি, আপনাদের আওয়ামী লীগ এখনও যথেষ্ট পপুলার। আপনাদের পার্টি তো ইণ্ডিয়ার সাহায্য পায়, ইলেকশান হলে আপনাদের জেতবার যথেষ্ট চান্স আছে। ইণ্ডিয়ার ব্যাকিং-এই আপনারা মিনিস্ট্রি ফর্ম করতে পারবেন।

মামুন তীক্ষ্ণ চোখে বাবুলের দিকে তাকালেন। ছেলেটি কি তাঁকে বিদ্রূপ করছে? 'আপনাদের আওয়ামী লীগ' কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা আছে। তিনি খানিকটা ধারালোভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ইণ্ডিয়া আমাদের সাহায্য করে কে বললো?

বাবুল হাসি মুখে বললো, লোকে বলে এই রকম কথা।

–লোকে তো অনেক কিছুই বলে। এমন বহু লোক আছে যারা বলে, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির চেয়ে সামরিক শাসন ভালো। তুমি লেখা পড়া জানা শিক্ষিত ছেলে, তুমি যা বলবে তা গুরুত্ব দিয়ে, ভেবে চিন্তে বলবে, এমন আশা করেছিলাম।

বাবুল হাসিটাকে আরো চওড়া করে বললো, আসলে ব্যাপার কী জানেন মামুনভাই, আমি আজকাল পলিটিক্স নিয়ে একেবারে মাথা ঘামাই না। কোনো খবরও রাখি না। আমি এখন–

মামুন তাকে বাধা দিয়ে বললেন, এতে নতুনত্ব কিছু নাই! অনেকেই তো এখন ভয় পেয়ে রাজনীতি ছেড়ে বাড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে আছে।

–ঠিক বলেছেন। আমি এখন শুধু চিন্তা করি যাতে আমার বউ-ছেলের কোনোক্রমে কোনো ক্ষতি না হয়। তবে লোকে যেসব কথা বলে, তা কানে আসে, কান তো আর বন্ধ রাখতে পারি না।

–কান বন্ধ রাখা যায় না বটে, তবে নিজস্ব বিচার বুদ্ধিটাকেও বন্ধ করে রাখা কোনো সুস্থতার পরিচয় নয়।

বাবুল আর তর্ক না বাড়িয়ে চুপ করে গেল। মামুন হঠাৎ খেয়াল করলেন যে তিনি এই ছেলেটির সঙ্গে যেন প্রথম থেকেই রাগ রাগ সুরে কথা বলছেন। অথচ বাবুল চৌধুরী এখন তাঁর কুটুম্ব, অনেকদিন পর বেড়াতে এসেছে, একে বরং বেশি বেশি খাতির যত্ন করা উচিত।

এক সময় এই বাবুল চৌধুরীকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। এর বড় ভাই আলতাফের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ, সে-ই তাঁকে প্রায় জোর করে অজ্ঞাতবাস থেকে টেনে এনেছে জনজীবনের স্পন্দনের মধ্যে। এক সময় কত খাতির করেছে তাঁকে। কিন্তু হঠাৎ সবকিছু

যেন বদলে গেল। আওয়ামী লীগ ভেঙে যখন ন্যাপের জন্ম হলো, এরা দু ভাই চলে গেল ন্যাপে। রাজনৈতিক বিচ্ছেদে ব্যক্তিগত সম্পর্কও নষ্ট করতে হবে? মৌলানা ভাসানীর যেমন মুখ আলগা, তেমনি ন্যাপের ছেলেরাও আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি বিষোদগার করতে লাগলো যখন তখন, অথচ কিছুদিন আগেও দু'পক্ষই ছিল ভাই-ভাই। ইস্কান্দার মীজার আমলে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ এবং পশ্চিমী জোট বাঁধা বৈদেশিক নীতি আঁকড়ে থাকা ওরা সহ্য করতে পারেনি। ওদের মধ্যে আবার আলতাফ আর তার ঘনিষ্ঠরা আরও বেশি উগ্রপন্থী, ওরা একেবারে কট্টর কমুনিস্ট। মামুন লক্ষ করেছেন, এদেশের কমুনিস্টদের প্রধান হাতিয়ার হলো গালাগাল। বিরুদ্ধ পক্ষের লোক হলেই বিনা প্রমাণে তাকে পা-চাটা, সুবিধাবাদী, সি আই-এর দালাল বলতে একটুও মুখে আটকায় না। যে আলতাফ একদিন মামুনকে মাথায় তুলে নাচতেও রাজি ছিল, সে-ই কিনা প্রকাশ্যে তাঁকে বলেছে, লোভী, হারামখোর, গুণ্ডা শেখ মুজিবর রহমানের লেজুড়, আরও কত কী। মামুন দারুণ দুঃখ পেয়েছেন সেসব শুনে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পেলেও তিনি কি কখনো মন্ত্রিত্বের উমেদারি করতে গেছেন? তিনি কখনো সরকারি পদ গ্রহণ করে একটা পয়সাও ছুঁয়েছেন? একটা সময় এসেছিল, যখন জেল খাটা চোর-ডাকাতরাও 'আমি সোহরাওয়ার্দি-হক-মুজিবগো সাথে জেইল খাটছি' বলে পরিচয় দিয়ে সরকারি পদ পাবার চেষ্টা করতো। মামুন কখনো নিজের কারাবাসের কথা কারুকে জানিয়েছেন?

বাবুল চৌধুরী অবশ্য কখনো ওরকম ভাষা প্রয়োগ করেনি তাঁর প্রতি। ছেলেটি বরাবরই মিতভাষী ও অতিশয় লাজুক ও বিনীত। কিন্তু মামুন জানেন, ও ওর বড় ভাইয়ের চেয়েও বেশি উগ্রপন্থী, চীনের মাও সে তুং-এর ভক্ত। এই সব ছেলেরা ইলেকশানেও বিশ্বাস করে না। এরা চায় সশস্ত্র বিপ্লব। বাবুল গালাগালি করে না বটে, কিন্তু মামুনের সন্দেহ হয়, সব সময়েই ওর কথাবার্তার মধ্যে থাকে কটাক্ষ ও বিদ্রূপ।

পুরোনো কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করে মামুন বললেন, তোমার কথা কও, বাবুল। তোমরা কি এখন ঢাকাতেই থাকবে?

বাবুল বললো, ঠিক নাই কিছু। এখন তো কলেজ বন্ধ, তাই চলে আসলাম। মঞ্জুও অনেকদিন বাপের বাড়ি আসে নাই।

–ভালো করেছো। তুমি তো ইচ্ছা করলেই ঢাকায় কাজ পেতে পারো। তুমি পি এইচ ডি-টা করলা না?

–এইবার করে ফেলবো ভাবছি। যদি ঢাকায় থাকি।

মঞ্জু ফিরে এলো এ-ঘরে। হেনার কোলে মঞ্জুর সন্তান। সে বললো, মামুনমামা, তুমি আমার ছেলেকে দেখলে না? বললে না ছেলে কেমন হয়েছে?

মামুন শশব্যস্ত হয়ে শিশুটির দিকে মুখ কঁকিয়ে তার গাল টিপে আদর করে বললেন, কী সুন্দর খোকা হয়েছে। এ যে রাজপুত্তুর। তা তো হবেই, বাপ-মা দু'জনেই এত সুন্দর। কী নাম রেখেছো।

মঞ্জু বললো, কোনো নাম রাখিনি। তুমি তো নাম ঠিক করে দেবে।

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে মামুন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, নাম রাখো নজরুল ইসলাম। আমার প্রিয় কবির নামে। আমার ছেলে হলে আমি এই নাম রাখবো ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমার দুই-দুইটাই মেয়ে। তোমার ছেলের একটা ডাক নামও রাখতে হবে, কবি নজরুলের ডাক নাম শুনেছি দুখু মিঞা, সে নাম রেখো না, ওর নাম রাখে সুখু মিঞা। তোমরা যে-যাই বলো, আমি ওকে সুখু মিঞা বলেই ডাকবো।

মামুনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একটি পুত্র সন্তান ছিল, বছর তিনেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে। সেই ছেলেটিরও ডাক নাম ছিল সুখু।

মঞ্জু তাকালো তার স্বামীর দিকে। বাবুল কৃত্রিম ভদ্রতার সঙ্গে অতিরিক্ত উৎসাহ জুড়ে বললো, বাঃ বাঃ, এ তো অতি চমৎকার নাম। নজরুল ইসলাম আর সুখু! দারুণ! মামুনভাই ছাড়া এত সুন্দর নাম আর কে রাখবে?

মামুন বললেন, একটু দাঁড়াও, এখুনি আসতেছি।

চটি ফটফটিয়ে প্রায় দৌড়েই তিনি চলে গেলেন শয়নকক্ষে। ফিরে এলেন অল্পকালের মধ্যেই। আবার বাচ্চাটিকে আদর করতে করতে বললেন, দেখি দেখিরে সুখু মিঞা। হাতটা দেখি, বাঃ, কী সুন্দর গোলাপি রঙের হাত।

শিশুর রঙীন করতলে তিনি গুঁজে দিলেন একটি মোহর।

মঞ্জু বললেন, একী, ওকে ওটা কী দিলে, মামুনমামা?

মামুন বললেন, বিশেষ কিছু না। একটা মোহর। কলকাতা থাকার সময় আমি দেখেছি দু'এক বাড়িতে, নতুন শিশুকে প্রথম দেখার সময় গুরুজনেরা মোহর দেয়, তা আমার কাছে ছিল একটা

মঞ্জু বললো, না না, ওকে ওটা দিও না।

বাবুল বললো, আপনি মোহর দিলেন? ওর যে অনেক দাম।

মামুন ঈষৎ আহতভাবে বললেন, তুমি দামের কথা বলো না। আমার দিতে ইচ্ছা হলো- ছিল বাড়িতে একটা-মঞ্জুর সন্তান-সে যে আমার বুকের মণি...।

মঞ্জু ছোঁ মেরে বাচ্চার হাত থেকে মোহরটা তুলে নিয়ে বললো, আমি সেজন্য বলছি না। ছেলেটা এমন দুষ্টু হয়েছে হাতের কাছে যা পায় তাই-ই মুখে পুরে দেয়।

মামুন হাসতে হাসতে বললেন, যদি ও মোহর খেয়ে ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে এই সুখু মিঞা একদিন পাকিস্তানের বাদশা হবে। থুড়ি এ যুগে তো বাদশা হয় না, মিলিটারি ডিকটেটর। হাঃ হাঃ হাঃ!

বাবুল তার স্ত্রীর হাত থেকে মোহরটি নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বললে, আকব্বরী মোহর। এখন এটা এদেশে তো পাওয়াই যায় না। পূর্ব পাকিস্তানে যে কটা বা ছিল সবই পশ্চিমে চলে গেছে।

এই সময় ফিরোজা এসে ঢুকলেন হাতে একটি ট্রে নিয়ে। তিনি যে শুধু স্নান করে সেজেগুঁজে এসেছেন তাই-ই নয়, এর মধ্যেই বাড়ির নফরকে দোকানে পাঠিয়ে পাঁচ রকম মিষ্টি আনিয়েছেন। স্ত্রীকে দেখে মামুন মনে মনে প্রার্থনা করলেন, মোহর প্রসঙ্গটি যেন থেমে যায়।

ফিরোজা বেগমের ব্যক্তিত্বটি এমনই প্রবল যে তিনি যেখানেই থাকেন সেখানেই দৃশ্যের কেন্দ্রস্থলে তাঁর অবস্থান। তিনিই মূল কথাবাতার ধারা পরিচালনা করেন। ওদের তিনি জোর করে করে মিষ্টি খাওয়াতে লাগলেন, বাবুল মিষ্টি তেমন পছন্দ করে না, কিন্তু তার কোনো আপত্তি গ্রাহ্য হলো না, পাঁচ রকমের পাঁচটি সন্দেশ গলাধঃকরণ করতে হলো তাকে।

মঞ্জুকে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন তার সংসারের কথা, স্বরূপ নগরের বাড়িতে কখানা ঘর, কে রান্না করে, কলের পানি না পুকুরের পানি, মশা আছে কিনা। সেই সঙ্গে উপদেশ দিতে লাগলেন সন্তান পালন বিষয়ে।

মামুন চুপ করে রইলেন, এই সব কেজো কথা শুনতে তাঁর ভালো লাগে না। মাঝে মাঝেই তিনি দেখছেন মঞ্জুর মুখোনি, কিন্তু মঞ্জু তাঁর চোখে চোখ ফেলছে না। কতদিন মঞ্জুর গান শোনা হয়নি। মেয়েটা কি গানের চর্চা রেখেছে, না বিয়ের পর সব ভুলে গেছে? এখন মঞ্জুকে গান গাইতে অনুরোধ করা যাবে না, কারণ ফিরোজা গান-টান পছন্দ করেন না একেবারেই।

মঞ্জু কত দূরে সরে গেছে। আগে সে মামুনের কাছে কতরকম আবদার করতো, মামুনের অগোছালোপনা দেখে শাসন করতো, মামুন রাত করে বাড়ি ফিরলে জেগে বসে থাকতো সে। আর এখন এক মাসের ওপর ঢাকায় থেকেও সে মামুনের সঙ্গে দেখা করার জন্য ছুটে আসেনি। আজ এসেও সে মামুনের সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি, নিজের ছেলের বিষয়েই গল্প করে যাচ্ছে। বিয়ের পর মেয়েরা এই রকম হয়ে যায়?

মঞ্জু চলে যাবার পর মামুন আর একটাও কবিতা লেখেননি। কবিতাও তাঁকে ছেড়ে গেছে।

অথচ মামুন নিজেই তো উদ্যোগ করে মঞ্জুর বিয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতার দুটি ছেলে এসে মঞ্জুর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাবার পর তার শিগগিরই একটা বিয়ে দেওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। মামুনই তাঁর আপা-দুলাভাইয়ের কাছে বাবুল চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করেছেন, বাবুলের কতরকম গুণপনার বর্ণনা করেছেন। বাবুলের পরীক্ষার কারণে বিয়েটা এক বছর পিছিয়ে যায়, তার মধ্যেই ওদের দু'ভাইয়ের সঙ্গে মামুনের অনেকখানি মানসিক ব্যবধান ঘটে গেল। মামুনের জন্যই যে বাবুল চৌধুরী এমন একটি হীরের টুকরোর মতন মেয়েকে বউ হিসেবে পেয়েছে, সেকি তার জন্য মামুনের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করে?

মামুন আড়চোখে বাবুলের দিকে তাকালেন। বাবুলও মেয়েদের কথাবার্তায় যোগ দেয়নি, তার ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি লেগেই রয়েছে। এই ছেলের মনের মধ্যে কী যে চলে তা বোঝা শক্ত।

হঠাৎ মামুন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা গল্প করো, আমাকে একটু কাজে যেতে হবে।

বাবুলও সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমরাও যাবো।

মঞ্জুর ছেলে তার মায়ের বুকের কাছে কোমল দুটি হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে খুঁ হুঁ শব্দ করছে, অর্থাৎ তার খিদে পেয়েছে। মঞ্জু খাটটার ওপর বসে পেছন ফিরে তাকে স্তন্য পান করাতে গেল। ফিরোজা হা-হা করে উঠে বললেন, ভিতরে যাও না, ভিতরে যাও।

মামুনের আর কিছুই ভালো লাগছে না। তাঁর বুকের মধ্যে একটা অজ্ঞাত ব্যথা। তিনি বাবুলের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বললেন, তোমরা আর একটু থাকো, আমাকে যেতেই হবে। একজনের সাথে দেখা করার কথা।

তারপর মঞ্জুর উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে বললেন, তোমরা আবার এসো, মঞ্জু। কেমন? আমি গেলাম।

বাইরে বেরিয়ে এসে মামুন একটা সিগারেট ধরালেন। ফিরোজা সিগারেটের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না বলে বাড়ির মধ্যে তাঁর সিগারেট খাওয়াই হয় না। অশান্তি এড়াবার জন্য তিনি ফিরোজার অনেক বিধিনিষেধই মেনে চলেন।

তবে কি সিগারেটের নেশাই তাঁকে বাইরে টেনে আনলো। এতদিন পর মঞ্জুর সঙ্গে দেখা তবু তিনি শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর সঙ্গে রইলেন না। আর একটু অপেক্ষা করে তিনি ওদের সঙ্গে একসঙ্গে বেরুতে পারতেন, সেটাই ভালো দেখাতো। একথা অবশ্য ঠিক যে আবুল মনসুরের বাড়িতে তাঁর একটা মিটিং-এ যোগ দেওয়ার কথা আছে, কিন্তু সেটাও এমন কিছু জরুরি নয়, এক- আধঘণ্টা পরে গেলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কেন যেন বাবুল আর মঞ্জুর সঙ্গে এক সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সম্ভাবনাটা তাঁর মনঃপূত নয়, তাই তিনি আগে বেরিয়ে এলেন।

মিটিং-এ যেতেও তাঁর ইচ্ছে হলো না। রাজনীতির কচকচি আজ সন্ধেবেলা আর ভালো লাগবে না। তাহলে কোথায় যাওয়া যায়? সংবাদপত্রে জনপ্রিয় কলামনিস্ট হয়েও মামুন কোনো কাগজে চাকরি নেননি। জীবিকার তাড়না তাঁর খুব একটা নেই, দেশের জমিজমা থেকে যা আয় আছে তাতেই অনেকটা চলে যায়। কেউ কেউ তাঁকে ওকালতি শুরু করার পরামর্শ দিয়েছিল। তাঁর একটা আইনের ডিগ্রি আছে। তাঁর ছাত্র বয়েসে কলকাতায় যারাই বি এ পাস করতো, তারা অনেকেই সঙ্গে একটা লডিগ্রি করে রাখতো। ল' কলেজে হাজিরা দেবার বাঁধাবাঁধি ছিল না, পাস করাও ছিল সহজ। ঢাকায় মামুনের বন্ধুদের মধ্যে যারা আওয়ামি লীগ সরকারে মন্ত্রীটন্ত্রী হয়েছিল, রাজনীতি ঘুচে যাওয়ার পর তারা সবাই এখন

চুটিয়ে ওকালতি করছে। বাংলায় কথাই আছে, যার নাই কোনো গতি, সেই করে ওকালতি। মামুন ওদিকে যাননি।

উকিলরা আদালতের চেয়ে বাড়িতেই বেশি ব্যস্ত থাকে, বিশেষত এই রকম সন্ধের সময়। তখন সব মক্কেলরা আসে। হঠাৎ করে এই সময়ে কোনো উকিল বন্ধুর বাড়িতে গেলে সে অস্বস্তিবোধ করবে! মামুন ভেবে দেখলেন, কবি জসীমউদ্দীনের বাড়িতে যাওয়া যেতে পারে, সেখানে প্রায় দিনই এই সময়ে আড্ডা জমে।

মামুন হাঁটতে লাগলেন জসীমউদ্দীনের বাড়ি ‘পলাশ বাড়ির দিকে। আগের তুলনায় ঢাকায় দোকান পাটের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, রাস্তায় ঝলমলে আলো। হাঁটতে বেশ ভালোই লাগে।

কমলাপুর পৌঁছোতে বেশি দেরি হলো না। অনেকখানি জমির ওপর কবির বাড়ি। সামনে পেছনে বহু রকমের ফুল ও ফলের গাছ। কবি যেমন প্রকৃতি-পাগল তাঁর স্ত্রীরও সেই রকম গাছপালার খুব শখ। নারায়ণগঞ্জের এক চেনা বাড়ির মেয়ে মণিমালাকে বিয়ে করেছেন জসীমউদ্দীন, সেই বিয়ের সময় থেকেই কবির সঙ্গে মামুনের পরিচয়। নারায়ণগঞ্জের মরগ্যান স্কুলে মামুন পড়িয়েছিলেন কয়েক মাস, মণিমালা ছিল নামকরা সুন্দরী।

পলাশ বাড়ির সামনে এসে মামুন দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাড়ির সামনে অনেক গাড়ি, দু’একখানা সরকারি বড়কর্তাদের গাড়ি বলে মনে হলো। এখানে আজ কোনো দাওয়াত উৎসব আছে নাকি? বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া তবে ঠিক হবে না। কিংবা সরকারের কোনো হোমরা-চোমরা দেখা করতে এসেছে। আশ্চর্য কিছু নয়। শোনা যায় স্বয়ং আইয়ুব খাঁও নাকি কবির খোঁজখবর নেন।

তা হলে থাক! মামুন পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন আবার।

এই সন্ধ্যেবেলা তাঁর কোথাও যাবার জায়গা নেই। এটা যেন এক সমৃদ্ধ নগর নয়, তেপান্তরের মাঠ, মামুন কোনো দিক খুঁজে পাচ্ছেন না। এতদিন পর অকস্মাৎ মঞ্জুকে দেখেই কি তাঁর এই দিশাহারা অবস্থা হলো? অনির্দিষ্ট ভাবে হাঁটতে হাঁটতে মামুন নিজেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলেন। তাঁর দিদির মেয়ে মঞ্জু তাঁর অতি স্নেহের, অতি আদরের, সে যথোপযুক্ত স্বামী পেয়েছে, একটি স্বাস্থ্যবান পুত্রের জননী হয়েছে, এসব দেখে মামুনের তো খুবই আনন্দিত হবার কথা। কিন্তু আজ মঞ্জুকে দেখার পরেই তাঁর বুকে যে কম্পন শুরু হয়েছে, তা শুধু সেই ধরনের আনন্দ নয়, অন্য কিছু। নিজের ওপরেই রাগ করলেন মামুন। না, না, এটা ঠিক নয়, এটা স্বাভাবিক নয়। এখন কোনো আড্ডায় গিয়ে তর্কাতর্কিতে মেতে উঠতে পারলে এই চিন্তা মুছে যাবে। কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি? আর কোনো প্রিয়জনের নাম মনে পড়ে না। মঞ্জুর মুখোনি দেখার আরও কিছুক্ষণ সুযোগ ছিল, তবু তিনি শুধু শুধু বেরিয়ে এলেন কেন?

১৪ কয়েকদিন এড়িয়ে এড়িয়ে চলার পর

কয়েকদিন এড়িয়ে এড়িয়ে চলার পর অতীনকে একদিন প্রতাপের সামনে পড়তেই হলো। মা কিংবা পিসিমণিকে সে চেঁচিয়ে তর্কে হারিয়ে দিতে পারে কিন্তু বাবার সামনে সে মুখচোরা।

সপ্তাহের মাঝখানে কাজের দিন হলেও প্রতাপ সেদিন আদালতে যাননি। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর জ্বর ভাব ও শরীর কিছুটা অবসন্ন হয়েছে। অফিসে না যাবার সিদ্ধান্ত নেবার পর প্রতাপ দাড়িও কামাননি, স্নানও করেননি, দুপুরের খাওয়া সেরে নিজের ঘরে বসে কাগজ পড়ছেন। মমতাকে বলে রেখেছেন, বাবলু ফিরলেই যেন দেখা করে তাঁর সঙ্গে। ইদানীং বাবলু সক্কালবেলা বেরিয়ে যায়, সারাদিন কোথায় থাকে ঠিক নেই। ফেরে রাত দশটা-সাড়ে দশটায়, মাঝখানে দুপুরে একবার খেতে আসে, এক একদিন তাও আসে না।

বাড়ির শাসনের সীমা সে অতিক্রম করে গেছে! প্রতাপ খবর পেয়েছেন যে বাবলু এখন রাজনীতির হুজুগ নিয়ে মেতেছে।

আজ দুপুরে খেতে এসে বাবলু ধরা পড়ে গেল। বাবা ডেকেছেন, দেখা না করে উপায় নেই। বাইরে থেকে এসেই বাবলু গায়ের জামা ছুঁড়ে ফেলে স্নানের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল,মমতা গম্ভীর ভাবে বললেন, বাবার সঙ্গে আগে দেখা করে আয়। তোর জন্য আজ তোর বাবা অফিস যায়নি।

বাবলু ঘাড় গোঁজ করে একটুখানি থমকে দাঁড়ালো। তার পেটে খিদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। খিদে সে সহ্য করতে পারে না বেশিক্ষণ, বাস থেকে নেমে সে ছুটতে ছুটতে এসেছে। বাবা যখন বাড়িতে আছেনই, তখন স্নান করে খেয়ে নেওয়ার পর বাবার সঙ্গে কথা বলা যায় না! কিন্তু মায়ের গলার সুর অন্য রকম।

বাবলু বাবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো। প্রতাপ মন দিয়ে একটি পত্রিকা পড়ছেন। দু' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর বাবলু বললো, বাবা, তুমি আমায় ডেকেছো?

প্রতাপ চোখ তুলে বাবলুকে দেখলেন। প্রায় মাসখানেক তিনি তাঁর ছেলেকে ভালো করে দেখেননি। সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। বাবলুর খালি গায়ের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন, ছেলেটার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই হয়েছে, বুকখানা পেটানো। কিন্তু সারাদিন নিশ্চয়ই রোদ্দুরে টো-টো করে ঘোরে। চোখের নিচে কালো দাগ, মুখের রং পোড়া পোড়া, বোধ হয় দু'তিন মাস মাথার চুল কাটেনি।

প্রতাপ তাঁর বাবাকে অতিরিক্ত সমীহ করতেন। সেকালে যৌথ পরিবারের প্রধানরা ছিলেন গোষ্ঠি অধিপতির মতন প্রতাপশালী। প্রতাপদের আমলে বাবাকে আপনি বলে সম্বোধন করার রেওয়াজ ছিল। বাবলু কি তাঁকে ভয় পায়? ছেলেটার চোখের পাতা ঘন ঘন পড়ছে। ছেলের সঙ্গে ভয় বা অতিরিক্ত সমীহর সম্পর্ক চান না প্রতাপ। যদিও বাবলু সম্পর্কে একটা চাপা রাগ ঘোরাফেরা করছে প্রতাপের মাথার মধ্যে, তবু তিনি সংযত হতে চাইলেন। যেজন্য তাঁর একটু সময় দরকার।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোর সারা গা দেখছি ঘামে ভিজে গেছে। তুই চান করিসনি?

বাবলু মাথা নেড়ে বললো, না।

প্রতাপ নরমভাবে বললেন, আগে চান করে আয়। খেয়ে নে। তারপর তোর সঙ্গে আমার কতকগুলো কথা আছে।

বাবলু তবু দাঁড়িয়ে থেকে বলল, পরে চান করতে যাবো। তুমি বলো না।

প্রতাপ দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। পৌণে একটা বাজে। তিনি আবার বললেন, না, আগে খাওয়া-টাওয়া সেরে আয়।

বাবলু এবারে ফিরে গেল বাথরুমে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্নান সেরে সে রান্নাঘরের টেবিলে এসে বসলো। মুখে কোনো কথা নেই। যেন সে এ বাড়ির অতিথি, কেউ খাবার দিলে খাবে, নইলে খাবে না। মমতা তাকে নিঃশব্দে ভাত বেড়ে দিলেন। বাবলুর সঙ্গে কয়েকদিন তিনি ভালো করে কথা বলতে পারছেন না। অভিমান এক এক সময় মাতৃস্নেহকেও অতিক্রম করে যায়।

সুপ্রীতি আড়াল থেকে সব কিছু লক্ষ্য করছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আজ পিতা-পুত্রে একটা সংঘর্ষ হবে। প্রতাপের মাথা গরম, ছেলেটাকে যদি মার ধোর শুরু করে তখন সুপ্রীতিকে বাধা দিতেই হবে। রাগের মুহূর্তে প্রতাপ মমতাকেও অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু এখনও সুপ্রীতিকে অমান্য করতে পারে না। বাবলু খাওয়া শেষ করে উঠে গেল, সুপ্রীতি দুঃখ পেলেন এই দেখে যে ছেলেটার আর একটু ভাত লাগবে কিনা, মমতা তা একবারও জিজ্ঞেস করলো না। অবশ্য একটু পরেই রান্নাঘরে এসে তিনি দেখলেন, বাবলু থালায় খানিকটা ভাত ফেলে রেখে গেছে।

বাবলু যখন আবার প্রতাপের ঘরে এলো, তখন প্রতাপ পায়জামা ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট পরে বাইরে বেরুবার জন্য তৈরি হয়েছেন। দাড়ি কামাননি এখনো। বাবলুকে দেখে তিনি বললেন, ভেতরে এসে এই চেয়ারটাতে বোস।

বাবলু আধখানা চেয়ারে খানিকটা কাৎ হয়ে বসলো, সরাসরি সে তার বাবার দিকে তাকাচ্ছে না।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, তোর মা বলছিল, তুই নাকি চাকরি খোঁজার চেষ্টা করছিস? বাবলু দ্বিধা না করে বললো, হ্যাঁ।

-তুই আর পড়তে চাস না? কেন?

-আমার আর পড়তে ভালো লাগে না। তাছাড়া, চাকরি করা তো দরকার।

-কিসের দরকার?

দরকার, মানে, টাকা পয়সার দরকার।

--কেন, দু'বেলা খেতে পাচ্ছিস না নাকি?

-সেজন্য না। ছোড়দি পড়ছে, মুন্নি পড়ছে, ওদের পড়াশুনোর খরচ আছে।

-তোর পড়াশুনোর খরচ আমি চালাতে পারবো না, তুই বুঝি তাই ভেবেছিস? শোন, আমি। এম এ পড়িনি, পড়ার দরকারও ছিল না, আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি আইন পাস করে। আদালতে চাকরি করি। সেইসব সময়ে মুন্সেফ-হাকিমদের খুব সম্মান ছিল গ্রামের দিকে। যদি পার্টিশান না হতো, আমি ইস্ট বেঙ্গলেরই কোনো জেলায় থাকতাম, ছুটি-ছাটায় বাড়ি চলে যেতে পারতাম। আমার বাবা তাই-ই চেয়েছিলেন। তোর বেলায় আমি আমার সে রকম কোনো ইচ্ছে চাপিয়ে দিতে চাই না। তুই সায়েন্স পড়েছিস নিজের ইচ্ছেতে। ঠিক কি না?

বাবলু মাথা নাড়ালো।

প্রতাপ একদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই ভালো রেজাল্ট করেছিস। তুই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট না হয়েও যা হয়েছিস, তাতেই আমি খুশী হয়েছি। এই রকম রেজাল্ট করে কেউ হায়ার এজুকেশনের সুযোগ ছাড়ে না। আজকাল তো শুনি ইউনিভার্সিটিতেও সিট পাওয়াই শক্ত। তুই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস, তুই ঠিক সুযোগ পাবি। এর পরেও তুই যদি এম এস সি না পড়িস, লোকে বলবে আমি তোকে পড়াতে পারলাম না, আমার সে সামর্থ্য নেই। আমার কিন্তু সেরকম অবস্থা এখনও হয়নি।

প্রতাপ চুপ করে গেলেন। বাবলুও চুপ করে রইলো। সে বাবার দিকে মুখ ফেরাচ্ছে না, কিন্তু সে বুঝতে পারছে যে বাবা তার কাছে থেকে একটা উত্তর আশা করছে।

সে বললো, আজকাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনো কিচ্ছু হয় না। ওরা নতুন কিছু শেখায় না।

প্রতাপ বললেন, পড়াশুনোর অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে ঠিকই। জীবনের শিক্ষা নিজেকেই নিতে হয়, মাস্টাররা আর কতখানি শেখাতে পারে। কিন্তু সায়েন্স শিখতে গেলে অ্যাকাডেমিক পড়াশুনোর দরকার আছে। আজকাল কেউ বাড়িতে বসে বিজ্ঞানচর্চা করতে পারে না। এম এস সি ডিগ্রিটা ভালোভাবে পেলে তারপর রিসার্চ করার সুযোগ আসে, তখন নিজস্ব চিন্তা প্রকাশ করা যায়।

বাবলু তবু জেদের সঙ্গে বললো, তারপর তো সবাই চাকরিই করে।

প্রতাপ এবারে খানিকটা শ্লেষ গোপন করে পারেলেন না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বিজ্ঞান পড়ে বাঙালীর ছেলেরা নিউটন-আইনস্টাইন হতে চায় না। এমনকি সত্যেন বোসও হতে চায় না। সবাই চাকরি পেয়েই নিশ্চিন্ত হতে চায়। কিন্তু চাকরিরও তারতম্য আছে। বি এস সি ডিগ্রি নিয়ে তুই কী চাকরি পাবি? আমাদের অফিসে অনেক অর্ডিনারি এম এ, এম এস সি পাস ছেলে আসে কেরানিগিরির জন্য। তুই কেরানি হয়ে থাকতে চাস! ভালো

কেরানিগিরিও তুই পাবি না। আমরা তো রিফিউজি,এখনো আমরা পশ্চিম বাংলায় পুরোপুরি অ্যাকসেপ্টেড হইনি। আমাদের প্রতি পদে পদে লড়াই করতে হয়। সেই লড়াই হবে মেধা দিয়ে, মনের জোর দিয়ে। বি এস সি ডিগ্রি নিয়ে চাকরি খুঁজতে গেলে তোকে পঞ্চাশটা অফিসের দরজায় ঘুরতে হবে, কেউ কেউ জুতোর ঠোক্কর দেবে।

–কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন বেরোয়, তাই দেখে অ্যাপ্লাই করবো, পরীক্ষা দেবো।

–হ্যাঁ, অ্যাপ্লাই করবি। পাঁচটা পোস্টের জন্য পাঁচ হাজার দরখাস্ত পড়ে, এদের মধ্য থেকে কারা চাকরি পায় জানিস না? যাদের কানেকশন আছে। যাদের মামা, কাকা, পিসেরা বড় বড় পোস্টে আছে। তোকে এখন কে চাকরি দেবে? কিন্তু তোমার নামের পাশে যদি একটা পি এইচ ডি থাকে, তখন তোমাকে কেউ সহজে ফেরাতে পারবে না! তুই ...

প্রতাপের কথার মাঝখানে একটা নাটকীয় কাণ্ড হলো। মমতা হঠাৎ ছুটে এলেন ঘরে, তাঁর দুটি চোখ নীরব ক্রন্দনে রক্তিম। এবার তিনি সরব হয়ে বাবলুকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতন বলতে লাগলেন, বাবলু, তুই কেন এম এস সি পড়বি না। বল, বল, আমাকে? আমার কোন কথায় তোর রাগ হয়েছে। এই বংশের একটা ছেলে লেখাপড়া শিখবে, নাম করবে, সবাই তাই চায়, আর তুই ... তোর কী হয়েছে, বল, বাবলু, তুই আমাকে বল্।

প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আঃ, মমতা ছাড়ো, ওকে ছাড়ো, আমি ওর সঙ্গে আলোচনা করছি।

মমতা বললেন, না, ছাড়বো না! ও আমার ছেলে নয়? আমি ওকে পেটে ধরিনি? ও আমার কাছেও মন খুলে কথা বলবে না?

প্রতাপ অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, আঃ, আমি তো ওর সঙ্গে আলোচনা করছি, তুমি আবার কেন ডিসটার্ব করতে এলে?

মমতা পাগলাটে গলায় বললেন, কেন, আমি বুঝি কেউ না? ও আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। মুখ ফুটে কিছু খেতে চায় না। কেন, কেন, আমি কী দোষ করেছি?

প্রতাপ গর্জে উঠে বললেন, এ সব কথা এখন থাক না। আমরা কাজের কথা বলছি! মমো, তুমি বাইরে যাও!

মমতাও সমান তেজের সঙ্গে বলে উঠলেন, না, আমি যাবো না! আমি জানতে চাই, ও কেন...

বাবলু হঠাৎ যেন এক প্রবল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। নীল রঙের জল, দারুণ ভারি, তলার দিক থেকে চুম্বকের মতন টানে, সেই টানে বাবলু তলিয়ে যাচ্ছে, তার দাদা এসে তাকে ধরলো, ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে পিকলু তাকে ওপরে তুলে ধরতে চাইছে, সে পিকলুকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে, মুখে এত জল ঢুকেছে যে সে আর নিশ্বাস নিতে পারছে না...

বাবলু উঠে দাঁড়িয়ে মাকে একটু দূরে সরিয়ে দিয়ে তাঁর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালো।

মমতাও সোজা তাকিয়ে থেকে বললেন, বাবলু, একদিন আমি তোকে বলেছিলাম, তোর জন্যই তোর দাদা...সেই জন্য তুই আমাকে...

বাবলু বললো, মা, মা, তুমি চুপ করো। হ্যাঁ, আমি পড়বো, এম এস সি পড়বো। তোমাকে এমনই বলেছিলাম।

মমতার কান্না ভেজা মুখে এক পলক রোদের মতন হাসি ফুটে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তীব্র চোখে বললেন, পড়বি! সত্যিই তুই পড়বি!

বাবলু বললো, হ্যাঁ।

মমতা তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। একবার স্বামীর দিকে, একবার ছেলের দিকে তাকালেন। বাবলুর ব্যবহারে তাঁর মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিল, বাঁচার সাধই চলে গিয়েছিল। সব হঠাৎ বদলে গেল?

মমতা বললেন, তুই ভর্তি হবি? আমার গা ছুঁয়ে বল! বাবলু বললো, এই তো তোমার গা ছুঁয়ে আছি মা! কৌশিকও আগে পড়বে না বলেছিল, এখন দু'জনেই ভর্তি হবো ঠিক করেছি!

প্রতাপ বললেন, টাকা জমা দেবার লাস্ট ডেট আর দু'দিন আছে। আমি ফর্ম এনে রেখেছি। তুই ফিল আপ কর। তারপর চল, আমি যাই তোর সঙ্গে। তিনটের মধ্যে পৌঁছালেই হবে।

বাবলু গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর সে বাবাকে বললো, তোমাকে যেতে হবে না। আমিই যাচ্ছি। তোমার তো দু'দিন ধরে জ্বর।

মমতা বললেন, তোর বাবার যে জ্বর তুই তা জানলি কী করে? তুই তো আমাদের কারুর খোঁজই রাখিস না।

এর পরের দৃশ্যটি অনেকদিন পর পারিবারিক পুনর্মিলনের মতন আনন্দময় হলো। বাবার কাছ থেকে ফর্ম নিয়ে বাবলু সেটি পূর্ণ করলো বাধ্য ছেলের মতন। মমতা তাঁর স্বামীকে বললেন, বাবলুর জন্য দুটো নতুন শার্ট কিনে দিতে হবে। ইউনিভার্সিটিতে ও কী পরে যাবে, ওর একটাও ভালো জামা নেই। প্রতাপ মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

সুপ্রীতি ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন, আমি জানতাম, ও রাজি হবে। বাবলু খুব ভালো ছেলে।

তিনি বাবলুর মাথায় হাত দিয়ে আশীবাদ করে বললেন, আরও বড় হও, গুণী হও, তোমাকে দিয়ে এই বংশের আরও সুনাম হোক!

জুতো-মোজা পরে প্রতাপ এক রকম জোর করেই বেরুলেন বাবলুর সঙ্গে। বাইরে দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। ওরা এসে দাঁড়ালো বাস স্টপে। এই দুপুরেও ট্রামবাস খালি নেই। সিনেমার ম্যাটিনি শো-এর দর্শকরা যাচ্ছে ঝুলতে ঝুলতে। ইদানীং সংসার খরচের খুবই টানাটানি যাচ্ছে বলে ট্যাক্সির কথা প্রতাপের মনেই পড়ে না।

ওঠা হলো একটা ভিড়ের বাসেই। ভালো করে দাঁড়াবারও জায়গা নেই। দু'তিন স্টপের পরই বাবলু ঠেলে ঠুলে একটা বসবার জায়গা পেয়ে চেঁচিয়ে বললো, বাবা, তুমি এখানে এসে বসো!

আরও দু'তিনজন লোক সেই সীট দখল করার জন্য বাবলুর ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে, বাবলু। দু হাত দিয়ে তাদের আটকে আছে। এই রকম ভাবে বসতে প্রতাপের লজ্জা করে। তিনি হাত তুলে বললেন, না, থাক, আমি ঠিক আছি।

প্রতাপের শরীর অবশ্য ঠিক নেই। এত ভিড়ে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে প্রায়। কয়েকদিনের জ্বরে তাঁর মাথাটা হাল্কা হয়ে আছে, টলটল করছে মাঝে মাঝে। তবু তিনি দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন।

ইউনিভার্সিটি ও সায়েন্স কলেজ ঘুরে সব কাজ চুকিয়ে ফেলার পর প্রতাপ নিশ্চিন্ত হলেন। পকেটে অনেকগুলো টাকা, তাঁকে সব সময় শঙ্কিত থাকতে হচ্ছিল।

প্রতাপ বললেন, চল, বাবলু, কোন দোকানে বসে একটু চা খাই। বাবার সঙ্গে বাবলু কখনো কোনো চায়ের দোকানে ঢোকেনি। এই গনগনে দুপুরে তার চা খাওয়ার ইচ্ছেও নেই। তবু বাবার এই অদ্ভুত শখের কথা শুনে তার মজা লাগলো. সে আপত্তি করলো না।

ওরা হেঁটে এগোলো রাজাবাজারের মোড়ের দিকে। রোদ্দুরটা প্রতাপের ঠিক সহ্য হচ্ছে না, মাথাটা ঘুরে উঠছে হঠাৎ, দু'তিনদিন জ্বরের জন্যই কী এমন? না অন্য কোনো বড় অসুখ বাসা বেঁধেছে। চিন্তাটা প্রতাপ মন থেকে উড়িয়ে দিলেন। ছেলের সঙ্গে তিনি হাঁটছেন, যেন তাঁর বয়েস অনেক কমে গেছে।

একটা অন্ধকার ঘুপচি মতন চায়ের দোকানে গিয়ে বসা হলো। ভনভন করে নীল ডুমো ডুমো মাছি উড়ছে। টেবিলের ওপর অয়েল ক্লথ পাতা, তাতে একটা চটচটে ভাব। চায়ের সঙ্গে প্রতাপ কেকের অর্ডার দিলেন। বাবলু একটু আগে ভাত খেয়ে এসেছে। তার কেক খাবার ইচ্ছে নেই, তবু প্রতাপ শুনলেন না। কাঁচের বৈয়ামে রাখা কতকালের বাসি কেক তা কে জানে! চায়ে দু'একটা মরা পিঁপড়ে ভাসছে। প্রতাপ সেই চা-ই বেশ তারিয়ে খেতে লাগলেন।

বাবলুর চোখে চোখ রেখে তিনি বলতে লাগলেন, আমি তো ইউনিভার্সিটিতে পড়িনি ... তবে ল' কলেজে পড়তে আসতাম ... আমাদের সময় তোদের ঐ কফি হাউসের নাম ছিল অ্যালবার্ট হল ... তোর বিমানকাকা আর আমি গোলদিঘিতে বসে গল্প করতাম প্রায়ই, ভাঁড়ের চা খেতাম, তখন ঐ চায়ের দাম ছিল এক পয়সা ... আমার বাবা আমাকে প্রতি মাসে তিরিশ টাকা হাত খরচ পাঠাতেন, তা দিয়ে যথেষ্ট বাবুয়ানি করা যেত। এক একদিন আমরা শখ করে ফিটন গাড়ি চাপতাম ... থাকতাম আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটা মেসে। এখান থেকে বেশি দূর নয় ... দেশ থেকে কোনো লোক এলেই মা তার হাত দিয়ে নানারকম জিনিস পাঠাতেন আমাদের মেসে। পাটালি গুড়, ঘি, নারকোল নাড়ু, তক্তি, আমসত্ত, সবাইকে ভাগ করে দিতাম ... তোর দেশের বাড়ির কথা মনে নেই, না রে বাবলু?

বাবলু বললো, একটু একটু মনে আছে।

প্রতাপ জোরে নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোর মনে থাকবার কথা নয়, তুই তখন। কতটুকু ... আমার বাবা তোকে খুব ভালোবাসতেন। . হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর প্রসঙ্গ বদল করে বললেন, তোর নামে আমি একটা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দেবো, সেখানে প্রতি মাসে জমা করে দেবো পঞ্চাশ টাকা। এখন বড় হয়েছিস, এখন রোজ রোজ বাবা-মায়ের কাছ থেকে পয়সা চাইতে তো লজ্জা করবেই। টিউশনি আর করতে হবে না, এ মাসেই ছেড়ে দে। পঞ্চাশ টাকায় তোর কুলিয়ে যাবে।

বাবলু লাজুক ভাবে বললো, না, অত লাগবে না।

–লাগবে, আজকাল সব জিনিসের তো খুব দাম, এক কাপ চা পনেরো পয়সা ... তোদের ক্লাসে তো এখন মেয়েরাও পড়বে ... মেয়েদের সঙ্গে মিশবি, বন্ধুত্ব করবি, তবে কখনো তাদের কারুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবি না, যাতে মনে দুঃখ পায়। মেয়েদের সঙ্গে যারা রুক্ষ ব্যবহার করে, তারা জীবনে সুখী হয় না।

বাবলু কয়েক ঢোঁকে চা শেষ করে ফেলেছে। সে এখন উঠতে পারলে বাঁচে। প্রতাপ বাবলুর চঞ্চলতা দেখে বললেন, বোস না। আমি আর এক কাপ চা খাবো। বেশ ভালো লাগছে। তুই পড়াশুনোটা করতে চাইছিলি না কেন? ছাত্রজীবনটা কত আনন্দের, ফুরিয়ে গেলেই তো গেল!

চায়ের দোকান থেকে বেরুবার পর বাবলু বললো, বাবা, তুমি তো বাড়ি ফিরবে? আমি মানিকতলায়, এক বন্ধুর বাড়িতে যাবো!

প্রতাপ বললেন, ঠিক আছে, তুই যা। আমি বাস ধরে নেবো এখন!

প্রতাপ একটা সিগারেট ধরিয়ে বাস স্টপের দিকে এগোলেন, বাবলু রাস্তা পার হয়ে অন্য দিকে চলে গেল। এখান থেকে সে হেঁটেও মানিকতলা চলে যেতে পারে। পমপমদের বাড়ি স্টাডি সার্কল আছে। এই স্টাডি সার্কল বাবলুকে চুম্বকের মতন টানে। বাবলু শেষ পর্যন্ত এম এস সি-তে ভর্তি হলো বলে ওখানে কেউ কেউ ঠাট্টা করবে। অবশ্য মানিকদা তাকে গোপনে বলেছিলেন, তুই ভর্তি হয়ে যা!

বাবলুর মনটা খচ খচ করছে। বাবাকে কি বাসে তুলে দেওয়া উচিত ছিল তার? ভিড়ের বাসে যেতে হবে। ট্রাম বরং কিছুটা ফাঁকা, এসপ্লানেড থেকে ট্রাম বদল করে গেলে ...

বাবলু পেছন ফিরে তাকালো। রাস্তার সোজাসুজি অন্য পারে প্রতাপ একটা বাতিস্তম্ভ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। থুতনিটা ঠেকে আছে বুকের কাছে, কেমন যেন অদ্ভুত ভঙ্গি। একটু বেশি

রাতের দিকে মাতালরা এইভাবে ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়ায়। বাবলু অবাক ভাবে চেয়ে রইলো। তার কি কিছু করা উচিত। বাবলুর বাবা শক্ত সমর্থ পুরুষ, বাবলু কোনোদিন তাঁকে দুর্বল হতে দেখেনি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রতাপ সেই বাতিস্তম্ভটা ধরেই উবু হয়ে বসে পড়লেন রাস্তার ওপর। বাবলু সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে, গাড়ি ঘোড়া অগ্রাহ্য করে রাস্তা পেরিয়ে চলে এল এদিকে। কাছে এসে ভয় পাওয়া গলায় ডাকলো, বাবা!

প্রতাপ পথের ধুলোর ওপর বসে পড়েছেন, মুখটা ঘুরিয়ে তাকালেন বাবলুর দিকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁকে দারুণ অসহায় মনে হলো, মুখোনি একেবারে বিবর্ণ, তিনি হাতটা বাড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন, বাবলু, বাবলু, আমি পড়ে যাচ্ছি!

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো প্রতাপকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, তোমার শরীর খারাপ লাগছে? একটা রিকশা ডাকছি ...

পাশ দিয়ে লোক জন হেঁটে যাচ্ছে, কারুর কারুর দৃষ্টি কৌতূহলী কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করছে না। কাছাকাছি কোনো রিকশা নেই, বাবলু ব্যাকুল ভাবে তাকাতে লাগালো এদিক ওদিক। এখন বাবার দায়িত্ব তার ওপর।

একটুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন প্রতাপ। তিনি জোর করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই বাবলু জিজ্ঞেস করলো, কী হলো?

প্রতাপ স্বাভাবিক গলায় বললেন, হঠাৎ খুব মাথা ঘুরছিল। কেন এমন হলো ব তো! হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, প্রতাপ সেটা একবার তুলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপরই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধরাতে গেলেন আর একটা, দেশলাই জ্বালতে গিয়ে তাঁর হাতের আঙুল কাঁপতে লাগলো থরথর করে।

বাবলু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলো। তার ধারণা, বেশি অসুস্থ হলে মানুষ সিগারেট খায় না। বেশি সিগারেট খাওয়ার জন্য বাবাকে মা মাঝে মাঝে বকেন। কিন্তু সে তো বাবাকে নিষেধ করতে পারবে না।

সিগারেটে দুটো বড় বড় টান দিয়ে প্রতাপ বললেন, ঠিক আছে। তুই যা ...।

বাবলু বললো, আমি তোমার সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছি।

প্রতাপ মাথা নেড়ে বললেন, না, না, আমি ঠিক আছি। আমি এখন নিজেই যেতে পারবো।

বাবলু বাবার হাত ধরে বললো, না, তুমি একা যাবে কেন? তোমার যদি আবার শরীর খারাপ হয় ... আমি যেখানে যাচ্ছিলাম, সেখানে না গেলেও চলবে, আমি তোমার সঙ্গে বাড়ি যাবো।

প্রতাপ ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সেদিনও বাচ্চা ছেলে ছিল বাবলু, আজ যেন হঠাৎ সাবালক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না, তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা, আমি ঠিক চলে যাবো। তুই কিছু চিন্তা করিস না। ঐ তো একটা বাস আসছে।

হাত তুলে প্রতাপ বাসটা থামালেন। তারপর বাবলুর দিকে আর একবার হাসি মুখ ফিরিয়ে জেদ করে উঠে গেলেন ভিড়ের মধ্যে।

১৫ মুড়ি ও তেলেভাজা খাওয়া

মুড়ি ও তেলেভাজা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম হাসি-ঠাট্টা চলছিল, হঠাৎ মানিকদা জোরে দু'বার হাততালি দিয়ে বললেন, চুপ, সবাই চুপ। অনেক গল্প হয়েছে, এবারে কাজের কথা হবে।

প্রীতিময় বললো, চা আনতে গেছে। মানিকদা, আগে চা-টা খেয়ে নিলে হতো না? মানিকদা একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন, আসুক, চা আসতে দেরি আছে, ততক্ষণ কথাবার্তা চলতে থাকুক।

তারপর তিনি একজনের দিকে আঙুল তুলে বললেন, এবারে তপন তুমি বলো, দেশ বলতে তুমি কী বোঝো।

তপন নামে এই ছেলেটিকে বাবলু আগে দেখেনি। বাবলুর থেকে বয়েসে তিন চার বছর বড়ই হবে, একটা ময়লা ধুতি ও নীল রঙের হাফশার্ট পরা, মাথার চুল ঝাঁকড়া, গায়ের রং বেশ কালো, চোখ দুটিতে ভয় ভয় ভাব। মানিকদা একে সঙ্গে নিয়ে ঢোকার সময় বলেছিলেন, এই আমাদের একজন নতুন বন্ধু। আর কোনো পরিচয় করিয়ে দেননি।

এখন সকলের দৃষ্টি পড়লো তপনের ওপর, সে যেন অসহায় বোধ করছে, এই নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেবার সে সময় পায়নি। এই ঘরে যে এগারো জন যুবক-যুবতী উপস্থিত, তারা সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের, তাদের কেউ কেউ ছেঁড়া জামা পরে থাকলেও তাদের চেহারার পালিশ দেখলেই বোঝা যায়, অন্তত তিন পুরুষ ধরে এক ধরনের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশে লালিত, সেই তুলনায় তপনের মুখ একেবারে টাটকা।

-চুপ করে রইলে কেন, কিছু বলো। দেশ বলতে তোমার চোখে কোন্ ছবি ফুটে ওঠে? তপনের ঠিক থুতনির কাছে একটা আঁচিল। সেটা খুঁটতে খুঁটতে সে মুখ খোলার চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলো না। ঘরের মধ্যে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। অন্যদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে চোখ নিচু করে নিচ্ছে।

বাবলুর পাশে বসা কৌশিক বললো, মানিকদা, এ নতুন এসেছে, প্রথম দিনই কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। আগে ওর সঙ্গে আমাদের ভালো করে পরিচয় করিয়ে দাও।

মানিকদা বললেন, এ সব লজ্জা ফজ্জা কোনো কাজের কথা নয়। ফর্মালি আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেওয়াও আমি পছন্দ করি না, ওগুলো সব বুর্জোয়া সিস্টেম। আমাদের একজন

নতুন বন্ধু এসেছে, তোমরা নিজেরাই তো আলাপ করে নেবে। যাই হোক, আমি কী করে ওর দেখা পেলুম, সেইটুকুই শুধু বলছি। শ্যামবাজারের মোড়ে যে কতকগুলো খুচরো দোকান আর স্টল আছে, তারই একটা দোকান, বুঝলে, দোকানটা ঠিক ফুটপাথে নয়, একটা ওষুধের দোকানের দেয়ালের গায়ে, সেই দোকান থেকে আমি মাঝে মাঝে গেঞ্জি কিনি।

পেছন থেকে একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, মানিকদা, আপনিও গেঞ্জি কেনেন?

সবাই হেসে উঠলো একসঙ্গে। গেঞ্জি কেনার কথাটা সত্যি অবিশ্বাস্য শোনায়। সারা বছর মানিকদাকে একই পোশাকে দেখা যায়, একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি ও গাঁজামা, কাঁধে একটা ঝোলা। এক একদিন গায়ের পাঞ্জাবিটা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে যায়, পরের দিনও মানিকদা সেটাই পরে আসেন। সবাই বলে, মানিকদা চান করবার সময় কিংবা ঘুমোবার সময়ও পাঞ্জাবিটা খোলেন না, আর মানিকদার গালের দাড়িও কখনো বাড়ে-কমে না।

অমল নামে একটি ছেলে বললো, আপনাকে শীতকালেও তো গেঞ্জি পরতে দেখিনি। মানিকদা নিজেও খানিকটা হেসে ফেলে বললেন, নিজের জন্য না হোক, বাড়ির লোকজনের জন্য তো কিনতে হয়। তা ছাড়া আমিও পরি, কলকাতার বাইরে গেলে...কলকাতার শীত আমার গায়ে লাগে না, কিন্তু গ্রাম ট্রামের দিকে গেলে ঠাণ্ডা আটকাবার জন্য আর একটা গেঞ্জি অন্তত... তার পর শোনো, সেই গেঞ্জির দোকানের যে দোকানদার, বুড়ো মতন একজন লোক, তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমি কোনো মানুষের সঙ্গেই শুধু দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে বিশ্বাস করি না, একটা কিছু ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখতে চাই...একদিন গিয়ে দেখি সেই দোকানে মালিকের বদলে এই তপন বসে আছে।

এবারে তপন মুখ তুলে বললো, দোকানটা আমার জ্যাঠামশাইয়ের।

মানিকদা বললেন, জ্যাঠামশাইয়ের দোকানে তার ভাইপো দু'-একদিন বসবে, আই মিন দাঁড়াবে, দেয়ালের গায়ে দোকান তো, বসার জায়গা নেই, মালিক বা কর্মচারিকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হয়, সেটা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু...

তপন আবার বললো, একটা টুল আছে, সেটা ওষুধের দোকানে রোজ রেখে দেওয়া হয়। আপনি যেদিন গেলেন, সেদিন ওষুধের দোকান বন্ধ ছিল, তাই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম...

মানিকদা হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, আমাকে শেষ করতে দাও। তারপর শোনো, সেদিন সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তায় বেশি লোক নেই, শ্যামবাজারের অধিকাংশ দোকানদারই সেদিন মাছি তাড়াচ্ছে, আমি আমার ছোট ভাইয়ের জন্য একটা গেঞ্জি কিনতে গেছি...

বাবলু একটু অবাক হয়ে কৌশিকের দিকে তাকালো। তাদের দু'জনের চোখেই পাতলা বিস্ময়। তাদের ধারণা ছিল, মানিকদার মা-বাবা, ভাই-বোন ইত্যাদি সম্পর্কের লোক থাকলেও তারা অনেক দূরে কোথাও আছে, মানিকদার মুখে কোনোদিন তাদের কথা শোনা যায়নি। মানিকদার মতন লোক কোনেদিন বাজার করে না, গেঞ্জি কেনে না, কোনদিন কোথায় কী খাবে তা নিয়ে চিন্তা করে না।

মানিকদা বলে চললেন, আমি গিয়ে দেখি, আমার চেনা বুড়ো লোকটি নেই, তার জায়গায় একটি নতুন ছেলে, খদ্দের নেই বলে সে এক মনে একটা বই পড়ছে। তোমরা ইমাজিন করতে পারবে, কী বই সেটা? শশধর দত্তের মোহন সিরিজ নয়, আধুনিক সাহিত্যিকদের কোনো ট্র্যাশও নয়, ও পড়ছিল, একটা কবিতার বই, সুকান্ত ভট্টাচার্যর 'ছাড়পত্র'। যাস্ট থিংক অ্যাবাউট ইট। ফুটপাথের একটা গেঞ্জির দোকানের কর্মচারি সুকান্তর কবিতা পড়ছে। তা হলে সুকান্তর কবিতা কতখানি ছড়িয়েছে। সেটাই তো দরকার। মাইকেল মধুসূদন বউবাজারের এক মুদিকে নিজের কবিতার বই পড়তে দেখে যে রকম থ্রিলড হয়েছিলেন, আমারও প্রায় সেই রকম অবস্থা। সুকান্ত বেঁচে থাকলে... সুকান্ত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, তার কবিতা আমি আমার নিজের...

সুকান্ত ভট্টাচার্য যে মানিকদার বন্ধু ছিলেন তা এ ঘরে উপস্থিত সবাই জানে। মানিকদা অনেকবার বলেছেন। বাবলু আগে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কোনো কবিতা পড়েনি, সে কবিতা-টবিতা পড়তে ভালোবাসে না, সে এখানে আসবার পরই কয়েকবার সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার আবৃত্তি শুনেছে কয়েকজনের মুখে।

পমপম বললো, মানিকদা, আমরা ওর মুখে একটা কবিতার আবৃত্তি শুনবো।

মানিকদা হাত তুলে বললেন, পরে, পরে, পমপম, অধৈর্য হচ্ছিস কেন? খানিকপরে কবিতার সেশান হবে। তার আগে সবটা শোন্? ওর হাতে সেই বই দেখে আমি প্রথমেই ভেবেছিলুম ওকে জড়িয়ে ধরবো। নিজেকে অতিকষ্টে সংযত করেছি। আস্তে আস্তে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললুম। ফ্যান্টাস্টিক ছেলে। কী মনের জোর। আমরা এখানে যারা বসে আছি, ইনকুডিং মাইসেলফ বলছি, আমাদের সবার চেয়ে ও অনেক বেশি স্ট্রাগল করেছে। বেশ কয়েকদিন ওর সঙ্গে মিশে, ওকে ভালো করে চেনবার পর একদিন জিজ্ঞেস করলুম, তপন, তুমি আমাদের স্টাডি সার্কেলে যাবে? ও রাজি হয়ে গেল। তাই ওকে আজ নিয়ে এসেছি। নাও, হিয়ার হি ইজ। তপনকে নিয়েই আজ আমাদের মেইন আলোচনা হবে। তার আগে, ওর ব্যাকগ্রাউণ্ডটা জানা দরকার। সেটা তপন নিজেই বলবে। তপন, এখানে লজ্জাটজ্জা পাবার কারণ নেই, এখানে সবাই তোমার বন্ধু, তুমি নিজের কথা কিছু শোনাও।

তপন মুখ তুলে বললো, কী বলবো, মানিকদা? নিজের কথা...মানে...আপনিই তো বলে দিলেন...

মানিকদা বললেন, আমরা তোমার সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাই। এখানে যারা নিয়মিত আসে, তাদের প্রত্যেকের নাড়ি-নক্ষত্র আমরা সবাই জানি। তুমিও জানতে পারবে। তুমি কোথা থেকে শুরু করবে, সেটা বুঝতে পারছে না তো? তাহলে, আমরা সবাই মিলে তোমাকে প্রশ্ন করব, এটাকে জেরা বলে ভেবো না। আমরা সবাই সবাইকে ভালো ভাবে

জানতে চাই। এই, তোমরা প্রশ্ন করার জন্য তৈরি হও। প্রথম প্রশ্নটা আমিই করছি। তপন, তুমি সবাইকে বলল, তুমি কোথায় থাকো। একটু ডিটেইলসে বললো।

তপন বললো, আমি দমদমে নাগের বাজারের কাছে থাকি। জায়গাটার নাম ক্লাইভ কলোনি। ঐখানে লর্ড ক্লাইভের বাগান বাড়ি ছিল। লর্ড ক্লাইভ মানে যিনি ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে...যিনি পলাশীর যুদ্ধে মুর্শিদাবাদ থেকে সব ধনরত্ন লুঠ করে এনে...

মানিকদা আবার বাধা দিয়ে বললেন, আমরা লর্ড ক্লাইভ বিষয়ে জানি, তুমি তোমার থাকার জায়গাটা সম্পর্কে বলো। তুমি কি লর্ড ক্লাইভের বাড়িতেই থাকো?

এতক্ষণ পরে তপন ফিকে ভাবে একটু হাসলো। তারপর বললো, না, আমি সে বাড়িতে থাকি না। জায়গাটার নাম ক্লাইভ কলোনি হলেও আসলে সেটা এখন একটা রিফিউজি কলোনি। আমি সেখানে আমার জ্যাঠামশাইদের সাথে থাকি।

–পাকা বাড়ি, না মাটির বাড়ি?

–পাকা বাড়ি মানে কি ইটের? না, ইটের বাড়ি না, চ্যাঁচার বেড়ার ওপরে মাটি ল্যাপা, আগে খড়ের ছাউনি ছিল, গত বর্ষায় টিন দেওয়া হয়েছে। এখন আর জল পড়ে না।

–কটা ঘর? ক'জন থাকো।

–দুইটা ঘর। ফেমিলি মেম্বার নয়জন।

মানিকদা পেছন ফিরে খানিকটা বিরক্তভাবে বললেন, তোমরা আর কেউ কোনো প্রশ্ন করছো না কেন? আমাকে একলাই সব বলতে হচ্ছে।

বাবলু এবার হাত তুলে বললো, আমার একটা প্রশ্ন আছে। তপনবাবুর বাড়ি আগে কোথায় ছিল? উনি রিফিউজি কলোনিতে থাকেন বললেন...।

তপন কিছু উত্তর দেবার আগেই মানিকদা বললেন, ওসব বাবু টাবু চলবে না। শুনলেই আমার গা জ্বালা করে। হয় ওকে তোমরা তপনদা বলবে, নয় শুধু নাম ধরে ডাকবে। তপন, তুমি উত্তর দাও প্রশ্নটার।

তপন বললো, আমাদের বাড়ি আগে ছিল কুমিল্লায়। আপনারা কেউ সরাইল-এর নাম শুনেছেন। সেই সরাইলে ছিলাম আমরা।

অনুপম বললো, আমার বাবা-মার মুখে শুনেছি, আমাদের বাড়ি ছিল কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। আমি অবশ্য সেখানে কখনো যাইনি। তার কাছে?

তপন বললো, খুব দূরে না। পাকিস্তান হবার পরও আমরা মোটামুটি ছিলাম। আমি সেখানে মেট্রিক পর্যন্ত পড়েছি। কিন্তু আমার বাবা ছিল খুব তেজী মানুষ, একবার জমি নিয়ে এক গণ্ডগোলে থানার দারোগার সাথে ঝগড়া হলো, সেই থেকে আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম, তারপর আমার বাবা খুন হলো, আমাদের বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

অনুপম বললো, তারপর আপনারা চলে এলেন?

তপন বললো, আসতে বাধ্য হলাম। আমি আসতে চাই নাই। আমি ঢাকায় থেকে পড়াশুনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উপায় তো নাই। কে আমার খরচ দেবে? বাবা মারা গেলেন... জ্যাঠামশাই আগেই চলে এসেছিলেন এই দ্যাশে, মায়েরে নিয়ে আমারেও চলে আসতে হলো।

হঠাৎ যেন তপনের চোখে ঘনিয়ে এলো স্মৃতির মেঘ। সে চুপ করে গিয়ে তার থুতনি ঠেকালো বুকে।

মানিকদা বললেন, এরকম ঘটনা আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু এক্সট্রা অর্ডিনারি ব্যাপার হলো, পায়ে হেঁটে বর্ডার ক্রশ করে, রিফিউজি কলোনিতে জ্যাঠামশাইয়ের আশ্রয়ে

থেকেও তপন হার স্বীকার করেনি। তাই না, তপন? তুমি এখানে এসেও কী করে লেখাপড়া চালালে।

তপন আবার মুখ তুললো, এবারে তার কণ্ঠস্বর বেশ গম্ভীর। সে বললো, মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট পেতে বেশ অসুবিধা হয়েছিল। একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল। তারপর আমি কলেজে ভর্তি হতে গেলে জ্যাঠামশাই রাজি হন নাই। আমাদের নাগেরবাজারে থাকেন প্রফেসার পি চ্যাটার্জি, তিনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আমাকে হাফ ফ্রি করে দিতে পারবেন বললেন, তাঁরও বাড়ি ছিল কুমিল্লায়-আমি শিয়ালদা বাজারে কিছুদিন ডিম বিক্রি করেছি, তাতে যাতায়াতের ভাড়াটা উঠে যেত...কিন্তু গ্রেজুয়েট হয়েও কোনো লাভ হলো না, কোথাও চাকরি পাই না, এম. এ. পড়ার কোশ্চেন নাই, অনেক খরচ, এদিকে চাকরিও জোটে না। তাই জ্যাঠামশাইয়ের দোকানে এখন মাঝে মাঝে বসি। আপনারাই বলেন, গেঞ্জি বিক্রি করার জন্য কি বি এ পাশ করা কোনো কাজে লাগে?

অনুপম জিজ্ঞেস করলো, কেন, রিফিউজিদের জন্য তো আলাদা কোটা আছে শুনেছি। তাতেও আপনি চাকরি পেলেন না?

মানিকদা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, শাট আপ। অনুপম, তুই কোটার কথা বলছিস, তোর লজ্জা করে না? মানুষে মানুষে আর এ রকম কত শ্রেণী বিভাগ হবে?

তপন তবু মুখ উঁচু করে অনুপমের উদ্দেশে বললো, হ্যাঁ, কোটা আছে। যে অফিসে পাঁচজনের কোটা আছে, সেখানে দেড়শো জন রিফিউজি অ্যাপ্লাই করে। তাদের মধ্যে পঁচাত্তরজনই ওভার কোয়েলিফাইড। জানেন তো, যারা আমাদের মতন রিফিউজি না, যাদের বাপ-ঠাকুদার দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে, এদেশে অনেক দিন আছে, বাড়ি ঘর আছে, তারাও এখন রিফিউজি সেজে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নিতে চায়।

এই সময় রাধা কেবিনের এক ছোঁকরা এলো কেটলিতে চা আর কিছু ভাঁড় নিয়ে। ছেলেটির বয়েস চোদ্দ-পনেরোর বেশি না, বেশ নাদুশনুদুশ চেহারা, সে এসেই

ভারিক্কিভাবে চ্যাঁচায়। চা লিন। তাড়াতাড়ি করুন। দু টাকা ষাট নয়া, পয়সাটা দিয়ে দিন আগে।

স্টাডি সার্কেলের সদস্যদের প্রত্যেক জমায়েতে চল্লিশ নয়া করে চাঁদা দিতে হয়, সেই পয়সা জমা হয় একটি ভাঁড়ে। পমপম তার থেকে চায়ের দাম মিটিয়ে দিল।

চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে মানিকদা আর একাট বিড়ি ধরালেন। কেউ সিগারেট দিলেও তিনি নেন না। অবশ্য, অন্যান্য সদস্যদের তিনি ইচ্ছেমতন বিড়ি-সিগারেট খাবার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। এখানে বয়েসের ব্যবধানকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

মানিকদা আবার দু'বার হাত তালি দিয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে বললেন, এতক্ষণ তোমরা তপন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করতে পেরেছো। এবারে অরিজিনাল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। আজ তপনকে কেন্দ্র করেই আমাদের আলোচনা হবে। তপন, তুমি বলো, দেশ বলতে তুমি কী বোঝো।

তপনের লাজুকতা অনেকটা কেটে গেছে। অনুপমের কাছ থেকে পাওয়া একটা সিগারেট প্রায় শেষ করে এনেছে, সে খানিকটা দুঃখী দুঃখী গলায় বললো, মানিকদা, দেশ বলতে এখনো আমি কুমিল্লার সেই সরাইলকেই বুঝি। মাপ করবেন! এখনো ইণ্ডিয়ায় আছি, কিন্তু প্রায়ই সরাইলের স্বপ্ন দেখি। যা সত্যি, তাই বললাম। পাকিস্তান হবার পরও আমরা সেদেশে ছিলাম, পাকিস্তানকেই নিজের দেশ বলে মেনে নিয়েছিলাম, কোনোদিন চলে আসতে হবে ভাবিনি, যে বাড়িতে জন্মেছি, যে পুকুরে সাঁতার শিখেছি, যে রাস্তা ধরে রোজ ইস্কুলে গেছি, তা কি কেউ সহজে ছেড়ে আসতে চায়? তবু ছেড়ে আসতে হয়েছে...এখন ইণ্ডিয়াতে আছি, রিফিউজি কলোনিতে... বি এ পাশ করেও চাকরি পাই না, বাসে-ট্রামে বেশি ভিড় হলে, "শালা বাঙালদের জন্য দেশটা উচ্ছন্নে গেল। এই কথা শুনতে হয়, তবু আমি বলবো, এখন ইণ্ডিয়াই আমার দেশ।

অনুপম জিজ্ঞেস করলো, পাকিস্তানে থাকলেও কি আপনি বি এ পাশ করলেই চাকরি পেতেন? সে দেশে বেকার নেই?

তপন বললো, তা আছে। কিন্তু সেখানে আমাদের বাড়ি-জমি ছিল, ভাত কাপড়ের অভাব ছিল না, রিফিউজি বলে পদে পদে লাথি ঝাঁটা খেতে হতো না। আপনারা তো দেশ ভাগের ফল ভোগ করেননি...

মানিকদা রেগে গিয়ে বললেন, আঃ, অনুপম, তুই আলোচনাটা বড্ড মানডেন দিকে নিয়ে যাচ্ছিস। এসব কথা তো বহুবার শোনা হয়ে গেছে। আমরা এর থেকে অনেক বড় ব্যাপার নিয়ে... তপন, তুমি আমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারোনি। তুমি পাকিস্তানের সিটিজেন না ইণ্ডিয়ার সিটিজেন, সেটা এমন কিছু ইমপটান্ট ব্যাপার নয়। দেশ বলতে আমি কোনো জিওগ্রাফিক্যাল বাউণ্ডারির কথা জিজ্ঞেস করছি না। দেশ নামে একটা ভাবমূর্তি তো আছে। তোমার কাছে সেটা কী রকম? সে কি বঙ্কিমের "সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্।" না কি, রবি ঠাকুরের "নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি", নাকি ডি এল রায়ের "সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।"

তপন বেশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে সবার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে ও মানিকদা ছাড়া আটটি যুবক ও তিনটি যুবতী রয়েছে এই ঘরে। যুবতীদের দিকেই চলে যাচ্ছে তার চোখ, কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে মুখ নামিয়ে নিচ্ছে। এখন সবাই চেয়ে আছে তার দিকে।

সে বললো, যে-দেশেই থাকি, সব সময়ই দেশ আমার কাছে মায়ের মতন। নীল আকাশ, সবুজ ধান খেত, নদীর ধারে কাশ ফুল ফুটে আছে...

মানিকদা উঁচু গলায় হেসে উঠলেন। তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বললেন, দ্যাখো, এই একটা টিপিক্যাল উদাহরণ, এই ছেলেটি এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে, তবু পুরোনো সংস্কার ছাড়তে পারেনি। দেশকে মা বলা কিংবা বাবা বলা একটা পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া কনসেন স্বার্থপর শ্রেণী নানারকম গানে ও কবিতায় এই সেন্টিমেন্টাল ইমেজটা বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

তপনের দিকে ফিরে তিনি ধমকের সুরে বললেন, নীল আকাশ, সবুজ ধান ক্ষেত, কাশ ফুলের আড়ালে আড়ালে সর্বক্ষণ কী উঁকি মারছে তা তুমি দেখোনি। সেদিন সুকান্তর ছাড়পত্র পড়ছিলে, সুকান্তর কবিতা তোমার মনে পড়লো না?

“এখানে মৃত্যু হানা দেয় বার বার
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার
এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু মেলেছে এখানে ঘাঁটি;
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ভাঙা নৌকোর পাল...”

শোনো তপন, দেশ বলে আলাদা কিছু নেই। এই পৃথিবীটাই সব মানুষের দেশ। আজও এই পৃথিবীতে দুটিই মাত্র জাতি আছে। হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান-বৌদ্ধ, এই সব আলাদা আলাদা জাত-পাঁতের ভাগও কৃত্রিম। শোষক ও শোষিত ছাড়া আর কোনো জাত নেই। তুমি হিন্দু বলে পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানে ধনী মুসলমানরা কি গরিব মুসলমানদের শোষণ করে না? তুমি হিন্দু হয়ে এদেশে পালিয়ে এসেছে বলে কি এদেশের ধনী হিন্দুরা তোমাদের আদর করে বুকে টেনে নিয়েছে? শোষক আর শোষিত ছাড়া আর কোনো জাত নেই। নিজেকে হিন্দু ভেবো না, মুসলমান ভেবো না, এগুলো ভুল। তুমি আর হুগলি জেলার চাষী রহিম শেখ একই শ্রেণী, একই রকম শোষিত। পৃথিবীতে একদিন শোষণ ও শোষিত শ্রেণীর লড়াই হবে, ওরা হারবে, ওরা হারতে বাধ্য, তারপর যখন একটাই শ্রেণী থাকবে তখনই সত্যিকারের পৃথিবীটা হবে আমাদের দেশ। আমাদের মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি যাই-ই বলো।

এই বক্তৃতায় খুব বেশি বিচলিত না হয়ে তপন শান্তভাবে বললো, এই সব কথা আমি আগেও শুনেছি। কিন্তু এই লড়াইটা কী করে হবে, মানিকদা? যারা অত্যাচারী, যাদের

আপনি শোষক বললেন, তাদের হাতেই যে সব অস্ত্রশস্ত্র। তারা সুবিধাভোগী, তারা দাবি ছাড়বে কেন।

মানিকদা এবারে অনুপমের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি বেশি কথা বলে ফেলছি। এটা বক্তৃতার জায়গা নয়, স্টাডি সার্কেল। সবাইকে আলোচনায় অংশ নিতে হবে। অনুপম, তুমি এবার তপনের প্রশ্নের জবাব দাও।

অনুপম বললো, শোষকদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে তা ঠিকই কিন্তু শোষিতরা সংখ্যায় বেশি। অনেক বেশি। একদিন তারাও যে যা পারবে অস্ত্র তুলে নেবে। তারা স্বার্থপর নয়, সেই জন্যই তারা জিতবে। তবে লড়াইটা একদিনে আরম্ভ হয়ে একদিনেই শেষ হবে না। লড়াই শুরু হয়ে গেছে, চলবে অনেকদিন।

বাবলুর পাশ থেকে কৌশিক বলে উঠলো, এ লড়াইতে নেতৃত্ব দেবে কে? চীন না রাশিয়া?

দারুণভাবে আহত হবার মতন মুখ বিকৃত করে মানিকদা বললেন, প্লিজ, তোমাদের কতবার বলেছি, রাশিয়ার নাম উচ্চারণ করো না। ওরা বিপ্লবের পথ থেকে সরে গেছে। ওরা শোধনবাদী। এদেশে ওরা বুর্জোয়া-ন্যাশনালিস্ট সরকারের সঙ্গে আঁতাত করেছে। এর পর ওরা আমেরিকার সঙ্গে হাত মেলাবে। ওদের কথা বলো না। প্রোলেতারিয়েত দুনিয়ার একমাত্র ভরসা হলো চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর চীন।

তপন বললো, কিন্তু মানিকদা, চীন তো আমাদের ইণ্ডিয়া আক্রমণ করেছিল গত বছর। ইণ্ডিয়াও একটা গরিব দেশ, তবু কেন চীন অ্যাটাক করলো।

মানিকদা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তপন, তুমি কয়েক বছর আগে মাত্র পাকিস্তান থেকে এসেছো, রিফিউজি কলোনিতে কষ্ট করে থাকো, তবু এর মধ্যেই ইণ্ডিয়া তোমার কাছে "আমাদের ইণ্ডিয়া" হয়ে গেল? শোনো, চীন কখনো ইণ্ডিয়া অ্যাটাক করতে পারে না, করেনি। ওটা জওহরলাল নেহরু দেশের লোককে ধোঁকা দিয়েছে। দেশের ইন্টার্নাল সমস্যা চাপা দেবার জন্য একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস সৃষ্টি করতে চেয়েছে। যুদ্ধটা

নিজে থেকেই কে থামালো, চীন থামায়নি? কখনো শুনেছো, যে-দেশ যুদ্ধে জিতছে, সেই দেশ নিজে থেকেই সীজ-ফায়ার ডিক্লেয়ার করে? গত বছর চীন ইণ্ডিয়ার মধ্যে ঢুকে এসেও তাই-ই করেছে। কেন? কারণ, চীন মিলিটারি ভিকট্রিতে বিশ্বাস করে না। এই চীনই এখন সারা দুনিয়ায়...

হঠাৎ এই সময় ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন পমপমের বাবা অশোক সেনগুপ্ত। সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা, মাথার চুলে পাক লাগায় তাকে এই পোষাকে বেশ সৌম্য দেখায়। তিনি একজন বামপন্থী নেতা, এই স্টাডি সার্কল তাঁরই দাক্ষিণ্যে খোলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে দেখেই মানিকদা থেমে গেলেন।

অশোক সেনগুপ্ত উদারভাবে বললেন, এই যে মানিক, তোমাদের চলছে এখনো? কিন্তু সাতটার সময় যে আমাদের একটা সেল মিটিং আছে এখানে?

মানিকদা হাসিমুখে বললেন, সাতটার তো দেরি আছে। আমরা উঠে যাবো একটু বাদে। অশোকদা, বসুন না।

কৌশিক ফিসফিস করে বাবলুকে জিজ্ঞেস করলো, চল, এবার উঠবি?

বাবলুর আরও একটু বসার ইচ্ছে ছিল। সে লক্ষ্য করেছে, পমপমের বাবা অশোক সেনগুপ্তর সঙ্গে ইদানীং মানিকদার একটুও মনের মিল নেই। তিনি এই জায়গাটার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বটে কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রায়ই মানিকদার কথা কাটাকাটি হয়। সেই তর্ক বাবলুর শুনতে ভালো লাগে।

কিন্তু আজ বাবলুকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। সে উঠে পড়ে কৌশিককে বললো, চল্।

মানিকদা তাদের দিকে ফিরে বললেন, অতীন আর কৌশিক, তোমরা একটু তপনকে এগিয়ে দাও। খুব যদি কাজ না থাকে, তা হলে কোনো পার্কে বসে তোমরা ওর সঙ্গে আর একটু কথা বলো। ওকে বুঝতে, বোঝাবার চেষ্টা করো।

এটা অনুরোধ নয়, আদেশ। বাবলু ও কৌশিক তা বোঝে। তারা সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানালো।

পেছন থেকে পমপম বললো, আমাকে একবার শ্যামবাজার যেতে হবে, আমিও যাবো ওদের সঙ্গে। এই, তোরা একটু দাঁড়া...

তপনকে নিয়ে ওরা তিনজন বেরিয়ে এলো রাস্তায়। বাবলু লক্ষ করলো, এই সন্ধের সময়ে বাড়ি থেকে বেরুবার জন্য পমপম তার বাবার অনুমত নিল না। পমপম সব ব্যাপারেই নিজেকে ছেলেদের সমান সমান বলে মনে করে। এই সময় কখনো বাড়ি থেকে বেরুলে বাবলুও তার মাকে বলে যায়। পমপমের অবশ্য মা নেই।

বাইরে ঝোড়ো বাতাস বইছে, রাস্তা ঘাট অনেকটা ফাঁকা। শ্যামবাজারের দিকে না গিয়ে ওরা মানিকতলা ব্রীজের মাঝখানে দাঁড়ালো ঝড় দেখবে বলে। পমপম ঝড় দেখতে ভালোবাসে। বাতাসের বেগ একই রকম রইলো, কিন্তু ঝড় উঠলো না। ওরা আড্ডা দিতে লাগলো

অনেকক্ষণ ধরে। তপনের আড়ষ্টতা কিছুতেই কাটছে না দেখে এক সময় পমপম তপনের একটা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে অদ্ভুত ভাবে হেসে বললো, আমাদের কথাবাতা তোমার অপছন্দ হচ্ছে না তো?

তপন প্রবল ভাবে দু দিকে মাথা নাড়লো।

পমপম বললো, অন্ধকারে মাথা নাড়া দেখে কি হ্যাঁ-না বোঝা যায়? মুখে বলতে হয়। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেও না যেন। আজ থেকে তুমি আমাদের দলে।

১৬ অসুখ-বিসুখের ব্যাপার

অসুখ-বিসুখের ব্যাপার নিয়ে প্রতাপ আলোচনা করতে ভালোবাসেন না। নিজের কখনো শরীর খারাপ হলে সহজে তা স্বীকার করতে চান না, এমনকি মমতার কাছেও না। দেহ নামক যন্ত্রটিতে কখনো সখনো বিকার ঘটেই, তখনও প্রতাপ ডাক্তার দেখাবার বদলে নিজেই গোপনে নিজের চিকিৎসা করেন।

রাস্তা ঘাটে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতন ঘটনা তাঁর জীবনে আর কখনো ঘটেছে কি না তা কেউ জানে না, তবে এবারের কথাটা বাবলু এসে তার মাকে বলে দিয়েছে। প্রতাপ তবু কয়েকবার অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেন, বললেন, ওটা কিছুই না, সেদিন মাথায় বেশি রোদ লেগে গিয়েছিল, তারপর থেকে তো আবার ঠিকই আছি, ট্রামে বাসে চাপছি...। মমতা তবু তাঁর এক আত্মীয় ডাক্তারকে ডাকার জন্য জেদ ধরতে প্রতাপ বললেন, ঠিক আছে, আগে বাড়ির ডাক্তারকে দিয়েই প্রেসার ট্রেসার মাপিয়ে দেখা যাক- তুতুলকে একবার ডাকো।

বাড়িতে তুতুলের সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না কখনো। এ বাড়িতে দুটি মেয়ে আছে, মুন্নি আর তুতুল, মেয়েদের কণ্ঠস্বর সাধারণত একটু উচ্চগ্রামে বাঁধা, মুন্নির হাসি-কান্না, কথাবার্তা অন্য ঘর থেকে শুনতে পাওয়া যায় প্রায়ই। তুতুল যদিও মুন্নির সঙ্গে একই ঘরে থাকে, তবু সে অদ্ভুত নিঃশব্দ। সে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে যায়, প্রত্যেকদিন ঠিক সময় ফেরে, তার কোনো বন্ধু বান্ধব আসে না এ বাড়িতে। সে কখনো চেঁচিয়ে বই পড়ে না, যদিও জেগে থাকে অনেক রাত পর্যন্ত। তাকে বাড়ির কিছু কাজ করতে বললে সে করে দেয় ঠিক ঠাক, এমনকি রান্নাবান্নাও করতে জানে, শুধু মুখের কথা খরচ করতেই তার যত কষ্ট। এজন্য সে প্রায়ই বকুনি খায় সুপ্রীতির কাছে।

ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্রটি নিয়ে তুতুল এসে দাঁড়াল প্রতাপের বিছানার কাছে।

শুক্রবারের সন্ধ্যা, আদালত থেকে ফিরে প্রতাপের আবার খানিকবাদে বেরুবার কথা, বাড়ি বদলাবার ব্যাপারে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন রাত আটটায়, মাঝখানের সময়টুকুতে প্রতাপ একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। অমনি মমতা উদ্বিগ্নভাবে এসে তাঁর কপালে হাত রেখে বলেছিলেন, তুমি বাড়ি ফিরেই শুয়ে পড়লে? নিশ্চয়ই আবার তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। প্রতাপ বলেছিলেন, আহা কী মুশকিল, আফিস থেকে ফিরে একটুখানি শুতেও পারবো না? তোমরা চা-টা করো...

তুতুলের দু'পাশ ঘিরে রয়েছেন মমতা এবং সুপ্রীতি, মুন্নিও এসে উঁকি মেরেছে পিছন থেকে। বাবাকে সবাই মিলে কাবু করে ফেলা হচ্ছে দেখে সে বেশ মজা পাচ্ছে।

তুতুল কিছু বলার আগেই দু'পাশ থেকে মমতা আর সুপ্রীতি নানারকম নির্দেশ দিতে থাকেন। এখন প্রতাপের কয়েকদিন অফিস যাওয়া চলবে না, ছুটি নিয়ে শুয়ে থাকতে হবে। বাড়িতে বসেও লেখা-পড়ার কাজ করা চলবে না, ওতে মাথার ওপর চাপ পড়ে, রোজ সকালে থানকুনি পাতার রস খাওয়া ভালো।

তুতুল প্রতাপের বাহুতে পট্টি জড়াতে শুরু করেছে, প্রতাপ তাকে বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়া তো একটু।

তিনি উঠে বসে আঙুল তুলে হুকুমের সুরে বললেন, তোমরা সব বাইরে যাও! ডাক্তার যখন পেশেন্ট দেখে, তখন অন্য কারুর সেখানে থাকার কথা নয়। কোনো রোগ এখনো ধরা পড়েনি, এর মধ্যেই তোমরা আমার চিকিৎসা করতে শুরু করে দিয়েছে। বা রে বাঃ! যাও, সবাই বাইরে যাও!

মমতা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে আবার বললেন, না হলে কিন্তু আমি দেখাবো না!

মমতা প্রতাপের জেদ জানেন, তিনি সুপ্রীতির দিকে তাকালেন। মমতা বাইরে যেতে রাজি হলেও মনে মনে ঠিক করলেন, তুতুল এখনও ছাত্রী, শুধু ওকে দিয়ে দেখালেই চলবে না, একজন বড় ডাক্তার ডাকতেই হবে।

মমতারা বেরিয়ে যাবার পর প্রতাপ বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয় তুতুল। তারপর তুই ঐ চেয়ারটা টেনে আমার সামনে বোস।

প্রতাপ ভালো করে তুতুলকে দেখতে লাগলেন, যেন তিনি অনেকদিন পরে ওকে দেখছেন। লম্বা হয়েছে মেয়েটা, কিন্তু অসম্ভব রোগা। রংটাও ময়লা ময়লা লাগছে। ব্লাউজটা ঢলঢলে, একটা বিবর্ণ শাড়ি পরে আছে, মাথার চুলের যত্ন নেই। এই মেয়ে কিছুদিন পরে ডাক্তার হবে, তখন ওকে কেউ মানবে? অবশ্য তুতুল রেজাল্ট ভালো করে, ও পড়ছে নিজের স্কলারশিপের টাকায়। কিন্তু শুধু ভালো রেজাল্ট করলেই তো হয় না, ডাক্তারদের খানিকটা ব্যক্তিত্ব না থাকলে চলে? এ মেয়ে শুধু রোগা নয়, শীর্ণ। তার ওপরে কথাই বলতে চায় না, ডাক্তার হিসেবে ওকে মানবে কে?

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, তুতুল, তুই বাড়িতে খেতে পাস না নাকি? এত রোগা হচ্ছিস দিন দিন...

তুতুল একটু ম্লান ভাবে হাসলো। অধিকাংশ প্রশ্নের তার এই উত্তর। নিতান্ত দরকার না হলে সে হাঁ কিংবা না-ও বলে না।

প্রতাপ আবার বললেন, সেই সকালে বেরিয়ে যাস, দুপুরে খাস তো কিছু? মেডিক্যাল কলেজে ক্যান্টিন আছে তো?

তুতুল সম্মতিসূচক মাথা হেলালো একদিকে, তারপর যাতে আর কোনো প্রশ্ন শুনতে না হয়। সেইজন্য কানে গুজলা স্টেথোস্কোপ।

প্রতাপ তুতুলের চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করলেন কিন্তু সে মুখ নিচু করে আছে। প্রতাপ ভাবলেন, মেয়েটা প্রত্যেক রাত জেগে পড়াশুনো করে, বড় বেশি পরিশ্রম করছে, সেই জন্য তার মুখে ক্লান্তির ছাপ। এরকম ভাবে চললে ওর শরীর ভেঙে যাবে। ও নিজে ডাক্তারি পড়ে, আর নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা বোঝে না?

হঠাৎ নিজের বড় ছেলের কথা মনে পড়ে গেল প্রতাপের। বেঁচে থাকলে পিকলু এতদিনে পরিপূর্ণ যুবক হয়ে যেত, কিন্তু মৃত্যুতে মানুষের বয়েস থেমে থাকে, পিকলুর সেই সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ চেহারাটাই চোখে ভাসে, তার তুলনায় তুতুলও বড় হয়ে গেল। এমনকি মুন্নিও একদিন পিকলুকে ছাড়িয়ে যাবে...। পিকলুর মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে রাত্তিরবেলা শুয়ে মমতা চুপি চুপি প্রতাপকে বলেছিলেন, পিকলু আর তুতুল দু'জনেই বড় হচ্ছে, এই বাড়িতে এত ছোট জায়গা, আমি আর দিদি দুপুরে সিনেমা-টিনেমায় গেলে ওরা একা একা থাকে...আমার ভয় করে...যদি কিছু একটা হয়ে যায়...এই বয়েসী ছেলেমেয়েরা হঠাৎ মাথার ঠিক রাখতে পারে না।

প্রতাপ শুনে অবাক হয়েছিলেন। পিঠোপিঠি ভাই বোনের মধ্যে অনেক সময় ঝগড়া হয়, অনেক সময় বেশি ভাবও হয়। মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে সেই ভাব যদি ভালোবাসাতেও উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তাতে ক্ষতি কী? সেই ভালোবাসার সম্পর্ক তো অতি মধুর। সেই সম্পর্কের মধ্যে নোংরামি আসতে পারে যদি ছেলে বা মেয়ের মধ্যে কেউ একজন বদ হয়। পিকলু বা তুতুল দু'জনের কেউই সেরকম নয়। ওরা, অন্যায় কিছু করতেই পারে না।

প্রতাপ মমতাকে সেদিন ধমক দিয়েছিলেন। নিজের ছেলেমেয়ের ওপর যে বাপ-মা বিশ্বাস রাখতে পারে না, তারা ছেলেমেয়েদেরও ক্ষতি করে, নিজেরাও অশান্তিতে ভোগে। ছেলেমেয়েদের ঠিক মতন লেখাপড়ার সুযোগ দাও, সহবৎ শেখাও, পারিবারিক সম্মান সম্পর্কে সচেতন করো, আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলো, তারপর ওদের ভালোমন্দ ওরা নিজেরাই বুঝে নেবে। কিছুদিন পর তো এই পৃথিবীটা ওদেরই হবে, আমাদের চলে যেতে

হবে, ওরা যদি কিছু ভুলও করে, সেই ভুলের বোঝাও ওরাই বইবে, আমরা তো বইতে যাবো না!

মমতাও সঙ্কীর্ণমনা নন। প্রতাপের উপদেশ মেশানো বকুনি শুনে তিনি আহতভাবে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিলেন, ওরা খারাপ কিছু করবে, আমি মোটেই সে কথা বলিনি। তুমি বাড়ি বদলাবার ব্যবস্থা করবে কি না বলো। জায়গায় মোটেই কুলোয় না, শুধু তুতুল কেন, মুন্নিও তো বড় হচ্ছে, সে আর কতদিন আমাদের সঙ্গে শোবে? তুতুলের একটা আলাদা ঘর না হলে...বাথরুমের দরজাটা ভাঙা, বেচারা কাপড় ছাড়বারও জায়গা পায় না...

প্রসঙ্গটা তখন বাড়ি বদলের সমূহ প্রয়োজনীয়তার দিকে গড়িয়ে যায়।

সেই একবারই শুধু প্রতাপ তুতুল আর পিকলুর সম্পর্কে কিছু শুনেছিলেন। তখন তিনি জীবিকার তাড়নায় ব্যস্ত ছিলেন বড় বেশি, বাড়ি বদলাবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকে উপার্জন বাড়াবার চেষ্টা করতে হয়, তিনি ওদের দিকে লক্ষ্য করবার সময় পান নি। আজ তিনি তুতুলের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, ওদের ভালোবাসা কতটা গম্ভীর হয়েছিল? তুতুল কি এতদিন পরেও পিকলুর জন্যই মনমরা হয়ে থাকে?

প্রতাপের হাতের পট্টিটা খুলতে খুলতে তুতুল মৃদুস্বরে বললো, বেশি তো নয়!

প্রতাপ ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলেন কত, কত দেখলি প্রেসার?

তুতুল সিস্টোলিক, ডায়াস্টোলিক কী সব বললো, প্রতাপ অত সব বোঝেন না। তিনি বোঝেন নিচেরটা আর ওপরেরটা। পঁচানব্বই আর একশো সত্তর। একে তো মোটেই অ্যাবনমাল বলা যায় না। তাঁর সহকর্মী একজন হাকিম, মনোমোহন সেন একশো দশ আর দুশো দশ ব্লাড প্রেসার নিয়ে দিব্যি কাজকর্ম করছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একই বিয়ে বাড়িতে কব্জি ডুবিয়ে পাঁঠার মাংস খেলেন...

প্রতাপের ধারণা ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধিই একমাত্র ভয়ের বস্তু। তিনি উৎফুল্ল মুখে উঠে বসে বললেন, দেখলি, দেখলি, আমার কিছু হয় নি? তোর মামীমার যত বাড়াবাড়ি, আমি বেশ ভালো আছি।

তুতুল তার সরঞ্জাম গুছোতে গুছোতে বললো, ব্লাড সুগারটা একবার চেক করতে হবে...ফ্যামিলিতে কারুর ডায়াবিটিস ছিল?

-কী জানি! আমার বাবা-মা গ্রামে থাকতে তো কখনো ব্লাড টেস্ট করান নি। মার স্বাস্থ্য এখনো ভালো আছে। বাবা মারা গেছেন হার্ট অ্যাটাকে, যতদূর জানি ডায়াবিটিসের কোনো সিমটম ছিল না, আমারও নেই.তোর বাবার কিন্তু ছিল, আমার মনে আছে, অসিতদাকে ডাক্তার ইনসুলিন নিতে বলেছিল-হ্যারে মামণি, তুই এত রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন?

তুতুল নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো।

-তোর বাবার কাছ থেকে তুই আবার ওটা পাস নি তো? শিগগির একদিন চেক করা। তুই আমার ওপর ডাক্তারি করতে এসেছিস, আমার তো মনে হচ্ছে তোরই চিকিৎসা করানো, দরকার।

-আমি কাল-পরশু তোমার ব্লাড টেস্টের ব্যবস্থা করবো, মামা।

-তুই আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন রে? সব সময় গোমড়া মুখে থাকিস, এটাও শরীর খারাপের লক্ষণ। এই, তুই আমার দিকে ভালো করে তাকাচ্ছিস না কেন? কী হয়েছে তোর? আমাকে সব বল তো!

-আমার কিছু হয় নি।

তুতুল গিয়ে দরজা খুলতেই প্রতাপ চেঁচিয়ে বললেন, তোর মা আর মামীকে জানিয়ে দে যে আমার শরীরে রোগ টোগ কিছু নেই। আমি চমৎকার আছি!

প্রতাপ তখুনি বাইরে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। আবার বাড়ি বদল করতে হবে। আগেরবার পিকলু...। এ বাড়ি বদল না করে উপায় নেই। বাড়িওয়ালা ছিলেন একজন উকিল, বেশ সজ্জন, প্রতাপের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল, তিনি হঠাৎ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হবার পর তাঁর জামাই এ বাড়ি খালি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

তুতুলকে দিয়ে ব্লাড প্রেসার চেক করাবার ফলে বেশ উপকার হলো প্রতাপের, আবার মনের জোর ফিরে পেয়েছেন। মুখে যতই অস্বীকার করুন, সেদিন সায়েন্স কলেজের সামনের ফুটপাথের ঘটনার পর তাঁর মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতুনি ঢুকেছিল। রোদ্দুর লেগে মাথা ঘুরে যাবার ব্যাপার নয়, কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখের সামনে সব কিছু আবছা হয়ে এসেছিল, মনে হচ্ছিল, পায়ের তলায় মাটি নেই, তিনি অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন, যেন মৃত্যুর দেশ তাঁকে টেনে নিচ্ছে, তিনি বাবলুর হাত ধরে...। নাঃ, হয়তো শারীরিক কিছু নয়, ওটা মনের বিকার। প্রেসার যখন ঠিক আছে, তখন সব ঠিক আছে।

সে রাতে বাড়ি বদলাবার বিষয়ে কিছু ঠিকঠাক হলো না। ভাড়া অত্যন্ত বেশি।

এরপর কয়েকদিন প্রতাপ তুতুল সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বারবার তাকে ডেকে কথা বলাতে চান, তার কলেজের পড়াশুনো সম্পর্কে জানতে চান। তবু মেয়েটা কিছুতেই মুখ খোলে না। তাকে বকুনি দিলেও কাজ হয় না। প্রতাপ পরাস্ত হয়ে গেলেন।

মমতাকে তিনি একদিন বললেন, মেয়েটা দিন দিন কী রকম হয়ে যাচ্ছে, তোমরা একটু নজর দাও না কেন?

মমতা বললেন, আমি আর দিদি তো ওকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। কিছুই খেতে চায় না। ভাত খায় ঠিক এইটুকু, ওর থেকে মুন্নি অনেক বেশি খায়। কোনো মাছ-তরকারি ওর পছন্দ হয় না। আমার ওপরে ওর কিছু রাগ টাগ হয়েছে কিনা জানি না, আমার সঙ্গে তো পারতপক্ষে ও একটা কথাও বলতে চায় না।

–তুমি ওকে কোনোদিন বকেছো...পিকলুর নাম করে...বাবলুকে যেমন তুমি মাঝে মাঝে পাগলের মতন...

–না, ওকে আমি কোনোদিন কিছু বলিনি, বিশ্বাস করো। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

–এভাবে বেশিদিন চললে তো মেয়েটা মরে যাবে! এই বয়েসের মেয়ে, ভালো করে খাবে দাবে, সাজপোশাক করবে...ও কোনোদিন সিনেমা টিনেমাতেও যায় না?

–আমরা জোর করলেও যেতে চায় না। ও যেন ইচ্ছে করে এমন সাজ করে যাতে ওকে আরও খারাপ দেখায়! কানু বলছিল, ও কলেজে কোনো ছেলে মেয়ের সঙ্গেও মেশে না!

প্রতাপ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, কানু?

প্রতাপের আশঙ্কা মিথ্যে হয় নি, কানু একবার ছ'মাসের জন্য জেল খেটে এসেছে। এর মধ্যেই সে অবশ্য বিয়েও করেছে, বাচ্চা হয়েছে দুটি, তার অবস্থা সচ্ছল হচ্ছে দিন দিন, টালিগঞ্জে একটা ছোট বাড়ি কিনেছে, কিন্তু তার রোজগারের সঠিক পন্থাটা বোঝা যায় না। সে মুখে বলে অড়ার সাপ্লাই-এর ব্যবসা। প্রতাপ তাকে সহ্য করতে পারেন না, কানু তা জানে, তাই সে শুধু দুপুরের দিকে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসে।

প্রতাপ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কানু কী করে জানলো তুতুলের কলেজে কী হয় না হয়?

মমতা বললেন, কানুর এক শালা যে মেডিক্যোল কলেজে ওর সঙ্গেই পড়ে। সে নাকি বলেছে, তুতুলের একটাও বন্ধু নেই, প্রফেসাররা ছাড়া ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে কথাই বলে ...দু'একজন প্রফেসার ওকে বেশি ফেভার করে, চেম্বারে আলাদা করে ডেকে নিয়ে যায়, সেইজন্য ছেলেমেয়েরা তুতুলকে ক্ষ্যাপায়।

প্রতাপ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, কানুর শালাও সেই ক্ষ্যাপাবার দলে আছে নিশ্চয়ই। একদিন আমি মেডিক্যাল কলেজে খোঁজ নিতে যাবো, যদি দেখি কেউ অন্যায় ভাবে আমার ভাগ্নীর পিছনে ফেউ লেগেছে, তাহলে তাকে আমি চাবকে সোজা করবো!

মমতা হেসে স্বামীর বুকে হাত রেখে বললেন, তুমি এক কাজ করো। একটা চাবুক হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ো একদিন, তারপর যেখানে যত অন্যায়কারী দেখবে, সবাইকে চাবুক কষাবে এক ঘা করে!

এর কয়েকদিন পরে প্রতাপ ডাকবাক্স খুলে একটি অদ্ভুত খাম পেলেন। এয়ারমেলের লম্বাটে লেফাফা, তাতে কেউ হাতে ছবি এঁকেছে। বিভিন্ন সাইজের হৃৎপিণ্ডের ছবি, সেগুলি ক্রস করে কাটা। চিঠিটা তুতুলের নামে। ঠিকানার জায়গায় বাংলায় লেখা শ্রীমতী বহ্নিশিখা সরকার, তার নিচে, ব্র্যাকেট দিয়ে, বড় বড় লাল হরফে ইংরিজিতে লেখা Mrs. Grundy.

খামটি দেখে প্রতাপের বুক কেঁপে উঠলো একবার। ঐ মিসেস গ্রান্ডি লেখার মানে কী? তুতুল কুমারী মেয়ে, তার নামের নিচে মিসেস দিয়ে অন্য একটা পদবী...গ্রান্ডি নামের কোনো লোককে তুতুল গোপনে গোপনে বিয়ে করেছে? সে কথাটা বলতে পারে না বলেই সে এমন মনমরা হয়ে থাকে? মেডিক্যাল কলেজে ঐ নামের কোনো অধ্যাপক আছে? সাহেব অধ্যাপকরা তো সবাই বিদায় নিয়েছে, যদি কোনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান...বা পার্শী হতে পারে...

প্রতাপ মমতাকে এনে চিঠিটা দেখালেন। মমতাও বুঝতে পারলেন না কিছু। তুতুলকে এমনিতে কে চিঠি লিখবে? একসময় সে ফুলের মতন সুন্দর ছিল, পাড়ার ছোঁকরারা জ্বালাতন করতো...কিন্তু ইদানীং তো কেউ...।

প্রতাপের সবচেয়ে বেশি ভয় হলো সুপ্রীতির জন্য। চিঠিটার মধ্যে যদি সেরকম কিছু থাকে, যদি সুপ্রীতি জানতে পেরে যান, তাহলে তিনি সামলাবেন কী করে?

ভাগ্নীর নামে চিঠি যদিও খুলে পড়া উচিত নয়, তবু প্রতাপ কৌতূহল সামলাতে পারছেন না। যে-ই চিঠিটা লিখুক, মিসেস গ্রান্ডি লিখলো কেন, ওপরে আবার হৃৎপিণ্ডের ছবি, তাও কেটে দেওয়া...।

প্রতাপ মমতাকে জিজ্ঞেস করলেন, চিঠিটা খুলে দেখলে দোষ হবে?

মমতা একটা বাটিতে করে জল এনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর নিজেই আঙুলে জল লাগিয়ে বোলাতে লাগলেন আঠার জায়গায়। যাতে ছিঁড়ে না যায়, খুব সাবধানে আস্তে আস্তে খোলা হলো।

ভেতরের চিঠিটাও অদ্ভুত! একটা গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে বড় বড় অক্ষরে শুধু কতকগুলি প্রশ্নসূচক দুর্বোধ্যবাক্য লেখা। নিচে কোনো সই নেই। বাক্যগুলি এইরকম : মিসেস গ্রান্ডি, অ্যানাটমি ক্লাসের সব ছবিতে জামাকাপড় পরানো উচিত, তাই না?... মিসেস গ্রান্ডি, আমরা হাইড্রোশিলের চিকিৎসা শিখবো না, শিখবো না!...মিসেস গ্রান্ডি, গত শনিবার অনীতা সরকার আর সুশোভন ব্যানার্জি একসঙ্গে কোথায় গেল। কোথায় গেল?...মিসেস গ্র্যান্ডি, শর্মিলা বুক কাটা ব্লাউজ পরে আসে, তুমি তার পাশে বসো না, আমাদের বসতে দাও, বসতে দাও...

চিঠিটা পড়তে পড়তে প্রতাপের মুখ বিকৃতি ঘটতে লাগলো, মমতা হাসতে লাগলেন। এ কোনো বদমাইস সহপাঠীর কীর্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ চিঠি তুতলকে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, প্রতাপ রাগের চোটে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগলেন সেটাকে।

মমতা ছদ্ম কৌতুকের সঙ্গে বললেন, তুমি ছিঁড়ে ফেললে? হাতের লেখার প্রমাণ থাকতো যে লিখেছে পরে তাকে ধরা যেত!

প্রতাপ বললেন, হাকিমের বউ হয়ে তুমি দেখছি প্রমাণ-ট্রমাণের ব্যাপারটা খুব শিখে গেছো! এখন থেকে ডাকবাক্সতে তালা লাগাবে, রোজ আমি এসে খুলবো।

চিঠির ব্যাপারটা চুকে গেলেও মনের মধ্যে একটা সন্দেহের কাঁটা রয়ে গেল। মিসেস গ্রান্ডি কেন? ইংরিজিতে ঐ নামের কোনো রেফারেন্স আছে! প্রতাপের ইংরিজি সাহিত্য তেমন পড়া নেই।

বিমানবিহারীর বাড়িতে অনেক লেখা পড়া জানা মানুষ আসে। একদিন ইংরিজির অধ্যাপক পরেশ গুহর সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে প্রতাপ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা পরেশবাবু, মিসেস গ্রান্ডি কে আপনি জানেন!

পরেশ গুহ বললেন, মিসেস গ্রান্ডি? মিসেস গ্রান্ডি হচ্ছে আমার ন'পিসিমা। আমার নপিসিমা একদিন কী করেছেন জানেন? আমাদের পাড়ায় একটা বড় বকুল গাছ আছে। বিকেলবেলা কি সন্ধেবেলা ওখানে ছেলেরা আড্ডা মারে। আজকাল তো মেয়েরাও আড্ডা দিতে শিখেছে, দু'একটি মেয়েও সেখানে যায়। একদিন আমার পিসিমা কীর্তন শুনে ফিরছেন, তখন সেই গাছতলায় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, চুমুটুমু খায়নি, বুঝলেন, পাড়ারই তো ছেলেমেয়ে, এমনি দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, অমনি ন'পিসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, এই, তোরা এখানে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছিস কেন রে? তোদের লজ্জা সরম নেই! এত বড় একটা ধিঙ্গি মেয়ে-এরকম করলে তোর কোনো দিন বিয়ে হবে? তা শুনে ছেলে-মেয়ে দুটো দৌড়ে পালালো। আমার ন' পিসিমার জন্য পাড়ার কোনো মেয়ে জানলায় দাঁড়াতে পারবে না, কোনো ছেলে রাস্তায় গান গাইতে গাইতে যেতে পারবে না, আমার স্ত্রী তার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে সিনেমায় যেতে চেয়েছিল, তাই শুনে ন'পিসিমা নাক দিয়ে ঘোঁৎ শব্দ করে বললো, হুঁঃ, দিনে। দিনে কত কী দেখবো! একেবারে পারফেক্ট মিসেস গ্রাণ্ডি!

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, ঐ মিসেস গ্রান্ডি নামটা এলো কোথা থেকে?

-হঠাৎ মিসেস গ্রান্ডিকে নিয়ে আপনার এত কৌতূহল কেন, প্রতাপবাবু?

-এমনিই...মানে, একটা জায়গায় হঠাৎ এ, নামটা পেলাম।

–একটা পুরোনো ইংরিজি নাটক আছে, বুঝলেন, মর্টনের লেখা, স্পীড দা প্লাও, তাতে ঐ মিসেস গ্রান্ডি বলে একটা চরিত্র আছে। প্রচণ্ড নীতিবাগিশ আর শুচিবায়ুগ্রস্ত...তার থেকে এসেছে, ঐ রকম কোনো মহিলাকেই মিসেস গ্রান্ডি বলে...ভিকটোরিয়ান মরালিটি কোন পর্যন্ত পৌঁছেছিল জানেন তো, প্রায় সব কিছুই অশ্লীল, একটা আন্দোলন উঠেছিল যে অপারেশানের সময়, কিংবা বাচ্চার জন্ম দেবার সময়েও মেয়েদের জামাকাপড় খোলা চলবে না। পুরুষ ডাক্তাররা দেখে ফেলবে, এই চিন্তাটাও অন্যদের কাছে অশ্লীল...তখন কত শব্দ নিয়েও শুচিবাই ছিল, মোরগের ইংরিজি কক্ বলা চলতো না, কারণ ঐ শব্দটার অন্য খারাপ মানে আছে, কেউ কেউ বলতো রুস্টার! ষাড় মানে বুল শব্দটারও দোষ ছিল, তাই বলতে হতো জেন্টলম্যান কাউ!

--ঠিক আছে, বুঝেছি।

–আরও শুনুন না! শ্লীলতার বাতিক, মানে প্রডারি এতদূর পৌঁছে ছিল যে অনেক মহিলা দাবি করেছিল চেয়ার টেবিলের পায়াতেও পোশাক পরাতে হবে। কারণ চেয়ার টেবিলের পায়াও তো লেগ, আর পোশাক ছাড়া লেগ দেখতে হবে ভাবলেই মিসেস গ্রান্ডিদের কান লাল হয়ে যায়...হাঃ হাঃ হাঃ।

কিন্তু প্রতাপের এইসব রসিকতা শোনার দিকে মন নেই। তুতুলের কথা ভেবে তাঁর মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। অমন সুন্দর মেয়ে ছিল তুতুল, তার এই পরিণতি। এরকম কী করে হলো! তাঁদের বাড়িতে কেউ এরকম নয়। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তো তাহলে পিছনে লাগবেই। শুচিবায়ুগ্রস্তরা দিন দিন রোগা হয়ে যায়, এটা এক ধরনের পাগলামি। এই ভাবে চলতে থাকলে ও কি মেডিক্যাল কোর্স শেষ করতে পারবে, কিংবা কোর্স শেষ করলেই বা কী লাভ হবে?

প্রতাপ উঠে পড়লেন সেই আড্ডা থেকে। তুতুলকে এই অবস্থা থেকে ফেরাতেই হবে, যদিও কী করে ফেরাবেন তা প্রতাপ জানেন না। নিজের জন্য নয়, তুতুলের জন্যই তাঁর এবার কোনো বড় ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেওয়া দরকার।

১৭ টেবিলের ওপর জোর একটা চাপড় মেরে

টেবিলের ওপর জোর একটা চাপড় মেরে হোসেন সাহেব দাঁত কড়মড়িয়ে বললেন, ইন্ডিয়া! তোমাগো সব কথায় ইন্ডিয়া আসে ক্যান? ইন্ডিয়ার থিকা আমরা সেপারেট হইছি কি সব সময় ইন্ডিয়ার নাম জপ করার জইন্য?

আলতাফ বললো, চাচা, মাথা গরম করছেন কেন? এমনিই একটা তুলনা দিতেছিলাম।

হোসেন সাহেবের ফর্সা মুখটা লালচে হয়ে গেছে, চক্ষু দুটি বিস্ফারিত, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, যখন তখন ইন্ডিয়ার নাম শুনলে সত্যি আমার ম্যাজাজ গরম হইয়া যায়। আমি ব্লাড প্রেসারের রুগী, সে কথাটা মনে রাইখখো!

আলতাফ প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললো, চাচা, দুই প্লেট ফিস ফিংগারের অর্ডার দ্যান। হোসেনসাহেব আঙুল তুলে বললেন, বেলটা বাজাও!

একজন বেয়ারা যেন দরজার পাশেই অপেক্ষা করছিল, বেল বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে সে দরজা খুলে উঁকি মারলো।

হোসেন সাহেব ঘরে উপস্থিত সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, দুই প্লেট ফিস ফিংগার আর দুই প্লেট চিলি চিকেন আনো। জলদি করবা!

শাখাওয়াত হোসেনের নতুন সাততলা হোটেলের সপ্তম তলার এই ঘরটিতে খাট বিছানা নেই, রয়েছে একটি গোলাকার টেবিল, অনেকগুলি চেয়ার, দুটি আলমারি, এটা তাঁর অফিস ঘর। একদিকের দেয়ালের গায়ে একটি বন্ধ দরজা, তার ওপাশে আর একটি ছোট

ঘর আছে। খাট-বিছানায় সুন্দর করে সাজানো, সেটি তাঁর বিশ্রাম কক্ষ, কখনো কখনো তিনি রাত্রে সেখানে থেকেও যান।

হোটেল ব্যবসায় শাখাওয়াত হোসেনের কপাল এমনই খুলে গেছে যে তিনি নিজেই যেন সব সময় বিশ্বাস করতে পারেন না। এই সব ব্যবসায় নিয়মই হলো, একবার ছড়াতে শুরু করলে থামানো যায় না। টাকাকে তুমি দ্বিগুণ-চতুগুণ করার চেষ্টা না করলেই সে অর্ধেক সিকি হয়ে যাবে। হোসেন সাহেব এখন ঢাকায় দুটি এবং চিটাগাং ও করাচিতে একটি করে হোটেলের মালিক। একটি ফরেন চেইনের সঙ্গে কোলাবরেশানে তিনি শিগগিরই ঢাকা ও রাওয়ালপিন্ডিতে আরও দুটি ফোর স্টার খুলতে যাচ্ছেন।

হোটেলের ব্যবসা নিজে না দেখতে পারলে চুরিতে ফাঁক হয়ে যায়। কিন্তু তিনি নিজে কতদিক সামলাবেন? তাঁর পাঁচ কন্যা ও দুটি পুত্র, এর মধ্যে বড় ছেলেটি বরাবরই পিতৃ-বিরোধী, সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে আলাদা ব্যবসা শুরু করেছিল, দু বছর আগে হঠাৎ সে মারা গেছে। ছোট ছেলেটি এখনও স্কুলের ছাত্র। নাদেরা ও মনিরা নামে তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু দুটি জামাই-ই কাজের ব্যাপারে অপদার্থ কিন্তু পয়সা খরচে ওস্তাদ। এইসব কারণে হোসেন সাহেব বড় অসুখী ছিলেন।

তাঁর আর একটা অতৃপ্তির কারণ, তিনি ধনপতি হয়েছেন বটে, তবু সমাজে সেরকম স্বীকৃতি পাননি। লোকে আড়ালে তাঁকে হোটেলওয়ালা হোসেন বলে। অনেককাল আগে আমিনবাজারে প্রথম একটা ভাতের হোটেল খোলার পর সেই যে তাঁর এই নাম হয়েছিল, এখনও সেটা রয়ে গেছে। তিনি লেখাপড়া বিশেষ করেননি, জীবনে কখনো রাজনৈতিক কোনো দলে ঢোকেননি, এমন কিছু কাজ কখনো করেননি, যাতে খবরের কাগজে নাম বেরুতে পারে। ব্যবসায়ী মহল ছাড়া তাঁকে কেউ চেনে না। বছরখানেক আগে, বায়তুল মোকাররমের কাছে তাঁর গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, একটা দোকানে ঢুকে তিনি তাঁর হোটেলে টেলিফোন করলেন আর একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, সেই দোকানের মালিক তাঁকে চিনতে পারলো না। দ্বিতীয় গাড়িটা আসতে দেরি হচ্ছিল, তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন, রাস্তা দিয়ে দলে দলে লোক যাচ্ছে, ছেলে-ছোঁকরারা হই-

হট্টগোল করছে, কেউ ভূক্ষেপও করছে না তাঁর দিকে। এতে তাঁর মনে খুব লেগেছিল। তিনি যে-কোনো জায়গায় দাঁড়াতেই লোকে আঙুল তুলে ঐ যে শাখাওয়াত হোসেন, ঐ যে শাখাওয়াত হোসেন বলবে, হলে আর কোটি কোটি টাকার কারবার করে লাভ কী হলো?

কিন্তু শাখাওয়াত হোসেন শুধু হোটেলের ব্যবসাটাই বোঝেন, কী করে যে লোকের দৃষ্টি বা আঙুল নিজের দিকে ফেরাতে হয় তা তিনি জানেন না!

কয়েকমাস আগে বিদেশী পার্টনারদের আমন্ত্রণে শাখাওয়াত হোসেন ইওরোপের বিভিন্ন হোটেল ঘুরে দেখতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁর ছোট জামাই আবু সালেক-কে। সে ছোঁকরা অস্থিরমতি হলেও ইংরিজিটা ভালো জানে। ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম জার্মানির বন শহরে এসে দেখা পেলেন তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র আলতাফের। সেই সময়েই আবু সালেক কয়েক দিনের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিল।

আটান্ন সালের আগে এই আলতাফ যখন সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল তখন একে দু' চক্ষে দেখতে পারতেন না হোসেন সাহেব। পরে অবশ্য তিনি শুনেছিলেন যে সব ছেড়েছুঁড়ে আলতাফ জামানিতে গিয়ে ভালোই কাজকর্ম করছে, ছোটখাটো ব্যবসাও করছে, তবু তিনি আলতাফের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেননি। গত বছর আলতাফ যখন ঢাকায় এসেছিল, তখন একদিন মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে, একটি বিয়ে বাড়িতে।

বন্-এ এসে তিনি দেখলেন, আলতাফ বিষম বিমর্ষ হয়ে আছে, তার হিন্দু স্ত্রীর সঙ্গে তার সদ্য ডিভোর্স হয়েছে। সে মেয়েটি দুটি সন্তানকে নিয়ে চলে গিয়ে মিউনিখে একজন জামানকে বিয়ে করে ফেলেছে এর মধ্যেই। কেউ কেউ বলে, আলতাফই তার স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে ইদানীং, আবার কেউ কেউ বলে তার স্ত্রীই গোপনে গোপনে অন্য একজনের সঙ্গে পীরিত করে স্বামীকে ছেড়ে চলে গেছে। সে যাই-ই হোক, যাবার সময় সে জেদ করে তার সন্তান দুটিকে নিয়ে গেছে বলেই আলতাফ একেবারে ভেঙে পড়েছিল।

আলতাফের সেই অবস্থা দেখেই হোসেন সাহেব গোপনে গোপনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন এবং তাকে আবার পছন্দ করতে শুরু করলেন। তাঁর ধারণা, ঐ হিন্দু-প্রভাবেই আলতাফ এক সময় কমুনিস্ট হয়েছিল। তার শ্বশুর ঐ টাঙ্গাইলের উকিলটার প্রশংসায় আলতাফ এক সময় এমন পঞ্চমুখ থাকতো যে তাতেই বোঝা গিয়েছিল, আলতাফ হিন্দুদের কথায় নাচে। হিন্দুরা কেউ পাকিস্তান চায়নি, পাকিস্তান সৃষ্টিতে তারা খুশী হয়নি, তারা তো এখন কমুনিজ চাইবেই। যাতে পাকিস্তান আবার ভেঙে যায়, ইসলাম মুছে যায়, তখন হিন্দুদের আবার কর্তৃত্ব ফলাবার সুযোগ আসবে।

ব্যক্তিগত গোপন দুঃখের কারণে, হিন্দুদের ওপর শাখাওয়াত হোসেন সাহেবের জাতক্রোধ আছে। কমলা, আজও কমলার কথা মনে পড়ে! সে অনেককাল আগেকার কথা, তখন পাকিস্তান নামটা ইকবালের কল্পনাতেও ছিল না, ইংরেজ চলে যাবে এমন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, সেই সময় তিনি নরসিংদির মেয়ে কমলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কমলাদের বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না, এমনকি ওদের পরিবারে সেরকম বিদ্বানও কেউ ছিল না, কমলার বাবা ছিল নরসিংদি বাজারে সামান্য একটা মুদিখানার মালিক, ব্রাহ্মণও নয়; কায়স্থ, সেই লোকটাই শাখাওয়াত হোসেনের প্রস্তাব শুনে জুতো খুলে মারতে এসেছিল। একগাদা লোকের সামনে। সেই ভিড়ের মধ্যে কে যেন একজন বলেছিল, ঐ নেড়ে ব্যাটার মাথা ন্যাড়া করে তার ওপর গরম কল্কির একটা দাগ দিয়ে দে!

সব মনে আছে, শাখাওয়াত হোসেনের সেদিনের সব ঘটনা স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করে।

তারপর, অনেকগুলি বছর গেছে, জীবন তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছে, হোসেন সাহেব অন্তত সাতটি হিন্দু মেয়েকে নিজের শয্যায় নিয়ে শুয়েছেন, তবু তৃপ্তি হয়নি, কমলার কথা ভুলতে পারেননি। কমলার বিয়ে হয়েছিল বরিশালের এক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে, পঞ্চাশের রায়টে সে বিধবা হয়, তারপর সে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে! হোসেন সাহেবের এখনও মাঝে মাঝে মনে হয়, কমলার বাবা সেই নারায়ণ ঘোষবাবুটাকে হাতের কাছে

পেলে তিনি প্রথমে। জোর করে তার মুখে গোমাংস ভরে দিয়ে তারপর তার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নুন ছিটিয়ে দিতেন! কিন্তু সে ব্যাটা ফরটি সেভেনেই পালিয়েছে।

সেই নারায়ণ ঘোষের ওপর রাগেই হোসেন সাহেব যখন যেখানেই কোনো হিন্দু সম্পত্তি পান, অমনি তা গ্রাস করতে উদ্যত হন। তাঁর এই নতুন হোটেলটিও একটি প্রাক্তন হিন্দু জমিদারের বাড়ি ভেঙে তৈরি হয়েছে।

যাই হোক, বিদেশে আলতাফের এ অবস্থা দেখে হোসেন সাহেবের মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে গিয়েছিল। এখন তো এই ছেলেটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। আলতাফ লেখাপড়া জানে, চালাক-চতুর, বিদেশে সাহেব-মেমদের সঙ্গে মেলামেশার সহবৎ শিখেছে, তাকে তাঁর হোটেল-গ্রুপের জেনারাল ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করলে কাজের কাজ হবে। রক্তের সম্পর্ক তো আছে।

আলতাফ প্রথমে রাজি হয়নি, পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্কই রাখবে না ঠিক করেছিল। মাত্র বছরখানেক আগেই সে সপরিবারে ঢাকা ঘুরে গেছে, সকলের কাছে সে সুখী ও সার্থক মানুষ হিসেবে অহংকার করেছে। এবার ফিরে গেলে লোকে বলবে, সে তার ছেলে-মেয়ে দুটিকেও ধরে রাখতে পারলো না?

নিজের সব দুঃখ সে মদে ডোবাতে চেয়েছিল, সেই সময় শাখাওয়াত হোসেন স্নেহশীল চাচার ভূমিকা নিয়ে তাকে ফেরাতে চেষ্টা করলেন। বন- এ তিনি থেকে গেলেন অতিরিক্ত দশ দিন। আলতাফ সেবারেই তাঁর সঙ্গে ফিরে এলো না বটে, কিন্তু তিনি লেগে রইলেন, দু'বার তার কাছে লোক পাঠালেন।

মাস চারেক আগে জার্মানির পাট একেবারে গুটিয়ে চলে এসেছে আলতাফ। মদের নেশা কমিয়েছে অনেকটা, এখন সে সুস্থ মানুষ, হোটেলের পরিচালনা ভার নিয়েই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

হোসেন সাহেব লোক-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করেন তীক্ষ্ণভাবে। যে-কোনো মানুষের গুপ্ত দোষ-গুণ বুঝে নিতে তাঁর বেশি সময় লাগে না, তাঁর জীবনের উন্নতির মূলে আছে এই ক্ষমতাটি। তিনি লক্ষ করলেন যে আলতাফ বিলাসী প্রকৃতির মানুষ, লোকজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে অপব্যয় করতে ভালোবাসে, কিন্তু সে কাজে ফাঁকি দেয় না, কাজের প্রতি নিষ্ঠা আছে, মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই। হোসেন সাহেব তাকে টাকা খরচের ঢালাও অধিকার দিয়েছেন, নিজের জন্য কত খরচ করবে করুক, দু'লাখ, পাঁচ লাখ?

আলতাফও তার চাচার বর্তমান মনোবাঞ্ছটি টের পেয়েছে। চাচা টাকা করেছেন অনেক, এখন নাম করতে চান। কিছুদিন ভেবে চিন্তে সে একটা প্রস্তাব দিল। একটা কাগজ বার করা। যাক, একটা দৈনিক পত্রিকা, নাম করার সেটাই দ্রুততম উপায়। নিজের কাগজে প্রায়ই নিজের নাম ছাপা হবে, ছবি ছাপা হবে, নিজের অনেক মতামত দেশবাসীকে জানানো যাবে।

প্রস্তাবটা লুফে নিলেন হোসেন সাহেব। এইজন্যই লেখাপড়া জানা ছেলেদের দরকার, এই রকম একটা চিন্তা তো তাঁর মাথাতেই আসতো না। তিনি বড়জোর ভেবেছিলেন, নিজের গ্রামে একটা বড় সড় মসজিদ বানিয়ে দেবেন, কিন্তু তাতে তো মাত্র দু পাঁচখানা গ্রামের লোক তাঁর নাম জানবে, কিন্তু খবরের কাগজে যে নাম ছড়াবে সারাদেশে।

এখন প্রত্যেকদিন সেই পত্রিকা বিষয়ে আলোচনা চলছে। হোসেন সাহেব আগে আয় ব্যয়ের হিসেব কষে দেখেছেন। প্রথম ছ' মাস তাঁকে টাকা ঢালতে হবে, সেই টাকা আসবে ব্যাঙ্ক থেকে। ব্যাঙ্কে তাঁর গুডউইল যথেষ্ট। পত্রিকার মূল আয় বিজ্ঞাপনে, সেদিকে অসুবিধে হবে না, ব্যবসায়ী মহলে তাঁর দহরম-মহরম আছে, শুধু এখানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও। ভালো ভালো সাংবাদিকদের ভাঙিয়ে আনতে হবে অন্য কাগজ থেকে। মেসিনপত্র আনাবেন জার্মানি থেকে, সে ব্যবস্থা আলতাফই করতে পারবে।

কাগজ শুরু হলে লোকবল দরকার। বছর পাঁচেক বিদেশে থাকায় আলতাফ তার বন্ধুবান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন, পুরোনো রাজনৈতিক সহকর্মীরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে।

সেইজন্য আলতাফ ধরলো তার ছোট ভাই বাবুলকে। মফঃস্বল ছেড়ে বাবুল এখন ঢাকাতেই অধ্যাপনা করে, তার বন্ধুবান্ধবের একটি গোষ্ঠী আছে। বাবুল প্রথমে আসতে রাজি হয়নি, তার এই বড়লোক চাচার সঙ্গে সে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না, রাখতে চায় না। সে লেখক নয়, সাংবাদিকতায় তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, এই সব বলে সে আলতাফের প্রস্তাব উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আলতাফ প্রায় জোর করেই বাবুলদের আড্ডায় হাজির হলো দু একদিন। সেই দলে রয়েছে কয়েকজন কবি-লেখক, কয়েকজন প্রাক্তন সাংবাদিক, বইয়ের ব্যবসায়ী। আলতাফ নিজে তাদের আমন্ত্রণ জানাতে তারা কিন্তু উৎসাহ দেখালো প্রায় সবাই। একটা নতুন কাগজ, একটা নিজস্ব কাগজ, এর টান সাংঘাতিক।

এখন প্রতিদিন সন্ধেবেলা হোসেন সাহেবের নতুন হোটেলের সাততলার ঘরে আলোচনা সভা বসে। পল্টন, কামাল, জহির, বসির এই সব বন্ধুদের টানে বাবুলকেও আসতে হয়েছে। সম্পাদক হিসেবে হোসেন সাহেবেরই নাম থাকবে। ইত্তেফাক কাগজের এক প্রবীণ সাংবাদিকের সঙ্গে মানিক মিঞার মনোমালিন্য চলছে এই খবর পেয়ে তাঁকে এই কাগজে যোগ দেবার জন্য টোপ দেওয়া হয়েছে। নিত্য নতুন আরও খবর আসে।

সন্ধের এই আলোচনা সভায় হোসেন সাহেবই মধ্যমণি। খাবার-দাবার, সরবৎ, চাকফি-ঠাণ্ডা পানি পরিবেশিত হয় ঢালাওভাবে, কিন্তু মদ নেই। হোসেন সাহেব মদ্যপানের ঘোর বিরোধী। নিষ্ঠাবান মুসলমান, এখানে বসে আলোচনা করতে করতেও তিনি মাগরেবের আজান শুনে পাশের ঘরে গিয়ে নামাজ পড়ে আসেন। বাবুলের মদ্যপ বন্ধুদের এই ব্যবস্থায় একটুও আপত্তি নেই, এখানে আলাপ-আলোচনা করতে করতে খাওয়া-দাওয়াটা বেশ ভালোই হয়। এর পর একটু অধিক রাত্রে আলতাফের নিজস্ব চেম্বারে আর একবার বৈঠক হয়, সেখানে আলতাফ উদারভাবে স্কচের বোতল খোলে।

পত্রিকার নীতি নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনায় মতামত দিতে দিতে হোসেন সাহেব কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। রীতিমতন পাকাঁপোক্ত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতন তিনি মাঝে মাঝে এক একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দেন। তিনি বেশি দূর

লেখাপড়া শিখতে পারেননি, ইংরিজি কাগজ পড়েন না, তবু এই সব ইংরিজি লেখাপড়া জানা অধ্যাপক-লেখকরা যে তাঁর যুক্তির মূল্য দেয়, এতেই তিনি গভীর আনন্দ পান।

চাচার কথাবার্তা শুনে আলতাফ মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। সে আগে জানত, তার চাচা একজন কট্টর মুসলিম লীগপন্থী, হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দিদের দু চক্ষে দেখতে পারতেন না। আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার দুর্নীতি ও অপদার্থতার জন্যই যে সরকারের পতন হলো এবং আইয়ুব সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা হাতে নিয়ে পাকিস্তান রক্ষা করেছে, এই প্রচারের প্রবল সমর্থক। কিন্তু এখন হোসেন সাহেব সুর পাল্টে ফেলেছেন। তিনি চান তাঁর পত্রিকায় প্রথম থেকেই দাবি তুলতে হবে যে দেশে অবিলম্বে নির্বাচন চাই। গরম গরম লেখা দিয়ে ছাত্রদের ক্ষ্যাপাতে হবে, নইলে কাগজ চলবে না।

সেদিন কথায় কথায় তিনি বললেন, আমি আইয়ুব খাঁর ওপর কবে থেকে চটেছি জানো? আগের সংবিধান বাতিল করে দিয়ে যেদিন তিনি তাঁর পেটোয়া লোকদের দিয়ে নতুন সংবিধান কমিশান বসালেন। সেই কমিশান রায় দিল কী? না, পাকিস্তানের নাগরিকেরা গণতন্ত্রের যোগ্য নয়। সর্বসাধারণের ভোটের অধিকার নাই। এইটা কি একটা বিবেচনা মতন রায় হইলো? পাশের দ্যাশ ইন্ডিয়া, সেখানে সকলে ভোট দিতে পারে, আর পাকিস্তানীরা ভোটের অযোগ্য?, ইন্ডিয়ানরা যা পারে, আমরা তা পারি না? অরা আর আমরা কি আলাদা? এই সেদিনও পর্যন্ত একই দেশ আছিল, একই মানুষ, সব দিক থিকা এক, আর এখন ইন্ডিয়ানরা আমাগো চাইতে বেশি যোগ্য হইলো কিসে?

বসির হাসতে হাসতে বললো, চাচা, এখন কিন্তু আপনিই বারবার ইন্ডিয়ার নাম উচ্চারণ করছেন।

বেশি উত্তেজিত হলে হোসেন সাহেব হাঁপিয়ে পড়েন। তিনি একটু দম নিয়ে বললেন, তোমরাই আমারে বুঝাও, কেউ সেধে সেধে নিজের মুখে চুনকালি দ্যায়? আইয়ুব খান হোল ওয়ার্লর্ডরে জানাইলো যে ইন্ডিয়ার লোকেরা ভোট দিয়া ডেমোক্রেসি রাখতে পারে,

আর পাকিস্তানী নাগরিকরা ভোটের মর্ম বোঝে না। তারা বর্বর, অশিক্ষিত! এই কথাটা ভাবলেই আমার পিত্তি জ্বইলা যায়।

বসির বললো, কেন চাচা, আইয়ুব খান তো তাঁর কোটের আস্তিন থেকে এক নতুন চিড়িয়া বার করেছেন। অন্যরকম এক ডেমোক্রেসি, সারা দেশে মাত্র আশী হাজার লোক ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে!

হোসেন সাহেব হুংকার দিয়ে বললেন, ঐটারই আমরা অপোজ করবো। বেসিক ডেমোক্রাসি না কচু পোড়া! ভোট হবে, দ্যাশের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ-মেয়েলোক ভোট দেবে! সোজা কথা, আমরা ইন্ডিয়ার সমান!

বসির আবার বললো, ইন্ডিয়া এমন কিছু অ্যাচিভ করে নাই যে তার সমান হবার জন্য আমাদের ব্যস্ত হতে হবে। পাকিস্তানকে হতে হবে ওয়ার্লড-এর যে-কোনো পাওয়ারের সমান। তার জন্য আগে ওয়েস্ট পাকিস্তান আর ইস্ট পাকিস্তানের মধ্যে প্যারিটি আনতে হবে। ফেডারাল স্ট্রাকচারের প্রশ্নে আমরা কী স্ট্যান্ড নেবো, সেটা আগে ঠিক করেন।

জহির বললো, আমি আজ উঠি। বাসায় ফিরতে হবে, দিনকাল ভালো না, শুনছি নাকি আবার দাঙ্গা হতে পারে।

কামাল আর পল্টন সচকিত হয়ে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো, আবার দাঙ্গা? কে বললো তোমারে?

জহির বললো, শুনতে পাচ্ছি নানান জায়গা থেকে। বড় বিশ্রী লাগে। যা সব ঘটনা শুনি, তাতে মুখে ভাত রোচে না। মনে হয়, কোন্ যুগে বাস করছি।

পল্টন বললো, এই জানুয়ারি মাসেই তো একটা বীভৎস দাঙ্গা হয়ে গেল।

হোসেন সাহেব বললেন, ঐ সব কথা বাদ দাও। ইন্ডিয়ায় অনেক বেশি দাঙ্গা হয়। অনেক বেশি মুসলমান মরে।

জহির একটু গলা চড়িয়ে বললো, দাঙ্গা ইন্ডিয়ায় হউক আর পাকিস্তানেই হউক, এই একটা বিষয়ে পরস্পরের তুলনা চলে না। একপক্ষকে তো আগে বন্ধ করতেই হবে, নইলে অন্য পক্ষে বন্ধ হবে না। আমাদের এদিক থেকে যে বেশি লোক ভয়ের চোটে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সেকথা অস্বীকার করতে পারবেন? আমি ইন্ডিয়ার একটা কাগজে পড়লাম যে এই বছর সাড়ে চার মাসে সাড়ে তিন লক্ষ উদ্বাস্তু গেছে পাকিস্তান থেকে। শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলেই ডেইলি পাঁচ থেকে সাত হাজার উদ্বাস্তু ঢুকতেছে। আর ইন্ডিয়ায়: স্বাধীনতার পর মুসলমানের সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ।

হোসেন সাহেব ভুরু তুলে বললেন, তুমি ইন্ডিয়ার কাগজ পড়ে বিশ্বাস করেছো? ওরা কক্ষনো সত্য কথা লেখে না। পাকিস্তান সম্পর্কে সব মিথ্যা লেখে। ইন্ডিয়ায় মুসলমানের কী অবস্থা তা তোমরা জানো না। দ্যাখো না, কাশ্মীরের শ্যাখ আবদুল্লারে পণ্ডিত জওহরলাল ক্যামন পুতুলের মতন নাচাইত্যাছে।

জহির বললো, ইন্ডিয়ার কাগজে মিথ্যা লেখে মানলাম। আমাদের যে কাগজ বাইরাবে তাতে সব সত্য কথা লেখা হবে তো? জানুয়ারিতে যে দাঙ্গা হইল, তার আসল কারণ এখানকার কোনো কোনো কাগজে বেরোয়নি। আমি আপনার কাগজে লিখবো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। ঢাকা শহরেই যে বাস্তুহারা হিন্দুদের জন্য পঁচিশটা শিবির হয়েছিল, সে ছবি বেরিয়েছিল কোনো কাগজে?

পল্টন বললো, ঐ দাঙ্গাটা বাধিয়েছিল আদমজী জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার করীম। ও রটিয়ে দিয়েছিল যে কলকাতায় ওর ভাই খুন হয়েছে, সেই শোকে মিল দু'দিন ছুটি।

হোসেন সাহেব বললেন, তোমরা এই সব বাজে গুজবে বিশ্বাস করো?

পল্টন বললো, গুজব হোক আর যাই-ই হোক, গুজবেরই কি কম শক্তি? সেই রটনা শুনেই তো আদমজী জুট মিলের হাজার হাজার অবাঙালী শ্রমিক আল্লার নামে জেহাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আমি তখন মাধবদি বাজারে ছিলাম। গোলকানদয়াল গ্রামে

হিন্দুদের পৌষ সংক্রান্তির মেলা চলছিল, শ্রমিকরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথারি খুন করতে লাগলো, বাচ্চা, মেয়েছেলে কারুরে বাদ দেয় নাই। একে দাঙ্গা বলে না, হিটলারের নাৎসীবাহিনীর সঙ্গে এর তুলনা দেওয়া চলে!

জহির বললো, সেই সময়েই তো ঢাকেশ্বরী কটন মিল, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল আক্রমণ করা হলো। হিন্দুদের একেবারে জানে-মালে শেষ করে দিয়ে, এ দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলে কি আমাদের খুব লাভ হবে?

হোসেন সাহেব বললেন, তোমাদের দেখি হিন্দুদের জইন্য খুব দরদ? এটা তো আগে জানতাম না?

পল্টন বললো, হোসেন চাচা, এখানকার হিন্দুদের ঘৃণা করে আপনি যদি বিহার-উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের প্রতি দরদ দেখান, তা হলে ওদিককার মুসলমানদেরই বেশি ক্ষতি করবেন।

হোসেন সাহেব বললেন, কইলকাতাতেও বড় রকমের দাঙ্গা হয়েছে। ইন্ডিয়ায় অনেক জায়গায় রায়ট হয়। গান্ধীরে যারা খতম করছে, সেই হিন্দুগুলা এখন আরও স্ট্রং, ব্রাহ্মণের বাইচ্চা জওহরলালের সাইধ্য নাই তাগো কন্ট্রোল করে। অরা মুসলমান মারলে আমরা হিন্দু মারুম না? জাতভাইয়ের গায়ে যেখানেই হাত পড়ুক, কোনো সাচ্চা মুসলমান তা সহ্য করবে না! ভাবলেই আমার রক্ত গরম হইয়া ওঠে!

কামাল বললো, ওদেশে যারা মরে তারা যেমন নিরীহ মুসলমান, তেমন এদেশে যারা মরে তারাও নিরীহ হিন্দু। দাঙ্গার সময় অসহায়, নিরীহ আর গরিবরাই মরে। চোখের সামনে নিরীহ মানুষকে মরতে দেখেও যে লোক আনন্দে লাফায়, সে কোনো ধর্মেই সাচ্চা মানুষ হইতে পারে না।

জহির বললো, জগন্নাথ কলেজে প্রায় দশ হাজার হিন্দুকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, আমি নিজে দেখতে গিয়েছিলাম...অধ্যক্ষ সৈদুর রহমান যেভাবে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা

করেছিলেন...তিনি না থাকলে আরও অনেকে মারা পড়তো...তিনি আপনার চেয়ে কম খাঁটি মুসলমান নন।

পল্টন বললো, আমার যা লজ্জা লেগেছিল-জগন্নাথ কলেজের সেই ক্যাম্পে গিয়ে শুনি সেখানে রয়েছেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, এককালের কতবড় নাম করা বিপ্লবী, লোকে তাঁকে মহারাজ বলে, তিনিও শেষে...

হোসেন সাহেব হাত তুলে বললেন, বাদ দাও, ঐ সব কথা বাদ দাও!

এতক্ষণ বাদে আলতাফ বললো, আমি আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমানেকে পছন্দ করতাম না, সে গুণ্ডা লেলিয়ে একবার আমার মাথা ফাটিয়েছিল...এবারের দাঙ্গা কিন্তু সেই লোকই প্র্যাকটিক্যালি থামিয়ে দিল। পুলিস গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিচ্ছিল, সরকার থেকে হিন্দুদের। কোনো প্রোটেকশানই দেয়নি, তখন শেখ মুজিবর রহমান আর বোধ হয় শাহ আজিজুর রহমান মিলে একদিন চীফ সেক্রেটারি আলি আসগরকে শাসিয়ে এলো, গুণ্ডামি বন্ধ না করলে তাঁরা মীরপুরের বিহারী কলোনি উড়িয়ে দেবেন। তারপরেই তো সরকারের টনক নড়লো।

জহির বা পল্টন কেউই আওয়ামী লীগের সমর্থক নয়, তবে এখন তারা আলতাফের কথার প্রতিবাদ করলো না।

হোসেন সাহেব বললেন, তাহলে আজ এ পর্যন্তই রইলো। কাল সন্ধ্যাবেলা আবার সকলে চলে এসো। কাল আমরা কাগজ বার করার একটা টারগেট ডেট ঠিক করে ফ্যালবো।

সবাই উঠে দাঁড়ালো। বাবুল একটাও কথা বলেনি, প্রায় প্রতিদিনই সে নীরব শ্রোতা। জহিরের সঙ্গে সে একসঙ্গে বাড়ি ফেরে। তার মতন জহিরও এর পরে আলতাফের মদের আসরে যোগ দেয় না।

বাবুলের কাঁধে হাত রেখে জহির ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, তা হলে ঐ কথাই ঠিক রইলো, হোসেন চাচা। আমাদের কাগজে আমরা সব সত্যি কথা লিখবো। সত্যের মতন বড় অস্ত্র আর নাই!

হোসেন সাহেব বললেন, সে ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা ইন্ডিয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে পারবা না। আমি ইন্ডিয়ার খবর ছাপাবো না, নেহাৎ বড় কোনো খারাপ খবর না থাকলে

জহির বললো, চাচা, আমাদের চেয়ে আপনিই তো অনেক বেশিবার ইন্ডিয়ার নাম উচ্চারণ করেন। আপনার ইন্ডিয়া বাতিক হয়ে গেছে!

সকলের ঠোঁটে ঠোঁটে একটা মৃদু হাসির ঢেউ খেলে গেল।

১৮ কফি হাউসে ঢোকার মুখে

কফি হাউসে ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে অতীন কৌশিককে জিজ্ঞেস করলো, এই, উলুবেড়িয়া কী করে যেতে হয় জানিস?

কৌশিক অবাক হয়ে বললে, উলুবেড়িয়া, মানে উলুবেড়ে? কেন জানবো না! ওর কাছেই তো আমার মামাবাড়ি। আমার মামাবাড়ির গ্রামটার নাম ফুলেশ্বর। তোকে তো একবার নিয়ে যাবো বলেছিলুম।

অতীন একটুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলো। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলো, একদিনে ফিরে আসা যায়? ট্রেনে যেতে হয়, না?

কৌশিক হেসে ফেলে বললো, তুই আজও বাঙালই রয়ে গেলি, অতীন। উলুবেড়ে কত দূর তুই জানিস না? ট্রেনে যাওয়া যায়, বাসে যাওয়া যায়। কতক্ষণ লাগবে, বড়জোর ঘণ্টা ডেড়েক।

-চল ঘুরে আসি তা হলে।

–হঠাৎ?

–আজ তো ক্লাস হলো না, কতক্ষণ কফি হাউসে গ্যাঁজাবো? সারা দুপুর-বিকেল পড়ে আছে। আজ বেড়িয়ে আসি চল। এখন কটা বাজে? মোটে একটা দশ...

–তা বলে উলুবেড়ে? আগে থেকে খবর দিয়ে রাখলে আমার মামার বাড়িতে গিয়ে থাকা যেত। তার চেয়ে বরং চল বটানিক্স যাই। এই গরমের মধ্যে ওখানটা ভালো লাগবে।

–না, আমার উলুবেড়িয়াতেই যেতে ইচ্ছে করছে।

–কেন?

–না গেলে বলবো না।

–ঠিক আছে, কাল সকালে যাবো। কাল তো, ছুটি আছে।

–গেলে আজই যেতে হবে।

কৌশিক চুপ করে গেল। এরপর সে অনেকগুলো যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করলেও অতীনের কাছে হেরে যাবে। অতীনের কথায় বিশেষ যুক্তি থাকে না, তার থাকে জেদ। হঠাৎ এক একটা ব্যাপারে তার ঝোঁক চাপে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। কৌশিক জানে, সে যেতে রাজি না হলেও অতীন একাই উলুবেড়ের দিকে রওনা হবে।

মে মাসের অসহ্য গরম। রাস্তায় পিচ গলে যাচ্ছে। ক'দিন ধরেই আকাশটা বারুদ রঙের, সব বাতাস চলে গেছে অন্য কোনো দেশে। এই রকম দুপুরে কফি হাউসে পাখার তলায় বসে এক দঙ্গল বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিলে সময়টা অগোচরে কেটে যায়, তার বদলে এই জ্বালা-পোড়া রোদ্দুরে ট্যাং ট্যাং করে অতদূর যাবার কোনো মানে হয়? কৌশিকের ভুরু কুঁচকে গেল।

অতীন বললো, তুই এখানে ইসমাইলের দোকানটার কাছে দাঁড়া। তুই ওপরে গেলে আটকে যাবি। আমি চট করে ঘুরে আসছি।

–তা হলে দ্যাখ, রবিকে পাস কিনা। রবি গেলে জমবে।

–আমি রবিকেই খুঁজতে যাচ্ছি।

অতীন লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে। আজ বিনা নোটিসে ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে বলে ইউনিভার্সিটি ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেমেয়েতে একেবারে গমগম করছে কফি হাউস। অতীনকে দেখে বিভিন্ন টেবিল থেকে হাত উঠলো, কিন্তু সে কোনো টেবিলের কাছে গেল না, দ্রুত চোখ বুলিয়ে খুঁজতে লাগলো রবিকে।

রবি নেই। তবে এমন আরও তিন-চারজন বন্ধু আছে, যাদের ডাকলেই তারা অতীনের সঙ্গে যেতে রাজি হবে। অতীন কারুকে ডাকলো না।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সে অলি আর বর্ষার মুখোমুখি পড়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য সে ভাবলো, অলিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়? পরের মুহূর্তেই সে ভাবনাটা উড়িয়ে দিল। অলিকে নিতে চাইলে বর্ষাও যেতে চাইবে, মেয়েদের সঙ্গে নিলে ঠিক সময়ে ফিরে আসার একটা ঝামেলা আছে।

অলি জিজ্ঞেস করলো, এই বাবলুদা, তুমি চলে যাচ্ছো?

অতীন তার খাতাটা অলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এটা রাখ তো তোর কাছে। আজকাল ঘনঘন কফি হাউসে দেখছি তোকে, খুব আড্ডা দিতে শিখেছিস, তাই না?

বর্ষা বললো, কেন আড্ডা দেবো না? তোমরা দিতে পারো, তোমরা বুঝি কফি হাউসটা লিজ নিয়েছো?

একটা কোনো সুযোগ পেলেই বর্ষা তোমরা-আমরা দিয়ে কথা শুরু করে দেয়। সে পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারী-বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে চায়।

অতীন তাকে বললো, ঠিক আছে, আজ কফি হাউসটা তোমাদের দিয়ে দিলাম।

তারপর সে অলিকে বললো, এই, তোর কাছে ক'টাকা আছে? আমাকে পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারবি?

অলি সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ব্যাগ খুললো। তার কাছে-সাত টাকা রয়েছে, অতীন উঁকি মেরে। দেখে বললো, ঐ তো, যথেষ্ট আছে, বাঃ, ফাইন!

নিজেই সে তুলে নিল পাঁচ টাকার নোটটা।

অলি জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অতীন বললো, খাতাটা তোদের বাড়ি থেকে পরে নিয়ে নেবো। তারপর সে দৌড়ে নেমে গেল নিচে।

কৌশিকের পাশে অনুপম আর সিদ্ধার্থ এসে জুটেছে। অনুপম জিজ্ঞেস করলো, এই, তোরা উলুবেড়ে যাচ্ছিস কেন রে?

অতীন ভুরু তুলে কৌশিককে নিঃশব্দ বকুনি দিল। কৌশিকটার পেটে কোনো কথা থাকে। এখন এরা দু'জন সঙ্গে সেঁটে থাকতে চাইবে। সব জায়গায় সবার সঙ্গে যাওয়া যায় না।

সে গলা চড়িয়ে বললো, ওখানে যাচ্ছি কৌশিকের মামাবাড়িতে দুধ-ভাত খেতে।অন্য কারুর ভাগ বসানো চলবে না।

কৌশিকের হাত ধরে সে টেনে নিয়ে গেল সামনের দিকে। তারপর হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠে হাওড়ায়।

কৌশিক লোকাল ট্রেনের টিকিট কাটলো, কুড়ি মিনিট বাদেই ট্রেন। এর মধ্যেই ঘামে ভিজে গেছে ওদের জামা। ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিতে দিতে অতীন বললো, আমি এদিকে বিশেষ কোথাও যাইনি, জানিস? যাওয়ার মধ্যে তো কয়েকবার গেছি দেওঘর, আমার ঠাকুমা থাকেন সেখানে, আর খুব ছোটবেলা বাবা-মা'র সঙ্গে দেশের বাড়ি যেতাম, সে আমার ভালো মনে নেই, স্কুলে পড়ার সময় একবার শুধু। মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম, ব্যস! আর একবার বোধহয় চন্দননগরে কোন বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে, সেও অনেকদিন আগে ...

উলুবেড়িয়া, বসিরহাট, নৈহাটি, লক্ষ্মীকান্তপুর, কন্টাই ...এইসব জায়াগুলোর নাম কাগজে পড়ি, কিন্তু এগুলো কী রকম জায়গা তার কোনো আইডিয়াই নেই। দেশটাকে এখনো ভালো করে চিনি না।

কৌশিক বললো, তোরা বাঙালরা তো এখনও দেশ বলতে ইস্ট বেঙ্গল ভাবিস! যার নাম এখন ইস্ট পাকিস্তান।

অতীন চোখ পাকিয়ে বললো, মারবো শালা পেছনে এক লাথি। আমরা আবার কিসের বাঙাল রে? ফর্টি সেভেনের আগে থেকে এদিকে আছি।

কৌশিক তবু বললো, তোরা রিফিউজি তা তো বলছি না, কিন্তু বাঙাল ঠিকই। সেটা গা থেকে ঘষে তুলে ফেলতে পারবি না। বাঙালদের অদ্ভুত সেন্টিমেন্ট। সেদিন একটা বিয়ের চিঠি পেলাম, আমার বাবার এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে, ভদ্দরলোকের মোটর পার্টসের ব্যবসা, পূর্ণ দাস রোডে বিরাট বাড়ি হাঁকিয়েছেন, তবু বিয়ের চিঠিতে লিখেছেন, 'পূর্ববঙ্গের বরিশাল জিলার কোটালিপাড়া গ্রামের অধিবাসী, অধুনা কলিকাতার পূর্ণ দাস রোড নিবাসী' ...যেন পূর্ণ দাস রোডের বাড়িটা টেম্পোরারি, ওঁর আসল বাড়ি ঐ বরিশালে! সেখানে আর বাপের জন্মে কোনোদিন যেতে পারবেন কিনা ঠিক নেই।

–ওরকম কিছু কিছু লোকের বোকা সেন্টিমেন্ট এখনো রয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর কত বছর কেটে গেল খেয়াল নেই, কত বছর ...এদিকে তিন আর চোদ্দ, মোট সতেরো বছর, এক যুগের বেশি ...।

–তোর বাবাও দেখবি তোর বিয়ের সময় ঐ রকম চিঠি ছাপাবেন ...

–আমার বাবা খুব নস্টালজিয়ায় ভোগেন, হ্যাঁ, আমার বাবা সারা জীবন বাঙালই থেকে যাবেন, কিন্তু আমার ঐ সব হ্যাং আপ নেই, আমার মায়েরও তেমন নেই। পার্টিশান না হলেও আমি কি ঐ গ্রাম-ফ্রামে গিয়ে কোনোদিন থাকতুম নাকি? ধুস্!

–আচ্ছা অতীন, এবার বল তো, তুই হঠাৎ আজ উলুবেড়ে যাবার জন্য ক্ষেপে উঠলি : কেন? হোয়াট ইজ সো স্পেশ্যাল অ্যাবাউট উলুবেড়ে?

–তুই আজ সকালে স্টেটসম্যান পড়িসনি?

--কেন পড়বো না। কী আছে, উলুবেড়ে সম্পর্কে কিছু আছে?

–কাগজ খুলে শুধু খেলার খবর ছাড়া আর কিছু পড়িস না, তাই না?

ট্রেন ছেড়ে দেবে, ওদের উঠে পড়তে হলো। এই ঠা-ঠা দুপুরেও ট্রেনে ভিড় কম নেই, কৌশিক অবশ্য আগেই জানলার কাছে রুমাল পেতে রেখেছে। একজন লোক সেই রুমালটা এক পাশে ঠেলে সেখানে পেছন ঠেকিয়েছিল, অতীন চোখ গরম করে বললো, উঠুন, আমরা ওখানে বসবো।

লোকটি বললো, ওসব রুমাল পেতে জায়গা রাখা শিয়ালদা লাইনে চলে, হাওড়ায় চলে না।

কৌশিক বললেব, দাদা, এ লাইনে অনেকদিন যাতায়াত করছি। আমাদের হাওড়া লাইন শেখাবেন না।

ঝগড়া আরও গড়াতে পারতো কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা একজন বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি বললো, বড্ড গরম পড়েছে, এর মধ্যে আর মাথা গরম করবেন না। আপনারা রুমাল পেতে দুটো জায়গা রেখেছিলেন, একটা সীট ছেড়ে দিন, একটাতে একজন বসুন।

অন্যরাও তাতে সায় দিল। অতীন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কৌশিককে জোর করে বসালো সেই জায়গায়। আশ্চর্য, যে-লোকটি জায়গার জন্য ঝগড়া শুরু করেছিল, সে নেমে গেল পরের স্টেশনে। দাঁড়িয়ে থাকা সেই বলিষ্ঠ লোকটি হেসে বললো, যে দেশে ট্রামে-বাসে-ট্রেনে সামান্য বসবার জায়গা নিয়ে লোকে ঝগড়া করে, সেদেশে কখনো ইউনিটি আসতে পারে! দেখবেন, শিগগিরই এমন দিন আসছে, যখন হিন্দু-মুসলমানের রায়টের দরকার হবে না, আমরা এমনি এমনিই মারামারি কাটাকাটি শুরু করে দেবো।

দরজার কাছে দু'তিনজন মুসলমান ব্যাপারি দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে থেকে একজন বললো, আবার ঐ সব অলুক্ষণে কথা তোলেন কেন?

কৌশিকের পাশে বসা একজন শীর্ণকায় প্রৌঢ় বললো, আমাদের টাইমে দুপুরবেলা এই লাইনে এক এক কামরায় পাঁচ-সাতটা লোক থাকতো কিনা সন্দেহ। বাঙালরা এসে দেশটা ভরিয়ে দিল, ট্রেনে জায়গা পাবেন কোথ থেকে?

আর একজন বললো, আগে শেয়ালদা লাইনেই বাঙালদের রাজত্ব ছিল, এখন আস্তে আস্তে এদিকটাতেও ভরে যাচ্ছে।

কৌশিক আড় চোখে তাকালো অতীনের দিকে। সে উদগ্রীব হয়ে শুনছে। শীর্ণ প্রৌঢ়টি বললো, শেয়ালদা লাইন? আরে রাম রাম। আমি তো মরে গেলেও ওদিকের ট্রেনে কক্ষনো চাপবো না। ওদের কথা শুনলে মনে হয় আমাদের বাপ-পিতেমো' র বাংলা ভুলে যাবো!...

উলুবেড়িয়া স্টেশনে নেমে কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, যখন বাঙালদের নিয়ে ঐ সব কথা বলছিল, তখন তোর কেমন লাগছিল, সত্যি করে বল তো!

অতীন হেসে বললো, একটু একটু গায়ে জ্বালা ধরছিল, সেটা অ্যাডমিট করছি।

-ঐ যে বললুম, তোদের বাঙালত্ব কোনোদিন গা থেকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবি না!

-এক হিসেবে আমার অবস্থা আমার বাবাদের জেনারেশনের থেকেও খারাপ। আমার ইস্ট বেঙ্গলের কথা ভাল মনে নেই, কোনো ফিলিংও নেই। অথচ এদিককার লোক যখন রিফিউজিদের নামে দোষ দেয়, তখন তাদের সাইডও নিতে পারি না, আবার চুপ করে থাকলেও মনে হয় কাপুরুষের মতন নিজের পরিচয় গোপন করছি।

-শোন অতীন, এদিককার সব লোক রিফিউজিদের নামে দোষ দেয় না, অনেকে সিমপ্যাথিও দেখিয়েছে।

-এই সব ট্রেনে চাপলে দেশকাল সম্পর্কে সাধারণ লোকের অ্যাটিচিউড টের পাওয়া যায়। মানিকদাকে বলবো, আমাদের স্টাডি সার্কেল শুধু একটা ঘরের মধ্যে লিমিটেড না রেখে, মাঝেসাঝে এই সব ছোটখাটো জায়গায় ঘুরে ঘুরে যদি হয়, তা হলে অনেক কিছু শেখা যাবে।

-মানিকদা নিজে প্রায়ই গ্রামে যায় কৃষাণ ফ্রন্টের কাজ করতে। যাকগে ওসব কথা। উলুবেড়ে তো এলুম, এখন যাওয়া হবেটা কোথায়?

আমি কী ভেবেছিলাম জানিস, কৌশিক, এখানে এসে দেখবো ঝাঁকে ঝাঁকে লোক গঙ্গার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। গঙ্গা কোন দিকে? আজ সকালবেলার কাগজে পড়লাম, একটা বিলিতি জাহাজ এখানকার গঙ্গার কাছে কিসে যেন আটকে গিয়ে জখম হয়ে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে।

-হ্যাঁ। সে জাহাজের খবরটা তো আমিও দেখেছি। এখানকার গঙ্গায় বুঝি? সেটা লক্ষ করিনি।

–তুই পুরো খবরটা পড়িসনি তার মানে।

–জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে বলে তুই এখানে ছুটে এলি? তুই-আমি খুচরো আদার ব্যাপারি, আমাদের সঙ্গে জাহাজের কী সম্পর্ক?

–একটা জাহাজ আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে, সেটা তোর দেখতে যেতে ইচ্ছে করে না? এরকম সুযোগ ক'বার পাওয়া যায় জীবনে?

–তুই...জাহাজডুবি দেখতে এসেছিস?

–এটা একটা দেখার জিনিস নয়?

–চল, বাইরে গিয়ে রিকশা ধরি, ওরা হয়তো জানবে ব্যাপারটা কোথায় হয়েছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওরা একটা রিকশায় উঠে বসলো। দলে দলে লোক গঙ্গার দিকে ছুটে যাচ্ছে না, বটে, তবে রিকশাওয়ালা ঘটনাটা জানে। জাহাজটা ডুবছে কয়েকদিন ধরে। প্রথমে ওটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা হয়েছিল, এখন আশা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

স্টেশন থেকে ঘটনাস্থলটি বেশ দূরে। গঙ্গার ধারে পৌঁছে দেখা গেল, কিছু লোক জমায়েত হয়ে আছে সেখানে। গঙ্গা নদী এই জায়গায় একটা বাঁক নিয়েছে, যেন বাঁকের মুখে কাৎ হয়ে আছে জাহাজটা। দু'খানি স্টিম লঞ্চ ও বেশ কয়েকটি নৌকো ঘিরে আছে তাকে।

এদিকের আকাশে মেঘ জমছে বেশ। এর মধ্যেই রোদ মুছে গিয়ে একটু একটু অন্ধকার অন্ধকার ভাব হয়েছে, হেলে পড়া জাহাজটিকে যেন কোনো ট্রাজেডির নায়কের মতন দেখায়। দুটি মাস্তুল যেন আকাশের দিকে হাত তোলা।

ভিড় ঠেলে জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো দু'জনে। অতীন জাহাজটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। কৌশিক বললো, আমার মামাবাড়ি তো গঙ্গার ধারেই প্রায়, ছোটবেলা কত জাহাজ দেখতুম। সবচেয়ে ভালো লাগত রাত্তিরবেলা, এক একটা বিরাট বিরাট

বিলিতি জাহাজ, কত আলো জ্বেলে রাখতো.এখন গঙ্গায় চড়া পড়ে যাচ্ছে, কলকাতা বন্দরটার বারোটা বেজে গেল! এই জাহাজটা তো এমন কিছু বড় নয়, এই সাইজের জাহাজই যদি আটকে যায়...

অতীন বললো, চল, একটা নৌকো ভাড়া নিয়ে আরও কাছ থেকে দেখে আসি।

-আবার নৌকো-ফৌকোর ঝামেলা করে কী হবে?

-আমি কখনো খুব কাছ থেকে কোনো জাহাজ দেখিনি। ছেলেবেলায় ভাবতাম, জাহাজে কোনো একটা চাকরি নেবো, তারপর সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবো। এই জাহাজটাও, তুই ভেবে দ্যাখ, কত দেশ ঘুরেছে, সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত আমাদের এই গঙ্গায় এসে ডুবে গেল...ভালো বাংলায় কী যেন বলে, সলিল সমাধি হয়ে গেল!

-এটা তো মনে হচ্ছে দিশি জাহাজ।

-কাগজে লিখেছে বিলিতি।

-হ্যাঁ, জাহাজটার মালিক টানার মরিসন কম্পানি, জাহাজটার নাম এস এস মার্তণ্ড, বোধ হয় ব্রিটিশ আমল থেকে চলছে। বুড়ো না হলে কোনো জাহাজ সহজে ডোবে না।

-টাইটানিক বুঝি বুড়ো ছিল? অতীন নিজেই আর একটু নিচে নেমে গিয়ে দরাদরি করলো একজন নৌকোওয়ালার সঙ্গে। তারপর কৌশিককে ডেকে বললো, চলে আয়, ও রাজি আছে।

কৌশিক কাছে এসে বললো, আকাশের অবস্থা ভালো নয়। অতীন, তুই সাঁতার জানিস? অতীন হেসে দু'দিকে মাথা দোলালো।

কৌশিক উদ্বিগ্ন ভাবে বললো, তা হলে নৌকোয় যাওয়ার দরকার নেই। বছরের এই সময়টায় যখন তখন ঝড় ওঠে। তুই মাঝিকে জিজ্ঞেস কর।

অতীন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, আমার কিচ্ছু হবে না। আমি অমর। আমি সাঁতার জানি না, আমি একবার জলে ডুবে যাচ্ছিলাম, আমার দাদা সাঁতার জানতো, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আমার দাদাই মরে গেল। অথচ আমার কিছু হলো না। এইরকম ছেলে কি আর কখনো জলে ডুবে মরতে পারে?

–তুই কি ভয় পেয়ে তোর দাদাকে জড়িয়ে ধরেছিলি? অনেক সময় হয়, যে বাঁচাতে যায়

–সে সব আমার মনে নেই। তবে, অনেকেই মনে করে, আমার বদলে আমার দাদারই বেঁচে থাকা উচিত ছিল। আমার মা বাবাও বোধ হয় সেইরকমই মনে করে। অথচ বেঁচে রইলাম তো আমিই। শালা, পৃথিবীটা একটা বিচিত্র জায়গা, চল তো!

কৌশিকের হাত ধরে টেনে সে জোর করে নৌকোয় তুললো। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, এখন ঝড় উঠলে বেশ হয়! তুই তো সাঁতার জানিস। তুই যেন আমাকে

বাঁচাবার চেষ্টা করিস না। তাহলে কিন্তু তুই-ই মরবি?

কৌশিক বললো, অতীন, আমি আগে কখনো তোর মুখে এই ধরনের কথা শুনিনি। তোর মধ্যে মনে হচ্ছে একটা ডেথ উইশ আছে?

–তোর মাথা খারাপ! আমি অন্তত একশো বছর বাঁচবো। অনেককে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তারপর নিজে যাবো।

–তোর দাদা খুব ট্যালেন্টেড ছিল, তাই না?

–বাদ দে, বাদ দে। ওসব কথা রাখ তো! দ্যাখ, জাহাজটাকে এখন কীরকম একটা ভাঙা দুর্গের মতন দেখাচ্ছে।

অতীনকে এরকম রোমান্টিক হতে কখনে, দেখেনি কৌশিক। সে সব সময় চাঁছা ছোলা ভাষায় কথা বলে। হাওয়ায় চুল এলোমেলো হয়ে গেছে অতীনের, চোখ দুটি যেন খুবই ব্যগ্র। একটা ডুবন্ত জাহাজ দেখার জন্য তার এই ব্যাকুলতা যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

কৌশিক হঠাৎ আবৃত্তি শুরু করলো :

I'll warrant him for drowning, though the ship were no stronger than a nutshell, and as leaky as an unstanched wench.

Lay her a-hold, a-hold! Set her two courses: off to sea again; lay her off.

তারপর থেমে গিয়ে বললেন, এটা কোথায় আছে বল তো? অতীন উদাসীন ভাবে বললো, কী জানি! তুই তো জানিস, আমি কবিতা-টবিতা পড়ি না!

কৌশিক বললো, হ্যাঁ, লুকিয়ে লুকিয়ে পড়িস। একদিন হ্যামলেট থেকে মুখস্ত বলেছিলি। এটা শেকস্পীয়ারের দা টেমপেস্ট নাটকের প্রায় শুরুতেই...

সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অতীন জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা কৌশিক, আমরা আমাদের জন্মটা পেয়েছি মা বাবার কাছ থেকে, সেইজন্য সারাটা জীবনই কি তাদের কাছে ঋণী থাকতে হবে?

কৌশিক কয়েক মুহূর্ত বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, এর উত্তর ইয়েস অ্যান্ড নো!

-তার মানে?

–বায়োলজিক্যাল ব্যাপারটা সহজে এক্সপ্লেইন করা যায়। বায়োলজিক্যাল কারণে ঋণী থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার তো এত সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। শুধু জন্মের টানে নয়, বাবা-মায়ের সঙ্গে তার পরে কতখানি স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার ওপর সব কিছু ডিপেন্ড করে। কত ছেলে-মেয়ে তো বাবা-মাকে ভালো করে চেনেই না!

অতীন অস্ফুট ভাবে বললো, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার বন্ধন, নাইলনের দড়ির চেয়েও অনেক শক্ত। স্টাডি সার্কলে মানিকদার কথা শুনতে শুনতে মনে হয়, কবে সব বন্ধন অগ্রাহ্য করে বেরুবো!

এখন ভাটার টান চলছে তাই জাহাজটার কাছাকাছি যেতে ওদের খানিকটা সময় লাগলো। ছোট নৌকো, দু'জনেই ছই ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ডুবন্ত এস এস মার্তণ্ড থেকে নামানো হচ্ছে মালপত্র, সন্নিহিত স্টিমবোট ও নৌকোগুলি সেই কাজে নিযুক্ত। বড় বড় সব খয়েরি রঙের পেটি।

একটি স্টিম বোট থেকে একজন পুলিস অফিসার ওদের উদ্দেশ্যে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললো, এই, এদিকে আসবে না! যাও, হটে যাও!

অতীন মাঝিকে বললো, তুমি ওর কথা শুনো না, আর একটু কাছে চলো তো ভাই!

মাঝি বললো, ঐ জাহাজের ধারে যাওয়া নিষেধ আছে। লোকে যদি জিনিস চুরি করে সেই ভয় আছে তো।

অতীন বললো, ঐ পুলিস ব্যাটারাই অনেক কিছু চুরি করবে! তুমি চলে এসো, আর একটু কাছে চলো।

কৌশিক অবাক হয়ে অতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, কী বলছিস পাগলের মতন! পুলিস যদি গুলি চালায়? মাঝিভাই, তুমি আর যেও না!

অতীন বললো, গুলি চালালেই হলো নাকি!অ্যাই, আরও কাছে না গেলে আমি জলে ঝাঁপ দেবো বলে দিচ্ছি!

পুলিস অফিসারটি হুংকার দিতে শুরু করেছে। অতীনদের নৌকো অন্য একটি নৌকোর গায়ে লাগতেই অতীন লাফিয়ে চলে গেল সেটাতে। তারপর সামনে দৌড়ে গিয়ে জাহাজটির রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ালো। একজন সাদা পোশাক পরা ইংরেজ অফিসার পুলিসের হম্বিতম্বি শুনে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে অতীনদের লক্ষ করছিল। এবারে সে সহাস্যে ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, যুবক, এই ডুবন্ত জাহাজে তোমার কোনো নিকট আত্মীয় রয়ে গেছে নাকি? তোমার বাকদত্তা?

অতীন বললো, না, আমরা কলকাতা থেকে এসেছি এই জাহাজটা দেখতে। একবার ওপরে আসতে পারি?

অফিসারটি ভুরু তুলে বললো, তোমরা কলকাতা থেকে এই জাহাজটি দেখবার জন্যই এসেছো শুধু?

-হ্যাঁ।

-তবে তো অবশ্যই ওপরে আসতে পারো। এস এস মার্তণ্ড ধন্য, মৃত্যুকালেও সে তোমাদের মতন দু'একজন উপযাজক ভক্ত পেয়েছে।

অতীন আর কৌশিককে ওপরে তোলা হলো। অফিসারটি তাদের ওপরের ডেকের কয়েকটি ফাঁকা ক্যাবিন ঘুরিয়ে দেখালেন। জাহাজটি ঝুঁকে আছে পোর্ট সাইডের দিকে, ভেতরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উঁকি মারলে ইঞ্জিন ঘরে জল দেখা যায়।

অফিসারটি ওদের দু'প্যাকেট সিগারেট উপহার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মদ খাও?

অতীন আর কৌশিক একই সঙ্গে বললো, না।

অফিসারটি বললেন, তা হলে আর তোমাদের সঙ্গে ফেয়ারওয়েল টোস্ট করা গেল না। আমি এর আগে সাতবার কলকাতা এসেছি, আর কখনো আসবো না। গুড বাই!

ফেরার পথে ট্রেনে উঠে অতীন বললো, আমি জাহাজটাকে এখন যেন আরও ভালো করে দেখতে পাচ্ছি।

কৌশিক বললো, যাই-ই বল, ওপরে উঠে আমার বেশ ভয় ভয় করছিল। যদি ভুস করে ডুবে যেত!

–একটা কী রকম ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ হলো।

–লোকটা বেশ ভদ্র ছিল ঠিকই, কিন্তু আমি ইংরেজদের পছন্দ করি না।

–ও ইংরেজ নয়, ও একজন নাবিক। ও যখন বললো, আর কোনোদিন কলকাতায় আসবো না, তখন আমার মনে হলো, ঐ লোকটা যেন এই জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে জলের তলায় তলিয়ে যাবে।

–যাঃ, তা কখনো হয় নাকি? ও মালপত্র খালাস করাবার জন্য রয়ে গেছে।

–তা জানি। তবু ঐ রকম একটা দৃশ্য ভাবতে ভালো লাগে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, জাহাজটা একটু একটু করে ডুবছে, আর ঐ সাদা পোশাক পরা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে রেলিং ধরে...

কৌশিক বললো, আমি কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না, তোর এই ডুবন্ত জাহাজ দেখতে আসার ব্যাপারটা!

অতীন ভুরু কুঁচকে বললো, কেন, তোর ভালো লাগে নি? জাহাজটার ওপরে যে ওঠা যাবে, এতটা আশাই করিনি আমি!

কৌশিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ভালো লাগবে না কেন? দৃশ্যটার মধ্যে একটা ট্র্যাজিক মহিমা আছে, আকাশে সেই সময় সূর্যাস্তের রঙের সঙ্গে মিলে ছিল কালো মেঘ। তবে কি জানিস অতীন, আগে এই সব দৃশ্য দেখে যত আনন্দ পেতাম, এখন আর পাই না। সুন্দর কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেই হঠাৎ কে যেন আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা!

অতীন জিজ্ঞেস করলো, এটা কী? কবিতা? তোর কানে কানে কে এই কবিতা বলে?

কোনো উত্তর না দিয়ে কৌশিক এবার জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলো বাইরে। হঠাৎ কৌশিকের মুখখানা কেন বিষণ্ন হয়ে গেল, তা বুঝতে পারলো না অতীন।

এত কাণ্ডের পরেও ওরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেল পৌনে ন'টার মধ্যে। কৌশিকের মামাবাড়িতেও বুড়ি ছুঁয়ে আসা হয়েছে। সত্যিকারের বুড়ি ছোওয়ার কারণ ওর থুরথুরে দিদিমা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল না।

দু'জনে দু বাসে চাপলো। অতীন নেমে পড়লো ভবানীপুরে অলিদের বাড়ির সামনে। তার খাতাটা নিতে হবে। সায়েন্স কলেজে যাবার সময় খাতা নিয়ে বেরিয়েছিল, বাড়ি ফেরার সময় হাতে খাতা থাকবে না, এটা ভালো দেখায় না।

অলিদের অবারিতদ্বার বাড়িতে ঢুকে পড়ে অতীন একবার দোতলায় উঁকি মারলো, তারপর তিন তলায় উঠে এলো। অলির ঘরে তার পড়ার টেবিলের সামনে একজন মধ্য বয়স্ক পুরুষ বসে আছেন। ইনি ইংরিজির অধ্যাপক, অলিকে পড়াতে আসেন সপ্তাহে দু দিন। এই লোকটিকে অতীন দু'চক্ষে দেখতে পারে না। সে ঠিক করে রেখেছে, কোনো একটা সুযোগ পেলেই সে ঐ অধ্যাপকটিকে অলিদের বাড়ি থেকে তাড়াবে। এই উদ্দেশ্যে সে ইতিমধ্যে অধ্যাপকটির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছে।

অধ্যাপকটি মন দিয়ে কিছু লিখছেন, অতীনের পায়ের শব্দ পেয়েই অলি চোখ তুলে তাকালো। অতীন দু হাত তুলে ইসারায় বুঝিয়ে দিল খাতাটার কথা।

একটু আসছি বলে অলি উঠে এলো চেয়ার থেকে। তার চুলের বেনীটা বুকের ওপর ফেলা।

অলি দরজা দিয়ে বেরুতেই অতীন ক্ষিপ্র হাতে তাকে একপাশে টেনে নিয়ে সবলে বুকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটটা কামড়ে চুমু খেল। অলি ভয়ের চোটে কোনো শব্দ করতে পারলো না। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাও করলো না। তার মায়ের ঘরের দরজা খোলা, যে-কোনো মুহূর্তে মা বেরিয়ে আসতে পারে।

একটু পরে অতীন অলিকে ছেড়ে দিয়ে বললো, চলি! তোর টাকাটা আমি পরে শোধ করে দেবো।

অলি অতীনের একটা হাত চেপে ধরলো। তার চোখ ফেটে জল আসছে। সে কোনো কথা বলতে পারছে না। বাল্লুদা এলেই এরকম একটা কাণ্ড করবে, আবার এজন্য তাকে বকুনি দিলে আসা বন্ধ করে দেবে। মাসের পর মাস এ বাড়িতে আসবে না।

অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বাবলুকে টেনে নিয়ে এলো সিঁড়ির কাছে। তারপর ধরা গলায় বললো, তোমরা উলুবেড়িয়া গিয়েছিলে?

–হ্যাঁ। সে কথা বুঝি এর মধ্যে কফি হাউসে রাষ্ট্র হয়ে গেছে? কেন গিয়েছিলাম বল তো। একটা দারুণ ব্যাপার দেখলাম। একটা জাহাজ ডুবে যাচ্ছে...

–আমার সঙ্গে দেখা হলো, তবু কেন আমায় সঙ্গে নিয়ে গেলে না?

–তোর সঙ্গে যে ঐ ফেমিনিস্ট মেয়েটা ছিল! তাছাড়া তুই যেতে পারতিস না। নৌকো-টৌকো চড়ার ব্যাপার ছিল...কিন্তু আমি ভাবলাম, ফিরে এসেই তোকে সব শোনাবো, সেইজন্য দৌড়োতে দৌড়োতে এসেছি, এদিকে তুই ঐ বদ মাস্টারটাকে নিয়ে বসে আছিস!

–ছিঃ, ও কথা বলে না।

–তা হলে তুই থাক ঐ মাস্টারকে নিয়ে। আমি চলি! অতীন পেছন ফিরতেই অলি আবার বাবলুর হাত চেপে ধরলো। অতীন ধারালোভাবে হেসে জিজ্ঞেস করলো, কী?

অলি কোনো উত্তর দিল না। সে বুঝতে পেরেছে, এখন এভাবে সে বাবলুদাকে ধরে রাখতে পারবে না। তার মুষ্টি আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে এলো। তার ঠোঁট জ্বালা করছে, তার বুকের মধ্যেও সব কিছু কাঁপছে।

অতীনকে ছেড়ে দিয়ে সে দেয়ালে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

১৯ তিন তিনটে সাধারণ নির্বাচন

তিন তিনটে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে স্বাধীন ভারতে। প্রত্যেকবারই কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছে কংগ্রেস দল, একটানা প্রধান মন্ত্রিত্ব করলেন জওহরলাল নেহরু। যথেষ্ট বয়েস হয়ে গেলেও তাঁর আচরণ যুবকোচিত। সুদর্শন পুরুষ তিনি, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সুরুচিসম্মত। সকলের সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার। তিনি গোলাপ ফুল, শিশু ও কবিতা ভালোবাসেন। এমন মানুষকে কেউ অপছন্দ করতে পারে না। ভারতের শেষ ভাইসরয়ের পত্নী শ্রীমতী মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত তাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। আরও কত নারী এই বিপত্নীক পুরুষটির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, তা কে জানে?

নিজের দলের মধ্যে জওহরলাল নেহরুর প্রতিদ্বন্দ্বী তো দূরের কথা, সমকক্ষ হবার মতন কাছাকাছিও কেউ নেই। বিরোধী দলগুলিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। দেশের যেখানেই তিনি যান, হাজার হাজার মানুষ তাঁকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখে জীবন সার্থক করতে চায়। তিনিও বছরে দু'তিনবার প্রচুর ক্যামেরাম্যান ও সাংবাদিকদের চোখের সামনে, সব রকম নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘন করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে একেবারে জনসাধারণের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান, বয়স্কদের আলিঙ্গন করেন, বাচ্চাদের গাল টিপে দেন। জাতির পিতা হলেন মহাত্মা গান্ধী, আর কর্ণধার চাচা নেহরু।

বিদেশেও তাঁর প্রচুর খ্যাতি ও সম্মান। পশ্চিমী দুনিয়ায় নেতারা প্রথম দিকে আশঙ্কা করেছিল, এই লোকটা কমুনিস্ট হয়ে না যায়। ওঁর লেখা বইপত্রে সমাজতন্ত্রের দিকে খানিকটা ঝোঁক দেখা গেছে। তাছাড়া, চীনের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব! কিন্তু এত বড় দেশে তিন তিনটি সাধারণ নির্বাচন নির্বিঘ্নে পার করার পর সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। ভারতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দিন দিন বেড়েই চলেছে বটে, বহু লোক এখনও না খেয়ে থাকে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যখন তখন কয়েক শো লোক মারা যায়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী কিছুই দমন করা যায়নি, কিন্তু জওহরলাল নেহরু গণতন্ত্রকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভারতে গণতন্ত্রের উজ্জ্বল পতাকা সগর্বে ওড়ে। ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির নেই, সরকারি ভাবে এ দেশ ধর্মনিরপেক্ষ।

দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করলেও জওহরলাল নেহরু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে পুরোপুরি হাত মেলাননি, জোট নিরপেক্ষতার নীতি আঁকড়ে ধরে থেকে তিনি তৃতীয় বিশ্বের প্রধান নেতা হয়ে উঠেছেন। ক্রেমলিন ও হোয়াইট হাউস থেকে তিনি সমান নেমন্তন্ন পান। দেশের মধ্যেও তিনি চালু রেখেছেন মিশ্র অর্থনীতি। ইস্পাতের উৎপাদন ভার নিয়েছে পাবলিক সেকটর, বিমা কম্পানিগুলি জাতীয়করণ করা হয়েছে। দেশীয় রাজ্যগুলি বশ্যতা স্বীকার করে 'ইণ্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত'-এর অন্তর্গত হয়েছে, একমাত্র হায়দ্রাবাদ ছাড়া অন্য কোথাও বলপ্রয়োগ করতে হয়নি। শুধু এখনও কাশ্মীর প্রশ্নটি গলার কাঁটা হয়ে ফুটে আছে।

এ বছরের গোড়ার দিকে ভুবনেশ্বরে কংগ্রেসদলের অধিবেশন চলার সময় জওহরলাল নেহরু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সারা দেশ জুড়ে একটা বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল। অনেকেরই ধারণা ছিল, উনি চিরযুবা থাকবেন, কোনো দিন বৃদ্ধ হবেন না, এখনও তো দিনের মধ্যে উনিশ ঘণ্টা খাটেন, হাঁটা-চলার মধ্যে একটুও শ্লথ ভাব নেই, ক্লান্তি নেই দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছোটাছুটিতে। সেই মানুষ শয্যাশায়ী হয়ে থাকবেন?

অনেকে বলতে লাগলো, শরীর নয়, আসলে ওঁর মন ভেঙে গেছে। চীনের কাছ থেকে যে আঘাতটা পেয়েছেন, সেটা উনি কিছুতেই সামলাতে পারছেন না। এত দোস্তি ছিল চীনের

প্রধানমন্ত্রী চো এন লাই-এর সঙ্গে, দু'জনে এক সঙ্গে পঞ্চশীল ঘোষণা করেছেন, ভারত সফরে এসে চৌ এন লাই 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' শ্লোগান দিয়েছেন, ফুর্তি করে লোকজনের সঙ্গে নেচেছেন। সেই চৌ এন লাই আচমকা ভারত আক্রমণ করে বসলো? শান্তির প্রবক্তা নেহরুর কাঁধে চাপিয়ে দিল একটা যুদ্ধ, শুধু তাই নয়, পরাজয়ের কলঙ্ক! এখনও ম্যাকমাহন লাইনের এদিকের অনেকটা জমি চীনা সৈন্যরা দখল করে বসে আছে। ভারতের ডিফেন্স ফ্যাকটরিগুলিতে বন্দুকের বদলে হাঁড়ি-কড়াই বানাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল, তা জেনে সবাই এখন ছি ছি করছে। প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হলে অনেক। মাঝে মাঝে গুজব শোনা যায়, চীনের প্ররোচনায় এ দেশের কমুনিস্টরা নাকি পশ্চিম বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান আর আসাম নিয়ে পিপলস রিপাবলিক অফ বেঙ্গল গড়তে চাইছে। কেউ কেউ বলে, সি আই এরও একই মতলব।

কয়েক মাস বাদেই আবার নেহরু সুস্থ হয়ে উঠলেন, যাতায়াত করতে লাগলেন সংসদে, প্রেস কনফারেন্সে ডেকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, অনেকেই এখন জানতে চাইছে, আফটার নেহরু, হু? আপনার উত্তরাধিকারী কে হবে আপনি ঠিক করেছেন?

নেহরু হেসে উত্তর দিলেন, আমি আরও অনেকদিন বাঁচবো, এখনই ঐ প্রশ্ন উঠছে কেন?

সাংবাদিকরা লক্ষ করলো, প্রধানমন্ত্রীর চোখের নিচের কালিমা মুছে গেছে, মুখে উৎফুল্ল ভাবটি ফিরে এসেছে, তিনি আবার সক্ষম স্বাস্থ্যবান হয়েছেন।

কাজে যোগ দিতে না দিতেই অনেক রকম সমস্যা। চতুর্দিকে নানান গোলমাল, খাদ্য পরিস্থিতি ভালো নয়, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুর্ভিক্ষের মতন অবস্থা, চালের দাম বাড়তে বাড়তে বত্রিশ টাকা মন পর্যন্ত উঠে এখন কালোবাজারে আত্মগোপন করেছে সব চাল। পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমন হঠাৎ বেড়ে গেছে এ বছর। এত উদ্বাস্তু সামলাতে একেবারে হিমসিম অবস্থা।

উদ্বাস্তুর সংখ্যা যত বাড়ছে, ততই ভারতে ধূমায়িত হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। কট্টর হিন্দুরা প্রকাশ্যে বলাবলি করছে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে জওহরলাল নেহরু আসলে মুসলমানদের তোষামোদ করেছেন। পার্টিশানের সময় দু'দেশ থেকে হিন্দু-মুসলমান বদলাবদলির প্রস্তাব নেহরু মানেননি। তার ফল হলো এই যে পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা চলে আসছে আর ভারতে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পশ্চিম বাঙলা, আসাম, ত্রিপুরায় প্রতিদিন হাজার হাজার উদ্বাস্তু আসছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। মে মাসে মাত্র একদিনেই পশ্চিম বাংলার সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছে সাত হাজার শরণার্থী। তাদের মুখে মুখে ছড়াচ্ছে অত্যাচার ও বিভীষিকার কাহিনী। পূর্ব পাকিস্তানের বড় বড় ব্যবসা থেকে শাসন যন্ত্র পর্যন্ত সব অবাঙালী মুসলমানদের দখলে, তারা সে-দেশ থেকে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করতে চায়। অনেক বাঙালী মুসলমানও সহযোগিতা করছে তাদের।

আবার সেখানে অনেক বুদ্ধিজীবী, শান্তিপ্রিয় মানুষ, পশ্চিম পাকিস্তানের এক তরফা আধিপত্যের বিরোধী, ধর্মের চেয়ে মনুষ্যত্ব যাদের কাছে বড়, সেই রকম মুসলমান পূর্ব পাকিস্তান থেকে সমূলে হিন্দু বিতাড়নের প্রতিবাদ জানাতে চায়। অনেক রকম বৃত্তিজীবী হিন্দুদের অনুপস্থিতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তার ফল ভালো হবে না। কিন্তু কে শোনে তাদের কথা।

পুনবাসনমন্ত্রী মহাবীর ত্যাগী দিল্লী থেকে পশ্চিমবাংলার সীমান্তে ছুটে আসছেন উদ্বাস্তুদের সংখ্যা গুণে দেখবার জন্য। তারপর স্বীকার করলেন, রাজধানীতে বসে যা শুনেছিলেন তা গুজব নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ বিবৃতি দিলেন, দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকেও উদ্বাস্তুদের দায়িত্বের ভাগ নিতে হবে, দেশ বিভাগের কোনো আঁচই ওদের গায়ে লাগবে না। তা তো হতে পারে না!

নানারকম সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা জওহরলাল নেহরুর কাছে সবচেয়ে বড়। কাশ্মীর প্রশ্ন আবার প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শেখ আবদুল্লা মুক্তি পেয়েই কাশ্মীরের

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করেছেন। তিনি পাকিস্তানে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চান।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ আন্তজাতিক ক্ষেত্রেও গড়িয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের তরুণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বক্তৃতার আগুন ছোটাচ্ছেন। কাশ্মীর আদায়ের জন্য তিনি ভারতের সঙ্গে এক হাজার বছর ধরে যুদ্ধ চালাতেও রাজি।

পাকিস্তানের বন্ধুরা নেহরুকে বিদ্রূপ করে বলছে, ভারত যদি এতই ভোটাভুটির ভক্ত হয়, গণতন্ত্র নিয়ে লম্বা চওড়া বড়াই করে, তা হলে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে কাশ্মীরে ভোটের ব্যবস্থা করছে না কেন? নেহরু এর জবাব দিয়ে রেখেছেন যে পাকিস্তানের একটা অংশ তো পাকিস্তানী ফৌজ দখল করে রেখেছে। ওরা হানাদারবাহিনী আগে সরিয়ে নিক, তারপর ভোটের ব্যাপার দেখা যাবে। পাকিস্তানীরা বলে, ভারতই তো আসল হানাদার, ফৌজ সরাতে হয় ওরা সরাক। কাশ্মীরের হিন্দু রাজা ভারত ইউনিয়ানে যোগ দেবার জন্য আবদার ধরেছিল কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো মূল্য নেই? ভারতীয় মুখপাত্র আবার এর উত্তরে বলে, তোমরা পাকিস্তানী জনগণের ওপর সামরিক শাসন চাপিয়ে গলা টিপে রেখেছো, তাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছো, এখন কাশ্মীরে ভোটের কথা তোমরা বলছো কোন মুখে?

আগে ফৌজ সরানো হবে, না আগে ভোট হবে, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। যেমন, গাছ থেকে বীজ, না বীজ থেকে গাছ, এ ধাঁধার উত্তর কেউ জানে না।

নেহরুর ঘনিষ্ঠ মহল অবশ্য জানে যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেমন বিধান সভায় সরকারি দল গঠনের জন্য নির্বাচন হয়, সেই রকম একটি অঙ্গ রাজ্য হিসেবে কাশ্মীরেও নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করবেন নেহরু, শেখ আবদুল্লাকে তিনি সেই উদ্দেশ্যেই ছেড়েছেন। সেটাই তো আত্মনিয়ন্ত্রণ। কাশ্মীর পাকিস্তানে যাবে কি না, এ প্রশ্নই ওঠে না। কোনো কারণেই নেহরু কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নন। তাঁর ব্যক্তিগত দুর্বলতা তো আছেই, তা ছাড়া এতদিন পর কাশ্মীর হাতছাড়া হয়ে গেলে সারা দেশের

মানুষের ক্রোধ তাঁকে এবং তাঁর কংগ্রেস দলকে ভস্ম করে দেবে। কাশ্মীরের জন্য তিনি চালের দর এক টাকা সের বেঁধে দিয়েছেন, সেখানে বনস্পতি নিষিদ্ধ, সস্তা দরে পাওয়া যায় খাঁটি ঘি, এম এ পর্যন্ত পড়াশোনা ফ্রি, তবু কি কাশ্মীরীরা এতই অকৃতজ্ঞ হবে যে তারা পাকিস্তানে যেতে চাইবে?

দক্ষিণপন্থীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও নেহরু শেখ আবদুল্লাকে পাকিস্তান সফরের অনুমতি দিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ঐ লোকটি জাতীয়তাবাদী, ধর্ম-গোঁড়া নয়। পাকিস্তানের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসুক!

অসহ্য গরম পড়েছে দিল্লীতে, বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই, প্রত্যেক দিন দুপুরে লু বইছে। এর মধ্যে এত কাজের চাপ। শুভার্থীরা নেহরুকে পরামর্শ দিলেন, কিছুদিন আগেই শক্ত অসুখ থেকে উঠেছেন, তারপরেই, এত কাজের বাড়াবাড়ি ঠিক হচ্ছে না। শেখ আবদুল্লা ফিরে না আসা পর্যন্ত তো কাশ্মীর সম্পর্কে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে না, আপনি কয়েকটা দিন কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় বিশ্রাম নিয়ে আসুন!

পরামর্শটা নেহরুর মনে ধরলো। একমাত্র মেয়ে ইন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেরাদুন চলে গেলেন। পাহাড় তাঁর প্রিয়। প্রকৃতির কাছ থেকে শুশ্রূষা পাবার মতন চোখ তাঁর আছে। দু'একদিনেই তাঁর শ্রান্তি কেটে গেল, হিমালয়ের টাটকা বাতাসে তিনি যেন নতুন করে শারীরিক বল ও প্রেরণা পেলেন।

তিন দিন বাদেই রাজধানী আবার তাঁর মন টানল। কর্মোদ্যোগী পুরুষ তিনি। সুস্থ শরীরে কাজ ছাড়া বেশিদিন থাকতে পারেন না। ইন্দিরাকে বললেন, বাক্স গুছোও, আজই দিল্লি ফিরবো।

দিল্লী এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছোলেন সন্ধের সময়। দফতরবিহীন মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এসেছেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁর সঙ্গে হাস্য পরিহাস করলেন কিছুক্ষণ। দিল্লীর আকাশ এখনো গুমোট, এই তুলনায় দেরাদুনের আবহাওয়া কত চমৎকার ছিল। সাহেবরা শীতকালে রাজধানী দিল্লী থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত সিমলায়, সেখানে ঠাণ্ডার মধ্যে অনেক

ভাল কাজ করা যেত। কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ব্রিটিশ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা মানায় না।

লাল বাহাদুরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বাড়ি চলে এলেন। নৈশভোজে বসে মোটামুটি জেনে নিলেন দিল্লীর পরিস্থিতি, তারপর শুয়ে পড়লেন তাড়াতাড়ি। কাল সকাল থেকে আবার সব কাজে হাত দেবেন।

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস তাঁর। প্রথমে খানিকটা পায়চারি করে নেন। কয়েক পা হাঁটতে না হাঁটতেই চীন, কাশ্মীর, দেরাদুনের স্মৃতি, রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা সব তালগোল পাকিয়ে গেল। তিনি চোখে হঠাৎ অন্ধকার দেখলেন, ঝুপ করে পড়ে গেলেন মাটিতে। সেই যে চক্ষু বুজলেন, আর খুলতে পারলেন না, জ্ঞান আর ফিরলো না একবারও, দুপুর দুটো বেজে এক মিনিটে তাঁর হৃৎস্পন্দন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। তাঁর এত সাধের দেশটিকে মাঝিহীন নৌকোর মতন মাঝ দরিয়ায় ছেড়ে দিয়ে পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেলেন তিনি।

কারুর কারুর থাকাটাই এমন অভ্যেস হয়ে যায় যে তাঁর না-থাকাটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য হতে চায় না। টানা সতেরো বছর ধরে যিনি একটি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী, তার আগেও যিনি বহু বছর ছিলেন নেতৃত্বের শীর্ষ সারিতে, যিনি গতকালও ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ, তিনি আজ আর নেই, এই নির্মম সত্যটি কিছুতেই যেন মগজে ঢুকতে চায় না। সারা দেশেরই হলো এই রকম উদ্ভ্রান্ত অবস্থা। প্রাচ্যদেশীয় লোকেরা সশব্দ শোক প্রকাশ করে। ভারতের প্রত্যেক শহরের রাস্তায় ঘাটে বহু লোককে দেখা গেল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে।

পাকিস্তানেও নেহরুর জন্য শোক করার লোকের অভাব নেই। যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন তাঁদের অনেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গণতন্ত্রবাদীরা এই উপমহাদেশের গণতন্ত্রের কাণ্ডারীর আকস্মিক প্রস্থানে সত্যিকারের দুঃখিত হলেন। কেউ কেউ ভাবলেন, দেশ বিভাগের জন্য যারা দায়ী, ইণ্ডিয়া-পাকিস্তান নামে দুটি দেশের যারা স্রষ্টা, একে

একে তারা সবাই চলে গেল। আবার এই দু'দেশেই 'লোকটা মরেছে, যাক বাঁচা গেছে! এমন চিন্তা করার মানুষ অনেক।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা প্রথামতন শোক বার্তা পাঠিয়ে দেবার পর বলাবলি করতে লাগলো, এবারে তো নেহরু সরে গেছে, এবার দেখা যাক ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে বিলাসিতা ক'দিন টেকে! মারামারি, কাটাকাটি শুরু হলো বলে! ওদেশের আর্মি জেনারেলদের মধ্যে কি কেউ মরদের বাচ্চা নেই, এখনও মাথা তুলছে না কেন?

কলকাতায় সকালের দিকে নেহরুর অসুস্থতার খবর বিশেষ কেউ জানতে পারেনি। সুতরাং দুপুরে চরম সংবাদটি এলো একেবারে আচম্বিতে।

অতীন তখন একটি সিনেমা হলের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে। সত্যজিৎ রায়ের একখানা ছবি চলছে এখানে। খুব নাম হয়েছে ছবিটার, মমতা বেশ কয়েকদিন ধরে ছেলেকে বলছেন টিকিট কেটে দিতে, অতীনের আর সময়ই হয় না। আজ মমতা পাঠিয়েছেন জোর করে। বেশ ভিড়, টিকিট পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। টিকিট নাকি ব্ল্যাক হচ্ছে। অতীন একা এসেছে তাই। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে থাকলে সে টিকিট ব্ল্যাকারদের ঠাণ্ডা করে দিত।

হঠাৎ লাইনটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অতীন প্রথমে কারণটা বুঝতে পারলো না। সিনেমা হলের লোহার গেটটা ঝনঝন করে টেনে বন্ধ করা হচ্ছে। আশেপাশের দোকানগুলোরও ঝাঁপ পড়তে লাগলো এক এক করে। কংগ্রেসের পতাকা ওড়ানো একটা খোলা জিপ গাড়িতে চেপে একদল ছেলে বলতে বলতে গেল, দোকান বন্ধ করুন। দোকান বন্ধ করুন!

অতীন প্রথমেই ভাবলো, দাঙ্গা শুরু হলো নাকি? তারপর নেহরুর মৃত্যু সংবাদটি শুনে তার তীব্র কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না, সে মনে মনে বললো, যাঃ, আজ আর মা-পিসিমণির সিনেমা দেখা হল না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে অতীনের মনে বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা গড়ে ওঠেনি। তার বাবা মাঝে-মাঝেই নেহরুর সমালোচনা করেন। তাদের স্টাডি সার্কেলের মানিকদা তো প্রায়ই বাপান্ত করেন নেহরুর। মানিকদার মতে পাকিস্তানের মতন ভারতেরও নেহরু-সরকারের বদলে মিলিটারি শাসন থাকলে অনেক ভালো হতো, তা হলে এ দেশে বিপ্লব ত্বরান্বিত হতো। পাকিস্তানের জঙ্গি সরকারের সঙ্গে চীনের যে নতুন বন্ধুত্ব হয়েছে, মানিকদার মতে এর পেছনে গূঢ় কারণ আছে, চীন এই সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানে বিপ্লব ঘটাতে চায়। তপন নামে যে রিফিউজি ছেলেটির সঙ্গে অতীনের এখন বন্ধুত্ব হয়েছে, সেও নেহরুর ওপরে হাড়ে চটা। তার ধারণা উদ্বাস্তুদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী ঐ জওহরলাল নেহরু।

অতীনের যা বয়েস তাতে একেবারে খুব কাছের প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারুর মৃত্যু বিশেষ অভিঘাত সৃষ্টি করে না। রাস্তার কিছু লোকের হাহাকার ও শোকের উচ্ছ্বাস দেখে সে ভাবল, এত বাড়াবাড়ি করার কী আছে? নেহরুর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তাই মারা গেছে! এত বছর ধরে প্রধানমন্ত্রিত্বগিরি করেছে, আরও কত চাই? মানুষ কি মরবে না নাকি?

বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মনটা ছটফট করলেও সে ভাবলো, বাড়িতে গিয়ে মাকে খবরটা জানানো উচিত আগে। দেখতে দেখতে ট্রামবাস বন্ধ হয়ে গেল, সে হাঁটতে শুরু করলো বাড়ির দিকে।

হাজরার মোড়ের কাছে একটা মুসলমান শালকরের দোকানের সামনে ছোটখাটো ভিড় জমেছে। এখানে আবার কী হলো, অতীন উঁকি মেরে দেখতে গেল। একজন লোক হাউ হাউ করে কাঁদছে। লোকটি বৃদ্ধ, লুঙ্গি ও ফতুয়া পরা, মাথায় সাদা টুপি, মুখভর্তি ধপধপে দাড়ি, ঐ লোকটিই দোকানের মালিক। অতীন চেনে ওকে, গত শীতের আগে সে এই দোকানে বাড়ির দু'খানা শাল ধোলাই করতে দিয়েছিল।

লোকটির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে, সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলছে, হায়, হায়, অতবড় মানুষটা চলি গেল, আমরা বট বিরিক্ষের নিচে আশ্রিত ছিলাম। মুসলমানেরে

আর কে দ্যাখবে? এবারে কাজিয়া বাধলে আর বাঁচবো না, হায় হায়, উনি চলি গ্যালেন গো, সব যে অন্ধকার হইয়ে গেল...

দু'জন কর্মচারি থামাবার চেষ্টা করছে বৃদ্ধকে, উনি কিছুতেই শুনছেন না। বারবার বলে যাচ্ছেন ঐ একই কথা। বৃদ্ধটি কাঁদছেন ঠিক শোকে নয়, অনেকখানি ভয়ে। ভয়ে যেন ওর মাথা বিগড়ে গেছে।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন চেঁচিয়ে বললো, চুপ করো মিঞা। ঐ সব কথা বলছো কেন? তোমাকে কি কেউ ভয় দেখিয়েছে?

অতীন সেখানে আর দাঁড়ালো না, বাড়ির দিকে জোরে পা চালালো। কান্নার দৃশ্য সে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এই লোকটির কান্নার মধ্যে এমন একটা আকুলতা রয়েছে যে বুকে ধাক্কা মারে। সে চেষ্টা করেও লোকটির মুখটা ভুলতে পারলো না।

বাড়িতে এসে দেখলো, প্রতাপ আগেই খবর পেয়ে আদালত থেকে বাড়িতে ফিরে, এসেছেন। বাড়িতে একেবারে নিঝুম অবস্থা, প্রতাপ গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁর দু'পাশে মমতা আর সুপ্রীতি। অতীন আর সিনেমার প্রসঙ্গ তুললোই না। প্রতাপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এখন কী হবে? নেহরু শক্ত হাতে হাল ধরে ছিলেন, এবার দেশটা যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায়...ওঁর মতন আর তো কেউ নেই...

বাবা নেহরুর সমালোচনা করতেন, সেই বাবা যে নেহরুর মৃত্যুতে এতখানি বিহ্বল হয়ে পড়বেন, তা অতীন ভাবতে পারেনি। দেশটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি আছে? বিপ্লবের পর আবার ছোট ছোট রাজ্যগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হবে, এই তো নিয়ম! সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন হয়েছে।

মৃত্যুর পরে দেখা গেল নেহরু সত্যিই কোনো উত্তরাধিকারী ঠিক করে রেখে যাননি, তবে গণতন্ত্রের বনিয়াদটি বেশ শক্ত করেই গড়ে রেখে গেছেন। মারামারি কাটাকাটি শুরু হলো না, বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিল না। দিল্লিতে ক্ষমতা দখলের কোনো কুৎসিত রূপও

ফুটে উঠলো না। সৈন্যরা ব্যারাকেই রইলো। টু শব্দটিও করলো না কোন সেনাপতি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দকে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী করে কাজ চালিয়ে যাওয়া যেতে লাগলো। তলে তলে আলাপ-আলোচনা চললো, পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন। প্রথমেই মোরারজি দেশাই জানালেন তাঁর দাবি। যদিও কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতার ইচ্ছে নিঝাট, নিঃশত্রু লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে নেহরুর জায়গায় বসানো। কয়েকদিন বাদে এগিয়ে এলেন জগজীবন রাম। গান্ধীজী সমাজের নিচুতলার মানুষের নাম দিয়েছিলেন হরিজন, কোনো একজন হরিজনকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি করা উচিত, এরকম কথাও একবার বলেছিলেন না?

লালবাহাদুর শাস্ত্রী নিজে প্রথম দিকে চুপচাপ ছিলেন, কয়েকদিন পর বললেন, তাঁর দল যদি অন্য কোনো প্রার্থীকে মনোনীত করে, তা হলে তিনি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াবেন। কেউ কেউ বলতে লাগলো, ঐ যে গুলজারিলাল নন্দ একবার প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছে। ও আর ছাড়বে না। এসব চেয়ার কি কেউ ছাড়ে, ওই অন্যদের হটিয়ে দেবে।

শেষ পর্যন্ত সে রকম কিছু হল না। দক্ষিণ ভারতের নেতা কামরাজের মধ্যস্থতায় ছোট্টখাট্টো মানুষ লাল বাহাদুরই হলেন প্রধানমন্ত্রী; মোরারজি ও জগজীবন রাম তাতে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন না। মেনে নিলেন দলের সিদ্ধান্ত। গুলজারিলাল চেয়ার ছেড়ে দিলেন বিনা বাক্যব্যয়ে। পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের প্রত্যাশা ব্যর্থ করে ভারতে টিকে গেল গণতন্ত্র।

দিন দশেক বাদে অতীন হাজরা মোড়ের সেই শালকরের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলো, সেই দোকানের মালপত্র টেনে বার করা হচ্ছে রাস্তায়। পাকা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধটি একটি লরিতে সেই সব মালপত্র তোলার তদারকি করছেন। আজও তাঁর মুখোনি বিষণ্ণ। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি চোখ মুছছেন মাঝে মাঝে।

অতীন সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। টুকরো টুকরো কথাবার্তা শুনে সে বুঝতে পারলো, সেদিন ঐ বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন তা একেবারে অমূলক নয়।

এর মধ্যেই কারা নাকি দু'বার তাঁকে ভয় দেখিয়ে গেছে, এ পাড়ায় কোনো মুসলমানের ব্যবসা করা চলবে না। তিনি তাই দোকান বিক্রি করে ইস্ট পাকিস্তানে চলে যাচ্ছেন।

দু'চারজন তোক বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বলছে, মিঞা, তুমি ঐ কয়েকটা গুণ্ডা বদমাসের কথা শুনে ভয় পেলে? আমরা তো আছি। থানায় একটা খবর দিয়ে রাখো। ওরা কিছু করতে পারবে না। দু'পুরুষের ব্যবসা ছেড়ে চলে যাবে?

বৃদ্ধটি চোখ মুছে বললেন, দুই পুরুষের দোকান ছাড়ি চলি যেতে কী কষ্ট হয় না? কষ্ট তো হবেই, সাধ করে কি আর চক্ষের পানি ফেলছি রে দাদা! তবু যেতেই হবে। এখন ভালয় ভালয় যাতে যেতে পারি, সেই দোয়া করুন।

২০ ভিত নেই তবু বাসস্থান গড়ে উঠেছে

ভিত নেই তবু বাসস্থান গড়ে উঠেছে, মাথার ওপর চাল যখন তখন ঝড়ে উড়ে যায়, তাহলেও এরই মধ্যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই চলে। খিদের কান্না, মৃত্যুশোকের কান্না, স্মৃতির কান্নার মধ্যেও মাঝে মাঝে শোনা যায় উলুধ্বনি। রঙ্গ কৌতুক, দু'একটা যাত্রা পালার সংলাপ।

কয়েকদিন আগে দণ্ডকারণ্যের কুরুদ শিবিরে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে উদ্বাস্তুদের সব কটা চালাঘর ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। উদ্বাস্তুরা আবার উদ্বাস্তু। এখানকার হাজার সাতেক মানুষের সংসার এখন খোলা আকাশের নিচে। এখনো কোনো রিলিফ এসে পৌঁছোয়নি, দিল্লিতে খবর পৌঁছেচে কি না সন্দেহ। যে তিনজন অফিসার এই শিবিরের দায়িত্বে, তাদের মধ্যে একজন ছুটিতে ছিল, আর দু'জন উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভের ভয়ে পালিয়েছে।

হারীত মণ্ডল তার মেয়ে গীতার বিয়ে দিয়েছে মাত্র গত মাসে। পাত্র এই কুরুদ শিবিরেরই। নানান ক্যাম্পে ক্যাম্পে পাত্র আর পাত্রী একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে, এখন আর পাঁচ জনের পরামর্শে ওদের হাতে হাত মিলিয়ে দেওয়া হলো। বিয়ের নিয়ম কানুনও মানা হয়েছিল মোটামুটি, একজন পুরুত আছে এখানে, হারীত মণ্ডল তার পুতুল বেচা টাকায় দু'খানা নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছে মেয়েকে, জামাই মাধবের জন্য ধুতি। সেদিন পঁচিশ-তিরিশটা পরিবারের বরাদ্দ চাল নিয়ে রান্না হয়েছে এক সঙ্গে, সবাই একসঙ্গে বসে খেয়েছে, সুতরাং সেটাকে বিবাহের প্রীতিভোজ বলা যেতে পারে। ফুলশয্যাতেও ত্রুটি রাখা হয়নি। আট দিনের দিন দ্বিরাগমন, সেই দিন গীতা পাকাঁপাকি চলে যাবে মাধবের বাড়িতে, সেই দুপুরেই ঝড় উঠলো। গীতার বাপের বাড়ি, স্বামীর বাড়ি কিছুই রইলো না।

তিন দিন কেটে যাবার পরেও পলাতক অফিসারদের কোনো পাত্তা নেই বলে আজ সকালে ক্যাম্প অফিস লুট করে চাল-ডাল যা পাওয়া গেছে তা ভাগ করে নিয়েছে সবাই।

একদল লোক ঘিরে ধরেছে হারীত মণ্ডলকে। সে এখন আর নেতা হতে না চাইলেও সবাই তাকেই নেতা মনে করে। সবাই জানতে চায়, অফিসাররা যদি আর ফিরে না আসে, তা হলে তাদের ভাগ্যে কী হবে?

হারীত মণ্ডলের যৌবনের সেই তেজ আর নেই। মাঝখানে তার শরীরটা খুবই ভেঙে গিয়েছিল, এখন সামলে উঠেছে অনেকটা। তার স্ত্রীও প্রায়ই অসুস্থ থাকে ইদানীং, তার পালিতা কন্যা গোলাপীই এখন তার সংসার দেখে।

এত দুর্যোগ-দুর্দিনের মধ্যেও অবশ্য সে তার কৌতুক বোধ হারায়নি। ঝড়ে যে ঘর-বাড়ির চালা উড়ে গেছে, তাতে সে খুব একটা বিচলিত নয়। ঝড় থামবার পর সে অন্যদের বলেছিল, আরে, এ তো এক প্রকার ভালোই হলো! এবারে নতুন বাড়ি হবে। পুরোনো না ভাঙলে নতুন পাবি কী করে? সরকার বাহাদুর এই ক্যাম্পের বাড়িগুলান পকা নড়বড়ে করে বানায়েছিল, তার কারণ হইলো, এ গুলান তো অস্থায়ী। আমরা তো আর চিরকাল ক্যাম্পে থাকবো না, এরপর পাকা বাড়িতে যাবো! তোরা শুনিসনি, শিগগিরই আমাগো

উদ্বাস্তু নাম ঘুচে যাবে। এই দ্যাশের আর পাঁচটা রামা-শ্যামা-যদু-মধুর মতন আমরাও হবো সাধারণ মানুষ!

হারীত মণ্ডলের এই ধরনের রসিকতা কারুরই পছন্দ হয় না। সকলেই নিদারুণ নৈরাশ্যে ভুগছে। যতই ছোট, নড়বড়ে, নোংরা চালাঘর হোক, তবু তো একটা মাথা গুজবার নিজস্ব আস্তানায় এই কয়েক বছর তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, এখন আবার সেটাও গেল!

হারীত মণ্ডল সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করে, আরে শোন, সব কিছুরই একটা ভালো দিক আছে। এই কুরুদ ক্যাম্পের কথা সরকার তো ভুইলেই গিয়েছিল, অখাইদ্য চাউল দিত, আমরা নালিশ করলে কেউ শোনতো? এই ঝড়ে সরকারের টনক নড়াবে। খবরের কাগজের মাইনেষেরা আসবে, আমাগো ফটো ছাপাবে, আবার একটা কিছু হবে।

এ কথাতেও কেউ ভরসা পায় না।

অনেকে হারীতকে বললো, চলো কাকা, আমরা পশ্চিম বাংলায় ফিরা যাই। যদি মরতেই হয় সেখানে গিয়ে মরুম। তুমি আমাগো রাস্তা দেখাও!

হারীত মণ্ডল মাথা নাড়ে। এ প্রস্তাব তার কাছে হঠকারিতার সমান মনে হয়। ঝড়ের কয়েকদিন আগেই এই ক্যাম্পের এক অফিসার তাকে বলেছিল, পশ্চিম বাংলায় নতুন করে লাখ। লাখ উদ্বাস্তু ঢুকছে, সেখানে এখন দুর্ভিক্ষের মতন অবস্থা, চাল একেবারেই পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় দণ্ডকারণ্য থেকে আবার রিফিউজিরা ফিরে গেলে তাদের কেউ ঠাঁই দেবে না। খেতে দেবে কে? এখানে তবু ভারত সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, আজ হোক কাল হোক, অফিসাররা ফিরে আসবেই। জোড়াতালি দিয়ে বাসস্থানের একটা কিছু হবেই। পশ্চিম বাংলায় ফিরে গেলে দুর দুর করে আবার তাড়াবে।

হারীত মণ্ডলকে ঘিরে সবাই চেঁচামেচি, তর্কাতর্কি করছে। এই সময় দূরে শোনা গেল একটা ঢোলের আওয়াজ। সবাই কথা থামিয়ে সন্ত্রস্ত। উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। এই ক্যাম্পে বসতি নেবার পর প্রথম দিকে প্রায়ই জঙ্গলের আদিবাসীরা হানা দিত রাত্তিরের দিকে।

এখানে আসবার আগে অনেকে রটিয়েছিল যে দণ্ডকারণ্যে নাকি রাক্ষসদের বাস। এসে দেখা গেল, রাক্ষস নেই বটে, কিন্তু মারাত্মক তীর-ধনুক ও টাঙ্গি নিয়ে এক জাতীয় কালো কালো অরণ্যবাসী মানুষ ঘুরে বেড়ায়। তারা এমনিতে সরল ও নিরীহ, কিন্তু বহুকাল ধরে এই জঙ্গলে তারা ফল মূল কাঠ-পাতার অধিকার ভোগ করে আসছে। হঠাৎ বাইরে থেকে হাজার হাজার মানুষ সেখানে উড়ে এসে জুড়ে বসলে তারা সহ্য করবে কেন? আদিবাসীদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংঘর্ষ হয়েছে একাধিকবার।

এখন কলোনিটি অরক্ষিত ও ছিন্নভিন্ন অবস্থায় আছে, এই খবর পেয়েই কি আদিবাসীরা আবার আক্রমণ করতে আসছে। সবাই লাঠি-সোঁটা কুড়ুল যা পেল তাই নিয়ে তৈরি হলো।

ঢোল বাজনা ক্রমশ এগিয়ে এলো কাছে। দেখা গেল, একজন লোক ঢোল বাজাচ্ছে, অন্য একজন তার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে চিৎকার করে কিছু বলছে। জঙ্গলের গাছপালাকে কী শোনাচ্ছে ওরা? এ তো গান নয়, কোনো সওদা বিক্রির ব্যবস্থাও নয়, কারণ ওদের সঙ্গে কিছু নেই।

সবাই ছুটে গিয়ে ঐ দু'জনকে ঘিরে ধরলো।

ঢোল বাদকটি এবারে দর্শক ও শ্রোতা পেয়ে প্রবল উৎসাহে খানিকটা বাজিয়ে থেমে গেল। হঠাৎ। তার সঙ্গের লোকটি হাতের ছোট লাঠিটি তুলে রাজকীয় ঘোষণার ভঙ্গিতে বললো, ভাইয়ো আউর বহেনো, অপলোগ সব শুনিয়ে, ভারতকা পরধান মন্ত্রীজী, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকো স্বরগ প্রাপ্তি হো গ্যয়া! ভারতকা পরধান মন্ত্রীজী পণ্ডিত জবারলাল...

এক মুহূর্তে সমস্ত গোলমাল থেমে গেল। খবরটা হৃদয়ঙ্গম করতে সময় লাগলো খানিকটা। তারপর হারীত মণ্ডলের জামাই মাধব চেঁচিয়ে উঠলো, বেশ হয়েছে, আপদ গেছে?

অনেকেই গলা মেলালো তার সঙ্গে। আবার শুরু হয়ে গেল কলরব। দু'একজন নাচতে শুরু করে দিল।

এত কষ্ট ও হতাশার মধ্যেও একজন মানুষের মৃত্যু সংবাদ তাদের মধ্যে খানিকটা আনন্দ এনে দেয়। তারা ঢোল বাদক ও ঘোষককে চেপে ধরে জানতে চাইলো আরও তথ্য। লোকটাকে কেউ গান্ধীর মতন গুলি করে মেরেছে? কষ্ট পেয়ে মরেছে? মৃত্যুকালে তার ঠোঁটে জল দেবার মতন কেউ ছিল পাশে!

ঘোষক অতশত জানে না। ঘটনাটি দশ দিন আগেকার। সরকারি নির্দেশে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে রাজা বদলের খবর জানাতে হয়। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বদল। নেহরুর মৃত্যু হয়েছে, এখন লালবাহাদুর শাস্ত্রী গদীতে বসেছে!

সমস্ত বিশ্বের চোখে এক বরেণ্য নেতা, বিশ্ব শান্তির প্রবক্তা, স্বাধীন ভারতের একটানা সতেরো বৎসর ব্যাপী প্রধানমন্ত্রী, দেশের জন্য খাটতে খাটতে যিনি দেহান্ত করলেন, সেই জওহরলাল নেহরু এই বাস্তুচ্যুত, দেশচ্যুত, ভাগ্যতাড়িত মানুষগুলির কাছে একটুও জনপ্রিয় নন। জিন্না সাহেবের মতন নেহরুকেও এরা তাদের সমস্ত দুর্দশার জন্য দায়ী মনে করে।

খবর শুনে হারীত মণ্ডলের মুখটাও কুঁচকে গেল একবার। সে জনতার মধ্য থেকে সরে গিয়ে একটা ভগ্ন্যুপের ওপরে গিয়ে বসলো। তারপর তার পালিতা মেয়েকে ডেকে বললো, গোলাপী মা, একটু তামুক সেজে দিবি!

এই ক্যাম্প থেকে মাইল পনেরো দূরে একটা হাট বসে মাসে একবার। এখানকার কাঠ ভালো, হারীত মণ্ডল নানা রকম পুতুল বানিয়ে সেই হাটে বিক্রি করে। তার তৈরি কয়েকটি পুতুল নাকি বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে দেবতা জ্ঞানে পুজো পাচ্ছে। পুতুল বিক্রির টাকায় আর যাই কেনা হোক বা না হোক, কিছুটা তামাক হারীতের কেনা চাই। এটাই তার একমাত্র বিলাসিতা। বিড়ি ছেড়ে সে এখন হুঁকো ধরেছে।

দু'জন বয়স্ক লোক, পীতাম্বর আর হরেন, খানিকটা তামাকের ভাগ পাবার লোভে আর হারীতের মতামত জানার কৌতূহলেও হারীতের পাশে এসে বসলো। হারীত এদের তুলনায় বেশি খবর রাখে। সে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির কথা জানে। সে একথাও জানে যে পাঞ্জাবের রিফিউজিরা এরকম জঙ্গলের মধ্যে থাকে না, তাদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গরু-ছাগলের মতন তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না। বস্তুত তারা আর রিফিউজি নয়, তারা এখন ভারতের নাগরিক। কিন্তু বাঙালী উদ্বাস্তুদের প্রতি নেহরু কোনোদিন সদয় ছিলেন না। তিনি পূর্ব বাংলার হিন্দুদের দেশ ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন বারবার, যারা সে দেশ ছেড়ে আসছে, তাদের তিনি বলেছেন কাপুরুষ। অথচ পূর্ব বাংলার কংগ্রেস নেতারাই দেশ ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে এসেছেন সবার আগে। ওদিককার সবচেয়ে নামকরা হিন্দু নেতা কিরণশঙ্কর রায়কে বিধান রায় ডেকেছিলেন পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী হতে।

নেহরু কি ভেবেছিলেন যে বাংলা বিভাগ একটা অবাস্তব ব্যাপার। সেইজন্য তিনি বাঙালী উদ্বাস্তুদের ভর্ৎসনা করতেন? এদের তিনি এত বৎসর ধরে রিফিউজি আখ্যা দিয়ে রেখেছিলেন এই ভরসায় যে এইসব বাস্তুহারারা আবার ফিরে যাবে নিজেদের বাস্তু ভূমিতে? নেহরুর এই দিবাস্বপ্নের খেসারত দিল লক্ষ লক্ষ অসহায় পরিবার।

পীতাম্বর হারীতের হুঁকোর দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, এবার কী হইব, কও তো হারীত। তুমি তো অনেক কিছু জানো!

হারীতের এখনো মৌজ হয়নি, সে হুঁকো না দিয়ে বললো, আমি তত কিছু জানি না। তবে ঐ যে আমি সব সময় কই না, সব ঘটনারই একটা ভালো দিক আছে? নেহরু মারা গ্যালেন, তাতে দিল্লির মহা বিপদ হইতে পারে, কিন্তু আমাগো বোধ হয় কিছু উপকার হবে।

হরেন বললো, কী উপকার হবে?

হারীত বললো আমরা এখন যা আছি, তার থিকা খারাপ তো আর কিছু হইতে পারে না। একটা কিছু বদল হইলেই বোঝবা কিছু ভালো হইলো।

হরেন বা পীতাম্বর এতে সন্তুষ্ট হলো না। এ কেমন যেন ভাসা ভাসা কথা। আজকাল হারীতের ওপর যেন আস্থা হারিয়ে ফেলছে সবাই। সংকটের মুহূর্তে সে কোনো উত্তেজক কথা বলে না।

এ কথা অবশ্য ঠিক যে চরবেতিয়া ক্যাম্প ছেড়ে আসার সময় হারীত মণ্ডল আবার পুলিসের কাছে প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প থেকে তাদের আনা হয়েছিল চরবেতিয়ায়, সেখানেও অব্যবস্থার চূড়ান্ত। দিনের পর দিন এক ফোঁটা কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝেই চাল ফুরিয়ে যায়। হারীতের তখন দাপট ছিল, তার কথায় সবাই উঠতোবসতো, সে বিদ্রোহ জানিয়ে একদিন সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। হারীত ভেবেছিল উড়িষ্যার পুলিস তার সম্পর্কে কিছু জানবে না। কিন্তু পুলিসে পুলিসে কথা চালাচালি হয়, বেঙ্গল পুলিস উড়িষ্যা পুলিসকে জানিয়ে দিয়েছে হারতের চরিত্র বৃত্তান্ত। পুলিস বাহিনী বিদ্রোহীদের ঘিরে ধরে শুধু হারীতকে আলাদা করে বেছে নিয়ে যায়। বেদম মার ও প্রাণনাশের হুমকির পর সে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয় যে সে তার দলবল নিয়ে দণ্ডকারণ্যের দিকে চলে যাবে।

মার খেয়ে খেয়েই লোকটার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। সে এখনও হাসি-ঠাট্টা করে বটে, কিন্তু উগ্র সরকারবিরোধী কথা তার মুখে একবারও শোনা যায় না।

একটু বাদে হারীত তার কোটা ওদের দিয়ে দিল, কিন্তু আলাপ-আলোচনা জমলো না। আবার একটা হৈ হৈ শোনা গেল।

ঢোল বাদক ও ঘোষককে রিফিউজির ছেলে-ছোঁকরারা ছেড়ে দেয়নি। হঠাৎ তারা উত্তেজিত হয়ে ঢোলটা আছড়ে ভেঙে ফেললো এবং লোকদুটিকে চড় চাপড় মারতে শুরু করে দিল। লোক দুটির একমাত্র দোষ, অতি নিম্নপদের হলেও তারা সরকারি কর্মচারি। রিফিউজিদের চোখে ওরাই অদৃশ্য সরকারের একমাত্র প্রতিভূ, তাই ওদের ওপর বর্ষিত

হলো পুঞ্জীভূত রাগ। হারীতের হস্তক্ষেপে লোকদুটো প্রাণে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু ছেলে-ছোঁকরারা শাসিয়ে দিল, যা ব্যাটারা, তোরা বাবুদের গিয়ে বল, আমরা কী অবস্থায় আছি। কাইলকের মইধ্যে যেন র‍্যাশোন আসে, আর যদি না আসে, তবে তোগো এই দিকে আর একবার দ্যাখলে ঘেটি ভেঙ্গে দেবো!

কিন্তু তার পরের দুদিনেও কোনো সাহায্য এলো না। দুর্দশার একেবারে চরম অবস্থায় পৌঁছোলো এতগুলো মানুষ। দিনের বেলা অসহ্য গরম, রাত্তিরে নানা রকম পোকা মাকড়ের উৎপাত, তার ওপরে আছে সাপ। ক্যাম্প অফিসে আর এক কণা খাদ্য নেই। নেহরু মারা গেছে বলে কি সরকারি কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেছে? সবাই ভুলে গেছে এই ক্যাম্পের কথা? খবরের কাগজওয়ালারাও এলো না? বড় খবর পেলে তারা ছোট খবরের কাছে আসে না।

আর উপায় নেই, এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতেই হবে। ছেলে-ছোঁকরারা জোর করে রাজি করালো হারীতকে। কয়েকজন বললো, তারা জেনেছে যে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী এখন বীরেন মিত্র, নাম শুনে মনে হয় বাঙালী। কটক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোলে তিনি কি কিছু সাহায্য করবেন না?

আবার শুরু হলো পদযাত্রা। সেই পঞ্চাশ সালে শুরু হয়েছিল, আজও ঘরছাড়ারা ঘর পায়নি। সামান্য বাসনপত্র, ভেঁড়া বিছানা বা দু'একটা জামা কাপড়ের পুঁটলি কাঁধে সাত হাজার নারী-পুরুষ-শিশু বৃদ্ধ জঙ্গল ছেড়ে চললো শহরের খোঁজে।

অনিচ্ছুক নেতা হিসেবে হারীতকে যেতে হলো সকলের সামনে সামনে। তার কোলে গোলাপীর পাঁচ বছরের ছেলে নবা। কুপার্স ক্যাম্প থেকে চলে আসার পর অবিবাহিতা পোয়াতী মেয়ে গোলাপীকে নিয়ে অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়েছে হারীতকে। এমনকি তার সঙ্গী সাথীরাও তার নাম জড়িয়ে কুৎসিত কথা বলতেও ছাড়েনি, কিন্তু এই একটা ব্যাপারে কিছুতেই হার স্বীকার করেনি হারীত। গোলাপী তার কেউ নয়, তবু তাকে সে পরিত্যাগ করেনি, গোলাপীর অবৈধ শিশুটিকে সে এখন সকলের কাছে নিজের নাতি

বলে পরিচয় দেয়। গোলাপীকে কেউ বিয়ে করতে রাজি হয়নি, তাতে কিছু যায় আসে না। এই নাতিকে নিয়েই এখন হারীতের অধিকাংশ সময় কাটে।

এই নিয়ে পাঁচবার গৃহত্যাগ করতে হলো হারীতকে। এর মধ্যে একবারও কলকাতার দিকে যায়নি সে। চন্দ্রার ঠিকানায় তার ছেলে সুচরিতের নামে দু'খানা পোস্টকার্ড লিখেছিল, কোনো জবাব আসেনি তার। হারীত তার ঘুমন্ত নাতির পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে মনে মনে বললো, একদিন না একদিন তোকে আমি একখানা নিজস্ব বাড়িতে তুলবোই। সে বাড়ির সামনের জমিতে লঙ্কাগাছ, বেগুন গাছ, জবা ফুলের গাছ থাকবে, ঘরের ছাউনির ওপর বসে শালিক পাখি ডাকবে...।

এই হতভাগ্যদের মিছিল নিয়ে বেশি দূর এগোনো গেল না। রিলিফ নিয়ে সরকারি কর্মচারিরা এতদিন পর এদিকেই আসছিল, গোলমালের আশঙ্কায় তারা সঙ্গে এক গাড়ি পুলিসও এনেছে।

পুলিস দেখেই হারীতের শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। নবাকে চট করে গোলাপীর কোলে দিয়েই সে লাফিয়ে লাফিয়ে বলতে লাগলো, ভাইসকল, পুলিসের সাথে জেদাজেদি করতে যাইও না, তর্ক করো না, বসে পড়ো, সবাই বসে পড়ো, আমি হাত জোড় করতেছি, আমার কথা শোনো, সরকার রিলিফ পাঠায়েছেন...আমাগো ভালোর জইন্যেই...

একদল স্পষ্ট বিদ্রোহ করলো হারীতের বিরুদ্ধে। তারা হারীতকে ধিক্কার দিয়ে দল বেঁধে ছুটে গেল, ঠিক পুলিসের মুখোমুখি নয়, বাঁ দিকের জঙ্গলের মধ্যে, তারা যে কোনো উপায়ে কটক পৌঁছোতে চায়। পুলিস তাদের তাড়া করে গেল, কিন্তু খুব একটা আন্তরিকভাবে নয়, নামকাওয়াস্তে রিফিউজিরা পাঁই পাঁই করে ছুটতেই হুইশল বাজিয়ে পুলিসের দল ফিরে এলো।

হারীতের অনুগতরা প্রধানত বয়স্ক এবং স্ত্রীলোকেরাই বেশি, পথের ওপর বসে পড়েছিল হারীতের কথা মতন। খানিকটা দূরত্ব রেখে পুলিসরা লাইন করে দাঁড়িয়ে রইলো তাদের সামনে। প্রভুভক্ত হনুমানের মত ভঙ্গিতে হাত জোড় করে রইলো হারীত।

তবু একটুবাদেই পুলিসের দিক থেকে চোঙা ফুঁকে ঘোষণা করা হলো, হারীত মণ্ডল কিসকা নাম হ্যায়? হারীত মণ্ডল! সামনে আও! মাথা পর হাত উঠাকে আও?

হারীতের বুক কেঁপে উঠলো। আবার তাকে মারবে। এবার মার খেলে কি সে আর বাঁচবে? তবু তাকে যেতেই হবে। সে একবার তাকালো নবা আর গোলাপীর মুখের দিকে, তারপর অন্যদের বললো, তোমরা চুপচাপ বসে থাকো, আমি কথাবার্তা বলে আসি। ভয়ের কিছু নাই!

লাঠিওয়ালা পুলিস লাইনের পেছন দিকে দুটি স্টেশন ওয়াগন দাঁড়ানো। দু'তিন জন পুলিস অফিসার ও কয়েকজন সিভিলিয়ান অফিসার বসে আছেন সেই দুটি গাড়িতে। একজন সেপাই হারীতের হাত ধরে একজন পুলিস অফিসারের কাছে নিয়ে গেল। তিনি প্রথমে মিষ্টি করে বললেন, তোমার নাম হারীত মণ্ডল? তুমি আবার রিফিউজিদের ক্যাম্প ডেজার্ট করার উস্কানি দিয়েছো?

হারীত বললো, ক্যাম্প কোথায়, স্যার? দ্যাখেন গিয়ে ক্যাম্প নাই! ঝড়ে সব তছনছ করে দিয়েছে!

লোকটি হঠাৎ রেগে গিয়ে বললো, শাট আপ। যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও?

সঙ্গে সঙ্গে হারীত হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বললো, মারবেন না। মারবেন না, স্যার? আপনার পায়ে ধরছি। কোনো দোষ করি নাই। দুই দিন ধরে আমরা কিছুই খেতে পাই নাই, তাই হুজুরদের কাছে দরবার করতে যাইতেছিলাম।

পাশের গাড়ি থেকে একজন সিভিলিয়ান বললেন, মিঃ দাস, আমি এই হারীত মণ্ডলের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

অফিসারটি গাড়ি থেকে নেমে হারীতের কাঁধে হাত দিয়ে একটু দূরের একটা গাছতলায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমার নাম অরুণকুমার দাশগুপ্ত, আমারও দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। হারীতবাবু, আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমা চাচ্ছি!

হারীত হকচকিয়ে গেল। এ আবার কী ধরনের কথা! মিষ্টি কথা শুনলে বেশি ভয় লাগে, মনে হয় পিটুনীর প্রস্তুতি। এ লোকটার পূর্ব বঙ্গে বাড়ি ছিল তো কী হয়েছে! ভদ্দরলোক তো! ভদ্দরলোক রিফিউজিরা এদিককার ভদ্দরলোকদের মধ্যে ঠিক মিশে গেছে!

হারীত হাত জোড় করে বললো, আজ্ঞে?

অফিসারটি আরও মোলায়েম গলায় জিজ্ঞস করলো, এদিকে কী হয়েছিল, বলুন তো? হারীত বললো, আজ্ঞে, এমন কিছু না। নেহরুজী যেদিন মারা গেলেন, সেইদিনই ঝড়ে আর শিল পড়ে আমাগো ঘরবাড়িগুলো ভেঙে গেল। অফিসার দু'জন গেলেন সদরে খবর দিতে, তা নেহরুজীর মৃত্যুতে মনে ব্যথা পেয়ে বোধ হয় ভুলে গেলেন আমাগো কথা। তা তো হতেই পারে, কী বলেন! এতবড় একজন মানুষ চলে গেলেন, সেই তুলনায় আমরা তো মশা মাছি। তবে কি না, তিন দিন ধইরা এক কণা দানাপানি নাই, অবুঝ পোলাপানগুলা কান্নাকাটি করে তাই ভাবলাম।

অফিসারটি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, অপদার্থ, ছি ছি ছি ছি ছি! ঐ অফিসার দু'জনকে আমি ফিরেই সাসপেণ্ড করার অর্ডার দেবো! জানেন, হারীতবাবু, এই দণ্ডাকারণ্য প্রজেক্টে এখনো কোনো কো-অর্ডিনেশান নেই। কেউ কারুর কথা শোনে না। লোকাল অথরিটির সঙ্গে আমাদের এখনও ঠিক মতন আণ্ডারস্টাণ্ডিং হলো না।

–স্যার আমি ইংরাজি বুঝি না।

–আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। জানেন তো, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাঙালী রিফিউজিদের জন্য এখনও সে রকম কিছুই করছে না। আমরা যত টাকা চেয়েছি, যতগুলো প্রজেক্ট, মানে পরিকল্পনা দিয়েছি, কোনোটাই ঠিক মতন পাস হচ্ছে না। আমি বাঙালী হয়ে সব সময় এটা ফিল করি। আমাদের চেয়ারম্যান, মিঃ শৈবাল গুপ্ত তো ডিসগাস্টেড হয়ে রিজাইন করতে চেয়েছেন।

–স্যার, আমার সাথীরা তিনদিন ধরে না খেয়ে অস্থির হয়ে আছে। আমার দেরি হলে তারা ভাববে, আপনেরা বুঝি আমারে গ্রেফতার করেছেন!

–না, না, অফ কোর্স! আমরা চিড়ে মুর্কির বস্তা সঙ্গে এনেছি। এক্ষুনি ডিস্ট্রিবিউট করা। হবে। তবে, হারীতবাবু, কাজের কথা হচ্ছে, এই কুরুদ শিবিরের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এখানকার ঝড়ে পড়ে যাওয়া বাড়িঘর আর নতুন করে তৈরি করা যাবে না। সে টাকার স্যাংকশান নেই। তবে উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার সোনাগড়াতে নতুন ক্যাম্প হয়েছে। আপনাদের যেতে হবে সেখানে।

–আবার আর এক জায়গায়?

–হ্যাঁ, আই প্রমিস, সোনাগড়া আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। সেখানে কাজের সুযোগ আছে। আপনারা চাষবাস করতে পারবেন। বাঙালী রিফিউজিরা অলস, অকর্মণ্য, এই দুনামটাও তো ঘোচানো দরকার। আপনি আপত্তি করবেন না। আপনার লোকদের বোঝান!

হারীত অফিসারটির চোখে চোখ ফেলে হাসলো। তারপর বললো, সোনাগড়া! নামটি সুন্দর। সেখানে গ্যালে আমরা সোনার ভবিষ্যৎ গড়তে পারবো, কী বলেন?

–নিশ্চয়ই! আই মীন, আই হোপ সো!

তিন দিন পরে সোনাগড়ার পথে এই হা-ঘরের দলটির আবার যাত্রা শুরু হলো। যাত্রা পথেই দুটি নিদারুণ খবর এসে পৌঁছোলো। সোনাগড়ায় নাকি সাঙ্ঘাতিক জলকষ্ট, সেখান থেকে ইতিমধ্যেই একদল উদ্বাস্তু পালিয়েছে অন্ধ্রের দিকে। আর হারীতদের দল থেকে যে অংশটি কয়েকদিন আগে কটকের দিকে পালিয়েছিল, তারাও কটক পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেনি, মাঝপথে বীরেন মিত্রর পুলিস বাহিনী তাদের ওপর গুলি চালিয়েছে। নিহত হয়েছে পাঁচজন, চোদ্দজন গুরুতর আহত, বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে কোথায় গেছে কে জানে!

ঐ দলটিতে গেছে হারীতের মেয়ে-জামাই। তাদের জন্য উদ্বিগ্ন হবার আগেই হারীত ভাবলো, সে নিজে যদি ঐ দলটিতে থাকতো, তা হলে পুলিসের প্রথম গুলিটি নিশ্চিত আসতো তার বুক লক্ষ্য করে।

আশ্চর্য, এরকম চিন্তা করার পরই হারীত তার পাঁচ বছরের নাতি নবাকে বুকে তুলে নিয়ে। বেশ জোরে জোরেই পাগলাটে গলায় বললো, তোকে আমি একটা নিজস্ব বাড়ি দেবো। একদিন ঠিকই দেবো। তোমরা সবাই দেখে নিও!

অন্যরা অবাক হয়ে তাকাতে হারীত আরও গলা চিরে বললো, তোরা মনে রাখিস, আমরা কিছুতেই খতম হমু না। রক্তবীজের ঝাড় আমরা, আদাড়ে-জঙ্গলে যেখানেই রাখুক আমাগো মাটি কামড়াইয়া থাকুম। এই নবা একদিন না একদিন ভারতের নাগরিক হবেই, ভোট দেবে।

২১ বৃষ্টির ছাঁট আসছে খুব

বৃষ্টির ছাঁট আসছে খুব, তবু সুলেখা জানলা বন্ধ করবে না। জানলার গরাদে সে মুখ চেপে আছে, যেন সে তৃষিতের মতন মুখ-চোখে শুধু বৃষ্টি মাখছে না, শেষবারের মতন দেখে নিচ্ছে বাংলার মাটি। একটু আগে রানীগঞ্জ ছাড়িয়ে গেছে, আর দু এক ঘণ্টার মধ্যেই এই ট্রেন বাংলা ছাড়িয়ে বিহারে ঢুকবে।

ওরা একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপে পেয়েছে, দরজা বন্ধ করে রাখলে আর অন্য কোনো যাত্রীর সঙ্গে সংশ্রব নেই। সুতরাং এর মধ্যে যে-কোনো রকম ছেলেমানুষী করা যেতে পারে। বই থেকে চোখ তুলে ত্রিদিব মাঝে মাঝে সকৌতুকে লক্ষ করছেন সুলেখাকে। সুলেখার এমন ছটফটে ভাব তিনি আগে কখনো দেখেননি। যেন সে এই প্রথম কোনো দূর পাল্লার ট্রেনে চেপেছে, মাঝে মাঝেই সে উচ্ছলা হয়ে উঠছে বালিকার মতন।

একটা সেতুর ওপর দিয়ে যাবার সময় ট্রেনটার গতি মন্থর হয়ে এলো, সুলেখা মুখ ফিরিয়ে বললো, এই দ্যাখো, দ্যাখো, এক ঝাঁক বক কী রকম বসে আছে, কী সুন্দর।

ত্রিদিব হেসে বললেন, মনে হচ্ছে, আমরা আবার হনিমুনে যাচ্ছি!

সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা জানলার কাছ থেকে সরে এসে স্বামীর কণ্ঠলগ্না হয়ে তাঁর বুকে মুখ ঘষতে লাগলো। অনেকদিন এমনভাবে দিনের বেলা সে তার স্বামীর কাছ থেকে আদর চায়নি।

ত্রিদিব সুলেখার প্রগাঢ় চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সুলেখার এই অস্থিরতার কারণ তিনি কিছুটা অনুমান করতে পারেন। সুলেখা নিজের মনের কাছেই অনেক কিছু চাপা দিতে চাইছে।

আসানসোল এসে পড়েছে, এখানে খাবার দেবে। সুলেখার পিঠে মৃদু চাপড় মেরে ত্রিদিব বললেন, এই, ওঠো!

সুলেখা মুখ তুলে বললো, আমার দারুণ ভালো লাগছে, আজকের দিনটাও কী চমৎকার, ঠান্ডা ঠান্ডা!

-দিল্লিতে কিন্তু গরম হবে। ওখানে দেরিতে বৃষ্টি নামে।

-দিল্লিতে আমরা ছাদে শোবো, অনেকেই শোয় শুনেছি, সত্যি?

–হ্যাঁ, গরমকালে অনেকেই শোয়।

–আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে ঘুম আসে? পাশের বাড়ির ছাদ থেকে কি আমাদের ছাদ দেখা যাবে? আমাদের বাড়িটা কী রকম হবে?

–শুনেছি তো বাংলো ধরনের বাড়ি। সঙ্গে বাগান আছে, কিন্তু ছাদ আছে কিনা জানি না!

–আমি দিল্লিতে গিয়ে বাগান করা শিখবো। তুমি আমাকে গার্ডনিং-এর বই কিনে দিও! আমার মায়ের ফুল গাছের শখ ছিল, আমি কোনোদিন গাছটাছ লাগাইনি।

ত্রিদিব আবার হাসলেন, কয়েকদিন ধরে সুলেখার মুখে প্রায় সর্বক্ষণ দিল্লির কথা। দিল্লি যেন একটা ইউটোপিয়া, ওখানে সবরকম সুখ পাওয়া যাবে।

ত্রিদিবের অফিস দিল্লিতে একটা ব্রাঞ্চ খুলছে, ত্রিদিবকে সেখানে ম্যানেজার হবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ত্রিদিব রাজি হননি। কলকাতায় তাঁর নিজস্ব বাড়ি, অনেকদিনের চেনা পরিবেশ, তাছাড়া সুলেখার কলেজের চাকরি আছে। নিজের চাকরি জীবনে বিশেষ উন্নতি করার দিকে ত্রিদিবের আগ্রহ নেই। তিনি নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকার মত মানুষ। নতুন জায়গায় নতুন অফিসের দায়িত্ব নেওয়া মানেই আবার অনেক নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয়, অনেক বেশি ব্যস্ততা।

সুলেখাও প্রথম শুনে উড়িয়ে দিয়েছিল। কলকাতার থিয়েটার, সিনেমা, সঙ্গীতের জলসা, এসব কি পাওয়া যাবে আর কোথাও? তাছাড়া কলেজে পড়াতে তার ভালো লাগে, সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দিল্লিতে শুধু হাউস ওয়াইফ হয়ে থাকতে রাজি নয় সুলেখা।

হঠাৎ এক সকালে সুলেখার মতের আমূল পরিবর্তন হলো। দিল্লি শহরের পঞ্চাশ রকম গুণপনা সে আবিষ্কার করে ফেললো, সে দিল্লিতেই যেতে চায়, কলকাতায় আর একটুও ভালো লাগছে না। ত্রিদিবকে একপ্রকার সে জোর করেই রাজি করিয়েছে।

ত্রিদিব বুঝেছিলেন, কলকাতা থেকে পালাতে চাইছে সুলেখা। রাতুলের কাছ থেকে? রাতুলটা এখনো ছেলেমানুষ, হঠাৎ হঠাৎ যুক্তিহীন আবদার ধরে।

বিপত্নীক রাতুল যে হঠাৎ সুলেখার প্রতি বেশি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে তা ত্রিদিব জানেন। সুলেখার রূপ ও ব্যবহার দেখে পুরুষ মাত্রই মুগ্ধ হয়, এমনকি রিকশাওয়ালারাও তার কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নিতে চায় না। সুলেখার টানে অনেক বন্ধুরা তাঁর বাড়িতে আসেন, একথা ত্রিদিব বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এর মধ্যে খারাপ তো কিছু নেই। সুলেখার রূপ তো শুধু তার শরীরে নয়, তার চরিত্রে, তার ব্যবহারের মাধুর্যে। এই মাধুর্যের ভাগ অনেকেই নিতে পারে।

কিন্তু সুলেখার প্রতি যারা মুগ্ধ হয়, তারা সম্পর্কটাকে সহজ বা প্রকাশ্য রাখতে পারে না, গোপনীয়তার দিকে নিয়ে যেতে চায় কেন, এটাই ত্রিদিব বুঝতে পারেন না। এইসব মানুষদের কি সম্মান জ্ঞান নেই? এরা সুলেখার শরীরটা দেখে, মন বোঝে না?

রাতুলের পাগলামি, দুপুরে দেখা করতে আসা, গভীর রাত্রে টেলিফোন, এসব টের পেয়েও ত্রিদিব একটিও কথা বলেননি, সুলেখার ওপর তাঁর অগাধ ভরসা, সুলেখা যা চাইবে, তাই-ই হবে। এমনকি সুলেখা যদি রাতুলকে ঘনিষ্ঠ প্রশ্রয় দেয়, তাহলেও তিনি ধরে নিতে রাজি আছেন যে রাতুল ওরকম প্রশ্রয় পাবার যোগ্য।

কিন্তু এবারে রাতুলের জন্য সুলেখা কলকাতাই ছেড়ে চলে যেতে চাইলো? এতখানি বিরাগ

তো আগে কখনো ঘটেনি।

হাওড়া স্টেশনে রাতুল, শাজাহান ওদের বিদায় জানাতে এসেছিল। রাতুলের কেমন যেন বিহ্বল অবস্থা। ত্রিদিবরা যে কলকাতার পাট তুলে দিয়ে দিল্লি চলে যাচ্ছেন, এটা সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। সুলেখার চোখে চোখ ফেলে সে প্রশ্ন করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সুযোগ পায়নি। এক একবার মনে হচ্ছিল, সে যেন সুলেখার হাত চেপে ধরে সরাসরি

কিছু জানতে চাইবে, কিন্তু শাজাহান সব সময় ছিল তার পাশেপাশে। শাজাহানও জানে, কিংবা অনেকটাই অনুমান করেছে। শাজাহানও সুলেখার খুব অনুরাগী, সেইজন্য সে রাতুলকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়।

তাঁর স্ত্রীকে কেন্দ্র করে যে অন্য পুরুষদের মনে মনে নানারকম আবেগ-প্রবাহ চলছে তা অনুভব করে ত্রিদিব বেশ কৌতুকই বোধ করছিলেন। অন্য দম্পতিদের জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটে কি না তা কে জানে! মানুষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা কম, তবে উপন্যাসে ঘটে। অধিকাংশ উপন্যাসই তো ত্রিভুজ প্রণয়ের। বিবাহিত নারী-পুরুষদের প্রেম কাহিনী বাংলায় বিশেষ লেখা হয় না, কিন্তু ইওরোপিয় ভাষায় অজস্র। ওদের বিবাহ-বন্ধনটাও যে অনেক শিথিল।

আসানসোলে যখন কুপের দরজা খোলা হয়েছে, সেই সময় একজন দীর্ঘকায় পুরুষ উঁকি মেরে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, ত্রিদিববাবু, ডাব খাবেন?

ত্রিদিব সন্ত্রস্ত বোধ করলেন। হাওড়া স্টেশনে শাজাহান এই লোকটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, শাজাহানের ব্যবসার সঙ্গে এই ব্যক্তিটি কোনো সূত্রে যুক্ত, একই ট্রেনে দিল্লি যাচ্ছে।

লোকটির নামও ভুলে গেছেন ত্রিদিব, কী যেন মজুমদার।

ত্রিদিব বললেন, না, ডাব খাবো না।

লোকটি জোর দিয়ে বললেন, খান না, বেশ ভালো ডাব, শস্তা ... বৌদি, আপনি খাবেন নিশ্চয়ই, এই ডাব, এদিকে এসো–

লোকটি হাঁকডাক করে একটা ছোঁকরা ডাবওয়ালাকে একেবারে ভেতরে নিয়ে এলো। সুলেখার হাতে নিজে ডাব তুলে দিল, ত্রিদিবের দাম দেবার ক্ষীণ প্রস্তাব উড়িয়ে দিল এককথায়। তারপর ডাবওয়ালাকে বিদায় করে নিজে জেঁকে বসলো সেখানে।

একটু বাদেই ত্রিদিব আর সুলেখার জন্য খাবারের ট্রে এলো।

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ মজুমদার, আপনি?

লোকটি বললো, আপনারা খাননা, খান, আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি, সঙ্গে টিফিন আছে।

তৃতীয় ব্যক্তির সামনে, বিশেষত অচেনা কোনো লোকের সামনে খাওয়াটা ত্রিদিবের ঘোরতর অপছন্দ। তা হলে আর কুপে নেবার প্রাইভেসি রইলো কোথায়?

ত্রিদিব হাত গুটিয়ে বসে নিখুঁত ভদ্র গলায় প্রশ্ন করলেন। আপনাকে বুঝি প্রায়ই দিল্লি যাতায়াত করতে হয়, মিঃ মজুমদার।

-হ্যাঁ দাদা। মাসে অন্তত একবার তো বটেই। আমায় নাম ধরে ডাকবেন, আমার নাম বাসুদেব, আমার এক কাকা সত্যব্রত মজুমদার, করপোরেশনের কাউন্সিলার, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?

ত্রিদিব ঐ নাম শোনেননি, হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। করপোরেশনের প্রত্যেক কাউন্সিলারের নাম না জানা যেন তাঁরই অজ্ঞতা।

-আপনারা তো এই প্রথম দিল্লি যাচ্ছেন শুনলুম। কোনো অসুবিধে হলে আমায় বলবেন। বৌদি, বাড়ি সাজাবার জন্য যদি আপনার ফার্নিচার লাগে, আমার কনট প্লেসে ভালো দোকান চেনা আছে, রাষ্ট্রপতি ভবনে সাপ্লাই দেয়...

সুলেখাও খাবারে হাত দেয়নি, সে ত্রিদিবের স্বভাব জানে। সে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলো, আপনি বুঝি ট্রেনের খাবার খান না? ৪৪২

-না বৌদি, আমার ঠিক ডাইজেস্ট হয় না, বড্ড মশলা দেয় তো। আমাকে ঘন ঘন ট্রাভল করতে হয়।

যতই ইঙ্গিত দেওয়া হোক, লোকটি উঠবে না। ভদ্রতার প্রতিদান দেবার মতন মানুষ আজকাল খুঁজে পাওয়া শক্ত।

এর মধ্যে কামরার দরজার কাছে আর একটি লোক উঁকি মেরে বললো, বাসুদেব দা, আপনি এখানে? আপনাকে ওরা সবাই খুঁজছে, তাস খেলার জন্য।

বাসুদেব,সোৎসাহে বললো, আরে সুখেন, এসো, এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

সুখেন নামের লোকটি সুলেখার দিকে একবার তাকিয়েই মন্ত্রমুগ্ধের মতন ভেতরে চলে এলো। এতটুকু ছোট কুপেতে আর দাঁড়াবারও জায়গা নেই। এই স্থান অসঙ্কুলানের একটা সুবিধে পাওয়া গেল, আর একজন তাস খেলোয়াড় এই দু জনকে খুঁজতে এসে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেল না, তাই বাসুদেব ও সুখেনকে সে জোর করে ডেকে নিয়ে গেল।

সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে উঠে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল দরজায়। ত্রিদিব হো হো করে হেসে উঠলেন।

সুলেখা বললো, তুমি হাসছো? খাবারের থালাটা একবারও ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করেনি তোমার?

ত্রিদিব বললেন, একবার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়েছিল বটে। একেই তো এরা ঠাণ্ডা খাবার দেয়, আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

–আর দিল্লি পৌঁছোবার আগে একবারও আমি দরজা খুলবো না। এই লোকটাকে তুমি আমাদের দিল্লির বাড়ির ঠিকানা দিও না, প্লীজ!

–শাজাহানের কাছ থেকেই জেনে যাবে। শাজাহান চিঠি লিখতে বলেছে।

–দিল্লিতে গিয়েও আমরা বাঙালীদের হাত থেকে রেহাই পাবো না?

–অবাঙালীরা এর থেকে বেশি ভদ্র হবে বলছো? আশা করা যাক।

সুলেখা সত্যিই আর কুপের দরজা খোলা রাখলো না দিল্লি পর্যন্ত। স্টেশানে ত্রিদিবের কম্পানির গাড়ি এসেছে, বাসুদেবের দলবল এসে ধরবার আগেই ওরা উঠে পড়লো সেই গাড়িতে।

কম্পানি থেকে ওদের জন্য সুন্দর একটি বাড়ি ভাড়া করে রেখেছে, কালকাজীতে একটি ছিমছাম বাংলো। সামনে-পেছনে অনেকখানি বাগান, ঘেঁষাঘেঁষি করা আর কোনো বাড়ি নেই। ত্রিদিবের কম্পানিটির মালিক আগে ছিল সাহেবরা, এখন একটি মাড়োয়ারি গোষ্ঠী কিনে নিয়েছে কিন্তু সাহেবি কায়দা অক্ষুণ্ন রেখেছে। ম্যানেজারের বাংলোয় বাবুর্চি, দারোয়ান এমনকি মালি পর্যন্ত আছে।

এখানে শুরু হলো সুলেখার অন্যরকম জীবন।

সুলেখা আগে কখনো দিল্লি আসেনি, তাই প্রথম দিকে দ্রষ্টব্য প্রচুর। ত্রিদিব অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো খুবই, কিন্তু শনিবার রবিবার সে অফিসের কাজ বাড়ি পর্যন্ত টেনে আনে না। ঐ দিন ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে খাবারদাবার থাকে, হুমায়ুনস টুম্ব, কুতুব মিনার, লাল কেল্লা, জুম্মা মসজিদ এইসব জায়গায় সারাদিন কাটিয়ে দেয়। প্রত্যেক সপ্তাহান্তেই পিকনিক।

কলকাতার জন্য মন কেমন করে না সুলেখার। দিল্লিতেও ছবির এক্সিবিশন হয়, হলিউডের ফিম কলকাতার চেয়েও আগে দেখা যায়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরও বসে। দিল্লির লোক যখন তখন কারুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় না।

কলকাতার সঙ্গে এখন যোগাযোগ চিঠিপত্রে। সুলেখা চিঠি লেখে, অনেক চিঠি আসে। মমতা আর প্রতাপ দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। প্রতাপ কৌতুক করে লিখেছেন যে আদালত থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝে তিনি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সুলেখার হাতে তৈরি চা খেতেন, এখন আর তিনি কোনো চায়েই স্বাদ পান না।...তালতলার বাড়িতে এখন ত্রিদিবের ছোট

বোনরা এসে আছে, সুতরাং সে বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের কোনো চিন্তা নেই। সুলেখার দু'তিনটি ছাত্রীও খুব কাতর চিঠি পাঠিয়েছে।

রাতুলের চিঠি আসে সপ্তাহে অন্তত তিনখানা। রাতুলের হাতের লেখা চেনে সুলেখা, সে ওর একটা চিঠিও খোলে না, খাম শুদ্ধুই ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

একবার তো ভেবেছিল, দিল্লিতে এসে রাতুলকে সব কথা বুঝিয়ে চিঠি লিখবে। কিন্তু রাতুলকে সে এখন ভয় পায়। রাতুল যেন অন্ধ হয়ে গেছে, সে কোনো যুক্তি বুঝবে না। একজন যদি বারবার না না বলে, তবু আর একজন জোর করে প্রেম, ভালোবাসা চাইতে পারে? না, একে প্রেম বা ভালেবাসা বলে না, রাতুল চায় জোর করে তাকে অধিকার করতে। রাতুলের কথা ভাবলেই এখন সুলেখার ধিক্কার এসে যায় নারী জন্মে।

ত্রিদিবকে এখানে প্রায়ই যেতে হয় টুরে, কানপুর, মীরাট, আগ্রায়। কলকাতার তুলনায় তাকে খাটতে হচ্ছে অনেক বেশি। তার যেটা সবচেয়ে প্রিয় শখ, বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়া, তার জন্য সে সময়ই পায় না এখন। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। সে সব সময় উৎফুল্ল থাকে। সুলেখাকে খুশী দেখলেই তার ভালো লাগে।'

শাজাহান চিঠি লিখবে বলেছিল, কিন্তু চিঠির বদলে মাস দেড়েক বাদে সে নিজেই একদিন এসে উপস্থিত হলো।

তখন রাত সাড়ে আটটা, পরদিন ভোরে তাকে লখনৌ যেতে হবে। সুলেখা আর ত্রিদিব তখন সবে মাত্র ডিনার খেতে বসেছে। এখন তাদের রাত্রির খাবারের নাম ডিনার, কারণ বাবুর্চি প্রতি রাতে ঠিক সাড়ে আটটার সময় এসে বলে, মেমসাব, ডিনার লাগা দিয়া যায়?

শাজাহানকে দেখে তারা খুব খুশী হলো। সে কিছু খেয়ে এসেছে বললেও জোর করে তাকে বসানো হলো ডিনার টেবিলে। তারপর শুরু হলো কলকাতার গল্প।

শাজাহান এক সময় বললো, সুলেখা, তোমরা চলে এসেছো, কলকাতা একেবারে কানা হয়ে গেছে!

সুলেখা হেসে বললো, তাই নাকি। এরকম সুন্দর মিথ্যে কথা শুনতেও ভালো লাগে।

শাজাহান বললো, সত্যি বলছি। এখন সন্ধেবেলাগুলো কোথায় যাবো, ভেবেই পাই না। মাথা গ্রাহামের নাচের টিম এলো, কার সঙ্গে যাবো, কে বুঝবে, এই সব চিন্তা করে আর যাওয়াই হলো না। আনসা লোকের সঙ্গে যাওয়া যায় না। একেলা যেতেই ইচ্ছা করে না।

–আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যান না কেন?

–জানো তো, সে এসব ওয়েস্টার্ন গান বাজনায় কোনো মজা পায় না। বাল-বাচ্চাদের ফেলে যেতেও চায় না কোথাও। যাক, আমি তো বিজনেসের জন্য মাঝে মাঝে দিল্লি আসি, এবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আরো ফ্রিকোয়েন্টলি আসবো।

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গে দিল্লির কী বিজনেস কানেকশান? তোমরা তো চায়ের ব্যবসা করো, চায়ের অকশান হয় লন্ডনে, আর কলকাতা পোর্ট থেকেই বালক চা চলে যায় লন্ডনে। এর মধ্যে দিল্লি আসছে কোথা থেকে?

শাজাহান চোখ টিপে বললো, পাকিস্তান? পাকিস্তান!

এরপর শাজাহান যে কাহিনীটি বললো, সেটি চমকপ্রদ। পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট অঞ্চলে যদিও যথেষ্ট চা হয়, তবু পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন ব্যবসাদার ভারতীয় চা কেনে। সেগুলো তারা কোথায় বিক্রি করে তা কে জানে! করাচীর একটি বিখ্যাত পরিবারের সঙ্গে

দিল্লির ভগত্রাম নামে এক ব্যবসায়ীর কয়েক কোটি টাকার চা ও তামাকের ব্যবসা আছে। ব্যবসাটা ঠিক প্রকাশ্য নয়, তবে নরম সীমান্ত দিয়ে প্রায় দিন দুপুরেই মালপত্র চালান যায়। সে সব ব্যবস্থা আছে।

ত্রিদিব সবিস্ময়ে বললেন, দু'দেশে এখন এত টেনশান চলছে, এর মধ্যেও এক কট্টর ওয়েস্ট পাকিস্তানী ফ্যামিলির সঙ্গে দিল্লির মাড়োয়ারির ব্যবসা?

শাজাহান বললো, আরে ভাই, বিজনেসের ব্যাপারে ধর্ম-টর্ম কিছু না, দেশ-জাতি কিছু না। ভগরাম নিরামিষ খায় আর হররোজ দু'বেলা হনুমানজীর পূজা করে। ওদিকে করাচীর আসফাঁকউল্লা দিনে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে। কিন্তু টাকার কোনো জাত নেই।

ত্রিদিব ভূকুঞ্চিত করে বললো, শাজাহান, তুমি এর সঙ্গে জড়িত। তাই আমি চিন্তা করছি। এর মধ্যে কোনোরকম বে-আইনী শেডি ডিল নেই তো?

শাজাহান তার কাঁধ চাপড়ে বললো, আরে না রে ভাই, আমি চা আর তামাক সাপ্লাই করি। আর আমি মুসলমান বলে ভগরাম মাঝে মাঝে পাকিস্তানের সঙ্গে বিজনেসের সময় আমার নাম ইউজ করে। করাচীতে আমার রিলেটিভস আছে, আমি বছরে একবার যাই কন্ট্রাক্ট পাকা করতে।

কথায় কথায় রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। ত্রিদিব দু'একটা হাই গোপন করলো। সপ্তাহের মাঝখানের দিনগুলো তাদের তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া অভ্যেস হয়ে গেছে। তাছাড়া কাল তাকে ভোর সাড়ে চারটেয় উঠতে হবে। কিন্তু সে তো শাজাহানকে চলে যাবার জন্য ইঙ্গিত করতে পারে না।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলো, আপনি দিল্লিতে এসে কোথায় উঠেছেন? শাজাহান জানালো যে ডিফেন্স কলোনিতে তার এক চাচার বাড়ি আছে। বেশ বড় বাড়ি, প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে, সেই জন্য হোটেলের বদলে সে ওখানেই এসে ওঠে।

-সে জায়গাটা কত দূরে?

শাজাহান বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অনেক দূর এবার যেতে হবে, তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে এত ভালো লাগছিল যে সময়ের কথা মনেই ছিল না।

ত্রিদিব ব্যস্ত হয়ে বললো, বসো, বসো, তুমি যাবে কী করে? তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে?

শাজাহান জানালো যে সে দিল্লিতে এসে ট্যাক্সিতেই ঘোরাফেরা করে। কিন্তু গতকালই এসে সে এক কাহিনী শুনেছে যে এক মাসের মধ্যে রাত দশটার পর তিনজন ট্যাক্সি প্যাসেঞ্জার ছুরিতে খতম হয়েছে। রাত্রে দিল্লির ট্যাক্সি নিরাপদ নয়। সেইজন্য সে স্কুটারে যেতে চায়। ত্রিদিবের দারোয়ান একটা স্কুটার ডেকে দিতে পারবে না?

ত্রিদিবের অফিসের গাড়ি এখানে থাকে না। সেটা যেন তারই অন্যায়, সে জন্য সে সংকুচিত ভাবে দারোয়ানকে পাঠালো একটা স্কুটার ডেকে আনার জন্য। দারোয়ান কুড়ি মিনিট বাদে ফিরে এসে বললো, এ পাড়ায় এতরাতে স্কুটার পাবার কোনো আশা নেই।

আবার দাঁড়িয়ে পড়ে শাজাহান বললো, তবে তো ভারি মুশকিল হলো। তবে কি টেলিফোনে একটা ট্যাক্সিই ডাকবে?

ত্রিদিব আর সুলেখা চোখাচোখি করলো। ত্রিদিবের দৃষ্টিতে মিনতি।

সুলেখা বললো, তা হলে আপনি রাত্তিরটা এখানেই থেকে যান না। আমাদের একটা গেস্ট রুম আছে।

শাজাহান যেন এই প্রস্তাবের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে আগ্রহের সঙ্গে বললো, তা হলে তো খুবই ভালো হয়। আরও অনেকক্ষণ তোমাদের সঙ্গে গল্প করা যাবে!

ত্রিদিব আর সুলেখা আবার চোখাচোখি করলো।

২২ আদালতে প্রতাপ

আদালতে প্রতাপ একটি সম্পত্তি ঘটিত বিবাদের সওয়াল শুনছিলেন। মামলাটি অতি বিরক্তিকর, দুই ভাইয়ের পৈতৃক জমি-জায়গার শরিকানা নিয়ে গণ্ডগোল, মামলা চলছে প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে।

এক এক সময় প্রতাপের মনে হয়, আগেকার কাজীর বিচারই বোধ হয় ভালো ছিল। এই মামলায় প্রথম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বড় ভাইটি ছোট ভাইকে ঠকাচ্ছে। প্রতাপের ইচ্ছে করে, বড় ভাইটির কান ধরে দুই থাপ্পড় মেরে বলতে, এই হারামজাদা, দে, তোর দখল করা সম্পত্তির অর্ধেকটা ছোট ভাইকে দিয়ে দে!

কিন্তু আইনের কূট কচালিতে এই রকম সমাধান তো সম্ভব নয়। বছরের পর বছর মামলা গড়াবে, উকিলদের পকেট ভারি হবে।

মামলা চলার মধ্যে প্রতাপের পেশকার তাঁর হাতে একটা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিল। অতি জরুরি তার বার্তা, পাঠিয়েছেন দেওঘর থেকে ওস্তাদজী। “ইয়োর মাদার ওয়ান্টস টু সী ইউ। কাম শার্প। বিশ্বনাথ।”

প্রতাপ অতীব বিস্মিত হলেন। প্রথম কথা, বাড়িতে না পাঠিয়ে এটা আদালতের ঠিকানায়। পাঠানো হলো কেন? দেওঘরের চিঠিপত্র সব বাড়িতেই আসে। দ্বিতীয় কথা, “ইয়োর মাদার ওয়ান্টস টু সী ইউ” মানে কী? মা খুব অসুস্থ। আগের চিঠিতেও বিশ্বনাথ লিখেছেন যে মা ভালো আছেন। মা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই কথাই তো জানানো উচিত ছিল। মা শুধু দেখা করতে চেয়েছেন বলে কি ততটা গুরুত্ব বোঝায়? তার জন্য আর্জেন্ট টেলিগ্রাম?

গত পুজোয় অবশ্য দেওঘর যাওয়া হয়নি, মা’র সঙ্গে দেখা হয়নি অনেকদিন।

যথারীতি মামলাটির আর একটি তারিখ ফেলে প্রতাপ উঠে গেলেন নিজের চেম্বারে। তাঁর চিত্ত খুব উতলা হয়ে গেছে। মা দেখা করতে চেয়েছেন। প্রায় দেড় বছর মায়ের কাছে যাওয়া হয়নি, এজন্য একটা প্রচণ্ড অনুতাপবোধ তাঁকে দংশন করতে লাগলো।

শরীর খারাপের জন্য প্রতাপ কিছুদিন আগেই ছুটি নিয়েছেন, এখন ছুটি পাওয়ার অসুবিধে আছে। তবু তাঁকে যেতেই হবে।

মাসের ছাব্বিশ তারিখ, হাতে বিশেষ টাকা পয়সা নেই। দেওঘরে যেতে গেলে কিছু কেনাকাটি করতেই হয়, ওস্তাদজী একবার লিখেছিলেন যে বাড়িটা না সারালে কোনদিন কড়িকাঠ খসে পড়বে, তা ছাড়া মায়ের চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু টাকা হাতে রাখা দরকার। এত টাকা এখন কোথায় পাওয়া যাবে?

বিমানবিহারীর কাছ থেকে অনেক অগ্রিম নেওয়া আছে, এখন আর চাওয়া যায় না। যদিও বিমানবিহারী ঘুণাক্ষরে জানতে পারলেই পকেটে খুঁজে দেবেন টাকা।

অন্তত হাজার খানেক টাকা তো দরকারই। কে দেবে? প্রতাপের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স এখন দুশো-আড়াইশোর বেশি নয়। এত বড় সংসারের ব্যয়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, মাইনের টাকাতে কিছুতেই কুলোয় না। উপরি রোজগার বলতে বইয়ের অনুবাদ, কিন্তু এখন তার চাহিদাও কমে গেছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সবরকম শিক্ষা চালু হবে বলে একটা রব উঠেছিল, সেটা কেন যেন ধামা চাপা পড়ে গেল, এখন চতুর্দিকে গজাচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল।

প্রতাপ লাখ লাখ টাকার মামলার নিষ্পত্তি করেন, এখন তিনি নিজেই এক হাজার টাকার চিন্তায় কাতর। খুব সংকটে পড়ে মমতার দু'একখানা গয়না বিক্রি করতে হয়েছে, কিন্তু নিজের মায়ের চিকিৎসার জন্য মমতার কাছে হাত পাততে তাঁর কিছুতেই ইচ্ছে হলো না। এই একটা ব্যাপার আছে, যা মুখে কোনোদিন বলা হয়নি, কিন্তু বাস্তবে কঠিন সত্য। মমতা তাঁর খুবই আপন, তবু প্রতাপ লক্ষ করেছেন, যখন নিজের মা বা দিদি বা দেওঘরের দিদি-ওস্তাদজীর ব্যাপারে কখনো কোনো খরচপত্রের প্রসঙ্গ এসে পড়ে,

তখনই মমতার সঙ্গে সে সব আলোচনা করতে প্রতাপ সঙ্কোচ বোধ করেন। মমতা যেন তখন অন্য দলের লোক হয়ে যান। যদিও মমতা কৃপণ নন মোটেই, ননদ বা শাশুড়ির সঙ্গে তাঁর ঝগড়াও নেই, তবু যেন কিসের একটা বাধা...

প্রতাপ খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তিনি একদা এক সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন, এখনও অর্থ সঙ্কটে পড়লে তাঁর মেজাজ গরম হয়ে যায়। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে হলেও তিনি এক হাজার টাকা হেসে-খেলে যে কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে দান করতে পারতেন। অথচ, আজ তাঁর মাতৃদায়, তিনি টাকা জোগাড় করতে পারছেন না।

বেশি দেরি করা যাবে না, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। প্রতাপ শুনেছেন, এই এ আদালতেই অনেকে টাকা ধার দেয়। বিপন্নদের ঋণ দিয়ে চড়া হারে সুদ নেয়। প্রতাপের অধস্তন কর্মচারিরা কেউ কেউ তাঁর তুলনায় অনেক গুণ অবস্থাপন্ন।

তিনি তাঁর পেশকার রতনমণি নাগকে ডেকে পাঠালেন। রতনমণির চিমসে চেহারা, ধুতির ওপর হাফ শার্ট পরে। চোখের দৃষ্টিতে সব সময় একটা ভয় ভয় ভাব। কিন্তু প্রতাপ জানেন, এই মানুষটি অতিশয় ধূর্ত।

প্রতাপ বিনীতভাবে বললেন, নাগবাবু, আমার মায়ের খুব অসুখ, কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে, শুনেছি এখানে কারা যেন টাকা ধার দেয়...

প্রতাপের কথা শুনে রতনমণির চোখ চক চক করে উঠলো। সে বললো, হ্যাঁ, সার, ব্যবস্থা হয়ে যাবে স্যার, আপনার কত টাকা লাগবে, কবে লাগবে বলুন। এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। টাকা ঠিক...-বাড়িতে পৌঁছে যাবে!

প্রতাপ রতনমণির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এই লোকটি কী ইঙ্গিত করছে তা বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধে হলো না। টাকা বাড়িতে পৌঁছে যাবে, এর মানে তো অতি সরল।

প্রতাপ এক মুহূর্ত ভাবলেন, তিনি আর কত ঋণের বোঝা টানবেন? তিনিও এবারে একটুর জন্য রাজি হয়ে গেলে ক্ষতি কী? সারা দেশ জুড়েই তো এই কারবার চলছে। আণ্ডার হ্যাণ্ড মানি, ব্ল্যাক মানি, গ্র্যাস্ট? প্রতাপ কি কোনোদিনই এইসব দমন করতে পারবে? কোনো আশা নেই। ইফ ইউ ক্যানট বীট দেম, জয়েন দেম!

পর মুহূর্তেই প্রতাপ বংশ গরিমায় অহংকারী হয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, টাকাটা আমার আজ, এক্ষুনি দরকার। আটশো থেকে হাজার। যা সুদ লাগে আমি দেবো। সুদ আর প্রিন্সিপালের খানিকটা অংশ সামনের মাস থেকে আমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।

প্রতাপের কণ্ঠস্বর শুনেই রতনমণি খানিকটা সাবধান হয়ে গিয়ে বললো, আটশো...হাজার...অত টাকা তো স্যার এক্ষুনি জোগাড় করা শক্ত? তবু আমি দেখছি চেষ্টা করে।

-দেখুন। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে জানাবেন। আমার খুবই দরকার। এখানে না পেলে আমাকে অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে হবে।

প্রতাপের শরীরে একটা অস্থিরতা জেগে উঠলো। যেন দেরি হয়ে যাচ্ছে খুব। মায়ের সত্যি কী হয়েছে তার কেন একটু ইঙ্গিত দেননি ওস্তাদজী? যদি মায়ের সঙ্গে আর দেখা না হয়! আজ রাত্তিরেই ট্রেন আছে।

দারোয়ানরাও নাকি যখনতখন হাজার দু'হাজার টাকা ধার দিতে পারে। ওরা বাড়ি ভাড়া দেয় না, ছাতু খেয়ে টাকা জমায় আর দেশের বাড়িতে টাকা পাঠায়। রতনমণি যদি টাকা জোগাড় করতে না পারে, প্রতাপ দারোয়ানদের কাছে চাইবেন? নিজের মুখে বলবেন কী করে? আদলিকে দিয়ে বলাবেন? তা প্রতাপ মুখ ফুটে বলতে পারবেন না! অহংকার! না খেয়ে শুকিয়ে যদি মরতে হয় কখনো, তবু প্রতাপ এই অহংকার ছাড়তে পারবেন না।

রতনমণি একটু পরে এসে বললো, নশো টাকা জোগাড় করা গেছে, স্যার!

জোগাড় শব্দটির ওপর সে জোর দিল, হয়তো টাকাটা তার নিজেরই।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক আছে, ওতেই হবে। সুদ কত?

-সে কথা এখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনার বিশেষ দরকার বলছেন, এখন কাজ চালিয়ে নিন।

প্রতাপ গম্ভীর ভাবে বললেন, ওভাবে আমি কারুর কাছ থেকে টাকা নিতে পারবো না। আপনি হ্যাণ্ড নোট তৈরি করে আনুন, আমি তাতে সই করে তারপর টাকা নেবো।

টাকাটা হাতে পাবার পর প্রতাপ সত্যিকারের কৃতজ্ঞ বোধ করলেন রতনমণির ওপর। আরকারুর কাছে হাত পাতার গ্লানি তো তাঁকে সহ্য করতে হলো না?

বাড়ি ফিরে খবরটি প্রকাশ করতেই মমতা বললেন, তুমি একা যাবে? না, না, তা হবে না, তোমার নিজেরই শরীর ভালো না।

প্রতাপ মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মমতা লক্ষ করেছেন, ইদানীং প্রতাপের আহারে রুচি নেই, সেটাই তাঁর শরীর খারাপের লক্ষণ। আগে প্রতাপ যাই-ই খেতেন তৃপ্তি করে খেতেন। মুসুরির ডালের বদলে একদিন ভাজা মুগের ডাল হলেই বলতেন, বাঃ। বড় ভালো হয়েছে তো, আর একটু দাও! সেই মানুষ এখন কী রান্না হলো, না হলো তা গ্রাহ্যই করেন না।

কিন্তু কে যাবে সঙ্গে? মমতা যেতে পারেন না, মুন্নির পরীক্ষা আছে সামনের সপ্তাহে। বাবার সঙ্গে বাবলুরই যাওয়া উচিত, কিন্তু কোথায় বাবলু? সে কোনোদিনই আটটার আগে বাড়ি ফেরে না। তার পড়াশুনোর জন্য তাড়া দিয়ে কোন লাভ নেই। সে নিয়মিত সকাল-সন্ধেবেলা কিছুতেই পড়তে বসে না। তার পড়াশুনোর ধরনটাই অন্য রকম। যেদিন তার ইচ্ছে হবে, সে সারা রাত জেগে পড়বে। পরীক্ষার আগেই তার এরকম জেদ চাপে। রেজাল্ট তো খারাপ করে না।

এখন বাবলু কোথায় আছে, তাকে খবর দেবার উপায় নেই। প্রতাপও বাবলুকে সঙ্গে নিতে চান না। প্রতাপ কবে ফিরতে পারবেন ঠিক নেই, কলকাতার বাড়িতে বাবলুর থাকা দরকার। বাড়িওয়ালাদের অত্যাচার ইদানীং খুব বেড়েছে। বাড়িতে একজনও পুরুষ মানুষ না থাকলে ওরা আরও পেয়ে বসবে।

সুপ্রীতি বললেন, আমি তোর সঙ্গে যাবো, খোকন! মাকে আমি অনেকদিন দেখিনি।

প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। সুপ্রীতি তার মায়ের বড় মেয়ে, প্রথম সন্তান, তাঁকে দেখলে মায়ের ভালো লাগবে। তা ছাড়া, আর যদি কখনো দেখা না হয়?

এর পর সুপ্রীতি একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, তুতুলকেও নিয়ে যাবো?

এত বড় হয়েছে তুতুল, তবু তার সম্পর্কে ভয় পান সুপ্রীতি। মেয়েটা শুধু মেডিক্যাল কলেজে যায় আর ফিরে আসে, এ ছাড়া যেন তার আর কোনো জীবন নেই। আগে গান শুনতে কত ভালোবাসতো, এখন গান শোনে না। নিজে থেকে কারুর সঙ্গে একটা কথাও বলে না। সুপ্রীতির সব সময় আশঙ্কা হয়, বাল্ব ফিউজ হয়ে যাবার মতন, এ মেয়েটা হঠাৎ যদি একদিন মরে যায়?

এ প্রস্তাবও প্রতাপের পছন্দ হলো। ট্রেন ভাড়া বেশি লাগবে, তবু তুতুলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভালো। সে ডাক্তারির অনেকখানি জানে, সে মায়ের চিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারবে। তা ছাড়া প্রতাপ তুতুলের সঙ্গে ভালো করে কথাবার্তা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন কয়েকদিন ধরেই।

তুতুল কিন্তু যেতে রাজি হলো না, তার কলেজ খোলা, সে এখন কী করে বাইরে যাবে? পড়াশুনোই তো তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। একদিনের জন্যও সে কলেজ কামাই করে না।

প্রতাপ তার আপত্তি শুনলেন না। রীতিমতন ধমকের সুরে তিনি বললেন, তোর যদি জ্বর হতো, খুব অসুখ করতো, তা হলেও তুই কলেজে যেতি? কিংবা, আমি যদি কাল হঠাৎ মারা যাই, তাহলেও তুই কাল কলেজে যাবি?

সুপ্রীতিও অনেক করে মেয়েকে বোঝাতে চাইলেন, তুতুল ঘাড় গোজ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো কথার উত্তর দেয় না।

প্রতাপ শেষ আদেশ জারি করলেন, আর কোনো কথা শুনতে চাই না। ওকে যেতেই হবে। আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে, তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নে!

কিছু জিনিসপত্রের কেনাকাটির জন্য প্রতাপ বাড়ি থেকে বেরুতে যাচ্ছেন, সেই সময় সুপ্রীতি একটা একশো টাকার নোট দিতে এলেন তাঁকে।

প্রতাপ বললেন, এটা কী হবে? টাকা আমার কাছে আছে যথেষ্ট।

সুপ্রীতি জোর দিয়ে বললেন, না, খোকন, আমাদের দু'জনের টিকিট, আরও অনেক খরচপত্র আছে, এটা তুই রাখ।

প্রতাপ বললেন, দিদি, এমনভাবে আমাকে বলো না, আমার মনে লাগে। যদি হাত-পা ভেঙে কখনো অথর্ব হয়ে পড়ি, তখন হয়তো আর কিছুই পারবো না। ও টাকাটা তোমার সঙ্গে রাখো, পরে লাগলে দেখা যাবে।

বরানগরের বাড়ি থেকে এক সময় সুপ্রীতি কিছু টাকা পেতে শুরু করেছিলেন, তা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। আর একটি মামলা চাপিয়েছে অন্য কে শরিক। এখন সব মিলিয়ে তিন চারটি বেশ জটিল মামলা, প্রতাপের ধারণা, ঐ মামলা করতে করতেই সব কটি শরিক সর্বস্বান্ত হবে, ঐ বাড়ি থেকে তাঁর দিদির আর কিছু পাওয়ার আশা নেই। সুপ্রীতিও আর মামলার ঝঞ্ঝাটে যেতে চান নি।

প্রতাপ জানেন, দিদির গয়নাও সব শেষ হয়ে গেছে। তবে, তুতুল শিগগিরই ডাক্তারি পাশ করবে, ঐ মেয়েই তো দিদির শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

এরই মধ্যে মমতা বাবলুর জন্য উদ্বেগ বোধ করতে লাগলেন। ছেলেটা কোথায় থাকে, কাদের সঙ্গে মেশে, তাই বা কে জানে! তার বাবা একটা দুঃসংবাদ পেয়ে দেওঘর চলে যাচ্ছেন, ছেলেটা সে কথা জানলোই না। বাবলু তো ওঁদের অন্তত ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে পারতো! আজকাল বাবলু বাড়ির কোনো খবরই রাখে না; শুধু খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক।

প্রতাপ বেরিয়ে যেতে তিনি মুন্নিকে বললেন, একবার দেখে আসবি নাকি, মুন্নি, তোর ছোড়দা অলি বুলিদের বাড়িতে আছে কি না?

মুন্নি এখন একা একা স্কুল যায়। কালীঘাট থেকে ভবানীপুর সে যেতে পারে রাস্তা চিনে, খুব দূর তো নয়।

কিন্তু মুন্নি বললো, ছোড়দা ওখানে বিকেলবেলা থাকে না।

মমতা বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই কী করে জানলি? তোকে একবার দেখে আসতে বলছি, তুই যাবি কিনা বল্!

মুন্নি বললো, মা, তুমি সব সময় আমাকে বকো। আমি বলছি, ছোড়দা বিকেলবেলা ওখানে যায় না। তবু তুমি আমাকে জোর করে পাঠাবে?

-তুই কী করে জানলি, সেই কথাটা আমাকে বল?

-ছোড়দা ওর বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে, আমি শুনেছি। সায়েন্স কলেজ থেকে বেরিয়ে ছোড়দা মানিকতলায় কোথায় যেন যায়। সেখানে অনেকক্ষণ থাকে। ছোড়দা সেখানে কাকে যেন পড়ায়।

–পড়ায়? ওকে যে টিউশানি করতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে?

–সে আমি কী জানি!

মমতার আবার চিন্তা বাড়লো। নিষেধ করা সত্ত্বেও বাবলু গোপনে গোপনে টিউশনি করছে? বাবলু তাঁর কাছে অনেক কিছু লুকোয়?

প্রতাপ অনেক কিছু বাজার করে ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। কোথাও যাবার আগে প্রতাপ শোরগোল করতে ভালোবাসেন। এটা নেওয়া হয়েছে? ওটা নেওয়া হয়েছে? খাবার জলের কুঁজো? মায়ের জন্য জর্দার কৌটো, সুপুরি, আখের গুড়। সুপ্রীতির সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক গোছানো হয়েছে? তুতুলের?

মমতা তাড়াতাড়ি রুটি, তরকারি আর ডিমের ঝোল বানিয়ে দিলেন। প্রতাপরা যখন খেতে বসেছেন, তখন মমতা ভাবছেন, এর মধ্যেও যদি বাবলু ফিরে আসতো! কেন যেন তাঁর মনে। হচ্ছে, যাবার আগে প্রতাপের সঙ্গে বাবলুর একবার দেখা হবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল!

বাবলু এলো না, প্রতাপরা বেরিয়ে পড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটাই যে খুব খালি হয়ে গেল তাই-ই নয়, মমতার বুকটাও খালি হয়ে গেল। এরকম অনুভূতি আগে কখনো হয়নি, প্রতাপ যেন অনেক দূরে চলে গেলেন, আবার কবে ফিরবেন তার ঠিক নেই। সুপ্রীতি আর তুতুলকে নিয়ে প্রতাপ যাচ্ছেন তাঁর মায়ের কাছে, এটা যেন ওঁদের একটা পারিবারিক সম্মিলন, এর মধ্যে মমতার ভূমিকা অতি গৌণ। প্রতাপ যত আগ্রহ করে সুপ্রীতি আর তুতুলকে নিয়ে গেলেন, মমতা আর মুন্নি যেতে চাইলে কি রাজি হতেন? খরচপত্রের কথা তুলতেন না? প্রতাপ নিশ্চয়ই টাকা ধার করে এনেছেন, মমতা তা বুঝেছেন ঠিকই, অথচ প্রতাপ সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি তাঁকে!

মমতা খুব ভালো করেই জানেন, কারুর কাছে টাকা চাইতে, ধারের জন্য তো বটেই, এমন কি নিজের প্রাপ্য টাকা চাইতেও প্রতাপের আত্মাভিমানে লাগে।

মমতার নিজের মা নেই অনেকদিন, শাশুড়িকে তিনি মায়ের মতনই দেখেন। সুহাসিনীর যদি গুরুতর অসুখ হয়ে থাকে, সুপ্রীতির মতন মমতারও কি তাঁকে একবার দেখার ইচ্ছে করতে পারে না! অথচ প্রতাপ একবারও সে কথা বললেন না মমতাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বুঝি কখনো রক্তের সম্পর্ক হয় না?

মমতা রান্নাঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।

অতীন ফিরলো ন'টার পর। প্রত্যেকদিনই সে সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে ফেরে। জামা খুলতে খুলতেই সে চেঁচিয়ে বলে, খাবার দাও! খাবার দাও!

চোখের জল মুছে মমতা ছেলের খাবার বেড়ে দিলেন।

খেতে বসেই অতীন চেঁচিয়ে বললো, আজও রুটি? ও আর পারি না! কম খান আর গম খান! কম খান আর গম খান! হারামজাদারা দেশের লোককে খাবার দিতে পারিস না,আমেরিকান গম খাওয়াচ্ছিস! যত সব জোচ্চোরের দল!

মমতা অতীনের পাশে বসে পড়ে বললেন, বাবলু, তুই ছাত্র পড়াচ্ছিস?

-কে বললো, তোমাকে?

-আমার কথার উত্তর দে!

-যদি বা পড়াই, ছাত্র পড়ানো কি খারাপ কাজ?

-তোর বাবা তোকে বারণ করেছে না? এ বছর তোর ফাইনাল ইয়ার-টাকা রোজগার করতে গিয়ে নিজের রেজাল্ট যদি খারাপ হয়...এত টাকারই বা দরকার কিসের ভোর?

–মা, আমি টাকা নিয়ে ছাত্র পড়াই না আর। আমাদের একটা স্টাডি সার্কল আছে। সেখানে আমাদের চেয়ে যারা বেশি কিছু জানে, তারা আমাদের পড়ায়। আমরা আবার অল্প বয়েসী ছেলে-মেয়েদের কিছু কিছু পড়াই। ধরো, যারা স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ পায় নি, তাদেরও তো কিছু শেখাতে হবে। আমার রেজাল্টের জন্য বাবাকে চিন্তা করতে বারণ করো!

হঠাৎ কথা থামিয়ে অতীন উৎকর্ণভাবে এদিক-ওদিক তাকালো। ভুরু কুঁচকে গেল তার। সে জিজ্ঞেস করলো, বাবা কোথায়, এখনো ফেরেননি?

মমতা কোনো উত্তর দিলেন না।

–বাড়িটা এত চুপচাপ কেন? পিসিমণির ঘর বন্ধ। পিসিমণি, ছোড়দি, এরা সব কোথায় গেছে?

মমতা কোনো উত্তর দিতে পারছেন না, তাঁর গলার কাছে বাষ্প জমে গেছে। তাঁর স্বামী যেন তাঁকে আজ অবহেলা করে চলে গেলেন। আদালত থেকে ফিরে প্রতাপ কি একটিবারও মমতাকে ঘরে ডেকে নিয়ে আলাদা করে কিছু বলেছেন? তিনি কতদিন পর ফিরবেন, কী করে এই ক'দিন সংসার চলবে, সে বিষয়ে কিছুই বলে গেলেন না।

ছেলের ওপরই বা ভরসা করবেন কী করে মমতা। ছেলের বাড়ির প্রতি মন নেই। মমতা তাঁর ছেলেকে আঁকড়ে ধরতে গেলেও সে পিছলে পিছলে বেরিয়ে যায়। মমতা তা হলে কার ওপরে আর ভরসা করবেন?

খাওয়া থামিয়ে অতীন এক দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ যেন সমস্ত বাইরের জগৎ ভুলে গিয়ে সে দেখতে লাগলো শুধু মাকে। তার বুকটা কেঁপে উঠলো একবার।

–মা, কী হয়েছে বলো তো। বাবা কোথায়? পিসিমণিরা কোথায় গেছে? মমতা আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে চোখের জল ঝরাতে ঝরাতে বললেন, তাতে তোর কী আসে যায়? এ বাড়িতে কেউ মরুক, বাঁচুক, তোর কিছুই আসে যায় না।

অতীন সেই মুহূর্তে বালক হয়ে গেল। সে উঠে এসে মায়ের মাথার চুলে গাল ঠেকিয়ে বললো, মা, তোমার কী হয়েছে বলো? আমি তো আছি। আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো। তুমি কাঁদছো কেন, বলো? কী হয়েছে? কী হয়েছে?

২৩ সীট রিজার্ভেশানের সুযোগ

সীট রিজার্ভেশানের কোনো সুযোগ পাওয়া যায়নি, প্রতাপদের উঠতে হয়েছে ভিড়ের কামরায়। কুলিকে বেশি পয়সা দিয়ে কোনোক্রমে একটি মাত্র বসার জায়গা পাওয়া গেছে, সেখানে জোর করে বসানো হয়েছে সুপ্রীতিকে। তুতুলকে নিয়ে প্রতাপ দাঁড়িয়েছেন বাথরুমের দরজার পাশে।

মানুষের ভিড় তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু এই সব কামরার লোকে এত মালপত্র তোলে যে সামান্য একটু নড়াচড়ার জায়গাও পাওয়া যায় না। লাগেজ কেরিয়ারে ভারি মালপত্র বুক করার প্রথা বোধহয় উঠেই গেছে। থার্ড ক্লাস কামরায় এক একজন যাত্রী তিন চারখানা বস্তা, স্টিলের ট্রাঙ্ক নিয়ে ওঠে, বাংকে রাখার জায়গা না থাকলে সীটের তলায় না ঢুকলে সেগুলো যেখানে সেখানে পড়ে থাকে।

ট্রেন চলতে শুরু করার পর আস্তে আস্তে একটু একটু জায়গা হয়ে যায়। যারা করিকমা তারা অন্যদের ঠেলেঠুলে প্রথমে সূচ হয়ে ঢোকে। কেউ কেউ মালপত্রগুলোর ওপরেই বসে। প্রতাপ আর তুতুল সেরকমও কোনো জায়গা পেল না।

সুপ্রীতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মেয়ে আর ভাইয়ের দিকে। একটুও স্বস্তি নেই তাঁর মনে, দাঁড়িয়ে যেতে তাঁর একটুও কষ্ট হবে না, কিন্তু ওদের দু'জনের কেউই রাজি হবে

না তাঁর জায়গায় বসতে। তিনি উঠে দাঁড়ালে অন্য কেউ জায়গাটা দখল করে নেবে। এক একবার সুপ্রীতি ভাবছেন, সেটাই ভালো কি না। তিনজনেই বেশ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যাবেন, তাতে তাঁর মনে শান্তি আসবে অন্তত।

কিন্তু সুপ্রীতি জানেন, তিনি উঠে দাঁড়াতে গেলেই বকুনি খাবেন ভাইয়ের কাছে। এ এক মহা জ্বালা!

রাত্রির ট্রেনের শব্দ বেশি। রাত্রির ট্রেনের দুলুনিও বেশি। রাত্রির ট্রেন ছোটেও কি বেশি জোরে? এটা একটা মেইল ট্রেন। আগেকার দিনে বলতো ডাক গাড়ি। মেইল শব্দটার সেই অর্থ এখন অনেকেরই মনে পড়ে না। মেইল ট্রেন শুনলেই মনে হয় এক দুর্দান্ত প্রকৃতির পুরুষ, দিগন্ত ভেঙে আর এক দিগন্তে যাচ্ছে। পাহাড় ডিঙিয়ে যায় অনায়াসে, গভীর জঙ্গলও এই মেইল ট্রেনকে দেখলে যেন দু'পাশে সরে যায় ভয়ে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রতাপের ঝিমুনি এসে গেল। মা তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন, মা তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন, কী কথা, কী কথা! এই চিন্তাটা সর্বক্ষণ তাঁর মাথার মধ্যে এমন ঘুরছে যে ক্রমশ তাঁকে ক্লান্ত করে দিচ্ছে। মার সঙ্গে শেষ দেখা হবে তো?

তুতুল প্রতাপের বাহু চেপে ধরে বলে উঠলো, মামা!

প্রতাপের চটকা ভেঙে গেল। তিনি ঢুলতে ঢুলতে পড়ে যাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে জোর করে চোখ মেলে তাকালেন। দু'এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে পড়লো না তিনি কোথায় আছেন।

তুতুল বললো, মামা, তুমি আমার কাঁধে মাথা রাখো।

একটা বিস্ময়ের ধাক্কায় মিলিয়ে গেল ঘুমঘোর। অনেক দিন পর তুতুল নিজে থেকে একটা কথা বলেছে। তার মুখে অন্ধকার-অন্ধকার ভাবটা নেই। সে প্রতাপের ভার বহন করতে চায়।

–না রে, আমি এখন ঠিক আছি।

–তোমার মাথাটা এখানে রাখো না!

প্রতাপ নিজের মাথা রাখলেন না। তুতুলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোর বুঝি কষ্ট হচ্ছে না?

বর্ধমানের পরে একজন টিকিট চেকার উঠলো। অল্পবয়েসী, বেশ চটপটে স্বভাবের। ঘুমন্ত মানুষগুলিকে ঠেলে ঠেলে তুলে টিকিট দেখতে চাইছে। এক একজন মানুষের এক এক রকম প্রতিক্রিয়া। প্রতাপ সেদিকে চেয়ে রইলেন, এতক্ষণে তবু খানিকটা একঘেয়েমি কাটলো।

টিকিট চেকারটি ঘুরতে ঘুরতে এলো প্রতাপের সামনে। প্রতাপ আগে থেকেই টিকিট বার করে হাতে রেখেছিলেন, ছেলেটি তুতুলকে দেখতে দেখতে টিকিটগুলোনিল। রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা, ভালো করে খায় না, তবু আগেকার মাধুরীর কিছুটা রেশ তো রয়ে গেছে, অল্পবয়েসী ছেলেদের এখনও চোখ টানবেই।

টিকিটগুলো ফেরত দিতে গিয়ে ছেলেটি প্রতাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল যেন। অবাক ভাবে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বললো, প্রতাপদা না?

প্রতাপ চিনতে পারলেন না। আদালতে কত লোক যায় আসে, কত লোক কথা বলে, সকলের মুখ কি মনে রাখা সম্ভব!

ছেলেটি এরপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো। প্রতাপের পায়ের কাছে একটা বস্তা, সেটার মধ্যে কিছু কঠিন দ্রব্য আছে, মনে হয় লোহা-পাথর নিয়ে যাচ্ছে কেউ। টিকিট চেকারটি নিচু হয়ে, সেই বস্তাটা সরিয়ে প্রতাপের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ফেললো।

প্রতাপ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আরে, আরে, একী একী!

আবার সোজা হয়ে সে বললো, প্রতাপদা, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি সুবীর!

এই নাম শুনেও প্রতাপের কিছু মনে পড়লো না। তিনি এক দৃষ্টিতে ছেলেটির মুখের দিকে। তাকিয়ে পূর্ব-পরিচয়ের কোনো চিহ্ন খুঁজতে লাগলেন।

মালখানগরে আপনাদের বাড়ির কাছেই আমাদের বাড়ি ছিল। বোস বাড়ি। আমার বাবার নাম সুধাকান্ত বসু। আপনার বাবাকে আমরা জ্যাঠামশাই বলতাম। কতবার গেছি আপনাদের বাড়িতে।

–তুমি সুধাকাকার ছেলে?

–আমার ডাক নাম নাড়। আমাদের বাড়িতে বড় রথ ছিল, রথের দিন আপনারা সবাই আসতেন।

ওপাশ থেকে সুপ্রীতি সব শুনছেন। তিনি বলে উঠলেন, নাড়ু! তোমার দিদির নাম ছিল মনিকা।

প্রতাপ হঠাৎ খুব অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছে করলো নাড়ুকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। এ এক অদ্ভুত টান। প্রতাপের সব মনে পড়ে গেছে। বোসেদের বাড়ি অনেকবার গেছেন তিনি। এই নাড়ুরই জ্যাঠতুতো দাদা প্রথম সিগারেট টানতে শিখিয়েছিল প্রতাপকে। ওদের বাড়ির সামনেই বকুল গাছ ছিল দুটো, পাশাপাশি, কাছাকাছি গেলেই গন্ধ পাওয়া যেত... সেই প্রিয়. বাল্যকাল, টুকরো টুকরো স্মৃতি, সব কিছু যেন ফিরে এলো এই ছেলেটির ডাকের মধ্যে দিয়ে।

নাড়ু বললো, আপনি... আপনি এই ভাবে যাচ্ছেন, দাঁড়ান, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কত ব্যাটা বিনা টিকিটে জায়গা দখল করে আছে।

প্রতাপ বললেন, না, না, আমাদের জন্য কিছু করতে হবে না। আমরা ঠিক আছি।

নাড়ু গিয়ে সুপ্রীতিকেও প্রণাম করলো। তুতুলের পরিচয় জানলো। একটু আগে সে তুতুলের দিকে অন্য চোখে তাকাচ্ছিল, এখন তুতুল হয়ে গেল তার বোনের মতন।

তারপর শুরু হলো পুরোনো স্মৃতির বিনিময়। কে কোথায় আছে! নাড়ু বছর তিনেক আগেও একবার ভিসা নিয়ে গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে, সে ওখানকার খবর অনেক বেশি জানে। নাড়ুর এক কাকা অনেকদিন ওখানে ছিল, সে মারা যাবার পর আর কোনো সম্পর্ক নেই। প্রতাপদের বাড়িটাও সে দেখে এসেছে, সেখানে এখন একটা সরকারি অফিস হয়েছে, গোয়ালঘরের জায়গাটা ভেঙে একটা পাকা দোতলা কোঠাবাড়ি উঠেছে...

পরবর্তী স্টেশন আসতেই নাড় বললো, আজ স্পেশাল চেকিং হচ্ছে, সব বিনা টিকিটের যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হবে। প্রতাপদা, আপনার জন্য আমি অন্যায় কিছু করছি না। এবারে জায়গা পাবেন, বসুন।

বিনা টিকিটের যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রতাপ আপত্তি জানাতে পারেন না। কিন্তু এত রাত্রে ঘুমন্ত লোকগুলোকে টেনে টেনে নামানো... সেই জায়গাতেই বসতে হলো প্রতাপ আর তুতুলকে।

নাড়ু যখন বিদায় নেবে তখন আর প্রতাপ আবেগ দমন করতে পারলেন না। তিনি তাকে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন, বড় ভালো লাগলো রে, তোকে দেখে নাড়ু। বড় ভালো লাগলো। ভালো থাকিস, নাড়ু, সুধাকাকাকে বলিস আমাদের কথা।

তারপর বাকি রাত আধো ঘুমে, তন্দ্রায় প্রতাপ যেন ফিরে গেলেন নিজের জন্মস্থানে। বিশ্বনাথের টেলিগ্রামের উত্তর পাঠানো হয়নি, তাই স্টেশনে কেউ নেই। প্রতাপের খুব চায়ের নেশা। ঘোড়াগাড়িতে ওঠার আগে প্রতাপ তাই একটু চা খেয়ে নিলেন। নিজের টাকা থেকে এক বাক্স মিষ্টি কিনলেন সুপ্রীতি।

যেখানে একসময় গেট ছিল, এখন সেখানে গেটের চিহ্নমাত্র নেই। যেখানে বাগান ছিল, এখন সেখানে বাগান নেই। দারোয়ানের সেই ছোট ঘরটিতেও ভাড়াটে বসানো হয়েছে।

ঘোড়ার গাড়ির শব্দ শুনেই আগে বেরিয়ে এলেন শান্তি। লম্বা কাঠির মতন চেহারা, শাড়িটা যেন গায়ের সঙ্গে ঝুলছে। প্রতাপের মনে হলো, আসল ক্ষয় রোগ যেন ধরেছে তার এই দিদিকেই। সুপ্রীতি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, শান্তি, শান্তি, তোর এ কী চেহারা হয়েছে?

শান্তি নিষ্প্রাণ গলায় বললো, বড় দেরি কইরা ফেলাইলা তোমরা। মায়ের শ্বাস ওঠছে সে। গেছে ডাক্তার আনতে।

প্রতাপরা ছুটে গেলেন দোতলায়। যেটা আগে ঠাকুরঘর ছিল, সেটাই এখন সুহাসিনীর শোবার ঘর। নোংরা চিটচিটে বিছানা, পানের পিকদানিতে গত রাত্রের বমি, সেখানে মাছি। উড়ছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন সুহাসিনী, তাঁর বুকে ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে, শান্তির মেয়ে হাত বুলাচ্ছে দিদিমার বুকে।

মায়ের এই অবস্থা দেখেও সুপ্রীতি ভেঙে পড়লেন না। দ্রুত হাতে তিনি শুরু করলেন ঘর পরিষ্কার করতে। তুতুল তার ব্যাগ নিয়ে বসলো শিয়রের কাছে।

একটু পরীক্ষা করে তুতুল মুখ তুলে বললো, মামা, অক্সিজেন সিলিণ্ডার পাওয়া যাবে? তাহলে ভালো হতো।

প্রতাপ তখুনি ছুটলেন। বাড়ি থেকে বেরুবার পরই বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ডাক্তার নয়, বিশ্বনাথ একজন বৃদ্ধ কবিরাজকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছেন। বিশ্বনাথের মুখে এখন দাড়ির জঙ্গল, বাঙালী বলে চেনাই যায় না। কবিরাজটিও প্রবাসী বাঙালী।

কবিরাজ বললেন, অত চিন্তার কিছু নেই। কালই তো আমি দেখে গেছি। শ্লেষ্ম জমেছে, অতিরিক্ত শ্লেষ্ম।

প্রতাপ বললেন, আমার ভাগ্নীকে সঙ্গে এনেছি, সে ডাক্তারি পড়ে। সে বলছে, অক্সিজেন দেওয়া দরকার।

কবিরাজটি মাথা নেড়ে বললেন, প্রয়োজন হবে না, আমি ওষুধ দিলেই কাজ হবে।

বিশ্বনাথ বললেন, আগে একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারকে দেখিয়েছি। তিনি অ্যাডভাইস করেছিলেন হাসপাতালে রিমুভ করতে। তোমাদের মতামত না নিয়ে তা করতে সাহস পাইনি।

প্রতাপ খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, অবস্থা এত খারাপ, আগে জানাননি কেন আমাকে? বিশ্বনাথ উদাসীন ভাবে বললেন, বয়েস হয়েছে, অসুখ-বিসুখ তো লেগেই থাকবে। তোমার কাছে একবার টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম, তুমি পাঠাওনি।

-মায়ের জন্য প্রতি মাসে যা পাঠাবার তা তো নিয়মিতই পাঠাচ্ছি। বাড়তি টাকা দেবার সামর্থ্য আমার নেই। তবু মায়ের চিকিৎসার জন্য যদি টাকা লাগতো... আপনি সেকথা তো লেখেননি, লিখেছিলেন বাড়ি সারাবার কথা!

-পরশু থেকেই হঠাৎ ক্রিটিক্যাল হলো। তোমার কথা বারবার বলছিলেন, তোমাকে কী যেন জানাবার আছে

-অক্সিজেন সিলিণ্ডার কোথায় পাওয়া যাবে? আমি সেটা নিয়ে আসতে চাই।

-সে তো পাওয়া যাবে হাসপাতালে। আমাদের দেবে কেন? এখানে কি আর দোকানে বাজারে ওসব জিনিস পাওয়া যায়?

কবিরাজটি বললো, আগেই এত উতলা হচ্ছেন কেন? আমি গিয়ে দেখি!

সবাই মিলে ওপরে আসার পর তুতুল সুহাসিনীর শিয়র ছেড়ে উঠে এসে বললো, একটা কোরামিন ইঞ্জেকশন দিয়েছি।

কবিরাজ বললেন, বেশ করেছো মা, ভালো করেছে। অধিকন্তু ন দোষায়। আমার ওষুধেই কাজ হবে। অ্যালোপ্যাথি-কবিরাজিতে ঝগড়া নাই। হোমিওপ্যাথি হলে আলাদা কথা ছিল।

আধঘণ্টা দেখে কবিরাজ মশাই দশটি টাকা নিয়ে বিদায় হলেন। সুহাসিনীর তখনও জ্ঞান ফেরেনি। যাবার সময় কবিরাজ মশাই আবার বলে গেলেন, ভয়ের তেমন কারণ নাই। আমি তো বুকে শুধু শ্লেষ্মাই দেখলুম।

প্রতাপ নিজেকে সামলাতে পারছেন না। মা আর চোখ মেলবেন না? মা একটিবারও দেখবেন না? কী কথা বলতে চেয়েছিলেন মা?

কবিরাজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রতাপ বাইরে এসেছিলেন। আবার ফিরতে যেতেই বিশ্বনাথ তাঁর হাত ধরে বললেন, শোনো ব্রাদার, একটা কথা আছে। তোমার মা যদি চলে যান, তাহলে এ বাড়ি কী হবে, তা নিয়ে কিছু ভেবেছো?

প্রতাপ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এখন এই কথা বলতে পারলেন বিশ্বনাথ? বাড়ি মানে কি, সম্পত্তি? প্রতাপ তার ভাগ নিতে আসবেন!

–এ বাড়ি আপনাদেরই থাকবে, ওস্তাদজী।

–তোমার মা কোনো উইল করেননি। আমি আগে অনেকবার বলেছি, উনি বুঝতেন না।

–তাতে কী হয়েছে, আপনারা যেমন আছেন, তেমনই থাকবেন।

–উইলে একটা সই না থাকলে–

–আমি তো বলছি আপনাকে, এ বাড়ি ছোড়দি পাবে!

কাষ্ঠহাসি হেসে বিশ্বনাথ বললেন, তোমার মুখের কথাই তো যথেষ্ট নয়। কাগজপত্রে লেখাপড়া থাকা দরকার। ধরো, তোমার ছেলে যদি কোনোদিন এসে ক্লেইম করে...

বিশ্বনাথের ঐ হাসিটা যেন অগ্নিশলাকার মতন প্রতাপের কানে বিধলো। বিশ্বনাথ এত নিচে নেমে গেছেন! মানুষের এত ডিগ্রেডেশন! এই সেই বিশ্বনাথ গুহ, যিনি গানবাজনার

নেশায় মজে একদিন ঘর-সংসার ছেড়ে ছিলেন, টাকাপয়সার কোনো চিন্তা করেননি কোনোদিন...

প্রতাপ গম্ভীর ভাবে বললেন, ওস্তাদজী, আমি আইন জানি। যদি সে রকম কিছু হয়, এখান থেকে যাবার আগেই আমি আপনাকে সব লিখেটিখে দিয়ে যাবো।

-তোমার মা বোধ হয় এই কথা বলার জন্যই তোমাকে ডেকেছেন।

প্রতাপ আর সে কথায় কর্ণপাত না করে ফিরে গেলেন মায়ের ঘরে। তুতুলকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, কোনো বড় ডাক্তারকে কল দেবো?

তুতুল মাথা তুলে, একটুক্ষণ থেমে থেকে বললো, বোধ হয় তার আর দরকার হবে না।

প্রতাপ এই কথার মর্ম ঠিক ধরতে পারলেন না। তার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। তাহলে মা সত্যি ভালো হয়ে উঠবেন?

সুহাসিনীর চেতনা ফিরে এলো দুপুরের দিকে। তিনি দু'বার ডাকলেন, খুকন! খুকন! প্রতাপ দৌড়ে এসে বিছানার ওপর বসে পড়ে বললেন, মা! মা!

সুহাসিনী পরিষ্কার চোখ মেলে তাকালেন, টলটলে দৃষ্টি। একটা হাত তুলে প্রতাপের মাথার ওপর রাখলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, খুকন, তুই আমার একটা কথা রাখবি?

-হ্যাঁ, মা। বলো, বলো!

-খুকন, তুই আমাকে একবার সেখানে নিয়া যাবি!

প্রতাপ কেঁপে উঠলেন। আর কি কেউ বুঝতে পেরেছে মা কোথায় যেতে চান? মা কেন প্রতাপকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

প্রতাপ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

সুহাসিনী ছেলের চুল আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে সবরকম অনুনয়ের সুরে বলতে লাগলেন, খুকন, একবার আমারে নিয়া চল। এখানে মইরা 'আমি শান্তি পাবো না, সেই তুলসীমঞ্চের নিচে...

ট্রেনে নাড়ুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার পর থেকে মালখানগরের স্মৃতি সর্বক্ষণ প্রতাপের মনে উথাল-পাথাল করছে। প্রতাপ পরিষ্কার দেখতে পেলেন উঠোনের মাঝখানে সেই তুলসী মঞ্চটি, যেখানে তাঁর বাবাকে শোওয়ানো হয়েছিল... সেটা কি আর আছে? নাড় কিছু বলেনি। সেখানে আর কোনোদিন ফিরে যাওয়া যাবে না।

-ও খুকন, লক্ষ্মী সোনা আমার, একবার নিয়া চল।

একদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে তুতুল আর টুনটুনি, বিশ্বনাথ আর শান্তি। প্রতাপ মায়ের হাত ধরে আছে, সেই হাতে কোনো উত্তাপ নেই। নিশ্বাস এত মৃদু যে বক্ষস্পন্দন বোঝা যায় না। সারা শরীরে আর কোথাও জীবন-চিহ্ন নেই, শুধু যেন প্রাণটুকু এখনো থেমে আছে চোখের দৃষ্টিতে আর কণ্ঠস্বরে। সুহাসিনীর শরীরটা এখন বালিকার মত ছোট্ট।

-ও খুকুন। তুই আমার এই কথাটা শুনবি না? আর একবার, তুলসী, তুলসী, তুলসীতলায়...

এ কী মাতৃ-আজ্ঞা, না এক অবুঝ বালিকার আবদার? প্রতাপ যেন নিজেই বালক হয়ে, দেখতে পেলেন তার বহুকাল আগেকার যুবতী মাকে। প্রতাপ যখন যা চেয়েছেন, মা সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন। চাইবার অতিরিক্ত অনেক কিছু। এখন মায়ের এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করার সাধ্য তাঁর নেই।

সারা ঘর নিস্তব্ধ। একটা সাঙ্ঘাতিক অসহায়তায় প্রতাপ অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে ঝরে পড়তে লাগলো জল।

২৪ লোদি গার্ডেনসে ত্রিদিব আর সুলেখা

শনিবার দুপুরে লোদি গার্ডেনসে ত্রিদিব আর সুলেখার নেমন্তন্ন। এক সপ্তাহ আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। ত্রিদিব বেলা দেড়টার সময় অফিস থেকে ফিরেই সুলেখাকে তুলে নেবে, এই রকম কথা আছে, কিন্তু যা আগে কোনোদিন ছিল না এখন ত্রিদিবের সেই রোগ ধরেছে। অফিসের কাজে মত্ত হয়ে সে মাঝে মাঝে বাড়ির কথা ভুলে যায়। পদোন্নতির মূল্য দিতে হচ্ছে তাকে।

সুলেখা সব কিছু গুছিয়ে তৈরি, একটা চল্লিশ বেজে যাওয়ার পর ও ত্রিদিব এলো না দেখে সে একবার ভাবলো বাইরে বেরুবার শাড়ি খুলে ফেলবে কি না। ক্ষীণ অভিমান জমা হয়েছে তার বুকে। কলকাতায় থাকার সময় সে নিজেও কলেজে পড়াতো। অধিকাংশ গৃহিণীদের মতন তাকে বাড়িতে বসে স্বামীর ফেরার প্রতীক্ষায় পল-অনুপল গুণতে হতো না। কিন্তু দিল্লিতে তার সময় কাটতে চায় না কিছুতেই।

এক মিনিট পরেই টেলিফোন বেজে উঠলো।

সেই ঝনঝন শব্দ শুনেই অভিমানটা বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে সেখানে জুড়ে বসলো খানিকটা লজ্জা। ত্রিদিবই টেলিফোন করেছে, সুলেখাও তো আগে টেলিফোনে দেরির কারণ জিজ্ঞেস করতে পারতো নিজে থেকে।

ত্রিদিব বললেন, শোনো, আমি তো এক্ষুনি যেতে পারছি না, আটকে গেছি, কখন যে শেষ হবে-তুমি খেয়ে নাও...

সুলেখা খানিকটা কৌতুকের সুরে বললো, খেয়ে নেবো, কোথায়? না, না, শোনো, শোনো, আমার খাওয়াটা তো এমন কিছু নয়, আমি বাড়িতে খেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু তুমি কোথায় খাবে? ৪৫৬

ত্রিদিব একটু অধীরভাবে বললেন, আমি স্যাণ্ডউইচ আনিয়ে নেবো।

-তা হলে লোদি গার্ডেসের নেমন্তন্নটা আজ ক্যানসেল্ড তো? কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা যেন বেশ কয়েকটি অনুভবের। তারপর ত্রিদিব টেলিফোনে হেসে উঠে বললেন, জানো, জাপান থেকে দু'জন ডেলিগেট এসেছে, তারা একবর্ণও ইংরেজি বোঝে না। অনেক কষ্টে একজন সাউথ ইণ্ডিয়ান ইন্টারপ্রেটার জোগাড় করা হয়েছে। তার ইংরিজি উচ্চারণ আবার এত খারাপ, যে প্রত্যেকটা কথা প্রায় তিনবার করে বলতে হচ্ছে। ফলে সময় লেগে যাচ্ছে তিনগুণ, সেইজন্যই ঐ কথাটা একেবারে ভুলে হজম করে দিয়েছিলুম!

সুলেখা জিজ্ঞেস করলো, তুমি সত্যিই স্যাণ্ডুউচ এনে খাবে তো, না উপোস করে থাকবে! আমি আদালিকে দিয়ে খাবার পাঠাতে পারি।

ত্রিদিব বললেন, যাঃ, ভারত-নিপ্পন বাণিজ্য সম্পর্ক আরও চল্লিশ ঘণ্টা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতে পারে। আমি ঠিক কুড়ি মিনিটের মধ্যে গিয়ে তোমাকে তুলে নিচ্ছি। আমার এরকম ভুল হলো কী করে!

সুলেখা বললো, শোনো, তা বলে তোমাকে কাজ নষ্ট করে... ত্রি

দিব বললেন, ঠিক কুড়ি মিনিটের মধ্যে...তৈরি থেকো, এখন রেখে দিচ্ছি!

কুড়ি মিনিটের বদলে একুশ বা তেইশ হতে পারে, কিন্তু পঁচিশের বেশি না, ঠিক পৌঁছে গেলেন ত্রিদিব। গেটের সামনে গাড়ি থামতেই খানসামা কয়েকটি টিফিন কেরিয়ার তুলে দিল, সুলেখা এসে উঠলো হাতে একটি বড় প্যাকেট নিয়ে।

আবার গাড়ি ছাড়ার পর ত্রিদিব বললেন, আমার খানিকটা দেরি হয়ে যাওয়াটা এমন কিছু অপরাধ নয় জানি, কিন্তু আমার ভুলে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ। ছি ছি, কী যে হচ্ছে আমার আজকাল।

সুলেখা বললো, তুমি তো ঠিক ভুলে যাওনি, তোমার সাব-কনসাস মাইণ্ডে ঠিকই ছিল, নইলে তুমি ফোন করতে না। অন্য দিন বাড়ি ফিরতে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা দেরি হলে তো তুমি ফোন করো না। তোমাকে শনিবারেও এত কাজ করতে হয় কেন?

–জাপানীরা কাজের ব্যাপারে শনিবার রবিবার মানে না। কাজটা ওদের কাছে প্রায় ধর্মীয় গোঁড়ামির মতন, খুঁটিনাটি পর্যন্ত নিখুঁত হওয়া চাই, দেখছি তো কদিন ধরে।

–তোমাকে কাজ নষ্ট করে চলে আসতে হলো না তো?

–আলাপ আলোচনা এখন চলবে কদিন ধরে। ভার্গবকে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে বলে এসেছি, আমি আবার বসবো কাল সকালে।

–আমি তোমাকে জোর করে দিল্লি নিয়ে এলাম, তোমাকে এখানে খাটতে হচ্ছে বেশি!

–দিল্লি আমার চমৎকার লাগছে!

লোদি গার্ডেনসে ওদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই। নেমন্তন্নটা শুধু ওদের দু'জনের এবং পরস্পরের। বিয়ের পর কলকাতায় থাকার সময় ওরা প্রায়ই ছুটির দিন বা শনি-রবিবার দু'জনে চলে যেত কাছাকাছি কোথাও, দিল্লিতে এসে ওরা আবার শুরু করেছে দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমা। এক সপ্তাহ সুলেখা ত্রিদিবকে নেমন্তন্ন করে, অন্য সপ্তাহে ত্রিদিব সুলেখাকে।

দিল্লি শহরটা পুরোনো' হতে সময় লাগে। ছড়ানো শহর, দ্রষ্টব্য অনেক। স্বাধীনতার পর রাজধানীকে নতুন ভাবে সাজানো হচ্ছে, চওড়া হচ্ছে রাস্তাঘাট, তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন উপনগরী। দিল্লির সঙ্গে রোমের অনেকটা তুলনা করা যায়। প্রাচীন ও আধুনিকের

পাশাপাশি সহাবস্থান। কংক্রিটের নতুন রাস্তার পাশেই হাজার খানেক বছরের পুরোনো কোনো সমাধি ভবন।

লোদি গার্ডেনসের মধ্যেও লোদি সম্রাট-বংশের অনেক সমাধি রয়েছে। এই শহরে ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের নিদর্শন এখানে রয়ে গেছে, এটা ত্রিদিবের খুব পছন্দ। ইতিহাস তাঁর শখের বিষয়।

এতখানি ছড়ানো, এমন সুন্দর একটা বাগান, কিন্তু ভিড় বিশেষ নেই। আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে ওরা দু'জন সব কটি সমাধি ভবন ঘুরে ঘুরে দেখলো, ত্রিদিব শোনালেন ইতিহাসের নানারকম চুটকিলা। তারপর এক সময় একটা বড় গাছের ছায়ায় বসে পড়ে বললেন, জানো, এইসব পুরোনো জায়গায় এলেই আমার মনে হয়, দিল্লিতে একটার পর একটা বংশ দাপটের সঙ্গে রাজত্ব চালিয়ে কিছুদিন পর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এখনকার এই কংগ্রেস-বংশই বা কতদিন টিকবে?

সুলেখা বললো, জওহরলাল নেহরু চলে যাবার পরেও তো কংগ্রেস টিকে গেলই মনে হচ্ছে।

ত্রিদিব একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, কী জানি! আমি বাতাসে যেন যুদ্ধের গন্ধ পাচ্ছি!

–আবার যুদ্ধ? কার সঙ্গে? চীনের সঙ্গে?

–হতে পারে। চীন যে জায়গা দখল করেছিল, তা ছাড়ে নি। পাকিস্তানের সঙ্গেও হতে পারে। ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখো, যুদ্ধ ছাড়া কোনো রাজত্ব চলে না। হয় প্রতিবেশীকে আক্রমণ করো, নয় আক্রান্ত হও! শান্তি অতি কঠিন, দুর্লভ ব্যাপার। ক'টা মানুষের জীবনে সত্যিকারের শান্তি আছে বলো! একটা রাষ্ট্রের জীবনে শান্তি তো আরও অসম্ভব।

সুলেখা মুখে বেদনার রেখা ফুটিয়ে বললো, আমার যুদ্ধ-টুদ্ধের কথা ভাবতেই খুব খারাপ লাগে।

ত্রিদিব মৃদু হাস্যে বললেন, যদি সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একটা ভোট নেওয়া যায়, তা হলে দেখা যাবে, অন্তত নব্বই ভাগ মানুষই যুদ্ধ চায় না। তবু যুদ্ধ হয়। পৃথিবীতে সব সময় কোথাও না কোথাও যুদ্ধ চলছে।

–এই ছোট্ট-খাট্টো মানুষ লালবাহাদুর শাস্ত্রী কি কোনো যুদ্ধ চালাতে পারবে? মনে হয় তো শান্ত-শিষ্ট একটি পুরুত ঠাকুর।

–যুদ্ধ কি আর শুধু ওঁর একলার ইচ্ছেতে হচ্ছে! ভারত আর পাকিস্তানের রাজধানী বড্ড কাছাকাছি, সেইজন্য উত্তাপ দিন দিন বাড়ছে। পাকিস্তানের রাজধানী হওয়া উচিত ছিল ঢাকায়, ওদিকে জনসংখ্যা বেশি,ওদের একটা ন্যায্য দাবি আছে। আর ভারতের রাজধানী কোথায় হওয়া উচিত ছিল জানো? আমার মতে, মাদ্রাজে। দিল্লি বহুকাল ধরেই রাজধানী ছিল, কলকাতাও ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল অনেকদিন, স্বাধীন ভারতের রাজধানী হওয়া উচিত ছিল নতুন কোনো জায়গায়, দক্ষিণ ভারতে হওয়াটাই ছিল বেশি স্বাভাবিক। ওদিককার লোকেরা নিজেদের বলে সাউথ ইণ্ডিয়ান, শুধু ইণ্ডিয়ান বলে না।

সুলেখা ওপরের দিকে তাকিয়ে গাছটার দিকে দেখলো। এটা কী গাছ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অনেকটা কৃষ্ণচূড়ার মতন, ডালপালা বিস্তৃত, ছোট ছোট পাতা, কিন্তু কোনো ফুল নেই। আকাশ আজ মেঘলা, তাই ছায়া বেশি এবং ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

বাগানটিতে যত্ন নেই বিশেষ, এখানে ওখানে আগাছার ঝোঁপ। কাছেই একঝাড় টকটকে লাল রঙের কলাবতী ফুল ফুটে আছে। খানিকটা দূরে, আর একটা গাছের তলায় ছায়ায় সতরঞ্চি পেতে বসেছে পুরো একটি পরিবার। কতা-গিন্নি, ছেলে-মেয়ে, জামাই পুত্রবধূ ইত্যাদি নিয়ে দশ-এগারো জন। তারা একটি রেডিও বাজাচ্ছে তারস্বরে। এই ট্রানজিস্টার রেডিও নামে বিদ্যুৎবিহীন বেতার যন্ত্রটি নতুন উঠেছে বাজারে, অনেকে বিদেশ থেকে নিয়ে আসে, এবং যাদের এই যন্ত্রটি আছে, তারা এটা অন্যদের দেখাবার জন্য সর্বত্র সঙ্গে

নিয়ে ঘোরাফেরা করে। এরকম একটা দুপুরবেলা বাড়িতে থাকলে ঐ দশ-এগারোজন লোক কি একসঙ্গে বসে রেডিও শুনতো?

সুলেখা ভাবলো, ঐ যান্ত্রিক আওয়াজ শুনে গাছপালাগুলোর কষ্ট হয় না? ওরা তো আগে এরকম আওয়াজ কখনো শোনেনি!

অফিসের পোশাকেই ত্রিদিব শুয়ে পড়েছেন ঘাসে। মুখে একটা চুরুট।

সুলেখা চমকে উঠে বললো, এই যাঃ, ভুলেই গিয়েছিলুম। তোমার জন্য তো আমি পাজামা-পাঞ্জাবী এনেছি!

সেইরকমই কথা। যেদিন ওদের এরকম বাইরে পিকনিক থাকে, সেদিন সুলেখা একটু বেশি সাজগোজ করে, ত্রিদিবও অফিসের পোশাক ছেড়ে নেয়। আজ সুলেখা পরে এসেছে একটা আকাশী রঙের শাড়ি, ত্রিদিবের জন্য সে লক্ষ্ণৌ-এর কাজ করা নতুন পাঞ্জাবী কিনে এনেছে।

এখানে যে-কোনো ঝোঁপের আড়ালে গিয়ে পোশাক পাল্টে নেওয়া যায়, কিন্তু ত্রিদিবের আলস্য লেগে গেছে। তিনি ওঠবার উদ্যোগ না করে সামনের ঝোঁপের ওপর একটা লম্বাটে ধরনের পাখির দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কী পাখি জানো?

সুলেখা পাখি-টাখি বিশেষ চেনে না, এইরকম লম্বা ল্যাজওয়ালা ইঁট রঙের পাখি সে আগে দেখেনি।

ত্রিদিব বললেন, আমাদের যশোরের বাড়িতে একটা বড় পেয়ারা গাছে এইরকম একটা পাখি এসে বসতো মাঝে মাঝে। তখন আমরা শুনেছিলাম, এর নাম ইষ্টকুটুম পাখি। এখানে নিশ্চয়ই অন্য নাম। আমার ঠাকুমা বলতেন, ইষ্টকুটুম পাখি বাড়ির সামনে এসে ডাকলে, সেদিন বাড়িতে অতিথি আসে।

সুলেখা বললো, তোমার ঠাকুমাকে আমার বেশ লাগতো। একটাও দাঁত ছিল না, কিন্তু বেশ মিষ্টি করে কথা বলতেন।

ত্রিদিব হেসে ঠাকুমার প্রসঙ্গ সরিয়ে দিয়ে বললেন, আজ আমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই অতিথি আসবে, এই পাখিটাকে দেখলাম...

-আজ মাসের কত তারিখ?

-পাঁচ তারিখ, শনিবার...

সুলেখা আর কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল, এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ত্রিদিবের মুখের দিকে।

ত্রিদিব আবার বললেন, আমার সঙ্গে যদি বাজি ধরো, তুমি হেরে যাবে। বিশেষ বিশেষ অতিথি এলে আমার তো ভালোই লাগে। যাক গে, তুমি আজ কী বই এনেছো?

মৃদু সুপবন বইছে, অনেকরকম ফুল আর গাছ পাতা মিলিয়ে একটা আলাদা গন্ধ, মেঘ নেমে আসছে নিচের দিকে। গাছতলায় শুয়ে থাকার মতনই দুপুর। সুলেখা ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললো, ত্রিদিব ইয়েটসের কবিতা পড়ে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু সুলেখার আজ মন বসলো না কবিতায়।

শাজাহান প্রত্যেক মাসেই একবার করে দিল্লিতে আসে। তার ব্যবসার সঙ্গে যে দিল্লির এতটা যোগাযোগ তা আগে জানা ছিল না ত্রিদিবদের। শাজাহান প্রায় নিয়ম করেই মাসের প্রথম সপ্তাহের শনিবার সন্ধের পর এসে হাজির হয় ত্রিদিবদের বাড়িতে। গল্পে গল্পে অনেক রাত হয়, এখন ধরেই নেওয়া হয়েছে সে রাত্তিরটা ওখানেই থেকে যাবে। শাজাহানের ব্যাগে তার রাত-পোশাক থাকে।

মানুষ হিসেবে শাজাহান অতি সজ্জন, বন্ধু হিসেবেও আকর্ষণীয়। কোনো ব্যাপারেই সে বেশি বাড়াবাড়ি করে না। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান হলেও সে ইংরিজি সাহিত্য নিয়ে

যথেষ্ট পড়াশুনো করেছে, সে একজন শেক্সপীয়ার-বিশেষজ্ঞ, ঐ বিষয় নিয়ে ত্রিদিবের সঙ্গে প্রায়ই তার তর্ক জমে। গত মাসেই একদিন তারা মালো ও শেক্সপীয়ারের তুলনামূলক আলোচনায় রাত প্রায় ভোর করে দিয়েছিল।

রাতুলের সঙ্গে শাজাহানের এখানেই তফাৎ, রাতুল সাহিত্যের বিশেষ ধার ধারে না। সে খেলাধুলো ভালোবাসে, ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেটের স্কোর পর্যন্ত তার মুখস্থ থাকে। সে গান গাইতে পারে ভালো, কিন্তু কবিতা-টবিতা তার সহ্য হয় না। কলকাতায় ত্রিদিব আর শাজাহানের শেক্সপীয়ার আলোচনার সময় তাকে নীরবে বসে থাকতে হতো, তাতে সে কিছুটা অবহেলিত বোধ করতো। তার পক্ষে সমগ্র শেক্সপীয়ার পড়ে ফেলা এখন আর সম্ভব নয়, তাই সে কিছু কিছু কোটেশান মুখস্থ করে মাঝে মাঝে যোগ দেবার চেষ্টা করতো ত্রিদিবের আলোচনায়। অপ্রাসঙ্গিকভাবে সেই সব উদ্ধৃতি এক এক সময় অতি হাস্যকর মনে হয়।

যেমন, একদিন সুলেখা চা তৈরি করে দিচ্ছিল ওদের। কাজের লোকটি টি কোজিতে ঢাকা এক পট চা, ফাঁকা কাপ সসার, দুধ-চিনি আলাদা ভাবে এনে দেয়। সুলেখা প্রত্যেকের রুচি মতন কম বা বেশি চিনি মিশিয়ে হাতে হাতে কাপ তুলে দেয়, এটাই তাদের বাড়ির রীতি। সেদিন সন্ধেবেলা সুলেখাদের একটা থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা, তাই সে একটু বেশি সাজগোজ করেছিল, একটা নতুন মারফিউম মেখেছিল।

শাজাহানের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতি প্রখর। সে নিশ্বাস টেনে বলেছিল, ভাবী,আজ জয় মেখেছেন মনে হচ্ছে? চায়ের ফ্লেভার আপনার এই পারফিউমের গন্ধে ঢেকে যাবে।

সুলেখা অবাক ভাবে বলেছিল, কী করে বুঝলেন জয়? বাবা, আপনার তো দারুণ নাক!

শাজাহান মুচকি হেসেছিলেন।

রাতুল সেই আলোচনায় ঢুকে পড়ার জন্য হঠাৎ সুলেখার হাত মুঠোয় ধরে বলে উঠেছিল “অল দা পারফিউমস অফ অ্যারাবিয়া উইলনট সুইটন দিস লিটল হ্যাণ্ড!”

ত্রিদিব আঁতকে উঠেছিলেন প্রায়। অতি ভদ্র তিনি, শুধু ভুরু তুলেছিলেন অনেকখানি, মুখে কিছু বলেননি। শাজাহান কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত থেকে তারপর হেসে উঠেছিল হো হো করে। সুলেখা সরিয়ে নিয়েছিল নিজের হাত।

শুধুমাত্র পারফিউম শব্দটির সূত্র ধরে রাতুল যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছিল, তা যে শুধু অপ্রাসঙ্গিক বা ভুল অর্থেই তা নয়, রীতিমতন অপমানজনক। খুনের ষড়যন্ত্রকারিণী লেডি ম্যাকবেথের রক্তাক্ত হাতের সঙ্গে সুলেখার করতলের তুলনা?

রাতুল নিজের ভুলটা এর পরেও বুঝতে না পেরে শাজাহানের ওপর রেগে উঠে বলেছিল, তুমি হাসলে কেন? তুমি হাসলে কেন?

সুলেখার মায়া হয়েছিল। রাতুল শেক্সপীয়ার পড়েনি, তা বলে তার মুখের ওপর ওরকমভাবে হেসে ওঠা উচিত হয়নি শাজাহানের।

শাজাহান কিন্তু রাতুলের অজ্ঞতা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ বিদ্রূপ করতে ছাড়ে নি সেদিন। ত্রিদিব আর সুলেখা দু জনেই সূক্ষ্মভাবে বাধা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাতুল যে এই আড্ডায় যোগ দেবার যোগ্য নয় তা শাজাহান প্রায়ই বুঝিয়ে দিতে চায়।

শাজাহান আর রাতুলকে এক সঙ্গে দেখলেই শেষের দিকে ভয় ভয় করতো সুলেখার। দু' জনে যেন হঠাৎ হঠাৎ হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কী নিয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা?

সুলেখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

ত্রিদিব জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েটসের কবিতা তোমার ভালো লাগছে–?

সুলেখা বললো, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লো, এবারে উঠতে হবে।

ত্রিদিব বললেন, আর একটু জোরে বৃষ্টি আসুক। তোমাকে আজ একদম অন্যরকম লাগছে, সুলেখা?

-কী রকম?

-যেন তুমি কোনো মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্য হয়েছিলে, হঠাৎ এই মাত্র রক্তমাংসের নারী হয়ে নেমে এলে।

সুলেখা জিনিসপত্র গুছোতে গুছোতে হেসে বললো, ছত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল আমার, বুড়ি হতে আর বাকি নেই, এখনও এইসব কথা!

জোরে বৃষ্টি নামলো, ওদের ফিরতেই হলো গাড়িতে। তখুনি সুলেখা আগামী শনিবারের জন্য ত্রিদিবকে হুমায়ুনস টুম-এ নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলো অগ্রিম।

বাড়ি ফেরার পর সুলেখাকে বেরুতে হলো আবার। সুলেখার পিসিমারা থাকেন দড়িয়াগঞ্জে। তার পিসেমশাই দিল্লিতে চাকরি থেকে অবসর নেবার পর এখানেই বাড়ি কিনে থেকে গেছেন। সুলেখা-ত্রিদিবের সন্ধান পেয়ে তিনি মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করেন। তাঁর মাধ্যমে কিছু কিছু প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হয়েছে, কেউ কেউ নেমন্তন্ন করেন, অমিশুক ত্রিদিব কোথাও যেতে চান না, সুলেখাকেই ভদ্রতা রক্ষা করতে হয়।

আজ সেই পিসেমশাই এসে জানিয়ে গেলেন, তাঁর মেয়ের হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়েছে, পাত্রপক্ষ। আশীবাদ করতে আসবে সন্ধেবেলা, সুলেখা-ত্রিদিবকে যেতেই হবে একবার। ত্রিদিবের যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, বিশ্বস্ত ড্রাইভারের সঙ্গে তিনি পাঠিয়ে দিলেন সুলেখাকে। তারপর তিনি বইপত্র নিয়ে বসলেন।

ইস্টকুটুম পাখির বার্তা ভুল হয়নি, খানিকবাদেই এসে উপস্থিত হলো শাজাহান।

ত্রিদিব তাকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানালেন, বাবুর্চিকে বলে দিলেন খানা বানাতে, কিন্তু আড্ডা জমলো না। সুলেখা বাড়িতে নেই শোনা মাত্র সে যেন কেমন চুপসে গেছে। তার

দৃষ্টিতে জ্যোতি নেই, এমনকি খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর সে প্রস্তাব দিল, আজ সে ফিরে যাবে, কাল সকালে তার জরুরি কাজ আছে।

ত্রিদিব বললেন, বসুন, আর একটু বসুন। সুলেখার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলে সে দুঃখ পাবে।

সুলেখা ফিরলো রাত দশটার একটু পরে। তার চোখে মুখে অনেক গল্প। তার এম এ পাস পিসতুতো বোন শিখা একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছে। বাবা-মাকে আগে সে কিছু জানায়নি, কিন্তু গোপনে সে একটি পাঞ্জাবী যুবকের বাগদত্তা। শিখার বাবা-মা এলাহাবাদের এক বঙ্গ সন্তানের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করেছেন, শিখা তার রাশভারি বাবার মুখের ওপর না বলতে পারে না, সেইজন্য সে এলাহাবাদের পাত্রটিকে চিঠি লিখে সব কথা জানিয়েছে। তাই নিয়ে আজ হুলুস্থুলু কাণ্ড। শিখার আজ আশীবাদ হবার কথা, কিন্তু এলাহাবাদ-পক্ষ বাড়িতে এসে। তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল, তারা অপমানিত বোধ করেছে।

এই সব গল্পে রাত হয়ে গেল অনেক, শাজাহান থেকেই গেল শেষপর্যন্ত।

রবিবার সকালে দেরি করে উঠলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু ত্রিদিবকে যেতে হবে জাপানী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা চালাতে। ব্রেক ফাস্ট টেবিলেই কথা শুরু হবে।

ত্রিদিব উঠে পড়ায় সুলেখারও ঘুম ভেঙে গেছে। ত্রিদিব আলতো করে তার কপাল ছুঁয়ে বললেন, তুমি আরও একটু ঘুমিয়ে নাও না! আমাকে তো যেতেই হবে, উপায় নেই।

সুলেখা একটুখানি উঠে বসে বললো, তুমি তা হলে শাজাহানকে নিয়ে যাও। ওকে তোমার গাড়িতে লিফ্ট দিলে ওর সুবিধে হবে।

ত্রিদিব বললেন, শাজাহান ঘুমোচ্ছে, এখন ওকে জাগিয়ে লাভ কী? ও থাক। ওকে বরং আজ দুপুরে এখানে খেয়ে যেতে বলো।

–তুমি কখন ফিরবে?

–আশা করছি লাঞ্চের আগে ফিরতে পারবো। রবিবার আমার বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না।

সুলেখার চোখে তখনও এক রাশ ঘুম। সে আর কথা না বাড়িয়ে বালিশে মুখ গুজলো।

সকাল থেকেই টিপটিপ করে আবার বৃষ্টি পড়ছে। বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। দিন-মজুর, খেলোয়াড় কিংবা জাপানীদের সঙ্গে যাদের ব্যবসার কথা চালাতে হয়, তারা ছাড়া আজ সকালে কারুর ঘুম থেকে ওঠার তাড়া নেই।

সুলেখার দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙলো সাড়ে নটায়। বারান্দায় পাজামার সঙ্গে ড্রেসিং গাউন পরে শাজাহান চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছে। সুলেখাকে দেখে সে সহাস্যে বললো, গুড মর্নিং ভাবী। আপনার লোক যা চা বানিয়ে দিয়েছে, মুখে দেওয়া যায় না। আপনার হাতের তৈরি আসল এক কাপ চা এবার খেতে চাই।

সুলেখা বাবুর্চিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে শাজাহানের সামনে এসে বসে লজ্জিতভাবে বললো, ইস, আজ বড্ড বেশি ঘুমিয়েছি। আপনি অনেকক্ষণ উঠেছেন?

শাজাহান বললো, না, এই তো কিছুক্ষণ, দাদা বেরিয়ে গেছেন শুনলাম, কখন গেলেন টেরও পাইনি।

শাজাহান প্রায় ত্রিদিবেরই সমবয়েসী, তবু সে ত্রিদিব সুলেখাকে দাদা ও ভাবী বলে। সৌজন্য ও বিনয়ে সে ত্রিদিবের চেয়েও এক কাঠি ওপরে যায়। সুলেখার দিকে সে মাঝে মাঝেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে ঠিক লালসা নেই কিন্তু অন্য একটা কিছু আছে। শাজাহানের সামনে একলা বসতে সুলেখা বেশ অস্বস্তি বোধ করে, যদিও তার কারণটা সে এখনও বুঝতে পারে না।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলো, রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

এটা একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন। নিছক কথা শুরু করার জন্যই বলা। এর উত্তরটাও মামুলি হয়। কিন্তু আজই প্রথম শাজাহান দুদিকে মাথা নেড়ে গাঢ় স্বরে বললো, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম! আপনার এখানে আসি, আপনি যতক্ষণ চোখের আড়ালে থাকেন, ততক্ষণ মনটা অস্থির অস্থির লাগে।

সুলেখা মুখ নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো। এই সব কথা তার পছন্দ হয় না, যদিও মানুষ হিসেবে সে শাজাহানকে পছন্দ করে।

শাজাহান আবার বললো, ভাবী, প্রত্যেক মাসে দিল্লিতে ছুটে আসি শুধু আপনাকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য। আমার ব্যবসা...অন্য লোক এলেও চলে, কিন্তু আমি না এসে পারি না।

সুলেখা তখনও মুখ নিচু করে আছে দেখে শাজাহান খানিকটা ব্যাকুলভাবে বললো, আপনি রাগ করলেন? আমি মনের কথাটা বললাম, আমি আপনার একজন দারুণ ভক্ত!

একটা কিছু বলা দরকার, তাই সুলেখা চোখ না তুলেই বললো, যাঃ, কী যে বলছেন! ...আজকের সকালটা ভারি সুন্দর, না? আপনি সিমলা কিংবা নৈনীতাল গেছেন? বর্ষায় আমার পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে।

–যাবেন? আমি ব্যবস্থা করবো?

–ও যে এখন কাজে বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

–দাদাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবো। চলুন, সিমলায় তবে একটা হোটেল বুক করে ফেলি? আমার চেনা আছে।

বাবুর্চি চায়ের ট্রে এনে রাখলো সামনের গোল টেবিলে। আর তখনই একটা ট্যাক্সি থামলো গেটের সামনে। সেই ট্যাক্সি থেকে নামলো রাতুল। সুলেখার বুকটা ধক করে উঠলো! একপলক দেখলেই বোঝা যায় রাতুল সুস্থ, স্বাভাবিক নয়।

রাতুলের পোশাক সব সময় এমন পরিপাটি থাকে যে তার চেহারা থেকে তার পোশাককে কখনো আলাদাভাবে চোখে পড়ে না। এখন রাতুলের গায়ের জামাটা দোমড়ানো, যেন কাল সারা রাত সে ঐ জামা পরেই ট্রেনে শুয়েছিল। মুখে দু দিনের দাড়ি, মাথায় চুল এলোমেলো।

শাজাহান উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আরে, রাতুলবাবু, আসেন, আসেন! রাতুল যেন শাজাহানের কথা শুনতে পেল না, তাকে দেখতেও পেল না। সে সোজা এগিয়ে এসে বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় সুলেখাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার চিঠির উত্তর দাওনি কেন?

সুলেখা নিষ্প্রাণ গলায় বললো, আপনি এসে বসুন। চা খাবেন? আমি চা করছি। রাতুল আরও জোরে বললো, আগে আমার কথার উত্তর দাও, তুমি আমার চিঠির...তুমি কি আমার জন্যই কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছো?

শাজাহান বললো, আরে, আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? এসে বসেন। কোন্ ট্রেনে এলেন?

রাতুল এবারে দেখলো শাজাহানকে। তার ঘরোয়া পোশাক, তার সাবলীল ভঙ্গি। গৃহস্বামীকে দেখা যাচ্ছে না, যেন তার ভূমিকাটাই নিয়েছে শাজাহান।

রাতুল একবার শাজাহান আর একবার সুলেখাকে দেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, ত্রিদিব কোথায়?

সুলেখা উত্তর দিল না, শাজাহান বললো, দাদা এখন বাড়িতে নেই।

–আপনি কবে এসেছেন?

–আমি কাল এসেছি।

–রাত্তিরে এখানে ছিলেন?

–হ্যাঁ।

রাতুল এবারে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো সুলেখার দিকে। ত্রিদিব বাড়িতে নেই। সদ্য বিছানা ছেড়ে আসা শরীর নিয়ে শাজাহান আর সুলেখা অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে চা খেতে বসেছে সকালে, এই দৃশ্যে তার মাথায় জ্বলে উঠলো ঈর্ষার আগুন। মাথার মধ্যে অন্য আগুনও ছিল, আগুনে আগুন যোগ হলো।

বাড়িতে যে কাজের লোকজন রয়েছে, তারা শুনবে, সেসব কিছু গ্রাহ্য না করে সে সুলেখাকে বললো, তোমরা আমার জন্য কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছো? আমি এমনই সাংঘাতিক প্রাণী? তুমি টেলিফোনে আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলে, আমি কি ছেলেমানুষ?

সুলেখা রাতুলকে কী বলবে তা ভেবে পাচ্ছে না। চিঠির উত্তর না দেওয়াটাই যে প্রত্যাখ্যান তা যে বোঝে না, তাকে আর কী ভাবে বোঝানো যাবে? রাতুলকে সে অপছন্দ করে না। কিন্তু তাকে আর বেশী প্রশ্রয়ও দেওয়া যায় না।

রাতুল আজ সব ভদ্রতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। পুরুষ মানুষের এই রূপের সঙ্গে পরিচিত নয় সুলেখা।

সে কাতর মিনতির সঙ্গে বললো, আপনি প্লিজ বসুন। রাতুল তবু কর্কশ ভাবে বললো, তুমি কেন আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে? হোয়াই? হোয়াই?

–আমি তো কিছু মিথ্যে বলি নি। আপনি ভুল বুঝেছিলেন।

রাতুল সুলেখার কাঁধ ধরে আরও চেঁচিয়ে বললো, আমি ভুল বুঝেছি? ডিড্‌নড্‌ ইউ সিডিউস মি...।

শাজাহান উঠে এসে রাতুলের হাত ধরে বললো, এ কী করছেন? বসুন, বসুন, আগে একটু জিরিয়ে নিন। সারা রাত ট্রেন জার্নি করে এসেছেন।

রাতুল এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে বললো, আপনি সরে যান। আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে আসিনি। সুলেখার সঙ্গে আমার বোঝাঁপড়া আছে।

–তা বলে এত চ্যাঁচামেচি করবেন? এটা ঠিক হচ্ছে না। মাথা ঠাণ্ডা করুন!

রাতুল আরও গলা চড়িয়ে বললো, সুলেখা, তুমি এই মুসলমানটাকে তোমার বাড়িতে থাকতে দাও, আর আমার চিঠির জবাবও দাও না। এই তোমার সতীপনা। ত্রিদিব বুঝি কাল রাত্রেও বাড়িতে ছিল না?

সুলেখা এবার মুখ তুলে প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে বললো, ছিঃ!

শাজাহান বললো, রাতুলবাবু, ইউ আর ক্রসিং ইওর লিমিট!

রাতুল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঠাস করে এক চড় কষালো শাজাহানের গালে। শাজাহান কয়েক পা পিছিয়ে গেল, দ্বিতীয়বার মারার জন্য হাত তুলে রইলো রাতুল।

আঘাতের চেয়েও অনেকখানি বিস্ময় ফুটে উঠলো শাজাহানের মুখে। ত্রিদিবের বাড়ির পরিবেশে চড় মারামারি যেন অকল্পনীয় ব্যাপার।

–আপনি, আপনি আমাকে মারলেন, রাতুলবাবু? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

–বেশ করেছি। আরও মারবো। তুই কোন্‌ সাহসে এ বাড়িতে আসিস। দূর হয়ে যা! শুয়োরের বাচ্চা পাকিস্তানী! যা, পাকিস্তানে চলে যা!

সুলেখা আর সহ্য করতে পারলো না। দু হাতে মুখ চাপা দিয়ে সে ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

রাতুল আর শাজাহান মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। রাতুলের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, সে আরও মারামারি করার জন্য তৈরি। আঙুল তুলে হুকুমের সুরে বললো, যা, বেরিয়ে যা! কোনোদিন যেন তোকে আর এ বাড়িতে না দেখি!

শাজাহান মৃদু শক্ত গলায় বললো, আপনি আমাকে পাকিস্তানে পাঠাতে চাইছেন? না, আমি পাকিস্তানে যাবো না। দিল্লি জায়গাটা আপনার বাপের সম্পত্তি নয়। এ বাড়িতেও আপনাকে গুণ্ডামি করার অধিকার কেউ দেয়নি!

-দেখবি, অধিকার আছে কি না! তুই যে পাকিস্তানের স্পাই তা আমি জানি না ভেবেছিস?

শাজাহান দু চোখে তীব্র ঘৃণা ফুটিয়ে বললো, আপনি যে এত নিচে নেমে যেতে পারেন, তা আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি। পাকিস্তানের স্পাই, আমি? শুধু মুসলমান বলে? না, আমি পাকিস্তানে যাবো না। আপনি আমার গায়ে হাত তুলেছেন, তার শোধ আমি নেবোই। হিন্দুদের নরকে সবচেয়ে যে খারাপ জায়গাটা আছে, সেখানে আমি আপনাকে পাঠাবো। আমি মুসলমানের বাচ্চা, আমার কথার খেলাপ হয় না।

২৫ পত্রিকার নাম নিয়ে আলাপ-আলোচনা

পত্রিকার নাম নিয়ে আলাপ- আলোচনা চললো বেশ কয়েকদিন। নাম ঠিক করা সহজ নয়, নানারকম মত বিভেদ। আলতাফের ইচ্ছে নবারুণ বা নবার্ক, এই জাতীয় নাম দেওয়া, শাখাওয়াত হোসেনের আবার ঐ ধরনের সংস্কৃত-ঘেঁষা শব্দ অপছন্দ। তিনি প্রস্তাব নিলেন, নাম রাখা হোক ‘জেহাদ’ ।

এই নামটি অবশ্য তরুণদের পছন্দ হয় না, কিন্তু শাখাওয়াত হোসেন পত্রিকার মালিক, তাঁর ইচ্ছেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না এককথায়। পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক যতই চলুক, হোসেন সাহেব নিজের পছন্দটি আঁকড়ে ধরে রইলেন। নামটি ছোট, তিন অক্ষরের, শুনতে ভালো, বেশ একটা তেজের ভাবও আছে।

ঐ নামটি যেদিন প্রায় ঠিক হবার উপক্রম, তার পরদিন পল্টন তার কাঁধের ঝোলায় একটি বাংলা অভিধান নিয়ে এলো। কথা শুরু হবার পর সে হোসেন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো, চাচা, জেহাদ কথাটার মানে আপনি কী ভেবেছেন?

হোসেন সাহেব বললেন, কেন? এ সহজ কথার মানে সবাই জানে। জেহাদ মানে লড়াই!

পল্টন বললো, ডিকশনারিটা একবার কনসাল্ট করা যাক। বর্গের জ, জে জে জে, এই জেহাদ। লিখেছে, জিহাদ দেখো। আসল কথাটা হলো জিহাদ, আমরা মুখে বলি জেহাদ। নাম রাখতে গেলে জিহাদই রাখতে হয়। জিহাদ মানে লিখেছে, "মুসলমানগণের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে একযোগে ধর্মযুদ্ধ"।

বসির, আলতাফরা এক সঙ্গে বলে উঠলো, না, না, এ নাম রাখা চলবে না।

হোসেন সাহেব একটুখানি দমে গেলেন। কুর্তার পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল মুছতেই তাঁর আর একটা নাম মনে পড়ে গেল। তিনি উজ্জ্বল মুখে বললেন, তা হলে নাম দাও 'আজান'। এ নাম অতি সুন্দর!

পল্টন অভিধানের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো, এর মানেটা দেখেনি।

আলতাফরা হেসে উঠলো। আজানের মানে সবাই জানে।

পল্টন বললো, আজমীর...আজল্. আজা...আজাড়...এই যে আজান! মানে হলো, "আহ্বান, মুসলমানদিগকে নমাজ পড়িবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান। বৈদেশিক।"

হোসেন সাহেব বললেন, এতে আপত্তির কোনো কারণ আছে? আমরা তো সকল মানুষরে ডাক দিতেই চাই।

অন্যরা কেউ চট করে কিছু মন্তব্য করলো না। যদিও এই নামটিও সকলের ঠিক পছন্দ। হয়নি। বসির আর বাবুল চোখাচোখি করলো, এরা তলে তলে মার্ক্সবাদে দীক্ষা নিয়েছে, পত্রিকার নামে ধর্মীয় গন্ধ রাখা এদের মনঃপূত নয়।

আলতাফ বললো, আমি একটা কথা কই, চাচা। মামুন ভাইরে আমরা নিচ্ছি, এডিটর হিসাবে আপনার নাম থাকলেও ভারচুয়ালি তিনিই সব দেখাশুনা করবেন। মামুনভাই কবি মানুষ, পত্রপত্রিকার সাথে অনেকদিন ধইরা কানেকটেড, নামের ব্যাপারে তাঁর একটা মতামত নেওয়া দরকার।

হোসেন সাহেব ঈষৎ অসন্তোষের সঙ্গে বললেন, ঠিক আছে, লও হ্যাঁর মতামত, কিন্তু আমার মন-পসন্দ না হইলে আমি ভেটো দিমু!

বাবুল তার বড় ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছোট করে কাশলো। পত্রিকার নামের ব্যাপারে মামুনভাই-এর সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে আগেই। মামুনভাই তার বাসায় প্রায়ই আসেন মঞ্জু আর তার সন্তানের খোঁজ-খবর নিতে। মামুনভাই বলেছেন যে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি একটি নামই বলবেন এবং সেটাই গ্রহণ করতে হবে। তিনি ঠিক করে রেখেছেন, 'ভবিষ্যৎ'। আমরা তো সবাই ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে আছি। বাবুল বলেছিল, কিন্তু য-ফলা দিয়ে নাম কি প্র্যাকটিকাল হবে? মামুন উত্তর দিয়েছিলেন, কেন? তয় ত দিয়ে 'ইত্তেকাফ' যদি ভালোভাবে চলতে পারে, তা হলে য-ফলা দিয়ে ভবিষ্যৎ' কেন চলবে না।

আলতাফ মুখ ফেরাতেই বাবুল বললো, মামুনভাই তাঁর পছন্দের কথা আমাকে জানিয়েছেন। উনি নাম রাখতে চান ভবিষ্যৎ।

হোসেন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ভেটো প্রয়োগ করে বললেন, ও চলবে না, আর কিছু সাজেস্ট করতে বলো!

শেষ পর্যন্ত কাগজের নাম হলো 'দিন-কাল'। আগে ঠিক ছিল আগামী ঈদের দিন থেকে পত্রিকার যাত্রা শুরু হবে, কিন্তু এর মধ্যেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন। অমনি সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নির্বাচনের মুখেই তো কাগজ চালাবার প্রকৃষ্ট সময়।

আইয়ুব যে নির্বাচন চাইলেন, তাতে দেশের সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। ভোট দেবে পাকিস্তানের দুই ডানা থেকে মাত্র আশী হাজার মানুষ, এদের নাম হলো বেসিক ডেমোক্রাটস, যাদের নির্বাচন আগেই হয়ে গেছে। এই বেসিক ডেমোক্রাটসরা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ, নব্য ধনী সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি, আইয়ুবের আমলে এদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হচ্ছে। এই বেসিক ডেমোক্রাটসরা নির্বাচিত করবে শুধু মাত্র প্রেসিডেন্টকে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আবার সেই পদের প্রার্থী।

এটা কি নির্বাচন, না নির্বাচনের প্রহসন? বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রথমেই এই নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানালো। এই নির্বাচন বয়কট করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রমনা পার্কের কাছে বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'দিন-কাল' কার্যালয়। সম্পাদক হিসেবে শাখাওয়াত হোসেন-এর নাম ছাপা হবে, নামের জন্যই তিনি কাগজ করছেন। তাঁর আলাদা ঘর, সেখানে তিনি যখন ইচ্ছে আসবেন। মামুন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, তাঁর নাম ছাপাবার আকাঙ্ক্ষা নেই, তিনি চান গণতন্ত্রের উদ্ধার, প্রথম দিন থেকেই তিনি খাটতে লাগলেন দারুণ ভাবে।

তিনি আলতাফ বসির পল্টনদের নিজের ঘরে ডেকে বললেন, আমরা কিন্তু এই নির্বাচন সমর্থন করবো। আমরা গণতন্ত্র চাই, নির্বাচন চাই, যে-কোনো নির্বাচন থেকেই দূরে সরে থাকা কোনো কাজের কথা নয়। ধরো, এই ইলেকশানে যদি আমরা আইয়ুবকে ফেলে

দিতে পারি, তা হলে পরবর্তী প্রেসিডেন্টের ওপর জেনারাল ইলেকশান কল্ করার জন্য চাপ দেওয়া যাবে।

পল্টন জিজ্ঞেস করলো, আইয়ুবের সঙ্গে কনটেস্ট করবে কে? সে রকম ন্যাশনাল ফিগার কে আছে?

সেটা ভেবে দেখতে হবে। তোমরা অপোজিশান পার্টির লিডারদের ইন্টারভিউ করো!

আলতাফ বললো, মামুনভাই, একটা কথা বলবো। কাগজের পলিসি আপনিই ঠিক করবেন। কিন্তু সেটা আমার হোসেন চাচারে দিয়ে একটু অ্যাপ্রুভ করায়ে নিতে হবে। একটু কায়দা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আসল ব্যাপার কী জানেন, আপনার মুখের কথাটাই ওনার মুখ দিয়ে বলায়ে নিতে হবে আর কি!

মামুন বললেন, সেটা কী ভাবে সম্ভব? অলতাফ, তুমি জানো, আমি পয়সার জন্য এই চাকরি করতে আসি নাই। এসেছি তোমাদের কথাতে। তোমার চাচা যদি কোনো প্রতিক্রিয়াশীল মতামত চাপায়ে দিতে চান, আমি তৎক্ষণাৎ রিজাইন করবো। আবার তোমার বন্ধুরা যদি প্রো-চাইনিজ লাইন নিতে চায়, আমি তার মইধ্যেও নাই। আমি পাকিস্তানের সব মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী। আমি বিচ্ছিন্নতাবাদ ঘৃণা করি। পাকিস্তানরে যারা ভাঙতে চায় আমি তাদের দুশমন মনে করি। আমি ন্যাশানালিস্ট। এই আমার সোজা কথা!

পল্টন বললো, আমরা এক একটা ইস্যু ধরে আপনার সাথে আলোচনা করবো। আমার ধারণা, আপনার সাথে আমাদের মতবিরোধ হবে না।

আলতাফ বললো, আগে আমার কথাটা কইতে দাও! সব কাগজেই মালিকের স্বার্থ দ্যাখতে হয়। আমার চাচা...

মামুন বললেন, কাগজ লসে রান করলে বেশিদিন চলবে না সে আমি জানি। সার্কুলেশান যাতে বাড়ে সে দায়িত্ব আমার।

আলতাফ বললো, আমার চাচা শুধু প্রফিট চান না, তিনি সমাজে নাম কেনতে চান। মাঝে মাঝে তেনার দুই একটা ছবি ছাপাইতে হবে, এই আমার অনুরোধ। আর এমন একটা ভাব দেখাতে হবে, যেন ওনার মতামতেই সব কিছু চলতেছে। কায়দাটা আমি বলে দিই। বিচক্ষণ কথাটার ওপর আমার চাচার খুব দুর্বলতা আছে। মাঝে মাঝে ঐ শব্দটা ব্যবহার করবেন। যেমন ধরেন, আপনি যদি বলেন, হোসেন সাহেব, আপনার মতন বিচক্ষণ মানুষ নিশ্চয়ই বুঝবেন যে এখন এই ইলেকশন আমাদের সাপোর্ট করা দরকার। দ্যাখবেন যে আমার চাচা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলবেন, হা, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

পল্টন হেসে বললো, ঠিক, এটা আমিও লক্ষ করেছি বটে!

মামুন ভুরু কুঁচকে বললেন, ছবি ছাপাতে হবে!

আলতাফ বললো, এমনি এমনি কী আর ছবি ছাপাবেন? ধরেন, উনি মোনেম খাঁর সাথে আলাপ করতে গেলেন, তখন দুইজনের ছবি ছাপাবেন। সেটা একটা নিউজও হইলো!

কাগজ চলতে লাগলো মন্দ না। মামুন প্রেসে পাঠাবার আগে প্রত্যেকটা কপি নিজে দেখে দিতে লাগলেন, ভাষার শুদ্ধতার প্রতি নজর রাখলেন, সরকারের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণের বদলে সম্পাদকীয় কলমে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রয়োগ করতে লাগলেন প্রচুর। বিভিন্ন জায়গায় রিপোর্টার পাঠিয়ে প্রকাশ করতে লাগলেন নানান দুর্নীতির কাহিনী। পাঠকরা এই সব পছন্দ করে।

বিরোধী দলগুলিও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আইয়ুব-বিরোধী সব দলগুলি একত্র হয়ে নাম নিল কম্বাইনড অপোজিশন পার্টি বা কপ। এখন প্রশ্ন হলো, আইয়ুবের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হবে কাকে? এমন কোন নেতা আছেন, যিনি পূর্ব ও

পশ্চিম দুই পাকিস্তানেই সমানভাবে স্বীকৃত? সোহরাওয়ার্দি বেঁচে থাকলেও না হয় কথা ছিল...।

শেষ পর্যন্ত একটা নামই সবার মনে এলো। জিন্নার নামে পাকিস্তানের মানুষ এখনও মাথা অবনত করে। তিনি পাকিস্তানের স্রষ্টা, নতুন রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হবার পর তিনি বেশিদিন বাঁচেননি, তাই তাঁকে কোনো বদনাম কুড়োতে হয়নি। সেই জিন্নার নামের ম্যাজিকটা কাজে লাগানো দরকার। জিন্না সাহেবের বোন ফতিমা জিন্না এখনো বেঁচে আছেন। তিনি আগে বিশেষ রাজনীতি করেননি, তাতে কী আসে যায়, তাঁর হয়ে প্রচার চালাবেন অন্যরা।

ফতিমা জিন্না এই নির্বাচনী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে রাজি হয়ে গেলেন।

কিন্তু মামুন বিপদে পড়লেন শাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে। একজন স্ত্রীলোক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবে, এই চিন্তাটাই তাঁর কাছে অসহ্য। স্ত্রীলোক দেবে মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা? 'দিন-কাল' অফিসে ঢুকতে ঢুকতে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, ইমপসিবল। আমাগো কাগজ ফতিমারে সাপোর্ট করবে না! ইমপসিবল! পাকিস্তানে আর কোনো পুরুষ নাই? মাইয়া মানুষের এই মদ্দাপনা ইসলাম-বিরোধী।

মামুন নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে রইলেন। হোসেন সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠালেও তিনি দেখা করতে গেলেন না। বিকেলবেলা আলতাফ এলে তিনি গম্ভীরভাবে এক টুকরো কাগজ তুলে বললেন, এই নাও আমার রেজিগনেশান লেটার। দিয়া আসো তোমার চাচারে। তিনিই এডিটারি করুন।

আলতাফ হালকাভাবে বললো, আরে মামুনভাই, আপনে মাথা গরম করেন ক্যান! কী হইছে শুনি!

মিতভাষী, নম্র-স্বভাব মামুন হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে বললেন, তুমি বলতে চাও আমি ফতিমা জিন্নাকে ছেড়ে আইয়ুবকে সমর্থন করবো? যদি এক বাপের সন্তান হয়ে থাকি...

আলতাফ বললো, হায় আল্লা! আপনে দেখি বড় চটা চটছেন! দ্যাখেন না, সব ম্যানেজ কইরা দিতেছি। আচ্ছা মামুনভাই, আগে একটা কথা জেনেনি, হিস্ট্রিতে যেন পড়ছিলাম, দিল্লির মসনদে একবার এক সুলতানা বসে ছিল না? কী যেন নামটা?

–রাজিয়া!

–তিনি তো ভালোই রাজ্য চালিয়েছিলেন, তাই না? ব্যাস, তবে তো কেল্লা ফতে!

এর পর আলতাফ কিছুক্ষণ মামুনের সঙ্গে শলা পরামর্শ করলো। তারপর দু'জনে একসঙ্গে গেল হোসেন সাহেবের ঘরে।

হোসেন সাহেব প্রথমেই বললেন, আমি নোট দিয়া দিছি আমার কাগজ ফতিমার এগেইনস্টে।

আলতাফ বললো, চাচা, আগে দু' একটা কথা শুইনা লন। খুব প্রাইভেট। দরজা বন্ধ করি? চা-পানি কিছু লাগবে?

হোসেন সাহেব অস্থিরভাবে বললেন, না। আগে কাজের কথা কও! মাইয়ালোকে রাষ্ট্রপতি হইতে চায়, তোবা, তোবা, এমন কথা শোনাও হারাম।

আলতাফ বললো, চাচা, মামুনভাই আপনের মতামতগুলিরে খুব মূল্য দ্যান। আজ সকালেই কইতেছিলেন, ওহে, তোমার চাচার মতন বিচক্ষণ মানুষকে যদি প্রশ্ন করা যায়, আইয়ুব না। জিন্না, আইয়ুব না জিন্না। এই দুইটা নামের মধ্যে আপনি কোন্টা বেছে নেবেন, তা হলে নির্ঘাৎ তিনি বলবেন, জিন্না, জিন্না!

হোসেনসাহেব বললেন, আলবাৎ! একশো বার। জিন্নার সাথে আইয়ুবের কোনো তুলনা চলে? কায়েদ এ- আজম হলেন জাতির পিতা।

জিন্নারে ইন্ডিয়ার লোক পছন্দ করে না, একথা আপনি স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই।

অরা জিন্না সাহেবের মর্যদা কী বোঝে। অগো গান্ধীর থিকা, জওহরলালের থিকা আমাগো জিন্না অনেক বড়, তিনি অনেক বেশি বুদ্ধি ধরতেন!

ঠিক, আপনি ঠিক বলেছেন চাচা। পাকিস্তানরে স্ট্রং করার জন্য এখন আর একজন জিন্নার দরকার কি না?

হক কথা! যদি জিন্না সাহেবের একজন ভাই থাকতো কিংবা পোলা থাকতো, আমি তারেই সালাম জানাতাম। তার বদলে তোমরা একজন মাইয়া মানুষেরে...

শোনেন চাচা, শোনেন। মামুনভাই বলছিলেন, শাখাওয়াত হোসেনের মতন বিচক্ষণ মানুষ নিশ্চয়ই বুঝবেন যে ফতিমা জিন্না আসলে আর একজন রাজিয়া সুলতানা।

হেডায় আবার কেডা?

আলতাফ মামুনের দিকে ফিরে বসলো, মামুনভাই, এবারে আপনিই বলেন।

মামুন একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, আপনি একটা নতুন পত্রিকার সম্পাদক, আপনার পত্রিকা থেকেই পাঠকরা জানবে যে একদা দিল্লির মসনদে বসেছিল এক মুসলমান কুমারী। তিনি দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেছেন, নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সৈন্য পরিচালনা করেছেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ লিখে গেছেন যে নারী হয়েও রাজকার্যে তিনি ছিলেন বড় বড় বাদশাদের সমকক্ষ, ন্যায়পরায়ণ, বিদ্যোৎসাহিনী, যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ।

হোসেন সাহেবের ভুরু উঁচুতে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই এরকম কেউ দিল্লির সিংহাসনে বসেছিল? স্ত্রীলোক? মুসলমান?

মামুন বললেন, সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা রাজিয়া মসনদে বসেছিলেন বারো শো ছত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে। অযোগ্য রুকনউদ্দীনকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজিয়া মসনদে বসে প্রজাদের...

আলতাফ এর মধ্যে মাথা গলিয়ে বললো, ঐ রুকনউদ্দীন হইলো আমাদের আইয়ুব। বোঝলেন চাচা। রাজিয়াও কুমারী ছিলেন,ফতিমা জিন্নাও কুমারী। এই সব মিলের কথা কোনো কাগজে এখনও ছাপা হয় নাই। আমাগো দিনকালে যদি প্রথম বাইরায়...সেইজন্যই তো মামুনভাই বলছিলেন, আপনার মতন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এটা বেশি বুঝাতেই হবে না।

হোসেন সাহেব টেবিলে কিল মেরে বললেন, আরে, আমি তো তোমাগো টেস্ট করতেছিলাম! আমি রাজিয়ার কথা জানি না? তিনিই যে নব রূপে এসেছেন...কাইলকের কাগজে ব্যানার হেড লাইন দাও, ফতিমা জিন্না নব রূপে রাজিয়া সুলতানা...।

নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের বিক্রিও বাড়তে লাগলো। মামুন কাজের নেশায় মেতে উঠলেন। তিনি রিপোর্টার পাঠাতে লাগলেন গ্রামে গ্রামে।

বাবুল চৌধুরী দিনকাল পত্রিকায় কাজ নেয়নি, তার কলেজের চাকরিটা সে রেখে দিয়েছে, তবে এখানে সে প্রতি সন্ধেবেলাতেই আসে, আড্ডার এক কোণে চুপ করে বসে থাকে। বন্ধুদের চাপে পড়ে সে দু'একটা প্রবন্ধও লিখেছে, তাও ছদ্মনামে। সে একটু আড়ালে আড়ালে থাকতে। চায়।

বেশি আড্ডা জমে নিউজ রুমে। রিপোর্টাররা একটু রাতের দিকে নানা রকম খবর ও বহু অসমর্থিত গুজব নিয়ে আসে ঝুড়ি ভরে, সেই সব নিয়ে হাসি-মস্করা হয়। বাবুল পারতপক্ষে মামুন বা শাখাওয়াত হোসেনের ঘরে যায় না, ঐ দুই কক্ষে পত্রিকার নীতি নির্ধারক আলোচনায় সে অংশ নিতে চায় না। আলতাফ অনেক চেষ্টা করেও তার ছোটভাইকে এই কাগজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াতে পারেনি।

মামুনের সঙ্গে বাবুলের দেখা হয় তার নিজের বাড়িতে। বাবুলের ছেলে সুখু এখন হামগুড়ি দেওয়া ছেড়ে টলটলে ভাবে হাঁটতে শিখেছে, দু একটা কথাও বলে। মামুন সুখুকে না দেখে থাকতে পারেন না, সপ্তাহে অন্তত দু তিনটি সন্ধেবেলা আসবেনই। পত্রিকা শুরু

হবার আগে প্রতিদিন সন্ধেবেলা আসতেন। ঠিক সাতটা বাজার দু' এক মিনিট পরেও সিঁড়িতে ডাক শোনা যেত, মঞ্জু, মঞ্জু! মামুনমামাকে দেখলে মঞ্জুরও চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মামুন মামা আসতে পারেন বলে সে কোনো সন্ধেবেলাই পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে যেতে চায় না। মামুন এসেই সুখুকে কোলে তুলে নিয়ে এমন আদর করতে থাকেন যে মনে হয় তিনি নিজেও শিশু হয়ে গেছেন। সুখু কখনো কখনো তার মায়ের কোলে যেতে চাইলেও মামুন একটু পরেই। আবার মঞ্জুর কোল থেকে সুখুকে তুলে আনেন নিজের বুকে। মামুনের এখন কোনো পুত্র সন্তান নেই বলেই হয়তো তিনি মঞ্জুর ছেলের ওপর তাঁর সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা-আদর উজাড় করে দিতে চান।

একদিন একটু বেশি রাত করে বাড়ি ফিরে বাবুল মঞ্জুকে বললো, শোনো, আমি কয়েকটা দিন একটু মফস্বল থেকে ঘুরে আসবো ভাবছি।

সুখুকে সদ্য ঘুম পাড়িয়ে মঞ্জু তখন দেয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। পাশের ঘরের টেবিলে ঢাকা আছে রাতের খাবার। বাবুলের ফিরতে যতই দেরি হোক, সে কোনোদিনই আগে খেয়ে নেয় না। বাবুলের ফিরতে দেরি হলে সে বকাবকিও করে না। পাশের বাড়িতেই থাকে মঞ্জুর ফুফাতো বোন জুনিপার, তার স্বামী শোভান একটি অতি বদ মাতাল, প্রতি রাতে সে বাড়ি ফেরে চিৎকার করতে করতে এবং স্ত্রীকে সে অকথ্য ভাষায় যে-সব গালিগালাজ দেয় তা পাড়া-প্রতিবেশী সবাই শুনতে পায়। সেই তুলনায় বাবুল তো প্রায় ফেরেস্তা। সে মদ স্পর্শ করে না, সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, স্ত্রীর প্রতি এ পর্যন্ত একবারও দুর্ব্যবহার করেনি। যে-সব দিন বাবুল পুরোপুরি বাড়ি থাকে, সেইসব দিনেই যেন মঞ্জুর একটু একটু ভয় করে। কোনো মানুষ, বই নিয়ে এমন পাগল হতে পারে? সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরই বাবুল চোখের সামনে বই খুলে বসে, তারপর সারা দুপুর বিকেল সন্ধে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সে বই থেকে চোখ সরায় না। মামুন এলে সে অন্য ঘরে বসে থাকে। শুধু মামুন কেন, মঞ্জুর বাপের বাড়ির কোনো লোকের সঙ্গেই সে ভালো করে কথা বলে না। এইটা মঞ্জুর একটা গোপন দুঃখ।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাবে।

একটা লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে নিয়ে বাবুল বললো, কয়েকটা জায়গায় একটু ঘুরবো ভাবছি। ইলেকশানের মিটিংগুলো নিজের চোখে দেখে আসতে চাই। শুনছি তো মিস জিন্নার মিটিং-এ ভিড় হচ্ছে খুব। মঞ্জু, তুমি কাকে সাপোর্ট করো?

মঞ্জু বললো, আমার সাপোর্ট করা না করায় কী আসে যায়? আমার কি ভোট আছে?

তবু মনে মনে তো তোমার একজনের প্রতি সমর্থন থাকবে।

আমি চাই ফতেমা জিন্না জিতুন। মামুনমামা বলেছেন, ফতেমা জিন্না জিতলে আমাদের বাঙালীদের অনেক সুবিধা হবে!

বাবুল জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে রইলো। মঞ্জু তার পাশে গিয়ে কাঠের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কার সাথে যাবে?

বাবুল তার কোনো উত্তর না দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মঞ্জুর গালে ছোট একটা টোকা মেরে বললো, মোনেম খাঁর লোকজনরা কী বলে জানো? বেগম ফতেমা জিন্না পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থনে কখনো কোন কথা বলেছেন কী? এইযে আমাদের এদিকে পর পর দু'বার এত বড় ঝড় আর সাইক্লোন হয়ে গেল, তাতে তিনি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা তো দূরের কথা, একটু ঠোঁটের দরদও দেখাননি।

মঞ্জু এস্তভাবে বললো, এ কী, তুমি কি আইয়ুব খানকে সাপোর্ট করো নাকি? বাবুল বললো, চলো। খানা লাগাও। ক্ষুদা পেয়েছে খুব।

কী যেন একটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপছে মঞ্জুর বুক। সে তার স্বামীর চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ইলেকশন মিটিং-এ কেন যেতে চাও বলো তো? তুমি যে বলেছিলে আর কোনোদিন তুমি পলিটিকসের সাথে নিজেকে জড়াবে না?

বাবুল সহাস্যে স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে বললো, এত ভয় কিসের, বিলকিসবানু? আমি নিজেকে পলিটিকসে জড়াচ্ছি না, শুধু একটু দেখতে যাচ্ছি। আমি যেকদিন থাকবো না, মামুনভাইকে বলে যাবো, যাতে তিনি প্রত্যেকদিন এসে তোমার খোঁজ-খবর নিয়ে যান।

মঞ্জুর তবু ভয় লাগে, সে বাবুলের বুকের কাছ থেকে সরতে চায় না।

ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে, ওপরতলায় আর কেউ নেই। বাবুল হঠাৎ দু হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় মঞ্জুকে, চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেয় তার শরীর। কৃত্রিম লজ্জায় ছটফট করতে থাকে মঞ্জু, জানলা খোলা, পর্দা সরে গেলেই সব দেখা যায় পাশের বাড়ি থেকে। জুনিপার মাঝে মাঝেই এই বেডরুমের দিকে চেয়ে থাকে।

বাবুল তখুনি মঞ্জুকে বিছানায় নিয়ে যেতে চাইলে মঞ্জু আগে দুটো জানলাই বন্ধ করে দিয়ে এলো। জুনিপারের জন্য তার মায়া হয়। আহা, সে বেচারা স্বামীর সোহাগ পায় না!

২৬ নোয়াখালিতে বসিরের বাড়ি

নোয়াখালিতে বসিরের বাড়ি। বসিরের সঙ্গে আগে থেকে কথা হয়েছিল। তাই বাবুল প্রথমে নোয়াখালিতে গেল।

ভাদ্র মাস। নদী-খাল-বিল জলে একেবারে টইটম্বুর। যে দিকে তাকাও, শুধু সজল দৃশ্য। খানিকটা বাসে আর খানিকটা নৌকোয় আসতে হলো বাবুলদের। যাত্রা পথে বাবুল অনুভব করলো, শহরের চেয়ে গ্রাম্য প্রকৃতি তাকে অনেক বেশি উদ্বেল করে। নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ, জলজ শ্যাওলার গন্ধ, এমনকি পাট-পচা গন্ধের মধ্যেও একটা মাদকতা আছে। একটা বিলের ওপর দিয়ে আসার সময় এক গুচ্ছ কচুরিপানার ফুলের সঙ্গে একটা হলদে রঙের ঢোঁড়া সাপের জড়িয়ে থাকার দৃশ্য দেখে তার মনে হয়, এই মুহূর্তে, এই বিল দিয়ে না গেলে এই বিশেষ দৃশ্যটি তো জীবনে দেখা হতো না! ছবিটি অকিঞ্চিৎকর, তবু যেন চোখে লেগে থাকে।

বসিররা এক পুরুষের বুদ্ধিজীবী। বসিরের বাপ-ঠাকুর্দা চাষবাস নিয়েই থাকতেন। বসিরই লেখাপড়া শিখে সাংবাদিক হয়েছে, বসিরের এক বড় ভাই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে বড় অফিসার ছিলেন কিন্তু তিনি কোনো অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেছেন গত বছর। আর এক ভাই আবার একেবারে গণ্ডমূর্খ, চাষবাসও করে না, সংসারের কিছু দেখেও না, গ্রামে মাতব্বরি করে।

বসিরদের বাড়িটি একটি খালের ধারে, বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন, উঠোনের একপ্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে আম-কাঁঠালের বাগান। দুটি বড় বড় ধানের গোলা ও হাঁস-মুর্গির খোঁয়াড়, অবস্থা বেশ সচ্ছল বোঝা যায়, বসিরের এক চাচা এখনো দেড়শো বিঘে জমি চাষ করান।

খালের উল্টো দিকে হিন্দু পাড়া, এরা ঠিক বর্ণহিন্দু নয়, নমঃশূদ্র, এদের জীবিকা মাছ ধরা, জাল বোনা ও নৌকোয় আলকাতরা লাগানো। এদের মধ্যে আবার কিছু কিছু খৃষ্টানও রয়েছে। এই অঞ্চলে দাঙ্গা হয়নি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো সহজ মেলামেশা আছে, পাশের গ্রামে দুর্গাপূজাও হয়।

খালের ধারে ধারে ফুটে আছে কাশফুল, শিউলি গাছেও ফুল এসেছে। কিন্তু আকাশের চেহারা এখনো ঠিক শরৎকালের নয়, মেঘ সাদা হয়নি, নীল শূন্যতা তেমন চোখে পড়ে না, যখন তখন ঝেকে ঝেকে বৃষ্টি আসে। পায়জামা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে, খালি পায়ে, দু'খানা ছাতা নিয়ে বাবুল আর বসির গ্রাম ঘুরতে বেরুলো।

খানিকটা যেতেই সদ্য গোঁফদাড়ি গজানো এক ছোঁকরা দৌড়োতে দৌড়োতে এসে জুটে গেল ওদের সঙ্গে। এর নাম সিরাজুল, বসিরের এক পিসির ছেলে, বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, সে বসিরের হাত ধরে অভিমানের সুরে বললো, আপনে কাইল রাতে আসলেন, আমারে একটা খবরও দিলেন না?

বসির বললো, আবার তুই এসে জুটলি? তোরে আমি ভয় পাই!

তারপর বাবুলের দিকে ফিরে বললো, এই ছ্যামড়াডা, মেট্রিক পাস করে বসে আছে, খুব ইচ্ছে কলেজে পড়ার। ওর বাপ-দাদারা ওরে পড়াবে না, তার আমি কী করি বলো তো?

সিরাজুল বললো, আমি কতবার আপনেরে কইলাম আমারে একবার ঢাকা নিয়া চলেন, তারপর আমি নিজেই সব মেনেজ করবো।

-মেনেজ তো করবি। কিন্তু ঢাকায় গিয়ে তুই থাকবি কোথায়?

-কেন, আপনের বাসায়?

বসির আবার বাবুলের দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা কও তো, আমার বাসায় ও ক্যামনে থাকবে? দুইখান মাত্র ঘর!

সিরাজুল চোখের ইশারায় জানতে চাইলো, ইনি কে?

বসির বললো, ইনি বাবুল চৌধুরী, ইকোনমিকসের লেকচারার; ঢাকায় গিয়ে যদি ল্যাখাপড়া করতে চাস তো এনারে ধর।

সিরাজুল অমনি বাবুলের দিকে তাকিয়ে কাতরভাবে বললো, সার, আমার একটা ব্যবস্থা কইরা দ্যান, সার!

বাবুল হাসলো, মফঃস্বলের ছেলেদের কাছে ঢাকার ছাত্রজীবন খুব রোমাঞ্চকর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু দিন দিন যেরকম খরচ বাড়ছে, তাতে সাধারণ গরিব ঘরের ছেলেদের আর ঢাকায় গিয়ে পড়াশুনো চালানো সম্ভব নয়।

বসির বললো, ও মনে পড়ছে, শোনলাম, তুই নাকি এর মধ্যে শাদী করেছিস? ঢাকায় কে যেন খবর দিল আমারে।

সিরাজুল লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলো।

বসির একটু ধমক দিয়ে বললো, সত্যি কথা? এর মইধ্যেই শাদী করে ফেললে তুই আর পড়াশুনা করবি কী করে?

সিরাজুল বললো, কী করবো। আমার আব্বায় যে জোর কইরা আমার বিয়া দিল।

–জোর কইরা বুঝি বিয়া দেওয়া যায়? যাক যা করছোস তো করছোস, তোর বউ দেখাবি □□? চল, তোর বউ দেইখ্যা আসি!

সিরাজুল এবার মাথা তুলে উজ্জ্বল মুখে বললো, যাবেন আমাগো বাসায়, যাবেন?

দু'পাশে পাট খেতের মাঝখান দিয়ে কাঁচা রাস্তা। কাদায় পা গেঁথে যায়। পাট গাছের ওপর প্রচুর ফড়িং ওড়াউড়ি করছে। এক জায়গায় একটা বাঁশের সাঁকো। একখানা মাত্র বাঁশ পায়ের নীচে, আর একখানা বাঁশ ধরে ধরে যাওয়া, বাবুলের ভয় ভয় করে। সে টাঙ্গাইল ও ঢাকা শহরেই বাল্য-কৈশোর কাটিয়েছে, তেমন গ্রামের অভিজ্ঞতা তার নেই। সন্তর্পণে সেই সাঁকো পার হতে হতে সে তলার জলের দিকে তাকিয়ে দেখলো ঈষৎ লালচে রঙের এক ঝাঁক মাছের পোনা, তার পাশেই রয়েছে একটা বড়, কালো রঙের শোল মাছ, যেন বাচ্চাগুলোর পাহারাদার। বাবুল এমন দৃশ্য আগে কখনো দেখেনি, সে মোহিত হয়ে থমকে যায়।

বসিরের সাংবাদিক প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে এর মধ্যে। সে সিরাজুলের কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এদিকে ভোটের গরম ক্যামন রে? কে জিতবে?

সিরাজুল বললো, ফতেমা জিন্না! আমরা কী শ্লোগান দেই জানেন না? 'স্বৈরাচারী আইয়ুব খান, ভোট দিয়ো না এক খান! আমি এখনই কইতে পারি, এদিকে আইয়ুব খান একটাও ভোট পাচ্ছে না!

–কপ্-এর নেতারা কেউ এদিকে আসে?

–জী, আসে। আইজ বিকালেই তো রথতলার মাঠে মিটিং আছে, যাবেন?

–যাবো তো বটেই।

বাবুলের দিকে ফিরে সে বললো, পূর্ব পাকিস্তানর চল্লিশ হাজার ভোটের মধ্যে আইয়ুব কয়টা পাবে আমারও সন্দেহ আছে। পশ্চিম পাকিস্তানে মিস জিন্নার সাপোর্টার কম হবে না। যদি ফেয়ার ইলেকশন হয়, তাহলে আইয়ুবের জেতার কোনো চান্স নাই।

বাবুল বললো, জোর করে যে-লোক, প্রেসিডেন্টের আসন দখল করেছে, এখনও সিভিল-মিলিটারি সব ক্ষমতা যার হাতে, সে আবার প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন ডেকেছে। কোনো কারণেই সে জায়গা ছাড়বে বলতে চাও? এটা শুধু নিজের পজিশানটাকে আইনসম্মত করা।

সিরাজুলদের বাড়ি বেশি দূর নয়। এরা বসিরদের তুলনায় অনেক দরিদ্র। খড়ের চালের ঘর, উঠোনে এক হাঁটু জল জমে আছে, সেই জলে ভাসছে কতকগুলো মুর্গির পালক।

জল ঠেলে দাওয়ায় উঠে বসির বললো, ও পিসি, বাড়িতে মেহমান আইছে। কী খাইতে দিবা কও!

বসির এ বাড়িতে মান্যগণ্য অতিথি। একদল বাচ্চা এসে ওদের ঘিরে ধরে। তারা বাবুলের দিকেও অবাক ভাবে চেয়ে থাকে। বাবুলের চেহারা এমনিতেই সুদর্শন, তার ওপরে শহুরে পালিশ আছে, গ্রাম্য শিশুদের চোখে সে যেন একজন অপরূপ মানুষ।

নারকোল কোরা ও মুড়ি খেতে দেওয়া হয় ওদের। মুড়ি খেলেই বাবুলের চা তেষ্টা পায় কিন্তু এ বাড়িতে বোধ হয় চায়ের পাটই নেই। সিরাজুলের এমন ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখের গল্প শুরু করে যে একটু পরেই বাবুলের অধৈর্য লাগে।

সিরাজুলের বালিকা বধূ কিছুতেই লজ্জায় ওদের সামনে আসতে চায় না। সিরাজুল তাকে ধরে প্রায় টানাটানি করতে লাগল। সে আরও বেশি লজ্জা পাচ্ছে বাবুলের জন্য, কারণ

বাবুল বাইরের লোক। একই ব্যাপার অনেকক্ষণ চলতে থাকার পর বসির বললো, থাক সিরাজুল, তোর বিবির মুখ আমরা দ্যাখতে চাই না। তুই একলাই দেখিস।

বাবুল বললো, আমি না হয় বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।

এই সময় দু'তিনজন সাঙ্গপাঙ্গ সমেত একজন মুরুব্বি গোছের লোক বাইরে থেকে হাঁক দিল, এই সিরাজুল, সিরাজুল!

দীর্ঘকায় লোকটির পরনে সিল্কের লুঙ্গি, খালি গা, গলায় একটা সোনার চেন। বাঁ হাতে একটা সিগারেটকে গাঁজার কল্কের মতন ধরে হুস হুস করে টানছে। তাকে দেখে বাচ্চারা ভয় পেয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সিরাজুলের আঁচলে মুখ ঢেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন, সিরাজুলের যেন মুখ শুকিয়ে গেল। সে এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে গা মোচড়াতে মোচড়াতে দীন কণ্ঠে বললো, চাচা আপনি নিজে আইছেন, আমিই তো আপনের বাড়িতে যাইতাম, কাইলই যাইতাম।

লোকটি রাগে দাঁত কিড়মিড় করে, নিচু হয়ে পায়ের জুতো খুলে মারার ভঙ্গি করলো, কিন্তু পায়ে জুতো নেই! চড় তুলে বললো, হারামখোর, আবাগীর পুত, বেহায়া! তোরে কিছু কই না, তাই তুই মাথায় উইঠ্যা বসছোস? সেই বকরিদের সময় টাহা হাওলাৎ নিচ্ছিল, এহন আউস ধান উঠানের সময় হইয়া গেল, আমার নিজেরই এহনে টানাটানি, তার উপর তুই আমার ছুট ভাইরে মারতে গেছিলি। সাপের পাঁচ পা দেখছোস বুঝি, না?

বসির চোখ গোল গোল করে বললো, ওরে বাবা, সেই লোকের এখন এই অবস্থা? বাবুল জিজ্ঞেস করলো, এই অভদ্র লোকটা কে?

বসির বললো, এর নাম ইরফান আলি, আগে কী সব ছোটখাটো কাম কাজ করতো, এখন সার, পেস্টিসাইডের ব্যবসা করে শুনেছি। আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, গলার আওয়াজেও অনেক জোর হয়েছে, ইউনিয়ন কাউনসিলের মেম্বার!

–সিরাজুল টাকা ধার করেছে বলে তারে মারতে এসেছে?

–ভাবভঙ্গি তো সেইরকমই দেখি! দাঁড়াও, আমি দাবড়ানি দিচ্ছি। ব্যাটা কী যেন একটা ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল একবার। ওঃ হো, মনে পড়েছে, ইরফান আলি তো একজন বেসিক ডিমোক্রাট!

–বেসিক ডিমোক্রাট-এর একখান নমুনা?

–পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার এলিটের একজন। কম কথা নয়!

বসির দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে ভারিক্কি গলায় বললো, আরে, ইরফান ভাই যে! কী ব্যাপার, এত হল্লা কিসের?

ইরফান আলি যেন ভূত দেখলো কিংবা জোঁকের মাথায় নুন পড়লো। এখানে বসিরকে দেখতে পাবে, এটা যেন কল্পনাতীত ব্যাপার।

পূর্ব মূর্তি মুছে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরে কোমলতা ঝরিয়ে বিগলিত মুখে সে বললো, আরে বসির? তুমি কবে আইলা? আমারে একটা সংবাদ দাও নাই?

বসির বললো, তুমি তো এখন বিগ ম্যান। আমি তোমারে সংবাদ দেবো কোন সাহসে?

ইরফান আলি এগিয়ে এসে বসিরের হাত চেপে ধরে বললো, কী যে কও তুমি! আমরা হইলাম বিগ ম্যান, হেঃ! কেউ মানে না। বসির, তুমি এখন কুন্ পেপারে আছো?

বাবুল তাকিয়ে দেখলো, একটু দূরে সিরাজুলের পত্নী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। এখন আর সে কাঠ-পুত্তলী নয়, এখন সে মানুষ, তার চোখেমুখ শঙ্কা। যতদূর মনে হয়, ধারেই এখন সিরাজুলদের সংসার চলছে, আজকের মতন এই রকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। এ বাড়িতে।

হঠাৎ বাবুলের বুকটা কেঁপে উঠলো, কতই বা বয়েস মেয়েটির, বড় জোর পনেরো-ষোলো। আব্বা-আম্মাকে ছেড়ে একটি নতুন সংসারে এসেছে। সবার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগবে। তার আগেই এরকম অশান্তি! বাড়ি বয়ে এসে লোকেরা তার স্বামীকে মারতে আসে। স্ত্রীর চোখের সামনে যারা স্বামীকে অপমান করে, তারা কতখানি অমানুষ!

বাবুল আর একটা কথাও ভাবলো। সিরাজুলের স্বাস্থ্য ভালো, দেখলেই মনে হয় গায়ে বেশ জোর আছে। সে যদি একটা দলবল তৈরি করে নিতে পারতো তা হলে কেউ তার মুখের ওপর চোটপাট করতে সাহস পেত না। কিন্তু চেহারা বলশালীদের মতন হলেও সিরাজুলের প্রকৃতি নিশ্চয়ই নরম। গা-জুয়ারি করার বদলে সে আরও লেখাপড়া শিখতে চায়।

সিরাজুলের বউ এখন আর লজ্জাশীলা নয়। বাবুলের সঙ্গে একবার তার চোখাচোখি হলো। সেই দু'চোখে মিনতি। বাবুল নিজেই চোখ ফিরিয়ে নিল, তবু তার সারা অঙ্গে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। মেয়েটি যেন খুব চেনাচেনা। না, বাবুল এই মেয়েটিকে আগে কখনো দেখেনি, কিন্তু গ্রাম বাংলার সরল অসহায় নির্যাতিতা তরুণী মেয়েদের মুখ আঁকার সময় সমস্ত শিল্পীরা যেন অবিকল এই মুখটিই আঁকেন। মাটির রঙের শরীর, মাটির মতন সর্বংসহা কিন্তু মাটির মতন বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

বাবুল অধিকাংশ জায়গাতেই দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সে মনে মনে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করে, কিন্তু নিজে কোনো সক্রিয় অংশ নেয় না। এই মুহূর্তে হঠাৎ যেন সে একটা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে সিরাজুলের নবোঢ়ার দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিতে জানালো, ভয় নেই। তারপর সে নেমে গেল দাওয়া থেকে।

বাবুল এমনিতে লাজুক ও মৃদুভাষী হলেও কখনো কখনো বেশ কঠোর হতে পারে। বসিরের মধ্যস্থতায় সিরাজুল ও ইরফান আলির মধ্যে একটা রফা হলো, বাবুল সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। বসিরের কথা থামিয়ে সে সিরাজুলকে ডেকে অন্যদের শুনিয়ে বেশ জোরে জোরে বললো, শোনো সিরাজুল, তুমি ঢাকায় যেয়ে যদি লেখাপড়া করতে চাও, আমার

বাসায় থাকতে পারো। সেখানে থাকা-খাওয়ার কোনো অসুবিধা নাই। এখানে তোমার কত টাকা হাওলাৎ আছে? দুপুরে বসিরের বাড়িতে যেয়ে তুমি টাকাটা নিয়ে এসো আমার কাছ থেকে। তুমি পরে আমারে শোধ দেবে।

বসির হকচকিয়ে বাবুলের দিকে ঘুরে তাকাতেই বাবুল আবার বললো, চলো, ইস্কুল বাড়িটা দেখে আসি। এখানে আর কতক্ষণ থাকবে?

ইরফান আলি বিস্ফারিত লোচনে বসিরকে জিজ্ঞেস করলো, এনারে তো চেনলাম না? বসির সঙ্গে সঙ্গে বললো, চেনো না? মোনেম খাঁর ভাইর ব্যাটা, বাবুল চৌধুরী। বাবুলের চেহারা দেখে প্রথমেই ইরফান আলির মনে সমীহভাব জেগেছিল, তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খাঁর নাম শুনে ভয় পায় না এমন ব্যক্তির সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

আর সকলের থেকে বাবুল যেন আলাদা হয়ে গেল। সবাই শঙ্কা ও ভক্তি মিশ্রিত চোখে বাবুলকে দেখছে। ইরফান আলি রীতিমতন হাত কচলাতে শুরু করেছে। বসিরের ঠাট্টাটা সিরাজুলও বুঝতে পারে নি, সে ভাবলো, সত্যিই মোনেম খাঁ'র ভাইয়ের ছেলে এসেছে তার মতন এক গরিবের বাড়িতে? নিজে থেকেই তিনি অতগুলো টাকা দিয়ে দিতে চাইলেন? এ কী রূপকথা?

কোনো ঘটনারই কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকা নেওয়া বাবুলের শখ নয়। কেন সে এমন একটা নাটকীয় কাজ করে ফেলল তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। তবে ইরফান আলির ব্যবহার দেখে তার গা জ্বলে যাচ্ছিল, সিরাজুলের বাচ্চা বউটার অসহায় দৃষ্টি দেখে তার মনে হয়েছিল, চিরকালই কি গরিবরা এ রকম অপমান সহ্য করে যাবে, কেউ তাদের ভরসা দেবে না?

যদিও বাবুল জানে, নিজের টাকায় একজন গরিবের ধার শোধ করে দেওয়াটা কোনো সমস্যার সমাধানই নয়। সে নিজের বদান্যতা জাহির করতেও যায় নি, সে শুধু ইরফান আলিকে একটু অপমান করতে চেয়েছিল।

ইরফান আলি গদগদ ভাবে বললো, আমাগো বাড়িতে একবার পায়ের ধুলা দেবেন না সার? একটু পান-তামুক খাবেন।

বাবুল কঠিন গলায় বললো, না। সময় নাই। চলো, সিরাজুল।

বিকেলবেলা ওরা গেল রথতলার মাঠে মিটিং শুনতে। একটি বড় পাকা বাড়ির সামনে প্রশস্ত মাঠ, এককালে এখানে ধূমধামের সঙ্গে রথটানা হতো, এখন বোধ হয় আর তেমন ধূমধাম হয় না কিন্তু একটি চালা ঘরের মধ্যে দোতলা সমান রথটি এখনো রয়ে গেছে।

মিটিং ডেকেছে কপ, তবে আওয়ামী লীগের কর্মীসংখ্যাই বেশি। প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ এসেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দুপুরের পর থেকে আর বৃষ্টি পড়েনি। মাঠটিও বেশ উঁচু, কাদা জমে না। জনতার মধ্যে চাষাভূয়ো জেলে মুসলমান-হিন্দু সবরকমই আছে।

ফতিমা জিন্না নিজেই এখন সারা দেশে ঘুরে ঘুরে মিটিং করছেন। বক্তৃতাও ভালো দেন। তা বলে তিনি এত ছোট জায়গায় আসবেন তা আশা করা যায় না। তিনি আসেননি, তাঁর লিখিত ভাষণই পাঠ করা হলো, প্রথমে উর্দুতে, তারপর বাংলায়। তাঁর ভাষণে বেশ ভালো ভালো কথা আছে। তিনি ক্ষমতা হাতে পেলে সামরিক শাসনের অবসান ঘটাবেন। দেশে গণতন্ত্র আনবেন। প্রতিটি মানুষের সমান ভোটাধিকার থাকবে। অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেবেন। পাকিস্তান নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তাঁর ভাষণের মাঝে মাঝেই জনতার হর্ষধ্বনি হচ্ছে। যারা নিজের নামটিও স্বাক্ষর করতে জানে না, তারাও গণতন্ত্রের নামে উত্তেজনা বোধ করে। গণতন্ত্র যেন এক ম্যাজিক, যা এলে সব সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে।

ছোট একটি প্যাডে নোট নিতে নিতে বসির বললো, তুমি সাধারণ মানুষের এনথুথিয়াজম লক্ষ করছো, বাবুল? এবারে দেশে একটা চেইঞ্জ না এসেই পারে না।

বাবুল কোনো মন্তব্য করলো না।

খানিকবাদে একজন বাঙালী নেতা বক্তৃতা শুরু করলো। সেই বক্তৃতার ভাষা সাদামাটা, কিন্তু কণ্ঠস্বরে বেশ নাটক আছে, তার বক্তব্য মন স্পর্শ করে।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, এই লোকটা কে?

বসির বললো, একে চেনো না? এই-ই তো আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমান। ঐ পার্টির বড় বড় নেতাদের সরিয়ে দিয়ে সে এখন প্রধান হয়ে উঠেছে।

বাবুল প্রায় পাঁচ ছ' বছর পর শেখ মুজিবর রহমানকে দেখলো। চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, তাই সে চিনতে পারেনি। রাজনৈতিক দলে ক্ষমতার ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতাদের চেহারা বদলায়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি আর ক্ষমতাচ্যুত সোহরাওয়ার্দির চেহারায় ও ব্যক্তিত্বে অনেক তফাত সে দেখেছে। এই শেখ মুজিবর রহমানও এক সময় যখন মওলানা ভাসানি আর সোহরাওয়ার্দির যুগল ছত্রছায়ায় ছিলেন তখন তাঁর চেহারা ছিল বেশি প্রশ্রয় পাওয়া ধনী ব্যক্তির নাতির মতন। এখন তাঁর কণ্ঠস্বরে পৃথক ব্যক্তিত্ব।

সভা অতি সার্থক ভাবে শেষ হবার পর বসির আর বাবুল একটা শিরীষ গাছের নিচে বসে রইলো কিছুক্ষণ। হেঁটেই তো ফিরতে হবে, সুতরাং কোনো তাড়া নেই।

শর্টহ্যাণ্ডে লেখা নোটগুলি পড়তে পড়তে বসির বললো, আরও দু'তিনটা মিটিং দেখে একটা সার্ভে রিপোর্ট লিখবো। ভালো কপি হবে। মামুনভাই খুশী হবে।

বাবুল কোনো মন্তব্য করলো না।

বসির আবার বললো, সাধারণ মানুষের এতখানি সাপোর্ট, ফতিমা জিন্না পাওয়ারে আসবেনই। আইয়ুব ইলেকশান ডেকে নিজের কবর খুঁড়েছেন।

বাবুল এবারে বললো, তোমাকে একটা কথা বলবো, বসির? মিটিং শুনতে শুনতে আমার বউয়ের কথা মনে পড়ছিল খুব। তুমি হাসবে শুনে, তবু আমি আমার বউয়ের একটা কথা বলি। মঞ্জু বলেছিল, "আমার সাপোর্ট করা না করায় কী আসে যায়? আমার কী ভোট আছে? এই কথাটাই আমার কানে বাজছিল এতক্ষণ। এই যে আজ হাজার দেড় হাজার মানুষ এসেছিল বক্তৃতা শুনতে, এত উৎসাহের সঙ্গে চ্যাঁচামেচি করলো, এদের কিন্তু কারুরই ভোট নাই। এমন কি শেখ মুজিবর রহমানেরও ভোট দেবার অধিকার নাই। এ এক অদ্ভুত ফার্স, একটা ইলেকশান হচ্ছে, যারা বক্তৃতা দিচ্ছে কিংবা বক্তৃতা শুনতে আসছে, তাদের প্রায় কারুরই ভোট দেবার অধিকার নাই, ভোট দেবে মাত্র আশি হাজার মানুষ।

বসির বললো, দেশের এত মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, তা কি অস্বীকার করা যায়? বেসিক ডেমোক্র্যাটরা এর উল্টো দিকে যেতে পারবে?

–মাদাম জিন্না যা ঘোষণা করেছেন, তার সার কথাটা কী? তিনি সকলের জন্য গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার এনে দেবেন। অর্থাৎ? বেসিক ডেমোক্রাটদের উচ্ছেদ। এরা কিন্তু সুবিধাভোগী শ্রেণীর। এরা নিজেদের সব সুযোগ সুবিধা বিসর্জন দেবে, ফতিমা জিন্নার জন্য? আশ্চর্য!

–তুমি এতটা নৈরাশ্যবাদী হয়ো না, বাবুল। রিগিং যাতে না হয় তার জন্য আমরা সর্বক্ষণ ভিজিলেন্স রাখবো।

–রিগিং হোক বা না হোক, বেসিক ডিমোক্রেসি তুলে দিতে চাইবে, ঐ ইরফান আলির মতন ডিমোক্র্যাটরা? এ আমি বিশ্বাস করি না। ফতিমা জিন্নার কোনো ভবিষ্যৎ নাই।

–তুমি বাজি রাখবে? এক বোতল স্কচ!

–আমি মদ খাই না, বসির।

এর পর চার পাঁচটা গ্রাম ঘুরে নির্বাচনী সভা দেখলো বাবুল আর বসির। সর্বত্রই সমান উত্তেজনা। কাগজে কাগজে লেখা হচ্ছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ভোটের উৎসাহ অনেক বেশী। বাঙালীরা গণতন্ত্র-প্রিয়, তারা সামরিক শাসন চায় না, তারা ফতিমা জিন্নাকে চায়।

বাবুলের তবু মনে হয়, এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস। যারা ভোটের জন্য এত লাফাচ্ছে, তাদের মতামতের আসলে কোনো মূল্যই নেই।

শেষ পর্যন্ত বাবুলের কথাই ঠিক হলো। নির্বাচনী ফলাফলে শোচনীয় ভাবে হেরে গেলেন বেগম ফতেমা জিন্না। আইয়ুব খাঁ শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে নয়, পূর্ব পাকিস্তানেও সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট পেলেন, বিশ্বের চোখে তিনি হলেন পাকিস্তানের আইনসঙ্গত রাষ্ট্রপতি।

২৭ থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে

থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠতে না উঠতেই অলি তার কয়েকজন বান্ধবীকে হারালো। তার সহপাঠিনীদের, টুপটাপ করে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এই ফাল্গুনেই তিনজন পদবী বদলালো। অনিন্দিতা বিয়ের পর চলে গেল কানপুর, নাসিমের শ্বশুরবাড়ি কলকাতায় হলেও ৪৭৬

সে আর কলেজে আসে না।

ক্লাসে বরাবর আলির পাশে বসে চন্দনা, সেও হঠাৎ একদিন বাড়িতে এসে লাজুক লাজুক মুখে একখানা প্রজাপতি আঁকা চিঠি বার করল। তার বিয়ে ঠিক হয়েছে একেবারে অকস্মাৎ, পাত্র তার বৌদির ভাই, ডাক্তারি পাশ করে সে বিলেত যাচ্ছে। বিলেতের সুলভ নারীদের সম্পর্কে নানা রকম রটনা আছে, তাই সেই তরুণ ডাক্তারটির সন্ত্রস্ত পিতা-মাতা ছেলের বিয়ে দিয়ে বউকে সঙ্গে পাঠাতে চান।

চন্দনার বিয়ের খবর শুনে অলি খুবই অবাক। চন্দনা অসাধারণ ভালো ছাত্রী। অনার্সে ফাস্ট বা সেকেণ্ড স্ট্যাণ্ড করবেই, সে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে?

দেখা গেল চন্দনা সে জন্য মোটেই দুঃখিত নয়, বরং সে গোপন আনন্দে ঝলমল করছে। বিলেত যেন এক স্বর্গপুরী, সেখানে যাবার সুযোগ কে উপেক্ষা করতে চায়।

চন্দনা এ বাড়িতে অনেকবার এসেছে, সে অলির বাবা-মাকেও নেমন্তন্ন করলো। সে চলে যাবার পর বিমানবিহারী সকৌতুকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন তাঁর মেয়ের দিকে, তারপর বললেন, কী রে, তোর বন্ধুরা দেখছি একে একে গিয়ে ছাদনাতলায় বসছে, তোর জন্যও একটা পাত্তর-টাত্তর দেখি? অলির মা কৌতুকের সঙ্গে নয়, বেশ উদ্বিগ্ন ভাবেই বললেন, আমি ঠিক সেই কথাই ভাবছিলুম। অলকাদি একটি ভালো ছেলের কথা বলছিলেন, সেও বিলেত যাবে, অলকাদি বলছিলেন যদি আমরা অলির সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চাই...

অলি অনেকখানি ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো, সম্বন্ধ মানে?কল্যাণী ধমক দিয়ে বললেন, মেমসাহেব হয়েছিস নাকি? সম্বন্ধ করা কাকে বলে জানিস না?

বিমানবিহারী বললেন, আজকাল ভালো ভালো ছেলেরা সবাই বিলেত আমেরিকা চলে যাচ্ছে। তবু ওরকম ছেলের সঙ্গে আমি অলির বিয়ে দিতে চাই না।

কল্যাণী বললেন, কেন? অলকাদি যে ছেলেটির কথা বলেছেন সে জাস্টিস পি এন মিত্রর ছেলে, ব্যারিস্টারি পড়তে যাচ্ছে, চেহারাও সুন্দর।

বিমানবিহারী বললেন, তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু এরা যদি বিলেত থেকে আর না ফেরে? আমি মরে গেলে আমার এই ব্যবসা দেখবে কে? অলি আর অলির বরকেই তো সামলাতে

কল্যাণী বললেন, তোমার যত সব অদ্ভুত কথা। ফিরবে না কেন? ভালো বংশের ছেলেরা কখনো বিলেতের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে না। সবাই তো আর তোমার গুণধর ভাইটির

মতন নয়! দু'চার বছরের জন্য যারা গিয়ে ঘুরে আসে, তারা অনেক ভদ্র-সভ্য হয়। আমার ছোটমামার ছেলে অরুণকেই দ্যাখো না! কত বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে এসেছে। অলকাদিকে বলবো, তুমি ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে?

তা আমি কথা বলে দেখতে পারি। জাস্টিস পি এন মিত্রর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ওঁর স্ত্রী তো কৃষ্ণনগরের মেয়ে, নামকরা সুন্দরী ছিলেন, আমরা আতরদি বলে ডাকতুম। ওঁদের তো তিন ছেলে, তুমি কার কথা বলছো?

-ছোট ছেলে, ডাক নাম লালটু। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনোয় খুব মাথা। বুলির সঙ্গে মানাবে!

চায়ের টেবিলে চা-পান শেষ হয়ে গেছে। টেবলক্লথের ওপর ছড়িয়ে আছে কিছু বিস্কুটের গুড়ো, বাবা আর মা বসেছেন পাশাপাশি, উল্টো দিকে অলি, পিছনের জানলা দিয়ে শীতের নরম রোদ এসে পড়েছে তার গায়ে। জানলার বাইরে এসে বসেছে তিনটি শালিক পাখি।

বাইরে সবাই অলিকে খুব লাজুক আর নম্র জানে, কিন্তু বাবা-মায়ের কাছে সে বেশ জেদী মেয়ে।

সে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কার সম্পর্কে আলোচনা করছো? কল্যাণী বললেন, লালটুকে তো তুই একবার দেখেছিস! নীপার বিয়ের দিন এসেছিল, খুব ফর্সা রং, হলদে সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছিল...

অলি বললো, হ্যাঁ, তার সঙ্গে কার বিয়ের কথা হচ্ছে? আমি যে সামনে বসে আছি...আমি বুঝি একটা মানুষ নয়, আমার একটা মতামত নেবার কথাও বুঝি ভাবো না?

কল্যানী গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন? তোর মতামত ছাড়া বিয়ে হবে, তা কে বলেছে? হুট করে বললেই কি বিয়ে হয়ে গেল নাকি? কথাবার্তা

চলবে, দেখানো হবে, তোর মতামত নেওয়া হবে, ছেলের মতামত, তারপর সব কিছু যদি মেলে:একেই তো বলে সম্বন্ধ করা!

–আমার মতামতটা আগে নিলে তোমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট কমে যাবে!

–সেটা কী শুনি?

–এটা নাইনটিনথ সেঞ্চুরি নয়। গৌরীদানের প্রথা উঠে গেছে। আমার বিয়ের চিন্তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

বিমানবিহারী হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, তুই আমাদের একেবারে নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে ফেলে দিলি? তোর মায়ের কি গৌরীদান হয়েছিল নাকি?

অলি বললো, মার বিয়ে হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়েসে। তোমরা যদি ভেবে থাকো... বিমানবিহারী বাধা দিয়ে বললেন, তোর মায়ের খুব একটা খারাপ বিয়ে হয়নি কি বলিস? ভেবে দ্যাখ, ঐ বয়েসে আমার সঙ্গে যদি তোর মায়ের বিয়ে না হতো তা হলে হয়তো তোর জন্মই হতো না। সেটা একটা খুব খারাপ ব্যাপার হতো, বল্!

অলি উঠে পড়ে চলে যাচ্ছিল, বিমানবিহারী ঝুঁকে তার হাত চেপে ধরে বললেন, পালাচ্ছিস কেন? তোর মতামতটা কি বল, ভালো করে শোনা হলো না!

অলি ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, এম এ পাশ করার আগে আমি ওসব নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলতেও চাই না, শুনতেও চাই না!

–যাক বাঁচা গেল। আমারও ঠিক তাই মত। এখন তুই আর আমি দু'জনে মিলে তোর মায়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাবো। কি বল? জাস্টিস মিত্রের ছেলে লালটু অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করুক?

কল্যাণী বললেন, তোমাদের যা ইচ্ছে করো, আমি আর কোনোদিন কিছু বলতে যাবো না!

এই প্রসঙ্গটা আপাতত এখানেই চাপা পড়ে গেল।

কলেজে অলির একমাত্র বন্ধু রইলো বর্ষা। বিয়ের ব্যাপারে তার মতামত আরও অনেক বেশী উগ্র। সে চন্দনার বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে যেতেও রাজি নয়।

অলি তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো, চন্দনা তাদের খুবই ঘনিষ্ঠ, তার বিয়েতে না গেলে সে দুঃখ পাবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে বকুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে বর্ষা বললো, চন্দনার বাবা কত খরচ করছেন জানিস? মেয়ে-জামাইয়ের বিলেত যাবার জাহাজ ভাড়া দেবেন, মহম্মদ আলির দোকানে জামাইয়ের জন্য পাঁচখানা সুটের অর্ডার দিয়েছেন, এ ছাড়া গয়না দিয়ে চন্দনার গা

তো মুড়ে দেবেনই। আর ছেলের বাবা কী করবেন? ওদের বাড়ি আসানসোলে। সেখান থেকে শ'খানেক বরযাত্রী আসবে, বাস রিজার্ভ করে। সেই বাসের আসা-যাওয়ার ভাড়াও তিনি চেয়েছেন চন্দনার বাবার কাছে।

-তুই অত সব জানলি কী করে?

-চন্দনা বাড়িতে এসেছিল নেমন্তন্ন করতে, ওর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়েছি। যে-কোন বিয়ের কথা শুনলেই আমি এই সব খবরগুলো জেনে নিতে চাই। যে-সব বিয়েতে মেয়ের বাড়ি থেকে পণ নেওয়া হয়, সে সব বিয়ের নেমন্তন্ন আমি খেতে যাই না। আমার ঘেন্না করে।

-চন্দনার বাবা তো ঠিক পণ দিচ্ছেন না।

–মেয়ে-জামাইয়ের জাহাজ ভাড়া তিনি দিতে যাবেন কেন? ছেলেটার মুরোদ নেই? তুই একটা কথা ভেবে দ্যাখ, অলি, চন্দনা কি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী। দেখতে সুন্দর, তাকে যে বিয়ে করবে, সেই-ই তো ধন্য হয়ে যাবে? চন্দনা শুধু মেয়ে বলেই তার বাবাকে টাকা খরচ করতে হবে? এই বারবারিক সিস্টেমকে তুই সাপোর্ট করিস?

–চন্দনার বাবার আছে বলেই দিচ্ছেন। উনি নিশ্চয়ই ইচ্ছে করেই দিচ্ছেন। ওরা চায়নি।

–কী করে বুঝলি ওরা চায়নি? চন্দনার বাবা দিতে চাইলে, সেই হতভাগা ছেলেটা নিতে রাজি হলো কেন? তার কোনো প্রেস্টিজ জ্ঞান নেই? ওর আমি মুখও দেখতে চাই না।

–তুই বড্ড রেগে যাচ্ছিস, বর্ষা। ঠিক আছে, আমরা চন্দনার বরের মুখ দেখবো না, শুধু চন্দনার সঙ্গে দেখা করে আসবো।

–তোর যেতে ইচ্ছে করে, তুই যা!

হ্যাণ্ড ব্যাগ খুলে বর্ষা একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করলো। শঙ্কিত ভাবে এদিক ওদিক তাকালো অলি। বর্ষার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি করা চাই। ছেলেরা যদি সিগারেট খেতে পারে তা হলে মেয়েরা কেন পারবে না, এই যুক্তিতে সে কিছুদিন ধরে সিগারেট টানতে শুরু করেছে। তাও সে লুকিয়ে চুরিয়ে খাবে না, প্রকাশ্যেই খাওয়া চাই। অনেকেই হাঁ করে তাকিয়ে দেখে, বয়স্ক লোকরা চলতে চলতে থমকে যায়, কেউ কেউ বিড় বিড় করে কী যেন বলে, খুব সম্ভবত ঘোর কলিকালের আন সম্পর্কে ঘোষণা, কেউ কেউ তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই কটুক্তি করে যায়। বর্ষার কোনো দিকে ভূক্ষেপ নেই। সহপাঠীরাও অনেকে টিটকিরি দেয়। তার প্রসঙ্গ উঠলেই ছেলেরা বলে, কোন্ বর্ষা স্যান্নাল, সেই সিগারেট ফোঁকা পাগলিটা? ওয়াল ম্যাগাজিনে তার সম্পর্কে রসরচনা বেরিয়েছে, একটি ছেলে নিখুঁত ভাবে বর্ষার মুখ এঁকে দিয়েছে।

অলি অনেক ভাবে আপত্তি জানিয়েও শুধু ধমক খেয়েছে বর্ষার কাছ থেকে। বর্ষার ব্যক্তিত্বের কাছে সে হেরে যায়। তবে বর্ষার অনেক প্ররোচনাতেও সে নিজে সিগারেট ধরেনি। কয়েকবার সে সিগারেট টেনে দেখেছে, তার ভালো লাগে না।

সিগারেট ধরিয়ে বর্ষা বললো, আমার আরও রাগ ধরে কেন জানিস? প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়া কত শক্ত, অনেক ছেলেমেয়ে চান্স পায় না, আর এই মেয়েগুলো ফোর্থ ইয়ারে উঠতে না উঠতেই বিয়ে করে কলেজ ছেড়ে দিচ্ছে! এটা একটা ক্রাইম। বিয়ের নাম শুনলেই মেয়েগুলো নেচে ওঠে। চন্দনার মতন মেয়েও যে পড়াশুনো ছেড়ে

অলি বললো, চন্দনার কথা শুনে মনে হলো ওর বিলেত যাবার খুব ইচ্ছে হয়েছে।

–ও নিজে বিলেত যেতে পারতো না? ওর বাবার পয়সা আছে, তা ছাড়া ও ডেফিনিটলি ভালো রেজাল্ট করতো, বিলেতের যে-কোনো কলেজে অ্যাপ্লাই করলে স্কলারশিপ পেতে পারতো! সেটুকু ধৈর্য ধরতে পারলো না, বরের ল্যাজ ধরে ওকে সমুদ্র পার হতে হবে?

–তুই বড্ড খারাপ কথা বলিস বর্ষা।

–কী খারাপ কথা বলেছি রে? চন্দনার বরকে শুধু বাঁদর বলেছি, ওকে শালা বলা উচিত। শালা!

–তুই মনীশকে বিয়ে করবি না?

–মনীশকে? তোর মাথা খারাপ হয়েছে অলি? তুই আমাকে এরকম একটা সিলি প্রশ্ন করতে পারলি? যে-ছেলে ফ্রানৎস কাফকার নাম শোনেনি, থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি কী তা জানে না, তাকে আমি কথা বলার যোগ্যই মনে করি না।

–মনীশ কিন্তু তোর জন্য একেবারে পাগল?

–আমি পাগল-টাগলদের থেকে দূরে থাকতে চাই। ছোটবেলা থেকেই আমি পাগলদের দেখলে ভয় পাই।

–ধ্যাৎ! আমি কি সেই সেন্সে বলছি নাকি?

–জানি। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হলে মনীশকে আমার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। আমার রুচি, আমার মানসিকতা বুঝতে হবে, শুধু পেছন পেছন ঘোরা আর তোষামোদ করলেই তো চলবে না। ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমার আপত্তি নেই, শুধু বন্ধুত্ব। বিয়ে-ফিয়ের কথা ভাবলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে। কপালে সিঁদুর, হাতে লোহা...এগুলো কিসের চিহ্ন জানিস? মেয়েদের জোর করে ধরে এনে পুরুষরা তাদের চুলের মাঝখানটায় চিরে দিত। অর্থাৎ এই মেয়েটা আমার বন্দিনী। সেই রক্তের দাগ এখনকার সিঁদুর। বিয়ের পর হাতে লোহা পরতে হয় কেন, তার মানে লোহার শেকল দিয়ে হাত বাঁধা হলো...এখনও চন্দনার মতন মেয়েরা সেধে সেধে ক্রীতদাসী হতে চায়। পৃথিবীতে যেদিন পুরুষ আর মেয়েরা একদম সমান সমান হবে, সেইদিন আমি বিয়ের কথা ভাববো!

অলি হেসে ফেললো। বর্ষাও হেসে বললো, ভাবছিস, ততদিনে আমি বুড়ি হয়ে যাবো?

–সে কথা ভাবিনি। তুই যখন এই সব কথা বলিস, তোর মুখে এমন একটা সীরিয়াস ভাব ফুটে ওঠে, মনে হয় তুই যেন আমার সঙ্গে কথা বলছিস না, গোটা পুরুষ জাতিটাই তোর চোখের সামনে...।

–চল, কফি হাউসে যাবি?

একটু দ্বিধা করে অলি বললো, না। কয়েকদিন আগে কফি হাউসে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে, সেই জন্য আর ওখানে যেতে ইচ্ছে করে না।

বর্ষা বললো, চল, তা হলে আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটু বসবি? আজ আমাদের বাড়িতে কেউ নেই।

অলির জন্য এখন আর বাড়ির গাড়ি আসে না, সে নিজেই বারণ করে দিয়েছে। সে এখন ট্রামে বাসে যাতায়াত করে। এখন দুপুর তিনটে, পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ফিরলেই চলবে।

বর্ষাদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। তিনতলা বাড়িটিতে অনেকগুলি ভাড়াটে। দোতলায় বর্ষাদের দুটি মাত্র ঘর। বাবা মারা গেছেন, মা ছোট বোন আর দাদা-বৌদির সঙ্গে থাকে বর্ষা। বাড়ির সবাই মুর্শিদাবাদে দেশের বাড়িতে গেছে। কলেজ খোলা বলে বর্ষা যায়নি।

একখানা নিজস্ব পড়ার টেবিল পর্যন্ত নেই বর্ষার। টেবিল ফেলার জায়গা নেই, দু'দিকে দুটি খাট পাতা, একটি তার মা ও ছোট বোনের। ঘরের দেয়ালে একটি জোন অব আর্ক-এর বাঁধানো ছবি। বর্ষার খাটের ওপর বইপত্র ছড়ানো, সেগুলোই সরিয়ে সরিয়ে বর্ষা বললো, বোস এখানে। আমি চা তৈরি করে আনছি।

বসবার ঘর নেই, শোওয়ার ঘরেই বাইরের লোক এসে বসে, তাও খাটের ওপর। এরকম দেখার অভিজ্ঞতা নেই অলির। পড়ার টেবিল নেই, তবু বর্ষা রেজাল্টের জোরে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছে। হাত খরচ চালানোর জন্য সে একটা টিউশনি করে। হঠাৎ অলির চোখ ছলছল করে উঠলো। নিজেকে তার মনে হলো স্বার্থপর। বর্ষার তুলনায় সে কত আরামে, কত ভালো অবস্থায় থাকে! এটা যেন একটা অন্যায়।

শুধু চা নয়, দুটি ডিমের ওমলেটও ভেজে নিয়ে এলো বর্ষা।

অলি জিজ্ঞেস করলো, বাড়িতে আর কেউ নেই, তোর খাবার কে রান্না করে দেয়?

বর্ষা বললো, কে আবার দেবে? আমি নিজেই রান্না করি। আমাদের তো ঠাকুর-চাকর নেই। অন্য সময় মা রান্না করে। আমার মা কী রকম জানিস? যেন পরের সেবা করার জন্যই জন্মেছে। আমার বাবা ছিলেন অটোক্রাট হিটলারের মতন। এক হিসেবে হিটলারের চেয়েও খারাপ। কারণ কোনো ক্ষমতা ছিল না, সাধারণ রেলের চাকরি করতেন, বাড়িতে ছিল যত রকম হম্বিতম্বি, মা ভয় পেত খুব বাবাকে। আগে মা মুখ বুজে স্বামীর সেবা করে গেছে, এখন ছেলেমেয়ের সেবা করছে। নিজের কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই। দাদাকেও মা

ভয় পায়। আমি সামনের বছর একটা চাকরি নেবো ঠিক করেছি। তখন মাকে নিয়ে দাদার সংসার থেকে চলে যাবো।

–তুই এম এ পড়বি না?

–প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবো। কোয়ালিফিকেশন তো বাড়াতেই হবে। এদিকে আয় অলি... বর্ষা একদিকের একটা জানলা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠলো একটা অপূর্ব দৃশ্য। একটা চমৎকার বাগান, অনেক রকম ফুলের গাছ, কয়েকটা বড় বড় আম গাছ, তার মাঝখানে একটি শ্বেত পাথরের নগ্ন নারীমূর্তি।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দুই বান্ধবী দাঁড়ালো জানলার পাশে। অলির তুলনায় বর্ষা বেশ লম্বা, তার মাথার চুল আলুথালু।

বর্ষা বললো, এটা লাহাদের বাড়ির বাগান, সুন্দর না? আমি বিনা পয়সায় এই বাগানের শোভাটা পেয়ে যাই। তবে জানলাটা সব সময় খুলি না, সব সময় দেখলে এই সুন্দর ব্যাপারটা যদি পুরোনো হয়ে যায়? ঐ লাহারা কি আর রোজ ওদের বাগানে এসে বসে?

পাথরের মূর্তিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বর্ষা বললো, ঐ মূর্তিটা দেখলেই আমার তোর কথা মনে পড়ে। মুখখানা ঠিক তোর মতন না?

লজ্জায় রক্তিম হয়ে অলি বললো, যাঃ, কী যে বলিস!

অলির কাঁধে হাত রেখে বর্ষা বললো, তুই বড় সুন্দর রে, অলি! এই বাগানটার মতন, নরম আর পবিত্র। এত নরম থাকিস না। এই পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর জায়গা, সবাই তোর ওপর সুযোগ নেবে।

কিছুক্ষণ দু জনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো জানলার কাছে। বর্ষা সাধারণত বেশী কথা বলে, এখন সেও নীরব। অলির মনে পড়ছে বাবলুদার কথা। বাবলুদা এখন আর বেশী আসে

তাদের বাড়িতে। ক'দিন আগে কফি হাউসে অলির সামনেই বাবলুদা একটি ছেলের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়েছিল, সেই ছেলেটি নাকি কৌশিকের নামে কী খারাপ কথা বলেছে। বাবলুদা কি অলির চেয়েও কৌশিককে বেশী ভালবাসে? রাস্তায় কোনো ছেলে যখন অলির দিকে তাকিয়ে অসভ্য ইঙ্গিত করে, তখন তো বাবলুদা তাদের কিছু বলে না?

ছেলেবেলা থেকে দেখছে, তবু বাবলুদাকে এখনো ঠিক বুঝতে পারে না অলি। হঠাৎ হঠাৎ বাবলুদার মেজাজ বদলে যায়। বাবলুদা যখন-তখন তাকে জোর করে আদর করতে চায়, কিন্তু মুখে একটাও ভালো কথা বলে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বর্ষা বললো, চন্দনার মতন তুইও হঠাৎ বিয়ে করে চলে যাবি না তো, অলি? তা হলে আমি তখন কী করবো?

অলি বললো, যাঃ, ওসব বিয়ে-টিয়ের কথা আমি ভাবিই না মোটে!

অলিকে আর একটু কাছে আকর্ষণ করে বর্ষা বললো, তোকে আমি বড় ভালোবাসি রে, অলি! তুই একদিন কলেজে না এলে আমারও ক্লাস-ফ্লাস করতে ইচ্ছে করে না!

বর্ষা অলির গালে তার গালটা ঠেকালো।

২৮ কবি জসিমউদ্দিনের বাড়িতে

কবি জসিমউদ্দিনের বাড়িতে এক রবিবার সকালে আড্ডা দিতে গিয়ে মামুনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।

ঐ বাড়িতে একবার আড্ডায় জমে গেলে উঠে পড়া শক্ত। কবি নিজেই অত্যন্ত মজলিশী মানুষ, অফুরন্ত তাঁর গল্পের স্টক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন থেকে শুরু করে, হাস্য রাজা, নজরুল প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনেক অন্তরঙ্গ কাহিনী শোনা যায় তাঁর মুখে। তা ছাড়া আরও অনেক বিশিষ্ট আড্ডাধারী এখানে এসে জমায়েত হন প্রায়ই।

মামুন ইদানীং আড্ডা দেবার সময় পান না, সংবাদপত্রের কাজ নিয়েই খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। নতুন কাগজ, রেফারেন্স লাইব্রেরি নেই, কোনো তথ্য যাচাই করতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে হয় খুব। পুরোনো কোনো তথ্যের সন্ধানে তিনি নিজেই নানা জায়গায় ছোটাছুটি করেন। সেইরকম একটি কারণেই তাঁর মোতাহার হোসেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন ছিল, তাঁকে বাড়িতে পাননি, তাঁর খোঁজেই তিনি এসে পড়লেন কবি জসিমউদ্দিনের বাড়ির আড্ডায়। মোতাহার হোসেনের সঙ্গে দেখা হলো, প্রয়োজনও মিটলো, কিন্তু আজ্ঞা ছেড়ে ওঠা গেল না। কবির গৃহের আতিথেয়তা বিখ্যাত, শুধু গাল-গল্প নয়, নাস্তা-পানি না খাইয়ে তিনি কারুকে ছাড়েন না।

বৈঠকখানা ঘরটি বেশ প্রশস্ত। দেওয়ালে নানাবিধ ছবি, তার মধ্যে একটি রাধাকৃষ্ণের। একটি বড় ক্যালেণ্ডারে পল্লী দৃশ্য ঝুলছে এক কোণে, ক্যালেণ্ডারটি গত বৎসরের, কিন্তু সুন্দর ছবিটির জন্যই সেটি এখনও স্থানচ্যুত হয়নি। সেই ছবিটির নিচে একটি ইজি চেয়ারে বসে আছেন একজন প্রায়-বৃদ্ধ সুদর্শন পুরুষ। এক একজন মানুষের চেহারা ও পোশাক ছাড়িয়েও একটা ব্যক্তিত্বের জ্যোতি থাকে, একবার সে তাকালে আর একবার দৃষ্টি ফিরে আসে।

মানুষটি যে বেশ দীর্ঘকায় তা তাঁর ছড়ানো পা ও হাঁটুর উচ্চতা দেখলেই বোঝা যায়। পাজামা ও কুতা পরা, গালে নিখুঁতভাবে ছাঁটা কাঁচা-পাকা দাড়ি। চোখে রোদ-চশমা। ঘরের মধ্যেও ঐ চশমা পরে আছেন বলে তাঁর মুখোনি পুরোপুরি বোঝা যায় না। কিন্তু তাঁর চিবুক ও নাক দুই-ই সূচোলো। মামুনের সঙ্গে কেউ তাঁর পরিচয় করিয়ে না দিলেও তিনি চিনতে পারলেন।

অবিভক্ত বাংলার শেষ দশ বছরের রাজনীতিতে জনাব আবুল হাসেম ছিলেন একজন প্রভূত ক্ষমতাশালী মানুষ। নিজে কিঞ্চিৎ আড়ালে থেকে তিনি মুসলিম লীগ ও কোয়ালিশন মিনিস্ট্রিতে কলকাঠি নাড়তেন। লেখাপড়া জানা, তীক্ষ্ণধী পুরুষ, আর্থিক অবস্থাও ভালো। বর্ধমানের দিকে ওঁদের অনেক জমি জায়গা ছিল। পার্টিশানের পর এদিকে চলে এসেছেন।

মামুনের সঙ্গে সেই কলকাতার সময় থেকে যথেষ্ট চেনাশুনো থাকলেও এর মধ্যে বছর দু'তিন দেখা হয়নি। তবে মামুন শুনেছিলেন যে আবুল হাসেম সাহেবের দৃষ্টিশক্তি সম্প্রতি খুব খারাপ হয়ে গেছে, চোখে প্রায় দেখতেই পান না, কিন্তু মস্তিষ্ক আছে পুরোপুরি সজাগ। ওঁর এক ছেলের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই দেখা হয়, তাঁর নাম বদরুদ্দিন ওমর। পত্র-পত্রিকায় এই ছেলেটির দীপ্ত-খরসান ভাষায় প্রবন্ধ পড়ে মামুন অবাক ও মুগ্ধ হয়েছেন। তবে এর লেখার মধ্যে কিছুটা তিক্ততার ভাব আছে, যা মামুনের ঠিক পছন্দ হয় না। মামুনের সন্দেহ হয়, আবুল হাসেম সাহেবের মতন একজন। ধর্মনিষ্ঠ, জাতীয়তাবাদী মানুষের এই পুত্রটি বোধ হয় কমুনিস্ট!

মামুন এগিয়ে গিয়ে বললেন, আস্সালাম আলাইকুম, হাসেম সাহেব!

কালো চশমা পরা মানুষটি মুখ তুলে প্রতি-অভিবাদন জানালেন, তারপর উঁচু গলায় হাসলেন। জসিমউদ্দিনও হেসে উঠলেন। আরও দু'তিনজন।

বিস্মিত মামুনের পিঠে হাত দিয়ে জসিমউদ্দিন বললেন, সবাই ঐ এক ভুল করে। ওনারে চেনতে পারলা না? উনি হইলেন মুসাফির।

মামুনের তবু ভুরু কুঁচকে রইলো। মুসাফির মানে? সৈয়দ মোস্তাফা আলির ভাই মুজতবা আলি? যে এখন লেখক হিসেবে খুব নাম করেছে, শান্তিনিকেতনে পড়ায়? কিন্তু তার তো চেহারা অন্যরকম, টকটকে ফর্সা রং!

আর একজন কেউ বললো, সওগাতে এই মুসাফির সাহেব সিরিজ লিখতেন, আপনি পড়েন নাই?

মামুন অস্ফুট স্বরে বললেন, হ্যাঁ, তা পড়েছি। কিন্তু...

কথায় কথায় জানা গেল এই মুসাফির এক সময় বেশ পরিচিত লেখক ছিলেন, তারপর বহু বছরের জন্য উধাও হয়ে যান। সত্যিকারের মুসাফিরের মতন বহু দেশ ঘুরেছেন, সম্প্রতি সেট্‌ল করেছেন ভারতে, কয়েকদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে বেড়াতে এসেছেন।

মামুনের মুখ থেকে ফস্‌ করে প্রশ্ন বেরিয়ে এলো, ইণ্ডিয়ায় সেট্‌ল করলেন কেন?

মামুন অন্য কিছু ভেবে প্রশ্নটি করেননি, তাঁর মাথায় সব সময় এখন তাঁর পত্রিকার চিন্তা। মুসাফির সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে সেটল করলে তাঁর পত্রিকার জন্য আর একজন লেখককে পাওয়া যাবে, মামুনের এই কথাটাই প্রথমে মনে এলো। ভালো গদ্য লেখকের খুব অভাব।

মামুনের প্রশ্ন শুনে মুসাফির সাহেব হেসে বললেন, আপনারা নবাব ফারুকির নাম শুনেছেন? অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী ছিলেন একসময়।

সকলেই মাথা হেলালো। নবাব ফারুকীর নাম কে না জানে! মামুন লক্ষ করলেন, মুসাফির সাহেবের কথায় পরিষ্কার পশ্চিমবঙ্গীয় শান্তিপুরী টান। কণ্ঠস্বরটি ভরাট ও মিষ্টি।

মুসাফির সাহেব বললেন, পার্টিশানের পর নবাব ফারুকীকে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কলকাতায় রয়ে গেলেন, পূর্ব পাকিস্তানে গেলেন না কেন? সেখানে আপনার জমিদারি রয়েছে...তিনি কী উত্তর দিতেন জানেন? তিনি সবাইকেই বলতেন, ওদিকে যেতে পারি। কিন্তু ক্যালকাটা ক্লাবটাকে উপড়ে তুলে নিয়ে যেতে পারো ঢাকায়? ক্যালকাটা ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গে

রোজ আড্ডা দিতে না পারলে যে ওদিকে মন টিকবে না। আমারও হয়েছে সেই অবস্থা। আমার অবশ্য ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে আছে একটা বাগান। নিজে হাতে আমি তার অনেক গাছ পুঁতেছি। সেই গাছগুলোকে তুলে না আনতে পারলে আমার একা আসা হবে না!

মোতাহার হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মুসাফির হয়েও নিজের বাড়ির বাগানের ওপর এত টান?

–আমি মুসাফির হতে পারি, যাযাবর তো নই। আমার একটা শিকড় আছে, সেটা সব সময় টের পাই।

–ইণ্ডিয়ার অবস্থা এখন কী রকম? থাকার অসুবিধা নাই? কাগজে তো যা পড়ি মাঝে মাঝে,

–হ্যাঁ, অসুবিধে আছে। অন্তত ছ'রকম অসুবিধের কথা বলা যায়। তার মধ্যে তৃতীয়টি হলো, হঠাৎ কোনোদিন দাঙ্গা লাগলে কচুকাটা হতে পারি। ইণ্ডিয়ায় দাঙ্গার তো বিরাম নেই!

–এইটা হলো তৃতীয় অসুবিধে?

সবাই হেসে উঠলো একসঙ্গে। মামুন আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, ইণ্ডিয়ার অবস্থা সত্যিই এখন কী রকম বলেন তো! আপনার কাছ থেকে ঠিক খবর পাওয়া যাবে।

মুসাফির একটা চুরুট ধরালেন। কালো চশমাটা তিনি খোলেননি একবারও। ঠোঁটে সব সময় পাতলা হাসি। সব মিলিয়ে মানুষটিকে রহস্যময় মনে হয়।

তিনি চুরুটে টান দিয়ে বললেন, ইণ্ডিয়ায় একটা এক্সপেরিমেন্ট চলছে। হিন্দুরা অনেকদিন পর রাজ্য শাসনের ভার পেয়েছে। মুখে ওরা যাই-ই বলুক, ওদের কনস্টিটিউশানে যতই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা থাক, হিন্দুরাই এখন শাসক। ধরুন, প্রায় সাত শো বছর পর এই ক্ষমতা পেয়ে তাদের খানিকটা দিশেহারা অবস্থা। হিন্দু চিন্তাধারার মধ্যে সব সময় একটা বৈপরীত্য থাকে। সেই তুলনায় মুসলিম মাইণ্ড বোঝা তবু সহজ। তা স্পষ্ট ও একমুখী। হিন্দুদের মধ্যে যেমন আছে গোঁড়ামি, তেমনই আবার ঔদার্যের প্রতি মোহ।

একজন বললো, ঔদার্যের ভাণ! কিংবা ঔদার্যের ভণ্ডামিও বলতে পারেন!

মুসাফির বললেন, মোহটাই বোধ হয় সঠিক আমার মতে। হিন্দুরা যেমন সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তেমনি নাস্তিকতাও তারা কিছুটা সহ্য করে। হিন্দুধর্মের একটা অংশের মধ্যে নাস্তিকতাবাদ চলে আসছে অনেকদিন ধরে। তারা একসময় বৌদ্ধদের পিটিয়ে মেরেছে, আবার নিরীশ্বরবাদী গৌতম বুদ্ধকে অবতার বলেও স্বীকার করে নিয়েছে।

–স্বীকার করে নিয়েছে শুধু মুখেই। কোনো হিন্দু কি বিষ্ণু বা রামের মতন বুদ্ধের পূজা করে?

–বুদ্ধ মূর্তি দিয়ে তারা ঘর সাজায়। তাতে বাধা নেই। ঐটাই ঔদার্যের মোহ। এই মোহ থেকেই তারা মনে করে যে আধুনিক পৃথিবীতে তারা একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়তে পারবে। দু'পাঁচ শো জন হয়তো এটা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে। আবার হিন্দুদের একটা বিরাট অংশ মনে করে, ইংরেজদের কাছ থেকে তারাই ক্ষমতা ছিনিয়ে এনেছে, সুতরাং মুসলমানদের তারা দয়া করে যেটুকু দেবে, তা নিয়েই মুসলমানদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অধিকাংশ হিন্দু কংগ্রেস পার্টিকে ভোট দেয় কিন্তু মহারাষ্ট্রের সাভারকরকে অস্বীকার করে না। সুতরাং কাগজে-কলমে ও হিন্দু মানসিকতায় একটা দো-টানা চলছে। এই জন্যই আমি বলেছি, এটা একটা

এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজ। তার পরে, তাদের রাজ্য শাসনের অভিজ্ঞতা নেই, তারা ফলো করছে। ব্রিটিশ মডেল। কিন্তু যে দেশে শতকরা সত্তর জনের ক-অক্ষর গোমাংস, শতকরা ষাট জন দু বেলা খেতে পায় না, শতকরা পঞ্চাশ জনের একটি গেঞ্জি পর্যন্ত গায়ে দেবার সামর্থ্য নেই, সেই দেশে ব্রিটিশ মডেল পদে পদে হাস্যকর হয়। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইকুয়ালিটি ইন দা আই অফ ল, আইনের চক্ষে ধনী-নির্ধন সবাই সমান। জমিদার রামচন্দ্র তার প্রজা শ্যামচন্দ্র কিংবা শেখ রহিমের জমি কেড়ে নিল জোর করে। এখন শ্যামচন্দ্র কিংবা শেখ রহিম আইনের। সাহায্য পাবে কী করে? আইন কিনতে পয়সা লাগে। আইন বুঝতে লেখাপড়া লাগে। ব্রিটেনে কী হয়? সেখানে সরকারের চোখনাক অনেক বেশি সজাগ, সরকারের হাত লম্বা। সারা দেশে কী ঘটছে, সরকার তার খোঁজ খবর রাখে। সে দেশেও ধনীরা গরিবদের শোষণ করে বটে কিন্তু জমি কেড়ে নিতে পারে

না, যাকে-তাকে খুন করে পার পায় না, মাঝখানে সরকারের হাত এসে পড়ে। আর ভারতের নতুন সরকার বড় বড় শহরগুলোই সামলাতে পারছে না, গ্রামে তো সরকারের কড়ে আঙুলটিও কখনো পৌঁছোয় না।

মামুন বললেন, আমাদের এদিকেও তো একই অবস্থা।

মুসাফির বললেন, আমি আপনাদের দেশ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। আমি ইণ্ডিয়ার সিটিজেন, সে দেশের সমালোচনা করতে পারি। আপনাদের সম্পর্কে শুধু একটা কথাই বলতে পারি, আল্লা আপনাদের রক্ষা করুন!

–আপনি মুসলমান হয়েও আমাদের পর পর ভাবছেন? পার্টিশান তো একটা পলিটিক্যাল ডিভিশন, কিন্তু দু'দেশের মানুষ যে এত দূরে সরে যাচ্ছে... ৪৮৪

–সেইটাই তো সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। ভারত কাগজে-কলমে ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা করে বসে আছে, আর আপনারা গড়ছেন ইসলামিক রাষ্ট্র। আমার ধারণা, পার্টিশান না হলে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের এক্সপেরিমেন্টটা তবু যদি বা সাকসেসফুল করা যেত, এখন আর তার কোনো আশা নেই। অবস্থা আরও খারাপ হবে, যদি এই দুই দেশের মধ্যে একটা যুদ্ধ বাধে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, শিগগিরই সেরকম একটা যুদ্ধ বাধবে।

–অ্যাঃ আবার যুদ্ধ?

–আমি চোখ বুজলেই যেন সেই দৃশ্য দেখতে পাই। এবারে আর কাশ্মীরে সীমান্ত সংঘর্ষ নয়। পুরোপুরি দুই দেশের যুদ্ধ, প্লেন থেকে বোমা পড়বে

–না, না, না, আপনি বড় সিনিক্যাল কথা বলছেন।

মোতাহার হোসেন গম্ভীরভাবে বললেন, আমি মুসাফির সাহেবকে বহুদিন ধরে চিনি। ওকে তোমরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বলতে পারো। উনি যা যা বলেন সব মিলে যায়। নজরুলের যে এই অবস্থা হবে, সে কথা উনি আমাকে বহু আগেই বলেছিলেন। মনে আছে, আপনার?

আমার নিজের জীবন সম্পর্কেও উনি এমন কয়েকটা কথা বলেছেন, যা প্রত্যেকটা মিলেছে।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, উনি হাত দেখতে পারেন বুঝি? মুসাফির প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, না, না, আমি ওসব কিছু জানি না। মোতাহার, তুমি এসব কী আবোলতাবোল বলছো!

জসিমউদ্দিন বললেন, হ্যাঁ, মুসাফিরের এই একটা আনক্যানি ক্ষমতা আছে, আমিও লক্ষ করেছি।

আলোচনা অন্যদিকে ঘুরে গেল। অনেকেই মুসাফিরকে ঘিরে ধরে হাত বাড়িয়ে দিল। মুসাফির প্রথম কয়েকবার তাদের প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত এক একজনের হাত ছুঁয়ে নানান কৌতুকময় মন্তব্য ছুঁড়তে লাগলেন।

আড্ডা ভাঙলো বেলা একটায়। মুসাফির সাহেবের জন্য একটা গাড়ি মজুত আছে। তাঁর কোনো ব্যবসায়ী বন্ধু কয়েকদিনের জন্য গাড়িটি দিয়েছে। কাগজের সম্পাদক হবার পর মামুন একখানা অফিসের গাড়ি পান বটে কিন্তু আজ ড্রাইভার আসেনি, তিনি রিকশায় এসেছেন।

মুসাফির সাহেব কয়েকজনকে লিফট দিতে চাইলেন। মামুন উঠলেন সেই গাড়িতে। তিনি সব শেষে নামবেন। নামবার একটু আগে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সত্যিই ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখতে পান? সাধু-ফকিরদের যেরকম অলৌকিক ক্ষমতা থাকে শুনেছি...

মুসাফির স্বভাবসিদ্ধ সহাস্য কণ্ঠে বললেন, না, আমার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। তবে ঐ জসিমউদ্দিন যা বললো, সেটাই ঠিক। মাঝে মাঝে আমার একটা আনক্যানি ফিলিং হয়, হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে...ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের একটা ছবি আমি প্রায়ই দেখি। আপনি তো সাংবাদিক, সে জন্য তৈরি হয়ে থাকুন!

–কিন্তু কী নিয়ে যুদ্ধ হবে? মুসাফির নিজের মাথায় টোকা মেরে বললেন, পাগলামি নিয়ে! দু'দেশের পাগলামির তো একটাই নাম, কাশ্মীর!

–হায় আল্লা! এই গরিব দেশে যুদ্ধ!

–সব যুদ্ধেই গরিবরা গরিবদের মারে! বড়লোকরা মজা দেখে!

–আপনি...মুসাফির সাহেব, আপনি...কোনো মানুষের জীবনেরও এরকম ছবি দেখতে পান?

–হ্যাঁ, তাও কখনো কখনো দেখি। কী করে দেখি তা জানি না। খুব সম্ভবত টেলিপ্যাথি। অন্য একজনের সাব-কনসাস মাইণ্ডের ছবিটা আমার মস্তিষ্কের বেতার তরঙ্গে কী করে যেন ধরা পড়ে যায়। আমার নিজের ছোট ভাই, খালেদ, একদিন তার মুখের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলাম। দেখি যে, তার চোখের দুটো মণি নেই। সে তাকিয়ে আছে, কিন্তু চোখ দুটি সাদা। আমি খালেদকে তখুনি ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করতে বললাম। সে শুনলো না। তার আই-সাইট পারফেক্ট! স্বাস্থ্য ভালো, সে কেন ডাক্তারের কাছে যাবে। চাকরিও ভালো করে, বুদ্ধিমান ছেলে...কিন্তু শুনলে হয়তো আপনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না, এক মাসের মধ্যে সেই সুস্থ ভাইটি আমার পাগল হয়ে গেল। একে আপনি কী বলবেন!

–সত্যি বিশ্বাস হতে চায় না।

–আরও আশ্চর্য হচ্ছে, আমি নিজের জীবনের ভবিষ্যতের কোনো ছবি দেখি না। অন্যদের দেখি। আমি জিন্না সাহেবকেও দেখেছিলাম। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের গোড়ার দিকে। আমি তখন জিন্না সাহেবের প্রচণ্ড অ্যাডমায়ারার। কিন্তু ওনার দিকে তাকিয়েই আমার বুক কেঁপে উঠলো। মুখে পরিষ্কার মৃত্যুর ছায়া। ভাবুন তো আপনি, যে মানুষটা এতকালের একটা পুরাতন দেশ ভেঙে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, তার নিজের আর আয়ু নেই।

–মুসাফির সাহেব, আপনি আর কতদিন থাকবেন ঢাকায়? একদিন আমার বাসায় এলে খুব খুশি হবো। আমরা একটা নতুন পেপার বার করছি, যদি সেখানে আসেন, যদি আমাদের জন্য কিছু লেখেন–

মুসাফির কোনো উত্তর না দিয়ে মামুনের মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মামুনের বুকটা কেঁপে উঠলো। এক্ষুনি জিন্না সাহেবের কথা বলার পরই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে এমন দীর্ঘশ্বাস...

–আপনি কী দেখলেন মুসাফির সাহেব? আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে নাকি!

–না, না, বালাই ষাট, আপনি আরও অনেকদিন বাঁচবেন।

–তবে কী দেখলেন?

–না, সেরকম কিছু না।

–কী দেখলেন, তবু বলুন।

–আপনার না শোনাই ভালো। হয়তো ঠিকই আছে। জানেন, সময়ে সময়ে আমারও ভুল হয়।

–এটা আপনি কী করছেন, মুসাফির সাহেব। আমার মনের মধ্যে একটা খটকা ঢুকিয়ে, দিলেন। এখন আমি অনবরত এই কথাই ভাববো। আমি তো ছেলেমানুষ নই, আপনার যা মনে এসেছে বলুন, শুনলেই যে আমি বিশ্বাস করবো, তারও তো কোনো মানে নাই!

–একটা ছায়া দেখলাম। হঠাৎ যেন আপনি দুটো মানুষ হয়ে গেলেন। একটা আপনার কর্ম জীবনের, আর একটা আপমার ব্যক্তি জীবনের। এর মধ্যিখানে একটা ছায়া। একটি

অল্পবয়েসী যুবতীর, সে যেন দু'হাত মেলে আপনার ঐ দুটি সত্তাকে দু'দিকে সরিয়ে দিতে চায়, সে আপনার...

মামুন হেসে বললেন, এটা আপনার স্বপ্নই বটে। না, কোনো যুবতী-টুবতী আমার জীবনে নাই। বুড়া হয়ে যাচ্ছি, এখন আর কে আসবে। সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকি। ব্যক্তি জীবনের কথা ভাবারও সময় পাই না।

মুসাফির বললেন, হয়তো সে এখনও আসেনি। তাই তার ছায়া মূর্তি। আগামীতে কোনো সময় আসবে!

মামুন বললেন, যদি সে রকম কেউ আসেই, মন্দ কী! দেখা যাক, যদি এই বুড়োকে কারুর পছন্দ হয়!

হালকা সুরেই শেষদিকের কথাবার্তা বলে মামুন নেমে পড়লেন এক সময়। মুসাফিরকে তাঁর বেশ পছন্দ হয়েছে। এই মানুষটির আসল নাম কী তা কেউ বলেনি। পরদিন তিনি মোতাহার হোসেনের সঙ্গে আবার টেলিফোনে কথা বললেন, তখন মুসাফিরের প্রসঙ্গ উঠলো। মোতাহার হোসেন এই মুসাফিরকে বহুদিন ধরে চেনেন, কিন্তু আসল নামটা ভুলে গেছেন। সকলেই ওঁকে মুসাফির বলে ডাকে। লেখাপড়া জানা মানুষ, অভিজ্ঞতাও প্রচুর, এই লোককে পূর্ব পাকিস্তানে ধরে রাখতে পারলে অনেক লাভ হয়।

মুসাফিরের সঙ্গে মামুনের পরিচয় হবার ঠিক চারদিন পরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে গেল।

২৯ অতীনদের স্টাডি সার্কল

অতীনদের স্টাডি সার্কল মানিকতলার মোড় থেকে সরে গেছে আরও উত্তরে। গ্রে স্ট্রিট আর সার্কুলার রোডের মোড়ের কাছে। খান্না সিনেমার পাশে এক ফ্ল্যাট বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। বাড়িটাতে নানান জাতের পাঁচমিশেলি লোকেরা থাকে, কে

কখন আসে যায়, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ঘরখানা সাবলেট করেছেন মানিকদার এক বন্ধু আবিদ আলি; এই ভদ্রলোক এক সময় এ ডিভিশনে ফুটবল খেলতেন, এখন ছিট কাপড়ের ব্যবসা করেন। মানুষটি অকৃতদার ও সুরসিক।

মানিকতলার ঘরটা ছাড়তে হলো কারণ পমপমের বাবা অশোক সেনগুপ্তর সঙ্গে ওদের অনেকেরই মতপার্থক্য দিন দিন বাড়ছিল। তাত্ত্বিক আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক প্রায়ই পর্যবসিত। হচ্ছিল তিক্ততায়। ভারতীয় কর্মানিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হবার পরেও কোনো কোনো নেতা দু নৌকোয় পা দিয়ে রাখতে চাইছিলেন। অতীনদের গুরু মানিক ভট্টাচার্যের মতে অশোকদা সেই রকমই একজন। তিনি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকেও পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির দিকে নিয়ে যেতে চান বলে মানিকদার দারুণ রাগ।

পমপমদের বাড়ি ছেড়ে আসা হলে পমপম এই স্টাডি সার্কল ছাড়েনি। পমপমের মা নেই, যদিও তাদের বাড়িতে মাসি-পিসির সংখ্যা অনেক। ওদের বর্ধমানের গ্রামের বাড়ি থেকে প্রায়ই কেউ না কেউ এসে এখানে থেকে যায়, কিন্তু পমপমের সঙ্গে বাড়ির সম্পর্ক খুব কম। রোগা, লম্বাটে চেহারা পমপমের, চোখ দুটো যেন বেশি উজ্জ্বল, সে কক্ষনো সাজগোজের ধার ধারে না, তার কাঁধে সব সময় একটা শান্তিনিকেতনী কাপড়ের ব্যাগ ঝোলে। একদিন কংগ্রেসী ছেলেদের গুণ্ডামি প্রসঙ্গে আলোচনার সময় পমপম খুব ক্যাজুয়ালি সেই ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা রিভলভার বার করে বলেছিল, আমার সঙ্গে ওরা কেউ বাঁদরামি করতে এলে আমি সোজা কপাল ফুটো করে দেবো।

পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যে ওটা খেলনা পিস্তল। আবার এ খবরও জানা গিয়েছিল যে পমপমদের মেমারির বাড়িতে অনেকদিন ধরেই আসল বন্দুক আছে এবং পমপমের দাদু নিজে তাঁর প্রিয় নাতনীকে বন্দুক ছোঁড়া শিখিয়েছিলেন। পমপম সহজ মেয়ে নয়। সে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে এম এ পড়ছে, আবার সে গাছপালাও ভালো চেনে। এক বিঘে জমিতে কতটা সার, কতটা জল, কতদিনের মজুরি দিলে কতখানি ফসল পাওয়া যায়, সে বিষয়ে স্টাডি সার্কেলের সদস্যদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বেশি জানে। পমপম তার বাবার চেয়ে মানিকদার বেশি ভক্ত মনে হয়। পমপমের একটাই দোষ, সে প্রায় হাসেই

না বলতে গেলে। তার ঠোঁটে হাসি দেখা অতি দুর্লভ ঘটনা। অতীন একদিন তাকে বলেছিল, এই, তুই জানিস না, গম্ভীর মুখে ঠোঁট দুটো থাকে সোজা, আর হাসলে ঠোঁটে একটা ঢেউ খেলে যায়। ঢেউ খেলানো ঠোঁটেই মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়!

এর উত্তরে ঠোঁটে কোনো ঢেউ না খেলিয়েই পমপম বলেছিল, আসুক আগে সে রকম দিন আসুক, তখন আনন্দ করে হাসবো।

পমপম ছাড়া আরো দুটি মেয়ে আসে ষ্টাডি সার্কেলে, অনীতা আর শুভ্রা, কিন্তু তারা আবার বড্ডই মেয়ে মেয়ে! কথা বলতেই চায় না, কথা বলার সময় বারবার আঁচল ঠিক করে।

অতীনকে এখানে প্রথম এনেছিল তার বন্ধু কৌশিক। ওরা সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও দু' জনের স্বভাবে বেশ বৈপরীত্য আছে। কৌশিকের মুখে চোখে একটা সরল আদর্শবাদের আলো জ্বলে,সে এই পৃথিবীটাকে বদলাতে চায়। কৌশিকের ব্যক্তিগত চরিত্রও খুব নির্মল, তার বিশ্বাসের সঙ্গে তার জীবনযাত্রার কোনো অমিল নেই। কৌশিক খারাপ কথা তো বলেই না, তার মুখ দিয়ে সামান্য একটা মিথ্যে কথা বার করাও প্রায় অসম্ভব। বন্ধুরা অনেকবার এরকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

সেই তুলনায় অতীনের কোনো মূল্যবোধেই স্থির দৃঢ় বিশ্বাস নেই, আদর্শবাদীদের বক্তৃতাকে তার মনে হয় বড় বড় কথা, যে কোনো আলোচনাতেই উপদেশের গন্ধ পেলে সে নাক কুঁচকোয়, সে যে-কোনো মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে ভণ্ডামির চিহ্ন আছে কি না তা খোঁজার চেষ্টা করে। এই কারণেই সমাজের অনেক শ্রদ্ধেয় মানুষ তার চোখে অবজ্ঞার যোগ্য। এবং এক মাত্র এই কারণেই সে কৌশিককে ভালোবাসে।

কৌশিকের কথায় সে প্রথম এই স্টাডি সার্কেলে এসে যোগ দিয়েছিল। আস্তে আস্তে মানিকদাকেও তার পছন্দ হয়। মানিকদার সব মতামত সে মেনে নিতে পারে না, কিন্তু সে বুঝেছে যে মানুষটা খাঁটি। মানিকদা ইংরিজির ভালো ছাত্র ছিলেন, কিন্তু চাকরি-বাকরির চেষ্টা করেন নি, পার্টিতেও উঁচু পদের দিকে ঝোঁক নেই। তিনি অল্পবয়েসী

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে ভালো পার্টি ওয়ার্কার তৈরি করার কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই মানিকদার মধ্যে অতীন যেন তার দাদার খানিকটা মিল খুঁজে পায়। চেহারা বা ব্যবহারে কোনো মিল নেই, শুধু কথা বলার ধরনটা যেন কিছুটা পিকলুর মতন। অতীনের ধারণা, তার দাদা বেঁচে থাকলে সাধারণ ছেলেদের মতন চাকরিবাকরির দিকে না ঝুঁকে এই মানিকদারই মতন কোনো একটা আদর্শ নিয়ে থাকতো।

প্রথম দিকে খানিকটা কৌতূহল আর খানিকটা অবজ্ঞার ভাব নিয়ে এলেও অতীন এখন এই স্টাডি সার্কেলের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে গেছে। ইউনিভারসিটিতে ইলেকশানের সময় কংগ্রেসী ছেলেদের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে অতীন, মাথায় চোট লেগেছিল, তারপর থেকে তার জেদ আরও বেড়ে যায়।

এখন থেকে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই বেশ রাত হয়ে যায় অতীনের। আলোচনা ও তর্কাতর্কি শেষ হতেই চায় না, অতীনেরও এই আড্ডা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। এক একদিন তেলেঙ্গানা ও কাকদ্বীপের তে-ভাগা আন্দোলনের কাহিনী শুরু হয়, আবিদ আলি সাহেবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে কাকদ্বীপের আন্দোলনের, কংসারি হালদার নামে একজন বিপ্লবী নেতা সম্পর্কে এমন সব গল্প বলেন তিনি যা শুনতে শুনতে অতীনদের রোমাঞ্চ হয় শরীরে।

রাত সাড়ে নটা-দশটার পরেও খান্না সিনেমা সংলগ্ন এই অঞ্চলটি মানুষজনের ভিড়ে বেশ রমরম করে। কাছেই একটি বৃহৎ বাজার, রাস্তার ওপাশে আশুতোষ অয়েল মিলের গা ঘেঁষে লম্বা বেশ্যা পল্লী। ট্রাম লাইন থেকে মাত্র দু' তিন হাত দূরে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে মুখে ফটফটে সাদা রং মাখা নানা বয়েসী স্ত্রীলোকেরা।

স্টাডি সার্কল থেকে বেরিয়ে অতীন আর কৌশিক গ্রে স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে হাতিবাগানের মোড়ের কাছে। অন্য অনেকেই উত্তর কলকাতায় থাকে, শুধু ওদের

দু'জনের বাড়ি সুদূর দক্ষিণে। এখান থেকে ওরা টু-বি বাস ধরে, তাতে একটানা চলে যাওয়া যায়।

এক রাতে প্রায় খালি একটা দোতলা বাসে উঠতে গিয়েও কৌশিক অতীনের হাত চেপে ধরে বললো, এটা ছেড়ে দে, পরের বাসে যাবো।

রাতের দিকে বাসের সংখ্যা কমে আসে, পরের বাসের জন্য অন্তত মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হবে, অতীন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার?

সেই স্টপ থেকে তিন চারজন তোক ওঠার পর বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। পা-দানিতে দাঁড়ানো ধুতি ও শাদা হাফ শার্ট পরা একটা লোক মুখ ঘুরিয়ে বিস্মিতভাবে কৌশিক ও অতীনকে দেখলো। তার মুখের ভাবটা এমন যেন সে নিজে বাসে উঠে পড়লেও তার অন্য সঙ্গীরা উঠতে পারে নি, রয়ে গেল।

কৌশিক বললো, ঐ লোকটাকে দেখলি? ও রোজ খান্না সিনেমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা বেরুনর পর এক একদিন আমাদের এক একজনকে বাড়ি পর্যন্ত ফলো করে!

অতীন বললো, যাঃ!

কৌশিক বললো, তুই লক্ষ করিস নি? কাল দেখিস। তপন আর উৎপলকে দুতিনদিন একজন ধুতি আর শার্ট পরা লোক ফলো করে বাড়ি পর্যন্ত গেছে। আমাদের বাড়ির ঠিকানা জেনে রাখছে।

–লোকটা কে?

–পুলিসের ইনফর্মার হতে পারে। সি আই এর কোনো দালাল হতে পারে। আমাদের ওপর নজর রাখছে। কংগ্রেস গভর্নমেন্ট জ্যোতিবাবু, প্রমোদ দাশগুপ্তকে অ্যারেস্ট করেছে, এরপর পার্টির অনেক ওয়ার্কারকে রাউন্ড আপ করবে বলে শোনা যাচ্ছে।

অতীনের ঠিক বিশ্বাস হয় না। সে বা কৌশিক কেউই পার্টির কার্ড হোল্ডার নয়। মানিকদার কাছে তারা পার্টির মেম্বারশীপ পাবার জন্য আবেদন জানিয়েছিল, মানিকদা বলেছেন, এখনও সময় হয়নি। তবু পুলিস তাদের এতখানি গুরুত্ব দেবে? তাদের স্টাডি সার্কল তো গোপন কিছু ব্যাপার নয়, প্রায়ই তাতে নতুন ছেলেমেয়েরা যোগ দিতে আসে। তা ছাড়া, শুধু ঘরের মধ্যে তো নয়, এক একদিন কফি হাউস থেকে বেরিয়ে কলেজ স্কোয়ারে ঘাসের ওপর বসে আড্ডা মারে। সেখানেও তো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এইসব বিষয়েই কথা হয়।

ওরা পরের বাসটা ধরলো এবং পরবর্তী স্টপে সেই ধুতি-শার্ট পরা লোকটা উঠলো। সে নেমে গিয়ে অতীনদের জন্যই অপেক্ষা করছিল? কৌশিক অতীনের গায়ে ঠেলা দিয়ে চুপিচুপি বললে, দেখলি? আমরা এসপ্লানেডে নেমে পড়ে একটু ঘুরে ফিরে তারপর অন্য বাস বা ট্রাম ধরবো।

অতীন ভালো করে লক্ষ করলো লোকটাকে। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। বাসের ভেতরে ঢোকেনি, পাদানিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, অতীনদের দেখছে না, চেয়ে আছে রাস্তার দিকে।

অতীন কৌশিককে বললো, চুপ করে বসে থাক। আমরা একসঙ্গে কালীঘাটে নামবো। ঐ লোকটাও যদি আমাদের সঙ্গে নামে আমি ওর কলার চেপে ধরবো। যদি পুলিস হয়, বলবো ওয়ারেন্ট দেখাও! যদি তা দেখাতে না পারে রামধোলাই দেবো শালাকে। আমার সঙ্গে চালাকি না!

কৌশিক বললো, চুপ কর, অতীন!

অতীন বললো, কেন, ভয় কিসের রে! কনস্টিটিউশনে ফ্রিডম অফ স্পীচের গ্যারান্টি দিয়েছে, তাও পেছনে পুলিশ লাগবে? মামদোবাজি নাকি?

অতীন আর কৌশিক বসেছে একতলায়, লোকটা গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো, ভেতরে এলো না, বৌবাজার মোড়ের কাছে হঠাৎ নেমে গেল।

অতীন কৌশিককে কনুই দিয়ে খোঁচা মারতেই সে বললো, ও বুঝতে পেরে গেছে যে আমরা ওকে চিনে ফেলেছি। কাল থেকে অন্য লোক লাগবে।

অতীন বললো, তাকেও আমরা চিনে ফেলবো।

–শোন অতীন, তোকে একটা কথা বলবো? আমিই তো তোকে স্টার্ডি সার্কলে এনেছিলুম, আমিই রিকোয়েস্ট করছি, তুই এখন কিছুদিন এখানে আসা বন্ধ করে দে।

–কেন?

–তোর এবার ফাইনাল পরীক্ষা। যদি সত্যিই পুলিস ধরে-টরে–

–তার মানে। ফাইনাল পরীক্ষা আমার একার?

–আমি এবার ড্রপ করছি। আমার প্রিপারেশন ভালো হয়নি, আমি সামনের বছর দেবো।

কৌশিকের একথার গুরুত্ব দিল না অতীন। সে বললো, ড্রপ করবি মানে? আমি ঘাড় ধরে তোকে পরীক্ষায় বসাবো। তুই ড্রপ করলেও আমি শান্তনু আর নির্মলকে ডিঙিয়ে টপ পজিশনে পৌঁছোতে পারবো না।

–আমি সিরিয়াসলি বলছি, অতীন। হঠাৎ যদি আমাদের জেলে ভরে দেয়...

–জেলের ভেতরটা আমার একবার ঘুরে দেখে আসার ইচ্ছে আছে। জেলে বসেও তো পরীক্ষা দেওয়া যায়।

–আমাদের পলিটিক্যাল প্রিজনারদের স্টেটাস দেবে না। বিনা বিচারে আটক করে চোর ডাকাতদের সঙ্গে রাখবে।

–ধ্যাৎ! তুই বেশি রোমান্টিসাইজ করছিস!

পরদিন সেই ধুতি-হাফশার্ট পরা লোকটিকে খান্না সিনেমার আশেপাশে আর দেখা গেল না। তার বদলে আর কেউ এসেছে কিনা সেদিকে নজর রাখলো অতীনরা। সেরকম চেনা গেল না কারুকে। যদিও, মানিকদারও ধারণা, তাদের স্টাডি সার্কলের প্রতি পুলিসের নজর পড়েছে।

অতীন একদিন অলিকে নিয়ে এলো এখানে। সপ্তাহে অন্তত একদিনও দেখা না হলে অলি অভিমান করে। অতীন সময় পায় না। সেইজন্যই সে ঠিক করলো, অলিকে সে সপ্তাহে একদিন দুদিন অন্তত স্টাডি সার্কলেই নিয়ে আসবে। কলেজ যাওয়া ছাড়া অলি একা একা বাইরে কোথাও বেরোয় না। তাই বাইরের জগৎটা চেনে না। পমপমের মতন মেয়ের সঙ্গে কয়েকদিন মিশলে অলি অনেককিছু শিখবে।

প্রথম দিন অলি আগাগোড়া প্রায় চুপ করে বসে রইলো। পমপম তার সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করেও বেশি কথা বলতে পারলো না। সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েও অলিকে যখন বাড়ি পৌঁছে দিল অতীন, তখন রাত সাড়ে নটা। এত দেরিতে অলি কখনো বাড়ি ফেরে না। অতীন তাকে কলেজ থেকে ফেরার পথে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, অলি বাড়িতে খবর দেবারও সময় পায়নি। বাড়ির সবাই উৎকণ্ঠিত, বিমানবিহারী বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর মেয়ে বাবলুর সঙ্গে ফিরছে দেখে তিনি অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন।

অতীন জানে, অলিকে তার বাবা-মা তুলোয় মোড়া বাক্সে আদরে যত্নে রাখতে চান। কুমারী মেয়ের সাড়ে নটায় বাড়ি ফেরা ওঁদের পক্ষে অকল্পনীয়। কিন্তু ওঁদের খানিকটা কালচার শক দেওয়া দরকার। ছেলেরা দেরি করে ফিরতে পারে, আর মেয়েরা একটু দেরি করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

দুদিন বাদে অতীন অলিকে জিজ্ঞেস করলো, কীরে, তুই আবার যাবি আমার সঙ্গে ওখানে?

অলি বিনা দ্বিধায় বললো, হ্যাঁ।

সেদিন বাড়িতে অলি বকুনি খেয়েছে কিনা তা কিছুতেই স্বীকার করলো না। অলি তার বাবা-মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলেনি, বাবলুদার সঙ্গে সে কোথায় গিয়েছিল তা জানিয়েছে। তার বাবা-মায়ের কোনো আপত্তি নেই। তবে, যেদিন সে ওখানে যাবে, সেদিন বাড়িতে জানিয়ে যেতে হবে।

অতীন দুষ্টুমি করে জিজ্ঞেস করলো, আর স্টাডি সার্কেলে যাবার নাম করে আমি যদি তোকে অন্য কোথাও নিয়ে যাই?

অলি বললো, অন্য কোথাও মানে?

অতীন বললো, এই ধর, ডায়মন্ড হারবার। সেখানে নদীর ধারে বালিতে দু'জন শুয়ে থাকবো।

অলি অতীনের দিকে গাঢ় ভাবে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বললো, বাবলুদা, তুমি কোনোদিন আমায় ডায়মন্ডহারবার নিয়ে যাবে না তা আমি ভালোই জানি। তুমি যে সবসময় ব্যস্ত। আমি ডায়মন্ডহারবারে বাড়ির লোকদের সঙ্গে দুতিনবার গেছি। তুমি নিশ্চয়ই কখনো যাওনি। তুমি যদি চাও, আমি তোমায় একদিন ট্রেনে করে নিয়ে যেতে পারি সেখানে। কিন্তু

সেখানে নদীর ধারে বালি নেই, শুধু কাদা, শুয়ে থাকা যায় না।

হঠাৎ অতীনের মনে পড়ে গেল একটা বিশেষ দিনের কথা। স্কুলে পড়ার সময় সে অলির মুখে ডায়মণ্ড হারবার বেড়ানোর গল্প শুনেছিল। তার খুব লোভ আর ঈর্ষা হয়েছিল। অমন একটা সুন্দর জায়গা অলি দেখেছে, অথচ সে দেখে নি! কে তাকে নিয়ে যাবে?

সেই বিশেষ দিনটিতে, বাগবাজারের গঙ্গার ধারে, মা আর পিসিমনির শাড়ি-টাড়ি পাহারা দিতে দিতে তার দাদা পিকলু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে একদিন বাবলুকে ডায়মণ্ড হারবার নিয়ে যাবে। সে প্রতিশ্রুতি রাখে নি দাদা। সম্ভবত সেটাই ছিল দাদার শেষ কথা...

দৃশ্যটা মনে পড়লেই অতীনের যেন দমবন্ধ হয়ে আসে, চতুর্দিকে নীল জল, সেই জল তাকে টানছে...

দৃশ্যটা মুছে ফেলার জন্য অতীন মাথা ঝাঁকালো, সিগারেট ধরালো। স্মৃতি যেন মাকড়সার জাল, তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া, অলি আর তার মাঝখানে একটা পর্দা নেমে আসছে। ঠিক পদ সরাবার ভঙ্গিতে হাত তুললো অতীন।

তারপর মুখ ফিরিয়ে বললো, তুই একদিন আমাকে নিয়ে যাস তো ডায়মন্ডহারবার। ওখান থেকে কাকদ্বীপটা দেখে আসবো।

দুতিন দিন স্টাডি সার্কলে এসেও অলির ঠিক পছন্দ হলো না জায়গাটা। যেসব কথা সে বইতে আগেই পড়েছে, সেইসব কথাই অনেকে এখানে এমন ভাবে গলা ফুলিয়ে জোর দিয়ে বলে, যেন নতুন কথা। এরা কি বই পড়ে না? পমপম নামের মেয়েটি গ্রাম জীবনের সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করে বিভূতিভূষণ আর তারাশঙ্করকে খুব গালাগালি দিল। অথচ অলির এই তিনজনের লেখাই ভালো লাগে। পমপম এককথায় আরণ্যক উপন্যাসটিকে খারিজ করে দিল, অলির সন্দেহ হলো পমপম বোধহয় আরণ্যক পড়েইনি। বাবলুদা এইসব বই পড়ে না, অলি তা জানে। কৌশিকও কি পড়ে না? মানিকদা বললেন চীনা লেখক লু সুনের লেখা পড়তে, অলি লু সুনের কয়েকটি গল্পের অনুবাদ আগেই পড়েছে কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলো না সেকথা।

তারপর এই শনিবারের রাতটা অলির বহুকাল মনে থাকবে।

স্টাডি সার্কল থেকে বেরিয়েই সে রাতে ওরা একটা বিরাট হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে গেল। সার্কুলার রোডের দুপাশে কয়েকশ লোক জড়ো হয়ে ইঁট ছুঁড়ছে, দুম দাম করে ফাটছে বোমা। কী নিয়ে যে গণ্ডগোল তা বোঝা যাচ্ছে না।

অলির হাত শক্ত করে চেপে ধরে বাবলু বললো, তুই ঘাবড়াসনি, এসব এ-পাড়ার গুণ্ডা আর মাতালদের ব্যাপার, এরকম প্রায়ই হয়। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের দিকটায় গেলেই ফাঁকা হয়ে যাবে।

কিন্তু গ্রে স্ট্রিট ধরে বেশিদূর এগোনো গেল না, স্টার থিয়েটারের পাশের গলি দিয়ে একদল লোক সোডার বোতল ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়ে এলো এদিকেই। কৌশিক চেঁচিয়ে বললো, পেছনে পুলিসের গাড়ি। ওরা আমাদের আগে ধরবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা ছিটকে গেল আশেপাশের গলিতে। অতীন অলির হাত ছাড়েনি। কিন্তু কৌশিক চলে গেলে অন্যদিকে। পুলিস গুলি চালাতে শুরু করেছে।

বছর দেড়েক আগে কফি হাউস থেকে বেরিয়ে অলি ঠিক এই রকম একটা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে একা হয়ে গিয়েছিল, সেদিন সে বাড়ি পৌঁছেছিল অতি কষ্টে, দু চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল কান্না। আজ বাবলুদা তার সঙ্গে রয়েছে, আজ তার একটুও ভয় করছে না। আজ সারারাত ধরে এরকম চললেও ক্ষতি নেই।

একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় ওরা একটুখানি দম নেবার জন্য দাঁড়াতেই ওপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, কারফিউ! কারফিউ ডিক্লেয়ার করেছে।

৩০ আজকালকার যুদ্ধে

আজকালকার যুদ্ধে কোনো রাষ্ট্রই আক্রমণকারীর ভূমিকা নিতে চায় না। যুদ্ধ থেমে নেই, পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যে যখন তখন বিষফোঁড়ার মতন হানাহানি শুরু হয়, তবু যুযুধান দুই পক্ষই তারস্বরে বলতে শুরু করে, ওরা আগে আক্রমণ করেছে, আমরা উপযুক্ত জবাব

দিচ্ছি! এমনকি রণোন্মাদ হিটলারকেও পোলান্ড আক্রমণের আগে একটা ছুতো খুঁজতে হয়েছিল।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবার পরেও যথারীতি পাকিস্তানের নাগরিকরা জানলো যে নির্লজ্জ ভারত সরকার আচমকা আক্রমণ করে পাকিস্তান নামে নতুন ঐশলামিক রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করতে চাইছে। আর ভারতের নাগরিকরা জানলো যে পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকরা দেশের বহুরকম অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান না করতে পেরে সীমান্তে সংঘর্ষ বাধিয়ে উত্তেজিত করতে চাইছে সে দেশের মানুষদের।

বোন অফ কনটেনশান অবশ্যই কাশ্মীর!

তুষারময় গিরিচূড়ায় ঘেরা, হ্রদ ও নদীময়, ফুল-ফলে ভরা এই সুরম্য উপত্যকাটির যেন অশান্তিই নিয়তি। মাত্র ৩৫০ মাইল লম্বা আর ২৭৫ মাইল চওড়া এই রাজ্যটির জনসংখ্যা গত আদমসুমারিতে ছিল ৩৬ লক্ষের কাছাকাছি। তার মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের বেশিই মুসলমান, বাকিরা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান। ধর্মীয় কারণে এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিশেষ হয়নি। এখানকার মানুষরা অধিকাংশই নম্র, শান্তিপ্রিয় ও অতিথিপরায়ণ। কিন্তু এই রাজ্যটি নিয়ে অন্যদের খুব মাথাব্যথা।

ভারত বিভাগ হবার পর যুক্তিসঙ্গতভাবে এই রাজ্যটি পাকিস্তানেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। হলো না দুটি কারণে। মুসলমান প্রধান এই রাজ্যটির রাজা বংশানুক্রমিকভাবে হিন্দু, ভারত ভাগের সময় তিনি দোলাচলে রইলেন। আর একটি কারণ হলো, শেখ আবদুল্লার মনোভাব।

এক শালকর পরিবারের ছেলে এই শেখ আবদুল্লা। অকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়, তাঁর বিধবা জননী ছেলেকে পারিবারিক পেশায় নিযুক্ত না করে লেখাপড়া শেখাতে চাইলেন। শ্রীনগর, জম্মু, লাহোর ও আলিগড়ে পড়াশুনো সমাপ্ত করে একটা এম এস-সি ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসে শেখ আবদুল্লা নিজের শহরে একটা সরকারি স্কুলে মাস্টারি নিয়েছিলেন। কিন্তু

অত ছোট গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। অচিরেই তিনি চলে এলেন রাজনীতিতে।

তিরিশের দশকে কাশ্মীরে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আলিগড় থেকে লেখা-পড়া শিখে এলেও মোল্লাতন্ত্র ও ধর্মান্ধতাকে অপছন্দ করতেন শেখ আবদুল্লা। তখন কাশ্মীরে একটি জনপ্রিয় দলের নাম 'মুসলিম কনফারেনস', শেখ আবদুল্লার উদ্যোগেই সেই দলের রূপান্তর হলো 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' হিসেবে; সেই দলে তখন থেকে যে-কোনো ধর্মের মানুষই যোগ দেবার অধিকারী। অবিলম্বেই শেখ আবদুল্লা শুধু কাশ্মীরে নয়, অবিভক্ত ভারতেও একজন প্রধান নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। গান্ধী, নেহরু, আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে নাম শোনা যেতে লাগলো তাঁর।

পাকিস্তান সম্ভাবনা যখন অনেকখানি দানা বেঁধেছে, মহম্মদ আলি জিন্না যখন তাঁর দাবির সমর্থন আদায় করার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন, সেই রকম সময়েই জিন্না একবার এলেন কাশ্মীরে। আপাত উদ্দেশ্য বিশ্রাম, কিন্তু এই সুযোগে কাশ্মীরী শের শেখ আবদুল্লাকেও তিনি স্বমতে আনতে চেয়েছিলেন। সেটা ১৯৪৪ সাল।

জিন্না সাহেবের সঙ্গে শেখ আবদুল্লার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তিরিশের দশকে একবার কাশ্মীরী পুলিসের এক দারোগা মেহের আলির বিরুদ্ধে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হানিফা, বিবির খোরপোশের মামলার সময় শেখ আবদুল্লা জিন্না সাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন মহিলার পক্ষ নিয়ে আদালতে দাঁড়াতে। জিন্না মামলার বৃত্তান্ত শুনে বলেছিলেন, দাঁড়াতে পারি, কিন্তু প্রত্যেক দিন এক হাজার টাকা করে দিতে হবে! শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর সহযোগীরা আকাশ থেকে পড়েছিলেন, তাঁরা এক নিপীড়িত মহিলার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। এত টাকা পাবেন কোথায়? জিন্না সাহেব বলেছিলেন, তিনি প্রফেশনাল এথিকসে বিশ্বাস করেন, তাঁর অনেক দান-ধ্যান আছে, তিনি অনেক জায়গায় চাঁদা দেন, কিন্তু ব্যারিস্টার হিসেবে তিনি এক পয়সাও কম ফি নিতে রাজি নন। শেষ পর্যন্ত শেখ আবদুল্লার দল ঐ টাকাই চাঁদা করে তুলে দিতে রাজি হন।

জিন্না পরের বার কাশ্মীরে আসেন মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে বক্তৃতা দিতে। শেখ আবদুল্লা তখন প্রতিযোগী ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের নেতা। জিন্নাকে সেবার রাজ্য সরকার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাশ্মীর ত্যাগ করার হুকম দেয়। জিন্না চলে যেতে বাধ্য হলেন পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ মুখে নিয়ে। শেখ আবদুল্লার প্রতি এই সময় তাঁর মনোভাব ভালো হওয়ার কথা নয়। শেখ আবদুল্লা নিজেই চিঠি লিখে জিন্নার সঙ্গে একটা সমঝোতার প্রস্তাব দিলেন, জিন্না তাঁকে আহ্বান জানালেন দিল্লিতে আসার জন্য।

কিন্তু সমঝোতা হলো না। জিন্না সাহেব ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের নেতা আর শেখ আবদুল্লা যে রাজ্যের নেতা সেখানে মুসলমানরা প্রবলভাবে সংখ্যাগুরু। দু'জনের মনোভাব আলাদা হতে বাধ্য। সংখ্যালঘুদের নেতা সংখ্যাগুরুদের প্রতি সন্দেহ, বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষ পোষণ করতে পারেন, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু সংখ্যাগুরুদের যিনি নেতা তিনি সংখ্যালঘুদের প্রতি খানিকটা উদার, পৃষ্ঠপোষক, বড় ভাই সুলভ আচরণ করতেই পারেন। তরুণ শেখ আবদুল্লা দ্বিজাতিতত্ত্ব মানেন না, তিনি জিন্নাকে বলতে চাইলেন যে মূল সমস্যাটা ধর্মীয় ততখানি নয়, যতখানি শোষক ও শোষিতের। শোষণ ব্যবস্থা দূর করতে পারলে হিন্দু-মুসলমান দু' দলই উপকৃত হবে। জিন্না সাহেব যে পাকিস্তানের পরিকল্পনা করছেন, তাতে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যে দূরত্ব থাকবে এক হাজার মাইল, ধর্ম ছাড়া এই দু দিকের মানুষের মধ্যে কি অনেক রকম বৈষম্য থাকবে না?

এ সব কথা জিন্নার পছন্দ হয়নি। শেখ আবদুল্লার বক্তব্য শোনার পর তিনি বলেছিলেন, শোনো শেখ, আমি তোমার বাবার মতন। রাজনীতি করতে করতে আমি ঝুনো হয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা এই যে কোনো হিন্দুকেই বিশ্বাস করা যায় না। তারা কখনো তোমার বন্ধু হবে না। সারা জীবন ধরে আমি তাদের আপন করতে চেয়েছি কিন্তু কিছুতেই ওদের আস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়। তোমার জীবনে একটা সময় আসবে যখন তুমি অনুতাপ করবে, আমার কথার মর্ম বুঝবে। কী করে ওদের তুমি বিশ্বাস করবে, যারা তোমার হাত

থেকে এমন কি পানি পর্যন্ত খাবে না? সেটাকে পাপ মনে করে? ওদের সমাজে তোমার কোনো স্থান নেই। ওদের চোখে তুমি একটা ইনফিডেল!

প্রবীণ জিন্না অনেক অভিজ্ঞতায় যা ঠেকে শিখেছিলেন, তরুণ শেখ আবদুল্লা আদর্শবাদের উদ্দীপনায় তা মানতে চাননি। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করছি না, হিন্দুদের একটা সাংঘাতিক রোগ আছে, যার নাম অস্পৃশ্যতা। কিন্তু ওদের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণী এর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং এর পরিবর্তন করতে চাইছে। মহাত্মা গান্ধী হরিজনদের স্বীকৃতি এবং আরও অন্যান্য সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করছেন। বীর সৈনিকের মতন তিনি লড়ছেন অস্পৃশ্যতা নামের রোগটার বিরুদ্ধে। সুতরাং আমি মনে করি, সমস্ত সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয়েরই উচিত জাতি, ধর্ম, বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করা। রোগ যতই ভয়ংকর হোক, একজন ডাক্তার সেই রোগীর গলা চেপে ধরে না কিংবা সেই রোগীকে না দেখে ফেলে চলে যায় না, বরং তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য সব রকম চেষ্টা করে। জিন্না সাহেব, আপনি এত বড় একজন আইনজ্ঞ, আপনি এটা বোঝেন না?

এ সব কথা শুনে জিন্না সাহেবের খুশি হবার কথা নয়। ১৯৪৪ সালে যখন তিনি কাশ্মীরে শেষ বারের মতন এলেন তখন তিনি স্পষ্টতই শেখ আবদুল্লার প্রতিপক্ষ। তিনি এসেছেন মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন আদায় করতে, কিন্তু মিটিং করতে গিয়ে দেখলেন, কাশ্মীরের যুব-জনতা শেখ আবদুল্লার পক্ষে। শেখ আবদুল্লা দুই জাতি তত্ত্বের প্রবল বিরোধী, আর জিন্না ঐ তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি তখন জয়যাত্রায় বেরিয়েছেন, কিন্তু কাশ্মীর হয়ে রইলো পথের কাঁটা। কাশ্মীরকে তিনি ভুলতে পারলেন না।

ব্রিটিশ ভারত দু ভাগ হলো, দুটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হলো। দেশীয় করদ রাজ্যগুলি যে-কোনো একটিতে যোগ দেবে এই রকমই ছিল বোঝাঁপড়া, কিন্তু পৃথক সত্তা বজায় রাখলো কাশ্মীর। জিন্নার জীবদ্দশতাতেই কাশ্মীরে হয়ে গেল একটা যুদ্ধ, বাইরের লোকের চোখে সেটাই প্রথম ভারত-পাক সংঘর্ষ। অবশ্য, ভারতের বক্তব্য অনুযায়ী সেটা পাকিস্তানী

হানাদারদের আক্রমণ; আর পাকিস্তানের মতে, সেটা কাশ্মীরীদের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান, যা দমন করতে এগিয়ে এসেছিল বে-আইনী ভারতীয় ফৌজ।

ভারত যাদের আখ্যা দিল হানাদার, পাকিস্তান ঘোষণা করলো তারাই মুজাহিদ। দেশ বিভাগের মাত্র দু' মাস সাত দিন পরেই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে গেল ভারত-পাকিস্তান বৈরিতা। পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাসুদ, ওয়াজির ও আফ্রিদি সম্প্রদায়ের সশস্ত্র লোকেরা ঢুকে পড়লো কাশ্মীরে। এরা স্বভাবতই যোদ্ধা জাতি, তা ছাড়া কাশ্মীরে তখন কোনোরূপ যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল না। পাখতুনিস্তানের সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফফার খানও পাকিস্তানের একটি শিরঃপীড়া। এই বর্ষীয়ান পাখতুন নেতা এখনও পাকিস্তান-সৃষ্টি মেনে নিতে পারেননি। কাশ্মীর পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হয়ে গেলে পাখতুনিস্তানের পৃথক হওয়ার দাবি এমনিই মিইয়ে যাবে, এ রকমই হয়তো ভেবেছিলেন জিন্না।

কিন্তু মাসুদ-ওয়াজির-আফ্রিদি উপজাতীয়দের অভিযানে তেমনভাবে সাড়া দিল না কাশ্মীরীরা। কাশ্মীরে পাকিস্তানের স্বপক্ষে কোনো গণ-অভ্যুত্থান হলো না। বরং কাশ্মীরের হিন্দু রাজা সাহায্য প্রার্থনা করলেন ভারতের কাছে। জননেতা শেখ আবদুল্লাও ছুটে এলেন দিল্লিতে।

টেকনিক্যালি একটি স্বাধীন রাজ্যে ভারত নিজস্ব ফৌজ পাঠাতে পারে না। যেমন, পাকিস্তানী ফৌজ তো কাশ্মীর আক্রমণ করেনি, ঢুকে পড়েছে উপজাতীয়রা। যদিও ভারত ও পাকিস্তানের দু দেশের নেতারাই কাশ্মীর সম্পর্কে লোলুপ। কাশ্মীরের রাজা এবং বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল কনফারেনসের নেতা শেখ আবদুল্লার অনুরোধে ভারত সরকারের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটন কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে সম্মতি দিলেন আগে, তারপর ফৌজ পাঠালেন।

জিন্না সাহেব তাঁর অকাল মৃত্যুর আগে কাশ্মীর নামে রঙিন পালকটি তাঁর শিরোভূষণে দেখে যেতে পারলেন না। যদিও কাশ্মীর সমস্যা রয়েই গেল। ভারতের দক্ষিণপন্থী নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের কাশ্মীরকে নিষ্কন্টক করার আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও মুজাহিদ বা হানাদার

বাহিনীকে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল যুদ্ধ। কাশ্মীর প্রশ্নটি চলে গেল রাষ্ট্রসংঘে। তারপর যুদ্ধ বিরতি সীমারেখায় পাকিস্তানের আধিপত্যমূলক এক অংশের নাম হলো 'আজাদ কাশ্মীর', আর ভারতীয় অংশের নাম রইলো শুধু কাশ্মীর, যেন সেটাই আসল কাশ্মীর, ক্রমে সেটি ভারতীয় একটি অঙ্গ রাজ্য হয়ে গেল। দু দুটো সাধারণ নির্বাচন হলো সেখানে, তা ছাড়া কাশ্মীরী নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এসে আসন নিলেন ভারতীয় লোক সভায়। নীতির দিক দিয়ে এই কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিশ্চিত যুক্তিসিদ্ধ নয়। কিন্তু আইনের দিক দিয়ে কোনো খুঁত রইলো না।

সুতরাং পঁয়ষট্টি সালে যখন আবার যুদ্ধ বাঁধলো, তখন ভারতের পক্ষ থেকে বলা হলো, এটা তার একটা অঙ্গ রাজ্য আক্রমণেরই সমান। মাত্র কয়েক মাস আগেই কচ্ছের রানে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ হয়ে গেছে। গুজরাট সংলগ্ন ঐ অনুর্বর, বালিয়াড়ি ও গাধা-খচ্চর অধ্যষিত অঞ্চলটি নিয়ে দু' দেশের অস্ত্রক্ষয় চললো কয়েকদিন। তারপর সুমতি ফিরে এলো দু' দেশের। শান্তি চুক্তির সইয়ের সময় কলমের কালি শুকোতে না শুকোতেই আবার কাশ্মীরে যুদ্ধ।

ভারত কাশ্মীরের বৃহত্তর অংশটি নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেও ঠিক হজম করতে পারেনি। মুসলমান প্রধান কাশ্মীরকে তোয়াজ করার জন্য ভারত সরকার খাদ্য ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধে দিয়ে আসছিল। তার প্রতিক্রিয়া হলো দু রকম। যাদের বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তারা সন্দেহ করে, তারা প্রশ্ন করে, তারা জানতে চায়, ব্যাপারটা কী? আমরাও যদি সমান ভারতীয় হই, তা হলে অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে আমরা সুযোগ। সুবিধে বেশি পাবো কেন? কাশ্মীরে চালের দাম কেন এত কম, কেন কাশ্মীরের বেতার কেন্দ্রের নাম কাশ্মীর রেডিও, কেন পশ্চিমবাংলা বা মহারাষ্ট্রের মতন অল ইন্ডিয়া রেডিও নয়? আবার ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কিছু কিছু লোক চিন্তা করতে লাগলো, কাশ্মীর যদি ভারতের অন্তর্গত একটি রাজ্যই হয় তা হলে সেখানকার লোকরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধে পাবে কেন! কেন ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে-কেউ গিয়ে কাশ্মীরে বসতি স্থাপন করতে পারবে না? কেন অন্য ভারতীয়দের কাশ্মীরে যেতে

গেলে পারমিট লাগবে? এসব তো গণতন্ত্র-বিরোধী ব্যাপার। এই প্রশ্ন নিয়েই হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরে গেলেন এবং অকস্মাৎ বন্দী অবস্থায় রহস্যময় ভাবে মৃত্যুবরণ করলেন।

ভারত সরকারের এই তোষণ নীতি কাশ্মীরী রাজনীতিতেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। এখন পাকিস্তানের দিকে একটু ঝুঁকে কথা বললেই ভারত সরকারের কাছ থেকে বেশি খাতির পাওয়া যায়। এ তো বেশ মজার ব্যাপার। ভারত-বিরোধী একটা বিক্ষোভ মিছিল বার করো, দিল্লি থেকে আরও চাল-ঘি আসবে। তা ছাড়া ভারত-পাকিস্তান বিবাদে ধর্মপ্রাণ কাশ্মীরীরা পাকিস্তানকেই সমর্থন জানাবে, ইসলামের বন্ধন তো অস্বীকার করা যায় না, ভারতের সঙ্গে তাদের কিসের আত্মীয়তা?

এতগুলি বছরে শেখ আবদুল্লারও মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। কাশ্মীরীদের, একচ্ছত্র নেতা হয়ে থাকতে গেলে তাঁর পক্ষে পাকিস্তানকে অস্বীকার করা অসম্ভব। পুরোপুরি ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি দাবি তুললেন স্বায়ত্তশাসনের। দেশ বিভাগের ঠিক পর পরই নেহরু একবার কাশ্মীরে প্লেবিসাইটের কথা বলে ফেলেছিলেন, শেখ আবার খুঁচিয়ে তুললেন সেই প্রস্তাব। কাশ্মীরের জনসাধারণেরও খুব পছন্দ হলো এটা। টাঙ্গাওয়ালা, শিকারাওয়ালা থেকে শুরু করে ছাত্র ও ব্যবসায়ীরা সবাই ধ্বনি তুললো, হমারা মুতলবা রায় সুমার! রায় সুমার ফওরন করো। আমাদের দাবি গণভোট, গণভোট পালন করো!

এই রকম একটা অবস্থায় কাশ্মীরে একটা যুদ্ধ লাগানোতে পাকিস্তান ও ভারত, এই দুই দেশেরই স্বার্থ আছে। কাশ্মীরে ভারত-বিরোধী হাওয়া বইছে, এই সুযোগে পাকিস্তান যদি মুজাহিদ ও সৈন্য পাঠায়, তা হলে কাশ্মীরীরা তাদের সাদরে বরণ করে নেবে। কাশ্মীরে একটা গণ-অভ্যুত্থান হবে, ভারত বাধা দিতে এলে বিশ্ববাসীকে বোঝানো যাবে যে ভারত জোর করে কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করে রেখেছে!

আর ভারতের পক্ষেও কাশ্মীরের গণভোটের দাবি বা স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব বর্তমানে মেনে নেওয়া অসম্ভব। কাশ্মীর এখন ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য, সেখানে যদি স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তা হলে ভারতের অন্যান্য মুসলমান প্রধান অঞ্চলেও যে-কোনো দিন এরকম দাবি উঠবে। শুধু ধর্মীয় কারণে কেন, ভাষাগত, উপজাতিগত কারণেও এরকম দাবি উঠবে, ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সুতরাং কাশ্মীর সীমান্তে এখন বড় রকম একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে গণভোটের প্রশ্ন ধামা চাপা পড়ে যেতে বাধ্য।

যে পক্ষই আগে শুরু করুক, যুদ্ধ একটা লাগলো কাশ্মীরে। সেখানে গণ অভ্যুত্থান হলো না, লড়াই করতে লাগলো ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্যরা।

যুদ্ধে যত গোলাগুলি ওড়ে, সেই তুলনায় মিথ্যে কথাও কম ছোঁড়াছুড়ি হয় না। যুদ্ধের প্রথম দিকে দু পক্ষই সমানভাবে জেতে। খবরের কাগজগুলির পোয়াবারো। সরকারি মিথ্যে তথ্য তো আছেই, তার ওপর নিজস্ব সংবাদদাতারা অনেকগুণ রঙ চড়ায়। পাকিস্তানের মানুষ বেতার ও সংবাদ পত্র মারফত জানলো যে পাকিস্তানী বীর সৈনিকদের হাতে ভারতীয় সৈনিকরা পোকা মাকড়ের মতন মরছে। একজন পাকিস্তানী সৈনিক দশজন ভারতীয়ের সমান, মরলে শহীদ, মারলে গাজী হওয়ার উদগ্র বাসনা নিয়ে তারা যুদ্ধে নেমেছে। আর ভারতে বেতার সংবাদপত্রে প্রচারিত হচ্ছে যে ভারতীয় সেনাদের সামনে পাকিস্তানীরা দাঁড়াতেই পারছে না, ছামব সেকটরে তারা পিছু হটছে, হাজি পীর গিরিবর্ত্য অনায়াসে ভারতের দখলে ইত্যাদি। এ পক্ষের বিমান ওপক্ষের বিমানবাহিনী ধ্বংস করে নিশ্চিন্তে ফিরে আসছে। ওদের ট্যাংকগুলি টিনের তৈরি, আমাদের গোলা লাগলেই ঘায়েল হয়, আমাদের ট্যাংকগুলি অভেদ্য, বোমাও হজম করে নেয়।

অঘোষিত যুদ্ধ, তবু তাতেও মানুষ মরে, জলের মতন অর্থের অপব্যয় হয়। পৃথিবীর ধনী ও শক্তিশালী দেশগুলি হাসে। তাদেরই কাছ থেকে কেনা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুটি চরম গরিব দেশ, যারা মাত্র সতেরো বছর আগে ছিল একই জাতি, এখন শিশুর মতন মারামারি করছে।

সংঘর্ষ চলছিল কাশ্মীরে, আচম্বিতে ভারতের সেনাপতি জয়ন্তনাথ চৌধুরী লাহোর সেকটারে আক্রমণ করে বসলেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি চেঁচিয়ে উঠলো, লাহোর নগরীর পতন আসন্ন! কাশ্মীর সীমান্তে শক্তি সংহত করায় পাকিস্তান লাহোর সেকটারে ধরা পড়ে গেল খানিকটা অপ্রস্তুত অবস্থায়। তা হলে কি ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ হবে? এবারে কি পূর্ব পাকিস্তানও আক্রান্ত হবে?

ভারতীয় উপমহাদেশের এক প্রান্তে কাশ্মীর, আর এক প্রান্তে বাংলা। এই বাংলা আগেই দু'খণ্ড হয়েছিল, এবারে কাশ্মীরকে উপলক্ষ করে বাঙালী জাতিও সত্যিকারের দ্বিখণ্ডিত হলো। দু' দিকের নাগরিকদের তবু যা কিছু যাতায়াত ছিল তা বন্ধ হয়ে গেল একেবারে। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ি-জমি শত্রু-সম্পত্তি বলে ঘোষিত হলো, গ্রেফতার হতে লাগলো সেখানকার গণ্যমান্য হিন্দুরা। নিষিদ্ধ হলো রবীন্দ্র সঙ্গীত। এক শ্রেণীর কবি সাহিত্যিক দেশাত্মবোধের নামে উগ্র গল্প কবিতা লিখতে লাগলেন!

পশ্চিমবাংলাতেও অবস্থা প্রায় একই রকম। যুদ্ধের সময় নানারকম প্রচারযন্ত্রে মারাত্মক এক ধরনের কৃত্রিম দেশাত্মবোধ চাগিয়ে তোলা হয়। সাধারণ মানুষের মনোভাব হলো এই যে, এবারে পাকিস্তান নামের দেশটাকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। যে-কোনো পাকিস্তানী মানেই যেন ব্যক্তিগত দুশমন। মুসলমান মাত্রই যেন পাকিস্তানের স্পাই। হুমায়ুন কবীর, শা নওয়াজ খান প্রমুখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সম্পর্কেও সন্দেহ তোলা হলো, পাকিস্তানের সঙ্গে ওঁদের গোপন যোগাযোগ আছে কি না। লোকসভার সদস্য সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং আরও ৩৫০ জনকে আটক করা হলো ভারতরক্ষা আইনে। সৈয়দ মুজতবা আলি, আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতন শ্রদ্ধেয় লোকদের সম্পর্কেও শোনা যেতে লাগলো ফিসফাস। সৈয়দ মুজতবা আলি শান্তিনিকেতন থেকে মর্মান্তিক ক্ষোভের সঙ্গে এক তরুণ লেখককে চিঠিতে জানালেন, তুমি শোনোনি, চারদিকে গুজব ম ম করছে যে আমি পাকিস্তানের স্পাই!

যুদ্ধ মানেই ঘৃণা, অবিশ্বাস। যারা যুদ্ধ-বিরোধী, তারাও এই সময়ে কণ্ঠ তুলতে সাহস পায় না।

পূর্ব পাকিস্তানে এই যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে গেল। গভর্নর মোনেম খান লাট ভবনে সমস্ত বিরোধী নেতাদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আপনারা যুদ্ধের সরকারি ব্যবস্থা সমর্থন করে যুক্ত বিবৃতি দিন!

মৌলভীরা ঘোষণা করলো জেহাদ। কেউ কেউ কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে মসজিদে যেতে লাগলো নামাজ পড়তে, জেহাদের সময় তা সুন্নত। মেয়েরা শুরু করলো কুচকাওয়াজ। তরুণরা শপথ নিল দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও পাকিস্তানকে রক্ষা করবে। ছাত্র সমাজে আলোচনা চলতে লাগলো যে আইয়ুব খাঁ-কে যাবজ্জীবন প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব তোলা যায় কিনা! পূর্ব পাকিস্তানেও আইয়ুব হয়ে উঠলেন দারুন জনপ্রিয়।

কিন্তু যুদ্ধের আওয়াজ শুধু শোনা যেতে লাগলো রেডিওতে। আর কোথায় যুদ্ধ? সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পশ্চিমীরা যেন পূর্ব পাকিস্তানের কথা ভুলেই গেছে। ভারতীয় বাহিনী লাহোর আক্রমণের পর হঠাৎ পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট লোকদের খেয়াল হলো যে, এই দিকটা তো সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ভারত যদি চায় তো একদিনেই পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য যত খরচ, কামান-বিমান আর সৈন্যবাহিনী পোষা, সবই শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য? পূর্ব পাকিস্তানীরা অর্থ জুগিয়ে যাবে, ফল ভোগ করবে পশ্চিমীরা। ভারত তাদের শত্রু,কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরাও তাদের আপনজন মনে করে না! পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের রক্ষা করবে কে?

৩১ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মামুন আকাশের দিকে তাকালেন কয়েকবার। রাস্তার বাতিগুলি জ্বালানো হয়নি, কোনো বাড়ির একচিলতে আলোও এসে পড়েনি পথে, চতুর্দিক আবছায়া

অন্ধকার। কিন্তু আকাশে একটা বড়সড় চাঁদ উঠেছে, শত শত ঝরনা ধারার মতন নেমে আসছে জ্যোৎস্না। আকাশে কেউ ব্ল্যাক আউট করতে পারেনি।

সারাদিন ধরেই বারবার গুজব ছড়াচ্ছে, আজ বোমা বর্ষণ হবে। লাহোর ফ্রন্টে তুমুল আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর সব কটা প্লেনই চলে গেছে ওদিকে, ঢাকা শহর রক্ষার জন্য একটাও রেখে যায়নি, এই সুযোগে আজ কলাইকুণ্ডা থেকে উড়ে এসে ভারতীয় বোমারু বিমান ঢাকা আক্রমণ করবে। সন্ধে থেকে বেশ কয়েকবার প্যানিক সৃষ্টি হয়েছে, লোকের বাড়ির জানলা-দরজা জোরে বন্ধ করলেও বোমার শব্দ বলে ভুল হয়। ভারতীয় বিমানগুলি নাকি খুব ছোট ছোট, ওগুলোর নাম ন্যাট, বাদুড়ের মতন নিঃশব্দে উড়ে আসতে পারে।

এ গুজবের কোনো ভিত্তি নেই, তবু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পূর্ব পাকিস্তানেও ফ্রন্ট খুলে ভারত এই যুদ্ধটা সর্বত্র ছড়িয়ে দেবে, মামুনের তা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কাশ্মীর ছেড়ে লাহোরে তো ভারত আক্রমণ করেছে ঠিকই। এবারে এদিকেও অতর্কিতে এসে পড়তে পারে। ভারতের কি মতলেব তা হলে পাকিস্তানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া?

অফিসের কাজের চাপ সাঙ্ঘাতিক, তবু মামুন হঠাৎ এক সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন একা। শুধু তাঁর সেক্রেটারি শওকতকে বলে এসেছেন যে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরবেন, কোথায় যাচ্ছেন তা বলেননি। এখন পৌনে আটটা বাজে। প্রত্যেকদিন রাত সাড়ে বারোটা-একটা পর্যন্ত যুদ্ধের শেষতম খবর দিয়ে পাতা ছাড়তে হয়, পর পর কয়েক রাত মামুন বাড়ি ফেরেননি, অফিসে নিজের ঘরেই একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন কয়েক ঘণ্টা। আজ কাজ করতে করতে এক সময় তাঁর অসহ্য লাগছিল, তাঁর মনে হলো মাথায় একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগানো দরকার। তা ছাড়া মামুন নিজের মনকে বোঝালেন, শুধু রিপোটারদের মুখ থেকেই তিনি খবর পাচ্ছেন, কিন্তু সম্পাদক হিসেবে তাঁর নিজের চোখেও একবার শহরের অবস্থাটা দেখে আসা উচিত। গাড়ি নেননি, তিনি পায়ে হেঁটে বেরিয়েছেন। যদি সত্যিই প্লেন থেকে বোমা পড়ে, তা হলে বাড়ি বসে থেকেও কি নিস্তার পাওয়া যাবে?

অফিসে তাঁর মালিকের সঙ্গে রোজ রোজ তর্ক বাঁধছে, এ কাজ মামুন আর কতদিন করতে পারবেন তাতে সন্দেহ আছে। তবে, খবরের কাগজের কাজের একটা নেশা আছে, বিশেষত যুদ্ধ-বিগ্রহের মতন বড় ধরনের খবরের সময় কাজ ছাড়ার প্রশ্ন ওঠে না।

কাশ্মীরে সংঘর্ষ শুরু হবার পরদিনই হোসেন সাহেব মামুনকে তাঁর চেম্বারে ডাকিয়ে টেবিল চাপড়িয়ে বলেছিলেন, দ্যাখলেন, দ্যাখলেন, আমি তখনই কইছিলাম না? আপনেরা ম্যাডাম ফতিমা জিন্নারে সাপোর্ট করলেন! আমাগো চৌদ্দ পুরুষের ভাইগ্য যে ফতিমা জিন্না জেতে নাই। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইজ যদি মাইয়া মানুষ হইত, তাইলে আর রক্ষা আছিল? মাইয়া মানুষে এই যুদ্ধ চালাইতে পারতো? জবরদস্ত জেনারাল আইয়ুব খান আছে বইলাই তো ইণ্ডিয়া এখনো পাকিস্তানরে ডরায়! আপনেরা তখন ফতিমা জিন্নার নামে নাচতে আছিলেন।

মামুন নম্রভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ফতেমা জিন্না জয়ী হলে হয়তো এ যুদ্ধই হতো না। ফতেমা জিন্না প্রেসিডেন্ট হলে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, গণতান্ত্রিক সরকার এলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যেত। কিন্তু কে শোনে কার কথা! হোসেন সাহেব টেবিল চাপড়েই নিজের মতটা প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাঁর কাছে যুদ্ধ মানে যেন দুই দেশের শীর্ষ পদাধিকারীর দৈহিক লড়াই! ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছোট্ট খাট্টো মানুষ, আর আইয়ুব খান লম্বা চওড়া পুরুষ, সুতরাং এই যুদ্ধে পাকিস্তান জিতবেই। হোসেন সাহেব হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন, কী ভাবে আইয়ুব খান ঐ চড়ুই পাখির মতন লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে বাঁ হাতের মুঠোয় পিষে মেরে ফেলবেন।

সংবাদ পরিবেশনা ও সম্পাদকীয় নিয়েও হোসেন সাহেবের সঙ্গে মামুনের মতভেদ হচ্ছে পদে পদে। হোসেন সাহেব ইণ্ডিয়ার বদলে হিন্দুস্থান নামটির ওপর জোর দিতে চান। লোকে মুখে মুখে পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের লড়াই বলে বটে, কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী পাশের রাষ্ট্রটির নাম ইণ্ডিয়া,দ্যাট ইজ ভারত। কাগজেকলমে হিন্দুস্থান নামে কোনো দেশের

অস্তিত্ব নেই, সুতরাং সাংবাদিকতার এথিক্স অনুযায়ী ইণ্ডিয়া বা ভারতই লেখা উচিত। হোসেন সাহেব সে যুক্তি বুঝবেন না। তাঁর মতে, ইণ্ডিয়া মানেই হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ।

গতকালের সম্পাদকীয় নিয়েও মতবিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল। হোটেলওয়ালা হোসেন সাহেব এখন সম্পাদকীয় পলিসিও ডিকটেট করতে চান! কয়েকদিন আগে আদমজী জুট মিলে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে, পুলিস সেখানকার শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। এই খবরে অনেকেই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। বড় বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি ঐ জুট মিল এলাকা থেকেই শুরু হয়। মোনেম খাঁ এবং তার চ্যালারা এখন একটা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা লাগিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে পারে, যাতে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানী যুদ্ধের দুর্বলতা এদিকে চাপা পড়ে যায়। মামুন সেই বিষয়েই লিখেছিলেন সম্পাদকীয়। ছাপতে দেবার আগেই সেই সম্পাদকীয় পড়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে হোসেন সাহেব বলেছিলেন, এদিকে এত বড় একটা যুদ্ধ চলতাছে, আর আপনে ল্যাখলেন এই রকম একটা তুচ্ছ বিষয়ে? আপনার কি মাথা খারাপ হইছে, এডিটর সাহেব?

মামুন বলেছিলেন, এটা মোটেই তুচ্ছ বিষয় নয়! এখন কোনোরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়াতে দেওয়া উচিত নয় আমাদের নিজেদের স্বার্থে। আসল লড়াইয়ের জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে না?

টেবিল থেকে সেদিনের "ইত্তেফাক" কাগজটা তুলে নিয়ে মামুন আরও বলেছিলেন, এই দেখুন, আজকের "ইত্তেফাক"-এও সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, "রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিরোধ যতই, মর্মান্তিক হোক, তা যেন বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি না ঘটায়।"

হোসেন সাহেব তাঁর কাগজের সঙ্গে অন্য কোনো কাগজের তুলনা পছন্দ করেন না। তাঁর মতে, "দিন কাল"ই বাংলার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র। তিনি তাঁর দাড়ি চেপে ধরে রাগের সঙ্গে বললেন, ঐ মানিক মিঞার চোথা কাগজে কী ল্যাখছে তা আমার জানার দরকার নাই! মনে রাখবেন, "দিন কাল" আওয়ামী লীগের মাউথ পীস না! আমাগো মতামত স্বাধীন। এই যুদ্ধে হিন্দুস্থানরে আমরা ক্র্যাশ কইরা দিমু! আপনে সেই রকম গরম গরম ল্যাখেন।

মামুন এবারে আলতাফের দিকে ফিরে কঠোরভাবে বলেছিলেন, তোমার চাচাকে জিজ্ঞেস করো, আমি এখনও এই কাগজের সম্পাদক আছি কিনা। যতক্ষণ আমি তা থাকবো, ততক্ষণ আমার লেখার ওপরে কেউ কলম চালাতে পারবে না। আরও একটা কথা ওঁকে বলে দাও, খবরের কাগজে মিথ্যা মিথ্যা গরম গরম কথা লিখে একটা দেশকে ক্র্যাশ করে দেবার ক্ষমতাও আমার নাই, সেই রকম কোনো ইচ্ছাও নাই।

আলতাফ তার চাচাকে খুব ভালোই চিনে গেছে। মামুন ভাই যতক্ষণ শান্ত থাকেন ততক্ষণই হোসেন চাচা পেয়ে বসেন আর নানারকম হুংকার দেন। মামুন একবার পদত্যাগের কথা তুলতেই উনি চুপসে যান। এই অফিসের অধিকাংশ ছেলেছোঁকরাই মামুনের ভক্ত, মামুন কাজ ছেড়ে দিলে তারাও সদলবলে চলে যাবে, কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে।

আলতাফ সহাস্যে বললো, আরে না, না, মামুন ভাই, আমার চাচা বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি ঠিকই বোঝেন যে ওরকম কিছু সম্ভব না। উনি শুধু মাঝে মাঝে আপনারে একটু চ্যাতাইয়া দিতে চান, যাতে আপনে ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে আর একটু গরম গরম অ্যাটাকিং লেখেন!

রাস্তায় বেরিয়েও মামুনের মাথায় এই সব কথাই ঘুরছে। তিনি কিছুক্ষণ অফিসের বিষয় ভুলে থাকতে চান। তিনি সিগারেট ধরিয়ে, এক খিলি পান খাওয়ার কথা ভাবলেন।

অন্ধকার হলেও রাস্তা একেবারে নির্জন নয়। মোড়ে মোড়ে মানুষের জটলা। অনেকেই তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। এমন ধপধপে চাঁদের আলোয় বোমারু বিমান এসে পড়লেও ওপর থেকে ঢাকা শহরটি স্পষ্ট চিনতে পারবে।

বড় দোকানপাট সব বন্ধ থাকলেও দু-একটা পান বিড়ির দোকান গোপনে বিক্রি বাটা চালাচ্ছে। একটা ছোটখাটো জটলার মধ্যে গান ধরেছে একজন ভিখিরি জাতীয় মানুষ। এরা সিনেমা হলের সামনে ভিক্ষে করে। ব্ল্যাক আউটের জন্য রোজগার বন্ধ। মামুন গানটা শুনলো মন দিয়ে।

আল্লা যদি করে ভাই লাহোরে যাইব
হুথায় শিখের সাথে জেহাদ করিব।
জিতিলে হইব গাজী মরিলে শহীদ
জানের বদলে জিন্দা রহিবে তৌহিদ।

গানটা শুনে মামুনের ঠোঁটে হাসি এলো। এটা অনেককাল আগেকার একটা ছড়া, খুব শৈশবে মামুন তাঁর পিতামহের মুখে শুনেছিলেন। সেই ছড়াতেই সুর দিয়ে এই লোকটি এখন বেশ বুদ্ধি করে কাজে লাগিয়েছে তো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মামুন লোকজনের কথাবার্তাও শুনলেন কিছু কিছু। অধিকাংশই গুজব-চচা। দুটো গুজব নতুন শুনলেন মামুন। রেডিওতে নাকি বলেছে যে একজন মান্যগণ্য মৌলবী স্বপ্ন দেখেছেন, স্বয়ং রসুলুল্লাহ যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার সওয়ার হয়েছেন। মৌলবী জিজ্ঞেস করলো, হুজুর সওয়ারে কায়েজাত, কোথায় তশরীফ নিতে যাচ্ছেন। হুজুর উত্তর দিলেন, পাকিস্তানে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে, ওদের রক্ষার জন্যই যেতে হচ্ছে আমাকে।

আর একটি, যুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য আশমান থেকে নেমে আসছেন অসংখ্য ফেরেশতা। তাঁদের লম্বা দাড়ি ও সবুজ পোশাক। ইণ্ডিয়ার সৈন্যরাই এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। হিন্দুস্থানী সোলজাররা ধরা পড়বার পর ক্যাম্পে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে, আমাদের যে সবুজ পোশাকধারী সৈনিকরা গ্রেফতার করলো, তারা কোথায়?

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, ভাই-বেরাদরেরা শুনেছো, লাহোরে আসল লড়াই লড়ত্যাছে কারা? আমাগো ইস্ট পাকিস্তানী ব্যাটেলিয়ান! আমাগো বাঙ্গালী সোলজারদের সামনেই ইণ্ডিয়ানরা দাঁড়াইতে পারতেছে না, পিছু হাঁটতেছে।

আর একজন বললো, তা তো বোঝলাম, কিন্তু বাংগালী ব্যাটেলিয়ান রইলো লাহোরে, আর ইদিকে ইণ্ডিয়ান আর্মি যদি যশোর দিয়া ঢুইক্যা পড়ে, তাইলে তাগো সাথে লড়াই দিবে কেডা? ইদিকে যে বেবাক ফাঁকা!

মামুন আবার হাঁটতে শুরু করলেন। একটা পান খেয়ে চাঙ্গা বোধ করছেন। অনেকদিন তিনি এরকম একলা একলা ঘুরে বেড়াননি সন্ধের পর। তিনি আজ নিজের চোখে দেখলেন, নিজের কানে শুনলেন, ঢাকা শহরের মানুষ এই যুদ্ধে অসহায় বোধ করছে, পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিরক্ষার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এখন রসুলুল্লার ও ফেরেস্তাদের ওপর তাদের ভরসা। কাশ্মীর নিয়ে কারুর বিশেষ মাথাব্যথা দেখা গেল না।

মামুন কোনো গন্তব্য ঠিক করে পথে বেরোননি। তবু তিনি একটি বাড়ির সামনে এসে থামলেন। পকেট থেকে সরু টর্চ জ্বেলে দেখলেন, সদর দরজা বন্ধ। একটু ইতস্তত করে তিনি টর্চের উল্টো দিক দিয়ে দরজায় ঠকঠক করে ঠুকলেন কয়েকবার।

একটু পরে হাতে একটি কুপি নিয়ে অল্পবয়সী একটি মেয়ে দরজার এক পাল্লা খুলে মামুনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

মামুন জিজ্ঞেস করলো, বাবুল বাসায় আছে না?

মেয়েটি বললো, জী না, বাসায় নাই।

মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, মামুন এক হাত দিয়ে ঠেলে তাকে রুখলেন। ভেতরে এসে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, তুই কে রে, ছেমরী, আমারে চেনোস না?

শালোয়ার কামিজ পরা কিশোরী মেয়েটি বললো, জী না। আপা গ্যাট বন্ধ রাখতে কইছেন।

–তোর আপা কোথায়? তারে গিয়া ক যে মামুন মামা আইছে।

–আপা গোসলখানায়।

–ঠিক আছে, আমি উপরে গিয়া বসতাছি।

সিঁড়ি দিয়ে মামুন চলে এলেন দোতলায়। এই সময় বাবুল কোথায় গেল? আলতাফের ছোট ভাই হলেও বাবুল চৌধুরী 'দিনকাল পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। মামুনের অনুরোধেও সে কিছু লিখতে চায় না। আগে সে নিউজ রুমে আড্ডা দিতে যেত সন্ধের দিকে, এখন তাও যায় না, তা হলে কোথায় যায় সে?

ওদের বাচ্চাটি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে, নইলে তার সাড়া পাওয়া যেত। মঞ্জুর ছেলেকে মামুন এত ভালোবাসেন যে কয়েকদিন না দেখলে তাঁর মন ছটফট করে। যুদ্ধের ডামাডোলে বেশ কিছুদিন তিনি এ বাড়িতে আসতে পারেন নি। বসবার ঘর পেরিয়ে মামুন শয়নকক্ষে এসে উঁকি দিলেন। সুখু মিঞা সত্যিই ঘুমিয়ে আছে। মামুন কাছে এসে আলতো করে তার কপালে একটা চুম্বন দিলেন, তাকে জাগালেন না।

মঞ্জু গা ধুয়ে আসুক, ততক্ষণ তিনি অপেক্ষা করবেন। বসবার ঘরে ফিরে এসে তিনি আর একটি সিগারেট ধরালেন। ইদানীং তাঁর সিগারেট খাওয়া বেড়ে গেছে। রাত জাগতে গেলে সিগারেট বেশি খেতেই হয়। অফিসে ফিরে গিয়ে আজও অনেক রাত জাগতে হবে। আর যদি ইণ্ডিয়ান বোমারু বিমান আসে...অনেকের ধারণা ওরা এলে আসবে মাঝরাত্তিরের পর...থাক, মামুন এখন ওসব নিয়ে চিন্তা করতে চান না।

ঢাকা শহরে খুব ধরপাকড় চলছে। গ্রেফতার হয়েছেন আওয়ামী লীগের অনেক নেতা। এরা যে দেশপ্রেমিক তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? যুদ্ধের সময় কোনো দেশপ্রেমিক কি অন্য দেশের সমর্থক হতে পারে? গভর্নর মোনেম খাঁ হিন্দু ছেলেছোঁকরাদের যে আটক করছেন, তাতে অবশ্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় আমেরিকা তার নিজের দেশের মধ্যে জাপানী বংশোদ্ভূতদের আটক করে রাখেনি? পল্টন বাবুল-আলতাফদের দু-একজন হিন্দু বন্ধু আটক হয়েছে, সেজন্য তারা খুব উত্তেজিত, কিন্তু আপকালে এরকম কিছু কিছু ঘটনা তো ঘটবেই।'

বাবুল হঠাৎ ধরা-টরা পড়ে যাবে না তো? এই ছেলেটি বড় গভীর-সঞ্চারী, মামুন ওকে ঠিক বুঝতে পারেন না। তাঁর অতি স্নেহের, অতি আদরের মঞ্জুর স্বামী এই বাবুল। মামুনের

নিজের পুত্র সন্তান নেই, তিনি বাবুলকে নিজের ছেলের মতন দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবুল তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। বাবুল বলে, সে এখন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নেই, সে আওয়ামী লীগে নেই, ন্যাপের সঙ্গেও নেই তা সত্যি। ফতেমা জিন্না হেরে যাবার পরে তো সব রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও আবার বন্ধ হয়ে গেছে। তবু, বাবুল যেন গোপনে গোপনে কিছু একটা করছে। সে প্রায়ই একা একা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে যায় কেন? ছেলেটার নিজের নাম প্রচারের চেষ্টা নেই, রোজগার বাড়াবারও ধান্দা নেই, তবে সে কী চায়?

বাথরুমে মঞ্জু গায়ে জল ঢালছে সেই শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মেয়েটার তিনবেলা স্নানের বাতিক। তার হৃদয়ের মতনই তার শরীররটাও সব সময় ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। এই মেয়েটার কথা ভাবলেই মামুনের মনটা দ্রব হয়ে আসে। এই মেয়েটা কোনো বড় রকমের দুঃখ পেলে মামুন তা কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না।

রাস্তায় একটা হুড়োহুড়ির শব্দ, কিছু লোক ছোটাছুটি করছে। মামুন জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আবার কিছু একটা গুজব। ও হরি, ওয়াটার ওয়ার্কসের শব্দ। প্রত্যেকদিনই এই শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু আজ ঐ শব্দতেই লোকে বোমারু বিমানের শব্দ বলে ভুল করেছে। অবশ্য আজ নিস্তব্ধতাও অনেক বেশি।

আকাশে কী শান্ত, সুমধুর জ্যোৎস্না। এর মধ্যেও আততায়ী এসে শত শত মানুষ খুন করার জন্য বোমা নিক্ষেপ করতে পারে? কিন্তু মানুষ তো মরছে। এই মুহূর্তে ছা-আগনুরে পাকিস্তানী স্যাবার জেট আর ভারতীয় ভ্যামপায়ার অগ্নিবর্ষণ করছে, ইছোগিল খালের। এপাশে-ওপাশে গর্জন করছে রাইফেল।

মামুনের হঠাৎ মুসাফিরের কথা মনে পড়লো। রহস্যময় পুরুষ। তাঁকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে পরিচিত মহলে। লোকটা সত্যিকারের কী মহাপুরুষ, না জালিয়াৎ? বিশ্ব মানবতাবাদী, না গুপ্তচর? কাশ্মীর উপলক্ষ করে এই সময়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ যে শুরু হবে, তা উনি আগে থেকে কী করে জানলেন? মামুন তো কল্পনাও করতে

পারেননি, ইণ্ডিয়ার অনেক পত্র-পত্রিকাতেও এই আকস্মিকতায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। তবে উনি কী করে জানলেন? স্বপ্ন দেখেছেন?

এর মধ্যে আরও দু-তিনবার মুসাফিরের সঙ্গে দেখা হয়েছে মামুনের। প্রত্যেকবারই উনি ওঁর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির প্রখরতায় মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। অবশ্য ম্যাজেশিয়ানরাও চকিতে মানুষকে মুগ্ধ করে দিতে পারে। মামুন একদিন অফিস আসার পথে দেখেছিলেন, গ্যাণ্ডেরিয়ার মোড়ে উনি একা দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর চেহারার জন্য ওঁকে ভিড়ের মধ্যেও আলাদা ভাবে চোখে পড়ে। দীর্ঘ, সমুন্নত দেহ, সাদা কুতা-পাজামা পরা, চোখে কালো চশমা। ঐ চশমা তিনি কক্ষনো চোখ থেকে খোলেন না। অথচ অন্ধও তো নন, একা একাই চলাফেরা করেন।

মামুন গাড়ি থামিয়ে তাঁকে তুলে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজি হননি। মৃদু হেসে বলেছিলেন, এখন যাবো না, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানারকম মানুষ দেখছি। বেশ লাগছে।

যেন মুসাফির অন্য গ্রহের অধিবাসী। তিনি মানুষ দেখতে এসেছেন। কথার সুরটি ছিল সেই রকম। মামুনের মজা লেগেছিল। লোকটিকে দিয়ে কিছু লেখাতে পারলে ভালো হতো।

কিন্তু তা আর হলো না। পরশুদিন মুসাফিরও গ্রেফতার হয়েছেন। তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। মুসলমান হলেও ঐ মুসাফির ইণ্ডিয়ান সিটিজেন, এই যুদ্ধের সময় অন্য দেশের সিটিজেনদের আলাদা করে এক জায়গায় আটকে রাখাই তো স্বাভাবিক, সব দেশই তাই করে।

প্রথম দিনের আড্ডায় মামুন যাঁদের মুসাফিরের বন্ধু হিসেবে দেখেছিলেন, তারা এখন সবাই মুসাফিরের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করছেন। মামুন কবি জসিমুদ্দিনের কাছে খবর করেছিলেন, কবিও অনেকটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, পার্টিশানের আগে ওনার সাথে পরিচয় ছিল, তারপর অনেকদিন খবর রাখি না, এখন ওনার মতবাদ কী হয়েছে না

হয়েছে তা আমি কী করে বলবো! কেউ কেউ বললো, লোকটা আসলে হিন্দু, বিশেষ একটা মতলোবে এই সময়ে ঢাকায় এসেছিল। নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ার স্পাই। মামুনের এতটা বিশ্বাস হয় না। স্পাইয়ের চাকরির জন্য এতটা বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া স্পাই হলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনার কথা সে আগেই বলে দেবে কেন?

মুসাফির আরও একটা কথা বলেছিলেন, যা ভাবলেও এখনও মামুনের হাসি আসে। মামুনের ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের মাঝখানে নাকি একটি সুন্দরী নারী এসে ছায়া ফেলবে। মামুন দাড়িতে হাত বুলোলেন, অর্ধেকের বেশি পেকে গেছে। মাথার পিছনে ইন্দ্রলুপ্ত। চশমা

পরলেই একেবারে অন্ধ। বয়েস তাঁর খুব বেশি হয়নি, কিন্তু অকাল বার্ধক্য এসে গেছে, এই সময় কোন সুন্দরী নারী স্বেচ্ছায় আসবে তাঁর জীবনে! আকাশ-কুসুম ছাড়া আর কিছু পাওয়ার আশা নেই এ জীবনে।

রাস্তায় আবার গোলমাল, একটা ধাতব ঘর্ঘর শব্দ। দুটো সাঁজোয়া গাড়ি বেরিয়েছে। তা হলে সব কটা ট্যাঙ্ক পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়নি, কয়েকটা রয়ে গেছে? ঢাকাবাসীদের মনোবল বাড়াবার জন্য সেগুলো রাস্তায় বার করা হয়েছে, ভারতীয় বিমান এলে এই দু-চারখানা। ট্যাঙ্কই তাদের মোকাবিলা করবে! পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি রোজ বড় বড় ব্যানার হেডলাইনে যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, এখানে একটা কিছু না ঘটলে আর ইজ্জত থাকে না।

মামুন জানলা বন্ধ করে দিতেই অন্য দিক থেকে একটা আলোর শিখা দেখতে পেলেন। পাছে মঞ্জু হঠাৎ তাঁকে দেখে ভয় পেয়ে যায় তাই তিনি আগে থেকেই সহাস্যে বললেন, কেমন আছিস রে, মঞ্জু? আমার বিলকিসবানুর খবর কী?

একটা বড় মোম হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো মঞ্জু। সদ্য স্নান করে সে একটা গোলাপি রঙের শাড়ি পরেছে, এক রাশ চুল পিঠের ওপর ফেলা। সে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে, বাতাস

নিয়ে আসছে তার শরীরের সুগন্ধ। তার সারল্যমাখা দু চোখে এখন অদ্ভুত বিস্ময়, যেন সে মামুনকে চিনতে পারছে না।

মামুনও মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকারের মধ্যে মোমবাতি হাতে নিয়ে এই অসামান্যা রমণীটি যেন উঠে এসেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। কিংবা সে রক্তমাংসের মানবী নয়, কোনো মহাকবির কল্পনা। যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজনৈতিক দলাদলি, ক্ষুদ্র স্বার্থ সব কিছু এই রূপের কাছে তুচ্ছ। নারীর এই রূপ যুগ যুগ ধরে পুরুষকে মহান শিল্প সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

এই প্রৌঢ় বয়েসেও মামুনের বুক কেঁপে উঠলো। তারপরই তিনি দেখলেন মঞ্জুর মুখে আতঙ্কের ছায়া।

খুব কাছে এসে মঞ্জু থমকে দাঁড়ালো। একদৃষ্টে চেয়ে রইলো, কোনো কথা বললো না।

মামুন মঞ্জুর এক হাত ধরে বললেন, কী হয়েছে তোর? ভয় পেয়েছিস নাকি? ভয় কী?

মঞ্জু খুব আস্তে আস্তে প্রায় ফিসফিসানির মতন গলায় জিজ্ঞেস করলো, মামুনমামা, উনি কোথায়? উনি আসেন নি?

মামুন বললো, বাবুলের খোঁজেই তো আসলাম। তাকে বাসায় দেখছি না। সে গেছে কোথায়, তোকে কিছু বলে যায়নি?

মঞ্জু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, না।

মামুন বললেন, আচ্ছা পাগল ছেলে তো! এমন দিনে বউকে একা বাসায় রেখে কেউ বাইরে থাকে? তবে তুই চিন্তা করিস না, রাস্তায় অনেক মানুষজন, সে এসে পড়বে।

মোমবাতিটা খুব যত্ন করে একটা টেবিলের ওপর আটকালো মঞ্জু। তারপর হঠাৎ পেছন ফিরে মামুনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে হু-হুঁ করে কাঁদতে লাগলো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে

বললো, মামুনমামা, আমার: কী হবে? উনি আমার সাথে আর ভালো করে কথা কন না, আমারে আর ভালোবাসেন না!

কত বাচ্চা বয়েস থেকে দেখছেন এই মেয়েটিকে, মামুন এর কষ্ট সইতে পারেন না। বাবুলের ওপর তাঁর বেশ রাগ হলো, কিসের এত আড্ডা সে ছেলের যে এমন বউয়ের কথা ভুলে যায়? মঞ্জুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মামুন সাবান, পারফিউম ও শরীরের একটা আলাদা সুগন্ধ পেলেন, তিনি ভুলে গেলেন যুদ্ধের কথা, ভুলে গেলেন অফিসের কথা। কোমল সুরে তিনি বলতে লাগলেন, তুই কিছু চিন্তা করিস না, মা, সে এসে পড়বে। সে বুঝদার ছেলে, সে কোথাও যাবে না।

–আমি জাহানারা আপার বাসায় গেছিলাম, উনারাও কিছু বলতে পারলেন না। আগে ঐ বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় যেতেন প্রায়ই!

–তুই এই অন্ধকারের মধ্যে একা রাস্তায় বেরিয়েছিলি? কাজটা মোটেই ভালো করিস নাই! বাবুল তো দায়িত্ববান মানুষ, নিশ্চয়ই কোথাও...।

–সেই দুপুর দুইটার সময় বাইরাইছেন...আমি জুনিপারের বাসা থিকা তিন-চার জাগায় টেলিফোন করলাম, কেউ কিছু জানে না, পল্টনভাইও কিছু কইতে পারলেন না। জুনিপার আমারে ভয় দেখাইলো

–জুনিপারের কথা তুই শুনিস না।

মঞ্জু একবার মুখ তুলে জল-ছলছল দু চোখে বললো, মামুনমামা, উনি কোথায় যান বলেন তো? আমি বুঝে গেছি, উনি আমারে আর ভালোবাসেন না। তাইলে আমি কী নিয়া বাঁচবো।

মামুন মঞ্জুর মুখখানা আবার নিজের বুকে চেপে ধরলেন। বিদ্যুতের মতন একটা চিন্তা তাঁর মন ছুঁয়ে গেল। বাবুল ইদানীং খবরের কাগজের অফিসে যায় না, প্রত্যক্ষ রাজনীতিও

করে না, বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, তা হলে কি সে অন্য কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়েছে? সে অত্যন্ত রূপবান যুবক, ঢাকা শহরের অনেক যুবতীই তাকে আকৃষ্ট করতে চাইতে পারে। হাই সোসাইটিতে এরকম কিছু কিছু রমণী দেখেছেন তিনি, যাদের কোনো হায়াসরম নেই, বিবাহিত পুরুষদের দিকে তারা যখন তখন ঢলে পড়ে। নব্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে এরকম একটা ইঙ্গ বঙ্গ সমাজ তৈরি হয়েছে, যারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের বাড়িতে ডেকে পার্টি দেয়, ঘরের বউ-ঝিদের বাইরে বার করে, বাবুল কি সেরকম কোথাও গিয়ে জুটলো? তিনি মনে মনে তৎক্ষণাৎ শপথ করলেন, যেভাবেই হোক, বাবুলকে তিনি ফিরিয়ে আনবেনই!

মামুন মঞ্জুর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, দূর পাগল, সে তোরে ভালোবাসবে না, এ কি হতে পারে? বাবুল আমাদের হীরার টুকরা! সে একটু বেশি আড্ডা দিতে ভালোবাসে এই যা! তোর কোনো ভয় নাই রে, মঞ্জু, সে আজ যতক্ষণ না আসে, আমি থাকবো এখানে। কী, তা হলে হলো তো? আর ভয় নাই তো? একটু চা খাওয়াবি?

চায়ের প্রস্তাবে মঞ্জু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো মামুনের বুক থেকে। কিন্তু মামুনের চায়ের জন্য তেমন ব্যস্ততা নেই। মেয়েটা ভয় পেয়েছে, তাকে সান্ত্বনা দেওয়াটাই অনেক বেশি জরুরি, তিনি মঞ্জুকে সম্পূর্ণভাবে বুকে জড়িয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন।

৩২ কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস

দুপুর থেকে রাত নটা পর্যন্ত কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস যাদের ঘরবাড়ি, তারা আজ সন্ধেবেলাতেই স্থানচ্যুত। তারা বেশ ক্ষুব্ধ, এখন তারা কোথায় যাবে? এই কফি হাউসের বেশ কয়েকটা টেবিল জুড়ে বসে নবীন কবি ও গল্পকারদের দল, লিটল ম্যাগাজিনের উদ্ধত, রাগী লেখকবৃন্দ, এরা কলেজ জীবন শেষ করেছে, অনেকেই কোনো চাকরি-বাকরি পায়নি, বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই তাদের। সাতজনের টেবিলে তিন কাপ কফির অর্ডার দিয়ে ভাগ করে নিয়ে সময় কাটায় দু' ঘণ্টা, তারপর বেয়ারা এসে গজ

গজ করলে আরও দু' কাপের অডার দেয়। একজন সিগারেট ধরিয়ে অর্ধেকটা টানতে টানতেই হাত বাড়িয়ে দেয় আর একজন, আরও একজন বলে, লাস্ট সুখটানটা দিস! এদের দু'একজন টিউশানি করে কিছু টাকা রোজগার করে, যেদিন টিউশানির মাইনে পেয়ে কফি হাউসে আসে, সেদিন বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হয়ে যায়, বড় দলটার মধ্যে তৈরি হয়ে যায় একটা ছোট দল, কফি হাউস ছেড়ে তারা চলে যায় খালাসিটোলায় দেশি মদের আড্ডায়। সেসব দিনে বাড়ি ফিরতে ফিরতে পেরিয়ে যায় মধ্যরাত।

ব্ল্যাক আউট শুরু হয়েছে, সন্ধেবেলা সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। মিশমিশে অন্ধকার রাস্তাঘাটের কলকাতাকে সম্পূর্ণ অচেনা মনে হয়। রাতের কলকাতার প্রধান অলঙ্কারই তো আলো। বম্বে-দিল্লির থেকেও কলকাতায় আলো বেশি, এই শহর অনেক রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকে। বিজ্ঞাপনের রঙীন বাতিগুলি জ্বলে সারা রাত। সেই কলকাতা সন্ধেবেলাতেই ডুবে আছে নিথর অন্ধকারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্ল্যাক আউটের স্মৃতি এই প্রজন্মের অনেকেরই নেই। যে সব তরুণেরা এই শহরটিকে পাগলের মতন ভালোবাসে, তাদের এই অন্ধকার সহ্য হচ্ছে না।

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে অবিনাশ, পরীক্ষিৎ, হেমন্ত, বরুণ, সুবিমলরা এসে দাঁড়ালো প্রেসিডেন্সি কলেজের উল্টোদিকে। সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোথাও যাবার জায়গা নেই বলেই এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। একটা অর্থহীন যুদ্ধ এবং অনভিপ্রেত অন্ধকারের প্রতি ওরা প্রতিবাদ জানাতে চায়।

মানিকদার স্টাডি সার্কলের সদস্য তপনও ইদানীং এই নব্য সাহিত্যিকের দলে ভিড়েছে। তপন কবিতা লেখে। স্টাডি সার্কলে সে একদিন তার কবিতা পড়ে শুনিয়ে খুব লজ্জা পেয়েছিল। সুকান্ত ভট্টাচার্যর বন্ধু মানিকদা শুধু বিস্মিত নয়, রীতিমত আহত হয়েছিলেন সেই সব কবিতা শুনে। গরিবের ছেলে তপন, রিফিউজি কলোনিতে জ্যাঠামশাইয়ের

সংসারে থাকে, তবু সে লিখলো প্যানপেনে প্রেমের কবিতা? দেশের যা অবস্থা, এই কি প্রেমের কবিতা লেখার সময়? অন্য কয়েকজন সদস্যও বিদ্রূপ করেছিল তপনকে।

মানিকদার স্টাডি সার্কল সে ছাড়েনি, কিন্তু কফি হাউসের এই আড্ডাটাতেও তার নেশা ধরে গেছে। দেশ, সমাজ, মা বাবা, কবিতা, মদ, নারী ইত্যাদি বিষয়ে এরা এমন তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলে যে তপন চমকে চমকে ওঠে। এরা পূর্বনির্ধারিত কোনো নীতির পরোয়া করে না, সব কিছু নিজেরা যাচাই করে নিতে চায়। এরা ধর্ম, দেশপ্রেম, কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, আমেরিকান পালিসিকে অবজ্ঞা করে, আবার চীন-রাশিয়া বা মার্কসবাদকেও অমোঘ, অকাট্য বলে মানে না। তপনের কাছে এসব নতুন অভিজ্ঞতা।

অবিনাশ বললো, চল, কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসি।

আজ সন্ধেবেলা পাওয়া যাবে কি যাবে না এই ঝুঁকি না নিয়ে দুপুরবেলাতেই কয়েক বোতল বীয়ার খেয়ে এসেছে হেমন্ত। তার মেজাজ বেশ ফুরফুরে। সে বললো, কেউ আমার একটা হাত ধরো ভাই, আমি বোমা খেয়ে মরতে রাজি আছি, কিন্তু অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পা ভাঙতে রাজি নই। শালারা রাস্তাগুলো যা করে রেখেছে না।

অবিনাশ বললো, এ বছর আর রাস্তা সারাবে না। যুদ্ধের জন্য বর্ডারের দিকে নাকি নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, শহরের রাস্তা সারাবার টাকা নেই।

হেমন্ত বললো, আরে বর্ডারের রাস্তা তো বানাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। শহরের রাস্তা সারাবে করপোরেশন। যুদ্ধের সঙ্গে করপোরেশনের কী সম্পর্ক।

সুবিমল অবজ্ঞার সুরে বললো, সব কিছুর সঙ্গেই সব কিছুর সম্পর্ক থাকে।

হেমন্ত তার কাঁধে এক চাপড় মেরে বললো, তার মানে। এটা তুই কী বললি? সব কিছুর সঙ্গে সব কিছুর সম্পর্ক থাকে, এর মানে কী?

সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর বদলে সুবিমল বললো, ও, কোনো মানে নেই বুঝি? তা হলে ভুল বলেছি।

পরীক্ষিৎ বললো, না, সুবিমল, তুই ভুল বলিসনি। সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক তো থাকেই। যেমন তেলের সঙ্গে জলের একটা সম্পর্ক আছে।

অবিনাশ বললো, আগুনের সঙ্গে খিদের যেমন একটা সম্পর্ক আছে।

মাঝে মাঝে গাড়ির হেড লাইটের আলো পড়ছে ওদের গায়ে। যানবাহন পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, হেডলাইটে কালো রঙ করাও হয়নি। সেই আলোতে ওরা দেখলো রাস্তার উল্টোদিকের ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে আছে অদিতি। একা।

অবিনাশ নিজের বুকে চাপড় মেরে বিরাট দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

অদিতি আর গায়ত্রী, এই দু'জন এ বছর কফি হাউসের বিশ্ব সুন্দরী। গায়ত্রী ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী, আর অদিতি কেমিস্ট্রিতে রিসার্চ করে। গায়ত্রী ফসা, মুখের গড়ন অতি ধারালো, সে ভালো ডিবেট করে। অদিতির গায়ের রং মাজা মাজা, বেশ লম্বা এবং গম্ভীর। গায়ত্রী এবং অদিতির মধ্যে কে বেশী সুন্দর তা নিয়ে কফি হাউসে মতভেদ এবং স্পষ্ট দুটি দল আছে। কিন্তু গায়ত্রী বা অদিতি কেউই এই কবি-লেখকদের পাত্তা দেয় না, ওদের দু'জনের আলাদা, নির্দিষ্ট টেবিল ও নির্দিষ্ট বন্ধু আছে। এরা আলাপ করতে গিয়েও পাত্তা পায়নি। এই লেখকদের দলটি নারী-বর্জিত, আধো-চেনা এক-আধজন বন্ধুর স্ত্রী বা কারুর মামাতো-মাসতুতো বোন কচিৎ কখনো আসে, সাহিত্য যশোপ্রার্থিনী দু'একটি মেয়ে কখনো কখনো ওদের টেবিলে বসে, কিন্তু বিকেল শেষ হতে না হতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে, সন্ধের পর তাদের বাইরে থাকার অনুমতি নেই। অবিনাশের মতে, যে সব গুঁড়ি-গুড়ি টাইপ মেয়ে বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে যায়, তারা কবিতা-গল্প লিখতে পারবে না কোনোদিন।

হেডলাইটের আলোয় অদিতিকে দেখাচ্ছে রাজেন্দ্রণীর মতন। এই সব নারী কবিদের প্রেরণা হতে পারে, কিন্তু এরা কবিতা পড়ে না, কবিদের গ্রাহ্য করে না।

অবিনাশ বললো, ও অন্ধকারের মধ্যে একা একা কী করে বাড়ি ফিরবে? ওর সেই পাইলট বন্ধুটা আজ আসেনি।

হেমন্ত বললো, তুই ওকে বাড়ি পৌঁছে দিবি নাকি? দ্যাখ না চেষ্টা করে।

অবিনাশ বললো, আমার ইচ্ছে করছে ওর সঙ্গে এক ট্রামে চেপে খানিকটা চলে যাই।

–যা না।

–ও যদি রাগ রাগ চোখে আমার দিকে তাকায়, তা হলে যে খুব খারাপ লাগবে। ঐ মুখখানাতে বিরক্তি মানায় না।

সুবিমল বললো, অদিতি যদি আজ আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ বসতো পার্কে, তারপর আমরা সবাই মিলে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারতুম।

হেমন্ত বললো, প্রস্তাবটা দিয়ে দেখবি নাকি?

আর একবার আলো পড়লো অদিতির মুখে। যেন একটা অন্ধকার মঞ্চে সে একলা দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে কোনো চাঞ্চল্য নেই, বাড়ি ফেরার জন্য কোনো দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই তার। এই মেয়ে কেন কবিতা লেখে না, কেন কবিতা ভালোবাসে না? কেমিস্ট্রিতে কী রস পায়?

অবিনাশরা কেউই দ্বিধা কাটিয়ে রাস্তা পার হয়ে অদিতির কাছে গেল না। একটা ট্রাম এলো, অদিতি উঠে পড়লো।

অবিনাশ আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, অদিতি যদি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসতো, তাহলে পৃথিবীর একটা উপকার হতো। হয়তো আজ রাত্তিরে আমি একটা ক্লাসিক স্ট্যাণ্ডার্ডের কবিতা লিখে ফেলতুম।.

সুবিমল বললো, ভাগ্যিস পাকিস্তান যুদ্ধটা বাধিয়েছিল, তাই অন্ধকারের মধ্যে অদিতিকে দেখা গেল খানিকক্ষণ। অন্ধকারের ব্যাকগ্রাউণ্ডে সত্যি ওকে কী রকম মানিয়েছিল বল তো!

অবিনাশ বললো, চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, ...

হেমন্ত বললো, পাকিস্তানী বোমারুগুলো অকর্মার ধাড়ী। এত দেরি করছে কেন? এর মধ্যে দু চারটে বোমা ফেলে গেলেই তো পারতো। মনে কর, ঠিক পাঁচ মিনিট আগে যদি এখানে একটা বোমা পড়তো, কী ফার্স্টক্লাস হতো। সবাই ছোটাছুটি করছে, সেই সময় আমি অদিতির হাত ধরে বলতুম, কোনো ভয় নেই, আমি তোমাকে শেলটারে নিয়ে যাচ্ছি।

অবিনাশ বললো, মাইরি আর কি, তোকে চান্স দিতুম আর কি। সুবিমল বললো, রোজই শুনছি পাকিস্তানী প্লেন আসবে আসবে, এ আর ভালো লাগছে না। এলেই তো পারে। কলকাতার ওপর গোটা কতক বোমা ফেলে যাক না।

হেমন্ত বললো, কলকাতার এখন কিছু বোমা খাওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। কিছু ভাঙচুর হলে শহরটা নতুনভাবে তৈরি হবে।

সুবিমল বললো, কোথায় কোথায় বোমা পড়া উচিত বল তো?

-ডেফিনিটলি বড়বাজারে। ওখানে অন্তত ডজনখানেক বেশ বড় সাইজের বোমা ফেলে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের ঘুঘুর বাসা ভেঙে দেওয়া দরকার। আর রাইটার্স বিল্ডিং-ডালহাউসিতেও ডজনখানেক। আর গোটাকতক চিৎপুরে।

–চিৎপুরের ওপর আবার তোর এত রাগ হলো কেন? সাউথ ক্যালকাটাটা বুঝি বেঁচে যাবে!

এত অন্ধকারেও কলেজ স্কোয়ার সম্পূর্ণ নির্জন নয়। ফুচকা আলুকাবলিওয়ালারাও তাদের ব্যবসা বন্ধ করেনি। আকাশে ঝাঁক ঝাঁক মেঘ। তার আড়ালে একটা বড় আকারের চাঁদ দেখা যাচ্ছে দু একবার, কিন্তু মেঘের জন্য জ্যোৎস্না ফোটেনি। ওরা বসে পড়লো এক কোণে, ঘাসের ওপর। একজন কেউ বললো, একটা চাওয়ালা কাছাকাছি আছে কি না দ্যাখ না।

পরীক্ষিৎ বললো, দেখি একটা পাঁইট–ফাঁইট জোগাড় করা যায় কি না।

তপন আগাগোড়া চুপ করে আছে। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের মতন এতবড় একটা ব্যাপার নিয়ে অবিনাশ হেমন্তরা ঠাট্টা তামাশা করে যাচ্ছে আগাগোড়া, এতেই সে হতবাক। ওপার বাংলার স্মৃতি তার এখনো টাটকা। সে যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে, তাদের গ্রামের রাস্তাতেও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধটা কি ভারত-পাকিস্তানের, না শেষ পর্যন্ত আবার হিন্দু-মুসলমানের?

সে চুপি চুপি হেমন্তকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এই যুদ্ধের ওপর কোনো কবিতা লিখেছেন?

অন্যরাও তার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছে, তারা হেসে উঠলো হা-হা করে। হেমন্ত হুংকার দিয়ে বললো, কী? এই বোকা..., হারামী, গাণ্ডুর বাচ্চাদের যুদ্ধ নিয়ে কবিতা? এই খোঁচাখুঁচিতে আপনার আমার কী যায় আসে মশাই? কাশ্মীর নিয়ে দিল্লি করাচী লড়ালড়ি করছে, তার জন্য আমরা কেন সাফার করবো? কাশ্মীরটা ওদের দিয়ে দেওয়া হবে নাই বা কেন? মোছলমানদের দেশ, মোছলমানরা পাবে। সোজা কথা। কাশ্মীর যদি না-ই দিতে চাস, তা হলে শুয়ারের বাচ্চারা ফটি সেভেনে পার্টিশান করতে রাজি হলি কেন?

সুবিমল বললো, পাখতুন নেতা সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফফার খান কাল কী স্টেটমেন্ট দিয়েছেন দেখেছিস? পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাবটাই মেনে নেওয়া উচিত হয়নি, ভারতকে এখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

অবিনাশ লম্বা পা ছড়িয়ে আধো কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বললো, ওসব পুরোনো কথা ছাড়। পাকিস্তান যখন হয়েই গেছে, আঠেরো বছর বয়েস এখন দেশটার, পাকিস্তান এখন একটা রিয়েলিটি, তাকে তার যা প্রাপ্য তা তো দিতেই হবে। কাশ্মীরে গণভোট করলে দেখা যাবে, ওরা সবাই পাকিস্তানে যেতে চায়।

সুবিমল বললো, তবু যাই বলিস, আমি কাশ্মীর ছাড়ার পক্ষপাতী নই। এমন সুন্দর একটা জায়গা পাকিস্তান চাইলেই দিতে হবে, এ কী মামাবাড়ির আবদার।

তপন বলে উঠলো, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে পূর্ব পাকিস্তানকে সব দিক থেকে বঞ্চিত করছে? আমি নিজে দেখেছি।

অবিনাশ বললো, আপনি মশাই নিজেকে এখনো ইস্ট পাকিস্তানী মনে করেন তাই না? ওখানে শুনেছি এখন উর্দু মিশিয়ে বাংলা লেখা হচ্ছে। সংস্কৃত তৎসম শব্দগুলো সব খুঁটে খুঁটে বাদ দিয়ে সেখানে আরবী-ফার্সী শব্দ ঢোকাচ্ছে?

তপন বললো, মোটেই না। নাজামুদ্দিনের ভাই সাহাবুদ্দীন সেরকম ফতোয়া দিয়েছিল, চেষ্টা করেছিল খুব, কিন্তু বাঙালী লেখকরা তা মেনে নেয়নি কেউ।

কী জানি ওখানকার বইপত্তর তো পাই না।

পরীক্ষিৎ ফিরে এলো একটুবাদে। সে অনেক চেষ্টা করেও বাংলা মদের পাঁইট জোগাড় করতে পারেনি, তার বদলে নিয়ে এসেছে খানিকটা গাঁজা। হেমন্তর কাঁধের ঝোলা থেকে একটা পত্রিকা বার করে নিয়ে সে ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিল, তারপর দেশলাই কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তামাক বার করতে লাগলো সিগারেট থেকে।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করলো, কোথায় পেলি রে গাঁজা?

–রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকে। শালা কী দাম বেড়েছে রে। ছোট পুরিয়া, যেগুলোর দাম ছিল আট আনা, সেই পুরিয়াই দু' টাকা চার আনা নিল। গাঁজাও কি যুদ্ধের কাজে লাগে নাকি?

–আলবাৎ লাগে। এই যুদ্ধটাই তো গাঁজাখোরদের যুদ্ধ। পাকিস্তানী বোমারু পাইলটগুলো গাঁজায় দম দিয়ে একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে আছে, নইলে ব্যাটারা আসছে না কেন? বোমা ফেলার কাজটা চুকিয়ে দিলেই পারে।

সুবিমল বললো, কে বলেছে ওরা কলকাতায় বোমা ফেলতে আসবে? এদিকে ওরা ফ্রন্ট খুলবে, ওরা এত বোকা নাকি? ততখানি হিম্মতও কি ওদের আছে?

–ওরা যে লাহোর আক্রমণের বদলা নেবে শুনছি? এখানকার খবরের কাগজগুলো তো খুব চ্যাঁচাচ্ছে। তা ছাড়া ক্যালকাটা বম্বিং হবার চান্স না থাকলে শুধু শুধু এখানে ব্ল্যাক আউট করতে গেল কেন?

–এসব হচ্ছে যুদ্ধের টেমপো তোলা। সোলজাররা যত না যুদ্ধ করে তার চেয়ে খবরের কাগজওয়ালারা অনেক বেশি যুদ্ধ চালায়। রোজ আট কলম ব্যানার হেড লাইন। কাগজের বিক্রি বাড়ে। আর গভর্নমেন্ট থেকেও চায় সাধারণ লোকের মধ্যে একটা কৃত্রিম দেশাত্মবোধ চাগিয়ে তুলতে। দেশের অন্য সব সমস্যা তা হলে চাপা পড়ে যাবে।

পরীক্ষিৎ-এর এই সব কথাবার্তা পছন্দ হয় না। যুদ্ধ-টুদ্ধ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে এক ধমক দিয়ে বললো, কী ভ্যাড় ভ্যাড় করছিস তখন থেকে। চুপ মার তো।

তামাকের বদলে গাঁজা ভরে পরীক্ষিৎ সিগারেটটির আগের গড়ন প্রায় ফিরিয়ে এনেছে। নিজে সাজলেও প্রথমে সে নিজে ধরায় না, সে সম্মানটা সে দিল হেমন্তকে। হেমন্ত লম্বা

দুটি টান দিয়ে সেটি চালান করে দিল অবিনাশকে, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তপনকে বললো, আপনি বুঝি যুদ্ধ নিয়েও কবিতা লেখেন?

তপন একটু কেঁপে উঠলো। সে সত্যিই দুটি কবিতা লিখে ফেলেছে। মানিকদাদের স্টাডি সার্কলে সে ঐ কবিতা পাঠ করতে পারবে না, ভেবেছিল এই আড্ডায় শোনাবে। কিন্তু হেমন্তর গলার আওয়াজে কৌতুকের সুর টের পেয়ে সে তাড়াতাড়ি বললো, না, না, যুদ্ধ নিয়ে নয়, আমি। আমার গ্রাম নিয়ে দু একটা লিখেছি, এই সময় আবার খুব মনে পড়ছে।

–নস্টালজিয়া? মুখস্থ থাকে তো শোনান।

পরীক্ষিৎ সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, না, এই অন্ধকারের মধ্যে কবিতা-টবিতা চলবে না।

হেমন্ত বললো, জিনিসটা ফার্স্টক্লাস, আর একটা বানা তো পরীক্ষিৎ।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করলো, মনে কর আমাদের এখানে অদিতি এসে বসেছে। ওর সামনে আমরা কী কথা বলতুম?

পরীক্ষিৎ বললো, তুই যে ঐ মেয়েটার জন্য হেদিয়ে মরলি রে। ওর পাইলট প্রেমিক জানতে পারলে তোকে ধোলাই দেবে।

–ঐ পাইলটটা কি যুদ্ধে গেছে? প্লেন ক্র্যাশ করে পাকিস্তানে যদি ওয়ার প্রিজনার হয়ে থাকে, বেশ হয়।

সুবিমল বললো, সে গুড়ে বালি। ও ছেলেটা আছে সিভিল অ্যাভিয়েশানে।

হেমন্ত হেসে উঠে বললো, অবিনাশ কিন্তু ছেলেটাকে মারতে চায়নি, দেখলি? শুধু মাত্র ওয়ার প্রিজনার হবার অভিশাপ দিয়েছে। আরে এ যুদ্ধ আর কতদিন, ওয়ার প্রিজনার হলে তো সে ফিরে আসবে। তখন তাকে প্যাঁদাবে।

তপন জিজ্ঞেস করলো, এই যুদ্ধ কি শিগগির থামবে?

হেমন্ত বললো, বেশিদিন চলতেই পারে না। দু' সাইডেরই তো খেলনাগুলো ফুরিয়ে যাবে ক' দিনের মধ্যেই।

সুবিমল বললো, ইণ্ডিয়া কী ট্যাকটিকস নিয়েছে বুঝতে পারছিস না? ওয়াই বি চ্যবন আর জেনারাল চৌধুরী চায় যুদ্ধটাকে যতদূর সম্ভব প্রোলং করতে। যাতে পাকিস্তানের দম ফুরিয়ে যায়। আমেরিকা তো দু পক্ষকেই আর্মস সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে। রাশিয়া তবু ইণ্ডিয়াকে কিছু কিছু দিয়ে যাবে। ইণ্ডিয়া নিজেও এখন টেন পরসেন্ট আর্মস বানায়। পাকিস্তানের তো নিজস্ব বলতে কিছুই নেই, ওরা কতদিন আর চালাতে পারবে?

হেমন্ত বললো, চীন দেবে। চীন এখন ওদের দিকে হেলেছে। চীন যদি এই সুযোগে সিকিম বা আসামের দিকে ইণ্ডিয়াকে আর একবার খোঁচাখুঁচি করে, তা হলে ইণ্ডিয়া বিপদে পড়ে যাবে।

সুবিমল বললো, চীন এখন ইণ্ডিয়াকে অ্যাটাক করতে পারে না। ওসব খবরের কাগজের রটনা। তা ছাড়া চীন পাকিস্তানকে কী অস্ত্র দেবে, ওদের কী স্যাবার জেট আছে, না মিগ আছে?

পরীক্ষিৎ রাগত স্বরে বললো, আবার! আবার তোরা ঐ সব ফালতু কথা শুরু করলি। এই, মোছলমানটা গেল কোথায় রে? তিন চারদিন ওকে দেখিনি।

অবিনাশ বললো, রশীদ? কোথায় যেন বাইরে যাবে শুনেছিলুম।

সুবিমল বললো, কাল আমি দুপুরে ওকে একবার দেখেছি এসপ্লানেডে।

অবিনাশ বললো, তা হলে কফি হাউসে এলো না কেন? তোরা তো কেউ রাজি হলি না, রশীদ সঙ্গে থাকলে আজ আমি নির্ঘাৎ অদিতির কাছে গিয়ে কথা বলতুম।

–তুই এখনো সেই মেয়েটার কথা ভেবে যাচ্ছিস? সে এতক্ষণ বাড়িতে পৌঁছে, কাপড়-টাপড় বদলে...পুরোনো হয়ে গেছে।

হেমন্ত বললো, অদিতি নামের মেয়ের সঙ্গে অবিনাশ নামের কোনো ছেলের কক্ষণো ভাব হতেই পারে না। আমার মতন তিন অক্ষরের নাম চাই। আজ অদিত বাই চান্স এখানে এলে ওকেও গাঁজা খাওয়াতুম। ভেবে দ্যাখ, ওর বুকের কাছ দিয়ে ধোঁয়া গড়িয়ে যেত, দেবী সরস্বতীর হাতে পদ্মফুল!

পরীক্ষিৎ চমকে গিয়ে বললো, অ্যাঁ, কী বললি?

হেমন্ত ভালো করে চাইতে পারছে না, কষ্ট করে চোখ বড় বড় করে বললো, কী বলেছি, ভুল কিছু বলেছি?

সরস্বতী কোথায় পেলি! পদ্মফুলই বা কোথায় পেলি! গাঁজার ধোঁয়াটা পদ্মফুল হয়ে গেল?

–হোক না, ক্ষতি কি? তবে, সরস্বতীর বদলে গায়ত্রী এলেও আমি কম খুশী হতুম না। গায়ত্রীও চমৎকার কীরকম টিকোলো নাক, ঠিক যেন ডবল গুঁজিয়া!

–বদলে মানে? সরস্বতীর বদলে মানেটা কী?

পরীক্ষিৎ আর হেমন্ত দু'জনেরই নেশা ধরে গেছে, অন্যরা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। হেমন্ত অদিতি নামটা ভুলে গেছে, তার বদলে সে বলছে সরস্বতী এবং জোর দিয়ে বলতে চাইছে, সরস্বতীর বদলে গায়ত্রীরই আজ আসা উচিত ছিল, কারণ গায়ত্রীর নাকের সঙ্গে অন্য কোনো মেয়ের নাকের কোনো তুলনাই হয় না!

তপন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এবার চলি। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

সুবিমল বললো, হ্যাঁ, দমদম, অনেক দূর, শ্যামবাজার থেকে বাস পাবেন?

তপন বললো, বাস না পেলে হেঁটে যাবো। আমার অভ্যেস আছে!

হেমন্ত বললো, গ্রামের ছেলে, হাঁটার অভ্যেস আছে। নস্টালজিক কবিতা বানাতে বানাতে...যশোর রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে-বর্ডার পার হয়ে একেবারে সরাইল পর্যন্ত...তা ভাই

অতদূরে যাবেন, দু'একটা টান দিয়ে গেলে হতো না?

পরীক্ষিৎ তপনের হাত চেপে ধরে হুকুমের সুরে বললো, হ্যাঁ, দুটো টান দিয়ে যাও! শুধু মুখে চলে যেতে নেই।

সুবিমল বললো, খালি পেটে হাঁটতে কষ্ট হবে ভাই! একটু দম নিয়ে নাও!

তপন কোনোদিন গাঁজা খায়নি। সে দ্বিধা করতে লাগলো। মানিকদা জানতে পারলে কী বলবেন? একদিন তিনি বলেছিলেন, আধুনিক কবি-সাহিত্যিকরা অবক্ষয়ী মানসিকতার শিকার! সে হাত ছাড়িয়ে নিল খানিকটা জোর করেই।

এক সময় এদের আড্ডার দল ভাঙলো। অবিনাশ বললো, আমি একবার রশীদের কাছে যাবো। ছেলেটা স্পাই-ফাই বলে ধরা পড়ে গেল কিনা তার একটা খোঁজ নেওয়া দরকার।

পরীক্ষিৎ বললো, চল আমিও যাবো তোর সঙ্গে।

রশীদ থাকে পার্ক সার্কাসের কাছে একা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে। তার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সবাই থাকে পাকিস্তানে। সাত-আট বছর আগে সে কলকাতায় বেড়াতে এসে আর ফিরে যায়নি। তার যেতে ইচ্ছে করে না।

রাত বাড়ার পর রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে এসেছে। পার্ক সার্কাসের দিকটা একেবারে ফাঁকা। মেঘ সরে যাওয়ায় অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে এসেছে। সমস্ত বাড়ির দরজা, জানলা বন্ধ। রশীদ থাকে রাস্তার ধারে দোতলার একটা ঘরে। অবিনাশ আর পরীক্ষিৎ ছোট ছোট ইঁট কুড়িয়ে ওর জানলায় ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

একটুবাদে জানলা খুলে রশীদ জিজ্ঞেস করলো, কে?

অবিনাশ বললো, নিচের গেট খুলে দে!

নিচে এসে রশীদ এক গাল হেসে বললো, তোরা এত রাতে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস? ভয়-ডর নেই?

অবিনাশ বললো, ভয়ের কী আছে? দাঙ্গা কিংবা কারফিউ তো না, শুধু ব্ল্যাক আউট! রশীদ বললো, তোরা জানিস না কী সব কারবার হচ্ছে। এরকম ফাঁকা রাস্তায় লোকজন দেখলে পাবলিক তাদের ছত্রীবাহিনী বলে পেটাচ্ছে। আমাদের কী হয়েছিল শুনিসনি? খুব জোর বরাতে বেঁচে গেছি। আয়, ওপরে আয়!

ঘরে কোনো খাট নেই, মেঝের ওপর তোশক পাতা আর চারদিকে অসংখ্য বই ও পত্র-পত্রিকা। এক পাশে একটি স্পিরিট স্টোভ, একটা সসপ্যান, দু'চারখানা কাপ-প্লেট। এই নিয়ে রশীদের সংসার। রশীদের কাছে পৌনে এক বোতল হুইস্কি আছে, সেটা দেখে পরীক্ষিৎ যেন ধড়ে প্রাণ পেল। গেলাস মাত্র একটিই, তার থেকেই চুমুক দেবে তিন জন।

রশীদ শোনালো তার অভিজ্ঞতা। শক্তি-সুনীল-শরৎদের সঙ্গে ও গিয়েছিল ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে বেলপাহাড়ী নামে একটা জায়গায়। কাছেই কলাইকুণ্ডায় এয়ারফোর্সের বেস। ওখানে পাকিস্তানী ছত্রীবাহিনী যে-কোনো সময় নামবে এই গুজবে সবাই সন্ত্রস্ত। অচেনা লোক দেখলেই সন্দেহ। ওরা এসব খেয়াল করেনি, ফাঁকা মাঠে বসে মহুয়া খেতে খেতে গান গাইছিল, হঠাৎ এক বিশাল জনতা ওদের ঘিরে ধরে। ছত্রীবাহিনীর লোকেরা ফাঁকা মাঠে বসে গান গাইবে কিনা সে প্রশ্ন কারুর মনে এলো না, হিংস্র জনতা শেষ পর্যন্ত হয়তো ওদের লীর্চ করে ফেলতো, মাঝখানে দু'এক জনের হস্তক্ষেপে ওদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো থানায়!

অবিনাশ ভুরু তুলে বললো, কী সর্বনাশ, রশীদ, তুই-ও ওদের সঙ্গে গিয়েছিলি কোন আক্কেলে? তুই যে সত্যিই পাকিস্তানী! ওরা যদি তোর প্যান্টুল খুলে মিলিয়ে দেখতো?

রশীদ বললো, শরৎদা আমার নাম করে দিল রতন চৌধুরী। আমাকে ওরা কিছু বলার আগে শরৎদা নিজের প্যান্টের বোতাম খুলে...

তিনজনে হাসতে লাগলো তুমুল মজায়। যেন এটা কোনো বিপদের গল্পই নয়। যেন পুরো যুদ্ধটাই একটা হাস্য কৌতুকের ব্যাপার।

পরীক্ষিৎ এক সময় পকেট থেকে অবশিষ্ট গাঁজার পুরিয়াটা বার করে বললো, আমি আজ রাত্তিরে আর বাড়ি ফিরছি না। রশীদ, আমি তোর এখানেই থাকবো।

কেউই অবশ্য আর বাড়ি গেল না। আড্ডায় আড্ডায় সময় গড়িয়ে গেল অনেকখানি। নেশার দ্রব্য সব ফুরিয়ে গেলে ওরা আবার বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। রাত এখন প্রায় দুটো। মেঘ সরে গিয়ে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না ফুটেছে, রাস্তা দেখতে কোনো অসুবিধে হয় না। নির্জন রাত্রির রাজপথের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে, ওরা সেই সৌন্দর্যটা ভাঙতে লাগলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গেয়ে। অবিনাশ একটা গান বানালো, ওরে আয় রে উড়ে লাহোর থেকে একটা ছোট জঙ্গি বিমান, গোটা দশেক বোম্ ফেলে যা এই শহরে...। সেই গানে লাগালো একটা পরিচিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর।

কারফিউ আর ব্ল্যাক আউটের রাতে তফাত আছে। ব্ল্যাক আউটের মধ্যে কেউ বাইরে বেরুলেও পুলিশের আপত্তি থাকার কথা নয়। একটা পুলিশের গাড়ি ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার গতি মন্দ করলো, তারপর আবার ওদের অগ্রাহ্য করে চলে গেল। ওরা চলেছে শ্মশানের দিকে। একমাত্র সেখানেই এত রাত্রে জীবনের স্পন্দন টের পাওয়া যাবে। সেখানে সিগারেট, গাঁজা এমনকি দেশি মদও পাওয়া যাবে। শ্মশানে ব্ল্যাক আউট নেই!

৩৩ টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে সন্ধেবেলা একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন প্রতাপ। সিগারেট টানছেন আপন মনে, চোখের দৃষ্টি ভাসা ভাসা। এক এক সময় মানুষ কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার কার্যকারণ ভুলে যায়, নিজেই যায় কিন্তু নিজেকেই প্রশ্ন করে, কেন এলাম? সেই সময় তার মুখের চেহারাও হয় অন্যরকম।

আদালত থেকে প্রতাপ কিছু জরুরি কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন, বাড়ি ফেরারই কথা ছিল, হঠাৎ কেন যেন তাঁর ভাবান্তর হলো, আদালির হাতে ফাঁইলপত্তর দিয়ে বললেন, কাল সকালে এগুলো আমার বাড়িতে নিয়ে আসিস। তারপর তিনি চড়ে বসেছিলেন একটি

বিপরীতমুখী বাসে। দু'বার যানবাহন বদল করে প্রতাপ এ পর্যন্ত এসেছেন। কিন্তু কেন এসেছেন?

উত্তরটা প্রতাপ জানেন। কিন্তু নিজের কাছেও সেটা স্বীকার করতে চান না। অনেক রকম মানসিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভুত একটা টানেই প্রতাপকে হঠাৎ এতদূর আসতে হয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়া বেশ জটিল।

সাদা রঙের প্যান্ট শার্টের ওপর প্রতাপ একটা পাতলা নীল সোয়েটার পরে আছেন, পায়ে শু-মোজা। অন্যদিন প্রতাপ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে এই সব বদলে, স্নান সেরে, লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকেন। তাঁর মাথাটি কদম ফুলের মতন, মাতৃশ্রাদ্ধের পর এখনো ভালো করে চুল গজায়নি। বয়েস হয়ে গেলে চুল গজাতে দেরি লাগে।

দেওঘরে মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই প্রতাপ আর একটি নিদারুণ মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন। মৃত্যু নয়, আত্মহত্যা, দিল্লিতে সুলেখা শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে, নিজের রূপ নিজে নষ্ট করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

সে সংবাদে প্রতাপ দারুণ আঘাত পেলেও তার প্রতিক্রিয়া যেন খুব গভীরে প্রবেশ করেনি। মায়ের মৃত্যুতে প্রতাপ তখন খুবই আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। তখন দিল্লিতে গিয়ে ত্রিদিবের পাশে দাঁড়ানোও সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কী কারণে, কিসের দুঃখে, কোন যন্ত্রণায় সুলেখা এমন একটা সাঙ্ঘাতিক সিদ্ধান্ত নিল তাও তিনি জানেন না।

মাসখানেক আগে ত্রিদিব এসেছিলেন কলকাতায়, তাঁর সঙ্গেও কথা হলো না ভালো করে। প্রতাপ আশঙ্কা করেছিলেন ত্রিদিবের মতন সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ এত বড় আঘাত সামলাতে পারবেন না, ভেঙে পড়বেন একেবারে। কিন্তু ত্রিদিবকে দেখে প্রতাপ একেবারে অবাক। এ যেন একজন, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ, সেই লাজুক, ধীর স্থির ভাবটি একেবারেই নেই। কাটা কাটা পরিষ্কার কথা, শোকের সামান্য চিহ্নও নেই মুখের ভাবে, ভুরু দুটি কোঁচকানো, যেন সুলেখা এ রকম একটা নাটকীয় কাজ করে ফেলায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত।

সুলেখার সেই চরম দিনের ঘটনা নিয়ে কোনো আলোচনাই করলেন না ত্রিদিব, তিনি কলকাতায় এসেছিলেন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে। তালতলার বাড়িটি তিনি বিক্রি করে দিতে চান, প্রতাপ কিনে নিতে রাজি থাকলে তিনি যে-কোনো দামে দিয়ে দিতে রাজি, এমনকি প্রতাপ পুরো টাকা এখন দিতে না পারলেও চলবে। ত্রিদিব লন্ডনে একটা চাকরি পেয়েছেন, আগে থেকেই অফার ছিল, এখন সেখানে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত পাকা করতেই তিনি যেন খুব ব্যস্ত।

স্বপ্নেও বিলাসিতা করে প্রতাপ বাড়ি কেনার কথা ভাবতে পারেন না। সরকার তাঁকে এমন মাইনে দেন না যাতে সংসার খরচ চালাবার পরও কিছু সাশ্রয় করা যাবে। দুই ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ, তুতুলের ডাক্তারি পড়ার খরচ, এই সবে প্রতাপ একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছেন। আগেকার চক্ষুলজ্জা আর নেই, সুপ্রীতি গয়না বিক্রির প্রস্তাব দিলে তিনি শেষে আর অরাজি হন নি। তবে, সুপ্রীতির গয়নাও আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। বিমানবিহারীর কাছেও প্রতাপের অনেক ঋণ জমে গেছে।

খুব তাড়াহুড়ো করে, প্রায় জলের দরেই বাড়িটি এক মাড়োয়ারির কাছে বিক্রি করে দিলেন ত্রিদিব। তারপর সেই টাকার কিছু অংশ তিনি দিতে চাইলেন তাঁর দুই বোনকে। সে কথা শোনা মাত্র প্রতাপ বললেন, এ প্রশ্নই ওঠে না। বাড়ির মালিক একা আপনি, আপনার বাবা আপনার নামে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন, আপনার বোনদের কোনো রকম লিগ্যাল রাইট নেই...

প্রতাপের কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ত্রিদিব বলেছিলেন, আপনি আমাকে ল দেখাচ্ছেন কেন, টাকাটা তো আপনাকে দিচ্ছি না, দিচ্ছি আমার বোনেদের।

মমতাও সে টাকা প্রত্যাখ্যান করলেন। মমতা খুব ভালো ভাবেই জানেন, এখন তাঁর হাতে পাঁচ-দশ হাজার টাকা এলেও তা সংসারের কত প্রয়োজনে লাগবে, কিন্তু পাছে অভাবের তাড়নায় লোভর একটা নগ্ন রূপ বেরিয়ে পড়ে এবং পরে তার জন্য আত্মগ্লানিতে ভুগতে হয়, সেই জন্যই তিনি তাড়াতাড়ি না বলে দিলেন। তাঁর বোন বিনতারও সেই এক কথা। বিনতার স্বামী সুকেশের বদলির চাকরি, এখন ওরা রয়েছে কোচিন শহরে, তাদের অবস্থাও ভালো। ত্রিদিবের চিঠি পেয়ে বিনতা জানালো যে দিদি যা ঠিক করবে সে তাই-ই মেনে নেবে, তার স্বামীও প্রতাপদার সঙ্গে একমত যে ঐ বাড়ির ওপর তাদের কোনো দাবি নেই।

ত্রিদিব যেন বেশ ক্ষুণ্ণ হলেন বোনেদের এই ব্যবহারে। মমতাদের বাড়িতে তীর একদিন খেতে আসার কথা, সেদিন এলেন না। দু'দিন পরে এলেন, গম্ভীর হয়ে রইলেন আগাগোড়। সুপ্রীতি সুলেখার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে গেলেন, কী জানি কী হয়েছিল বলে? এক সময় তিনি শুধু প্রতাপকে বলেছিলেন, আমার বন্ধু শাজাহানকে পুলিসে আটকে রেখেছে জানেন তো? পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ তো মিটে গেছে, এখনও ওদের ছাড়ে না কেন? আপনি একটু দেখুন না, চেষ্টা-চরিত্র করে শাজাহানকে ছাড়াতে পারেন কি না!

প্রতাপ শুকনো ভাবে হেসে বলেছিলেন, আমি সামান্য সাব জজ। আমার কী ক্ষমতা আছে? ওসব তো স্টেট গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ব্যাপার!

ত্রিদিব দেওয়ালের উঁচুর দিকে চোখ তুলে বলেছিলেন, যাওয়ার আগে শাজাহানের সঙ্গে দেখা হলো না!

ত্রিদিব সব সম্পর্ক চুকিয়ে চলেই গেলেন শেষ পর্যন্ত। বিলেতের গ্লাসগো শহর থেকে সংক্ষিপ্ত দু'লাইনের পৌঁছ-সংবাদ পাঠিয়েছেন।

প্রবাসী ত্রিদিবের সেই চিঠিখানা হাতে নেবার পরেই প্রতাপের চোখে প্রথম ভেসে উঠলো ছবিটা। প্রজ্বলন্ত সুলেখা, ঘরের মধ্যে নয়, বাড়ির ছাদে, সেই বাড়ি যেন কুতুব মিনার সংলগ্ন, চারপাশে ইতিহাসের সাক্ষ্য, অন্ধকার আকাশের নিচে সুলেখা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, তার সঙ্গে লকলকে আগুনের শিখা। রূপের আগুন নয়, সত্যিকারের আগুন, যা মায়া-দয়াহীন, যা তীব্র যন্ত্রণা দিয়ে শরীরের মাংস-মজ্জা পোড়ায়! কেন সুলেখা চলে গেল অমনভাবে, কার ওপর অভিমানে? এইটুকু জেনেছেন প্রতাপ যে সুলেখার অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য ত্রিদিকে পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি, সুলেখা নিজের হাতে আত্মহত্যার স্বীকারোক্তি লিখে গিয়েছিল, সে কারুকে দায়ী করেনি।

ঐ ছবিটা কল্পনা করেই প্রতাপের বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠেছিল। অসহ্য এক ব্যথা, ঠিক যেন শরীরিক, বুকের ব্যথা। যেন সহ্য করা যাবে না। সুলেখা সত্যিই চলে গেল, আর তার সঙ্গে কোনো দিন দেখা হবে না? সুলেখার সঙ্গে তাঁর প্রেম-ভালোবাসা ছিল না। আবার শুধু আত্মীয়তাও নয়, একটা অন্য সম্পর্ক, চোখে চোখে কিছু একটা কথা, কোনোদিন সুলেখার শরীর ছুঁতে হয়নি প্রতাপকে, তবু সূলেখা ঠিকই জানতো! তালতলার বাড়িতে এখন অন্য লোক থাকে। ত্রিদিব তাড়াহুড়ো করে চলে গেল ইংল্যান্ডে, সুলেখার সব চিহ্নও কি মুছে গেল তা হলে?

কয়েকটা দিন সুলেখার স্মৃতিতে বিভোর হয়ে রইলেন প্রতাপ। সুলেখার দু'একটা টুকরো কথা, নিষ্কলুষ হাসি, তার যত্নময় হাত, এই সব কিছুই যেন এখনো জীবন্ত। সুলেখা

দিল্লিতে ছিল, অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, তবু প্রতাপ কোনো অভাব বোধ করেননি, এ পৃথিবীর কোনো একটা প্রান্তে সুলেখার থাকাটাই যথেষ্ট ছিল। এই পৃথিবী তাকে সহ্য করতে পারলো না? গড়-মানুষের চেয়ে যারা অনেক উঁচুতে, যাদের রূপ-গুণ-ব্যবহার অন্য অনেকের চেয়ে অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর, তাদেরই কেন অকালে চলে যেতে হয়। যেমন তার ছেলে কি? রাস্তায় ঘাটে অনেক ছেলেকেই তো দেখেন প্রতাপ, কিন্তু পিলর মতন অমন নম্র, ভদ্র, প্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল একজনকেও তো মনে হয় না। নিজের ছেলে বলে কি তিনি বাড়িয়ে ভাবছেন? পিকলুকে সবাই ভালোবাসতো, এখনো তো কেউ কেউ পিকলুর নাম উঠলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তাঁর ছোট ছেলে বাল্লুও তো পিকলুর তুলনায় কিছুই না। সামান্য জলে ডুবে ওরকম একটা প্রাণ নষ্ট হয়ে গেল, প্রকৃতির কি কোনো যুক্তিবোধ নেই?

সুলেখার মৃত্যুর তিন মাস বাদে সুলেখার শোকে এমন আহত হলেন প্রতাপ, তা যেন মাতৃশোকের চেয়েও বেশি। মায়ের জন্য নয়, মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মালখানগরের বাড়ি, প্রতাপের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের বহু স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। সেইজন্যই প্রতাপ যেন বেশি মোহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। মায়ের যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল, মা চলে যাবেন, এজন্য কি প্রতাপ মনে মনে কিছুটা তৈরি হয়ে ছিলেন না? বিশেষত আগেরবার ওস্তাদজীর পাগলামি আর মায়ের স্তব্ধ, জড় ভাব দেখেই কি তাঁর মনে হয়নি যে আর বেশিদিন দেরি নেই? আর দু'চার বছর বাঁচলেও মা কি আর আনন্দ পেতেন, প্রতাপই বা কী দিতে পারতেন মাকে? মৃত্যুর আগে মা যে একবার মালখানগরে নিয়ে যাবার জন্য ছেলের কাছে কাকুতি মিনতি করেছিলেন, তখন প্রতাপ নিজের অসহায় অবস্থার জন্যই কষ্ট পেয়েছিলেন বেশি।

বাড়িতে, আদালতে, বাথরুমে, ঘুমের আগে, ঘুমের মধ্যেও কয়েকদিন প্রতাপ সুলেখার স্মৃতিতে কাতর হয়ে কাটালেন। সত্যিকারের দুঃখ তিনি নিবেদন করলেন সুলেখাকে। তারপর সুলেখার বদলে অন্য একটা মুখের ছবি এসে পড়লো।

এ যে কী এক বিচিত্র রসায়ন! কোন স্মৃতি যে অন্য কাকে কোথা থেকে টেনে আনে, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। ডার্ক রুমে একটি নেগেটিভ প্রসেস করতে গিয়ে যেন সেখানে ফুটে উঠলো অন্য একটি ছবি।

সুলেখার কথা ভাবতে ভাবতে প্রতাপের হঠাৎ একদিন মনে পড়লো বুলার কথা।

বুলাও কি সুলেখার মতন চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে? কিংবা সে কোথায় কী ভাবে আছে? এই চিন্তা প্রতাপকে উদ্বেলিত করে তুললো। এবারে দেওঘর গিয়ে প্রতাপ বুলার খোঁজ করেননি, সে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বুলা দেওঘরে থাকলে কি মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে একবারও আসতো না? না, তা হতেই পারে না। তাছাড়া অত ব্যস্ততার মধ্যেও বুলার নাম একবার প্রতাপের কানে এসেছিল। বুলাকে কে যেন ডাকতে গিয়েও ফিরে এসেছে।

সুলেখার মতুন বুলার সঙ্গেও যদি তার দেখা না হয়? কী ভাবে যেন বুলা সম্পর্কে প্রতাপের মনের মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ রয়ে গেছে। যদিও এ কথাটা মমতাকে বলা যায় না। কিসের দায়িত্ব, বাস্তবিক ব্যাপারে কিছুই না তো!

বুলার শ্বশুরবাড়ি টালিগঞ্জে। বুলার দেওর সত্যেন বেশ একজন কেউকেটা হয়েছে, কাগজে টাগজে মাঝে মাঝে তার নাম দেখা যায়। ক্যালকাটা ক্লাব, রোটারি ক্লাব, মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে দান এই সব ব্যাপারে সে যুক্ত। বুলার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা প্রতাপ জানতেন না। কিন্তু টেলিফোন গাইড খুললেই তো যে কেউ সত্যেনের ঠিকানা পেতে পারে!

প্রতাপ কি বুলার সঙ্গে দেখা করার জন্য এতদূর এসেছেন? যে কেউ এই প্রশ্ন করুক, প্রতাপ দৃঢ় স্বরে উত্তর দেবেন, কক্ষণো না! নিজে থেকে, বিনা আমন্ত্রণে সত্যেনের মতন ঐ স্কাউনড্রেলটার বাড়িতে যাবেন তিনি? প্রতাপ মজুমদারের ব্যক্তিত্বের এখনও অত অধঃপতন হয়নি!

মনকে চোখ ঠারার জন্য প্রতাপ আর একটা যুক্তিও তৈরি রেখেছেন। দিন তিনেক আগে প্রতাপ খবর পেয়েছেন যে তাঁর মেজোমামা খুব অসুস্থ। ইনি প্রতাপের আপন মামা নন, তাঁর সৎ মায়ের ভাই, অর্থাৎ কানুর মামা। এই ভন্ত মামা অর্থাৎ জলধি বোসের সঙ্গে প্রতাপের কোনোকালেই ঘনিষ্ঠতা ছিল না, ইনি কানুকে নিজের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, এর ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলার ধরনটা প্রতাপ এককালে খুবই অপছন্দ করতেন। কিন্তু বয়েস হলে মানুষ হয়তো কিছুটা বদলায়। প্রতাপের মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইনি দেখা করতে এসেছিলেন এবং সুহাসিনীর নাম করে অশু বর্ষণ করেছেন। প্রতাপের মাকে তিনি নাকি নিজের বোনের মতনই। দেখতেন, যদিও দেশ বিভাগের পর এতগুলি বছরে তিনি প্রতাপদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখেননি, ছেলে-মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করা ছাড়া। কুম্ভীরাশু হোক আর যাই-ই হোক, তবু বয়স্ক মানুষটি এসেছিলেন তো সুহাসিনীর শ্রাদ্ধে। তাঁর দুই ছেলে রাস্তা তৈরির কন্ট্রাকটরি করে এর মধ্যে বেশ ধনবান হয়েছে, জলধি বোস গাড়ি কিনেছেন, প্রতাপের সঙ্গে তিনি পুরোপুরি সম্পর্ক ছেদ করতেও তো পারতেন। এখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ভদ্রতার বিনিময়ে প্রতাপের একবার দেখতে যাওয়া উচিত। অবশ্য, জলধি বোসের বাড়ি টালিগঞ্জের দিকে না হলে কি প্রতাপের মনে এই কর্তব্যবোধ জাগতো?

কিন্তু টালিগঞ্জ পর্যন্ত চলে এসেও প্রতাপের এখন এই সন্ধেবেলা একজন ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধের বিছানার পাশে গিয়ে বসতে একটুও ইচ্ছে করছে না। তিনি বেকার ছেলে ছোঁকরাদের মতন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। ঘনিয়ে এসেছে সন্ধে, শীতের প্রাক্কালে সমস্ত বাড়ির উনুনের ধোঁয়া ওপরে উড়ে যেতে চায় না, ঝুলে থাকে জমাট বেঁধে, রাস্তার আলোগুলো ফ্যাকাসে মনে হয়। এখানে রাস্তা বেশ সরু। তারই মধ্য দিয়ে ট্রাম, বাস, ঘোড়ার গাড়ি, রিকশা জড়ামড়ি করে শ্লথগতিতে চলেছে। বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি হয়নি তবু এখানে সেখানে কাদা, সব মিলিয়ে বিশৃঙ্খল, নোংরা নোংরা ভাব। এই জায়গাটায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কোনো দৃশ্য উপভোগ করার উপযোগী নয়। প্রতাপ অবশ্য পথের কোনো চলন্ত দৃশ্যই দেখছেন না।

বুলা কেমন আছে, এইটুকুই শুধু জানতে চান প্রতাপ, আর কিছু না। কিন্তু হুট করে বুলার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যেনকে তিনি কিছুতেই পছন্দ করতে পারেননি, সত্যেনও তা জানে। ও বাড়ির আর কেউ প্রতাপকে চিনবে না। প্রতাপ কী করে মুখ ফুটে বলবেন, আমি বুলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!

ভন্তু মামা অসুস্থ, কিন্তু তিনি কি মৃত্যুশয্যায়? তা না হলে আর তাঁকে দেখতে যাওয়া নিয়ে আদিখ্যেতা করার কী আছে? উনি মারা টারা গেলে ওঁর শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হলেই প্রতাপের কর্তব্য সারা হবে। এখন ভন্তু মামাকে খুশী করার কোনো দায় নেই প্রতাপের।

প্রতাপ ফিরে যাবার চিন্তা করেও ফিরতে পারলেন না, ধরা পড়ে গেলেন। একটা সাইকেল রিকশা থেমে গেল তাঁর অদূরে, একটি তরুণ দম্পতি তার থেকে নেমে এগিয়ে এলো তাঁর দিকে। যুবকটি ডেকে উঠলো, প্রতাপদা! তারপর দু'জনেই নিচু হয়ে প্রণাম করলো প্রতাপের পায়ে হাত দিয়ে। প্রতাপ তাদের একেবারেই চিনতে পারলেন না।

যুবকটি বললো, প্রতাপদা, তুমি এখানে? এই আমার বউ জয়ন্তী, তুমি তো ওকে দেখোনি, আমাদের বিয়েতে তুমি আসতে পারোনি, কিন্তু বড়দি এসেছিল তুতুলকে নিয়ে। তারপর তো আর কোনো যোগাযোগই নেই।

প্রতাপ অনেকটা আন্দাজে বুঝলেন যে এই যুবকটি তার এক বৈমাত্রেয় মামাতো ভাই। খুব ছোট বয়েসে দেখেছেন নিশ্চয়ই। পনেরো কুড়ি বৎসরের ব্যবধানে সেই সব বাল্যকালের মুখ আর চেনা যায় না। প্রতাপ আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে উদাসীন, সুতরাং তাদের চেহারা ও নামও নিজের স্মৃতিতে জায়গা জুড়ে রাখেননি।

প্রতাপ এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন, তার উত্তর দেওয়াও সহজ নয়। এই যুবকটিকে মামাতো ভাই হিসেবে নিশ্চিত জানলে অনায়াসে বলা যেত যে, তোমাদের বাড়িতে যাবার জন্যই তো এখানে এসেছি। কিন্তু সে রকম উত্তর দিলে মিথ্যে বলা হতো। প্রতাপের মনের

মধ্যে সত্য-মিথ্যের বিভাজন রেখা অতি স্পষ্ট। ভন্তু মামার কথা আংশিক মনে রেখে এ পর্যন্ত এলেও একটু আগেই প্রতাপ তাঁর বাড়িতে আজ যাবেন না ঠিক করেছিলেন।

আর দু'একটি কথার পর প্রতাপ বুঝতে পারলেন, এই ছেলেটি ভন্তু মামার বড় ভাই, অর্থাৎ তাঁর নন্তুমামার সন্তান। এর নাম অনিরুদ্ধ। সে তাদের বাড়িতে প্রতাপকে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। প্রতাপ তবুও বললেন না, তিনি ওদের বাড়িতে যাওয়ার কথা ভেবেই এতদূর এসেছেন!

অনিরুদ্ধের স্ত্রী জয়ন্তী বললো, দাদা, আমার বিয়ের আগে আমাকে আপনার ছেলে বাড়িতে এসে পড়াতো। অসীম মজুমদার, অঙ্কের খুব ভালো ছাত্র, আমার দাদার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন, তখন তো জানতাম না...

প্রতাপ চমকে উঠলেন। অসীম মজুমদার-তার মানে পিকলু। হ্যাঁ, হাত খরচ চালাবার জন্য পিকলু দু'এক জায়গা টিউশনি করতো বটে। এই মেয়েটিকে পড়াতো পিকলু। এই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তিনি যেন পিকলুর খানিকটা যোগসূত্র পেয়ে গেলেন। এই মেয়েটির স্মৃতিতে পিকলু রয়ে গেছে।

অনিরুদ্ধর কথা শুনে প্রতাপ দোনামনা করছিলেন, জয়ন্তীর কথা শুনে তিনি রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, চলো, তোমাদের বাড়ি তাহলে ঘুরেই আসা যাক। তোমাদের এই নতুন বাড়ি তো আমি দেখিনি!

আর একটা সাইকেল রিকশা ডাকা হলো। ট্রাম-ডিপো থেকে বেশ দূরে অনিরুদ্ধদের বাড়ি, একেবারে রিফিউজি কলোনির মধ্যে। আশেপাশে অনেকগুলি টিনের চালার ঘর, তার মধ্যে এই একটা তিনতলা পাকা বাড়ি। প্রতাপের এই মামারা আগে থাকতেন ভাড়া বাড়িতে, বছর তিনচারেক হলো এই নতুন বাড়ি হয়েছে। এই জবরদখল রিফিউজি কলোনিতে নন্তু মামা, ভন্তু মামারা কী করে যেন নিজেদের জন্য খানিকটা জমি দখল করে রেখেছিলেন।

এ বাড়িতে এখনও একান্নবর্তী পরিবার। নন্তু মামা মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েরা রয়েছেন এ বাড়িতেই, ভন্তু মামার দু'ছেলে টাকা রোজগার করছে চার হাতে, গিট্টু নামে আরও একজন মামা আছেন এ বাড়িতে, যিনি প্রতাপের প্রায় সমবয়েসী, তিনি বিয়ে করেননি। প্রতাপের মনে পড়লো, এই গিট্টুমামার বেশ মাথার দোষ আছে, প্রায়ই এর কোমর থেকে ধুতি খুলে যেত, একটা অস্বাভাবিক বড় পুরুষাঙ্গ দেখার স্মৃতি প্রতাপের এতদিন পরেও মনে পড়ে। গেল। গিট্টু মামা এখন প্যান্ট পরেন, অগেকার দিনের সাহেব শ্রমিকদের মতন শোলডার স্ট্র্যাপ দিয়ে সেই প্যান্ট টেনে রাখা হয়েছে।

সবাই মিলে বেশ খাতির যত্ন করতে লাগলো প্রতাপকে। মধ্য বয়স্ক পুরুষ হলেও প্রতাপের এটা তো মামার বাড়ি। এ বাড়িতে বাঙাল রীতিনীতি সবই পুরোপুরি চলছে। মহিলারা নির্ভেজাল বাঙাল কথা বলেন, ঘর-দোর অগোছালো, বসবার ঘরের মেঝেতে মুড়ি ছড়িয়ে আছে, কথাবার্তার অধিকাংশই অমুক কেমন আছে আর তমুক এখন কোথায়!

ভন্তুমামা তেমন কিছুই অসুস্থ নন, মাত্র দু'সপ্তাহ আগে একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন দিব্যি হাঁটাচলা করছেন এবং মাঝে মাঝে গড়গড়ায় তামাক টানছেন। গ্রামের বয়স্ক পুরুষদেরও প্রতাপ কখনো অসুখ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখেননি। এই অবস্থায় ভন্তু মামাকে একজন অসুস্থ মানুষ হিসেবে দেখতে আসা খুব লজ্জার ব্যাপার হতো।

ইচ্ছের বিরুদ্ধেও প্রতাপকে গুটি তিনেক সন্দেশ খেতে হলো মামীদের উপরোধে। এর পর চায়ের প্রস্তাব শুনে তিনি আরও সঙ্কিত বোধ করলেন। যে বাড়িতে অনেক লোক, সে বাড়িতে সাধারণত চা বেশ বিস্বাদ হয়। পেয়ালা-পিরিচ ঠিক মতন ধোওয়া থাকে না। কিন্তু জয়ন্তী নামের মেয়েটি একটি পাতলা, পরিচ্ছন্ন কাপে বেশ সুন্দর সৌরভময় চা এনে তাঁকে চমকে দিল। জয়ন্তীকে কাছে বসিয়ে তিনি তার বাপের বাড়ি গল্প শুনতে লাগলেন। জয়ন্তীর বাপের বাড়ি স্কটিশ চার্চ কলেজের কাছেই, গোয়াবাগানে, পিকলু তাকে পড়াতে যেত সপ্তাহে তিনদিন সন্ধেবেলা...।

এক সময় ভমামা জিজ্ঞেস করলেন, খোকন, তুমি বাড়ি টাড়ি করেছে নাকি কোথাও? প্রতাপ মাথা নেড়ে বললো, আজ্ঞে না।

ভন্তুমামা গড়গড়ার নল ঠোঁটে দিয়ে বললেন, জমি কিনে রেখেছিস? জমির যা দাম বাড়ছে দিন দিন।

প্রতাপ বললো, না, জমিও কিনিনি কোথাও। বাড়ি করার কথা ভাবিনি কখনো।

বাড়ি না হয় পরে হবে, কিন্তু জমি কিছুটা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। তোরা রিফিউজি কার্ড করেছিস না? এই রকম কোনো রিফিউজি এরিয়ায় যদি অন্তত পাঁচ-দশ কাঠা জমিও রেখে দিতিস, দ্যাখ না, আমাদের এ বাড়ির জন্য এক আধলাও জমির দাম দিতে হয় নাই!...

হঠাৎ দপ্ করে প্রতাপের মাথায় জ্বলে উঠলো রাগ। ভন্ডুমামার এই ধরনের কথার জন্যই প্রতাপ তাঁকে কোনোদিন পছন্দ করতে পারেননি। মালখানগরের মজুমদার বংশের ছেলে প্রতাপ মজুমদার সামান্য ভিখিরির মতন অন্যের জমি দখল করবেন? রিফিউজি কার্ড, কিসের রিফিউজি কার্ড? প্রতাপরা তো রিফিউজি নন, পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল ঠিকই, সে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে তাও ঠিক, কিন্তু পার্টিশানের আগে থেকেই তিনি কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে থেকেছেন, এখনও সেইভাবেই থাকেন, সরকারের কাছ থেকে তিনি এক পয়সা সাহায্য প্রত্যাশী নন।

জুতোর শব্দ করে প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এবার যাবো! ভ্যমামা বললেন, হ্যাঁ তা তো যাবিই, অনেক দূরের পথ, এসেছিস বড় খুশী হয়েছি। আবার আসিস। আমি যা বললাম, মনে রাখিস। নিজের নামে একটা জমি, বুঝলা না, ইন্ডিয়ায় এক টুকরো জমি করে না রাখলে সিটিজেনশীপ রাইট ঠিক মতন জন্মায় না। ওরে মালু, ভূতো, পুনি তোরা প্রতাপদাদাকে গোটা বাড়িটা একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দে। একটু দেখে যা থোকন, কেমন বাড়ি করিছি। দক্ষিণখোলা, প্রত্যেক ফ্লোরে মোজেইক...

রিফিউজি কার্ডের সুযোগ নিয়ে জবরদখল জমিতে এ রকম তিনতলা বাড়ি হাঁকানো, প্রতাপের ঘৃণা হতে লাগলো। কিন্তু উপায় নেই, ভদ্রতার চাপে মুখ বুজে থাকতেই হবে। প্রতাপকে একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখতে হলো, অনিরুদ্ধ আর জয়ন্তী এমন কি ছাদেও নিয়ে এলো তাঁকে। প্রতাপের ছাদ দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তবু অনিরুদ্ধ বারবার বলতে লাগলো, আসুন না, ছাদটা দেখলে ভালো লাগবে।

ছাদের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে গিট্টু মামা। মুখখানা নড়ছে, কী যেন চিবোচ্ছেন। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখে কৌতূহলের হাসি, প্যান্টের দু'পকেটে হাত ঢোকানো। প্রতাপকে দেখে তিনি বললেন, খোকন, আজ রাত্তিরে এখানেই থেকে যা না! খাওয়া-দাওয়া করবি, অনেকদিন তো আমাদের সাথে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিস না, তারপর আমার সাথে শুয়ে থাকবি...

বাল্য স্মৃতি আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠায় প্রতাপ প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, না না, আমার এখানে থাকার উপায় নেই, আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে, দেরি হয়ে গেছে।

গিট্টুমামা থপ থপ্ করে ওদের পেছন পেছন ছাদে উঠে এলেন। বেশ প্রশস্ত ছাদ, এখানে আরও একটি ঘর তোলার কাজ শুরু হয়েছে, সরঞ্জামগুলি এক পাশে স্তূপ করে রাখা।

অনিরুদ্ধ আর জয়ন্তী প্রতাপকে নিয়ে এলো কার্নিসের ধারে। জয়ন্তী একদিকে হাত তুলে বললো, এই দিকটা খুব সুন্দর, একেবারে ফাঁকা, এদিকে একটা খাল আছে।

অনিরুদ্ধ বললো, এই দিকটা পুরোপুরিই ছিল একজন মুসলমানের সম্পত্তি, বুঝলে প্রতাপদা। ভদ্রলোক ধনী ছিলেন খুব, এ দিকটায় নাকি বাগান ছিল, প্রায় দুশোটা ফ্যামিলি এখানে সেক্স করেছে। ঐ যে বাড়িটা দেখছেন, একটু ডান দিকে তাকান, ঐ যে রেডিওর এরিয়ালওয়ালা বাড়ি, ঐটা ছিল সেই মুসলমানের বসত বাড়ি।

প্রতাপ জয়ন্তীর কথা মতন ফাঁকা দিকটায় দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, এক ঝলকের জন্য বাড়িটার দিকে মুখ ফেরালেন।

অনিরুদ্ধ বললো, নারায়ণগঞ্জের এক ভদ্রলোক ঐ বাড়িটা এক্সচেঞ্জ করে পেয়েছেন। ভদ্রলোকের নাম সত্যেন রায়, বেশ নাম করা লোক।

প্রতাপের শরীরে কথাটায় বিদ্যুৎ শিহরন হলো। ঐ সেই বাড়ি! ঠিকানা দেখে বোঝা যায় কি যে এই দুটি বাড়ি এত কাছাকাছি হবে। সত্যেনদের বাড়িটার পেছন দিক দেখা যাচ্ছে, বেশি দূর নয়, দোতলার কয়েকটি ঘরে আলো জ্বলছে, কয়েকটি ঘর অন্ধকার। ওর কোনো একটি ঘরে বুলা থাকে। এখনো আছে বুলা? তাকে দেখা যাবে না।

গিট্টুমামা কী যেন বলছেন বিড়বিড় করে, প্রতাপের সেদিকে কান নেই। তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দূরের বাড়িটার দিকে। মাঝখানে কিছুক্ষণ বুলার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, এখন বুলার কথা ভাবতেই সুলেখার কথা মনে পড়লো। তারপর দুটি মুখ মিলে মিশে এক হয়ে গেল।

৩৪ মেডিক্যাল কলেজ থেকে বাড়ি

মেডিক্যাল কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাস থেকে কয়েকটা স্টপ আগে নেমে পড়লো তুতুল। জগুবাবুর বাজারের কাছে। এর আগে তুতুল কোনোদিন কোনো বাজারের মধ্যে ঢোকেনি, আজ সে ঢুকলো। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে তার বই খাতা, কলেজে যাবার তাড়া থাকায় কোনোদিনই সে চুল বাঁধে না, একটা হলদে রঙের শাড়ি পরা, পায়ে রবারের চটি। সে মুদি দোকান খুঁজতে লাগলো।

আতপ চাল একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না। বিধবা হবার পর সুপ্রীতি আর সেদ্ধ চাল খান না, তাই দু'তিন দিন ধরে তিনি দিনের বেলা ভাতের বদলে সাবু কিংবা চিড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছেন। মমতা, তুতুল আর মুন্নিকে তিনি মাথার দিব্যি দিয়েছেন, এ কথা কিছুতেই যেন প্রতাপের কানে না যায়। সাবু-চিড়ে খেয়ে তিনি দিব্যি আছেন, কোনো অসুবিধে নেই, অম্বুবাচীর সময়েও তো তাঁকে ভাত ছাড়াই তিনদিন কাটাতে হয়।

বাড়ির পুরুষ দু'জন খেয়ালই করে না বাড়ির মেয়েরা কী খায় না খায়। অতীন নিজের খাবারটি পেলেই খুশী। প্রতাপও দু'বেলাই আলাদা খেতে বসেন। তাঁকে যা পরিবেশন করা হয়, বাড়ির অন্যরা তাই-ই খাবে, এটাই তিনি ধরে নিয়েছেন। চালের অনটনের কথা তিনি জানেন, সেইজন্যই দিনের বেলা ভাত আর রাত্তিরে রুটি চালু হয়েছে। প্রতাপের নতুন আদালি রওনক আলি তার হাওড়া জেলার গ্রামের বাড়ি থেকে কিছু চাল এনে দেবার প্রস্তাব জানিয়েছিল, প্রতাপ রাজি হননি। বাইরের জেলাগুলি থেকে কলকাতায় চাল আনা বে-আইনি, প্রতাপ তেমন কাজে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। যদিও রুটিতে তাঁর রুচি নেই, রুটি খেলে মন ভরে না।

তুতুল জানে তার মা একেবারেই রুটি খেতে পারেন না। রাত্তিরবেলা দুটো একটা রুটি দাঁতে কাটেন বাধ্য হয়ে, তাও জলে ভিজিয়ে নরম করে; দিনের বেলা রুটি খাওয়ার চেয়ে চিড়ে মুড়ি-সাবুও ভালো।

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের উত্তেজনা শেষ হতে না হতেই খাদ্য-সমস্যা হিংস্র দাঁত আর রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়েছে সারা দেশের ওপর। এ বছর ফসল ভালো হয়নি। আগামী বছর খাদ্য সংকট আরও বাড়বে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ বিরতি হলেও ভারতীয়দের ধারণা হয়েছে যে যুদ্ধে তারাই জিতেছে। জয়ের উন্মাদনায় চিৎকার করতে গিয়ে তারা দেখলো খালি পেটের জ্বালায় গলার জোর আসে না।

এই যুদ্ধে ব্রিটেন ও আমেরিকা পাকিস্তানের দিকে ঢলে ছিল বলে খবরের কাগজগুলিতে দিল্লির পার্লামেন্টে ঐ দুই দেশের প্রতি খুব উষ্ম প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এখন আবার সভয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে, আমেরিকা গম পাঠাবে তো? পি এল-৪৮০ প্রকল্প চালু রাখবে তো? সোভিয়েত ইউনিয়ান ভারতকে অস্ত্র ও বন্ধুত্ব দিয়ে সাহায্য করলেও নিরন্ন ভারতীয়দের খাদ্য দিয়ে সাহায্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। বিশ্বের বাজার থেকে তাদেরও গম কিনতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কলকাতার ময়দানে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিতে এসে সাম্প্রতিক দেশপ্রেমের উন্মাদনাকে কাজে লাগাবার জন্য বললেন, এখন প্রকৃত দেশপ্রেম হলো কম খাওয়া। প্রতি সোমবার দেশের সমস্ত মানুষের উপোস দেওয়া উচিত। অধিক খাদ্য ফলাতে হবে, সমস্ত পোড়ো, পতিত, অনাবাদী জমিতে ফসল ফলাতে হবে, এক ফসলী জমিকে দো ফসলী করতে হবে ইত্যাদি। এসব নিছক কথার কথা। দু'দশ বছরে এরকম উদ্যোগের ফল পাওয়া যায় না।

তুতুল জানে, তার মায়ের অ্যানিমিয়া আছে। তা ছাড়া লো প্রেসার। ইদানীং যখন তখন একটা তীব্র পেট ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন সুপ্রীতি, অনেক পরীক্ষা টরিক্ষা করিয়েও সে ব্যথার কারণটা ঠিক ধরতে পারেনি তুতুল। গতকালই তাদের এক প্রোফেসর পেটের রোগ সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে হঠাৎ তিক্ত ভাবে হেসে বলেছিলেন, আমি যে-সব বই দেখে তোমাদের পড়াচ্ছি, তোমরা যে-সব বই মুখস্ত করবে, তাতে কোথাও লেখা নেই যে মানুষ যখন অনিচ্ছায় অনাহারে ভোগে, খিদে আছে অথচ খাদ্য নেই, তখন তাদের কী কী রোগ হতে পারে! কোন ওষুধেই বা তাদের চিকিৎসা হবে। লালবাহাদুর তো বলে গেলেন সোমবার উপোস করতে, এদিকে গ্রামের বহু মানুষ সপ্তাহে দু'তিন দিনও পেট ভরে খেতে পায় না।

মাকে নিয়ে তুতুল চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সুপ্রীতির সেই মনের জোর, সেই তেজী ভাব একেবারেই যেন হারিয়ে গেছে, এখন সর্বক্ষণ যেন মনমরা হয়ে থাকেন। না খেলে মাকে বেশিদিন বাঁচানো যাবে না। শুধু পেট ভরাই তো বড় কথা নয়, খেতে ভালো লাগারও তো একটা প্রশ্ন আছে। সুপ্রীতি ভাত খেতে ভালোবাসেন, ফেনা ভাতের সঙ্গে একটু আলুসেদ্ধ কাঁচা লঙ্কা হলেই তিনি তৃপ্তি পান। সেই সামান্য ভাতটুকুও তাঁকে দেওয়া যাবে না। ই

কলেজের সহপাঠীদের কাছেই তুতুল জেনেছে যে র‍্যাশনের বাইরেও বাজারের মুদি দোকানে গোপনে চাল বিক্রি হয়। কিন্তু তুতুল জানে না যে সেইভাবে চাল কিনতে গেলে একটু মুখ চেনার দরকার হয়। সে বাজারের মধ্যে ঢুকে এক একটি দোকানে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, চাল আছে, আতপ চাল? দোকানদাররা অন্য খদ্দেরদের দিকে এক

ঝলক তাকিয়ে তারপর মাথা নেড়ে বলে, চাল? আমরা চাল রাখি না। দু'একজন চেনা খদ্দের হাসে।

কয়েক দোকান ঘোরার পর একটি রোগা পাতলা ছেলে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, দিদি, কতটা চাল নেবেন? এ দিকটায় সরে আসুন। থলে এনেছেন?

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, আতপ চাল আছে?

ছেলেটি মাথা নেড়ে বললো, আতপ চাল কোথায় পাবেন? গোটা বাজার খুঁজলেও এক দানা পাবেন না। সেদ্ধ চাল দিতে পারি।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ার ভঙ্গিতে ছেলেটি বললো, তবে, কামিনীভোগ দিতে পারি, দাম অনেক বেশি পড়ে যাবে। সাড়ে দশ টাকা সের পড়ে যাবে।

তুতুল বললো, সেটাই নেবো।

যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তুতুলের, তবু টাকা পয়সার হিসেবটা সে সদ্য বুঝতে শিখেছে। এতদিন সে বই পড়া ছাড়া আর কিছুই জানতো না। শুধু একটাই লক্ষ্য ছিল তার, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে। কলেজ যাওয়া আর কলেজে আসার বাইরে আর কোনো জীবন ছিল না তার। এই মাত্র মাস ছয়েক আগে তার জীবন বাঁক নিয়েছে অন্য একটা দিকে।

রোগা ছেলেটি তাকে নিয়ে এলো একটি কোণের দোকানে। বাইরে না দাঁড় করিয়ে নিয়ে এলো ভেতরে। একজনকে ডেকে ফিসফিস করে বললো, ও দিনুদা, এই দিদি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছেন, একে কিছু কামিনীভোগ দিতে হবে।

দিনু নামের সেই লোকটি জিভ কেটে বললো, এ হে, একটু আগে বললি না? আমার কাছে, যা এস্টক দিল, এ পাড়ার জজ সাহেব যে সবটাই নিয়ে চলে গেলেন।

তুতুল কুড়িটি টাকা এনেছে, সেই টাকা সে রেখেছিল অ্যানাটমি বইয়ের পাতার ভাঁজে, কাঁধের ঝোলা থেকে সে বইটা বার করলো।

রোগা ছেলেটি বললো, আর নেই? দিদিকে কথা দিয়ে নিয়ে এলুম, পরেশদার দোকানে আছে?

দিনু বললো, আজ আর কোনো দোকানে পাবি না। জজ সাহেব আরও চেয়েছিলেন, আমি নিজেই তো খুঁজে এলুম।

তুতুলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, সেদ্ধ চাল নিন না, ভালো মাল আছে, গ্যারান্টি দিচ্ছি। কাঁকর হবে না...।

তুতুল কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো লোকটির মুখের দিকে। সেই মুহূর্তে সে একটা সিদ্ধান্ত নিল। জীবনে প্রথম সে বাজারে ঢুকে চাল কিনতে এসেছে, সে চাল না নিয়ে ফিরবে না।

সে দর দাম করতে জানে না, দশ টাকার নোট দুটি বাড়িয়ে দিয়ে সে বললো, তাই দিন!

মোটাসোটা চালের ঠোঙাটি সে তার বইয়ের ব্যাগে ভরে নিয়ে বেরিয়ে এলো। বাড়ি ফিরে সে কারুকে কিছু না বলে রান্না ঘরে গিয়ে চাল রাখবার টিনের ড্রামটির মধ্যে খালি করে দিল ঠোঙাটা। সে বেশ তৃপ্তি বোধ করলো, এই প্রথম সে এই সংসারের জন্য কিছু একটা কাজ করেছে। এবার থেকে সে প্রায়ই কিছু না কিছু করবে।

মুখ হাত ধুয়েই সে তাড়াতাড়ি চলে গেল পাড়ার লাইব্রেরিতে। সাড়ে সাতটার সময় লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যায়, এখনো এক ঘণ্টা সময় আছে। পিকলু বেঁচে থাকতে সে প্রচুর গল্প-উপন্যাস কবিতার বই পড়তো, পিকলুই এনে দিত সেইসব বই। মাঝখানে কয়েকটা বছর তুতুল পড়ার বই ছাড়া আর কিছুই পড়েনি। ইদানীং তার আবার রস সাহিত্য পাঠের তৃষ্ণাটা ফিরে এসেছে, সে নিজেই ভর্তি হয়েছে এই লাইব্রেরিতে।

রাত্তিরবেলা বিছানায় শুয়ে সে সুপ্রীতিকে বললো, মা, আজ একটা বই এনেছি, তুমি পড়বে?

সুপ্রীতি ক্লান্ত ভাবে বললেন, না, আমার বই পড়তে ইচ্ছে করছে না। তুই পড়বি তো পড়, আলো নেবাবার দরকার নেই।

তুতুল বললো, আমি তোমাকে পড়ে শোনাবো?

-কী বই রে, ওটা? আজই শুনতে হবে? আমার যে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। তুতুলের ওষ্ঠে দুষ্টুমীর হাসি ফুটে উঠলো।

সে মলাট দেওয়া বইটা খুলে বললো, এটার নাম 'মনুসংহিতা'। খুব বিখ্যাত বই, তুমি পড়োনি নিশ্চয়ই আগে?

স্কুলে বেশি দূর না পড়লেও সুপ্রীতি বাংলা লেখাপড়া ভালোই করেছেন। মুনসংহিতার নাম জানেন তিনি। তাঁর প্রায় ডাক্তার হওয়া মেয়ে হঠাৎ মনুসংহিতা পড়ছে দেখে তিনি ক্লান্ত শরীরেও খানিকটা সচকিত হয়ে উঠলেন।

তুতুল বললো, আমাদের হিন্দু সমাজ এই বইটির নির্দেশে চলার কথা। তাই সবটা পড়ে দেখলাম। আমাদের একজন স্যার বলেছেন, মানুষের চিকিৎসা করতে গেলে সমাজ ব্যবস্থাটাও জানা দরকার। এর পর মুসলমানদের হাদিস পড়বো। এই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে ভক্ষ্যাভক্ষ বিচার; শৌচ ও অশৌচ বিধি। অর্থাৎ হিন্দুরা কী খাবে না খাবে, তাও এতে বলে দিয়েছে। বিধবাদের কী খাওয়া উচিত না উচিত সেটা খুঁজে দেখলাম। এতে আলো চাল, সেদ্ধ চালের কোনো উল্লেখ নেই। তখন বোধহয় দু'রকম চাল ছিল না। মেয়েদের সম্পর্কে বা বিধবাদের সম্পর্কে কী লিখেছে জানো মা? তারা যেন সব সময় স্বামীর আরাধনা করে, পর। পুরুষের চিন্তা না করে। সৎ থাকার পবিত্র থাকার এই একটাই মাত্র ক্রাইটেরিয়ান। একটা শ্লোকে লিখেচে।

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্প মূল ফলে শুভৈঃ
নতু নামাপি গৃহীয়াৎ প্রত্যৌ প্রেতে পরস্য তু ॥

অতি কষ্টে থেমে থেমে সংস্কৃতটা উচ্চারণ করে তারপর তুতুল বললো, এর তলায় বাংলা মানেও লিখে দিয়েছে : "পতির মৃত্যু হলে স্ত্রী বরং পবিত্র পুষ্প, ফল ও মূল দ্বারা অল্পাহারে দেহ ক্ষয় করবেন, তবু পরপুরুষের নামোচ্চারণ করবেন না।" তার মানে মা, বুঝলে, এই মনু নামের লোকটা বিধবাদের অল্প খাইয়ে মেরে ফেলার কথা বলছেন, যাতে বিধবারা অন্য পুরুষের নামও উচ্চারণ না করে। কী নিষ্ঠুর! সে যাই হোক, ফুল, ফল আর মূল খেতে বলেছে, মাছ-মাংস নিষেধ। ফুল-ফলের মধ্যে চাল-ডাল-গম এই সবই পড়ে। মুসুর ডাল খাওয়া বারণ তা কোথাও লেখা নেই। ঠিক তো?

সুপ্রীতি ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললেন, তুই এসব আমাকে বোঝাচ্ছিস কেন?

তুতুল বললো, তার কারণ, তুমি কাল থেকে সেদ্ধ চালের ভাত খাবে। শাস্ত্রে বারণ নেই! সুপ্রীতি আস্তে বলে উঠলেন, না, না, না, এতদিন খাইনি, হঠাৎ এখন সেদ্ধ চাল খেতে যাবো। কেন?

–যখন দু রকম চাল পাওয়া যেত, তখন না হয়...

–আমার সাবু খেতে কোনো অসুবিধে হয় না।

–যদি আতপ চাল আরও এক মাস দু'মাস না পাওয়া যায়?

–তাতেও কিছু হবে না। তুই এ নিয়ে ভাবিস না, তুতুল!

–মনুসংহিতার এই মনু যাই বলুন না কেন, আমার মা বিধবা বলেই তাড়াতাড়ি মরে যাবেন, তা আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। শোনেনা মা, কাল আমার ছুটি। কাল আমি সেদ্ধ চাল আর মুসুরির ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করবো। তুমি যদি না খাও, আমিও তা

হলে খাবো না। তুমি দুপুরবেলা যতদিন ভাত না খাবে, ততদিন আমিও কিছুতেই ভাত খাবো না!

–তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি?

–এটা কি পাগলের মতন কথা! বরং, তোমার এই মনু ভদ্দরলোকই পাগল ছিলেন। আর একটা শ্লোকে কী লিখেছেন জানো? সংস্কৃতটা আমি আর পড়ছি না, বাংলা মানেটা হলো এই যে, "পতি সদাচার শূন্য, পরদার রত বা গুণহীন হলেও স্বাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে দেবতার মত পূজা করবেন।"

--থাক, তুতুল, যাক, ওসব কথা থাক।

–আমি মামাকে কাল জিজ্ঞেস করবো, তিনি এসব মানেন কিনা! আমার তো মনে হচ্ছে এই মনুসংহিতা নামের বইটি ব্যান করা উচিত। এতদিন লোকেরা এই বই সহ্য করেছে কী। করে? একটা অপদার্থ, দুশ্চরিত্র, বদমাস লোকও যদি স্বামী হয়, তবু তার স্ত্রী তাকে দেবতার মতন পূজো করবে।

–এখন সময় বদলে গেছে। এখন কি আর লোকে ওসব মানে?

–এই সব বই পড়বারও কোনো মানে নেই। এই বইয়ের একটা কথাও ভালো নয়। তুতুল বইটি খাটের তলায় ফেলে দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, মা, তুমি কেন দিন দিন এত রোগা হয়ে যাচ্ছো? কেন আর আগের মতন হাসো না?

সুপ্রীতির চোখে জল এসে গেল আনন্দে। তার নিজের জন্য নয়, তুতুলের যে হঠাৎ এই পরিবর্তন হয়েছে, তা তিনি যেন এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। এই মেয়েটাই তো পিকলুর কথা ভেবে ভেবে দিন দিন শালিকের মতন রোগা হয়ে যাচ্ছিল, কোনো সাধ আহ্লাদ ছিল না, ওর চিকিৎসার জন্য প্রতাপ কত চেষ্টা করেছেন...সেই তুতুল হাসছে, জোর দিয়ে কথা বলছে!

খুব গোপনে একটা নিষিদ্ধ কথা বলার মতন তুতুল মায়ের কানে কানে বললো, মা, আজ আমি বাজারে গিয়েছিলাম চাল কিনতে।

সুপ্রীতি শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। শুধু চোখ নয়, নিজের কানকেও এবার তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। চোখ বড় বড় করে তিনি বললেন, তুই বাজারে গিয়েছিলি।

তুতুল বললো, হ্যাঁ। বাজারে বেশি দামে চাল বিক্রি হয়। কিন্তু সেখানেও আতপ চাল নেই। যেটুকু ছিল এক জজ সাহেব কিনে নিয়ে গেছেন। তোমার মতন অনেক বিধবাই নিশ্চয়ই আতপ চাল খায় শুধু। গভর্নমেন্ট তাদের কথা চিন্তা করছে না। গভর্নমেন্টের উচিত ছিল সব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো যে এখন থেকে সব বিধবারাই আতপের বদলে সেদ্ধ চাল খেতে পারবে। তাতে কোনো দোষ নেই!

সুপ্রীতি বললেন, অনেকে তো ভাতের বদলে রুটি খেয়ে দিব্যি থাকতে পারে।

–তোমার মতন বাঙালরা যে ভাত না খেয়ে থাকতে পারে না। তারা বুঝি আতপ চালের অভাবে না খেয়ে মরে যাবে? আমার মাকে আমি কিছুতেই মরতে দেবো না!

সুপ্রীতির বুকের মধ্যে কূল কূল করে একটা সুখের ঝরনা বয়ে যেতে লাগলো। তুতুল ঘুমিয়ে পড়লেও অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘুম এলো না। অঘ্রাণ মাস, একটু শিরশিরে ঠাণ্ডা পড়েছে। এক সময় উঠে সুপ্রীতি শিয়রের কাছের জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। তুতুল শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে। একই খাটে মা আর মেয়ে। আর কিছুদিন বাদেই মেয়ে ডাক্তার হবে, তার জন্য একটা আলাদা ঘর চাই।

তিনি একটা পাতলা চাঁদর বিছিয়ে দিলেন তুতুলের গায়ে।

পরদিন সকালে তুতুল অতীনকে ধরে বললো, এই বাবলু, তুই আমাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটা বড় ছবি জোগাড় করে দিতে পারবি?

অতীন বললো, সে ছবি আমি কোথায় পাবো?

–তুই তো অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করিস, একটু খোঁজ নিতে পারবি না? তোকে আমি পয়সা দিয়ে দেবো?

–হঠাৎ বিদ্যাসাগরের ছবি দিয়ে কী হবে?

–আমার ঘরে টাঙাবো। তোর মনে আছে, ইডেন গার্ডেনে আমরা একবার একটা খুব বড় মেলা দেখতে গিয়েছিলাম? সেখানে পিকলুদা বলেছিল, বাঙালি মেয়েদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত উপকার করেছিলেন অথচ মেয়েরা রামকৃষ্ণের ছবি ঘরে টাঙিয়ে পুজো করে। সত্যিই তো, বিদ্যাসাগরের জন্যই তো আমরা স্কুল কলেজে যেতে পারছি। কাল মনুসংহিতা পড়তে গিয়ে পিকলুদার ঐ কথাটা আবার মনে পড়ে গেল!

তুতুল সকালবেলা হঠাৎ বিদ্যাসাগরের ছবির কথা তোলায় অতীন যত না অবাক হয়েছে তার চেয়েও বেশি চমকে গেল তুতুলের মুখে পিকলুর নাম শুনে। দাদার মৃত্যুর পর সে একদিনও ফুলদির মুখে দাদার উল্লেখ মাত্র শোনেনি। এমন কি তুতুল কাছাকাছি থাকলে অন্যরা পিকলুর কথা আলোচনা করতে করতেও থেমে যায়। ফুলদির মুখ চোখও আজ অন্যরকম।

আচ্ছা দেখবো ছবি পাওয়া যায় কি না, এই বলে অতীন বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, তুতুল আবার তাকে জিজ্ঞেস করলো, এই, আজ তো ইউনিভারসিটি বন্ধ, তুই কোথায় যাচ্ছিস?

ইউনিভারসিটি বন্ধ থাকলেই যে বাড়ি বসে থাকতে হবে, এ তো বড় অদ্ভুত কথা। অতীন হেসে বললো, যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে।

–কখন ফিরবি? শোন, আমি আজ খিচুড়ি রাধবো। তুই তাড়াতাড়ি ফিরবি কিন্তু, সবাই বসে খাবো একসঙ্গে। শোন বাবলু, তুই কয়েকটা ডিম এনে দিতে পারবি? মামা ডিম ভাজা খেতে ভালোবাসেন।

অতীন বললো, আমার যে আজ এক বন্ধুর বাড়িতে খাওয়ার কথা! আমি ডিম এনে দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে!

অতীনের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তুতুল বললো, ও, তুই আজ খেতে আসবি না?

সঙ্গে সঙ্গে মত বদল করে অতীন বললো, ঠিক আছে, আমি ফিরে আসবো। একটা দেড়টার মধ্যে। বাবা তো দেড়টার আগে খায় না।

খাওয়ার টেবিলে নয়, বারান্দায় সতরঞ্চি ভাঁজ করে লম্বা আসন পাতা হয়েছে, যেন নেমন্তন্ন বাড়ি। তুতুল জোর করে তার মা, মাসিমা, মুন্নিকে বসিয়েছে, এমনকি অতীনও এসে গেছে। প্রতাপ লেখাপড়ার কাজ করছিলেন, দু'তিনবার ডাকাডাকির পর এসে বললেন, হ্যাঁ, শুনলাম তুতুল আজ সবাইকে খাওয়াচ্ছে। কী ব্যাপার রে, তুতুল? তোর রেজাল্ট বেরিয়ে গেল নাকি?

অনেকক্ষণ রান্নাঘরে কাটিয়েছে বলে তুতুলের মুখোনি লালচে এবং ঘামে চকচকে। চূর্ণ চুল পড়েছে কপালে। সে মুখ তুলে বললো, সে সব কিছু নয়, আজ আমি প্রথম খিচুড়ি বেঁধেছি।

প্রতাপ সকৌতুকে বললেন, ওরে বাবা, প্রথম দিনই আমার ওপর এক্সপেরিমেন্ট করবি? আগে তোর মা মামীদের ওপর পরীক্ষা করলে পারতি।

হাঁটু মুড়ে বসে প্রতাপ অতি গরম খিচুরি, চামচে করে তুলে একটু মুখে দিলেন। তারপর আরও দু'চামচ। মুখের ভাব বদলে গেল, তিনি বললেন, নারে, খারাপ হয়নি তো, ভালোই তো হয়েছে, ঝাল একটু কম। একটা কাঁচা লঙ্কা এনে দে।

অন্যদের দিকে তাকালেন প্রতাপ। অনেকদিন এরকম এক সঙ্গে খেতে বসা হয়নি। মমতাও খেতে শুরু করেছেন, সুপ্রীতি এখনও হাত দেননি। মমতা বললেন, খারাপ হয়নি, কী বলছো? বেশ ভালো হয়েছে। খিচুড়িতে ঠিক স্বাদটা আনা সহজ নয়।

প্রতাপ বললেন, সত্যি ভালো হয়েছে, দিদি খেয়ে দ্যাখো। তোমার মেয়ের হাতের গুণ আছে।

সুপ্রীতি হেসে বললেন, পাগল মেয়ের যা কাণ্ড। এর মধ্যে পেঁয়াজ রয়েছে, এ খিচুড়ি কি আমি খেতে পারি?

প্রতাপ বললেন, হ্যাঁ, তাই তো পেঁয়াজ দিয়ে ফেলেছে। তুমি খাবে কী করে? তুতুল বললো, মনুসংহিতায় কায়স্থবাড়ির বিধবাদের পেঁয়াজ খাওয়া নিয়ে কোনো নিষেধ তো নেই। ফল-মূল খেতে বলেছে, পেঁয়াজ তো একটা মূল, আলুরই মতন।

প্রতাপ চোখ গোল গোল করে হেসে উঠে বললেন, ওরে বাবা, একেবারে মনুসংহতা! তুই পড়েছিস বুঝি?

তুতুল মাথা নেড়ে সপ্রতিভ ভাবে বললো হ্যাঁ, কালই পড়েছি!

প্রতাপ বললেন, তাহলে দিদি খেয়ে নাও! তোমার মেয়ে যখন মনুসংহিতা পড়ে বিধান দিয়েছে।

সুপ্রীতি বললেন, তা হলেই বা। প্রায় দশ বছর হয়ে গেল পেঁয়াজ খাইনি, এখন আমি পেঁয়াজের গন্ধই সইতে পারি না!

প্রতাপ বললেন, এঃ হে, আমরা খাবো, তুমি খাবে না? তুই এ কী করলি রে, তুতুল? তোর। মা কী খাবে?

সবাই খাওয়া থামিয়ে অপরাধীর মতন চেয়ে রইলো সুপ্রীতির দিকে। এমনকি অতীনেরও মনে হলো, পেঁয়াজ দেওয়া খিচুরি একজন বিধবাকে খাওয়ানো সত্যিই সম্ভব নয়। এটা বাড়াবাড়ি!

তুতুল হেসে জিজ্ঞেস করলো, পেঁয়াজ খাওয়া দোষের কেন, সেটা আগে বলো? ভারতের অনেক জায়গায় যারা নিরামিষ খায়, তারাও পেঁয়াজ খায়!

মমতা বললেন, দোষগুণের কথা হচ্ছে না! তোর মা যে গন্ধটাই সহ্য করতে পারবে না! অভ্যেস চলে গেছে।

প্রতাপ বললেন, দিদি একটু মুখে দিয়েই দেখো না!

সুপ্রীতি বললেন, নারে, পারবো না! তোরা খা, দেখতেই আমার ভালো লাগছে!

তুতুল বললো, আমি পেঁয়াজ ছাড়া খানিকটা আলাদা করে রেখেছি।

প্রতাপ বললেন,বাঃ বাঃ, মেয়ের বুদ্ধি আছে। দিদি, এতক্ষণ ও তোমায় পরীক্ষা করছিল!

সুপ্রীতির খিচুড়ি বদলে দিল তুতুল। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, খাও, মুখে দিয়ে দ্যাখো আগে।

সুপ্রীতি এক গ্রাস মুখে তুলতেই তুতুল সগর্বে বললো, মামা, এই খিচুড়ি আলো চাল নয়, সেদ্ধ চাল দিয়ে বেঁধেছি!

মমতা আর তুতুল মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসলো। সেদ্ধ চালের ব্যাপারটা মমতা আগেই শুনেছেন সুপ্রীতির কাছে। মমতাও নিজেও কতবার অনুরোধ করেছেন সুপ্রীতিকে।

আলো চাল সেদ্ধ চালের তফাৎটা প্রতাপ ঠিক বুঝতে পারলেন না। তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না। তুতুল তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলো,একটা নিঃশব্দ বিপ্লব হয়ে

গেল। এর পর সে মাকে মাছ-মাংসও খাওয়াবে, তাঁর চিকিৎসার জন্য দরকার। রান্না মাছ মাংস যদি খাওয়ানো না যায়, তা হলে শার্ক লিভার অয়েল, প্রোটিনেক্স অন্তত...।

খাওয়ার মাঝখানে সদর দরজায় করাঘাত হলো। এই অসময়ে কে আসবে? বাড়িওয়ালার এক জামাই ও ছোট ছেলে ইদানীং প্রায়ই এসে উৎপাত করছে, তাদের কেউ? প্রতাপের মুখ ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠলো।

মুন্নি এঁটো হাতে দরজা খুলে দিয়ে এসে বললো, ফুলদি, তোমাকে একজন ডাকতে এসেছে, নাম বললো, জয়দীপ।

তুতুলের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। অন্য সকলেও অবাক। তুতুলকে তো কেউ কখনো ডাকতে আসে না, তার সহপাঠীরাও কেউ আসে নি একদিনও।

বসবার ঘরের গায়ে লাগা এই বারান্দা, ও ঘর থেকে সব দেখা যায়। এই রকম খাওয়ার দৃশ্য বাইরের একজন মানুষ দেখে ফেলবে, এই ভেবে সুপ্রীতি লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন। যেন বাইরের কেউ এক পলক দেখেই বুঝে ফেলবে, তিনি সেদ্ধ চালের খিচুড়ি খাচ্ছেন। মুন্নি মাঝখানের দরজাটাও বন্ধ করে নি।

সেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো একটি যুবক। প্রায় ছ' ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ, চোখ-মুখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি। প্যান্টের ওপর হলুদ রঙের টি শার্ট পরা।

তুতুল বিব্রত ভাবে প্রতাপকে বললো, বড়মামা, এ আমাদের সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, এর নাম জয়দীপ।

জয়দীপ অনাড়ষ্ট গলায় বললো, এ কী, খিচুড়ি খাওয়া হচ্ছে? বাঃ বাঃ, আমি একটু ভাগ পাবো না? খিচুড়ি আমার দারুণ ফেভারিট।

প্রতাপ বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসো। এই, ওকে একটা থালা দে!

সতরঞ্চিতে আর জায়গা নেই, জয়দীপ বসে পড়লো মাটিতেই। যেন সে এই বাড়িতে বহুবার এসেছে! সে বললো, খিচুড়ির সঙ্গে আর কী আছে, ডিম ভাজা? ফার্স্টক্লাস!

সুপ্রীতি সরাসরি না তাকিয়ে গোপনে দেখতে লাগলেন ছেলেটিকে। এর কথা তুতুল তাঁকে কোনোদিন বলে নি। অথচ দেখে মনে হচ্ছে, এই ছেলেটি তুতুলের খুবই বন্ধু। তা হলে এর জন্যেই তুতুলের ব্যবহারে হঠাৎ একটা পরিবর্তন এসেছে। আবার সে স্বাভাবিক হয়েছে! সুপ্রীতি তৎক্ষণাৎ খুব পছন্দ করে ফেললেন জয়দীপকে।

৩৫ নোয়াখালিতে সিরাজুল

নোয়াখালিতে সিরাজুল নামে একটি ছেলেকে ঝোঁকের মাথায় একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছিল বাবুল, পরে সেকথা তার মনে ছিল না, সিরাজুলও সেই সময় ঢাকায় আসেনি। এক শীতের সকালে বৈঠকখানা ঘরে বসে কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ একজন আগন্তুককে দেখে . বাবুল চিনতে পারলো না। লম্বা, কালো চেহারা যুবকটির দুই কাঁধে দুটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ ঝুলছে, গালে অল্প অল্প দাড়ি, ময়লা কুর্তা-পাজামা পরা, মুখে গ্রাম্য অপ্রস্তুত হাসি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে বললো, আদাব, বাবুলভাই, আমি আইস্যা পড়ছি।

বাবুলের মেজাজটি ভালো নেই, ঘুম থেকে উঠেই মঞ্জুর সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। এখন সে খবরের কাগজ চোখের সামনে মেলে নিজের সঙ্গেই বোঝাঁপড়া করছিল, এই সময় এক মূর্তিমান ব্যাঘাতকে দেখে সে হঠাৎ বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার?

যুবকটি বললো, বাবুলভাই, আমি সিরাজুল ইসলাম, সেই যে নয়াডাঙ্গায় আপনে গেছিলেন...আমার বউরেও সাথে নিয়া আসতে হইলো।

নাম শুনেও বাবুলের কিছু মনে এলো না। যুবকটি পেছন ফিরে তার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এলো ভেতরে, সেই মেয়েটির হাতে গোলাপ ফুল ছাপ মারা একটি টিনের সুটকেস। সিরাজুলকে দেখে চিনতে না পারলেও তার পত্নী মনিরার মুখের দিকে এক নজর

তাকাতেই বাবুলের সব মনে পড়ে গেল। জয়নাল আবেদিনের আঁকা একটি ছবিতে অবিকল এই রকম একটি নারীর মুখ আছে, সেইজন্যই ভোলা যায় না।

মনের মধ্যে একটা প্রবল অস্বস্তি ও দ্বন্দ্ব থাকলেও বাবুল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এসো, এসো!

সিরাজুল সবিস্তারে তার কাহিনী শোনালো। আইয়ুব খাঁ বনাম ফতিমা জিন্নার ভোট যুদ্ধের সময় গ্রামের অবস্থা দেখতে গিয়ে বাবুল চৌধুরী এই সিরাজুলের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, সিরাজুল যদি ঢাকায় এসে পড়াশুনো করতে চায় তা হলে বাবুল তাকে সবরকম সাহায্য করবে। সিরাজুল তখনই সে সুযোগ নিতে পারেনি কারণ তাদের গ্রামের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতা ইরফান আলীর সঙ্গে সে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিল। বড়লোকদের সঙ্গে মামলা করে কোনোদিনই জেতা যায় না, তাই রাগের চোটে ইরফান আলীকে খুন করতে গিয়েছিল সিরাজুল। ইরফান আলীর মতন মানুষকে খুন করাও সহজ নয়, তারা সব সময় চ্যালাচামুণ্ডা পরিবৃত হয়ে থাকে, ইরফান আলীর ঘাড়ে কুড়ুলের কোপ মারতে গিয়ে সে ধরা পড়ে যায়, তার ফলে সে নিজেই যে খুন হয়ে যায়নি, সেটাই তার সাত পুরুষের ভাগ্য। তবে মার খেয়ে সে তিন মাস শয্যাশায়ী হয়ে ছিল, এখন তার ঘা শুকিয়েছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রামে বসবাস করা আর সম্ভব নয় তার পক্ষে। ইতিমধ্যে তার মায়েরও মৃত্যু হয়েছে। ভিটেমাটি সব ইরফান আলীর হাতে সঁপে দিয়ে সে এখন বাবুলের কাছে আশ্রয় প্রার্থী। দুনিয়ায় আর কোথাও তার যাবার জায়গা নেই।

বাবুল ভেতরে ভেতরে বেশ খানিকটা দমে গেল। একটি গ্রাম্য যুবকের পড়াশুনোর প্রতি খুব আগ্রহ দেখে সে তাকে ঢাকার কলেজে পড়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে চেয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি সে ফিরিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু তাকে সপরিবারে আশ্রয় দেওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব? ঢাকার এই বাড়িখানা তো বাবুলের নিজস্ব নয়। তার বাবা-মা এখন অধিকাংশ ময় টাঙ্গাইলের বাড়িতে থাকলেও মাঝে মধ্যে এখানে এসে ওঠেন। তার বড় ভাই আলতাফ হোটেলেই বেশির ভাগ রাত কাটালেও এ বাড়িতে তার জন্য দুখানি ঘর

রাখা আছে। এখানে কোনো বাইরের লোককে আশ্রয় দিতে গেলে তার বাবা মা ও আলতাফের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু সুটকেস ও বোঁচকা কুঁচকি সমেত এসে উপস্থিত হয়েছে যে তরুণ দম্পতি, তাদের সে এখন ফেরাবে কী করে?

একতলার গোটা তিনেক ঘরই তাদের পারিবারিক মালপত্রে ঠাসা, তারই কোণে একটা ঘর। পরিষ্কার করে এদের জায়গা দিতে হবে আপাতত। তার আগে মঞ্জুকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। মঞ্জু সকাল থেকেই রেগে আছে, সেই রাগের ঝাল যদি এদের ওপরে পড়ে? এখুনি মঞ্জুকে ডাকতে বাবুলের সাহস হচ্ছে না।

সে সিরাজুল ও মনিরার মুখের ওপর চোখ বোলালো। কী অসহায় দুটি মুখ। লজ্জিত, ভীত ব্যাকুল। মানুষই মানুষকে এরকম অসহায় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়। ইরফান আলীর মতন লোকেরা এখন ক্ষমতা পেয়েছে, গ্রামে তারা যা খুশি করতে পারে, গরিবের ধন-প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেললেও তাদের বাধা দেবার কেউ নেই। থানা-পুলিস, সরকারি প্রশাসন সবই এখন ওদের কজায়। ইরফান আলীর কথা ভেবে বাবুল নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলে উঠলো। তার ফর্সা মুখোনি লালচে হয়ে গেল, সে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না।

সিরাজুল হুমড়ি খেয়ে বাবুলের হাঁটু ধরে বসে পড়ে কাতর গলায় বললো, সাহেব, আমাগো পায়ে ঠ্যালবেন না। আমাগো যেকোন কাম করতে কন. আমার বউ বাসন মাজবে, ঘর সাফ করবে, আর, আমি...আপনে আমারে...

বাবুল মৃদু ধমক দিয়ে বললো, ও কী করছো, উঠে বসো!

প্রথমে সম্বোধন করেছিল বাবুলভাই, এখন বলছে সাঁহেব। আগে চেয়েছিল লেখাপড়া শেখার সুযোগ, এখন চাইছে চাকর-দাসী হিসেবে কোনো ক্রমে আশ্রয়। এইভাবেই নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব বন্ধ, বাবুলের বাইরে বেরুবার তাড়া নেই। এখনও ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। বাবুল মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো এ বাড়িতে দু'জন নতুন মানুষকে আশ্রয় দিতে গেলে পুরোপুরি দায়িত্ব সে একা নিতে পারবে না, মঞ্জু আর আলতাফের সঙ্গে পরামর্শ করতেই হবে। আলতাফ প্রায় নিশাচর, কোনোদিনই রাত দুটো আড়াইটের আগে শুতে যায় না। সকাল দশটার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠে না। সকালের দিকে তার হোটেলে কিংবা খবরের কাগজের অফিসে কাজও থাকে না বিশেষ। টেলিফোন করলেও এখন জাগানো যাবে না আলতাফকে। মঞ্জু খুব সম্ভবত এখন গোসলখানায়। এদের সঙ্গে পরিচয় করাবার আগে মঞ্জুর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে হবে।

একটি নতুন মেয়েকে রাখা হয়েছে বাড়ির কাজের জন্য,বাবুল তার উদ্দেশে হাঁক দিল, সেফু, সেফু! তারপর সিরাজুলকে বললো, অনেক দূর থেকে এসেছো, আগে নাস্তা পানি খেয়ে নাও, তারপর তোমাদের ঘরের ব্যবস্থা করা হবে।

সিরাজুল আর মনিরার মুখ থেকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগের কালো ছায়াটা সরে গেল। এই প্রথম তাদের আশ্রয় দেবার স্বীকৃতি জানালো বাবুল। এতক্ষণ তারা বাবুলের আচরণে ভরসা পায়নি।

সিরাজুল আবার নেমে এসে পা জড়িয়ে ধরলো বাবুলের। ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ালো বাবুল। দাতা কিংবা পরোপকারীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা সে কখনো নেয়নি, যেকোনো কারণে কেউ তাকে কৃতজ্ঞতা জানালে কিংবা সামনা সামনি প্রশংসা করলে সে খুব অস্বস্তি বোধ করে।

সেফু নামে মেয়েটি এই সময় ঘরে ঢুকতেই সে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলো, কিছু খেতে টেতে দিবি না? পরোটা ভেজেছিস? নিয়ে আয়। বাড়িতে মেহমান এসেছে, কয়েকখানা বেশি করে নিয়ে আয়। আর দ্যাখ, ভাবী গোসলখানা থেকে বেরিয়েছে কিনা!

মনিরা ভীতু ভীতু গলায় জিজ্ঞেস করলো, আমি একটু ওর সাথে যাবো?

বাবুল কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলো। মঞ্জুকে আগে কিছু বলার আগেই যদি মেয়েটিকে সে দেখতে পায়, তা হলে তার প্রতিক্রিয়া কী রকম হবে?

সে সেফুর দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বললো, ওনারে নিচের বাথরুমটা দেখায়ে দে।

ওপরে মঞ্জুর গলা শোনা গেল। তবু ওপরে যেতে বাবুল সময় নিচ্ছে, সে কি মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে? মঞ্জুর মতন সরল আর নরম স্বভাবের মেয়ে, কিছুদিন আগে পর্যন্তও যে কক্ষনো গলা চড়িয়ে কথা বলতো না, তাকেও ভয়? ইদানীং মঞ্জুর সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বাঁধছে, সেইজন্যই বাড়িতে বেশিক্ষণ বাবুলের মন টেকে না।

হঠাৎ বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামলো, তার থেকে নেমে এলো আলতাফ। পুরোদস্তুর সুট পরা, সদ্যস্নাত মাথার চুল, মুখে চোখে ব্যস্ত ভাব। আলতাফ শুধু যে আজ সকাল সকাল জেগে উঠেছে তাইই নয়, সে কোথাও যাবার জন্য তৈরি। গট গট করে ভেতরে এসে সে বাবুলের সঙ্গে কোনো কথা না বলেই ওপরে উঠে যাচ্ছিল, বাবুল তাকে ডেকে বললো, ভাইয়া, তোমার সাথে একটা কথা আছে!

আলতাফ থেমে গিয়ে মুখ ফেরালো। ছোট ভাইটিকে সে এক সময় খুবই ভালোবাসতো। এখন তার প্রতি খানিকটা বিরক্তি মেশানো অবজ্ঞা জমেছে। তার ধারণা হয়েছে, বাবুল নিতান্তই কুঁড়ে এবং অপদার্থ। কোনো কাজে তার সাহায্য পাওয়া যায় না। দিনকাল পত্রিকার কাজে তাকে জুড়ে দেবার অনেক চেষ্টা করা হলো, সে কিছুতেই মন লাগালো না, দুএকটা লেখা দিয়ে এখন একেবারে সরে পড়েছে। হোটেল ম্যানেজমেন্টের ভারও দিতে চাওয়া হয়েছিল তাকে, সে নেয়নি। নিজের ভবিষ্যৎ বা দেশের ভবিষ্যৎ কোনো কিছু সম্পর্কেই যেন বাবুলের মাথাব্যথা নেই।

বাবুল আলতাফকে একপাশে নিয়ে গিয়ে সংক্ষেপে সিরাজুলদের বৃত্তান্তটি জানালো। সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি হলো না আলতাফের। এই পরিবারের দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে সে বললো, অরা থাকুক এখানে। একটা ঘর খালি কইরা দে। আমাকে আইজই

করাচী যেতে হবে, এগারোটার ফ্লাইট, আমি ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে ওদের জন্য কোনো কাজকর্ম জোটানো যায় কিনা!

তারপর সে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, কী নাম বললি? ইরফান আলী। ইনসেকটিসাইড, ফার্টিলাইজারের ব্যবসা করে? বেসিক ডেমোক্র্যাট?

সিরাজুল মাথা নেড়ে বললো, জী!

আলতাফ বললো, সে লোকটারে তো আমি চিনি। আমাদের হোটেলে এসে রেগুলার ওঠে। সে এমন অমানুষ নাকি?

বাবুল বললো, আমি নিজের চোখেই তার বাঁদরামির খানিকটা নমুনা দেখেছি।

আলতাফ বললো, আমি ফিরে আসি, তারপর আমাদের কাগজে ওরে টাইট দেবো। ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্টিং করে ওর বাপের নাম ভুলাবো।

মনিরার চোখে চোখ রেখে আলতাফ আশ্বাস দিয়ে বললো, ভয় নাই, আমরা তো আছি। এখন আমার হাতে সময় নাই, পরে আলাপ করবো। কেমন?

বাবুল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আলতাফ দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। আলতাফ ওপরে উঠে যেতেই সে একতলার পেছন দিকের একটা ভাঁড়ার ঘর খালি করতে লেগে গেল। প্রচুর ধুলো ও মাকড়সার জাল, শৌখিন স্বভাবের বাবুল, সেই ধুলোজাল মাখতে দ্বিধা করলো না। একটা কিছু কাজ সে করছে, এই অনুভূতি তার মন থেকে কিছুক্ষণ আগের বিরাগ ভাবটা মুছে দিতে লাগলো। এর আগে বাড়ির কোনো দেয়ালে নিজের হাতে একটা পেরেকও পোঁতেনি সে।

একটা পুরোনো আলমারির মাথায় নানান আকারের অনেকগুলি কাঁচ রাখা ছিল, কে কবে কোন্ উদ্দেশ্যে ওখানে ঐ কাঁচগুলি রেখেছে তা বাবুল জানে না। আলমারিটি ঠেলে ঘরের

বার করে দিতে গিয়ে সেই কাঁচ কয়েকটা খসে পড়ে গেল, তাতে এমন ঝন্ ঝন্ শব্দ হলো যাতে গোটা বাড়ির বাসিন্দারা সচকিত হবেই।

সেই শব্দে বাবুলেরও চড়াৎ করে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আলতাফের সম্মতি পেয়েই সে অতি উৎসাহে সিরাজুলদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু মঞ্জুকে এখনো কিছু জানায়নি। এটা স্পষ্টতই মঞ্জুর প্রতি অবহেলা।

হাত মুছতে মুছতে সে সিরাজুলকে বললো, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি উপর থেকে আসছি।

বেরিয়েই সে দেখলো সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জু। একটা কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরা। তার একটু পেছনে সুখু মিঞাকে কোলে নিয়ে আছে মনিরা। মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, কী ভাঙলো?

বাবুল বললো, এমন কিছু না, কয়েকটা পুরোনো কাঁচ। আর শোনো, ইসে মানে, এই এরা এসে পড়েছে, এরা কয়েকদিন এখানে থাকবে।

মঞ্জু বললো, মনিরার কাছে সব শোনলাম। জানো, ঐ সিরাজুলের নাকি এখনও বুকে খুব ব্যথা হয়, ভালো করে সারে নাই, ওরে খাজুরের ডাল দিয়ে পিটায়েছিল, একবার ডাক্তার আশরাফ সাহেবের কাছে দেখাবার বন্দোবস্ত করো।

বাবুল ভেতরে ভেতরে বিরাট এক স্বস্তি বোধ করলো। তাকে বিশেষ ব্যাখ্যা করতে হলো, আলতাফের মতনই মঞ্জুও এই নবাগতদের এক কথায় মেনে নিয়েছে। চাপা অশান্তি সে একেবারে সহ্য করতে পারে না।

মঞ্জু আবার বললো, মামুন মামারে বলে ঐ শয়তান লোকটারে শাস্তি দেওন যায় না?

বাবুল একটু হাসলো। মঞ্জুর চোখে তার মামুনমামা এক মহা শক্তিমান পুরুষ। আসলে মামুনভাই একটি মাঝারি গোছের দৈনিকের সম্পাদক, দুর্বল ও মিনমিনে স্বভাবের মানুষ,

তার কতটুকু ক্ষমতা আছে? আলতাফও আস্ফালন করে গেল, কিন্তু ঐ কাগজে সরকার পক্ষের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি সম্পর্কে কী, ছাপা হলো বা না হলো, তাতে কিছুই যায় আসে না।

সে বললো, মামুনমামা এলে তেনাকে বলে দেখো!

সিরাজুল-মনিরাকে এ গৃহে প্রতিষ্ঠার ভার মঞ্জুর ওপর সঁপে দিয়ে এক সময় আড্ডা দিতে বেরিয়ে পড়লো বাবুল। তার মনটা বেশ ভালো আছে, মঞ্জুর কাছে সে কৃতজ্ঞ বোধ করছে। মঞ্জু তো সত্যিই খুব ভালো, তার ওপর রাগ করার কোনো মানে হয় না।

বাবুল নিজে সাংবাদিকতা না করলেও সে তার বন্ধু জহিরের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে যায় প্রায়ই। এখন সেটা তার নেশা হয়ে গেছে। মোটামোটা বই পড়ে, তত্ত্ব মুখস্ত করে, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে সে অর্থনীতি শিখেছে, এখন গ্রামের মানুষদের দেখে সে অনুভব করে যে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে স্বদেশের মানুষকে চেনা যায় না।

পল্টনদের বাসায় ঢোকার রাস্তায় কামালের সঙ্গে দেখা। যুদ্ধের মধ্যে সে লাহোরে আটকা পড়ে গিয়েছিল, একটা ফিলমের শুটিংয়ের জন্য গিয়েছিল সে, তার জন্য দুশ্চিন্তা ছিল সকলের।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, তুই তাহলে বেঁচে আছিস?

কামালের মুখে এখন চাপ দাড়ি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। বেশ মোটা হয়েছে, তাকে দেখলে এখন কল্পনা করাই শক্ত যে ছাত্রজীবনে সে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে অনেক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে।

কামাল বললো, শহীদ হবার চান্সটা মিস করলাম। তোরা বোধহয় শুনেছিলি যে লাহোর শহর ইন্ডিয়ার হাতে চলে গেছিলো? সে সব কিছু না। লড়াই হয়েছে ইছোগিল খালের

আশেপাশে, ওরা অনেকখানি এগিয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু লাহোর শহরে একটাও গোলা পড়ে নাই।

বাবুল বললো, শহর দখল করলে শহরের লোকদের খাওয়াতে হতো।

কামাল বললো, অনেকে অবশ্য ভয়ে পালিয়েছিল...শোন বাবুল, ইসে, তুই আর একটা খবর শুনেছিস?

কী?

নীলা ভাবীর বোন দিলারা, তার হ্যাঁজব্যান্ড তো আর্মিতে ছিল, সেই ইউসুফ মারা গেছে, যুদ্ধের একেবারে শেষ দিনে, যুদ্ধ বিরতির মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।

বাবুল গম্ভীর ভাবে বললো, হ্যাঁ, এ খবর শুনেছি। এই যুদ্ধে আমাদের চেনাশুনাদের মধ্যে ইউসুফই একমাত্র ভিকটিম। গ্রেট ট্রাজেডি, মাত্র আড়াই বছর আগে বিয়ে হয়েছিল, ওরকম ইউথফুল এনারজেটিক ছেলে...।

-দিলারা লাহোরে গিয়েছিল বডি আইডেন্টিফাই করতে।

-জানি। দিলারা কিছুতেই বিশ্বাস করে নাই। তাকে কিছুতেই বুঝানো যায় নাই। জোর করে সে লাহোরে চলে গেল পল্টনের ছোট ভাইয়ের সাথে।

-সে সময় আমি ছিলাম লাহোরে। আমার সাথে ওদের দেখা হয়েছিল কিন্তু সে বডি একেবারে মিউটিলেটেড, আইডেন্টিফাই করার কোনো উপায় নাই, ঐ দিককার একজন লেফটেনান্ট কর্নেল আমাদের খুব সাহায্য করেছিল, সমস্ত প্রমাণ পত্তর দেখিয়েছিল, দিলারা অবশ্য তাতে কনভিন্সড হয় নাই, তার কান্না থামানোর জন্য সেই লেফটেনান্ট কর্নেল নিজের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেল সকলকে। আমাকেও নিয়ে গেল, আমাকে তার বেশ পছন্দ হয়েছিল, আমাকে প্রথম দেখেই সে কী বলেছিল জানিস? “আপ বাঙালী হোনেসে কেয়া হ্যায়, আপকো তো সাচ্চা মুসলমান মালুম হোতা হ্যায়।”

দাড়ি চুমড়ে হেসে ফেললো কামাল। বাবুল হাসতে পারে না, দিলারার মুখোনি মনে পড়ে তার। কলকাতার মেয়ে, তার মুখে সপ্রতিভ ছাপ, অনেক বইপত্র পড়েছে সে, তার দুলাভাই-এর বন্ধুদের সঙ্গে কখনো কখনো তর্ক করতেও সে দ্বিধা করেনি। এই মেয়েটির একটি সুন্দর জীবন প্রাপ্য ছিল।

পল্টনের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কামাল বললো, ভিতরে গিয়ে তুই আরও দু একটা নতুন খবর শুনবি। তার আগে তোকে ব্যাক গ্রাউন্ডটা বলে দিই। ওয়েস্ট পাকিস্তানের সেই সহৃদয় লেফটেনান্ট কর্নেলের নাম মীর মহম্মদ খান। বেশ সরল, ধর্মপ্রাণ, জেদী ধরনের মানুষ, বাঙালীদের সম্পর্কে তার মনে বেশ খানিকটা অবিশ্বাসের ভাব আছে, আবার কিছুটা অনুকম্পাও আছে। না হলে দিলারার অমন কান্নাকাটি শুনে তার এত দয়া হবে কেন? নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে তার আব্বা-আম্মার সাথে পরিচয় করায়ে দিয়েছে, আমাদের তিনদিন ধরে খাইয়েছে। আর জানিস তো, মায়েরা সব দেশেই এক, ঐ কর্নেল সাহেবের মা দিলারাকে নিজের কন্যার মতন স্নেহ করেছেন। পরিবারটি সত্যিই ভালো। আমি ওদের খুশি করবার জন্য দৈনিক সব নামাজ পড়েছি, উর্দু সিনেমা দেখে যতখানি উর্দু শিখেছি, তার সবটা ফলিয়ে কথা বার্তা বলেছি উর্দুতে, আমার বাবা যে একজন মৌলবী তাও জানিয়েছি।

বাবুল ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, এসব কিসের ব্যাকগ্রাউন্ড?

কামাল মৃদু হেসে বললো, দিলারাকে ওরা এত যত্ন করেছে, তার কান্না থামিয়ে সুস্থ করেছে, এইজন্য অনেক ধন্যবাদ ওদের প্রাপ্য। ঠিক কিনা? কিন্তু তারপর...

পল্টন দরজা খুলে দিল এই সময়। তার মুখ থমথমে। কোঁচকানো ভুরুটা ওদের দেখে খানিকটা সোজা করে সে বললো, আয়।

বাবুল কিছুই বুঝতে পারলো না। পল্টন রঙ্গরস প্রিয় মানুষ, বন্ধুদের দেখে সে হাসলো না পর্যন্ত। বাড়িতে আবার কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে?

অন্দরমহলে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ! দুতিনজন মহিলা যেন একসঙ্গে কাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

বাবুল জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে?

পল্টন কামালের দিকে তাকিয়ে বললো, এই কামালটাই তো যত নষ্টের গোড়া।

কামাল চোখ বড় বড় করে বললো, আরে, আমি কী করলাম?

পল্টন ধমক দিয়ে বললো, তুই কেন দিলারাকে সাথে নিয়ে এলি না? লাহোরে রেখে এলি কেন?

-বাঃ, আমি কী করতে পারতাম। মীর মহম্মদের মা দিলারাকে আরও কয়েকটা দিন রেখে দেবার জন্য পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন, দিলারাও দেখলাম অরাজি না, আমি কি তারে জোর করে নিয়া আসতে পারি? সে তো ওখানে ভালোই ছিল!

পল্টন নিচু গলায় বললো, সেই মীর মহম্মদ এখন ঢাকায়। গতকাল সে আমাদের বাসায় এসেছিল, আজ সকালেও এসেছিল।

কামাল বললো, সে রোজই আসবে।

পল্টন বললো, সে কী প্রস্তাব দিয়েছে জানিস? সে দিলারাকে শাদী করতে চায়। লোকটার প্রথম বউ মরেছে দুবছর আগে।

কামাল বললো, আমি জানতাম এ রকম হবেই। আমরা সিনেমার গল্প লিখি তো, তখন দেখেই বুঝেছিলাম।

পল্টন আবার তাকে ধমক দিয়ে বললো, তুই চুপ কর। এখন কী করা যায়, বল তো বাবুল?

–দিলারার কী মত? এত তাড়াতাড়ি ইউসুফের সাথে তার সুন্দর সম্পর্ক ছিল।

–ততটা সুন্দর ছিল না বোধ হয়। বাইরের থেকে বোঝা যায় না। ইউসুফের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সে অত কান্নাকাটি করেছিল, কিন্তু এখন মীর মহম্মদের প্রস্তাবে সে অরাজি নয়...মেয়েমানুষের চরিত্র বোঝা দায়...আসলে মীর মহম্মদের মাকে নাকি তার খুব পছন্দ হয়েছে।

তিন বন্ধু কথা বলছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, এক সময় দিলারা ছুটে এলো ভেতর থেকে, তার চুল এলোমেলো, তার পোশাক আলুথালু দুই গালে কান্নার রেখা, সে বাবুলদের দেখলো না, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

বাবুল ধীর স্বরে বললো, ও যদি রাজি থাকে, তাহলে আর আপত্তির কী আছে? বিধবা হয়ে শুধু শুধু কষ্ট, পাওয়া...ওর যখন কোনো বাচ্চা কাচ্চা নাই...।

পল্টন বললো, নীলার একেবারে পছন্দ নয়। আর কিছুদিন বাদে এখানকারই কোনো ভালো ছেলের সঙ্গে দিলারার আবার বিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের সংসারে একটা পশ্চিম পাস্তিানী এসে ঢুকবে?।

কামাল বাবুলের বুকে হাত রেখে বললো, সেটা যেমনভাবেই তোক আটকাতেই হবে। ভারতের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবারে আমাদের আসল লড়াই হবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে। লাহোরে থাকতে থাকতেই আমি সেটা বুঝে গেছি। আমাদের মেয়েদের ওরা পছন্দ করতে পারে বটে, বাঙালী পুরুষদের ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না।

পল্টন বললো, তুই একটু চেষ্টা করে দ্যাখ। তুই বুঝিয়ে বললে...

বাবুল বললল, আমি কী করতে পারি? আমার কথা শুনবে কেন?

পল্টন বললো, তোর কথা শুনবে। তোর ওপর দিলারার দুর্বলতা ছিল, তোকে এখনও খুব পছন্দ করে, তুই যদি একটু ভালো করে বলিস, অন্তত একটু প্রেমের ভান করিস...

মুখটা কুঁকড়ে গেল বাবুলের। মাটির দিকে তাকিয়ে সে ক্লিষ্ট গলায় বললো, ওভাবে বলিস না, ওভাবে বলিস না...

৩৬ স্টাডি সার্কল থেকে

স্টাডি সার্কল থেকে একটি ছোট দল যাবে বর্ধমানের মেমারিতে, থাকার ব্যবস্থা পমপমদের বাড়িতে, তবে সেই জায়গাটি কেন্দ্র করে ঘোরা হবে আরও কয়েকটি গ্রামে।

অতীন তো যাবেই এবং সে ধরেই নিয়েছে অলি যাবে না, অলিকে সে কিছু জিজ্ঞেসও করেনি। তা ছাড়া ক্রিসমাসের ছুটিতে বিমানবিহারী সপরিবারে প্রতি বছরই কৃষ্ণনগরের বাড়িতে যান, এবারেও যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে, অলিই বরং অতীনকে বললো, বাবলুদা, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে?

অতীন ভুরু কুঁচকে বললো তোর বাবা-মায়ের সঙ্গে আমি কৃষ্ণনগরে গিয়ে কী করবো? খোকা সেজে সরপুরিয়া-সর ভাজা খাবো? আমি তো এই শনিবার বর্ধমান যাচ্ছি, ওখানে আমাদের স্টাডি সার্কলের প্রোগ্রাম আছে।

এবারে অলির ভুরু কোঁচকানর পালা। নিয়মিত প্রতি বৈঠকে না গেলেও অলি এখন স্টাডি সার্কলের সদস্যা, সে চাঁদা দেয়।

অলি বললো, বর্ধমানে স্টাডি সার্কলের প্রোগ্রাম হচ্ছে? সে কথা আমাকে জানানো হয়নি কেন?

তিনতলায় অলির পড়ার ঘরে অতীন চেয়ারে বসে সামনের টেবিলে দুটো পা তুলে দিয়েছে, সে এরকম দ-এর ভঙ্গিতে বসতে ভালোবাসে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, মাত্র

কিছুদিন হলো সে এই ঘরে সিগারেট টানার প্রশ্রয় পেয়েছে। ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ার বিশ্রী গন্ধ হয়ে যায়, অনেকক্ষণ সেই গন্ধটা থাকে, সেই জন্য অলি প্রথম প্রথম আপত্তি করতো। কিন্তু তা হলে অতীনকে দশ মিনিটের বেশি আটকে রাখা যায় না। সে ঝড়ের বেগে আসতো, অলির সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে বলতেই সে হঠাৎ পকেট চাপড়ে বলে উঠতো, ও, তোর এখানে তো সিগারেট টানা যাবে না, তা হলে আমি এখন চলি! সুতরাং বাধ্য হয়েই অলিকে সম্মতি দিতে হয়েছে।

অতীন বললো, সবাই তো যাচ্ছে না, ছোট একটা গ্রুপ, সবাই মিলে গেলে ওখানে থাকার অসুবিধে আছে।

–আমি বুঝি সেই ছোট গ্রুপের মধ্যে থাকতে পারি না?

–কেন পারবি না? তোর যদি যেতে ইচ্ছে করে তো চল!

–কে কে যাচ্ছে?

–কৌশিক, অনুপম, অরুণ, প্রীতিময়, শুভানন আর আমি। মানিকদা দু'দিন পরে জয়েন করবেন।

–পমপম যাচ্ছে না?

–পমপম তো যাবেই, ওদেরই বাড়ি, পমপম না গেলে আমাদের কে চিনবে?

–তা হলে আমিও যাবো। বাবলুদা, তুমি আমার মাকে একটু বলো,মা রাজি হলেই বাবা আর আপত্তি করবেন না।

–ওসব আমার দ্বারা হবে না ভাই। তোর মাকে বাবাকে আমি কিছু বলতে পারবো না। তুই কি কচি খুকী নাকি, অলি? নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ।

–শুধু আমি বললে মা বাবা আমাকে একটা অচেনা জায়গায় যেতে দেবে?

-যেতে না দিলে যাবি না! তোর হয়ে আমি ওকালতি করতে পারবো না, আই অ্যাম স্যরি, সেদিন সেই রাত্তিরের পর...

অতীন টেবিল থেকে পা দুটি নামিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো, সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে দিল জানলা দিয়ে। সে বিদায় নেবার জন্য উদ্যত।

মাস কয়েক আগে একদিন স্টাডি সার্কল থেকে ফেরার পথে হঠাৎ হাঙ্গামা ও কারফিউতে ওরা দু'জন আটকে পড়েছিল, বাড়ি ফিরতে পারেনি। বাড়িতে কোনো খবর না জানিয়ে সারা রাত বাইরে কাটালে যতখানি নাটকীয় ব্যাপার হতো, ততটা হয়নি অবশ্য। যে গাড়ি বারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল, সেই বাড়ির সহৃদয় মালিক দরজা খুলে ওদের ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রে স্ট্রিটে সাত রাউন্ড গুলি চলেছে। রাত এগারোটার পর অবস্থা কিছুটা শান্ত হলেও সারা রাতের জন্য কারফিউ জারি হয়ে গেছে, ওদের পক্ষে দক্ষিণ কলকাতায় ফেরা সম্ভব নয়। প্রথম দিকের উত্তেজনা খানিকটা স্তিমিত হয়ে গেলে অলি তার মা বাবার চিন্তায় দারুণ মুষড়ে পড়েছিল। তাদের পরিবারে একটি কুমারী মেয়ের সারা রাত বাড়ি না-ফেরা একেবারে অকল্পনীয় ব্যাপার। একমাত্র উপায় টেলিফোনে খবর দেওয়া কিন্তু সে বাড়ির টেলিফোনটি খারাপ। পাশের বাড়িতে টেলিফোন ছিল, কিন্তু তারা কেউ সাড়া শব্দ দিচ্ছিল না। অতীন ছাদের পাঁচিল টপকে গিয়ে সে বাড়ির লোকজনদের ডেকে তোলে কিংবা তাদের মটকা ঘুম থেকে জাগায়। টেলিফোনের লাইন পাওয়া গেল, কিন্তু শুধু অতীনের কথা শুনে অলির মা কল্যাণী শান্ত হননি। তিনি অলির কণ্ঠস্বর শুনতে চেয়েছিলেন। তখন অলিকে আনার ব্যবস্থা করা হলো। তাতেও মিটলো না।

রাত দুটোর সময় পুলিসের গাড়ি চেপে মেয়েকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন বিমানবিহারী। সরকারি মহলে তাঁর অনেক চেনা-শুনো, গভীর রাতে হোম সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি পুলিসী সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। শান্তিনিকেতন এবং কৃষ্ণনগরের লোকদের হাতেই তো অধিকাংশ সরকারি ক্ষমতা।

সেদিনের ঘটনায় দুটি কারণে অতীন ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কলকাতা শহরে হঠাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধা কিংবা কারফিউ জারি হওয়ার জন্য তো অতীন দায়ী নয়। অলিকেও সে জোর করে স্টাডি সার্কলে নিয়ে আসেনি। তবু অলির মা বেশ কিছুদিন অতীনকে দেখেই মুখ গোমড়া করেছেন। কথা বন্ধ করেননি, অতীনের নামে কোনো অভিযোগ করেননি, কিন্তু তাঁর শুষ্ক ভাবটা অতীনের চোখ এড়ায়নি। তা দেখে অতীন ভেবেছিল, সে আর জীবনে কোনোদিন এ বাড়িতে আসবে না। কিন্তু অলি কান্নাকাটি করে। বিমানবিহারী নিজে একদিন এলগিন রোডের সামনে অতীনকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বলেছিলেন, এই বাবলু, তুই আমাদের বাড়ি অনেকদিন আসিসনি কেন রে? কী হয়েছে তোর?

অতীনের দ্বিতীয় ক্ষোভের কারণ, সে রাতে বিমানবিহারী তাকে জোর করে পুলিসের গাড়িতে ফিরতে বাধ্য করেছিলেন। পুলিসের ওপর অতীনের জাতক্রোধ জন্মে গেছে, গোর্কির লেখা পড়ে সে বুঝেছে যে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় পুলিস বাহিনী হলো স্রেফ বড়লোকদের দারোয়ান। এরা কক্ষনো শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ দেখে না। সেই পুলিসের সাহায্য নেবে অতীন? সে রাজি হয়নি, সে চেয়েছিল, বিমানবিহারী নিজের মেয়েকে নিয়ে চলে যান, সে ঐ গাড়িবারান্দাওয়ালা বাড়িটাতেই রাতটা কাটিয়ে যাবে। কিন্তু বিমানবিহারী তাতে রাজি হননি কিছুতেই, তিনি তো শুধু অলিকে নিতে আসেননি, অতীনও তো তাঁর সন্তানের মতন!

অতীন ভেবেছিল, তার এই পুলিসের গাড়িতে ফেরার ব্যাপারটা শুনে স্টাডি সার্কলের বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করবে; কৌশিককে সে অনুরোধ করেছিল খবরটা যেন মানিকদার কানে না পৌঁছোয়, কিন্তু মানিকদা ঠিকই জেনেছেন, পুলিসের উঁচু মহলে মানিকদার কয়েকজন বন্ধু। আছে, তাদের কাছ থেকেই সম্ভবত জেনেছেন, কিন্তু কিছু উচ্চ বাচ্য করেননি।

অলি উঠে এসে অতীনের জামার একটা বোতাম ধরে গাঢ় গলায় বললো, বাবলুদা, আমি তোমাদের সঙ্গে যাবে বর্ধমানে!

অতীন নিস্পৃহভাবে বললো, সে জন্য তোকে নিজেই ব্যবস্থা করতে হবে। দ্যাখ যদি তোর বাপ-মাকে বোঝাতে পারিস।

অত কাছে পেয়েও সে অলিকে বুকে টেনে নিল না, টপ করে একটা চুমু খাবার চেষ্টাও করলো না, অলির মিনতিময় চক্ষুদুটি অগ্রাহ্য করে সে বেরিয়ে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে গুন গুন করে সুর ভাজতে লাগলো পর্যন্ত।

অলিরও জেদ আছে। সে বর্ধমানে যাবেই। মায়ের কাছে এমনি এমনি বললে সে অনুমতি পাবে না, তাই সে পমপমকে ধরলো, তাকে একদিন ডেকে নিয়ে এলো বাড়িতে। মা ও বাবার সঙ্গে পমপমের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, পমপমকে তাঁদের অপছন্দ করার কোনো কারণ নেই। পমপমের চেহারা ও ব্যবহারে একটি সচ্ছল পরিবারের পালিশ আছে। দু'দিন বাদে পমপম আবার এসে অলির মায়ের কাছে প্রস্তাবটি জানালো, সে অলিকে তাদের বর্ধমানের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। কল্যাণী সরাসরি আবেদনটি অগ্রাহ্য করলেন না, রাজিও হলেন না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন যে তাঁদের কৃষ্ণনগরে যাওয়া সব ঠিকঠাক হয়ে আছে, তাঁর শাশুড়ি অর্থাৎ অলির ঠাকুমা এখন সেখানে আছেন, তিনি আর কতদিন বাঁচবেন তার ঠিক নেই, তিনি অলিকে না দেখলে দুঃখ পাবেন!

পমপম তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারিণী মেয়ে। মানুষকে যুক্তি দিয়ে জব্দ করার শিল্প সে যত্ন করে আয়ত্ত করেছে। সে নিরীহ মুখ করে কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, মাসিমা, আপনি বিয়ের আগে...আপনার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ছাড়া কখনো আপনার বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেছেন?

কল্যাণী বললেন, আমাদের সময় এসব ছিল নাকি? বাড়ি থেকে এক পা বেরুতে দেওয়া হতো না। বড় বয়েস পর্যন্ত ইস্কুলে গেছি, বাড়ির খুব কাছেই ইস্কুল, তবু বাড়ির দারোয়ান পৌঁছে দিয়ে আসতো, নিয়ে আসতো! আমার বাবা...তিনি কি এই অলির বাবার মতন নাকি? কী প্রচণ্ড ভয় পেতুম বাবাকে, চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস ছিল না...

পমপম বললো, কিন্তু আপনার কখনো ইচ্ছে করতো না, বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যেতে, দেওঘর-মধুপুর, কিংবা সারা দিন বোটানিকসে বা চিড়িয়াখানায়...সত্যি করে বলুন, ইচ্ছে করতো না?

কল্যাণী পমপমের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না।

পমপম দৃষ্টি না সরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, সত্যি করে বলুন, ইচ্ছে করতো না?

--ওরে বাবারে, ওসব ভাবলেও ভয় হতো। বাবার কাছে এসব কথা বলার সাহসই হতো না।

-আপনি ভয়ে আপনার বাবাকে বলতে পারেননি, কিন্তু মনে মনে আপনার ইচ্ছে হতো কি। সেটা বলুন? কল্যাণী আবার চুপ করে গেলেন।

পমপম বললো, তার মানে আপনার ইচ্ছে হতো ঠিকই। আপনি আপনার নিজের যেসব ইচ্ছে ফুলফিল করতে পারেননি, আপনার মেয়েকে সেই সব সুযোগ দেওয়া...মেয়েকে সেই স্বাধীনতা যদি না দেন তা হলে বুঝতে হবে আপনি আপনার সেই ইচ্ছেগুলোকেই অপমান করছেন!

কল্যাণী বললেন, অন্য সময় গেলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু, ঐ যে বললুম, কৃষ্ণনগরে মা অলিকে না দেখলে দুঃখ পাবেন, তিনি আশা করে আছেন।

পমপম সঙ্গে সঙ্গে বললো, তা হলে নীতিগতভাবে আমার সঙ্গে অলিকে যেতে দিতে আপনার আপত্তি নেই? ঠিক আছে, অলি আমার সঙ্গে বর্ধমান চলুক, কয়েকদিন বাদে আমি নিজে ওকে কৃষ্ণনগরে পৌঁছে দিয়ে আসবো। আমাদের ওদিক থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত বাস আছে। কাটোয়া লাইনে ট্রেনেও নবদ্বীপ যাওয়া যায়, আর নবদ্বীপ থেকে গঙ্গা পেরুলেই তো কৃষ্ণনগর। আমারও দেখে আসা হবে আপনাদের কৃষ্ণনগরের বাড়িটা!

বিমানবিহারীও আপত্তি করলেন না। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পমপমদের গ্রামের বাড়ির খবরাখবর নিলেন, তারপর বললেন, বেশ তো, তোমরা দু'জনে বর্ধমান ঘুরে তারপর কৃষ্ণনগরে চলে এসো!

অনুমতি পাওয়া গেল বটে, তবু অলির মনের মধ্যে রয়ে গেল একটা কাঁটার খচখচানি। মা, বাবা কারুকেই জানানো হলো না যে তাদের সঙ্গে বাবলুদাও যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে আর কে কে যাবে সে প্রসঙ্গই তোলেনি পমপম। বাবলুদার সঙ্গে যাওয়াটা তো গোপন করার মতন কিছু ব্যাপার নয়। পরে এটা জানতে পারলে মা, বাবা দুঃখিত ও আহত হবেন। তাঁরা ভাবতেই পারেন যে বাবলুও যখন বর্ধমানে যাবে, তখন সে নিজে এসে কল্যাণী বা বিমানবিহারীর কাছে সে কথা বলে গেল না কেন? সত্যিই তো, বাবলুদার তো বলা উচিত ছিলই, কিন্তু অদ্ভুত সেই ছেলে, সে সেই যে একবার ঘাড় বেঁকা করেছে, আর কিছুতেই সোজা করবে না, সে বর্ধমান যাওয়ার ব্যাপারে অলির কোনো দায়িত্ব নিতে রাজি নয়।

অলি যাচ্ছে শুনে সুস্মিতা নামে আর একটি মেয়েও জুটে পড়লো, মূল দলটি থেকে বাদ পড়লো প্রীতিময়, কারণ তার মা অসুস্থ। ট্রেন হাওড়া ছাড়ার পর অলি সত্যিকারের একটা মুক্তির স্বাদ পেল। বাড়ির গাড়ি চেপে সে বাইরে অনেক ঘোরাঘুরি করেছে, ট্রেনেও গেছে পুরী আর বেনারস, কিন্তু এইভাবে, শুধু সমবয়েসীদের সঙ্গে দল বেঁধে কোথাও যাওয়ায় অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। এর অন্য আনন্দ।

ওরা চেপেছে দুপুরবেলার লোকাল ট্রেনে, কামরা বেশ ফাঁকা, জানলা দিয়ে এসে পড়েছে শীতের রোদ। অতীন বসেছে খানিকটা দূরে, কৌশিকের সঙ্গে খুব মন দিয়ে কী যেন আলোচনা করে যাচ্ছে। অলির সঙ্গে চোখাচোখি হলে তাতে যেন ফুটে উঠছে একটা রাগ রাগ ভাব, যেন অলির আসাটা তার ঠিক পছন্দ হয়নি। অলির এক একবার সন্দেহ হয়, বাবলুদা কি তাহলে তাকে ভালোবাসে না? অথচ, অলির গানের মাস্টার, তার ইংরিজির স্যার, এদের ঘোরতর অপছন্দ করতো বাবলুদা, তার কথাতেই ওদের বিদায় করা হয়েছে, অন্য কারুর সঙ্গে অলির সামান্য ঘনিষ্ঠতাও সে সহ্য করতে পারে না।

অনুপম ভালো গান করে। কয়েক স্টেশান পর কামরা আর একটু জনবিরল হলে সে উচ্চ কণ্ঠে গান ধরলো। প্রথমেই ইন্টার ন্যাশনাল, অ্যারাইজ ও প্রিজনার অফ স্টারভেশান, অ্যারাইজ ও রেচেড অফ দা আর্থ...

অন্যরাও গলা মেলালো। শেষ হতেই অরুণ বললো, এর নজরুলের অনুবাদটা জানিস! 'জাগো, জাগো, সর্বহারা...'

অনুপম এর পর গাইলো, উই শ্যাল ওভারকাম, উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে...

অতীনের সঙ্গে কথা থামিয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, অনুপম, তুই পুরোনো আই পি টি এর গান জানিস না?

অনুপম মাথা নেড়ে বললো, আমার বাংলা গানের স্টক খুব কম, ছোট বেলায় মুঙ্গেরে ছিলাম তো...

কৌশিক বললো, আমার দাদার কাছে কিছু ঐ সময়কার গান শুনেছি। আমার সেগুলো দারুণ লাগে, আমি চেষ্টা করছি :

...আমার ভিটেয় চড়লো ঘুঘু
ডিম দিল তোমাকে
সেই আজব ডিমের আজব শিশু
খাস দিল্লিতে থাকে
শুন শিশুর পরিচয়
যেমন তেমন নয়কো শিশু মস্ত মহাশয়
ওগো শুন শিশুর পরিচয়
হিটলার তাহার জ্যাঠা ছিল
মুসোলিনী মেসো- ও- ও

আর মার্কিন দেশের মার্শাল মাসি
পাঠায় খেলনা ডলার ঝুম ঝুম
নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক ডুমাডুম ডুম
আর জান দিয়ে জানোয়ার পেলাম
লাগলো দেশে ধূম...

অতীনের গলায় সুর নেই, সে গান গাইতে পারে না। কিন্তু এই গান শুনে সে মুগ্ধ এবং অবাক। কৌশিক তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু কৌশিক যে এইরকম গান গাইতে পারে সে সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। সে বললো, দারুণ তো, আবার গা তো কৌশিক, গানটা তুলে নিই...

কৌশিক প্রথম দু'লাইন দু'তিনবার গাইলো, কিন্তু অতীনের গলায় তা উঠতে চায় না। অনুপম বাধা দিয়ে বললো, এই গানের ক্লাস এখন থাক। মেমারিতে গিয়ে তুই অতীনকে আলাদা শিখিয়ে দিস। অন্য গান হোক। আর কে কে গান জানে?

সুস্মিতা বললো, অলি নিশ্চয়ই গান জানে। অলিকে দেখেই মনে হয়। অন্যরা অনেক পিড়াপিড়ি করলেও অলি মুখ খুলতে চাইলো না, সে কখনো এমনভাবে খোলা গলায় গান করেনি। অতীন এক সময় বললো, থাক, ওকে জোর করিস না। ও প্যানপ্যানানি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কিছু গাইতে জানে না।

অনুপম ও অন্য দু'একজন হই হই করে অতীনের কথায় আপত্তি জানালো। তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করে, তারা রবীন্দ্রসঙ্গীতই শুনতে চায়। শুভানন বললো, দেবব্রতর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে আমার মনটা এমন আনচান করে...অলি, তুমি এই গানটা জানেনা, এ শুধু অলস মায়া...

ট্রেন একটা স্টেশানে থেমেছে। বাথরুমের দেয়ালের গায়ে একটি বিরাট পোস্টার, অশোক সেনগুপ্তর নামে। সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি পড়লো। অতীন জিজ্ঞেস করলো, পমপম, তোর। বাবা সামনের ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছেন বুঝি?

পমপম বললো, খুব সম্ভবত। কোঙারকাকু এসে খুব বোঝাচ্ছেন ক'দিন ধরে...

অরুণ বললো, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিরাট মার্কসিস্ট তাত্ত্বিক, তিনিও পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসির লাইন নিয়েছেন এখন। মানিকদা নাকি ওঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলেন। এখন ওঁদের বিপ্লব টিপ্লবের চিন্তা চুলোয় গেছে। " অনুপম বললো, এই লাইনটাকে তোরা অ্যান্টি মার্কসিস্ট ভাবছিস কেন? একটা স্টেট মেশিনারি দখল করার জন্য যে-কোনো পথ নেওয়া যায়...

অরুণ অবজ্ঞার সুরে বললো, স্টেট মেশিনারি দখল, হেঃ! দিল্লিতে ক্যাপিটালিস্ট অর ন্যাশনালিস্ট বুর্জোয়াজির যে ক্লিক আছে, সেটা ভেদ করে ইলেকশানের মাধ্যমে আগামী পঞ্চাশ বছরেও ক্ষমতা দখল করা যাবে তোরা মনে করিস?

অনুপম বললো, দিল্লিতে হয়তো সহজে ক্ষমতা দখল করা যাবে না। কিন্তু একটা একটা করে স্টেট যদি দখল করা যায়, যেরকম কেরালায় হয়েছিল, সেই রকমভাবে ওয়েস্টবেঙ্গলে, পাঞ্জাবে, আসামে...

অরুণ বললো, ওয়েস্টবেঙ্গলে? তুই খোয়াব দেখছিস অনুপম? অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেন গুষ্ঠীকে তোরা হঠাতে পারবি? জ্যোতিবাবু অপোজিশান পার্টির লিডার হিসেবে গরম গরম বক্তৃতা দিতে দিতেই বুড়ো হয়ে যাবেন!

অনুপম বললো, অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেন কি অমর?

-ওদের বদলে কংগ্রেসের সেকেন্ড র‍্যাংক উঠে আসবে। তারা এখনও কমন বাঙালীদের চিনিস না, এই বাঙালীরা সুভাষ বোসের নাম শুনলেই নেচে ওঠে। তুই রটিয়ে দে, সুভাষ বোস হিমালয়ের কোনো গুহায় সাধু সেজে বসে আছে, অমনি দেখবি সব বাঙালী বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে ধেই ধেই করে নাচছে!

-তবু এই বাঙালীরা ফরোয়ার্ড ব্লককে ভোট দেয় না।

–ফরোয়ার্ড ব্লকের অগানাইজেশান নেই সেরকম। কংগ্রেস সেই সেন্টিমেন্টটা এক্সপ্লয়েট করছে। দেখবি, প্রত্যেক ইলেকশানের আগে ওরা জনযুদ্ধের সেই ব্যাপারটা খুঁচিয়ে তোলে। সুভাষ বোস যদি বাই চান্স ফিরে আসে, তাহলে এরা ইন্দোনেশিয়ার প্যাটার্নে কমুনিস্টদের খুঁজে খুঁজে বার করে খুন করবে।

–সে গুড়ে বালি। সুভাষ বোস মরে ভূত হয়ে গেছে।

কৌশিক আর অতীনের দিকে সমর্থন চাওয়ার ভঙ্গিতে একবার তাকিয়ে অরুণ পমপমকে বললো, ওসব ইলেকশান ফিলেকশানের ধাপ্পাবাজিতে আমরা বিশ্বাস করি না। পমপম, আমরা যদি তোর বাবার এগেইনস্টে কখনো কাজ করি, তুই তা হলে কী করবি?

পমপম নির্বিকার মুখে বললো, আমায় যিনি জন্ম দিয়েছেন, সব ব্যাপারেই যে তাঁকে আমার সাপোর্ট করতে হবে, এমন মাথার দিব্যি আমায় কেউ দেয়নি!

অলির এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না। সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। শরকাল শেষ হয়ে গেছে কবে, তবু মাঠের ধারে জলা জায়গায় এখনও ফুটে আছে কত কাশ ফুল। পুকুরগুলোতে লাল ও সাদা রঙের শালুক। সদ্য ধান কাটা হয়েছে। এক জায়গায় খড়ের স্তূপে লুটোপুটি খাচ্ছে দু'তিনটে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে, কী মিষ্টি তাদের হাসি। এদিকে ওদের কারুর চোখ নেই কেন?

৩৭ তিনতলার এই ঘরখানি

তিনতলার এই ঘরখানি সদ্য তৈরি হয়েছে। দেয়ালে ধপধপে সাদা চুনকাম, জানলা-দরজায় টাটকা সবুজ রং, এখনো সেই রঙের গন্ধ যায়নি। এ ঘরে কেউ বসবাস শুরু করেনি, কয়েকটি এলোমেলো ছড়ানো চেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দিলারা, জানলার ওপাশের আকাশ আজ বেশ পরিষ্কার নীল। দু দিন ধরে ঢাকায় বেশ শীত পড়েছে। দিলারার অঙ্গে একটি হলুদ শাড়ি, তার ওপরে একটি কাশ্মীরী শাল জড়ানো। দীর্ঘাঙ্গী সে, নাকটি তীক্ষ্ণ, টানাটানা দুই চোখে আজ কোনো জলের চিহ্ন নেই।

একখানা দেয়াল-ঘেঁষা চেয়ারে বসে আছে বাবুল। সে চোখ তুলতেই দিলারার সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে দিলারা, সে জানে বাবুলকে কোন নিভৃত আলোচনায় পাঠানো হয়েছে।

বাবুল কথা শুরু করতে পারছে না, জড়তাশূন্য, পরিষ্কার কণ্ঠে দিলারাই বললো, আপনিও আমাকে নিষেধ করতে এসেছেন, তাই না বাবুল মিঞা?

কয়েক পলক দিলারার দিকে চেয়ে থেকে তারপর দুদিকে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বাবুল না জানালো।

ওষ্ঠে সামান্য হাসি ফুটয়ে দিলারা বললো, থ্যাঙ্ক ইউ। আমার ভরসা ছিল, আপনি পেটি প্যারোকিয়ালিজম নিয়ে মাথা ঘামান না।

প্যারোকিয়ালিজম কথাটা শুনে বাবুলের হঠাৎ পরকীয়া শব্দটা মনে পড়ে গেল। দিলারা কিছুদিন আগেও পরকীয়া ছিল, এখনও পরকীয়া হতে যাচ্ছে, এর মধ্যে বাবুল চৌধুরীর ভূমিকা কী থাকতে পারে? পল্টনদের যত সব পাগলামি। একটি শিক্ষিতা, প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে কি জোর করে আটকানো যায়? তবে, এটাও বিস্ময়ের যে দিলারার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে মাত্র দু' মাস আগে, এর মধ্যেই সে দ্বিতীয় বিবাহে সম্মত হয়েছে।

–মঞ্জু ভাবী আর আপনার ছেলে কেমন আছে?

–ভালো।

–ঢাকাতেই আছে?

বাবুল সামনের দিকে দু'বার মাথা ঝোঁকালো। হঠাৎ বেশ জোরে হেসে উঠে দিলারা বললো, বাবুলমিঞা, আপনি যে আমার সাথে এই ভাবে কথা বলতে এসেছেন, মঞ্জু ভাবীর পারমিশান। নিয়েছেন?

–কারুর সাথে কথা বলতে গ্যালেও বউয়ের পারমিশান নিতে হয় বুঝি? দু'পা এগিয়ে এসে মুখখানা একটুখানি নিচু করে দিলারা বললো, আপনার মনে আছে, আমরা অনেকে মিলে একবার নারায়ণগঞ্জে পিকনিক করতে গেছিলাম? আপনি তখন সবে মাত্র শাদী করেছেন। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই আপনি ভাবীর দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন আমার কথার উত্তর দিতে গেলে ভাবীর অনুমতির প্রয়োজন। আমি তো তখনও প্রায় কলকাতার মেয়ে ছিলাম, আমি জানতাম না যে ঢাকায় কোনো নিউলি ম্যারেড পুরুষের সাথে অন্য মেয়েদের কথা বলতেও নাই!

অনুযোগটি এমনই সত্য যে বাবুল প্রতিবাদ করতেও পারলো না। অন্য যে কোনো মেয়ের সঙ্গেই কথা বলতে গেলে মঞ্জুর অনুমতি নেবার প্রশ্ন ছিল না, মঞ্জুর মন সেরকম ঈষাপ্রবণ নয় মোটেই। কিন্তু তাদের বিয়ের ঠিক আগেই পল্টনরা অনেকে মিলে বলাবলি করতে শুরু করেছিল যে দিলারার সঙ্গে বাবুলের বিয়ে হলে তারা সবাই খুশী হতো, দিলারাও মনে মনে বাবুলকে খুব পছন্দ করে। বাবুল চেয়েছিল, সেই কথাটা যেন মঞ্জুর কানে না যায়, মঞ্জু শুনে ফেললে কি দিলারাকে পছন্দ করতে পারতো? নারায়ণগঞ্জের পিকনিকে সে যেতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের পর কয়েক বছর সে পারতপক্ষে পল্টনদের বাড়ির দিকও ঘেঁষেনি।

কথা ঘোরাবার জন্য বাবুল বললো, নিউলি ম্যারেড কাপলাররা পরস্পরের দিকে একটু বেশি তাকায়। সেটা কি অস্বাভাবিক?

দিলারা বললো, আপনার বিয়ের সময় আপনি আমাদের বাড়িশুদ্ধ সবাইকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, আমাকে আপনি নিজের থেকে তো কিছু বলেনইনি, আমার নামও দুলাভাইকে বলেন নাই। তারপর আর একবার, তখন আমারও বিয়ে হয়ে গেছে, পিকচার

প্যালেসে হঠাৎ দেখা, একেবারে সামনা-সামনি, আপনি মঞ্জু ভাবীকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মুখ ফিরায়ে নিলেন, যেন আমারে দেখতেই পান নাই, কিংবা দেখেও ভাবলেন, আমি একটা কথা বলার যোগ্য মানুষই না...

এই শীতের মধ্যেও বাবুলের কান দুটি উষ্ণ হয়ে এলো। দিলারা প্রত্যেকটি ঘটনা মনে রেখেছে, তার কণ্ঠস্বরে মর্মভেদী শ্লেষ। আগে সে তাকে বাবুলভাই বলতো, আজ বলছে বাবুলমিঞা। এই একটি বিষয়ে বাবুল নিজের অক্ষমতার কথা ভালো করেই জানে, সে মেয়েদের সঙ্গে কিছুতেই সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না, সে দিলারাকে প্রবোধ দেবার কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

দিলারা আবার জানলার কাছে চলে গেল। জানলার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, যে সময় আপনি আমার সাথে দুটা মিষ্টি কথা বললে, আমার দিকে একটু ফিরে চাইলে আমার প্রাণ নেচে উঠতো, সেই সময় আপনি আমার দিকে একবারও ফিরেও তাকান নাই। আজ আপনে এসেছেন আমাকে লাহোরে যেতে নিষেধ করতে। আমি লাহোরে না গিয়ে যদি ঢাকায় থাকি, তাতে আপনার কী আসে যায়, সত্যি করে বলেন তো?

বাবুল নিবার্ক, নত মস্তক।

কিছুক্ষণ এরপর ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা। বাবুল এখন পালাতে পারলে বাঁচে। নিজেকে তার জবাইয়ের পাঁঠা বলে মনে হচ্ছে। অথচ সে উঠে চলেও যেতে পারছে না। দু একবার আড় চোখে সে দেখছে দিলারাকে। তেজস্বিনী দিলারা হঠাৎ যেন বেশি সুন্দরী হয়ে উঠেছে।

একটু পরে কণ্ঠস্বর বদলে দিলারা জিজ্ঞেস করলো, আপনি লাহোরে গ্যাছেন কোনোদিন?

বাবুল বললো, না, আমার ওয়েস্ট পাকিস্তানে যাওয়া হয় নাই।

–একবার গিয়া নিজের চোখে দেখে আসেন। আপনারা তো ঘরে বসে বসেই সব কিছু বুঝে যান। ঢাকার তুলনায় লাহোরের সোসাইটি অনেক নর্মাল। হিপোক্রেসি নাই। তারা যা বিশ্বাস করে, জীবনেও তা মানে। আপনারা বলেন যে ওয়েস্ট পাকিস্তানীরা আমাদের এক্সপ্লয়েট করে। প্রত্যেক ওয়েস্ট পাকিস্তানীই কি তাই? সেখানে গরিব নাই? সেখানে একজনও সৎ মানুষ নাই?

এবারে কথা খুঁজে পেয়ে বাবুল বললো, না, না, আমি তা মনে করি না। কোনো দেশেরই জনসাধারণকে আমি দুশমন মনে করি না। অবশ্যই সেদিকে অনেক সৎ মানুষ আছে।

–আমার মা নাই। লাহোরের একজন মহিলার কাছ থেকে আমি মাতৃস্নেহের স্বাদ পেয়েছি অনেককাল পর। তিনি আমাকে পুত্রবধূ করে নিতে চান।

–আমার কোনো আপত্তি নাই, দিলারা।

–বহুৎ শুক্রিয়া, চৌধুরী সাহেব।

বাবুল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মাই কংগ্রাচুলেশা। আশা করি লাহোরের সেই মহিয়সী মহিলার পুত্রটিও তোমাকে খুশী করবে।

এমন শুষ্কভাবে শেষ কথা বলে চলে যাওয়া উচিত নয় ভেবে দরজার কাছে গিয়ে বাবুল আবার ফিরে তাকিয়ে বললো, ঢাকা থেকে একজন সুন্দরী মেয়ে কমে যাবে, সেইটুকুই যা আমাদের দুঃখ।

অদ্ভুত তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে দিলারা বললো, আমার হাজব্যাণ্ড ঢাকাতেই পোস্টিং নিচ্ছেন। কয় মাস পরে আমি ঢাকাতেই এসে থাকবো। কিন্তু তাতে কি আপনার কিছু যাবে আসবে? আমাদের বাড়িতে দাওয়াত দিলেও কি মঞ্জু ভাবী আপনাকে পারমিশান দেবে?

আর কোনো উত্তর না দিয়ে বাবুল ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো নিচে। পল্টনদের সঙ্গে দেখা না করে সে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কামাল ও জহির ছুটে এলো তাকে ধরবার জন্য, ততক্ষণে বাবুল মোড়ের মাথায় পৌঁছে গেছে।

কামাল জিজ্ঞেস করলো, কী হইলো? প্রথম প্রেমিকের কথা শুনে কি একটুও মন গললো দিলারা বেগমের।

বাবুলের এমনই মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে যে সে জোরের সঙ্গে কামালের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, কেন তোরা আমাকে এরকম বিরক্ত করিস? জানিস যে আমি এসব পছন্দ করি না!

জহির বললো, জানতাম, বাবুলের দ্বারা কিছু হবে না। বাবুল যে বেশি বেশি মরালিস্ট! ফাঁকা ঘরে পাঠানো হইলো, আমরা নিচে পাহারা দিতেছিলাম, কেউ ডিসটার্ব করতো না, বাবুল যদি দিলারাকে জড়িয়ে ধরে কয়েকটা চুমা টুমা খেতো।

বাবুলের ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেছে, সে ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো বন্ধুদের দিকে।

কামাল তার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললো, ছাড়ান দে ওসব কথা। যা হবার তা তো হবেই। নবাব-জমিদারদের দিন গ্যাছে, এখন তো সুন্দরী মেয়েরা আর্মি অফিসার আর বড় বড় ব্যবসায়ীদেরই ভোগে লাগবে। ওয়েস্ট পাকিস্তানীরা আমাদের এদিককার সোনাদানা, ফরেন এক্সচেঞ্জ সবই নিয়া ফাঁক কইরা দিল, সুন্দরী সুন্দরী মাইয়াগুলারেও নিয়া যাবে, এ আর বেশি কথা কী?

জহির বললো, বাদ দে, বাদ দে! চল বাবুল, এখন আমরা একখানে যাবো।

বাবুল বললো, এখন আমি বাড়ি যাবো।

কামাল বললো, বাড়ি তো যাবিই, তার আগে একটা জায়গায় ঘুরে যাই।

জাহির বললো, কাছেই, গোল্ডেন গুজ হোটেলে। একজনের সাথে তোর আলাপ করিয়ে দেবো। খুব জরুরী কথা আছে।

বাবুলের আপত্তি ওরা শুনলো না, প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে গেল।

সন্ধে হয়ে এসেছে, পথে অজস্র সাইকেল রিকশার জটলা। ওরাও দুটি সাইকেল রিকশা নিল। বিভিন্ন মসজিদ থেকে ভেসে আসছে মাগরেবের আজানের সুর। একটি সিনেমা হলের সামনে উর্দু সিনেমার লাইনে টিকিটের জন্য হঠাৎ মারামারি শুরু হয়ে গেছে।

নিউ মার্কেটের কাছেই গোল্ডেন গুজ হোটেল, মাঝারি ধরনের। কাউন্টারের ম্যানেজারটি কামালের চেনা, সে আদাব জানালো। ওরা উঠে এলো দোতলায়। একটি ঘরের দরজায় কামাল নির্দিষ্ট ছন্দে তিনটি করে তিনবার টোকা দিতে খুলে গেল দরজা। লাউঞ্জ শুট পরা একজন সুদর্শন যুবক দরজা খুলে হাসি মুখে বলল, ইউ আর লেইট।

ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দিল কামাল। তারপর বাবুলের দিকে হাত ছড়িয়ে দিয়ে বললো, আলাপ করায়ে দিই। ইনি বাবুল চৌধুরী, এর কথা তোমাকে বলেছিলাম, আর এই হচ্ছে সিরাজুল আলম খান, আমরা সবাই আলম বলে ডাকি, লণ্ডনে থাকে। আলম একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে আমাদের কয়েকজনের সাথে কথা বলতে।

আলম বললো, বসেন, আগে বসেন সবাই। চা কফি কিছু খাবেন, তাইলে আনতে বলি। যদিও দা টি দে আর সারভিং হিয়ার ইজ টেস্টলেস। আমরা লণ্ডনে অনেক ভালো চা খাই।

জহির বললো, না, বিকালে দুই তিন কাপ খেয়েছি, এখন দরকার নাই।

-অন্য কিছু ড্রিংকস নেবেন? সাম হার্ড ড্রিংকস, তাও আছে আমার কাছে।

--থাক, এখন থাক। তোমার সিগারেট দাও বরং।

বাবুল ধূমপানও করে না, অন্য তিনজন সিগারেট ধরালো। আলম বাবুলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি ইকোনমিক্স পড়ান? ইউ কে-তে আসেন নাই কখনো? আসেন একবার!

বাবুল শুকনো ভাবে বললো, হ্যাঁ, যাবো কোনো সময়ে।

–আপনার বড় ভাই একটা নিউজ পেপার চালান? আমরা আপনাগো সাপোর্ট চাই। আমরা সব পারটির কাছেও অ্যাপ্রোচ করতাছি।

–আমরা মানে?

জহির বললো, আমি বুঝয়ে বলি। আগে ব্যাকগ্রাউণ্ডটা জানা দরকার। বাবুল, তুই লণ্ডনের "উত্তর সূরি" গ্রুপের নাম শুনেছিস? আলম এসেছে সেই গ্রুপের পক্ষ থেকে।

আলম বললো, এখন "উত্তর সূরি" নামটা বিশেষ চালু নাই। এখন আমাদের গ্রুপের নাম 'ইস্ট পাকিস্তান হাউজ'। আমরা নর্থ লণ্ডনে হাইবেরি হিল-এ একটা বাড়ি কিনেছি, সেই বাড়ির নাম ইস্ট পাকিস্তান হাউজ। সেখান থেকে আমরা দুটো সাপ্তাহিক কাগজ বার করি, ইংরেজি আর বাংলায়, এশিয়ান টাইড' আর 'পূর্ব বাংলা'। সে বাড়িতে আমাদের মিটিং হয়, এক অংশে কিছু ছাত্রও থাকে।

দরজায় টক টক শব্দ হতেই আলম থেমে গেল। কামাল উঠে দরজা খুলে সামান্য ফাঁক করে কথা বললো যেন কার সঙ্গে। তারপর মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আলম, তোমার সাথে। দেখা করার জন্য কে যেন এসেছে নিচে।

আলমের মুখে সামান্য যেন আশঙ্কার ছায়া খেলে গেল। সে জিজ্ঞেস করলো, কে? নাম বলেছে কিছু?

কামাল বাইরের লোকটিকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়ে বললো, না, নাম বলে নাই।

আলম তার চিবুকটা নোখ দিয়ে চেপে ধরে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললো, আর কারুর তো আসার কথা নাই। কে আসবে? কামাল, তুমি একটু নিচে গিয়ে লোকটাকে দেখে আসবে?

কামাল দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে না ফেরা পর্যন্ত বাকি তিনজন একেবারে চুপ। আলম একটা সিগারেট শেষ হতে না হতেই ধরালো আর একটা।

কামাল ফিরে এসে হাসি মুখে বললো, যতসব বখেরা! উটকো ঝঞ্ঝাট! অন্য এক আলম সাহেবকে খুঁজতে এসেছে। হোটেলের ম্যানেজার বোঝে নাই। তাকে আমি এবারে ভালো করে বলে দিয়ে এসেছি।

আলম বললো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমরা এতদিন...

বাবুল বললো, আমি আপনাদের গ্রুপের অ্যাকটিভিটির কথা কিছু কিছু জানি। আপনারা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি তুলেছিলেন।

-জী। তবে সেটা এতদিন ছিল থিয়োরিটিক্যাল দাবি। ওয়েস্ট পাকিস্তান আমাদের কতখানি এক্সপ্লয়েট করে সেই চিত্র তুলে ধরে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গড়া ছাড়া আমাদের আর বাঁচার পথ নাই। এখন সেই দাবিকে কাজে পরিণত করার সময় এসেছে।

জহির বললো, লণ্ডনে বসে এরকম দাবি তোলা সহজ! এখানে ঐ কথাটা একবার রাস্তায় গিয়ে উচ্চারণ করে দ্যাখ না!

আলম বললো, টাইম ইজ রাইপ নাউ। ইণ্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধে আইয়ুব অপদস্থ হয়েছে। এই যুদ্ধে লাভ কী হলো? শুধু সৈন্যক্ষয় আর ধনক্ষয়। ইণ্ডিয়াকে ঠাণ্ডা করতে পেরেছে? কাশ্মীর দখল করতে পেরেছে? ওয়েস্ট পাকিস্তানেও আইয়ুব এখন আন-পপুলার। বাঙ্গালীদের এখন বোঝাতে হবে যে আমাদের জান-মালের কোনো দায়িত্বই ওয়েস্ট

পাকিস্তানীরা নেবে না। তারা শুধু শোষণই করবে। আমাদের রক্ত চুষে ওয়েস্ট পাকিস্তানের বাইশটা ফেমিলি ধনী হবে। এই অবস্থায় আমরা ওদের সাথে সব সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলবো না কেন?

–সেটা কি অত সোজা?

–জনমত গঠন করতে হবে। আমাকে পাঠানো হয়েছে সব পলিটিক্যাল লিডারদের সঙ্গে কথা বলতে। সিকস্টি থ্রি-তে শেখ মুজিব যখন লণ্ডনে এসেছিলেন সোহরাওয়ার্দি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে, তখন আমরা মুজিবকে বুঝাতে গিয়েছিলাম। উনি তখন আমাদের কথা মানেন নাই। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রস্তাব শুনে উনি আঁতকে উঠে বলেছিলেন, আমি বড় জোর সায়ত্তশাসন চাই, তার বেশি না। তাছাড়া উনি সোহরাওয়ার্দি সাহেবকে ভয় পেতেন, ওঁর কথার ওপর কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু এখন সিচুয়েশান অনেক চেইঞ্জড়। শেখ মুজিব এখন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, তাঁর সর্বময় ক্ষমতা, আমি কাল তাঁর সাথে দেখা করবো, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি।

জহির জিজ্ঞেস করলো, কে তোকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিল?

আলম বললো, আমার লণ্ডনের সোর্স আছে। আমরা বিদেশে প্রচারের ভার নেবো, আইয়ুব লণ্ডনে কমনওয়েলথ কনফারেন্সে গেলে আমরা বিক্ষোভ দেখাবো। ফরেন প্রেসের কাছে আমাদের দাবির কথা জানাবো। এখানে প্রচারের জন্য, জনমত সংগঠনের জন্য আমরা তোমাদের সাহায্য চাই।

বাবুল বললো, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গড়া একটা অবাস্তব প্রস্তাব। আমি থিয়োরিটিক্যালিও এই প্রস্তাব সমর্থন করি না। এটা মিসগাইডেড চিন্তা!

আলম ও কামাল একসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে দু'জনেই থেমে গেল, অবাক হয়ে তাকালো।

জহির জিজ্ঞেস করলো, কেন, তুই এটাকে মিসগাইডেড চিন্তা বলছিস কেন?

বাবুল গম্ভীরভাবে বাঁ হাতের পাঞ্জা তুলে কর গুনতে গুনতে বললো, এক নম্বর, যে-কোনো ভাবে পাকিস্তানকে দুর্বল করার চেষ্টা দেশদ্রোহীতারই নামান্তর। দেশের মানুষ তা সহ্য করবে না। দুই নম্বর, আইয়ুবের নেতৃত্বে এখন চীনের সাথে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব হয়েছে, এই সময়ে আইয়ুবকে প্যাঁচে ফেলায়ে দিলে চীনের সাথেই শত্রুতা করা হবে। কোনো সোসালিস্ট তা চাইতে পারে না। তিন নম্বর, আওয়ামী লীগ একটা ন্যাশনালিস্ট পেটি বুর্জোয়াদের পার্টি, তাদের নেতৃত্বে এদেশে কোনোদিন টোটাল সোসালিজম আসতে পারে না। ওয়েস্ট পাকিস্তানীদের বদলে বাঙালী বুর্জোয়া এলিটদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলে সাধারণ মানুষের কী লাভ হবে? এ দেশেও বাইশটি ধনী পরিবারের সৃষ্টি হবে। চার নম্বর, এখন আইয়ুবের হাত শক্ত করে, চীনের সাথে আরও ঘনিষ্ঠতা করে আমাদের উচিত টোটাল রেভলিউশনের জন্য তৈরি হওয়া। সর্বাত্মক বিপ্লব ছাড়া পথ নাই। এখনো তার সময় আসে নাই। এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইস্ট পাকিস্তান মুভমেন্ট করতে গেলে সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রস্তুতিরই ক্ষতি হবে!

কামালরা যেন দমবন্ধ করে বাবুলের কথা শুনছিল, এবারে কামাল বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, তুই দেখছি বুড়া মৌলানা ভাসানীর ন্যাপের সুরে সুর মিলায়ে এখনও কথা বলছিস।

জহির বললো, তুই গোপনে গোপনে এখনো ন্যাপের মিটিং-এ যাস, তাই না? তাই তোরে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না।

আলম বলল, কিন্তু আপনি যে টোটাল রেভলুশানের কথা বলছেন, এই ধর্মের ধ্বজাধারী দেশে তা কতদিনে হবে? ততদিন ওয়েট করতে গ্যালে যে দেশটা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে? আগে আমরা স্বাধীন হই, তারপর আমরা সমাজতন্ত্রের পথে আগিয়ে যাবো!

বাবুল জোর গলায় বললো, আমাকে এখানে শুধাশুধি ডেকে আনা হয়েছে। আমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গঠন একটুও সমর্থন করি না। বরং আপনাদের এই চেষ্টার আমি বিরোধিতা করবো।

তর্কাতর্কিতে বেজে গেল রাত সাড়ে দশটা। এতক্ষণ ঘড়ি দেখার কথা কারুরই মনে ছিল। হঠাৎ খেয়াল হতে বাবুল উঠে দাঁড়ালো। শেষের দিকে বাবুলের সঙ্গে আলমের প্রায় ঝগড়া বেঁধে যাবার উপক্রম। দিলারার সামনে বাবুল বিশেষ কিছু কথা বলতে পারেনি কিন্তু রাজনীতির ব্যাপারে তার জিহ্বা অতি ধারালো।

বাবুল উঠে দাঁড়াতেই আলম তাকালো কামালের দিকে। কামাল সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, না, সে বিষয়ে চিন্তা নাই। বাবুল, আলম যে এই হোটেলে আছে এবং সে কী উদ্দেশ্যে এসেছে, সে কথা আশা করি তুই অন্যদের বলে দিবি না। আলম এখানে গোপনে এসেছে।

জহির বললো, মতের বিরোধীতা থাকলেও বাবুল তো আমাদের বন্ধু। সে কখনো বিট্রে করবে না।

বাবুল কোনো উত্তর দিল না, বেরিয়ে এলো। রাস্তায় এসে রিকশা পাওয়া গেল না সহজে, বাড়ি ফিরতে তার আরও অনেক রাত হলো।

মঞ্জু কোনোদিনই ঘুমিয়ে পড়ে না। একতলায় সিরাজুলদের ঘরে বাতি জ্বলছে না, কিন্তু সিঁড়িতে ও ওপরে আলো আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বাবুল ভাবলো, একটু গরম পানি পেলে এখন একবার স্নান করে নিতে পারলে ভালো হতো। তর্ক করে মাথা গরম হয়ে গেছে, সহজে ঘুম আসতে চাইবে না। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান না ঘোড়ার ডিম! লণ্ডনে আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে থেকে শৌখিন চিন্তা। কামাল, জহিররাও ঐ মাকাল ফলের মতন চেহারার ছেলেটার কথা শুনে মেতেছে। লাউঞ্জ সুট পড়ে হোটেলে বসে থাকে, তার আবার বাঙালীদের জন্য দরদ!

এত রাত্রে মঞ্জুকে গরম পানির কথা বলা যায় না। সে ঢুকে গেল গোসলখানায়। খুব খিদে লেগেছে, মঞ্জু এর মধ্যে খাবার বেড়ে ফেলবে।

আজ যে বাবুল দিলারার সঙ্গে দেখা করেছে একটি নিভৃত ঘরে, সে কথা কি মঞ্জুকে বলা উচিত? গোপন করবারই বা কী আছে? কয়েকদিন ধরেই মঞ্জুর মন-মেজাজ ভালো নেই,

হঠাৎ যদি দপ করে জ্বলে ওঠে? এত রাতে ওসব ঝঞ্ঝাট আর তার ভালো লাগবে না। বাবুল ঠিক করলো, পরে কোনো এক সময় মঞ্জুকে গল্পচ্ছলে বলে দিলেই হবে।

খাবার টেবিলে বসে বাবুল ভাতের সঙ্গে কপির তরকারি মেখে খানিকটা খাওয়ার পর ভাবলো, বাড়িতে ঢুকে সে এ পর্যন্ত মঞ্জুর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। কিছু একটা তো বলা উচিত। সে বললো, বাঃ, সবৃজিটা তো বেশ ভালো হয়েছে। তুমি নিজে বেঁধেছো নাকি?

মঞ্জ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি আবার পলিটিক্স করত্যাছো, তাই না?

মুখ তুলে বাবুল বললো, পলিটিকস? কিসের পলিটিকস?

মঞ্জু একই রকম সুরে বললো, পার্টি। পার্টির কাজে যাও। তাই তোমার বাড়ি ফেরতে দেরি হয়। আবার তুমি জেলে যাবে!

-যাঃ, এসব বাজে কথা কে বলেছে তোমাকে?

-যখন স্বরূপ নগর থিকা আসি, তুমি কথা দিছিলা, তুমি পার্টি-পুট্টি, পলিটিকস আর করবা। কথা দাও নাই? তুমি আমার জন্য আর সুখুর জন্য ঐ সব ছাড়বা।

-কথা দিছিলাম ঠিকই।

-তুমি কথা রাখো নাই। তুমি আবার জেলে যাইতে চাও!

হা-হা করে হেসে উঠলো বাবুল। অদ্ভুত কথা, কেউ কি সাধ করে জেলে যেতে চায়? জেলখানার মতন জায়গা বাবুল চৌধুরীর একেবারেই পছন্দ নয়!

কথা ঘুরিয়ে সে বললো, তোমার মামুনমামা আজ আসেন নাই? রোজই তো তোমাগো খবর নিতে আসেন, আমি জেলে গেলেই বা তোমার এত চিন্তা কী!

৩৮ আলপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে

আলপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অতীনের বাঁ পায়ের চটি ছিঁড়ে গেল। ধান কাটা হয়ে গেছে, মাঠে মাঠে রয়ে গেছে খড়ের গোড়াগুলো, তার ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে পায়ে বেশ লাগে, আলের ওপর দিয়েও সব সময় হাঁটা যায় না। চটি জোড়া অতীনকে হাতে নিতে হয়েছে, এক একবার সে ভাবছে ছুঁড়ে ফেলে দেবে কি না। চটির বদলে তার সু আনা উচিত ছিল, কিন্তু মানিকদা সবাইকে বলেছিলেন, দেখিস, যেন পিকনিকের বাবুদের মতন সেজেগুঁজে গ্রামে যাস না। অতীন বা কৌশিক কেউই সে জন্য ট্রাউজার্স বা কোটও আনেনি, পা-জামা, পাঞ্জাবি আর আলোয়ান। কৌশিক অবশ্য চটির বদলে কেডস এনেছে, অতীনের কেডস নেই।

এখন খালি পায়ে হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার, কিন্তু সেকথা সে কিছুতেই মুখে স্বীকার করবে না। এক সময়ে তার পায়ে আরও বেশি ব্যথা লাগলো।

অতীনরা পা-জামা পরে এলেও গ্রামের অনেক ছেলেই প্যান্ট পরে। গতকাল সন্ধেবেলা একটা হাটে গিয়ে সে রকম অনেককে দেখেছে, এমনকি যে লোকটি বিস্কুটের লটারি চালাচ্ছিল, তার পরনে প্যান্ট-শার্ট ও ঘড়ি। কৌশিক বলেছিল, ওর ঘড়িটা প্লাস্টিকের খেলনা, কাঁটা নড়ে না।

সবাইকে একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে নিষেধ করেছে পমপম। এ রকম একটা শহুরে দলকে গ্রামের মধ্যে দেখা গেলে অনেক রকম কথা বলাবলি হবে। দু'জন দু'জন করে যাবে যেদিকে খুশী।

অতীন আর কৌশিক কালকের রাতটা নিরাপদ দাসের বাড়িতে কাটিয়েছে। পমপমদের গ্রাম থেকে প্রায় ন' মাইল দূরে। অচেনা চাষীর বাড়িতে গিয়ে ভাব জমিয়ে রাত্রিবাসের ব্যাপার নয়, এই নিরাপদর সঙ্গে মানিকদার পরিচয় আছে। একবার ধান কাটার দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ অংশ নিয়ে দেড় বছর জেল খাটতে হয়েছে নিরাপদকে, মানিকদাও সে সময় ঐ

একই জেলে ছিলেন। তারপর থেকে মানিকদা এই নিরাপদ দাসের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

বেশ শক্ত সমর্থ, লম্বা চেহারা নিরাপদর, চোখ দুটো সব সময় খানিকটা কুঁচকে থাকে বলে তাকে নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ মনে হয়, কিন্তু কৌশিকদের সঙ্গে সে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। এবারে দাঙ্গা হয়নি এবং তার জমিতে ভালো ফসল হয়েছে বলে নিরাপদর মেজাজ প্রসন্ন। সারাদেশে অন্নের জন্য হাহাকার পড়ে গেলেও বর্ধমান জেলায় ধানের ফলন আশাতিরিক্ত।

নিরাপদর সংসারটি বেশ বড়, তিনজন স্ত্রীলোক ও নানা বয়েসী আট দশটি ছেলেমেয়ে দেখে অতীন বুঝতে পারেনি, কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক। সারা দুপুর উঠোন জুড়ে ধানমলাই হচ্ছিল, গোরু ও মানুষের পায়ের চাপে যে ধানগাছ থেকে ধান ঝরানো হয়, সে জ্ঞানই ছিল না অতীনের। কৌশিকের তবু গ্রামের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ আছে, তার মামার বাড়ির গ্রামে সে মাঝে মাঝে যায়, কিন্তু অতীনের কোনো গ্রাম্য স্মৃতি নেই। গ্রামের সব কিছুই তার কাছে। নতুন। হুঁকো টানতে টানতে নিরাপদ কৌশিককে বোঝাচ্ছিল কেন সে লেভিতে ধান দেবে না, লেভিতে তার কতখানি ক্ষতি। অতীন লেভি শব্দটা প্রায়ই খবরের কাগজে দেখেছে, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে মনোযোগ দেয়নি কখনো।

নিরাপদ দাসের বাড়িতে আলাদা ঘর নেই, তাদের থেকে কিছু কম বয়েসী তিনটি ছেলের সঙ্গে এক ঘরে শুতে দেওয়া হয়েছিল তাদের। কৌশিক চেষ্টা করেও সেই ছেলে তিনটির সঙ্গে ভাব জমাতে পারেনি, তারা কী একটা গুপ্ত কথা বলে অনবরত হি হি হো হো করে হাসছিল, আর একজন চড়ে বসছিল অন্য একজনের গায়ের ওপর। এক সময় তুতুলের বয়েসী একটি মেয়ে ঝাঁ করে সেই ঘরে ঢুকে এসে ছেলে তিনটিকে থাবড়াতে লাগলো এলোপাথারি, এও কোনো পূর্ব ঝগড়ার ব্যাপার। মেয়েটির নাম উমা, সারা দিনে ঐ ডাক অতীনরা অনেকবার শুনেছে। চূড়ো করে চুল বাঁধা, অনেকখানি ঘাড় দেখা যায় মেয়েটির, মুখখানা পান পাতার মতন, বুকে দুটি বাতাবি লেবু। এই রকম মেয়েরাই গ্রাম্য উপন্যাসের

নায়িকা হয়। অবশ্য অতীন কোনো গ্রাম্য উপন্যাস পড়েনি, অচেনা মেয়েদের শরীর গঠন লক্ষ করার দিকে ঝোঁকও তার নেই।

সারারাত সে ভালো করে ঘুমোতে পারেনি। অন্যরা সবাই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেও অতীন কিছু একটা শব্দ শুনে চমকে চমকে জেগে উঠেছে। ঘরের মধ্যে যেন কার পায়ের আওয়াজ। তারপর সে দেখেছে দেয়ালের গায়ে দুটি জ্বলন্ত বিন্দু, যেন দু' কুচি হীরে, অন্ধকার সেখানে ফুটো হয়ে গেছে। ভয় পেয়ে সে কৌশিককে ডেকে তুলেছিল, কৌশিক ঘুম চোখে অবহেলার সঙ্গে বলেছিল, ওঃ, ও কিছু না, ইঁদুর! কিছু করবে না!

কৌশিক আবার ঘুমিয়ে পড়লে আবার সেই শব্দ, সেই আলোর বিন্দু। ইঁদুরের চোখ ওরকম হীরের মতন জ্বলে? কত বড় ইঁদুর, যদি গায়ের ওপর এসে পড়ে? কৌশিক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে দেখে তার হিংসে হচ্ছিল। সে ভাবছিল, কৌশিক পারছে, সে কেন পারবে না? কৌশিক ঘুমের ঘোরেও চটাস চটাস শব্দে মশা মারছে, অথচ মশার পিনপিনে ডাকে অতীনের চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেছে। তাদের বাগবাজারের বাড়িতেও মশা ছিল না। কালীঘাটের বাড়িতেও মশা নেই! অতীনের শীতও করছিল খুব, শুধু নিজের আলোয়ান দিয়ে গা ঢাকা, চ্যাঁচার বেড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সোঁ সোঁ করে ঢুকছে হাওয়া।

অতীন নিজেকে বুঝিয়েছিল, প্রথমবার তো, তাই সে সহ্য করতে পারছে না। আস্তে আস্তে সহ্য হয়ে যাবে। মানিকদা বলেছেন, প্রথমেই বেশি বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই, একটু একটু করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেই ভিত্তি মজবুত হয়।

আলপথ ছেড়ে কৌশিক আর অতীন গ্রামের রাস্তায় উঠেছে। ভাঙা শামুক কিংবা ঝিনুকের খোলায় অতীনের পায়ের তলায় কেটে গেছে অনেকটা, কিন্তু সে কথা সে কৌশিককে জানায়নি। তার প্রধান গরজ এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পমপমদের বাড়ি পৌঁছানো। সকালবেলার ব্যাপারগুলো সবই তার বাকি রয়ে গেছে। এমন কি এক কাপ চাও খাওয়া হয়নি। নিরাপদ দাসের বাড়িতে চায়ের পাট নেই। উমা নামের সেই মেয়েটি চ্যাঁ-চোঁ শব্দে দুধ দুইছিল, গোরুটি ছবির মতন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল উঠোনের এক পাশে, যেন সে

উমাকে খুব স্নেহ করে। পেতলের গামলায় ফেনা ওঠা দুধ দেখে খুব লোভ হয়েছিল অতীনের, দুধ তার খুব প্রিয়, আর এমন খাঁটি দুধ, কিন্তু চাওয়া তো যায় না। নিরাপদর কথা শুনে একটা নিমের ডাল ভেঙে দাঁতন করতে গিয়ে অতীনের মুখটা এখনও তেতো হয়ে আছে।

সামনেই হাটখোলা, এখানে গতকাল হাটুরে মানুষের ভিড় গমগম করছিল, এখন একেবারে শুনশান। কিছু কলাপাতা, শালপাতা ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক, আর কয়েকটা ঘেয়ো কুকুর। বাঁশের চালাগুলো কাল তো এমন অসুন্দর দেখায়নি।

এক কোণে একটা চায়ের দোকান, সেখানে কিছু মানুষজন রয়েছে মনে হলো। বাইরে একজন লুঙ্গি পরা লোক, রোদে দাঁড়িয়ে বেশ উপভোগ করে চা খাচ্ছে। কৌশিক বললো, চ, এখান থেকে চা খেয়ে নিই।

অতীন বাড়ি ফিরতে চায়, সে বুঝতে পারছে তার পায়ের কাটা জায়গাটায় একটা কিছু ওষুধ লাগানো দরকার। যদি সেপটিক হয়, কিংবা টিটেনাস?

সে বললো, এখানে না, পমপমদের বাড়িতে গিয়ে চা খাবো!

কৌশিক বললো, আয় না, একটু বসে যাই, অনেকটা হেঁটেছি। চায়ের দোকানের গল্পে অনেক রকম মালমশলা পাওয়া যায়।

কৌশিক অতীনের হাত ধরে টানলো। অতীন অন্য হাত থেকে চটি জোড়া ফেলে দিয়ে বাঁ পাটা তুলতে গেল, এবারে কৌশিককে বলতেই হবে।

তখনই চায়ের দোকান থেকে ছুটে এলো সুশোভন, তার হাতে একটা খবরের কাগজ। সে বন্ধুদের দেখতে পেয়েছে। সে ওদের নাম ধরে ডাকছে।

উত্তেজিতভাবে সে বললো, এই তোরা খবর শুনেছিস? কাল আমরা কিছু টেরই পায়নি, যদি একবার রেডিও নিউজটাও শুনতুম।

কৌশিক ভুরু তুলে বললো, কী হয়েছে?

–তোরা এখনও জানিস না? এটা কালকের কাগজ...ঘটনাটা ঘটেছে পশু রাত্তিরে, ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার মারা গেছে...লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসকেন্টে...

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কৌশিক বা অতীনের কোনো ভাব-ভালোবাসা নেই, তবু খবরটির আকস্মিকতায় একটু বিহ্বল হয়ে গেল। মানুষটি তো জলজ্যান্ত সুস্থ ছিলেন। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের পেড়াপেড়িতে লালবাহাদুর আর আইয়ুব খাঁ গেলেন তাসখেন্টে কাশ্মীর নিয়ে দরাদরি করতে। কৌশিকরা কলকাতা ছাড়ার দিনেও জেনে এসেছিল যে আলোচনা ভেস্তে যাচ্ছে, লালবাহাদুর ফিরে আসবেন খালি হাতে। রাশিয়া চায় আমেরিকার খপ্পর থেকে পাকিস্তানকে টেনে আনতে, কিন্তু ওদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো অতি ধুরন্ধর।

কৌশিক কাগজটা টেনে নিল।

সুশোভন অতীনকে বলল, আমি মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে ছিলুম, বুঝলি, রাস্তায় একজন বললো এদিকে একটা চায়ের দোকান আছে,...ভেতরে ঢুকে কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই...শেষ পর্যন্ত আইয়ুব আর লালবাহাদুর হাতে হাত মিলিয়েছিল, একটা যুক্ত বিবৃতি দিয়েছে। এরপর লালবাহাদুরের তো খুশী থাকারই কথা, যুদ্ধ বিরতি হয়ে গেল, তারপর ভোজ সভাতেও লালবাহাদুর ভালোই ছিল...শুতে যাবার পর রাত একটা পঁচিশে বুকে ব্যথা, সাত মিনিটের মধ্যেই শেষ। একটু চিকিৎসারও সময় পেল না।

কৌশিক খবরের কাগজে দ্রুত চোখ ছোটাতে ছোটাতে বললো, যুক্ত বিবৃতি না ছাই! গোঁজা মিল! কাশ্মীর নিয়ে কোনো সুরাহা হলো না, অনাক্রমণ চুক্তির কথাও নেই, শুধু কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথা। লালবাহাদুর নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বুঝেছিল দেশে ফিরলে মার খেতে হবে, পার্লামেন্টে তার নিজের পার্টির লোকই চ্যাঁচাবে! এই দ্যাখ না, মৃত্যুর

একটু আগে লালবাহাদুর তার বউ ললিতা দেবীকে ফোনে বলেছিল, দেশের খবরের কাগজগুলোর রি- অ্যাকশন তাকে জানাতে।

সুশোভন বললো, ইস, লোকটা ভালো করে প্রধানমন্ত্রিত্বগিরি করার চান্সই পেল না। আমরা জন্ম থেকে নেহরুর নাম শুনে আসছি। নেহরু মরবার পর লালবাহাদুর এলো, তখন ভাবলুম, এই লালবাহাদুর এখন আবার অন্তত পনেরো কুড়ি বছর রাজত্ব চালাবে, এদেশে তো না মরলে। কেউ জায়গা ছাড়ে না!...এই, আমার চা ফেলে এসেছি, চল, চা খাবি?

অতীন বললো, তোরা গিয়ে বোস, আমি একটু বাড়িতে যাচ্ছি।

দুপুরবেলা পমপমদের বাড়ির পেছনে আমবাগানে ওদের মিটিং বসলো। গতকাল মানিকদার এসে পৌঁছোবার কথা ছিল, তিনি আসেননি, নিশ্চয়ই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর কারণেই। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে।

বাগানটি বেশ বড়, তাতে নানা রকম কলমের গাছ। এখানে বসবার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা আছে, একটা ফাঁকা জায়গায় কয়েকটা শাল কাঠের গুঁড়ির বেঞ্চ। বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে শীত, রোদে গা দিতে বেশ আরাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর শীত বেশি লাগে, সবাই এসেছে চাঁদর মুড়ি দিয়ে। খিচুড়ি খাওয়া হয়েছে আজ, তারপর কারুর কারুর মুখে সুপুরির টুকরো কিংবা সিগারেট।

পমপম বললো, আমাদের বাড়ির রেডিওটা খারাপ। মেমারিতে যে দুটো খবরের কাগজ আসে, তাতে ট্র্যাস লেখে। মনে কর, আজই যদি সারা দেশে একটা আর্মড রেভলিউশন শুরু হয়ে যায়, আমরা তার খবরই পাবো না।

কৌশিক এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললো, আর্মড রেভলিউশন? তুই কোন দেশের কথা বলছিস রে, পমপম!

পমপম হাসে না, সে সকলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো, তোরা ভেবে দ্যাখ, এইটাই কি ঠিক প্রপার টাইমিং নয়? দেশের প্রধানমন্ত্রী মারা গেছে বিদেশে, কংগ্রেসের টপ লেভেল নেতারা পাজলড, কারুর হাতেই বিশেষ ক্ষমতা নেই, চ্যবন আর শরণ সিং-ও বাইরে, ক্ষমতা দখলের এইটাই তো উপযুক্ত সময়। উই হ্যাভ এনাফ অফ ডেমোক্রেসি। দেশের মানুষকে এখন বিপ্লবের ডাক দিলে সবাই সাড়া দেবে।

কৌশিক বললো, বিপ্লব বুঝি হাতের মোয়া? কৃষক ফ্রন্টে কতটা সংগঠনের কাজ হয়েছে? কৃষক-শ্রমিক ঐক্য কতটুকু এগিয়েছে? একবার গ্রামে ঘুরে জিজ্ঞেস করে আয় না, কটা লোক বিপ্লব কথাটার মানে জানে? তোরা যা বলছিস...

অতীন কোনো কথা বলছে না। পমপমদের বাড়িতে কোনো ওষুধ পাওয়া যায়নি, খানিকটা চুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তার ক্ষত স্থানে। পমপম বলেছিল, শীতকালে ও এমনি সেরে যায়। কিন্তু অতীনের মন মানেনি। পায়ের ক্ষতের চেয়েও তার মনটা খচখচ করছে বেশি। টিটেনাসের সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি। অন্যরা কেউ বলছে না বলেই সে ডাক্তার দেখাবার কথাটা নিজে তুলতে পারছে না।

যদি টিটেনাস হয়ে এখানে সে হঠাৎ মরে যায়? তা হলে তার মা, বাবামা কি পাররে সহ্য করতে? মায়ের আর একটাও ছেলে থাকবে না। অতীন যেন বারবার দেখতে পাচ্ছে তার মাকে, নাঃ, মায়ের জন্যই তার এখন মরা চলবে না।

অলি বসে আছে পমপমের পাশে। অলিকে তার পায়ের ক্ষতটা এখনও দেখায়নি অতীন। অলি বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে তার দিকে, সেই দৃষ্টির মধ্যে যেন একটা প্রশ্ন রয়েছে। সন্তর্পণে অতীন নিজের বাঁ পাটাকে আদর করতে লাগলো। মনের জোর দিয়ে কি টিটেনাস সারানো যায়?

সুশোভন বললো, আমিও পমপমের সঙ্গে একটা ব্যাপারে এক মত। এই রকম একটা অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমর্ড রেভলিউশন ছাড়া আর কোনো পথ নেই। পালামেন্টারি

প্রসেসে আগামী পঞ্চাশ বছরেও কংগ্রেসের ঘুঘুর বাসা ভাঙা যাবে না, ক্ষমতা দখল তো দূরের কথা।

কৌশিক বললো, তোরা যা বলছিস, তার প্লেইন অ্যান্ড সিমপল মানে হলো আর্মিকে প্রশ্রয় দেওয়া। শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে কোনো লিডারশিপ নেই। আমরা বামপন্থীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছি, এখন বিপ্লবের একটা হুজুগ তুললে কোনো একজন আর্মি জেনারেল ক্ষমতা দখল করে নেবে। পাশের দেশ পাকিস্তানে যা হয়েছে। এখন তবু যা কিছু ডেমোক্রেটিক রাইটস আছে, সেগুলোও সব যাবে!

পমপম বললো, তবু একটা কিছু হোক। এই পচা-গলা ডেমোক্রেসি আর আমাদের সহ্য হচ্ছে না।

অলি হঠাৎ নরম ভাবে বললো, আচ্ছা, আমাদের স্টাডি সার্কলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর জন্য শোক প্রস্তাব নেওয়া উচিত না?

যেন এরকম একটা অদ্ভুত কথা আগে শোনেনি, এই ভাবে বিস্মিত হয়ে পমপম বললো, শোক প্রস্তাব? আমরা নেব? কেন, যে শ্রেণী শত্রু, সে মরলে শোকের কী আছে?

অন্য একজন বললো, মানিকদাকে জিজ্ঞেস না করে...

অলি নিজেই একা উঠে দাঁড়ালো।

আরও একটি মেয়ে সেই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে জোর দিয়ে বললো, নিশ্চয়ই এক মিনিট নীরবতা পালন করা উচিত।

এর পরেও আলোচনা চললো প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে। অতীনকে কয়েকবার খুঁচিয়েও তার মুখ দিয়ে কথা বার করা গেল না। তার পায়ের তলায় একটা চিড়িক চিড়িক ব্যথা শুরু হয়েছে, এটা নতুন রকম ব্যথা, এটাই কি টিটেনাসের শুরু? এ কথা কারুকে জিজ্ঞেস করাও যায় না। এরই মধ্যে একবার সে ভাবলো, এই আমবাগানে বসে এমন সীরিয়াস সুরে মিটিং

চলেছে যেন ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব এখনই শুরু হবে কি না তা নির্ভর করছে এই সভার সিদ্ধান্তের ওপর।

সে রকম কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো না বটে, কিন্তু সকলেই ঠিক করলো, এখন যে-কোন মুহূর্তে দেশে একটা বড় রকম পরিবর্তন ঘটতে পারে, এই সময় গ্রামে বসে থাকা ঠিক হবে না। মানিকদা যদি আজ সন্ধের মধ্যেও না আসেন, তা হলে কাল সকালের ট্রেনেই সবাই চলে যাবে কলকাতায়।

অতীন এই কথায় খুশী হলো। প্রথমবারের পক্ষে তার যথেষ্ট গ্রাম দেখা হয়েছে, সে এখন নিজের বাড়িতে যেতে চায়। কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে সে আর কখনো এতখানি নিজের বাড়ির প্রতি টান অনুভব করেনি।

অলি অসহায় ভাবে চিবুক তুলে বললো, কিন্তু আমার যে কৃষ্ণনগরে যাবার কথা?

পমপম বললো, তোমাকে আমরা নবদ্বীপের ট্রেনে তুলে দেবো, তুমি যেতে পারবে না?

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে নিজেই আবার বললো, না, তুমি পারবে না, একা যেতে পারবে। ঠিক আছে। অতীন তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

যেন তার এই আদেশের ওপর আর কোনো বাদ প্রতিবাদ চলে না, এই ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো পমপম।

এই মনোরম শীতকালে দল মিলে গ্রামে বেড়াতে আসার মধ্যে একটা চমৎকার উপভোগ্য দিক ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা যেন পিকনিক পার্টির মতন হয়ে না যায়, সেদিকে ছিল পমপমের কড়া নজর। এক জায়গায় বেশিক্ষণ আড্ডা বা গান পমপমের পছন্দ নয়। খাওয়া নিয়েও কোনোরকম বাড়াবাড়ি চলবে না। পমপমদের বাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছল, দুটি বেশ বড় বড় ধানের গোলা, অনেক রকম ফলের গাছ, পমপমের ঠাকুর্দা এখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হলেও তিনি তাঁর নাতনীর বন্ধুদের সেবাযত্নের জন্য ঢালাও অডার

দিয়েছেন। তবু পমপম প্রথম দিনই জানিয়ে দিয়েছিল, এই দলের কারুরই তাদের বাড়িতে দু'বেলা খাওয়া চলবে না, হাটে বাজারে ঘুরে একবেলার খাওয়া নিজেদের জোগাড় করতে হবে। কৌতুকবর্জিত সুরে সে বলেছিল, আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়াবার জন্য তো কারুকে ডেকে আনিনি। এ বাড়িটা শুধু একটা সেন্টার।

মানিকদা এসে পৌঁছোবার আগে পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো প্রোগ্রাম ছিল না, শুধু গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এমনকি গ্রামের চাষী বা সাধারণ মানুষদের সঙ্গে রাজনৈতিক কথাবার্তা বলাও নিষিদ্ধ ছিল। এই সব ব্যাপারে এগোতে হয় নির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত কার্যসূচি নিয়ে। মানিকদা এলেন না, এর মধ্যে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর মতন ঘটনা না ঘটলে ওরা অনেকেই আর কয়েকদিন থেকে যেত, দশ বারোদিন তো থাকার কথা ছিলই। ভোরবেলা খেজুরের রস, নতুন চালের ফ্যানা ভাত, গাছ থেকে সদ্য ছিঁড়ে আনা বেগুনের টুকরো ভাজা, পুকুর থেকে তুলে আনা মাছের স্বাদ, এই সব আকর্ষণ ছাড়াও ধুলো মাখা রাস্তা, গোরুর গাড়ির চাকার আওয়াজ, খড়ের গন্ধ, মানুষজনের সাদাসিধে কথাবার্তা, এইসবও ভালো লেগে যাচ্ছিল। জমিদারের বদলে গ্রামে গ্রামে গজিয়ে উঠছে জোতদার শ্রেণী, তাদেরও চেনা যাচ্ছিল একটু একটু। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের প্রান্তে দাঁড়ালে বেশ একটা দেশ দেশ ভাব মনের মধ্যে জাগে, শহরে এমন মনে হয় না, শহর যেন কারুর দেশ নয়।

পমপমই ফিরে যাবার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত। তার ধারণা, কলকাতায়-দিল্লিতে বিরোধী পক্ষগুলির সঙ্গে কংগ্রেসীদের মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে। বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে যে আকস্মিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, এই সুযোগে কংগ্রেসের মৌরসিপাট্টা ভাঙার চেষ্টা অন্যরা করবেই। এ সময়ে দূরে থাকা চলে না।

কথা ছিল, অলিকে কৃষ্ণনগরে পৌঁছে দেবে পমপম। সে দায়িত্ব সে এখন অতীনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। অলিকে এখানে একটু বেশি খাতির করা হয়েছে, সে বিশেষ গ্রামে ঘুরতে যায়নি, একদিনও সে অন্য বাড়িতে রাত কাটায়নি, সকলে ধরেই নিয়েছিল অলি কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। সে বড়লোকের মেয়ে, হঠাৎ তার গা থেকে বুর্জোয়া গন্ধ মুছে

ফেলা যাবে না। তার নিজের যদি আন্তরিকতা থাকে তবে সে নিজেই একদিন ডিক্লাসড হবে, ব্যস্ততার কিছু নেই।

অতীন একবারও অলিকে তার নিজের সঙ্গে নিয়ে বেরোয়নি। দু'জন দু'জনের যে দল করা হয়েছিল, তার কোনো দলেই একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল না, এ রকম কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি, সে রকম কেউ চায়ওনি। অতীন বরং অলিকে একটু এড়িয়ে এড়িয়েই চলেছে, অলিকে সে একবারও নিভৃতে তার কাছে আসার সুযোগ দেয়নি, বরং অলির প্রতি তার কথাবার্তা কিছুটা রুক্ষ। পমপমকে সে বলেছিল, তোরা ঐ মেয়েটাকে তুলোয় মুড়ে রাখতে চাইছিস কেন রে, তা হলে গ্রামে নিয়ে এলি কেন? ও কি মেমসাহেব নাকি? অলির প্রতি অতীনের এই ব্যবহার ছদ্ম কিংবা আরোপিত নয়। অলির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দেখলে অন্যরা রঙ্গরসিকতা করতে পারে, অতীন সে সম্ভাবনাকেও গ্রাহ্য করে না। তার ভয় নিজেকে।

অলিকে কৃষ্ণনগরে পৌঁছোবার দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ায় অতীন প্রথমে প্রতিবাদ করবে ভেবেছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলেনি, তখন তার পা নিয়ে সে খুবই চিন্তিত। যখন তার ধনুষ্টঙ্কার শুরু হবে, তখন অন্য সবাই বুঝবে ঠ্যালা। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মারা গেছেন শুনে সবাই অন্য কথায় এমন মেতে উঠেছে যে এদিকে যে অতীন মজুমদার মরতে বসেছে সেদিকে কারুর হুঁশ নেই। বিকেলের মধ্যেই তার পা-টা ফুলে উঠলো অনেকখানি, আর সন্ধের পর তার জ্বর এলো।

পরদিন সকালে অতীনের ঘুম ভাঙলো সকলের আগে এবং ভোরের স্নিগ্ধ আলোর মতন একটা খুশীতে ভরে গেল তার মন। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে, আর টিটেনাসের ভয় নেই। তা হলে সে বেঁচে গেছে! অতীন ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে খানিকটা ঘুরে বেড়াতে গেল, পায়ে অসহ্য ব্যথা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। টিটেনাস তো হয়নি! এখন বাকি রইলো সেপটিক হওয়া। সেটাও এমন কিছু না, একটা ক্ষত সেপটিক হলে কেউ প্রাণে মরে না, বড় জোর অপারেশন করার পর বাকি জীবনটা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে। তাতে বরং খানিকটা ব্যক্তিত্ব আসে। ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সে অপূর্ব দত্তকে

দেখেছে, ডিবেট করার সময় তিনি যখন গ্যালারিতে ওঠেন, তখনই বোঝা যায় এই মানুষটি অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা। কৌশিক অবশ্য বলে, খবরদার অপূর্ব দত্তর বক্তৃতা শুনবি না, ওরা হচ্ছে হেরেটিক। ওরা চমৎকার ধারালো কুযুক্তি দিতে জানে।

সকাল আটটার মধ্যেই সবাই তৈরি হয়ে নিল। এরই মধ্যে গুজব শোনা গেছে যে ট্রেনের কী যেন গণ্ডগোল হচ্ছে, কলকাতা থেকে ফাস্ট ট্রেন আসেনি। তাতেই পমপমের আরও ধারণা হলো যে কলকাতায় সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু শুরু হয়ে গেছে। ট্রেন বন্ধ থাকলে বাস বদল করে করে যেতেই হবে। একটুও সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

পমপমদের বাড়িতে গোরুর গাড়ি আছে, এ বাড়ির মানুষ স্টেশনে পৌঁছোবার জন্য ঐ গাড়িই ব্যবহার করে। কিন্তু এক গাড়িতে সবাইকে ধরবে না, তাছাড়া গোরুর গাড়ির ঢিকুস চিকুস চলা এখন সহ্য হবে না। তার চেয়ে হেঁটে অনেক আগে যাওয়া যাবে। পমপম অতীনকে বললো, তুই আর অলি ইচ্ছে করলে গো-গাড়ি নিতে পারিস, তোরা তো উল্টোদিকে যাবি, একটু দেরি হলেও ক্ষতি নেই।

অতীন রাজি হলো না। সে দুখানা রুমাল দিয়ে তার বাঁ পা ভালো করে বেঁধে নিয়েছে। তারা সবাই একসঙ্গেই মেমারি স্টেশন পর্যন্ত যাবে।

অতীনকে খোঁড়াতে দেখে অলি কাছে এসে সরল বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, বাবলুদা, তোমার পায়ে কী হয়েছে?

অতীন শ্লেষের সঙ্গে বললো, মহারানীর এতক্ষণে নজরে এলো। কাল সারাদিন একবারও দেখিসনি?

–না দেখিনি তো। কী হয়েছে, কাঁটা ফুটেছে?

–কিছু হয়নি। চল্।

অতীন একটু পেছিয়ে পড়েছে। অলি তার বাহু ছুঁয়ে কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলো, বাবলুদা, তুমি সব সময় আমার ওপর রাগ রাগ করে কথা বল কেন? আমি কী দোষ করেছি?

তারপর সে বললো, এ কি, তোমার গা গরম। জ্বর হয়েছে?

অতীন ধমক দিয়ে বললো, চুপ কর। জ্বর হয়েছে তো কী হয়েছে? এ নিয়ে চ্যাঁচামেচি করতে হবে না। তাড়াতাড়ি চল।

গলা চড়িয়ে সে কৌশিককে কাছে ডাকলো একটা সিগারেট চাইবার জন্য।

মেমারিতে পৌঁছেই একটা ট্রেন পেয়ে পমপমরা উঠে পড়লো, অতীন আর অলিকে বসে থাকতে হলো উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে।

কৌশিকের কাছ থেকে প্যাকেটটা নিয়েছে অতীন, পায়ের ব্যথা ভোলার জন্য সে ঘন ঘন সিগারেট টানছে। একসময় সে বললো, আমি তোকে কৃষ্ণনগর স্টেশনে পৌঁছে দেবো, সেখান থেকে তুই সাইকেল রিকশা নিয়ে বাড়ি যেতে পারবি নিশ্চয়ই। আমি কিন্তু তোদের বাড়িতে যাব না।

অলি বললো, কেন, আমাদের বাড়িতে গেলে কী হয়? একটা দিন থেকে যেতে পারো না?

-না। কলকাতায় আমার তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। তাছাড়া মাসি-পিসি মামা-মামীর ভিড়, ঐ সব নেটিপেটি ব্যাপার আমার বিচ্ছিরি লাগে!

-তোমার পা-টা এতখানি ফুলেছে, আমার পিসেমশাইকে একবার দেখিয়ে নিতে পারো। আমার পিসেমশাই ওখানকার নাম করা ডাক্তার।

–আরে যা যা, মফস্বলের হাতুড়ে ডাক্তার দেখিয়ে আমার পা-টা হারাই আর কি! কেন, কলকাতায় ডাক্তারের অভাব? আমার নিজের বাড়িতেই দিদি আছে। আমি থাকতে-টাকতে পারব না। ওখানে গিয়ে আমার ওপর জোর করবি না বলছি!

--ঠিক আছে, থাকতে হবে না।

অলি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো। অতীন কিন্তু অলিকেই দেখছে, কখনো অলির পা, কখনো তার ঘাড়, কখনো তার উরুর ওপর মেলে রাখা করতল। অতীনের বুক কাঁপছে।

একটুবাদে অলি বললো, এই যে গ্রামে তোমরা সবাই মিলে এলে, এতে তোমাদের কী লাভ হচ্ছে?

অতীন বললো, লাভ আবার কী? অনেক কিছু দেখা হলো, তার মধ্য থেকেই কিছু কিছু শেখা যায়। এই যে নিরপদ দাসের বাড়িতে আমি আর কৌশিক রইলাম চব্বিশ ঘণ্টা, এই নিরাপদ দাস মাত্র তেরো বিঘে জমির মালিক। তেরো বিঘেতে কতটা ফসল হয় তুই জানিস? তাতে অত বড় একটা সংসার সারা বছর চলে না। ওদের প্রত্যেক বছর ধার করতে হয়। সেই ধার শোধ করার জন্য মহাজনের কাছে বেগার খাটতে হয়, প্রায় বণ্ডেড লেবারেরই মতন।

–কী রকম যেন মুখস্ত করা কথার মতন শোনাচ্ছে।

–মুখস্ত কথা মানে? আমি নিজের চোখে দেখলাম।

–তবুও। এসব কৌশিক, তোমাকে বলেছে। তুমি নিজে উপলব্ধি করোনি। শেখানো বাবলুদা। তোমরা যেভাবে এগোতে চাইছো, আমার মনে হচ্ছে সেটা অ্যামেচারিস!

–তোমরা তোমরা বলছিস যে! তুই নিজেও তো স্টাডি সার্কলের মেম্বার। তুই নিজে জোর করে এখানে এসেছিস।

–হ্যাঁ। এখানে এসেই আমি বুঝলুম, তোমরা যেভাবে দেশটাকে বদলাতে চাইছো, সে পদ্ধতিটা ঠিক বা ভুল যাই-ই হোক, তাতে আমি বিশেষ কিছু করতে পারবো না। আমার পক্ষে গ্রামে গ্রামে চাষীদের বাড়ি ঘোরা সম্ভব নয়। আমি নিজের লিমিটেশন জানি। যা আমি পারবো না, তা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

–তুই স্টাডি সার্কেল ছেড়ে দিবি?

–যদি আমাকে দিয়ে শহরে বসে কোনো কাজ করানো সম্ভব হয়, তা হলে থাকতে পারি। কিংবা তোমরা যদি বাদ দিতে চাও...

--থাক, ও কথা থাক এখন।

--দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোকই নিজের লিমিটেশন বোঝে না। আমি বলছি না, মানুষ সীমাবদ্ধ প্রাণী। মানুষ তার সীমানা ছাড়াতে পারে, তার আগে সীমানাটা চেনা দরকার ভালো করে, বুঝতে হয় কোথায় কোথায় তার অক্ষমতা আর কোথায় কোথায় তার ক্ষমতাকে একটু কাজে লাগানো হয়নি।

–বলছি না। এখন থাক ওসব কথা।

অতীনের মাথাটা খুব ভারী লাগছে। তার ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। স্টেশানে এত লোক, হলে যদি অলির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়া যেত। অলির কোলটাকে তার মনে হচ্ছে অগাধ সমুদ্রের মধ্যে একটা সবুজ দ্বীপ। এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে অলির গায়ে। সেই রোদটা যেন অতীনের হৃদয়।

সে নিজেকে একটা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে আবার সিগারেট টানতে লাগলো। একটুক্ষণ সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল, চোখ অনেক সুদূরে। অলি তার পায়ে হাত রাখতেই সে চমকে উঠলো।

অলি জিজ্ঞেস করলো, খুব ব্যথা?

অতীন অলির চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললো, ট্রেনের দেখা নেই। কলকাতা থেকে আজ সারাদিনই যদি ট্রেন না আসে?

অলি কোনো উত্তর দিল না।

সমস্ত সকালের মধ্যে এই প্রথম অতীন একটু হেসে বললো, কৃষ্ণনগরে যে যেতেই হবে তার কি কোনো মানে আছে? অলি, তুই আর আমি যদি এখন নিরুদ্দেশে চলে যাই তা হলে কেমন হয়?

৩৯ কয়েকদিনের জ্বরেই একেবারে কাবু

কয়েকদিনের জ্বরেই একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে কামাল। এ এক অদ্ভুত ধরনের জ্বর, উত্তাপ ওঠে একশো চার ডিগ্রি, সাড়ে চার ডিগ্রি, শরীরের সবকটি গ্রন্থীতে অসহ্য বেদনা, অথচ ম্যালেরিয়া নয়, শীতের কাঁপুনি নেই। একটা ফিলমের এডিটিং চলছে, কামালের সেখানে উপস্থিত থাকার খুব প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যাওয়ার ক্ষমতা নেই তার। আগামী সপ্তাহে এই ছবির কালার প্রিন্টিং-এর জন্য হংকং যাবার কথা, শুধু সংলাপ-চিত্রনাট্য লেখাই নয়, এই ছবিতেই তার প্রথম পরিচালনার হাতেখড়ি, তাই ঝুঁকি অনেক।

সকালবেলা সে তার বন্ধু জহির রায়হানকে টেলিফোনে অনুরোধ করেছিল এডিটিং ও ডাবিং-এর ব্যাপারে খানিকটা সাহায্য করতে। জহির দেখা করে গেছে কামালের সঙ্গে।

কামালের স্ত্রী হামিদা একটা স্কুলে পড়ায়, দু'দিন সে ছুটি নিয়েছিল, আজ তাকে স্কুলে যেতেই হয়েছে একবার। তার এক চাচাতো বোনের অ্যাডমিশানের ব্যাপার আছে। হামিদা মাথার দিব্যি দিয়ে গেছে, কিছুতেই যেন কামাল বাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা না করে।

নানা রকম দুশ্চিন্তায় কামালের ঘুম আসছে না, দুপুরটা বিরাট লম্বা মনে হচ্ছে। জানলার বাইরে দুটো কাক ডেকে যাচ্ছে অশ্রান্তভাবে, আগে কখনো কাকের ডাক এত কর্কশ মনে হয়নি কামালের। কাকেরা তো প্রতিদিনই সারাদিন ধরে ডাকে, কিন্তু অন্যদিন কাকের ডাক কানেও আসে না। অতি কষ্টে দু'বার বিছানা ছেড়ে কামাল কাকদুটোকে তাড়াবার চেষ্টা করেছে, ওরা যাবে না। ওদের ডাক ঢাকার জন্যই কামাল বড় রেডিওটা খুললো, সঙ্গে সঙ্গে তার একটা কথা মনে পড়ে গেল, সে কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরার চেষ্টা করলো বি বি সি।

একটু পরেই নুরু নামে তাদের বাড়ির কাজের ছেলেটি এসে বললো, ছায়েব, এক মেমছাব আইছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কামালের মুখে একটা আশঙ্কার ছায়া পড়লো। অচেনা মহিলা মাত্রই নুরুর কাছে 'মেমছাব'। স্টুডিও মহলে এতক্ষণে রটে গেছে কামালের অসুস্থতার কথা। পরিচালক হবার পর উঠতি-নায়িকাদের চোখে কামালের দাম বেড়ে গেছে অনেক, কেউ কেউ এই সুযোগে তার বাড়িতে হানা দিতে চাইবেই। কিন্তু হামিদার স্পষ্ট নির্দেশ আছে, বাড়িতে সিনেমার লোকের আনাগোনা চলবে না। বাংলা সিনেমা একেবারেই পছন্দ করে না হামিদা, তার স্বামীর এই পেশাটাও তার মনঃপূত নয়। একদিন সে কাজরী আর আফজলকে বাড়ির দরজা থেকে তাড়িয়েই দিয়েছিল। আজ হামিদা যে-কোনো সময়ে ফিরে আসতে পারে। সে যদি দেখে একা একটি মেয়ে কামালের ঘরে, তা হলে সে তুলকালাম করবে।

কামাল জিজ্ঞেস করলো, মেমসাহেব একা এসেছে, না সাথে কেউ আছে?

নুরু বললো, জী না, মেমছাবের লগে কেউ নাই। মেমছাবের গায়ে কী সোন্দর গন্ধ! দ্যাখতেও খুব খুবছুরৎ!

একা ঘরে, জ্বরতপ্ত কপালে কোনো সুন্দরী রমণীর হাতের স্পর্শ বেশ লোভনীয় মনে হলেও হামিদার মেজাজের কথা ভেবে কামাল তা সম্বরণ করলো। সে ফিসফিস করে বললো, যা, বলে দে, সাহেব ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরও বন্ধ, উপরে আসা যাবে না। মেমসাহেব চলে গ্যালে দরজা বন্ধ করে দিবি। আর শোন, চারটার সময় আমার দুই একজন দোস্ত আসবে, তাদের যেন আবার ফিরায়ে দিস না।

–দুইজন না একজন?

–দুইজন হইতে পারে, তিনজনও হইতে পারে। পুরুষ মানুষ আসলে ফিরাবি না, বোঝচোস?

–বুঝচি ছাব!

কামাল আবার রেডিওতে বি বি সি নিউজ বুলেটিন শোনায় মন দিল। রাশিয়ার তাসখন্দ থেকে আইয়ুব ফিরে আসার পর পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, লাহোর ও লায়ালপুরে ছাত্ররা রাস্তায় গাড়ি পোড়াচ্ছে। ভারতের সঙ্গে আইয়ুবের চুক্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র ক্ষোভ। কাশ্মীর আদায়ের বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা করতে না পেরেও আইয়ুব কোন আক্কেলে ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে গেলেন? তাহলে কিসের জন্য যুদ্ধ হলো, কেন এত রক্তপাত, লোকক্ষয় ও অর্থ ব্যয়? সবই তো ব্যর্থ হলো!

পাকিস্তান রেডিও-তে এই সব খবর শোনা যাবে না। বি বি সি থেকে জানা যাচ্ছে যে পশ্চিম পাকিস্তানী ছাত্ররা রাস্তায় নেমেছে। মোনেম খাঁর ভয়ে ঢাকায় এখনো কিছু গণ্ডগোল শুরু হয়নি। মোনেম খাঁ ভেদবুদ্ধি চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে।

পাকিস্তানের খবর শুনতে শুনতে অন্য একটা খবর কানে আসায় কামাল আরও উৎকর্ণ হলো।

খানিকবাদে এসে উপস্থিত হলো আলম আর পল্টন। দু'জনেরই মুখ গম্ভীর। পল্টন জিজ্ঞেস করলো, কী রে, কেমন আছিস আজ?

কামাল বললো, একই রকম। তোদের খবর কী বল, গেছিলি শেখ সাহেবের কাছে। দেখা করলেন তিনি?

পল্টন বললো, দেখা তো হলো, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হলো না। ভালো করে শুনলোই না আমাদের কথা।

কামালের কপালটা একবার ছুঁয়ে আলম একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। সিগারেট ধরিয়ে বললো, শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি আগে যেমন দেখেছি তার থেকে অনেক বদলে গেছেন। আওয়ামী লীগের সর্বেসর্বা হবার পর হঠাৎ যেন অনেকখানি ব্যক্তিত্ব এসেছে, কথাবার্তাও বেশ ডিপ্লোম্যাটিক্যালি বলেন। আমাদের প্রস্তাবটা তুলতে না তুলতেই দু'হাতে কান চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, ঐসব বলবা না। আমার সামনে ঐ রকম কথা উচ্চারণও করবা না। আমি পাকিস্তান ভাঙার কোনো মতেই পক্ষপাতী না।

পল্টন বললো, ভাবী তো বাড়িতে নাই দেখলাম। তোর ঐ ছেলেটা চা বানাতে পারবে?

কামাল বললো, ওর হাতের চা খাওয়া যায় না। কেন, শেখ সাহেব, তাদের চা অফার করেন নাই?

পল্টন বললো, করেছিলেন, তবে না করারই মতন। উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ততার ভাণ দেখিয়ে বলেছিলেন, চা-পানি কিছু খাবেন? সুতরাং আমরা মাথা নেড়ে না বললাম।

কামাল বললো, হামিদা এখনই এসে পড়বে, তখন চা খাস। শেখ সাহেব তোদের পাত্তাই দিলেন না?

আলম বললো, শেখ সাহেব একটা অদ্ভুত কথা বললেন। পাকিস্তানের ক্যাপিটাল ঢাকায় শিফট করলেই নাকি সব প্রবলেম সল্ভড হয়ে যাবে। উনি বললেন, আমরা বাঙ্গালীরা

পাকিস্তানে মেজরিটি, আমরা পাকিস্তান ভাঙতে চাবো কোন দুঃখে? আমরা এবার পাকিস্তানের লায়ন্স শেয়ার আদায় করবো।

পল্টন বললো, উনি চাইলেই আয়ুইব খাঁ বাঙ্গালীর হাতে নিজের হাতের মোয়াটি তুলে দিচ্ছেন আর কি! ঢাকায় ক্যাপিটাল শিফট করার দাবিও তো অনেক পুরানো।

আলম বললো, আমার কেমন যেন মনে হলো, শেখ সাহেবের প্যাটে প্যাটে আরও কিছু মতলব আছে, মুইচকি মুইচকি হাসছিলেন কিন্তু কিছু খুলে বললেন না।

পল্টন বললো, রেডিওটা বন্ধ কর, কী ভ্যাড় ভ্যাড় শুনছিস?

আলম জিজ্ঞেস করলো, ওয়েস্ট পাকিস্তানের আর কিছু খবর আছে?

কামাল রেডিওর নবে হাত দিয়েও বন্ধ না করে দুই বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, বি বি সির নিউজ শুনতেছিলাম, ইন্ডিয়ার খবর।

পল্টন বললো, আমিও সকালে শুনেছি। দশদিন হয়ে গেল ওদের প্রাইম মিনিস্টার লালবাহাদুর শাস্ত্রী মারা গেছেন, এর মধ্যে ইন্ডিয়ায় কোনো মারদাঙ্গা হয় নাই। সিংহাসন দখল করার জন্য লিডারগো মধ্যে কাজিয়া শুরু হয় নাই। আমাদের তুলনায় ইন্ডিয়ার কতখানি এগিয়ে আছে বুঝে দ্যাখ!

কামাল হঠাৎ শ্লেষের সঙ্গে বললো, পল্টন তুই আগে ইন্ডিয়ায় ছিলি, এখনও দেখি ইন্ডিয়ার। জন্য তোর দরদ উথলাইয়া পড়ে।

পল্টন বললো, তুই আমাদের দেশের কথা ভাব তো! প্রাইম মিনিস্টারের সিংহাসন ভারচুয়ালি খালি পড়ে আছে, অথচ লিডারেগো মধ্যে মাথা ফাটাফাটি শুরু হয় নাই, আর্মি জেনারাল এসে জবর দখল করে নাই, এরকম অবস্থা আমাদের দেশে কবে আসবে?

আলম বললো, ডেমোক্রেটিক প্রসেস ওদের ওখানে এখনও কাজ করছে। ইন্ডিয়ানরা আর আমরা একই সব-কনটিনেন্টের মানুষ, আমাদের এখানেই বা আমরা কেন ডেমোক্র্যাসি এস্টাব্লিশ করতে পারবো না?

পল্টন বললো, প্রাইম মিনিস্টারের পোস্টের জন্য ওদের পালামেন্টারি পার্টিতে ইলেকশান হবে। এখন যে টেমপোরারি প্রাইম মিনিস্টার, সেই গুলজারিলাল নন্দ সরে দাঁড়িয়েছে, স্বেচ্ছায় সে সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছে। মোরারজি ভাই দেশাই একজন প্রধান কনটেনডার। ওদিকে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন স্টেটের চীফ মিনিস্টাররা অনেকেই প্রপোজ করেছে ইন্দিরা গান্ধীর নাম।

কামাল জিজ্ঞেস করলো, ইন্দিরা গান্ধী কে? নামটা শোনা শোনা, গান্ধীর মাইয়া?

পল্টন বললো, ধেৎ! তুই কিছুই জানোস না। জওহরলাল নেহরুর মেয়ে, সে বিয়ে করেছে আর এক গান্ধীকে। তার সাথে মহাত্মা গান্ধীর কোনো সম্পর্ক নাই। এই ইন্দিরা গান্ধী তো অলরেডি ইন্ডিয়ার একজন মন্ত্রী। আজই ইলেকশানের রেজাল্ট জানা যাবে।

সিঁড়িতে শব্দ করে উঠে এলো হামিদা। অন্য দু'জন অতিথিকে গ্রাহ্য না করে জ্বলন্ত চোখে কামালের দিকে তাকিয়ে সে বললো, গ্যাটের সামনে দুইটা মাইয়া আর একখান ঢ্যামনা খাড়াইয়া আছে দ্যাখলাম, অরা কারা?

কামাল নিরীহ মুখ করে বললো, আমি তো জানি না!

হামিদা ঝঙ্কার দিয়ে বললো, আপনেরে আমি আবার কইয়া দিতেছি, ঐ সিনেমার বান্দরীগুলা যদি এই বাড়িতে ঢোকে আমি তাইলে অগো মুখে নুড়া ঠাইস্যা ধরুম। কপালে আবার সিন্দুরের টিপ পরছে। হিন্দুর-চাটা!

পল্টন দু'হাত তুলে বললো, আরে, আরে, ভাবী আপনার এত অগ্নিমূর্তি ক্যান? আমরা সিরিয়াস ডিসকাশন করতে আছি, শিগগির এটু চা খাওয়ান!

কামাল ক্লিষ্টভাবে বললো, উফ, সাংঘাতিক মাথার বেদনা! এর উপর আর চেঁচাইও না। তোমারে তো আমি বলেই দিয়েছি, কোনো সিনেমার লোকরে বাড়িতে ঢুকতে দিবা না। কেউ যদি এসে পড়ে তো আমার ওপর চোটপাট করো কেন?

হামিদা পল্টনের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনেরাও এখন যান। দ্যাখতে আছেন না মানুষটা কত অসুস্থ! এখন কথা কইতে পারবেন না।

পল্টন হেসে বললো, আরে, আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন, আমরা কি সিনেমার তোক নাকি? আমরা অন্য কথা বলতে এসেছি।

কামাল বললো, হামিদা হইলো মোনেম খাঁর চর, ওর সামনে কিছু বলিস না। আমার বাড়ির মইধ্যে পুরাপুরি মিলিটারি রুল!

পল্টন হামিদার মাথায় একটা হাত রেখে বললো, হাজব্যান্ডের অসুখ হইলে বউয়ের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। ভাবী, আমাগো এই বন্ধুটির সাথে তো আপনার পরিচয় হয় নাই, আলাপ করায়ে দিই, এর নাম ইউসুফ আলম, লন্ডনে থাকে, বিশেষ প্রয়োজনে এসেছে। তা ছাড়া আলম একজন ডাক্তার।

আলম উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে হামিদাকে অভিবাদন জানালো।

একটু বাদে হামিদা চা বানাবার জন্য নিচে গেলে তিন বন্ধুতে আবার শুরু হলো আলোচনা।

কামাল আলমকে জিজ্ঞেস করলো, এর পর আর কার কার সাথে দেখা করতে যাবি তোরা?

আলম বললো, আমি শেখ সাহেবের সাথে আবার কথা বলার চেষ্টা করবো। ওঁকে রাজি করানো বিশেষ প্রয়োজন। উনি যদি আন্দোলন সংগঠন করতে পারেন, তাইলে ফান্ডের অভাব হবে না। লন্ডনে আমরা তো আছিই, তাছাড়া ইওরোপে-আমেরিকায় অনেক ইস্ট পাকিস্তানী ছড়ায়ে আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইস্ট পাকিস্তানের জন্য তারা অনেকেই মদত দেবে!

এখানে নুরুল আমিন, আবুল মনসুর, আতাউর রহমান খান, মানিক মিঞা এনাদের সাথেও আমার দেখা করার ইচ্ছা আছে।

পল্টন বললো, মৌলানা ভাসানীর কাছে গিয়ে তো কোনো লাভ নাই। বাবুল চৌধুরীর কাছে তো শুনলিই, চীনের মুখ চেয়ে ওরা এখন আইয়ুব খানের সাপোর্টার। ওরা শেখ মুজিবকে একেবারে দেখতে পারে না।

কামাল বললো, পল্টন,তুই যে আলমের সাথে সাথে এই সব জায়গায় যাইতাছোস, তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস। আলম তো লন্ডনে ফিরে যাবে, কিন্তু মোনেম খাঁর স্পাই যদি তোর পিছনে লাগে

পল্টন বললো, সে আমি গ্রাহ্য করি না। অনেকদিন চুপচাপ ছিলাম, আর কতদিন সহ্য করবো? বাড়িতে বসে বসে মনে মনে শুধু গুমড়াইলে মানসিক রোগ হয়ে যাবে। শয়তানের চ্যালা চামুণ্ডারা দেশটারে উচ্ছন্নে দেবে, আর আমরা শুধু দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরায়ে থাকবো?

আলম বললো, রেডিওটা আবার খোল তো। বি বি সি শুনি।

কামাল রেডিয়ো চালাতেই তিন বন্ধু উৎকর্ণ হলো। নিউজ বুলেটিন শুরু হয়েছে, ইন্ডিয়ার খবরই বেশি। ভারতের প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ নিয়ে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিত হয়েছে মোরারজি দেশাই ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে, ভোট গণনা চলছে, একটু পরেই ফলাফল জানা যাবে।

এই সময় নুরু এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, আর এক ছাব আইছেন। উফরে আসতে চান না!

কামাল বিরক্ত ভাবে বললো, আঃ! তোরে কইছি না দরজা বন্ধ রাখতে? কারুর সাথে আইজ আমি দ্যাখা করুম না।

নুরু বললো, আপনে যে বললেন, পুরুষ মানুষ হইলে উফরে উঠাইতে!

–যাগো আসার কথা আছিল তারা আইছে। আর কাউর আসার দরকার নাই! তুই যা! আলম বললো, ইন্দিরা গান্ধীই জিতে গেল। মোরারজি পেয়েছে ১৬৯ ভোট আর ইন্দিরা ৩৫৫। ভালো মেজরিটি।

পল্টন বললো, শুধু তাই না, শান, এই মাত্তর কী বললো। হেরে গিয়ে মোরারজি গ্রেসফুলি হার স্বীকার করে নিয়েছে, ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সেও স্বীকার করছে। বি বি সি থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের বয়ঃকনিষ্ঠা অধিশ্বরী হিসাবে অভিনন্দন জানালেন।

কামাল বললো, জওহরলালের মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী। এ কি ডেমোক্র্যাসি না ডাইনাস্টি? এ যে উত্তরাধিকারী সূত্রে সিংহাসন দখল বাবা!

পল্টন বললো, মোটেই তা না। নেহরুর পর ইন্দিরা আসেন নাই। লালবাহাদুর বেঁচে থাকলে ইন্দিরার কোনো চান্স ছিল না। এবারেও ইন্দিরা গান্ধী এসেছেন পার্টির ভোটে জিতে, জোর করে চেয়ার কেড়ে নেন নাই, তারে কেউ উপর থেকে বসায়েও দ্যায় নাই!

আলম বললো, ইমপারশিয়ালি দেখতে গেলে এটা গণতন্ত্রের জয় বলেই ধরতে হবে। নেহরুর মেয়ে হওয়াটা ইন্দিরার ডিসকোয়ালিফিকেশান হতে পারে না। আবার একথাও ঠিক, নেহরুর নামের ম্যাজিকটা উনি অনেকখানি কাজে লাগিয়েছেন। আমরা যেমন বেগম ফতিমা। জিন্নাকে দাঁড় করায়েছিলাম।

কামাল বললো, কিন্তু ফতিমা জিন্না জেততে পারেন নাই।

পল্টন সঙ্গে সঙ্গে বললো, তার কারণ আমাদের ইলেকশানটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয় নাই।

চায়ের ট্রে নিয়ে হামিদা ঘরে ঢুকে আলমকে জিজ্ঞেস করলো, কী রকম দ্যাখলেন?

আলম উত্তর দিল, চিন্তার কিছু নাই, এক ধরনের ফ্লু, তিন চার দিন রেস্ট নিতে হবে।

পল্টন অতি উৎসাহের সঙ্গে বললো, ভাবী, নিউজ শোনছেন? ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী।

তার দিকে একটি ঠাণ্ডা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হামিদা বললো, ইন্ডিয়ার কে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে তাতে আমার কী আসে যায়?

–বাঃ, একজন মহিলা এত বড় পোস্টে গেলেন, আপনাদের তো গর্ব হওয়ার কথা। মডার্ন ওয়ার্ল্ডে আর কোনো মহিলা কি কোনো দেশের প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন?

–প্রাইম মিনিস্টারগিরি করা কোনো মহিলার পক্ষে যে যোগ্য কাজ, তা আমি মনে করি। কত মিথ্যা কথা বলতে হবে, সে হিসাব আছে?

আলম হাসতে হাসতে বললো, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি! পলিটিশিয়ানদের প্রধান অস্ত্র!

হামিদা কামালের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে বললো, ইন্ডিয়া থেকে একজন মানুষ এসে নিচে বসে আছে। আপনের কাছে অন্য মানুষ আছে শুনে উপরে আসতে চায় না।

পল্টন বিস্ময়ে ভুরু তুলে বললো, সে কি ভাবী, আপনি আমাদের তাড়ায়ে দিচ্ছিলেন, এখন অন্য মানুষকে বাড়ির মধ্যে অ্যালাউ করলেন কী করে?

কামালও ভুরু কুঁচকে বললো, ইন্ডিয়া থেকে লোক এসেছে? কী করে আসলো? বর্ডার সীল্ড না?

হামিদা পল্টনকে উত্তর দিল, যে এসেছে সে ওনার খালাতো ভাই। তারেও আমি খ্যাদায়ে দেবো নাকি?

কামাল আবার জিজ্ঞেস করলো, কে? শাজাহান নাকি, সত্যি? তারে উপরে পাঠায়ে দাও এখনই। বলল, এরা বাইরের মানুষ না, এরা আমার বিশেষ বন্ধু।

হামিদা নেমে যেতেই কামাল বন্ধুদের বললো, এই শাজাহান কলকাতায় থাকে, বড় ব্যবসায়ী, খুব শিক্ষিত মানুষ। সে কী ভাবে এখন ঢাকায় এলো বুঝতেই পারছি না।

পল্টন বললো, আমরা তা হলে এখন উঠি।

কামাল বললো, আরে বয়, বয়। শাজাহানের কাছ থেকে হয়তো কিছু নতুন খবর শোনা যাবে। তোদের সাথে গল্প-গাছা করে শরীরটা ভালো লাগছে।

শাজাহানকে দেখে আলম ও পল্টন দু'জনেই কয়েক পলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতনই সুপুরুষ সে, গাঢ় নীল সুট পরা, কিন্তু মুখোনি গাম্ভীর্য মাখা।

কামাল অন্য দু'জনের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এলে কী করে শাজাহান ভাই? বডার কী খুলে দিয়েছে নাকি?

শাজাহান বললো, বড়ার বেশ কয়েকদিন হলো খুলে দিয়েছে। ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের প্রিজনার বিনিময় দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপর দু'দেশে যারা আটকা পড়েছিল তাদের যাতায়াতের জন্য, আমিও কিছুদিন জেলে ছিলাম।

-তুমি জেলে ছিলে? কেন?

-কেউ আমার নামে কমপ্লেন করেছিল, আমি পাকিস্তানের স্পাই।

পল্টন বললো, আমাদের এখানেও অনেককে আটকে রেখেছিল। মনিলাল, শম্ভুদের বোধ হয় এখনও ছাড়েনি।

কামাল তপ্তভাবে বললো, শাজাহান ভাইরা সাত আট পুরুষ ধরে কলকাতার মানুষ, ওনারা বাদশা ওয়াজির আলী শা'র সাথে সাথে লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, শাজাহান ভাই কোনোদিন মুসলিম লীগকে সাপোর্ট করেনি।

পল্টন বললো, যুদ্ধের সময় ওরকম কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়ই। শাজাহান ভাই, আপনি কি আজই আসলেন? ইন্ডিয়ার লেটেস্ট খবর শুনেছেন তো? ইন্দিরা গান্ধী আপনাদের প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শাজাহান বললো, শী ইজ ডেফিনিটলি আ বেটার চয়েস। মোরারজি লোকটা অনেক রি-অ্যাকশানারি।

–আপনার কী মনে হয়, একজন মহিলা প্রাইম মিনিস্টার হবার পর ইন্ডিয়ার অবস্থা কিছু পাল্টাবে?

–মাপ করবেন, আমি পলিটিকস নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই না। আমি বিজনেসম্যান, বিজনেস বুঝি?

–এখানে কোনো বিজনেসের ব্যাপারে এসেছেন?. ইন্ডিয়ার সাথে আবার আমাদের বিজনেস শুরু হচ্ছে নাকি? বইপত্তর তো কিছুই আসে না। টোটালি ব্যান করা হয়েছে।

–নাঃ, আপাতত এখানে কোনো বিজনেসের ব্যাপারে আসিনি।

কামাল জিজ্ঞেস করলো, তুমি উঠেছো কোথায়? কোনো হোটেলে নাকি, না, না, সেসব চলবে না। মালপত্তর আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসো।

শাজাহান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আপাতত একটা হোটেলেই আছি। এখানে একটা বাড়ি কিনতে চাই। সেই ব্যাপারে তোমার সাহায্যের দরকার হবে।

–তুমি এখানে বাড়ি কিনবে? কেন? ইন্ডিয়ার সিটিজেন হয়ে কি এখানে সম্পত্তি রাখা যাবে?

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অনেকটা আপন মনে উচ্চারণ করার ভঙ্গিতে শাজাহান বললো, ভাবছি এখানেই থেকে যাওয়া যায় কি না। ইন্ডিয়াতে আর আমার থাকতে ইচ্ছা করে না। আমার মন ভেঙে গেছে।

৪০ একটা ভিড়ের বাসে চেপে

একটা ভিড়ের বাসে চেপে ওরা দু'জনে চলে এলো বর্ধমান। ট্রেন আর আসবে না বোঝাই গেছে। সকালের দিকে দু'একখানা ট্রেন শুধু কলকাতার দিকে গিয়েছিল, তারপর দু দিকেই বন্ধ।

বর্ধমান থেকে আবার অন্য একটি বাসে নবদ্বীপ যাওয়া যায়। তবে ট্রেনের যাত্রীরা আজ সবাই হুড়মুড়িয়ে বাসে উঠছে, প্রথম বাসে অতীনরা জায়গা পেল না। পরের বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, সে বাসের জন্যও আরও অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের ব্যথার জন্য অতীনের পক্ষে ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করা সম্ভব নয়।

অতীনের খুব খিদে পেয়েছে। আগের রাত্রে তার জ্বর ছিল বলে ভালো করে খেতে পারে নি, সকালেও খানিকটা মুড়ি-পাঁপরভাজা ছাড়া আর কিছু খাওয়া হয়নি, এখন জঠরের আগুনটা বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অতীন খিদে সহ্য করতে পারে না। অন্যান্য দিন বাড়িতে স্নান করার পর তাকে ভাত দিতে একটু দেরি হলেই সে চাচামেচি করে, চুল আঁচড়াবার সময়টুকুও সে বাদ দিয়ে দেয়।

অলিকে একটা গাছতলায় দাঁড় করিয়ে অতীন দেখতে গেল অন্য কোনো রুটে নবদ্বীপ পৌঁছোনো যায় কিনা। এখান থেকে অনেক জায়গার বাস ছাড়ে। বোলপুর, কালনা, দুর্গাপুর, মাসানজোড়, রামপুরহাট, নানুর-উদ্ধারণপুর...এর কোনো জায়গাতেই যায় নি অতীন। অচেনা নামের জায়গাগুলি যেন হাতছানি দেয়, কৃষ্ণনগরে অলিদের বাড়ি, সেই জন্যই খানিকটা চেনা চেনা, কিন্তু যেখানে একজনও চেনা মানুষ নেই, সেইসব জায়গা কেমন যেন রহস্যময়।

ফিরে এসে অতীন বললো, আজই নবদ্বীপ হয়ে কৃষ্ণনগর যেতে হবে, তার কি কোনো মানে আছে? অন্য যে-কোনো একটা জায়গাতেও তো যাওয়া যেতে পারে।

দু'দিকে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে অলি বললো, না।

অতীন ভুরু দুটো বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন, যাবি না কেন?

-কেন যাবো আগে সেটা বলো! তোমাকে তো তখনই বলেছি, আমি নিরুদ্দেশটিরুদ্দেশে যেতে চাই না।

-ঠিক, আছে, এটা তো নিরুদ্দেশ হচ্ছে না। ধর রামপুরহাট কিংবা কালনায় গেলাম, সেখানে একটা হোটেলে ঘর ভাড়া করে থাকবো, বিকেলবেলা বেড়াবো, সন্ধেবেলা তুই নদীর ধারে বসে গুনগুন করে গান গাইবি, তারপর কাল চলে যাবো নবদ্বীপে। আমাদের তো মেমারিতেই আরও দু'একদিন থেকে যাওয়ার কথা ছিল। সুতরাং একদিন দেরি হলেও ক্ষতি নেই।

-বাড়িতে গিয়ে বুঝি আমি মিথ্যে কথা বলবো?

-মাঝে মাঝে দু'একটা ছোটখাটো মিথ্যে কথা বলা এমন কিছু দোষের না। ঠিক আছে, মিথ্যে কথা বলতে হবে না, তুই কিছুই বলবি না, তোর বাবা-মা ভাববেন আমরা মেমারি থেকেই এসেছি।

-কিন্তু তোমার সঙ্গে একটা হোটেলে গিয়ে থাকবো কেন, সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি।

-এত কেন-র কী আছে। থাকতে ভালো লাগবে, কেউ আমাদের চিনবে না, আমরা কারু সঙ্গে কথাই বলবো না!

অতীনের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অলি ভর্ৎসনার সুরে বললো, বাবলুদা, তুমি বড্ড অসভ্য হয়েছে। আজকাল প্রায়ই খারাপ কথা বলো।

–আরে, এর মধ্যে খারাপের কী আছে?

–আমি কোথাও যাবো না। নবদ্বীপের বাস এলে তাতে উঠবো, তুমি যদি না যেতে চাও, আমি একাই চলে যেতে পারবো!

–তোর কাছে কত টাকা আছে রে অলি?

–সত্তর-আশী টাকা আছে এখনো।

--ওরে বাবা, সে তো অনেক টাকা। আমার কাছেও গোটা পনেরো আছে। রামপুরহাটের ভাড়া মাত্র এক টাকা বারো আনা। হোটেলের ঘর ভাড়া আর কত হবে, বড় জোর দশ টাকা?

–আবার ঐ কথা বলছো? তোমাকে আমার সঙ্গে নবদ্বীপেও যেতে হবে না, যাও! তুমি একলা চলে যাও! টাকা চাই, দেবো?

অলিদের বাড়িতে অলি অতীনের প্রতি সামান্যতম রূঢ়তা দেখালে অতীন আর এক মুহূর্ত দেরি করে না। তারপর মাসের পর মাস আর সে ও বাড়িতে যায় না। প্রত্যেকবার অলিই নিজে থেকে এসে তার অভিমান ভাঙায়। আজ কিন্তু অতীন একটুও রাগ করছে না, তার ঠোঁটে খানিকটা দুষ্টুমির হাসি লেগেই আছে।

সে বললো, দারুণ খিদে পেয়েছে রে, দাঁড়াতে পারছি না। ভিড় একটু কমুক না, খানিকটা পরের বাসে যাবো। রাস্তার উল্টোদিকে কয়েকটা ভাতের হোটেল আছে, চল না কিছু খেয়ে নিই।

অলি এই প্রস্তাবে আপত্তি করলো না। হোটেলটা পথচলতি মানুষদের জন্য, অতিশয় শস্তা। নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চ, ভন করছে অসংখ্য মাছি, কঞ্চির বেড়ায় বহু পুরোনো ক্যালেন্ডারের ছবি, কাছেই হাত ধোওয়ার জায়গাটায় থিকথিকে কাদা হয়ে আছে।

ওরা বসতেই একটি অল্প বয়েসী নাদুশনুদুশ চেহারার ছেলে ওদের সামনে কলাপাতা রেখে তাতে নুন আর লেবুর টুকরো দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী লেবেন?

অতীন জিজ্ঞেস করলো, কী কী আছে?

ছেলেটি গড়গড়িয়ে বললো, রুটি, ডাল, ঢাড়োশের শবজি, আলু-ফুলকপি, মাছের কালিয়া, মাছের ঝোল...

–ভাত নেই?

–আছে, দাম বেশি পড়ে যাবে।

–তুমি ভাতই দাও, আর ডাল, একটা তরকারি আর মাছ। আর ইয়ে, বেগুন ভাজা দেবে দুটো করে।

–বেগুন ভাজা হবে না, মাছ ভাজা লিতে পারেন।

–মাছ ভাজা চাই না। তুমি চটপট নিয়ে এসে যা বললুম।

–হাফ না ফুল?

অতীন এ প্রশ্নের মর্ম না বুঝে অলির দিকে তাকালো। অলিও কিছু জানে না। অতীন বললো, আগে তুমি হাফই নিয়ে এসো।

বেগুন ভাজা অতীনের প্রিয়, সেটা না পেয়ে সে একটু ক্ষুণ্ন হলো। হোটেলে পয়সা দিয়ে খেতে এসেও যদি ইচ্ছে মতন জিনিস না পাওয়া যায়... সে ছেলেটিকে ডেকে বললো, এই, কাঁচা লঙ্কা নিয়ে আসবে!

একটু পরেই সে আবার অধৈর্যভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, কী হলো, খোকা, ভাত দিয়ে গেলে না?

অলি এরকম হোটেলে কোনোদিন ঢোকে নি। বাইরে খাওয়ার ব্যাপারেই তাদের পরিবারের একটু পিটপিটিনি আছে। কলকাতার বাইরে কোথাও গেলে তারা সঙ্গে পর্যাপ্ত বাড়ির খাবার নিয়ে যায়, সাধারণ হোটেল যায় না। অলির আবার পরিষ্কার বাতিক আছে, নোংরা দেখলেই তার গা ঘিনঘিন করে। তার হিসেবে এই হোটেলটি এতই নোংরা যে সহ্য করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবু অতীনকে অম্লান বদনে খেয়ে যেতে দেখে সে মুখে একটুও বিকৃতি ফোঁটালো না। তার শাড়ীর আঁচলটা একেবারে ঠেকে গেছে মাটিতে, ডায়িং ক্লিনিং-এ না পাঠিয়ে এ শাড়ি সে আর পরবে না।

হাফ প্লেট ভাতে পেট ভরে নি অতীনের, সে দ্বিতীয়বার ভাত নিল। মাছটা তার পছন্দ হয়নি, সে ডাল তরকারি নিল আবার।

অলি জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী করে কাঁচা লঙ্কাটা খাচ্ছো, ঝাল নেই?

অতীন বললো, হ্যাঁ, বেশ চমৎকার ঝাল। এই একটাই বাঙালত্ব টিকে আছে আমার, ঝাল ছাড়া খেতে পারি না।

-বাবলুদা, পাশের টেবিলটায় দ্যাখো।

অতীন একবার পাশ ফিরে তাকালো। লুঙ্গি পরা দু'জন মুসলমান হাটুরে শ্রেণীর লোক শুধু দু'বাটি ডাল আর এক গোছা করে রুটি নিয়ে বসেছে, দু'জনেরই হাতে কাঁচা লঙ্কা, তারা টিয়া পাখির মতন কচ কচ করে সেই লঙ্কা দাঁতে কাটছে।

অলি জিজ্ঞেস করলো, ওরাও বুঝি বাঙাল?

অতীন হেসে বললো, নাঃ, বাঙাল মুসলমান হলে নিশ্চয়ই বর্ধমানের এই হোটেলে খেতে আসতো না।

-তোমার বাঙালত্বর আর একটা প্রমাণ আছে, বাবলুদা, তুমি ভাত ছাড়া খেতে পারো না।

–এখন মনে পড়লো, আজকাল হোটেলে রোজ ভাত বিক্রি করা বে-আইনী, কাগজে। পড়েছিলুম। এ কী, তুই কিছুই খেলি না যে?

–আমার খিদে পায় নি।

–বুঝেছি, কেষ্টনগরের দুধ-ভাত ছাড়া তোর মুখে আর কিছুই রুচবে না।

এই হোটেলে একটি চালু রেডিও- ও রয়েছে। তাতে সেতারের দুঃখের সুর বাজছে, লালবাহাদুরের জন্য এখন রাষ্ট্রীয় শোক চলবে বেশ কয়েকদিন। রাস্তায় অনেক মানুষ, তীব্র স্বরে হর্ন বাজিয়ে ও ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে বাস, সাইকেল রিকশা ও ঠেলাগাড়ির জটলা, একটি কমলালেবুওয়ালার সঙ্গে জোরে জোরে বচসা করছে একজন খদ্দের। এসবই প্রতিদিনকার রুটিন বাঁধা দৃশ্য। দেখলে বোঝার উপায় নেই যে ভারতের ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ চলছে, যে-কোনো মুহূর্তে একটা বড়রকম রদবদল হয়ে যেতে পারে।

সেতারের বাজনাটা শুনেই অতীন একবার ভাবলো, এদেশেও কি সামরিক শাসন এসে যাবে? পর মুহূর্তেই সে এই চিন্তাটা উড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

হোটেলের বাইরে এসে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, এবারে কি নিরুদ্দেশে যাওয়া হবে? রাজকুমারীর মত বদলেছে?

অলি বললো, তোমার ইচ্ছে হলে তুমি একা যেতে পারো। আমি সোজা নবদ্বীপ যেতে চাই।

অতীন বললো, কী সুন্দর রোদ উঠেছে, এরকম একটা গ্লোরিয়াস দিনে টপ করে বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না...উঃ মাগো, উঃ উঃ। গেলাম রে।

একজন লোক ট্যালার মতন কাবলিজুতো-পরা পায়ে ধাক্কা মেরেছে অতীনের ব্যথার পা-টিতেই। লোকটি পেছন ফিরে তাকালোও না, চলে গেল হনহনিয়ে। অতীন যন্ত্রণায়

চিৎকার করে উঠলেও অলির হাসি পেয়ে গেল। অতীন বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না বলার সঙ্গে সঙ্গে উঃ মাগো বলে ফেলেছে। অলির ইচ্ছে হলো অতীনের পিঠে একটা কিল মারতে।

এর পর অতীনের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা ছাড়া আর কোনো উপায় রইলো না। অলি জিজ্ঞেস করলো, ঐ দিকে একটা ওষুধের দোকান আছে, ওখানে নিশ্চয়ই ডাক্তার পাওয়া যাবে। একবার দেখিয়ে নেবে পা-টা?

অতীন বললো, বর্ধমানে ডাক্তার দেখাই আর সে আমার পাখানা কুচ করে কেটে বাদ দিক। আর কি? সেপটিক হয়ে গেছে, তাতো বুঝতেই পারছি। যা হবার কলকাতায় গিয়ে হবে! হারে, তোদের বাড়িতে কারু সামান্য একটু জ্বর হলেই অমনি ডাক্তার ডাকা হয়, তাই না? তোদের নিশ্চয়ই ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আছে?

–বাঃ, থাকবে না?

–আমাদের বাড়ির সিস্টেম কী জানিস, তিন-চারদিন ধরে জ্বর চললেও ডাক্তারের কাছে। যাওয়া চলবে না। অসুখের কথা লুকিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের কাছে বীরত্বের পরিচয়। আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান বলে কিছু নেই, আমার বাবা জীবনে একবারও কোনো ডাক্তারের কাছে গেছেন কি না সন্দেহ।

–এখন তোমাদের বাড়িতেই তো তুতুলদি ডাক্তার।

–হ্যাঁ, কিন্তু ফুলদির নিজের দারুণ শরীর খারাপ হলেও কোনো ওষুধ খাবে না। সব ওষুধই নাকি একটু একটু বিষ। ভেবে দ্যাখ, একজন ডাক্তার হতে চলেছে অথচ কোনো ওষুধেই তার বিশ্বাস নেই। আমাদের বাড়িটাই একটা পাগলের বাড়ি।

–এই বাবলুদা, ওরকমভাবে কথা বলে না।

–আমার মায়ের যে আলসার আছে, তা আমি এই সেদিনমাত্র জানলাম। অথচ সাত-আট বছর ধরে নাকি হয়েছে!

-তুমি তো বাড়ির কোনো খবরই রাখে না।

–ঠিক বলেছিস, অলি, আমি একটা অপদার্থ। আমার দাদা যদি আমার বদলে বেঁচে থাকতো, তা হলে আমার বাবা-মা কত ভালোভাবে থাকতে পারতো, আমাদের সংসারের চেহারাটাই বদলে যেত।

–ছিঃ বাবলুদা।

চল্লিশ মিনিট পরে নবদ্বীপের একটা বাসে জায়গা পাওয়া গেল কোনোক্রমে। ভিড় প্রচুর। অলি একটা লেডিজ সীটে বসতে পারলেও অতীনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো হাতল ধরে। অনেকখানি জার্নি। বাসটা জোরে যেতেই পারছে না, মাঝে-মাঝেই রাস্তায় বিফল ট্রেনযাত্রীরা জোর করে বাস থামিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, অনেকেই বসেছে. বাসের ছাদে।

এত ভিড়ের মধ্যে কথা বলারও উপায় নেই, অতীন আর অলি চোখাচোখি করছে শুধু। দু'জনের দৃষ্টির মধ্যে যেন একটা সেতু। অলি তবু জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে বাইরে তাকাতে পারে কিন্তু অতীন একদৃষ্টিতে দেখছে শুধু অলিকে। বাসের অন্যান্য যাত্রীদের গায়ের স্পর্শ সে পেলেও তাদের অস্তিত্ব সে ভুলে গেছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা বাদে অলির পাশের বৃদ্ধা মহিলাটি নেমে গেলেন। অতীন তবু সেখানে বসলো, দাঁড়িয়েই রইলো। অলি মৃদুভাবে তাকে ডাকলো কয়েকবার। অতীন যেন শুনতেই পাচ্ছে। না। অলি একটু ঝুঁকে অতীনের হাত ধরে টানলো, তখন অতীন বসলো, কিন্তু বললো, দাঁড়িয়েই। তো ভালো ছিলাম, পাশাপাশি বসলে ভালো করে মুখ দেখা যায় না।

অলি প্রগাঢ়ভাবে অবাক হলো। এরকম একটা কথা বলার পক্ষে বাবলুদা যেন পৃথিবীর শেষতম ব্যক্তি। আজ বাবলুদার সব কিছুই অন্যরকম।

অতীনকে ছুঁয়ে অলি তার শরীরের উত্তাপ টের পেয়েছে, সে উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, বাবলুদা, তোমার আবার জ্বর এসেছে।

অতীন বললো, ও কিছু না। তোকে বললাম তো, আমাদের ফ্যামিলিতে দুতিনদিনের জ্বরটা কোনো ব্যাপারই না। ও আমরা হজম করে ফেলতে পারি।

–কিন্তু তোমার এই জ্বরটা হচ্ছে পায়ের ব্যথার জন্য।

–তুই-ও বুঝি ডাক্তারি জানিস? গোপাল ভাঁড়ের গল্পে পড়েছি, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লোক যে জিনিসটা জানে তা হলো ডাক্তারি। ও, তোরাও তো গোপাল ভাঁড়ের দেশের লোক!

আরও বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বাসটা হঠাৎ থেমে গেল এক জায়গায়। ইঞ্জিনে ঘটাং ঘটাং শব্দ, একটুখানি চলার চেষ্টা করতেই ম্যালেরিয়ার রুগীর মতন কাঁপুনি। অনেক যাত্রী হইহই করে উঠলো, কেউ কেউ নেমে গেল ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে। শীতের সন্ধে নেমে এসেছে তাড়াতাড়ি, তার মধ্যে বাসটি অনড়।

প্রায় আধঘণ্টা বসে থাকার পর অতীন বেশ উফুল্ল গলায় বললো, আর যাবে না মনে হচ্ছে। এবারে আর উপায় নেই, নেমে হোটেল খুঁজতে হবে। তাহলে রাতটা আমার সঙ্গেই কাটাতে হচ্ছে, রাজকুমারী!

অলি বললো, মোটেই না। আমি জায়গাটা চিনতে পারছি, এখান থেকে নবদ্বীপের ঘাট বেশি দূর না। হেঁটেই যাওয়া যায়! চলো, তাই যাবে?

দু'জনে নেমে পড়ে কয়েক পা হাঁটার পরই অলি খুব অনুতপ্তভাবে বলে উঠলো, ইস, ছি ছি ছি ছি, আমি কী ভুল করতে যাচ্ছিলুম। চলো, বাসেই গিয়ে বসি। একসময় না একসময় তো চলবেই।

অতীন বললো, কেন, কী হলো?

-তোমার পায়ে ব্যথা। তুমি হাঁটবে কী করে?

-আমি ঠিক হাঁটতে পারবো। মনে কর, কোনো কারণে আমাদের পুলিশে তাড়া করলো.। তা হলে আমি পাঁই পাঁই করে ছুটতেও পারতাম।

-না, চলো। ফিরে চলো।

-বলছি তো, আমার কষ্ট হবে না। তোর কাঁধটা একটু ধরবো, তা হলে সুবিধে হবে?

অলি এদিক ওদিক তাকালো। এখনও অন্ধকার তেমন জমে নি। আরও অনেক লোক। হাঁটছে। অলি লজ্জিত ভাবে বললো, এখানে ...মানে...লোকে দেখে কী ভাববে!

-লোকে দেখে কী ভাববে এই জন্য আমরা অনেক কিছুই করতে পারি না, তাই না? খেয়াঘাটে কিন্তু ভিড় বেশি নেই। দু'তিনটি নৌকো যাত্রীদের ডাকাডাকি করছে, অতীনরা যে-নৌকোয় উঠলো, সে নৌকোটি আর দু'তিনজন মানুষ পেয়েই ছেড়ে দিল।

শীতকালের পরিষ্কার আকাশ, অসংখ্য তারা। গঙ্গায় অবশ্য জল বেশি নেই। এ বছর বৃষ্টিও তেমন হয়নি। একজন যাত্রী মাঝি দু'জনের সঙ্গে এবছরের ধানের ফলন বিষয়ে এমন জোরে জোরে আলোচনা শুরু করে দিল যে নৌকোযাত্রাটা তেমন সুখকর হলো না। অতীন অলিকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, অমনি সেই যাত্রীটি তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, কী বললেন ভাই? যেন, ধানের ফলন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলা এ যাত্রায় নিষিদ্ধ।

ওপারে কয়েকটি সাইকেলরিকশা অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু অলি নৌকো থেকে নেমেই কোনো রিকশায় উঠতে রাজি হলো না। সে বললো, বাবলুদা, একটু দাঁড়াও, এই জায়গাটা বেশ ফাঁকা, এখানে একটু বসে যাই না!

অতীন বললো, ও, বাড়ির কাছে এসে গিয়ে এখন রোমান্টিসিজম হচ্ছে! এই শীতের মধ্যে বসতে ভালো লাগবে?

অলি তীরভূমি দিয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে পায়ের চটি খুলে ফেলে জলে নামলো একটু। তারপর পেছন ফিরে ডেকে বললো, বাবলুদা, এখানে এসো, জলে হাত দিয়ে দেখো, জল কিন্তু বেশি ঠাণ্ডা নয়।

অতীন কাছে এসে বললো, নদীর জল বেশি ঠাণ্ডা হবে কী করে? সব সময়ই তো দৌড়োচ্ছে!

অলি চাপা গলায় গান ধরলো। পর পর দুটি গান, ‘অমন ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া...’ তারপর, ‘ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সময়...’ ।

গান দুটি শেষ করার পর বেশ কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে অলি বললো, তুমি বলেছিলে নদীর ধারে গান গাইবার কথা...আচ্ছা, বাবলুদা, তুমি রবীন্দ্র সঙ্গীত পছন্দ করো না, তাই না? সেদিন ট্রেনে আসবার সময় বলছিলে...কিন্তু আমি তো অন্য কোনো গান জানি না...তুমিই তো আমায় গান শিখতে দিলে না।

অতীন কোনো মন্তব্য করলো না।

অলি আবার বললো, আজকের সারা দিনটা, এটাই তো আমাদের নিরুদ্দেশ। বর্ধমানের ঐ হোটেলে খাওয়া, তুমি আর আমি একসঙ্গে, আর কেউ চেনা নেই, এরকম তো আগে কখনো হয়নি। তারপর বাসে এতখানি পথ আসা, সেই ছেলেবেলায় তুমি আমাদের বাড়িতে খেলতে আসতে, তারপর তো বহুদিন আমরা সারাদিন এক সঙ্গে থাকিনি... বাসে

আমার পাশে বসার পর তুমি বললে, পাশাপাশি বসলে মুখ দেখা যায় না, তখন আমার মনে হলো, সত্যিই আমি তোমার সঙ্গে নিরুদ্দেশে চলে যাচ্ছি, কী ভালো যে আজ লাগছে বাবলুদা, তোমার পায়ে ব্যথা, তবু তুমি আজ আমাকে একবারও বকুনি দাওনি...

কাছাকাছি একজন মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে অতীন চট করে ঘুরে দাঁড়ালো। কালো রঙের চাঁদর মুড়ি দিয়ে সত্যিই একজন মানুষ এসে সেখানে কখন দাঁড়িয়েছে। অলিকে আড়াল করে অতীন কাঁপা-রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে? কী চাই?

লোকটি বললো, আপনারা কি রিকশা যাবেন? আমার রিকশাই লাস্ট যাচ্ছে, এরপর আর পাবেন না। খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে!

অগত্যা নদী-তীর ছেড়ে ওদের রিকশাতেই এসে উঠতে হলো। ধারালো ছুরির মতন ফিনফিনে বাতাস বইছে। অতীন তার গায়ের শালটার খানিকটা অংশ জড়িয়ে দিল অলির শরীরে। এখন রাস্তা একেবারে নিকষ অন্ধকার। রিকশাওয়ালাকেও দেখা যাচ্ছে না, ওদেরও দেখা যাচ্ছে না। যেন ওরা চলন্ত অলীক।

অতীনতার ডান হাতে অলির কোমর বেষ্টন করে তারপর পায়রার বুকের মসৃণতার মতন, অর্ধ তরল পাথরের মতন, উষ্ণ স্তনে করতল রাখলো। তার হাতটি যেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাজ পেয়েছে।

অলি অতীনের সেই হাত চেপে ধরে খুব মৃদু, কাতর গলায় বললো, না বাবলুদা, প্লীজ...

চলন্ত রিকশাতে অলি জোরে প্রতিবাদ করতে পারবে না, রিকশাওয়ালা কিছু টের পাবার বদলে অলি. সব সহ্য করবে, একথা জেনেও অতীন সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিল নিজের হাত, বললো, আচ্ছা, আর বিরক্ত করবো না।

অলি নিজেই ধরে রইলো অতীনের হাত, সে কোনো শোক গাথা বলার মতন সুরে বললো, বাবলুদা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? এবারে তুমি সর্বক্ষণ আমার ওপরে

রেগে ছিলে কেন? আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে নি, আসবার সময় ট্রেনে, পমপমদের বাড়িতে...আমি কি কোনো দোষ করেছি?

অতীন বললো, সত্যি কথাটা বলবো?

তুমি আজকাল প্রায়ই মিথ্যে কথা বলো, আমি জানি। এবারে আমাকে সত্যি কথা বলো, প্লীজ, ফর এ চেইঞ্জ।

-আমি তোর কাছে মিথ্যে কথা বলি না। তবে কোনো কোনো ব্যাপার গোপন করে যাই। তুই এত নরম, অলি, অনেক সত্যি কথা শুনলে তুই আঘাত পাবি, সেইজন্য সেগুলো বলি না। কোনো কিছু গোপন করা আর মিথ্যে কথা বলা কি এক?

-এখন কিছু গোপন করো না। আমার ওপরে কী কারণে তোমার রাগ হয়েছে সেটা সত্যি করে বলল!

-তোর নাম অলি কে রেখেছিল?

-তুমি কথা ঘোরাচ্ছো!

-কিছুদিন ধরে আমার মনের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক একটা লড়াই চলছে। একদিকে মানিকদা, কৌশিকরা, আর একদিকে তুই। একটা দারুণ ঝঞ্ঝাট চলছে এই নিয়ে, অন্য কাউকে কিছু বলতে পারছি না, এমনকি তোকেও না!

-আমাকেও বলতে পারো না? আমি কি তোমার কোনো কাজের বাধা হয়ে উঠেছি?

-তুই যে অলি, তুই আমার একেবারে নিজস্ব অলি, তোকে অন্য কেউ ছোঁবার চেষ্টা করলেও তাকে আমি শেষ করে দেবো, অথচ, আমি যেন তোকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছি, আমি তোর দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিই...

-বাবলুদা, তুমি কী বলতে চাইছো, আমি এখনো বুঝতে পারছি না!

–তবে বলি শোন। ঘাবড়ে যাস নি কিন্তু। দিন দশেক আগে থেকেই আমার কী যেন হয়েছে, আমি প্রায় সর্বক্ষণ মনে মনে একটা কথাই বলছি, এরকম আগে কখনো হয়নি। এখন আমি মনে মনে বলছি, আমার অলিকে চাই, আমার অলিকে চাই! সমস্ত শরীর দিয়ে চাই, সর্বস্ব দিয়ে চাই, এক্ষুনি চাই, সর্বক্ষণ চাই, ঠিক যেন পাগলামির মতন। তোর দিকে তাকালে, মাঝে মাঝে সত্যি আমার মনে হচ্ছিল, পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো, এক মুহূর্তও তোর কথা মন থেকে সরাতে পারছি না, শুধু চাই চাই, অলিকে চাই, অলিকে চাই বলে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল। আর কারুকে ভালো লাগছিল না। কৌশিকের কথাও শুনতে ইচ্ছে করছিল না। আমি তবু অতি কষ্টে নিজেকে দমন করে, তোর সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে...আজ তুই আমার সঙ্গে কোনো হোটেলে যেতে চাস নি, খুব ভালো হয়েছে, যদি যেতাম, আমি বোধহয় তোকে খেয়েই ফেলতাম, অলি, আমার সংযম নেই, আমি তোকে এরকম পাগলের মতন কেন যে চাইছি...

অতীনের হাতে একটা চাপড় মেরে অলি বললো, বাবলুদা, আমি তোমার কাছে কী চাই, তা তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?

অলির এরকম প্রশ্ন শুনেও অতীন কিছু জানতে চাইলো না। সে নিজের মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে অলির একটি কানের লতি আলতোভাবে কামড়ে ধরলো।

৪১ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এলাকা ছাড়িয়ে

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এলাকা ছাড়িয়ে অনেক দূরের শূন্যে, মহাকাশ যান জেমিনি ৭ নম্বরে চমৎকার ঘুম হয়েছে জেমস লোভেলের। চোখ মেলে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে সে অদূরে তার সঙ্গীকে দেখতে পেল। বন্ধ বাতাসে ভাসছে বিটোফেনের নবম সিমফনির

সুর। যদিও বাইরের আকাশ দেখা যাচ্ছে না, তবু সেই সুরের মূর্ধনায় লোভেলের মনে হল এখন সব কিছুই গাঢ় নীল। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে সে বলল, গুড মর্নিং, ফ্র্যাঙ্কি!

ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান একটি দূর-নিরীক্ষণ যন্ত্রে চোখ দিয়ে বসেছিল এবং রেকর্ডের সঙ্গীতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শিস দিচ্ছিল। মুখ তুলে সে বলল, এটা কি সকাল না সন্ধ্যা?

দু'জনেই হেসে উঠলো এক সঙ্গে। সত্যিই তো, এই মহাশূন্যে সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, দিন নেই, রাত্রি নেই, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ নেই। স্বদেশ-বিদেশ নেই, এমনকি আবহাওয়া পর্যন্ত নেই। সীমাবদ্ধ মানুষের কল্পনায় এরকম অনেক কিছু না থাকলেও এখানে যেন আরও অনেক কিছু আছে।

ফ্লাস্ক থেকে একটি কাপে খানিকটা কফি ঢেলে লোভেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বোরম্যান বলল, চটপট তৈরি হয়ে নাও জিমি, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেমিনি ৬-এর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। আমরা খুব সম্ভবত একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে যাচ্ছি। এই নিবাত, নিষ্কম্প শূন্যমণ্ডলে দুটি মহাকাশ যানের মিলন যদি সম্ভব হয়, অর্থাৎ রান্দেভু ও ডকিং নিখুঁত হয়, তবে চাঁদে নামবার পথে আমাদের আর কোনো বাধাই থাকবে না। এরপর খুব শিগগিরই মানুষ একদিন চাঁদে পা দেবে!

ভালো করে উঠে বসে লোভেল বলল, যদি বলছো কেন, সম্ভব হবেই।

এই সময় পৃথিবী থেকে বার্তা আসতেই বোরম্যান বাজনাটা থামিয়ে দিল। ঘুমের রেশ তাড়াবার জন্য লোভেল চোখে জল দিয়ে দাঁতটা মেজে নিল দ্রুত, তারপর দু'জনেই কাজে লেগে গেল এক সঙ্গে।

লোভেল-এর চোখে ভেসে উঠলো পৃথিবীর ছবি। চার শো কোটি মানুষ অধুষিত পৃথিবীর এই রূপ এ পর্যন্ত দেখেছে মাত্র অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন। সবুজ হাল্কা ঘেরা একটি পরিপূর্ণ গোলক, যেখানে মরুভূমি নেই, সমুদ্র নেই, নগর কারখানা নেই। মানুষের চিহ্নমাত্র নেই, তবু সেই গোলকটিকে প্রকৃতির একটা খেলনা মনে হয় না। মনে হয় অতিমাত্রায় জীবন্ত,

সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা। মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে এলেও লোভেল ও বোরম্যান সেই সুদূর, সবুজাভ পৃথিবীর দিকে যতবার তাকিয়েছে, তারা অনুভব করেছে বুকের মধ্যে প্রবল এক হ্যাঁচকা টান।

কমপিউটারের দিকে চোখ রেখে লোভেল বললো, ফ্র্যাঙ্কি,তুমি ওয়েনডেল উইকির লেখা ‘ওয়ান ওয়ার্লর্ড’ নামের লেখাটি পড়েছ? এখানে এসে আমার বারবার মনে হচ্ছে, আমাদের পৃথিবীটায় যদি একটাই মানুষ জাতি থাকতো, যদি এই পৃথিবীতে সব মানুষের সমান অধিকার থাকতো! তা নয়, ভাষা, ধর্ম, গায়ের রঙের ভেদাভেদে আমরা পরস্পর মারামারি করে মরছি। এই সুন্দর পৃথিবীটি কেন হিংসায় ভরা?

বোরম্যান গম্ভীরভাবে বলল, এক সময়ে তো সব সমানই ছিল। মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। নিজের দোষে। তুমি ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিস অধ্যায়ের দশ ও এগারো নং চ্যাপ্টার পড়নি?

লোভেল বলল, আমাদের পরিবার তোমাদের মতন চার্চ গোয়িং নয়, আমি ইস্কুলে শিশুপাঠ্য বাইবেল ছাড়া আর বিশেষ কিছু পড়িনি। কী আছে জেনেসিস অধ্যায়ে? ৫৬৪

–তুমি টাওয়ার অফ ব্যাবেলের কথা জানো না?

–নামটা শুনেছি তো বটেই, অনেক লেখাতে উল্লেখও দেখেছি, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কী তা। আমার জানা নেই।

–তবে সংক্ষেপে বলি শোনো। মানবজাতির আদি ভাষা ছিল হিব্রু...

লোভেল হা হা করে হেসে উঠল। তারপর দ্বিতীয় কাপ কফিতে একটা চুমুক লাগিয়ে বলল, তুমি এই গাঁজাখুরি কথাটায় বিশ্বাস কর? মানুষের আদি ভাষা হিব্রু? আমার ভাষাতত্ত্বে কোনই জ্ঞান নেই, তবু আমি এইটুকু অন্তত জানি যে প্রাচ্য দেশগুলিতে এর চেয়ে অনেক প্রাচীনতর ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে।

বোরম্যান শান্ত কণ্ঠে বলল, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। তুমি জেনেসিস অধ্যায়ের কাহিনীটা শুনতে চেয়েছো, সেটাই বলছিলুম। কোনো একটা সময়ে নিশ্চয়ই মানুষের একটাই ভাষা ছিল। জুডাইয়ো-খ্রীষ্টান ট্র্যাডিশনে মনে করা হয় সেই ভাষাটাই হিব্রু। নোয়ার বংশধররা ছিল হিব্রুভাষী, তারা প্রাচ্য দেশ ছেড়ে পশ্চিমে গিয়ে শিনার বা ব্যাবিলোনিয়ায় উপস্থিত হয়, সেখানে ব্যাবেল নামে একটি শহর নির্মাণ করে। পরবর্তীকালে সেই শহরেরই নাম হয় ব্যাবিলন। এই ব্যাবেল-এর রাজার নাম নিমরড, সে হচ্ছে নোয়ার দৌহিত্রের দৌহিত্র। এই নিমরড উত্তরাধিকারীসূত্রে এক জোড়া চামড়ার পোশাক পেয়েছিল, কোন পোশাক জানো? স্বয়ং ঈশ্বর অ্যাডাম ও ইভের জন্য যে পোশাক বানিয়েছিলেন, এই সেই পোশাক এবং এই পোশাক পরিধান করে নিমরড হয়ে উঠেছিল মহা শক্তিশালী বীর ও শিকারী। দুর্দান্ত অহংকারীও হয়ে উঠেছিল সে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে পর্যন্ত স্পর্ধা করতে শুরু করল...জিমি, তোমার সামনের তিন নম্বর কমপিউটারে একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠলো, কী বলছে দ্যাখো তো!

লোভেল সে যন্ত্রের গণনা পাঠ করে বলল, আমাদের তৈরি থাকতে বলছে। রান্দেভুর আর সত্তর মিনিট দশ সেকেণ্ড দেরি আছে। ফ্র্যাঙ্কি, তুমি নিমরডের গল্পটা শেষ করো।

বোরম্যান বলল, এই নিমরড এমন একটা গম্বুজ নির্মাণ করবে ঠিক করল, যার চূড়া আকাশ স্পর্শ করবে। সেই গম্বুজে উঠে সে স্বর্গ আক্রমণ করবে। তার পূর্ব পুরুষদের বন্যার জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল বলে সে ঈশ্বরের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। শেষ পর্যন্ত তৈরি হলো এই গম্বুজ, যা সত্তর মাইল উঁচু।

–সত্তর মাইল উঁচুতেই স্বর্গ?

–তখনকার কল্পনার পক্ষে আকাশের দিকে সত্তর মাইল উচ্চতা নিশ্চিত অনেকখানি! এই বিশাল গম্বুজের পূর্ব দিকে একটা সিঁড়ি, যেটি আরোহণের জন্য, আর পশ্চিম দিকে অবতরণের জন্য আর একটি সিঁড়ি। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের উদয় অস্তের মতনই

এই পূর্ব-পশ্চিমের সিঁড়ি দুটি। সমস্ত কর্মীরা অভিন্নমত হয়ে, মিলেমিশে সুশৃঙ্খলভাবে তৈরি করল এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটি। এই স্তম্ভই টাওয়ার অফ ব্যাবেল নামে পরিচিত।

–এই নামটার সঙ্গে মানুষের নানান ভাষার কচমচির কী একটা যেন সম্পর্ক আছে না?

–হ্যাঁ, এবারে সেটাই বলছি। এক রাত্তিরে স্বয়ং ঈশ্বর সেই স্তম্ভ ও নগরীটি দেখতে এলেন। তাঁর সিংহাসনের চার পাশ ঘিরে আছে সত্তরটি দেবদূত। ঈশ্বর মানুষের সেই সদর্প কীর্তি অবলোকন করে বললেন, দ্যাখো কাণ্ড! এই মানুষেরা একই জাতি এবং একটাই ওদের ভাষা, ওরা ভবিষ্যতে কী যে করতে পারে, এটা সবে মাত্র তার শুরু।.এবং ওরা যা করতে চাইবে তা কিছুই আর অসম্ভব থাকবে না। তখন তিনি মানুষের ভাষার মধ্যে ধন্দ ঢুকিয়ে দিলেন, পরস্পরকে আর তারা বুঝতে পারলো না, তারপর তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দিল। গণ্ডগোলটা কী রকম হলো জানো? গম্বুজের কারিগরদের একজন হয়তো তার সহকারির কাছে একটা হামানদিস্তা চাইলো, সে ভাষা বুঝতে না পেরে এনে দিল ইট, বারবার এরকম ঘটতে থাকায় একজন আর একজনের মাথায় হঁট ছুঁড়ে মারল। কিছুদিন মারামারি করার পর সেই মানুষেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন ভাষা নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো সারা পৃথিবীতে। ভাষা নিয়ে সেই ঝগড়া এখনো চলছে।

–কিন্তু এই কাহিনীতে তো দেখা যাচ্ছে মানুষের কোনও দোষ নেই, ঈশ্বরই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। অথচ মানুষ জাতি এই তথাকথিত ঈশ্বরের সন্তান।

–মানুষ স্বর্গ দখলের স্পর্ধা দেখালে ঈশ্বর রাগ করবেন না? তা ছাড়া মানুষের ঐ একতা দেখে ঈশ্বরের নিশ্চয়ই ঈর্ষা হয়েছিল; একতাবলে মহাশক্তিশালী হলে মানুষ আর ঈশ্বরকে গ্রাহ্য। করবে না। এই জন্যই ওল্ড টেস্টামেন্টের ভগবানকে ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর বলা হয়েছে। অবশ্য অন্য কোনো ধর্মের ঈশ্বরকেই আমি কম হিংসুক বলতে পারি না সত্যের খাতিরে। কোনো ঈশ্বরই মনুষ্যজাতির অহিংস একতা চায় না এখনো।

–তাহলে, ফ্র্যাঙ্কি, তোমার কী মনে হয় না, আধুনিক মানুষের চিন্তার জগৎ থেকে এই ঈশ্বর নামের বিদঘুঁটে বিশ্বাসটিকে একেবারে ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলা উচিত? ভগবান নামে এই ভূতটাই তো মানুষের প্রধানতম শত্রু!

–তুমি আমি চাইলেই কি তা মুছে ফেলা সম্ভব! পৃথিবীর সব দেশেই ঈশ্বরের দালালগুলি অতিশয় শক্তিমান। এমন কি যারা ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বর-টিশ্বরের ধার ধারে না অথচ ক্ষমতার উচ্চ শিখরে বসে আছে, তারাও নিজেদের সুবিধের জন্য নিরীহ জনসাধারণের ওপর ভগবান নামে একটা বিরাট বোঝা চাপিয়ে রাখে। ধর্ম হচ্ছে মাদক ককটেল আর তার মাঝখানের চেরি ফলটি হচ্ছেন ঈশ্বর।

–কিন্তু কমুনিস্টরা তো ঈশ্বরকে মুছে ফেলেছে। এই শতাব্দীতে এটা নিশ্চিত মস্ত বড় একটা ঘটনা...এই রে, আমাদের কথাবার্তা আর্থ সেন্টার শুনতে পাচ্ছে না তো?

–না, আমি আগেই প্রধান কমপিউটার রিডিং-এর সঙ্গে আর্থ সেন্টার জুড়ে দিয়েছি। আমাদের হাতে আর কতটা সময় আছে?

–অনেক। কথাবার্তা না বলে চুপ করে বসে থাকলে প্রতিটি মুহূর্তকেই মনে হয় অনন্ত মুহূর্ত। ফ্র্যাঙ্কি, আমার নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা তেমন মনে পড়ছে না। গোটা মানবজাতির কথা এক সঙ্গে ভাবছি, যেন দেখতে পাচ্ছি একটিই অর্ধনারীশ্বরকে। এত দূরে এসেছি বলেই কি এরকম মনে হচ্ছে।

–নিশ্চিত তাই, জিমি। তুমি যে বললে, কমুনিস্টরা ঈশ্বরকে মুঝে ফেলেছে, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। সত্যিই কি মুঝে ফেলেছে? জনসাধারণের মাথার ওপর তারাও কি অন্য কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে না? মার্কসইজম তো অবিকল একটি ধর্মেরই মতন, গত শতাব্দীতে উদ্ভূত হলেও এই শতাব্দীতেই প্রত্যক্ষত পরীক্ষিত ধর্ম। এই ধর্মেরও সার কথা, আমার জানা অন্য যে কোনো ধর্মেরই মতন, হয় সবাইকে নিজের দলে টানো, নয় তাদের মারো। সুতরাং মারামারি কাটাকাটি চলতেই থাকবে।

–হয়তো সারা পৃথিবীই কমুনিস্ট হয়ে গেলে মানুষের মধ্যে প্রকৃত শান্তি আসবে। সেটাই তো কমুনিজমের মূল কথা, তাই না?

–এটা একটা তত্ত্ব মাত্র। যদি শেষ পর্যন্ত তা না হয়? তা হলে তো মারামারি কাটাকাটি চলতেই থাকবে। ক্রিশ্চিয়ানিটিও তো এই একই কথা বলতে চেয়েছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে তো ক্রিশ্চিয়ানিটিকে একবারও চান্স দেওয়া হয়নি; সকলেই ক্রিশ্চিয়ান হলে মানুষের মধ্যে সম ভ্রাতৃত্ববোধ আসতেও পারতো হয়তো।

–ক্রিশ্চিয়ানরা নিজেদের মধেই তো মারামারি করেছে?

–কম্যুনিস্টরা এর মধ্যেই বুঝি নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেনি? পৃথিবীতে এখন যে কটা কম্যুনিস্ট দেশ তাদের মধ্যে মতের মিল আছে? হাঙ্গেরিতে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক নেমেছিল, চীন ও সোভিয়েট দেশের মধ্যে এখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তুমি জানো কি, রুমানিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ানরা পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না? আমার এক বন্ধু চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়েছিল, সেখানে সে দেখেছে, একটা মদের পার্টিতে হঠাৎ দু'দলে বেঁধে গেল প্রচণ্ড ঝগড়া। এই দুটো দল কাদের জানো? একদিকে চেক অন্য দিকে শ্লাভেরা, একই দেশের মানুষ এবং মার্কসইজুমে দীক্ষিত হয়েও এদের মধ্যে পুরোনো জাতিগত রেশারেশি রয়ে গেছে। পেটে একটু মদ পড়লেই তা বেরিয়ে পড়ে। এ যেন ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই ঈশ্বরের অভিশাপের মতন, মানুষে মানুষে রেশারেশি থাকবেই, এমন কি সাম্যের বাণীও তা ঘোচাতে পারছে না।

–কিন্তু তোমার ঐ ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর তো মানুষে মানুষে ভাষার বিভেদ ও সেই কারণে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু যেখানে সেই বিভেদ নেই, যেমন ধরো পূর্ব ও পশ্চিম জামানি, একই ভাষা, একই সংস্কৃতি, অথচ মাঝখানে কী গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গেল!

–তার কারণ ভাষা ও সংস্কৃতির চেয়েও ধর্ম অনেক বড় হয়ে ওঠে। আগেকার ইণ্ডিয়া ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান হয়ে গেল যে কারণে। জার্মানিতেও ক্যাপিটালিজম ও কমিউনিজম নামে এ যুগের সব চেয়ে দুটি প্রবল ধর্মের সংঘাত, তার ফলে ঐ মাঝখানের দেওয়াল।

–কিন্তু, ফ্র্যাঙ্কি, পূর্ব জার্মানদের কি সোভিয়েটরা জোর করে তাঁবে রেখেছে বলতে চাও? তারা অন্য অংশের সঙ্গে মিলন চায় না? জামান জাত কি এত কাপুরুষ? দু'চারটে লোক পাঁচিল টপকে এদিকে আসার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু পূর্ব জার্মানিতে সেরকম কোনো গণ অভ্যুত্থান তো হয়নি!

–পশ্চিম জার্মানির মানুষও কমিউনিজম মেনে নিয়ে অন্য জার্মানির সঙ্গে মিলতে চায় কি তা জানবারও কোনো উপায় নেই। কারণ, ওদিকে যেমন সোভিয়েতরা, এদিকে তেমনি আমরাও ওদের ঘাড়ে চেপে বসে আছি। শোনো জিমি, পূর্ব থাকলে পশ্চিম থাকবেই। সব দেশের মধ্যেই পূর্ব পশ্চিম আছে। আমাদের পৃথিবীটাও পূর্ব পশ্চিমে বিভক্ত, উত্তর দক্ষিণে নয়। এমন কি, ভালো করে ভেবে দ্যাখো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও একটা করে পূর্ব পশ্চিম আছে। পূর্বের চেয়ে পশ্চিম অনেক বেশী বর্ণাঢ্য, কারণ ধ্বংসের আগে কিংবা অস্তাচলে যাবার আগে আভাটা বেশি হয়। এরপর পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে পুবের আকাশ ও পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করো। ৩

–ফ্র্যাঙ্কি, তুমি কি নৈরাশ্যবাদী?

–অ্যাঁ? না, না, আমি কখনোই নৈরাশ্যবাদী হতে চাই না। তবে আমি কোন আপ্ত বাক্য অর্থাৎ অন্যের প্রচারিত আদর্শবাদই বিনা যুক্তি-তর্কে গ্রহণ করতে রাজি নই। যাই হোক, জিমি, এখন আমাদের আশাবাদ নিবদ্ধ থাক আমাদের আশু সাফল্যের প্রতি। জেমিনি ৬ আর কত দূর? মানুষে মানুষে যতই বিভেদ থাক, দুই মহাকাশ যানের মিলন সার্থক করতেই হবে।

–আজ আমরা সার্থক হবই। আমি স্বপ্ন দেখেছি, রুশীদের আগে আমরাই চাঁদের মাটিতে পা দিয়েছি।

এবারে বোরম্যান মৃদু হাস্য করে লোভেলের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, এতক্ষণ পরে তোমার ভেতর থেকেও বেরিয়ে এসেছে আসল মানুষটা! কেন জিমি, সোভিয়েট দেশের কেউ আগে চন্দ্র জয় করলে কী ক্ষতি আছে? সেও তো মানুষেরই জয়! তুমি সব মানুষের মিলনের কথা বলছিলে,কমিউনিজমের প্রশংসা করছিলে, তবু তোমার মধ্য থেকে থলে-বন্দী বিড়ালের মতন জাতি-বৈরী বেরিয়ে পড়ল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোভেল বলল, ঠিক বলেছ; আমাদের শিক্ষাদীক্ষার ধরন ও প্রচার যন্ত্রগুলির অনবরত চিৎকারে এরকম একটা ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। আমরা আমেরিকানরা, যে কোনো উপায়ে ছলে বলে কৌশলে সোভিয়েটদের ওপরে থাকতে চাই।

তার জন্য যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও যেন কিছু আসে যায় না। দ্যাখো সোভিয়েটরা আর আমরা মহাকাশ অভিযানের প্রতিযোগিতায় নেমেছি। রাশি রাশি অর্থব্যয় হচ্ছে। অথচ দুটি দেশ এক সঙ্গে হাত মিলিয়ে যদি গবেষণা চালাতো, কত অর্থের সাশ্রয় হতো। অগ্রগতি ত্বরান্বিত হত! মনুষ্যজাতিই তো সেই ফল ভোগ করত। কিন্তু তা হবার নয়।

ক্যাপিটালিজম ও কমুইনিজ নামে এ যুগের দুই ধর্মের লড়াই তো পৃথিবীটাকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে! এ যুদ্ধের তো কোনো হারজিত নেই। কেন না, এরকম সর্বাত্মক ধ্বংসের অস্ত্র তো মানুষের হাতে আগে আসেনি।

–আশা করি আমাদের জীবকালের মধ্যে সেই মহাপ্রলয় দেখে যেতে হবে না।

–ফ্র্যাঙ্কি, ঈশ্বর নামে সত্যিকারের কেউ যদি থাকবেন, তা হলে এ সময় তিনি হস্তক্ষেপ করে কি মানুষকে বাঁচাতে পারবেন না? তিনি কি মনুষ্যজাতির ধ্বংসই চান? তাহলে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন কেন?

–এ পৃথিবীতে মানুষের পাপের ভরা পূর্ণ হলে এক সময় তিনি মহাপ্লাবন ঘটিয়েছিলেন, আবার তিনি হয়তো সেই কারণেই মহাপ্রলয় চান!

–ফ্র্যাঙ্কি, তুমি কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করো?

বোরম্যান সহসা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। একটুক্ষণ মুখ নিচু করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি ঠিক জানি না। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে পাই না, তবু প্রায়ই এই প্রশ্নটা জাগে, একটা কোনও শক্তি কি নেই, যা এই জগৎ সংসার নিয়ন্ত্রণ করছে? শুধু আহার নিদ্রা মৈথুনের জন্যই কতগুলি বছর এই পৃথিবীতে কাটিয়ে যাওয়া, এটাই যদি শেষ কথা হয়, তাহলে জীবনটা অর্থহীন হয়ে পড়ে না? মানুষ কি কিছুই খুঁজবে না?

--চেতনার উন্নত স্তরে পৌঁছবার চেষ্টা করে যাওয়াই তো মানুষের জীবনের পরম অনুসন্ধান! আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতাই আমাদের শিক্ষক, তা ছাড়া আর কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন আছে কি?

–তুমি ঠিক কী বলতে চাইছো, জিমি, আমি ঠিক বুঝলাম না।

–জীবনের সার্থকতা হল বোধের বিকাশ। যে-কটা দিন বেঁচে গেলাম, জীবনটাকে বুঝে গেলাম। পৃথিবী ছাড়িয়ে এসে, এই দিকহীন মহাশূন্যে এসে বারবার টের পাচ্ছি, আমি নামে এই মানুষটা কত সামান্য, অণু-পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র, এই বিরাট বিশ্ব-সংসারে আমার যেন কোনো ভূমিকাই থাকতে পারে না। আবার সঙ্গে সঙ্গেই একথা মনে হয়, স্নেহ-প্রেম-মমতায় আমার যে জীবন, তাও তো কম বিশাল নয়, মহাকালের একটা অংশ আমি বহন করছি, আমার এই মগজে আমি এই নিখিল বিশ্বকে ধরে রাখতে পারি, আমার চেতনা এই আকাশের মতন পরিব্যাপ্ত। মানুষের এই বোধই তার জীবনটাকে সম্মানিত করতে পারে।

ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর বেশি দেরি নেই। সেই চরম মুহূর্ত আগতপ্রায়। কী সুন্দর, শুদ্ধ, পবিত্র এই মহাশূন্য। জিমি, ডকিং-এর সময় জেমিনি ৬-এর সঙ্গে সমান্তরাল হতে যদি আমাদের এক মাইক্রো মিলিমিটার ব্যবধান ঘটে, তা হলে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমরা টুকরো টুকরো হয়ে হারিয়ে যাবো। আমাদের আর কোনো চিহ্নও থাকবে না।

–তেমন যদি হয়ও, তা হলেও কি কিছু থাকবে না? ধ্বংস হয়ে গেলেও কী জীবন একেবারে হারিয়ে যায়?

–যায় না?

–ফ্রাঙ্কি, ফ্র্যাঙ্কি আমরা এখানে কী করছি? কেন আমরা এখানে এসেছি? কি হবে এই মহাকাশযান প্রতিযোগিতায়? চাঁদে নেমেই বা আমাদের লাভ কী হবে? মনুষ্য জাতি এর থেকে কী পাবে?

–এসব প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, জিমি, সামনে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের নিয়তি। মানুষের জীবনে এটাই তো একটা প্রধান ট্র্যাজিডি যে তাকে এগিয়ে যেতেই হবে, থেমে থাকার কোনো উপায় নেই। মহাকাল যেমন গত শতাব্দীতে থেমে থাকেনি, মানুষের জীবন যেমন যৌবনে থেমে থাকতে পারে না, বিজ্ঞান যেমন কখনো বলতে পারবে না, যথেষ্ট হয়েছে, আর চাই না, অস্ত্র প্রতিযোগিতা যেমন কোথাও শেষ হবে না, স্প্যানিশ জাহাজে চেপে কলম্বাস যেমন প্রথম দ্বীপটিতে পৌঁছেই বলতে পারেননি, আর যেতে চাই নাঃ...প্রবল এক অতৃপ্তি মানুষকে সব সময় ঘুরিয়ে মারে, এই অতৃপ্তি থেকেই যত সব উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম, হিংসারও জন্ম! এর পর যখন মহাকাশে পাশাপাশি দুটি মার্কিন ও সোভিয়েত মহাকাশ যান যাবে, আমরা অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকবো, আর একজন যাতে আগে যেতে না পারে, সেইজন্যে তাকে ধ্বংস করতে চাইবো, এমনকি এখন থেকেই অঙ্ক কষে অস্ত্র ছুঁড়ে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ দেশকে ঘায়েল করতে সুযোগও হারাব না!

–এটা যে মনুষ্যজাতির আত্মধ্বংস, তা তো একটা শিশুও বোঝে।

–অনেকেই বোঝে। যে বৈজ্ঞানিক অস্ত্র বানাচ্ছেন, তিনি বোঝেন না? অন্যকে মারতে গেলে নিজের মৃত্যুরও যে ডেকে আনার সম্ভাবনা থাকে, তা কে না বোঝে? তবু যেন কোনো উপায় নেই, মনুষ্যজাতির ইতিহাসের কোনো একটা বিশেষ অংশে দু'দণ্ড থেমে জিরিয়ে নেবার উপায় নেই। জন্ম থেকেই মানুষ একটা গড়ানে পাথরের ওপর চেপে বসে।

–ফ্র্যাঙ্কি, যদি আর একটু পরেই আমরা শেষ হয়ে যাই, তার আগে আবার পৃথিবীকে দেখে যেতে ইচ্ছে করছে। একবার দেখাও।

–এখন আমাদের চোখে আমাদের হাসি-কান্নার পৃথিবীটা আকাশের যে-কোনো গ্রহ তারকারই মতন। চোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পাবো না। এসো আমরা কল্পনায় দেখি।

রকেটের পোর্ট হোল দিয়ে দু জোড়া ব্যাকুল চক্ষু চেয়ে রইলো বাইরে।

এই সময় পৃথিবীতে যথা নিয়মে প্রেম ও প্রতারণা, সেবা ও স্বার্থপরতা, আদর্শবাদ ও ভণ্ডামি, শান্তির বাণী ও যুদ্ধ, ক্ষুধা ও বিলাসী অপচয় সব কিছুই চলছে ঠিকঠাক। এরই মধ্যে একটি অতি ছোট্ট দৃশ্য এইরকম :

হরিদাসপুর পেট্রাপোল সীমান্তের দু'পাশে রক্ষীবাহিনী, কয়েকদিন আগেও তারা পরস্পরের দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছিল, আজ তারা অস্ত্র নামিয়ে রেখেছে পাশে। দু'দিকের রক্ষীবাহিনীর পিছনে যে সমস্ত মানুষ তাদের ভাষার বিভেদ নেই, সংস্কৃতির ঐক্য রয়েছে তবু তাদের মাঝখানে কঠোর সীমারেখা, তারা এখন দুই শত্রু দেশের নাগরিক। তারা ধর্মে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। অধিকাংশ হিন্দুই জানে না, তাদের ধর্মটা প্রকৃত পক্ষে ঠিক কী। বাপ-ঠাকুদার কাছ থেকে গালগল্প শুনেছে মাত্র অথবা কিছু অশিক্ষিত পুরুত পাণ্ডা যা খুশী বানিয়ে বলেছে; একটা অক্ষর সংস্কৃত ভাষা বোঝে না, তারা তবু ভুলভাল সংস্কৃত বচন শুনলে ভক্তিতে মাথা নোয়ায়। যারা মুসলমান তারাও অধিকাংশই কিছু জানে না ইসলামের মূলতত্ত্ব, মোল্লা ও হঠাৎ নেতারা যা শোনায় তাই-ই মাথা নিচু করে মেনে নেয়। সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্বে তাদের ভাত-কাপড়ের কী

আসে যায় তা ভাবতে শেখেনি, এক বর্ণ বোঝে না আরবী ভাষা তবু আউড়ে যেতে হয়। এই দুই জাতির অন্তরে অন্তরে কোনো শত্রুতা নেই তবু একটা পারস্পরিক ঘৃণা ও অবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তোলা হয়েছে।

যুদ্ধ বিরতির পর সম্প্রতি সীমান্ত একটু নরম হয়েছে, যেন সামান্য একটু ফাঁক করা হয়েছে দরজা। বন্দী ও অন্তরীণ মানুষদের বিনিময় চলছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৩৮৫৩ জনকে যুদ্ধের দরুন আটকে রাখা হয়েছিল পাকিস্তানী নাগরিক বলে, পূর্ব পাকিস্তানে এই সংখ্যাটি হাজার পাঁচেক। মাত্র আঠারো বছর আগেই এরা ছিল একই দেশের নাগরিক, এখন এরা এসেছিল আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, কেউ বা নিজের জন্মস্থান দেখতে, কেউ এনেছিল ওপার থেকে পাটালি গুড়,কেউ এপার থেকে নিয়ে গিয়েছিল স্পঞ্জ রসগোল্লা, এরা বন্দী হয়েছিল দিল্লি ও করাচীর কয়েকজন মাত্র মানুষের জেদাজেদিতে।

বন্দী বিনিময় চলছে গুণে গুণে, সুশৃঙ্খলভাবে। আশ্চর্য ব্যাপার, ছাড়া পেয়েও উৎফুল্ল হবার বদলে কেউ কেউ কাঁদছে, এদিকের মাটি ছেড়ে ওদিকে যেতে তাদের পদক্ষেপ দ্রুত হচ্ছে না। পশ্চিম সীমান্ত থেকে একটি ক্রন্দনরত পরিবার ওদিকে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ একজন রেডক্রশ কর্মী, সদ্য তরুণ সে, ছুটে গিয়ে সেই পরিবারের একজনের হাতে একটি ফুলের মালা দিয়ে বললো, আবার আসবেন!

তা দেখে পূর্ব দিকের একজন রক্ষী সেদিকের একজন ক্রন্দনরত মহিলার দিকে তাকিয়ে বললো, ঠিক আছে, আপনের পোটলাটা নিয়া যান। আর কাইন্দেন না, সময় ভালো হইলে আবার আসবেন!

৪২ মামুনের মেজাজ খারাপ

সকাল থেকেই মামুনের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। তাঁর পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার নিচের চার কলম জুড়ে গভর্নর মোনেম খাঁর প্রশস্তিমূলক একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। তাঁর সম্পাদিত কাগজ পড়তে গিয়ে মামুন নিজেই আঁতকে উঠলেন।

কাগজ বড় হয়েছে, কাজ অনেক বেড়েছে, এখন প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা দেখে ছাড়া মামুনের পক্ষে সম্ভব হয় না। নিযুক্ত করা হয়েছে একজন অভিজ্ঞ নিউজ এডিটর। প্রত্যেকদিন বেলা একটার সময় মামুনের ঘরে সেই নিউজ এডিটর, চীফ রিপোর্টার ও দু'জন অ্যাসিস্টান্ট এডিটরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকার পলিসি ঠিক করা হয়। আইয়ুব খাঁ-র নির্লজ্জ তাঁবেদার মোনেম খাঁ-র পায়ে তৈল মর্দন করা 'দিন-কাল পত্রিকার নীতি নয়, তবু এরকম খবর ছাপা হয় কী করে? কুষ্টিয়ার এক কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মোনেম খাঁ যা সব আবোল-তাবোল বকেছে, খবর হিসেবে তার কোনো মূল্যই নেই, ইংরিজি পত্রিকাগুলিতে সে খবর ছাপাই হয়নি, আর মামুনের কাগজে চার কলম! মানিক মিয়া বা অন্যান্য সম্পাদকদের সঙ্গে এর পর দেখা হলে মামুনকে নিশ্চিত বিদ্রূপ শুনতে হবে।

কাগজ পড়তে পড়তেই মামুন ফোন করলেন তাঁর নিউজ এডিটর নুরুল সাহেবকে। ফোন ধরেই নুরুল সাহেব দু'বার হাঁচলেন, তারপর যেভাবে কথা বলতে শুরু করলেন তা বুঝতে মামুনের বেশ অসুবিধে হলো। নুরুল সাহেবের নাক ভর্তি সর্দি, দন্ত্য ন গুলি ল হয়ে গেছে। মোটকথা তিনি জানালেন যে, জ্বর জ্বর বোধ হওয়ায় তিনি গতকাল রাত আটটার সময় অফিস থেকে বাড়ি চলে এসেছিলেন, মামুন সাহেব তখন ঘরে ছিলেন না বলে তিনি চার্জ দিয়ে এসেছিলেন চীফ সাব সুধীর দাসের ওপর। প্রথম পাতার অ্যাংকর নিউজটি কে লিখেছে তিনি জানেন না। তিনি নিজেও ঐ খবর পড়ে অবাক হয়েছেন।

মামুন ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন। সুধীর দাসের বাড়িতে টেলিফোন নেই। আলতাফ হয়তো জানতে পারে। কিন্তু আলতাফ তো সাংবাদিক নয়, সে ম্যানেজার, আলতাফের কাছে কোনো সংবাদের সূত্র জানতে চাওয়া সম্পাদকের পক্ষে সম্মানজনক নয়। হাতের কাছে আর কারুকে না পেয়ে মামুন ফিরোজা বেগমের ওপরই উগ্র মেজাজ দেখাতে লাগলেন। তাঁর গোসলের জন্য গরম পানি দেওয়া হয়নি কেন? খেতে বসে তিনি মাছের বাটিটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন।

শীতকালে ইলিশ মাছ তিনি একেবারে পছন্দ করেন না। ফিরোজা বেগম তা জানে না? তাঁর সেবা-যত্নের প্রতি বাড়ির লোকের কোনো নজরই নেই, তিনি তবু টাকা রোজগারের জন্য গাধার মতন খেটে চলেছেন। শেষ পাতে খানিকটা ডাল চুমুক দিয়ে খেতে মামুন ভালোবাসেন, আজ ডাল রান্নাই হয়নি।

তাড়াতাড়ি অফিসে পৌঁছে মামুন হাঁকডাক শুরু করলেন। সুধীর দাস কোথায়? এখনো আসেনি। রিপোটাররাও কেউ এখনো আসেনি, একজন মাত্র সাব এডিটর ও দু-তিনটি বেয়ারা ছাড়া আর কেউ নেই। দশটা থেকে শিফট শুরু হওয়ার কথা, বারোটার মধ্যেও অনেকেই এসে পৌঁছোয় না। মামুন তাঁর বেয়ারা আবদুলকে দিয়ে প্রফ ডিপার্টমেন্ট থেকে আগের দিনের কপির বাণ্ডিল আনালেন, আশ্চর্যের ব্যাপার, তার মধ্যে ঐ বিশেষ কপিটিই নেই। ইচ্ছে করেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

মামুন চেঁচিয়ে বললেন, আবদুল, সব কমপোজিটারদের ডেকে নিয়ায়! শান্ত প্রকৃতির মামুনকে এত রাগতে কেউ দেখেনি আগে। তাঁর চক্ষু দুটি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যে তিনজন কমপোজিটার এখন উপস্থিত, তারা কেউই ঐ নিউজ কমপোজ করেনি, কে করেছে তারা জানে না। মামুনের সন্দেহ হলো তাঁর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে, তিনি তখুনি আলতাফকে টেলিফোন করতে গেলেন, কিন্তু আলতাফকেও পাওয়া গেল না।

মামুনের নিজস্ব সেক্রেটারি শওকতও এখনো এসে পৌঁছোয়নি। এই শওকত ইদানীং গানবাজনা নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। অফিসে বসেও সে মাঝে মাঝে টেবিল বাজিয়ে গান গায়। মামুন তার গান শুনতে পছন্দই করেন, কিন্তু এখন তার ওপর রেগে উঠে ভাবলেন, এবার ঐ গায়ক ছোঁকরাটাকে তাড়াতে হবে! সবকটা অকর্মাকে তিনি আজ থেকে সমঝে দেবেন যে এই অফিসে যা খুশী করা চলবে না!

এই সময় উপস্থিত হলো সুধীর দাস। বেশ বয়স্ক মানুষ, সারা জীবন সাংবাদিকতা করে চুল পাকিয়েছেন, ধুতির ওপর সাদা শার্ট তাঁর প্রতিদিনের পোশাক। এমনই তাঁর নস্যি নেওয়ার বাতিক যে হাতে নস্যি না থাকলেও দুটি আঙুল সব সময় জুড়ে থাকে।

তাঁকে দেখে মামুন একেবারে ফেটে পড়লেন। সেদিনের কাগজটা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মামুন বললেন, এ কী ব্যাপার, সুধীরবাবু, কে এটা লিখেছে, কার হাত দিয়ে পাস হয়েছে, আমি জানতে চাই।

প্রথমেই মামুনের কথার উত্তর না দিয়ে সুধীর দাস পেছন ফিরে কমপোজিটারদের বললেন, যাও, তোমরা কাজে যাও।

তারপর এগিয়ে এসে একটা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে তিনি অতি স্বাভাবিক গলায় বললেন, আমার হাত দিয়েই পাস হয়েছে। কিন্তু আপনি এত চটছেন কেন, মামুন সাহেব?

অতি নিরীহ নিউজ, এর মধ্যে দোষের কী দ্যাখলেন?

মামুন আরও উত্তপ্ত হয়ে বললেন, নিরীহ নিউজ? আপনার কী ভীমরতি হয়েছে? এবারে আপনার রিটায়ার করার বয়েস হয়ে গেছে দেখছি। পড়ে দেখে পাস করেছিলেন?

সুধীর দাস মৃদু হাস্যের সঙ্গে বললেন, জী, পড়ে দেখেই পাস করেছি।

-কে লিখেছে এই গর্ভস্রাব? তারে আইজই আমি সাসপেণ্ড করবো।

–সেটা বলতে পারবো না।

–তার মানে? আপনি কপি ছাড়লেন, অথচ আপনি জানেন না কে লিখেছে? এর মানে কি? কপিটা আপনার হাতে কে দিল?

–যে দিয়েছে, সে লেখে নাই।

–সুধীরবাবু, আপনি আমার সাথে রহস্য করতে আছেন? আপনি লিমিট ছাড়ায়ে যাচ্ছেন, আপনার বয়েস হয়ে গেছে, আমি বলে কয়ে আপনারে কাজে রেখেছি।

–মামুন সাহেব, একটু শান্ত হন, আপনার প্রেসার হাই, এত উত্তেজনা ভালো না। আপনারে আমি বুঝয়ে বলতেছি। কপি আমার হাতে এনে দিয়েছে ইয়াকুব।

–ইয়াকুব? সে কিছু দিলেও আপনি প্রেসে পাঠাবেন? আমার পত্রিকা এতখানি জাহান্নমে নেমেছে? সুধীরবাবু, এতদিন ধরে জানালিজম করতেছেন, নিউজ পেপারের কোনো এথিকস শেখেন নাই।

–শোনেন, শোনেন, ইয়াকুব হইলো হোসেন সাহেবের খাস বেয়ারা। হোসেন সাহেব নিউজটা ছাপাতে বলেছেন, আমার ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে যে না বলি? আপনি অ্যাকটিং এডিটর, আর হোসেন সাহেব এই কাগজের প্রোপ্রাইটর ছাড়াও চীফ এডিটর, আপনার অনুপস্থিতিতে তিনি যদি কোনো নিউজ আইটেম ছাপার নির্দেশ দেন, আমি তা পালন করবো না?

–আমি অফিসে ছিলাম না, আমাকে টেলিফোনে কেন জানালেন না?

–টেলিফোন করেছিলাম, আপনি রাত্তির নয়টার সময় বাড়িতে ছিলেন না।

মামুন হঠাৎ চুপ করে গেলেন। হোসেন সাহেব ইদানীং আর কাগজের অফিসে বিশেষ আসেন না। সংবাদপত্র প্রকাশ করার সুফল তিনি ইতিমধ্যেই পেয়েছেন যথেষ্ট। অনেকেই

এখন তাঁর নাম জানে, বার বার ছবি ছাপা হওয়ায় তাঁর চেহারাটাও পরিচিত, পূর্ব-পাকিস্তানে তিনি গণ্যমান্যদের একজন। এখন তিনি আবার ব্যবসা বৃদ্ধিতে মন দিয়েছেন, একটি জ্যাম-জেলি তৈরির ফ্যাকটরি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। আইয়ুব খাঁ এখন পূর্ব পাকিস্তানে কিছু কিছু লাইসেন্স ছড়াচ্ছেন, ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা লালায়িত হয়ে উঠেছে, এমনকি অনেক

অধ্যাপক বুদ্ধিজীবীরাও নানা রকম সুযোগ-সুবিধে পেতে শুরু করে সরকার-বিরোধী মনোভাব ঝেড়ে ফেলছে একেবারে।

তা হলে মোনেম খাঁর তোষামোদ করা এই খবর ছাপানোর পেছনে আছে হোসেন সাহেবের জ্যাম-জেলির ফ্যাকটরি?

কিন্তু এ তো শুধু সরকার-তোষণ নয়, এ যে বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার সমূহ ক্ষতি করার চেষ্টায় সায় দেওয়া। ভবিষ্যতে এর কুফল কতদূর পর্যন্ত গড়াবে, তা কেউ ভেবে দেখছে না? মোনেম খাঁ সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে ও পাঠ্যপুস্তকে পরদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ আর সহ্য করা হবে না? পরদেশী সংস্কৃতি মানে কী? পাকিস্তান সৃষ্টির আগে বাংলা ভাষায় যে-সব বই লেখা হয়েছে, তা আর পড়বে না এদিকের বাঙালীরা? পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনা থাকবে না? বেতারে এর মধ্যেই রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। বাংলা ভাষায় বেছে বেছে সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়ে আর্বি-ফার্সি শব্দ ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে। জোর করে কোনো ভাষা বদলানো যায়? ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে কোনো ভাষা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে? দেশ ভাগ হয়েছে বলে ভাষাকেও ভাগ করার কথা যারা ভাবে, তারা উন্মাদ ছাড়া আর কী? দুই জার্মানির ভাষা কী বদলে গেছে? দুই কোরিয়ায়? দুই ভিয়েৎনামে?

মুখ তুলে মামুন আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, তবু, কপিটা কে লিখেছে, তা আমাকে বলবেন না, সুধীরবাবু?

সুধীর দাস বললেন, খুব সম্ভবত এটা একটা সরকারি হ্যাণ্ডআউট। যদিও টাইপ করা না, হাতের লেখা। ইয়াকুব প্রথমে কাগজখানা এনে দিয়েছিল নিউজ এড়িটর নুরুল সাহেবকে। তিনি সেখানা দেখেই শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়ি চলে গ্যালেন। তিনি জানেন, আপনি এ খবর ছাপা হলে রাগ করবেন। তিনি আরও জানেন যে, আমার হাতে পড়লে, এ কপি চেপে রাখার সাহস আমার হবে না। সত্যই তো আমার তেমন সাহস নাই।

একটু পরে ঘর ফাঁকা করে মামুন সম্পাদকীয় লিখতে বসলেন। হোসেন সাহেব বা আলতাফের সঙ্গে বোঝাঁপড়া হবে পরে। আজ তিনি কলমের কালি দিয়ে যতখানি আগুন ছোটানো যায় তা দিয়ে তিনি ভস্মসাৎ করবেন সরকারি নীতি। এ চাকরি চলে গেলেও তাঁর খেয়ে মরার ভয় নেই, কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট হয়ে এরকম চাকরি আঁকড়ে ধরে থাকলে তিনি মরমে মরে যাবেন।

লেখা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন তাঁর টেবিলের ওপর একটা ছায়া। মুখ তুলে মামুন বিষম অবাক হলেন। কালো চশমা পরা দীর্ঘকায় একজন মানুষ, সেই মুসাফির। কী করে লোকটি ঢুকলো এই ঘরে? মামুন যখন সম্পাদকীয় লেখেন, তাঁর কড়া নির্দেশ আছে, সেই সময় কোনো দর্শনার্থীকে আসতে দেওয়া হবে না। আবদুল কী ঘুমোচ্ছে?

মামুন কিন্তু বিরক্ত বোধ করলেন না। এক-একজন মানুষের উপস্থিতিতেই একটা ভালো লাগার তরঙ্গ এসে গায়ে লাগে। মুসাফিরের হাস্যময় মুখ দেখে মামুন ভুরু কুঁচকোতে পারলেন না, অভিবাদন বিনিময় করে তিনি বললেন, বসেন, একটু বসেন, আমার আর দেরি নাই।

যে-রকম মনঃসংযোগ নিয়ে মামুন লিখছিলেন, তা যেন একটু নষ্ট হয়ে গেল, একটা সিগারেট ধরিয়ে কপাল চেপে ধরে তিনি আবার লেখার মধ্যে ফিরে এলেন। সমাপ্তিটা মোটামুটি পছন্দই হলো তাঁর, একবার রিভাইজ করতে হবে, তার আগে মুসাফিরের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি কলম বন্ধ করলেন।

জেল থেকে সদ্য ছাড়া পেয়েছেন মুসাফির, কিন্তু তাঁর পোশাকে বা মুখমণ্ডলে তার কোনো ছাপ নেই। ধপধপে সাদা পোশাক, তার ওপরে একটি দামী শাল জড়ানো, মুখখানা প্রসন্নতা মাখা। তিনি একদৃষ্টিতে মামুনের মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

মামুন জিজ্ঞেস করলেন, কবে ছাড়া পেলেন?

–পরশুদিন। বিকাল তিনটার সময়।

–খুব কষ্ট দিয়েছে? টচার করেছে? কিছু কিছু রিপোর্ট পেয়েছি, তবে আপনার মতন একজন মানী লোককে...।

–না, না, কোনো টচার করেনি, অসুবিধা কিছুই হয়নি, আপনাদের জেলখানায় খাদ্যও অতি উপাদেয়। দিব্যি বহাল তবিয়তে ছিলাম।

–ক্লাস ওয়ান প্রিজনার হিসাবে রেখেছিল নাকি আপনাকে?

–তা তো জানি না, এক হল ঘরে দশ বারো জন ছিলাম, সেটা ক্লাশলেস সোসাইটি বলা যায়।

মামুন বুঝলেন যে মুসাফির সাধারণ কয়েদী হিসেবেই জেলে ছিলেন কিন্তু তিনি সে সম্পর্কে কোনো অভিযোগ জানাতে চান না। হঠাৎ একটা কথা তাঁর মনে পড়লো। তিনি বেশ খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে বললেন, আপনি তো মশায় দূরদর্শী মানুষ। ভবিষ্যৎ দেখতে পান। ইণ্ডিয়ার সাথে যুদ্ধ লাগবার কয়েকদিন আগেই আপনি ফোরকাস্ট করেছিলেন। কিন্তু আপনি নিজেও যে জেল খাটবেন তা কি আগে থেকে জানতেন?

এ কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে মুসাফির কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে হাসলেন। কেউ প্রশ্ন করলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন না, এতে যেন তাঁর চরিত্রে অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব আসে।

অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি বললেন, আমার কয়েদ তো শেষ হয়ে গেছে, এবারে আপনার জেল খাটার পালা, মোজাম্মেল সাহেব।

মামুন আঁতকে উঠলেন। লোকটা বলে কী? তিনি আজ একটু আগে যে লেখাটি শেষ করলেন, সেটার জন্য সরকারের গোঁসা হওয়ার কথা, কিন্তু এই লোকটি জানলো কী করে তিনি কী লিখছেন?

-আপনি কী বলছেন, আমাকে জেল খাটতে হবে কেন? সবে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এর মধ্যেই আবার ধরপাকড় শুরু হবে? নাঃ, এটা আপনি ঠিক বলছেন না।

-আমি ঠিকই বলছি, আপনার ললাটে লেখা আছে।

-মুসাফির সাহেব, আমার ঐ সব ললাটের লেখা-টেখায় বিশ্বাস নাই। আপনি এর আগেও আমার সম্পর্কে বলেছিলেন...

-সেটাও ভুল বলি নাই। একটি। অল্পবয়েসী তরুণী মেয়ের ছায়া দেখতে পাচ্ছি আপনার মাথার পিছনে। সে আপনারে কষ্ট দেবে, আপনিও তারে কষ্ট দেবেন!

-আমার এত কাজ, আমি নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাই না!

-বুঝেছি, আপনি ব্যস্ত, আমারে চলে যেতে বলছেন। চলেই তো যাবো আমি, ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাবো, যাবার আগে একবার আপনার সাথে দেখা করতে এলাম। অযাচিত উপদেশ দিতে এসেছি ভাববেন না, জেলের মধ্যে বসেও আমি আপনার কথা চিন্তা করেছি। ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ!

মামুন নিরস গলায় বললেন, ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।

মুসাফিরকে দেখে মামুন প্রথম যে ভালো লাগার তরঙ্গটি অনুভব করেছিলেন, সেটা হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেছে। তিনি ভেবেছিলেন, মুসাফিরকে তাঁর কাগজের জন্য কিছু লিখতে

বলবেন। কিন্তু লোকটির জ্যোতিষীগিরির চেষ্টা দেখে কেমন যেন হামবাগ মনে হলো। তিনি আর লেখার প্রসঙ্গ তুললেন না। এমন কি, মুসাফির বিদায় নেবার সময় মামুন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে দিতেও এলেন না।

লোকটা বলে কি না, মামুনের জীবনে একটি তরুণী মেয়ের ছায়া পড়েছে। যতসব রাবিশ! লোকটা স্টান্ট দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে। দৈবাৎ দুটো একটা মিলে যায়। যেমন পাক-ভারত যুদ্ধের ব্যাপারটা মিলেছে। ঐ যুদ্ধের ফলে সে নিজেও যে গারদে যাবে তা বোঝেনি?

ঐ মুসাফির অযাচিত ভাবে আজ এসেছিল কেন? এসেই বললো, এবারে মামুনের জেলে যাওয়ার পালা- অদ্ভুত কথা! একটা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে জেলে দেবে, গভর্নর মোনেম খাঁ অত বোকা নয়।

রমনা পার্কের এক কোণে ঘাসের ওপরে বসে আছে বাবুল আর মণিলাল। শীতের জন্য পার্কে একেবারে ভিড় নেই, খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে শীতটা আরও জাঁকিয়ে পড়েছে। বাবুলের হাতে একটা খবরের কাগজ ছিল, সেই কাগজ পেতে দু'জনে বসেছে ঘাসের ওপর, সামনে এক ঠোঙা বাদাম।

মণিলালকে সহজে চেনাই যায় না। তার মাথায় পাগলের মতন, উস্কোখুস্কো চুল, গাল ভর্তি দাড়ি, চোখ দুটি বসে গেছে কোটরের মধ্যে। কয়েক সপ্তাহের কারাবাস সে সহ্য করতে পারেনি।

দু'জনে বসে আছে বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু কথা বলছে সামান্যই, মাঝে মাঝে দু একটা কাটা কাটা কথা, বেশির ভাগ সময়েই নিস্তব্ধতা। এরকম ভাবে বসে থাকতে মণিলালের ভালো লাগছে না, কিন্তু বাবুল কিছুতেই উঠতে চাইছে না।

এক সময় বাবুল জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি তা হলে ইণ্ডিয়াতেই চলে যাবে?

ঝাঁঝের সঙ্গে মণিলাল বললো, তুই বার বার ঐ কথা বলছিস কেন রে? কিসের জইন্য আমি ইণ্ডিয়াতে যাবো? সেখানে আমার কে আছে?

মণিলালের বাহুতে চাপড় মেরে বাবুল বললো, তুমি আমার ওপর মিছামিছি রেগে যাচ্ছো, মণিদা। যে-কোনো কথায় ফোঁস করে উঠছো কেন?

মণিলাল একই ভাবে বললো, আমি ইণ্ডিয়ায় চলে গ্যালে তোর কী লাভ? তুই আমার সম্পত্তি ভোগ করবি? আমার তো আছে কচু পোড়া!

বাবুল ঠোঙা থেকে কয়েকটা বাদাম বার করে বললো, নাও, বাদাম খাও। শরীরটার কী দশা করেছো এই কয়দিনে? রাগ করে খাওয়া-দাওয়া করো নাই বুঝি?

–ছাগলের খাদ্য মানুষে খাইতে পারে না। আমি ছাগল না।

–সেইজন্যই তো কইতাছি, আমার বাসায় চলো, মঞ্জু তোমারে বেঁধে খাওয়াবে। মঞ্জুর হাতের রান্না তুমি তো পছন্দ করো।

–না যাবো না, আমি কারুর বাসায় যামু না।

–তুমি পল্টন ভাই-এর ওপর রাগ করে আমার উপর সেইটা ফলাচ্ছো। শোনো, পল্টন ভাইয়ের অসুবিধার কথাটা তোমারে বলি। দিলারাকে মনে আছে তো তোমার? সেই দিলারা এক পাঞ্জাবী মিলিটারি অফিসারকে বিয়ে করেছে। সে লোকটা প্রায়ই এসে ঐ বাড়িতে বসে থাকে। সে যদি তোমারে দ্যাখে, যদি শোনে যে তুমি ওয়ারের সময় ডিটেইনড আছিলা, তা হলে যদি কিছু অশান্তি করে, সেই জন্যই পল্টন ভাই তোমারে বাসায় নিয়া যাইতে চায় নাই।

সে আমারে দ্যাখলেই বোঝবে যে আমি ইণ্ডিয়ার স্পাই? ক্যান, আমি পাকিস্তানের সিটিজেন না? একবার মাত্তর একটা বিয়ার নেমন্তন্ন ছাড়া আর কখনো ইণ্ডিয়াতে যাই নাই। ঠিক আছে, আমি কারুর বাসায় যাইতে চাই না, কারুরে বিপদে ফ্যালতে চাই না।

–তুমি আমার বাসায় চলো।

–না! এক কথা বার বার বলিস না, বাবুল। শুধু জেলে যাওয়ায় আমার ক্ষতি ছিল না, কিন্তু এর মধ্যে আমার বিজনেসটা ছারেখারে গ্যাছে। ঢাকায় আমার নিজের বাসায় রাত্তিরে থাকতে ভয় হয়।

–এখন কিছুদিন তোমার ওখানে না থাকাই ভালো। আমার সাথে চলো। কিছুদিন চুপচাপ থাকো। তারপর ধীরে-সুস্থে আবার বিজনেস শুরু করবা। তুমি একেবারে পানিতে পড়ো নাই, মণিদা, আমরা তো আছিই।

–বাবুল চৌধুরী, তোমার জেনারাস অফারের জন্য বহুৎ শুক্রিয়া; কিন্তু মণিলাল রায় এখনো মরে নাই। জেল থেকে যখন বেঁচে ফিরে এসেছি, আমি আবার ঠিক উঠে দাঁড়াবো। কামালের বাড়িতে গেছিলাম, ও আমার কাছে কিছু টাকা হাওলাৎ করেছিল, সে জইন্য না, আমি টাকা চাইতে যাই নাই, কিন্তু কামালের বউ আমারে ভিতরে ঢুকতেই দিল না এই বলে যে কামালের নাকি জ্বর।

–সত্যিই কামালের জ্বর।

–আরে রাখ। কামালের বুঝি আগে কোনোদিন জ্বরজারি হয় নাই, তখন তারে আমরা দ্যাখতে যাই নাই?

–হামিদা ভাবীর স্বভাবের কথা তো তুমি জানোই, সকলের উপরেই ম্যাজাজ দেখায় ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে মণিলাল বললো, আমি চলি রে, বাবুল। বাবুল তার হাত ধরে টেনে বললো, কোথায় যাবে?

–তোরা ভাবোস, আমার কোথাও যাওনের জাগা নাই? গ্রামে একখান বুইড়া ঘর এখনো আছে।

বাবুলও উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মণিদা, পল্টন ভাইরে তুমি ভুল বুইঝো না, সে তোমারে সত্যিই। ভালোবাসে। বেচারি নিজেই খুব অসুবিধার মধ্যে আছে। মণিদা, রাগ করো না, আর একটা কথা বলবো? তোমার টাকার দরকার থাকলে আমি কিছু দিতে পারি।

বাবুলের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে মণিলাল বললো, আমার এখনো ভিক্ষা করার স্টেজ আসে নাই।

বাবুল কোনোক্রমেই মণিলালকে নিরস্ত করতে পারলো না, সে একটা রিকশা ডেকে চলে গেল একা। এই মণিলাল সব সময় হাসি-মস্করা করার জন্য বন্ধুদের মধ্যে প্রিয় ছিল।

বাস স্ট্যাণ্ডে এসে মণিলাল নারায়ণগঞ্জের বাস ধরলো। আকাশ মেঘলা বলে দুপুর বেলাতেই ছায়া ছায়া ভাব। যথারীতি বাসে প্রচণ্ড ভিড়, মণিলাল বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠোঁটে একটা তেতো তেতো ভাব, বুকের মধ্যে অনির্দিষ্ট জ্বালা। পাকিস্তান সরকার তাকে জেলে আটকে রেখেছিল, এ জন্য তার ক্ষোভ নেই, নিজস্ব যুক্তি দিয়ে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে, কিন্তু তার বন্ধুরাও তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে এখন, এটা সে সহ্য করতে পারছে না। বন্ধু না থাকলে আর এ দেশে রইলো কী? ইণ্ডিয়াতেও তার কোনো নিকট-আত্মীয় নেই, কে সেখানে তাকে আশ্রয় দেবে?

রাস্তায় একটা কিছু গোলমালে বাস থেমে যেতেই মণিলাল ভয় পেয়ে গেল। কিসের গণ্ডগোল? মুখে দাড়ি গোঁফ থাকলেও লোকে তাকে চিনে ফেলবে? যদি চিনতে পারে, যদি চিনতে পারে...

সেটা একটা ছাত্রদের মিছিল, কয়েক মিনিট পরেই বাসটা আবার ঠিকঠাক ছুটলো। বাস থেকে নেমে মণিলাল আবার একটা রিকশা নিয়ে চলে এলো শীতলক্ষা নদীর ধারে। খেয়া নৌকোয় পার হয়ে সে ওপারে নামলো যখন তখন বিকেল প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এদিকে আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে বেশ খানিকটা, তাই আকাশ পরিষ্কার, পশ্চিম দিকে খুব গাঢ় রং করে সূর্য ডুবছে।

মণিলাল হাঁটা পথ ধরলো। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, সে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিল ভালো করে, যদিও তার মাথাটা এখনো উত্তপ্ত হয়ে আছে। রাগের চেয়েও একটা প্রবল অভিমান দলা পাকিয়ে রয়েছে তার গলার কাছে। কামালের জ্বর, সেই জন্য হামিদা বেগম তাকে ওপরে যেতে দিল না? কয়েক বছর আগের দাঙ্গাতে এই কামালই তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল। পল্টনের বাড়িতে সে যখন তখন গেছে, কত রাত ঐ বাড়িতেই কাটিয়েছে, সেই পল্টনের বাড়ির দরজা তার জন্য বন্ধ। তিন বার গিয়েও জহিরকে বাড়িতে পাওয়া গেল, সে কি সত্যিই এতখানি ব্যস্ত? এর আগে কত দুঃসময় গেছে, মণিলাল নিজেকে কখনো এমন নিবান্ধব মনে করেনি।

সে এগিয়ে চললো মুন্সিগঞ্জের দিক লক্ষ করে। রাস্তা ছেড়ে সে আলপথ ধরেছে, তবু দিক নির্ণয় করতে তার কোনোই অসুবিধে হয় না। দূরের গাছপালার সারি, এখানকার আকাশ, আলপথের কাটাকুটি, এই সবই তার খুব চেনা। ইণ্ডিয়ায় গিয়ে সে কি কোনো গ্রাম্য রাস্তায় এমন সাবলীলভাবে হাঁটতে পারবে?

চাষের সময় নয়, মাঠ একেবারে ফাঁকা। তার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একলা একজন অভিমানী মানুষ। প্রায় এক ঘণ্টা পরে, সন্ধের মুখে মুখে মণিলাল মাঠ ছেড়ে ঢুকে পড়লো সাঁইবাজার গ্রামে। সে গ্রামের প্রান্তেই একটি চৌকো দিঘির পাড়ে একটি বিশাল ভূতুড়ে বাড়ি। সে বাড়িতে একটাও দরজা-জানলা অক্ষত নেই, দোতলার একটি বারান্দা একদিকে ধসে পড়েছে, সেই অংশটা আধো-অন্ধকারে একটা হাঁ-করা দৈত্যের মতন মনে হয়।

এটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। মণিলালের মনে আছে, ছেলেবেলায় এই বাড়িটি সে কত জম-জমাট দেখেছিল, কালীপুজোর সময় এই মল্লিক বাড়ির বাজি পোড়ানো দেখতে আট দশখানা গ্রামের লোক এসে জড়ো হতো। দীঘিটার দু দিকে বাঁধানো ঘাট, একটা ঘাট ছিল মেয়েদের, মল্লিক বাড়ির ছোট কতা একবার এই ঘাটের কাছে একটা পাগলা কুকুরকে গুলি করে মেরেছিলেন।

এর পরের বাড়িটা সেনগুপ্তদের। কিছুদিন আগেও দু'জন বুড়োবুড়ি ছিল এখানে, তারা দু'জনেই মরে গেল নাকি, এ বাড়িতেও কোনো আলো জ্বলছে না!

পর পর সব খালি বাড়ি। এখন এটাকে আর গ্রাম বলা যায় না, একটা পরিত্যক্ত জনপদে যেমন কিছু কিছু ইঁদুর আর কুকুর বেড়াল থাকে, সেই রকম এখানে ওখানে কিছু মানুষ এখনো রয়ে গেছে। প্রায় নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রদীপ। বামুন পাড়ায় একঘরও মানুষ নেই। ধোপা পাড়াতেও চার পাঁচ ঘর ছিল, তারা সব গেল কোথায়, ইণ্ডিয়ায়? ইণ্ডিয়া এত ধোপা নিয়ে কী করবে?

–কে যায়?

মণিলাল দারুণ ভাবে কেঁপে উঠলো। একটা বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে মোটা গলায় কেউ একজন হাঁক দিয়েছে। লোকটা হিন্দু না মুসলমান?

আঃ এই চিন্তাটা কেন যে মন থেকে কিছুতেই তাড়ানো যায় না! মানুষ আর শুধু মানুষ নেই, যে-কোনো মানুষ দেখলেই প্রথমেই যেন জেনে নেওয়া খুবই জরুরি যে লোকটি মুসলমান

হিন্দু! নিজের গ্রামের রাস্তায় মণিলাল আগে কখনো এমন ভয় পায়নি। উত্তর না দিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে রইলো। বাঁশ ঝাড়ের অন্ধকার ভেদ করে লোকটি এগিয়ে এলো কাছে। তাকে চিনতে পেরে মণিলাল যেন হাতে চাঁদ পেল, এর নাম ডোমরেল, বেশ বলিষ্ঠ জোয়ান পুরুষ, হাতে একটা ল্যাজা অর্থাৎ বর্শা।

ডোমরেলরা নিম্নবর্ণ এদের পল্লীটা এখনো অটুট রয়ে গেছে, এরা মাছ ধরে, বেতের চুবড়ি বোনে। এদের জল-চল নেই, আগে এরা মণিলালদের বাড়িতে এলেও উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতো, দাওয়ায় ওঠার অধিকার ছিল না। এই ডোমরেল একবার একটা গোসাপ ধরে দেখাতে এনেছিল তাদের বাড়িতে, মণিলালের তখন মাত্র সাত-আট বছর বয়েস,

মণিলালের বাবা একটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন, যা বেটা, দূর হ! ওডারে তো মাইরা খাবি, দ্যাখলেও আমাগো পাপ হয়।

ডোমরেল আরও কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কে?

মণিলাল তার হাত চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বললো, ডোমরেলদাদা, আমি মণি, আমারে চেনতে পারো না? আমারে এট্ট বাড়িতে পৌঁছাইয়া দাও।

৪৩ তুতুল একা একা

তুতুল একা একা কারুর বাড়িতে কখনো যায়নি। মেডিক্যাল কলেজ ও বাড়ির রাস্তা ছাড়া শহরের রাস্তাঘাট বিশেষ চেনে না। কিন্তু জয়দীপের বাড়িতে তাকে একবার যেতেই হবে। দু'দিন আগে সে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরেছে, তারপর কেমন আছে সে খবর পাওয়া যায় নি। শিখা আর হেমকান্তির কথা ছিল তুতুলকে নিয়ে যাওয়ার, কিন্তু সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলো, ওরা এলো না। আর দেরি করা যায় না।

সে মুন্নিকে জিজ্ঞেস করলো, আমার সঙ্গে যাবি এক জায়গায়?

মুন্নির আপত্তি নেই, বাড়ির বাইরে যাবার যে-কোনো সুযোগ পেলেই সে খুশী। এই সদ্য মুন্নির কাছে পৃথিবীটা বড় হতে শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে হঠাৎ তাদের স্কুল বাসটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, মুন্নিকে হেঁটে হেঁটে বাড়িতে ফিরতে হয়েছিল, বড় রাস্তার পাশে পাশে ছোট ছোট গলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার মনে হচ্ছিল, ঐ সব গলির মধ্যে বাড়িগুলো কী রকম? ওখানে কারা থাকে?

প্রতাপ এখনও বাড়িতে ফেরেন নি। সুপ্রীতি ও মমতা তুতুলের সঙ্গে মুন্নিকে ছাড়তে আপত্তি করলেন না। ওরা যাবে নিউ আলিপুর, বেশি দূরের রাস্তা নয়। জয়দীপের কথা মমতা আর সুপ্রীতি দু'জনেই জানেন, তার জন্য ওরাও খুব চিন্তিত।

একটা হালকা হলদে রঙের শাড়ি পরেছে তুতুল। ছিপছিপে, লম্বা শরীর তার, চুলে সে খোঁপা বাঁধে না। মুন্নিও লম্বা হতে শুরু করেছে, এর মধ্যেই সে তুতুলের কাঁধ ছুঁয়েছে প্রায়। সে পরেছে একটা কচি কলাপাতা রঙের ফ্রক।

রাস্তায় বেরিয়েই মুন্নি বললো, আমি কিন্তু আগে ফুচকা খাবো।

তুতুলের এখন নিজস্ব উপার্জন হয়েছে, তার হাতব্যাগে কিছু টাকা থাকে। কিন্তু সে ফুচকা, আলু কাবলি ইত্যাদি খাবার একেবারেই পছন্দ করে না, রাস্তায় কতরকম ধুলোময়লা ওতে মেশে, যে-লোকটা ফুচকা দেয় সে টক-জলের হাঁড়িতে হাত ডোবায়, তার জলে কতরকম দূষিত জীবাণু আছে তার ঠিক কী! সে বললো, ওসব খেতে হবে না, আমি তোকে আইসক্রিম খাওয়াবো।

মুন্নি তবু কিছুক্ষণ ফুচকার জন্য বায়না ধরলেও তুতুল তাকে প্রশ্রয় দিল না। কালিঘাট স্টপে দুটি আইসক্রিমের কাপ কিনে দু'জনে আগে শেষ করলো, তারপর উঠে পড়লো সাত নম্বর বাসে।

দুটি লোক লেডিজ সিট ছেড়ে দিতে ওরা জায়গা পেয়ে গেল। যে-দুটি লোক উঠে দাঁড়ালো, তাদের মধ্যে একজন বললো, আরে, মুন্নি, কেমন আছিস রে তোরা?

মুন্নি চোখ তুলে বললো, কানুকাকা?

কানু প্রথমে তুতুলকে লক্ষ করেনি। এর পরেই তুতুলকে দেখে সে বললো, ও তুতুল, কত বড় হয়ে গেছিস রে! তুই তো এখন পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে গেছিস, তাই না? আমার শালাও

তোর সঙ্গে পাশ করেছে, তার নাম অনিরুদ্ধ, চিনিস তো?

বাসের ভিড়ের মধ্যে এই রকম যে-কোনো কথাই অন্য যাত্রীরা খুব মন দিয়ে শোনে, তারা মুখের দিকে তাকায়, সেইজন্য বাসের মধ্যে জোরে জোরে কথা চালানো তুতুলের পছন্দ নয়। সে শুধু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো।

মুন্নি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কানুকাকা, তুমি বসো।

কানু তার ঘাড় ধরে চেপে বসিয়ে দিয়ে বললো, আরে না, না, তুই বোস, তুই বোস, আমার গাড়িটা কারখানায় দিয়েছি, তাই ক'দিন আমায় বাসে চাপতে হচ্ছে।

তুতুল আরও সঙ্কুচিত বোধ করলো। কানুকাকার যে নিজস্ব গাড়ি আছে সে কথাটা বাসের যাত্রীদের না জানালে কি চলতো না?

কানু আবার জিজ্ঞেস করলো, এদিকে কোথায় যাচ্ছিস রে, তোরা? আমার ওখানে আসবি নাকি, চল না?

মুন্নি মাথা নেড়ে বললো, না, না, আমরা এখন নিউ আলিপুরে যাচ্ছি, ফুলদির এক বন্ধুর বাড়িতে।

কানু অবশ্য নেমে পড়লো টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে। তার আগে সে শুনিয়ে গেল নিজের সম্পর্কে অনেক খবর। শুধু বাসের যাত্রীদের মনোযোগ টানার জন্যই নয়, এসব খবর সে মুন্নি ও তুতুল মারফত প্রতাপকে জানাতে চায়। আনোয়ার শা রোড ছাড়িয়ে মাত্র সাত মিনিটের হাঁটা পথে সে একটি বাড়ি কিনেছে, তার তৃতীয় সন্তান জন্মেছে দু'মাস আগে, তার বড় মেয়েটি ক্লাসে সেকেণ্ড হয়েছে, দেওঘরের জামাইবাবু তার কাছে এক হাজার টাকা ধার চেয়ে চিঠি লিখেছে, ইত্যাদি।

কানু নামবার পর মুন্নি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ফুলদি, কানুকাকা আমাদের বাড়িতে আর আসে না কেন?

তুতুল বললো, কী জানি!

মুন্নি বললো, অনেকদিন আগে, বাবা একদিন কানুকাকাকে খুব মেরেছিল, আমার মনে আছে!

তুতুল বললো, চুপ, ওসব কথা বলতে নেই।

নিউ আলিপুরে নেমে ওদের খানিকক্ষণ ঠিকানা খোঁজাখুঁজি করতে হলো। যদিও জয়দীপের বাড়িতে এর আগে তুতুল দু'বার এসেছে বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু এখন সে বাড়ি চিনতে পারছে না। একজন রিকশাওয়ালা পৌঁছে দিল ওদের।

সামনে লোহার গেট বসানো বাড়ি, ভেতরে খানিকটা বাগান। গেটের সামনে একটি ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে চার-পাঁচটি ছোট ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে। মুন্নি মুচকি হেসে তুতুলের দিকে তাকাতেই তুতুল ভুরু নাচিয়ে নিষেধের ভঙ্গি করলো। মুন্নি এখানে ফুচকা খাবে না তা ঠিকই, তবু ফুলদির বন্ধুর বাড়ির ছেলেমেয়েরাও যে ফুচকা খায়, এটা দেখে তার মজা লেগেছে।

দোতলার বারান্দায় গেঞ্জি পরা একজন মধ্যবয়স্ক, সুঠাম পুরুষ দাঁড়িয়ে, তিনি তুতুলকে দেখতে পেয়ে বললেন, কুকুর বাঁধা আছে, সোজা ওপরে উঠে এসো।

জয়দীপের ঘরটির তিনদিকে জানলা, প্রচুর আলো বাতাস, এরকম ঘরে ঢুকলেই মন ভালো লাগে। তিনটি বালিসে মাথা হেলিয়ে আধো শোওয়া হয়ে জয়দীপ আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাস পড়ছিল, তুতুলকে দেখে বইটি নামিয়ে রাখলো, কিন্তু কোনো সম্ভাষণ করলো না, হাসলো না, তাকিয়ে রইলো সোজা।

জয়দীপের দাদা শঙ্কর আর ওদের মা এসেছেন সঙ্গে সঙ্গে। তুতুল জিজ্ঞেস করলো, শিখা ওরা আসে নি? আসবে বলেছিল?

মা বললেন, না, আর তো কেউ আসে নি। তুমি এসেছো, খুব ভালো করেছো, দ্যাখো তো, খোকা আমাদের কারুর সঙ্গে কথা বলতে চায় না। কী যে হয়েছে, এরকম করলে চলে? সব ডাক্তার বলেছেন, ভয়ের কিছুই নেই!

তুতুল এগিয়ে গিয়ে জয়দীপের একটা হাত ধরে বললো, কেমন আছো, আজ? জয়দীপের দৃষ্টি একইরকম স্থির, কোনো উত্তর দিল না।

মা বললেন, বহ্নিশিখা, তুমি ঐ চেয়ারটায় বসো। খানিকক্ষণ থাকো, ও নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে কথা বলবে। এই মেয়েটিকে আমি ভেতরে নিয়ে যাই?

অচেনা বাড়িতে এসে মুন্নি তার দিদির পাশ ছাড়তে চায় না। কিন্তু তুতুল বুঝলো, জয়দীপকে কথা বলাতে গেলে ঘরে অন্য কারুর না থাকাই ভালো। সে হেসে বললো, মাসিমা, এ আমার মামাতো বোন, ফুচকা খেতে খুব ভালোবাসে, আপনাদের গেটের সামনে একটা ফুচকাওয়ালা রয়েছে দেখছি, ও বরং সেখানেই যাক।

মুন্নি সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, আমি এখন ফুচকা খাবো না।

তুতুল চোখ দিয়ে মিনতি করে বললো, তাহলে মাসিমার সঙ্গে ভেতরে যা না মুন্নি। তোর বয়েসী একটি মেয়ে আছে এ বাড়িতে, তার ঘরে গিয়ে বোস। অনেক বই আছে...

অন্যরা বেরিয়ে যাবার সময় শঙ্কর দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেলেন।

জয়দীপের হাতে হাত রেখে তুতুল কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলো। কণ্ঠার হাড় জেগে গেছে জয়দীপের, চোখের নিচে গাঢ় কালো ছাপ, নাকটা খাড়া দেখাচ্ছে। খেলোয়াড়-সুলভ স্বাস্থ্য ছিল তার।

তুতুলের নিজেরই কথা-না বলা রোগ হয়েছিল। সেইসব দিনগুলি তার ভালোই মনে আছে। কিছুতেই বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করতো না। যদিও কোনো

যুক্তি ছিল না, কিন্তু মনকে বোঝানো যেত না সেই যুক্তি দিয়ে। অন্যদের অধিকাংশ কথাই মনে হতো অর্থহীন। কত তুচ্ছ কথা নিয়ে মানুষ সারা দিন মুখ চালায়!

এই জয়দীপ ছিল কী দুর্দান্ত, দুরন্ত ও উচ্ছৃঙ্খল। মেডিক্যাল কলেজে প্রথম দুটো বছর সে তুতুলকে কম জ্বালিয়েছে! চিঠি লিখেছে বেনামীতে, কাটুন এঁকেছে ব্ল্যাক বোর্ডে, রাস্তায় যখন তখন সামনে এসে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত সব মন্তব্য করেছে। এক সময় শুধু এই জয়দীপের জন্যই তুতুল ডাক্তারি পড়া ছেড়েই দেবে ভেবেছিল। এই শেষ বছরটিতেই জয়দীপের সঙ্গে তার ভাব হয়, জয়দীপই তার মানসিক জড়তা কাটিয়ে দিয়েছে বলতে গেলে। পড়াশুনোতেও সাহায্য করেছে, অ্যানাটমি প্র্যাকটিক্যালে তুতুল খুব নার্ভাস বোধ করতো, জয়দীপ তাকে ধরে রাখতে জোর করে। ফাইন্যাল এম বি বি এস-এ জয়দীপ আর সে প্রায় একই রকম রেজাল্ট করেছে।

জয়দীপের বাঁ কানের ঠিক নিচে একটা বেশ বড় মতন আঁচিলের মতন ছিল, হঠাৎ সেদিকে নজর পড়লে মনে হতো জয়দীপ বুঝি এক কানে দুল পরেছে। শুধু বন্ধুবান্ধবরা নয়, জয়দীপ নিজেও হাসিঠাট্টা করতো সেই আঁচিলটা নিয়ে। পরীক্ষার পর থেকেই জয়দীপের সেই আঁচিলটা বড় হতে শুরু করে, ক্রমশ সেটা একটা রয়াল গুলির মতন হয়ে যায়, সুতরাং সেটা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওদের সাজারির প্রফেসর ডাঃ জি, ব্যানার্জি নিজে ওটা অপারেশন করে দেবেন বলেছিলেন। অপারেশানের নির্দিষ্ট তারিখের ঠিক দুদিন আগে জয়দীপ কলুটোলার মোড়ের কাছে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়, তার সঙ্গে তখন হেমকান্তি আর প্রদীপ ছিল, ওরা জয়দীপকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে এমারজেন্সীতে। একঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরলেও জয়দীপ মাথায় অসহ্য ব্যথা নিয়ে ছটফট করছিল...

জয়দীপের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে তুতুল একবার ডান দিকের জানলাটার দিকে তাকালো। জানালার ঠিক বাইরেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ, এই মধ্য এপ্রিলে সেটা ফুলে ভরে গেছে। বেশ হাওয়া দিচ্ছে আজ, আন্দোলিত ডালপালাগুলি দেখলে মনে হয়, এইখানটায় বাতাসের রং লাল। কোথায় যেন শানাই বাজছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য

অন্যমনস্ক হয়ে গেল তুতুল, তাতেই তার চোখ জ্বালা করে আসছিল, সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার মনটা ফিরিয়ে, চোখকে সংযত করে বললো, বাঃ, তোমার জানলার ধারে কী সুন্দর একটা গাছ!

জয়দীপের দৃষ্টি এখন তীব্র, এখনও সে কথা বলছে না। মাথার ব্যথার জন্য বা অপারেশনের জন্য জয়দীপের বাকশক্তির যে কোনো ক্ষতি হয়েছে তা নয়, সে ইচ্ছে করে কথা বলছে না, যেন তীব্র এক অভিমানে সে মৌন।

তুতুল আবার বললো, হেমকান্তি আর শিখা একটু পরেই নিশ্চয়ই এসে পড়বে। জানো জয়দীপ, একটা মজার কথা শুনবে? কাল প্রথম আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিসে রোজগার করলুম। আমাদের বাড়িওয়ালার ছেলের হঠাৎ রাত্তিরবেলা নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করেছিল, আমায় ডেকে পাঠালো, এমন কিছু ব্যাপার নয়, বুঝতেই পারছো, আমি টাকা নিতে চাইনি, টাকা নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু ওরা কিছুতেই ছাড়বে না, ডাক্তারকে ভিজিট না দিলে নাকি রুগীর অকল্যাণ হয়, জোর করে আমার ব্যাগে কুড়িটা টাকা গুঁজে দিল। তাহলে আমার ফি ঠিক হয়ে গেল, কুড়ি টাকা? বাড়িওয়ালা নিজে এসে আমার মামাকে আবার বলে গেল, আমি নাকি খুব ভালো ডাক্তার, একবার ওষুধেই কাজ হয়েছে, এবার থেকে ওরা সবাই আমাকেই দেখাবে!

একলা একলা হাসতে গিয়ে থেমে গেল তুতুল। জয়দীপকে কথা বলতে গিয়ে সে নিজে। বেশি কথা বলে ফেলছে, এরকম তার স্বভাব নয়। তার নিজের কানেই নিজের কথাগুলো অদ্ভুত লাগছে। হেমকান্তিরা যদি এসে পড়তো...

হাতব্যাগ খুলে সে একটি ছোট প্যাকেট বার করে বললো, আমার প্রথম ভিজিটের টাকায় তোমার জন্য একটা জিনিস কিনে এনেছি। এর মধ্যে কী আছে বলো তো!

প্যাকেটটা জয়দীপের হাতে সে গুঁজে দিল। জয়দীপ সেটা ঠেলে সরিয়ে দিল না বটে, কিন্তু খুলেও দেখলো না, রেখে দিল মাথার কাছে।

কানের নিচের আলুটা নেই, শেলাইও কেটে দেওয়া হয়েছে, মুখখানা এখন অনেক পরিষ্কার দেখাচ্ছে। সে কি নিজে দাড়ি কামিয়েছে না বাড়িতে নাপিত এসে কামিয়ে দিয়েছে? জয়দীপের মতন ছেলে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকবে, কোনো কথা বলবে না, এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

আগাথা ক্রিস্টির বইটা তুলে নিল তুতুল। সেটা দেখিয়ে সে আবার বললো, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না? তা হলে... এই বইটা আমার পড়া, কে খুনী এক্ষুনি বলে দেবো!

জয়দীপ এবারে খাটের অন্যদিকে সরে গিয়ে বেড সাইড টেবিলের ড্রয়ার খুলে সিগারেট-দেশলাই বার করলো। ডাক্তার ব্যানার্জি জয়দীপের সিগারেট খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু তুতুল বুঝলো, এখন তাকে বারণ করে লাভ নেই। বরং সে মুখ ঝুঁকিয়ে বললো, দাও, আমি দেশলাই জ্বেলে দিচ্ছি।

জয়দীপ এতে আপত্তি করলো না। তুতুল তার সিগারেট ধরিয়ে দেবার পর খানিকটা ধমকের সুরে বললো, এটা কী হচ্ছে তোমার? কেন কথা বলছো না?

সিগারেটে বড় টান দিয়ে আস্তে আস্তে জয়দীপ বললো, যারা সত্যি কথা বলে না, তাদের সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

তুতুল ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, আমি... আমি মিথ্যে কথা বলি কখনো?

তুতুলের একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে জয়দীপ জিজ্ঞেস করলো, তাহলে বলো, বায়োপসির রিপোর্ট কী?

তুতুলের যেন হঠাৎ দম আটকে গেছে, সে কোনো কথা বলতে পারছে না। তার ধারণা ছিল, একটা ডুপ্লিকেট রিপোর্ট জয়দীপকে দেখানো হয়ে গেছে। হেমকান্তিরাই সে ব্যবস্থা করেছে।

তুতুলের হাতে একটা জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে জয়দীপ আবার জিজ্ঞেস করলো, বলো?

–রিপোর্ট তুমি দেখো নি?

–একটা ফস রিপোর্ট দেখিয়ে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা। আমি ছেলেমানুষ? গাঁজায় দম দিয়ে ডাক্তারি পাশ করেছি? আসল রিপোর্টে আছে কারসিনোমা, তাই না?

এবারে তুতুলের চুপ করে থাকার পালা। মাথা হেঁট করে সে তার শাড়ির পাড় দেখছে। যদিও সে বুঝতে পারছে, তার নীরবতা এখন মস্ত বড় ভুল, যতই সে দেরি করছে ততই ভুল হয়ে যাচ্ছে, তবু তার গলায় স্বর আসছে না।

তুতুলের হাত ছেড়ে দিয়ে জয়দীপ পুরোপুরি শুয়ে পড়ে বললো, মাথার একঘেয়ে ব্যথাটা এখনো কেউ কমাতে পারলো না।

বন্ধ দরজার ওপাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভবত জয়দীপের মা। তিনি কি জয়দীপের কথাগুলো বুঝতে পারছেন? তবু জয়দীপ যে কথা বলছে, তা বুঝতে পেরেই তিনি খুশী।

তুতুল মুখ তুলে বললো, একেবারে ফাস্ট স্টেজ, এমন কিছুই ব্যাপার নয়।

জয়দীপ বললো, এটাও মিথ্যে কথা। একটু মধু মাখানো খুব তেতো মিথ্যে।

তুতুল এবারে জোর দিয়ে বললো, না, এটা মোটেই মিথ্যে নয়। একটুও মিথ্যে নয়। শোনো, আমাদের স্যার, মানে ডক্টর ব্যানার্জি তোমাকে একটা কথা জানাতে বলেছেন। উনি নিজেও আসবেন। তুমি যদি লন্ডনে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চাও, উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে জয়দীপ বললো, আমিও লন্ডনে যাবার কথা ভেবেছি। এত সহজে আমি ফুরিয়ে যেতে চাই না, আই শ্যাল ফাঁইট টু দা লাস্ট।

তুতুল জয়দীপের বুকে হাত রেখে ব্যাকুলভাবে বললো, জয়দীপ, বিশ্বাস করো, এই স্টেজে একদম সারানো যায়, তুমি পারফেক্টলি নমল জীবন যাপন করতে পারবে, স্যার বারবার বলেছেন।

জয়দীপ খানিকটা ঠাট্টার সুরে বললো, একদম সেরে যাবে, তাই না? বেশ ভালো কথা। লন্ডনেই যাবো। তুমিও চলো। তুমিও আমার সঙ্গে চলো।

–আমি? আমি কী করে যাবো?

--কেন, যাবে নাই বা কেন? ওখানে এফ আর সি এস করে আসবে। আমি যদি সেরে উঠি আমিও তো ওখানে পড়বো।

–তা বলে কি আমি যেতে পারি? আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

–কেন, অসম্ভব কিসের? লন্ডনে আমার বড় মামা থাকেন, বেলসাইজ পার্কের কাছে নিজের বাড়ি, আমি ছেলেবেলায় একবার লন্ডনে গিয়েছিলুম, সে বাড়ি দেখে এসেছি, তুমি প্রথম কিছুদিন সেখানে থাকতে পারো। এদেশ থেকে যারা যায়, তারা অনেকেই প্রথমে আমার বড়মামার ওখানে ওঠে। উনি খুশী হয়ে থাকতে দেন, ওঁর অবস্থা বেশ ভালো। বড়মামা নিজেও ডাক্তার, ওখানে অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

–আমার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, জয়দীপ।

–তুমি না গেলে আমি যাবোই না।

–এটা তোমার ছেলেমানুষী! ঠিক বাচ্চা ছেলের মতন তুমি গাল ফুলিয়ে কথা বলছে।

–তোমার প্যাসেজ মানির কথা ভাবছো? যদি জোগাড় করতে না পারো, আমার কাছ থেকে ধার নেবে। লজ্জার কিছু নেই, পরে শোধ দিয়ে দেবে আমাকে।

–তুমি বুঝতে পারছে না, আমার মা আছেন, মাকে ফেলে কী করে যাবো?

-তুমি কি তোমার মায়ের কাছে চিরকাল থাকবে নাকি?

--মা আমাকে ছাড়বেন না।

-তোমার মা যদি তোমাকে আঁকড়ে ধরে রাখেন, সেটা তাঁর স্বার্থপরতা। ঠিক আছে, তোমার মাকে আমি বুঝিয়ে বলবো। আমি সব ব্যবস্থা করবো তোমার জন্য।

-জয়দীপ, প্লীজ! বুকের ওপর রাখা তুতুলের হাতের ওপর নিজের হাত রেখে জয়দীপ হুকুমের সুরে বললো, তুমি না গেলে আমি যাবো না। আমার বুক ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো, তুমি যাবে?

দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো হেমকান্তি আর শিখা। শিখা বললো, এমন ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গিয়েছিলুম

জয়দীপ ওদের দিকে না তাকিয়ে তুতুলের চোখের দিকে সেই আদেশের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, সে তুতুলের মুখ থেকে শপথটা শুনতে চায়। তুতুল হাতটা সরিয়ে নিতে গেল, পারলো না।

হেমকান্তি ওদের এই অবস্থায় দেখে বললো, প্রেমালাপ হচ্ছে, ডিসটার্ব করলাম বুঝি?

তুতুল এবারে জোর করে সরিয়ে নিল নিজের হাত।

এর পর আর বেশিক্ষণ সে রইলো না, তার ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। মুন্নির পড়াশুনোনা আছে। হেমকান্তিরা তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেও পারলো না।

হেমকান্তিরা এসে পড়ায় তুতুল স্বস্তি পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয় নি। আর একটু সময় পেলে জয়দীপ নিশ্চয়ই তার মুখ থেকে কথা আদায় করে নিত। জয়দীপের পাগলামি। বিলেত যাওয়া কি মুখের কথা, জয়দীপদের অনেক পয়সা-টাকা

আছে, জয়দীপ যেতে পারে। হেমকান্তিও যাবার চেষ্টা করছে। হেমকান্তিই জয়দীপকে দেখাশুনো করতে পারবে ওখানে।

এর পর কদিনের মধ্যেই জয়দীপের যাওয়ার ব্যবস্থা দ্রুত ঠিকঠাক হয়ে গেল। ওর শরীর ভেঙে পড়ছে। তুতুল জয়দীপকে আরও কয়েকবার দেখতে এসেছে, কিন্তু কখনো তার ঘরে একা থাকেনি। জয়দীপ যে তুতুলের মায়ের সঙ্গে কথা বলবে বলেছিল, তা সম্ভব হয় নি জয়দীপের একা চলাফেরার ক্ষমতা ছিল না, সে চাইলেও তাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেওয়া হয় নি।

সহপাঠী, বন্ধুবান্ধবরা দল বেঁধে গেল দমদম এয়ারপোর্টে জয়দীপকে সি-অফ করতে। যাওয়ার দিনটিতে জয়দীপকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে, সে হাঁটছে সাবলীল ভাবে, হাসি-ঠাট্টা করলো কয়েকজনের সঙ্গে, অনেকটা যেন পুরোনো জয়দীপ।

তুতুল রয়েছে একটু দূরে-দূরে। জয়দীপের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেক সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে ঘিরে আছে তাকে। কত ফুল এসেছে জয়দীপের জন্য।

ধপধপে সাদা শাড়ী পরা জয়দীপের মা চিন্ময়ী সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ছেলের পাশে। আজ তাঁর মুখখানা পরিষ্কার, কোনো দুশ্চিন্তার রেখা নেই। হেমকান্তির যাওয়ার কথা ছিল জয়দীপের সঙ্গে, কিন্তু তার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় হেমকান্তির যাওয়ার দিন পিছিয়ে দিতে হয়েছে, জয়দীপ লণ্ডনে একাই যাবে। চিন্ময়ী জানেন তাঁর ছেলের কী অসুখ, তবু তিনি ভেঙে পড়েননি। একটুও, অন্তত বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। চিন্ময়ীকে দেখে খুব শ্রদ্ধা হয় তুতুলের।

অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও জয়দীপ মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে তুতুলের দিকে। তুতুলকে সে কাছে আসতে ইঙ্গিত করছে। তবু তুতুল থাকছে দূরে দূরে। বিদায় নেবার সময় জয়দীপ যদি বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, তাহলে সে সামলাবে কী করে? জয়দীপের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে শুধু বন্ধুত্বের, তা অনেকেই বোঝে না। জয়দীপ অবশ্য কয়েকবার প্রেমের কথা বলার চেষ্টা করেছে, ঠিক প্রেমের কথাও নয়। সে এমন ভাব

দেখিয়েছে যেন তুতুল তার নিজস্ব সম্পত্তি, তুতুল অবশ্য জয়দীপের সে ভাবনার একটুও প্রশ্রয় দেয়নি। জয়দীপকে সে অগ্রাহ্য করতেও পারেনি, অথচ বন্ধুর বেশী আর কিছু মনেও করেনি।

হঠাৎ বাথরুমে যাবার নাম করে জয়দীপ চলে এলো তুতুলের কাছে। নিচু গলায় বললো, আমি পৌঁছেই সব ব্যবস্থা করে চিঠি দেবো। টিকিট পাঠিয়ে দেবো। মনে থাকে যেন, আমার বুকে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছে।

তুতুল বলতে গেল, না, না, আমি তো প্রতিজ্ঞা করিনি। বুকে হাত রেখেছিলুম শুধু। আমি যেতে পারবো না, জয়দীপ।

কিন্তু একেবারে বিদায়ের সময় এরকম কথা উচ্চারণ করতে পারলো না তুতুল। যদি জয়দীপ আবার পাগলামি শুরু করে। যদি আঘাত পায়। থাক, পরে চিঠিতে জানিয়ে দিলেই হবে। এখন তার চোখ জ্বালা করছে, চোখে এত জ্বালা।

৪৪ ঝোঁকের মাথায় প্রতাপ

ঝোঁকের মাথায় প্রতাপ বাড়ি ফেরার পথে একটা মস্ত বড় ইলিশ মাছ কিনে ফেললেন। বিমানবিহারীর বাড়ি থেকে প্রতাপ হেঁটেই ফিরছিলেন, রাত প্রায় ন'টা, জগুবাবুর বাজারের সামনে, ফুটপাথেই একজন ইলিশ নিয়ে বসেছিল, ঝুড়িতে মাত্র পাঁচটা মাছ। আর কিছু নয়, মাছগুলোর সাইজ দেখেই প্রতাপকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। মাছের দেশের মানুষ, সত্যিকারের ভালো মাছ দেখলে চোখ আটকে যাবেই।

প্রত্যেকটি ইলিশই অন্তত পৌনে দু' কেজি ওজন হবে, চওড়া পিঠ, সরু পেট, আঁশের চকচকে ভাব দেখলেই বোঝা যায় বেশ টাটকা। এরকম নিখুঁত গড়নের ইলিশ সহসা বাজারে ওঠে না। বিক্রেতাটি বললো, আরমানি ঘাটের ইলিশ, বাবু, মাত্তর এক ঘণ্টা আগে ধরা পড়েছে!

রাত ন'টার সময় এত বড় একটা ইলিশ কেনার কোনো মানে হয় না, তবু প্রতাপ নড়তে পারছিলেন না। এরকম একটা ভালো জিনিসকে কি অবহেলা করা যায়? সরস্বতী পুজো পার হয়ে গেছে, এখন পেটে ডিম নেই, স্বাদ খুব ভাল হবে। একসময় প্রতাপদের বাড়িতে প্রত্যেক সরস্বতী পুজোর দিন জোড়া ইলিশ আসতো, তখন তাঁদের পরিবারে অনেক মানুষ ছিল, ফেলে ছড়িয়ে খাওয়া হতো।

দরাদরি করার আগে ঝট করে একটা বাল্যস্মৃতি মনে পড়ে গেল। তখন প্রতাপের বয়েস কত হবে, তের কিংবা চোদ্দ, বাবার সঙ্গে কোথায় যেন নৌকো করে যাওয়া হচ্ছিল, আরিচা ঘাটে ইলিশ মাছের নৌকো দেখে বাবা দরাদরি শুরু করে দিলেন। সেই ইলিশগুলো কি এই রকমই বড় ছিল? প্রতাপের বাবা কক্ষনো কম জিনিস কিনতে পারতেন না, সামান্য একটু দরের সুবিধে হবে বলে তিনি এক হালি অর্থাৎ চারখানা ইলিশ কিনে ফেললেন। সুহাসিনী আঁতকে উঠে বলেছিলেন, এত মাছ কে খাবে? বাবা অম্লান বদনে উত্তর দিয়েছিলেন, শুধু নিজেদেরই খেতে হবে তার কী মানে আছে, অন্যদের দেবে, বাসেদের বাড়ি, চক্রবর্তীদের বাড়ি পাঠাবে! তাই-ই হয়েছিল শেষ পর্যন্ত, প্রায় মাঝ রাত্তিরে প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙিয়ে মাছ পাঠানো হয়েছিল এবং তাঁরা খুশীও হয়েছিলেন।

ছাত্র বয়েসে, প্রতাপের সঙ্গে তাঁর বাড়ির লোকদের প্রায়ই ইলিশ বিষয়ে তর্ক হতো। পদ্মার ইলিশ ভালো না গঙ্গার ইলিশ? প্রতাপ কলকাতার ছাত্র, তিনি বলতেন, পদ্মার ইলিশ অনেক বেশি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সত্যিকারের ভালো স্বাদ গঙ্গার ইলিশের, বিশেষত বাগবাজারের ঘাটের। প্রতাপের বাবা, মা, দিদিরা হৈ হৈ করে উঠতেন একথা শুনে। সুহাসিনী ঠাট্টা করে বলতেন, ঘটিরা তো ইলিশ খাইতে জানেই না, কয় কি না, হাতে ত্যাল লাগে। আরে মরণ, ইলিশ খাইয়া যদি দুইদিন হাতে সেই ত্যালের গন্ধ না থাকে, তয় আবার সেডা ইলিশ কিসে?

প্রতাপ একবার ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় দুটি গঙ্গার ইলিশ কাটিয়ে, নুন-হলুদ মাখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, রান্নার পর সুহাসিনী মুখে একটা টুকরো ঠেকিয়ে থু থু করলেন এমন যে তাঁর আর কিছুই খাওয়া হলো না, অন্যরা কেউ সে মাছ ছুঁয়েও দেখলো না!

তবু প্রতাপ এখনো গঙ্গার ইলিশের ভক্ত। একবার তিনি ভাবলেন, ঝুড়ির পাঁচটা ইলিশই কিনে নেবেন। তাঁর পকেটে আজ টাকা আছে। এই মাছগুলো যদি আজ রাত্তিরেই বিক্রি না হয়, বরফ চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হয় কাল সকালের জন্য, তখন তার স্বাদ হবে একেবারেই ভিন্ন, সেটা হবে এই সৌন্দর্য্যময় ইলিশগুলির প্রতি অপমান। ইলিশের প্রাণ থাকে জলের তলায়। জল থেকে তোলা মাত্র তার প্রাণ বিসর্জন হয়। সুতরাং তারপর যতই দেরি হবে, ততই সে অন্যরকম হয়ে যাবে।

পকেটে পয়সা থাকলেও যথেচ্ছ খরচ করার দিন আর নেই। পুরনো আমলের মেজাজ মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে উঠলেও তা দমন করতে হয়। তাছাড়া, এখন পাঁচটা ইলিশ নিয়ে কোন বাড়ি বাড়ি পৌঁছোবেন প্রতাপ? একজোড়া কেনা যেতে পারে, একটা দিয়ে আসা যায় বিমানবিহারীকে, সে দশটার আগে খেতে বসে না, গরম গরম মাছ ভাজা...।

শেষ পর্যন্ত প্রতাপ একটাই কিনলেন। রাত হলেও দাম মোটেই কম নয়, ছ'টাকা করে সের চেয়েছিল, অনেক ধস্তাধস্তি করে এক সের আটশো ওজনের মাছটি দশ টাকায় রফা হলো। বিমানবিহারীর বাড়ি মাছ পৌঁছোবার ব্যাপারটায় প্রতাপ সঙ্কোচ বোধ করলেন, কোনদিন তিনি এরকম করেননি, আজ হঠাৎ একটা মাছ হাতে করে নিয়ে গেলে বিমানবিহারী নিশ্চিত হাসতেন। বিমানবিহারী খুব একটা মাছের ভক্তও নন।

ইলিশটির কানকোয় সুতলি বেঁধে প্রতাপের হাতে ঝুলিয়ে দিল মাছওয়ালাটি। এমন ভাবে মাছ নিয়ে রাত্তিরবেলা প্রতাপ বহুদিন বাড়ি ফেরেননি। একেবারে বাড়ির কাছে পৌঁছে প্রতাপের লজ্জা লজ্জা বোধ হলো। মমতার কী প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে! এখন প্রতাপের খেয়াল হলো যে সুপ্রীতির অসুখের সময় যে রাধুনীটিকে রাখা হয়েছিল, সে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। সুপ্রীতি এখন ভালো হয়ে উঠলেও সন্ধের পর আঁশ ছোঁবেন না। মমতাকেই

মাছটা কুটতে হবে, রাঁধতে হবে। বাঙাল বাড়ির বউ হলেও মমতার বাপের বাড়ির লোকেরা সঠিক অর্থে বাঙাল নয়, ইলিশ মাছ দেখলে মমতার চোখ চকচক করে না, যে-কোনো মাছই এক টুকরোর বেশি দু টুকরো খেতে সাধ হয় না তাঁর।

প্রতাপের দৃঢ় ধারণা, মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই খুশী হতেন। বিধবা হবার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সুহাসিনী প্রত্যেকদিন বাজার এলে আগ্রহের সঙ্গে দেখতেন যে কী মাছ এসেছে। ছেলে, ভালোবাসে বলে মাছ রান্না করে দিতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। দেওঘরে প্রতাপরা গেলে সুহাসিনী অনেকবার মাছ বেঁধেছেন, প্রতাপকে যাতে মাছের মুড়োটা দেওয়া হয় সেজন্য তিনি পরিবেশনেরও সময়ও দাঁড়িয়ে থাকতেন।

আজকের মাছটা একজন কেউ জোর করে প্রতাপকে গছিয়ে দিয়েছে। মমতাকে এইরকম বললে কেমন হয়? দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এরকম একবার চিন্তা করলেন প্রতাপ। কিন্তু এই সব ছোটখাটো মিথ্যে কথাও তাঁর মুখে আসে না, তিনি ঠিক বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে পারবেন না। সুতরাং দরজা খোলার পর, নিটোল একটা শিল্পের মতন ইলিশটা উঁচু করে দেখিয়ে প্রতাপ বললেন, জানো, এত ভালো মাছটা দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। এরকম মাছ আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না।

মমতা খুশী হননি একটুও, তাঁর বিস্ময়ই বেশি। অনেকটা ভুরু তুলে তিনি বললেন, এত বড় মাছ তুমি নিয়ে এসেছো, এত রাত্তিরে, কে খাবে?

প্রতাপ বললেন, কেন, সবাই খাবে? কী এমন রাত হয়েছে?

মমতা বললেন, ছেলেমেয়েরা এই একটু আগে খেয়ে নিয়েছে!

–তাতে কী হয়েছে। গরম গরম মাছ ভাজা ঠিক খেয়ে নেবে।

বসবার ঘরের দরজা বন্ধ, ভেতরে আলো জ্বলছে। ঐ ঘরটি আপাতত অতীনের দুর্গ, অন্য কারু প্রবেশ নিষেধ। পাশের সরু বারান্দাটা দিয়ে ভেতরে আসবার পর মমতা ঠাণ্ডা গলায়

বললেন, এতই যদি তোমার মাছ খাওয়ার লোভ, তাহলে একটা রেফ্রিজারেটার কেনা উচিত!

লোভ কথাটা প্রতাপের ব্যবহার করা ঠিক হয়নি, ঐ শব্দটি মমতা প্রতাপের বিরুদ্ধে বারবার অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করার জন্য পেয়ে গেলেন। প্রতাপের মতন একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের এরকম লোভ থাকতে নেই।

প্রতাপ তবু মমতাকে খুশী করার জন্য বললেন, হাতে হঠাৎ অনেকগুলো টাকা এসে গেল বুঝলে, বিমানের কম্পানি থেকে অনেকদিন কিছু নিইনি, আজও কিছু অনুবাদের কাজ করে দিলাম। সব সুষ্ঠু সওয়া দুশো টাকা পাওয়া গেল।

-ঐ টাকা বাজে খরচ না করে রেফ্রিজারেটারের জন্য জমানো উচিত ছিল। যে বাড়িতে কারু কোনো খাওয়ার সময়ের ঠিক নেই...

-বাঃ, তাহলে একদিন একটু বাজে খরচ করব না?

আজকের মাছগুলো দেখে বহুদিন আগে আরিচা ঘাটে তাঁর বাবার মাছ কেনার দৃশ্য যে মনে পড়ে গিয়েছিল, সে কথা এখন মমতাকে বলে লাভ নেই। একটা মাছেই এই, প্রতাপ যদি পাঁচটা ইলিশই কিনে ফেলতেন, তাহলে কী হতো!

নিজের দল ভারি করার জন্য প্রতাপ গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দিদি কোথায়? দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে?

বাল্যস্মৃতিতে ফিরে যাওয়ায় প্রতাপ বিস্মৃত হলেন যে সুপ্রীতি আর আগের মতন নেই। সুপ্রীতি নিজের দরজা খুলে বাইরে আসতেই প্রতাপ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, দিদি, দেখেছো, দেখেছো, কী রকম টাটকা মাছ!

সুপ্রীতির পরনে কালো পাড়ের শাড়ি, মাথার চুলে হঠাৎ সাদা ছোপ লেগেছে, মুখোনি বিষণ্ণ। তিনি হঠাৎ শিউড়ে উঠে বললেন, ইঃ, খোকন, এই রাতে এত বড় একটা মাছ আনলি! মমোকে কী বিপদে ফেললি বলতো! ওকে এখন রান্না করতে হবে।

মমতা বললেন, রান্না করলেই বা খাবে কে? মাছ কেনার তো একটা সময় আছে, ছেলেমেয়েরা একটু আগে খেয়ে উঠলো।

সুপ্রীতি বললেন, তুতুল তো ইলিশ মাছ খেতেই চায় না!

প্রতাপ একবার বাথরুমের পাশের নর্দমাটার দিকে তাকালেন। তাঁর মাথায় হঠাৎ রাগ চড়ে যায়। মাছটা নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেবেন,? এখন রাগের থেকে অভিমানটাই হলো বেশি। স্ত্রী ও দিদির সঙ্গে মায়ের এই তফাত! মা থাকলে... ছেলে শখ করে একটা জিনিস এনেছে, যতই অসুবিধে হোক, ঠিক রান্না করে দিতেন। কী এমন বেশি রাত হয়েছে।

নর্দমায় ছুঁড়ে দিলেন না বটে, প্রতাপ সেখানেই নামিয়ে রাখলেন মাছটা।

মমতা জিজ্ঞেস করলেন, কাল সকাল পর্যন্ত রেখে দেওয়া যায় না?

প্রতাপ গম্ভীরভাবে বললেন, তোমাদের যা খুশী করো।

প্রতাপের এই স্বরটা মমতা চেনেন, কোমরে আঁচল গুঁজে তিনি মাছ কুটতে বসলেন। সুপ্রীতি বললেন, তুতুলকে ডেকে দেবো, ও তোমাকে সাহায্য করবে?

মমতা বললেন, না, ওকে ডাকতে হবে না। সারাদিন হাসপাতালে ডিউটি দিয়ে এসেছে মেয়েটা...

এক ঘণ্টা বাদে খেতে ডাকা হলো প্রতাপকে। সারা বাড়িতে ম ম করছে ইলিশ মাছের তেলের গন্ধ। অথচ বাড়িটা কেমন যেন নিস্তব্ধ। অন্যদিনের তুলনায় আজ যে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটছে, সে সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের কোনো আগ্রহ নেই?

মাছটা দেখে প্রতাপের যতখানি পছন্দ হয়েছিল, মাছ খাওয়ায় ততটা লোভ নেই প্রতাপের। পেটুকের মতন আট-দশ খানা মাছ খাওয়া তাঁর স্বভাবে নেই, বড় জোর দু'তিন পীস খেতে পারেন। তিনি ভেবেছিলেন, সবাই মিলে আনন্দ করে খাওয়া হবে, ছেলেমেয়েরা উৎসাহে হই চই করবে, কেউ বলবে, আমাকে বড় পেটির মাছটা দাও... প্রতাপদের ছেলেবেলায় যেমন হতো, খেতে বসে আর ধৈর্য থাকতো না, মাছ ভাজার থালা আসতে না আসতেই শেষ!

ভাত আর ডালের বাটির সঙ্গে প্রতাপকে দু'খানা মাছ ভাজা দেওয়া হয়েছে, একটি পেটি আর একটা গাদা। এই রকম টাটকা ইলিশ ভাজতে গেলেই যে তেল বেরোয় তা অতি উপাদেয়, প্রতাপ লক্ষ করলেন, সেই তেল তাঁকে দেওয়া হলো না। ইলিশ মাছের পেটের মধ্যে যে তেলটা থাকে, সেটা ভাজা খাওয়া প্রতাপের অতি প্রিয়, মমতা বোধহয় সেটা ফেলেই দিয়েছেন!

মমতা একটা বড় থালা ভর্তি আট দশখানা মাছভাজা এনে বললেন, এত মাছ কে খাবে বলো তো? আরও তো একগাদা রয়েছে! তুতুল কিছুতেই খেতে চাইলো না, ওর গন্ধ লাগে। মুন্নি ঘুমিয়ে পড়েছে, ডেকে তুলে কত খাওয়াবার চেষ্টা করলুম, আধখানা কোনোরকমে খেয়ে আবার চোখ বুজে ফেললো, জোর করে কি খাওয়ানো যায়?

রাত্রের রান্না আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, মমতাকে এত রাতে কোনোদিন রাঁধতে হয় না। আগুনের আঁচে মুখখানা লালচে হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য কোনো রাগের ভাব নেই। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা।

মমতার দিকে দু' এক পলক তাকিয়ে প্রতাপ বললেন, বাবলু? বাবলুকে দাওনি?

খেতে আসবার সময়েও প্রতাপ দেখেছেন বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। বাবলু পড়ছে।

মমতা এবারে খানিকটা যেন ভয় পেয়ে বললেন, বাবলুও খাবে না বললো, কাল সকালে

প্রতাপ অবাক হলেন। বাবলু মাছ ভালোবাসে তিনি জানেন, খেতে বসে রোজই বাবলু আগে জিজ্ঞেস করে, আজ কী মাছ? সেই বাবলু এত ভালো মাছ খাবে না!

মমতা বললেন, বাবলু অনেক রাত জেগে পড়ে তো, পেট হালকা রাখতে চায়, খাওয়ার সময়েও তো মাত্র দু'খানা রুটি খেয়েছে, ইলিশ মাছ খেলে পেট গরম হবে!

প্রতাপ বললেন, দূর! ঐ বয়েসের ছেলের আবার পেট গরম কী? তুমি বলেছো, ভালো ইলিশ?

–হ্যাঁ, বলেছি।

–বাবলু নিশ্চয়ই ঠিক বোঝেনি, দাঁড়াও আমি বাবলুকে ডাকছি।

–না, ওকে ডেকো না! প্রতাপ মমতার দিকে একটা অদ্ভুত চাহনি দিলেন। ছেলেকে তিনি ডাকবেন, তাতে মমতার আপত্তি কিসের?

পরীক্ষার দু'তিন সপ্তাহ আগে বাবলু পুরোপুরি বদলে যায়, বইয়ের পাতায় চোখ রেখে রেখে চোখ ক্ষইয়ে ফেলে একেবারে, বাড়ি থেকে বেরুতেও চায় না। এই সময়টায় তার মেজাজটাও তিরিক্ষি হয়ে থাকে। মমতার সেইটাই ভয়।

প্রতাপ এঁটো হাতে উঠে গিয়ে বসবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন, বাবলু, বাবলু!

দরজা খুলতে একটু দেরি হলো। প্রতাপ ভাবলেন, রাত জাগার জন্য বাবলু বোধ হয় সিগারেট-টিগারেট খায়, তাই দরজা বন্ধ রেখেছে। বাবলুর থেকেও কম বয়েসে প্রতাপ সিগারেট ধরেছিলেন, তাই ছেলের সিগারেট টানায় তিনি দোষের কিছু দেখেন না। বাবলু তো দরজা খোলা রেখেও সিগারেট টানতে পারে, মমতাকে এই কথাটা বলে দিতে হবে।

প্রথমেই দরজা না খুলে বাবলু জিজ্ঞেস করলো, কে?

প্রতাপ বললেন, আমি রে, আমি! একটু খোল তো!

বাবলু আবার বললো, কী, বলো না?

-তুই একবার দরজাটা খুলতে পারছিস না?

দরজাটা খোলার সত্যি খানিকটা অসুবিধে আছে বাবলুর। রাত জাগার সে একটা নিজস্ব উপায় বার করেছে। সে সব জামা-কাপড় খুলে ফেলে। হঠাৎ প্রচণ্ড গরম পড়ে গেছে, ঘামে গেঞ্জি ভিজে যায়, পা-জামা পর্যন্ত চট চট করে, তাই বাবলু একা ঘরে কিছু গায়ে রাখতে চায় না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সে বই হাতে নিয়ে সারা ঘর পায়চারি করে। এই অবস্থায় যে-কেউ তাকে দেখলেই ভাববে পাগল, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটি জ্বলজ্বলে, তার ছিপছিপে লম্বা শরীরে একটা সুতো পর্যন্ত থাকে না। দরজা-জানলা সব সে নিচ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করে রাখে, যাতে বাইরের কোনো আওয়াজ না আসে।

কিছু একটা বিপদের কথা ভেবেই দ্রুত পোশাক পরে নিয়ে বাবলু দরজা খুলে বললো, কী হয়েছে?

প্রতাপ বললেন, আজ খুব ভালো মাছ এনেছি। কয়েকখানা খেয়ে যা। আমাদের সঙ্গে একটু বসবি আয়!

এক ঝলক রাগ এসে গেল বাবলুর মুখে। কিন্তু সে বাবার মুখের সামনে চেঁচিয়ে কথা বলে না। পেছনে মায়ের দিকে একপলক ঝাঁঝ চোখে তাকিয়ে সে শান্তভাবে বাবাকে বললো, বাবা, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আর কিছু খাবো না।

প্রতাপ বললেন, সে তো অনেকক্ষণ আগে খেয়েছিস। এখন ক'খানা মাছ ভাজা খাবি, তাতে কী আছে!

-এখন আর আমি খেতে পারবো না, বাবা।

-একবার এসেই দ্যাখ না, খুব ভালো মাছ, এরকম ইলিশ বাজারে চট করে দেখাই যায়।

-আমার পেট ভর্তি, মাকে তো বলেইছি, আর রাত্তিবে আমি কিছু খেতে পারবো না।

-এত মাছ আনলুম, সব নষ্ট হবে?

বাঃ, নষ্ট হবে বলে আমাকে জোর করে খেতে হবে? পরীক্ষার আগে আমি পড়বো, না শুধু খাবো?

শেষের কথাটায় প্রতাপ গলা চড়িয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী বাবলুও কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলেছে। নিজেরটা প্রতাপ শুনলেন না, ছেলেরটাই তাঁর কানে যেন একটা ঝাঁপটা মারলো।

তিনি আস্তে আস্তে বললেন, ও, খাবি না! আচ্ছা থাকা।

প্রতাপ ফিরে এলেন খাওয়ার টেবিলে। নিঃশব্দে দুগ্রাস ভাত মুখে তুললেন, তাঁর মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। মাছটাও খেতে একটুও ভালো লাগছে না।

অন্য দিকে কথা ফেরাবার জন্য প্রতাপ মমতাকে বললো, তুমিও খেতে বসে যাও, দেরি করছো কেন?

মমতা বললেন, একটু পরে বসবো... একবার চট করে গা ধুয়ে নেবো, ইলিশ মাছ ভাজলে সমস্ত শরীরে আঁশটে গন্ধ হয়ে যায়। শোনো, ঝোলটোল করিনি কিন্তু, অর্ধেকটা ভেজেছি, বাকিটা হলুদ মাখিয়ে রেখে দেবো কালকের জন্য। যা গরম পড়েছে, থাকবে?

প্রতাপ মৃদু গলায় বললেন, পাশের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও না! ওরা একবার মিষ্টি না কী যেন দিয়েছিল!

-তা বলে এত রাত্রে মাছ পাঠানো যায়? তুমি কি পাগল হয়েছে? তুমি নিজে চাও দিয়ে এসো, আমি পারবো না!

–মমো, মাছটা নিয়ে এসে তোমাদের খুব বিপদে ফেলে দিয়েছি, তাই না? আমার হঠাৎ যদি একদিন একটা কিছু সাধ আহ্লাদ হয়, তার কোনো দাম নেই তোমাদের কাছে! আমি শুধু টাকা রোজগার করে যাবো তোমাদের জন্য!

এবারে মমতা তীব্র অভিমানের সঙ্গে বললেন, তুমি এই কথা বলছো? এত রাতে আমি তোমার জন্য মাছ কুটে, রান্না করে দিইনি? কেরোসিন ফুরিয়ে গেছে, কয়লার উনুন জ্বেলে... তোমার মাছ খেতে লোভ হয়েছে, তুমি খাও না কত খাবে। যদি চাও তো আরও ভেজে দিতে পারি!

–আমার লোভ!

প্রতাপ আর থাকতে পারলেন না, সম্পূর্ণ ভাতের থালাটা ধরে উল্টে দিলেন। তারপর মাছের প্লেটটা ফেলে দিলেন মাটিতে!.

পর মুহূর্তেই তাঁর অনুশোচনা হলো। ইদানীং তিনি এরকম রাগের প্রদর্শন করেন না। জগুবাবুর বাজারের সামনে এক মাছওয়ালার ঝুড়িতে কয়েকটা টাটকা ইলিশ দেখে প্রতাপের বাবার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, সেই স্মৃতিটাই যত নষ্টের মূল! ঐ সব স্মৃতি মুছে না ফেললে এখনকার জীবনে আর শান্তি নেই।

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আই অ্যাম সরি।

দু'জনে দু'জনের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন বেশ কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর মমতা অনুত্তেজিতভাবে বললেন, ঠিক আছে বসো, আরও ভাত এনে দিচ্ছি, আর কয়েকখানা মাছ। ভেজে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি।

প্রতাপ উদাসীন ভাবে বললেন, না, আর খাবো না, যথেষ্ট হয়েছে।

হাত ধুয়ে তিনি চলে গেলেন নিজের ঘরে।

প্রতাপের থালা ওল্টাবার শব্দে সুপ্রীতি বেরিয়ে এসেছিলেন। সব বুঝেও তিনি কিছু বললেন, আবার ফিরে গেলেন। ইচ্ছে থাকলেও তিনি মমতাকে সাহায্য করতে পারবেন না এঁটো তুলতে, মাছ-মাংসে হাত ছোঁয়াতে এখন তাঁর গা ঘিনঘিন করে। রামনাথ স্বামী নামে এক গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর আমিষের প্রতি তাঁর ঘৃণা হঠাৎ বেড়ে গেছে।

মমতা পুরো খাবার ঘরটা পরিষ্কার করে, মাছগুলো ফেলে দিলেন রাস্তার আস্তাকুঁড়ে; বাড়ির মধ্যে রাখলে গন্ধ হবে। তারপর তিনি বাথরুমে গিয়ে শুধু গা ধোওয়ার বদলে স্নান করলেন। ভালো করে। আর তাঁর একটুও খাওয়ার ইচ্ছে নেই, তবু খেতে বসলেন এবং নিজের জন্য একটি গাদার মাছ ভেজেও নিলেন। বস্তুত মমতাই সবচেয়ে ভালো করে খেলেন মাছটা। ইলিশ মাছের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা নেই, কিন্তু প্রতাপের কথা ভেবেই খেলেন।

শোওয়ার ঘর সিগারেটের গন্ধে ভরপুর। অন্তত তিন চারটি সিগারেট টেনে কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রতাপ। মমতা ইচ্ছে করেই এতক্ষণ এ ঘরে আসেননি। একটা কথা বললেই ঝগড়া বেঁধে যেত। উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন প্রতাপ, মমতা জানেন,ঐটা রাগের ভঙ্গি, ঠিক শিশুদের মতন। তাঁর স্বামীর চরিত্রে এখনো অনেক ছেলেমানুষী রয়ে গেছে। আজকের কাণ্ডটাও প্রতাপের ছেলেমানুষী ছাড়া আর কী? এত রাত্রে একটা অত বড় ইলিশ আনলেই বাড়ির সকলকে সেটা আহ্লাদ করে খেতে হবে? অত বড় একটা মাছ কেনার আগে, বাড়িতে যে ফ্রিজ নেই সেকথা ভাবা উচিত ছিল!

বাবলুর ওপরেই বা রাগ করার কী মানে হয়? সে বেচারি এখন দিন রাত জেগে পাগলের মতন পড়ছে, এটাই ওর স্বভাব, প্রত্যেক পরীক্ষার আগে এরকম করে। এভাবে পড়লে শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। খাওয়াদাওয়া সাবধানেই তো করা উচিত। অন্য কিছু খেতে চায় না বাবলু, দুধ ভালোবাসে, কাল থেকে ওর জন্য দুধ বাড়িয়ে দিতে হবে।

অনেক রাত পর্যন্ত মমতার ঘুম এলো না। ঠিক তিনি যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই, ওরকম তেলালো ইলিশ খেয়ে তাঁর অম্বল হয়ে গেছে।

জোয়ানের আরক খাবার জন্য আবার উঠতে হলো মমতাকে। তাঁর যে আলসারের ধাত আছে, একথা প্রতাপের মনে থাকে না।

ওষুধ খাবার পর মমতা ঘড়ি দেখলেন। তার পর বাইরে এসে উঁকি দিয়ে দেখলেন বাবলুর ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। আলো জ্বেলেই ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? এই গরমে ও সব জানলাও বন্ধ করে রাখে কেন?

তিনি বেরিয়ে এসে ও ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে চাপা গলায় ডাকলেন, বাবলু, এই বাবলু!

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো, আবার কী হলো?

মমতা বললেন, এখনো ঘুমোস নি? এবার শুয়ে পড়, আর পড়তে হবে না, শরীর খারাপ করবে।

–ঠিক আছে, মা তুমি যাও!

–না। তুই শো এবার। কটা বাজে জানিস? পৌনে তিনটে!

এবারে বাবলু প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললো, আঃ, মা, যাও না, কেন বিরক্ত করছে আমাকে?

অন্ধকার বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মমতা। তাঁর স্বামীর মেজাজ সর্বক্ষণ চড়া, কখন যে রাগারাগি করবেন তার ঠিক নেই। নিজের বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছেন যে ছেলেকে, সেও আজকাল যখন তখন ধমকায়। বাড়িতে সবসময় একটা চাপা অশান্তি। সুপ্রীতিও আজকাল প্রায়ই রাগ করে কথা বন্ধ করে দেন। এসব হচ্ছে কেন? টাকার টানাটানি, আগেকার মতন স্বচ্ছল অবস্থা নেই, সেই জন্য? আগেকার মানে তো অনেকদিন আগেকার। মমতাও তো বেশ অবস্থাপন্ন বাড়ি থেকেই এসেছেন, কিন্তু এতদিনে তিনি সব কিছু মানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু মালখানগরের এই এরা এখনো পুরোনো গর্বের কথা ভুলতে

পারে না। এত টানাটানির মধ্যেও প্রতাপ দশ টাকা খরচ করে একটা ইলিশ নিয়ে এলেন, যা কেউ খেলই না! তারও যেন সব দোষ মমতার।

অভিমান, বিষাদ ও অনুশোচনা নিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মমতা আবার বসবার ঘরের দরজায় মৃদু চাপড় দিয়ে কাতর গলায় বললেন, বাবলু, লক্ষ্মীসোনা, এবার ঘুমিয়ে পড়। আমার কথা শোন! ও বাবলু, আজ থাক, শরীরকে কষ্ট দিলে কি পড়াশুনো হয়, না কিছু মনে থাকে!

বাবলু কোনো উত্তর দিল না। সে এর মধ্যেই ঘুমে ঢলে পড়েছে।

৪৫ সন্ধ্যারতির সময় ভক্ত ও দর্শক

সন্ধ্যারতির সময় ভক্ত ও দর্শকদের মধ্যে ঐ বিশেষ মানুষটিকে অসমঞ্জ রায় অনেক আগে থেকেই লক্ষ করেছিলেন। টাইট প্যান্ট ও সাদা টুইলের শার্ট পরা লোকটির হাঁটু মুড়ে বসতে কষ্ট হচ্ছিল নিশ্চয়ই, বসার ভঙ্গি বদলাতে হচ্ছিল বারবার। লোকটির চোখ ও নাক বেশ ধারালো, মাথার কুচকুচে কালো চুল নিখুঁত ভাবে ব্যাক ব্রাশ করা। এ রকম আধুনিক ও তরুণবয়স্ক কারুকে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দেখলে অসমঞ্জ রায় আজকাল আর বিশেষ অবাক হন না। তবে এই লোকটির মুখের হাসিটা যেন কী রকম কী রকম।

আশ্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সন্ধেবেলা মন্দিরের সামনের শামিয়ানার নিচের জায়গাটায় এক একদিন মানুষ ধরে না। অসমঞ্জ আগে ভাবতেন, শুধু বুড়ো বুড়িরাই ধর্মকর্ম করতে আসে। অথবা যারা পাপ করে, যারা মানুষ ঠকায়, যারা ফাটকাবাজ, যারা চট করে ভাগ্য ফেরাতে চায়, তারাই ভয়ে কিংবা অলৌকিক কিছু পাবার আশায় কোনো গুরুজী বা মাতাজীর পায়ে ধরনা দেয়। কিন্তু চন্দ্রামার আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হবার পর থেকে তিনি দেখছেন আঠেরো উনিশ বছরের ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে কত শিক্ষক- অধ্যাপক- সরকারি অফিসার, ব্যবসায়ী, রাজনীতির নোক এখানে আসে, প্রণাম করবার সময় তাদের চোখ-মুখ ভক্তিতে একেবারে মাখো-মাখো হয়ে থাকে।

চন্দ্রার মতন একজন রূপসী সন্ন্যাসিনীর টানেও নিশ্চয়ই অনেকে আসে।

অসমঞ্জ রায় শুধু এই আশ্রমের ট্রাস্টি বোর্ডের সেক্রেটারি নন, তাঁর আর একটি বড় দায়িত্ব চন্দ্রার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কারুকে আসতে না দেওয়া। তিনি নিজেই এই দায়িত্বটা নিয়েছেন, এ বিষয়ে চন্দ্রার সঙ্গে তাঁর কোনো কথা হয়নি, কিন্তু চন্দ্রা নিশ্চিত তাঁর এই ভূমিকাটা সমর্থন করে, চন্দ্রা অসমঞ্জর কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে না, অসমঞ্জ তিন চারদিন না এলে আশ্রমের লোক তাঁর বাড়ি যায় খবর নিতে। গেটের বাইরে দু'জন দারোয়ান থাকে, তারা অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের আটকায়, যেমন কোনো মাতালের এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, গাড়ি নিয়ে কেউ এই আশ্রমের কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকতে পারবে না, হতদরিদ্র চেহারার লোকরা সন্ধেবেলা প্রার্থনার সময় আসতে পারে বটে কিন্তু অন্য সময় তাদের জন্য গেট বন্ধ। অসমঞ্জ তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ রাখেন, অতিশয় ভক্তির ভাব দেখিয়েও কেউ অন্য কোনো মতলবে চন্দ্রার খুব কাছাকাছি আসতে চায় কি না। এ রকম ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে।

এই আশ্রমের প্রথম ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক দত্ত মশাইকে নিয়েও বেশ কিছুদিন সমস্যা চলেছিল। একটা নিঃশব্দ দ্বৈরথ। দত্তমশাই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, অসমঞ্জ সেক্রেটারি, দু'জনের যখন তখন মতবিরোধ হয়েছে। চেয়ারম্যানের ক্ষমতা বেশী, সুতরাং অসমঞ্জ বারবার পদত্যাগ করতে চেয়েছেন, প্রত্যেকবারই মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে চন্দ্রা, সে কিছুতেই অসমঞ্জকে ছাড়বে না, দত্তমশাইকে অগত্যা মেনে নিতে হয়েছে চন্দ্রার কথা। অসমঞ্জর বরাবরেরই ধারণা, ঐ দত্ত লোকটা একটা প্রচণ্ড ভণ্ড, ধর্মে-টর্মে তার বিশ্বাস নেই। এই আশ্রম করা তার একটা ভড়ং, আসলে সে চন্দ্রাকে নিয়ে খেলাতে চায়। চন্দ্রা কখনো ধরা দিতে চায় না বলেই তার জেদ চড়ে গেছে। লোকটা কিন্তু খাঁটি বর্বর নয়, জোর-জবরদস্তির দিকে যেতে চায় না। বুদ্ধির খেলার দিকেই তার ঝোঁক।

দত্তকে নিয়ে অসমঞ্জর শিরঃপীড়া হঠাৎ দূর হয়ে গেল অদ্ভুত ভাবে, আশ্রম প্রতিষ্ঠার বছর খানেকের মধ্যেই। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে দত্তমশাই ভর্তি হলেন পি জি হাসপাতালে, অসমঞ্জ ধরে নিলেন ও আর বাঁচবে না। চন্দ্রা যাতে মনে না করে যে দত্তমশাই চলে গেলে

আশ্রমের খরচ চালাতে অসুবিধে হবে, তাই অসমঞ্জ এই সুযোগে একটা বিরাট চ্যারিটি শো-এর ব্যবস্থা করে তুলে দিলেন সতেরো হাজার টাকা। অসমঞ্জ দেখিয়ে দিলেন আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা তাঁরও কম নয়।

কিন্তু দত্তমশাইয়ের জান অতি কড়া। অত বড় হার্ট অ্যাটাক সামলেও তিনি আবার উঠে বসলেন, শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই জীর্ণ হয়ে যায় নি, নিজের পায়ে হেঁটে তিনি বেরুলেন হাসপাতাল থেকে, তবে তারপর থেকে তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ। নিজের ব্যবসাপত্তরের ভার সব ছেড়ে দিলেন জামাই ও ভাইপোদের ওপর। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, ডাক্তারদের চিকিৎসায় নয়, তিনি সেরে উঠেছেন চন্দ্রামার অলৌকিক কৃপায়। কোমায় থাকার সময় চন্দ্রা প্রতিদিন এসে পুজোর ফুল-বেলপাতা ছুঁইয়ে দিয়ে যেত। দত্তমশাইয়ের মাথায়। সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও তিনি দেখতে পেতেন এক জ্যোতির্ময়ী দেবী মূর্তি তাঁকে আশীর্বাদ করছেন, সেই দেবীর স্পর্শে তিনি নিবিড় শান্তি অনুভব করতেন সারা শরীরে। সবার সামনে তিনি চন্দ্রাকে মা মা বলে ডেকে পায়ের কাছে বসে পড়েন।

প্রথম প্রথম অসমঞ্জ সন্দেহ করতেন যে এটাও দত্তমশাইয়ের আর এক রকম চতুরালি। চন্দ্রার মাহাত্ম্য প্রচার করে আশ্রমের প্রতি আরও ভক্তদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা। আজকাল অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই হার্টের রুগী, তারা অনেকেই চন্দ্রার কাছ থেকে আশীবাদ, ফুল, প্রসাদ পাওয়ার জন্য লালায়িত হবে। সে রকম ঘটতেও শুরু করলো, বড়বাজারের বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী অনেক টাকার প্রণামী দিয়ে সামান্য ফুল-বেলপাতা আর দু'চার টুকরো সন্দেশ কিনে নিয়ে যেতে লাগলো।

তবু অসমঞ্জকে এক সময় স্বীকার করতেই হলো, দত্তমশাই আর আগের মতন নেই, চোখের দৃষ্টিটাই বদলে গেছে, চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে, প্রতিদিন দুবার চন্দ্রাকে তার প্রণাম করা চাই, কিন্তু চন্দ্রার পা পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। একটু দূরের মাটি ছুঁয়ে জিভে ঠেকান। আমিষ আহার ত্যাগ করেছেন, আশ্রমের বাগানের গাছগুলির নিজে হাতে যত্ন করার ঝোঁক হয়েছে তাঁর। অসমঞ্জর সঙ্গে কোনো ব্যাপারে

মতবিরোধ নেই তাঁর। যে-কোনো সমস্যা উঠলেই তিনি বলেন, ওসব আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই-ই হবে। আগে তিনি অসমঞ্জকে ডাকতেন মাস্টারবাবু বলে, এখন বলেন মাস্টারদা। এ আশ্রমের ছোট বড় সবাই তাঁর দাদা কিংবা দিদি।

শরীর দুর্বল হয়েছে বলে দত্তমশাইয়ের ভোগ বাসনাও অন্তর্হিত হয়েছে। শরীর এখন আর শরীর চায় না। এখন শুধু কোনোক্রমে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার লোভ। অসমঞ্জ এখন দত্তমশাইকে খরচের খাতায় তুলে দিয়েছেন।

চন্দ্রা সম্পর্কে ধাঁধার ভাবটা কিছুতেই অসমঞ্জর মন থেকে গেল না। চন্দ্রার সত্যিই কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে, এ তিনি মেনে নিতে পারেন না। কয়েকবছর আগেই এই চন্দ্রা টেনিস খেলতো, সিগারেট খেত, কখনো কখনো মদের গেলাসেও চুমুক দিয়েছে। হঠাৎ কি আকাশ থেকে তার ওপরে আধ্যাত্মিক শক্তি নেমে এলো? চন্দ্রার মুখে অনেক সময়ই একটা ভাবের ঘোরের মতন দেখা যায়, সেটা কি আরোপিত? মাঝে মাঝে যেন পুরোনো চন্দ্রা উঁকি মারে।

অসমঞ্জ এ আশ্রমের পরিচালনার ভার নিয়েছেন, কিন্তু এখনো ভক্ত হতে রাজি হননি। পুজো ও আরতির সময় তিনি মন্দিরের সামনে বসেন না, অফিস ঘরের জানলা দিয়েই সব দেখতে পান। চন্দ্রাও তাঁকে কখনো দীক্ষা নেবার কথা বলেনি। চন্দ্রা যেন জানে, অসমঞ্জ তার কাছে বাঁধা পড়ে থাকবেই। এখনো হঠাৎ হঠাৎ অসমঞ্জ চার হাত কিংবা শরীরের কোনো অংশ ছুঁয়ে দিয়ে বিদ্যুতের শিহরন বোধ করেন, সেই শিহরনে সুখ নেই, প্রত্যেকবার তাঁর মনে হয়, চন্দ্রা তাঁর জীবনটা ধ্বংস করে দিল, শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময় পর্যন্ত অসমঞ্জর এক গভীর অতৃপ্তি থেকে যাবে।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার ফলে, শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানই প্রধান হয়নি, সতেরোটি অনাথিনী নারী আশ্রয় পেয়েছে এখানে। এদের কয়েকজনকে কুড়িয়ে আনা হয়েছে রাস্তা থেকে, ওরা হাতের কাজ ও কিছু লেখাপড়া শিখছে, দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা এপর্যন্ত ভালোই আছে। এই বিশাল দেশে অসংখ্য অসহায় নারী, তাদের মধ্য থেকে মাত্র

সতেরোজনের পুনবার্সন, হয়তো কিছুই না, তবু তো একটা কাজ। চন্দ্রার আশ্রম প্রতিষ্ঠার শখের এই ভালো দিকটা অসমঞ্জ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু এ দেশে যে-কোনো সামাজিক কাজ করতে গেলে কি একটা ধর্মের বাতাবরণ তৈরি করে নিতেই হবে?

সন্ন্যাসিনী হবার বছর খানেক পর থেকে চন্দ্রা একটু মোটা হতে শুরু করেছিল। আলো চালের ভাত ও আলু সেদ্ধ, ঘি মাখনের ফল। তা ছাড়া যে মেয়ে নিয়মিত ব্যাডমিন্টন খেলতো, সে যদি দিনের অধিকাংশ সময় বসে বসে ধ্যান করতে শুরু করে, তবে তার গায়ে তো চর্বি লাগবেই। অসমঞ্জ কষ্ট পেয়েছিলেন। চন্দ্রার ঐ রূপ, এত তাড়াতাড়ি ফ্যাকাসে হয়ে যাবে? এ যে সৌন্দর্যের অনর্থক অপচয়। চন্দ্রা যদি ক্রমে একটি গোলগাল, নিরামিষ চেহারার গুরুমা-তে পরিণত হত, তা হলে হয়তো উপকারই হতে অসমঞ্জর, চুম্বকের টান ছিন্ন হয়ে যেত।

কিন্তু ঠিক সময়ে সচেতন হয়ে গেল চন্দ্রা। সে কি গোপনে ব্যায়াম শুরু করেছে? সে আর মিষ্টি খায় না, সপ্তাহে একদিন সে সম্পূর্ণ উপবাস করে ও মৌন থাকে। আবার সে রূপের ঔজ্জ্বল্য ও ধারালো ভাবটি ফিরে পেয়েছে। শুধু পরমার্থের চিন্তাই নয়, চন্দ্রা তা হলে নিজের শরীর নিয়েও চিন্তা করে। তা হলে শরীরের অন্যান্য দাবিগুলোর কথা কি সে ভাবে না? তার বুকে, দু'বাহুর মধ্যে একটা আলিঙ্গনের শূন্যতা নেই? অসমঞ্জ চন্দ্রার চোখের দিকে চেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে সেটাই বুঝবার চেষ্টা করেন। এখনো তাঁর আশা, একদিন না একদিন চন্দ্রার সংযমের বাঁধ ভাঙবে।

আরতি শেষ হয়ে যাবার পর আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে এলো। যারা নিয়মিত আসে, যাদের বাড়িতে হয়তো কথা বলার বিশেষ কেউ নেই, তারা আরও কিছুক্ষণ থেকে যায়। আজ অবশ্য চন্দ্রার বদলে প্রার্থনা পরিচালনা করেছে পূর্ণিমা, তাই আজ অন্যদের আকর্ষণ কম।

সেই সাদা শার্ট পরা নতুন লোকটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো মন্দিরের সিঁড়ির কাছে। পূর্ণিমা তার হাতে এক টুকরো সন্দেশের প্রসাদ দিতে, সেটি নিয়ে সে কপালে ঠেকালো কিন্তু খেল না, পকেটে রেখে দিল।

তারপর অতি নম্র স্বরে সে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের এই আশ্রমের গুরুমার সঙ্গে একবার দেখা করা সম্ভব?

এই সময় অসমঞ্জ বেরিয়ে এলেন অফিস ঘর থেকে। মানুষের মুখের রেখাতেই অনেক কিছু প্রকাশ পায়। এই যুবকটি এতক্ষণ ধরে বসেছিল, কিন্তু এর মুখে ভক্তিভাব ছিল না একবিন্দু, শুধু কৌতূহল।

অসমঞ্জ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী চাইছেন?

অসমঞ্জর এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে যুবকটি চেয়ে রইলো পূর্ণিমার দিকে। তার কাছ থেকে সে নিজের প্রশ্নের উত্তর আশা করছে।

পূর্ণিমা বললো, আজ তো দেখা হবে না। আজ বেস্পতিবার, ওঁর মৌন।

যুবকটি বললো, কথা বলবার দরকার নেই, আমি শুধু একটু দেখা করবো।

পূর্ণিমার বদলে অসমঞ্জ গলা ভারি করে বললেন, না, আজ দেখা হবে না। আজ উনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।

এতেও বিচলিত হলো না সেই আগন্তুক, পকেট থেকে একটি নোট বই ও কলম বার করে খসখস করে দু লাইন লিখে কাগজটি ছিঁড়ে বললো, এই চিঠিটা একটু দিয়ে আসবেন, আমি অপেক্ষা করছি।

পূর্ণিমা অসমঞ্জর দিকে তাকালো। চন্দ্রার মৌনব্রতের দিনেও চিঠি পাঠাবার কোনো নিষেধ নেই। আশ্রমের নানান খুঁটিনাটি কথা তাঁকে সারাদিন ধরেই ছোট ছোট চিঠিতে জানানো হয়। চন্দ্রা উত্তরও লিখে দেয়। অসমঞ্জও একটু আগেই একটা চিঠি পাঠিয়েছেন।

মৌনব্রতের দিন চন্দ্রা যে সর্বক্ষণ ধ্যান বা পুজো-আচ্চা করে তাও না। সেদিন সে। চিলেকোঠায় একলা একলা কাটায়, সঙ্গে প্রচুর বই থাকে। সে বইও ধর্মপুস্তক নয়। শতবার্ষিকীর বছরে রাজ্য সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর পুরো এক সেট আছে সেখানে, ইয়েটস-এজরা পাউণ্ড-এলিয়টের কাব্য সংগ্রহ আছে, অসমঞ্জ প্রায়ই চন্দ্রার জন্য নতুন বই এনে দেন।

অসমঞ্জ আপত্তি জানাতে পারলো না, পূর্ণিমা চিরকুটটি নিয়ে চলে গেল। অসমঞ্জ জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথা থেকে আসছেন? যুবকটি এবারে ফিরে বললো, আপনি অসমঞ্জবাবু, তাই না? আপনার কথা শুনেছি। আমি কাছ থেকেই আসছি। এখানকার গুরুমার যিনি বাবা, সেই আনন্দমোহন চক্রবর্তী আমায় চেনেন, তাঁর সোর্স ধরেই এসেছি, আমার একটা জরুরী সমস্যা আছে।

অসমঞ্জু বললো, আনন্দমোহনবাবু তো প্রায়ই এখানে আসেন, প্রার্থনা শোনেন, আজই আসেননি দেখছি।

–হ্যাঁ, তিনি এলে আমার খানিকটা সুবিধে হতো। আচ্ছা, এই আশ্রমের মধ্যে সিগারেট খাওয়া যায় না, তাই না? আমি একটু কম্পাউণ্ডের বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

–অফিস ঘরের মধ্যে আসুন।

বাইরের লোক অনেকেই চলে গেছে। দুটি আশ্রমের মেয়ে মন্দিরের সামনে উবু হয়ে বসে পরিষ্কার করছে ফুল-বেল পাতা। এদের মধ্যে একটি মেয়ে শিয়ালদা স্টেশনে ছিল। এখন খুব মন দিয়ে সব কাজ করে।

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে বাঁধা কপির তরকারি রান্নার গন্ধ। এক একদিন অসমঞ্জ এখান থেকেই খেয়ে যান। আগে এক বেলাও নিরামিষ খেতে পারতেন না। এখন মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না।

নিজেও একটি সিগারেট ধরিয়ে অসমঞ্জ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম?

যুবকটি হেসে বললো, নাম শুনে আপনি আমাকে চিনবেন না, আমি অতি সাধারণ মানুষ, আমি এসেছি একটা খুব ব্যক্তিগত ব্যাপারে।

ব্যক্তিগত শব্দটির ওপর বেশি জোর দিয়ে সে যেন বুঝিয়ে দিতে চাইলো, অসমঞ্জর কাছ থেকে সে আর কোনো কৌতূহলী প্রশ্ন শুনতে চায় না।

এই সময় পূর্ণিমা ফিরে এলো সবেগে। বোঝাই যায় সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে ছুটতে

–আপনি চলে যান, দেখা হবে না!

অসমঞ্জ এবং যুবকটি পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারা দু' জনেই আরও কিছু শুনতে চায়।

পূর্ণিমা বললো, চিঠিটা পড়েই চন্দ্রামা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন, আমার দিকে রাগ রাগ চোখে তাকালেন।

যুবকটি মুখ নিচু করে সিগারেটে একটা জোর টান দিল। তারপর যখন আবার মুখ তুললো, তার চরিত্র বদলে গেছে। কঠিন গলায় সে বললো, ঠিক আছে, আমি আবার কাল আসবো! কালকে উনি প্রকাশ্যে দেখা দেবেন আশা করি?

অসমঞ্জ বললেন, আপনার কী দরকার যদি আমাকে বলতে পারেন...

কোনো উত্তর না দিয়ে সে পেছন ফিরে চলে গেল হনহনিয়ে।

পূর্ণিমা ফিস ফিস করে বললো, মাস্টারদা, খুব রেগে গেছেন চন্দ্রামা। বোধ হয় লোকটা ওঁর চেনা।

চিঠিখানা কেন আগে অসমঞ্জ সেনসর করে পাঠাননি, সে জন্য অসমঞ্জ অনুতপ্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল, এর পর থেকে কোনো উটকো লোকের চিঠিই চন্দ্রার কাছে পাঠানো হবে না। অসমঞ্জ নিজে আগে পড়ে দেখবেন। কে এই যুবকটি?

যেদিন চন্দ্রার মৌনব্রত থাকে, সেদিন অসমঞ্জ আর বেশিক্ষণ থাকেন না আশ্রমে। কিন্তু আজ তাঁর যেতে পা সরলো না। তিনি হিসেবের কাগজপত্র নিয়ে বসে গেলেন। মেয়েদের অনাথ আশ্রম চালাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি ইংরিজি আবেদন পত্রের মুশাবিদা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু কিছুতেই তাঁর ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না। এই যুবকটির ব্যবহার তার মনের মধ্যে একটা খটকা ধরিয়ে দিয়ে গেছে। ও সাধারণ কেউ নয়।

একসময় অসমঞ্জর মনে হলো, আজ চন্দ্রার সঙ্গে একবার দেখা না করে গেলে কিছুতেই রাতে ঘুম হবে না। তিনি দেখা করতে গেলেও কি চন্দ্রা ফিরিয়ে দেবে? সব নিয়মেরই তো ব্যতিক্রম আছে।

তিনি সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে এলেন ছাদের ঘরে। তিনতলায় এই একটিই মাত্র ঘর। এদিকে এখনও তেমন নতুন বাড়ি ওঠেনি, ছাদ থেকে অনেকদূর পর্যন্ত ফাঁকা দেখায়। বোধ হয় শুক্লপক্ষ চলছে। সন্ধের পর থেকে আকাশে পাতলা জ্যোৎস্না। ছাদের পাশেই দুটি নারকোল গাছের ডগা দুলছে বাতাসে। শেয়াল ডাকছে জলাভূমির ধারে।

চন্দ্রার ঘরের দরজাটা বন্ধ নয়, ভেজানো। খুব কাছে গিয়ে তিনি দু'বার আস্তে ডাকলেন, চন্দ্রা, চন্দ্রা।

বই পড়তে পড়তে চন্দ্রা অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। আবার জেগে উঠে পড়ে। একদিন ভোর থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত এই রকম চলে। এই ঘরের সংলগ্ন একটি বাথরুম আছে, সুতরাং চন্দ্রাকে একবারও বেরুতে হয় না।

জেগে থাকলেও তো চন্দ্রা সাড়া দেবে না। অসমঞ্জ নিজেই দরজাটা ঠেলে খুলবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় দরজাটা খুলে গেল। শ্বেতবসনা চন্দ্রা, মাথার চুল খোলা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অসমঞ্জ খানিকটা কম্পিত বক্ষে লক্ষ করলেন, এরকম অসময়ে এলেও চন্দ্রার চোখে রাগ বা বিরক্তির চিহ্ন নেই।

অসমঞ্জ বললেন, একটু ভেতরে আসব? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর কাছে চিঠিটা ড্রাফট করার জন্য দু একটা পয়েন্ট...

দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে চন্দ্রা মেঝেতে বসে পড়লো, এ ঘরে খাট-বিছানা নেই, শুধু একটি কম্বল পাতা। একটি কাঁচের জগ ভর্তি জল ও গেলাস। চন্দ্রার উপবাস নিরম্বু নয়। আর একটা বেস্পতিবার মাত্র অসমঞ্জ এই ঘরে চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন বিশেষ দরকারে। এ ঘরে চন্দ্রাকে দেখলেই তার "যৌবনে-যোগিনী" শব্দ দুটি বার বার মনে পড়ে।

রবীন্দ্ররচনাবলীর একটি গল্পের পৃষ্ঠা খোলা। রাজা নাটক পড়ছে চন্দ্রা। পাশে একটি খাতা। সেই খাতাটা টেনে নিয়ে চন্দ্রা লিখলো, গভর্নমেন্টের চিঠির কথা কাল হবে। তুমি নিশ্চয়ই অন্য কথা বলতে এসেছো? বলো।

খাতাটা নিয়ে লেখাগুলি পড়ে অসমঞ্জ তার তলায় লিখলেন, আজ একটি লোক এসেছিল, তোমাকে চিঠি পাঠালো। তুমি তাকে চেনো? সে কে?

চন্দ্রা আবার লিখলো, ও কথা থাক, অন্য কথা বলো।

অসমঞ্জ আবার কিছু লিখতে গিয়ে থেমে গেলেন। চন্দ্রার আজ মৌন, সে লিখে লিখে কথা বলবে। কিন্তু অসমঞ্জর তো লেখার দরকার নেই। তিনি তো মুখে বললেই পারেন। তা ছাড়া তাঁর বাংলা হাতের লেখা ভালো নয়।

তিনি বললেন, লোকটি আবার কাল আসবে বলে গেল। খুব রাগ রাগ ভাব। তুমি চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছো শুনে অপমানিত বোধ করেছে।

“আসুক কাল।”

–মনে হয় কাল একটা কিছু গণ্ডগোল করবে। আমরা কি ওকে গেটে আটকাবো?

“কোনো দরকার নেই। ও কী বলবে তা আমি জানি।”

–চন্দ্রা, তুমি ওকে চেনো? ও কে?

“তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন, অসমঞ্জ? অন্য কথা বলো।”

–না, আমি জানতে চাই ঐ লোকটা কে? যদি আশ্রমের মধ্যে চ্যাঁচামেচি করে, যদি তোমাকে কোনো খারাপ কথা বলে...আগে থেকে তার প্রতিকার করা আমাদের কর্তব্য।

চন্দ্রা কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো অসমঞ্জর দিকে। তারপর আবার লিখলো, “ও বিমান! আমার স্বামী। এতদিন পরে এসেছে। ও খুব ভদ্র, ওর মুখ দিয়ে খারাপ কথা বেরোয় না।”

অসমঞ্জ প্রায় ফিসফিস করে বললেন, তোমার স্বামী? আমি প্রথমে তাই-ই ভেবেছিলুম। কিন্তু দেখলে তোমার চেয়ে বয়েসে ছোট মনে হয়...এতদিন পর এসেছে... কেন?

“ও কী চায়, আমি জানি। ও আবার বিয়ে করতে চায়...কিন্তু আমি ওকে বিবাহ-বিচ্ছেদ দেবো না। ওকেও সন্ন্যাসী হতে হবে?”

এবারে গলা চড়িয়ে অসমঞ্জ বললেন, ও তোমার স্বামী...ডিভোর্স চাইতে এসেছে...একটা প্রচণ্ড স্ক্যান্ডাল হবে, আশ্রমের সুনাম নষ্ট হবে...চন্দ্রা, তুমি কোনোক্রমেই কাল ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। তুমি কয়েকটা দিন অন্য কোথাও গিয়ে থাকো।

“কোথায়?”

–তুমি পুরী যাবে বলছিলে, জগন্নাথ দর্শন করতে। আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি। চন্দ্রা, প্লীজ, ঐ লোকটিকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, একটা কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে। ওকে তুমি কেন ডিভোর্স দেবে না?...

“ও আর একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করবে। সে অধিকার ওকে দেওয়া চলে না।”

চন্দ্রা যতক্ষণ ধরে লিখছে ততক্ষণ যেন অসমঞ্জ ধৈর্য ধরে থাকতে পারছেন না। আবেগের আতিশয্যে তিনি চন্দ্রার অন্য হাতটা চেপে ধরলেন।

চন্দ্রা মুখ তুলে নিবিড়ভাবে দেখলো অসমঞ্জকে। তারপর আবার লিখলো, অসমঞ্জ, তুমি কী চাও?

–আমি চাই, তুমি কয়েকদিনের জন্য...আমার সঙ্গে পুরী যেতে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি নেই। তুমি তো একা যেতে পারো না...

চন্দ্রা আবার ঐ একই কথা লিখলো, “অসমঞ্জ, তুমি কী চাও?”

এবারে অসমঞ্জ গভীর অভিমানের সঙ্গে বললেন, আমি কী চাই, তুমি জানো না। এতদিন ধরে... চন্দ্রা, তুমি আমার বউকেও তোমার মতন সন্ন্যাসিনী করেছে, তাকে দীক্ষা দিয়েছো, সে আমাকে আর স্বামীর মর্যাদা দেয় না...আমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছো তুমি, দিন দিন আমি শুধু এই আশ্রমের সেবাদাস হয়ে যাচ্ছি...সে সব কেন, কিসের জন্য? আজও তুমি জিজ্ঞেস করছো, আমি কী চাই?

চন্দ্রাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে তিনি তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে গেলেন। চুম্বনের একটা ভঙ্গি মাত্র, প্রকৃত চুম্বন নয়, শুধু ঐটুকু স্পর্শেই সাতচল্লিশ বছর বয়স্ক অসমঞ্জ রায় এমন কেঁপে উঠলেন যে নিজেই পরের মুহূর্তে চন্দ্রাকে ছেড়ে সরে গেলেন দূরে। একটা ভয়ার্ত পশুর মতন বসলেন দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

ঠিক যেন সম্মোহন করার মতন অসমঞ্জর দিকে চন্দ্রা নিষ্পলকভাবে চেয়ে রইলো প্রায় পুরো এক মিনিট। তারপর রাগের বদলে তার মুখে ফুটলো হাসি। এবারে সে কথাও বললো। বুক থেকে আঁচল ফেলে দিয়ে সে বললো, তুমি এই চাও, অসমঞ্জ, এসো।

পটপট শব্দে ব্লাউজের টিপ বোতাম খুললো চন্দ্রা। ব্রেসিয়ার সে অনেকদিনই পরে না। অনেকদিন অস্পৃষ্ট, অনাঘ্রাত, নিটোল স্তন দুটির দিকে চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলো অসমঞ্জ। মা যেমন করে তার সন্তানকে স্তন্য পান করায়, সেইভাবে নিজের একটি বুকে হাত দিয়ে চন্দ্রা বললো, এসো।

অসমঞ্জ দেরি করছে দেখে চন্দ্রা নিজের শায়ার দড়িতে হাত দিয়ে আরও মধুর করে হেসে বললো, তুমি যা চাও, আজ সব দেবো, অসমঞ্জ। আমার তো কোনো লজ্জা নেই। পাপ নেই।

অসমঞ্জর মনে হলো যেন তার শরীরে হাজার হাজার তীর বিধছে। হাজার হাজার চোখ। এই আশ্রমের সব মেয়েরা, রাস্তার লোকেরা, তার স্ত্রী, তার শ্বশুরবাড়ির সবাই দেখছে, এক্ষুনি তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। চন্দ্রার মতন এই জ্বলন্ত আগুন নিয়ে সে কী করবে, কোথায় পালাবে, এই আশ্রম ভেঙে যাবে, কেউ আর তাদের দু'জনকে আশ্রয় দেবে নাঃ না, না, এতখানি সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই, তিনি তো এত বেশি চাননি। চন্দ্রার একটু স্পর্শ, মুখের হাসি, যদি চন্দ্রা তার বুকে একবার মাথা রাখতে দেয়। সেই-ই তো যথেষ্টরও বেশি।

অদ্ভুত ভয় মাখানো গলায় অসমঞ্জ বললেন, না, না, চন্দ্রা, আমায় ক্ষমা করো, আমি অন্যায় করেছি। আমার মাথার ঠিক ছিল না।

চন্দ্রা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এত ভয় কিসের, অসমঞ্জ? তোমার যখন এতটাই ইচ্ছে, এই অতি সামান্য শরীর, রক্তমাংসের পিণ্ড, তার প্রতি তোমার যদি এতটাই মোহ থাকে, তবে সে মোহটাকে মিটিয়ে নাও। শরীরের তো পাপ-পুণ্য নেই, সব কিছুই মনের। অসমঞ্জ, যতদিন তোমার চোখে লোভ থাকবে, মোহ থাকবে, ততদিন তো তুমি কোনো বড় কাজে মন বসাতে পারবে না! এসো অসমঞ্জ, আমাকে ছুঁয়ে দেখো, আমার ভেতরেও যদি ষড়রিপুর কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাকে শেষ করে দাও!

অসমঞ্জর মনে হলো, চন্দ্রা যেন তার মাথা ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে আরও ওপরে। চন্দ্রার দুই স্তন, তার নিম্ন উদর, তার দুই ঊরু, সবকিছুই বিশাল। চন্দ্রার তুলনায় তিনি কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছেন খুব দ্রুত। ঘরের অনেকগুলি জানলা দিয়ে শত শত নারী-পুরুষ সকৌতুকে দেখছে সেই দৃশ্য।

একটু এগিয়ে এসে চন্দ্রা আবার বললো, অস্বীকার করতে পারি না, আজ আমার মধ্যেও চাঞ্চল্য ঘটেছে। আজ যে এসেছিল, সে আমার স্বামী, বিমান, কেন তাকে ছেড়ে এসেছিলাম এ পর্যন্ত কারুকে তা বলিনি। তুমি শুনতে চাও?

কথা বলার ক্ষমতাই যেন চলে গেছে, অসমঞ্জ শুধু ঘাড় হেলালেন।

চন্দ্রা আস্তে আস্তে থেমে থেমে বললো, আমাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়েছিল, যেমন যুবক যুবতীদের মধ্যে হয়। বিমান আমাকে বিয়ে করার জন্য সাধ্যসাধনা করেছিল, আমি তখনও ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, পরীক্ষা না দিয়েই ঝোঁকের মাথায় রাজি হয়ে গেলুম বিয়ে করতে। এই ঝোঁকটা আসলে কী বলো তো, শারীরিক মিলনে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য একটা সামাজিক স্বীকৃতি। তার নামই তো বিয়ে, তাই না? বিয়ে আমাদের হলে, শারীরিক মিলনের তীব্র সুখও যে পেয়েছিলাম, তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমাদের বিয়ের ঠিক এক বছর এক মাস সতেরো দিন পর বিমান তার এক মাসতুতো বোনের সঙ্গে শুয়েছিল, আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল। তাতে আমি প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী অবাক হয়েছিলাম। তা হলে ভালোবাসা কী? ভালোবাসা

বলে কি কিছুই নেই? কিংবা শরীর পুরোনো হয়ে যায়, তবু ভালোবাসা থাকে। বিমান আমাকে ঠিক আগের মতনই ভালোবাসার ভান করতো, কিংবা সেটা ভান নয়, শরীর-নিরপেক্ষ ভালোবাসা? রবীন্দ্রনাথ তো এরকম ভালোবাসার কথা লেখেননি? কোনো কবি-সাহিত্যিক লেখে না। তুমি বিমানের সঙ্গে মিশে দেখো, অসমঞ্জ, সে চমৎকার মানুষ, তার ব্যবহারে কোনো খুঁত নেই, কিন্তু সে কি শুধু শরীরের মধ্যে ভালোবাসা খোঁজে? অসমঞ্জ, তুমি আরও শুনবে?

কম্পিত গলায় অসমঞ্জ বললেন, চন্দ্রা, চন্দ্রা, তুমি শান্ত হও! বাকি সব কথা পরে শুনবো!

চন্দ্রা অসমঞ্জর কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, আমিও শরীরের মধ্যে ভালোবাসা খুঁজেছি। কিছুতেই পাইনি। সে যে কী কষ্ট! শরীরে একটা জৈবিক সুখ আছে। কিন্তু ভালোবাসা না পাবার উপলব্ধির বেদনা যে আরও অনেক, অনেক বেশী তীব্র! তোমার স্ত্রী অসুস্থ, তুমি তার কাছ থেকে সুখ পাও না, তুমি আমার শরীরের মধ্যে কি ভালোবাসা খুঁজতে চাও, অসমঞ্জ? তবে নাও, খুঁজে দেখো, এসো অসমঞ্জ, লজ্জা কী?

অসমঞ্জ বলে উঠলেন, না, না, না!

চন্দ্রা নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে বললো, ভালো করে ভেবে দ্যাখো, অসমঞ্জ, মনে কোনো দ্বিধা রেখো না। যদি এই শরীরটাকে পেলে তোমার মোহ মিটে যায়...

রক্তচন্দনবর্ণা, খলিতবসনা চন্দ্রাকে অসমঞ্জর মনে হলো যেন কালী মূর্তি। তিনি আর তাকাতে পারছেন না। সত্যিকারের ভয়ে তার শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে।

হাত জোড় করে তিনি প্রায় কেঁদে ফেলে বলতে লাগলেন, এই শেষবারের মতন আমায় ক্ষমা করো, চন্দ্রা। আমি স্বীকার করছি, তুমি অসাধারণ, তোমার অলৌকিক শক্তি আছে, তুমি আমাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে...

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অসমঞ্জ চন্দ্রাকে প্রণাম করে ফেললেন।

৪৬ দোতলা থেকে কল্যাণী ডাকছেন

দোতলা থেকে কল্যাণী ডাকছেন, অলি, অলি!

অলি শুনতে পেয়ে একটু অবাক হলো। তাদের লম্বাটে ধরনের তিনতলা বাড়ি, যখন তখন একতলা-তিনতলায় ওঠানামা করতে হয়, তবু এ বাড়িতে কারুর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকার প্রথা নেই। বিমানবিহারী বা কল্যাণী কেউই কখনো উঁচু গলায় কথা বলেন না। অলি ভুরু কুঁচকে ভাবলো, মা কোনো কারণে ব্যস্ত হয়ে তার খোঁজ করছে, জগদীশকে পাঠালেই তো পারতো। নিশ্চয়ই ফাঁকিবাজ জগদীশটা ধারে কাছে নেই, আর একটা নতুন ছেলে এসেছে ফটিক, সে আবার কানে কম শোনে।

অলি বসে আছে পড়ার টেবিলে, আর তার খাটে শুয়ে আছে বর্ষা। আজ সকাল থেকেই। তারা এক সঙ্গে পড়াশুনো করছে। বর্ষার এক মামাতো ভাই হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে কানপুর থেকে, সেই জন্য তাদের বাড়িতে জায়গা নেই, অথচ পরীক্ষার আর মাত্র সাতাশ দিন বাকি।

বর্ষার বরাবরই শুয়ে শুয়ে পড়া অভ্যেস, কারণ তার কোনো নিজস্ব পড়ার টেবিলই নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে উপুড় হয়ে বইয়ের পাতায় চোখ আটকে রাখতে পারে। অলি আবার সারা দিন শুয়ে শুয়ে পড়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না।

অলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এই, আমি একটু আসছি রে।

বর্ষা চোখ তুললো না, ভালো করে শুনলোই না অলির কথা, মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ করলো শুধু।

আজ অলি চুল বাঁধেনি, বিকেলবেলায় শাড়ি-জামা বদল করেনি। একটা সাধারণ গোলাপী শাড়ি পরা, তার চুল আজ প্রায় বর্ষার মতনই উলুসথালুস। দিশি ফাউন্টেন পেন ব্যবহার

করার বেশি বেশি ঝোঁক অলির, সেই পেনের কালি আঙুলে লাগবেই, খানিকটা কালি কখন যে তার থুতনিতে লেগেছে, তা সে খেয়ালই করেনি।

বাইরের সিঁড়ির রেলিং ধরে উঁকি মেরে অলি মাকে দেখতে পেল না। ওপর থেকেই সংলাপ সেরে নেওয়া অলির ধাতে নেই, সে নেমে এলো দোতলায়।

অফিস ঘরের দরজার কাছে আসতেই কল্যাণী বললেন, আয় অলি, ভেতরে আয়।

এ ঘরে অন্য অতিথি আছে, পাক্কা সাহেবের মতন স্যুট পরা একজন মধ্যবয়স্ক সুপুরুষ, তাঁর পাশে জর্জেটের শাড়ি-পরা একজন মহিলা। মহিলাটির প্রসাধন বেশ উগ্র, আই লাইনার দিয়ে চোখ আঁকা, ভুরুর ঠিক নিচে সবুজ আই শ্যাডো, চোখের পাতায় ম্যাসকারা।

এই দু'জনের দিকে দু' পলক তাকিয়েই অলির মনে পর পর কয়েকটি ভাব খেলে গেল। এই গরমে মহিলাটি জর্জেটের শাড়ি পরে আছেন কী করে? ইনি বেশ ডাকসাইটে ধরনের সুন্দরী, কিন্তু এত মেক-আপ না নিলেই বোধ হয় আরও বেশি ভালো দেখাতো। ভদ্রলোক স্যুটের সঙ্গে ওয়েস্ট কোট পর্যন্ত পরেছেন, বাবা, আজকাল ওয়েস্ট কোট তো প্রায় দেখাই যায় না। বাইরের লোকের সামনে এভাবে হঠাৎ তাকে ডাকবার মানে কী? মায়ের কি আগে থেকে বলে দেওয়া উচিত ছিল না? অলির ব্লাউজের একটা বোতাম ছেঁড়া!

বিমানবিহারী বললেন, অলি, তুই এঁদের চিনিস তো? জাস্টিস পি এন মিত্র আর মিসেস মিত্র।

এই বিচিত্র দম্পতিকে আগে কখনো দেখে থাকলেও অলির মনে নেই। সে হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বললো না, মুখে সৌজন্যের হাসি ফোঁটালো।

কল্যাণী তাকিয়ে আছেন অলির চোখের দিকে। তিনি নিঃশব্দে যে আদেশ দিচ্ছেন তা বুঝতে পেরেও অলি শুধু দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো। মাত্র পাঁচজন নারী-পুরুষ ছাড়া সে আর কারু পায়ে হাত দিয়ে কখনো প্রণাম করবে না, ঠিক করে ফেলেছে।

বিমানবিহারী মহিলা-অতিথিটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আতরদি, তুমি তো অলিকে চেনো? আমাদের কেষ্টনগরের বাড়িতে এসছিলে।

মহিলা তাঁর ভুরু বাঁকিয়ে বললেন, ওকে কত ছোট দেখিছি, ফ্রক পরে দৌড়াদৌড়ি করতো, মাথার চুল কোঁকড়া ছিল না? এখন তো রীতিমতন ইয়াং লেডি!

জাস্টিস মিত্র বললেন, তুমি প্রেসিডেন্সিতে ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়ছো? শন্তু...মানে, এস এন ব্যানার্জি, তোমাদের এখনও পড়ান?

অলি মাথা হেলিয়ে বললো, হ্যাঁ, উনি হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট।

-ঐ শন্তু ছিল আমার ক্লাস মেট, লন্ডনেও আমরা একই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে...

জাস্টিস মিত্রের বাংলা বলার একটা নিজস্ব কায়দা আছে। গলার আওয়াজটি মিষ্টি, বাংলা শব্দগুলো উচ্চারণ করেন ইংরিজি কায়দায়,' যেমন তোমাদের কথাটা বললেন, তো-ও-মা-আ-দের, পড়ান' হলো পওড়ান!

জজ-পত্নী উঠে এসে অলির হাত ধরে বললেন, বসো, একটু বসো আমাদের সঙ্গে, আমরা কাছেই এক জায়গায় এসেছিলুম...

শনিবার বিকেল সোওয়া পাঁচটা, এই সময় মানুষ তো মানুষের বাড়িতে বেড়াতে আসতেই পারে, অলির পক্ষেই এই সময়টাতেও বই নিয়ে বসে থাকা অস্বাভাবিক। বাড়িতে অতিথি এলে তার আলাপ করা উচিত। টুকিটাকি কথা চলতে লাগলো।

জজ-পত্নী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আর একটি মেয়ে আছে না? সে কোথায়, বিমান?

কল্যাণী বললো, ছোট মেয়ে এই সময় নাচের ইস্কুলে যায়।

–একদিন মেয়েদের নিয়ে এসো আমাদের বাড়িতে। তুমি তো আমাদের বাড়ি চেনো, বিমান?

–মে ফেয়ারের সেই বাড়ি তো? হ্যাঁ, গেছি একবার। জাস্টিস মিত্র অলির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের একটি মাত্র ছেলে। সে বিলাতে গেছে ব্যারিস্টারি পড়তে। নেক্সট মানথে একবার আসবে। তুমি তার সঙ্গে আলাপ করলে। নিশ্চিত খুশি হবে। ইংলিশ লিটরেচারে তার খুব ইরেস্ট আছে।

অলি বললো, আমার সামনের মাসে পরীক্ষা।

–হ্যাঁ, পরীক্ষার পরই এসো। আমার ছেলে আসবে নেক্সট মাসের ফোর্থ উইকে, তারপর ফাইভ উইকস এখানে থাকবে।

বিমানবিহারী বললেন, অলি একটু দেখবি, জগদীশ কোথায় গেল? একটু চা–

জজ-পত্নী বললেন, না, না, চায়ের জন্য ব্যস্ত হবেন না।

অলি উঠে পড়ে একতলার রান্নাঘর থেকে জগদীশকে খুঁজে বার করলো। মৃদু বকুনি দিল তাকে, তারপর চা ও জলখাবারের নির্দেশ দিয়ে সে আর অতিথিদের কাছে ফিরলো না, চলে এলো তিনতলায়।

বিছানার ওপর উঠে বসে বর্ষা এখন একটা সিগারেট ধরিয়েছে। অলির মুখের রক্তিম আভা তার চোখ এড়ালো না।

অলি বর্ষার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, দে, আজ আমিও একটু সিগারেট খাবো।

বর্ষা জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে রে? মাসিমা তোকে বকলেন নাকি?

অলি জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, হঠাৎ মা বকবে কেন? নিচে দু'জন অতিথি এসেছে, মা আমায় ডেকে ওঁদের পাত্রী দেখালেন।

–অ্যাঁ?

–হ্যাঁ রে। তুই জাস্টিস পি এন মিত্র-র নাম শুনেছিস? একেবারে টপ সোসাইটির লোক, ওঁর স্ত্রীকে নাকি অল্প বয়েসে মেমসাহেব বলে ভুল করা হতো, বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিতের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব আছে, ব্রিটিশ আমলে বেঙ্গলের গভর্নর কেসির বউয়ের সঙ্গে উনি ব্যাডমিন্টন খেলেছেন, এই সব এইমাত্র শুনলুম। ওঁদের একমাত্র ছেলে ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়ে, তার সঙ্গে আমায় মানাবে না?

–তুই, তুই এরকম সাজপোশাক নিয়ে...যাঃ, তুই বানিয়ে বলছিস, অলি?

–বিশ্বাস না হয় নিচে গিয়ে দেখে আয়। ওঁরা বোধ হয় চেয়েছিলেন, 'তুমি যেমন আছো, তেমনি এসো, আর করো না সাজ।'

–আমার সত্যিই একবার ওঁদের দেখে আসতে ইচ্ছে করছে রে!

–উঁকি মেরে আসতে পারিস। ভেতরে ঢুকে কথাও বলতে পারিস। জজের থেকে তার বউ বেশি ইন্টারেস্টিং। তবে দেখিস, তোকে যেন আবার পছন্দ করে না ফেলে! আমার চান্সটা নষ্ট করে দিস না ভাই!

বর্ষা সত্যি উঠে সিঁড়ি পর্যন্ত গেল। তারপর আবার ফিরে এসে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বললো, নাঃ, নিজেকে চেক করলুম। যদি ওঁদের সামনে উল্টো-পাল্টা কিছু বলে ফেলি, তোর বাবা-মা দুঃখ পাবেন। তুই সত্যি বিয়ে করতে রাজি আছিস নাকি রে, অলি?

উত্তর না দিয়ে অলি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।

বর্ষাও হেসে উঠে বললো, মেলোমশাই-মাসিমাকে এত ওল্ড ফ্যাশা বলে তো মনে হয়নি কোনোদিন। বাড়িতে তোক ডেকে মেয়ে দেখানো...এতে পর্যন্ত রাজি হলেন?

–বাবা কোনো কিছুতেই না বলতে পারেন না।

–তোকে ওঁরা গান গাইতে বলেনি? শক্ত ইংরিজি শব্দের বানান জিজ্ঞেস করেননি? একটু হাঁটো তো মা, বলে পায়ের কোনো খুঁত আছে কিনা দেখার চেষ্টা করেননি?

–প্রায় সেই রকমই। জজমশাই দু লাইন শেক্সপীয়ার কোট করে আমার দিকে চোখ সরু করে তাকালেন, কোন নাটকের সেটা আমি ধরতে চাইছি কি না জানতে চাইছিলেন।

–তুই বললি?

–কিছুই বলিনি। বললে বলা উচিত ছিল মিস কোট করেছেন। উনি ওথেলো থেকে বলতে গেলেন :

Keep up you bright Swords, for the dew will rust them
Good Signior, you shall more command with years
Than with your weapons...

এর মধ্যে শেষের □□□□-টা বাদ দিয়ে ফেললেন।

–হঠাৎ এই লাইনগুলো কোট করার মানে?

–অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী! নিজের বয়েসের কথা বলতে গিয়ে...

দুই সখী এবার হাসলো অনেকক্ষণ ধরে। যে-কোনো উচ্চ পদ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি বর্ষার একটা অবজ্ঞার ভাব আছে, সে চুটিয়ে ঠাট্টা করলো নানা রকম। তারপর এক সময় সে বললো, এবারে আমি উঠি রে, অলি।

অলি বললো, কেন, বোস না। এরপর চা খেয়ে সেকেণ্ড পেপারটা একটু পড়বো।

বর্ষা তার চুলের গোছায় একটা গিট বাঁধতে বাঁধতে বললো, নাঃ, বিকেল হয়ে গেল, এখন তোদের বাড়িতে অনেক লোকজন আসবে।

–আর কেউ আসবে না। এ ঘরে আসবে না।

–ঐ পাগলা অতীনটা যদি এসে পড়েনা বাবা, আমি পালাই!

–যদি আসেই বা, তুই কি বাবলুদাকে ভয় পাস নাকি?

–ভ্যাট, তোর ঐ প্যাংলা চেহারার বাবলুদাকে আমি ভয় পেতে যাবো কেন, কোনো ছেলেকেই আমি ভয় পাই না। কিন্তু...আমার মনে হয়...ঐ অতীন মজুমদার আমাকে ঠিক পছন্দ করে না। আমার দিকে কীরকমভাবে যেন তাকায়... আমাকে বোধ হয় সন্দেহ করে।

অলি সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার কথার প্রতিবাদ করতে পারলো না। এ কথা তো ঠিকই, অতীন বর্ষাকে পছন্দ করে না, বর্ষার প্রসঙ্গ উঠলেই 'তোর ঐ ফেমিনিস্ট বন্ধুটা' বলে ঠাট্টা করে, যদিও বর্ষার সামনে সে কিছু বলে না।

কিন্তু একটা শব্দে তার খটকা লাগলো। সে বলল, সন্দেহ মানে, তোকে কী সন্দেহ। করবে?

বর্ষা বললো, ও হয়তো ভাবে, আমি তোকে খারাপ করে দিচ্ছি। আমি তোকে বখাচ্ছি!

অলি বললো, আ-হা-হা-হা!

বর্ষা অলির একটি হাত ধরে তার পাশে নিজের অন্য হাতটি রেখে বললো, দ্যাখ অলি, তুই যে আমার থেকে বেশি ফর্সা তাই-ই না, তোর হাত কত নরম, তুলতুলে, আঙুলগুলো

সরু সরু, আটিস্টিক, আর আমার হাত শক্ত, কড়া কড়া। দশ-এগারো বছর ধরে আমি নিজের বাড়ির বাসনপত্তর মাজি, ঘর ঝাঁড় দিই, রান্না করি...তোর থেকে আমার অভিজ্ঞতা কত বেশি, আমার যখন তের বছর বয়েস, আমার এক কাকা আমাকে মোলেস্ট করেছিল, আমি যত রকম খারাপ গালাগাল শুনেছি, তুই কল্পনাও করতে পারবি না, তুই কখনো গয়নার দোকানে গয়না বিক্রি করতে গেছিস একা একা? আমাকে যেতে হয়েছিল, কলেজে ভর্তি হবার আগে, দাদাকে না জানিয়ে মায়ের একটা গয়না বউবাজারের এক দোকানে...আমাকে প্রথমেই কী বললো জানিস, কোন বাড়ি থেকে গয়নাটা চুরি করেছো? আমাকে ভেবেছিল কোনো বাড়ির ঝি...আর একজন জিজ্ঞেস করলো, এই, তুই বুঝি হাড়কাটায় থাকিস?...অলি, তুই জানিস, কাকে হাড়কাটা বলে? থাক, তোর জেনে দরকার নেই... সেদিন আমি এমন ভয় পেয়েছিলুম, ভেবেছিলুম ওরা আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবে...সেই দোকানে আর একটা লোক বসেছিল, এখনও মনে আছে তার চেহারা, কালো, রোগা,সিল্কের জামা-পরা, গায়ে আতরের গন্ধ, সে আমায় বলেছিল, খুকী, তুমি গয়না বিক্রি করো না, আমার সঙ্গে চলো, তোমায় টাকাটা দিয়ে দেবো...সে লোকটাও ছিল বদমাইশ...।

হঠাৎ থেমে গিয়ে বর্ষা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো হাঁটুর ওপর থুতনি ঠেকিয়ে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, জগদীশ আমাদের চা দেবে না?

অলি জিজ্ঞেস করলো, তোর তের বছর বয়েসে...তোর কাকা তোকে মোলেস্ট করেছিল মানে?

-সে সব ডিটেইলস্ তোর শুনে দরকার নেই...তখন আমরা আরপুলি লেনের একটা বাড়িতে দেড়খানা ঘরে গাদাগাদি করে থাকতুম, বাবা সদ্য মারা গেছে...ঐ রকমভাবে অনেক ফ্যামিলিই তো থাকে, একখানা দেড়খানা ঘরে সাত-আটজনসে সব পরিবারের মরালিটি একেবারে অন্য রকম...সবচেয়ে বেশি সাফার করে উঠতি বয়েসের মেয়েরা- এক এক সময় আমার কী কষ্ট যে হতো, নিরিবিলিতে একটু পড়াশুনোর জায়গা পেতুম

নাঃবেড়াল যেমন তার বাচ্চা মুখে করে ঘোরে, সেই রকম আমি বই বুকে নিয়ে একবার ছাদে, একবার সিঁড়িতে...

দরজায় শব্দ হতেই অলি উঠে গিয়ে দরজা খুলে জগদীশের কাছ থেকে চায়ের পেয়ালা নিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এক কাপ? আমার জন্য আনিস নি?

জগদীশ বললো, ধরো না। তোমার জন্য দুধ আনছি একটু পরে।

অলি লজ্জা পেয়ে ধমক দিয়ে বললো, দুধ আনতে হবে না, তুই আমাকেও চা দে।

বর্ষা বললো, তুই দুধ খা না, অলি। তোর অভ্যেস।

–না, আমি মোটেই রোজ বিকেলে দুধ খাই না। এই জগদীশটার মাথায় কিছু নেই...এই, যা, চা আন। আমাদের জন্য বিস্কুট আর সন্দেশও আনবি.

ফিরে এসে অলি বললো, বর্ষা, তোর ছেলেবেলার কথা বল্।

বর্ষা হেসে বললো, সে শোনবার মতন কিছু নয়। একঘেয়ে ব্যাপার। প্রেসিডেন্সিতে ঢোকবার আগে, জানিস, আমি ভাবতুম, আমাদের জীবনটা তো এই রকমই, এইটাই যেন স্বাভাবিক। তারপর তোদের মতন কয়েকজনের সঙ্গে মিশে, তোদর বাড়িতে এসে বুঝতে পারলুম, আমাদের জীবনের এত তফাত যেন আলাদা আলাদা গ্রহ...তোরা কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস উপভোগ করতে পারিস, গানবাজনা, ছবি,তারপর ধর প্রেম-ভালোবাসা...ফুল ফোঁটার মতন প্রেমও তো আস্তে আস্তে...প্রথমে কলি, তারপর একটু একটু করে পাপড়ি মেলা, তারপর সৌরভ, এর পর তো প্রজাপতি বা মৌমাছি আসবে...আমার এক জ্যাঠতুতো বোন ছিল, জানিস, ছিল মানে এখনও আছে, বিয়ে হয়ে গেছে...এক সময় আমাদের বাড়ির দুখানা বাড়ি পরেই থাকত, তার যখন পনেরো বছর বয়েস, তখনই সে ওদের বাড়িওলার ছেলের সঙ্গে কয়েকবার শুয়েছে...শুনে আমার যা গা ঘিন ঘিন করছিল:-তুই ভেবে দ্যাখ, ভালোবাসা কাকে বলে তা জানলেই না, তার

আগেই শরীর চিনে গেল, তাও একটা লম্পটের সঙ্গে, সে লোকটা আমার ঐ বোনকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেনি। তা নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট হয়েছিল...কী কদর্য, অশ্লীল ব্যাপার-এই সব দেখে দেখে পুরুষ জাতটার ওপরেই আমার রাগ জন্মে গেছে।

অলি মৃদু স্বরে বললো, কিন্তু মনীশ? তুই ওকে আগের মতন আর বকাঝকা করিস না দেখেছি।

-হ্যাঁ, মনীশটা একেবারে নাছোড়বান্দা। ও আমার মধ্যে কী যে পেয়েছে! আমার না আছে রূপ, না আছে কোনো গুণ, সব সময় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলি...তবু ও আমার কাছে...তোর কথা না হয় বাদই দিলুম, অলি, তোর কাছে ঘেঁষতে অনেক ছেলেই ভয় পাবে, কিন্তু দেবযানী, শ্বেতী, কুমকুম এই সব সুন্দরীরা থাকতেও

-খুব হচ্ছে, না বর্ষা? তোর এরকম টল, সুন্দর ফিগার, তুই পড়াশুনোয় এত ব্রাইট

-ব্রাইট না ছাই! স্কলারশিপ না পেলে এম-এ পড়তে পারবো না, তাই দাঁতে দাঁত চেপে সব মুখস্থ করে যাচ্ছি...আমি মনীশকে বলেছি, দ্যাখো বাপু, যতই আমার পেছনে ঘোরো, অন্তত দশ বছরের আগে আমার সঙ্গে ঘরটর বাঁধার কথা স্বপ্নেও মনে স্থান দিও না! এই পরীক্ষার পরেই আমি চেষ্টা করবো, আমার দাদার সংসার থেকে আলাদা হয়ে যেতে। বৌদি আমার মায়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না। বৌদি থাক তার নিজের সংসার নিয়ে। আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই কি নিজের বিধবা মায়ের দায়িত্ব নিতে পারবো না? ছেলেদেরই যে সব সময় শুধু বুড়ো বাপ-মায়ের দায়িত্ব নিতে হবে তার কী মানে আছে? আমি একটা মিশনারি স্কুলে চাকরি পেতে পারি, মোটামুটি একজনের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, সকালবেলা সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্লাস, ভালো মাইনে দেবে, আলাদা বাড়ি ভাড়া করে মা আর ছোট বোনটাকে নিয়ে যাবো, ছোট বোনটাকে লেখাপড়া শেখাবো, তারপর সে যা খুশি করবে, আমি অন্তত পি এইচ ডি না করে অন্য কিছু ভাববো না।

-তুই অনেক দূর পর্যন্ত প্ল্যান করে ফেলেছিস দেখছি।

-তুই বুঝি ভবিষ্যতের কথা কিছু ভাবিসনি?

-না।

-তোর বাবা-মাই ভাবছেন। হ্যাঁরে, অলি, ঐ বাবলুদা তোকে চুমু খেয়েছে?

অলি কোনো উত্তর দিল না, বর্ষার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বর্ষা আবার জিজ্ঞেস করলো, তুই ওর সঙ্গে শুয়েছিস একদিনও?

এবারে অলি কাতরভাবে বর্ষার হাত ধরে বললো, বর্ষা, প্লীজ, ওভাবে কথা বলিস না!

শোওয়া-টোওয়ার কথা এমন অনায়াসে বলে বর্ষা যেন জল-ভাতের মতন ব্যাপার। কিন্তু শোনা মাত্র অলির বুকে দুম দুম করে শব্দ হয়।

বর্ষা বললো, কেন জিজ্ঞেস করছি জানিস? শোন, তোকে একটা ঘটনা বলা হয়নি। গত মাসে মনীশ আমাকে একদিন ব্যারাকপুরে বেড়াতে নিয়ে গেল। আমি তো আগে কখনো যাইনি, সেদিন ভাবলুম, ঠিক আছে, দেখাই যাক না। সবাই ভাবে আমার কোনো রসকষ নেই, আমার মধ্যে নাকি একটুও রোমান্টিসিজম নেই, তাই ভাবলুম দেখা যাক, গঙ্গার ধারে কোনো ছেলের মুখে প্রেমের কথা শুনতে কেমন লাগে। ব্যারাকপুরে একটা গান্ধী ঘাট হয়েছে জানিস তো, বেশ সুন্দর জায়গা, মনীশ আমাকে সেটা দেখাবার নাম করে নিয়ে গেল...আসলে অন্য মতলোব, জানিস তো! ব্যারাকপুরে ওর দাদার বাড়ি, দাদারা সবাই ওয়ালটেয়ার বেড়াতে গেছে, সেই বাড়ির চাবি মনীশের কাছে...সেই বাড়িতে ঢুকেই মনীশ আমাকে তিনটে চুমু খেল!

অদ্ভুত ধরনের একটা হাসি দিয়ে অলির মুখের দিকে তাকিয়ে বর্ষা জিজ্ঞেস করলো, তুই বিশ্বাস করছিস না আমার কথা?

--কেন বিশ্বাস করবো না! ঠিক তিনটেই?

--শোন না! মনীশটা পাগলের মতন করছিল, তাই আমি প্রথমে দুটো চুমু অ্যালাউ করলুম।

-অ্যালাউ করলি? উইদাউট এনি পারটিসিপেশান?

-হ্যাঁ। তাও করেছি, মনীশ বললো, ওর পিঠে হাত রেখে জড়িয়ে ধরতে। সত্যি কথা বলছি, খুব একটা খারাপ লাগেনি। দারুণ ভালো যে কিছু, একেবারে আহা মরি ব্যাপার, তাও না! ঠিক আছে, মাঝে মাঝে কখনো-সখনও চলতে পারে।

অলি হাসতে লাগলো।

-তুই হাসছিস? বাকিটা শোন! সন্ধে হয়ে গেছে তখন, তিনতলার বারান্দা থেকে জ্যোৎস্নার গঙ্গা দেখাবে বলে মনীশ আমাকে নিয়ে এলো বেডরুমে। আমাকে সিডিউস করে যাচ্ছে, আমার সঙ্গে শুতে চায় আর কি! ঐ বাড়ির চাবি খোলার পর থেকেই আমি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিলুম...আমার সেক্স নিয়ে কোনো ইনহিবিশান নেই, আমার বাড়িতে এমন কোনো গার্জেনও নেই যে বেশি রাত করে ফিরলে বকুনি দেবে, আমার যা ইচ্ছে হবে, আমি তা করতে পারি। কিন্তু আমার ইচ্ছে করলো না! তোকে আমি সিনসিয়ারলি বলছি, আমার মনের ভেতর থেকে কোনো সাড়া পেলুম না, একটা ফাঁকা বাড়ি পাওয়া গেছে বলেই...হোল আইডিয়াটা আমার কাছে রিপেলিং মনে হলো, আমি মনীশকে বললুম, নাথিং ডুয়িং, ফরগেট ইঁট

-মনীশ জোর করতে চায় নি?

-আমার ইচ্ছে না থাকলেও কেউ আমার ওপর জোর করবে? আমি তো এখন আর সেই বারো-তের বছরের কচি খুকিটি নেই! মনীশকে বললুম, ওসব হবে না। তখন মনীশ কাকুতি-মিনতি করে আর একবার চুমু খেতে চাইলো, সেটাই হলো থার্ড চুমু! তারপর অনেকক্ষণ এমনি এমনি বসে গল্প করলুম রে!

জগদীশ দ্বিতীয় কাপ চা ও সন্দেশ দিয়ে গেছে। সেগুলো খেতে খেতে অলির মনে পড়লো বাবলুদার সঙ্গে তার মেমারি থেকে কৃষ্ণনগর যাওয়ার দিনটার কথা। কিন্তু বর্ষাকে সে কথা তার বলতে ইচ্ছে করলো না। মনীশের সঙ্গে বাবলুদার কোনো তুলনাই চলে না।

একটুক্ষণ আপন মনে খুঁটে খুঁটে সন্দেশ খেতে খেতে বর্ষা হঠাৎ একটা অন্য রকম মুখ। তুললল। সঙ্কটের ছায়া মাখানো, একটু যেন বিষণ্ন। নিজে উঠে গিয়ে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে এসে সে আর একটি সিগারেট ধরালো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, এবার তোকে আমি একটা কথা বলবো, অলি, যা শুনলে তুই হয়তো রেগে যাবি। কিন্তু কথাটা আমার বলাই উচিত, চেপে রাখার কোনো মানে হয় না। এ কথা শোনার পর তুই যদি তোর বাড়িতে আমাকে আসতে বারণ করে দিস, তাহলে আর আমি আসবো না, তবু আমাকে বলতেই হবে।

অলির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। কী এমন কথা বলতে চায় বর্ষা? সে কোনো কঠিন কথা শুনতে চায় না। সে কি অজান্তে কখনো বর্ষার সঙ্গে কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করেছে? এ বাড়ির অন্য কেউ?

বর্ষা বললো, সেদিন মনীশ অত করে চাইলেও কেন আমার ইচ্ছে করলো না? কেন কোনো ছেলের সঙ্গে একা একা ঘুরে বেড়াতে কিংবা গল্প করতে আমার তেমন আগ্রহ হয় না? আমি নিজের মনটা অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করি। আমার আগে কয়েকটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হলেও...তারা তো কেউ বন্ধু ছিল না। কিন্তু এখনও যে-সব ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, তাদের কারুর সঙ্গেই...তোকে একটা পরিষ্কার সত্যি কথা বলি, গত দু মাস ধরে এই প্রশ্নটা আমার মাথার মধ্যে খুব ঘুরছে, আমি কি লেসবিয়ান?

অলি সঙ্গে সঙ্গে বললো, যাঃ!

–এ রকম তো হতেও পারে। অনেকের ক্ষেত্রে এটা একটা বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টের মতন, বিদেশে অনেকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে, হোমো-সেক্সুয়ালরা যদি সংখ্যায় এত বেশি

হতে পারে...দু'তিন বছর আগে কলকাতায় অ্যালেন গীংসবার্গ বলে একজন বীটনিক কবি এসেছিল, সঙ্গে তার বউ, সে একজন পুরুষ!

–এ সব কথা আমার শুনতে ইচ্ছে করছে না রে, বর্ষা!

–আমার কথাটা তোকে শুনতেই হবে। অলি, আমি যখন বাড়িতে একা একা থাকি, তখন মনীশ বা অন্য ছেলেদের কথা আমার বিশেষ মনে পড়ে না, আমার প্রায় সর্বক্ষণ মনে পড়ে তোর কথা। তোর সঙ্গে দু'তিন দিন দেখা না হলে আমার মন ছটফট করে। কোনো দিন যদি তোর সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করি, পরে সে জন্য আমার এত মন খারাপ লাগে, কিংবা, তুই যদি আমার সঙ্গে ভালো করে কথা না বলিস, তুই যদি অতীন মজুমদারের সঙ্গে চলে যাস...ওর সঙ্গে আমার ভাব হলো না কেন জানিস, ওকে আমি আসলে ঈষা করি। তোকে আমি এত ভালোবাসি, ও তার ওপর ভাগ বসাচ্ছে...অতীনও নিশ্চয়ই সেটা বোঝে, তাই আমাকে পছন্দ করে না।

অলির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে, সে কোনো কথা বলতে পারছে না। সে তাকাতেও পারছে না বর্ষার দিকে।

–আমি তোকে ভালোবাসি, অলি! যে-কোনো সুন্দর কিছুর কথা মনে পড়লেই তোর মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেদিন ব্রাউনিং-এর কবিতাগুলো পড়তে পড়তে আমি ভাবছিলুম, এই সব কথাই যেন আমি তোকে বলতে চাই...অলি, আমি কি সত্যি লেসবিয়ান? আমি কি তোদের ছেড়ে চলে যাবো? আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তবু তবু...আজ যখন প্রসঙ্গটা উঠলোই, তুই আমাকে একটা এক্সপেরিমেন্ট করার চান্স দিবি?

অলি তবু চুপ করে আছে দেখে বর্ষা তার থুতনিতে আঙুল ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুই আমার কথা শুনছিস না?

অলি মুখ না তুলেই বললো, শুনছি।

–আমি এর মধ্যে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে লেসবিয়ানিজম নিয়ে পড়াশুনো করেছি। আমি মিলিয়ে দেখে সিওর হতে চাই, অলি, একবার যদি এক্সপেরিমেন্ট করি, অলি, একবার...

–কী?

–একটু উঠে দাঁড়া।

বর্ষা নিজেই অলিকে দাঁড় করলো, ফেলে দিল তার বুকের আঁচল। তারপর দরজায় পিঠ দিয়ে সে আলিঙ্গন করলো অলিকে। অলির অনিচ্ছুক হাত দুটি জড়িয়ে নিল নিজের গলায়, অলির গালে সে গাল ঠেকিয়ে রাখলো।

অলি বাধা দিল না। একটা কথাও বললো না। মাত্র দু'এক সপ্তাহ আগেই সে একটা পেপার ব্যাক উপন্যাসে লেসবিয়ানদের কথা পড়েছে। অবাস্তব কিছু নয়। তবু তার যেন সাঙ্ঘাতিক ভয় করছে। যেন কোথাও যেতে যেতে চেনা রাস্তা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে, একটা খাদের কিনারে দাঁড় করানো হয়েছে তাকে।

বর্ষা তাকে জড়িয়ে ধরে আছে–কতক্ষণ-যেন মিনিটের পর মিনিট...অনেকক্ষণ কেটে যাচ্ছে।

বর্ষা তার একটা হাত বুলোচ্ছে অলির পিঠে। তার উরু দুটি অলির উরুর সঙ্গে জোড়া। বর্ষা তার হাতটি সামনের দিকে এনে একবার অলির বুকে রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে সে অলিকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে পড়লো বিছানায়। উপুড় হয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

অলি আরও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তা হলে কী হলো শেষ পর্যন্ত, খাদের কিনারে এসে কি বর্ষা পড়ে গেল নিচে? বর্ষার মতন মেয়ে যে কাঁদতে পারে, তা যেন কল্পনাই করা যায় না। অলি এখন কী করবে।

একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অলি বিছানার কাছে এসে বললো, এই বর্ষা, কী হলো? এই–

বর্ষা মুখ তুললো। সত্যি চোখের জলে তার মুখখানা মাখামাখি, কিন্তু সে হাসছে। অলিকে

আবার জড়িয়ে ধরে সে বললো, আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে রে! তুই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিস, অলি, অন্য যে-কোনো মেয়ে আমাকে ভুল বুঝতো।

অলিকে ছেড়ে সে আঁচল দিয়ে মুখ চোখ মুছলো। তারপর শান্ত গলায় বললো, তোর ঐ পাগলা অতীনটাকে বলিস, আমার ওপর রাগ করার কোনো দরকার নেই। আমি ওর ভালোবাসায় ভাগ বসাবো না। আমি লেসবিয়ান নই!

–কেউ কি তোকে লেসবিয়ান বলেছে? তুই নিজেই তো–

–জানিস, কোনো গোপন কঠিন অসুখ হলে যেমন কারুকে বলা যায় না, সেই রকমই প্রায় গত একটা মাস...আমি অবসেড হয়ে গিয়েছিলুম, আমি সত্যি ভেবেছিলুম...আমি লেসবিয়ান, আমাকে সবাই অসট্রাসাইজ করে দেবে...কিন্তু আমি যাকে ভালোবাসি, আজ তাকেই সত্যি সত্যি ফিজিক্যালি জড়িয়ে ধরে দেখলুম, অন্তত পাঁচ মিনিট তো হবেই, আমার কোনো সেক্স-ইমপাস এলো না, আমার একবারও ইচ্ছে করলো না তোকে চুমু খেতে...কিংবা...তার মানে মেয়েদের শরীরের প্রতি আমার আকর্ষণ নেই...তোর প্রতি আমার যে ভালোবাসা, সেটা পিওরলি ইমোশানাল, তার মধ্যে কোনো সেক্স নেই.

বর্ষার চোখ আবার সিক্ত হয়ে গেল, ধরা গলায় সে বললো, আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, অলি, যেন আমার নতুন জন্ম হলো।

অলি এবারে দুষ্টুমী করে বললো, কিন্তু তুই যখন আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলি, আমার তে তখন বেশ ভালো লাগছিল। তা হলে কি আমি লেসবিয়ান?

বর্ষা বললো, ভ্যাট, একটা চাঁটি খাবি। অতীনটা একটা লাকি ডগ, তোর মতন মেয়েকে ভালোবেসে ধন্য হয়ে যাবে।

-তুই অনেক কিছুই ধরে নিচ্ছিস, বর্ষা। বাবলুদা যে আমাকে ভালোবাসে তাই বা তোকে কে বললো? মেলামেশা করলেই ভালোবাসা হয়? বাবলুদা তো আমাকে নিজের মুখে কোনোদিন ওসব কিছুই বলেনি!

-ওর টাইপটাই আলাদা। ওরা মুখে গদোগদো প্রেমের ডায়লগ দেবে না কক্ষনো! ঐ অতীনটা এক একদিন কফি হাউসে এসে যতই পাগলামি করুক, ওর কিন্তু একটা সিরিয়াস দিক আছে, সে জন্য আমি ওকে একটু একটু শ্রদ্ধাও করি। ও দেশের কথা ভাবে, এই দেশের সিসটেমটা বদলাতে চায়। হ্যাঁরে, অতীন মজুমদার কম্যুনিস্ট, তাই না?

অলি দুদিকে মাথা নাড়লো।

-ওদের সায়েন্স কলেজের পুরো ব্যাচটাই ক্যুনিস্ট। আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছেলেগুলো সব কেমন যেন ম্যাদামারা। মনীশকে আমার তেমন পছন্দ হয় না কেন আজ বুঝতে পারলুম। কারণ, ও মেয়েলি।

বই-খাতা টেনে নিয়ে বর্ষা এবার গম্ভীরভাবে বললো, নাও, গার্লস, ব্যাক টু ওয়ার্ক। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এখন তাহলে সেকেণ্ড পেপারটা ঝালানো হোক।

বর্ষা বাড়ি ফিরে গেল ন'টার সময়। তার পরেও অলি পড়তেই লাগলো। জগদীশ তাকে খাবার জন্য ডাকতে এলেও সে গেল না। বর্ষা চলে যাবার পর তার বিকেলের ঘটনাটা মনে পড়ে গেছে। উদ্ভট সাজপোশাক করা দু'জন নারী-পুরুষের সামনে বাবা-মা তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান করেছে। এখন বাবা-মা'র সামনে গেলেই অলির ঝগড়া হবে।

বিমানবিহারী নিজেই একটু পরে এলেন অলির ঘরে।

দুবার তাঁর ডাক শুনেও অলি মুখ ফেরালো না। বিমানবিহারী কাছে এসে মেয়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, যুগ পাল্টেছে, আজকাল পুরুষ মানুষদের কী দুর্দশা! সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। সারা জীবন বউয়ের ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলুম, এখন মেয়ের ভয়ে কাঁপছি। ওরে একবারও তাকাচ্ছিস না, আমাকে কি ভস্ম করে দিবি নাকি?

অলি মুখ ফেরাতেই তিনি আঙুল তুলে বললেন, রাগের কথা, বকুনির কথার আগে আমার কথা শুনতে হবে। দুটো মাত্র কথা। এক নম্বর হলো, জাস্টিস মিত্র আর ওঁর স্ত্রীকে আমরা নেমন্তন্ন করে ডেকে আনি নি, ওঁরা নিজের থেকেই এসেছেন, সোস্যাল ভিজিট। ওঁরা তোর সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন, সে ক্ষেত্রে না বলাটা অভদ্রতা নয়? ওঁদের দু'জনের আলটিরিয়ার মোটিভ যাই-ই থাকুক না কেন, আমরা নিদোষ।

আর দু নম্বর কথা হলো, এটা আমি শুধু নিজের দায়িত্বে বলছি, তোর মা আমার সঙ্গে এক মত নাও হতে পারেন, সেটা হচ্ছে, আমি মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নই। আমার ছেলে নেই, শুধু শুধু মেয়েদের হুড়োতাড়া করে বিয়ে দিয়ে বাড়ি খালি করতে চাইবো কেন? যত দেরি হয় ততই তো ভালো। আমার দুটি কন্যারই যখন ইচ্ছে হবে বিয়ে করবে। আর তোরা যদি বিয়ে করতে একেবারেই না চাস, তাতেও আমার আপত্তি নেই...

বাবা-মেয়ে পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো অপলক। অলির চোখ নরম হয়ে এসেছে, বাবাকে যে সে কতখানি ভালোবাসে, এই রকম এক এক সময় যেন নতুন করে টের পায়।

বিমানবিহারী হেসে বললেন, খাবার টেবিলে সব ঠাণ্ডা হচ্ছে, আমি এখনও খাইনি, আজ রাত্তিরে কি মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়ার সৌভাগ্য আমার হতে পারে? বেশ চনমনে খিদে পেয়েছে...

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অলি ভাবলো, একমাত্র বিয়ে করা ছাড়া, বাবার কথা শুনে পৃথিবীর আর যে-কোনো কাজ করতে পারে সে।

৪৭ অ্যালুমিনিয়ামের বাটি

একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ভর্তি মাছের ঝোল নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো মঞ্জু। একতলার রান্নাঘরে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হচ্ছে, তা শুনে বুঝলো যে মনিরাদের এখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি। কে এসে একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো, এই নে, এটা রাখ।

নিচের এই ঘরটি এক সময় নোকরের ঘর ছিল, একটি মাত্র উত্তরের জানলা, প্রচণ্ড গরম। মনিরার সারা মুখ ঘামে ভরা। একটা কস্তা ডুরে তাঁতের শাড়ি পরে আছে সে, শাড়িটা বেশ ময়লা।

দুঃখিত মুখ তুলে সে বললো, আবার কী আনছেন, আপা? কেন যে আপনে...

–নে, ধর আগে। দেখিস, গরম...

–এতগুলি মাছকে খাবে?

মঞ্জু দেখলো, কড়াইতে কী একটা শাক চড়িয়েছে মনিরা। মঞ্জু শাকপাতা বিশেষ চেনে না, তাদের বাড়িতে কেউ ওসব খায়ও না। মনিরা একদিন গল্প করেছিল, পাশের পাড়ার বড় উকিল সইফুদ্দিন চৌধুরীদের বাড়ির পেছনের পুকুর ধারে কলমী শাক ফলে থাকতে দেখে সে কোঁচর ভর্তি তুলে এনেছে। বিনা পয়সায় হয়ে গেল। মঞ্জুর ধারণা, বিনা পয়সায় যা পাওয়া যায়, তা আগাছা, তা মানুষের খাদ্য নয়। পুকুর ধারে তো গরু-ছাগলে এসব খায়। মনিরার কর্মী শাকের গল্প শুনে মঞ্জুর কষ্ট হয়েছিল।

আর একদিন মঞ্জু দেখেছিল, মনিরা লাউয়ের খোসা আর আলুর খোসা ভাজছে। ঐ ফেলে দেবার জিনিসগুলো কোনদিন কারুকে ভেজে খেতে দেখেনি মঞ্জু।

আজ মনিরা বেঁধেছে, ভাত, ডাল, আর একটা লাউয়ের ঘন্ট, কড়াইতে চাপানো শাকটাই তার শেষ পদ। মঞ্জু চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। সিরাজুলের মতন একটা জোয়ান ছেলে এই খেয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

সিরাজুলকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছে বাবুল। দিন-কাল পত্রিকা অফিসে সে একটা প্রুফরিডারের চাকরিও পেয়েছে। দিনেরবেলা কলেজ, রাত্তিরে কাজ। প্রুফরিডারের চাকরির মাইনে সামান্য হলেও সিরাজুলের আত্মসম্মান বোধ আছে, বাবুলদের কাছে সে পুরোপুরি আশ্রিত হয়ে থাকতে চায় না, মঞ্জু প্রথম থেকে অনুরোধ করলেও সে অন্নদাস হতে রাজি হয়নি। ওরা দু'জনে আলাদা রান্না করে খায়।

ওই অল্প বয়স্ক দম্পতিকে মঞ্জু খুব কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করে। সকালে ওরা নাস্তার সময়েও ভাত খায়, পান্তা ভাত। একটু পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ আর শুধু ভাত। তারপর দুপুরে ভাত খায়, রাত্তিরেও ভাত খায়। সঙ্গে সামান্য কিছু ভাজি আর সবজি। মাছ-মাংসের নামগন্ধ নেই, বড়জোর দু-একদিন আন্ডার ঝোল। একদিন দুপুরে মনিরা শুঁটকি মাছ রান্না করেছিল, ঠিক সেইদিনই সে সময়ে এ বাড়িতে আলতাফ এসে উপস্থিত। গন্ধ পেয়ে সে বাড়ি মাথায় করে তুললো।

মঞ্জর শ্বশুর বাড়িতে শুঁটকি মাছ খাওয়ার চল নেই। আলতাফ বাবুলদের স্বভাবে বেশ শহুরে শহুরে ভাব, আলতাফ তো এখন পুরোদস্তুর সাহেব। এ বাড়িতে সিরাজুল-মনিরাকে থাকতে দিতে আলতাফ আপত্তি করেনি, তা বলে বাড়িটাকে ভাড়াটে বাড়ি বানিয়ে তোলা চলবে না। শুঁটকি মাছ ফাচ রান্না করা চলবে না, সদর দরজা দিয়ে দেখা যায় এমন জায়গায় শায়া লুঙ্গি মেলা চলবে না, স্বামী-স্ত্রীর কথা কাটাকাটির সময় দরজা-জানলা বন্ধ রাখতে হবে, পাড়া-প্রতিবেশীদের শোনানো চলবে না।

এরপর মঞ্জু কতবার মনিরাকে অনুরোধ করেছে শুঁটকি মাছ রান্না করার জন্য, সে নিজে খেতে চেয়েছে, তবু মনিরার জেদ, সে আর একদিনও শুঁটকি রাঁধেনি। মনিরাদের জামা কাপড় সে ছাদে শুকোতে দিতে বলেছে, কিন্তু মনিরা ছাদে যায় না, বোধ হয় জামা-

কাপড় কাঁচেই না। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনো কথা কাটাকাটি হয় কি না, তাও টের পায় না মঞ্জু।

আলতাফ অবশ্য নির্দয় নয়। সিরাজুলকে সে নিজে ডেকে তাদের পত্রিকায় চাকরি করে দিয়েছে, মনিরাকেও সে হোটেলে একটা কাজ দিতে চেয়েছিল। মনিরার কম বয়েস সে চটপট কাজ শিখে নিতে পারবে, প্রথম কিছুদিন সে হোটেলের ঘরে ঘরে বিছানার চাঁদর, বালিশের ওয়াড়, বাথরুমের তোয়ালে বদল করার কাজ করবে, তারপর সে স্টোরকীপারের পদে প্রমোশন পেতে পারে। তখন অনেক মাইনে হবে। কিন্তু সিরাজুল তার স্ত্রীকে চাকরি করতে পাঠাতে রাজি হয়নি।

তা হলেও, এ বাড়িতে এলেই আলতাফ একবার করে ওদের খোঁজ খবর নেয়। গত মাসেও আলতাফ সিরাজুলকে একটা প্রস্তাব দিয়েছে। নিউ এস্কাটনে আলতাফ নিজস্ব একটা ফ্ল্যাট বাড়ি বানাচ্ছে, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সিরাজুল ইচ্ছে করলে সেই বাড়ির কেয়ারটেকার হয়ে থাকতে পারে, সেখানে তারা দুখানা ঘর পাবে এবং কোনো ভাড়া লাগবে না।

সিরাজুল তাতেও রাজি হয়নি, সে বলেছে যে বাবুলভাইয়ের কাছ থেকে সে পড়াশুনা দেখে-বুঝে নেয় প্রায়ই, সেইজন্য সে বাবুলভাইয়ের থেকে দূরে থাকতে চায় না।

বাবুল অবশ্য মঞ্জুকে বলেছে যে কলেজী শিক্ষা পাওয়ার জন্য সিরাজুল নোয়াখালি থেকে ঢাকা চলে এলেও তার লেখাপড়া শেখার আশা খুবই কম। তার স্কুলের শিক্ষার ভিতই খুব কাঁচা, তার ওপর দু-তিন বছর গ্যাপ গেছে। ছেলেটার ইচ্ছে আছে খুবই, গোঁয়ারের মতন মুখস্ত করতে পারে কিন্তু বেশিক্ষণ পড়ার সময়ও তো তার নেই। গরিবের ছেলে যদি ছাত্রজীবনেই সংসারী হয় তাহলে তার লেখাপড়া শেখার শখ অনেকটা কাটা মুণ্ডের দিবাস্বপ্নের মতন।

প্রথম কিছুদিন বাবুল নিজেই খুব গরজ করে সিরাজুলকে নিয়ে পড়াতে বসিয়েছে, এখন সে সিরাজলুকে এড়িয়ে চলে। তার ধারণা, ওকে সারাজীবন ঐ প্রুফ রিডার হয়েই কাটাতে হবে, একটা ডিগ্রি জোগাড় করতে না পারলে সে সাব-এডিটরও হবে না!

একমাত্র মঞ্জুই হাল ছাড়েনি। সিরাজুলের উদ্দীপনাময় মুখ ও মনিরার সরল, জেদী জেদী ভাব দেখলে তার মায়া হয়। মনিরার বয়েস সবে মাত্র সতেরো আর সিরাজুলের একুশ, তারা নিতান্তই গ্রাম্য তরুণ-তরুণী, কিন্তু মোটেই তারা অতি সাধারণ নয়। তাদের চরিত্রে কোথাও একটা বিশেষ জোর আছে, সবরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই তারা হাসি মুখে থাকতে পারে।

একটা কাঁঠাল কাঠের পিড়ি টেনে নিয়ে বসে পড়ে মঞ্জু বললো, আরে ছেমরি, মুখখানা যে তোর কালিবর্ণ হয়ে গেল, এত মন দিয়া কী ছাই ঘাসপাতা রানতেছোস?

মনিরা বললো, এগুলা চেঁকি শাঁক, আপনেরা খান না, আপা?

মঞ্জু হেসে বললো, আমাগো পাকের ঘরে এইসব হাবিজাবি ঢোকে না, বাবুরা মাছ আর গোস্ত ছাড়া কোনো ভেজিটেবলই পছন্দ করেন না। কোন এক রাইটারের গল্পে যেন ভেঁকির শাকের কথা পড়ছিলাম, খাওয়া তো দূরে থাক, দেখি নাই কখনো। দে তো, একটু চাইখ্যা দেখি!

-আপনে খাবেন আপা? কী যে কন! আপনেগো খাওনের মতন না, আমি ভালো রানতেও জানি না!

-তুই দে তো ছেমরি!

মনিরা খুব শঙ্কুচিত বোধ করে। মঞ্জু মাঝে মাঝেই এসে তার হাতের রান্না কিছু না কিছু খেতে চায়। এইসব কি দেওয়া যায় ওকে? তাছাড়া কোন পাত্রে দেবে, তাদের ঘরে অতি শস্তার কলাইকরা কয়েকটা থালা গেলাস ছাড়া আর কিছু নেই।

বাবুল চৌধুরীর জীবিকা অধ্যাপনা হলেও সে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনের টাকায় তাকে সংসার চালাতে হয় না। তাদের টাঙ্গাইলের বাড়ি থেকে সারা বছরের খোরাকি চাল আসে। চিড়ে-খই-গুড় আসে। ঘি আসে, কখনও কখনও মাছও আসে। তাছাড়া ঢাকা শহরেই বাবুলদের পরিবারের আর দুটি বাড়ি আছে অফিস পাড়ায়, তার ভাড়ার একটা অংশ পায় বাবুল। মঞ্জুও এসেছে সচ্ছল পরিবার থেকে। ওদের চেহারার জৌলুসই অন্যরকম। গ্রামে থাকার সময় মনিরার কাছে এইরকম চেহারার মানুষরা ছিল, অতি দূরের মানুষ, আর এখন এক অপরূপ সুন্দরী বড়লোকের বউ কি না তার রান্নাঘরে পিড়িতে বসে তার হাতের রান্না খেতে চাইছে!

কড়াইটা উনুন থেকে নামিয়ে মনিরা জিজ্ঞেস করলো, শুধা শুধা খাবেন, না দুগগা ভাত দিয়া খাবেন?

–দে, একটু ভাত দে!

একটি কলাইকড়া থালায় খানিকটা ভাত, চেঁকির শাক আর লাউয়ের ঘন্ট বেড়ে দিল মনিরা। এদের দুটিই মাত্র থালা। এখন যদি সিরাজুল এসে পড়ে তাহলে মনিরার নিজের খাওয়ার জন্য এই থালা মেজে নিতে হবে। ওপরতলায় মঞ্জুর সংসারে থালাবাসন অজস্র, আগেকার বড় বড় কাঁসার থালা, এখনকার স্টেইনলেস স্টীল ও চিনেমাটির প্লেট, তার থেকে কয়েকখানা এদের অনায়াসে দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মঞ্জু বুঝে গেছে, এদের অযাচিতভাবে সাহায্য করতে গেলেও এরা নেবে না। সিরাজুল মনিরার এই তেজটাও মঞ্জুর পছন্দ হয়।

মঞ্জু বললো, লাউয়ের রান্নাটা তো বেশ ভালো হয়েছে রে! জিরা ফোঁড়ন দিয়েছিস বুঝি?

–না, আপা, কিছুই দিই নাই। চেঁকির শাকটা বুঝি ভালো লাগলো না?

–কেমন যেন কাঠি কাঠি!

মনিরা চোখ গোলগোল করে বললো, খাইছে! তাইলে বোধ হয় এগুলা পাগলা চেঁকি! আমি চেনতে পারি নাই!

–পাগলা চেঁকি! সে আবার কী?

–দুই রকম চেঁকির শাক আছে। পাগলা চেঁকির কোনো শোয়াদ নাই।

–এগুলাও তুই দীঘির ধার থিকা উঠাইয়া আনছোস বুঝি?

মনিরা লাজুক ভাবে হাসলো। দিনেরবেলা সে বিশেষ বাড়ি থেকে বেরোয় না। ভোরবেলা, সিরাজুলের ঘুম ভাঙার আগে, সে এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে আসে, কোনো মাঠ থেকে নিয়ে আসা নিমপাতা, কোনো রাস্তার ধার থেকে ডুমুর, কোনো বাগান থেকে কাঁচা তেঁতুল।

মঞ্জু বললো, তুই অতটুক একটা ছেমরি, তুই অ্যাতসব জানলি ক্যামনে রে? আমি তো পাগলা চেঁকির নামই শুনি নাই।

–আমরা তো গ্রামের মাইয়া, আপা।

সিরাজুল তাকে বলে ভাবী, মনিরা বলে আপা। মঞ্জুর অনেক ভাই বোন, আপা ডাকটি শুনতেই সে বেশি অভ্যস্ত।

সদর দরজা দিয়ে কে যেন ঢুকলো, মনিরা' উৎসুক ভাবে দেখতে গেল বাইরে বেরিয়ে। সে ফিরে এলো একটু বাদে, তার মুখের শুকনো ভাবটা দেখেই মঞ্জু বুঝলো, সিরাজুল আসেনি।

–কে আসলো রে?

–বাবুল সাহেব। আমি পানি দিতেছি, হাত ধুয়ে ন্যান।

মঞ্জু ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চিন্তা করলো। বাবুল চৌধুরী সাড়ে দশটা-এগারোটায় ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায়, দুপুর-বিকেলে কোনোদিনই বাড়ি আসে না, কোনো কোনোদিন রাত ন'টা দশটার আগে ফেরেই না, মাঝখানে খিদে পেলে কোনো দোকানে কিছু খেয়ে নেয়। সিরাজুল নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে সকাল ন'টার মধ্যে, দশটা থেকে তার ক্লাস; যেহেতু বাইরে খাওয়ার পয়সা থাকে না তার, তাই প্রত্যেকদিন দুপুরে বাড়িতে খেতে আসে। আজ তার আসার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

মঞ্জু যে বাটি ভর্তি করে মাছ এনেছে, তার মধ্যে রয়েছে মস্ত বড় একটা কালা মাছের মুড়ো। আলতাফ হোটেল থেকে প্রায়ই মাছ পাঠায়, তাদের বিলেতি ধাঁচের হোটেলে মাছের মুড়োর খদ্দের নেই বলেই বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। অত বড় মুড়ো ফ্রিজে রাখার অসুবিধে বলেই মঞ্জু নিচে নিয়ে এসেছে, এরকম একটা ব্যাখ্যা একটু আগেই মনিরাকে শোনাতে হয়েছে।

এবারে সে মুড়োটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ঐইটা তোরা দুইজনে ভাগ করে খাবি। মনিরা বললো, আমি মুড়া খাই না। ও তো পুরুষ মাইনসে খায়। আপা, সাহেব আসছেন, আপনে উপরে যান এবার।

-দাঁড়া! আমি কি সাহেবের কেনা বাঁদী নাকি, তিনি যখন-তখন আইলেই আমারে গিয়া পদসেবা করতে হবে?

মনিরা আবার বিস্ফারিত চোখে তাকায়। সিরাজুল ও তার কাছে বাবুল একজন পীর-সদৃশ পুরুষ। বাবুল তাদের অনেক উপকার করেছে বলেই নয়, বাবুলের মধ্যে যে একটুও দেখানেপনার ভাব নেই, সেটাই তাদের মনে বেশি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আলতাফের মতন বাবুল কখনো উঁচু থেকে কথা বলে না। বাবুলের জন্য এরা দু'জন প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

ওপর থেকে বাবুলের ডাক শোনা গেল, সেফু, সেফু!

মনিরা বললো, ওই যে সাহেব ডাকছেন।

মঞ্জু দুষ্টুমী করে বললো, আমাকে তো না, সেফুকে ডাকছে। তুই কি আমাকেও চাকরানীর সমান ভাবিস নাকি?

এই সব বাড়ির কর্তারা যে স্ত্রীর নাম ধরে ডাকার বদলে ঝি-চাকরের নাম ধরেই চেঁচিয়ে ডাকেন, মনিরা তা জানে। মঞ্জুর ব্যবহার দেখে ক্রমশই সে অবাক হচ্ছে।

রান্নাঘরের এক কোণে মঞ্জু হাত ধুয়ে নিল। নিজের আঁচলেই মুছে নিল হাত। ওপরে তাদের পিংক টালি বসানো বাথরুমে বেসিন ও তোয়ালের রংও পিংক। তবু মঞ্জু যেন মনিরার এই দমবন্ধ করা রান্নাঘরেই সময় কাটাতে পছন্দ করছে।

এরপর একটা রিনরিনে শিশুকণ্ঠে আম্মা আম্মা ডাক শুনে মঞ্জু চঞ্চল হয়ে উঠলো। স্বামী নয়, ছেলের ডাকেই মঞ্জু ওপরে উঠে গেল দ্রুত।

সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে এসেছে সুখু, মঞ্জু তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললো, কী রে?

–আব্বু তোমায় ডাকছে!

মায়ের কোলে সে থাকতে চায় না এখন। সে সেফুর সঙ্গে লুডো খেলছিল। মঞ্জু ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে শয়নকক্ষে গেল।

জুতোও খোলেনি বাবুল, জানলার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে চোখের সামনে বই মেলে ধরেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রাগ হয়ে গেল মঞ্জুর। বাড়িতে ফিরেই যদি বই পড়তে হয়, তা হলে মঞ্জুকে ডাকা কেন? কিছুদিন ধরেই মঞ্জু লক্ষ করছে, বাবুলের মধ্যে একটা উদাসীন ভাব। বাবুল চৌধুরীর চরিত্রে রূঢ়তা বা অভদ্রতা একটুও নেই, তবু সে যেন অতি সূক্ষ্মভাবে মঞ্জুকে অবজ্ঞা করে চলেছে। কেন, তার কারণ কিছুই জানে না মঞ্জু।

মঞ্জু কয়েক মুহূর্ত আড় চোখে তাকালো তার স্বামীর দিকে। বাবুল কথা না বললে সেও কথা বলবে না। সে হঠাৎ দেয়াল আলমারি গুছোতে শুরু করলো। আলমারিটার একটা পাল্লা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে আসে, সেটা আবার খুলতে গেলে ধড়াম করে শব্দ হলো।

এবার চকিতে সে ফিরে তাকিয়ে দেখলো বাবুল বই নামিয়ে রেখেছে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে বাবুল বললো, কী? মঞ্জুও বললো, কী?

–বিলকিস বেগমের আজ মেজাজ ঠিক নাই মনে হচ্ছে?

–তুমি হঠাৎ দুপুরবেলা বাসায় ফিরলে যে?

–দেখতে এলাম, তুমি দুপুরটা কেমনভাবে কাটাও! প্রত্যেকদিন লম্বা লম্বা দুপুর। মঞ্জু জ্বলন্ত চোখে বললো, ও, চেক করতে এলে যে আমি দুপুরগুলা কোনো নাগরের সাথে বেড়রুমের দরজা বন্ধ করে কাটাই কি না?

বাবুলের ফর্সা মুখোনি সঙ্গে সঙ্গে কালিমাময় হয়ে গেল, চোখের নিচে নেমে এলো মেঘের ছায়া। সে মঞ্জুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো অপলক কয়েক মুহূর্ত। যেন অনন্তকাল।

টাঙ্গাইল থেকে সন্তোষের রাজবাড়িতে যাবার পথে এক তরুণীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, তার মুখমণ্ডল ছিল বিষণ্ণ, সে যেন তার বুকের শূন্যতা ভুলে যাবার জন্য একটা আশ্রয় খুঁজছিল। তারপর থেকে কটা বছর আর পার হয়েছে? সময় এমনই নিষ্ঠুর?

একই সঙ্গে অভিমান ও আহত মর্যাদার সঙ্গে দৃঢ়তা মিশিয়ে বাবুল বললো, ছিঃ মঞ্জু!

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর অনুতাপ হলো। সে জানে, বাবুল একেবারেই কোনো খারাপ শব্দ সহ্য করতে পারে না। যেন ঠিক শারীরিক আঘাত পায়। নাগর' শব্দটা ব্যবহার করা মঞ্জুর উচিত হয়নি, এই শব্দটি সে সদ্য একটি উপন্যাসে পড়েছে বলেই মনে এসে গেছে। একজন ইন্ডিয়ান রাইটারের লেখা বই, বাজে, বাজে, মঞ্জু ওসব বই আর কোনোদিন পড়বে না।

সঙ্গে সঙ্গে তো আর ক্ষমা প্রার্থনা করা যায় না, তাই মঞ্জু কণ্ঠস্বর বদলে জিজ্ঞেস করলো, তুমি চা খাবে?

–ওরকম কথা তুমি বললে কেন, মঞ্জু?

–যাঃ, আমি বুঝি একটু ঠাট্টা করতে পারি না?

–এটা ঠাট্টা? ও, ঠিক আছে। মঞ্জু, এখানে এসে একটু বসো। সন্ধেবেলা বাড়িতে প্রায়ই কোনো না কোনো অতিথি আসে, তোমার সঙ্গে ঠিক মতন কথা বলা যায় না।

–কে আসে?

–কেউ না কেউ আসে, বাঃ, বাড়িতে লোকজন তো আসবেই...রাত্তিরে যখন আমি ফিরি, তোমার তখন ঘুম পায়, বিশেষ কিছু কথা হয় না, সেই জন্য এখন...

সন্ধেবেলা কেউ না কেউ আসে, এর মধ্যে যেন একটু খোঁচা আছে, সেটাই মঞ্জুর গায়ে লাগলো। বাবুল যে তাকে এখন নিভৃতে কিছু বলতে চায়, তাতে সে গুরুত্ব দিল না।

–তুমি হঠাৎ চলে এলে, ক্লাস নাই?

–ছাত্ররা স্ট্রাইক করেছে, আজ বিরাট মিছিল।

–সিরাজুল এখনো ফেরে নাই, মনিরাবেচারী না খেয়ে বসে আছে।

–ও, মঞ্জু, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। গত দু তিন মাস ধরে আমি খবর পাচ্ছি, সিরাজুল বেশ একজন নামজাদা ছাত্র নেতা হয়ে উঠেছে।

–ছাত্র নেতা?

–কার যে কোন্ দিকে গুণ থাকে সব সময় বোঝা যায় না। আমি ভেবেছিলাম ওর লেখাপড়া বেশিদূর হবে না। কিন্তু ওর সংগঠনের বিশেষ ক্ষমতা আছে। গ্রামে থাকতে এই গুণটা প্রকাশ পায়নি। এখন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এসে...আজ তো বিরাট মিছিল, শেখ মুজিবর রহমানকে সরকার পর পর কয়েকবার গ্রেফতার করলো, সেই প্রতিবাদে, যে-কোনো সময় ভায়োলেন্ট হয়ে যেতে পারে...আবার কলেজ ইউনিভার্সিটি যে কতদিনের জন্য বন্ধ হবে।

–সিরাজুল আছে ঐ মিছিলে?

–থাকাই তো সম্ভব! সে এখন লীডার, পড়াশুনো ওর হবে না, ঐ মিছিলটিছিলই করবে।

–তুমি বুঝি ছাত্র বয়েসে মিছিল করোনাই! একবার মাথা ফাটিয়েছিলে না?

–ও, হ্যাঁ, তা ঠিক।

–তুমি এত ঠাণ্ডা ভাবে কথা বলছো কী করে। সিরাজুল মিছিলে গেছে, যদি লাঠি বা গুলি চলে...মনিরা বেচারি একা বসে আছে, খায়নি দায়নি...সিরাজুলেরও শরীর ভালো না।

–ঠিক বলেছো, সিরাজুলকে দেখতেই তাগড়া কিন্তু ভেতরটা ঝাঁঝরা। এই তাগৎ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লড়বে কী করে?

–তা হলে এখন কী হবে?

–এখন কী হবে মানে? তোমার সাথে আমার অন্য কথা ছিল, কিন্তু এখন সিরাজুল বিষয়েই আমরা আলাপ-আলোচনা করে যাবো? সে একটা হুজুগে মেতে মিছিলে গিয়ে লাফাচ্ছে, সেজন্য আমরা দায়ি হবো? আওয়ামী লীগের একজন লীডারকে সরকার গ্রেফতার করেছে, তা নিয়ে ছাত্রদের এত উত্তেজিত হবার কী কারণ আছে? এখনকার ছাত্ররা টোট্যাল দেশটার কথা চিন্তা করে না!

–তা বলে মনিরা ভাতের থালা নিয়ে বসে থাকবে, সিরাজুল কখন ফেরে না ফেরে, যদি পুলিস ওরে জেলে নিয়া যায়, মনিরা না খেয়ে বসেই থাকবে।

–খুবই মর্মন্তুদ পিকচার। যে-কোনো নভেলিস্ট পেলে লুফে নিতো। কিন্তু মঞ্জু, পৃথিবীটা এরকমই নিষ্ঠুর! শুধু আমাদের এই ইস্ট পাকিস্তানেই না, বহু দৈশে, তুমি ভাবো তো ভিয়েনামের কথা! এই মুহূর্তে সেখানে কী চলেছে; বর্বর মার্কিনীরা সতেরো হাজার মাইল দূর থেকে এসে...বোমা, গুলি, গ্যাস নিয়ে...সে দেশে কত মা, কত স্ত্রী তাদের সন্তান বা স্বামীর পথ চেয়ে বসে আছে।

–আমি ভিয়েত্রম চিনি না। কিন্তু আমি যদি পুরুষমানুষ হতাম

–কী বললে, তুমি...পুরুষ মানুষ? তুমি পুরুষ মানুষ হলে কয়েকজন লোক খুবই দুঃখ পেত...পৃথিবীতে পুরুষ মানুষ আছে কোটি কোটি, কিন্তু বিলকিস বেগম মাত্র একটিই...সে যাই হোক, তুমি যদি দিয়ে বললে...তুমি পুরুষ মানুষ হলে কী করতে?

–আমি পুরুষ মানুষ হলে আমি এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে সিরাজুলের খবর করতাম। তার যদি কিছু হয়...

–আই সাপোজ, ইউ আর রাইট, মঞ্জু! যে-কোনো পুরুষ মানুষেরই উচিত...উৎকণ্ঠিতা পত্নী বসে আছে...তার স্বামীর খোঁজ করা।

বাবুল উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পলক নিজের ঘরটি মমতাভরে দেখে নিল। সে প্যান্ট-শার্ট পরা, জুতো-মোজা খুলে রেখেছিল, সেগুলো পরে নিল দ্রুত। প্যান্টের পকেট থাবড়ে দেখে নিল পার্শটা ঠিক আছে কিনা।

তারপর ঠোঁট বাঁকিয়ে মৃদু কৌতুকের হাসির সঙ্গে বললো, সিরাজুলের খোঁজ না নিয়ে আমি ফিরছি না। হয়তো আমারও ফিরতে দেরি হবে। একেবারেই যদি না ফিরি আজ রাত আটটা নটার মধ্যে, তাহলে তোমার মামুনমামার কাছে খোঁজ নিও। উনি নিশ্চয়ই

লেটেস্ট ক্যাজুয়ালিটি আর অ্যারেস্টেডের ফিগার জানবেন। বাই-ই মঞ্জু, তুমি চা খাওয়াতে চেয়েছিলে, সেটা পাওনা রইলো।

হঠাৎ মঞ্জুর বুকটা ধক করে উঠলো। বাবুলের গলার আওয়াজটা অন্য রকম, যেন ইস্পাতের শব্দের মতন। মামুনমামার নামটা বললো সে চিবিয়ে চিবিয়ে। কী হয়েছে বাবুলের, ৬১২

মামুনমামার ওপর এত রাগ কেন? না, আজ মঞ্জুরই দোষ বেশী। বাবুল অসময়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চেয়েছিল। মঞ্জু তা না শুনেই সিরাজুলের নাম করে তাকে উত্যক্ত করতে লাগলো। আর একটু পরে গেলেই বা কী হতো! এমনকি স্বামীকে সে এক কাপ চাও খেতে দিল না?

অনুতাপে কেঁপে উঠে মঞ্জু ছুটে এসে বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি খুব জলদি চা বানিয়ে আনছি! একটু বসে যাও!

স্বামীর হাত ধরতে যাচ্ছিল মঞ্জু, বাবুল তা ধরতে দিল না। আর একবার গাঢ় ভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো, কোনো কথা বললো না। তারপর ব্যস্তভাবে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

৪৮ বড় তেঁতুল গাছ

এত বড় তেঁতুল গাছ বড় একটা দেখা যায় না। এদিককার ঝোঁপ-জঙ্গল অনেকটাই সাফ হয়ে গেছে, কিন্তু তেঁতুল গাছটার গায়ে কেউ কুড়ুল ছোঁয়ায়নি। এই গাছে প্রচুর কাক-চিলের বাসা, এই গাছের নিচে ছায়া অনেকখানি।

এই তেঁতুল গাছটাকে হারীত মণ্ডলের খুব চেনা লাগে, খুব আপন মনে হয়। ঘরের দাওয়ায় বসে সে এক এক সময় এক দৃষ্টিতে তেঁতুল গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর দু'হাত। জুড়ে কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজে বলে ওঠে, জয় জয় গুরু, জয় বাবা কালাচাঁদ!

এক শো পনেরো ডিগ্রি গরমে শুকিয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে মাটি। পূর্ব বাংলায় একটা চলতি কথা ছিল ফুটি ফাটা, এখানকার ভূমি অবিকল ফুটিফাটারই মতন। এই গরমে পোকা মাকড়রাও গর্ত ছেড়ে বেরুতে চায় না। তবু মানুষকে বেরুতে হয়। তাদের কারুর কারুর মাথায় খেজুর পাতার টোকা। হারীত মণ্ডলকে বসে থাকতে দেখলে তারাও বলে ওঠে, জয় জয় গুরু! জয় বাবা কালাচাঁদ!

এই সুভাষ কলোনির অনেকেই এখন সাধক গুরু কালাচাঁদের ভক্ত। যদিও কালাচাঁদকে তারা কেউ চোখে দেখেনি। একমাত্র হারীত মণ্ডলই তাঁকে দেখেছে, তাও স্বপ্নে। বছর খানেক আগে হারীতের প্রথম এই স্বপ্ন দর্শন হয়। সেই সময়টাও ছিল বৈশাখ মাস, শুধু দিনের বেলা নয়, রাতেও এত গরম যে মনে হয় সূর্য অস্ত যায়নি, জঙ্গলের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে আছে। সেই বৈশাখের এক শেষ রাতে এক জটাজুটধারী মহাপুরুষ হারীত মণ্ডলের কুটিরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বেদব্যাস মুনির মতন তাঁর দাড়ি ছাড়িয়ে গেছে তাঁর নাভি, তাঁর মাথায় গঙ্গাধর শিবের মতন জটা, তাঁর চক্ষু দুটি কিন্তু বড় কোমল, পদ্ম-পলাশ বর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের মতন। মনে হয় তাঁর বয়েসের গাছ-পাথর নেই। তিনি শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, ওরে হারীত, আমারে চেনোস না? তোর বাপ কৈলাশ, তার বাপ আছিল ধরণীধর, তারে আমি দীক্ষা দিছিলাম। তোগো জইন্যে আমার মন এখনও কান্দে রে, বাপধন।

স্বপ্ন ভাঙার পর হারীত সর্বাঙ্গে ঘাম নিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল। বেশ কিছুক্ষণ তার ঘোর ভাঙেনি, যেন বোধ হচ্ছিল, সেই তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষ তার ঘরে সশরীরেই উপস্থিত হয়েছিলেন। আস্তে আস্তে হারীতের মনে পড়েছিল যে তাঁর ঠাকুর্দা যশোরের বিখ্যাত তন্ত্র সাধক কালাচাঁদ বাবার শিষ্য হয়েছিলেন বটে। সে তো বহুকাল আগেকার কথা!

এই স্বপ্নের কথা হারীত তার স্ত্রী পারুলবালা এবং তারই সমবয়েসী যশোদাদুলাল ছাড়া আর কারুকে বলেনি। কিন্তু যেহেতু এই কলোনির নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রায় কোনো ঘটনাই ঘটে না, তাই এরকম একটা ব্যাপারও পাঁচ কান হতে দেরি হয় না।

দশদিন বাদে আবার হারীতের সেই একই স্বপ্নদর্শন হলো। এবার সেই সাধক কালাচাঁদ হারীতের সঙ্গে অনেক কথা বললেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথাটি হলো এই যে, শিগগিরই হারীত এবং তার মতন অন্যসব উদ্বাস্তুদের দুঃখ ঘুচে যাবে, সুদিন আসবে। তিনি স্বয়ং এসে সেই সুদিনের সন্ধিক্ষণটি জানিয়ে যাবেন।

এই দ্বিতীয় দৈববাণীর ঘটনায় হারীত এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে সে চৈতন্য হারিয়ে ফেলে টলে পড়ে যায় এবং তারপর সাতদিন প্রবলজ্বরে ভোগে। জ্বরের ঘোরে প্রলাপের মধ্যে সে শুধু ওই স্বপ্নের কথাই বলতে থাকে।

সুদিনের আশ্বাস যেন বাতাসে আগুনের মতন ছড়িয়ে যায়। শুধু সুভাষ কলোনি নয়, আশ পাশের আরও আট দশটা কলোনির মানুষ ছুটে আসে হারীতের সেই প্রলাপ শোনার জন্য।

তারপর থেকেই হারীত এখানকার অনেকের গুরু। পুলিশের মারের ভয়ে হারীত আর উদ্বাস্তুদের নেতা হতে চায় না, গুরুও হতে চায় না, কিন্তু সে সাধক কালাচাঁদের বকলমে গুরু। আগে হারীতের কথা পরামর্শ শুনে অনেকে তর্ক করতো, প্রতিবাদ করতো, কিন্তু এখন মাত্র দু'চারজন ছেলে ছোঁকরা ছাড়া আর সবার কাছে হারীতের প্রতিটি কথাই যেন বেদবাক্য।

হারীত নিজে প্রায়ই সেই স্বপ্নের কথা ভাবে। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়! কিন্তু এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন সে দেখলোই বা কেন? স্বপ্নে সে তন্ত্রসাধক কালাচাঁদকে দেখেছে এর মধ্যে কোনো ভুল নেই, তিনি সুদিন আসার কথাও বলেছেন, কিন্তু কী করে তিনি বললেন? যশোরের কালাচাঁদ স্বামী কি এতদিন বেঁচে থাকতে পারেন? সে যে অসম্ভব। হারীত মিথ্যে কথা বলে তার কাছের মানুষদের ধোঁকা দিতে চায় না, কিন্তু সে যে এই প্রকার স্বপ্ন দেখেছে, তা তো মিথ্যে নয়!

দিনের বেলা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হারীতের এক এক সময় মনে হয়, এই গাছটার সঙ্গে যেন মহাপুরুষ কালাচাঁদের কোথায় মিল আছে। ঠিক কী রকম, যে মিল তা সে বলতে পারবে না।

এখানে খবরের কাগজ আসে না। রেডিও নেই। রিলিফ অফিসের বাবুদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে বাইরের পৃথিবীর কিছু কিছু খবরাখবর পাওয়া যায়। তা ছাড়া গুজবের জন্ম হতে বাধা নেই। গত বছর হারীত তার পূর্ব পুরুষের গুরুদেবকে স্বপ্ন দেখার কিছুদিন পরেই খবর এলো যে ইণ্ডিয়া ও পাকিস্তানে সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধ বেধে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ কলোনির সব মানুষ দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, চতুর্দিকে রটে গেল যে এইবার ইণ্ডিয়া পাকিস্তান আবার এক হয়ে যাবে! ইণ্ডিয়াতে গান্ধী-প্যাটেল-নেহরু কেউ বেঁচে নেই, পাকিস্তানে জিন্না-লিয়াকত-সোহরাওয়ার্দিরা কেউ নেই। যারা দেশ ভাগ করেছিল তারা সব মৃত, তবে এখন দুটো আলাদা দেশকে কে সামলাবে? লালবাহাদুর শাস্ত্রী বা আইয়ুব খাঁর নাম উদ্বাস্তুরা আগে কখনো শোনেনি, তারা ধারণা করে নিল, এরা অতি শিশু! সবাই ভিড় করে এল হারীত মণ্ডলের কাছে। তা হলে সুদিন এসে গেল?

হারীত মণ্ডল তাদের অযথা স্তোকবাক্য দিতে পারলো না। স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ তাঁকে সুদিনের সন্ধিক্ষণের কথা জানিয়ে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু তিনি এর মধ্যে আর স্বপ্নে আসেন নি। হারীতের নিজেরও ভ্যাবাচ্যাকা খাবার মতন অবস্থা।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার খবরও এক সময় এই কলোনির মানুষের কানে এলো। কিন্তু সুদিন এলো না। বরং প্রতিদিনের জীবনযাত্রা আরও কঠিন। রিলিফ অফিসের বাবুদের কেমন যেন আলগা আলগা ভাব। জওহরলাল নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী দিল্লির সিংহাসনে বসেছেন, কিন্তু তিনি উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেননি।

হারীত মণ্ডল আরও দু'বার গুরু কালাচাঁদ সাধককে স্বপ্নে দেখেছে, তিনি কী যেন বলতেও চেয়েছেন, হারীত কিছুই বুঝতে পারে নি। হারীতের কানে যেন তখন তালা লেগে যাবার মতন অবস্থা। দু'বারই ঘুম থেকে জাগার পর হারীত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ।

পারুলবালার উপদেশ অগ্রাহ্য করেও হারীত তেঁতুল গাছতলায় মিটিং ডেকে সবাইকে জানিয়েছিল যে সে স্বপ্নে গুরুদেবকে আবার দেখলেও তিনি তাতে কোনো নির্দেশ দেননি

বা দিলেও সে বুঝতে পারে নি। সুদিনের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

এই সরল স্বীকারোক্তিতে হারতের জনপ্রিয়তা কমে যাবার বদলে বেড়েছে।

হারীতের পরিবারটি এখন ছোট। কুরুদ শিবির ছাড়ার সময় তার মেয়ে গীতা আর তার জামাই মাধব বিদ্রোহ জানিয়ে উড়িষ্যার কটকের দিকে চলে যায়। তাদের সঙ্গে ছোট একটি দলও গিয়েছিল। তাদের কয়েকজন পুলিশের গুলিতে মরেছে, অনেকে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু গীতা আর মাধবের খবর পাওয়া গেছে অনেকদিন পর। মাধব খুদারোড স্টেশনে কুলিগিরি করে এবং এক বস্তিতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে উদ্বাস্তু পরিচয় ঘুচিয়েছে। এর মধ্যে গীতা একদিন দেখা করতে এসেছিল হারীত ও পারুলবালার সঙ্গে, খুদা রোডে চলে এলে যে বাবা-মায়েরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, সে প্রলোভনও সে দেখিয়েছিল, কিন্তু হারীত হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সে প্রস্তাব। কলোনির অন্য লোকজনদের ছেড়ে তার চলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অগত্যা গীতা তার ছোট ভাইকে নিয়ে গেছে নিজের কাছে। সে-ও ভবিষ্যতে খুদা রোডের কুলি হবে কিংবা রিক্সা চালাবে, এরকম আশা করা যায়।

হারীতের পালিতা কন্যা গোলাপী আর তার ছেলে নবা রয়ে গেছে তাদের পরিবারে। নবা পারুলবালার বেশ ন্যাওটা, নিজের মাকে সে বলে দিদি আর পারুলবালাকে বলে মা। পারুলবালার ধারণা, নবার চেহারা ও স্বভাব চরিত্র যেন অবিকল তাঁর প্রথম সন্তান ভুলু অর্থাৎ সুচরিতের মতন। অল্প বয়েসে ভুলুও এরকম দুরন্ত ছিল।

ভুলুর কথা মনে পড়লে পারুলবালা এখনো মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলেন। তাঁর ধারণা, লেখা পড়া শিখে ভুলু একদিন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে, কিন্তু সে কি তার বাবা-মায়ের কথা ভুলে যাবে? যে সন্তান বাবা মায়ের কথা মনে রাখে না, তাকে লেখা পড়া শিখিয়ে লাভ কী? বরং জমি চাষ করলে সে সংসারের কিছু সাহায্য করতে পারতো!

হারীত মণ্ডলও সুচরিতের কথা প্রায়ই ভাবে বটে কিন্তু স্ত্রীর মতন উতলা হয় না। সুচরিতের কাছে কয়েকখানা চিঠি লিখেও উত্তর পাওয়া যায়নি। চন্দ্রা নামের সেই উগ্র সমাজসেবিকাটি অবশ্য হারীতকে বলেই দিয়েছিলেন, আপনি যখন চলেই যাচ্ছেন, পশ্চিম বাংলায় থেকে লড়ে যাবার মতন মনের জোর আপনার নেই, তখন আর পিছুটান রাখবেন না। আপনি যদি নিজেদের দুঃখ দুর্দশার ঘ্যানঘ্যানানি জানিয়ে ছেলেকে বারবার বিরক্ত করেন তা হলে ওর লেখা পড়া হবে না। ছেলেকে আমার হাতে দিয়ে যাচ্ছেন, নিশ্চিন্ত মনে চলে যান। এইটুকু শুধু মনে রাখবেন। আপনাদের যাই-ই হোক না কেন, আপনাদের ছেলে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে!

হারীত মণ্ডল ভাবে, সুচরিত লেখা পড়া শেষ করুক, দাঁড়িয়ে যাক, সমাজের একজন বিশিষ্ট মানুষ হিসেবে গণ্য হোক। তারপর ভাগ্যে যদি থাকে, ছেলের সঙ্গে একদিন না একদিন দেখা হবেই। যদি না-ও হয়, তাদের একজন বংশধর অন্তত এদেশে সসম্মানে বসবাস করুক।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, চন্দ্রা নামের মহিলাটি অযাচিতভাবে হারীতদের এত উপকার করলেও তার মুখ হারীতের এখন ভালো করে মনে পড়ে না। তাঁর ঠিকানা লেখা কাগজটাও কোথায় হারিয়ে গেছে। বরং মনে পড়ে তালতলার সুলেখার কথা। মনে পড়া মাত্রই যেন হারীতের বুকের ভেতরটা আলোকিত হয়ে যায়। অত নরম, অত সুন্দর কি কোনো মানুষ হয়? সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও ঐ একটি মুখের ছবি যেন সব আক্ষেপ ভুলিয়ে দিতে পারে। এক এক দিন কোণ্ডাগাঁওতে গিয়ে বিভিন্নমুখী বাস দেখে হারীতের তীব্র ইচ্ছে হয়, একবার একটা রায়পুরগামী বাসে চড়ে বসলে হয় না, সেখান থেকে কলকাতা গিয়ে একবার শুধু সুলেখাকে দেখে আসার জন্য।

গোলাপীর ছেলে নবা খুব দুরন্ত হলেও তাকে সামলানো যায়, কিন্তু গোলাপীকে নিয়েই এখনও কিছু কিছু সমস্যা আছে। গোলাপীর অতীত ইতিহাস অনেকেই ভোলেনি। যৌন কাহিনী সব সময়ই মুখরোচক। গোলাপীর বিয়ে হয়নি তবু তার একটি সন্তান আছে, সুতরাং গোলাপী নিজেই একটি সশরীর গল্প। হারীত অবশ্য পশ্চিমবাংলা ছাড়বার পর

সবাইকে বারবার বলেছে যে অরক্ষণীয়া হবার পর গোলাপীর সঙ্গে একটি কলাগাছের বিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কলাগাছের রক্ত মাংসের পিতৃত্বের কথা এই কলিযুগে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

গোলাপীর এখন পূর্ণ যৌবন, এই অভাগিনী মেয়েটা না খেয়ে না দেয়েও কী করে যে শরীরটা এত সুঠাম রেখেছে কে জানে! সন্তান সমেত গোলাপীকে কোনো দোজবরে পুরুষও বিয়ে করতে চায় না। তবু অনেকেই তার চার পাশে ঘুরঘুর করে। হারীত নিজে চাষবাসের কাজ করে না, গোলাপীই মাঠে যায়, সুতরাং তাকে একা পাওয়ার সুবিধে আছে। দিন দুপুরে কেউ কেউ গোলাপীর কাছে কুপ্রস্তাব করে। স্বামী নেই এমন বেওয়া স্ত্রীলোককে সবাই মনে করে সহজলভ্যা। একবার যে অসতী হয়েছে তার বেশ্যা হতে দোষ কী?

কলোনির তিন জন মানুষের প্রতি হারীত তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। এরাই গোলাপীকে নষ্ট করার জন্য দিন দিন দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। এদের শাস্তি দেওয়া হারীতের পক্ষে খুব সহজ। সে নিজে অধিকার ফলাতে চায় না, কিন্তু সে জানে যে তার মুখের কথাই এখানে আইন। সে সামান্য ইঙ্গিত করলে দুশো-তিনশোজন লোক ঐ তিনজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবু হারীত প্রকাশ্যে ওদের কিছু বলে না।

হারীতের বেশি চিন্তা গোলাপীকে নিয়েই। হতভাগিনীর একবার ঠকেও শিক্ষা হয়নি। একবার সে মরতে বসেছিল, মরতে চেয়েও ছিল, কিন্তু তারপর কয়েকটা বছর কেটে যাবার পর সুস্থ শরীর নিয়ে এখন শরীরের সবকটা দাবিই মেটাতে চায়। হারীত লক্ষ করেছে, বাড়ির মধ্যে শান্ত, নম্র হয়ে থাকলেও গোলাপী যখন বাড়ির বাইরে যায়, তখন চোখ মুখ ঘুরিয়ে কথা বলে, তার ঠোঁটে ফুটে ওঠে পাতলা হাসি। অথচ গোলাপীকে বাড়ির মধ্যে সর্বক্ষণ তো আটকে রাখাও যায় না। গোলাপীই এই সংসার চালায়। হারীত মণ্ডল রিলিফের খাদ্য পাবার জন্য অফিসের সামনে লাইন দিতে পারে না, তার ভক্তরাই তাকে নিষেধ করেছে, দরকার হলে তারা প্রত্যেকের ভাগ থেকে এক মুষ্টি দেবে। সুতরাং গোলাপীকেই যেতে হয় প্রতি সপ্তাহে।

গোলাপীর মধ্যে মাতৃত্বের ভাবও বেশ কম। অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে। সেই সন্তানের প্রতি তার মায়া পড়েনি। প্রায় জন্মের পর থেকেই তার ছেলেটা পারুলবালার কোলে আশ্রয় পেয়েছে, কিছুতেই সে গোলাপীকে মা বলে ডাকে না। হারীত ভাবে, গোলাপীকে যদি কেউ বিয়ে করতে চাইতো, তা হলে নবাকে নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না, সে থেকে যেত পারুলবালার কাছে। কিন্তু কে বিয়ে করবে গোলাপীকে?

একদিন হারীত কলোনির বাইরে বড় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে যোগানন্দ নামে একটি ছেলেকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো, তারপর তার কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে লাগলো উল্টো দিকে।

এদিকে এখনো ছাড়া ছাড়া জঙ্গল রয়ে গেছে, দূরে দেখা যায় কয়েকটি টিলা। দণ্ডকারণ্য শুনে যে ভয়াবহ জঙ্গলের কথা মনে আসে, তেমন গভীর জঙ্গল এদিকে ওরা দেখেনি। কোরাপুট জেলার সোনাগড়ায় ওরা মাত্র তিনমাস ছিল, সেখানে সাংঘাতিক জলকষ্ট, বরং এখানে চলে এসে অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে।

গাড়ি গাড়ি ইট-সিমেন্ট আসছে, একটু দূরেই তৈরি হচ্ছে বড় একটা সরকারি অফিস। গত মাসে একটা ইস্কুলও খোলা হয়েছে। মনে হয় এদিককার কলোনিগুলো পাকা হয়ে গেল, আর কোথাও যেতে হবে না ওদের।

গরমে রাস্তা এমন তেতে গেছে যে পা রাখা যায় না। এ বছর এদিকে একদিনও বৃষ্টি হয়নি। চৈত্র মাসটা শুধু ঝড়ের ওপর দিয়ে গেল, কিন্তু সেই ঝোড়ো বাতাস কোনো মেঘ উড়িয়ে আনলো না। সবাই চাষের জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে, বৃষ্টির অপেক্ষায়। সেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, কাছাকাছি নদী-নালা নেই, বৃষ্টিই একমাত্র ভরসা।

যোগানন্দকে নিয়ে হারীত রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো। অধিকাংশ গাছের পাতা শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। গাছের ছায়াতেও যেন শান্তি নেই, হাওয়ায় যেন আগুনের হল্কা। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের চাং পড়ে আছে, সেগুলো স্পর্শ করার উপায় নেই।

খানিকটা ঝোঁপ মতন জায়গা বেছে নিয়ে বসবার আগে, হারীত ভালো করে দেখে নিল সাপখোপ আছে কিনা। এদিকে বড় সাপের উৎপাত।

বসে পড়ে হারীত কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মুছলো, দাড়ি কামানো ছেড়ে দিয়েছে হারীত, মাথার চুলও ছাঁটে না, তার শীর্ণ লম্বা শরীরটা সাধু সাধুই দেখায় আজকাল। শুধু একটা ধুতি পরা, এই গরমে গেঞ্জি গায়ে দেবারও প্রশ্ন ওঠে না।

যোগানন্দর মুখখানা শুকিয়ে গেছে। হারীত তাকে একা ডেকে এনেছে বলেই বিপদের আশঙ্কা করেছে সে। কলোনির দু'তিনজন মানুষ দেখেছে তাকে হারীতের সঙ্গে যেতে। এতক্ষণ হারীত তার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি।

হারীত যোগানন্দর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না যোগানন্দ, সে মুখ নিচু করে। হারীত তার থুতনিটা ধরে তুলে বললো, চেয়ে থাক আমার দিকে।

যোগানন্দর সবাঙ্গ কেঁপে উঠলো, সে হারীতের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে বললো, বড়কত্তা, আমারে ক্ষমা করেন!

হারীত যোগানন্দের রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো স্নেহের সঙ্গে। নরম গলায় বললো, ওঠ, আমার কথা শোন।

যোগানন্দ আবার সোজা হয়ে বসার পর হারীত তার কাঁধে হাত রেখে বন্ধুর মতন বললো, যোগা, তুই আমার মাইয়া গোলাপীরে খুব পছন্দ করোস, তাই না?

যোগানন্দ বিস্ফারিত ভাবে চেয়ে রইলোহারীতের দিকে। কোনো কথা বলতে পারলো না। হারীত মৃদু হেসে আবার বললো, আমি বুঝি রে, বুঝি! জুয়ান বয়স, রক্ত চনমন করে, তোর মতন বয়স কি আমার ছিল না? তা শোন, যোগা, তোর যখন গোলাপীরে অ্যাতই মনে ধরছে, তুই অরে বিয়া কইরা ফ্যালা! আমি সব ব্যবস্থা কইরা দিমু।

বেশ স্বাস্থ্যবান পুরুষ এই যোগানন্দ, কিছুদিন আগেই সে দা দিয়ে কুপিয়ে একটা ভাল্লুক মেরেছে, সরকারি অফিসের বাবুদের সঙ্গে সে চোটপাট করে কথা বলে, সেই যোগানন্দেরও চোখ ছলছলিয়ে এলো, হারীতের এই কথা শুনে, কম্পিত গলায় সে বললো, বড় কত্তা, আর কোনোদিন আমি ক্ষমা করেন, ক্ষমা করেন, আমার ঘরে বউ আছে।

-জানি, জানি, তোর বউ আছে। সেই বউটারে গলা টিপা মাইরা ফালা। তুই ভাল্লুক মারছোস, একখান মাইয়া মানুষরে মারতে কী লাগে? বউটার ঘেটি ভাইংগা পুড়াইয়া ঝুড়াইয়া দে, তারপরে গোলাপীরে বিয়া কইরা তুই সুখে ঘর কর।

গোঁয়ার হলেও যোগানন্দর এইটুকু অন্তত বোঝার ক্ষমতা আছে যে হারীতের এই সব কথাই মারাত্মক ধরনের ঠাট্টা। হারীত কখনো সোজাসুজি কথা বলে না। সে আবার হারীতের পা ধরলো।

-আমারে কী শাস্তি দেবেন কন্, আমি আপনের পা ছুঁইয়া কিরা করতেছি, আর কোনোদিন আমি গোলাপীরে... আমি তারে নিজের বুইনের মতন দ্যাখবো।

আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে লাগলো হারীত। সামনের শিমূল গাছটায় একটা কাক শুকনো, খরখরে গলায় অবিশ্রান্ত ডেকে যাচ্ছে। সেটার দিকে তাকিয়ে হারীত বললো, অত সহজ না রে! একবার কোনো মাইয়া মানুষের জইন্য প্রলোভন হইলে তারে আর মা বুইন ভাবে দেখা যায় না। মানুষের মনটারে কি লাগাম পরানো যায়? তোরে আমি দোষ দেই না, যোগা! নিমাই আর হারানরেও দোষ দেই না, আমি তো জানি, আমার মাইয়ারও দোষ আছে। সে তোগো টানে। বুঝি, আমি সবই, কিন্তু কী করি ক তো? মাইয়াডারে তো ফেলাইয়া দিতে পারি না।

যোগানন্দ আবার কোনো শপথ করতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে হারীত বলতে লাগলো, এক মাইয়া নষ্ট হইলে অনেকগুলান ঘর ভাঙে। সমাজে পোকা লাগে। দ্যাখ, দ্যাশ-ঘর ছাইড়া আইছি কিন্তু জাইত ধরম তো ছাড়ি নাই। চোখের সামনে কিছু ঘটলে

সহ্য করি ক্যামনে? আবার গোলাপীর কষ্টটাও বুঝি! তুই এক কাম কর যোগা, তুই গোলাপীরে নিয়া পলাইয়া যা! রায়পুরে যা, বড় শহর, সেখানে একটা কাজ-কাম জুটাইতে পারবি না?

–অমন কথা আমারে বলবেন না বড় কত্তা! আমি বাপ-মায়ের নাম লইয়া কই, আর কোনোদিন আমি গোলাপীরে অইন্য চক্ষে দ্যাখলে আমার চক্ষু যেন ক্ষইয়া যায়... আমি ওরে পাহারা দিমু, যাতে অইন্য কেউ... আমি নিমাই আর হারানরেও কইয়া দিমু... বড় কত্তা, আপনে একটা কথা বোধহয় জানেন না, রিলিফ অফিসের সুধীর দাস, তার সাথে গোলাপীর হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠে হারীত বললো, কে? কী বললি?

যোগানন্দ কাচুমাচু হয়ে জানালো যে রিলিফ অফিসের একজন ক্লার্ক সুধীর দাস, তার সঙ্গে গোলাপী গোপনে গোপনে দেখা করে, সেই লোকটির মতলব ভালো নয়, যোগানন্দ আর হারান দু জনে মিলে গোলাপীকে এই ব্যাপার নিয়ে একদিন সাবধান করতে গিয়েছিল...

হারীত দাঁতে দাঁত চেপে বললো, তারে আমি বলি দেবো! তার গায়ের চামড়া ছুলে লবন ছিটাবো! আমাগো কলোনির কেউ যদি বান্দরামি করে তারে আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু কোনো ভদ্দরলাকের ছাওয়াল যদি আমার মাইয়ার গায় হাত-ছোঁয়ায়, তারে আমি ছাড়বো না। তারে খুন কইরা আমি ফাঁসি যাবো!

যোগানন্দর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে হারীত বুঝলো যে তার নজরের আড়ালেও অনেক কিছু ঘটে যায়। সুধীর দাসের ব্যাপারটা সে জানতোই না কিন্তু সম্পর্কটা অনেকদূর গড়িয়েছে। গোলাপীও যোগানন্দ-নিতাইদের বিশেষ পাত্তা দেয় না, তার ঝোঁকও ঐ সুধীর দাসের দিকে। সুধীর দাস বিবাহিত কিনা জানা যায় না, এখানে সে একা থাকে।

যোগানন্দ আরও বললো যে, একদিন ওদের দু'জনকে হাতে নাতে ধরে ফেলে তারপর ওদের জোর করে বিয়ে দিলে কেমন হয়?

হারীত রাগের সঙ্গে সে প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিল। জোর করে বিয়ে দিলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দাসী করে রাখবে কিংবা দু'চারদিন পরে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। হারীত ওদের আর একদিনও প্রশ্রয় দিতে চায় না। আজই সে সুধীর দাসের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

উঠে দাঁড়িয়ে সে যোগানন্দের চুলের মুঠি চেপে ধরে বললো, তুই যদি আমারে মিছা কথা বলিস, তাইলে তুই প্রাণে বাঁচবি না!

যোগানন্দ বললো, বড় কত্তা, আপনে যদি আমারে মারেন, তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আপনে আমারে ঘেন্না করলে তা সহ্য করতে পারুম না।

-চল, এখনই চল।

দু'জনে বেরিয়ে এলো জঙ্গল থেকে। দুপুর এখন খুব গাঢ়, এই সময় রিলিফ অফিসে জন-মনুষ্য থাকবে না জানা কথা, তবু দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে গেল সেই পর্যন্ত। সরকারি কর্মচারিদের মেস খানিকটা দূরে, সেই পর্যন্ত যাবে কিনা তাও একবার ভাবলো হারীত। যোগানন্দ ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে নিরস্ত করলো।

হারীতের মাথার মধ্যে কষ্ট হচ্ছে। সুধীর দাসকে যদি গোলাপীই আকৃষ্ট করে থাকে, তাহলে শাস্তি তো আগে গোলাপীরই প্রাপ্য। কিন্তু গোলাপীর ব্যাপারে যেন হারীত অন্ধ। কুপার্স ক্যাম্পে সেই ঘটনার সময় হারীত সক্কলের বিরুদ্ধে গোলাপীর পক্ষ নিয়েছিল। সকলেই মনে করেছিল, গোলাপীই পাপীয়সী, পুরুষরা পুরুষদের দোষ দেখে না।

চোখ বুজে হারীত মহাপুরুষ কালাচাঁদকে স্মরণ করলো। তিনি যদি এই সময় কোনো নির্দেশ দিতেন! অনেকদিন তিনি স্বপ্নে দেখা দেন না, হারীতের জীবনটা শূন্য বোধ হয়।

কলোনির মধ্য থেকে একটা গোলমাল শোনা গেল। স্ত্রী কণ্ঠের চিৎকারই বেশি। গরমে তিতিবিরক্ত হয়ে এখানকার স্ত্রীলোকেরা এমনিতেই মাঝে মাঝে ঝগড়া শুরু করে দেয়,

ওতে গুরুত্ব দেবার কিছু নেই, কিন্তু আজকের চ্যাঁচামেচির মধ্যে যেন খানিকটা আর্তনাদের সুর আছে।

হারীত জোরে পা চালালো।

একটা ভিড় জমেছে তেঁতুল গাছটার নিচে। হারীত প্রথমেই দেখলো গোলাপীকে, তার মুখখানা যেন এখন অন্যরকম মনে হলো। তার ছেলে নবা কাঁচা তেঁতুল পাড়তে ঐ তেঁতুল গাছে উঠেছিল, সেখান থেকে পড়ে গেছে, পারুলবালা জোড়াসনে বসে নবাকে কোলে শুইয়ে রেখেছে, আর একজন তার মাথায় ঢালছে জল।

গুরুর পদে উত্তীর্ণ হবার পর হারীত এখানকার চিকিৎসকও হয়েছে। সে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে অনেকের রোগভোগ সেরে যায়। তাকে দেখে একটা গুঞ্জন উঠলো। কিন্তু প্রিয় নাতির এই বিপদ দেখেও হারীতের মনে কোনো চাঞ্চল্য এলো না, তার মাথা জোড়া অশান্তি। কাছে এসেও সে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে।

পারুলবালা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি পোলাডারে দ্যাখবা না? হারীত স্ত্রীর মুখের দিকে অকারণ চেয়ে রইলো কয়েক পলক। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কী হইছে? নবু, এই নবু, ওঠ!-

নবা কোনো উত্তর দিল না। সে উপুড় হয়ে আছে, অনেকে ভাবছে তার জ্ঞান নেই।

হারীত আরও কাছে এসে ঝুঁকে নবার এক হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, ওঠ! ওঠ!

পারুলবালা জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করলেও হারীত নবাকে টেনে দাঁড় করালো। তার মুখখানা আমসিবর্ণ হয়ে গেছে, নাকের ফুটো দিয়ে গড়াচ্ছে রক্তের ধারা। কিন্তু চোখে জল নেই।

হারীত জিজ্ঞেস করলো, কী হইছে তোর, হাত ভাঙছে, না পা ভাঙছে?

নবা দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। এক পায়ে চোট লেগেছে তার। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে সে হারীতের দিকে।

হারীত তার দুটো হাত ধরে উঁচু করলো, তারপর বললো, হাঁট, আমার সাথে হাঁট! দেখি কিছু ভাঙছে নাকি?

ভিড় ফাঁক হয়ে গেল, হারীত তার নাতির হাত ধরে দশ পা এদিকে দশ পা ওদিকে হাঁটলো। তারপর চকিতে একবার মুখ ফিরিয়ে গোলাপীকে দেখে নিয়ে সে নবাকে বললো, ওঠ, আবার গাছে ওঠ। তোর কিছু হয় নাই!

এবার পারুলবালা এসে বললো, অরে ছাড়ো, ঘরে লইয়া যাই! শুইয়া থাকুক কিছুক্ষণ। হারীত হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বললো, না! ও ঘরে যাবে না! গাছে চড়তে গিয়া একবার আছাড় খাইলেই ভয় পাবে ক্যান? আবার গাছে ওঠবে। ওঠ নবু। আমি কাঁচা তেঁতুল খাবো। আন আমার জইন্যে।

নবা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে ভয়ার্ত ভাবে চাইছে পারুলবালার দিকে।

হারীত তার ঘাড় চেপে ধরে টানতে টানতে গাছের কাছে এনে বললো, ওঠ, ওঠ, তোকে ওঠতেই হবে।

গোলাপী ছুটে এসে হারীতের হাত জড়িয়ে ধরে বললো, বাবা, ওরে ছাড়েন! ও আর কোনোদিন গাছে ওঠবে না!

হারীত গোলাপীকেও ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললো, আলবাৎ ওঠবে। এখনই ওঠবে! তোরা সইরা যা!

বিড়ালছানার মতন নবাকে সে দু'হাতে তুলে গাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে দিল।

তারপর সরে এসে বললো, ওঠ, ভয় নাই, ওঠ! জয় জয় গুরু! জয় বাবা কালাচাঁদ!

এবার অন্য সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, জয় জয় গুরু, জয় বাবা কালাচাঁদ। সেই ধ্বনিতে গোলাপীর কান্নার শব্দ চাপা পড়ে গেল।

৪৯ স্টাডি সার্কেল শেষ হয়ে যাওয়ার পর

স্টাডি সার্কেল শেষ হয়ে যাওয়ার পর অন্যরা চলে গেছে, অতীনরা দু'তিনজন তখনো বসে আড্ডা দিচ্ছে মানিকদার সঙ্গে। কিছুদিন আগেই মানিকদা খুব প্লুরিসিতে ভুগেছেন, এখনও তাঁর মুখখানা অনেকটা পাংশুমতন, শুধু তাঁর মনের জোরের চিহ্ন রয়েছে তাঁর দুটি উজ্জ্বল চোখে। এই অসুখ হলে ভালো ভাবে খাওয়াদাওয়া করতে হয়, কিন্তু মানিকদা মুড়ি তেলেভাজা খেয়ে পেট ভরান। দুধ উনি স্পর্শ করেন না, ডিমে অ্যালার্জি, কেউ বেশি করে মাছ মাংস খাবার পরামর্শ দিলে হেসে বলেন, পয়সা কোথায়? বাড়িতে মাংস রান্নার গন্ধ পেলেই বাড়িওয়ালা এসে কাঁক করে চেপে ধরবে। পাঁচ মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি!

একসময় আবিদ আলি এ ঘরে ঢুকে বললেন, ও মানিকবাবু, আপনাদের পেছনে ফেউ লেগেছে, টের পেয়েছেন?

আবিদ আলি সাধারণত ফেরেন অনেক রাতে, তাঁর সঙ্গে স্টাডি সার্কেলের সদস্যদের দেখাই হয় না। শনি রবিবার উনি চলে যান কাকদ্বীপ।

মানিকদা চোখ নাচিয়ে বললেন, আমরা যদি বাঘ হই, তাহলে পেছনে তো ফেউ লাগবেই, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই!

আবিদ আলি ওদের পাশে বসে পড়ে বললেন, না মশাই, ঠাট্টা নয়। গত সপ্তাহে একজন। লোক এসে জিজ্ঞেস করে গেল, আপনারা কারা, কেন এখানে আসেন এইসব হ্যাঁনো ত্যানো। মনে হলো, সাদা পোষাকের পুলিশ।

কৌশিক বললো, একটা স্পাই এখানে ঘুর ঘুর করে, আমি অনেকদিন দেখেছি।

মানিকদা বললেন, ঘুরুক না পাই, তাতে ক্ষতি কী আছে? আমরা তো গোপনে কিছু করছি। আমাদের পার্টি কি ব্যান্ড নাকি?

আবিদ আলি বললেন, সে লোকটা এমন ইঙ্গিত দিল, যেন এখানে গোপনে গোপনে বোমা বানানো হয়।

এই তো ফাঁকা ঘর, একটা সতরঞ্চি আর কিছু কাগজপত্তর ছাড়া আর কিছুই নেই, ভেতরে এনে দেখিয়ে দিলেই পারতেন!

আরও শুনুন না, কাল রাত এগারোটার সময় এক দঙ্গল ছেলে এসে বললো, তাদের এই ঘরটা ভাড়া দিতে হবে। আমি যত বলি যে আমার এ ঘর ভাড়া দেবার কোনো কোশ্চেনই ওঠে না, তারা শুনবে না। কংগ্রেসের ছেলে মনে হলো, তারা এখানে পার্টি অফিস করতে চায়।

আপনি বললেন না কেন, আপনি অলরেডি এই ঘর আমাদের ভাড়া দিয়েছেন?

ওরা জানলো কী করে মশাই যে আপনাদের আমি ভাড়ার রসিদ দিই না? রসিদ দেবোই বা কী করে, সাবলেট করা তো বেআইনী! ওরা বললো, ওদেরও রসিদ লাগবে না, ওরা দেড়শো টাকা ভাড়া দেবে!

এই একখানা ছোট ঘরের জন্য দেড়শো টাকা দেবে?

হ্যাঁ, আপনারা যে চল্লিশ টাকা দেন, তা ওরা জানে। আপনাদের দলের মধ্যে নিশ্চয়ই ওদের কোনো স্পাই আছে।

এসব জানা এমন কিছু কঠিন নয়। আমরাই কেউ কথায় কথায় অন্য লোকদের হয়তো কখনো বলেছি।

পমপম বললো, মানিকদা, অনুপমের খুড়তুতো ভাইটা কংগ্রেসী করে। বেশ পাণ্ডা গোছের। অনুপম নিশ্চয়ই ওকে বলে ফেলেছে।

বলাটা অন্যায় কিছু নয়। কত টাকা ঘর ভাড়া দিই, সেটা কি একটা সিক্রেট নাকি? আমাকেও কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দিতুম। তা হলে আবিদ আলি সাহেব, চল্লিশ টাকার বদলে দেড়শো টাকার অফার পেয়ে আমাদের কী তাড়াবেন ঠিক করেছেন?

আরে ছি ছি, আপনি একথা বললেন মানিকবাবু? আমি কি টাকার লোভে আপনাদের এই ঘরটা ব্যবহার করতে দিয়েছি? আমার ছোটখাটো ব্যবসা, আপনাদের দোয়ায় কোনোরকমে. চলে যায়। কিন্তু আপনারা তো কেউ এই পাড়ায় থাকেন না, পাড়ার ছেলেরা যদি এসে হামলা করে...

ভয় পাবেন না, ঐ ছেলেদের বলবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

ভয় আমি পাই না। কাল অত রাতে এমন হল্লা করতে শুরু করলো, আশেপাশের ঘর থেকে ভিড় জমে গেল, ওরা আমায় চোখ রাঙাচ্ছিল, কেউ প্রতিবাদ করলো না। একটা ব্যাপার বুঝে দেখুন, আমি মাইনরিটি কমুইনিটির লোক, রুলিং পার্টিকে চটিয়ে আমি ফ্যাসাদে পড়তে চাই না। এখানে আমার ওপর জুলুম হলেও কেউ সাহায্য করতে আসবে না। এই যদি কাকদ্বীপ হতো, সেখানে যদি এরকম কোনো দল এসে আমার মুখের ওপর তড়পাতো, ইনসাল্লা, আমি তাদের পেছনে লাথি মেরে যদি ভূত না ভাগাতুম তো কী বলেছি?

আবিদ আলির চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে মানিকদা নীরস গলায় বললেন, তাহলে আপনি কী বলতে চান? আমরা আর এখানে আসবো না।

আবিদ আলি গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আমি বলি কী, কিছুদিন আপনারা ক্লাস বন্ধ রাখুন, শিগগিরই ইলেকশান হবে শোনা যাচ্ছে, সেসব ঝঞ্ঝাট চুকে যাক, তারপর আবার দেখা যাবে।

মানিকদা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ইলেকশানের সঙ্গে আমাদের ক্লাস বন্ধ রাখার কী সম্পর্ক আছে! আমরা একটা জরুরি ডিসিশান নিচ্ছি, আমরা স্টাডি সার্কেলের একটা মুখপত্র ছাপিয়ে বার করবো এখান থেকে।

আবিদ আলিও এবার কড়া সুরে বললেন, ইলেকশানের কথা শুনে পাত্তা দিলেন না, তবু প্রত্যেকবার আপনাদের পার্টি এত ক্যাণ্ডিডেট দাঁড় করায় কেন? কংগ্রেসীদের তো কোনোদিন পাওয়ার থেকে সরাতে পারবেন না, শুধু অ্যাসেম্বলিতে অপোজিশান পার্টি হয়ে গলা ফাটাবেন! এই তো আপনাদের বিপ্লব! না মশাই, আমার এই অ্যাড্রেস থেকে আপনাদের কোনো পত্রিকা-ফত্রিকা বার করা চলবে না। পুলিশ ওদের হাতে, এরপর পুলিশ এসে হুজ্জোত করবে!

আবিদ আলির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্ক হলো। বোঝা গেল, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তাঁর ফ্ল্যাটে আর স্টাডি সার্কেল চালাতে দিতে চান না। মানিকদাও অনড়, স্টাডি সার্কেল তিনি কিছুতেই বন্ধ রাখবেন না, তিনি এক মাসের নোটিস চান, তার মধ্যে অন্য একটা জায়গা ঠিক করে তারপর এই ঘর ছাড়া হবে।

ওরা সবাই নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়ালো, মানিকদা একটা বিড়ি ধরিয়ে দুঃখিত ভাবে বললেন, আবিদ আলি কী রকম বদলে গেছে দেখলি? আগে ও আমাদের সাপোর্টার ছিল, এখন খুব টাকা পয়সা চিনেছে, আজ আমি ওর মুখে মদের গন্ধ পেলাম

কৌশিক বললো, মাইনরিটি কমুইনিটি বলে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এদিককার দোকানদারদের মধ্যে তো মুসলমান কম নেই। মানিকদা, এই ফ্রন্টে আমাদের বিশেষ কাজ করা হয়নি, এরা সবাই কংগ্রেসের সাপোর্টার...

রাত দশটা বেজে গেলেও রাস্তার লোক চলাচল খুব কম নেই। এটা বাজার এলাকা, কাছেই বেশ্যাপল্লী, খান্না সিনেমায় এখনো চলছে নাইট শো। অতীনদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তাদের বাড়ি ফেরার তাড়া নেই।

দুটি ছেলে রাস্তা পার হয়ে এসে ওদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। দু'জনেরই পরণে চোঙা প্যান্ট ও রঙীন গেঞ্জি। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। শুক ও সারীর গানের ভঙ্গির মতন এরা শুরু করলো কথাবার্তা।

এই চীনের দালালগুলোকে দেখছিস? সিক্সটি টু-তে যুদ্ধের সময় এরা বলেছিল ইন্ডিয়াই প্রথম চীনকে অ্যাটাক করেছে!

আর সিক্সটি ফাঁইভের যুদ্ধের সময় এরা কী বলেছিল?

তখনও বলেছিল ইন্ডিয়াই প্রথম অ্যাটাক করেছে। এরা সব সময় ইন্ডিয়ার দোষ দেখে।

এরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কী বলেছিল?

কুইসলিং! কুইসলিং! এ বাঞ্চোৎদের বাপ আগে ছিল রাশিয়া, এখন বাপ বদলেছে। এখন মাও সে তুং-কে বাবা মেনেছে!

তাহলে এরা এদের বাপের দেশে চলে যায় না কেন? ভুজি এঁড়ের মতন এখানে ল্যাজ তুলে লাফালাফি করে কেন?

পমপম হঠাৎ ওদের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললো, অ্যাই, আমার গায়ে হাত দিয়েছো কেন? রাসকেল, ইডিয়েট!

একটি ছেলে পমপমের থুতনি ধরে বললো, খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দম, তোমার ঐ ছিরিঅঙ্গে কে হাত বোলাবে, মান্তু? চৌরঙ্গিতে চাঁদা তোলো গে যাও!

অতীন আর কৌশিক এ ছেলেদুটির এরকম অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে বারবার মানিকদার দিকে তাকাচ্ছিল, কী ভাবে ওদের কথার প্রতিবাদ জানানো হবে তার একটা নির্দেশ চাইছিল। কিন্তু পমপমের গায়ে ওদের হাত দিতে অতীনরা দেখেনি, পমপমই ইচ্ছে করে ওদের কাছ ঘেঁষে এসেছে।

এবার পমপম আরও গলা চড়িয়ে রাস্তার লোকদের শোনাবার জন্য বললো, মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছো, তোমাদের বাড়িতে মা-বোন নেই?

কৌশিক বললো, পমপম, তুমি সরে এসো!

অন্য পক্ষের একটি ছেলে বললো, ঢলানী মাগী, আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, তার মধ্যে তুই মাথা গলাতে এসেছিস কেন রে? এটা পাবলিকের রাস্তা! যা, আশুতোষ অয়েল মিলে লাইন দিগে যা!

অতীন ছুটে গিয়ে সে ছেলেটির কলার চেপে ধরে চোয়ালে এক ঘুষি কষালো, তারপর দু'জনেই জড়ামড়ি করে পড়ে গেল রাস্তার ওপর।

অন্য ছেলেটি অমনি পেছন ফিরে চিৎকার করতে লাগলো, এই অজিত, হেবো, পঞ্চুদা...

কৌশিক দেখলো রাস্তার উল্টো দিকে, কোনাকুনি একটা বড় দল দাঁড়িয়ে আছে, তারা দৌড়োবার জন্য ঝুঁকেছে।

সামনেই একটা ট্যাক্সি, কৌশিক ঝট করে তার দরজা খুলে মানিকদাকে টানতে টানতে নিয়ে বললো, শিগগির উঠে পড়ুন, পল্পম চলে আয়...

ফিরে গিয়ে সে অতীনকে ছাড়াতে যেতেই অন্য ছেলেটির হাতে প্রচণ্ড এক ঘুষি খেল, ছিটকে গেল তার চশমা। তবু ওপারের দলটি এসে পৌঁছোবার আগেই তাদের ট্যাক্সিটা স্টার্ট নিল, দম্ দম্ করে কয়েকটা ইঁট এসে পড়লো ট্যাক্সির গায়ে, পেছন দিকে একটা বোমা ফাটলো।

মানিকদা থরথর করে কাঁপছেন, ভয়ে নয়, উত্তেজনায়, তাঁর দুর্বল শরীর এই আবেগ সামলাতে পারছে না, শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। অতীন তার বাঁ কাঁধটা চেপে ধরে বললো, হারামীর বাচ্চাটা আমায় কামড়ে ধরেছিল। জানোয়ার!

কৌশিক প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললো, অতীন, তুই ইডিয়টের মতন মাথা গরম করতে গেলি, ওরা তৈরি হয়ে এসেছিল, আমাদের ছাতু করে দিত!

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি বললো, ঐসব গুণ্ডাদের সঙ্গে আপনারা লাগতে গিয়েছিলেন কেন? সঙ্গে। মেয়েছেলে রয়েছে, ভদ্দরলোকেরা কি ওদের সঙ্গে পারে?

অতীন বললো, ওরা পম্‌পমকে... তখনও আমরা কিছু বলবো না?

পম্‌পম কঠিন গলায় বললো, আমার জন্য কারুর সাহায্যের দরকার ছিল না, আমি নিজেই নিজেকে ডিফেণ্ড করতে পারি। আমি চেঁচিয়ে তোক জড়ো করে ওদের মার খাওয়াতুম!

কৌশিক বললো, এত রাতে... ওরা বোমা চার্জ করলে কেউ কাছে আসতো না।

অতীন বললো, আমরা এর বদলা নেবো, আমরা ছাড়বো না!

অতীন, তোকে চিনে রেখেছে, তুই এ পাড়ার দিকে চট করে আসিস না।

ট্যাক্সিটা আগে পৌঁছোতে গেল পমপমকে। তখনই কৌশিক পমপমের বাবাকে পুরো ঘটনাটা জানাতে চায়। কিন্তু মানিকদা রাজি হলেন না। কয়েকদিন আগে অশোক সেনগুপ্তর সঙ্গে প্রবল তর্কাতর্কির পর মানিকদার সঙ্গে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে আছে।

মানিকদা আগে থাকতেন তাঁর দাদার সংসারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে দাদার সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন এক বন্ধুর বাড়িতে। সেই বন্ধুটিও ইদানীং বেকার। শ্যামপুকুরের সেই বাড়িটাতে মানিকদাকে পৌঁছে দিতে এসে সেখানেও

কিছুক্ষণ আলোচনা হলো এই ঘটনা নিয়ে। মানিকদার বন্ধু সুবিমলদা অতীনদের খুব ধমকালেন। কংগ্রেসের ঐ সব লুমপেন ক্যাডারদের সঙ্গে কনফ্রনটেশানে যাওয়া ওদের মোটেই উচিত হয়নি। ওরা তো ইচ্ছে করেই প্রভোক করতে এসেছিল। ইলেকশানের আগে ওরা বামপন্থীদের মারবে, জেলে ভরে দেবার চেষ্টা করবেই। মানিকদার দুর্বল শরীর, তাঁর গায়ে যদি হঠাৎ আঘাত লাগতো? এখন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে, ইলেকশান পর্যন্ত ওদের এড়িয়ে চলা।

মানিকদা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এখনো কথা বলতে পারছেন না, খাটে শুয়ে পড়লেন।

অতীন সুবিমলদাকে বললো, আমি আপনাদের ওসব স্ট্র্যাটেজি বুঝি না। আমায় কেউ

অপমান করতে এলে, মারতে এলে আমি ছাড়বো না। তাতে যা হয় হোক!

মানিকদাকে পৌঁছোনোর পর ওদের কাছে আর ট্যাক্সি ভাড়া নেই। এখনো ট্রাম চলছে। শ্যামপুকুরের মোড়ে, টাউন স্কুলের কাছে কয়েকজন যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অতীনের শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। ওরাই এখানে চলে আসে নি তো?

কৌশিক বললো, কোনোদিকে তাকাবি না, সোজা রাস্তাটা পার হয়ে যা!

মিনিট দশেক অধীরভাবে অপেক্ষা করবার পর যে ট্রামটা এলো, সেটাই শেষ ট্রাম, সামনে। বোর্ড ঝুলছে। সিনেমা-ভাঙা ভিড়ে ভর্তি হয়ে গেল সেটা।

এসপ্লানেডে নেমে পড়ার পর আর কোনো ট্রাম নেই। বাস আসবে কি না বলা শক্ত। এ পাড়ার ইংরিজি সিনেমাগুলো আগে আগে শেষ হয়ে যায়। রাস্তা ফাঁকা। রাস্তার রং যে কত কালো, তা রাত্তিরবেলা, দু'ধারে আলো-জ্বলা শূন্য পথ দেখলে বোঝা যায়। অসহ্য গুমোট গরমের রাত।

অতীন বললো, চল, হাঁটি! তোর চশমাটা গেছে, আর কোনো জায়গায় বেশি লেগেছে?

নাঃ! চশমাটা কুড়িয়ে নেবার সময় পেলুম না, তখন খুঁজতে গেলে... তোকে কামড়ে ধরেছিল!

হ্যাঁ, আমার কাঁধটা কামড়ে ও হাত দুটোকে ফ্রি করে নিজের কোমরে ঢোকাতে যাচ্ছিল, বোধহয় ছুরিটুরি বার করতো। হ্যাঁ রে, মানুষের দাঁতে বিষ আছে? টিটেনাস হতে পারে?

কী জানি! তোর খুব টিটেনাসের ভয়। দ্যাখ, সুবিমলদা ঠিকই বলেছে, ওদের দেখেই আমাদের চলে যাওয়া উচিত ছিল।

ওরা ঐ সব খারাপ কথা বলবে আর আমরা ল্যাজ গুটিয়ে পালাবো?। আমরা কি ছুরি-ছোরা চালাতে জানি, না যুযুৎসু জানি! আমরা শিখেছি শুধু বই মুখস্থ করে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে। যা প্র্যাকটিক্যালি কোনো কাজে লাগে না। আমাদেরও আগে তৈরি হতে হবে, আর্মস ব্যবহার করার ট্রেনিং নিতে হবে। তোর কি ও জায়গাটায় খুব ব্যথা করছে, অতীন?

না, ব্যথা বিশেষ নেই, কিন্তু এখনো রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। এই, বাস, বাস!

একটা খালি একতলা সরকারি বাস মৃগী-রুগীর মতন কাঁপতে কাঁপতে এবং বিকট ঝকার ঝকার শব্দ করতে করতে আসছে, ওরা মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে, হাত উঁচু করে বাসটা থামান্সে। সেটা যাচ্ছে গ্যারাজে, ভেতরে তিন চারজন কন্ডাকটর বসে ঢুলছে, ওদের তুলে নিতে আপত্তি করলো না।

পরীক্ষার পর এখন অতীন প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফেরে। তার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে, ছেলে বাড়ি ফেরার পর মমতা সেগুলো গরম করে দেন। যেদিন বাবা-মা ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েন, সেদিনও অতীন টের পায় যে কোনো এক সময় মা এসে দেখে যান, ছেলে ফিরেছে কি না।

ক'দিন ধরে মমতার শরীর ভালো যাচ্ছে না, খুব কাশি আর জ্বর। অতীন প্রায় নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করলো। পা টিপে টিপে গেল খাবার ঘরে। মাকে সে আজ জাগাতে চায় না। যত বেশিক্ষণই সে বাইরে কাটাক, বাড়িতে ফেরা মাত্র যেন খিদেটা পেটের মধ্যে তাণ্ডব নাচ শুরু করে দেয়।

আজ মাছ রান্না হয়নি, ভাত, ডাল, ঝিঙে-পোস্ত আর ডিমের ঝোল। ঝোলটার মধ্যে একটা আঙুল ডুবিয়ে তারপর সেটা সে মুখে ঠেকিয়েই স্বাদ নিয়ে বুঝলো, এটা মায়ের রান্না নয়, ফুলদি বেঁধেছে। তাহলে আজ বোধহয় বেশি শরীর খারাপ হয়েছে মায়ের।

আজ যদি ঐ গুণ্ডাটা তার পেটে একটা ছুরি বসিয়ে দিত, তাহলে মাঝরাত্তিরে কিংবা ভোরবেলা কেউ এসে এবাড়িতে খবর দিত, অতীন মজুমদার মারা গেছে। তখন মা কী করতেন?

যারা পলিটিক্যাল ওয়াকার, যারা কোনো আদর্শের জন্য লড়াই করতে যায়, তাদের সকলেরই তো মা বাবা আছে! একটা সমাজ ব্যবস্থা পাল্টাবার জন্য মৃত্যুর ঝুঁকি তো নিতেই হবে। কিন্তু অন্য কোনো পরিবারে তো তার দাদার মতন একটা ছেলে হঠাৎ মরে যায়নি! দাদা চলে গিয়ে তাকে কী বিপদেই না ফেলে গেছে!

ঝিঙে-পোস্তটা ভালো হয়েছে বেশ। সবটা ভাত শেষ করার পরও অতীনের খিদে মিটলো না। খানিকটা ডিমের ঝোল আর একটা আলু রয়ে গেছে, আর একটু ভাত পেলে বেশ হতো! আরও ভাত কোথাও ঢাকা দিয়ে রাখা আছে কিনা দেখার জন্য অতীন উঠতে যেতেই চোখে পড়লো, একপাশে একটা ছোট বাটি, তার ওপর একটা কাঁচের প্লেট চাপা দেওয়া।

প্লেটটা তুলে দেখলো, তার মধ্যে খানিকটা পায়েস! এই গরমকালে পায়েস রান্না হয়েছে কেন, আজ কারুর জন্মদিন নাকি?

অতীন প্রথমেই নিজের জন্মতারিখটা মনে করলো। না, তার নয়। মায়েরও হতে পারে না, বাবার জন্মদিনটা যেন কবে? ফুলদি কিংবা মুন্নি, এদের মধ্যে একজনেরই হওয়া স্বাভাবিক!

তারপরেই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। ১৬ই জুন, আজ তো তার দাদা পিকলুর জন্মদিন! কতদিন হয়ে গেল সে নেই, তবু এখনও মমতা প্রত্যেক বছর পিকলুর জন্ম তারিখে পায়েস রাঁধেন। দাদা পায়েস খেতে ভালোবাসতো! দাদা বেঁচে থাকতে কি তার প্রত্যেক জন্মদিনে পায়েস রান্না হতো? বোধহয় না। অতীন এখন বুঝতে পারে, সেইসময় তারা খুব গরিব হয়ে পড়েছিল, পিসিমারা বরানগরের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন, দেওঘরে নিয়মিত টাকা পাঠাতে হতো বাবাকে... একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে অতীন শুনতে পেয়েছিল, গয়না বিক্রি নিয়ে বাবা ও মায়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি...

পায়েস খেতে খেতে অতীন যেন তার দাদাকে চোখের সামনে দেখতে পেল। পরিষ্কার ছবি, একটুও মলিন হয়নি, ফর্সা, গেঞ্জি পরা পিকলু, হাতে একটা বই... দাদা কবিতা লিখতো না? সে কবিতাগুলো গেল কোথায়? কালকেই অতীন দাদার পুরোনো খাতাপত্র খুঁজে দেখবে।

আঁচাতে গিয়ে তার চোখে পড়লো, তুতুল-মুন্নিদের ঘরের দরজা বন্ধ থাকলেও তলা দিয়ে আলোর রেখা আসছে। তুতুল অনেক রাত জেগে পড়ে। পাশ করে ডাক্তার হয়ে গেছে তুতুল, এখনো তার পড়ার নেশা যায়নি।

অতীন আবার ঘাড়ে হাত বোলালো। শুয়োরের বাচ্চাটা অনেকখানি দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। কৌশিক ঠিকই বলেছে, তার টিটেনাস-ভীতি আছে, হঠাৎ নাকি ব্যথার চোটে শরীরটা ধনুকের মতন বেঁকে যায়।

দরজাটা আস্তে ঠেলতেই খুলে গেল। এই ঘরের কিছু বদল হয়েছে, অতীন এর মধ্যে এই ঘরে আসেনি। আগে পাশাপাশি খাট ছিল, এখন দুটি খাট ঘরের দু'দিকের দেয়ালে,

মাঝখানে একটা টেবিল, দেয়ালে বিদ্যাসাগরের ছবিটার দু'পাশে রবীন্দ্রনাথ ও লুই পাস্তুরের দু'খানা ছবি।

দরজার দিকে পেছন ফিরে টেল ল্যাম্পের আলোয় বসে পড়ছে তুতুল। অতীন খুব মৃদু গলায় ডাকলো, ফুলদি!

তুতুল মুখ ফেরাতেই অতীন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। সে মুন্নির ঘুম ভাঙাতে চায়,। মুন্নি দেয়ালের দিকে ফিরে পাশ বালিশ জড়িয়ে আছে।

তুতুল উঠে আসতেই অতীন চলে এলো নিজের ঘরের দিকে। ভেতরে এসে সে জিজ্ঞেস করলো, ফুলদি একটা কথা, কোনো মানুষ যদি অন্য একজন মানুষকে কামড়ে দেয়, তাহলে কি টিটেনাস কিংবা সেপটিক হতে পারে?

অতীনের মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে, সামান্য হেসে তুতুল বললো, তুই নরখাদকদের দেশে গিয়েছিলি বুঝি? কোথায় কামড়েছে, দেখি?

অতীন লুকোবার চেষ্টা করলো না, জামার কলারটা ধরে কাঁধ পর্যন্ত খুলে ফেললো। এখন যেন তার বেশি জ্বালা করছে।

তুতুল সে জায়গাটা পরীক্ষা করতে করতে জিজ্ঞেস করলো, কোনো মেয়ে, না ছেলে? জামা ভেদ করে মাংসতে দাঁত বসে গেছে। কোনো মেয়ে যদি এরকম ভাবে কামড়ে দিয়ে থাকে, তাহলে আমি তোর চিকিৎসা করবো না। নিশ্চয়ই তুই কিছু বাঁদরামি করতে গিয়েছিলি!

মেয়েও না, ছেলেও না। রাস্তার একটা গুণ্ডা।

আজকাল বুঝি রাস্তার গুণ্ডাদের সঙ্গে কোলাকুলি করা হচ্ছে? একবার বাইরে থেকে ফিরে এলি ফোলা পা নিয়ে, আজ আবার এত রাত্রে...

আমাদের পার্টির ছেলেমেয়েদের ওপর ওরা হামলা করতে এসেছিল, আমাদের কোনো দোষ ছিল না, আমিও একটাকে দিয়েছি খুব ভোলাই–

রাস্তার গুণ্ডারা মানুষকে কামড়ে দেয়, এমন তো কখনো শুনিনি। গুণ্ডা না ক্যানিবাল? দাঁড়া, আমার ঘর থেকে অ্যান্টিসেপটিক লোশন নিয়ে আসি।

ফুলদি, মা যেন কিছু জানতে না পারে।

তুতুল একটু পরেই তুলল আর ওষুধ নিয়ে ফিরে এলো। স্পিরিট ভেজানো তুলোয় আগে জায়গাটা ঘষে নিল ভালো করে। তারপর ওষুধ লাগাতে লাগাতে বললো, তুলোর সঙ্গে কতখানি ময়লা উঠে এলো দ্যাখ। আজকাল ভালো করে চানও করিস না বুঝি?

আরে লাগছে, লাগছে, লাগিয়ে দিচ্ছো তুমি–

চুপ করে বসে থাক, বাচ্চাদের মতন ছটফট করলে মার লাগাবো। সামান্য একটু জ্বালা করবে।

ফুলদি, তুমি বিলেত যাচ্ছো?

তুতুলের হাতটা কেঁপে গেল। সে থেমে গিয়ে বিবর্ণ মুখে বললো, যাঃ, কী আজেবাজে কথা বলছিস বাবলু? তোকে এসব কে বললো?

আমি জানি। কালকেও তো লেটার বক্সে তোমার নামে একটা ইংল্যাণ্ডের স্ট্যাম্প মারা চিঠি ছিল।

ওদেশে আমার বন্ধু থাকতে পারে না? কেউ যদি চিঠি লেখে...

কৌশিকের দাদা অনীশদা, মেডিক্যাল কলেজে পড়ান, তুমি চেনো তো, উনি বলছিলেন, তুমি স্কলারশিপ পেতে পারো।

বাজে কথা! একদম বাজে কথা।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররা একটু ভালো রেজাল্ট করলেই বিলেত-আমেরিকায় যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে থাকে। ঐ সব ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলোও এদের পাউণ্ড-ডলারের ঝুমঝুমি বাজিয়ে ডাকে। ওদের তো সুবিধে, আমাদের মতন গরিব দেশের সরকারি টাকায় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হবে, ওরা তাদের ইউজ করবে।

তোদের এম-এস-সি পাশ করা ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝি বিদেশে যায় না?

আমি তাদের মানুষ বলে গণ্য করি না। ফুলদি, তুমিও যে এদেশ ছেড়ে পালাতে চাইবে, তা আমি কল্পনাই করি নি।

তুই ভুল শুনেছিস, বাবলু। আমার যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই, আমি কোনো স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই-ও করিনি। আমি মাকে ছেড়ে, তোদের ছেড়ে কোথায় যাবো? এসব কথা মার সামনে কক্ষণো উচ্চারণ করবি না, বাবলু! কথা দে, তুই কিছু বলবি না, প্রমিস কর

সত্যি যাবে না? ঠিক আছে, আই প্রমিজ...

মানুষের দাঁতে হয়তো কোনো বিষ নেই। তুতুলের চিকিৎসার জন্যই হোক বা যে-জন্যই হোক পরদিন অতীনের কাঁধে কোনো ঘা হলো না, ব্যথাও হলো না। সকালবেলাই সে কৌশিককে নিয়ে মানিকদাকে দেখতে গেল।

মানিকদা বিছানায় শুয়ে আছেন, অনবরত কাশছেন। কথা বলতে গেলে বেশি কাশি হচ্ছে। সুবিমলদা বললেন, এটা অ্যালার্জির কাশি। প্লুরিসির পর ভালো মতন বিশ্রাম হয়নি, পুষ্টিকর খাবার খায়নি, এরকম চললে মানিকদার শরীর একেবারেই ভেঙে যাবে। ওর এখন উচিত ৬২৬

কিছুদিনের জন্য কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে থাকা। পার্টি সংগঠন করতে গেলে শরীর মজবুত রাখা সবচেয়ে বেশি দরকার।

মানিকদার এক মামার বাড়ি জলপাইগুড়ি। সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকা যেতে পারে। কিন্তু এই অবস্থায় মানিকদাকে একা পাঠানো যায় না। কৌশিক আর অতীন দু'জনেরই পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি, তারা মানিকদার সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল। ট্রেন ভাড়া জোগাড় করাও অবশ্য একটা সমস্যা, মানিকদার কাছেও টাকা নেই, সুবিমলদার হাতেও এখন কিছু নেই। অতীন নিজের যাওয়া আসার ভাড়া কোনোক্রমে জোগাড় করতে পারবে, কৌশিকদের অবস্থা একটু ভালো, ওদের স্টাডি সার্কেলের আর একজন সদস্য অনুপম ইচ্ছে করলে সবার টাকা দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তার বদলে স্টাডি সার্কেলের সব সদস্য-সদস্যাদের কাছ থেকে কিছুকিছু চাঁদা তোলাই ঠিক হলো। স্টাডি সার্কেল অবশ্য বন্ধ থাকবে না, আপাতত সুবিমলদার ঘরেই চলবে।

সুবিমলদা বললেন যে, জলপাইগুড়ির পার্টি ওয়াকাররাও মানিকদাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। ওখানকার ডিস্ট্রিক্ট কমিটির একজন মেম্বারের সঙ্গে সুবিমলদার ভালো পরিচয় ছিল একসময়। খুব ভালো সংগঠক। জেলা কমিটির সেই সদস্যটির নাম চারু মজুমদার।

৫০ জানলায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে

জানলায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বিমানবিহারী বললেন, তোমরা একটা টকটক গন্ধ পাচ্ছো না? আমি পাচ্ছি। কী দারুণ কথা লিখে গেছেন সুকুমার রায় মশাই, "শুনেছো কী বলে গেল। সীতানাথ বন্দ্যোঃ/আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ!" সত্যি, এখন আকাশের দিকে তাকালেই এই টকটক গন্ধটা পাওয়া যায়।

পরেশ গুহ রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বললেন, এক্সেলেন্ট! এই টকটক গন্ধটা কী রকম জানো? মনে করো আজকের রান্না ডাল কালকে খাবে বলে রেখে দিলে, কিন্তু সেটা পচে গেল, সেই ডালে যেমন টকটক গন্ধ হয়।

প্রতাপ একটু হেসে বললেন, আপনার উপমাটা বোধহয় সঠিক হলো না মিঃ গুহ। পচা ডালের টক গন্ধ খুব খারাপ নয়। আমাদের দেশে ডাল পচে গেলেও সেটাকে জ্বাল দিয়ে ঘন করে একেবারে শুকিয়ে খাওয়া হতো, মন্দ লাগতো না।

বিমানবিহারী বললেন, আমার তো ঘামে ভেজা মানুষের গায়ের টকটক গন্ধটাই মনে পড়ে। আমার গায়ে এখন যেমন হয়েছে, পাখার হাওয়াতে ঘামছি।

পরেশ গুহ বললেন, সত্যি আর পারা যাচ্ছে না। এত গরম বহুকাল পড়েনি। ক্লাউড বাস্ট করিয়ে বৃষ্টি নামাবার টেকনোলজি কতদিনে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, মানুষ এখন চাঁদে যেতে চলেছে–আর আমাদের এখানে উড়িষ্যায় বৃষ্টির জন্য যাগযজ্ঞ হচ্ছে।

বিমানবিহারী বললেন, উড়িষ্যার অবস্থা খুব খারাপ, ভয়াবহ খরা, মানুষ না খেয়ে মরছে।

প্রতাপ বললেন, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের অবস্থাই বা কী ভালো? গত বছরের চেয়ে আরও বেশি ফুড শর্টেজ।

কয়েকদিন ধরে দিনে ও রাতে সমান গরম চলছে। সাধারণত বিকেলের দিকে বঙ্গোপসাগর থেকে যে উদাত্ত হাওয়া আসে, সেটাও বন্ধ। এইরকম গুমোট গরমে কলকাতা শহরটা বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। যে-কোনো আড্ডাতেই এখন উত্তাপ প্রসঙ্গ।

বিমানবিহারী আবার জানলা দিয়ে আকাশ দেখে বললেন, জুনের মাঝামাঝি হয়ে গেল, এই সময় তো মনসুন এসে পড়ার কথা। সমুদ্রের মেঘেরা কী এবারে এদিকের রাস্তা ভুলে গেল?

পরেশ গুহ বললেন, উড়িষ্যার সম্বলপুরে যজ্ঞ করার পরেই নাকি খানিকটা বৃষ্টি হয়েছে। এক বাংলা কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা তো তাই লিখেছে। আসুন এখানেও আমরা

একটা যজ্ঞটজ্ঞ শুরু করে দিই। ঋক বেদে মেঘের এক দেবতা আছে, তার নাম পর্জন্য। সেই পর্জন্যের নামে একটি শ্লোক হচ্ছে এইরকম :
“পর্জন্যায় প্রগায়ত পুত্রায়মীড় পৃষে
স নো যবসমিচ্ছতু।”

প্রতাপ বিস্মিতভাবে পরেশ গুহর দিকে তাকালেন। ইনি ইংরেজির অধ্যাপক, অক্সফোর্ডে পড়েছেন, এর মুখে হঠাৎ এরকম সংস্কৃত শুনবেন আশা করেননি। তিনি বললেন, বাঃ, আপনার সংস্কৃত উচ্চারণ বেশ ভালো তো।

পরেশ গুহ বললেন, আমাদের কালে তো সংস্কৃত কমপালসারি ছিল, আমি বি এ পর্যন্ত সংস্কৃত পড়েছি। আপনারা পড়েননি?

প্রতাপ বললেন, ইস্কুলে পড়েছি একটু-আধটু, সে সব ভুলে গেছি। আপনি যে শ্লোকটা বললেন, তার মানে কী?

এর মানে হলো...”অন্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জন্যদেবের উদ্দেশ্যে স্তোত্র উচ্চারণ করো। তিনি আমাদের অন্য ইচ্ছা করুন।” এই পর্জন্যদেব বৃষ্টিপাতে শুধু ফসলই ফলান না, আর একটা শ্লোকে আছে, “যো গর্ভ...অর্থাৎ যে পর্জন্যদেব ওষধিসমূহের, গো-সমূত্রে, অশ্বসমূহের ও নারীগণের গর্ভ উৎপাদন করেন ...”

বিমানবিহারী বললেন, পরেশ, তুই কায়স্থর ছেলে হয়ে খুব বেদ আউড়ে যাচ্ছিস তো! আমরা সংস্কৃত জানি না, তুই ভুলটুল বললেও ধরতে পারবো না।

পরেশ গুহ বললেন, আমি মাঝে মাঝে বেদের অনুবাদ পড়ি, সত্যিকারের কাব্য আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই কী বলেছিলেন জানিস, বেদ হচ্ছে পলগ্রেভ সাহেবের গোল্ডেন ট্রেজারির মতন একখানা কবিতার সংকলন, ধর্মগ্রন্থ-ট্রন্থ কিছু না। আর বামুন কায়েতের কথা বলছিস? বেদ-এর প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেছিল জানিস, সেও এক কায়স্থ,

রমেশ দত্ত নামে এক সিভিলিয়ান। ঐ রমেশ দত্তর ফ্যামিলির সঙ্গে আমাদের খানিকটা আত্মীয়তা আছে।

বিমানবিহারী বললেন, আমরা ছাত্র বয়েসে শুনেছিলুম, ডঃ শহীদুল্লা, যিনি ইস্ট পাকিস্তানের একজন নামকরা স্কলার, এক সময় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন, মুসলমান বলে তাকে বেদ পড়তে দেওয়া হয়নি।

-ওসব হলো ভাই তোমাদের হিন্দু অথোডক্সির হিপোক্রিসি। বাড়িতে সংস্কৃত শিখে যে খুশী পড়তে পারে। সৈয়দ মুজতবা আলী নামে একজন বাংলার রাইটার আছেন না, রেডিও স্টেশানে বড় চাকরি করেন, একবার রেডিওতে একটা টক দিতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল,খুব গপ্পে মানুষটি, উনি আমায় বলেছিলেন, উনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছেলে বিনয়তোষ ভট্টাচার্যির বাড়িতে গিয়ে টানা সাত-আট বছর বেদ পাঠ নিয়েছেন।

বিমানবিহারী বললেন, মুজতবা আলী আমার খুব ফেবারিট রাইটার। উনি ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েও টিকতে পারেননি, এদেশেই আবার চলে এসেছিলেন। এখন বোধহয় শান্তিনিকেতনে থাকেন। একদিন ডাকবো আমার বাড়িতে।

গরম, সুকুমার রায়, বেদ, ইস্ট পাকিস্তান, মুজতবা আলীর গদ্য, চালের চোলাচালান এইরকম এক প্রসঙ্গ থেকে দ্রুত অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় আড্ডা। পরেশ গুহই প্রধান বক্তা, অধ্যাপকরা বোধহয় চুপ করে থাকতে পারেন না। প্রতাপ প্রায় নীরব শ্রোতা, কারণ হাকিমদের লম্বা লম্বা উঁকিলী বক্তৃতা শুনতে শুনতে চুপ করে থাকাই অভ্যেস হয়ে গেছে। বিমানবিহারী মাঝে মাঝে দু একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সুবক্তা হলেও পরেশ গুহর ভাষার রাশ কিছুটা আলগা। উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি শালা, শুয়ারের বাচ্চা ইত্যাদি ব্যবহার করে যান অবলীলাক্রমে। তাঁর বাড়ি চন্দননগরে, প্রতিদিন ট্রেনে যাতায়াত করার সময় তিনি চালের চোরাকারবারিদের দেখতে পান। এখন গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বুড়ো বড়িরাও এই কাজে নেমে গেছে। করডনিং ব্যবস্থাকে কাঁচকলা দেখিয়ে মফঃস্বল থেকে কলকাতা শহরে

চাল আসছে অনবরত। গ্রামের সাধারণ নারী পুরুষ বেআইনী কাজ করতে লেগে গেল দ্রুত, পুলিসকে তারা ঘুষ দেয়, যুবতী মেয়েদের পুলিসরা প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানি করে প্ল্যাটফর্মের ওপর। এই সামাজিক অবক্ষয়ের জন্যই পরেশ গুহ বেশি ক্ষুব্ধ।

তিনি এক সময় বলে উঠলেন, সেন্টারে একটা নভিস প্রাইম মিনিস্টার, নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা দিল্লি অ্যাডমিনিস্ট্রেশান চালাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। স্টেটগুলোর দিকে নজর নেই, আর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা অপদার্থ সরকার, যতসব শুয়ারের বাচ্চারা।

প্রতাপ প্রতিবাদমূলক খুক খুক করে কাশি দিলেন দুবার।

বিমানবিহারী বললেন, ওরে পরেশ, তুই গভর্ণমেন্ট সম্পর্কে যে সব অ্যাডজেকটিভ প্রয়োগ করছিস তাতে আমাদের জুডিশিয়ারির একজন প্রতিনিধির আপত্তি আছে। আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে কনটেমট অফ কোর্ট করে দেবে।

পরেশ গুহ সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বললেন, ইয়োর অনার, অপরাধ করে ফেলেছি।

প্রতাপ বললেন, আপনি বেদ-এর শ্লোকও মুখস্থ বলতে পারেন, আবার ঐ যে কী যেন বলে, অতি দেশজ শব্দও অনায়াসে উচ্চারণ করেন ...

বিমানবিহারী জিজ্ঞেস করলেন, প্রতাপ, তোমার আদালতে কখনো কোনো ইস্কুল কলেজের মাস্টারকে আসামী হিসেবে পাও না?

প্রতাপ বললেন, অ্যাঁ? হ্যাঁ হয়তো কখনো আসে, তবে ঠিক খেয়াল করতে পারছি না।

-এ বিষয়ে একটা চমৎকার জোক আছে, শোনো। এটা আমি শুনেছিলুম আমার আর এক বন্ধু, তুমি তাকে চেনো, সিগনেট প্রেসের দিলীপ গুপ্তর কাছে। আমেরিকার একটি আদালতে একবার একজন স্কুলের শিক্ষয়িত্রীকে আনা হয়েছে। সে মহিলা ট্রাফিকের লাল বাতির মধ্যেও গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, এই অপরাধে।

পরেশ গুহ বললেন, আমাদের দেশে ওরকম কত লোক যায়!

–আরে গল্পটা শোনো না! পুলিস থেকে ভদ্রমহিলাকে কোর্টে প্রোডিউস করার পর জাজকে অনুরোধ করা হলো, কেসটা একটু তাড়াতাড়ি বিচার করতে, কারণ ওর ক্লাসের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করে আছে। জাজ হঠাৎ আহ্লাদে ডগোমগো হয়ে উঠে মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি স্কুল টিচার? আজ আমার জীবনের একটা মস্ত বড় আশা পূর্ণ হবে। আমি এত বছর ধরে অপেক্ষা করেছি, কবে আমার এজলাসে একজন স্কুল টিচার আসবে ...যান, ঐ বেঞ্চিটায় বসে কাগজ কলম নিয়ে পাঁচশোবার লিখুন। আমি আর কোনোদিন লালবাতি দেখেও গাড়ি চালাবো না ...

পরেশ গুহ এত জোরে জোরে হাসতে লাগলেন যে তাঁর নাক দিয়ে শিকনিবেরিয়ে গেল। রুমাল দিয়ে মুখটুক মুছে তিনি বললেন, তাহলে আমি জজ সাহেবদের সম্পর্কে দু একটা গল্প শোনাই।

এমন সময় দড়াম দড়াম শব্দে দরজা-জানলা আছড়াবার শব্দ হলো। ঝড় উঠেছে। তিনজনেই দ্রুত চলে এলেন জানলার কাছে। শনিবারের সন্ধ্যায় রাস্তায় অনেক মানুষ, আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে সবাই চোখমুখ ঢেকে ছুটছে। কোনো একটা দোকানের টিনের সাইনবোর্ড খসে পড়লো ঝনঝন শব্দে। এই সময় জানলা বন্ধ করে দেওয়াই সঙ্গত, তবু তিন প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন বাইরের দৃশ্য।

একটু পরেই শিল পড়তে শুরু করলো। ঠিক এক ঝাঁক অশ্বারোহীর মতন খটাখট শব্দ। গাড়ি বারান্দাটার দরজা খুলে বাইরে এসে প্রতাপ ছেলেমানুষের মতন শিল কুড়োতে লাগলেন। বিমানবিহারী দুখানা কুড়িয়ে তা চেপে ধরলেন পরেশ গুহর মাথায়। তিন প্রৌঢ় এখন যেন তিন কিশোর।

প্রতাপ বললেন, ঐ যে অলি আর বুলি আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে সংযত হয়ে গেলেন অন্য দু'জন। একটা বাস থেকে নেমে অলি আর বুলি ছুটছে বাড়ির দিকে। অলি শক্ত করে চেপে ধরে আছে দুহাতে তার আঁচল আর শাড়ির তলার দিকটা।

বিমানবিহারী বললেন, যাক, মেয়ে দুটো ঠিক সময় ফিরেছে।

এ বাড়ির সদর দরজা এমনিতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই হাট করে খোলা থাকে। কিন্তু কী কারণে যেন আজই এখন বন্ধ। ঝড়ের তাড়া খাওয়া দুটি পাখির মতন অলি আর বুলি সেই দরজার ওপর এসে পড়ে দুমদুম করে ধাক্কা মারতে লাগলো।

ওপর থেকে বিমানবিহারী বললেন, আঃ, ধীরাজটা গেল কোথায়? দাঁড়া, আমি ডেকে দিচ্ছি।

ধীরাজ যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ দু বোন ঝড়ের ঝাঁপটা খাবে, সেইজন্য প্রতাপ নিজেই নেমে গেলেন নিচে। দরজার ছিটকিনি খুলেই যেন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দেবার মতন সুরে বললেন, জানিস, শিল পড়ছিল একটু আগে।

অলি বললো, জানি। এত ধুলো ঢুকে গেছে আমার চোখে।

একতলার উঠোনটাও শিল পড়ে প্রায় সাদা হয়ে গেছে। প্রতাপ একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন। প্রত্যেক বছরই বোধহয় দু'একদিন এরকম ঝড়ের সময় শিলাপাত হয়, প্রতাপ অনেকদিন দেখেন নি। এই শিল পড়ার সঙ্গে যেন বাল্যস্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেই মালখানগরে এরকম ঝড় উঠলেই ছেলেমেয়েরা আমবাগানে ছুটতো। জুন মাস নয় অবশ্য, মার্চ-এপ্রিলের ঝড়ে অনেক কাঁচা আম ঝরে পড়ে। শিললাগা আমগুলোতে একটা তামাটে দাগ হয়ে যায়। প্রতাপদের বাড়ির পুকুরের ওপারের বাগানে এখন কী সেই বাগানটা আছে? ছোট ছেলেমেয়েরা আজও সেখানে আম কুড়োতে যায়?

দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে গেল।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অলি বললো, প্রতাপকাকা, এখন যাবেন না! এই বৃষ্টি চট করে থামবে না। আমরা এসপ্ল্যানেডে দেখে এলুম, আকাশ একেবারে কালো হয়ে গেছে।

–কোথায় গিয়েছিলি রে, তোরা।

–লাইটহাউসে একটা সিনেমা দেখতে।

–অলি, তুই বাবলুর খবর কিছু জানিস?

অলি সচকিত হয়ে প্রতাপের মুখের দিকে তাকালো। অকারণেই যেন রক্তাভ হলো তার কানের দুই লতি। আমতা আমতা করে বললো, আমি? কেন, কী হয়েছে বাবলুদার?

প্রতাপ বললেন, ছেলেটা ওর বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে গেল। গিয়ে একটা চিঠি লেখেনি এ পর্যন্ত। দশবারোদিন তো হয়ে গেল, ওর মা চিন্তা করে।

অলির বুক ঢিপঢিপ করছে। বাবলুদার কাছ থেকে সে একটা চিঠি পেয়েছে দু'দিন আগে। বাবলুদার প্রথম চিঠি। সে চিঠিও অতীন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লেখেনি, সে যাবার আগে অলির সঙ্গে যখন দেখা করতে এসেছিল, তখন অলি বলেছিল, বাবলুদা, তুমি যদি চিঠি না লেখো, তোমার সঙ্গে জীবনে আর আমি কথা বলবো না।

অলি কিছুতেই প্রতাপের সামনে সেই চিঠির কথা উচ্চারণ করতে পারলো না। আর কোনো কারণে নয়, যদি প্রতাপ হঠাৎ চিঠিটা একবার দেখতে চান! কোনো কিছু গোপন করার অভ্যেস নেই অলির, কিন্তু বাবলুদার চিঠিটা অন্য কারুকেই দেখানো যায় না।

উত্তর দেবার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেল অলি, এরকম বৃষ্টির মধ্যেও দরজার কাছে একটা গাড়ি থামলো। সেই গাড়ি থেকে নামলেন বিখ্যাত প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত।

একটু আগেই এর কথা হচ্ছিল, বিমানবিহারী এর কাছ থেকে শোনা একটা গল্প বলছিলেন। এই বাড়িতেই দিলীপকুমারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে প্রতাপের। প্রতাপ হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আরে, আসুন, আসুন!

সুবিশালদেহী দিলীপকুমার গুপ্তর ঠোঁটে সব সময়েই একটা পাতলা হাসি মাখা থাকে। এতবড় চেহারা সত্ত্বেও তাঁর স্বভাবের মধ্যে যেন একটি শিশু লুকিয়ে আছে!

গমগমে গলায় তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, বিমান কোথায়?

প্রতাপ বললেন, ওপরের ঘরে। চলুন–

দিলীপকুমার অনেকখানি ভুরু তুলে মহাবিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, ঘরে বসে আছে? ওর কী মাথা খারাপ! এইরকম সময়ে-

প্রতাপ ভাবলেন, কোথাও নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে এইরকম ঝড়-জল মাথায় করে দিলীপকুমার নিশ্চয়ই ছুটে আসতেন না।

তিনি অলিকে বললেন, বাবাকে ডাক তো।

ডাকতে হলো না, ওপর থেকে নিশ্চয়ই দিলীপকুমারের গাড়ি দেখতে পেয়েছেন, তাই বিমানবিহারী নিজেই নেমে আসতে লাগলেন নিচে। রেলিং ধরে ঝুঁকে বললেন, কী ব্যাপার, ডি কে, এসো, ওপরে এসো!

দিলীপকুমার বললেন, তুমি নেমে এসো। এক্ষুণি বেরুতে হবে।

সিঁড়ির আরও কয়েক ধাপ নামতে নামতে বিমানবিহারী উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কী ব্যাপার? কী হয়েছে!

দিলীপকুমার আবার বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বললেন, বাঃ, তুমি জিজ্ঞেস করছো কী ব্যাপার? কেন, তোমার চোখ নেই। শোনো বিমান, চক্ষু কর্ণ-নাসিকা এগুলোর ঠিকঠাক ব্যবহার করার জন্য তোমাকে দেওয়া হয়েছে, এগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য নয়!

–ডি কে, প্রহেলিকা ছেড়ে একটু খুলে বলল। কী হয়েছে কী!

–কী আবার হবে, কতদিন পর এরকম ঝড় উঠলো, এটা সেলিব্রেট করা হবে না? আমি দেখে এলুম, ময়দানের কটা গাছ ভেঙে পড়েছে, আরও ভাঙবে, তুমি চোখের সামনে কখনো গাছ ভেঙে পড়তে দেখেছো? চলো, চলো, আর দেরি করলে কিছুই দেখা যাবে না!

প্রতাপ চমৎকৃত হলেন। দিলীপকুমার একে তো প্রখ্যাত প্রকাশক, তাছাড়া এখন বাটা কম্পানীর মস্ত অফিসার, সদাব্যস্ত মানুষ। এইরকম মানুষেরও ঝড় বৃষ্টি ও গাছ ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখার জন্য ময়দানে যাওয়ার এত ব্যাকুলতা!

বিমানবিহারী বললেন, এখন বেরুতে হবে, তাহলে পা-জামাটা ছেড়ে ধুতি পড়ে আসি–

–কিসসু দরকার নেই। গাড়িতে যাবে তো, ঝড় দেখতে যাওয়া হবে, কোনো স্বয়ম্বর সভায় তো যাচ্ছো না!

–আমার দু'জন বন্ধু রয়েছেন, তাহলে এদেরও ...

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তবে দেরি করো না।

প্রতাপের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, এই যে, ইয়ে, চন্দ্রশেখরবাবু, চলুন, ঘুরে আসা যাক।

প্রতাপ হাসলেন। দিলীপকুমার প্রায়ই তাঁর নাম ভুল করেন। তবে এই ভুলের মধ্যেও একটা প্যাটার্ন আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উপন্যাসের দুটি চরিত্রের নাম বদলাবদলি করে

ফেলেন তিনি। আর একদিন তিনি প্রতাপকে ডেকেছিলেন শিবনাথ বলে। সেটাও ব্রাহ্ম সমাজের দুই নেতার নাম পরিবর্তন।

প্রতাপের সঙ্গে দিলীপকুমারের বেশ কয়েকবার দেখা হলেও, প্রতাপ বুঝতে পারেন, দিলীপকুমার তাঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কথা বলেন না। সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রকাশক, ছাপাখামাওয়ালা এদের নিয়েই তিনি সব সময় মত্ত।

দিলীপকুমারের গাড়ির ড্রাইভার আছে, কিন্তু ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালাবেন তিনি নিজে। পেছনের সীটে বিমানবিহারী, পরেশ গুহ ও প্রতাপ। ঝড় এখন অনেকটাই প্রশমিত, বৃষ্টি পড়ছে প্রবল তোড়ে। এ বছরের প্রথম মনসুন।

ময়দানে কয়েকটি গাছ ভেঙে পড়ে আছে, নতুন কোনো গাছের ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখা গেল না। দিলীপকুমার রেড রোডের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, রেসকোর্সের প্রান্ত ধরে আলিপুরের দিকে অনেকখানি গিয়ে বেলবেডিয়ারের পাশ দিয়ে ঘুরলেন কয়েকবার। এ যেন কলকাতা নয়, কোনো অচেনা সুন্দর শহর। জনমানবহীন রাস্তা, অন্য গাড়িগুলির ছুটে যাওয়ার দারুণ ব্যস্ততা, দুটি পাশাপাশি শিশু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা একপাল গোবেচারার মতন গোরু।

খানিক বাদে দিলীপকুমার বললেন, বিমান, তুমি তো মিষ্টি খেতে ভালবাসো, চলো, শ্যামবাজারের সেনমশাইয়ের দোকানে তোমায় ...

পরেশ গুহ বাড়ি ফেরার তাড়ায় নেমে গেলেন ধর্মতলায়। ওঁদেরও আর শ্যামবাজার পর্যন্ত যাওয়া হলো না। ওদিকে রাস্তায় প্রচুর জল জমেছে।

এদিকেও, এলগিন রোড পর্যন্ত মোটামুটি ঠিক থাকলেও তারপর ভবানীপুরের দিকে এক হাঁটুর বেশি জল। দিলীপকুমার সেই জল ঠেলেই বিমানবিহারী ও প্রতাপকে বাড়ি পৌঁছাবার প্রস্তাব দিলেও ওঁরা দু'জনে রাজি হলেন না! এত জলে গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। জোর করে নেমে পড়লেন দু'জনে।

দিলীপকুমার এতক্ষণ গাড়িতে নানারকম রঙ্গ রসিকতা করছিলেন। এবারেও বললেন, বিড়লা মরার পর এক চান্সেই স্বর্গে যাবেন কেন জানো তো; অন্যের অ্যাকাউন্টে বিড়লার অনেক পূণ্য জমে যাচ্ছে। বিড়লার এই অ্যামবাসেডর গাড়ি, এই গাড়িতে প্রত্যেকদিন বাড়ি পৌঁছোবার পর লোকে বলে, থ্যাঙ্ক গড, আজ গাড়ির কোনো গোলমাল হয়নি। বিড়লার জন্য এত লোক ভগবানের নাম নিচ্ছে ...

বিমানবিহারী ও প্রতাপ একটি রিক্সা নিলেন। কলকাতার বর্ষায় রিক্সাওয়ালারাই অতি বিশ্বস্ত ভরসা। রাস্তার বাতিগুলো কী কারণে যেন নিবে গেছে। দোকানপাটও সব বন্ধ। অন্ধকার পথটাকে নদী বলে মনে হতে পারে। প্রতাপ একটা খালের কথা ভাবছেন, এই রিক্সাটা যেন নৌকো। মালখানগরে যেতে হলে নদী ছেড়ে একটা খালে ঢুকতে হতো।

বিমানবিহারীকে আগে নামতে হলো। তারপর প্রতাপ একটি নিজস্ব সিগারেট ধরালেন। দিলীপকুমার তাঁর গাড়ি সফরের সময় অকৃপণভাবে সিগারেট বিলিয়েছেন। মানুষটার স্বভাবের মধ্যে একটা অতি ভদ্র কিন্তু দিলদরিয়া ভাব আছে। প্রতাপ ভাবছিলেন, এই লোক কী করে অফিস টফিসে চাকরি করে, ব্যবসা চালায়? এইসব মানুষের হাতে অফুরন্ত টাকা খরচ করার স্বাধীনতা দিলে সেই টাকার সদ্ব্যবহার হতে পারে। অবশ্য সেজন্য একটা অন্য দেশ কিংবা অন্য শতাব্দীও দেওয়া দরকার।

প্রতাপের মনটা এখন বেশ ভালো লাগছে। রুটিনের বাইরের জীবন, রুটিনের বাইরের মানুষ তাঁর বিশেষ পছন্দ, যদিও নিজের দৈনন্দিন জীবনে সে রকম বিশেষ কিছু ঘটে না।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে প্রতাপ দেখলেন, তাঁদের বাড়ির দরজার সামনে আর একটি রিক্সা থেমেছে। রাত প্রায় নটা, অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না, তবু মনে হলো, একজন বৃদ্ধ, সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক, নামলো সেই রিক্সা থেকে, তারপর রিক্সাওয়ালার সঙ্গে দরদাম করতে শুরু করেছে।

এরকম সময়ে হঠাৎ কেউ দেখা করতে আসবে না। প্রতাপ বুঝলেন, এই বৃষ্টি-বাদলার রাতে তার বাড়িতে অতিথি এসেছে।

আগেকার দিন আর নেই, এখন বাড়িতে অতিথি এলে মনটা ভারী খুশী হয় না। মনে হয় অবাঞ্ছিত উপদ্রব। অতিথি আসা মানেই ব্যয় বৃদ্ধি। সবসময় অর্থ চিন্তা। অর্থের জন্য কি দয়া-মায়া সৌজন্য সব বিসর্জন দিতে হবে? মমতা কিছুদিন অসুখে ভুগলেন, সে জন্য এ-মাসে অতিরিক্ত খরচ হয়ে গেছে। বিমানবিহারীর কাছে আবার হাত পাততে হবে। এই দৈন্য, এই গ্লানি, এ সবের জন্য প্রতাপের হঠাৎ হঠাৎ ঘর সংসার ছেড়ে নিরুদ্দেশে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

৫১ চায়ের কাপ তুলে একটা চুমুক

চায়ের কাপ তুলে একটা চুমুক দিয়ে খসখসে গলায় বিশ্বনাথ গুহ বললেন, বাপরে, বাপ, কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! বাস চলে না। রিক্সাওয়ালা ব্যাটা পাঁচ টাকা ভাড়া নিল! আট আনা পয়সা পর্যন্ত কমাবে না। একেবারে চশমখোর!

প্রতাপ চিবুকটা বুকে ঠেকিয়ে বসে আছেন। বিশ্বনাথকে দেখেই তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, তার ওপর বিশ্বনাথ এসেই যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা শুনে প্রমাদ গুনেছেন।

মায়ের মৃত্যুর পর বিশ্বনাথের সঙ্গে প্রায় কোনোই সম্পর্ক রাখেননি প্রতাপ। এককালে এই জামাইবাবুটির সঙ্গে তাঁর যে মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে। মা যখন মৃত্যুশয্যায় তখনই বিশ্বনাথ বিষয় সম্পত্তির কথা তুলেছিলেন, তারপরেও নানান ছুতোনাতায় তিনি প্রতাপকে দোহন করার কম চেষ্টা করেননি। এককালের বিবাগী, সুর-সাধক বিশ্বনাথ গুহ'র মুখে এখন সব সময় টাকা পয়সার কথা।

দেওঘরের বাড়িটা তো পুরোপুরিই দিয়ে দেওয়া হয়েছে শান্তি-বিশ্বনাথকে, এখন ওঁরা নিজেদের সংসার নিজেরা যেমন করে তোক চালাবেন। মা মারা গেছেন, প্রতাপের আর কোনো দায়িত্ব নেই। এই দুর্দিনে কে আর অন্যের বোঝা টানতে পারে।

দড়ি-পাকানো চেহারা এখন বিশ্বনাথের, ধুতিটা ময়লা, পাঞ্জাবীতে নস্যির দাগ, মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি। গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা, তবু অনবরত কথা বলে চলেছেন। চা শেষ করার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে তিনি বললেন, নাঃ, এক কাপ চায়ে ঠিক জুৎ হলো না, ও মুন্নিমা, আর একটু চা খাওয়াবি?

দুপুর থেকেই মমতার পেটে ব্যথা। সন্ধ্যের দিকে খুব বেড়েছিল, তাই তুতুল ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। এখন বাড়িতে লোকজন এলে মুন্নি চা-টা করে দিতে পারে।

আজ সন্ধেটা বড় ভালো কেটেছে প্রতাপের, বেশ একটা ফুরফুরে মন নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। দরজায় পা দিতে না দিতেই এই মূর্তিমান উপদ্রব, তার ওপর আবার মমতার শরীর খারাপ। বিমানবিহারী, দিলীপকুমার, পরেশ গুহ নিশ্চিত এখন বাড়িতে বসে হাত-পা ছড়িয়ে রেডিও-গ্রামাফোনে গান বাজনা শুনছে। কিংবা বউ ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করছে, আর প্রতাপের কপালে এই!

টুনটুনির ভিজে শাড়ী ছাড়াবার জন্য সুপ্রীতি তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের ঘরে। এখন দু'জনেই আবার ফিরে এলেন। দিদিকে দেখে একটু স্বস্তি পেলেন প্রতাপ। একা একা বিশ্বনাথের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে তাঁর একটুও ভালো লাগছিল না।

সুপ্রীতি জিজ্ঞেস করলেন, ও বিশ্বনাথ, তুমি শান্তিকে নিয়ে এলে না কেন? তাকে একা ফেলে এলে?

বিশ্বনাথকে দেখেই প্রতাপ এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে মেজদির কথা তাঁর মনে পড়েনি। সত্যিই তো, শান্তি অসহায় ধরনের নারী। অন্য কারুর অবলম্বন ছাড়া সে নিজে যেন দাঁড়াতেই পারে না। সে একা দেওঘরের ঐ বাড়িতে থাকবে কী করে?

বিশ্বনাথ বললেন, পাশের বাড়ির একটা বুড়ি এসে ওর সঙ্গে থাকবে। বাড়ি খালি রেখে সবাই একসাথে আসি কী করে? নিচের তলার ভাড়াটে হারামজাদারা যদি পুরো বাড়িটা দখল করে নেয়? ও শালারা একেই তো ভাড়া দেয় না।

সুপ্রীতি বললেন, টুনটুনি বলছিল, শান্তির নাকি শরীর খারাপ?

বিশ্বনাথ অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, ওরকম শরীর খারাপ তো সারা বছর লেগেই আছে! হাঁটা চলা করতে পারে।

প্রতাপ টুনটুনির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেছে মেয়েটা। আগে তিনি টুনটুনিকে শাড়ী পরা অবস্থায় দেখেছেন কি না মনে করতে পারলেন না। মাতৃবংশের ধারা পেয়েছে। বেশ লম্বা হয়েছে টুনটুনি। রোগা হলেও মুখশ্রীটা সুন্দর। সুপ্রীতির অল্প বয়েসী চেহারার সঙ্গে যেন মিল আছে।

সুপ্রীতি আবার জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটাকে তুমি কলেজে পড়ালে না কেন বিশ্বনাথ?

ভেবেছিলাম তো ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরিতে দেবো। কিন্তু পড়াশুনোয় ওর মাথা নেই, বড়দি।

–আহা-হা মাথা নেই আবার কী? চেষ্টা করে দেখতে। তুমি তো ওকে কলেজে ভর্তি করালেই না। এটা বাপু তোমার অন্যায়।

–আমার না হয় অন্যায়। কিন্তু আপনাদেরও তো বোনঝি। আপনারা কি একবারও খবর নিয়েছেন যে মেয়েটা কলেজে ভর্তি হলো কি হলো না?

কথাটা শুনে প্রতাপের আবার রাগ হয়ে গেল। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বললেন, তোমার মেয়ে, তুমি তাকে কলেজে ভর্তি করতে পারো না। আমরা কেন দায়িত্ব নিতে যাবো? তুমি ওর জন্ম দিতে গিয়েছিলে কেন?

সুপ্রীতি বিশ্বনাথের কাছে কথায় না হেরে গিয়ে বললেন, আমরা আর খবর নেবো কি, তুমি তো চিঠিপত্র লিখতে, কই জানাওনি তো যে টুনটুনি কলেজে ভর্তি হয়নি। আমরা তো ধরেই নিয়েছি যে আমাদের বংশের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবেই।

–তাই তো আপনাদের বংশের মেয়েকে আপনাদের কাছেই রেখে যেতে এসেছি।

প্রতাপ দ্রুত চিন্তা করছেন, বিশ্বনাথ আর তাঁর মেয়েকে থাকতে দেওয়া হবে কোন্ ঘরে। এখন না হয় বাবলুর ঘরটা খালি, কিন্তু বাবলু কাল-পশুই ফিরে আসতে পারে। বাবলুর ঘরটা খুবই ছোট। সেখানে দু জনের শোওয়ার ব্যবস্থা করা যায় না। বাবলু তার ঘরে অন্য কারুর যখন তখন ঢোকাই পছন্দ করে না। সে এখন সাবালক হয়েছে। সে তো এখন খানিকটা প্রাইভেসি চাইবেই! বিশ্বনাথকে তখন এই বসবার ঘরে বিছানা পেতে দিতে হবে। বসবার ঘরে কারুকে শুতে দেওয়া প্রতাপ একেবারে পছন্দ করেন না। প্রতাপের কাছে লোকজন আসে। বাবলুর বন্ধুরা যখন তখন আসে। মুন্নি-তুতুলেরও বন্ধু আসে। বসবার ঘরে যাকে শুতে দেওয়া হয়, তারও যেমন অস্বস্তি, বাড়ির লোকেরও অস্বস্তি।

বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করলেন, ব্রাদার, তোমার ট্রামের মাথলি আছে?

–না, কেন বলুন তো?

–কলকাতায় তো অনেকদিন আসিনি। এক সময় অনেকের সঙ্গে চেনাশুনো ছিল। ভাবছি যতজনের সঙ্গে পারি দেখা করে যাবো। ট্রামবাসের যা ভাড়া বেড়েছে, ওফ্! আমাদের সময় দু পয়সা ট্রাম-ভাড়া ছিল, তোমার মনে আছে, ছ' আনায় পাওয়া যেত অল-ডে টিকেট? তুমি আমায় কাল পাঁচটা টাকা দিও!

প্রতাপ মনে মনে আবার প্রমাদ গুণলেন। বিশ্বনাথ ট্রামবাস ভাড়ার জন্য পয়সা চাইছেন। তার মানে ওঁর দেওঘরে ফিরে যাবার ট্রেন ভাড়া নেই। যাদের ফেরার ভাড়া থাকে না, তাদের ফিরে যাবার তাড়াও থাকে না। উনি তা হলে এখানে কতদিন থাকবেন?

মুন্নি আবার চা বানিয়ে নিয়ে এলো। বিশ্বনাথ তার পিঠে ও মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক আদর করলেন। তুতুলকেও ডেকে পাঠালেন তিনি, তুতুলকে বললেন, তুই মা আমার দাঁতটা একটু দেখে দিবি। দাঁতের ব্যথায় বড় কষ্ট পাচ্ছি। শক্ত কিছুই খেতে পারি না।

তুতুল হেসে বললো, আমি তো দাঁতের ডাক্তার নই, মেসোমশাই! ঠিক আছে, আপনাকে বউবাজারে এক ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যাবো।

বিশ্বনাথ বললেন, সে তুই যা ভালো বুঝবি, আমি তোর হাত-ধরা হয়ে থাকবো। বাঁ চোখটাতেও ভালো দেখি না। ওখানে তো সেরকম চিকিৎসার সুযোগ নেই, তোকেই একটু ব্যবস্থা করে দিতে হবে!

প্রতাপ দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন। স্বার্থপরতার চূড়ান্ত! একবার যখন কলকাতায় এসেছেন বিশ্বনাথ, তখন পরের পয়সায় সব রকম চিকিৎসা করিয়ে নিতে চান। আরও রোগ বেরুবে।

ওঁর টি-বি'র এখন কী অবস্থা? সে সম্পর্কে তো কিছুই বলছেন না।

এক সময় বিশ্বনাথ মেয়েদের বললেন, তোমরা এখন ভেতরে যাও মা, আমরা একটু কাজের কথা বলি?

সুপ্রীতি বললেন, দু বছর কলেজে ভর্তি না হয়ে বাড়িতে বসে থেকেছে, এখন কী আর কলেজে ভর্তি হয়ে তাল সামলাতে পারবে টুনটুনি?

বিশ্বনাথ মুখটা ঝুঁকিয়ে বললেন, কলেজে পড়ুক না পড়ুক, ওকে এখন আপনাদের কাছেই রাখতে হবে, বড়দি। নইলে জাত-ধর্ম সব যাবে। আপনাদেরও তো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বিয়ে-শাদীর সময়...এখানে মেয়ের জন্য আপনারা একটা ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। আপনারা যা ভালো বুঝবেন, আমাকে দেখাবারও দরকার নেই।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের ওদিকেও তো এখন অনেক বাঙালী সেক্স করেছে। ওখানে কোনো পাত্র পেলেন না?

-বিপদের কথা তোমাকে কী বলবো ভাই, ও মেয়ে কিছুতেই বাড়ি থাকতে চায় না। সব সময় টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। এই বয়েসের মেয়ে যে গলার কাঁটা! তোমার দিদিকে তো জানোই, ব্যক্তিত্ব নেই, মেয়েকে সে সামলাতে পারে না, আমিও প্রায় সময়েই বাড়ি থাকি না। কোনোদিন যদি একটা অঘটন ঘটে যায়...আমার বাড়ির ভাড়াটেগুলো একেবারে হারামজাদা, এক পয়সা ভাড়া ঠেকায় না, আবার টুনটুনিকে লোভ দেখায়। দুপুরবেলা ওদের ঘরে গিয়ে বসে থাকে। একদিন মেরে পিঠের চামড়া তুলে দিতে গিয়েছিলাম, তাতে ও আমাকে ধাক্কা মেরে বললো, বেশ করবো, যাবো! বুঝে দ্যাখো! এমনিতে দেখছো তো চুপচাপ, লাজুক, আসলে ও মেয়ে হয়েছে বদমাইসের জাসু!

সুপ্রীতি অপ্রসন্ন ভাবে বললেন, তোমরা ভালো শিক্ষা দিতে পারো নি।

বিশ্বনাথ বললেন, দোষ আমাদের দিতে পারেন ঠিকই। আপনারাও দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। আপনাদের মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়েছেন। আমাদের কোনো কথা তিনি শুনতেন না। আমি বাঙালী-অবাঙালী মানি না। একটা ভালো মতন ছেলে পেলে দেওঘরের বাড়ি বিক্রি করেও ওর বিয়ে দিয়ে দিতাম। কিন্তু সুশিক্ষিত বা ভালো বংশের ছেলে না হলে আমি কিছুতেই বিয়ে দেবো না, বরং মেয়ের গলা টিপে মেরে জলে ভাসিয়ে দেবো। তোমরা তো জানো না, ওদেশে অনেক ছেলেই বাঙালী মেয়ে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তাদের গ্রামে একটি করে বউ আছে আগে থেকেই।

সে রাতে প্রতাপের মেজাজটা খারাপ হয়েই রইলো।

পরদিন মমতা অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন। টুনটুনিকে এ বাড়িতে রাখার বিষয়ে মমতা ও সুপ্রীতির সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন প্রতাপ। মমতা ও সুপ্রীতি দু' জনেই টুনটুনিকে এ বাড়িতে রেখে দেওয়ার পক্ষে। বিশ্বনাথ যেভাবে অনুরোধ করছেন, তাতে না বলা যায় না। দেওঘরে থাকলে মেয়েটা গোল্লায় যাবে। এই বংশেরই তো মেয়ে।

দিদি ও স্ত্রীর যুক্তি প্রতাপ অস্বীকার করতে পারেন না। তবু তাঁর মন ঠিক সায় দেয় না। টুনটুনির প্রতি তাঁর স্নেহ জন্মায়নি। তা ছাড়া বাড়িতে আর একটি মানুষ বাড়বে, তার একটা খরচ আছে। সব ঠাট বজায় রেখে কীভাবে যে খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন, তা শুধু প্রতাপই জানেন।

প্রতাপের আসল আপত্তি, টুনটুনির ছুতো ধরে বিশ্বনাথ গুহ এখানে প্রায়ই যাতায়াত শুরু করবেন।

কিন্তু এই সব আপত্তির একটিও মুখে প্রকাশ করা যায় না।

বিশ্বনাথ টুনটুনিকে প্রায় এক বস্ত্রে নিয়ে এসেছেন। প্রায় পালিয়ে আসার মতন। আসল ব্যাপার হয়তো আরও কিছু ঘটেছে, বিশ্বনাথ তা খুলে বলছেন না। মমতার দু' খানা শাড়ী দেওয়া হয়েছে টুনটুনিকে। কিন্তু তার জন্য সায়া-ব্লাউজ কেনা দরকার এখনই। তার পায়ের চটিটা টায়ারের, কলকাতার কোনো ভদ্র মেয়ে ঐ চটি ব্যবহার করে না।

বিশ্বনাথ গুহকে নিয়ে তুতুলকে কয়েকদিন ঘুরতে হলো ডেন্টিস্ট ও চোখের ডাক্তারের কাছে। বিশ্বনাথ পকেট থেকে একটাও পয়সা বার করেন না। বরং রাস্তায় বেরিয়ে তিনি তুতুলের কাছে আবদার করেন, অনেকদিন কুলপি মালাই খাইনি। খাওয়াবি, মা? হ্যাঁরে, দ্বারিক ঘোষের দোকানে কচুরি ডাল পাওয়া যায় এখনও? আঃ, ওদের ডালটার যা স্বাদ ছিল না, এখনও জিভে লেগে আছে।

তুতুলের উপার্জন অতি সামান্য। পাশ করার পর দু মাস পি আর সি এ করার পর সে এখন হাউস স্টাফ হয়ে কিছু মাইনে পাচ্ছে, পঁচাত্তর টাকা। না, না, পুরো পঁচাত্তর নয়। তার বন্ধুরা বলে, আমাদের মাইনে চুয়াত্তর টাকা নব্বই পয়সা! দশ পয়সা কেটে নেয় রেভিনিউ স্ট্যাম্পের বাবদে। তুতুলের সহপাঠীদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন পরিবার থেকে এসেছে, তারা মাসের প্রথমে ঐ টাকা পেয়ে একদিনে উড়িয়ে দেয় দল মিলে চিনে

হোটেলে খেয়ে। আর তুতুলের মতন যারা, তাদের ঐ টাকাতেই সারা মাস চালাতে হয় টিপে টিপে।

বিশ্বনাথের জন্য চার পাঁচ দিনেই তুতুলের সব টাকা খরচ হয়ে গেল। তারপরেও তাঁর আবদারের শেষ নেই। তিনি সিনেমা দেখতে চান, গানের জলসা শুনতে যেতে চান। অনেকদিন পর কলকাতায় এসে তিনি যেন আদেখলা হয়ে গেছেন।

রাস্তায় বেরিয়ে এক পা-ও হাঁটতে চান না তিনি। তাঁর রিক্সা চাই। যে-কোনো পুরুষ মানুষের স্পর্শে তুতুলের অস্বস্তি হয়, বিশ্বনাথ তার কাঁধে হাত রাখেন।

শুধু টাকা পয়সার অসুবিধের জন্যই নয়, তুতুলের সময়ও নষ্ট হচ্ছে খুব। বিশ্বনাথের ব্যবহার অবুঝের মতন। শেষ পর্যন্ত তুতুল মায়ের কাছে খুব সংকোচের সঙ্গে অভিযোগ জানালো। তুতুল হাসপাতালে পর্যন্ত যেতে পারছে না। একদিন বিশ্বনাথকে সে হাসপাতালে ডিউটিতে যাবার কথা বলতে বিশ্বনাথও তার সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে সর্বক্ষণ বসে ছিলেন।

সুপ্রীতি বাধ্য হয়ে বিশ্বনাথকে তুতুলের কাজের কথা বুঝিয়ে বললেন এবং তাকে কুড়িটা টাকা দিলেন। তবু ভয়ের চোটে তুতুল ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

টুনটুনিকে নিয়েও সমস্যা হলো। টুনটুনি আসবার পর থেকেই মুন্নি আর তুতুলের দু একটা ছোটখাটো জিনিস হারাচ্ছে। ওগুলি যে টুনটুনিই নিয়ে লুকিয়ে রাখছে, তা অতি স্পষ্ট। এতই সামান্য সব জিনিস, লবঙ্গের কৌটো কিংবা নকল পাথরের দুল, ওসব টুনটুনি চাইলেই ওরা দিয়ে দিত। তুতুল বা মুন্নি টের পেয়ে গেলেও কিছু বলে না, কিন্তু ওদের ভয়, বাবলু এসে পড়লে, তার ঘর থেকে কোনো জিনিস সরালে সে চেঁচিয়ে সারা বাড়ি মাথায় করবে। এর মধ্যেই বাবলুর ঘর থেকে টুনটুনি কিছু সরিয়েছে কি না কে জানে!

মমতা একদিন টুনটুনিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন কালীঘাট মন্দিরের কাছে বাজার করতে। টুনটুনি কলকাতা শহরে কিছুই প্রায় দেখেনি। কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে সে তার বয়েসের

তুলনায় অনেক বেশি ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে। এমনকি ট্রাম চলতে দেখলেও সে সবিস্ময়ে তাকায়।

মমতার মায়া হয়। মেয়েটা তো আসলে এখনও ছেলেমানুষ, কতই বা বয়েস, কুড়িও পূর্ণ হয়নি। ওকে আস্তে আস্তে চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল এই সব দেখিয়ে দিতে হবে।

হারিয়ে যাবার ভয়ে টুনটুনি মমতার আঁচল চেপে ধরে আছে। মমতা ওকে রঙীন কাঁচের চুড়ি কিনে দিলেন, পায়ের নোখের জন্য নেলপালিশ কিনে দিলেন, আইসক্রিম খাওয়ালেন।

বাড়ি ফেরার পথে টুনটুনি ফিকফিক ফিকফিক করে হেসে বললো, মামী, এই দ্যাখো!

আঁচলের তলা থেকে সে একটি ছোট পাউডারের কৌটো বার করলো। মমতা স্তম্ভিত। এত সরল, লাজুক আর ভীতু মনে হচ্ছিল মেয়েটাকে, তার এই কাণ্ড। দোকান থেকে পাউডারের কৌটো চুরি করেছে?

মমতা নিজের ছেলেমেয়েদের আদর করলেও শাসন করতে কখনো কার্পণ্য করেননি। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে টুনটুনির দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোর পাউডার দরকার ছিল, বললি না কেন আমায়?

টুনটুনি শরীর মুচড়ে বললো, এইটার তো দাম লাগলো না?

–দাম না দিয়ে দোকান থেকে জিনিস নিলে তাকে কী বলে তুই জানিস না? তোর মামা কী কাজ করেন, তা জানিস? তোর মামা এই সব চোরদের জেলে দেয়। এরকম করলে তুই কলকাতায় থাকতে পারবি না! তোর মামা যদি একবার শোনে...

টুনটুনি সঙ্গে সঙ্গে মমতার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বললো, মামী, আর কোনোদিন করবো না, তুমি মামাকে বলে দিও না!

মমতা তবু ছাড়লেন না। টুনটুনিকে নিয়ে ফিরে গেলেন কালীঘাট মন্দিরের কাছে। সেই দোকানটির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, যা, ফেরৎ দিয়ে আয়। বলবি, ভুল করে নিয়ে গিয়েছিলি।

বাড়ি ফিরে তিনি সুপ্রীতিকে এই ঘটনাটা বলতেই সুপ্রীতি জানালেন যে ও মেয়ের যে হাত-টান স্বভাব তা তিনিও লক্ষ্য করেছেন। ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

টুনটুনির নামে তিনি প্রতাপের কাছে নালিশ করলেন না বটে, কিন্তু দু একদিন পরেই মমতা প্রতাপকে আর একটি বিষয় জানালেন। কানু মাঝে মাঝেই দুপুরের দিকে আসে। আগেরদিন এসে সে বলেছে যে বিশ্বনাথ তাকে খুব বিরক্ত করছেন। এর আগে দেওঘর থেকে বিশ্বনাথ প্রায়ই কানুর কাছে টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছেন। কানু দিয়েছিল দু একবার। এখন তিনি মেয়ের বিয়ের কথা বলে ছ হাজার টাকা চেয়েছেন। মেয়ের বিয়ে নাকি ঠিক হয়ে গেছে। কানু এখন অত টাকা দিতে পারবে না। কানু আরও খবর পেয়েছে যে, কানুর বাড়িতে বসেই নতুন দু জন ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশ্বনাথের আলাপ হয়েছিল, বিশ্বনাথ সেই দুই ভদ্রলোকের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে টাকার জন্য জ্বালাতন করেছেন।

প্রতাপ প্রথমটা হুঁ হাঁ করে শুনছিলেন, হঠাৎ মাথা তুলে উত্তেজিতভাবে বললেন, উনি বিমানবিহারীর বাড়িও যাতায়াত করছেন শুনলুম। বিমানের কাছেও টাকা চেয়েছেন নাকি?

এ কথাটা মনে আসা মাত্র প্রতাপ বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। আদালত থেকে ফিরে তাঁর জলখাবারও খাওয়া হয়নি। মমতার অনুরোধেও কর্ণপাত করলেন না।

বিমানবিহারী প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। না, না, ওসব কিছু না বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন অনেকবার। কিন্তু প্রতাপ ছাড়বার পাত্র নন, প্রচুর জেরা শোনার অভ্যেস আছে তাঁর।

শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে বিশ্বনাথ এখানে মেয়ের বিয়ের বদলে স্ত্রীর অসুখের প্রসঙ্গ তুলে কিছু টাকা ধার চেয়েছিলেন। বিমানবিহারী তাকে দুশো টাকা ধার দিয়েছেন।

প্রতাপ হুকুমের সুরে বললেন, বিমান, ভাউচার বার করো! আমার নামে দুশো টাকা লেখো। আমি এক্ষুনি তোমার টাকা শোধ করে দিতে চাই।

বিমানবিহারী বললেন, আহা, ব্যস্ত হচ্ছো কেন? সামান্য টাকা, পরে একটা কিছু ব্যবস্থা হবে।

প্রতাপ বললেন, আমার কাছে সামান্য নয়। তুমি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে এক্ষুনি কেটে নাও!

বিমানবিহারী জানেন, প্রতাপের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তাঁর এই গোঁয়ার বন্ধুটিকে তিনি এক কাপ চা খাওয়াবার জন্যও আর ধরে রাখতে পারলেন না। ভাউচারে সই করেই প্রতাপ হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

বিশ্বনাথ গুহ বাড়িতে ছিলেন না। প্রতাপ বাইরের ঘরে বসে রইলেন ঠায়। বিশ্বনাথ বাড়ি ফেরা মাত্র ভেতরের দিকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, বসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

প্রতাপ একসময়ে বিশ্বনাথকে ওস্তাদজী বলে ডাকতেন। এখন সেই খোনা-গলার ভাঙাচুরো মানুষটিকে এ সম্বোধন করলে তা ব্যঙ্গের মতন শোনাবে।

তিনি রাগের চেয়ে বেশি দুঃখিত গলায় বললেন, বিশ্বনাথবাবু, আপনার নামে আমি এসব কী শুনছি? আপনি আমারই বাড়িতে থেকে লোকজনের কাছে টাকা চেয়ে বেড়াচ্ছেন? আপনার নিজের মানসম্মান না হয় বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু আমার একটা মানসম্মান জ্ঞান এখনো টিকে আছে, যারা আমার বন্ধু, আপনি আমায় কিছু না জানিয়ে তাদের কাছে গিয়ে...এমনকি আপনার জন্য কানু এসে এ বাড়িতে কথা শুনিয়ে যায়...

বিশ্বনাথ চোখ পিটপিট করে শুনতে লাগলেন, প্রতাপের গলার উত্থান-পতন শুনেও তিনি বিশেষ বিচলিত হলেন না। প্রতাপ একটু থামতেই তিনি বললেন, তুমি আসল কথাটা বলতে পারছে না ব্রাদার। আসল কথাটা হলো আমি ভিক্ষে করছি। হ্যাঁ, ভিক্ষেই তো করছি। নানান কথার ছলনায় ভুলিয়ে...তবেই বুঝে দ্যাখো, পোড়া পেটের জন্য মানুষ কি না করে? ভিক্ষে না করলে খাবো কি বলতে পারো? দেওঘরে একটা শুধু বাড়ি আছে, আর একটা পয়সা রোজগার নেই। ভাড়াটেগুলো গাজুয়ারি করে পয়সা দেয় না, তাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করার সামর্থ্য আমার নেই। মেয়েটাকে এখানে গছিয়ে গেলাম, আমরা আর দুটি প্রাণী, বেঁচে থাকতে হবে তো?

জামাটা খুলে নিজের পেটের ওপর হাত রেখে আবার বললেন, এই যে, এইটিই সব কিছু। পেট কোনো যুক্তি শোনে না। ক্ষুধাই হলো মায়া, ক্ষুধাই ঈশ্বর। শ্মশানে যাবার আগে কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা মরে না। কী করি বলো, ব্রাদার!

৫২ আকাশে জোরে বিদ্যুৎ চমকালে

আকাশে জোরে বিদ্যুৎ চমকালেই বজ্র গর্জন শোনা যাবে একটু পরে। আলোর থেকে শব্দের গতি অনেক কম, তাই মেঘ সংঘর্ষের পর প্রথমেই দেখা যায় আলোর চমক, তারপর এসে পৌঁছোয় বজ্র নিঘোষ। কতদিনই তো ঝড় বৃষ্টি হয়, তবু এক-একদিন যেন নেশার মতন হয়ে যায়, বিদ্যুৎ চমক দেখলেই প্রতীক্ষা করতে হয় বজ্রের শব্দ শোনার জন্য। সেই শব্দ এক- একবার এক রকম।

মামুনের ঘরের জানলার পর্দা কাঁচতে দেওয়া হয়েছে, মাঝ রাত্রেও কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের খেলা। বৃষ্টি তেমন নেই, বিদ্যুৎবজ ঝড়ের দাপটই বেশি। এখন কৃষ্ণপক্ষ, এক-একবার তীব্র বিদ্যুতের ঝলক যেন আকাশটাকে চিড়ে দিচ্ছে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত। ঘুম আসছে না মামুনের, তাঁর মাথার মধ্যে বারবার ঘুরে আসছে মাইকেলের একটি লাইন, “ক্ষণপ্রভা প্রদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে।” এই লাইনটা এমন কিছু কবিত্বময় নয়, তেমন কিছু স্মরণযোগ্য নয়, তবু কোনো কোনো দিন

এরকম একটা কবিতার লাইন বা গানের লাইন মাথা জুড়ে বসে যুক্তিহীনভাবে, কিছুতেই যেতে চায় না।

বিদ্যুৎ আর বজ্র, এ দুটি যেন ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া। মামুন আকাশের দিকে চোখ রেখে ভাবছেন, যে-কোনো ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকবেই। এটাও একটা অতি সাধারণ চিন্তা, তবু মামুন বারবার ঐ একই কথা ভেবে চলেছে। এক- একবার বজ্রের শব্দ এমন প্রচণ্ড যে বুক কেঁপে উঠছে তাঁর, তখন মনে হচ্ছে, অতি সাধারণ ক্রিয়ারও প্রতিক্রিয়া হতে পারে প্রচণ্ড। বড় খাটটার এ-পাশে ও-পাশে ছটফট করছেন মামুন।

ফিরোজা বেগম তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে পাশের ঘরে শুয়ে আছেন। অনেকদিনই এ রকম পৃথক শয়নের ব্যবস্থা। অফিস থেকে ফিরতে মামুনের প্রায়ই রাত হয়, তা ছাড়া ফিরেও মামুন টেপ রেকডারে কিছুক্ষণ গানবাজনা শোনেন, এ সব ফিরোজা বেগমের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। কিছুদিন ধরে ফিরোজার প্রায়ই জ্বর হচ্ছে, ডাক্তারের সন্দেহ তাঁর পুরোনো বিকোলাই রোগটি ফিরে এসেছে। চিকিৎসায় ফল হচ্ছে না বিশেষ, অমন সুন্দর রূপ ও স্বাস্থ্য ফিরোজা বেগমের, ইদানীং তাঁকে ফ্যাকাশে দেখায়।

কিছুদিন ধরে মামুন পারিবারিক সমস্যায় বিব্রত। ফিরোজা বেগমের নিরন্তর অভিযোগ যে তাঁর স্বামী সংসারের প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেন না এবং সে অভিযোগ মিথ্যেও নয়। মামুনের ধারণা, সংসার চালাবার টাকা রোজগার করে এনে দেবেন তিনি, বাকি সব কিছু তো দেখবে স্ত্রী। মামুনের বড় মেয়ে হেনা বিবাহযোগ্যা হয়েছে, মামুন সে ব্যাপারেও মাথা ঘামাননি, মামুন চান তাঁর দুই মেয়েই অন্তত এম-এ পর্যন্ত পড়ুক, তারপর বিয়ের চিন্তা করা যাবে। তাঁর ছোট মেয়ে মীনা পড়াশুনোয় খুব ভালো, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার, কিন্তু হেনা বি-এ পরীক্ষায় ফেল করেছে। হেনার জন্য ফিরোজা বেগম একটি পাত্র ঠিক করে ফেলেছেন এরই মধ্যে, সম্বন্ধ প্রায় পাকা হয়ে যাবার পর সে খবর জানতে পেরে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন মামুন। ছেলেটার একমাত্র যোগ্যতা, তার চেহারা সুন্দর, যেমন ফসা, তেমন দীর্ঘকায়, হঠাৎ দেখলে পাঠান বলে মনে হয়, কিন্তু সে কোনো চাকরিবাকরি করে না, কী একটা এজেন্সি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ছেলেটির বাবা জামাত-এ-ইসলামীর একজন

ছোটখাটো নেতা, মামুন জানেন, ওঁদের পরিবার অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, ঐ পরিবারের সঙ্গে মামুন কুটুম্বিতার সম্পর্ক রক্ষা করবেন কী করে? মামুন তাঁর দুই মেয়েকেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন, হেনা একা একা স্কুল কলেজে গেছে, সে ঐ পরিবারের বউ হলে সুখি হতে পারবে?

আজ রাত্রে খাওয়ার সময়েও এই প্রসঙ্গ নিয়ে জোর কথা কাটাকাটি হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর। শরীর ভালো নেই বলে ফিরোজা বেগমের মেজাজ আরও খিটখিটে হয়েছে, তিনি বেশ কিছু খারাপ ভাষা ব্যবহার করেছেন। এখনও মাথা গরম হয়ে আছে মামুনের, ঘুম আসবে কী করে?

হঠাৎ যেন দরজায় খটখট শব্দ হলো। দরজায় না জানলায়? বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়ছে নাকি? না, আবার দু'বার শব্দ হলো দরজাতেই। মামুন ভুরু কোঁচকালেন। তাঁরা থাকেন দোতলায়, একতলায় অন্য ভাড়াটে, এত রাতে সদর দরজা বন্ধ থাকবেই, সুতরাং দোতলায় উঠে এসে কেউ দরজা ধাক্কাবে কী করে?

শব্দ বেশি জোরে নয়, কিন্তু দৃঢ়। যে এসেছে, সে কোনো অধিকার নিয়েই এসেছে। আর একবার বিদ্যুৎ চমকালো, সঙ্গে সঙ্গে মামুনের মনে হলো, তা হলে কি আলতাফ! সুখবর দিতে ছুটে এসেছে এত রাত্রে? দু'দিন ধরে গুজব শোনা যাচ্ছিল, মামুন তাঁর সদ্য প্রকাশিত দ্বিতীয় কবিতা পুস্তকটির জন্য এ বছর আদমজী পুরস্কার পাবেন। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, টাকার এখন বিশেষ দরকার মামুনের।

বিছানায় উঠে বসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে?

বাইরে থেকে উত্তর এলো, হক সাহেব, দরজা খোলেন, পুলিস!

অবাক হবার বদলে মামুন বিড়বিড় করে বললেন, "ক্ষণপ্রভা প্রদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে!" তারপর ভাবলেন, সুখবর দিতে হলে আলতাফ তো টেলিফোন করতেই পারতো, এত রাত্রে নিজে ছুটে আসবে কেন? তা ছাড়া, মামুন সরকারের নেক

নজরে নেই, আদমজী পুরস্কার তাঁকে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি নিজেও লোভীর মতন ঐ গুজবে বিশ্বাস করেছিলেন।

দরজা খুলে দেখলেন, তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, ইউনিফর্ম-পরা না থাকলেও চেহারা দেখেই পুলিস বলে বোঝা যায়।

পুলিস দেখে মামুনের ঠিক আতঙ্ক হলো না, বরং প্রথমেই এই প্রশ্নটা জাগলো যে, একতলার সদর দরজা খুলে দিল কে? নিচের ভাড়াটেরা? পুলিস দেখে তারা ওপরে এসে আগে মামুনকে খবর দিতে পারতো না? এদিকে তো তারা মুখে মামুনের সঙ্গে খুব খাতির দেখায়।

তিনজনের মধ্যে একজন মামুনকে অভিবাদন করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, স্যার, আমি ডি এস পি সামসুজ্জামান, আপনারে একবার আসতে হবে আমাদের সাথে।

মামুন উষ্মার সঙ্গে বললেন, এখন ক'টা বাজে? মাঝ রাতে ডাকতে এসেছেন মানে, ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না?

ডি এস পি সাহেব বাঁ হাতের কব্জী ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, এখন বাজে চারটা চল্লিশ, স্যার, আপনারে ঠিক ডাকতে আসি নাই...

-গ্রেফতার করতে এসেছেন? আপনার কাছে ওয়ারেন্ট আছে?

-জী, আছে।

পরোয়ানাটা হাতে নিয়ে তিন-চারবার পড়ে দেখলেন মামুন। দেশরক্ষা বিধানের ৩২ ধারা মোতাবেক তাঁকে আটক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সহজ ইংরাজি বাক্য, তবু তিনি যেন মানে বুঝতে পারছেন না। দেশরক্ষার কারণে আটক...তিনি কি দেশের শত্রু? পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিতে তিনি তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলিতে সব রকম সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, কতদিন আহার জোটেনি, কতদিন শুতে হয়েছে

মসজিদের চাতালে, তখন কোথায় ছিল আইয়ুব খান বা মোনায়েম খান, কোথায় ছিল এই সব পুলিস অফিসাররা?

পরোয়ানার তারিখ ১৬ই জুন। হ্যাঁ, ইংরেজি মতে রাত বারোটার পরেই ১৬ই জুন পড়েছে, তাই এদের রাত ফুরোবার সবুর সয়নি। সাধারণ চোর-ডাকাতের মতন বাড়ি থেকে পুলিস তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। তিনি পাকিস্তানের শত্রু!

পুলিস অফিসারটির দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন মামুন। অনিদ্রায় তাঁর চক্ষু লাল। কেন যেন তাঁর মনে হচ্ছিল, শিগগিরই কিছু একটা ঘটবে।

ফিরোজা ও তাঁর দুই কন্যা এখনো জাগেনি। বৃষ্টি বাদলার জন্য অন্য শব্দ শোনা যায় না, গাঢ় ঘুমে ঘুমোচ্ছে তারা। ওদের কি জাগাবার দরকার আছে? পরে তো জানবেই।

অফিসে একটা খবর দেওয়া দরকার, এত রাত্রে কেউ থাকবে না, আলতাফ কিংবা হোসেন সাহেবের বাড়িতে ফোন করা যায়। সম্পাদক হিসেবে তাঁর একটা দায়িত্ব আছে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কে কী কাজ চালাবে সেই নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। কিন্তু পুলিস কি তাকে ফোন করতে দেবে? থাক, এদের কাছে তিনি কোনো অনুরোধ জানাবেন না।

মামুন বললেন, চলেন, আমি রেডি। হাতকড়া দিতে চান তো দ্যান।

ডি এস পি বললো, স্যার, আমাদের ওপর রাগ করবেন না। আমরা হুকুমের চাকর। হাতকড়া দেবার কোনো অডার নাই। আমরা বাইরে অপেক্ষা করতেছি, আপনি কিছু পোশাক-আসাক গুছায়ে লন, যদি গোসল করতে চান, তাও করে নিতে পারেন।

মামুন, বললেন, কোনো কিছুর দরকার নাই, আমি এইভাবেই যাবো।

এবারে পাশের ঘরের দরজা খুলে ফিরোজা বেগম বেরিয়ে এলেন। পুলিস দেখা মাত্র তিনি দৌড়ে এসে মামুনকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, না,

ওনারে নিতে পারবেন না, আমারে না মেরে ফেলে...আমার আব্বাকে খবর দিতে হবে, জসিমদ্দিন সাহেবরে...আমার চাচা সরকারের বড় অফিসার...

মেয়ে দুটিও জেগে উঠলো। বড় মেয়ে হেনা বাবাকে বেশি ভালোবাসে। সে কাঁদতে শুরু করে দিল মামুনকে জড়িয়ে ধরে। এরকম নাটকীয় পরিস্থিতি মামুনের একেবারেই পছন্দ নয়। তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে বোঝাতে লাগলেন যে ভয় পাবার কিছু নেই, নিশ্চয়ই এরা ভুল করে তাঁকে ধরতে এসেছে, তিনি দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

টুথ ব্রাস, পেস্ট ও এক প্রস্থ পোশাক সঙ্গে নিয়ে মামুন বেরিয়ে পড়লেন একটু পরেই। এই পুলিসের দলটি ব্ল্যাক মারিয়া আনেনি, এনেছে একটি জাপানী টয়োটা গাড়ি, পেছনের সীটে বসানো হলো মামুনকে, দু'জনের মাঝখানে। এখনও বৃষ্টি পড়ছে প্রবল ধারায়।

জেল গেটে পৌঁছোবার পর মামুন দেখলেন, আর একখানা গাড়িও থেমেছে সেখানে। সে গাড়ির চালক তাঁর চেনা, মানিক মিঞার বড় ছেলে মইনুল হোসেন হীরত। তারপর তিনি ভালো করে দেখলেন, গাড়ির মধ্যে দীর্ঘদেহী মানিক মিঞাও বসে আছেন পুলিস পরিবৃত হয়ে। তা হলে মামুন একা নন, ধরা হচ্ছে অন্য সম্পাদকদেরও!

প্রথমে তাঁদের দু'জনকে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখা হলো ডেপুটি জেলারের ঘরে। মানিক মিঞার মুখোনি অস্বাভাবিক রকমের বিমর্ষ। এককালে বন্ধুত্ব থাকলেও ইদানীং মানিক মিঞার সঙ্গে মামুনের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। ইত্তেফাক'-এর প্রতিপত্তিশালী সম্পাদক মানিক মিঞা দেখা হলেই মামুনের সঙ্গে ব্যঙ্গের সুরে কথা বলেন। মামুনের দিনকাল পত্রিকার কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই, নীতির বালাই নেই, সম্পাদকীয় লেখা হয় এক সুরে, খবর পরিবেশন করা হয় অন্য সুরে। কথাগুলো একেবারে মিথ্যে নয়, তবু মামুন ঠিক সহ্য করতে পারেন না।

এখন দু'জনেই এক খাঁচার পাখি। মামুন খানিকটা রসিকতার সুরে মানিক মিঞাকে বললেন, পলিটিশিয়ানরা সব ফুরায়ে গেছে, তাই এবার ওরা আমাদের ধরছে, না কি বলেন?

রসিকতার উত্তর না দিয়ে মানিক মিঞা শুষ্কভাবে বললেন, ভাই, আমার মেয়ে বেবীর কাল রাতে একটা বড় অপারেশান হয়েছে, এখনো ক্রাইসিস কাটে নাই, এই অবস্থায় আমারে ধরে আনলো? বেবীর ভালো করে জ্ঞান ফেরার পর যদি এই খবর শোনে, যদি সেই ধাক্কা সামলাইতে না পারে... আমারে আর কয়েকটা দিন জেলের বাইরে রাখলে কি পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেত?

মানিক মিঞা এখন জবরদস্ত সম্পাদক নন, তিনি সন্তান স্নেহে কাতর এক পিতা। মামুন। তাঁর বাহু স্পর্শ করে বললেন, আল্লারে ডাকেন, আল্লা দয়া করবেন, বেবী ভালো হয়ে যাবে।

খানিক বাদে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হলো বিশ নম্বর সেলে। সেই বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের সময় মামুন একবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, তারপর এই দ্বিতীয়বার। ব্রিটিশ আমলে মামুন কখনো জেলখানা দেখেননি, জেলের অভিজ্ঞতা তাঁর স্বদেশী আমলেই। আগেরবারও মামুন এই বিশ নম্বর সেলেই ছিলেন।

এই সেলে আগে থেকেই অনেক আওয়ামী লীগের নেতা বন্দী হয়ে আছেন। মামুন চোখ বুলিয়ে দেখলেন, শেখ মুজিব সেখানে নেই। অন্য নেতারা সবাই বাইরের খবর জানবার জন্য মানিক মিঞাকে ঘিরে ধরলেন, মামুন তাঁদের বেবীর কথা জানিয়ে বললেন, ওনার মন ভালো নেই, এখন একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

বিশ নম্বর সেলে কয়েকটি ছোট ছোট কক্ষ আছে। সি ক্লাস প্রিজনার হিসেবে মামুন ও মানিক মিঞাকে রাখা হলো সে রকম দুটি আলাদা কক্ষে, খোরাকী হিসেবে দৈনিক ভাতা বরাদ্দ হলো দেড় টাকা। লোহার দরজা ছাড়া সেই ঘরে কোনো জানলা বা ভেন্টিলেটার পর্যন্ত নেই। বাইরে বৃষ্টি অথচ এই ঘরের মধ্যে অসম্ভব গরম। আর দুর্গন্ধ। কাছেই একটি পায়খানা, আড়াইশো-তিনশো'জন রাজবন্দীর জন্য ঐ একটাই, প্রায় সর্বক্ষণ তার সামনে লম্বা লাইন।

কষ্ট সহ্য করার একটা নিজস্ব উপায় আছে মামুনের। মনটাকে শরীর থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে নিতে হয়। শরীরটা শুয়ে থাকুক এই কারাগারে, মনটা চলে যাক কোনো আনন্দলোকে।

মামুন চোখ বুজে দৃশ্যের পর দৃশ্য পুনর্নির্মাণ করতে লাগলেন।

...অফিসে নিজের ঘরে একলা বসে মামুন তাঁর একটি লেখার প্রুফ সংশোধন করছিলেন, হঠাৎ তাঁর আদালি এসে খবর দিল, এক মেমসাব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিছুতেই ছাড়বে না। রাত তখন ন'টা। এই সময় কোনো স্ত্রীলোক খবরের কাগজের অফিসে আসে না। আদালিকে তিনি বললেন, নিয়ে এসো।

আলুথালু বেশ, মাথার চুল খোলা, মঞ্জু! এর আগে কোনোদিন সে পত্রিকা অফিসে আসেনি। আজ এত রাত্রে...মামুনকে কোনো প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে সে ঘরে ঢুকেই দৌড়ে এসে মামুনের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো। তার বিলাপের মধ্যে শুধু একটাই কথা, সে কোথায় গেল? সে আর ফিরবে না!

অফিসের মধ্যে এরকম একটা দৃশ্যে ভিড় জমে যাবেই। আলতাফ কিংবা হোসেন সাহেব সে সময় অফিসে ছিলেন না। মামুন অন্যদের চলে যেতে বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কী যে হয়েছে তা মঞ্জু কিছুতেই খুলে বলতে পারে না, শুধু কাঁদে। একটু একটু করে জানা গেল।

শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে সেদিন সমস্ত ঢাকা শহর উত্তাল। বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র-জনতার মিছিলে লাঠি ও গুলি চলেছে। বাবুল দুপুরবেলা বেরিয়ে গেছে, আর বাড়ি ফেরেনি।

এ খবর শুনে মামুন প্রথমে বিচলিত বোধ করেননি। তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে, বাবুল চৌধুরী ও তার বন্ধুরা শেখ মুজিবের সমর্থক নয়। ওরা ন্যাপের চীন পন্থী গ্রুপ।

সুতরাং বাবুল কিছুতেই ঐ সব সভা-মিছিলে যাবে না। শেখ মুজিব লাহোরে গিয়ে ছয় দফা প্রস্তাবের নামে যে বোমা ফাটিয়ে এসেছে, যার জন্য আইয়ুবসাহী আবার বাঙালীদের ওপর খঙ্গহস্ত, সেই ছয় দফাঁকেও সমর্থন করে না বাবুল চৌধুরীরা। শেখ মুজিবের গ্রেফতারে তাদের খুশি হবার কথা।

কিন্তু ঐ সব সভা মিছিলে বাবুল যেতে না চাইলেও মঞ্জু তাকে জোর করে পাঠিয়েছে সিরাজুলের খোঁজ নেবার জন্য। সিরাজুলের সঙ্গে বাবুলের দেখাও হয়েছে, সিরাজুল বাড়ি ফিরেছে অক্ষত শরীরে, তবু কেন বাবুল ফিরলো না?

মঞ্জু ঝগড়া করেছিল তার স্বামীর সঙ্গে, বাবুল এক কাপ চা খেতে চেয়েছিল, মঞ্জু সেই চা-ও দেয়নি, তাই অভিমান করেছে বাবুল, সে বোধ হয় আর কোনোদিন ফিরবে না।

মঞ্জুকে কিছুতেই শান্ত করা যায় না। মামুন তাকে নিয়ে বেরুলেন একটা গাড়িতে, সব কটা হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিলেন, হোম সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গ্রেফতারের লিস্টেও বাবুলের নাম পেলেন না। বাবুলের বিশেষ বন্ধু জহির, কামাল, পল্টনদের বাসায় গিয়েও বাবুলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, বাবুল যেন সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মঞ্জুর তখন পাগলের মতন অবস্থা, কিছুতেই শান্ত করা যায় না তাকে। বাবুল এর আগেও অনেকবার বেশি রাত করে বাড়ি ফিরেছে, আজ অবশ্য শহরের অবস্থা খুব অস্বাভাবিক, কারফিউ জারি করা হয়েছে দশটা থেকে, এর পর আর সে কী করে ফিরবে?

মঞ্জুকে সামলাবার জন্য সারা রাত মামুনকে থেকে যেতে হলো ও বাড়িতে। বাচ্চা মেয়ের মতন মঞ্জুকে তিনি কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই সে ঘুমোবে না। মঞ্জুর কষ্টে মামুনেরও বুক যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাবুলের জন্য তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা হচ্ছিল না। বাবুল বাড়ি না ফেরায় মামুন যেন খুশিই হয়েছিলেন। আজকাল বাবুলকে তিনি একেবারেই পছন্দ করতে পারেন না।

হঠাৎ সবাঙ্গের রোমকূপ শিহরিত হলো এক উপলব্ধিতে। মামুনের মনে পড়ে গেল মুসাফির নামের বিচিত্র লোকটির কথা। অলৌকিক শক্তি আছে নাকি লোকটার, সে দূরের জিনিস দেখতে পায়, সে বলেছিল, মামুনের সংসার ও কর্তব্যের মধ্যে এসে দাঁড়াবে একটি রমণী। তবে কি সে মঞ্জুর কথাই বলেছিল। আর তো কোনো রমণী নেই তাঁর জীবনে! সপ্তাহে তিন-চার দিন অন্তত মঞ্জুকে চোখের দেখা না দেখে মামুন থাকতে পারেন না, মঞ্জুর মুখ তাঁর মনে পড়ে অহরহ, মঞ্জুকে আদর করে তিনি পরম শান্তি পান।

মামুন দু হাতে নিজের মাথা চেপে ধরলেন। মুসাফির যখন ঐরকম ইঙ্গিত করেছে, তখন অন্য লোকেও কি মঞ্জুর সঙ্গে তাঁর একটা নিষিদ্ধ সম্পর্কের কথা ভাবে? সেই জন্যই কি বাবুল আজকাল মামুনকে সব সময় এড়িয়ে যেতে চায়, দেখা হলেও কথা বলে না?

মাথার ওপর আল্লা আছেন, তিনি জানেন, মঞ্জু সম্পর্কে মামুন কখনো কোনো পাপ-চিন্তা করেননি। সেদিন সারা রাত মঞ্জুর সঙ্গে থাকলেও তো তিনি একবারও মঞ্জুকে কামভাবে স্পর্শ করেননি। মঞ্জুকে তিনি ভালোবাসেন ঠিকই, কিন্তু সে তো স্নেহের ভালোবাসা। মঞ্জু যেন তাঁরই সৃষ্টি, মঞ্জুকে তিনি গান শিখতে উৎসাহ দিয়েছেন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন। বাবুল চৌধুরীর সঙ্গে তিনি নিজে উদ্যোগ করে মঞ্জুর বিয়ে দেননি? মঞ্জু তাঁর বন্ধু, মঞ্জু তার সব সুখ-দুঃখের কথা মামুন মামাকে বলে, মঞ্জুর সান্নিধ্যে এলে মামুনের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়, মঞ্জুর অনুরোধে তিনি আবার কবিতা লিখছেন, এসব অন্যায়?

বাবুল ফিরে এসেছিল পরদিন সকালে। সে রাত কাটিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী এক আর্মি অফিসারের বাড়িতে। সেই অফির্সারটি পল্টনের বোন দিলারার স্বামী, তাদের বাসায় কাল। খানাপিনা ছিল, তাই বাবুলকে কিছুতেই ছাড়লো না।

এসব বলার সময় বাবুলের মুখে বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ ফুটে ওঠেনি। যেন একটা রাত বাড়িতে খবর না দিয়ে অন্য জায়গায় কাটিয়ে আসা এমন কিছুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। যেন, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা যখন আইয়ুব সাহীর লাঠি গুলিতে মরছে, তখন পশ্চিম

পাকিস্তানী এক আর্মি অফিসারের বাড়িতে খানাপিনায় যোগ দেওয়া অতি স্বাভাবিক ঘটনা।

মামুনকে দেখে সে যেন খুশিই হয়েছিল, পাতলা হাসির সঙ্গে বলেছিল, আমি তো জানতামই যে আপনি মঞ্জুর খবরাখবর নেবেন, আমি মঞ্জুকে বলেও গিয়েছিলাম আপনাকে খবর দিতে...

তখনই মামুন ঠিক করেছিলেন, তিনি আর কোনোদিন মঞ্জবাবুলদের বাড়িতে আসবেন না। মঞ্জুকে তিনি এতটাই ভালোবাসেন যে মঞ্জুর দাম্পত্যজীবন অটুট রাখার জন্য তিনি চিরকালীন বিচ্ছেদও সহ্য করতে পারবেন। সেই দিনটা ছিল ছ' তারিখ, তার পরদিন প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আগের দিন, তারপর এই দশ দিনের মধ্যে মামুন আর একবারও যাননি ঐ বাড়ির দিকে। এখন কতকাল জেল খাটতে হবে কে জানে, এমনিতেই দেখা হবে না।

দেখা না হলেও মনে মনে কথা বলতে তো বাধা নেই। নির্জন সেলে শুয়ে শুয়ে মামুন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, মঞ্জু সুখু মিঞাকে খাওয়াচ্ছে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গুন গুন করছে গানের কলি, স্নান সেরে এসে সে চিরুনি চালাচ্ছে তার ভিজে, লম্বা চুলে। মঞ্জু কি এতক্ষণে মামুনের গ্রেফতারের খবর জেনে গেছে? এ খবর পেয়ে মঞ্জু কি কাঁদবে? না, তুই কাঁদিস না মঞ্জু, আমি যেখানে, যতদূরেই থাকি, আসলে সব সময় তোর পাশে পাশেই আছি।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলেন মামুন। মুসাফির নামের লোকটা আগেই তার জেলখাটার কথা ফোরকাস্ট করেছিল। লোকটা কি সত্যিই দূরদর্শী, না শয়তান? ওর কথা মনে পড়তেই রাগে মামুনের শরীর জ্বলে যাচ্ছে। এর পর কোনোদিন দেখা হলে ঐ লোকটির সঙ্গে একটা বোঝাঁপড়া করতে হবে।

৫৩ দিনের পর দিন কেটে যায়

দিনের পর দিন কেটে যায়, মামুনের কাছে কোনো ভিজিটর আসে না। দুশ্চিন্তায় অস্থিরতায় তাঁর সারাটা বুক ব্যথা হয়ে গেছে, যেন অসংখ্য বোলতা কামড়েছে তাঁকে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, জোরে শ্বাস টানতে গেলে ঘড় ঘড় শব্দ হয়। একেবারেই খিদে নেই। কিছুই খেতে ইচ্ছে, করে না। খানিকটা হাই-প্রেসার ছাড়া মামুনের অন্য কোনো অসুখ ছিল না, জেলখানায় এসে এরকম শারীরিক যন্ত্রণায় তিনি বিমূঢ় বোধ করছেন। অন্যায়ের প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, এটাই তাঁর বেশি কষ্টের কারণ।

শুয়ে শুয়ে মামুনের মনে পড়ে সেই ভাষা আন্দোলনের সময় কারাবাসের দিনগুলির কথা। সেবারও এই বিশ নম্বরেই ছিলেন, তবে সলিটারি সেলে নয়, বড় হলঘরে অনেকে মিলে একসঙ্গে। সেবারে কোনো রকম ভয় ছিল না, কষ্টবোধ ছিল না। সারাদিন হৈ-হল্লা ও আচ্ছা, মুহুর্মুহু শ্লোগান। পালা করে রান্না, যেন একটা পিকনিক। তখন শরীর ভরা যৌবন ছিল, যৌবন অনেক কিছুই সহ্য করতে পারে, যৌবনের অনেক দুঃখ-যন্ত্রণাকেও মনে হয় বিলাসিতা। এবারে মামুন টের পাচ্ছেন যে তাঁর বয়েস হয়ে গেছে!

শুধু মৃত্যুর কথা নয়, নিজের সংসারের কথা ভেবেও প্রবল দুশ্চিন্তা হচ্ছে তাঁর। বাড়িতে আর পুরুষ মানুষ নেই, ফিরোজা বেগম মেয়েদুটিকে সামলে রাখতে পারবেন? ছোটমেয়েকে নিয়ে তেমন চিন্তা নেই, কিন্তু হেনার মতিগতি বোঝা শক্ত। গত কয়েকটা বছর কাজ নিয়ে এমন পাগলামি করেছেন মামুন যে নিজের পরিবারের দিকে তাকাতে পারেননি, তিনি যেন পিতা কিংবা স্বামী ছিলেন না, ছিলেন শুধু একজন ব্যস্ত সম্পাদক। জেলখানায় এসে মামুন আবার পিতা ও স্বামী হলেন।

এরা খবরের কাগজ পড়তে দেয় না। প্রতিদিন বন্দীর সংখ্যা বাড়ছে, সেল-এর মধ্যে আর তিল ধারণের জায়গা নেই, এরা কি সারা পূর্ব পাকিস্তানের সব শিক্ষিত লোককে জেলখানায় আটকে রাখবে? নতুন যারা আসছে, তাদের মুখে বাইরের খবর কিছু কিছু

জানা যায়, সবই ধর-পাকড় আর অত্যাচারের কাহিনী, মামুনের প্রিয়জনদের কথা কেউ বলতে পারে না। তবে

কোনো কোনো বাড়িতে বারবার খানাতল্লাশের অজুহাতে স্ত্রীলোক ও শিশুদের ওপরেও নাকি নিপীড়ন চলেছে।

মামুনের খুব আশা ছিল, আলতাফ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। বড় উকিল লাগিয়ে তাঁকে জামিনে খালাস করবার চেষ্টা করবে। আলতাফ করিকর্মা মানুষ, সরকারি উঁচুমহলে তার দহরম মহরম আছে। মামুনের ধারণা, আলতাফ তাঁকে এখনো ভালবাসে। রাজনৈতিক নির্বাসন থেকে আলতাফই তো মামুনকে টেনে এনেছিল নতুন কর্মক্ষেত্রে। হোসেন। সাহেবের সঙ্গে এর মধ্যে যতবারই ঝগড়া হয়েছে মামুনের, আলতাফই মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়েছে। ইদানীং হোসেন সাহেবের সঙ্গে মামুনের সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছিল, তিনি আওয়ামী লীগ এবং সে দলের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে একেবারে সহ্য করতে পারেন না। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় থেকেই তাঁর ভারত বিদ্বেষ একেবারে চরমে উঠে বসে আছে, তার ধারণা, শেখ মুজিবের ছয় দফা প্রস্তাব আসলে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য ভারতের চক্রান্ত! ঐ লোকটা ভারতের দালাল। মামুন যত বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, আমাদের ভারত নিয়ে মাথা ঘামাবার এখন কোনো দরকার নেই, আমাদের লড়তে হবে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য। শেখ মুজিব এমন কিছু নতুন কথা বলেননি, তাঁর ঐ ছয় দফা অনেকদিন ধরেই আমাদের মনের কথা। হোসেন সাহেব তা মানবেন না, তিনি টেবিলে কিল মেরে বলবেন, পূর্ব পাকিস্তান আবার কী? পূর্ব পাকিস্তান কি একটা পৃথক দেশ? গোটা পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বার্থের কথা যে চিন্তা করে না, সে হয় হিন্দু ভারতের এজেন্ট অথবা কমুনিস্ট?

মামুনের আপত্তি সত্ত্বেও পত্রিকার চীফ সাব সুধীর দাসকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলেন হোসেন সাহেব। তাঁর কাগজে তিনি কোনো মালাউনকে রাখবেন না। সেই ইস্যুতে মামুন নিজের পদত্যাগপত্র দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা আঁচ পেয়ে সুধীর

দাস নিজেই হঠাৎ চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। লোকটা খানিকটা ফাঁকিবাজ হলেও কাজ জানতো, সে চলে যাওয়ায় মামুনের অসুবিধে হয়েছে যথেষ্ট।

যতই মালিকের সঙ্গে মতবিরোধ থাক, তবু মামুন এখানে দিনকাল পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকা অফিস থেকে সম্পাদকের জামিনের জন্য কোনো চেষ্টাই করা হবে না? আলতাফও চুপচাপ রয়ে গেল?

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন কেউ জিজ্ঞেস করলে, আরে মামুন মিঞা, সারাদিনই কি ঘুমাও নাকি?

লোকটার মাথার পেছনের দিকে আলো, সামনের দিকে অন্ধকার, তাই মামুন মুখখানা ঠিক দেখতে পেলেন না। একজন মোটাসোটা, গোলগাল ধরনের মানুষ। মামুন জিজ্ঞেস করলেন, কে?

পুরনো দোস্তরে একেবারে ভুইলা গ্যালা? আমার গতরখান না হয় খোদার খাসীর লাহান হইছে, কিন্তু গলার আওয়াজও কি পাল্টাইয়া গেছে?

–বদ্রু?

–হ, হ, আমি পটুখালির বদ্রু! মামুন মিঞা, মনে নাই, সেই বায়ান্ন সালে তুমি আর আমি। এক সাথে এই জেলে আছিলাম?

মামুন উঠে বসলেন। বদ্রু শেখ তাঁর পুরোনো বন্ধু হলেও মামুন এখন আর তাঁকে পছন্দ করেন না। বছর তিন চারেক দেখাও হয়েছে, কিন্তু মামুন তাঁর কীর্তিকলাপ সবই জানেন। আমদানি-রফতানির ব্যবসায় অনেক টাকা করেছে সে, তা করুক, কিন্তু বেশ কয়েকটি নারীঘটিত কেলেঙ্কারিও শোনা গেছে তার সম্পর্কে। ঢাকা ও চিটাগাঙে দুটি রক্ষিতা আছে। তার। সে আওয়ামী লীগকে মোটা চাঁদা দেয় আবার সরকারি কর্তাদের ঘুষঘাস দেবার

সব রকম ফন্দিফিকিরই তার জানা। অথচ, এই বদ্রই ছিল একসময় এক ফায়ার ব্র্যাণ্ড পলিটিক্যাল ওয়াকার। রক্ত গরম করা বক্তৃতা দিতে পারতো সে।

মাস ছয়েক আগে মামুনের কাগজের এক তরুণ রিপোটার বদ্রর ব্যক্তিগত জীবনের নানা রসালো খবর ও কয়েকটি ফটোগ্রাফ জোগাড় করে এনেছিল, মামুন সে রিপোর্ট ছাপেননি। সাংবাদিকটিকে তিনি ধমক দিয়ে বলেছিলেন, এই সব কী? কারোর ব্যক্তিগত স্ক্যাণ্ডাল ছেপে আমি কাগজের বিক্রি বাড়াতে চাই না। আসলে পুরোনো বন্ধুর প্রতি মামুন সম্পূর্ণ আবেগশূন্য হতে পারেননি। কিন্তু মামুন না ছাপলেও সেই খবর এবং ছবি অন্য কাগজে ছাপা হয়ে গিয়েছিল এবং বদ্রু শেখ মানহানির মামলা এনেছিল সেই কাগজের বিরুদ্ধে। সে মামলার নিষ্পত্তি আজও হয়নি বোধহয়।

দিনের বেলা লোহার দরজাটা খোলাই থাকে, বদু সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। পকেট থেকে একটা মার্কিনি সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললো, নাও।

মামুনের বুকটা ধক করে উঠলো, বহুদিন পর যেন এক অতি প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ! জেলে আসার সময় মামুনের কুতার জেবে একটি প্যাকেটে সাতখানি সিগারেট ছিল, পরবর্তী দু'দিন অতি কৃপণের মতন সেই সাতখানি সিগারেট উপভোগ করেছেন একটু একটু করে, তারপর আর সিগারেট পাওয়ার উপায় নেই। মামুন শুনেছেন বটে যে কারারক্ষীদের ঘুষ দিয়ে, সিগারেট আনানো যায়, কিন্তু সামান্য নেশার দাসত্ব করার জন্য ঘুষ দেবেন মামুন? মাঝে মাঝেই সিগারেট ছেড়ে দেবার চিন্তা তার মাথায় উদয় হয়েছে আগে, এবারে এই সুযোগে ধূমপানের নেশা একেবারে ত্যাগ করবেন ঠিক করেছিলেন।

বদ্রুর হাতের প্যাকেটটার দিকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতন চেয়ে রইলেন।

বদ্রু মৃদু হেসে প্যাকেটটা মামুনের কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এইটা তুমি রাখো! মামুন প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, ফ্যাকাসে ভাবে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ!

চারদিন পর প্রথম সিগারেটটি ধরাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপতে লাগলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বদ্রু, তোমারে অ্যারেস্ট করলো ক্যান? তুমি রাস্তার ডেমনস্ট্রেশানে গেছিলা নাকি?

বদ্রু মাটিতে বসে পড়ে বললো, নাঃ, আমারে বাসা থিকা অ্যারেস্ট করছে। বত্রিশ ধারায়। দ্যাশ রক্ষা আইনে, আমি দ্যাশের শত্তুর!

মামুন বদ্রুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আইয়ুবের আমলে পূর্ব পাকিস্তানের মাঝারি ব্যবসায়ীরা মোটামুটি খুশী আছে, আগের তুলনায় সুযোগ সুবিধে পাচ্ছে কিছু কিছু। অনেক বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক ও সাহিত্যিককেও নানা রকম উপঢৌকন দিয়ে হাত করেছে গভর্নর মোনেম খাঁ। তারা আর সরকার বিরোধিতা করে না।

বদ্রু বললো, আমারে ধরার একটাই কারণ থাকতে পারে। আমি মার্চ মাসে শেখ মুজিবের সাথে লাহোরে আছিলাম। আমি তার সাপোর্টার।

–আওয়ামী লীগের ডেলিগেশানের সাথে তুমি লাহোর গেছিলা? সে খবর তো শুনি নাই!

–আমি ডেলিগেশনের সাথে যাই নাই। আমি গেছিলাম অন মাই ওউন ব্যবসার কাজে, লাহোর এয়ারপোর্টে শেখ সাহেবরে রিসিভ করলাম; তারপর রইয়া গেলাম সাথে সাথে। মামুন মিঞা সেই মিটিং-এর থ্রিল-এর কথা তোমারে কী কমু! ব্যবসা ট্যাবসা কইরা এখন আমার চামড়া মোটা হইয়া গেছে, চর্বিও জমাইছি অনেক, তবু এই চর্বি-চামড়া ভেদ কইরা রোমাঞ্চ হইলো। আমরাই তো একসময় পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য জান কবুল কবছিলাম, সেই আমরাই আবার লাহোরে...

–লাহোরের মিটিং-এর কথা আমরা সবাই জানি।

–তবু তুমি আমার কাছে শোনো! সেই লাহোর, যেখানে চল্লিশ সালে ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব নেওয়া হয়, যে-প্রস্তাবের বয়ান আমার এখনও মুখস্ত আছে;

□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□-□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ তোমার মনে আছে, মামুন, এই প্রস্তাব পাশ হবার খবর শুনে আমরা কলকাতায় সেদিন আমজাদিয়া হোটেলে বিরিয়ানি খেতে গেছিলাম, কত রাত পর্যন্ত আমোদ করেছি? ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট স্টেটস, ইণ্ডিপেন্টে স্টেটস! স্টেট না, সেই স্টেটসগুলি হবে অটোমাস অ্যাণ্ড সভারেন?

মামুন শুকনো গলায় বললেন, ফর্টি সিক্সে দিল্লি কনভেনশনে আবার লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে বলা হয়েছিল, স্টেটস-এর এসটা টাইপের ভুল, ওটা স্টেট-ই হবে।

–ঐ কনভেনশানের কোনো লিগ্যাল স্ট্যাণ্ডিং নাই! ছয় বছর ধরে যে প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান আন্দোলন চালানো হইলো জনগণের মধ্যে তা হঠাৎ একটা অ্যাজেণ্ডা বিহীন কনভেনশানে বাতিল করে দিলেই হলো? এক পাকিস্তানের নামে পশ্চিমী শাসন?

–যাক, ওসব পুরনো কথা তুলে আর কী হবে?

লাহোরের কথাটা শোনো! সেই ঐতিহাসিক লাহোর, যেখানে পাকিস্তান প্রস্তাব পাস হয়েছিল, সেই লাহোরেই ছাব্বিশ বছর পর, অরিজিন্যাল প্রস্তাবের সেই সুপ্ত এসটা ফিরায়ে আনার দাবি তুললো বাঙ্গালী মুসলমান। পাকিস্তান একটা স্টেট থাকবে না, স্টেটস্ হবে। মুজিবের ছয় দফা তো সেই এস-এর পুনরুদ্ধার ছাড়া আর কী? এর মধ্যে তো পাকিস্তান ভাঙ্গার কথা নাই!

মামুন এবারে শীর্ণভাবে হাসলেন। ইংরেজি অ্যালফাবেট-এর একটি মাত্র অক্ষরের জন্য এত রক্তপাত, এত নির্যাতন, খুন, কারাবাস? বদ্রু শেখ অতি সরল করে দেখেছে ব্যাপারটা।

বদ্রু বললো, সেই কনফারেন্সে তুমি শেখ সাহেবের ব্যক্তিত্ব দ্যাখলে অবাক হয়ে যেতে, মামুন। জানি তুমি শেখ মুজিবকে এখনো পুরোপুরি সাপোর্ট করো না, আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে যখন ন্যাপের জন্ম হয়, তখন তুমি মুজিবকেই সেজন্য দায়ী করেছিলে, আমার ওপরেও চটেছিলে, তাই না? আসলে আমরাই তো আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন রোধ করতে চেয়েছিলাম! এখন দ্যাখো না, ন্যাপের কী ভূমিকা? কোনো ভূমিকাই নাই, আওয়ামী লীগই বাঙ্গালীর একমাত্র পার্টি, যাই হোক, শোনো এবারে লাহোর কনফারেন্সে শেখ মুজিব কী রকম ধীর স্থির ভাবে বোমাটি ফাটালেন, তা যদি তুমি দেখতে! ছয় দফা প্রস্তাবের দাবি নিয়ে বই ছাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সাথে, সেই বইয়ের উপর ল্যাখা, "আওয়ার রাইট টু লীভ"। প্রথমে সেই বই বিলি করে দিলেন সভার মধ্যে, তারপর নিজের বলার সময় উঠে দাঁড়িয়ে নির্ভীক ভাবে গম্ভীরগলায় বললেন, পাকিস্তানে ফেডারেশন গড়তে হবে, তা হবে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে, পূর্ব পশ্চিমের অধিকার হবে সমান সমান! পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু সেই অনুপাতে আমরা বেশি চাই না, সমান সমান চাই, এতে পশ্চিম পাকিস্তানই লাভবান হবে।

এইসব খবরই আমার কাগজে ছাপা হয়েছে বদ্রু। যাই হোক, শেখ মুজিব এখন কোথায়? তারে কি এই জেলে রাখছে?

–না! তার খবর কেউ জানে না, যতদূর মনে হয়, ক্যান্টনমেন্টে তারে লুকায়ে রেখেছে। কোনদিন না গোপনে খতম করে দেয়।

–বাইরের খবর কিছু জানো?

ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে। দেশরক্ষা আইনে নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

–সে খবরও জানি। মানিক মিঞা আছেন পাশের ঘরে। একদিন মাঝরাত্রে তাঁর হাতে ঐ মর্মে সরকারি নোটিস ধরায়ে দিল।

–তোমার কাগজ কিন্তু বার হচ্ছে ডেইলি। পুরাপুরি সরকারের ধামাধরা হয়ে গেছে।

–সম্পাদক হিসাবে কার নাম ছাপা হচ্ছে?

–সেটা লক্ষ্য করি নাই।

–বদ্রু, আমাদের বউ-বাচ্চাদের সংবাদ পাবার কোনো উপায় নাই? এরা কি আমাদের আদালতেও নিয়া যাবে না।

–দেশরক্ষা আইনে জামিন নাই, আদালত নাই। কতদিন এই ভাবে রাখবে তারও ঠিক নাই। আইয়ুব খাঁ বলেছেন না, ছয় দফার কথা যারা উচ্চারণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি ল্যাঙ্গোয়েজ অফ ওয়েপন ব্যবহার করবেন?

–তোমাকে সুখে থাকতে ভূতে কিলালো কেন, বদ্রু? আমি তো শুনেছিলাম পলিটিকসের সাথে তোমার এখন কোনো সম্পর্ক নাই!

–পলিটিকসের সাথে সম্পর্ক নাই, কিন্তু দেশপ্রেম কি কখনো ধুয়ে মুছে যেতে পারে? এক সময় এই পাকিস্তানের জন্য শরীরের রক্ত পানি করি নাই? ভাষা আন্দোলনের সময় আমার বুকে গুলি লাগতে পারতো না? সেইসব কি মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। শোনো মামুন, জানি, তুমি আমার নামে অনেক কথা শুনেছো। তার কিছু সত্যি, কিছু মিথ্যা। দেশের জন্য সব কিছু ত্যাগ করে, খেটে খেটে শরীরটাকে উপোসী রেখে মরে যাবো, সে ফিলোসফি আমার নয়। বয়েসও তো হয়ে গেল অনেক! আমি ভোগেও আছি, ত্যাগেও আছি। বিশ্বাস করো আর নাই করো, দেশের জন্যে এখনো অনেক স্বার্থত্যাগ করি, গ্রামের গরিব-বেকারদের যথাসাধ্য সাহায্য করি, আবার অন্যদিকে, তুমি বোধহয় জানো না, আমার বিবি গত চার বছর ধরে সূতিকায় ভুগে ভুগে বিছানার সাথে মিশে আছে, আমি কাছে

গ্যালেই ভয় পায়... পোলাপানদের মুখ চেয়ে দ্বিতীয় শাদী করি নাই, তা বলে বাকি, জীবনটা কি আমি নারীসঙ্গ বঞ্চিত থাকবো? মাঝে মাঝে শরীরে মাইয়ামানুষের কোমল হাতের ছোঁয়া না পাইলে কোনো কাজেই উৎসাহ আসে না!

এই সময় গেটের বাইরে একজন সেপাই মামুনকে ডাকলেন। বদ্রু মামুনকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করলো সিগারেটের প্যাকেটটা বিছানার তলায় রেখে যেতে। তারপর মামুনের কাঁধ চাপড়ে বললো, গুডলাক। নিশ্চয় তোমার ভিজিটর এসেছে। তোমার কাগজের মালিক হোসেন সাহেব ইচ্ছা করলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে।

মামুনকে নিয়ে আসা হলো ডেপুটি জেলার (সিকিউরিটি)-এর ঘরে। সেখানে মামুনের চেনা কেউ নেই। ডেপুটি জেলার মন দিয়ে একটি ফাঁইল পড়ছে। টেবিলের উল্টোদিকে একটি খালি চেয়ার, অভ্যেসবশতঃ মামুন সেখানে বসতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে একজন সেপাই সে চেয়ারটি সরিয়ে নিল তাঁর পেছন থেকে।

মামুন ধড়াস করে পড়ে গেলেন মাটিতে। ডেপুটি জেলার ও সেপাইটি হেসে উঠলো হা-হা করে। ব্যথার বোধের থেকেও মামুন অবাক হলেন বেশি। চাইডিশ প্র্যাংক! ইস্কুলের ছেলেরা এরকম করে। ডেপুটি জেলার একজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার, আর তিনি একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক!

ডেপুটি জেলার হাসি থামিয়ে বললো, মোজাম্মেল হক সাহেব, বিনা অনুমতিতে কয়েদীদের চেয়ারে বসবার অধিকার নাই, আপনি জানেন না! ঠিক আছে, এবার উইঠ্যা বসেন। অনুমতি দিলাম।

মামুনের পশ্চাৎদেশে বেশ চোট লেগেছে, তবু তিনি মুখ অবিকৃত রাখলেন, উঠলেন না, শান্তভাবে বললেন, ঠিক আছে, আমি মাটিতেই বসছি আপনি কেন ডেকেছেন বলেন!

যে লোকটি কয়েক মুহূর্ত আগে কৌতুকে হাসছিল, সে হঠাৎ এবারে রক্তচক্ষে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, উঠে বসেন! বেয়াদপি করলে...

সেপাইটি মামুনের চুল ধরে টেনে তুললো। বিস্ময়ের ঘোর এক পলকে কেটে গেল মামুনের। তিনি তখনই বুঝতে পারলেন, সামনে কত দুর্দিন আসছে। সরকারি কর্মচারিরা আগে থেকে টের পায়, সেই অনুযায়ী এদের ব্যবহার বদলে যায়। তাঁকে যে রাত্রে গ্রেফতার করে আনা হয়েছিল, সে রাত্রেও এই ডেপুটি জেলারটি তাঁর সঙ্গে অনেক নরম-ভদ্র ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে নতুন কোনো নির্দেশ এসেছে নিশ্চয়ই!

ফাইলটি খুলে রেখে ডেপুটি জেলার জিজ্ঞেস করলো, হক সাহেব, আপনার আব্বা-আম্মার নাম এখানে যা লেখা আছে, তাতে কিছু ভুল আছে মনে হয়। কী কী নাম ছিল বলেন তো?

মামুন নিজের বাবা ও মায়ের নাম বললেন।

ডেপুটি জেলার মাথা নেড়ে বললেন, উঁহু কিছু একটা ভুল আছে। কোনো হিন্দু খানকীর পেটে আপনার জন্ম হয় নাই? আপনার ফেমিলিতে কোনো হিন্দু কানেকশন নাই? তবে, আপনার এই ধুতি-পরা ছবি...

ফাইলটা মামুনের সামনে ঝপাৎ করে ফেলে দিল সে। মামুন দেখলেন তাতে রয়েছে প্রায় বিবর্ণ একটি খবরের কাগজের কাটিং, একটা গ্রুপ ফটো, ফজলুল হকের একপাশে মামুন, বোধহয় উনিশশো চল্লিশ-একচল্লিশ সালের। মামুনের রোগা পাতলা চেহারা, কলকাতায় থাকার সময় তিনি প্রায়ই ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন!

–এই ছবিটা আপনের না? ডিনাই করতে পারবেন?

মামুন বুঝলেন, ভয় পেয়ে কোনো লাভ নেই। এদের কাছে কাকুতি-মিনতি করেও কোনো ফল হয় না। এদের ক্রোধ, হিংস্রতা, খারাপ ভাষা এসবই কৃত্রিম। প্রচণ্ড মাতালকে যেমন কিছুই বোঝানো যায় না।

তিনি শান্ত এবং দৃঢ় গলায় বললেন, ডিনাই করার প্রশ্ন নাই। ধুতি পরেছি আপনার বাবা জীবিত আছেন কি না জানি না, জীবিত থাকলে.তেনারে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, এক সময় অনেক মুসলমানই ধুতি পরতো, সেটা দোষের কিছু ছিল না!

–ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে আপনি মান্থলি কতটাকা পান?

–ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে... ইণ্ডিয়ায় আমার কোনো প্রপার্টি নাই, সেখান থেকে টাকা পাবার তো কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

–ঘেটি সিধা করে কথা বলেন। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে কত টাকা পান?

সেপাইটি চুলের মুঠি ধরে মামুনের মাথাটা সোজা করে ধরে রাখলো। মামুনের মাথাটি যেন কাটা মুণ্ডু, চোখ বিস্ফারিত, ঠোঁট দুটি নড়ছে। তিনি বললেন, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট কোন্ সুবাদে আমাকে টাকা দেবে?

–দালালদের যে জন্য দ্যায়। আপনি ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ ওঝার বাসায় কয়দিন ডিনার খেতে গেছেন?

–মিঃ ওঝা কে, তারে আমি চিনিই না।

–ঝুট বাৎ বললে দাঁতগুলো খুলে নেবো! আপনি শেখ মুজিবর রহমানের সাথে মিঃ ওঝার আলাপ করায়ে দ্যান নাই?

–আপনি যে-সব কথা বলছেন, তার বিন্দু বিসর্গ আমি বুঝতে পারছি না। আমি একজন ল ইয়ারের সাথে যোগাযোগ করতে পারি কি? একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে আমার একটা রাইট আছে।

ডেপুটি জেলার হা-হা করে হেসে উঠলো থিয়েটারি কায়দায়। অকারণে টেবিলে জোরে একটা চাপড় দিয়ে বললো, ঠিক আছে, এখন যান! পরে আবার কথা হবে!

সেপাইটি মামুনকে সেল-এ ফিরিয়ে নিয়ে গেল না, এলো আর একটি ঘরে। বদ্রু শেখ ঠিকই আন্দাজ করেছে। মামুনের একজন ভিজিটর এসেছে। আলতাফ!

আলতাফ একটা চেয়ারে বসে ছিল, দ্রুত উঠে এসে মামুনের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করলো। মামুন পা সরিয়ে নিতে ভুলে গেলেন। আলতাফের এত ভক্তি তিনি আগে কখনো দেখেননি।

খুব কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন সেপাই। তাদের দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আলতাফ বললো, সময় দিছে মোটে পাঁচ মিনিট। জরুরি কথাগুলি আগে বলে নেই, মামুন ভাই। আপনার ' বউ মেয়েরা ভালো আছে। চিন্তা করবেন না। ফিরোজাভাবী আপনার ছোট মেয়েকে নিয়ে মাদারিপুর চলে গেছে, আমি নিজে ওনাদের স্টিমারে তুলে দিয়ে এসেছি। তিন হাজার টাকাও দিয়েছি ভাবীর হাতে।

–আর আমার বড় মেয়ে হেনা?

–সে আছে আপনার আপার বাসায়। সরকারের কাছে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। পারমিশান পাওয়া গেলেই সে আপনার সাথে দেখা করতে আসবে। এবারে আর একটা ভালো খবর দেই মামুনভাই। হোসেনসাহেব 'দিনকাল'-এর সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন আপনাকে। বিশ তারিখ থেকে আপনার সারভিস টারমিনেটেড। সম্পাদক হিসাবে, এখন হোসেন সাহেবেরই নাম ছাপা হবে। এটা একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার, কাগজ-কলমে আপনাকে বরখাস্ত করা হলো। আপনি ফুল তিন মাসের বেতন পেয়ে যাবেন, তারপর অবস্থা আবার নর্মাল হলে আবার আপনাকে সম্পাদক হিসাবে ফিরায়ে নেওয়া হবে নিশ্চয়। এটাই ভালো হল না? দিনকাল পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেই আপনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, এখন আপনি আর সম্পাদক না থাকলে আপনাকে ডিটেইনড় করার কোনো কারণই থাকলো না। আপনাকে ছেড়ে দেবে নির্ঘাৎ।

যেন সেপাইটি এখনও চুলের মুঠি ধরে আছে, এইরকম বিস্ফারিত ভাবে মামুন তাকিয়ে রইলেন আলতাফের দিকে। আলতাফ সুসংবাদ এনেছে! বিনা নোটিসে বরখাস্ত করা

হয়েছে তাঁকে। যে-সময় তাঁর পেছনে একটা সংবাদপত্রের জোর থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, সেই সময়েই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হলো সম্পাদকের পদ থেকে। এখন তিনি একজন সাধারণ নাগরিক। সেইজন্যই ডেপুটি জেলারটি অমন ব্যবহার করতে সাহস পেয়েছে তাঁর সঙ্গে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, আলতাফ, ভালো থেকো তোমরা। আমি আল্লার কাছে দোয়া করবো, যেন তোমাদের কখনো বিপদ না হয়। মঞ্জুবাবুল ভালো আছে তো? আর সুখু মিঞা?

৫৪ করোনেশান ব্রীজের কাছে

করোনেশান ব্রীজের কাছে এসে জিপ থেকে নেমে পড়লো অতীনরা! কৌশিকই বললো, এই ব্রীজটা ওরা হেঁটে পার হবে, গাড়িতে গেলে এমন সুন্দর দৃশ্যের প্রায় কিছুই উপভোগ করা যায় না। কৌশিক এদিকে আগে দু'বার এসেছে। মানিকদাও একবার এসেছিলেন খুব ছোটবেলায়, শুধু অতীনের কাছে তিস্তা নদীর এই রূপ একেবারে নতুন।

ব্রীজের অনেক নিচে নদী, দু পাশে খাড়া পাহাড়, দুপুরের রোদে জল একেবারে রূপোলি। এই রকম কোনো কোনো জায়গায় প্রকৃতি একসঙ্গে অনেকখানি ঐশ্বর্য দেখিয়ে দেয়, যা দেখে মানুষ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

এখানকার সুন্দরের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আছে। শুধু জঙ্গল, পাহাড়, সেতু, ও নদী নয়, সব মিলিয়ে একটা অপূর্ব নির্মাণ।

ব্রীজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে বড় বড় মালবাহী লরি, কয়েকটি আর্মির ট্রাক। একদিকের পাহাড় কেটে রাস্তাটা চওড়া করার কাজে নিযুক্ত কিছু নেপালী শ্রমিক। গাড়ির গর্জন ও পাথর ভাঙা আওয়াজের যে মিলিত ধ্বনি, তাও যেন কানে বেসুরো লাগছে না, এখানে মানিয়ে যায়।

একটু পরে কৌশিক বললো, দ্যাখো অতীন, ব্রীজে ওঠার আগে যে রাস্তাটা সিধে চলে গেল, ওটা গেছে কালিম্পঙের দিকে। আর ব্রীজ পেরিয়ে আমরা যাবো ডান দিকের রাস্তা ধরে হাসিমারায়।

অতীন বললো, কালিম্পঙ! ওখান থেকে একবার ঘুরে আসতে পারি না? কতক্ষণ লাগবে?

ওদের সঙ্গে দীপক নামে আর একটি ছেলে এসেছে, মানিকদার মামাতো ভাই। সে বললো, কালিম্পঙ খুব কাছে নয়, এখন গেলে সন্ধের আগে আর ফেরা যাবে না!

মানিকদার একটা কাশির দমক উঠলো। কাশতে কাশতে তিনি হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলেন। তাঁর গলার দুটো শিরা ফুলে উঠেছে। শিলিগুড়িতে এসেও মানিকদার শরীরের বিশেষ উন্নতি হয়নি।

দীপকের দাদা কাজ করে হাসিমারার কাছে এক চা বাগানে। মানিকদা সেখানে কিছুদিন থাকবেন শরীর সারাবার জন্য। অতীন আর কৌশিক মানিকদাকে হাসিমারায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবে কলকাতায়। শিলিগুড়িতে ওদের কেটে গেছে দু'সপ্তাহ।

কৌশিক মানিকদার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

অতীন কয়েকটা পাথরের নুড়ি জোগাড় করে টুপ টুপ করে ফেলতে লাগলো তিস্তার জলে। এত ওপর থেকে নুড়িগুলো পড়তে বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে, জলে পড়ার পর একটা গোল আবর্ত স্পষ্ট দেখা যায়। অতীন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে বারবার। কয়েকদিন শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে এদিকে ওদিকে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে উত্তর বাংলার পার্বত্য সৌন্দর্য দেখে সে মোহিত হয়ে আছে। দেওঘরের ত্রিকূট ছাড়া বড় পাহাড় তো সে আগে দেখেনি, জঙ্গলের এই রূপও তার জানা ছিল না।

সুন্দর কিছু দেখলেই তার মনে পড়ে অলির কথা। অলিকে নিয়ে এই জায়গায় একবার বেড়াতে আসতে হবে। কোনো কিছুর দিকে অলি যখন অবাক হয়ে কিংবা মুগ্ধ ভাবে

তাকায়, তখন অলির চোখদুটি যে কী গম্ভীর হয়ে যায়। একটা পবিত্র পবিত্র ভাব, অলির মতন ওরকম চোখ পৃথিবীতে আর কারো নেই।

একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে অতীন দেখলো তার হাত কাঁপছে। অলিকে সে অনুভব করছে সারা শরীরে। নিশ্বাসে সে পাচ্ছে অলির চুলের গন্ধ।

অতীনের একটু একটু অপরাধ বোধ হলো। মুখের সামনে ধোঁয়া সরাবার মতন সে হাত নেড়ে অলির ছবিটাকে মুছে দিতে চাইল, যেন অন্যরা টের পেয়ে যাবে, কয়েকদিন ধরে তারা যে সব আলোচনার মধ্যে রয়েছে, সেখানে অলিকে যেন মানায় না।

দীপক বললো, এই যে তিস্তাকে এখানে এত সুন্দর দেখছেন, আসলে কিন্তু ডেঞ্জারাস নদী, বর্ষাকাল এলেই আমাদের ভয় হয়...।

অতীন মুখ ঘুরিয়ে তাকালো দীপকের দিকে, শূন্য দৃষ্টি, কথাটা তার মাথায় ঢুকলো না। অতীন এই মুহূর্তে এখানে নেই, তাকে ফিরে আসতে হবে।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে মানিকদা বললেন, রোদ্দুরটা আমার সহ্য হচ্ছে না রে, চল এবার গাড়িতে উঠি।

মানিকদার চোখের পাতায় সূক্ষ্ম জলের পদা, বেশীক্ষণ কাশতে কাশতে এরকম হয়। তিনি চারদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন, এইসব সুন্দর দৃশ্য দেখবার জন্য মনটাকে তৈরি করতে হয়। আর মন তখনই তৈরি হবে, যখন জানবো যে দেশটা বদলেছে, দেশের সব মানুষ সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার পেয়েছে।

কয়েক পা এগিয়ে মানিকদা আবার বললেন, চারুবাবু ঠিকই বলেছেন, কলকাতায় বসে শুধু তর্ক আর আলোচনায় কোনো কাজ হবে না, আসল সংগ্রাম শুরু করতে হবে এই রকম জায়গা থেকেই।

কৌশিক বললো, মানিকদা কলকাতায় আমাদের স্টাডি সার্কেলে আমরা এই লাইনেই চিন্তা করছিলুম, কিন্তু চারুবাবুর কথাবার্তা অনেক কংক্রিট। উনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে কমরেড লেনিনের পর বিপ্লবী সংগ্রামের নেতৃত্ব এখন মাও সে তুঙ-এর হাতে। চীনের পার্টির বিরোধিতা করা মানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী পথ থেকে সরে যাওয়া। আমাদের পার্টি তো এখন তা-ই করছে।

মানিকদা বললেন, চারুবাবুর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না, আমি জানতুম না যে শিলিগুড়িতে বসে অ্যাকচুয়াল সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে একজন এইসব চিন্তা করছে!

অতীনরা শিলিগুড়িতে পৌঁছবার বেশ কয়েকদিনের মধ্যেও চারু মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। মাত্র দু'দিন আগে এই দীপকই ওদের নিয়ে গিয়েছিল চারুবাবুর বাড়িতে। চারুবাবুর স্ত্রী লীলা দেবীকে দীপক চেনে অনেকদিন ধরে, সেই সূত্রে।

শিলিগুড়ির প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা বীরেশ্বর মজুমদারের ছেলে এই চারু মজুমদার। শীর্ণ, হাড়-চামড়া সম্বল চেহারা, চোখদুটিতে রয়েছে তীব্রতা। বাল্য বয়সে মেধাবী ছাত্র ছিলেন, ফাস্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে পাবনার এডোয়ার্ড কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন, কিন্তু ধরাবাঁধা পড়াশুনোয় মন বসেনি, বি এ পরীক্ষার আগেই কলেজ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন রাজনীতিতে। প্রথম দিকে ছিলেন কংগ্রেসের সোসালিস্ট পার্টিতে, তারপর জলপাইগুড়ি জেলার শচীন দাশগুপ্ত ও বীরেন দত্তের প্রভাবে চলে আসেন কমুনিস্ট পার্টিতে, কাজ শুরু করেন কৃষক ফ্রন্টে। ছেচল্লিশ সালের তেভাগা আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই আন্দোলনকে ছাপিয়ে গেল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ডুয়ার্সের মঙ্গলবাড়িতে পুলিশের গুলিতে মারা গেল এগারোজন, পার্টি নেতৃত্ব সেই আন্দোলন বন্ধ করে দিতে চাইলে চারু মজুমদার দারুণ বিক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই।

জেল থেকে ছাড়া পান তিন বছর বাদে, তখন স্বাধীন ভারতের বয়েস মাত্র চার বছর। প্রকৃত মার্কসবাদীর চোখে এই স্বাধীনতা মোটেই প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, দেশব্যাপী শ্রমিক

কৃষকরা আগের মতনই দারিদ্র্য ও অবিচারের নিগড়ে বন্দী। তিনি কাজ শুরু করলেন চা বাগানের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার আদায়ের আন্দোলনে, সভাপতি হলেন রিকশাওয়ালাদের ইউনিয়নের। কিন্তু পার্টির সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হতে থাকে নানা বিষয়ে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে আন্তজাতিক কমুনিস্ট আন্দোলনের একমাত্র পথ হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। কিন্তু স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর থেকেই ক্রুশ্চেভপন্থী এক ধরনের শোধনবাদ ছড়িয়ে পড়ছে পার্টির নেতাদের মধ্যে। শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ও শোষক-শোষিতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান! পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই বুলি কপচেছেন, এই নীতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া, ভারতের ক্যুনিস্ট পার্টির নেতারাও এই সুবধাজনক নিরীহ পথে এগোতে চাইছে। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় ডাঙ্গে রাজেশ্বর রাও প্রমুখ নেতারা সমর্থন জানালেন নেহরুকে, চারু মজুমদারের মতন আরও কয়েকজন যুব নেতা পার্টির মধ্যে জ্বলন্ত ভাষায় করলেন এর প্রতিবাদ, তাঁরা বললেন, “জন বিরোধী ভারত সরকারই চীনকে আক্রমণ করেছে। কমুনিস্ট আন্তজাতিকতাবাদের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের উচিত এই যুদ্ধের বিরোধিতা করা।” এতটা উগ্রতা প্রমোদ দাশগুপ্তের মতন রাজ্যনেতাদেরও সহ্য হয়নি।

চারু মজুমদার একবার নির্বাচনেও দাঁড়িয়েছিলেন, জলপাইগুড়ির এক বাই-ইলেকশনে। সংসদীয় রাজনীতিতে যাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, তাঁকে নির্বাচনে অংশ নিতে হয়েছিল সম্ভবত স্থানীয় সহকর্মীদের উপরোধে, সেবারে তাঁর জামানত জব্দ হয়েছিল।

ব্যক্তিগত সুখ সাচ্ছন্দ্য অগ্রাহ্য করে তিনি গ্রামে গ্রামে, চা বাগানে কাজ করেছেন অক্লান্ত ভাবে, তাঁর শরীর বরাবরই অপটু, মনোবলই তাঁর প্রধান সম্বল, তবু চৌষট্টি সালে তাঁর একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। কমুনিস্ট পার্টিও সেই সময় দ্বিখণ্ড হয়েছে। তিনি সি পি আই (এম)-এর দিকে চলে এলেও পার্টির নেতাদের চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছেন না। দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রকৃত মার্কসবাদী কর্মীর কর্তব্য কী সে সম্পর্কে তিনি দলিল রচনায় মন দিলেন।

মোট পাঁচটি প্যামফ্লেট রচিত হবার পরেই তিনি গ্রেফতার হলেন দ্বিতীয়বার। পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দের তৎপরতায় প্রায় এক হাজার কমিউনিস্টকে বন্দী করে রাখা হয়। চারুবাবু এতে বিস্মিত হননি। প্রতিক্রিয়াশীল ভারত সরকারের কাছ থেকে এছাড়া আর কী আশা করা যায়? চারুবাবু বিশ্বাস করেন যে কাশ্মীর একটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবার জন্য কাশ্মীরীদের আন্দোলন যুক্তিপূর্ণ, এবং সেই আন্দোলন দমন করার জন্যই ভারত সরকার নানান ছুতোয় পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। প্রকৃত বিপ্লবীর কর্তব্য হচ্ছে এই সরকারকে যতভাবে সম্ভব আঘাত করা।

অতীনরা যেদিন চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল, তার মাত্র একমাস আগে তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এখন তাঁর বয়েস প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, শরীর বেশ দুর্বল। প্রথমে তিনি মানিকদার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতেই চাননি, কলকাতার বক্তৃতাবাজ পার্টি কর্মীদের সম্পর্কে তাঁর মনে স্পষ্ট একটা বিরাগ ভাব আছে বোঝা গেল। মানিকদা ধৈর্য হারাননি, বিনীতভাবে উত্তরবাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে টুকটাক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন, হঠাৎ চারুবাবু ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, আগে আসল কথাটা বলুন তো! সশস্ত্র সংগ্রামের পথে। বিশ্বাস আছে? আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে দেশের এখন যা অবস্থা, তাতে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করার এটাই উপযুক্ত সময়? ‘মজুত উদ্ধার’, ‘ঘেরাও’ ‘লাগাতার ধর্মঘট’, ‘প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট এইসব ন্যাকা মধ্যবিত্ত-সুলভ উগ্র বামপন্থী আওয়াজ শুনলে আমার গা জ্বলে যায়! আপনাদের ঐ সব বিশ্বাস থাকলে আমার কাছে কোনো সুবিধে হবে না!

মানিকদা মৃদু হেসে অতীন ও কৌশিকের দিকে তাকিয়েছিলেন। এইসব ব্যাপার নিয়েই পমপমের বাবার সঙ্গে তাঁর মতভেদ। শ্রমিক ফ্রন্টে শুধু দাবিদাওয়া ও মাইনে বাড়াবার আন্দোলন নিয়ে ঠাট্টা করায় একবার হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রচণ্ড বকুনি দিয়েছিলেন তাঁকে।

মানিকদা বললেন, চারুবাবু সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবে কী করে, কী ভাবে অস্ত্র যোগাড় করা যাবে, সে সম্পর্কে কি আপনি কিছু ভেবেছেন? শাসক দলের সঙ্গে রয়েছে পুলিশবাহিনী ও আর্মি, তাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে অস্ত্র, জোগাড় করাই কি প্রধান সমস্যা নয়?

মানিকদার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থেকে চড়া গলায় চারুবাবু বললেন, অস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকাও আসলে শোধনবাদ! কেন, দা, কুড়ুল, শাবল, কাস্তে, লাঠি এগুলোও কি অস্ত্র নয়? গ্রামের মানুষ এই সব অস্ত্রই ব্যবহার করতে জানে। এইসব দিয়েই লড়াই শুরু করা যায়। গ্রামের মানুষকে বোঝাতে হবে যে জোতদার-পুলিশ বুর্জোয়া

পার্টির অত্যাচারে মুখ বুজে থাকলে চলবে না। প্রতিঘাত করতে হবে। ছোট ছোট এলাকা ভিত্তিক মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

–তারপর?

–তারপর ওদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। মাও সে তুঙ বলেননি যে ‘শত্রুর অস্ত্রাগার আমাদেরই অস্ত্রাগার’ ?

অতীন কোনো কথা বলেনি, সে চুপ করে শুনছিল। মানিকদার সঙ্গে কৌশিক মাঝে মাঝে কথায় যোগ দিয়েছে। চারুবাবুর চোখের দৃষ্টিতে যেন চুম্বক আছে। এমন প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি কথা বলেন যে প্রতিটি শব্দ মনের মধ্যে গেঁথে যায়। গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট ইউনিট গঠন করে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের যে ব্লুপ্রিন্ট দিলেন, তা শুনে অতীনের মনে হয়েছিল, এক্ষুনি কাজ শুরু করা দরকার।

পরের দিনও দীর্ঘ সময় ধরে চারুবাবুর সঙ্গে ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। কিন্তু শেষের দিকে চারুবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাঁর বুকে উঠলো ইসকিমিয়ার ব্যথা। জেলে থাকার সময় তাঁর শরীর আরও ভেঙেছে অথচ মানুষটি যেন কিছুতেই বিশ্রাম নিতে জানেন না। লীলাদেবী তাঁকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন প্রায় জোর করে। মানিকদারও বিশ্রী কাশিটা

না সারালেই নয়। তাই ঠিক হলো কয়েকদিনের জন্য আলোচনা স্থগিত থাকবে। কৌশিক আর অতীনকেও একবার ফিরতেই হবে কলকাতায়।

পাহাড়ী রাস্তা ধরে জিপটা চলেছে, কৌশিক আর মানিকদা চারুবাবু সম্পর্কেই কথা বলে চলেছেন, অতীন আবার অন্যমনস্ক।

অতীন জানে, তার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে। মানিকদার সংস্পর্শে এসে সে দেশের মানুষের কথা ভাবতে শিখেছে। এই সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সে যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত। মানিকদার মতন মানুষ, চারুবাবুর মতন মানুষ যদি নিঃস্বার্থভাবে দেশের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে, তাহলে সেই বা পারবে না কেন? ওঁরা এমন কিছু অসাধারণ মানুষ নন।

কিন্তু মানিকদা বা আরও কয়েকজনকে সে দেখেছে, যাঁরা সর্বক্ষণ এইসব কথাই ভাবেন, আলোচনা করেন, তাঁদের অন্য কোনো দিকে আগ্রহ নেই, কোনো হাসিঠাট্টা নেই, ছাইগাদার মধ্যে একটা গাঁদা-ফুলের গাছ থাকলেও তাঁরা ছাইটাই দেখবেন, ফুল দেখবেন না। তার বন্ধু কৌশিকেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ফার্স্ট ইয়ার সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ার সময় কৌশিক খুব কবিতা-টবিতার চর্চা করতো, নিজেও লিখতে গোপনে গোপনে। সেই কৌশিক হঠাৎ একদিন জীবনানন্দ দাশের একটা কবিতার বই জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল, ধুৎ এসব আর্টস ফর আর্টস সেক-এর সাহিত্য আর কোনোদিন পড়বো না। শুধু শুধু মনটাকে বিগড়ে দেয়।

অতীন অবশ্য কবিতার ভক্ত নয়, তবু নিছক তর্কের খাতিরেই সে বলেছিল, আধুনিক বাংলা কবিতার বই না হয় তুই ছুঁড়ে ফেলে দিলি, কিন্তু তোর কাছে যে শেক্সপীয়রের বই আছে, সেটা কী করবি?

কৌশিক উত্তর দিয়েছিল, ওসব ক্লাসিকস নিয়েও পরে চিন্তা করা যাবে, এখন আলমারিতে। তালা বন্ধ করে রাখবো!

অতীন কবিতার ভক্ত নয়, ফুলটুলেরও ভক্ত নয়, ছাইগাদায় একটা গাঁদা ফুল দেখলে তার চোখ টানে বটে, মন উথলে ওঠে না। কিন্তু তার ভালো লাগে সিনেমা দেখতে, বিশেষত ও ওয়েস্টার্ন ফিল্ম। চৌরঙ্গি পাড়ার হলগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন দেশেরই ছবি আসে বেশি, আর কিছু কিছু ব্রিটিশ ফিল্ম, অন্য কোনো দেশের সিনেমা দেখার তো প্রায় কোনো সুযোগই নেই, তবু ঐ সব ছবিও সে উপভোগ করে। মনে মনে তার একটা অপরাধ বোধ হয়। এসব সিনেমা দেখা তার উচিত নয়, তবু নেশার মতন, দেওয়ালের পোস্টারে সোফিয়া লোরেন, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, গ্রেগরি পেক, ইনগ্রিড বার্গম্যানের ছবি দেখলেই তার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।

আর যখন-তখন মনে পড়ে অলির কথা। স্টাডি সার্কেলের সঙ্গে অলি সম্পর্ক ছেদ করেছে, আর সে তাদের সহযাত্রিণী নয়। অনুপমরা প্রায়ই অলিকে বড়লোকের আদুরে মেয়ে বলে ঠাট্টা করতো। ওরা জানতো, অলি কোনো আদর্শের টানে স্টাডি সার্কেলে আসেনি, এসেছিল শুধু অতীনের টানে। অলিরা বড়লোক? হ্যাঁ, এদেশের স্ট্যাণ্ডার্ডে ওদের বড়লোকই বলতে হবে। অলির বাবা বইয়ের ব্যবসা করেন, তিনিও কি তাহলে শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ? এই গরিবদেশে অন্য অনেক লোককে বঞ্চনা না করে কেউ ধনী হতে পারে না।

তাহলে কি অলির সঙ্গে তার আর মেশা উচিত নয়? এই চিন্তাটা এলেই অতীন দিশাহারা হয়ে যায়। অলি তার নিজস্ব, অলি যেন তার শরীরেরই একটা অঙ্গ। অন্য কোনো পুরুষ অলির সঙ্গে সামান্য ঘনিষ্ঠতা করতে এলেই অতীনের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। এমনকি অলির মেয়ে বন্ধুদেরও সে পছন্দ করতে পারে না। অলির সঙ্গে গল্প করার সময় একদিন বিমানবিহারী ওপরের ঘর থেকে মেয়েকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, অতীন অলির হাত চেপে ধরে রক্ত চক্ষে বলেছিল, এখন যেতে হবে না, একটু পরে যাবে! অতীন জানাতে চেয়েছিল, অলির বাবার চেয়েও অলির ওপর তার অধিকার বেশি!

সেই অলির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ কি সম্ভব?

মানিকদাকে সে ভালোবাসে, মানিকদার কথায় সে প্রাণ দিতে পারে, মানিকদা যদি কোনোদিন বলেন, অতীন, একজন সংগ্রামী কর্মীর পক্ষে ব্যক্তিগত প্রেম ভালোবাসা এগুলো হলো তুচ্ছ বিলাসিতা, এসব এখন মুলতুবি রাখতে হয়, তুমি অলির সঙ্গে আর মিশো না! তখন অতীন কী করবে?

পাহাড় ছেড়ে জিপটা সমতলে নেমেছে,দু'পাশে চা বাগান। অতীন আগে কখনো চা বাগান দেখেনি। বুক সমান উঁচু, সমান করে ছাঁটা গাছ, মনে হয় যেন মাইলের পর মাইল। মাঝে মাঝে এক একটা লম্বা লম্বা অন্য গাছও রয়েছে। দীপক তাকে বোঝালো যে, ঐ গাছগুলোকে বলে শেড ট্রি, ওদের ছায়াটা দরকার, চা-গাছের পাতায় বেশি রোদ লাগলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

দীপক বি এ পাস করে, আপাতত বেকার। বেঁটে খাটো বলিষ্ঠ চেহারা। কিছু কিছু পার্টির কাজ করে, যে-কোনো একটা চা বাগানে চাকরির চেষ্টাও করছে। ছেলেটি অনেক কিছুরই খবর রাখে।

অতীন জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, অনেক জায়গায় তো দেখেছি কোনো বেড়া নেই। বাইরের লোকে চা-পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে পারে না?

দীপক বললো, কত নেবে? একটু আধটু নিলেও কিছু যায় আসে না। তাছাড়া কাঁচা চা-পাতা নিয়ে তো তেমন লাভ নেই, প্রসেসিং না করলে লিকার হয় না। মাঝখানে অনেক ব্যাপার আছে।

কৌশিক বললো, নর্থ বেঙ্গলে চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে কী বিরাট একটা অর্গানাইজড ফোর্স হতে পারে ভেবে দ্যাখ তো? যদি কোনোদিন এরা একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায়...

একটা টি-এস্টেটের মধ্যে ঢুকে পড়লো জিপটা। দু'পাশে চা বাগান, তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। অনেকখানি ভেতরে যাবার পর সব কোয়াটার্স। দীপকের দাদা অসীম এই চা বাগানের সহকারি অ্যাকাউন্টান্ট। তার কোয়াটারে যাবার আগেই সহকারি ম্যানেজারের

বাংলো, সেই বাংলোর চওড়া বারান্দায় বসে আছেন কয়েকজন নারী-পুরুষ। সেদিকে তাকিয়ে দীপক বলে উঠলো, এই রে!

কৌশিক বললো, কী হলো?

দীপক আঙুল দেখিয়ে বললো, ঐ যে খদ্দরের পাঞ্জাবী পরা লোকটাকে দেখছেন, কাঁচা-পাকা চুল, উনি হলেন শৈলেন দাশগুপ্ত!

কৌশিক জিজ্ঞেস করলো, বিখ্যাত লোক? নাম শুনলেই চিনতে পারার কথা?

-নাম শোনেননি? নর্থ বেঙ্গলের বেশ বড় গোছের কংগ্রেস লিডার, অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজারের শ্বশুর হয়, বেড়াতে এসেছে। ঐ শৈলেন দাশগুপ্তের এত ক্ষমতা যে এস পি, ডি এমরা ওর কথায় ওঠে বসে।

মানিকদা বললেন, তাতে আমাদের কী আসে যায়? কংগ্রেসীদের দেখেই ভয় পেতে হবে, এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে নাকি?

-না তা নয়, তবে আপনাদের পরিচয় এখানে না জানানোই ভালো, তা হলে আমার দাদার ট্রাবল হতে পারে!

মানিকদা বললেন, তোমার দাদার কাছে আত্মীয় স্বজনরা বেড়াতে আসতে পারবে না?

অসীমকে কোয়ার্টারেই পাওয়া গেল। সে বিবাহিত, দুটি ছেলেমেয়ে এখানকার স্কুলেই পড়াশুনা করে। অসীম প্রায় মানিকদারই সমবয়সী, ছেলেবেলায় দু'তিন বছর একই স্কুলে পড়াশুনো করেছে। ওদের পেয়ে সে খুব খুশী। শৈলেন দাশগুপ্তর ব্যাপারটা সে আমলই দিল না। বরং বলল, উনি পুরনো আমলের কংগ্রেসী, খুব ভদ্দরলোক!

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর মানিকদা ঘুমিয়ে পড়লেন, অতীন আর কৌশিক চা বাগান দেখতে বেরুলো। দীপকের হাতে একটা লাঠি, চা-ঝোঁপের আড়ালে নাকি অনেক সময় শেয়াল লুকিয়ে থাকে।

চতুর্দিকে শুধু সবুজ, তাতে চোখ জুড়িয়ে যায়। এখন সীজন নয়, তাই কুলি-কামিনদের পাতা তুলতে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। বিশাল চা বাগানটি যেন শুনশান হয়ে পড়ে আছে। দূরের একটা শেড দেখিয়ে দীপক বললো, ঐটে কারখানা, ঐখানে প্রসেসিং-এর কাজ চলছে, ওদিকে যাবেন?

অতীনের কারখানা দেখার ইচ্ছে নেই, সে চায় শুধু এই সবুজের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে।

কৌশিক বললো, সে একবার মধেসিয়া শ্রমিকদের বস্তিটা দেখতে যাবে।

আকাশে আজ রোদ নেই, ঘোরাঘুরি করছে টুকরো টুকরো মেঘ, তার মধ্যে কয়েকটি বেশ কালো, যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। সে যখন বৃষ্টি নামবে, তখন দেখা যাবে, তার আগে এখন আবহাওয়াটি বড় মনোরম।

একটা বাঁক ঘুরতেই শৈলেন দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বেশ দীর্ঘকায় প্রৌঢ়, ধপধপে সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, মুখে বেশ একটা সৌম্য ভাব আছে। তাঁর সঙ্গে একটি যুবতী ও একটি কিশোরী। মেয়েদুটি প্রায় অলি আর বুলির বয়েসী। বড় মেয়েটি লম্বা, ছিপছিপে, মাজা মাজা রং, ভুরুদুটি প্রায় জোড়া। অলির সঙ্গে চেহারার কোনো মিল নেই, তবু তাকে দেখে অতীনের মনে পড়লো অলির কথা।

শৈলেন দাশগুপ্ত নিজেই আগে হাত তুলে বললেন, নমস্কার, আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কুচবিহার না জলপাইগুড়ি?

কৌশিক বললো, আমরা কলকাতা থেকে আসছি। আমাদের একজন আত্মীয় আছেন এখানে।

শৈলেন দাশগুপ্তর বয়েসী লোকেরা সাধারণত অতীন-কৌশিকদের বয়েসীদের সঙ্গে তুমি বলে কথা বলতে শুরু করে। ইনি আপনি বললেন, মানুষটি বেশ আলাপী, অনেক কথা শুরু করলেন কৌশিকের সঙ্গে।

এখানে আসবার আগেই কয়েকটি কংগ্রেসী গুণ্ডার সঙ্গে মারামারি হয়েছে বলে কংগ্রেসী নাম শুনলেই অতীনের গা জ্বলে যায়। শৈলেন দাশগুপ্তর ব্যবহারে তাঁকে অপছন্দ করার কোনো কারণ নেই, তবু অতীন লোকটির দিকে তাকাচ্ছে না, কোনো কথাও বলছে না। এবং একজন কংগ্রেসী নেতার মেয়ে বলে সে ঐ মেয়েদুটিকেও গ্রাহ্য করলো না।

শৈলেন দাশগুপ্ত চা বাগানের খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন আলাপ ফেঁদে বসেছেন কৌশিকের সঙ্গে যে চট করে চলেও যাওয়া যাচ্ছে না। বাবা-জ্যাঠার বয়েসী লোকের সামনে অতীন সিগারেট খায় না, কিন্তু এই লোকটির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য সে ফস করে একটা সিগারেট ধরালো।

মেয়ে দুটি শৈলেন দাশগুপ্তর কন্যা নয়। তিনি নিজেই আলাপ করিয়ে দিলেন, ওরা তাঁর জামাইয়ের বোন, বড়টির নাম শর্মিলা, ছোটটির নাম সুভদ্রা, ওরাও জামসেদপুর থেকে বেড়াতে এসেছে এখানে। অতীনরাও নিজেদের নাম জানালো।

শর্মিলা অতীনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা চিতা বাঘটা দেখেছেন? অতীন অবাক হয়ে বললো, চিতাবাঘ? কোথায় চিতাবাঘ?

শর্মিলা বিস্ময়মাখা হাসি দিয়ে বললো, ওমা, আপনারা চিতা বাঘটার কথা শোনেননি? কাল রাত্তিরে ম্যানেজারের বাংলোয় ধরা পড়েছে, কী সুন্দর দেখতে!

তার ছোট বোন সুভদ্রা দুটো হাত তুলে মাপ দেখিয়ে বললো, এইটুকু, গাটা একেবারে সিল্কের মতন!

শৈলেন দাশগুপ্ত বললেন, চিতা বাঘ নয়, লেপার্ড। এদিকে চা বাগানগুলোতে তো প্রায়ই চলে আসে জঙ্গল থেকে। এটা তিন চার মাসের বাচ্চা হবে, ধরে রেখে দিয়েছে ম্যানেজারের বাংলোয়।

শর্মিলা উৎসাহের সঙ্গে বললো যাবেন, যাবেন, দেখতে যাবেন? আমরা নিয়ে যেতে পারি। চিড়িয়াখানার বাইরে অতীন কখনো জংলী জানোয়ার দেখেনি। লেপার্ডের কথা শুনে তার বুকটা নেচে উঠেছে ছেলেমানুষের মতন। সে কৌশিকের দিকে তাকালো, দৃষ্টি দিয়ে যেন বলতে চাইলো, শ্রমিকদের বস্তিতে যাবার আগে একবার লেপার্ডের বাচ্চাটা দেখে এলে কি খুব দোষ হয়?

কৌশিক বললো, চল দেখে আসি!

শর্মিলা, অতীনের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন, আপনি বুঝি হাসতে জানেন না?

অতীনকে উত্তর দিতে হলো না, তক্ষুনি নেমে গেল ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টি এরকম হুড়মুড়িয়েই আসে। শর্মিলা হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, পালানো চলবে না কিন্তু, আমরা বৃষ্টিতে ভিজবো!

সবাই একটা শেড ট্রির নীচে দাঁড়ালো।

৫৫ তিনবার সিটি দিয়ে থেমে গেল ট্রেনটা

পর পর তিনবার সিটি দিয়ে থেমে গেল ট্রেনটা। সেই তীক্ষ্ণ শব্দ যেন মিশমিশে অন্ধকারের মধ্যে আর্তনাদের মতন শোনায়। এই অঞ্চলটায় কোনো বসতি নেই, ট্রেন লাইনের একদিকে ফসল কাটা মাঠ, অন্যদিকে জলা। ইঞ্জিনের জোরালো আলোয় দেখা যাচ্ছে যে

দুশো আড়াইশো গজ দূরে লাইনের ওপর সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে মানুষের মতন একটা মূর্তি শুয়ে আছে। তা দেখেই ব্রেক কষেছে ইঞ্জিন ড্রাইভার।

ট্রেনটা থামা মাত্র লাইনের দু'পাশ থেকে উঠে এলো সাত আটটি ছায়া মূর্তি। বজবজ থেকে, আসছে এই মালগাড়ি, কোন্ বগিতে কোন্ মাল আছে, তাও যেন এই ছায়ামূর্তিরা আগে থেকেই জানে। টর্চ জ্বেলে দেখে নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো একই বগিতে। তালা ভাঙতে আধ মিনিটও সময় লাগলো না।

ট্রেনের সামনে এবং পেছন থেকে ড্রাইভার ও গার্ড উঁকি মেরে দেখলো। কী ব্যাপার ঘটছে তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়, আজ রবিবার, যে-কোনো কারণেই হোক, রবিবার রাতেই এই সব বেশি ঘটে। সশস্ত্র ডাকাতদের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব গার্ড বা ইঞ্জিন ড্রাইভারের নয়, গার্ডসাহেব তাঁর লগ বুক খুললেন।

ধুপ ধুপ করে চিনির বস্তাগুলো পড়তে লাগলো মাঠে। সুচরিত তার দলের লোকদের ঠিক দশ মিনিট সময় দিয়েছে। মুঙ্গি, ইয়াসিন, লেটো, পন্টুরা এত দ্রুত হাত চালাচ্ছে যে ততখানি তৎপরতার সঙ্গে ভারতের কোনো কলকারখানায় শ্রমিক কাজ করতে জানে না। অনেকের ধারণা ভারতীয়রা অলস, এই মুহূর্তে এসে তারা সুচরিতের দলটাকে দেখুক তো!

সুচরিত নিজে হাত লাগায় না। তার এক হাতে একটা হুইল, সে সিগারেট টানছে উত্তেজিত ভাবে। এই ট্রেনে কোনো আর্মড গার্ড নেই, সে খবর নেওয়া আছে আগে থেকে, একটাও প্যাসেঞ্জার কামরা নেই, কোনো দিক থেকেই বাধা আসবার সম্ভাবনা নেই, তবু বলা যায় না, এক একদিন পুলিশ হঠাৎ কেরানি দেখাবার জন্য ঠিক সময় হাজির হয় অন্ধকার কুঁড়ে, কাগজে নিজেদের বীরত্বের কাহিনী ছাপাবার জন্য সেদিন তারা গুলি চালায়। পুলিশের মতন এমন নিমকহারাম প্রাণী সুচরিত আর দ্বিতীয় দেখেনি, এরা টাকাও খাবে, আবার মর্জি মতন এক একদিন গুলিও চালাবে।

ইঞ্জিনটার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সুচরিত। ইঞ্জিন ড্রাইভার সম্ভবত তাকে দেখতেও পাচ্ছে, তাতে কিছু যায় আসে না। ঠিক দশ মিনিট পার হতেই সে গার্ড সাহেবের ভঙ্গিতে লম্বা করে হুইল বাজালো। কাজ শেষ, সে এখন ট্রেন ছাড়ার নির্দেশ দিচ্ছে। লাইনের ওপর সাদা কাপড় জড়ানো মূর্তিটা সরে গেল এই মুহূর্তে, ইঞ্জিন ড্রাইভার আবার সিটি দিল নিয়মমাফিক।

পরিষ্কার কাজ, কোনো ত্রুটি নেই। রেলের লোকেরা সাধারণত পয়সা পেলে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যে-ট্রেন লুঠ হবে, সে-ট্রেন কোনো দিন এক মিনিটও লেট করে আসে না। লুণ্ঠিত হবার জন্য তার ব্যাকুলতা অতি নিখুঁত। এখন ঠিক দশটা পঁচিশ।

মাঠের মধ্যে অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একটি ট্রাক। বস্তাগুলো এবার ট্রাকে ওঠাতে হবে। চিনির দাম এখন সোনার মতন। খোলা বাজারে চিনি উধাও, কন্ট্রোলেও সরকার চিনি দিতে পারছে না। অধিকাংশ র‍্যাশান শপেই চিনি নেই, মিষ্টির দোকানগুলো বন্ধ হবার উপক্রম। বিয়ে বাড়িতে মিষ্টি খাওয়াবার জন্যও সরকারের কাছে পারমিট চাইতে হয়, তার জন্যও কত ধরাধরি।

বস্তাগুলো লোডিং হচ্ছে অতি সাবলীল দ্রুততার সঙ্গে। সুচরিত অনবরত মাথা ঘোরাচ্ছে এদিক-ওদিক। কোথাও কোনো আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে কি না। তার মাথার মধ্যে একটাই কথা ঘুরছে, পুলিশকে বিশ্বাস নেই, পুলিশকে বিশ্বাস নেই!

কয়েকটা বস্তা তোলা তখনও বাকি, ছায়ামূর্তিগুলির মধ্য থেকে একজন সুচরিতের কাছে এগিয়ে এসে বললো, ওস্তাদ, একটা কথা আছে।

কিছুদিন আগেও সঙ্গীসাথীরা সুচরিতকে শুধু ল্যাঙা বলে ডাকতো। খিদিরপুরের কেসটার পর সে ওস্তাদ হয়েছে। এমনি এমনি দলপতি হওয়া যায় না, তার জন্য মুরোদ লাগে। আর এ লাইনের শ্রেষ্ঠ মুরোদ হচ্ছে ধরা পড়ার পরেও পালাবার ক্ষমতা দেখানো। সেবার ওদের কাজটা ছোটই ছিল, ডক এরিয়া থেকে এক পেটি রিস্টওয়াচ ডেলিভারি আনা। পেটিটা জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে একজন, সুচরিত আর তার দু'জন

সঙ্গী শুধু পেটিটা ডক এরিয়া পার করে আর এক জায়গায় পৌঁছে দেবে। এমন কিছুই না। কিন্তু তিন নম্বর গেটের কাছাকাছি হঠাৎ তিনজন আর্মড গার্ড ওদের ঘিরে ধরলো, বন্দুক উঁচিয়ে বললো, হল্ট! তখন আর কোনো উপায় নেই, হল্ট বলার আগেই যে গুলি চালায়নি, সেই ওদের বাপের ভাগ্য, এবার ভাগ্যে আছে জেলের খিচুড়ি। একজন গার্ড মুঙ্গির পেটে অকারণে কষালো একটা লাথি, ঠিক সেই মুহূর্তে সুচরিত একটা পেটো ঝাড়লো অন্য একজনের ঠিক বুকের ওপর। শুধু তার হাতেই ছিল বন্দুক। লোকটা মরবার আগে গলা দিয়ে একটা আওয়াজও বার করতে পারেনি। সুচরিতের সেটাই প্রথম খুন এবং নিখুঁত খুন। তিনজন গার্ডকে এক লাইনে রেখেছিল সে। অন্য দু'জন এগিয়ে আসার সময় পায়নি।

পালাবার সময় সুচরিত রিস্টওয়াচের পেটিটাও ফেলে আসেনি। খোঁড়া পায়ে সুচরিত ঠিক মতন দৌড়োতে পারে না, সে ক্যাঙারুর মতন লাফায়, সাঙ্ঘাতিক তার দম, দেড় দু' মাইল ওরকম একটানা লাফিয়ে চলে আসতে পারে। সে রাতে আলিপুরের আখড়ায় মুঙ্গিরা। সুচরিতকে কাঁধে করে নেচেছিল, মদ খেয়ে চুরচুর মাতাল হয়েছিল এবং তখন থেকেই ওস্তাদ খেতাব দেওয়া হয়েছিল তাকে।

এ-লাইনে একটা অলিখিত নিয়ম আছে, যতই মাথা গরম হোক আর যতই ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকুক, কিন্তু পুলিশের গায়ে হাত দেওয়া চলবে না। পুলিশ বাহিনী নিজ পরিবারের প্রতি অতি বিশ্বস্ত। সামান্য একজন কনস্টেবলের মৃত্যুও পুলিশ বাহিনী সহ্য করে না। পুলিশকে যে মারবে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। পুলিশ এমনিতে চোর-ডাকাত-ছিনতাইবাজ-ওয়াগন ব্রেকার ইত্যাদি সকলেরই মোটামুটি সুলুক সন্ধান জানে, কাকে কখন ধরবে বা ধরবে না, সে ব্যাপারে তাদের নিজস্ব নিয়মকানুন আছে, ওপর থেকে চাপ আছে, কিংবা ধরা-ছাড়ার মধ্যে নানা রকম চুক্তি করা যায়। কিন্তু কোনোক্রমেই কোনো পুলিশের খুন সহ্য করা হবে না, পুলিশকে মেরে এ-লাইনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এরকম একজনকেও দেখা যাবে না।

সুচরিত তা জানতো এবং সেই রাতেই সে ঠিক করেছিল, এ লাইন থেকে চিরবিদায় নেবে। কিন্তু তার ভাগ্য ভালো, যাকে সে খুন করেছিল, সে পুলিশ নয়, কোনো একটি কোম্পানির গার্ড, পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সুতরাং তার খুন নিয়ে পুলিশ বাহিনী বিশেষ মাথা ঘামায়নি। শুধু ডক এরিয়া ছাড়তে হয়েছে সুচরিতকে। বাল্লুর ডাক শুনে সুচরিত চমকে উঠে বললো, কী রে?

এই বাল্লু সুচরিতের চেয়ে বছর চারেকের বড়, মাথায় তারই সমান ঢ্যাঙা, একটা চোখ ট্যারা। সে বললো, ওস্তাদ, যাবার পথে দশটা বস্তা গড়িয়ায় কিষেণচাঁদের গোডাউনে নামিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

সুচরিত ভুরু বাঁকিয়ে বললো, কেন? কিষেণচাঁদের সঙ্গে তো কোনো কনট্রাক্ট নেই।

বাল্লু বললো, কিষেণচাঁদ খুব করে ধরেছে। গড়িয়া-সোনারপুরের দিকে একদানা চিনি নেই। যা খুশী দাম পাওয়া যাচ্ছে।

যা ভাগ। বস্তাগুলো তোল জলদি। আমি কথার খেলাপ করি না। পুরো ডেলিভারি দমদমে যাবে।

এক ওয়াগনে কতগুলো বস্তা থাকবে তার কি কোনো ঠিক ছিল? দশটা বস্তা কম থাকতে পারে না!

কিষেণচাঁদকে বলবি, আসছে হপ্তায় দেখা যাবে!

শোনো ওস্তাদ, শোনো...

ওঠ ওঠ, আগে লরিতে ওঠ!

দলপতি হিসেবে ট্রাক ড্রাইভারের পাশেই সুচরিতের বসবার কথা। কিন্তু সুচরিত এসে পেছন দিকে তার দলবলের সঙ্গে বস্তাগুলোর ওপরেই বসলো। অসহ্য গুমোটের রাত।

এখানে বসলে তবু একটু আরাম পাওয়া যায়। আকাশে জমাট মেঘ, এক একবার একটু-একটু চাঁদের আলো ছিটকে আসছে।

চলন্ত ট্রাকে কেউ কোনো কথা বলছে না। এ কাজে দারুণ উৎকণ্ঠা থাকে, পরিশ্রমও প্রচুর, যতক্ষণ কাজ চলে ততক্ষণ অন্য কোনো বোধ থাকে না, তার পরেই খুব অবসন্ন লাগে। এখন মাল টানার জন্য গলা সকসক করছে সবার, কিন্তু সঙ্গে কিছু নেই। একটা বস্তা ফুটো হয়ে গেছে, তার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে ছাদাটাকে বড় করে নিয়ে, চিনি বার করে করে খাচ্ছে মুঙ্গি আর লেটো।

মাঠের মধ্য দিয়েই অনেকটা যাবার পর ট্রাকটা একটা রাস্তায় উঠলো। একটা কোনো কারখানায় অনেক আলো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে লেটো বলল, এ আবার কোন দিকে যাচ্ছে?

বাল্লু সুচরিতের দিকে তাকিয়ে বললো, ওস্তাদ, ড্রাইভারকে আমার বলা ছেল, একবার গড়িয়ায় ঘুরে যাবে।

দু'তিনজন অবাক হয়ে একসঙ্গে বললো, গড়িয়া? কেন?

সুচরিত প্রশ্রয়ের হাসি দিয়ে বললো, এই শালা বাল্লুটা মহা এটেলবাজ! বারণ করলাম, তাও শুনলো না! ওর কোন পেয়ারের নাগরকে চিনি খাওয়াবে।

বাল্লু বললো, আমি কিষেণচাঁদকে কথা দিইছি, কিছু না দিতে পারলে আমার প্রেস্টিজ পাংকচার হয়ে যাবে। মালকড়ি ভালো ছাড়বে!

মুঙ্গি বললো, কিন্তু ওস্তাদ, ভাটিয়ার কাছে আমাদের কথার খেলাপ হয়ে যাবে না? ওকে পুরো ডেলিভারি দেবার কথা। এই বাল্লু, হারামি, তুই কিষেণচাঁদের সঙ্গে সিঙ্গল সিঙ্গল কথা বলতে গেলি কেন?

বাল্লু তরপে উঠে বললো, বেশ করিছি! বেশ করিছি! আমার হক আছে।

সুচরিত হাত তুলে বললো, আঃ, ঝগড়া করছিস কেন? যাক গে, বাল্লু বলেছে যখন, দশটা বস্তা নামিয়ে দেবো। কিরে বাল্লু, নগদা দেবে তো?

বাল্লু বললো, হাতে হাতে।

সুচরিত তার কাঁধ চাপড়ে বললো, ঠিক আছে! দে, একটা সিগ্রেট ছাড় তো।

কারখানাটা পার হয়ে যাবার পর রাস্তাটা আবার ফাঁকা। একেবারে শুনশান। একটা সাইকেল রিকশাও চলছে না। রাস্তার ধারে ধারে এদো পুকুর, এখন একটু জ্যোৎস্না পড়ে চকচক করছে জল।

সুচরিত বসে আছে ড্রাইভারের ঠিক পেছন দিকটায়। এবারে সে মুখ ঝুঁকিয়ে বললো, গাড়িটা একটু শ্লো করো তো, আমি একটু হিসি করতে নামবো।

লেটো বললো, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ছেড়ে দাও না!

সুচরিত বললো, নাঃ, নামতে হবে। কী রে বাল্লু, তুই যাবি?

আমার পায়নি কো, তুমি যাও ওস্তাদ!

সেটাই বাল্লুর ইহজীবনের শেষ কথা। সুচরিত হঠাৎ জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরলো বাল্লুর গালে। আচমকা যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠতেই সুচরিত তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে বললো, কুত্তার বাচ্চা, আমার কথার ওপর কথা! এত সাহস তোর...

কথা বলতে বলতেই সুচরিত বাল্লুর পেটে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে। পুরো বাঁ দিক থেকে ডান দিক। চুলের মুঠি ধরেই বাল্লুর মাথাটা বাইরের দিকে নিয়ে এসে গলাটা চেপে ধরলো ট্রাকের এক পাশের কাঠের দেয়ালে। অর্ধেক বলি দেওয়া পাঁঠার মতন ছটফট করতে করতে বিকট চ্যাঁচাতে লাগলো বাল্লু, তবে দু'তিনবার মাত্র, তার মধ্যেই সুচরিত শেষ করে দিল তাকে।

একটা পা খোঁড়া বলেই বোধ হয় সুচরিতের হাত দুটোয় সাংঘাতিক জোর। সে এবার বাল্লুর নিথর শরীরটা উঁচু করে তুলে ছুঁড়ে দিল রাস্তার ধারে। তারপর ট্রাক ড্রাইভারকে বললো, চালাবি? না তুইও ঝাড় খাবি? সোজা দমদম!

অন্যরা চুপ করে বসে আছে, বাল্লুকে সাহায্য করবার জন্য কেউ একটা আঙুলও তোলেনি। কয়েক মিনিট আগে সুচরিত বাল্লুর সঙ্গে হেসে কথা বলছিল, তার কাছে সিগারেট চাইলো, তারপরেই সে ছুরিটা চালিয়ে দিল। সুচরিতের এই বিচিত্র মেজাজটাকেই ওরা ভয় পায়।

সুচরিতের অনুমতি ছাড়াই ট্রাক ড্রাইভারকে গড়িয়ায় যাওয়ার নির্দেশের কথা বাল্লু যেই উচ্চারণ করেছে, সেই মুহূর্তেই সুচরিত মনে মনে তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এরকম অবাধ্যতার প্রশ্রয় দিলে দল চালানো যায় না। অন্যরা একটু আগে তাকে হাসতে দেখলেও আসলে সুচরিতের রাগ বড্ড বেশি, যখন তখন চড়াৎ করে চড়ে যায়। বাল্লুকে খতম করার জন্য তার আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এই রকম ভাবে রাস্তার ওপর, ট্রাক থামিয়ে, রাতও এমন কিছু বেশি নয়, পেটে ছুরি খেলে খানিকটা চ্যাঁচাবেই...কিন্তু সুচরিত আর ধৈর্য রাখতে পারলো না। অবশ্য এইসব রাস্তায় রাত এগারোটাতেই কারুর মৃত্যু আর্তনাদ শুনলেও অন্য কেউ কৌতূহলী হয়ে দেখতে আসবে না।

দুটো চিনির বস্তার ওপর অনেকখানি রক্ত পড়েছে। ভেতরের কিছু চিনি ডেলা পাকিয়ে যাবে। অনেক চিনির সঙ্গে মিশে গেলে তেমন কিছু বোঝা যাবে না, ওরকম কিছু কিছু ডেলা তো থাকেই। এখন চিনি যা আক্রা, এক দানা কেউ ফেলতে চায় না। হয়তো এই চিনি দিয়েই কোনো বিয়ে বাড়িতে তৈরি হবে সন্দেশ-রসগোল্লা, যারা খাবে, তারা কিছু টেরও পাবে না।

ঘামে ভিজে গেছে সুচরিতের সারা গা। এখনও সে ঘামছে গলগল করে। গায়ের জামাটা সে খুলে ফেলে সেটা মুঙ্গির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, যতটা পারিস রক্তটা মুছে ফ্যাল তো এটা দিয়ে!

মুঙ্গির পাশে বসে আছে ইয়াসিন। বাল্লুই তাকে অন্য দল থেকে ছাড়িয়ে এ দলে এনেছে। সে বললো, তুমি ঠিক করেছো, ওস্তাদ! ও শালা অনেকদিন ধরেই তোমার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছিল। তুমি কিছু না বললে একদিন আমিই ওকে ঝাড়তুম!

লেটো বললো, গড়িয়ার ঐ কিষেণচাঁদ কী রকম মাল আমি জানি। ওখানে গেলে পুরো ট্রাক হাপিস করে দিত।

তারপর সবাই বললো কিছু না কিছু। এসব হচ্ছে সুচরিতের প্রতি আনুগত্যের শপথ। অবশ্য এটা শুধু আজ রাতের জন্য, কাল রাতেই ওদের মধ্যে কেউ আবার বদলে যেতে পারে।

মাসখানেক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হলো সুচরিতকে। বাল্লুর একটা ভাইও যে এ-লাইনে আছে, তা আগে কোনোদিন জানা যায়নি। সেই কালু নাকি বদলা নেবার জন্য সুচরিতকে খুঁজছে। দুই ভাইতে ভাব ছিল না মোটেই, ভাব থাকলে তো দু'ভাই মিলে একসঙ্গেই কাজ করতো। একটি রক্ষিতাকে নিয়েই নাকি দুই ভাইয়ে ঝগড়া। কিন্তু এখন বাল্লুর মৃত্যুর পর কালু যদি বদলা নেবার চেষ্টা না করে, তা হলে তার সাকরেদদের কাছে মান থাকে না।

এই সব খবর সুচরিত শুনলো ইয়াসিনের কাছ থেকে। লেকের আস্তানা আগেই ছেড়েছে সুচরিত, এবারে সে ঘাঁটি গাড়লো রাজাবাজারে। এর আগেও একবার তার অভিজ্ঞতা হয়েছে, আত্মগোপন করার জন্য মুসলমান বস্তিই সবচেয়ে ভালো জায়গা। মুসলমান বস্তির খুব ভেতরে পুলিশও ঢুকতে চায় না, হিন্দু গুণ্ডারাও এদিকে এসে হামলা করতে সাহস পায় না, তাতে যখন তখন কমিউনাল রায়টের রূপ নিতে পারে। খাঁটি লাইনের লোকেরা ঐ সব উটকো ঝামেলা এড়িয়ে চলে।

ইয়াসিন তাকে একটা ঘর জোগাড় করে দিয়েছে। এখানে সুচরিতের নাম আবু শেখ। মাসখানেকের মধ্যেই মুখে বেশ দাড়ি গজিয়ে গেছে তার। এই রকম সময়ে দাড়ি রাখাই নিয়ম। পুলিশের দিক থেকে সুচরিতের কোনো ভয় নেই। পুলিশের সঙ্গে বাল্লুর তেমন

কিছু আশনাই ছিল না। বাল্লুকে কে মেরেছে, ওদিককার পুলিশ তা জানে, বাল্লুর হত্যাকারীকে যে কালু খুঁজছে তাও তাদের অজানা নয়, এই সব গল্প তাদের কাছে খুব মুখরোচক। বাল্লু খুন হয়েছে বেঙ্গল পুলিশের এরিয়ায়, ক্যালকাটা পুলিশ তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাবে ন। তাদের অন্য কত কাজ আছে।

এই রাজাবাজারের বস্তিতে ইয়াসিন ছাড়াও বজলু আলি নামে আর একজনকে আগে থেকেই চেনে সুচরিত। বজলুর বয়েস বছর তিরিশেক, সে সংসারী মানুষ, তার ঘরে বিবি ও বালবাচ্চা আছে, তার একটা প্রকাশ্য চাকরিও আছে এক দর্জির দোকানে। কিন্তু বজলু খুব গোপনে মেয়ে চালান দেবার কাজ করে। মুর্শিদাবাদের গ্রাম থেকে মেয়ে এনে সোনাগাছির দালালদের কাছে বিক্রি করে দেয়। বছর দু'এক আগে মুন্সির মারফৎ বজলু এসেছিল তার কাজে সহযোগিতার একটা প্রস্তাব নিয়ে। অনেক ভেবেচিন্তে সুচরিত শেষপর্যন্ত রাজি হয়নি। ও লাইনে লাভ খুব কম। একটা মেয়ের দাম মাত্র আড়াই শো, তিনশো টাকা। বোম্বাই নিয়ে গিয়ে বেচতে পারলে পাঁচশো সাতশো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মাঝখানে খরচখচা আছে।'

সুচরিতকে চিনতে পেরেও বজলু কারুর কাছে মুখ খুললো না, বরং নিজের বাড়িতে একদিন সুচরিতকে দাওয়াত করে খাওয়ালো। একটা মাঠ কোঠায় দোতলায় থাকে বজলু, দর্জির দোকানের কর্মচারি হলেও তার ঘরে রেডিও আছে, খাঁটিয়ার ওপর বেশ বাহারী ফুলছাপ দেওয়া একটা চাঁদর। বেশ খাতিরযত্ন করলো সে সুচরিতকে। তার এই অতিথি বড় গোস্ত খাবে না ভেবে সে নিজের একটি পোষা মুগাঁ জবাই করেছে। সুচরিত অবশ্য সবই খায়।

বজলুর বউকে দেখে সুচরিতের মাথা ঘুরে গেল। তার চেনা এক নারীর সঙ্গে এর মুখের দারুণ মিল। টানা টানা চোখ, চওড়া কপাল, বেশ সুন্দরী এই রেশমা। ঘরে এমন বউ থাকতেও, বজলু মেয়ে-চুরির কারবার চালিয়ে যেতে পারে? কিংবা, এই মেয়েটিকেও কোনো

জায়গা থেকে চুরি করে এনেই শাদী করেছে নাকি? একথা জিজ্ঞেস করা যায় না। কিন্তু রেশমাকে দেখে রীতিমতন কাতর হয়ে পড়লো সুচরিত। প্রথম দর্শনেই প্রেমের মতন। যদিও সে জানে, বজলুর পরিবারের দিকে সে হাত বাড়াতে পারবে না, বজলু তাকে শেষ করে দেবে। বজলু হয়তো তার মতন ছুরি চালাতে জানে না, কিন্তু চোখ দেখলেই বোঝা যায়, বজলু কাকের মতন ধূর্ত, তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

রেশমাকে দেখার পর থেকে সুচরিত নারীসঙ্গ কাতর হয়ে পড়লো। কিন্তু এখন কোথাও যাওয়া যাবে না। কালু এখন সবকটা বেশ্যাপল্লীতেই তাকে খুঁজে বেড়াবে। কালুকে একবার দেখা দরকার সুচরিতের, মানুষটার চেহারা ও চোখ মুখ না দেখলে তার ক্ষমতা ঠিক আন্দাজ করা যাবে না। এটা তো ঠিকই যে হয় কালু তাকে মারবে অথবা সে মারবে কালুকে। নিয়তি তাদের একদিন মুখোমুখি দাঁড় করাবেই। অবশ্য, কাল্লু অন্য কোনো লোকের হাতে বা পুলিশের হাতে এরমধ্যে খতম হয়ে যেতে পারে। যেমন, সুচরিতকেও যে-কোনো দিন ধরিয়ে দিতে পারে ইয়াসিন কিংবা বজলু। সুচরিত নিজে কাছে বিশেষ টাকাপয়সা রাখেনি, সেকথা সে জানিয়েও দিয়েছে ওদের দু'জনকে।

কতদিন আর এই একটা বস্তির মধ্যে চুপচাপ শুয়ে বসে কাটানো যায়? সুচরিত একটু একটু বাইরে বেরুতে চাইলে ইয়াসিন নিষেধ করে। বাজার খুব গরম। কালুর অনেক সাঙ্গপাঙ্গ আছে। কালু নাকি লাইনে রটিয়ে দিয়েছে যে ল্যাঙা ওস্তাদটার যে খোঁজ দিতে পারবে, তাকে সে পাঁচশো টাকা ইনাম দেবে। একথা শুনে সুচরিতের মনে হয়, পাঁচশো টাকার লোভে ইয়াসিনই তাকে ধরিয়ে দেবে না তো? এবার জায়গা বদল করতে হবে।

আরও একটা কারণে এই জায়গাটা ছাড়া দরকার। রেশমার চিন্তা তাকে পাগল করে দিচ্ছে। একদিন দুপুরে বজলুর অনুপস্থিতিতে সুচরিত তার বাড়ি গিয়েছিল, রেশমা বেশ সহজ ভাবে কথা বলে, তাকে বিরিয়ানি আর বুরহানি খাওয়ালো। সুচরিতের পাগলের মতন ইচ্ছে করছিল রেশমাকে জড়িয়ে ধরতে, অতি কষ্টে সে নিজেকে দমন করেছে।

দিনের বেলা আস্তে আস্তে বেরুতে শুরু করলো সুচরিত। কোনো কাজকর্ম না থাকলে তার শরীর নিশপিশ করে। কাজের চেয়েও তার বেশি প্রয়োজন আধিপত্য, তার অধীনে পাঁচ-সাত-দশজন লোক থাকবে, সে তাদের ওপর হুকুম চালাবে, এতেই তার বেশি আনন্দ। রাজাবাজারের বস্তিতে সে যেন ইয়াসিন আর বজলুর দয়ার ওপরে আছে। সে এখন একটু প্যাঁচে পড়েছে বলে বজলু আবার তাকে সেই প্রস্তাবটা দিয়েছিল। দুটো মাল নিয়ে যেতে হবে। বোম্বাই। বোম্বাইতে গেলে সুচরিত কিছুদিন নিরাপদে থাকতে পারবে। সুচরিত রাজি হয়নি।

বস্তির মোড়ে একটা ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যান্ড। কিছু ঘোড়ার গাড়ি এখনও এই অঞ্চলেই টিকে আছে। এই মোড়ের মাথায় একজন সৌম্যদর্শন মুসলমান ভদ্রলোককে ঘিরে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। একে ঘিরে এরকম ভিড় মাঝে মাঝেই দেখে সুচরিত। ভদ্রলোকটি সিল্কের লুঙ্গি ও সিল্কের পাঞ্জাবি পরে, মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি, হাতের ঘড়ির ব্যান্ড ও চোখের চশমার ফ্রেম মনে হয় সোনার। সুচরিত কৌতূহলী হয়ে ভিড়ের মধ্যে উঁকি মেরে ভদ্রলোকের কথা শোনার চেষ্টা করলো। একটু শুনেই আগ্রহ চলে গেল তার। ভদ্রলোক ভোটের কথা বলছেন। পলিটিকসের লোক!

হাঁটতে হাঁটতে সুচরিত মানিকতলার কাছে খাল পেরিয়ে আরও খানিকটা চলে গেল এক দুপুরে। কিছুই ঘটলো না, কেউ তাকে পেছন দিক থেকে এসে জাপটে ধরলো না। দিনের আলোয় এসব অবাস্তব মনে হয়।

তার সাহস বেড়ে গেল, পরের দিন সে বাসে শ্যামবাজার এসে, সেখান থেকে বাস বদলে চলে এলো পাতিপুকুরে। সেখানে মহিলা আশ্রমটির সামনে দিয়ে দু'বার হেঁটে গেল আস্তে আস্তে, খুব ইচ্ছে হলো একবার ভেতরে ঢোকার, কিন্তু ঢুকলো না। একটু দূরে বড় রাস্তার পাশের চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসলো।

এই আশ্রমটি সুচরিত বছরখানেক আগেই আবিষ্কার করেছে। যাদের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান নেই, তারাই শহরটাকে ভালোভাবে চেনে। কলকাতা ও শহরতলির কোনো

অলিগলিই সুচরিতের এখন চিনতে বাকি নেই। উল্টোডাঙ্গা-পাতিপুকুরেও দু'এক রাত্রে রেলের কাজ করতে হয়েছে তাকে, তখন সে অন্য দলের হয়ে কাজ করতো, প্রয়োজনে পালাবার রাস্তা ঠিকঠাক বুঝে নেবার জন্য সে দিনের বেলা এই সব দিকে অনেক ঘোরাঘুরি করে গেছে। তারই মধ্যে একদিন সে দেখেছিল চন্দ্রাকে।

চায়ের দোকানে বসে সুচরিত দেখলো, বাস থেকে নামলেন চন্দ্রার বাবা আনন্দমোহন। তিনি একবার এই দোকানের দিকে তাকালেন, সুচরিতের চোখে চোখও পড়ল, কোনো ভাবান্তর হল না। সুচরিতের চেহারার বদল হয়েছে অনেক, তাছাড়া এখন মুখভর্তি দাড়ি, চিনতে পারার প্রশ্নই ওঠে না। চন্দ্রাও কি তাকে চিনতে পারবে না?

পরপর তিনদিন ঐ চায়ের দোকানে বসে থাকার পর সুচরিত দেখতে পেল চন্দ্রাকে।

আশ্রমের লোহার গেট খুলে গেছে, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, গাড়িতে ওঠার আগে তিনি কথা বলছেন দু'তিনজনের সঙ্গে। গেরুয়া শাড়ি পরা, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। তাঁর গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে, সুচরিতের মনে হলো, এই ক' বছরে তিনি যেন আরও অনেক বেশী সুন্দরী হয়েছেন।

চুম্বক আকৃষ্টের মতন সুচরিত দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এসে, রাস্তা পার হয়ে অনেকটা কাছে। এসে দাঁড়ালো। চন্দ্রার পাশে ঐ যে একজন হাত-পা নেড়ে কথা বলছে, ও সেই মাস্টারটা না? কী যেন নাম ছিল, সুচরিতের মনে পড়ছে না। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রার মুখের

দিকে। চন্দ্রার ঠোঁটে মাখানো হাসি, ঠিক যেন অমৃত। চন্দ্রার মুখের সঙ্গে সত্যিই কিছুটা মিল আছে রেশমার। রেশমাকে দেখে সুচরিতের যে কামনা জেগেছিল, এখনও তার ছুটে গিয়ে চন্দ্রাকে জড়িয়ে ধরার সেরকম একটা অদম্য বাসনা হলো। ঐ হ্যাংলা মাস্টারটার পেটটা ছুরি দিয়ে ফাঁসিয়ে দিলে কেমন হয়?

চন্দ্রামা এবার গাড়িতে উঠলেন, সুচরিতের পাশ দিয়েই গাড়িটা বেরিয়ে গেল, সুচরিতের দিকে তিনি তাকালেনও না। সুচরিতের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। সে আশ্রম বাড়িটাকে দেখলো ভালো করে, মনে মনে ঠিক করলো, এখানে আবার আসতে হবে তাকে, একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে!

সেই রাতে ইয়াসিন একটা প্রস্তাব দিল তাকে। তাদের পাড়ায় যে সুদর্শন ব্যক্তিটি ভোটের কথা বলতে আসেন, তাঁর নাম আবদুল মান্নান। তিনি তাঁর হয়ে ভোটের কাজ করার জন্য কয়েকজন বিশেষ ধরনের লোক খুঁজছেন। তিনি এমন লোক চান, যারা কোনো কাজেই ভয় পায় না, দরকার হলে বিপক্ষ দলের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস যাদের কাছে।

সুচরিত প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিল। সে মাথা নাড়িয়ে বললো, না, না, না, ওসব ফালতু ঝাটের মধ্যে আমি নেই। পলিটিকসের কাজ অতি ছ্যাঁচড়া কাজ, রোজগার মোটে দু'চার পয়সা, কিন্তু ওতে মার্কা মারা হয়ে যেতে হয়! পঞ্চাননতলার হাবু, সে আগে রেলের কাজ করতো, পলিটিকসের দলে ভিড়ে শুধুমুদু একদিন বোমা খেয়ে মরলো! ছাড় তো ওসব কথা!

ইয়াসিন বললো, তুমি বুঝছো না, ওস্তাদ! মান্নান সাহেব মালদার পার্টি, বসিরহাটের হাজার বিঘে জমির মালিক, ভালো পয়সা দেবে! আমাদের জন্য জিপ দেবে, সঙ্গে মাল ঝাল থাকবে, যেদিকে ইচ্ছে ঘোরাঘুরির অসুবিধে নেই। পার্টির ফ্ল্যাগ থাকলে পুলিশেও ধারে কাছে ঘেষবে না।

সুচরিত থমকে গিয়ে বললো, জিপ থাকবে?

একটা জিপের প্রতি তার খুব লোভ। কিছুদিন ধরেই সে ভাবছে একটা জিপ জোগাড় করার কথা। নিজে একটা জিপ চালিয়ে হাওয়ার মতন উড়িয়ে যেখানে খুশী যাবে, ব্যারাকপুর, আসানসোল, ধানবাদ...এইসব ভালো ভালো জায়গা। একটা জিপ থাকলে সে কাল্লুকে পরোয়া করতো?

ইয়াসিন বললো, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য জিপ দেবে বলেছে, মান্নান সাহেবের গাড়ির পেছু পেছু থাকতে হবে আমাদেরকে, বুঝলে না, যদি কেউ অ্যাটাক করে, আমরা সামাল দেবো! তুমি রাজি হয়ে যাও, ওস্তাদ, কতদিন ঘরে বসে থাকবে? মান্নান সাহেবকে আমি তোমার কথা বলেছি, সাহেব বল্লেন কি, রেজাল্ট বেরুবার পর উনি কালুব্যাটাকে লালবাজারে ভরে দেবেন। ব্যস, তোমার কাম ফতে!

জিপের কথা শুনেই সুচরিতের মনটা নরম হয়ে গিয়েছিল, আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর সে রাজি হয়ে গেল। সে খোঁড়া, কিন্তু জিপ গাড়ি চালাবার সময় কেউ বুঝবে না যে তার পায়ে খুঁত আছে।

সে জিজ্ঞেস করলো, তুই সাহেবকে আমার কী নাম বলেছিস? আবু শেখ, না সুচরিত মণ্ডল?

ইয়াসিন বললো, তুমি ফের হিন্দু বনে যাও ওস্তাদ। হিন্দু মহাল্লাতেও সাহেবের কামকাজ আছে, তুমি সেসব করতে পারবে, সাহেব বলেছেন সেকথা।

হাতে টুসকি দিয়ে সুচরিত বললো, ঠিক হ্যায়, কাল সকালেই দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলবো!

৫৬ সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে

একটা সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে এলো শাজাহান। গেটের সামনে অনেক লোকের ভিড়, সেই ভিড় এড়িয়ে সহজে আসতে পারছে না কামাল। নানাজনের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে তাকে। শাজাহান খানিকটা এগিয়ে একটি সিগারেটের দোকানের সামনে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। সিনেমা হলটির দেয়াল জুড়ে ক্যাটকেটে রঙের বিরাট পোস্টার, তাতে দুটি পুরুষের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, একটি নারীর কান্নামাখা মুখ, দু হাত তোলা এক অন্ধ ফকির, পালতোলা নৌকো ও আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ ইত্যাদি অনেক কিছু রয়েছে। কামালের নিজস্ব পরিচালনায় প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ বেশ কিছুদিন

ডিস্ট্রিবিউটারদের টালবাহানার পর সদ্য মুক্তি পেয়েছে, প্রথম দু দিন দর্শকের সংখ্যা বেশ ভালোই।

কামাল যথেষ্ট শিক্ষিত মানুষ, কিছুদিন সে একটা কলেজে পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপকের কাজ করেছিল, এক সময় গল্প-কবিতা লিখতো। কিন্তু তার এই বাংলা সিনেমাটির কাহিনীতে, ট্রিটমেন্টে, সংলাপে সামান্য একটুও বুদ্ধির ছাপ নেই, আগাগোড়া সব অবাস্তব দৃশ্য। অকারণ নাচ ও গান, একটি মেয়ে এতবার কেঁদেছে যে অন্তত সেরখানেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে তাকে। আড়াই ঘণ্টা ধরে বসে থেকে এই সিনেমা দেখতে দেখতে প্রায় শারীরিক কষ্ট হয়েছে শাজাহানের, এক একবার তার বমি পেয়েছে। শাজাহান শেক্সপীয়ারের ভক্ত, বিশুদ্ধ শিল্প-সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছুতেই তার রুচি নেই। তাকে জোর করে এরকম একটি সিনেমা দেখানো সত্যিই প্রায় অত্যাচারের পর্যায়ে পড়ে।

সিনেমা হলে বসে থাকতে থাকতেই শাহাজান একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

হালকা বাদামী রঙের সুট পরে আছে শাজাহান। চোখে সানগ্লাস, তার মাথার একটা চুল এদিক ওদিক হয় না। একটুক্ষণ একা থাকলেই তার মুখে একটা বিষণ্ণতার ছাপ পড়ে। সুলেখার মৃত্যুর পর থেকে অনেক চেষ্টা করেও এই বিষণ্ণতাটা সে মুছে ফেলতে পারছে না। সুলেখা...রক্তমাংসের পবিত্রতা...তার সঙ্গে কি শাজাহান কোনোদিন একটুও অসমীচীন ব্যবহার করেছে...সুলেখার মৃত্যুর জন্য সে কি কোনোক্রমে দায়ী? সুলেখার সঙ্গে তার শুধু বন্ধুত্ব ছিল। আর তো কিছু না। মাঝখানে ঐ ক্রিকেট খেলোয়াড় স্কাউন্ড্রেলটা এসে...। শাজাহান চোখ বুজলো, দিল্লিতে সেই একটি সকালের দৃশ্য মনে পড়লেই তার শরীর জ্বালা করে।

কামাল তার পিঠে হাত দিয়ে বললো, চলো শাজাহানভাই...আমার ছবিটা তোমার কেমন লেগেছে তা জিজ্ঞেস করবো না।

শাজাহান অতি-ভদ্রতার ধার ধারে না। করুকে খুশী করার জন্য মিথ্যে কথা বলতে পারে না, সে শুকনোভাবে বললো, ইউ বেটার নট!

কামাল অন্য উৎসাহে এখন টগবগ করছে। সে এখন সমালোচনার ধার ধারে না। এ দেশে সমালোচকদের মতামতের ওপর টিকিট বিক্রি নির্ভর করে না। ছবিটা রিলিজ করার ব্যাপারে সে বেশ কয়েক মাস দুশ্চিন্তায় ভুগেছে। সে বললো, মনে তো হয় বক্স অফিস হিট করবে। সেইটাই বড় কথা! আমি তো আর্ট করতে যাই নাই, আমি সাধারণ মানুষের জন্য পিওর অ্যাণ্ড, সিম্পল এন্টারটেইনমেন্ট-এর, ছবি বানিয়েছি। তোমারে যে জন্য নিয়ে এসেছি, আমার নায়িকা

সেলিমার অভিনয় তোমার কেমন লাগলো?

–থরোলি ডিসগাসটিং!

–যাঃ, এটা তুমি কী কইলা শাজাহানভাই? সেলিমা রিয়েলি ট্যালেন্টেড অ্যাকট্রেস। বোম্বাইয়ের ওয়াহিদা রহমানের থিকা কোনো অংশে কম না।

–আমি ওয়াহিদা রহমানের কোনো ফিল্ম দেখিনি। কিন্তু তোমার ঐ সেলিমা। ওর মুখখানা খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজের মতন। শী হ্যাঁজ নো বিজনেস টু অ্যাক্ট! শী শুড বী। ব্যানিল্ড ফ্রম দা ফিল্ম ওয়ার্ল্ড!

গাড়ির দরজার হাতল খুলতে গিয়ে একটুখানি আহতভাবে থমকে গেল কামাল। মৃদু আপত্তির সুরে বললো, এটা তুমি ঠিক বলছে না। সেলিমার অভিনয়ের অনেকেই প্রশংসা করেছে। আমার এই ছবি মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে। অনেকেরই ধারণা সেলিমা একটা কিছু অ্যাওয়ার্ড পাবেই!

–যদি পায়, তা হলে বুঝতে হবে, সেটা শিল্পের প্রতি রাশিয়ানদের নবতম তাচ্ছিল্য!

গাড়িটা শাজাহানের, ইদানীং কামাল সেটা প্রায়ই ব্যবহার করে। স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা' ছবির প্রেডিউসারের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় কামাল যখন ফ্যাঁসাদে পড়েছিল, তখন শাজাহানই এগিয়ে এসেছিল তার সাহায্যের জন্য। প্রিন্ট-পাবলিসিটির খরচ বাবদ সে দেড় লক্ষ টাকা। দিয়েছে, তার আগে সে নিজে ছবির রাসেজ-ও দেখতে চায়নি। শাজাহান তো ব্যবসায়ী, ছবি যদি বক্স অফিসে সাকসেসফুল হয় তাতে তার খুশী হওয়ার কথা। তার লগ্নী করা টাকা সে সুদ সমেত ফেরৎ পাবে। অথচ ছবিটা চলা না-চলার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহই নেই। আশ্চর্য মানুষ এই শাজাহান। সে কামালের আত্মীয় হলেও কামাল ওর কোনো কথার জোরালো প্রতিবাদ করতে ভয় পায়।

গাড়িতে উঠে বসে কামাল খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ড্রাইভারকে বললো, তুমি...ইসে...এখন সোজা চলো...নিউ এস্কাটনে যাবা।

তারপর শাজাহানের দিকে ফিরে বললো, সেলিমার বাসায় আমাদের যাবার কথা, তুমি ওখানে যেয়ে যেন ওরে বকাবকি করো না!

শাজাহান এবার সামান্য হেসে বললো, তুমি ওখানে যাবে? তোমার বউ তোমাকে কোনো অ্যাকট্রেসের বাড়িতে যেতে নিষেধ করেছে না?

কামাল মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, বাদ দাও তো হামিদার কথা! নাচতে নামলে ঘোমটা দিয়ে থাকলে চলে? ফিলিম করবো, অথচ কোনো হিরোইনের সাথে সেটের বাইরে দেখা করবো না। এটা একটা পাগলের মতন কথা না? সেলিমার বাড়িতে আজ পার্টি, আজ আমার একটা স্পেশাল ডে।

-কত লোক আসবে সেখানে? তুমি তো জানো কামাল, আমার বেশি মানুষের ভিড় সহ্য হয় না, আমি তোমাকে ওখানে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবো!

–আরে না, না। তেমন কিছু নয়। খুব প্রাইভেট পার্টি। পাঁচ সাত জন, তুমি সবাইরে চেনো। সাজাহানভাই, আমার নেস্ট ভেঞ্চারে তুমি আমার পার্টনার হবে তো? এবারে একটা জব্বর স্টোরি ভেবেছি। ইয়োর মানি রিটার্ন ইজ গ্যারান্টিড। বাংলা ও উর্দু ডাল ভাসান হবে...

–আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আই ওন্ট বী এবল টু ডু দ্যাট। আমি হয়তো আর পূর্ব পাকিস্তানে থাকবো না।

–থাকবে না? তাইলে কোথায় যাবে। পশ্চিম পাকিস্তানে? ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাবে?

–জানি না। এখনও ঠিক করিনি। তবে এখানে আর থাকবো না।

–কেন। কী হইলো তোমার?

একথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে শাজাহান কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো কামালের মুখের দিকে। যদিও তার ওষ্ঠে সামান্য হাসি। তবু শাজাহানের মুখমণ্ডলে একটা গাঢ় বিষাদের ছাপ। যেন সে তার বেঁচে থাকার উৎসবের আলোগুলি ইচ্ছে করে নিবিয়ে রেখেছে।

একটু পরে সে বললো, কামাল, একটা ঘটনা শুনবে? তুমি জানো, আমাদের আদি বাড়ি ছিল লখনৌতে। কলকাতায় আমাদের বেশ কয়েক পুরুষের বাস। তবু আমাদের ফ্যামিলির অনেকেরই ধারণা, আমরা খানদানি মুসলমান, আমরা বাঙালী নই, আমরা আপকারি। আমাদের পরিবারের মুরুব্বিরা এখনো বাড়িতে উর্দু জবান চালু রেখেছে। আমি একবার আমার রুটস খুঁজতে লখনৌ গিয়েছিলাম। কোনো কারণে কলকাতায় আমার মন টেকেনি, ভেবেছিলাম লখনৌতে সেটল করবো। অসুবিধা কিছু ছিল না। সেখানে আমাদের চেনাজানা বেশ কয়েকজন আছে। বিজনেস কানেকশান আছে। আমি উর্দু জানি। বিরিয়ানি-মুরগ মসল্লম খেতে ভালোবাসি, লখনৌ কালচারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতেও পারতাম। মাসখানেক থাকা হলো, নানান লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবার পর একদিন আমি রিয়েলাইজ করলাম, মাই গড, আমি এখানে টোটালি মিসফিট! যাদের সাথে মেলামেশা করতে যাই, তাদের সাথে আমার মনের একটুও মিল

নেই! আমিও মুসলমান আর তারাও মুসলমান। আমিও উর্দু বলি, তারাও উর্দু বলে। তবু কোনো কমুনিকেশান হয় না। আমি কলকাতার মতন একটা বড় শহরে মানুষ হয়েছি। আমি মুসলমান হলেও কসমোপলিটান, ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার কোনো কমন গ্রাউণ্ড খুঁজে পাই না। ওরা গান বাজনার কথা উঠলে পুরোনো আমলের গানবাজনার কথাই শুধু বলে। সেখানেই থেমে আছে। বাখ-মোৎসার্টের কথা তুললে ওরা ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে। ওরা সুরের হারমোনাইজ করায় বিশ্বাস করে না। কনসার্টের রস ওরা বুঝতে চায় না। ওরা কোনো নতুন এক্সপেরিমেন্টই মানতে চায় না। এমনকি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কোনো ঠাটের সামান্য সরগমের অদল বদলকেই মনে করে বেওকুফি! কোরান-হাদিস আমিও কম পড়িনি, কিন্তু ওদের ব্যাখ্যার সাথে আমার ব্যাখ্যা মেলে না। ওরা স্ত্রীলোকদের যে চক্ষে দেখে, তা শুনে আমি শিউরে উঠি। ওদের ভ্যালুজ আর আমার ভ্যালুজ সম্পূর্ণ আলাদা! এই উপলব্ধি যখন হলো, সেদিন কী দুঃখ যে হয়েছিল, কামাল!

কামাল বললো, দ্যাখো, সিয়া আর সুন্নিদের মধ্যে এই পার্থক্য...

তাকে বাধা দিয়ে শাজাহান প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠলো, না, না, না, এটা সিয়া-সুন্নির পার্থক্য নয়, এটা সম্পূর্ণ আলাদা মূল্যবোধের ব্যাপার। আমি অনেক ভেবেচিন্তেই এই কথা বলছি। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে তোমরা মিলতে পারছে না, তার কারণ, ভাষার তফাৎ। তাছাড়া, পশ্চিমীরা তোমাদের ঠিক খাঁটি মুসলমান মনে করে না। এই ঐস্লামিক রাষ্ট্রে ওরা নিজেদের বেশি মুসলমান মনে করে বলেই তোমাদের ওপর সদারি করতে চায়, বাঙালী মুসলমানরা হিন্দু-ঘেঁষা, এই কথা ভেবে ওরা তোমাদের সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন করে রাখতে চায়। কিন্তু আমার কেসটা সম্পূর্ণ আলাদা। আমি ওদের মতন সমান উর্দু বলতে পারি। ওদের মতনই আমার খানাপিনা, পোশাক-আশাক, ওদের চেয়ে আমি কোনো অংশে কম মুসলমান নই। লখনৌতে আমার শিকড় আছে, কিন্তু টাইম হ্যাঁজ চেইঞ্জড, নাউ আই বিলং টু আ ডিফরেন্ট কালচার? যে লোক শেক্সপীয়ার, রবি ঠাকুর, ওমর খৈয়াম, ইকবাল, কাহলিল জিবরান, টি এস এলিয়ট, জীবনানন্দ দাশ পড়ে আনন্দ

পায়, সে তো শুধু মুসলমান নয়।সে ওয়ার্ল্ড সিটিজেন! কিন্তু তার আশ্রয় কোথায়? এক হিসেবে সে হতভাগ্য!

–শাজাহানভাই, তবে তো কলকাতাই তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভালো জায়গা ছিল। বড় শহর, অনেক রকম মানুষ, ইচ্ছা করলে নিজস্ব একটা বন্ধুগোষ্ঠী বেছে নেওয়া যায় শুনেছি। তাহলে কলকাতায় তোমার মন টিকলো না কেন?

–সেটা খুব প্রাইভেট ব্যাপার। সেটা খুলে বলার মতন আমার মনের অবস্থা এখনও হয়নি। তোমাকে আমি আরও বলি, গত বছর ইণ্ডো-পাকিস্তান ওয়ারের আগে আমি করাচি রাওয়ালপিণ্ডিতে অন্তত তিনবার গেছি। ইচ্ছা করলে আমি সেখানেও সেটল করতে পারতাম। কিন্তু ঐ একই গণ্ডগোল। সেখানে বুদ্ধিমান, ভোলা মনের মানুষ নিশ্চয় বেশ কিছু আছে, কিন্তু তারা কোথায় যে লুকিয়ে থাকে, খুঁজে পাওয়া শক্ত। প্রকাশ্যে কেউ কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। বা, করতে সাহস পায় না। সেখানে অধিকাংশ মানুষই যেন এক রূপকথায় বুঁদ হয়ে আছে!

–শাজাহানভাই, তুমি উর্দু যতই ভালো জানো, আসলে তো তুমি এখন বাঙালী মুসলমান। পূর্ব পাকিস্তানে এসেও কি তুমি বন্ধুত্ব করার মতন মানুষ পাওনি? তুমি এখান থেকেও চলে যাবে বলছো। হঠাৎ তোমার এই মত পরিবর্তন কেন হলো?

–সত্য কথা বললে আশা করি, তুমি মনে দুঃখ পাবে না, কামাল? আমার মনের পরিবর্তন হলো আজই। তোমার তোলা সিনেমাটা দেখে। তুমি বললে না, সাধারণ লোকের এন্টারটেইনমেন্টের জন্য তুমি এই রদ্দি ছবি করেছে। তবে কি এই দেশের সাধারণ মানুষ একেবারে গরু-ছাগল? না, তারা গরু-ছাগল নয়। সেকথা বোঝা যায় তাদের ফোক সঙ শুনে। তাদের যাত্রা, কবির লড়াই দেখে। কিন্তু তোমরা তাদের মনে করো গরু-ছাগল, তাই তাদের এইসব ভুষিমাল গেলাতে চাও! তোমরা তাদের এই রকম গরু-ছাগল মনে করো বলেই তাদের মুক্তির জন্য তোমরা কোনোদিন সত্যিকারের লড়াই করবে না। তোমাদের লড়াইয়ের বুলি সব শখের বুলি। অন্ধকার ঘুপচি ঘরে বসে লম্বা লম্বা বাৎ

ঝাড়বে, তারপর পুলিস বা মিলিটারির একটু কোঁতকা খেলেই সব চুপ করে যাবে! গত বছর যখন এখানে আসি, তখন। তোমাদের কথা শুনে মনে হয়েছিল, কত কী-ই যেন করতে যাচ্ছো! তোমার সেই সব বন্ধুরা এখন গেল কোথায়? লণ্ডন থেকে আলম বলে যে ছেলেটি এসেছিল, সে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্চ করেছে? নিশ্চয়ই নিজের কেরিয়ার গোছাচ্ছে! লাহোরে মুজিব সাহেব ছয় দফা প্রস্তাবে স্বায়ত্তশাসনের কথা উচ্চারণ করতেই আইয়ুব খান খুব হুড়কো দিয়েছে, কয়েক হাজার লোককে ভরে দিয়েছে জেলে। ব্যাস তারপরেই ভয় পেয়ে সব চুপচাপ। আর কেউ কোনো কথা বলে না। তোমাদের পূর্ব পাকিস্তানে সব আন্দোলন বন্ধ। পত্র-পত্রিকায় এখন খুব আইয়ুব খানের প্রশংসা দেখতে পাই। আইয়ুব খাঁর দাক্ষিণ্যে এখন কলেজের সাধারণ প্রফেসাররাও জাপানী গাড়ি কিনছে। কামাল, আমি নিজে কখনো পলিটিকস করিনি, কিন্তু যারা পলিটিকস করতে নেমেও ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় কিংবা কমপ্রোমাইজ করে, তাদের আমি কিছুতেই শ্রদ্ধা করতে পারি না। কামাল, তুমি নাকি এককালে বিপ্লবী ছিলে? এখন এই যে। ট্র্যাস বাংলা ছবি তুলছো, এটা কি তোমার আত্মগোপন?

–শাজাহানভাই, এবার আমি একটা কথা বলি? ইণ্ডিয়া থেকে যারাই আসে, তারা মুসলমান হলেও বেশ একটা হামবড়াই ভাব দেখায়। যেন ইণ্ডিয়াতে তারা খুব সুখে আছে!

–আমার ট্র্যাজেডি কী জানো? আমি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন, আমার ইণ্ডিয়ান পাসপোর্ট, ইণ্ডিয়াতেই জন্ম-কর্ম সব কিছু, তবু শুধু মুসলমান বলেই, আমার নামে কেউ লাগিয়েছিল, লাস্ট ওয়ারের সময় আমাকে পাকিস্তানের স্পাই বলে অ্যারেস্ট করেছিল ওখানে। এবার এই ইস্ট পাকিস্তানেও বোধ হয় আমাকে ইণ্ডিয়ার স্পাই বলে ধরা হবে। চতুর্দিকে অ্যান্টি ইণ্ডিয়া ক্যামপেন চলছে। এই সময় আমার মতন দু'দশজনকে অ্যারেস্ট করলে গভর্নমেন্টের মর্যাদা বাড়বে! এর মধ্যেই আমার পেছনে পুলিস লেগেছে, আমি টের পেয়েছি। অর্থাৎ, আমার কোনো দেশ নেই। আমি না ইণ্ডিয়ার, না পাকিস্তানের! আমি রিফিউজি না, কিন্তু রুটলেস। এখন পশ্চিমী কোনো দেশে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার কোনো গতি নেই। আমি এখান থেকে কলকাতায় ফিরতে চাইলেও তা পারবো না। ঢাকা

থেকে কলকাতার দূরত্ব কত তা নিশ্চয়ই জানো? সোওয়া দুশো মাইলের বেশি নয়। কিন্তু ঢাকা থেকে কলকাতায় একটা চিঠি পাঠাতে হলে, প্রথমে সেটা পাঠাতে হয় লণ্ডনে কোনো চেনা লোকের কাছে। সে আবার সেটা অন্য খামে পুরে কলকাতায় পাঠায়। দিস ইজ দা গ্রেটেস্ট জোক অফ হিস্ট্রি ইন দিস সেঞ্চুরি!

গাড়ি এসে থামলো নিউ এক্সাটনের একটি নতুন তিনতলা বাড়ির সামনে। বাড়িটি এমনই নতুন যে গায়ে এখনও বাঁশের ভারা বাঁধা আছে। বাইরের দেয়ালের রঙ সম্পূর্ণ হয়নি। কাছাকাছি আর কয়েকখানা বাড়িরও কনস্ট্রাকশান চলছে। ঢাকা শহরের অনেক জায়গাতেই এখন নতুন বাড়ি তৈরির চুন-সিমেন্টের গন্ধ। এক হাজার কোটি টাকা খরচ করে ইসলামাবাদে তৈরি হয়েছে পাকিস্তানের নতুন রাজধানী, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বদান্যতা দেখিয়ে ঢাকাতেও দ্বিতীয় রাজধানী বানাবার জন্য বরাদ্দ করেছেন, কুড়ি কোটি টাকা। এখন জমিবাড়ির কন্ট্রাকটরদের বেশ সুসময়।

সেলিমার দ্বিতীয় স্বামী ইউসুফও একটি কনস্ট্রাকশান ফার্মের মালিক। এমনই লম্বা-চওড়া চেহারা যে হঠাৎ দেখলে পাঠান বলে ভ্রম হয়, কণ্ঠস্বরটিও গমগমে। পায়জামার ওপর সে একটি সবুজ রঙের সিল্কের কুতা পরে আছে। তার মাথার চুল এলোমেলো। দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সে বললো, আসেন, আসেন, এত দেরি হইলো, সেলিমা তো অধৈর্য হয়ে গেছে। আপনাদের জন্য।

সেলিমার অঙ্গে সি-থ্রু কাপড়ের তৈরি শালোয়ার কামিজ। যেন মসলিনের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। থিয়েটারি কায়দায় মাথা ঝুঁকিয়ে কপালে হাত ছুঁইয়ে সে শাজাহানকে বললো, আসলাম আলাইকুম! আসালাম আলাইকুম। এ গরিবের বাসায় আপনি দয়া করে এসেছেন...

শাজাহান বললো, আলাইকুম আসোলাম। আপনি আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন, সেজন্য ধন্য হয়েছি।

-ছবি দেখে এলেন। কেমন লাগলো বলেন, আমি কী রকম করেছি?

প্রথমেই এই প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে গেল শাজাহান। কামাল কিছু একটা বলে কথা ঘোরাতে এলেও সেলিমা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শাজাহানের দিকে।

নিজের মুখে মিথ্যে কথাটা উচ্চারণ করতে পারবে না বলে শাজাহান কামালের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, ওকে সব বলেছি। ওকে জিজ্ঞেস করুন।

ইঙ্গিতটা বুঝে গেল কামাল। সেলিমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত গলায় সে বললো, দারুণ, মার্ভেলাস! শাজাহানভাই বললো, তুমি ওয়াহিদা রহমানের থেকেও অনেক ভালো, সুপার্ব! এ ছবির জন্য তুমি একখান ইন্টার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাবেই। আমি আজ শুনেছি, তোমার অ্যাপিয়ারেন্সের সময় দর্শকরা চারবার সিটি দিয়েছে, আর লাস্ট সিনে, তোমার সেই ভেঙে পড়া কান্নার সিকোয়েন্সে গোটা হল জুড়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ। সবাই কাতে লেগেছিল!

সেলিমা কামালের দুই গালে ফটাফট করে চুমো খেয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে বলতে লাগলো, কামাল তুমনে কামাল কিয়া কামাল তুম নে কামাল কিয়া! আমি বলে দিচ্ছি, এ বই সুপারহিট হবেই।

ইউসুফ একটু দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মিটিমিটি হাসছে। লম্বা ঘরটির মধ্যে আরও সাত-আটজন নারী পুরুষ, তাদের মধ্যে শুধু পল্টনকে চেনে শাজাহান। কামালের ফিমের নায়ককে এখানে দেখা যাচ্ছে না।

কামাল ও সেলিমার উচ্ছাস বিনিময় এক সময় থামিয়ে দিয়ে ইউসুফ বললো, রুবি। মেহমানদের গেলাস দাও!

ঘরের এককোণে একটি গোল টেবিলের ওপর নানা রকম মদের বোতল ও গেলাস। কোনো বেয়ারা নেই, সেলিমা নিজে গেলাসে পানীয় ঢেলে নিয়ে এসে প্রথমে দিল

শাজাহানের হাতে। কৌতুকের সুরে বললো, বন্দেগী জাঁহাপানা শাহজাহান, আপনি এর সাথে পানি নিবেন,

সোড়া? শাজাহান আগেই দেখে নিয়েছে যে দ্রব্যটি প্রিমিয়াম স্কচ। সে মাথা নেড়ে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ, কিছুই লাগবে না।

ইউসুফ আবার বললো, রুবি, কাবাবের প্লেটটা নিয়া আসো। দ্যাখো গরম গরম আছে কি না!

শাজাহান ইউসুফের দিকে তাকাল। এটাই তা হলে ইউসুফের সুখ। লোকজনের সামনে জনপ্রিয় নায়িকা সেলিমা আখতারকে হুকুম করে সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। সেলিমা তার কাছে একটা দাসীর সমান। এই বিয়ে বেশিদিন টেকার নয়। সেলিমার জনপ্রিয়তা ও রোজগার আর একটু বাড়লেই সে ইউসুফকে ঝেড়ে ফেলে দেবে। ওদের দাম্পত্য জীবনে ফাটলের কথা সে এর মধ্যেই কামালের মুখে শুনেছে। শাজাহান এটাও লক্ষ্য করেছে যে সেলিমা যেন তার সঙ্গে একটু বেশি খাতির করে কথা বলে। দেখা হলেই গা ঘেঁষে দাঁড়াতে চায়।

সেলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বললো, খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজের মতন, কোমল, মসৃণ, ভাবলেশ শূন্য। ...হার ব্রেইন অ্যালাউজ ওয়ান হাফ-ফর্মর্ড থট টু পাস : "ওয়েল নাও দ্যাটস ডান : অ্যাণ্ড আই'ম গ্ল্যাড ইটস ওভার"। এর বেশি কিছু আর চিন্তা করা কি ওর পক্ষে সম্ভব?

এর আগে কামাল বেশ কয়েকবার ইঙ্গিত করেছে যে শাজাহান ইচ্ছে করলেই সেলিমাকে নিয়ে নিতে পারে। ধানমণ্ডিতে শাজাহান একলা বাড়ি ভাড়া করে রয়েছে, ইণ্ডিয়া থেকে সে হুণ্ডি মারফত টাকা পেয়েছে অজস্র, এখন সেলিমার মতন একটি সুন্দরী রমণীকে বিয়ে করলেই তাকে মানায়। ঢাকার উঁচু সমাজ তাকে এক নিমেষে চিনে যাবে।

কোনো একটি নারীকে সঙ্গিনী হিসেবে পাবার কথা আজকাল চিন্তা করে শাজাহান। কিন্তু কোন নারী? সেলিমার মতন মেয়েদের প্রতি তার কিছুতেই আকর্ষণ জন্মায় না। বরং রিপালশান হয়। তা হলে? শাজাহান জানে, সে সুলেখার স্মৃতি চিরকাল বুকে ধরে রাখবে না, সেটা মবিডিটি, সুলেখার স্মৃতি আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যাবেই। কিন্তু এখনও যাচ্ছে না কেন? কেন অন্য কোনো মেয়েকে দেখলেই সুলেখার সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়? এটাও বোধ হয় এক ধরনের অসুখ। আচ্ছা, সুলেখার স্মৃতির প্রতি অপমান করলে কেমন হয়? কোনো একটা ব্রেইনলেস মোমের পুতুলের মতন মেয়ের সঙ্গে চুটিয়ে লাম্পট্য করা যায়, তা হলে সুলেখার স্মৃতি নিশ্চয়ই লজ্জায় কুঁকড়ে মিলিয়ে যাবে!

কিন্তু এই পার্টিতেও শাজাহান কারুর সঙ্গে ভাব জমাতে পারলো না। সেলিমা তার কাছাকাছি আসছে, ইউসুফ একটা না একটা হুকুম করে তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। শাজাহান আবার ইউসুফের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললো, তোমার এই খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজটি নিয়ে নেবার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। এটিকে তোমার মাথার ওপরে চাপিয়ে রাখতে পারলেই আমি খুশী হবো।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই প্রায় সবাই মাতাল হয়ে গেল। এরা দ্রুত গেলাস শেষ করে। শাজাহান সেই প্রথম থেকে এক গেলাস নিয়েই নাড়াচাড়া করছে। এরা সবাই কথা বলছে কামালের সিনেমা বিষয়ে, এখনকার সিনেমা ইণ্ডাষ্ট্রি বিষয়ে। শাজাহান এ আলোচনায় যোগ দিতে পারছে না। সে দাঁড়ালো গিয়ে একটা জানলার ধারে।

এই ঘরে আজ যে আনন্দ-ফুর্তির ফোয়ারা, তা সব কিছুই হচ্ছে দরিদ্র ও চাষা, খেত মজুর, আর কারখানার শ্রমিকদের গাঁট কাটা টাকায়। এন্টারটেইনমেন্টের নাম করে তাদের দেখানো হচ্ছে রুপালি পর্দায় ভোজবাজি। বড়ঘরের সুন্দরী মেয়ের নাচ, তার স্তনের দোলানি ও নাভির প্রদর্শনী, এসব তো তারা চর্মচক্ষে বাস্তবে কোনোদিন দেখতে পাবে না। সেইজন্য অতি কষ্টের রোজগার করা পয়সা খরচ করে দেখতে আসবে। তাদের সেই ঘামে ভেজা টাকায় তৈরি হবে সেলিমা ও কামালদের মতন মানুষদের বড় বড় বাড়ি, কেনা হবে বিদেশী গাড়ি, স্কচ হুইস্কি, ফরাসী পারফিউম...।

এখান থেকে চলে যেতে হবে শাহাজানকে। কোথায় যাবে সে? পশ্চিম বাংলায় সে থাকতে পারলো না। পূর্ব বাংলাতেও তার মন টিকলো না। তবে কি আরও পশ্চিমে?

এখানে কামালই সব চেয়ে বেশি মাতাল হয়ে গেছে। আজ সে আনন্দ সামলাতে পারছে না, এক হাতে মদের গেলাস মাথার ওপর রেখে, অন্য হাতে কোমর ধরে সে নাচতে শুরু করেছে অশ্লীল ভঙ্গিতে, অন্যরা হাততালি ও শিস দিচ্ছে।

শাজাহান ভাবলো, এবার সে চুপি চুপি সরে পড়বে। তখনই পল্টন এসে দাঁড়ালো তার পাশে। পল্টন বিশেষ নেশা করেনি। সে-ও অন্যদের সঙ্গে তেমন মিশতে পারছে না মনে হয়।

পল্টন নিম্নস্বরে বললো, শাজাহানভাই, আজ আপনি নাকি গাড়িতে আসতে আসতে কামালকে খুব অ্যাটাক করেছেন? ও একটু আগে দুঃখ করছিল। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, এটা বুঝতে পারলেন না, এই সবই কামালের ছদ্মবেশ। ও একবার জেলখাটা মানুষ, খাঁটি দেশপ্রেমিক, ওর মধ্যে কোনো খাদ নেই।

শাজাহান আঙুল তুলে ধেই ধেই করে নৃত্যরত কামালকে দেখিয়ে শ্লেষের সঙ্গে বললো, এটা ছদ্মবেশ? এই বেলেল্লাপনা?

পল্টন বললো, নিশ্চয়! ছদ্মবেশ ধরতে গেলে নিখুঁতভাবে সাজাই তো ভালো। এখন যতদূর সম্ভব বোকা সাজতে হবে। কিংবা সুবিধাবাদীর ভূমিকা নিতে হবে। পুলিসের খাতায় আমাদের নাম আছে, একটু ওদিক হলেই আমাদের জেলে ভরে দেবে। এখন আমরা জেলে যেতে চাই না। বাইরে অনেক কাজ আছে।

–আপনারা বাইরে এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন? তার কোনো প্রমাণ তো দেখতে পাই। সবাই তো নেশা-ফুর্তিতে গা ঢেলে দিয়েছে দেখি।

-প্রমাণ আপনার চোখে পড়লে পুলিসের চোখেও ধরা পড়ে যাবে। এখন এইখানে, এই ঘরের মধ্যেও মোনেম খানের কোনো চর আছে কিনা তাও কি বলা যায়? ঐ ইউসুফকে সন্দেহ করার তো খুবই কারণ আছে। শাজাহানভাই, বাঙালী মুসলমান একবার যখন জাগতে শুরু করেছে, তখন আর থামবে না। এবারে একটা হেস্তনেস্ত হবেই।

হাতের গেলাসটা উঁচু করে শাজাহান বললো, আমি হয়তো এখানে তখন থাকবো না, তবু, আই উইস ইউ গুড লাক।

৫৭ তুতুলের খুব অস্বস্তি হয়

বাড়িতে কোনো বন্ধুটন্ধু এসে পড়লে তুতুলের খুব অস্বস্তি হয়। জায়গার খুব টানাটানি, তুতুলের এখনও একটা নিজস্ব ঘর নেই, তার ওপর আবার টুনটুনি এসেছে। টুনটুনির শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে সুপ্রীতির ঘরে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই সে মুন্নি আর তুতুলের ঘরে কাটায়। ছোট্ট একটা বসবার ঘর, সেখানে ছুটির দিন সকাল-বিকেল প্রতাপ বসেন, অন্যান্য দিনে সেটা থাকে বাবলু ও তার বন্ধুদের দখলে। বাবলু আবার তার বন্ধুরা এলে দরজা বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যে তুতুলের বন্ধুরা এসে পড়লে তাদের সে বসতে দেবে কোথায়? অথচ সব বন্ধু ও সহকর্মীদের তো বলে দেওয়া যায় না যে তোমরা কেউ আমার বাড়িতে দেখা করতে এসো না।

রবিবার বিকেল চারটের সময় হাজির হলো শিখা আর হেমকান্তি। প্রতাপ ভেতরে ঘুমোচ্ছেন। বসবার ঘরে বাবলু ও তার একজন মাত্র বন্ধু। তুতুল বাধ্য হয়ে বললে, এই বাবলু, তুই তোর বন্ধুকে নিয়ে নিজের ঘরে যা না প্লীজ, আমরা এখানে একটু বসবো।

বাবলু আপত্তি করলো না, ভেতরেও গেল না, বেরিয়ে পড়লো তার বন্ধুর সঙ্গে। এরপর কখন যে সে ফিরবে, তার কোনো ঠিক নেই।

শিখা এম ডি করবে ঠিক করেছে। হেমকান্তি বর্ধমানে তার নিজের দেশে ফিরে গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করতে চায়। অথচ ওরা কেউ কারুকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। শিখার

বাড়ির অবস্থা সচ্ছল, আর হেমকান্তি ইস্কুল মাস্টারের ছেলে। দু'জনের মনের মিল হয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তব অবস্থার অনেক গরমিল। প্রেমের দেবতা এইরকম গরমিলের মধ্যেও দু'জনের মনকে

জুড়ে দিয়ে কৌতুক করেন বোধহয়।

হেমকান্তি ভালো রেজাল্ট করেছে। শুধু একটা এম বি বি এস ডিগ্রি নিয়ে গ্রাম্য ডাক্তার হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তার পক্ষে মানায় না, কিন্তু হেমকান্তির এক কথা, বুড়ো বাপ যথাসর্বস্ব খরচ করে আমায় ডাক্তারি পড়িয়েছে, আর আমি তাঁর ঘাড় ভাঙতে পারবো না, আমায় এখন টাকা রোজগার করতে হবে। শিখা আবার চিরকালই কলকাতা শহরে মানুষ,সে গ্রামে থাকবার চিন্তাতেই শিউরে ওঠে।

এইসব বিষয়ে টুকিটাকি কথাবার্তা চলছে, এমন সময় সদর দরজার সামনে একটি গাড়ি থেকে নামলেন একজন সুসজ্জিতা পৌঢ়া মহিলা। তাকে দেখেই তুতুলের বুকটা ধক করে উঠলো। জয়দীপের মা!

হেমকান্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মাসিমা, আমি আর শিখা কিন্তু ঠিক চারটের সময় এসেছি।

জয়দীপের মা চিন্ময়ী রীতিমতন বিদুষী মহিলা, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা হিসাবে রিটায়ার করেছেন মাত্র কিছুদিন আগে, মৌর্য-কুষাণ যুগ সম্পর্কে তাঁর ইংরিজিতে লেখা দু'তিনটি বই আছে। তাঁর স্বামী ধনী ব্যবসায়ী, তবু কলেজে পড়ানোর কাজ ছাড়েননি। এককালে সুন্দরী ছিলেন বেশ, হঠাৎ খুব রোগা হয়ে গেছেন দু'তিন মাসে, ব্লাউজটা কাঁধের কাছে ঢলঢলে দেখাচ্ছে। তিনি পরে এসেছেন একটা নীল পাড় সাদা সিল্কের শাড়ী। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

ঘড়ি দেখে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার দেরি হলো, হঠাৎ দুপুরবেলা ভাবলুম, আমার এখানে আসাটা ঠিক হবে কি না। বহ্নিশিখা যদি রাগ করে...

তুতুলের মুখখানা অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে যেন আটকা পড়েছে একটা ফাঁদে। শিখা-হেমকান্তিরা আজ ষড়যন্ত্র করে এখানে এসেছে। গত দেড়-দু'মাস ধরে সে একটা কথা অতি সাবধানে গোপন করে এসেছে বাড়ির সবার কাছ থেকে, এমনকি নিজের কাছেও অস্বীকার করেছে। জয়দীপের কাছ থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসছে একটা করে চিঠি, সে চিঠি একটাও সে বাড়িতে রাখেনি। মেডিক্যাল কলেজে তাঁর খুব প্রিয় অধ্যাপক ডঃ ব্যানার্জি মাঝে মাঝে ডেকে বলছেন ঐ একই কথা, তুতুল শুধু না না বলেছে। আজ যেন হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটবে।

তুতুল এখন পর্যন্ত চিন্ময়ীকে বসতে পর্যন্ত বলেনি, একটা সম্বোধনও করেনি। চিন্ময়ী জিজ্ঞেস করলেন,শঙ্করকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলুম, তুমি একবারও কেন আমার সঙ্গে দেখা করলে না, বহ্নিশিখা?

তুতুল কোনো উত্তর দিল না।

চিন্ময়ী আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা'র সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, তাতে। তোমার আপত্তি আছে? তার আগে, তোমাকেই একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সেটাই খুব ইম্পটন্টি, তুমি কি জয়দীপের কাছে কিছু প্রতিজ্ঞা করেছিলে, মানে, কিছু কথা দিয়েছিলে? সে বারবার আমাকে লিখছে...।

তুতুল এবারেও কিছু উত্তর দিতে পারলো না। সে কি বলবে? না, সে জয়দীপের কাছে কোন প্রতিজ্ঞা করেনি! জয়দীপ তার বুকের ওপর তুতুলের একটা হাত রেখে জোর করে তাকে দিয়ে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তুতুল কিছুই উচ্চারণ করেনি নিজের মুখে।

কিন্তু জয়দীপের মাকে সে কথা সে কী করে বলবে?

হেমকান্তি বললো, হ্যাঁ, বহ্নিশিখা সেই সময় জয়দীপকে কথা দিয়েছিল, আমরা জানি। জয়দীপ সে কথা আমাদেরও বলে গেছে।

তুতুল এবারে অস্ফুটভাবে বললো, মাসিমা, আপনি বসুন।

শিখা জিজ্ঞেস করলো, আমি ভেতরে গিয়ে তোর মাকে ডেকে আনবো? সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের দরজার কাছ থেকে টুনটুনি বললো, আমি ডেকে আনছি।

অনেক আগে থেকেই দরজার ওদিকে দাঁড়িয়ে ছিল টুনটুনি। কলকাতা এখনও তার কাছে নতুন, বাইরের মানুষজন সম্পর্কে তার খুব কৌতূহল। বাবলুর বন্ধুদের আড্ডায় দরজা খোলা থাকলেই সে এক একবার ভেতরে ঢুকে পড়ে। বাবলু তাকে ধমকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। সে। আড়াল থেকে ওদের কথাবার্তা শোনে।

সুপ্রীতি দুপুরে ঘুমোন না। একটা সেলাই নিয়ে বসেছিলেন, টুনটুনির কথা শুনে আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে বাইরে এলেন। সুপ্রীতির শাড়ীটি আজ বড় মলিন। নাকের ওপর একটু একটু মেছেতার দাগ, পাতলা হয়ে এসেছে কপালের চুল। বাইরের ঘরে এসে এক ব্যক্তিত্বময়ী রমণীকে দেখে তিনি খানিকটা জড়োসড়ো হয়ে গেলেন।

সুপ্রীতিও এক সময় এক বনেদী বাড়ির বধূ ছিলেন, বড়লোকদের দেখে মোটেই তাঁর মধ্যে হীনমন্যতা জাগতো না। শুধু বরানগরের সরকার বাড়ির বধূ নয়, তিনি মালখানগরের ভবদেব মজুমদারের কন্যা। কিন্তু আগেকার সেই ঘাড় সোজা করে তাকানোর অভ্যেস তাঁর চলে। গেছে। অনেকগুলি বছর ধরে তিনি তাঁর ছোট ভাইয়ের সংসারে আশ্রিতা, তাঁর স্বামী তাঁকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি, নিজের মেয়েকে নিয়ে নানা সময়ে নিদারুণ দুশ্চিন্তায় ভুগেছেন, অর্থচিন্তা তাঁকে গোপনে গোপনে কুরে কুরে খেয়েছে। আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কখন যে তিনি হার স্বীকার করে বসে আছেন, তা তিনি নিজেও জানেন না। এখন তাঁর শরীর ও মনে যেন সূর্যাস্তের পালা।

চিন্ময়ী হাত জোর করে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আমি জয়দীপের মা। যেচে আপনার। বাড়িতে এসেছি।

শিখা নিজের জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে বললো, মাসিমা, আপনি এখানে এসে বসুন!

বসবার আগে সুপ্রীতি বললেন, একটু চা করতে বলি? এই টুনটুনি কেটলিতে জল বসা তো!

হেমকান্তি বললো, মাসিমা, জয়দীপ আমাদের বন্ধু, ক্লাসফ্রেণ্ড, আপনি তার কথা শুনেছেন। নিশ্চয়ই বহ্নিশিখার মুখে?

সুপ্রীতি বললেন, হ্যাঁ, সে তো বিলেতে চলে গেছে, তাই নয়?

তুতুল চমকে তাকালো মায়ের দিকে। মা কী করে জানলো? সে তো মাকে জয়দীপ সম্পর্কে কোনো কথাই বলেনি! মুন্নি কিছু বলেছে? কিংবা বাবলু?

চিন্ময়ী বললেন, হ্যাঁ আমার ছেলে...

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। তার চোখ শুকনো। লোকজনের সামনে অশ্রুবর্ষণ করা তাঁর স্বভাব নয়, কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তিনি কথা বলতে পারছেন না। তাঁর মনীষা ও যুক্তিবোধ দিয়েও তিনি তাঁর অপত্যবন্ধনকে ভুলতে পারছেন না এক মুহূর্তের জন্যও। তিনি জানেন, আজ এ বাড়িতে তিনি যে-প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তা যুক্তিহীন।

হেমকান্তি চিন্ময়ীর অসুবিধেটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাবার জন্য সুপ্রীতিকে বললো, মাসিমা আমাদের প্রফেসর ডক্টর ব্যানার্জি আপনার মেয়ের সবসময় এমন প্রশংসা করেন যে আমাদের হিংসে হয়। এমন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী উনি নাকি কখনো দেখেননি। অথচ ওর থেকে শিখার রেজাল্টও এমন কিছু খারাপ নয়।

শিখা বললো, মোটেই না, বহ্নিশিখা অনেক বেশী নম্বর পেয়েছে।

চিন্ময়ী এর মধ্যে অনেকটা সামলে নিয়েছেন। হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে তিনি বার করেছেন রুমাল, কিন্তু রুমাল দিয়ে ভেতরের রক্তক্ষরণ মোছা যায় না।

সুপ্রীতি কোনো কথা বলছেন না নিজে থেকে। বাইরের লোকজনের সামনে সঙ্কুচিত ভাবটা কাটছে না তাঁর। অথচ এমন একদিন ছিল, যখন যে-কোনো ঘরোয়া আসরে তিনিই থাকতেন মধ্যমণি হয়ে।

চিন্ময়ী বললেন, আমার এ বাড়িতে আসার কথা ছিল অন্যভাবে। আমার ছেলেসে আপনার মেয়েকে খুব পছন্দ করে...ওরা দু'জনেই ডাক্তারি পাস করেছে, ওরা যদি চাইতো, আমি নিজে এসে আপনাকে অনুরোধ জানাতুম...

সুপ্রীতি বললেন, ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে গেলে, তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছেটাই বড় কথা।

ধানাই-পানাই করার বদলে সোজাসুজি কথা বলাই চিন্ময়ীর স্বভাব। তিনি সুপ্রীতির চোখের দিকে কোমল ভাবে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু তা হবার নয়। আমার ছেলে অসুস্থ, সে আর কতদিন বাঁচে তার ঠিক নেই, এ অবস্থায় ওরকম কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সুপ্রীতি একটু কেঁপে উঠলেন, জয়দীপের কী অসুখ হয়েছে, তুতুল তা না বললেও তিনি জানেন। তবু তিনি ধরেই রেখেছিলেন, এই সিল্কের শাড়ীপরা মহিলা তাঁর রুগ্ন ছেলের সঙ্গে তুতুলের বিয়ে দিতে চাইলে তাতে না বলার ক্ষমতা তাঁর নেই।

তিনি তুতুলের দিকে তাকালেন। তুতুল মুখ নিচু করে আছে। একটা সময় আসে, যখন ছেলে মেয়েরা পর হয়ে যায়। তুতুল এখন হয়তো এই মহিলার কথাই বেশি করে শুনবে।

চিন্ময়ী বললেন, আপনার কাছে আমি শুধু একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আমি ইংলণ্ডে যাচ্ছি আগামী মাসে, লন্ডন শহরে আমার দাদা আছেন অনেক দিন ধরে, আমার দাদাও ডাক্তার, বেলসাইজ পার্কে বেশ বড় বাড়ি, ওখানে থাকা-টাকার কোনো অসুবিধে নেই।

আপনার মেয়েকে কি আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি? যদি শেষ কটা দিনে আমার ছেলেটা একটু শান্তি পায়, সে খুব করে চাইছে...অবশ্য আপনি অমত করলে...

সুপ্রীতি ফাঁকাভাবে তাকিয়ে রইলেন চিন্ময়ীর দিকে। এই মহিলার কথার অর্থ তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না। এর ছেলের অসুখ, লন্ডনে আছে, সেখানে তুতুল যাবে তার সেবা করতে? ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করে, না না করে? সে আর বেশিদিন বাঁচবে না জেনেও তুতুলকে তার সঙ্গে...।

চিন্ময়ী বললেন, আপনার মেয়ের কেরিয়ার নষ্ট করে তাকে আমি নিয়ে যেতে চাই না। বহ্নিশিখার হাউস স্টাফ থাকার পীরিয়ড এখনো শেষ হয়নি আমি জানি। ওখানে গিয়েও সেটা কমপ্লিট করা যায়। তারপর ওখানে যাতে এফ আর সি এস করে আসতে পারে সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। ওখানে থেকে আসবে কয়েক বছর...

হেমকান্তি বললো, ডক্টর ব্যানার্জি বলেছেন, উনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। মাসিমা, জয়দীপ ওখান থেকে বহ্নিশিখার নামে টিকিট পাঠিয়েছে, সব রেডি, আপনি আপত্তি করবেন না।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে সুপ্রীতি আবেগশূন্য গলায় বললেন, আমার তো আপত্তি নেই। তবে আমার ভাই, ভাইয়ের বউ, ওদের মতামত নেওয়া দরকার, ওদের একটু ডাকি?

দরজার কাছ থেকে টুনটুনি বললো, আমি ডাকছি, আমি ডাকছি।

তুতুল সবাঙ্গ দিয়ে চিৎকার করে বলতে চাইলো, না না! আমি বিলেত যেতে চাই না। সবাই মিলে আমাকে ফাঁদে ফেলছে! আমার বিলেত যাবার একটুও ইচ্ছে নেই। আমি জয়দীপের কাছে কোনো প্রতিজ্ঞা করিনি। জয়দীপের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তার বেশি কিছু তো নয়। জয়দীপ এখন পাগলামি করছে! হেমকান্তি যে কারণে বর্ধমানে তার গ্রামে চলে যেতে চায়, সেই কারণেই তো তুতুল তার মায়ের কাছে থাকতে চাইছে। না,

না শুধু সেই কারণে নয়, মাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না, সে চলে গেলে তার মা একটা অবলম্বনশূন্য লতার মতন নেতিয়ে পড়ে যাবেন, তা সে ভালো করেই জানে।

কিন্তু তুতুল মুখ দিয়ে কোনো কথাই উচ্চারণ করতে পারলো না।

প্রথমে প্রতাপ এলেন না, শুধু মমতা। তিনি বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। সুপ্রীতির তুলনায় মমতা অনেক সপ্রতিভ। তুতুলের বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ সম্মতি আছে.। আজকাল ডাক্তারি করতে গেলে বিলিতি ডিগ্রি না হলে চলে না। তুতুলের যখন যোগ্যতা আছে। তখন যাওয়াই তো উচিত।

প্রতাপ এসেও সেই মতই দিলেন। তবে তিনি বারংবার সুপ্রীতিকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, দিদি, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো? কয়েকটা বছরের তো মাত্র ব্যাপার...

সুপ্রীতি প্রত্যেকবার জানালেন, তাঁর কোনো আপত্তি নেই।

আর তুতুলের মুখ নিচু করা মৌনই সম্মতির লক্ষণ হিসাবে ধরে নেওয়া হলো।

শেষ কথা হিসেবে প্রতাপ চিন্ময়ীকে বললেন, ঠিক আছে, আমি কালই ওর পাসপোর্টের ব্যবস্থা করছি। তবে, আপনি আপনার ছেলের পাঠানো টিকিটটা ফেরৎ দিয়ে দিন। তুতুলের টিকিটের ব্যবস্থা আমরাই করবো। ওর কিছু ফরেন এক্সচেঞ্জেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার শালা ত্রিদিব আছে গ্লাসগো শহরে, তাকে আমি লিখে দিচ্ছি।

এরকম একটা সার্থক ব্যবস্থাপনার পরেও ফেরার পথে গাড়িতে একা একা কাঁদতে লাগলেন চিন্ময়ী। শিখা আর হেমকান্তি তুতুলকে নিয়ে গেল বাইরে।

এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, মমতা, প্রতাপ আর সুপ্রীতি অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করতে লাগলেন এই বিষয়ে। চিন্ময়ীর সামনে সুপ্রীতি যে কথাটা বলতে পারেননি, এবারে

সেই আশঙ্কাটাই ব্যক্ত করলেন। জয়দীপকে বিয়ে করে এত অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যাবে তুতুল? তারপর বাকি জীবন সে কী করবে? শুধু ডাক্তার হয়ে থাকবে?

সুপ্রীতির তুলনায় মমতা অনেক আধুনিক। তিনি বললেন, প্রথম দিকে ধরা পড়লে এই রোগ সেরেও যেতে পারে। তবে, পুরোপুরি সেরে না ওঠা পর্যন্ত জয়দীপের সঙ্গে তুতুলের বিয়ে হবার তো কোনো দরকার নেই! জয়দীপকে সঙ্গ দেবে তুতুল, সে জন্যে বিয়ে করতে হবে কেন?

হঠাৎ মনে-পড়া ভঙ্গিতে সুপ্রীতি প্রতাপকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে খোকন, তুই যে বললি ভাড়ার টাকা আমরা দেবো...সে যে অনেক টাকা! এরোপ্লেনের টিকিট ওরা যখন কেটেই ফেলেছিল...।

প্রতাপ খানিকটা বিরক্ত ভাবে বললেন, দিদি, আমরা কী মরে গেছি? আমাদের বাড়ির একটা মেয়ে বিলেত যাবে, সেজন্য অন্য লোকের দয়ার দান নিতে হবে?

প্রতাপ তাকালেন মমতার দিকে। মমতা জানেন যে প্রতাপ এখন তাঁর কাছ থেকে কী শুনতে চান। তিনি হেসে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। তবে, তোমাকেও চিন্তা করতে হবে না। পাঁচ সাত হাজার টাকা তোমাকে আমিই দিতে পারবো।

সুপ্রীতি বললেন, তোমরা তো অনেক দিয়েছো! আমার এক জোড়া মকর মুখো বালা, একটা টিকলি। সব মিলিয়ে ভরি পাঁচেক সোনা এখনও আছে, আর তো কোনো কাজে লাগবে না...

দু'দিন পরে বাবলুর সঙ্গে তুতুলের একটা ঘোরতর সংঘর্ষ হলো।

বাবলু বাড়ি ফিরেছে রাত এগারোটার পর। মমতা তার খাবার গরম করে দেবার পর মৃদু বকুনির সুরে বললেন, শোনো তোমার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে বলেই যে তুমি সাপের পাঁচ পা দেখেছো, তা ভেবো না। তোমার বাবা বলেছেন, বাবলু এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকে,

কী করে তা তিনি বাবলুর মুখেই শুনতে চান। যেদিন তোমাকে ধরবেন সেদিন বুঝবে ঠ্যালা।

মায়ের বকুনি গায়েই মাখলো না বাবলু। সে হেসে বললো ওলড ম্যানকে বলো, বেশি মাথা গরম করলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে! পৌনে এগারোটায় ফিরেছি, এটা কি বেশি রাত্তির নাকি? নাইট ইজ কোয়ায়েট ইয়াং!

ছেলের মাথায় এক চাঁটি মেরে মমতা বললেন, এই তুই তোর বাবাকে ওলড ম্যান বলছিস যে? তোর বাবা মোটেই বুড়ো হয়নি।

-মা, তুমি কি ইংরেজিটা ভুলে গেছো একদম? একবার সেই যে মেম কাকীমা এসেছিল একজন, তখন তো তুমি তার সঙ্গে খুব ইংরেজি বলেছিলে? নিজের বাবাকে ওল্ড ম্যান বললে মোটেই বুড়ো বলা হয় না... মা, তোমরা নাকি ফুলদিকে প্যাসেজ মানি দিয়ে বিলেত পাঠাচ্ছো?

-হ্যাঁ, কেন? তোর আপত্তি আছে নাকি? তুই যদি পি-এইচ ডি করার জন্য বিদেশে যেতে চাস, তোর প্যাসেজ মানিও আমরা দিতে পারবো।

-আমি? তোমরা কী ভাবো আমাকে? বাপ-মা'র টাকা নিয়ে বিদেশে যাবো? কেন, আমি কি ভিখিরির ছেলে যে বিদেশ যেতে হবে? এদেশে পি-এইচ ডি করা যায় না? পি- এইচ ডি করেই বা আমার কী ল্যাজ গজাবে? আর আমি পড়াশুনো করতে পারবো না। এবারে চাকরি খুঁজবো?

-চুপ, বাবলু, আস্তে আস্তে। তোর বাবা ঘুমিয়েছেন এই সবে মাত্র।

এ বাড়িতে অনেক রাত্তিরের দিকেও কিছু কিছু ঘটনা ঘটে।

এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে মমতা তাঁদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। সুপ্রীতিও ঘুমিয়ে পড়েন বেশ আগে আগে। এই দুই ঘরের আলো নেবানো। তুতুল অনেক রাত

জেগে পড়াশুনো করেছে গোটা ছাত্রী জীবন, এখনও তার সে অভ্যেস যায়নি। বাবলুও ইদানীং খুব রাত জাগে। পরীক্ষার সময় তো কথাই নেই। এখন তার কোনো অ্যাকাডেমিক পড়াশুনোর চাপ না থাকলেও সে দুটো-তিনটের আগে ঘুমোতে যায় না।

একদিন বাবলু রাত দুটো আন্দাজ বাথরুমে ঢুকে হঠাৎ ভূতের ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর তার কী লজ্জা! সে ভূতে বিশ্বাস করে না, তবু তার ভূতের ভয়! আসলে সে দেখেছিল টুনটুনিকে। এ বাড়িতে যে একজন নতুন মানুষ এসে আছে, তা অনেক সময় তার মনেই থাকে না। ভাগ্যিস বাবলুর চিৎকারটা তুতুল ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়নি।

টুনটুনি সুপ্রীতির সঙ্গে শুয়ে পড়লেও প্রায় দিনই আবার একটু পরে চুপিচুপি বেরিয়ে আসে। সে যেন রাত্তিরের পাখি। হঠাৎ সে উঁকি মারে বাবলুর ঘরে কিংবা তুতুলের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তুতুল, মুন্নি, বাবলু এরা দিনে অনেকটা সময় বাড়ির বাইরে কাটায়, সীজন শুরু হয়নি বলে টুনটুনিকে এখনো কোনো কলেজে ভর্তি করা যায়নি, তাই সে বাইরে বেরুতে পারে না। মামাতো, মাসতুতো ভাইবোনেরাই তার বাইরের জানালা।

বাবলুর সঙ্গে কথা বলার সময় সে একেবারে বাবলুর গা ঘেষে দাঁড়ায়। দেওঘরে তাদের বাড়ির একতলার ভাড়াটে ছেলেদের সঙ্গে সে এইভাবেই মিশতো। এইভাবেই দাঁড়িয়ে সে বাবলুকে নানান প্রশ্ন করে।

দুতিনদিন পর বাবলু হঠাৎ টের পেল, টুনটুনির স্পর্শে তার শরীরটা গরম হয়ে উঠছে। সে বেশ অবাক হলো। এ পর্যন্ত অলি ছাড়া আর কোনো মেয়ে সম্পর্কে সে কোনো শারীরিক বা মানসিক আকর্ষণ বোধ করেনি। তা হলে এটা কী হচ্ছে? এই মেয়েটা তার মাসতুতো বোন, কিন্তু দীর্ঘ অপরিচয়ের জন্য একে ঠিক আত্মীয় মনে হয় না, একটা মেয়ে মেয়েই মনে হয়।

টুনটুনি দু'মাস আগে যখন এ বাড়িতে আসে, তখন সে ছিল তার মায়েরই মতন রোগা পাতলা। কিন্তু তার শীর্ণতা ছিল অপুষ্টির জন্য, এই দু'মাসেই বর্ষার চারাগাছের মতন সে

ফনফনিয়ে বেড়ে উঠেছে, মাংস লেগেছে তার গালে, বুক দুটি সুস্পষ্ট, হাঁটা চলার সময় তার উরুতে খেলা করে একটা ছন্দ।

বাবলু টুনটুনির কাছ থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় বসলেও টুনটুনি আবার ঘন হয়ে এসে বাবলুর শরীরে শরীর ছোঁয়ায়। বন্ধু বান্ধবদের মাঝখানে টুনটুনি এসে পড়লে বাবলু তাকে রাইরে যাবার জন্য হুকুম করতে পারে, কিন্তু এই সময়, সে কিছু বলতে পারে না। তার দু'কানের পাশে আগুনের আঁচ। ইচ্ছে করে একটা হাত তুলে টুনটুনির কোমর জড়াতে, কিন্তু সে হাত তোলে না।

কৌশিকের সঙ্গে বাবলু সব রকম বিষয়ে আলোচনা করে। শুধু সায়েন্স নয়, অন্য অনেক বিষয়েও পড়াশুনো করেছে কৌশিক, তার মতামতের দাম আছে বাবলুর কাছে। একদিন বাবলু তাঁকে জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা কৌশিক, প্রাপ্তবয়স্ক দুটি ছেলে মেয়ের শরীর যদি কাছাকাছি আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ফিজিক্যাল আর্জ জেগে ওঠা তো স্বাভাবিক ব্যাপার?- কৌশিক মুচকি হেসে বললো, তুই বুঝি অলিকে বিয়ে করার কথা ভাবছিস? এই সময় তুই বিয়ে টিয়ের কথা চিন্তা করলে তোকে আমরা রেনিগেড বলবো।

অলির নামটা উচ্চারিত হওয়ায় বিরক্ত হয়ে বাবলু বললো, ধ্যাৎ! বিয়ে টিয়ের কথা আসছে কী করে! আমি তোকে একটা থিয়োরিটিক্যাল প্রশ্ন করছি। এই যে আর্জ, এটা স্বাভাবিক কি না।

-যদি পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা থাকে, তাহলে এই আর্জটা স্বাভাবিক। আর না হলে...

-ভালোবাসারও কোনো প্রশ্ন নেই। আমি বলছি, পিওরলি ফিজিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে, যদি দুটি শরীর কাছাকাছি আসে, তাহলে দুটি শরীরই রেসপণ্ড করবে না? সেক্স সিগন্যাল টের পাওয়া যাবে।

-ট্রামে বাসে আমরা তো কত মেয়ের পাশাপাশি যাই, ভিড়ের মধ্যে অনেকের গায়ের সঙ্গে গা ঠেকে যায়, তাতেই কি সেক্স সিগন্যাল শুরু হয়ে যায় নাকি?

–অনেক সময় হয়, সত্যি করে বল?

–হলেও সেটাকে দমন করাই সভ্যতা। অতি বদ লোকেরাই ট্রামে বাসে মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করে।

–পাবলিকলি এরকম কিছু করলে সেটা অসভ্যতা নিশ্চয়ই। কিন্তু যদি প্রাইভেসি থাকে– একটা ফাঁকা ঘরে যদি দু'জন কাছাকাছি আসে, মনে কর, তাদের মধ্যে প্রেম নেই, কোনো রকম মানসিক যোগাযোগ নেই, তবু শরীর সাড়া দিতে পারে না?

–কী আজেবাজে কথা বলছিস, অতীন? তোর মাথার মধ্যে সেক্স ঢুকেছে নাকি? আমি প্রেমের সম্পর্কের মানে বুঝি, কিন্তু শুধু অ্যানিমাল সেক্স, এটা কোনো আলোচনার বিষয়ই নয়।

–মাথায় যদি ঢুকেও থাকে, সেটাকে তাড়াতে হলে তো যুক্তি দিয়ে তাড়ানো দরকার! টু বি ফ্র্যাঙ্ক ইউথ-ইউ, সিনেমায় এলিজাবেথ টেলরকে দেখলে এক এক সময় আমি উত্তেজনা বোধ করি। অথচ তার সঙ্গে কি আমার প্রেম আছে? না কোনো মানসিক যোগাযোগ? কথার কথা বলছি, এলিজাবেথ টেলর যদি হঠাৎ রক্তমাংসের শরীরে আমার খুব কাছাকাছি আসে।

–ডিসগাস্টিং! তুই যা বলছিস, তা হলো সেক্সয়াল অ্যাবারেশন! সভ্য শিক্ষিত মানুষ এইসবের উপরে উঠতে চেষ্টা করে সব সময়। দু'জন নারী পুরুষ যদি পরস্পরকে সত্যিকারের ভালবাসে, তখন তাদের শারীরিক মিলন একটা পবিত্র, সুন্দর ব্যাপার। অবশ্য কিছু সামাজিক রীতিনীতি মেনে নিতেও হয়, ফর দা বেনিফিট অফ ফিউচার জেনারেশন। এছাড়া শারীরিক মিলনের কথা যারা ভাবে, তারা বদলোক, ক্রিমিন্যাল অথবা মহাপুরুষ। শুনেছি, বড় বড় কবি আর শিল্পীরা...

বাবলু হাসতে হাসতে বললো, ইন দিস কেস, আই অ্যাম টেমপটেড টু ডিক্লেয়ার মাইসেলফ এ মহাপুরুষ!

কৌশিকের কাছ থেকে কোনো সমাধান পেল না বাবলু। অলিকে সে ভালোবাসে অথচ টুনটুনি তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালে সে শারীরিক উত্তেজনা বোধ করে কেন? ওকে তো ঠেলে সরিয়ে দিত ইচ্ছে করে না, বরং নিজের ওপর একটু একটু রাগ হয়। দিনেরবেলা তবু অতটা মনে হয় না, কিন্তু রাত্তিরে, নিস্তব্ধতার ঝিমঝিমের মধ্যে শরীর যেন আরও স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। রাত্রির মাদকতা অগ্রাহ্য করা খুব শক্ত।

আজ রাতে টুনটুনি আবার আসতেই বাবলু ভাবলো, আজ পরীক্ষা করে দেখাই যাক না।

টুনটুনি পরে আছে সেমিজের মতো একটা ঢলঢলে পোশাক, এটা পরে সে শোয়, ঐ ভাবেই সে উঠে এসেছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তার স্তনের ডৌলি, উরুর বিভঙ্গ। বাবলু তার দিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারছে না, এই মেয়েটা তার আত্মীয় হয়, এর সঙ্গে শারীরিকভাবে কিছু করা অন্যায়, তা বাবলু জানে। তবু ড্যাম ইট, কেন তার ফিজিক্যাল রি-অ্যাকশন হচ্ছে? শরীরের কি আলাদা ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে? কৌশিক সেই কথাটাই বোঝাতে পারল না।

চেয়ারে বসে আছে বাবলু, টুনটুনি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তার পিঠে লেগেছে টুনটুনির উরু, তার মাথার খুব কাছে ওর বুক। সে কিন্তু কথা বলছে খুব নিরীহ ভাবে, সে শুনতে চাইছে কফি হাউসের গল্প।

বাবলু আজই প্রথম টুনটুনির কোমর জড়িয়ে ধরলো, তার মনে কি অপরাধবোধ জাগছে? কই না তো? অলির প্রতি সে অন্যায় করছে? তবু সে হাতটা সরিয়ে নিতে পারছে না কেন? তার গা কাঁপছে। সে হাতটা নামিয়ে এনে টুনটুনির নিতম্বে বোলাতে লাগলো, কোমর জড়িয়ে ধরাটাও দোষের নয়, কিন্তু এখন সে যা করছে, এটা যৌন খেলা, নিষিদ্ধ সম্পর্কের প্রথম ধাপ, এখনো বাবলু হাত সরাতে পারছে না, তার ভালো লাগছে। কী মসৃণ, কোমল অথচ শক্ত...

টুনটুনির কোনো লজ্জা বা বিকার নেই। দেওঘরের ভাড়াটে ছেলেরাও তার সঙ্গে ঠিক এইরকমই খেলা খেলতো। সে আরও ঘন হয়ে এল।

এবার কি বাবলু টুনটুনির বুকে হাত দেবে? না দেবার কী কারণ থাকতে পারে? মনের মধ্যে একটা দুর্দান্ত ইচ্ছে শিকল-ছেঁড়া সিংহের মতন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সারা বাড়িতে কোনো শব্দ নেই, রাস্তাও এখন নিঝুম, বাবলুর নিঃশ্বাসে ড্রাগনের মতন হালকা।

সে টুনটুনির বুকে অন্য হাতটা রাখলো। এভাবে সে অলিকেও কখনো ছোঁয়নি। হঠাৎ জড়িয়ে ধরে সে অলিকে চুমু খেয়েছে কয়েকবার, কিন্তু সব সময়ই অলি ছটফট করে ছাড়িয়ে নিয়েছে নিজেকে। টনটুনি বাধা দিচ্ছে না, সে হাসছে মৃদু মৃদু। বাবলু আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগলো তার দুই স্তনে, শুধুই তো দুটি মাংসের ডেলা, তবু কী অসম্ভব ভালোলাগা, চুম্বকের মতন বাবলুর হাত আটকে গেছে, এবার কি সে অন্য হাতে টুনটুনির মুখটা নিচু করে এনে তার ঠোঁটটা কামড়ে ধরবে?

-বাবলু?

মা কিংবা পিসিমণি নয়, দরজার দামনে দাঁড়িয়ে ফুলদি। বাবলু লজ্জা পেল না। নিজেকে অপরাধী বোধ করল না, তার মাথায় অসম্ভব রাগ চড়ে গেল ফুলদিকে দেখে। টুনটুনি সামান্য একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালো বাবলুর চেয়ারের পেছন দিকে।

তুতুল অবশ্য বাবলুকে শাসন করতে আসেনি, টুনটুনির সঙ্গে তার অতখানি শারীরিক ঘনিষ্ঠতাও সে লক্ষ করেনি পেছন দিক থেকে, তার ও সব দিকে মন নেই এখন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে বাবলুকে বলতে এসেছে। তার হাতে একটা পুরনো খাতা।

যে কথা সে বলবে তা টুনটুনির সামনে বলা যায় না। তুতুল তাই বললো, টুনটুনি তুই এখন শুতে যাতো, ওর সঙ্গে আমার দু'একটা কথা আছে।

বাবলু জেদের সঙ্গে বললো, না, টুনটুনি থাকবে, ওকে আমি কফি হাউসের গল্প শোনাচ্ছিলাম।

তুতুল কাতরভাবে বললো, তা হলে একটু পরে আবার আসিস। আমার মিনিট দশেক লাগবে।

টুনটুনি বেরিয়ে যেতেই বাবলু কড়া গলায় বললো, ফুলদি, তোমার সম্পর্কে আমার যা ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল, সব চলে গেছে। তুমি বিলেত যাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছো! তোমাকে আমি অন্যরকম ভাবতাম। একজন ডাক্তারকে তৈরি করতে গভর্নমেন্ট এক্সচেকারের কত টাকা খরচ হয় জানো না? গরিব দেশের টাকায় ডাক্তারি পাশ করে এখন সাহেব মেমদের পদসেবা করবে!

–তুই জানিস না বাবলু, আমি ইচ্ছে করে যাচ্ছি না?

–তোমায় কেউ জোর করে পাঠাচ্ছে? তুমি কি কচি খুকী? জয়দীপের ক্যানসার হয়েছে বলে কি কেউ তোমাকে ব্ল্যাকমেল করছে? তার ক্যানসার হয়েছে, সে এ দেশে না মরে ও দেশে গিয়ে মরতে চায়, তা বলে তোমাকেও ছুটতে হবে সেখানে? আসলে তুমি তোমার কেরিয়ার গোছাতে চাও, বিলিতি ডিগ্রির মোহ!

তুতুলের কান্না এসে গিয়েছিল, সে চোখের জল মুছে সংযত গলায় বললো, তুই আমাকে বকছিস, বাবলু, কেন বিলিতি ডিগ্রি নিতে গেলেই বা সেটা দোষের কেন হবে? অনেকেই তো যায়, আবার ফিরে আসে।

–অর্ধেকের বেশিই ফেরে না। এখন আমেরিকাতেও ডাক্তারদের খুব ডিম্যাণ্ড, স্টার্লিং ডলারের ঝুমঝুমি–যারা একবার মুগ্ধ হয়, তারা আর এই পোড়া দেশে ফিরবে কেন?

–তোদের ছেড়ে আমি বিদেশে থাকবো, তুই একথা ভাবতে পারলি?

–তোমাদের এই লোভটা দেখলেই আমার গা-টা রি রি করে ফুলদি। এ দেশে লেখাপড়া করে পুরোপুরি ডাক্তার হওয়া যায় না? ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো তোমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলেই তোমরা তু তু করে ছুটে যাবে।

ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে এরকম কড়া কড়া কথা শোনার অভ্যেস নেই তুতুলের, এর উত্তরে সে ধমক দিতেও পারবে না। এমনিতেই তার মনটা এখন আরও দুর্বল হয়ে আছে। একদিকে তার প্রস্তুতির তাড়াহুড়ো, এরই মধ্যে সব সময় তার কান্না পায়। মা তাকে সত্যি সত্যি মন খুলে যেতে দিতে রাজি হয়েছে কি না, তা সে এখনও বুঝতে পারে নি।

ধরা গলায় সে বললো, তোর সঙ্গে এই নিয়ে আমি তর্ক করতে আসিনি, বাবলু! যাওয়া আমার ঠিক হয়ে গেছে। কারুর মুখের ওপর আমি জোর দিয়ে না বলতে পারি না। হয়তো সেটাই আমার দোষ। তোকে আমি একটা জিনিস দিতে এসেছি। এটা আমার কাছে এতদিন রাখা ছিল, আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না, যদি হারিয়ে যায়।

–কী এটা?

–পিকলুদার কবিতার খাতা।

–দাদার কবিতার খাতা? কয়েকদিন আগেই আমি খুঁজেছি...

–তুই তো আমাকে জিজ্ঞেস করিসনি, আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলুম, মাঝে মাঝে পড়তাম, তুই যদি লেখাগুলো কোথাও ছাপাতে পারিস...

প্রায় কেড়ে নেবার ভঙ্গিতে বাবলু রুক্ষ গলায় বললো, দাও, ওটা আমাকে দাও!

বাবলুকে তো দিতেই এসেছিল তুতুল, তবু যেন একটা অমূল্য সম্পদ তার হাত থেকে চলে যাচ্ছে, এইভাবে সে শেষ মুহূর্তেও খাতাটা আবার ফিরিয়ে নিতে চাইলো, পারলো না। শূন্য হাতে সে একটা দেওয়ালের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

বাবলুর শরীরময় অতৃপ্তি, তার থেকে ক্রোধ, সেই ক্রোধের সবটা ঝাঁঝ সে তুতুলের উপর ছড়িয়ে দিয়েও এখনও মনে মনে গজরাচ্ছে।

৫৮ বছরের প্রথম দিনটি

বছরের প্রথম দিনটি ভালো মন্দ খাওয়ার কথা, কিন্তু আজ দুপুরে ভাতের বদলে রুটি। বাড়িতে এক দানা চাল নেই, বাজারেও কোথাও চাল নেই। রেশানের দোকানে সপ্তাহে মাথা পিছু মাত্র তিন শো গ্রাম চাল বরাদ্দ, ভবানীপুর কালীঘাট অঞ্চলে কোনো রেশানের দোকান দু'সপ্তাহ ধরে সেই চালটুকুও দিতে পারছে না। তাদের স্টক আসেনি। তারা চালের বদলে গম দিচ্ছে।

প্রতাপ নিজে সকালে চাল খুঁজতে গিয়েছিলেন, জগুবাবুর বাজারের কথা আগেই জানা ছিল, আজ গেলেন লেক মার্কেটে, সব মুদি দোকানের মালিকই চালের কথা শুনলে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে। অথচ প্রতাপ খবরের কাগজে পড়েছেন, কালোবাজারে চালের দাম এখন দু'টাকা কিলো। কোথায় সেই কালোবাজার, কী ভাবে সেখানে ঢুকতে হয়? দু'টাকা দরে সেই চাল কিনে কারা খায়?

দুটাকা কিলো দাম শুনলেই মাথাটা গরম হয়ে যায়! এই কলকাতা শহরেই সাত-আট টাকা মন দরে চাল কেনার স্মৃতি এখনও অনেকের মন থেকে মুছে যায় নি। এখন একজন কেরানি বা ইস্কুল মাস্টারের মাস মাইনে দেড় শো টাকা, তার যদি চার পাঁচ জনের সংসার হয় তা হলে দু'টাকা কিলো দরে চাল কিনে তারপর সে বাড়িভাড়া, জামা-কাপড়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এসবের খরচ জোগাবে কী করে? সাতচল্লিশ থেকে সাতষট্টি, স্বাধীনতা এবার কুড়ি বছরে পা দিল, আজও এই স্বাধীনতা দেশের মানুষকে শুধু দুবেলা দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারলো না? স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষ সব রকম কষ্ট স্বীকার করতে পারে। কিন্তু সে কষ্ট স্বীকারের মধ্যে একটা গৌরব বোধ থাকা চাই। কিন্তু এখন কিসের গৌরব, কিসের জন্য কষ্ট স্বীকার? অপদার্থ সরকার চালাচ্ছে এই

দেশ, সব কিছুরই এখন কালোবাজার, এক শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর পয়সা, আর দরিদ্ররা হচ্ছে দরিদ্রতর। সরকার লোককে সপ্তাহে তিন শো গ্রাম. চাল খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলছে, তাও প্রতিশ্রুতি মতো রেশানের দোকান থেকে সে চালটুকুও দিতে পারছে না। কিন্তু যার পয়সার গরম আছে সে পার্ক স্ট্রিট চৌরঙ্গির হোটেল রেস্তোরাঁয় প্রতিদিন দু'বেলাই ফ্রায়েড রাইস-বিরিয়ানি-পোলাউ খেতে পারে। দু'টাকা কিলো দরেও তো কালোবাজার থেকে চাল কেনার লোক আসছে!

বাজারের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে প্রতাপের মনে পড়লো, কয়েকদিন আগে তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার একটি বুলেটিন দেখেছিলেন। তাতে স্বীকার করা হয়েছে যে এ দেশের সাড়ে বারো কোটি মানুষ একদিন অন্তর একদিন খেতে পায়, আর দু'কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক শুধু একবেলার খাবার টুকু কোনোক্রমে জোটাতে পারে। এই লোকগুলো একদিন অন্তর একদিন বা রোজ একবেলা ভাত-রুটি খায় না বজরার দানা খায়, তা অবশ্য বলা হয়নি।

বাজারে ঘুরতে গেলেও মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত। সব কিছুরই আগুন দাম। মাছের বাজারে তো ঢোকারই উপায় নেই।

বেশ কিছুদিন ধরেই প্রতাপ একবেলা রুটি খেতে বাধ্য হয়েছেন। গত দু'সপ্তাহ ধরে দু'বেলাই রুটি। আজ ছুটির দিন, আজও দুপুরে একটু তৃপ্তি করে ভাত খাওয়া যাবে না? ছুটির দিনে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়া হয়, প্রতাপ নিজেও যেমন রুটি পছন্দ করেন না, ছেলেমেয়েরাও রুটি ভালোবাসে না।

প্রতাপ শুধু বাজারে চক্কর দিচ্ছেন, কিছুই কেনা হচ্ছে না। তাঁর দু'চোখে ঝলসাচ্ছে রাগ, কার ওপর এই রাগ? আদালতে প্রতাপ যখন বিচারকের আসনে বসেন, তখন আসামীর চোখে তিনি বিচ্ছুরিত ক্রোধ দেখেছেন, যেন বিনাদোষে তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। আদালতের বাইরে, আজকাল প্রতাপ প্রায়ই অনুভব করেন, তিনি নিজেই যেন ঐ রকম একজন আসামী।

কাটাপোনা, ভেটকি মাছের দাম লাফিয়ে উঠেছে, সাত টাকায়। অথচ মাছের বাজারে ভিড় তো কম নয়, এই দামেও মাছ কেনার লোক আছে। প্রতাপ ওদিকে গেলেন না। এক জোড়া মুর্গীর ডিম চাইছে ছাপ্পান্ন পয়সা। লোকটার কি চোখের চামড়া নেই? এই সেদিনও চার আনায় এক জোড়া পাওয়া যেত। শীতের সময় কড়াইশুটি, ফুলকপি শস্তা হবার কথা, তাও ডবল দাম, কড়াই শুটি তো এ বছর দেড় টাকায় চড়ে বসে আছে! চালের দাম বাড়লে সব কিছুরই দাম বাড়ে।

প্রতাপ আবার ফিরে গেলেন মাছের বাজারে। তিনি কিছুতেই বেশি পয়সা খরচ করবেন না। আজকাল এক রকম নতুন মাছ উঠেছে, তার নাম তেলাপিয়া, কেউ কেউ বলে আমেরিকান কই। আমেরিকানরা জাহাজ ভর্তি করে গম পাঠাচ্ছে, সেই সঙ্গে তারা মাছও এ পাঠাচ্ছে নাকি? খাঁটি কলকাতার লোকেরা মাছের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে, বাঙালরাও সমুদ্রের মাছ, কিংবা অচেনা মাছ চট করে ঢোকাতে চায় না রান্না ঘরে, সেইজন্যই এই তেলাপিয়া বা আমেরিকান কইয়ের দাম এখনও বেশ শস্তা। কয়েকদিন আগে ছিল দেড় টাকা কিলো, আজ চাইছে এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা। প্রতাপ এই মাছ দু'একবার খেয়ে দেখেছেন, একটু কাদা কাদা গন্ধ, তাও চলে যায়। মাছটার প্রধান গুণ, কই মাছের মতনই জ্যান্ত থাকে। রুটিই যদি খেতে হয়, তা হলে এই শস্তার মাছই যথেষ্ট।

বাজার থেকে বাড়ি ফিরে প্রতাপ দেখলেন তাঁর মামাতো ভাই অনিরুদ্ধ আর তার বউ জয়ন্তী বসে আছে তাঁর জন্য। সেই একবার ভন্তু মামার অসুখের খবর পেয়ে প্রতাপ একবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন টালিগঞ্জে, তারপর আর যোগাযোগ নেই। ওঁদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতেও আগ্রহী নন প্রতাপ। তবে অনিরুদ্ধর স্ত্রী জয়ন্তীকে তাঁর বেশ ভালো লেগেছিল, সে এককালে পিকলুর ছাত্রী ছিল! এর হৃদয়ের কোনো একটা জায়গায় পিকলুর স্মৃতি আছে।

মমতা ওদের চা-মিষ্টি দিয়েছেন। মমতা কি জানে, এই যে জয়ন্তী, এই আর একজন, যে পিকলুকে মনে রেখেছে? মমতা বেশ হেসে হেসে গল্প করছেন ওদের সঙ্গে, ওদের বাড়ির খবরাখবর নিচ্ছেন, এই সময় প্রতাপ আর পিকলুর কথা তুলতে চাইলেন না।

ওদের দেখে প্রতাপের আরও একটা কথা মনে পড়লো। ওদের বাড়ির ছাদ থেকে বুলাদের বাড়ি দেখা যায়। প্রতাপের আর যাওয়া হয়নি ওদিকে, কেমন আছে বুলা কে জানে। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে সত্যেন রায়ের নাম চোখে পড়ে।

অনিরুদ্ধ বললো, খোকনদা, আমার ছোট বোনের বিয়ে, বড় কাকা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে। বড়কাকা নিজে আসতে পারলেন না...বৌদি কথা দিয়েছেন যে উনি যাবেন, বৌদি আমাদের নতুন বাসায় একবারও আসেন নি...

মমতার দিকে এক পলক তাকিয়ে প্রতাপ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন, পড়তে লাগলেন। ...'কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রাম নিবাসী, অধুনা কলিকাতার উপকণ্ঠে টালিগঞ্জের অধিবাসী মমাগ্রজ স্বর্গীয় নকুলেশ্বর ঘোষের কন্যা শ্রীযুক্তা সুচরিতার সহিত ফরিদপুরের মাদারিপুর মহকুমার ধূয়াসার গ্রামের রায় বংশের সুযোগ্য সন্তান শ্রীমান নিরঞ্জনের...'

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন প্রতাপ, অন্য সবাই সচকিত হয়ে তাকালো।

প্রতাপ অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর ছোট বোনের বয়েস কত? সে কখনন ব্রাহ্মণবাড়িয়া চোখে দেখেছে? সে পূর্ববঙ্গে গেছে কখনো? তোরা তো ফরটি সেভেনেই দেশ ছেড়ে এসেছিস।

অনিরুদ্ধ বললো না, ফর্টি নাইনে, আমার ছোট বোন এখানে আসার পরেই জন্মায়, ওর ঠিক আঠেরো বছর হলো।

-আঠেরো বছর কি কম সময়? তোর বড় কাকা লিখেছেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সেই বাড়ি তোদর আছে এখনও?

-তা নেই অবশ্য!

তা হলে? এখনও ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে? তোদের টালিগঞ্জের বাড়িটাকে তুই বললি, 'আমাদের বাসা', যেন ওটা টেমপোরারি অ্যাবোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়াই আসল।

–চিঠিতে তো এই রকমই বয়ান লেখে সবাই।

–পাত্র পক্ষও তো দেখছি ফরিদপুরের! যত সব গাঁজাখুরি ব্যাপার। কবে চুকে বুকে গেছে ওসব সম্পর্ক, এখন খবরের কাগজে পুর্ব বাংলার কোনো খবরই থাকে না দিনের পর দিন, এতদিনে ওরা আর আমরা সত্যিকারের আলাদা হয়ে গেছি, মুখ দেখাদেখি বন্ধ! আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, তাদের কাছে মাদারিপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এইসব নামের কী মর্ম আছে?

জয়ন্তী বললো, নস্টালজিয়া! আমাদের বাড়িতে তো প্রায় প্রত্যেকদিনই দেশের বাড়ির গল্প হয়। আমার শাশুড়িতে প্রায় সব কিছুর সঙ্গেই, এমনকি লাউ-কুমড়ো-বেগুনের সঙ্গেও তুলনা দিয়ে বলেন, ওখানে এইসব জিনিসই বেশি ভালো ছিল।

মমতা প্রতাপকে একটু খোঁচা দিয়ে বললেন, তোমার মুখ দিয়েও তো মাঝে মাঝেই এ রকম কথা বেরিয়ে পড়ে। কালকেই না তুমি একবার বললে, ঢাকার মরণচাঁদের দোকানের দই-এর স্বাদ এখানকার চেয়ে অনেক ভালো?

প্রতাপ বললেন, তা বলে আমি আমার ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় চিঠিতে মালখানগর নিবাসী লিখবো না!

–আহা, ওরা চিঠিতে লিখেছে লিখেছে, তা নিয়ে তুমি অত রাগারাগি করছো কেন?

–না, না, রাগারাগি করছি না, এমনিই বললাম। এ রকম লেখা খানিকটা ইলিগ্যালও বটে, ইণ্ডিয়ার সিটিজেন হয়ে তুমি যদি বলো পাকিস্তান নিবাসী...যাক গে, ওটা টেকনিক্যাল ব্যাপার, ঐ নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাতে আসবে না...হ্যাঁরে তোরা কত লোক নেমন্তন্ন

করেছিস? এই দুর্দিনের বাজারে বেশি লোককে খাওয়ানো...চিনি পাওয়া যায় না, চাল পাওয়া যায় না।

অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বললল, ওসব ম্যানেজ হয়ে গেছে, তিন মন খুব ফাইন রাইস স্টক করে রেখেছি, চিনিরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে...আমরা চলি খোকনদা, আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে...আপনারা সেদিন সকালেই যাবেন কিন্তু, গাড়ি দেবো...গাড়ি পাঠিয়ে দেবো...

ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে প্রতাপ মমতাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই বিয়েতে যেতে রাজি হয়েছে?

-ওরা এমন ভাবে বললো।

-তিন মন চাল স্টক করেছে।

-সবাই কি আর তোমার মতন হাকিমী বুদ্ধি নিয়ে সূক্ষ্ম আইনের চুল চেরা বিচার করে, না মাথা ঘামায়। এই বাজারে অনেকেই চাল জমায়। পাশের বাড়ির মিসেস মুখার্জি দুটো বড় বড় মাটির জালা কিনেছেন, প্রত্যেক সপ্তাহে বর্ধমানে গিয়ে চাল কিনে আনেন।

-আমাদের জন্য গাড়ি পাঠাবে বললো। যেন আমরা ট্রামে। বাসে যেতে পারি না। ওদের যে গাড়ি আছে, সেটা জানানোই আসল উদ্দেশ্য। জানো তো, এই যে নন্তু মামা, ভন্তু মামা, এরা আমার মায়ের আপন ভাই নয়, ওদের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। আমার বাবার কাছে এসে কাচুমাচু হয়ে বসে থাকতো, ওদের ছেলেমেয়েরা কেউ বিশেষ লেখাপড়া শেখেনি, কী সব কন্ট্রাক্টারি করে বড়লোক হয়েছে। আমরা এখন ওদের গরিব আত্মীয়। তবু আমাদের ডাকাডাকি করে কেন জানোনা, নিজেরা যে বাড়ি গাড়ি করেছে, সে সব গরিব আত্মীয়দের না দেখাতে পারলে ঠিক সুখ হয় না। ভন্তু মামা আমার সঙ্গে পিঠ চাপড়ানির সুরে কথা বলে। একদিন বলেছিলেন, কি রে, খোকন, তুই কলকাতায়

এক টুকরো জমি নিজে রাখতে পারলি না? আমি কি টাকা পয়সা চুরি করি যে জমি কিনবো, বাড়ি বানাবো?

-আহা, এ কথার কোন মানে হয় না। যারা মাথা গোঁজবার জন্য একটা বাড়ি বানাচ্ছে, তারা সবাই চোর?

-যারা বাঁধা মাইনের চাকরি করে, চুরি জোচ্চুরি না করলে তাদের পক্ষে এই বাজারে বাড়ি বানানো সম্ভব? আর পাঁচ ছ'বছরের ব্যবসাতেই বা কী করে এত লাভ হয় যাতে তিনতলা বাড়ি, গাড়ি...হুঁ, একে ব্যবসা বলে না! বাড়িতে তিন মন চাল স্টক করেছে।

মমতা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ঐ চালের ব্যাপারটাই তোমার খুব মনে লেগেছে না? নিজে চেষ্টা চরিত্র করবে না আমার বাবা রুটি খেতে এমন কিছু কষ্ট হয়ে না...তোমরা এখনো ভেতো বাঙালী রয়ে গেলে।

-ঐ বিয়েতে আমি যাবো না। তোমার ইচ্ছে হলে যেতে পারো! আবার উপহার কেনার জন্য একগাদা টাকা খরচ!

একটুবাদেই এলেন বিমানবিহারী। গাড়ি থেকে নেমেই হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে বললেন, বাবলু কোথায়? সে কি খেলা দেখতে গেছে?

বাবলু বেরিয়ে গেছে সকালেই, সে খেলা দেখতে গেছে কি না তা বলে যায়নি। প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কী হয়েছে?

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বিমানবিহারী বললেন, আজ ক্রিকেট খেলার মাঠে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়েছে। আমাকে আমার ভায়রা একটা টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিল, এই খেলায় টিকিটের জন্য এত হাহাকার, তাই ভাবলুম টিকিটটা নষ্ট করি কেন, দেখেই আসি। আরে ভাই, খেলা দেখতে গিয়ে প্রাণটা যাবার জোগাড়।

-হাঙ্গামা হয়েছে বুঝি।

–হাঙ্গামা মানে, এ রকম কেউ কখনো দেখেইনি! ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে খেলা, সে খেলা তো ঠিক মতন শুরু হতেই পারলো না, একদল লোক জোর করে হুড়হুড়িয়ে ঢুকে পড়লো মাঠে, পুলিশ তাদের ওপরে লাঠি চালাতেই বেঁধে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। দর্শকরাও ইঁট মারতে লাগলো পুলিশের দিকে, মাথার ওপরে যে চাঁদোয়াগুলো ছিল, তাতে আগুন ধরিয়ে দিল, পুলিশ তখন ছুঁড়তে লাগলো টিয়ার গ্যাস, তারপর যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল, বুঝলে আমি ভাবলুম সেই কুম্ভমেলার স্ট্যামপিডের ঘটনা না ঘটে যায়। ভেবে দ্যাখো তুমি, হাজার হাজার লোক বসে আছে, সেদিকে কখনো টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে? আমি তো একবার ভাবলুম, মরেই যাব বুঝি। আমার চেনা এক ভদ্রলোক, সীতেশ রায়, তিনি নিজে রিস্ক নিয়ে দৌড়ে পুলিশের সামনে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন, টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া থামাতে, আমাদের সবার চোখের সামনে পুলিশ তাকে লাঠি পেটা করে শুইয়ে দিল। তাঁর কী অবস্থা এখন কে জানে! এ কি পুলিশ না নাৎসী বাহিনী?

প্রতাপ বললেন, বাবলুটা যায়নি তো খেলার মাঠে? মমতাকে জিজ্ঞেস করছি।

মমতা এসেও কিছু বলতে পারলেন না। খেলা দেখতে যাওয়ার কথা বাবলু কিছু জানায়নি, তবে দু'একদিন আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে এই টেস্ট খেলার টিকিট বিষয়ে আলোচনা করছিল।

বিমানবিহারী বিললেন, কী কেলেঙ্কারি ব্যাপার জানো, সোবার্স, কানহাই, ক্লাইভ লয়েডের মতন বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়, তাদেরও দেখলাম ভয় পেয়ে ময়দান দিয়ে ছুটতে। ইণ্ডিয়ার ক্যাপ্টেন পতৌদিও নাকি কিছুটা ইঞ্জিওর হয়েছেন। কী লজ্জার কথা। স্টেডিয়ামের চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, গণ্ডগোলটা শুরু হলো কী ভাবে?

–আসল ব্যাপার যা মনে হচ্ছে, ঐ ইনকমপ্লিট স্টেডিয়ামে ষাট হাজার সীট, টিকিট বিক্রি করেছে অনেক বেশি...যে সব দর্শক জোর করে ঢুকেছে, তাদের অনেকেরই হাতে নাকি

টিকিট ছিল...কতটা দুর্নীতি ভেবে দ্যাখো, কয়েক হাজার একস্ট্রা টিকিট বিক্রি করে বসে আছে...আর দর্শকদেরও দেখলুম পুলিশকে একটুও ভয় পায় না, সবাই ক্ষেপে আছে যেন, এ রকম আগে দেখিনি কখনো, শেষ পর্যন্ত মাঠে আর্মি নামাতে হয়েছে।

মমতার মুখে একটা কালো ছায়া পড়েছে। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, বাবলুটা...কখন কোথায় যায়, কিছু বলে না।

বিমানবিহারী বললেন, চিন্তা করবেন না, দুপুরে ফিরবে নিশ্চয়ই। বছরের প্রথম দিনটাই এই ভাবে শুরু হলো। এমনিতেই তো গণ্ডগোল লেগেই আছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে স্ট্রাইক চলছে কয়েক মাস ধরে, ট্রাম স্ট্রাইক, প্রায় কুড়ি বাইশ দিন ট্রাম চলছে না, কাল বিকেলে আমাদের বাড়ির সামনে হঠাৎ একটা মারামারি শুরু হয়ে গেল...লোকজন একেবারে ক্ষেপে আছে যেন।

প্রতাপ বললেন, আসল কারণটা হলো চাল। লোকে ভাত খেতে পাচ্ছে না, তাই সব সময় মনে মনে গজরাচ্ছে, যে-কোনো একটা উপলক্ষ পেলেই ফেটে পড়ছে।

বিমানবিহারী খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, চাল? চাল, পাওয়া যাচ্ছে না বুঝি?

প্রতাপ বললেন, তুমি তো বাড়ির কোনো খবরই রাখো না। তোমার গিন্নীই সব দিক সামলান, দু'বেলা ভাত খেতে পাচ্ছো?

-আমি বরাবরই রাত্তিরে পরোটা খাই। চাল-হ্যাঁ, আমাদের চাল তো কৃষ্ণনগর থেকে আসে, নিজেদের জমির চাল।

-বাইরে থেকে কলকাতায় চাল আনা বে-আইনী নয়? করডনিং সিস্টেম যখন চালু আছে।

-বে-আইনী নাকি? কোনোদিন তো কেউ কিছু বলেনি? কতটা বে-আইনী জেলে টেলে যেতে হবে নাকি?

বিমানবিহারী হাসতে লাগলেন। মমতা ভুভঙ্গি করলেন প্রতাপের দিকে তাকিয়ে। চালের

অভাব থাকলেও তাঁদের চেনাশুনো সকলেই এখনো ভাত খায়। কোর্টে যেন আর কেউ চাকরি করে না, তারা সকলেই কি আইন মেনে ভাতের বদলে রুটি খাচ্ছে?

প্রতাপও হাসলেন। আজ সকালে বাজারে ঘোরার সময় তাঁর নিজেরও একবার কালোবাজার থেকে চাল কেনার ইচ্ছে হয়েছিল। অন্তত শুধু এই ফাস্ট জানুয়ারি দিনটায়...কিন্তু কোথায় সেই কালোবাজারের চাল, তার সন্ধানই তিনি পাননি।

বিমানবিহারী বললেন, এরা দেশটা চালাতে পারছে না। রোজই রাস্তায় রাস্তায় মিছিল...একটা বিদেশী টিম খেলতে এসেছে, সেটা যাতে ঠিক ঠাক হয় সেটুকু দেখারও যোগ্যতা নেই।

প্রতাপ বললেন, অপদার্থ! অপদার্থ! সামনেই আবার ইলেকশন, এরা ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে : কথা বলে ভোট চাইবে। খেলার মাঠে মিলিটারি নামাতে হয় যাদের...

–কাকেই বা ভোট দেবে। অপোজিশান পার্টি বলে তো কিছু নেই। দুটো স্ট্রং প্যারালাল পার্টি না থাকলে ডেমোক্রেসি কখনো ফাংশান করতে পারে? ইংল্যান্ডে লেবার পার্টি আছে, আর আমাদের এখানে কম্যুনিস্ট পার্টি যাও বা ছিল, এখন দু'ভাগ হয়ে গিয়ে ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে, তার ওপরে আছে বলশেভিক পার্টি, আর সি পি আই, আর এস পি, এস ইউ সি, এরা সবাই নাকি মার্কসিস্ট, অথচ আলাদা আলাদা। আর ঐ অজয় মুখার্জির বাংলা কংগ্রেস, আমি বলে রাখছি তোমাকে, ইলেকশনের পর বাংলা কংগ্রেস আবার কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমে-দুধে মিশে যাবে। জ্যোতি বসুকে সারা জীবন ঐ বিরোধী দলের নেতা হয়েই থাকতে হবে, দেখো!

–অতুল্য ঘোষ থাকতে আর কারুর ইলেকশানে জেতার আশা নেই, তা জানি। এই ইলেকশনের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

বিমানবিহারী মুখ তুলে মমতার দিকে তাকিয়ে বললেন, বৌদি, কী রান্না করেছেন? আজ আপনার বাড়িতে খেয়ে যাবো। নিজের বাড়িতে আমার খাওয়া নেই, ওরা তো জানে আমি খেলা দেখে বিকেলে ফিরবো!

প্রতাপের হঠাৎ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। বিমানবিহারী এ বাড়িতে আসেন কদাচিৎ। বন্ধু হলেও তিনি এ বাড়িতে বিশিষ্ট অতিথি। তিনি নিজের মুখে খেতে চেয়েছেন। অথচ আজই বাড়িতে তেলাপিয়া মাছ! অন্য অনেক ছুটির দিনে মাংস রান্না হয়, আজ প্রতাপ রাগ করে...এখনও মাংস কিনে এনে চাপালে...না, তা সম্ভব নয়, কালীঘাট থেকে পাঞ্জাবী দোকানের কষা মাংস যদি আনানো যায়।

মমতারও মুখখানা লাল হয়ে গেছে। তাঁর স্বামীর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, ছুটির দিনে দু'একজন লোক তো এসে পড়তেই পারে, মাংসের বদলে তবু যদি একটা ভালো মাছ থাকতো।

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে মমতা বললেন, আপনি খাবেন...আজ কিন্তু আমাদের ভাত হয়নি, আমরা সরকারের সব নিয়ম কানুন মেনে চলি তো, তাই আমরা রুটি খাই!

বিমানবিহারী বললেন, রুটি খেতে আমার একটুও আপত্তি নেই। আপনার হাতের রান্না-আপনি যা দেবেন, তাই-ই খাবো!

মমতা স্বামীর দিকে একটা দুঃখের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন।

প্রতাপ তখন দ্রুত চিন্তা করে যাচ্ছেন, পাঞ্জাবী দোকানের কষা মাংস কাকে দিয়ে আনানো যায়। বাবলুটাকে তো দরকারের সময় কিছুতেই পাওয়া যাবে না, বাড়িতে কোনো চাকরবাকর নেই, বিমানবিহারীকে বসিয়ে রেখে এখন প্রতাপ বেরিয়ে যেতে পারবেন না, একমাত্র মুন্নিকে যদি পাঠানো যায়...

বাথরুমে যাবার নাম করে প্রতাপ একবার ভেতরে গেলেন। মুন্নি বাড়িতে নেই। সে তো আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনসে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে গেছে, আগে থেকেই ঠিক ছিল। টুনটুনি আছে, কিন্তু সে এখনও একা একা বাইরে বেরুতে শেখেনি, সে পারবে না। প্রতাপের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো।

রান্না ঘরে উঁকি দিয়ে তিনি গম্ভীর ভাবে মমতাকে বললেন, যা আছে, তাই-ই দাও! এক কাজ করো, বিমানরা এমনি রুটি খায় না, তুমি রুটি সেঁকবার সময় একটু ঘি মাখিয়ে দাও ওপরে।

মুখ না ফিরিয়েই মমতা বললেন, ঘি ফুরিয়ে গেছে!

ভবদেব মজুমদারের ছেলে প্রতাপ মজুমদার বাড়িতে একজন অতিথি খাওয়ানোর ব্যাপারে জীবনে এত লজ্জা পাননি। তাঁদের বাড়িতে বারো মাস দীয়তাং ভুজ্যতাং লেগে থাকতো। ভবদেব মজুমদার প্রায় প্রতিদিনই দুএকজন আত্মীয় বা বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসতেন।

বিমানবিহারী হাত ধুয়ে বসলেন খেতে। প্রথমে রুটির সঙ্গে ছোলার ডাল আর আল বাঁধাকপির তরকারি। তাই খেয়েই আহা-হা করতে লাগলেন বিমানবিহারী, মমতার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রতাপ আড়ষ্টভাবে তাকিয়ে আছেন, তাঁর গলা দিয়ে রুটি নামতে চাইছে না। তেলাপিয়া মাছ...বিমানবিহারী নিশ্চিত ঐ মাছ খান না, কোনো সচ্ছল পরিবারে ঐ মাছ ঢোকে না, ছুটির দিনের দুপুরে এ বাড়িতে আর কোনো মাছ নেই, মাংস নেই...

মমতা মাছের বাটিটা আনতে যেতেই প্রতাপ ঠিক করলেন বিমানকে তেলাপিয়া মাছের উপকারিতা বুঝিয়ে বলবেন। সব সময় জ্যান্ত পাওয়া যায়, কই মাছের সাবসটিটিউট, প্রোটিনে ভর্তি, অ্যামেরিকানরা দু'তিনরকম মাছের ক্রস ব্রীড় করিয়ে এই মাছ...

হঠাৎ অন্য একটা উপলব্ধিতে প্রতাপের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি হেরে যাচ্ছেন। দারিদ্র্য লুকোবার চেষ্টাটাই আসল মানসিক দারিদ্র্যের লক্ষণ। তিনি নিজে বাড়িতে যা খান, সেই খাবার একজন বন্ধুকে খাওয়ানোতে লজ্জা কিসের।

মমতা মাছের বাটিটা টেবিলের ওপর রাখতেই প্রতাপ বললেন, বিমান, তুমি তেলাপিয়া মাছ কখনো খাওনি বোধ হয়? দ্যাখো একটু টেস্ট করে খেতে পারো কি না। আমাদের বাড়িতে এখন কিছুদিন অস্টারিটি চলছে, তুতুল চলে গেল তো, অনেক খরচপত্র হয়েছে, তাই আমরা এখন শস্তার মাছ খাই।

বিমানবিহারী খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, তেলাপিয়া? নামটাই শুনেছি, আমাদের বাড়িতে কখনো আনে না কেন কে জানে! দেখি, দেখি তো...

একটা মাছ ভেঙে খানিকটা মুখে দিয়ে তিনি বললেন, বাঃ, স্বাদ তো বেশ ভালোই, সর্ষেবাটা দিয়ে রান্নাও ভালো হয়েছে, এই মাছ শস্তা বুঝি?

বন্ধুকে চেনেন প্রতাপ, খারাপ লাগলেও ঐ মাছ খেয়ে যাবেন বিমানবিহারী, অন্তত বমি না পেলে ফেলবেন না। বিমানবিহারীরর ভদ্রতা অতি সূক্ষ্ম ধরনের।

বিমানবিহারী বললেন, বৌঠান, আপনিও আমাদের সঙ্গে বসে গেলে পারতেন। এবারে বসে পড়ুন। বেলা অনেক হলো।

মমতা বললেন, বাবলু এখনও এলো না, খেলা দেখতে গেলেও খেলা তো ভেঙে গেছে, তা হলে বাড়িতে আসবে না কেন?

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে কি খেতে আসবে বলেছিল? মমতা বললেন, খেতে আসবে না, সে রকম তো কিছু বলে যায়নি! সকালে বেরুলে দুপুরে তো খেতে আসে।

বিমানবিহারী বললেন, খেলার মাঠে গেলে একটু চিন্তারই ব্যাপার আছে। পুলিশ এমন পিটিয়েছে, কতজনের যে হাত-পা ভেঙেছে ঠিক নেই।

মমতা বললেন, বাবলুর একটু খোঁজ নেবে না?

প্রতাপ বললেন, কোথায় খোঁজ নেবো? আজ তো সব ছুটি, কোথায় সে টো-টো করে ঘুরছে।

মমতা বললেন, ওর বন্ধু কৌশিক, দু'জনে সব সময় এক সঙ্গে থাকে, কৌশিকের বাড়িতে একবার খোঁজ নিলে জানা যেত।

ছেলের বন্ধুর বাড়িতে খোঁজ নিতে যাওয়ার প্রস্তাবটা প্রতাপের মনঃপূত হলো না। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, দ্যাখো, একটু বাদে আসবে নিশ্চয়ই।

হঠাৎ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুপ্রীতি। তাঁর চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ। সুপ্রীতি শুয়ে শুয়ে রেডিও শুনছিলেন, এই মাত্র রেডিওতে খেলার মাঠের দুর্ঘটনার খবর শোনালো।

সুপ্রীতি বললেন,ও থোকন, তুই একবার বাবলুর খবর নিয়ে আয়। ইডেন গার্ডেনে গিয়ে দ্যাখ, আমার ভালো লাগছে না...

সুপ্রীতি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটা দৃশ্য। গঙ্গার ঘাটে গোল করে দাঁড়ানো মানুষের ভিড়, তার মাঝখানে শাওয়ানো রয়েছে দুটি কিশোরের শরীর...

বিমানবিহারী পাত্র ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো প্রতাপ আমার সঙ্গে তো গাড়ি আছে, একবার দেখে আসা যাক!

৫৯ পুরোনো গাড়িটার বদলে

পুরোনো গাড়িটার বদলে কিছুদিন আগে একটা নতুন ফিয়াট গাড়ি কিনেছেন বিমানবিহারী। ভেতরে এখনও নতুন নতুন গন্ধ। পুরোনো বুড়ো ড্রাইভারটি এখনো রয়ে গেছে, সে কিছুক্ষণ পর পরই একটা পালকের ঝাড়ন দিয়ে গাড়িটা মুছে নেয়।

চমৎকার শীতের অপরাহ্ণ, রাস্তায় নিশ্চিন্ত মানুষের মুখ, কোনো কিছুই দেখে বোঝার উপায় নেই যে আজ ময়দানে একটা খণ্ড প্রলয় ঘটে গেছে। তবে দু একটা রাস্তার মোড়ে যুবকদের জটলা, তারা আলোচনা করছে ঐ ভাঙা খেলার।

বিমানবিহারী বললেন, এখন স্টেডিয়ামের দিকে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আগে বরং ঐ কৌশিকের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখা যাক। কী বলো?

এইভাবে বিমানবিহারীর সঙ্গে বেরুবার একটুও ইচ্ছে ছিল না প্রতাপের। শুধু শুধু বিমানকে ব্যতিব্যস্ত করা। বন্ধুর গাড়িতে চেপে ছেলেকে খুঁজতে যাওয়া ... সত্যি কি সেরকম কিছু ঘটেছে? হয়তো একটু পরেই বাবলু বাড়িতে ফিরে আসবে। মমতা আর সুপ্রীতির যুক্তিহীন। আশঙ্কার জন্যই প্রতাপকে বেরুতে হলো।

প্রতাপ বললেন, আমার ছেলেটা বুঝলে বিমান, যদিও বড় হয়েছে, কিন্তু এখনও ছেলেমানুষের মতন রয়ে গেছে। ধুড়ুম ধাড়ুম করে দরজা জানলা বন্ধ করে, খিদে পেলেই চাচায়, আবার এক একদিন নাওয়া খাওয়া ভুলে বাইরে কাটিয়ে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এম এস সি পাস করলো, কিন্তু এখনও ম্যাচিওরিটি আসেনি।

বিমানবিহারী বললেন, যতদিন ছেলেমানুষ থাকা যায়, ততই তো ভালো। এরপর একবার সংসারের ঘানিতে জুতলেই তো ... আমরাও ধরো না কেন, আমাদের বাবা-কাকাদের মতন অতটা বুড়ো হয়েছি কি? আমার বাবা আমার মতন এই বয়েসে হাতে ছড়ি নিয়ে

ঘুরতেন, মাথার চুল প্রায় সাদা। আমার তবু কিছু চুল পেকেছে, তোমার মাথাটি তো এখনও দিব্যি কালো রয়েছে, প্রতাপ! কলপ টলপ মাখো নাকি?

–আরে যাঃ! চুলে কলপ মাখবো কাকে ভোলাতে? তবে আমারও চুল পাতলা হয়ে আসছে।

–বাবলুকে আই এ এস পরীক্ষায় বসাবে নাকি? মেরিটোরিয়াস ছেলে, ও ঠিক পেরে যাবে।

–ওর মা ওকে একবার সাজেস্ট করেছিল, তাতে মায়ের ওপর ওর কি চোটপাট! ও নাকি কোনোদিন সরকারি চাকরি করবে না। আজকালকার ছেলেদের জোর করে কিছু করানো যায় কি?

–সরকারি চাকরি করবে না ...যদি বেঙ্গল কেমিক্যালে ঢুকতে চায়, আমি চেষ্টা করতে পারি। রাজশেখর বসু মশাইয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ জানাশুনো ছিল, সেই সূত্রে ওখানকার অনেককেই চিনি।

–আমার ইচ্ছে, চাকরিতে ঢোকার আগে পি-এইচ ডি করুক।

–পি-এইচ ডি যদি করতেই হয় ...এদেশে করবে? ভালো রেজাল্ট করেছে, অনায়াসে বিদেশের কোনো ইউনিভারসিটিতে চান্স পেয়ে যেতে পারে। আজকাল তো দলে দলে ছেলেমেয়ে আমেরিকা চলে যাচ্ছে।

–ওর মা'র মুখে শুনেছি, ওর বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি আছে।

–ওর মা'র মুখে শুনেছো ...কেন, তুমি ওকে নিজে জিজ্ঞেস করতে পার না?

–এই একটা দুঃখের ব্যাপার হয়েছে, বিমান, ছেলেটা সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলতেই চায় না। আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। হয়তো আমারই দোষ, অল্পবয়সে একটু বেশি শাসন করেছি, খুবই দুরন্ত ছিল তো, পড়াশুনোয় একেবারে মন ছিল না।

–পড়াশুনোয় মন ছিল না, কিন্তু প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই রেজাল্ট ভালো করেছে।

–সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার! সারা বছর পড়ে না ...ওর মায়ের সঙ্গে যেমন মাঝে মাঝেই ঝগড়া হয়, আবার মায়ের সঙ্গেই মনের কথা হয়, আমাকে কিছু বলতে চায় না।

কৌশিকদের বাড়ির কাছাকাছি গাড়িটা থামলো। মমতা কৌশিকদের ঠিকানা বলে দিয়েছিলেন, ছেলের কাছে তিনি কৌশিকদের বাড়ির বর্ণনাও শুনেছেন। পুরোনো আমলের বাড়ি, সামনে কোলাপসিবল গেট, একপাশে একটা বড় কদমফুলের গাছ।

বিমানবিহারীকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে প্রতাপ নামলেন। এখন দুপুর পৌনে তিনটে। এই সময় কারুর বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করা কি ঠিক? এ বাড়ির অন্য কেউ প্রতাপকে চেনে না, এমনকি কৌশিকের সঙ্গেও তার কোনোদিন একটাও কথা হয়নি। বসবার ঘরে ছেলের বন্ধুদের দেখে তিনি গম্ভীর ভাবে ভেতরে ঢুকে যান, ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করার কথা কোনোদিন তার মনে আসেনি। বাবলুর বন্ধুরাও তাকে দেখলে আড়ষ্ট হয়ে চুপ করে বসে থাকে।

প্রতাপ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তার অহমিকা প্রবল, তিনি অযাচিতভাবে এ বাড়িতে এসেছেন, এমন দুপুরবেলা বিরক্ত করার জন্য যদি এ বাড়ির কেউ প্রথমেই তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে?

গেটের পাশে একটি কলিং বেল আছে। অনেকখানি দ্বিধা নিয়ে প্রতাপ সেখানে আঙুল রাখলেন। ছেলের খোঁজ নিতে এসেছেন বটে, কিন্তু প্রতাপের মনের একটা অংশ চাইছে, বাবলু যেন এখানে না থাকে! এম এস সি পাস করা ছেলে বাবাকে এইভাবে ছুটে আসতে দেখলে কি খুশী হবে? তার আত্মসম্মানে লাগতে পারে। একমাত্র মায়ের মন এইসব বোঝে না।

দু তিনবার বেল বাজবার পর দোতলার বারান্দা থেকে একটি তরুণী মেয়ে রেলিং-এ অনেকখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো, কে? এই যে, ওপরে তাকান, কী চাই?

প্রতাপ যেন একজন ফেরিওয়ালা। তার মুখ লালচে হয়ে গেছে, তবু শান্তভাবে তিনি বললেন, কৌশিক আছে কী? তার সঙ্গে একটু কথা বলতাম।

তরুণীটি বললো, কৌশিক তো নেই, বেরিয়ে গেছে।

প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ত হলেন। কৌশিক নেই, বাবলুও এখানে নেই, যাক বাচা গেল, প্রতাপ এখন ওদের মুখোমুখি হতে চাইছিলেন না। দোতলার তরুণীটি প্রতাপকে ফিরতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, কৌশিককে কিছু বলতে হবে। কী? আপনার নাম?

প্রতাপ মাথা নেড়ে বললেন, আমার নাম শুনে চিনতে পারবে না, দরকার নেই...

-এই যে, শুনুন, রাস্তার উল্টোদিকে, ঐ যে হলদে বাড়িটার পাশে একজন মুচি বসে আছে, তাকে একটু ডেকে দেবেন, প্লীজ!

তরুণীটির অনুরোধ প্রতাপ মান্য করবেন অবশ্যই। তরুণীটি প্রতাপকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করছে। এরপর প্রতাপ যখন গাড়িতে উঠবেন, তখন সে লজ্জা পেয়ে যায় যদি! বিস্মিত বিমানবিহারীর চোখের সামনে দিয়ে প্রতাপ রাস্তা পার হয়ে মুচিটিকে নির্দেশ দিলেন, তারপর ধীরে-সুস্থে একটি সিগারেট ধরালেন। তরুণীটি যাতে দেখতে না পায়, তিনি মুখ ফিরিয়ে আছেন অন্যদিকে।

গাড়িতে ফিরে আসার পর বিমানবিহারী জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো?

-কৌশিক বাড়িতে নেই বললো।

-বাবলু এসেছিল এখানে?

-তা জিজ্ঞেস করিনি।

–বাঃ, সে কথাটা জিজ্ঞেস করলে না? বাবলু আর ঐ ছেলেটি যদি একসঙ্গে বেরিয়ে থাকে ...যাও, একবার বাবলুর কথাটা জিজ্ঞেস করে এসো

--থাক, দরকার নেই। এখানে নেই যখন...

বিমানবিহারী একটু চিন্তা করে বললেন, চলো, আমার বাড়িতে যাই। আমার জন্যও ওরা হয়তো চিন্তা করতে পারে, রেডিওতে খবর শুনেছে নিশ্চয়ই, বাবলুও থাকতে পারে ওখানে, অলির সঙ্গে তো প্রায়ই গল্প করতে আসে।

গাড়ি আবার ঘুরলো, প্রতাপের একটা কথা মনে পড়লো, বাবলু না-ফেরা পর্যন্ত মমতা না খেয়ে থাকবেন। মমতার আলসার আছে, বেশিক্ষণ খালি পেটে থাকা তার পক্ষে ঠিক নয়। বাবলুর হয়তো কিছুই হয়নি, সে কোথাও বসে আড্ডা দিচ্ছে, কিন্তু দুপুরে বাড়িতে এসে খাবে কি খাবে না, সে কথা কেন বলে যায়নি হতভাগা ছেলেটা?

বিমানবিহারী আবার বললেন, বাবলু কোনো পলিটিক্যাল পার্টিতে যোগ দিয়েছে নাকি, তুমি কিছু জানেন?

প্রতাপ দু দিকে মাথা নাড়লেন।

–অলির সঙ্গে প্রায়ই পলিটিক্স নিয়ে তর্ক করে, আমি মাঝে মাঝে শুনতে পাই। উঃ, এক এক সময় এমন চাচামেচি করে ঝগড়া লাগায় দু'জনে, ঠিক যেন পিঠোপিঠি ভাই বোন!

প্রতাপ একটু হেসে উঠলেন। অলিকে তার খুবই পছন্দ, এমন শান্ত, শ্রীময়ী মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। সেও চেঁচিয়ে ঝগড়া করতে জানে নাকি? মমতার মাথায় সম্প্রতি একটা চিন্তা ঘুরছে, ছেলে এম এস সি পাস করেছে, দু' এক বছরের মধ্যে তার বিয়ের কথা ভাবতে হবে, অলির সঙ্গে বাবলুর ছেলেবেলা থেকে বন্ধুত্ব, অলির সঙ্গেই বিয়ে হলে সবদিক থেকেই চমৎকার হয়, যদি বিমানবিহারীদের আপত্তি না থাকে এই বিষয়ে প্রতাপ কি বিমানবিহারীর সঙ্গে একটু আলোচনা করতে পারেন না?

প্রতাপ তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। বাবলুর বিয়ে নিয়ে তিনি এখন একটুও মাথা ঘামাতে চান না। আগে পড়াশুনো শেষ করুক, চাকরি বাকরিতে ঢুকুক ...তা ছাড়া বিমানবিহারীর কাছে তিনি কিছুতেই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারবেন না। কোনো রকম প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারেন না প্রতাপ, নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে তো নয়ই। অলির বিয়ে সম্পর্কে বিমানবিহারী ও কল্যাণী যদি অন্যরকম চিন্তা করে থাকেন? তাদের এই দুই পরিবারের অবস্থা সমান নয়। কল্যাণী কোনো ধনী পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতেই পারেন ...অলি আর বাবলু দু'জনেই লেখাপড়া শিখেছে, তারা নিজেরা যদি ঠিক করে, কিংবা বিমানবিহারী ও কল্যাণীর কাছ থেকে যদি কোনো প্রস্তাব আসে ...তার আগে প্রতাপ নিজে থেকে মুখ ফুটে কিছুতেই কিছু বলবেন না।

বিমানবিহারী এইমাত্র বললেন, অলি আর বাবলু পিঠোপিঠি ভাই-বোনের মতন! তা হলে বোধ হয় বিমানবিহারীর চিন্তা অন্যরকম!

ভবানীপুরে পৌঁছে দোতলার ঘরেই দেখতে পাওয়া গেল অলিকে। ছুটির দিনেও সে অফিস ঘরে বসে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করছে। টেবিলের ওপর অনেক কাগজপত্র ছড়ানো, অলির হাতে একটা পুরোনো আমলের গেরুয়া রঙের মোটা পার্কার কলম।

বাবলু এখানে নেই। আজ সে এ বাড়িতে আসেনি।

বিমানবিহারী বললেন, অলি, আমাদের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করবি? জগদীশটা বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

অলি উঠে যেতেই বিমানবিহারী বললেন, পঁড়াও, লালবাজারে একটা ফোন করি। ধরো, কোনো কারণে বাবলু যদি খেলার মাঠে ইনজিওরড় হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে থাকে, ওদের কাছে নিশ্চয়ই লিস্ট থাকবে!

প্রতাপ বললেন, না, না, তার দরকার নেই। এত ব্যস্ত হবার কোনো মানে হয় না। শক্ত সমর্থ ছেলে ...খেলার মাঠে গিয়ে থাকলেও সে নিশ্চয়ই একা যায়নি, কিছু একটা হয়ে থাকলে অন্য কেউ না কেউ নিশ্চয়ই খবর দিত।

বিমানবিহারী তবু লালবাজারে তার পরিচিত ডি সি ডি ডি ওয়ান-কে ফোন করলেন, কিন্তু কোনো সুবিধে হলো না, ছুটির দিনে ডি সি ডি ডি নেই অফিসে, এমার্জেন্সি সেল থেকেও হতাহতদের লিস্ট দিতে পারলো না, এখনও তাদের হাতে আসেনি।

বিমানবিহারী ফোন রেখে দিয়ে বললেন, দাঁড়াও, চা-টা খেয়ে নিই, তারপর পি জি হাসপাতালে যাওয়া যাবে, কাছেই তো, ওখানেই প্রথমে নিয়ে আসবে, কিংবা মেডিক্যাল কলেজে ...

প্রতাপ এবারে প্রবল আপত্তি করলেন, বিমানবিহারীকে তিনি আর মোটেই ব্যতিব্যস্ত করতে চান না, বিমানবিহারী পেট্রল পুড়িয়ে গাড়ি নিয়ে ঘুরবেন সারা কলকাতা, এরও কোনো মানে হয় না। পেট্রলের দামও তো কম না!

প্রতাপ বললেন, হয়তো আমরা বাড়াবাড়ি করছি, এতক্ষণে বাবলু বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে। আগে আমি একবার বাড়ি যাই, বুঝলে, যদি দেখি সন্ধের মধ্যেও ফিরলো না, তারপর না হয় তোমাকে আবার খবর দেবো ...তুমি এর মধ্যে অলিকে কিছু বলল না, ও বেচারি শুধু শুধু চিন্তা করবে...

চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন প্রতাপ।

বিমানবিহারী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও তার গাড়ি ব্যবহার করতে খুবই লজ্জা বোধ করছিলেন তিনি। টাকা পয়সার ব্যাপারটা কিছুতেই ভোলা যায় না। ল কলেজে পড়ার সময় যখন বিমানবিহারীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়, তখন প্রতাপদের অবস্থা বেশি সচ্ছল ছিল। বিমানবিহারীদের কৃষ্ণনগরের বাড়ির চেয়ে মালখানগরে প্রতাপদের বাড়ি ছিল

অনেক বড়, ছাত্র বয়েসে প্রতাপ বেশ ভালো টাকা হাতখরচ পেতেন, বন্ধুদের চপ কাটলেট খাওয়াতেন ফারপো হোটেলে। আজ বিমানবিহারীকে তেলাপিয়া মাছ খাওয়াতে হলো।

বাড়ি ফিরে যদি দেখা যায়, বাবলু এখনও খেতে আসেনি, তা হলে মমতা সুপ্রীতিকে কী সান্ত্বনা দেবেন প্রতাপ? তিনি নিজে খুব একটা উদ্বেগ বোধ করছেন না। খেলার মাঠে গেলে বাবলু সেকথা নিশ্চয়ই বলে যেত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে এই খেলা দেখার জন্য সারা কলকাতা পাগল হয়ে উঠেছিল, টিকিট ব্ল্যাক হয়েছে, সেই খেলার টিকিট জোগাড় করতে পারলে বাবলু কি সে কথা বাড়িতে জানাতো না? আজ দুপুরে খেতে আসতে পারেনি, নিশ্চয়ই কোথাও আটকে গেছে, কোনো বন্ধুর বাড়িতে জোর করে খেয়ে নিতে বলেছে, টেলিফোন তো নেই যে খবর দেবে!

মমতা বা সুপ্রীতি এইসব যুক্তি মানতে চাইবে না। বাবলুর আড়ালে ছায়া হয়ে দাঁড়াবে পিকলু। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। কত সামান্য, তুচ্ছ কারণে চিরকালের মতন হারিয়ে গেল পিকলুর মতন একটা প্রাণবন্ত ছেলে। এরকম দুর্ঘটনা তো ঘটে! আজ বেশি করে পিকলুর কথা মনে পড়বে আবার। বাবলুকে বাঁচাতে গিয়েই পিকলু চলে গেছে। বাবলু বোঝে না যে তার মায়ের কাছে তার দাদার অভাবটাও পূরণ করতে হবে তাকেই, তার দ্বিগুণ দায়িত্ব। ছেলেটার এই কাণ্ডজ্ঞান হলো না এ পর্যন্ত।

পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছলেন প্রতাপ। নিজেই তিনি অবাক হলেন, পিকলুর কথা মনে পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এসে গেল তাঁর, এত বছর পরেও? পুত্রস্নেহের টান এমন প্রবল হয়? তিনি কিন্তু পিকলুকে ভুলে যেতেই চান। যে চিরকালের মতন হারিয়ে গেছে, তার স্মৃতি আকড়ে ধরে রাখার কোনো মানে হয় না। মমতার আপত্তি সত্ত্বেও শয়নকক্ষ থেকে পিকলুর ছবি সরিয়ে রেখেছেন তিনি।

বাড়ির দিকে যেতে পা উঠছে না প্রতাপের। মমতা ও সুপ্রীতি একসঙ্গে কান্নাকাটি শুরু করলে তিনি সামলাবেন কী করে? বকাবকি করতে হবে। কিন্তু আর কোথায়ই বা বাবলুর ঘেঁজে তিনি যাবেন এখন? হাসপাতালে যাওয়ার একেবারেই প্রবৃত্তি নেই তার।

প্রতাপ যে বাসে উঠলেন, সেই বাসেই বসে আছে বাবলু। সঙ্গে দু'জন বন্ধু। তাদের মধ্যে। কৌশিক নেই, পেছনদিকের লম্বা টানা সিটটায় বসে বাবলু তাদের সঙ্গে গল্পে মত্ত। বাবলু নিজে থেকেই বাবাকে দেখতে না পেলে প্রতাপ ছেলের সঙ্গে তখুনি কথা বলতেন না। দুশ্চিন্তার অবসান হলেই মন সবসময় ফুর্তিতে ভরে ওঠে না। অনেক সময় তীব্র রাগ হয়। প্রতাপ ঠিক করলেন, বাবলু বাড়ির স্টপে নামে কিনা সেটা তিনি আগে লক্ষ করবেন। কিন্তু বাসে বেশি ভিড় নেই, বাবলু তাঁকে দেখতে পেয়েছে।

গল্প থামিয়ে অবাকভাবে বাবলু জিজ্ঞেস করলো, বাবা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

প্রতাপ উদাসীনভাবে বললেন, এই এদিকে, বিমানদের বাড়িতে।

বাবলুর দুই বন্ধু তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মেসোমশাই, আপনি এখানে এসে বসুন।

বাবলুও উঠে দাঁড়িয়েছে, প্রতাপ বুঝলেন, আপত্তি করে লাভ নেই, ছেলের বন্ধুরা তাকে পঁড়িয়ে থাকতে দেবে না, যদিও বাড়ি বেশি দূরে নয়।

প্রতাপ বসলেন, বাকি জায়গাটাতে অন্য দুই বন্ধুও বসলো, বাবলুই পঁড়িয়ে রইলো। বাবলু পরিচয় করিয়ে দিল, তার দুই বন্ধুর নাম অলোক আর সিদ্ধার্থ। অলোক তাকে মেলোমশাই বলে ডেকেছে, সিদ্ধার্থ বললো, কাকাবাবু, আজ খেলার মাঠে কী কাণ্ড হয়েছে শুনেছেন? ...গারফিল্ড সোবার্স ময়দান দিয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়েছে, হেল্প হেল্প! আর রোহন কানহাই নাকি ভয়ের চোটে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল!

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা খেলা দেখতে গিয়েছিলে?

সিদ্ধার্থ আর অলোক দু'জনেই শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ওরা টিকিট পায়নি, ওদের হস্টেলের কয়েকটি ছেলে গিয়েছিল রঞ্জি স্টেডিয়ামে, তাদের মধ্যে একজনের হাত

ভেঙেছে, একজনের কাঁধের ওপরে এসে পড়েছে টিয়ার গ্যাসের সেল ... ওরাও পুলিশের কয়েকজনকে শুইয়ে দিয়েছে মাটিতে ...

বাড়ির কাছাকাছি এসে প্রতাপ উঠে দাঁড়ালেন। বাবলু যদি নামতে না চায় তিনি কিছু বলবেন না। বাড়িতে গিয়ে বাবলুর খবরটা দিলেই তো হলো। ছেলের যদি বাড়ি ফেরার মন না থাকে, তিনি জোর করতে যাবেন কেন?

বাবলুও নামলো প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বাবার পাশাপাশি না হেঁটে সে রইলো এক পা পিছিয়ে। রাস্তার লোক দেখে ভাববে, ওরা দু'জন অচেনা মানুষ, আলাদা পথচারী।

একটু পরে বাবলু মৃদুগলায় বললো, বাবা, আমি শিলিগুড়ি কলেজে একটা লেকচারারের পোস্টের অফার পেয়েছি। নেবো?

প্রতাপ মুখ ফিরিয়ে বললেন, কলেজে পড়ানোর চাকরি? তুই পি এইচ ডি করবি না?

-চাকরি পাওয়া এখন দারুণ শক্ত ব্যাপার। এটা পাচ্ছি যখন ...পি-এইচ ডি পরেও করা যায়!

-মফস্বলের চাকরি, তুই পারবি?

-আমার নর্থ বেঙ্গল খুব ভালো লাগে। এই যে আমার বন্ধু সিদ্ধার্থ, ওর দাদা ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল, কেমিস্ট্রির একটা পোস্ট খালি হয়েছে ...এই রকম চান্স সহজে পাওয়া যায় না

-চাকরিই যদি করতে হয়, তা হলে কলকাতায় চেষ্টা করা যেতে পারে, তোর বিমানকাকা বলছিল বেঙ্গল কেমিক্যালের কথা ...তুই কলেজে পড়াতে পারবি?

-চেষ্টা করে দেখি অন্তত কয়েক মাস। ভালো না লাগলে ছেড়ে দেবো।

-তোর মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে দ্যাখ।

–সকালে শিবপুরে চলে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম দুপুরের আগেই ফিরবো ...ওদের হস্টেলে আজ খিচুড়ি আর ফ্রায়েড প্রণ হয়েছিল, ওরা জোর করে ধরে রাখলো, না খাইয়ে ছাড়লো না, এমন চমৎকার খিচুড়ি হয়েছিল, অনেকদিন এরকম খাইনি ...ওদের রুটি খেতে হয় না, ওদের হস্টেলের জন্য চালের কোটা আছে। নর্থ বেঙ্গলেও শুনলুম চাল পাওয়া যায়।

প্রতাপ আর কোনো মন্তব্য করলেন না। বাড়ির মধ্যে ঢুকে রান্না ঘরের দিকে এক পলক দৃষ্টি দিয়েই তিনি বুঝলেন, মমতা এবং সুপ্রীতি এখনো না খেয়ে রয়েছেন। বাবলু ঢুকে গেল বাথরুমে।

প্রতাপ শোওয়ার ঘরে আসতেই মমতা বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, বাবলু? বাবলু কোথায়?

প্রতাপ ধীর স্বরে বললেন, তোমার ছেলে ফিরে এসেছে।

মমতার কপালটা ফর্সা হয়ে গেল, চোখে জ্বলে উঠলো আলো। কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো কৃতজ্ঞতা। তিনি এগিয়ে এসে স্বামীর হাত ধরে বললেন, তুমি বাবলুকে খুঁজে আনলে? কোথায় ছিল? কৌশিকদের বাড়িতে যেতে তো এতক্ষণ লাগে না...

প্রতাপ বললেন, না, আমি খুঁজে আনিনি। ও বাড়িতেই ফিরছিল, আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো।

মমতার মুখের দিকে বেশ কয়েক পলক স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন প্রতাপ। তারপর মিনতি মাখা কণ্ঠে বললেন, আমি যে ওকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, সে কথা ওকে বলবার দরকার নেই। বলো না কিন্তু। বলো না!

৬০ অকস্মাৎ মামুনকে গ্রেফতার

যেমন অকস্মাৎ মামুনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, সেইরকমই হঠাৎ একদিন ছেড়ে দেওয়া হলো তাঁকে। মুক্তি পেয়েই মামুন যেন বেশি বিস্মিত হলেন। অন্যান্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে তাঁকে রাখা হয়েছিল আর্মি ক্যানটনমেন্টে। মাসের পর মাস তাঁর ওপর মানসিক ও শারীরিক উৎপীড়ন চলেছে। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা দিয়ে তাঁকে ভারতের গুপ্তচর সাজাবার চেষ্টা হয়েছিল। মামুন ধরেই নিয়েছিলেন, একা কুকুরকেও ফাঁসী দেবার আগে যেমন একটা বদনাম দিতে হয়, সেই রকমই কিছু চেষ্টা চলছে। জেরার সময় ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ ওঝা, চিটাগাঙ-এর আওয়ামী লীগ নেতা মানিক চৌধুরী ও স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান, শেখ মুজিব নয়, অন্য একজন, এদের নাম তোলা হচ্ছিল বারবার। অথচ মামুন এই তিন ব্যক্তিকে কোনোদিন চক্ষেও দেখেন নি।

বিনা ভূমিকায় মামুনকে জেল গেটের বাইরে যেতে দেওয়া হলো। তাঁর পকেটে একটি পয়সা নেই, বাইরে তাঁর জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই। ইন্টেলিজেন্স-এর লোকদের অত্যাচারে এবং রক্তামাশায় ভুগে মামুনের শরীরটা শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে, তবু শীতকালের পরিষ্কার আকাশ দেখে তাঁর মনটা আনন্দে ভরে গেল। কী সুন্দর, টাটকা আলো। মুক্তির স্বাদ যে এত সুন্দর, তা জেলখানায় কিছুদিন না কাটালে বোঝা যায় না।

বেলা এখন এগারোটা। আজ ঠিক কী বার বা তারিখ, তা মামুনের খেয়াল নেই। পথের গাড়ি-ঘোড়ার জটলা ও মানুষজনের যাওয়া-আসার ব্যস্ত ভঙ্গি দেখলে ছুটির দিন মনে হয় না। শোনা যাচ্ছে গতিশীল পৃথিবীর একটা গমগম শব্দ।

রাস্তার কোনো মানুষ কি মামুনকে দেখে বুঝতে পারছে যে তিনি এই মাত্র জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন? শুধু কারাবাস থেকে মুক্তি কেন, হয়তো তিনি ফিরে এসেছেন মৃত্যুর সীমান্ত থেকেও। এক সময় সত্যি তাঁর মৃত্যুভয় ধরে গিয়েছিল। ইন্টারোগেশনের সময় অফিসাররা যেমন ভাবে যখন তখন তাঁর মাথার চুল খামচে ধরতো কিংবা শিরদাঁড়ায়

লাথি মারতো, তাতে মনে হতো, ঐ সব আঘাতের ফলে হঠাৎ মামুনের মৃত্যু হলেও তারা কিছু পরোয়া করবে না। একটি দিনের জন্যও তাঁকে আদালতে হাজির করানো হয়নি। সুতরাং তাঁর লাশ গায়েব করে ফেলতেও অসুবিধে ছিল না কিছুই।

মামুন নিজের বেশ কয়েকটি কবিতায় মৃত্যুর বন্দনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে মৃত্যুকে সম্বোধন করেছেন বন্ধু বলে, কিন্তু জেলখানার অত্যাচারে যখন এক একবার দারুণ যন্ত্রণা ও অপমানের রূপ ধরে মৃত্যু এসে উঁকি মারতো, তখন মামুন শিউরে উঠতেন, তাঁর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হতো, না, না, না, আমি আরও বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচতে দাও!

হাঁটতে হাঁটতে মামুনের খুব ইচ্ছে করছে, কোনো একজন অচেনা লোকের হাত চেপে ধরে বলতে, ওরে ভাই শোনো, আমি এই মাত্তর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি, আমি বেঁচে ফিরে এসেছি!

এখন কোথায় যাওয়া যায়? হেনা দু'বার দেখা করার অনুমতি পেয়েছিল, তার কাছ থেকেই মামুন জেনেছেন যে ঢাকায় তাঁদের বাসা তুলে দেওয়া হয়েছে, ফিরোজা বেগম চলে গেছেন মাদারিপুর। আলতাফ আর একদিনও আসেনি। দিনকাল পত্রিকা অফিসে মামুনের নিজস্ব ঘরটির ওপর এখন তাঁর আর কোনো অধিকারই নেই। ঐ ঘরের জানলার পর্দার রংও মামুন নিজে পছন্দ করেছিলেন। এখন তাঁর চেয়ারে অন্য কেউ বসে।

চেনাশুনা কারুর কাছে অযাচিতভাবে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু একটি প্রধান বাস্তব সমস্যা হলো পকেটে একটা আধলাও নেই। বাইরের টাটকা বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে তাঁর স্বাধীন, সুস্থ মানুষের মতন খিদে পেয়ে যাচ্ছে! কতদিন কালো জিরে ফোড়ন দেওয়া মুসুরির ডাল খাওয়া হয়নি।

মামুন সেগুনবাগিচার দিকে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর আপার বাসাতে তো একবার যেতেই হবে, হেনা সেখানেই থাকে। এই কয়েকমাসেই রাস্তা ঘাটের চেহারায় কিছু উন্নতি হয়েছে মনে হয়। খানা-খন্দ কম, অনেক নতুন গাড়ির আমদানী হয়েছে দেখা যাচ্ছে। ফুটপাথে

বিক্রি হচ্ছে কমলালেবু আর কলা। গতবছর শীতে কমলালেবুর খুব দাম ছিল, এবারে মনে হচ্ছে চালান এসেছে ভালো। পকেটে পয়সা নেই, তবু কমলা লেবু খাওয়ার জন্য কী লোভই যে হলো তাঁর।

মামুনের দুলহাভাই একজন নামজাদা উকিল, তবু তিনি মামুনের জামিনের জন্য একবারও চেষ্টা করেননি তো! কিংবা, চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন? এতবড় একজন উকিল হয়ে জেলে গিয়ে একবার দেখাও করতে পারলেন না? ওখানে অন্যান্য সহবন্দীরা অনেকে বলাবলি করেছে যে, অনেক উকিলই নাকি পলিটিক্যাল আসামীদের কেস নিতে চাইছে না সরকারের বিরাগভাজন হবার ভয়ে। আর্মি রেজিমেন্ট বিচারকরাও নিরপেক্ষ রায় দিতে পারে না, এখন জুডিশিয়ারির হাতেই হাতকড়া।

কিন্তু নিজের জামাইবাবু পর্যন্ত ভয় পেলেন। শামসুল আলমের সঙ্গে মামুনের শুধু আত্মীয়তা নয়, গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলে তিনি আবার বিব্রত বোধ করবেন না তো?

দরজার সামনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মামুন। কী অসহায় যে লাগছে তাঁর। দিদির বাড়িতে আগে যখন তখন এসেছেন, মাসের পর মাস এখানে থেকে গেছেন, মলিহা বেগম তাঁর মায়েরই মতন স্নেহময়ী। আজ যদি কেউ তাকে অবাঞ্ছিত মনে করে?

মামুন একবার পেছন দিকে তাকালেন। কেউ কি তাঁকে অনুসরণ করছে? এতক্ষণ এ কথাটা মনে পড়ে নি। জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে ওরা কি এখন নজর রাখতে চায় যে মামুন কোথায় যান, কার সঙ্গে কথা বলেন? আবার একটা বেড়াজাল ফেলে আরও অনেকের সঙ্গে মামুনকে ধরবে?

কিন্তু হেনার সঙ্গে তো দেখা করতেই হবে! দ্বিধা কাটিয়ে মামুন দরজায় ধাক্কা দিলেন।

ভৃত্যটি নতুন। সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে মনে হয়, মাথার চুল তেল চুকচুকে, বছর কুড়ি বয়েস। সে জিজ্ঞেস করলো, কারে চাই?

এ বাড়িতে এসে ভৃত্যের কাছে জবাবদিহি করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। মামুন বললেন, সর, আমি উপরে যাবো।

মামুন তার পাশ দিয়ে ঢুকতে যেতেই সে হাত ছড়িয়ে বাধা দিয়ে বললো, ও ছায়েব, ও ছায়েব কই যান? কারে চান আগে কইয়া লন!

মামুনের আর ধৈর্য থাকছে না, ধাক্কা দিয়ে ছেলেটিকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছে হলো তাঁর। অতিকষ্টে নিজেকে দমন করে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, ওরে তুই সর, আমি এই বাড়িরই মানুষ, হেনার বাপ।

তারপর সামনে চোখ তুলেই মামুন অনড় হয়ে গেলেন, তাঁর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলে। একতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জু।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে, এতটা পথ হেঁটে এসে পরিচিত মানুষদের মধ্যে মঞ্জুকেই প্রথম দেখবেন, এটা মামুনের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অথচ অস্বাভাবিক তো কিছু নয়। এটা মঞ্জুর বাপের বাড়ি।

মঞ্জুও যেন প্রথমটায় ঠিক বিশ্বাস করতে পারলো না। মামুনের শরীর এমনই শীর্ণ হয়ে গেছে যে মঞ্জু কয়েক মুহূর্ত ভাবলো, অনেকটা তার মামুনমামারই মতন চেহারার একজন আগন্তুক না সত্যিকারের মামুনমামা? তার হাতে একরাশ কাপড় জামা। সে বোধহয় কাঁচতে দিতে যাচ্ছিল, সেগুলো ফেলে সে ছুটে এসে মামুনকে জড়িয়ে ধরে বললো, মামুনমামা, তুমি? তুমি সত্যি ফিরে এসেছো?

মঞ্জুর কণ্ঠস্বর আবেগ, আনন্দ ও কান্নায় মাখা।

মামুন মঞ্জুকে সরিয়ে দিয়ে শুকনো গলায় বললেন, কেমন আছিস রে, মঞ্জু? ছেলেটা ভালো আছে?

মঞ্জু বললো, মামুনমামা, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে? তোমায় কবে ছাড়লো? তুমি কার সাথে আসলে?

এসব কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মামুন মঞ্জুকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন দোতলায়।

ছোটভাইকে দেখে মলিহা বেগমের আনন্দ ও উচ্ছাসের মধ্যে কোনো খাদ নেই। তিনি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন। হেনা কলেজে গেছে, তিনি তখুনি ভৃত্যটিকে পাঠালেন হেনাকে ডেকে আনার জন্য। আজ তার বাবা জেল থেকে ফিরেছে, আজ হেনার কলেজ করার দরকার নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই মামুন ঠিক করে নিয়েছেন, শামসুল আলম সাহেবের সঙ্গে তিনি খোলাখুলি আলোচনা করে নেবেন। মামুনকে নিয়ে তাঁর যদি সামান্যতম অস্বস্তি বা উদ্বেগ থাকে, তাহলে মামুন এ বাড়িতে এক রাতও কাটাবেন না। তাঁর জন্য তাঁর দিদির স্বামীর পেশার কোনো ক্ষতি হোক, তা তিনি চান না।

জেলের বাইরের প্রথম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মামুন জিজ্ঞেস করলেন, দুলাভাই কোর্ট থেকে কয়টার সময় ফিরবেন?

মলিহা বেগম বললেন, হায় আমার পোড়া কপাল, তুই শোনোস নাই বুঝি? হ্যায় তো আর কোর্টে যায় না, রিটায়ার করছে, এখন সর্বক্ষণই বাসায় থাকে। মাথায় ভূত চাপছে!

মামুন প্রকৃত বিস্মিত হয়ে বললেন, দুলাভাই রিটায়ার করেছেন? কেন? শরীল-গতিক ঠিক আছে তো?

-তা আছে। কিন্তু ঐ যে কইলাম, মাথায় ভূত চাপছে। উপরের ঘরে একা-একা থাকে। আর বিড়বিড়াইয়া নিজের মনে মনে কথা কয়। দুফুরে খাইতে নামবে, তখন তুই কথা কইয়া দেখিস, দ্যাখ যদি বুঝাইতে পারোস কিছু!

অন্যান্য ভাগ্নে ভাগ্নীরা ঘিরে ধরেছে মামুনকে, মঞ্জু এসে বসেছে একেবারে মামুনের মুখোমুখি। সবাই জেলের গল্প শুনতে চায়। মামুনের ক্লান্ত লাগছে খুব। তিনি মঞ্জুর চোখের দিকে একবারও সরাসরি তাকাচ্ছেন না। অন্যদের প্রশ্নের কয়েকটা সামান্য কাটাকাটা উত্তর দেবার পর তিনি মস্তবড় একটা হাই তুলে বললেন, এখন আমি ঘুমাবো।

মামুনকে মুখ ফুটে বলতে হয়নি, আজ এ বাড়িতে রান্না হয়েছে মুসুরির ডাল। তাতে পুরু করে হলুদ মেশানো। এইসব ছোটখাটো প্রাপ্তিগুলি অনেকখানি গুপ্ত সুখ এনে দেয়। গরম ভাত, আলুসেদ্ধ মাখা সর্ষের তেল দিয়ে, শুঁটকি মাছ দিয়ে রান্না কুমড়োর শাক। মাগুর মাছের কালিয়া,এই প্রত্যেকটি খাবারই মামুনের প্রিয়। কিন্তু যতখানি তৃপ্তির সঙ্গে খাবেন ভেবেছিলেন, তা হলো না, জেলের অখাদ্য খেয়ে খেয়ে পেট ও জিভ মরে গেছে, এই খাবারগুলি দেখে লোভ হচ্ছে। কিন্তু গলা দিয়ে নামছে না। অনেকটাই ফেলে ছড়িয়ে, শেষ পাতে একটু ডালে চুমুক দিয়ে মামুন উঠে পড়লেন।

আলম সাহেব এখনও খেতে নামেন নি। বাড়ির বাচ্চারা কয়েকজন গিয়ে তাঁর কাছে মামুনের আগমন বার্তা জানিয়ে এসেছে, কিন্তু তিনি চক্ষু বুজে গভীর চিন্তায় মগ্ন। ছাদের যে-ঘরটিতে মামুন কিছুদিন থেকে গেছেন, এখন সেখানেই আলম সাহেবের আস্তানা।

দোতলার একটি ঘরে মামুনকে শুতে দেওয়া হলো। বিছানায় একবার গড়িয়ে পড়ার পরও মামুন উঠে এসে দরজাটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন। বাচ্চাদের জন্য নয়, মঞ্জুর জন্য। মঞ্জু নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে বিরলে গল্প করতে চাইবে। সেবা করতে চাইবে। মামুন আর মঞ্জুর সঙ্গে কখনো একা থাকতে চান না। মঞ্জু তাঁর অন্যান্য ভাগ্নে-ভাগ্নীদের মতন একজন, বিশেষ কেউ নয়। মঞ্জুর দাম্পত্য জীবনে আর কোনোদিন মামুনের ছায়া পড়বে না।

মঞ্জু কি এ বাড়িতেই এখন কিছুদিন থাকবে? তাহলে মামুনের আর এখানে থাকা হবে না। একই বাড়িতে থেকে তিনি মঞ্জুকে এড়িয়ে চলবেন কী করে?

জেলখানায় কোনোদিন ভালো ঘুম হতো না। একটানা বড় জোর এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ঘুম। আজ দুপুরে প্রাণ ভরে ঘুমিয়ে নেবেন ভাবলেন, তবু ঘুম আসছে না। ধপধপে সাদা চাঁদর পাতা নরম বিছানা, তবু যেন গা কুটকুট করছে, মামুন এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন বারবার। চোখের সামনে বারবার আসছে মঞ্জুর মুখ, বিস্মিত, বিহ্বল, বেদনামাখা মুখ।

একটা কিছু বই পড়তে পারলে সুবিধে হতো। সামনের তাকে অনেকগুলি বই। মামুন উঠে গিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন। অনেকদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন নি, অনেকবার মানসিক অশান্তির সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

এই তাকে রবীন্দ্রনাথের বই নেই। এটা সেটা খুঁজতে খুঁজতে তিনি একটা নজরুলের কবিতা সংকলন পেলেন। মাঝখানটা খুলতেই দেখতে পেলেন এই কবিতা :

কত ছল করে যে বারে বারে দেখতে আসে আমায়।
কত বিনা-কাজের ছলে চরণদুটি
আমার দোরেই থামায়।
জানলা-আড়ে চিকের পাশে
দাঁড়ায় এসে কিসের আশে
আমায় দেখেই সলাজ ত্রাসে
অনামিকায় জড়িয়ে আঁচল গাল দুটিকে ঘামায় ।।...

এ কবিতা মামুনের চেনা, একবার দেওঘর ঘুরে এসে সেখানকার কোনো একটি মেয়েকে। দেখার স্মৃতি ধরে রেখেছেন এই 'ছকুমারী' কবিতায় কাজী নজরুল।

আমার দ্বারের কাছটিতে তার ফুটতো লালী গালের টোলে

টলতো চরণ, চাউনী বিবশ...

মামুন হঠাৎ থেমে গেলেন। দরজার বাইরে যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্জু? তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে ... না, না, মনের ভুল। তাছাড়া, মঞ্জু এলেও মামুন এখন দরজা খুলবেন না। তাঁকে ঘুমোতে হবে...

পুরো কবিতার সংকলনটা পড়া হয়ে গেল, তবু মামুনের ঘুম এলো না। দুপুরের নিঃঝুম ভাব কেটে গিয়ে একসময় সারাবাড়িতে জেগে উঠলো বিকেলের কলরব।

খানিক বাদে মামুন নিজেই গেলেন ছাদের ঘরে আলম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। জানুয়ারি মাসের হাওয়া দিচ্ছে, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব, তবু শুধু লুঙ্গি পরে, খালি গায়ে বসে আছেন শামসুল আলম। আগের চেয়ে মোটা হয়েছেন অনেক, তাঁর গৌরবর্ণ যেন ফেটে পড়ছে। মামুন তাঁকে কখনো দাড়ি রাখতে দেখেন নি, সঙ্গীতপ্রিয় আমুদে ধরনের মানুষ ছিলেন, এখন মুখে অযত্ন বর্ধিত দাড়ি। কপালে অনেকগুলি ভাঁজ।

তিনি বললেন, আসো মামুনমিঞা, আসো। তোমার ছাড়া পাওনের খবর দুপুরেই শুনছি। তুমি ঘুমাইয়া পড়ছিলা, আমি যখন খাইতে যাই। আছো কেমন কও! জেলখানায় তোমাগো কোরআন শরীফ পড়তে দিত? নাকি জালিমগুলা তাও দ্যায় নাই?

প্রথমেই এই প্রকার প্রশ্ন শুনে মামুন একটু হকচকিয়ে গেলেন। মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, তা দিত। আপনি...

মামুনের হাত ধরে কাছে টেনে এনে তিনি বড় বড় চোখ মেলে বললেন, তবু ভালো। কোরআন শরীফ পড়লে সব সময় মনে শান্তি পাওয়া যায়। তোমার মনে যে-কোনো প্রশ্ন আসুক, তুমি উত্তর পাবা। কেমন কি না। যেমন ধরো, মক্কায় আবির্ভূত যে সূরা এনাম, তাতে আছে, জিজ্ঞাসা করো। কোন্ বস্তু সাক্ষ্যদান বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? তুমি বল, তোমাদের ও আমার মধ্যে ঈশ্বরই সাক্ষী...

পরপর আয়াত বলে যেতে লাগলেন তিনি। মামুনের বিস্ময় ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছিল, তারপর তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝলেন। দুলহাভাই আগে ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না বরং

কিছুটা ভোগবাদী নাস্তিক ধরনেরই ছিলেন। একটা বয়েসে মানুষের হঠাৎ ধর্মের দিকে মতি ফেরে। নাস্তিকেরা যখন আস্তিক হয়, তখন সর্বক্ষণ সেই আনন্দেই বিভোর হয়ে থাকে। দেশের ও সমাজের দুঃসময়ে বেশি বেশি করে ধর্মকে আঁকড়ে ধরাও স্বাভাবিক ব্যাপার।

মামুন ভক্তি ভরেই আলম সাহেবের কথাগুলি শুনে যেতে লাগলেন। তারপর একবার একটু ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দুলাভাই, আপনি হঠাৎ ওকালতি ছাড়লেন কেন? এত ভালো পশার ছিল...

উদার ভাবে হেসে আলম সাহেব বললেন, আর ওসবে কী হবে? পয়সা তো যথেষ্ট করেছি। সারা জীবনে কত মিথ্যা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম, এখন যদি সত্যের সন্ধান না করি, তা হইলে পরকালে কী জবাবদিহি করবো? অ্যাঁ? তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। আইজকাইল আমি প্রায়ই ঘুমের মধ্যে ফেরেশতা, জিবরাইলরে স্বপন দেখি। আমার সাথে কথা বলেন। আরও কী হয় জানো, জাইগা থাকার সময়ও মাঝে মাঝে আমি কানের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি শোনতে পাই। তারপরই শুনি এক বাণী।

এবারে মামুন চোখ সঙ্কুচিত করে তাকালেন।

আলম সাহেব মুখ ঝুঁকিয়ে এনে বললেন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতেছ না? আমার উপর অহী নাজিল হয়।

মামুন খানিকটা দমে গেলেন। এত অল্পদিনে দুলাভাই এতদূর চলে গেছেন? কিন্তু এইসব বিষয়ে তর্ক চলে না। তিনি বুঝতে পারলেন, এর সঙ্গে কোনো কাজের কথা বলা যাবে না এখন।

একটু পরে তিনি ওঠার চেষ্টা করতেই আলম সাহেব তাঁর ঘাড় খামচে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, মামুনমিঞা, তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছো, কও তো "খাতামান নবিয়্যীন"-এর সঠিক অর্থ কী?

মামুন ব্যক্তিজীবনে ধর্মাচরণ তেমন না করলেও ধর্মশাস্ত্রগুলি পাঠ করেছেন মোটামুটি। তবু তিনি বিনীতভাবে বললেন, আমি ও কথার অর্থ জানি না, দুলাভাই। তেমনভাবে পড়াশুনো করার আর সময় পাইলাম কোথায়?

–তুমি বলো, নবুয়তের সিলসিলা কি খতম হয়ে গেছে? পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসবে না?

–এ আপনি কী বলছেন, দুলাভাই? কোরআন-হাদীশ যে পড়েছে, সে-ই তো জানে যে রসুলুল্লাহ (সঃ) শেষ নবী। তিনি অনেকবার বলেছেন, আমার পর আর কোনো নবী নাই আর আমার উম্মতের পর আর কোনো উম্মত নাই।

–মৌলবীরা ভুল ব্যাখ্যা করেছে। তুমি শুনে রাখো আমার কাছে। "খাতামান নবিয়্যীন"-এর অর্থ নবীদের মোহর অর্থাৎ শীলমোহর। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর পর তাঁর মোহরাঙ্কিত হয়ে আরও নবী আসবেন। সেই সময় এসে গেছে!

মামুন এবার ভয় পেয়ে গেলেন। এ যে কাদীয়ানীদের মতন কথাবার্তা। মির্জা গোলাম মহম্মদ কাদিয়ানীর চ্যালারা একসময় এই রকম কথা প্রচার করেছিল। কাদিয়ানীদের কেউ পছন্দ করে না। অনেকে তাদের প্রকৃত মুসলমান বলেও মনে করে না। তারা বিপথগামী।

মামুন বললেন, এরকম কথা উচ্চারণও করবেন না, দুলাভাই। রসুলুল্লহ (সঃ)-এর পর কেউ যদি নিজেকে নবী বলে দাবি করে, তাহলে সে হবে মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, কাজ্জাব! একথা আপনি বাইরে বলতে যাবেন না, বিপদে পড়বেন।

–আলবাৎ বলবো! আমাদের পাকিস্তানের এই দুঃসময়ে একজন নবীর আবির্ভাব হবে, তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন! আমি কয়ে দিলাম, তুমি মিলায়ে নিও! আর দেরি নাই, তিনি আসবেন, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান তাঁর আদেশে সকলে

সমান ভাই ভাই হবে... মুসলমান আর মুসলমানরে মারবে না, শোষণ করবে না...তাঁকে আসতেই হবে, দোয়া করো, মামুনমিঞা, দোয়া করো...

খানিকপরে মামুন যখন উঠে এলেন, তখনও আলম সাহেব চিৎকার করছেন আপন মনে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মামুন।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নামতেই মঞ্জুর সঙ্গে দেখা। সে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে! আগে যখন মামুন ওপরের ঘরটিতে থাকতেন, তখন কতদিন মঞ্জু এসে তাঁকে গান শুনিয়েছে। সময় কী নিষ্ঠুর, আজ মঞ্জুকে দেখে মামুনের একটা কথা বলতেও ইচ্ছে হলো না।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার ওপরে রাগ করেছ, মামুন মামা?

মামুন কয়েক ধাপ নামতে নামতে নীরস গলায় বললেন, নারে, রাগ করবো কেন? বাবুল কেমন আছে, সে আসবে আজ?

মঞ্জু মামুনের সঙ্গে সঙ্গে নামেনি, দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। সে বললো, না, সে এ বাড়িতে আসে না। মামুনমামা, সে আর আমাকে দ্যাখে না। আমার সাথে ভালো করে কথা বলে না। আমি নিজে থেকে–

মামুন দ্রুত নামতে লাগলেন, তিনি মঞ্জুর বাকি কথাগুলো শুনতে চান না। মঞ্জুদের দাম্পত্য জীবনের কোনো ব্যাপারেই তিনি থাকতে চান না আর। তবু মঞ্জুর শেষ কথাগুলো ঠিকই তার কানে এলো।

মঞ্জু বললো, আমি নিজে থেকে কিছু বলতে গেলে সে তোমার নামে খোটা দ্যায়। তুমি আমারে ভালোবাসতা, আমার খোঁজ খবর নিতা, তাতেই তার রাগ...

মামুন দু'হাতে কান চাপা দিতে চাইলেন। বাবুলটা কত গাধা? মঞ্জুকে তিনি ভালোবাসতেন ঠিকই, কিন্তু তা কি কোনো অবৈধ ভালোবাসা? এক একজনের ওপর একটু বেশি স্নেহের

টান থাকে না? আর তো তিনি ওদের মাঝখানে যাবেন না কথা দিয়েছেন, মনও কঠিন করেছেন, তবু বাবুল কষ্ট দিচ্ছে এই মেয়েটাকে?

মঞ্জুকে সুখী করার তা হলে বোধহয় আর একটাই উপায় আছে। মৃত্যু! এই মুহূর্তে মামুনের বেঁচে থাকার সমস্ত সাধ চলে গেল।

৬১ লণ্ডন শহরে পা দিয়ে

লণ্ডন শহরে পা দিয়ে তুতুলের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এই তবে লণ্ডন! লণ্ডন শহরটি যে ঠিক কী রকম হবে, সে সম্পর্কে তুতুলের মনে স্পষ্ট কোনো ছবি ছিল না। পত্র পত্রিকার ছবিতে কিংবা কয়েকটি ব্রিটিশ ফিমে সে টুকরো টুকরো লণ্ডন আগে দেখেছে, কিন্তু তাতেও কোনো ধারণা গড়ে ওঠে না। ছেলেবেলা থেকেই সে নানা লোকের মুখে লণ্ডন বা বিলেত

নামটি এমন ভক্তির সঙ্গে উচ্চারিত হতে শুনেছে, যাতে তার মনে হয়েছিল সাহেবদের এই দেশটি বোধ হয় স্বর্গ-টর্গর মতন কিছু একটা হবে।

জয়দীপের মা চিন্ময়ী আগে একবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে বিমান যাত্রায় তুতুলের কোনো অসুবিধে হয়নি। হিথরো এয়ারপোর্টে কাস্টমস বেরিয়ার থেকে বেরিয়ে আসার পর সামনের একটি ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চিন্ময়ী বলেছিলেন, ওই তো আমার দাদার ছেলে রঞ্জন!

রঞ্জনের বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর, ধূসর রঙের ফ্ল্যানেলের সুট পরা, গলায় চওড়া মেরুন রঙের টাই, তার গায়ের রং যেমন ফসা, হাবভাবও তেমনি সাহেবী সাহেবী। তার সঙ্গে একজন বন্ধু এসেছে, রঞ্জন পরিচয় করিয়ে দিল, ওর নাম সিরাজুল আলম খান, সে একজন ডাক্তার এবং জি পি। এই সিরাজুল আলম একটা বুক খোলা শার্ট পরে আছে। তার ওপর রেইন কোট জড়ানো।

তুতুলের কেন যেন আগে থেকে মনে হয়েছিল, লণ্ডন শহরে বাংলায় কথা বলা যায় না। সাহেবরা বাংলা শুনলে রাগ করবে। ইংরিজি বলা সম্পর্কেই তুতুলের মনে জমে ছিল রাজ্যের দ্বিধা আর আশঙ্কা। ইংরিজিতে কথা বলা তো তার অভ্যেস নেই, ঠিক সময়ে ঠিক শব্দটি মনে পড়তে চায় না। কিন্তু এখানে অন্য অনেকেই, যারা আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিতদের নিতে এসেছে, তারা দিব্যি হিন্দী, গুজরাটি, বাংলায় কলকল করে কথা বলে যাচ্ছে। আলম নামের লোকটি এক গাল হেসে পূর্ব বাংলার ভাষায় তুতুলকে বললো, দ্যান আপনার লাগেজটা আমারে দ্যান!

তুতুলের কাঁধে একটি ভারি ব্যাগ, তবু সে সেটা নিজেই কাছে রাখতে চাইলো, সদ্য পরিচিত এক ব্যক্তিকে দিয়ে সে তার ব্যাগ বহন করাতে চায় না। আলম দু'তিন বার অনুরোধ করলেও তুতুল লাজুকভাবে বললো, না না, ঠিক আছে।

রঞ্জন চিন্ময়ীর ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বললো, পিসীমা, জয়দীপ ভালো আছে, খুব কুইক রিকভারি হচ্ছে, বাবা এয়ারপোর্টে আসতে পারলেন না। হি হ্যাঁজ অ্যান ইমপর্টান্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে যেতে লাগলো সামনের দিকে। তুতুল মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিমানবন্দরের মানুষজনদের দেখছিল ভালো করে, এত ভারতীয়দের উপস্থিতি দেখে সে বিস্মিত হচ্ছিল, হঠাৎ তার শাড়ীর আঁচলে যেন কার পা পড়লো, একজন মানুষের ধাক্কা, তার ব্যাগটাও গলে নেমে এলো কাঁধ থেকে। একইসঙ্গে শাড়ী ও ব্যাগটা সামলাতে গিয়ে সে পারলো না, সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সামনের দিকে। একেবারে সোজাসুজি আছাড় খেয়ে পড়লে কী লজ্জার ব্যাপারই হতো, তুতুল একেবারে মরমে মরে যেত, কিন্তু সে পড়বার আগেই তাকে ধরে ফেললো আলম। ক্ষিপ্র হাতে তুতুলের ডানবাহু ও পিঠ ধরে সামলে নিয়ে সে ফিসফিস করে বললো, কিছু হয় নাই, লজ্জার কিছু নাই। প্রথম প্রথম এইরকম একটু হয়, এই দ্যাশে কেউ কাউরে দ্যাখে না, ধাক্কা মাইরা শুধু 'সরি' কইয়া চইল্যা যায়। বললাম না, আপনার ব্যাগটা আমারে দ্যান।

চিন্ময়ী রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলায় নিমগ্ন ছিলেন, তিনি এই ছোট ঘটনাটা দেখতে পেলেন না। আলমকে নীরব দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা জানালো তুতুল।

আলম জিজ্ঞেস করলো, আপনিও ডাক্তারির ছাত্রী শুনলাম?

তুতুল যে এম বি বি এস পাশ করেছে সে কথা আর জানালো না, মাথা নাড়লো শুধু। এখনও লজ্জায় তার শরীর কাঁপছে।

এয়ারপোর্টের মধ্যে বেশ গরম ছিল, বাইরে বেরুতেই কনকনে শীতের হাওয়া ঝাঁপটা মারলো চোখেমুখে। তুতুলের ওভারকোট নেই, সে পরে আছে দুটো সোয়েটার, তবু সে কেঁপে উঠলো শীতে।

তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়া হলো। কালো রঙের চৌকো ধরনের গাড়ি, সামনের সীট ও পেছনের সীটের মাঝখানে কাঁচের দেওয়াল। তুতুলের ধারণা ছিল সব ট্যাক্সিতেই বুঝি হলুদ রং থাকে। চারজন যাত্রী তোলার ব্যাপারে ট্যাক্সি ড্রাইভারের আপত্তি ছিল, রঞ্জন তার সঙ্গে কী একটা চুক্তি করলো। গাড়ির মধ্যে আর অতটা ঠাণ্ডা নেই।

শহরতলি অঞ্চলটা বেশ সুন্দর লাগছিল তুতুলের। বেশ মিষ্টি মিষ্টি চেহারার বাড়ি, চওড়া রাস্তার দু'পাশে গাছ। তুতুল জানলা দিয়ে অবাক চোখ মেলে দেখছে, রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বলতে গেলে। শুধু গাড়ি। সে তাহলে সত্যিই বিলেতে চলে এসেছে, এখন থেকে। কলকাতা কত দূর!

শহরে ঢোকার পরই তার আবার মনে হলো, এই লণ্ডন!

এমন কিছু অচেনা বা রোমহর্ষক তো লাগছে না। লাল রঙের ডবল ডেকার বাস, বাড়িগুলোর আকারও চেনা চেনা, কলকাতার ডালহাউসি, পার্ক স্ট্রিট, এমনকি ভবানীপুরের সঙ্গেও বেশ মিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে, রাস্তায় এখন অসংখ্য কালো ছাতা, সাহেব-মেমদের মধ্যে মধ্যে এক একটি শাড়ী পরা মহিলা কিংবা মুখভর্তি দাড়িগোঁফ ও মাথায় পাগড়িপরা সদারজীদের দেখে সে চমকে চমকে উঠছে।

তুতুল জানতো, জয়দীপের মামার বাড়ি বেল সাইজ পার্কে। সে মনে মনে ছবি এঁকে রেখেছিল, বিরাট একটি পার্কের পাশে হবে সেই বাড়ি। ট্যাক্সিটা কিন্তু বেশ কয়েকটা ছোট ছোট রাস্তা ঘুরে থামলো একটা বাড়ির সামনে। তার আশেপাশে কোনো পার্ক নেই।

রাস্তাটি মহিম হালদার স্ট্রিটের মতনই সরু। ফুটপাথে অসংখ্য ঝরাপাতা। পাশাপাশি সব বাড়িগুলিই প্রায় একরকম দেখতে। প্রত্যেক বাড়ির সামনেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি, তারপর দরজা। সেই সিঁড়ির দু'পাশে কয়েকটা গোলাপ ফুলের গাছ। তিন চারটি নিগ্রো ছেলে সেই রাস্তায় একটা ফুটবল পেটাচ্ছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই রঞ্জন তুতুলকে বললো, চটপট বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ো, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

আলম সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজার বেল বাজালো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিল একটি কিশোরী মেয়ে, তার এক হাতে একটা চকোলেট বার। একগাল হেসে সে বললো, ওয়েলকাম টু লান্! ডিড যু হ্যাভ আ নাইস জার্নি?

তারপরই সে গলা চড়িয়ে বললো, মামি, দা গেস্ট হ্যাভ অ্যারাইড, উইল যু প্লীজ কাম ডাউন?

ওপরতলা থেকে উত্তর এলো, ওয়ান মোমেন্ট, ডিয়ার!

এতক্ষণ বাদে তুতুলের বুক ঢিপঢিপ করতে লাগলো। এইবার জয়দীপের সঙ্গে দেখা হবে। জয়দীপকে সে প্রথম কী কথা বলবে? জয়দীপের মামা-মামীমা যদি ভাবেন, তুতুল কে হয় জয়দীপের? সে কলকাতা থেকে এতদূর উড়ে এসেছে কেন?

মালপত্র ভেতরে পৌঁছে দেবার পর তুতুল আর চিন্ময়ীকে আলম বলল, আমি এবার চলি! আমাকে সাজারিতে যেতে হবে! বাই- ই!

রঞ্জন পাশের একটা বসবার ঘর দেখিয়ে বললো, পিসিমা, এইখানে বসুন আপনারা, টেইক সাম রেস্ট, মা আপনাদের ঘরটা প্রিপেয়ার করে দেবেন।

চিন্ময়ী সে ঘরে না ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, জয়দীপ কোন ঘরে? আমি আগে সেখানে যাবো!

রঞ্জন চট করে উত্তর না দিয়ে বসবার ঘরের সোফা থেকে অদৃশ্য ধুলো ঝাড়তে লাগলো। ম্যান্টল পীস থেকে একটা ঘড়ি তুলে নিয়ে দম দিল।

চিন্ময়ী আবার বললেন, রঞ্জু, খোকা কোন ঘরে আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে চল!

রঞ্জন এবার মুখ ফিরিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো চিন্ময়ীর দিকে। তারপর বললো, পিসিমা, সরি, তোমাকে আগেই ডিসক্লোজ করিনি, বাবা অ্যাডভাইজড মী টু ডু সো, তোমরা খানিকটা রেস্ট নেবার পর, মানে এতখানি জার্নি করে এসেছো তো, এখন কিছুটা রেস্ট করে না নিলে...

চিন্ময়ী তীক্ষ্ণগলায় জিজ্ঞেস করলেন, খোকার কী হয়েছে? রঞ্জু...

রঞ্জন সারা শরীর মুচড়ে বললো, না না, জয়দীপ ভালো আছে। হিজ কণ্ডিশান ইজ মিরাকুলাসলি ইমপ্রুভিং, তবে দু'দিন আগে তাকে হসপিটালাইজড করা হয়েছে, হি ইজ আণ্ডারগোয়িং কেমোথেরাপি ট্রিটমেন্ট, বাড়িতে ঠিক সুবিধে হয় না, অনেক প্যারাফারনেলিয়া আছে তো।

চিন্ময়ী অস্ফুট গলায় বললেন, খোকা হাসপাতালে? দাদা যে আমাকে লিখেছিল বাড়িতেই...

রঞ্জন বললো, আগে বাড়িতে রেখেই ট্রিটমেন্ট চলছিল, কিন্তু এখন এই স্টেজে কেমোথেরাপি না করালে... তা ছাড়া তোমরা আসছো, বাড়িতে সবার অ্যাকোমোডেশানের কোয়েশ্চেন আছে...হসপিটালে হি উইল গেট দা বেস্ট অ্যাটেনশন।

চিন্ময়ী আচ্ছন্নভাবে বললেন, চল, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল।

রঞ্জন বলল, এখনই তো যাওয়া যাবে না, ভিজিটিং হাওয়ার্স ছাড়া।

তুতুল আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে। জয়দীপ হাসপাতালে আছে শুনে তারও বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল। অবশ্য এটা ঠিক কেমোথেরাপির জন্য হাসপাতালই উপযুক্ত, বিলেতের হাসপাতালে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা খুব ভালো। কিন্তু জয়দীপ যদি হাসপাতালে থাকে, তাহলে তো তাকে তুতুলের সেবা করার প্রশ্ন আসে না! হাসপাতালে সে কতক্ষণ জয়দীপের পাশে থাকতে পারবে!

ওপরের সিঁড়ি দিয়ে এবারে নেমে এলেন ড্রেসিং গাউনপরা একজন মোটাসোটা মহিলা। এমনই ফর্সা তিনি যে তুতুলের প্রথমে মনে হলো মেমসাহেব নাকি? তারপরেই নজরে পড়লো, তাঁর মাথার চুল ভারতীয়দের মতো কালো।

তিনি নিচে এসে চিন্ময়ীর হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, কেমন আছো, চিনু? জার্নিতে কষ্ট হয়নি তো? ওঃ, যা ব্যাড ওয়েদার চলছে লণ্ডনে, রেইনিং অল দা টাইম, ইউ নো, দু'একদিনের মধ্যেই ইঁট উইল স্টার্ট স্নোয়িং... তোমরা একটু ওয়াশ করে নেবে? ইউ মাস্ট বী স্টারভিং। প্লেনে যা বিচ্ছিরি খাবার দেয়, আমি তোমাদের জন্য ইণ্ডিয়ান ফুড কুক করে রেখেছি

চিন্ময়ী তুতুলকে দেখিয়ে বললেন, অমলা, এই মেয়েটির নাম বহ্নিশিখা সরকার, জয়দীপের সঙ্গে পাস করেছে।

অমলা সঙ্গে সঙ্গে তুতুলের দিকে ফিরে বললেন, অফ কোর্স। তুমি তো এর কথা লিখেছিলে, শী উইল স্টে উইথ আস, তুমি ভাই জুতোটুতো খোলো...

তুতুল আগেই শুনেছিল, চিন্ময়ীর এক স্কুলের বান্ধবীর সঙ্গে তাঁর দাদার বিয়ে হয়েছিল। সেইজন্যই চিন্ময়ী একে বৌদি না বলে নাম ধরে ডাকলেন। চিন্ময়ীর দাদা অমরনাথ

বিলেত থেকেই ডাক্তারি পাস করে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, সেখানেই বিয়ে করেছেন, কিন্তু কলকাতায় প্র্যাকটিস জমাতে না পেরে সপরিবারে চলে এসেছিলেন এদেশে, বারো-তের বছর আগে।

অমলা এমন উচ্ছ্বসিত ভাবে কথা বলতে লাগলেন, ওদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে খেতে বসিয়ে দিয়ে লণ্ডনে কী কী খাবার পাওয়া যায় এবং যায় না সে বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন, যেন চিন্ময়ী ও তুতুল দেশভ্রমণের জন্য এসেছে এখানে।

রান্নাঘর ও খাবারঘর একইসঙ্গে জোড়া। গোল ডাইনিং টেলে ছটি চেয়ার। কে কোন চেয়ারে বসবে তাও বলে দিলেন অমলা। তুতুল বুঝলো, এদেশের খাবার ঘরে যে-কোনো চেয়ারে বসা যায় না। টেল ম্যাটের ওপর একটা করে প্লেট ও সাইড ডিশ দিয়ে তার ওপর কাগজের রুমাল সাজিয়ে, অমলা তাঁর ছেলেকে বললেন, রন, টু ডে ইজ ইয়োর টার্ন টু ওয়াশ দা পটস অ্যাণ্ড প্যানস, ডোন্ট ফরগেট... তারপর চিন্ময়ী ও তুতুলের দিকে যুগপৎ তাকিয়ে বললেন, জানো তো, এদেশে এই একটা বিচ্ছিরি নিয়ম, আফটার ইউ ফিনিশ ইয়োর ফুড, ইউ ডোন্ট লীভ ইয়োর প্লেইটস অ্যাণ্ড গ্লাসেস অন দ্যা টেল, নিজেরটা নিজেকেই ধুতে হয়, ঝি-চাকর তো পাওয়া যায় না এদেশে।

একটুখানি দেখেই তুতুলের মনে হলো, অমলার কথা বলার ধরনটা বেশ কৃত্রিম, চিন্ময়ীর প্রতি তাঁর ব্যবহার স্কুলের বান্ধবীর মতন তো নয়ই, একজন নিকট আত্মীয়কে অনেকদিন পর কাছে পাওয়ার কোনো আন্তরিক আনন্দও তাতে নেই। বাড়ির মধ্যেও অনাবশ্যক ইংরিজি বলছেন তিনি, সেই ইংরিজিতেও ছোট ছোট ভুল।

প্রথমে দুটি গেলাসে ফলের রস দিয়ে তিনি বললেন, এপ্রিকট জুস, আগে খেয়েছো, চিনু? দ্যাখো, আই থিংক ইউ উইল লাইক ইট! তোমরা চীজ খাও তো? আমি চীজ দিয়ে কারি বেঁধেছি, আমার ছেলেমেয়েদের খুব ফেভারিট ডিশ!

ফলের রসের গেলাসটা ঠোঁটের কাছে এনেও স্পর্শ না করে নামিয়ে রেখে চিন্ময়ী বললেন, আমার এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, অমলা। জয়দীপ হাসপাতালে...আমি জানতুম ...ওকে কখন দেখতে যাবো?

অমলা বললেন, হাসপাতালটা বেশি দূর নয়, টিউবে মাত্র তিনটে স্টেশন, বাট ইউ কান্ট গো দেয়ার এনি টাইম ইউ লাইক, ইউ নো, ভিজিটিং আওয়ার্স ছাড়া...

–কটায় ভিজিটিং আওয়ার?

–কখন রে, রঞ্জন?

রান্নাঘরে ডেকচি মাজতে মাজতে রঞ্জন উত্তর দিল, ফোর থার্টি। ইউ হ্যাভ টু ওয়েইট অ্যানাদার হাওয়ার...

তুতুলেরও কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। জীবনের প্রথম বিমান যাত্রায় তার মাথায় যেন এখনো একটা ঘোর লেগে আছে। দুটো কান দিয়ে মাঝে মাঝে ফুস ফুস করে বেরুচ্ছে হাওয়া। প্লেনে চাপতে হয়েছিল মাঝরাত্রে। সকালবেলা প্লেনের বাথরুমের সামনে যাত্রীদের লাইন দেখে সে প্রাতঃকৃত্য সারতে পারেনি, শরীরটা নোংরা নোংরা লাগছে। এতদূরের পথ পাড়ি দিয়ে আসার পর সে ভেবেছিল, এ বাড়িতে একটা নিজস্ব ঘর পেয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবে, জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করবে...। কিন্তু এখনও তাদের ঘর দেখিয়ে দেওয়া হয়নি, প্রথমেই এনে বসিয়ে দেওয়া হলো খাবার টেবিলে, এটা তুতুলের অদ্ভুত লাগছে। এ দেশে বুঝি এরকমই নিয়ম।

চিন্ময়ী কিছুই খেলেন না, তুতুলকে বাধ্য হয়ে কিছু মুখে দিতে হলো, তারপর সবাই মিলে এলো বসবার ঘরে। অমলা বললেন, তোমরা একটু টি ভি দ্যাখো, ততক্ষণে আমি তোমাদের বেডরুমটা...

এটা চিন্ময়ীর দাদার বাড়ি, তবু তিনি এ বাড়িতে অতিথি। তিনি গম্ভীর হয়ে আছেন। টি ভি জিনিসটা আগে দেখেনি তুতুল, রঞ্জন সেটা চালিয়ে দিল, তাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটা ফিলম দেখানো হচ্ছে, একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তুতুল আর কোনো আগ্রহ বোধ করলো না।

একটা ব্যাপারে তুতুলের খটকা লাগলো। চিন্ময়ী যে আজ লণ্ডনে এসে পৌঁছোবেন, তা তো অনেক আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবু তাঁর জন্য থাকার ঘর আগে ঠিক করে রাখা হয়নি? এ বাড়িতে পৌঁছোবার দেড়ঘণ্টার মধ্যেও তারা বসার ঘর ও খাবার ঘর ছাড়া আর কিছুই দেখেনি।

একটু পরে অমলা এসে ওদের ডেকে নিয়ে গেলেন সিঁড়ির পাশের একটা ঘরে। বেশ ঘোট ঘর, কলকাতায় তুতুল আর মুন্নির ঘরটার মতনই। জানলায় সাদা লেসের পদা। দেওয়ালের র‍্যাকে প্রচুর বই। একপাশে একটি মাঝারি সাইজের খাট, ঘরটায় পুরুষ-পুরুষ গন্ধ।

অমলা বললেন, তোমাদের দু'জনকে এ ঘরে স্কুইজ করে থাকতে হবে, একটু কষ্ট হবে হয়তো, এটা আমার ছেলের ঘর চিন্ময়ী ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, রঞ্জুর ঘর? তাহলে রঞ্জু কোথায় শোবে?

-ও কটা দিন বেসমেন্টে ঘুমোবে।

-তোমার আর এক ছেলে, শংকর, সে কোথায়? তাকে দেখছি না?

-সে এখন এ বাড়িতে থাকে না!

-জয়দীপ কোন্ ঘরে থাকতো?

-ওপরে দুটো ঘর আছে, বুঝলে, জয়দীপ কিছুদিন ওপরের ঘরে ছিল, কিন্তু আমার মেয়েনীটা, সে বড় হচ্ছে, শী নিড়স সাম প্রাইভেসি, তাই জয়দীপকে এ ঘরেই রাখা হয়েছিল

খানিকবাদে অমলা বেরিয়ে যাবার পর চিন্ময়ী দেওয়ালে একটি ছবি দেখার ছলে তুতুলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। মাত্র দু'বার হেঁচকির মতন সামান্য কান্নার আওয়াজ শোনা গেল, তারপর শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছে তিনি মুখ ফিরিয়ে তুতুলকে বললেন, জামা কাপড় বদলাবে তো বদলে নাও, হাসপাতালে যাবার সময় হয়ে গেছে।

এবারে আর ট্যাক্সি নয়, টিউব ট্রেন। প্রথম টিউব ট্রেনে চাপার অভিজ্ঞতাও তুতুলের এমন কিছু অসামান্য মনে হলো না। সব কিছুই তো অন্য ট্রেনের মতন, শুধু মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া। তুতুল ভেবেছিল, কলকাতার বাস-ট্রামের মতন এদেশে কেউ দাঁড়িয়ে যায় না। তা তো ঠিক নয়, ট্রেনে বেশ ভিড়, অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়ছে, ওঠা ও নামার সময় রীতিমতো ঠ্যালাঠেলি।

অমলা বা তাঁর মেয়ে আসেনি, রঞ্জনই ওদের পথ প্রদর্শক। রঞ্জনকে আজ অফিস থেকে ছুটি নিতে হয়েছে। হাসপাতালে ঢোকার মুখে রঞ্জন চিন্ময়ীকে বললো, ইয়ে...পিসিমা... এদেশের হাসপাতালে কেউ চেঁচিয়ে কথা বলে না, কান্নাকাটিও করে না।

কথাটা শুনে বেশ বিরক্ত বোধ করলো তুতুল। রঞ্জন কি তার পিসিমাকে ঠিক মতন চেনে? চিন্ময়ীর মতন বিদুষী মহিলা কি কলকাতার হাসপাতালে গিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলেন, না কান্নাকাটি করেন?

লিফট দিয়ে তিনতলায় উঠে, লম্বা করাইডোর দিয়ে হেঁটে একেবারে কোণের একটি ঘরে ঢুকলো রঞ্জন। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই থমকে গেল তুতুল। ক্যাবিন বটে কিন্তু জয়দীপের নিজস্ব নয়। দুটি বেড। প্রথম বেডটিতে শুয়ে আছে একজন বিশালাকায় কালো মানুষ, তাকে ঘিরে রয়েছে তার আত্মীয় স্বজন। তাদের ভেদ করে জয়দীপকে প্রথমে দেখাই গেল না।

এই একটা ছোট ঘরে, অন্য লোকজনদের সামনে সে জয়দীপের সঙ্গে কী কথা বলবে? জয়দীপকে চেনাই যায় না। অমন চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তার, লম্বা চওড়া পুরুষ, হঠাৎ যেন গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। তার মুখখানা মসীবর্ণ। চিন্ময়ী প্রথমে এগিয়ে গিয়ে শুধু বললেন,

খোকন...। জয়দীপ তার মায়ের হাত চেপে ধরে চোখ দিয়ে তুতুলকে খুঁজতে লাগলো। তুতুল চিন্ময়ীর পাশে এসে দাঁড়াতে জয়দীপ তার মাকে ছেড়ে তুতুলের দিকে হাত বাড়ালো, তুতুল তার কম্পিত হাত রাখলো জয়দীপের বুকে। তার মনে হলো, সে নিজেই বুঝি ভদ্রতা রক্ষা করতে পারবে না, হঠাৎ তার গলা দিয়ে তীব্র কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসবে!

ফ্যাসফেসে হয়ে গেছে জয়দীপের গলার আওয়াজ, সে বললো, আমি ভালো আছি! কলকাতার খবর কী? হেমকান্তি, শিখা ওরা কেমন আছে।

অমলা বা রঞ্জন একবারও কলকাতার কোনো খবর জিজ্ঞেস করেনি। কলকাতার কোনো একজন মানুষের কথাও জানতে চায়নি।

পাশের নিগ্রো পরিবার বেশ জোরে জোরে কথা বলছে। একজন একটি বিয়ারের টিন খুলে তাদের রুগীকে খাওয়ালো। চিন্ময়ী আর তুতুলকে রেখে রঞ্জন সিগারেট খেতে বেরিয়ে গেছে। ওরা প্রায় নিঃশব্দ হয়ে বসে রইলো জয়দীপের পাশে। আশ্চর্য মনের জোর চিন্ময়ীর, ছেলের কাছে এসে একবারও চোখ ভেজেনি তার। একটু বাদে তিনি বললেন, বহ্নিশিখা, তুমি খোকনের কাছে একটু একা থাকো, আমি বাইরে দাঁড়াই।

একা একা কী কথা বলবে তুতুল? জয়দীপ একবার জিজ্ঞেস করলো তোমাকে কি মা জোর করে ধরে এনেছে? তুমি টিকিটের টাকা ফেরত দিয়েছো শুনলাম...

তুতুল জোরে জোরে মাথা নাড়লো। তারপর বললো, তুমি বেশি কথা বলো না।

পাশের বেডের রুগীকে একজন স্বাস্থ্যবতী মহিলা অন্যদের সামনেই ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে, সেদিকে চোখ পড়তেই লজ্জায় অরুণবর্ণ হয়ে গেল তুতুলের মুখ। জয়দীপ নিজের হাতটা তুলে দিল তুতুলের গালের ওপর।

এতদূর থেকে আসা, তবু জয়দীপের সঙ্গে বিশেষ কোনো কথাই হলো না। পাশের রুগীটি দুতিনদিন পরেই ছাড়া পাবে, সেই আনন্দে তার আত্মীয়স্বজন বেশী উচ্ছ্বসিত। দু একবার অবশ্য তারা চিন্ময়ী আর তুতুলের দিকে ফিরে বললো, স্যরি! একটু গলা নামিয়ে কথা বলার চেষ্টাও করলো তারা, মিনিট খানেক বাদেই আবার যে কে সেই!

চিন্ময়ী আর তুতুল একটি-দুটি বাক্য বিনিময় করতে লাগলো জয়দীপের সঙ্গে। বাকি সময় চুপ করে চেয়ে থাকা। তুতুল ভালো করে তাকাতে পারছে না জয়দীপের দিকে। সেই মুখ। থেকে জীবনের আভা অনেকখানি মিলিয়ে গেছে।

বিদায় নেবার আগে তুতুল জয়দীপের হাতে ছোঁয়ালো তার ঠাণ্ডা ওষ্ঠ।

বাড়ি ফেরার পর দেখা হলো অমরনাথের সঙ্গে। তিনি নিজে ডাক্তার হলেও নিজস্ব প্র্যাকটিস নেই, চাকরি করেন একটি ওষুধের ফার্মে। বেশ দীর্ঘকায় পুরুষ, হঠাৎ মোটা হতে শুরু করেছেন মনে হয়, চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। এক একজন মানুষ থাকে, যাদের কোনো পোশাকেই ঠিক মানায় না, অমরনাথও সেইরকম। সুটটা তার গায়ে যেন ঢলঢল করছে। টাইয়ের গিট আলগা, তার দাড়ি কামানো মুখেও গলার কাছে কিছু পাকা দাড়ির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

অমরনাথ ইংরিজি ব্যবহার করেন না বিশেষ। বসবার ঘরের সোফায় এলিয়ে বসে তিনি বললেন, বুঝলি চিনু, আজকের দিনটাতেই এমন কাজ পড়ে গেল, এক ব্যাটা আইরিশ সাহেব আজই এসে স্টক টেকিং করার জন্য যাক তোদের অসুবিধে হয়নি তো কিছু? প্লেনটা তো লেট করেছে আড়াই ঘণ্টা, তারপর তোরা এমন সময় এলি, সারাদিন প্যাঁচপেচে বৃষ্টি। এ কথা বলতে বলতে অমরনাথ পাশের সোফায় পা তুলে দিতেই অমলা ধমক দিয়ে বললেন, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং? তোমার ন্যাস্টি হ্যাঁভিটগুলো কিছুতেই যাবে না।

স্ত্রীর কথা শুনে পা নামালেন বটে অমরনাথ, কিন্তু উল্টে ধমক দিয়ে বললেন, টি ভি'টা বন্ধ কর না, কী ভ্যাজর-ভ্যাজর শুনছো...

অমলা বললেন, আজ একটা সিরিয়াল আছে, এটা আমি মিস করি না...

-তা বলে আমার বোন এসেছে এতদিন বাদে, তার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না? আস্তে করো, আমার বোতল আর গেলাস এনে দাও?

-ইউ গেট ইয়োর ওউন ড্রিংকস।

অমরনাথ উঠে গিয়ে একটা কাবার্ড খুলে একটা হুইস্কির বোতল আনলেন। গেলাসে অনেকখানি ঢেলে একটা বড় চুমুক দিয়ে বললেন, সারাদিন এমন গাধার খাটুনি গেছে, এই শালা আইরিশগুলো এমন খচ্চর হয়-

ঘরের এক কোণ থেকে ছোট মেয়ে নীটা বললো, ড্যাডি, মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গোয়েজ! চিন্ময়ী যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন। হুঁ-হাঁ ছাড়া কিছুই বলছেন না। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর অমরনাথ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ও, আজ তো আবার নেমন্তন্ন আছে, চিনু, তোরা তৈরি হয়ে নে। উপেন মিত্তিরকে মনে আছে তো। বাবার বন্ধু ছিলেন, তার ছেলে কল্যাণ এখানে বড় চাকরি করে, তোরা আজ আসছিস শুনে পার্টিতে ডেকেছে। চল আর বেশি দেরি করা যাবে না, যেতে হবে সেই সাউথ লণ্ডনে।

তুতুল শিউরে উঠলো কথাটা শুনে। কলকাতা থেকে আজই এসে পৌঁছেছেন চিন্ময়ী। হাসাতালে অতখানি অসুস্থ ছেলেকে দেখার পর তিনি এখন নেমন্তন্ন খেতে যাবেন? অথচ অমরনাথ এমনভাবে বললেন কথাটা, যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

চিন্ময়ী মৃদু গলায় বললেন, দাদা, আমি আজ খুব ক্লান্ত, আমি আজ কোথাও যাবো না! কিন্তু তুতুল ছাড়া পেল না। সে অনেকবার না না বললেও অমরনাথ তার আপত্তি গ্রাহ্যই করলেন না, প্রায় জোর করেই তুতুলকে নিয়ে গেলেন। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা বলে তুতুলকে পরিয়ে দেওয়া হলো অমলার একটা ওভারকোট।

কল্যাণ মিত্রের বাড়ির পার্টিতে চোদ্দপনেরো জন নারী-পুরুষ, সকলেই অতিরিক্ত সুসজ্জিত, এ বাড়িটাও অনেক বেশি সাজানো। এক কোণে খোলা হয়েছে বার কাউন্টার, প্রত্যেকের হাতে নানারকম মদের গেলাস, এরকম কোনো পার্টিতে তুতুল কখনো যায়নি, সে সিনেমায় দেখেছে। কল্যাণ মিত্রের স্ত্রী গায়ত্রী অবশ্য বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে আলাপ করলেন তুতুলের সঙ্গে। আলাপ হলো আরও দু'জন মহিলার সঙ্গে। মেয়েরা কেউ কেউ বীয়ার বা ওয়াইন নিয়েছে, তুতুল নিল কোকাকোলা।

একটু পরে সেখানে এসে ঢুকলো আলম, তার সঙ্গে শিরিন নামে একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে। একমাত্র আলমের গলাতেই টাই নেই। সে সোজা তুতুলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী, ঘুম পাইতেছে না? জেট ল্যাগ হয় নাই?

তুতুল দু'দিকে মাথা নাড়ালো।

আলম ধপাস করে তার পাশে বসে পড়ে বলল, মিস সরকার, না বহ্নিশিখা দেবী, কী নামে ডাকব আপনাকে?

তুতুল বলল, যেটা আপনার খুশি!

–আমারে আপনি শুধু আলম কবেন, আমি বহ্নিশিখা বলে ডাকবো, ঠিক আছে?

তুতুল ঘাড় হেলালো। আলম তার সঙ্গের মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, শিরিন, তুমি এনার পাশে বসো, ভদ্রমহিলা নতুন আসছেন। একটু অস্বস্তি ফিল করবেন তো বটেই, তুমি একটু লণ্ডনের হালচাল বুঝাইয়া দাও!

তুতুলের অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে। শিরিনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও সে চোখ মেলে রাখতে পারছে না।

এখানে কেউ জয়দীপের নাম একবারও উচ্চারণ করেনি। এই সব পার্টিতে অসুখের আলোচনা করা বোধ হয় নিষেধ।

খাবার দেওয়া হলো রাত এগারোটার পর। সে খাওয়া যেন আর শেষ হতেই চায় না। খাওয়ার চেয়ে গল্প আর হাসাহাসি হচ্ছে বেশী। এমন সব লোকের নাম নিয়ে অন্যরা গল্প করছে, যাদের কারুকেই তুতুল চেনে না, সে কিছু বুঝতেও পারছে না। শিরিন আর আলম চলে গেছে ডিনার না খেয়েই, তারপর আর তুতুলের সঙ্গে কেউ কথা বলে না।

বাড়ি ফিরতে রাত একটা হলো। অমরনাথ বেশ মাতাল হয়ে গেছেন, তাই গাড়ি চালালেন অমলা। আসবার সময় তুতুল গাড়িতে ঘুমে ঢুলতে লাগলো, অধিক রাতে লণ্ডন নগরের দৃশ্য তার দেখা হলো না।

চিন্ময়ী তখনও জেগে আছেন তুতুলের জন্য। বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসা, তাঁর হাতে একটা বই। এক নজর দেখেই তুতুল বুঝতে পারলো, সারা সন্ধে তিনি একা একা কেঁদেছেন। চোখদুটি ফোলা।

কিন্তু এখন তাঁর কণ্ঠস্বরে কোনো জড়তা নেই। তুতুলকে তিনি দরজাটা বন্ধ করে দেবার ইঙ্গিত করলেন। তারপর বললেন, বহ্নিশিখা, আমি একটা জিনিস ঠিক করেছি, তোমাকে এতদূরে শুধু শুধু নিয়ে এলাম, কিন্তু উপায় নেই, আমি জয়দীপকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

তুতুল কিছু বলার আগেই তিনি আবার বললেন, তোমার যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, তা আমি দেখবো। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আজ ভালো করে ঘুমিয়ে নাও...

তারপর তিনি তুতুলের একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে মাথা নীচু করে রইলেন।

৬২ সারারাত ঘুমোতে পারেনি তুতুল

সারারাত ভালো করে ঘুমোতে পারেনি তুতুল। দু'কানে অবিরল শুনতে পাচ্ছিল বিমানের গোঁ গোঁ ধ্বনি, তাছাড়া কূল-কিনারাহীন দুশ্চিন্তা। চিন্ময়ীও জেগেই ছিলেন মনে হয়, কিন্তু

ছটফট করেননি। জানলার সব পর্দা টানা, সকালের আলো ফুটলেও বোঝা যাবে না। তুতুল এক সময় বেড সুইচ টিপে ঘড়ি দেখল। পৌনে সাতটা, তার মানে তো রীতিমতন সকাল, তুতুলের ছ'টার মধ্যে উঠে পড়া অভ্যেস। সে ধড়মড় করে নেমে পড়লো খাট থেকে। চিন্ময়ীর চক্ষু বোজা, নিঃশ্বাস পড়ছে সমান ভাবে, বোধ হয় ভোরের দিকে তাঁর একটু ঘুম এসেছে।

ঘরের দরজা খুলে বেরুতে গিয়ে তুতুল একটু দ্বিধা করলো। সে শাড়ি পরেই শুয়েছিল। বিলেতের মেয়েরা কি সবাই সকালবেলা হাউস কোট কিংবা ড্রেসিং গাউন পরে? কাল অমলাকে সে বাড়িতে ঐ রকমই একটা পোশাক পরে থাকতে দেখেছে। তুতুলের ওসব কিছু নেই। তাহলে কি হবে? এখানে এসে কোনো আদব-কায়দা ভুল না হয়ে যায়, সেই ভয় তুতুলের সব সময়। কিন্তু তাকে তো এখন বাথরুমে যেতেই হবে। দরজায় কান রেখে সে শুনলো, বাইরে কোনো শব্দ নেই, সে দরজাটা খুলে ফেললো!

সারা বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ, বাড়ির কেউ এখনো জাগেনি মনে হয়। বিলেতে সবাই তো বেশ সকাল সকাল স্কুল-কলেজে, অফিসে যায়। এরা কেউ যাবে না? আজ কী বার, আজ বুধবার, ছুটির দিন তো নয়। বসবার ঘরে এসে তুতুল ভারি পদাটা সরিয়ে বাইরেটা একটু দেখলো, এবং চমকে উঠলো। ঘড়িটা কি সে ভুল দেখেছে, এখনও ভোর হয়নি? না, বসবার ঘরের একটা ঘড়িতেও একই সময়। বাইরেটা এখনও রীতিমতন অন্ধকার, ছির ছির করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে, রাস্তায় কোনো মানুষ নেই। বিলেতে তার প্রথম সকাল, কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়।

এখন সকাল সাতটা, তার মানে কলকাতায় দুপুর। ঝকঝক করছে রোদ, রাস্তায় কত মানুষ, রান্নাঘরে এতক্ষণে মা কিংবা মামীমার রান্না প্রায় শেষ, বাবলু নিশ্চয়ই এখন বাড়িতে নেই, মুন্নি কলেজে গেছে, টুনটুনি সারা বাড়ি ঘুরঘুর করছে...স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছে তুতুল, তবু কলকাতা কত দূরে!

মাকে চিঠি লিখতে হবে, সবাইকে চিঠি দিতে হবে। কাল তো একটুও সময় পাওয়া যায়নি। কয়েকখানা এরোগ্রাম কিনতে হবে, কত দাম লাগবে কে জানে, তুতুলের কাছে আছে মাত্র তিন পাউণ্ড।

ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠতেই দারুণ চমকে কেঁপে উঠলো তুতুল। সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ থাকে বলে বাইরের কোনো শব্দ শোনা যায় না, সারা বাড়িতেই কোনো শব্দ নেই। টেলিফোনের শব্দটা তাই এত জোরালো মনে হয়। তুতুল কোনোদিন এত নিস্তব্ধ বাড়িতে থাকেনি।

ফোনটা দেওয়ালের গায়ে, সেটা বেজেই চলেছে। তুতুল প্রথমে ভাবলো, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ উঠে এসে ধরবে, কিন্তু কেউ এলো না। বেশ কয়েকবার বাজবার পর ফোনটা থেমে গেল, কয়েক মুহূর্ত বাদে আবার বাজতে শুরু করলো। তুতুল ফোনটা তুলতে ভয় পাচ্ছে। সাহেব-মেমদের উচ্চারণই সে বুঝতে পারবে না, তারা কিছু জানতে চাইলেও সে উত্তর দিতে পারবে না!

তবু ফোনটা জেদীভাবে বেজে চলেছে, একটা কিছু করা দরকার। অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচের। সঙ্গে তুতুল ফোনটা তুললো। তারপরেই দারুণ বিস্ময়! হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফ দিয়ে চলে এলো গলায়।

ফোনের ওপাশে একটি ভারি পুরুষ কণ্ঠস্বর প্রথমে টেলিফোন নাম্বারটা মিলিয়ে নিয়ে তারপর পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলো, বহ্নিশিখা সরকারের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

তুতুল আমতা আমতা করে বললো, আমি–আমি বহ্নিশিখা সরকার।

–ও, বহ্নিশিখা, মানে তুতুল! কেমন আছো? কেমন লাগছে লণ্ডন? খুব প্যাঁচপেচে বৃষ্টি না? আর সারাদিন অন্ধকার? আমি কে বলছি বুঝতে পারছো তো? ত্রিদিব, তোমার মামা না, কাকা কী যেন হই...প্রতাপ চিঠিতে লিখেছেন তোমার এখানে আসার কথা...

প্লেন থেকে নামবার পর এই প্রথম তুতুলের একটা সুন্দর অনুভূতি হলো। পিকলুবাবলুদের ত্রিদিব মামা, তারও মামা, অতি চমৎকার মানুষ। তিনি যে বিলেতের টেলিফোনে কথা বলছেন তা বোঝাই যায় না। অতি স্বাভাবিক স্বর, পরিষ্কার বাংলা।

ত্রিদিব প্রথমে কলকাতার প্রত্যেকের খবরাখবর নিলেন। তারপর বললেন, তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, বলো ততুল? ডাক্তারি পাস করে এসেছো শুনলুম, এফ আর সি এস করবে কোথায়, লণ্ডনে?

তুতুলের সামনে কোনো ভবিষ্যতের ছবি নেই। জয়দীপের জন্য সে এসেছে, জয়দীপকে যদি তাঁর মা কলকাতায় ফেরত নিয়ে যান, তা হলে তুতুল কী করবে? সেও ফিরে যাবে, না এখানে থাকবে? এখানে কোথায় থাকবে?

তুতুল বললো, এখনো কিছু ঠিক করিনি।

ত্রিদিব বললেন, প্রথমে এক কাজ করো, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জানাল এক কপি জোগাড় করে নাও। ওতে দেখবে অনেক চাকরির বিজ্ঞাপন থাকে, দেখেশুনে একটা অ্যাপ্লাই করে দাও, তোমাদের চাকরি পেতে অসুবিধা হবে না। তারপর তুমি পড়াশুনোর জন্য তৈরি হয়ে আস্তে আস্তে...তার আগে কয়েকটা দিন গ্লাসগোতে আমার কাছে এসে থেকে যাও না! গ্লাসগো এমন কিছু ভালো জায়গা নয় অবশ্য, বেশ নোংরা, আর বাতাসে সর্বক্ষণ ধোঁওয়া। তবে এখানে এখনো রোদ আছে। চলে এসো কয়েকটা দিনের জন্য...কলকাতা থেকে এতদূরে প্রথম এলে, বিলেতে এসে প্রথম প্রথম একটা কালচার শক লাগে, অনেক কিছুই তো অন্যরকম কবে আসবে বলো? আমি শনিবার লণ্ডনে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসতে পারি।

তুতুলের মনে হলো, ত্রিদিবমামার কাছে কয়েকদিন থাকলে তার ভালোই লাগবে, ত্রিদিবমামা নিজেদের লোক, এখানে চিন্ময়ীর দাদার বাড়িতে প্রথম থেকেই তার বেশ অস্বস্তি লাগছে। কিন্তু জয়দীপের ব্যাপারটা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সে কী করে যাওয়ার

কথা বলবে? সে বললো, ত্রিদিবমামা, এখানে আমার এক বন্ধু অসুস্থ.-হাসপাতালে আছে...এখন কয়েকটা দিন-

-ঠিক আছে, আমাকে পরে জানিও, আমার টেলিফোন নাম্বারটা লিখে নাও, আর শোনো, তোমার কাছে পয়সাকড়ি নিশ্চয়ই কিছু নেই, ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট তো মাত্র তিন পাউণ্ড হাতে খুঁজে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়...আমি তোমাকে একশো পাউণ্ডের ড্রাফট আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি, পরে যখন অনেক টাকা রোজগার করবে, তখন শোধ দিও।

ফোনটা রেখে দেবার পরই তুতুলের মনে পড়লো সুলেখার কথা। সুলেখার চেয়ে বেশি লাবণ্যময়ী কোনো রমণীকে এ পর্যন্ত দেখেনি তুতুল, সেই সুলেখা কেন গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরলেন? এত ভালো যাঁর স্বামী...ত্রিদিবমামাকে কিছু বলতে হলো না, তিনি নিজে থেকেই তুতুলের সমস্যাগুলো বুঝে নিয়ে...ইস, সুলেখাও যদি এখানে থাকতেন, তাহলে যেমন করেই হোক দু'একদিনের মধ্যে তুতুল একবার গ্লাসগো ঘুরে আসতো।

মুখ ফেরাতেই তুতুল দেখলো বেসমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে রঞ্জন। মুখে কাঁচা ঘুম ভাঙার বিরক্তি, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, তার গায়ে একটা ড্রেসিং গাউন জড়ানো। তুতুলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, মর্নিং'। তুতুল বললো, গুড মর্নিং?

-ওয়াজ দা ফোন রিংগিং?

-ইয়েস।

-হুঁ কলড? ডিড় য়ু নোট ডাউন দা নেইম অ্যাণ্ড দা নাম্বার?

-ফোনে আমাকেই ডাকছিলো...গ্লাসগো থেকে, আমাদের একজন আত্মীয়-ত্রিদিব মিত্র। রঞ্জন ভুরু কুঁচকে কয়েক লহমা তাকিয়ে রইলো তুতুলের দিকে। তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, তোমার ফোন কল? কী করে আমাদের ফোন নাম্বার জানলো? য়ু র্যাং হিম ফাস্ট?

–না, আমি আগে ফোন করিনি?

–হাউ ডিড হি নো আওয়ার নাম্বার?

–তা জানি না। আমি জিজ্ঞেস করিনি!

–ট্রিডিব মিট্রা ফ্রম গ্লাসগো? ডোন্ট থিংক আই হ্যাভ হার্ড দা নেইম বিফোর... তুতুলের কান গরম হয়ে গেল। টেলিফোন করতে পয়সা খরচ হয়, রঞ্জন কি ভাবছে যে সে চুপিচুপি ভোরবেলা উঠে টেলিফোন করে ওদের পয়সা খরচ করিয়ে দিচ্ছে?

মাথার চুল খামচে ধরে রঞ্জন বললো, উ, বেসমেন্টে যা ঠাণ্ডা–মা রাত্তিরবেলা হিটিং অফ করে করে দিয়েছে তোমার ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

তুতুল আবার অপরাধ বোধ করলো। তারা এসেছে বলেই রঞ্জনকে মাটিরতলার ঘরে শুতে হচ্ছে। কলকাতায় থাকতে সে অনেকবার, শুনেছে যে বিলেতে জয়দীপের মামার নিজস্ব খুব বড় বাড়ি আছে। কলকাতায় বসে, খুব বড় বাড়ি' শুনলে মনে হয়, অন্তত আটদশখানা ঘর, টানা টানা বারান্দা, তিন-চারটে বাথরুম...

রঞ্জন এবার হেসে উঠে বললো, য়ু লুক হ্যাঁপি আফটার টকিং টু দ্যা ম্যান অ্যাট গ্লাসগো! ইজ হি কামিং টু মীট য়ু?

তুতুল মাথা নেড়ে বললেন, না। আমার খোঁজখবর নিচ্ছিলেন।

–তুমি এত ভোরে উঠেছো, কফি-তেষ্টা পেয়েছে বঝি? ইউ কুড প্রিপেয়ার ইওর ওউন কফি! এদেশে যার যখন যেটা দরকার হয়, নিজেই বানিয়ে নেয়।

–আমি গ্যাসের উনুন জ্বালাতে জানি না।

–গ্যাসের উনুন? ওঃ হো! কলকাতায় বুঝি গ্যাসে রান্না হয় না? কয়লার চুল্লি এখনো চলছে? এসো, শিখিয়ে দিচ্ছি!

প্রথম থেকেই রঞ্জন তাকে তুমি বলছে। অথচ রঞ্জন তার চেয়ে বয়েসে বছর দু'এক বড় হবে। ইংরেজিতে তুমি-আপনি ভেদ নেই, সেই জন্য? ওর বন্ধু আলম কিন্তু তাকে আপনিই বলে, অবশ্য আলম এত ইংরেজিও বলে না।

রান্না ঘরে এসে রঞ্জন গ্যাস জ্বালিয়ে কেটলি চাপালো। সিঙ্কে কিছু এঁটো বাসনপত্র পড়ে আছে, সেগুলো ধুতে গিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে বললো, তুমিও এসে হাত লাগাও। এদেশে তো ঝি-চাকর পাওয়া যায় না। এসব কাজ নিজেদেরই করতে হয়।

তুতুল বললো, আপনি সরুন, আমি ধুয়ে দিচ্ছি। রঞ্জন তবু তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাকে সাবানের ব্যবহার শেখাতে লাগলো। রান্নাঘরটি ছোট, কোনো পুরুষ মানুষের এত কাছাকাছি দাঁড়াতে তুতুলের খুবই অস্বস্তি হয়। রঞ্জন কি ইচ্ছে করে তার গা ছুঁয়ে দিচ্ছে? নাকি এদেশে নারী-পুরুষে এত সহজ মেলামেশা যে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না?

কেটলিটা এক সময় বাঁশীর মতন বেজে উঠলো। হুইশলিং কেল, তুতুল বইতে পড়েছে, এই তা হলে সেই? জল গরম হয়ে গেলেই এ রকম শব্দ হয়।

দুখানা পেল্লায় সাইজের মগে রঞ্জন কফি বানালো। কালো কফি, নিজে একটা নিয়ে বসে সে তুতুলকে বললো, তুমি যদি দুধ-চিনি মেশাতে চাও, ফ্রিজ খুলে দুধ বার করো, আর কাবার্ডে দ্যাখো চিনি আছে।

মেডিক্যাল কলেজ ক্যান্টিনে তুতুল কয়েকবার কফি খেয়েছে বটে, কিন্তু কফির স্বাদ তার ভালো লাগে না। এতখানি কফি তাকে খেতে হবে? সকালবেলা তার চা খেতে ইচ্ছে করে। এদের বাড়িতে বোধ হয় চায়ের পাট নেই। বিলেতে ভালো চায়ের খুব দাম, তুতুল আগেই শুনেছে। চিন্ময়ী কয়েক প্যাকেট চা নিয়ে এসেছেন...কিন্তু তুতুল মুখ ফুটে চায়ের কথা বলতে পারলো না।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে রঞ্জন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তুতুলের দিকে। তুতুল মুখ নিচু করে রইলো। একটু বাদে রঞ্জন লঘু হাস্য করে বললো, ইউ আর আ প্রীটি গার্ল। টেল মি সামথিং, আর যু এনগেইজড টু জয়দীপ?

তুতুল ঠিক জয়দীপের কথাই ভাবছিল। একটু চমকে উঠলেও সে মুখ না তুলে দু'দিকে মাথা দোলালো।

-ইউ আর আ ডকটর ইয়োরসেলফ। টেল মী, জয়দীপের কণ্ডিশান কী রকম দেখলে? তুতুল এবারও মাথা তুললো না, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না।

-হি ইজ ডেসটি টু ডাই। ম্যাটার অফ মাথস, ইফ নট উইক। শুধু শুধু অনেক টাকা খরচ হবে কিন্তু এ রোগের চিকিৎসা নেই। তুমি এখন...

রঞ্জনের কথা শেষ হলো না, সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে এলো প্রথমে তার ছোট বোন, তারপর তার বাবা। এরপর বাড়িতে যেন একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কে আগে বাথরুমে যাবে, কে দাড়ি কামাবে, কে বেকফ্রাস্ট বানাবে...অমলা নামলেন সবার শেষে, একমাত্র তাঁকেই বাইরে যেতে হবে না। তুতুল গিয়ে চিন্ময়ীকে ডেকে নিয়ে এলো। বাড়ির কর্তা ও ছেলেমেয়ে দুটি তৈরি হয়ে নিল আধ ঘণ্টার মধ্যে, অমরনাথ ছুটলেন টাই বাঁধতে বাঁধতে, রঞ্জনের হাতে আধ-খাওয়া স্যাণ্ডউইচ। যাবার সময় রঞ্জন বলে গেল, তার বন্ধু আলম এসে সকালে ওদের। হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব চিন্ময়ীর। ছেলের অবস্থা দেখে তিনি ভেতরে ভেতরে কতটা ভেঙে পড়েছেন না পড়েছেন, তার কোনো চিহ্ন নেই বাইরে। ব্রেকফাস্ট টেবলে বসে তিনি ফলের রস খেলেন, কলা আর দুধ দিয়ে কর্নফ্লেক্স খেলেন কিন্তু স্যাণ্ডউইচ প্রত্যাখ্যান করলেন। অমলার সঙ্গে চালিয়ে গেলেন টুকিটাকি কথা। অমলাও একবারও জয়দীপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না। চিন্ময়ীও সে সম্পর্কে কিছু বললেন না। এরা দু'জনে স্কুলের সহপাঠিনী হলেও এদের দু'জনের যে মনের মিল নেই, তা বুঝতে অসুবিধে হল না তুতুলের।

একসময় অমলা বললেন, তোমরা স্নান-টান করে তৈরি হয়ে নাও, আলম এসে পড়বে। আমি আজ ওয়াশিং মেশিনটা চালাবো, তোমাদের ময়লা জামা কাপড় যা আছে দিয়ে দাও।

অমলা বেসমেন্টে নেমে যাবার পর চিন্ময়ী বললেন, আমি আজ সকালে হাসপাতালে যাবো না, ঐ ছেলেটি এলে তুমি ঘুরে এসো, বহ্নিশিখা।

–আপনি যাবেন না, মাসীমা?

–না। এখানে দু'এক জায়গা থেকে টাকা পাওয়ার কথা আছে, এরা পাউণ্ড দিলে আমি দেশে গিয়ে রুপিতে শোধ করে দেবো, সেই টেলিফোন করতে হবে। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি, বহ্নিশিখা। খোকনকে এখানে রেখে লাভ নেই। কাল তোমরা চলে যাবার পর আমি টেলিফোনে ওর ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি।

–এতদিন জয়দীপের কী চিকিৎসা হয়েছে, মাসীমা?

–সে কথা এখন আর বলে লাভ নেই। কিন্তু বহ্নিশিখা, তোমাকে আমি জোর করে নিয়ে এলুম, তুমি কী করবে? এখানে থেকে যাবে? একলা একলা থাকতে পারবে? পড়াশুনোর খরচ চালাবে কী করে?

–আপনি বললে আমি ফিরে যেতে পারি আপনার সঙ্গে।

–তুমি ফির গেলে তোমার মায়ের কাছে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে? তোমার মামা খরচপত্র করে তোমাকে পাঠিয়েছেন।

–মাসীমা, আমি শেষপর্যন্ত জয়দীপের সঙ্গে থাকতে চাই।

চিন্ময়ী বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন তুতুলের দিকে। তাঁর চোখ আস্তে আস্তে জলে ভরে গেল। তুতুলও আর কান্না সামলাতে পারলো না। সে এই মাত্র একটা মিথ্যে কথা

বলেছে। সে যে বলল, শেষপর্যন্ত জয়দীপের সঙ্গে থাকতে চায়, এই কথাটার মধ্যে বিশ্বাসের জোর নেই। জয়দীপের জন্য তার অনুভূতি কখনো তেমন তীব্র হয়নি। সে লণ্ডনে এসেছে একটি মাতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে, এখনো সে যে ফিরে যাবার কথা বলল, তা জয়দীপের জন্য নয়। চিন্ময়ীকে আশ্বস্ত করার জন্য।

চিন্ময়ী উঠে এসে তুতুলের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তুমি যে এই কথাটা বললে, সেটাই তো যথেষ্ট, বহ্নিশিখা! আমি মা হয়েও বলছি, তুমি লণ্ডনে যখন এসেই পড়েছো, একটা কিছু ডিগ্রী না নিয়ে তোমার ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। জয়দীপের জন্য তোমার ফিরে যাওয়া-না তা আর দরকার নেই। আজই খোকনকে এসব কথা কিছু বলল নাসর ব্যবস্থা করতে দু'চারদিন সময় লাগবে!

আলম একটু বাদেই এসে পড়ল একটা লাল রঙের গাড়ি নিয়ে। বাইরে খুব ঠাণ্ডা, তাই অমলার ওভারকোট আজও ধার করতে হল। সেই সঙ্গে গরম মোজা এবং জুতো। তুতুল চটি ছাড়া কিছু আনেনি।

গাড়িতে আলম তাকে নানারকম প্রশ্ন করে যেতে লাগল, তুতুল শুধু হ্যাঁ কিংবা না ছাড়া কিছুই বলতে পারছে না। তার মনের মধ্যে একটা উথাল-পাথাল চলছে। সে কি ফিরে যাবে, না এখানে থাকবে? এখানে সে একা থাকবে কী করে? জয়দীপের মামার বাড়িতে সে কিছুতেই থাকতে পারবে না।

কয়েকটা ফাঁকি এর মধ্যেই ধরা পড়ে গেছে। সবাই জানতো যে জয়দীপের মামা বিলেতে বড় ডাক্তার, দারুণ বড়লোক, মস্ত বড় বাড়ি, সেখানে জয়দীপ একবার পৌঁছোলেই তার চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বিলেত...ডাক্তার মামা...খোদ লণ্ডন শহরে নিজস্ব বাড়ি...এসব শুনলেই একটা মোহময় ছবি ফুটে ওঠে। আসলে, জয়দীপের মামা অমরনাথ বিলেতে এসেও সুবিধে করতে পারেননি, নিজস্ব প্র্যাকটিসের বদলে তাঁকে চাকরি নিতে হয়েছে। এলোমেলো স্বভাবের জন্য তাঁকে ঘন ঘন চাকরি বদলাতে হয়। তাঁর অবস্থা মোটেই ভালো নয়, বাড়ির মর্টগেজ শোধ হয়নি, তাছাড়া তিনি

অ্যালকোহলিক। তাঁর এক ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বড় ছেলে রঞ্জন একটি মেম বিয়ে করেছিল, একটি বাচ্চা সমেত তার বউ ডিভোর্স নিয়েছে এক বছর আগে, সেই বউকে অ্যালিমনি দিতে হয়। অমলা শ্বশুরবাড়ির লোকদের আসা বিশেষ পছন্দ করেন না, তাঁর বাপেরবাড়ির লোকজন এখানে প্রায়ই আসে, আগামী সপ্তাহে তার দাদা-বৌদির আসার কথা আছে। চিন্ময়ী ও তুতুল এ বাড়িতে প্রায় অবাঞ্ছিত অতিথি। চিন্ময়ী ভেবেছিলেন তিনি তাঁর দাদার বাড়িতে আসছেন নিজস্ব অধিকারে, আসলে তাঁর দাদার কোনো ব্যক্তিত্বই নেই।

হাসপাতালে জয়দীপের ক্যাবিনের দরজা বন্ধ, বাইরে একটা বোর্ড টাঙানো, 'সরি, নো ভিজিটর'! তুতুলকে বাইরে দাঁড় করিয়ে আলম তবু দরজা ঠেলে ঢুকে গেল। তুতুল ওভারকোটটা খুলে ফেলল, বাইরে ঠাণ্ডা, ভেতরে ঢুকলেই গরম লাগে। বারান্দা দিয়ে ডাক্তার নার্সরা দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, এদেশে কেউ আস্তে হাঁটে না, শীতের দেশের মানুষের স্বভাবই এই।

আলম একটু বাদে বেরিয়ে এসে বলল, দু'জন পেশেন্টকেই সিডেটিভ দিয়ে রেখেছে। একবার ভেতরে গিয়ে দেখে আসবেন? আমি নার্সকে বলেছি।

তুতুল বলল, থাক। বিকেলে আবার আসব।

হাসপাতালের চত্বরে প্রায় শ'খানেক গাড়ি। এরই মধ্যে আলম ভুলে গেছে, কোথায় সে গাড়িটা রেখেছে। গাড়িটা খুঁজতে খুঁজতে সে তুতুলকে জিজ্ঞেস করলো, এখনই বাসায় ফিরবেন, না আমার সাথে এক জাগায় যাবেন?

–কোথায়?

–নর্থ লণ্ডনে হাইবেরি হিল-এ আমাদের একটা আস্তানা আছে। সে বাড়ির নাম 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস'। সেখানে গ্যালে অনেকের সঙ্গে আলাপ-সালাপ হবে। সেখানে সবাই বাংলায় কথা কয়। অ্যাট হোম ফিল করবেন। আপনার দেশ ছিল কোথায়?

–দেশ...মানে বাড়ি? আমাদের বাড়ি কলকাতায়...আগে ছিল বরানগর।

–ও কলকাত্তাইয়া মাইয়া? কোনো ইস্টবেঙ্গল কানেকশান নাই?

–আমার মায়ের দেশ...মানে মামাবাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে।

–ও, তবে তো হাফ বাঙাল! পূর্ববঙ্গে কোথায়?

–বিক্রমপুর জেলায়, মালখানগরে। আমি অবশ্য সেখানে খুব ছোটবেলায় একবারই গেছি।

–মালখানগরের বোস?

–না, আমার মামাবাড়ির ওঁরা মজুমদার। আপনি চেনেন মালখানগর?

–আমাদের বাড়িও ঐ কাছাকাছিই। লাল রঙের গাড়িটা খুঁজে পেয়ে, দরজা খুলে সামনের সীটে বসলো দু'জনে। আলম একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, আপনি কি অনেক ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে এসেছেন, না চাকরি-বাকরি করার দরকার হবে?

–যদি এখানে থাকি, তা হলে চাকরি করতেই হবে।

–যদি মানে? এসেছেন যখন একটা ডিগ্রি করে যাবেন না? আমি যে সাজারির সাথে অ্যাটাল্ড, সেখানে সামনের সপ্তাহে একটা পোস্ট খালি হবে। সাজারি মানে বুঝলেন তো? দেশে যাকে ডাক্তারের চেম্বার বলে, এখানে তারই নাম সাজারি। চার-পাঁচজন ডাক্তার মিলে এক সাথে...একজন আমেরিকায় চলে যাচ্ছে, সেইখানে আপনার জন্য কথা বলতে পারি, আমি আছি তো, একজন চেনা লোক থাকলে আপনার সুবিধে হবে।

–তা তো নিশ্চয়ই।

–থাকবেন কোথায়? ঐ রঞ্জনদের বাড়ি? যদি পৃথক থাকতে চান, আমাদের ঐ ইস্ট পাকিস্তান হাউজে একটা রুমের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। ওখানে কিছু ছাত্র থাকে।

–ইস্ট পাকিস্তান হাউসে আমার জায়গা হবে কী করে? আমি তো পাকিস্তানী নই।

–আমাগো অত শুচিবাই নাই। তাছাড়া আপনি তো হাফ বাঙাল। চলুন, রুমটা দেখে আসবেন, লণ্ডন শহরটাও খানিকটা দেখা হবে।

–কিন্তু...বাড়ি না ফিরলে মাসীমা চিন্তা করবেন।

–ওখানে পৌঁছে টেলিফোন করে দেবো। চিন্তার কী আছে? আপনি পানিতে পড়েন নাই। আমিও বাঘ কিংবা সিংহ না।

হা হা করে হেসে উঠে আলম স্টার্ট দিল গাড়িতে। বৃষ্টি থেমেছে'একটু, কিন্তু এখানে ওখানে কুয়াশা। একটু দূরের জিনিস দেখা যায় না। তবু এরই মধ্যে রাস্তায় অনেক গাড়ি।

আলম বললো, এখনও টেমস নদী দ্যাখেন নাই তো? চলেন ওয়াটালু ব্রীজের উপর দিয়ে একটু ঘুরে যাই। ফগ-এর জন্য কিছুই দ্যাখতে পাবেন না ভালো করে। পাশেই টেমস নদী, আমাদের বুড়ি গঙ্গার থেকেও অনেক ছোট, মনে করেন একখান খাল, তার উপরেই কতকগুলো ব্রীজ।

–সকালে আপনার ছুটি থাকে?

–ঠিক ছুটি বলা যায় না। আমি সাজারিতে যাই বিকালে, সকালের দিকটায়, 'এসিয়ান টাইড' আর 'পূর্ব বাংলা' নামে দুইটা কাগজ বার করি আমরা, সেই কাগজের কাজ দেখাশোনা করতে হয়। কিছু কিছু পলিটিক্যাল কাজকর্মের সাথেও যোগ আছে আমার। আমাদের ইস্ট পাকিস্তানের পলিটিক্যাল সিচুয়েশন সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে আপনার?

কুণ্ঠিতভাবে তুতুল বলল, না, বিশেষ কিছু জানি না।

আলমের এমনিতেই মুখখানা হাসি মাখানো, তার ওপর যখন তখন সে জোরে জোরে হেসে ওঠে। সিগারেট টানে একটার পর একটা। গাড়ির সুইচগুলোর কাছেই কী একটা টিপে দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড বাদে বার করে আনে, সেটার মুখটা লাল গনগনে। সেটা দিয়েই সিগারেট ধরায়। এরকম লাইটার তুতু। আগে দেখেনি।

আলম বললো, এবারে জানবেন। কলকাতার কাগজে, ইণ্ডিয়ার কোনো কাগজেই আমাদের ওদিককার খবর কিছু থাকে না প্রায়। ব্রিটিশ কাগজে খবর পাবেন। তাছাড়া আমাদের মুখপত্র তো আছেই। আমাদের ওখানে অবস্থা খুব খারাপ। সাংঘাতিক রিপ্রেশন চলছে। আমি এখানে থাকলে আপনার কলেজ-টলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিতাম সব, কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যেই আমাকে একবার ঢাকায় যেতে হবে। কবে ফিরবো, বলা যায় না। ঢাকায় আমি পাসোনা নন গ্রাটা, পুলিশ একবার আমারে পাইলে ছাড়বে না। আমার দুইখান পাসপোর্ট, এবারে অন্য একটা নামে যাবো। তবু যদি ধরে ব্যাটারা!

–এরকম বিপদ হতে পারে জেনেও...যাচ্ছেন কেন? কারুর অসুখ বুঝি?

–ঠিকই কইছেন, পুরা দেশটারই অসুখ। আমরা তো এখানে বেশ ভালোই আছি, তাই না। রোজগারপাতি ভালোই করি, মদ-মুদ খাই, ফুর্তি-ফাতা করি, তবু মাথার মইধ্যে একটা পোকা কামড়ায়, দুঃখিনী দেশ আমারে টানে, আমার বাংলা দেশেই যেন আমার নিয়তি বাঁধা।

হঠাৎ কথা থামিয়ে, একটা ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি থামিয়ে, তুতুলের দিকে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে সে প্রায় আপনমনেই বললো, একটুখানি আলাপেই আপনাকে এত সব কথা বলছি কেন কে জানে?

৬৩ ট্রাম ধর্মঘট মিটলো

ট্রাম ধর্মঘট মিটলো দেড় মাস পরে। এতদিন ধরে ট্রাম চলেনি বলে ট্রাকগুলোতে মর্চে পড়ে গেছে। চৌরঙ্গির পাড়ায় সাউন্ড অফ মিউজিক সিনেমা দেখে অতীন বাড়ি ফিরলো ট্রামে চেপে। অনেকদিন পর ট্রামে চড়ায় তার বেশ নতুন নতুন লাগছে। মনটা বেশ ফুর্তিতে আছে তার। ফিল্মটা খুবই ভালো, আর একবার দেখার মতন, তা ছাড়া আজই অতীন শিলিগুড়ি কলেজ থেকে তার চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি পেয়েছে।

ট্রামের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অতীন, ভেতরে ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। বুকফোলা একটা জহরকোট গায়ে সে ঠাণ্ডা বাতাস বেশ উপভোগ করছে। নর্থ বেঙ্গলে আরও অনেক বেশি ঠাণ্ডা হবে, এখন থেকেই সইয়ে নেওয়া ভালো। হঠাৎ সে যেন দেখতে পেল দিগন্তের গায়ে আঁকা পাহাড়ের শ্রেণী। জঙ্গল, কাঞ্চনজঙ্ঘা...সে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলো, দা হিলস আর অ্যালাইভ উইথ দা সাউন্ড অফ মিউজিক...

ভবানীপুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে একবার ভাবলো, অলিদের বাড়িতে একবার নামবে,

নামবে না? অলিকে খবরটা দিতে হবে। অলি খুশি হবে খুব, অলি আগেই বলেছে, ছুটির সময় সে দার্জিলিঙ বেড়াতে যাবে, ততদিনে অতীন সব চিনে যাবে ওদিকটা। কিন্তু ভবানীপুর পেরিয়ে গেল, অতীনের নামা হলো না। অলির কাছে কাল আসবে, এখন রাত পৌনে ন'টা, বাবা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে থাকবেন তার যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য।

বাড়ির স্টপে নেমে অতীন দেখলো তাদের রাস্তার মোড়ের একটা মিষ্টির দোকান খুব আলো-টালো দিয়ে সাজানো হয়েছে, সেখানে মাইক বাজছে। কী ব্যাপার? বেশ কিছুদিন ধরে এই দোকানটা বেশ মনমরা হয়েছিল, প্রায় কিছুই পাওয়া যেত না। দোকানটা এখানে আছে কি নেই, সেটাই বোঝা যেত না।

দোকানটার সামনে বেশ ভিড়, দু'খানা বিরাট কাঠের পরাত ভর্তি ডাঁই করা সন্দেশ, লোকে চিলুবিলু করে কিনছে। ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে লোকজনের কথাবার্তা শুনে অতীন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ থেকে ছানার মিষ্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। আজ ময়রা ও মিষ্টি ব্যবসায়ীদের পক্ষে একটা বিরাট আনন্দের দিনই বটে। প্রফুল্ল সেনের খেয়ালে এই অদ্ভুত নিষেধাজ্ঞায় কত মিষ্টির দোকানের কারিগর যে এতদিন বেকার হয়ে বসে ছিল তার ঠিক নেই। কয়েকজনের আত্মহত্যার খবরও বেরিয়েছে কাগজে।

আনন্দের চোটে আজ এই দোকানে সুস্তায় মিষ্টি দেওয়া হচ্ছে। চার আনা দামের বড় সাইজের সন্দেশ আজ এক টাকায় ছ'টা। অতীনও কিনে ফেললো দু'টাকার। এই প্রথম সে বাড়ির জন্য নিজে থেকে কিছু কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

সন্দেশের বাক্সটা হাতে নিয়ে অতীন মনে মনে হাসলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার সন্দেশ খেতে দিচ্ছে সবাইকে। এদিকে বাজারে চাল নেই। ভাত খেতে না পাও তো সন্দেশ খাও; ফরাসী দেশের রানী মেরি আঁতোয়ানেৎ বলেছিল না, লোকেরা রুটি খেতে পাচ্ছে না, তাতে কি, তারা কেক খেতে পারে! দাঁড়াও না, একদিন এই ব্যাটাদেরও সবকটার গলা কাটা যাবে!

ট্রামের পর সন্দেশ। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় চার মাস ধরে যে ধর্মঘট চলছে, সেটাও দু'একদিনের মধ্যেই মিটে যাবে শোনা যাচ্ছে। ভোটের আগে সরকারের এই সব তৎপরতা! ভোট! স্বাধীন ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। এবারে এখন অনেক তরুণ-তরুণী ভোট দেবে যাদের পরাধীন ভারতের কোনো স্মৃতি নেই। স্বাধীনতার দু'এক বছর আগে মাত্র জন্মেছে।

অতীন অবশ্য ভোট গ্রাহ্য করে না। শিলিগুড়িতে যেতে না হলেও সে ভোট দিত না। এ তো গাঁজাখোরদের ভোট। দেশের অর্ধেকের বেশি লোক খেতে পায় না, থ্রি ফোর্থ পপুলেশন নিজের নামটা পর্যন্ত পড়তে পারে না, এদের আবার গণতন্ত্র! ফুঃ! শুধু যারা

খবরের কাগজ পড়ে, তারাই এ দেশের জনগণ'। জোতদার, জমিদার আর কালোবাজারিদের পেটোয়া পার্টি কংগ্রেস মুঠো মুঠো টাকা ছড়াবে আর প্রত্যেকবার জিতে যাবে। ছিটেফোঁটা পাবার আশায় শোধনবাদী বামপন্থীদলগুলোও এই ভোটের খেলায় মেতে আছে। পার্লামেন্ট একটা শুয়োরের খোঁয়াড়!

বাড়িতে পা দিয়েই বাবার মুখোমুখি হবার ইচ্ছে ছিল না অতীনের, কিন্তু প্রতাপ বসবার ঘরেই বসে আছেন আদালতের কাগজপত্র মেলে।

অতীনের বাইরের কলেজে চাকরি নেওয়ার ব্যাপারে প্রতাপ আপত্তিও করেননি, উৎসাহও দেখাননি। মমতার একটুও সম্মতি ছিল না। অতীন প্রায় জোর করেই দরখাস্ত পাঠিয়েছে। বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন বাইরে থাকার জন্য তার মন ছটফট করছে। বাড়িতে সে যেন কিছুতেই সাবালক হয়ে উঠতে পারছে না। বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকলেই মা আর পিসিমা মিলে তাকে এখনও বাচ্চা ছেলে করে রাখতে চায়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অতীন বেশ কয়েক পলক বাবার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আজ সে তার জীবনের একটা খুব বড় সিদ্ধান্তের কথা জানাতে চলেছে। সেই একদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ি না ফিরে একা একা দোতলা বাসে চেপে দক্ষিণ কলকাতায় যাওয়া বাবার কাছে সেদিন সে খুব মার খেয়েছিল। হঠাৎ সেই দিনটার কথা মনে পড়লো। বাবা পরে বলেছিলেন, তুই আমাদের সব কথা বলিস না কেন। বাবলু, তুই আমাদের কাছে কিছু লুকোবি না...

–বাবা, আমি শিলিগুড়ি থেকে আজ অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি পেয়েছি। প্রতাপ এতদিন চশমা পরতেন না, এখন রিডিং গ্লাসের দরকার হয়। চোখ থেকে চশমাটা খুলে বাবলুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ও, পেয়েছিস চিঠি? কবে জয়েন করতে হবে?

–ফিফটিথ ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

–পার্মানেন্ট পোস্ট? কত স্কেল দিয়েছে?

–আপাতত লীভ ভ্যাকেনসি। তবে সিদ্ধার্থ আমাকে বলেছে, যে-ভদ্রলোক ছুটিতে গেছেন, তিনি আর ফিরবেন না, খুব সম্ভবত বিদেশে চলে যাচ্ছেন। এখন আমাকে একশো পঁচাত্তর দেবে।

–কই চিঠিটা দেখি?

–ভেতরে আছে। আমি একটু পরে এনে দেখাচ্ছি, বাবা, বাথরুম থেকে আসছি। একটু থেমে, সে আবার যোগ করলো, আমার প্রফেসার-গাইডকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি, ওখানে বসেও পি-এইচ ডি করা যাবে।

ভেতরে ঢুকে অতীন দেখলো, মায়ের ঘরে দু'জন অচেনা মহিলা বসে গল্প করছেন। সেই জন্যই প্রতাপকে অফিসের কাজকর্ম নিয়ে বাইরের ঘরে বসতে হয়েছে। সন্দেশের প্যাকেটটা সে রান্নাঘরে রেখে দিল।

খানিক বাদে বাথরুম থেকে জামা-কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে সে দেখলো, বাবা ফিরে গেছেন নিজের ঘরে, সেখানে মায়ের সঙ্গে বাবার কী নিয়ে যেন উষ্ণ বাদানুবাদ চলছে। এখন আর চিঠিটা হাতে নিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। খিদে পাচ্ছে অতীনের, এখন কাকেই বা সে খাবার কথা বলবে, পিসিমা তো রাত্তিরে আর রান্নাঘরে ঢোকেনই না, তুতুল চলে যাবার পর তিনি কেমন যেন ঝিম মেরে গেছেন। অতীন নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে একটা বই খুললো।

ঠিক এক পাতা পড়ার পর মুন্নি এসে বললো, এই ছোড়'দা, মা তোমাকে ঐ ঘরে ডাকছেন। বিছানা থেকে ওঠবার আগে অতীন মুন্নিকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললো, অ্যাই মুন্নি, আমার ঘরের এই ক্যালেন্ডারটা তোর খুব ভালো লাগে বলেছিলি, যা, নিয়ে যা।

মুন্নি বিনা বাক্যব্যয়ে দেয়াল থেকে ছ'খানা বিখ্যাত বিদেশী চিত্রকরদের ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারটি খুলতে লাগলো। ছবি আঁকার দিকে মুন্নির খুব ঝোঁক। ছোড়দা কেন এই ভালো ক্যালেন্ডারটা তাকে দিয়ে দিচ্ছে, তা সে জানে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি হাতে নিয়ে অতীন গেল মায়ের ঘরে। প্রতাপ বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে একটি সিগারেট ধরিয়েছেন, তাঁর গেঞ্জি পরা বুকখানি বেশ প্রশস্ত। প্রতাপের শরীরের গড়নটি চওড়া ধরনের, তাঁর উচ্চতাও সাধারণ বাঙালীর তুলনায় ভালোই। মমতা বসে আছেন খাটের পাশের একটি চেয়ারে। এখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহের কোনো চিহ্ন নেই।

প্রতাপ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলেন, মমতা জিজ্ঞেস করলেন, তুই এই চাকরিটা নিবি ঠিক করেছিস, বাবলু?

অতীন বললো, বাঃ, নেবো না? চাকরি কি সহজে পাওয়া যায়?

-কেন, কলকাতায় চাকরি...আর দু'দিন অপেক্ষা করলে পাওয়া যেত না?

-কাগজে বিজ্ঞাপন দেখো না, সবাই অন্তত চার-পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স চায়। এক্সপেরিয়েন্স কি এমনি এমনি হবে?

-এক্ষুনি চাকরিতে ঢোকার জন্য তাড়াহুড়ো করার কী ছিল তোর? কোয়ালিফিকেশান বাড়ালে লোকে ডেকে ডেকে চাকরি দেবে।

-মা, তোমাকে তো বলেইছি, বাড়িতে বসে থেকে শখের পিএইচ ডি করার একটুও ইচ্ছে নেই আমার।

প্রতাপ মুখ তুলে বললেন, ও তো যাবেই ঠিক করেছে, এখন আর এসব কথা বলে লাভ কী, মমো? ইচ্ছে যখন হয়েছে, বাইরে কিছুদিন থেকে আসুক না। একটা অভিজ্ঞতা হবে।

মমতা বললেন, ওখানে তুই কোথায় থাকবি তা ঠিক হয়েছে? কলেজ থেকে কি কোয়ার্টার দেয়?

অতীন বললো, না, কোয়াটার দেয় না, কয়েকজন অধ্যাপক মিলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেস করে থাকে, মানে যারা বাইরে থেকে গেছে, সেখানে থাকতে পারি, কিংবা আলাদা বাড়ি ভাড়া করেও থাকা যায়।

-তোর বাবা তো যেতে পারবেন না বলছেন। আমি তোর সঙ্গে যাবো তা হলে!

-তুমি যাবে, কেন? তোমরা পরে বেড়াতে যাবে, আমি যখন বাড়ি-টাড়ি ভাড়া নেবো

-বাঃ, তুই একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছিস,তোর জিনিসপত্র সব গুছিয়েস্টুছিয়ে দিয়ে আসতে হবে না? তুই কি আগে কখনো বাইরে থেকেছিস একা একা?

-তুমি কি পাগল হয়েছে মা? তুমি আমার জিনিস গুছিয়ে দিতে যাবে? ওখানকার সবাই হাসবে না? আমি কি ছেলেমানুষ? জিনিস গোছাবার আবার কী আছে? কত লোক বাইরে চাকরি করতে যাচ্ছে, তারা কি বাবা-মা'কে সঙ্গে নিয়ে যায়?

মমতা আড় চোখে তাকালেন প্রতাপের দিকে। বাবলুর বয়েসী ছেলেরা একা একা বাইরে গিয়ে থাকে, তা কি তিনি জানেন না? কিন্তু তাঁদের যে এই একটি মাত্র ছেলে! বাবলুটা শেষ পর্যন্ত সাঁতার শিখলোই না, হুট করে যদি জলে-টলে নামে...শিলিগুড়িতে কি পুকুর কিংবা নদী নেই? পরিবেশটা নিজের চোখে দেখলে, কাছাকাছি মানুষজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলে মমতা অনেকটা ভরসা পেতেন।

মমতা দৃঢ়ভাবে বললেন, তবু আমি যাবো তোর সঙ্গে!

অতীন বললো, মা, একটা কথা বলো তো, বাবারও তো একসময় মফস্বলে পোস্টিং ছিল, তখন কি ঠাকুদা-ঠাকুমা বাবার সঙ্গে যেতেন?

মমতা বললেন, তখনকার কথা ছিল আলাদা। চাকরির প্রথম বছরেই তোর বাবার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল!

মা ও ছেলের তকাতর্কির মাঝখানে বাধা দিয়ে প্রতাপ বললেন, তোমার এখন যাবার দরকার নেই, মমো! শিলিগুড়ি একটা শহর, সেখানে আরও পাঁচজনের সঙ্গে একসঙ্গে থাকবে, ও ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবে! বাবলু তো ঠিকই বলেছে, তোমরা কিছুদিন পরে বেড়াতে যেও!

বাবার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করলো অতীন। বাবা ঠিক বুঝেছেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছোলে অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে তার লজ্জায় মাথা কাটা যেত!

একটু বাদে নিজের ঘরে এসে অতীন তার জিনিসপত্র গোছাতে লাগলো। যদিও তার ‘ যাওয়ার অনেক দেরি। কত দিনের কত কাগজ জমে আছে, এক সময় সব কিছুই মনে হতো খুব জরুরী। এখন অনেকগুলোই ফেলে দেওয়া যায়। অলির চিঠি আছে কয়েকখানা। ওগুলো থাকবে। দাদার কবিতার খাতাটা? সে নিজে কবিতা বোঝে না, কৌশিক আর প্রভাতকে সে পড়িয়েছিল লেখাগুলো। দু’জনের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। কৌশিকের মতে ওগুলো নিতান্তই রোমান্টিক, বুর্জোয়া সেন্টিমেন্টের কবিতা, এখনকার এই কঠিন সংক্রান্তির সময়ে ঐ সব কবিতার কোনো মূল্য নেই। প্রভাতের মতে, কবিতাগুলোর মধ্যে ভাষার খুব জোর আছে, রোমান্টিক কবিতার আবেদন চিরকালই থাকবে, বিপ্লবের সঙ্গে রোমান্টিকতার কোনো বিরোধ নেই।

কৌশিকই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কৌশিক পরামর্শ দিয়েছে, ব্যক্তিগত স্মৃতি হিসেবে খাতাটা অতীন নিজের কাছে রেখে দিতে পারে, কিন্তু ঐ কবিতাগুলি ছাপানো এখন আদিখ্যেতার মতন মনে হবে। মৃতদের স্মৃতি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে নেই।

খাতাটা সে সঙ্গে নিয়ে যাবে, না এখানে রেখে যাবে, কিংবা আর কারুকে দেবে, সে বিষয়ে অতীন সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না। সে নিজে কবিতা সম্পর্কে আগ্রহী নয়, কিন্তু এই

কবিতাগুলির মধ্যে তার দাদা যেন এখনও জীবন্ত, দাদার নিজের হাতের লেখা! সে পাতা উল্টে উল্টে কবিতাগুলি পড়তে লাগলো। অধিকাংশ লাইনেরই মানে বোঝা যায় না।

টুনটুনি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, ছোড়দা, তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছো? খাতাটা বন্ধ করে রেখে অতীন বললো, চলে যাচ্ছি মানে কী? প্রত্যেক মাসেই একবার করে আসবো, এই ঘরটা আমারই থাকবে। খবরদার, আমার কোনো জিনিসে হাত দিবি না। এই নে, একটা কলম নিবি?

টুনটুনিকে চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। অতীন তাকে দু'একদিন পড়া দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, টুনটুনির পড়াশুনোর দিকে একেবারেই মন নেই। কী করে সে দেওঘর থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে এসেছে কে জানে!

কয়েকটা পুরোনো খাতা, একটা ছবির বই, এক গাদা পেন্সিল সে দান করে দিল টুনটুনিকে। অতীন জানে, টুনটুনি প্রায়ই তার ঘর থেকে পেন্সিল-কলম চুরি করে। এসব নিয়ে সে কী করে কে জানে?

যথারীতি অতীনের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে টুনটুনি। দুই উরু দিয়ে সে চেপে ধরেছে চেয়ারে বসে থাকা অতীনের কাঁধ। শারীরিক স্পর্শের জন্য সে যেন সব সময় কাঙাল। অতীন তাকে আর প্রশ্রয় দেয় না, তাকে বকুনি দিলেও সে শোনে না।

অতীন গলা চড়িয়ে ডাকলো, মুন্নি, এই মুন্নি।

টুনটুনি এবার খানিকটা সরে গেল। মুন্নি এসে দাঁড়াতেই অতীন জিজ্ঞেস করলো, এই, আমার অনেক খাতায় কিছু কিছু সাদা পাতা রয়ে গেছে দেখছি। তুই নিবি?

তারপরই হঠাৎ মনে পড়ার মতন সে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে মুন্নি, তোরা সাউন্ড অফ মিউজিক দেখিসনি? দারুণ বই! তুই আর টুনটুনি দেখে আয়।

মুন্নি বললো, আহা, আমাদের কে নিয়ে যাবে? মা কি একা একা যেতে দেবে? ফুলদি থাকতে তবু দু'একবার আমাদের নিয়ে গেছে। তোমার তো পাত্তাই পাওয়া যায় না!

-ঠিক আছে, আমি তোদের এটা দেখাবো। টিকিট কেটে হলে বসিয়ে দেবো, আবার ভাঙার সময় নিয়ে আসবো।

মুন্নি মুচকি হেসে বললো, ইস্! এখন চলে যাচ্ছে কি না, তাই হঠাৎ আমাদের জন্য দরদ উথলে উঠেছে। তোমার নিজের বুঝি দেখা হয়ে গেছে?

সত্যি সত্যি বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে বলেই অতীনের একটি কথা ভেবে সামান্য অনুতাপ হলো। ছোট বোনটাকে সে কখনো কিছুই দেয়নি। আসলে, ফুলদি থাকতে, মুন্নি ছিল পুরোপুরি তার চার্জে। মুন্নির কথা বলার ধরনটাও অনেকটা ফুলদির মতন।

সে বললো, বড় হয়েছিস, এখন একা একা চলাফেরা করতে শেখ! মুন্নি বললো, ছোড়দা, আমাকে শম্ভু মিত্রর অয়দিপাউসের টিকিট কিনে দিবি? ঐ নাটকটা আমার খুব দেখার ইচ্ছে।

-থিয়েটারের টিকিট তো অনেক দাম! আমি অত পয়সা পাবো কোথায়? মার কাছে চেয়ে দ্যাখ।

-মার কাছে চাইতে হবে না। টিকিটের দাম আমি দেবো, আমি রোজ পাঁচ পয়সা করে জমাই। আমার আর টুনটুনির জন্য দু'খানা টিকিট দশ টাকায় হবে না?

অতীন আর একটা ব্যাপার অনুভব করলো। সে এখান থেকে চলে গেলে এ বাড়িতে থাকবে টুনটুনি আর মুন্নির বয়েসী দুটি মেয়ে। এই বয়েসটা বিপজ্জনক। পাড়াটাও দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এ পাড়ায় একটা বখা ছেলের চোখ পড়েছে টুনটুনির ওপর, একদিন টুনটুনিকে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চেয়েছিল, অতীন তা টের পেয়ে ছেলেটার

কলার ধরে খুব কড়কে দিয়েছে। অতীন চলে যাবার পর আবার যদি ঐ ধরনের ছেলেরা বাড়াবাড়ি করে, তখন কে সামলাবে?

পরক্ষণেই এ চিন্তাটাকে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উড়িয়ে দিল। সব পরিবারেই কি ছেলে থাকে? এই সব ঘেঁদো কারণের জন্য কি কেউ বাইরে চাকরি করতে যাবে না? তাছাড়া, সে তো মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসবে।

অলির সঙ্গে সে দেখা করতে গেল পরদিন বেলা দশটায়। দোতলায় অফিস ঘরে সে আগে বিমানবিহারীকে খবরটা জানালো। বিমানবিহারী খুশি হলেন না। তাঁর মতে, শিলিগুড়ি অতি বাজে জায়গা। চীন যুদ্ধের পর নর্থ বেঙ্গলে যেমন আর্মির তৎপরতা বেড়েছে, তেমনি যত রাজ্যের ব্যবসায়ীরা গিয়ে ওদিকে ভিড় জমিয়েছে। ওখানে পড়াশুনার পরিবেশ নেই। তা ছাড়া, মফস্বলে একবার চাকরি নিলে আর সহজে কলকাতায় আসা যায় না। অতীনের উচিত ছিল একেবারে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই চাকরি শুরু করা। তার জন্য আর দু'তিন বছর অপেক্ষা করে পি-এইচ ডি-টা সেরে নিলে ক্ষতি কী ছিল? সে চাকরি না করলে তাদের সংসার চলছে না, এমন তো নয়! মফস্বলের মাস্টারিতে ক' পয়সাই বা মাইনে পাবে অতীন, তাকে আলাদা এস্টাব্লিশমেন্ট করতে হবে, নিজের খরচই কুলোতে পারবে কিনা সন্দেহ!

অতীন বিশেষ তর্ক করলো না, হুঁ-হাঁ দিয়ে উঠে গেল। সিঁড়িতে সে পেয়ে গেল বুলিকে। বুলি এখনও ফ্রক ছাড়েনি, শরীরটা বেশ মোটা হয়ে যাচ্ছে তার। অনেকে বলে, বুলির মুখখানা অলির চেয়েও অনেক সুন্দর, কিন্তু আইস ক্রিম আর চকলেট খেয়ে খেয়ে সে তার ফিগার ঠিক রাখতে পারছে না।

বুলি বললো, বাবলুদা, আমি আর দিদি আজ সন্ধেবেলা সাউন্ড অফ মিউজিক দেখতে যাচ্ছি, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে? চলো, চলো।

অতীন যে সিনেমাটা আগেই দেখে ফেলেছে, সে কথা শুনলে অলি অভিমান করবে। এটা এতক্ষণে খেয়াল হলো অতীনের। কাল সিদ্ধার্থ একবার বলতেই অতীন ছবিটা দেখতে

রাজি হয়ে গেল, তখন অলির কথা তার মনে পড়েনি। তবে, ছবিটা দেখতে দেখতে সে জুলি অ্যান্ড্রুজের মুখের সঙ্গে অলির মিল খুঁজে পেয়েছিল।

এখন মিথ্যে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। বুলির কাঁধে হাতে রেখে সে বললো, আমার যে এখন বড্ড কাজ, এখন সিনেমা দেখার একদম সময় নেই, আমি বাইরে চলে যাচ্ছি জানিস তো!

–কোথায়? তুমিও বিলেত যাচ্ছো?

–ভ্যাট! বিলেত যাবো কেন, আমি যাচ্ছি পাহাড়ে, শিলিগুড়িতে, কাছেই দার্জিলিং–

–আজই তো যাচ্ছে না। চলো না সিনেমায়।

আরও অনেক মিথ্যে কথা বলে ভোলাতে হলো বুলিকে। এদের বাড়িতে একটা সুবিধে আছে, দুই বোন সিনেমা দেখতে গেলেও কোনো পুরুষ সঙ্গী লাগে না। টিকিট কাটা হবে অনেক বেশি দামের, বাড়ির গাড়িতে আসবে-যাবে। এইসব বাড়ির মেয়েদের পাড়ার ছেলেরাও ঘাঁটাতে ভয় পায়।

অলির ঘরে তার বন্ধু বর্ষা বসে আছে। বিমানবিহারীর কথাগুলো শুনে অতীনের মনের মধ্যে একটা চাপা রাগ জমেছিল, বর্ষাকে দেখে তার আরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এই মেয়েটি তাকে পছন্দ করে না, অতীন বুঝতে পারে, সেও ওকে দেখতে পারে না। তবু এই বর্ষা কেন ঘনঘন আসে অলির কাছে?

মাথার চুলগুলো কাকের বাসা, শাড়িটা মোচড়ানো, চোখে একটা গোল নিকেলের ফ্রেমের চশমা, এ মেয়েটা যেন কিছুতেই একটুও সাজ-পোশাক করবে না ঠিক করেছে। পমপমও কোনোরকম মেকআপ নেয় না। কিন্তু পমপমের সঙ্গে এ মেয়েটির বেশ তফাত আছে। বর্ষা তার না-সাজাটাই সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়। কফি হাউসে অতীন

গুজব শুনেছে, এই বর্ষা নাকি সাঙ্ঘাতিক পুরুষ- বিদ্বেষী। মনীষ নামে একটা ছেলে এর সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিল, সকলের সামনে সে মনীষকে অপমান করেছে।

বর্ষার হাতে একটা সিগারেট, সে পা দোলাচ্ছে চেয়ারে বসে। অতীনের দিকে সে তাকালো, কিন্তু কোনো কথা বললো না। দেয়াল-আলমারি খুলে কিছু একটা খুঁজছিল অলি, মুখ ফিরিয়ে বললো, আচ্ছা বাবলুদা, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশানে কি আছে যে চাকরির ব্যাপারে ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে ডিসক্রিমিনেট করা যাবে?

বাবলু ভুরু কুঁচকে বললো, আমি কনস্টিটিউশান পড়িনি, কী আছে জানি না। তবে অনেক চাকরি আছে, যেমন আর্মি, পুলিশ, দমকল, সেখানে কি আর মেয়েদের নিতে পারে? কেন, কী হয়েছে?

-পুলিশ, দমকল নয়। এই বর্ষা একটা সিগারেট কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভ ট্রেইনীর পোস্টে অ্যাপ্লাই করেছিল। ও তো নামের আগে মিস বা শ্রীমতী লেখে না, তাই ওর নাম দেখে বুঝতে পারেনি, ইন্টারভিউতে কল পেয়েছিল, ও হাজির হবার পর ওরা বললো, ঐ পোস্টে মেয়েরা এলিজি নয়। ওর ইন্টারভিউ নিলই না। এটা অন্যায় নয়?

অতীন অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, ঐ সিগারেট কম্পানি... ও তো মাল্টিন্যাশনাল কম্পানি, ওরা যা খুশি করতে পারে। ওখানে চাকরির অ্যাপ্লাই করবারই বা কী মানে হয়?

বর্ষা বললো, ওরা মাইনে বেশি দেয়। চাকরি তো টাকার জন্যই। যেখানে বেশি টাকা দেয়

বর্ষার হাতের সিগারেটের গন্ধ পেয়ে অতীনেরও সিগারেটের তেষ্টা পেয়ে গেল, কিন্তু বর্ষা এখানে বসে সিগারেট টানছে বলেই তার ধরাতে ইচ্ছে করলো না। দু'জনে একসঙ্গে সিগারেট টানলে যেন কিছুটা বন্ধুত্ব দেখানো হয়ে যায়। অলির আগে সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে খুব আপত্তি ছিল।

অলি বললো, বাবলুদা, বর্ষা চাইছে চাকরির ব্যাপারে মেয়েদের ওপর যে অবিচার করা হয়, তাই নিয়ে একটা আন্দোলন করতে। মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিগুলোর এরকম আস্পর্ধা হবে কেন?

অতীন বললো আন্দোলন মানে তো খবরের কাগজে চিঠি লেখা?

জানলার কাছে গিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে রইলো। এই মেয়েটা কি উঠবে না? মেয়েটা এত সিগারেট খায় বলেই কি সিগারেট কম্পানিতে চাকরির জন্য এত আগ্রহ। সমাজ ব্যবস্থাটা গোটাটাই বদলাতে না পারলে যে এসব কিছুই বদলানো যায় না। সেটুকু বোঝার মতন বুদ্ধিও এদের নেই।

বর্ষা আর অলি কী সব কথা বলছে, অতীন ঘুরে তাকিয়ে বললো, অলি, তোর সঙ্গে আমার বিশেষ একটা কথা আছে।

স্পষ্ট ইঙ্গিত। অলির মুখটা লালচে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাবার জন্য সে বললো, বাবলুদা, জানো, আমাকে ফুলদি একটা চিঠি লিখেছে, গ্লাসগো থেকে। এত সুন্দর চিঠি–

অতীনের ভুরু কুঁচকে গেল। ফুলদি চিঠি লিখেছে অলিকে? বাড়িতে ফুলদির দু'খানা চিঠি এসেছে এর মধ্যে। তার মধ্যে বাবলুর নামে আলাদা কোনো চিঠি নেই। যাওয়ার কয়েকদিন আগে ফুলদির সঙ্গে সে ঝগড়া করেছিল। তা বলে ফুলদি তাকে এক লাইনও চিঠি না লিখে অলিকে চিঠি লিখলো?

এরকম ইঙ্গিত পেয়েও বর্ষা এখনো উঠছে না। সমানে পা দুলিয়ে চলেছে। অতীনের সঙ্গে চোখচোখি হতেই বর্ষা হাসি মুখে বললো, আমি এখন যাচ্ছি না। আমি আগে এসেছি, আমার কাজ না হলে আমি যাবো কেন?

অলি বললো, বাবলুদা, তুমি একটু পরে আসবে? বর্ষা এখন মেয়েদের অর্গানাইজেশন তৈরি করতে চায়, সেই নিয়ে কথা বলতে এসেছিল, আমরা একটা নামের লিস্ট করছি... তুমি দুপুরে একবার আসতে পারবে না? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

অলি যে নিছক ভদ্রতা করেই বর্ষাকে উঠতে বলতে পারছে না, তা অতীন বুঝলো না। সে ওসবের ধার ধারে না। শুধু শিলিগুড়ির চাকরি না, সে অলির সঙ্গে টুনটুনির বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছিল। সে অলিকে একটা স্বীকারোক্তি দিতে চায়। আর কদিন বাদেই সে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে। এখন অলি এই ফেমিনিস্ট মেয়েটাকে নিয়ে মত্ত?

আর একটাও কথা না বলে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অলিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো, অতীনের একটা বাহু ছুঁয়ে সে বললো, এই বাবলুদা, তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছো নাকি? তুমি দুপুরবেলা আসবে তো?

রাগের সময় অতীনের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। যে কথা সে বলবে বলে এসেছিল, তার বদলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ অন্য কথা! সে বেশ জোরে জোরে বললো, তোর বাবা আমাকে কী মনে করে বল তো? আমি কি এ বাড়ির চাকর? তোর বাবা আমার গলায় চেন দিয়ে বেঁধে কলকাতায় ধরে রাখতে চায়?

অলির মুখখানা শুকনো পদ্মপাতার মতন হয়ে গেল। তার বাবার সম্পর্কে এমন কঠোর কথা সে বাবলুদার মুখে কখনো শোনেনি। আবার একথাও ঠিক, কাল তার বাবাও বাবলুদা সম্পর্কে অলিকে কিছু কথা শুনিয়েছেন। বাবলুদার কিছু কিছু কার্যকলাপ বাবার পছন্দ হচ্ছে না।

অসীম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অতীন বললো, তোদের বাড়িতে আর আমার আসতেই ইচ্ছে করে না! আসবো না আর কোনোদিন।

৬৪ ট্রেন সাড়ে চার ঘণ্টা লেট

ট্রেন সাড়ে চার ঘণ্টা লেট, তবু অতক্ষণ স্টেশনের প্লাটফর্মে ঠায় বসেছিলেন মানিকদা। মুখে একটুও বিরক্তির চিহ্ন নেই, অতীন ও কৌশিককে তিনি জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। মানিকদার স্বাস্থ্য এখন অনেকটা ভালো হয়েছে, খাঁকি প্যান্টের ওপর জমকালো একটা সবুজ রঙের কোট পরেছেন।

কৌশিক প্রথমেই হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, মানিকদা, আপনি এই অদ্ভুত কোটটা কোথা থেকে পেলেন?

মানিকদা বললেন, একজন নেপালী ড্রাইভারের কাছ থেকে খুব সস্তায় কিনেছি রে! কেন, খারাপ হয়েছে? এখানে গ্রামের দিকে খুব শীত পড়ে। অতীন, তুই গরম জামা-টামা এনেছিস তো?

অতীন আর কৌশিক দু'জনেই পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর শাল জড়িয়ে এসেছে, কৌশিকের সঙ্গে শুধু কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। অতীনের সঙ্গে টিনের সুটকেশ ও বেডিং, মা জোর করে বেডিংটা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে ওরা এক রাউণ্ড চা খেয়ে নিল, তারপর স্টেশনের বাইরে এসে দুটো সাইকেল রিকশা ধরলো।

মানিকদা অতীনের পাশে বসে বললেন, কি রে, প্রথম বাড়ি ছেড়ে বাইরে চাকরি করতে এসেছিস, মন কেমন করছে না তো?

অতীন কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাড়ির কথা মনে পড়লো না, মনে পড়লো অলির মুখ। আসবার আগে সে অলির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এসেছে। আজই অলিকে একটা চিঠি লিখতে হবে।

অতীন বললো, এ চাকরিটা না পেলেও আমি এদিকে চলে আসতুম। নর্থ বেঙ্গল আমাকে টানছিল।

-বেশির ভাগ বাঙালী ছেলেদেরই কলকাতা-রোগ আছে। কলকাতায় চাকরি চাই। কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। এমনকি আমি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির ছেলেদেরও দেখেছি, কোনো রকমে কলকাতায় যে-কোনো একটা চাকরি পেলেই যেন বর্তে যায়! কলকাতাটা তো দিন দিন একেবারে জঘন্য হয়ে যাচ্ছে। এখানে কী টাটকা হাওয়া!

-মানিকদা, আমার জয়েনিং ডেট কালকে, আমরা কি এখন কোনো হোটেলে উঠবো? মানিকদা হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, হ্যাঁরে, হোটেলেই উঠবি, মানিক ঠাকুরের হোটেল। চল না, গিয়ে দেখবি। এই রিকশা, ডাইনে, ডাইনে, অত জোরে নয়, একটু আস্তে আস্তে চলো ভাই-।

অনেকগুলো গলি ঘুরে ঘুরে রিকশা থামলো একটা ফাঁকা মতন জায়গায়। একটা এঁদো পুকুরের ধারে একতলা বাড়িতে ঢুকলেন মানিকদা। সে বাড়িটাতে টিনের চাল। সামনে কয়েকটা জবা ফুলের গাছ, এক পাশে একটা বেশ বড় চালতা গাছ, তাতে চালতা ফলেও আছে।

মানিকদা হাঁকডাক করতেই বাড়ির ভেতর থেকে যে দু'জন বেরিয়ে এলো, তাদের দেখে অতীন অবাক। তপন আর পমপম! তপনের মুখে একগাল হাসি আর পমপম ভুরু নাচিয়ে বললো, কীরে, কীরকম সারপ্রাইজ দিলুম!

মানিকদা বললেন, এই বাড়িটাতে তিনখানা মোটামুটি বড় রুম আছে, ভাড়া মাত্র এইট্টি ফাইভ রুপিস। নিজেরা রান্না করে খাই, খুব সস্তা পড়ে। অতীন, তোরা এখানে থাকতে পারবি না?

অতীন দারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তাদের কলকাতার স্টাডি সার্কেল উঠে গেছে, মানিকদা কি এখানে আবার সেই স্টাডি সার্কল বসাতে চান? মানিকদার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা হবে, এটাই তো দারুণ আনন্দের ব্যাপার।

মানিকদা বললেন, দ্যাখ না, একে একে আরও অনেককে টেনে আনবো এদিকে। তপন এখানে ইনসিওরেন্স অফিসে কাজ পেয়েছে, ওর হিল্লে হয়ে গেছে। পমপমের জন্যও যদি একটা মাস্টারি-ফাস্টারি জোগাড় করা যায়।

পমপম বললো, আমার জন্য তোমায় চাকরি খুঁজতে হবে না, মানিকদা। আমি আমার থাকা-খাওয়ার খরচ এমনিই দিতে পারবো।

কৌশিক বললো, ইস আমারও যে লোভ হচ্ছে মানিকদা। কিন্তু আমাকে ফিরে যেতে হবে।

পমপম বললো, আমাকেও ফিরতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝেই আসা যেতে পারে। মোটে এক রাতের জার্নি।

বাড়ির ভেতর দিকে একটা ঢাকা বারান্দা, তারই এক পাশে রান্না ঘর। সামনের উঠোনে লঙ্কা ও বেগুন গাছ অনেকগুলো। সেখানে নেমে মানিকদা গাছগুলোতে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, দেখেছিস, আমাদের ভেজিটেবিল গার্ডেন? লঙ্কা তো কিনতেই হয় না, বেগুনগুলোও কিছুদিনের মধ্যেই বড় হয়ে যাবে। তপন গ্রামের ছেলে, ও এসব পারে ভালো। তপন রাঁধেও চমৎকার। আমিও খারাপ রান্না শিখিনি, কী বল পমপম? কাল তোদের কেমন আলুর দম খাওয়ালুম?

পমপম চায়ের জল বসিয়ে দিল। তপন বললো, আজ তাহলে বাজার থেকে মাছ নিয়ে আসি? নতুন গেস্টদের অনারে ...

মানিকদা বললেন, এখানে গেস্ট কেউ না। সবাইকে পয়সা দিয়ে খেতে হবে। আগেই ওদের বলে দিয়েছি, এটা মানিক ঠাকুরের হোটেল। আমরা এখানে মাছ-মাংস বিশেষ খাই না, বুঝলি অতীন, তাতে খরচ অনেক কম পড়ে। তবে, আজ একটু মাছ খাওয়া যেতে পারে। শীতকালে এখানে ভালো রুই ওঠে।

কৌশিক বললো, আমি মাছ কেনার পয়সা দিচ্ছি। আজ ভালো করে মাছ খাওয়া হোক।

অতীনের মনে হলো, সে যেন একটা পিকনিকের মধ্যে এসে পড়েছে। বারান্দায় বসে গল্প করতে করতে সবাই নানারকম কাজ করতে লাগলো। অতীনকেও দেওয়া হলো আলু ও পেঁয়াজের খোসা ছাড়াবার ভার। এইরকম কাজ অতী জীবনে কখনো করেনি। পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে তার চোখ একেবারে কান্নায় মাখামাখি!

দুপুরবেলা খাওয়ার পর কিছু কাজের কথা হলো। মানিকদা বললেন, স্টাডি সার্কেলের আর দরকার নেই। এবারে নেমে পড়তে হবে মাঠে, দেশের সত্যিকারের মানুষের মধ্যে। এখানকার মহকুমার কিষাণ সভার সেক্রেটারি জঙ্গল সাঁওতালের সঙ্গে মানিকদার অনেক আলোচনা হয়েছে। চারুবাবুর সঙ্গেও দেখা হয় প্রায়ই। শিগগিরই ভূমি দখলের লড়াই শুরু হবে। মার্কসবাদী কমুনিস্ট পার্টি জোতদারের জমি কেড়ে নেবার প্রোগ্রাম নিয়েছে, আপাতত কাজ চলবে সেই প্রোগ্রাম অনুসারে। দিকে দিকে কিষাণ সভার ঝাণ্ডা উড়িয়ে নাস্তানাবুদ করে দিতে হবে কংগ্রেস সরকারকে।

রাত্রে ট্রেনে ভালো করে ঘুম হয়নি, অতীনের চোখ ঢুলে আসছে, পমপম চিমটি কেটে জাগাবার চেষ্টা করছে তাকে। তবু সে চোখ খুলে রাখতে পারছে না। মানিকদা দেখতে পেয়ে বললেন, অতীন, তুই একটু ঘুমিয়ে নে বরং। কৌশিক, তুই-ও যা।

কৌশিক বললো, আমার ঘুম পায়নি।

সঙ্গে সঙ্গে অতীনের শরীরে যেন বিদ্যুতের শক্ লাগলো। কৌশিক আর সে একই সঙ্গে রাত জেগে এসেছে, অথচ কৌশিকের এখন ঘুমের দরকার নেই, তার ঘুম পাচ্ছে? সে কি কৌশিকের থেকে দুর্বল? বাইরে গিয়ে অতীন দু'চোখে জলের ঝাঁপটা দিল তো বটেই, দশবার ওঠ-বোস করে নিল ঘুম তাড়াবার জন্য।

সন্ধেবেলা রান্নার ট্রেনিং দেওয়া হলো অতীনকে। সে কোনোদিন এক কাপ চা-ও বানায়নি, কী করে ডিম সেদ্ধ করতে হয়, তাও জানে না। কেমিস্ট্রির ভালো ছাত্র হলেও কোন রান্নায় কী কী মশলা লাগে সে সম্পর্কে তার ধারণা নেই বিন্দুমাত্র।

পমপম হাতে ধরে ধরে ভাতের ফ্যান গালা শেখাতে লাগলো অতীনকে। তার কানে ফিসফিস করে বললো, বিপ্লবীকে সব কিছু শিখতে হয়!

পমপম সচরাচর হাসে না, সব কথাই ধ্রুব সত্য হিসেবে বলে। বিপ্লবী শব্দটা শোনামাত্র রোমাঞ্চ হলো অতীনের, পর পর দৃশ্য মনে পড়ে গেল অনেকগুলো। ফিনল্যাণ্ডে আত্মগোপনকারী লেনিন...অরোরা জাহাজ থেকে কামান গর্জন...মাও সে তুঙ, ফিদেল কাস্ট্রো...। এতদিন তারা ছিল রাজনৈতিক কর্মী, এই প্রথম বিপ্লবী কথাটা উচ্চারণ করল পমপম। সত্যি শুরু হবে বিপ্লব? অতীনের একটু একটু গ্লানি বোধ হচ্ছে, সে যেন ঠিক খাঁটি বিপ্লবী নয়। আজ সারাদিনই বারবার তার মনে পড়ছে অলির কথা, অলির মনে সে ব্যথা দিয়ে এসেছে, অলির সেই বিহ্বল দুটি চোখ...। প্রকৃত বিপ্লবীর কি এইসব দুর্বলতা থাকা উচিত?

পমপমকে সে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে আমাদের আর্মসের ট্রেনিং নেবার দরকার নেই? আমি জীবনে কোনোদিন কোনো বন্দুক রিভলভার ছুঁয়েই দেখিনি। তুই তো তবু ওসব চালাতে জানিস?

পমপম বলল, আর্মড স্ট্রাগল ছাড়া কোনো বিপ্লবই হতে পারে না। তবে সেটা আর একটু পরের স্টেজ। এখন জমি দখলের লড়াইয়ে গ্রামের লোকের যে সব ট্রাডিশনাল ওয়েপনস্ থাকে, লাঠি টাঙ্গি দা কুড়োল সেই সবই কাজে লাগাতে হবে। মানিকদা বললেন, এটাই চারুবাবুর থিয়োরি!

–পমপম, তুই কি সঙ্গে পিস্তলটিস্তল কিছু এনেছিস? একবার আমাকে দিবি, একটু ধরে দেখব?

যেন সে অতীনের চেয়ে বয়েসে বড়, এরকম একটা ভাব করে পমপম। তার কাছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র আছে কি নেই তা খোলাখুলি স্বীকার না করে সে অতীনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, হবে, হবে! সময় মতন সব কিছু পাবি।

তারপরই সে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে অতীন, মনে কর তুই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলি। তারপর অন্য সবার নাম-ধাম খবরাখবর তোর পেট থেকে বার করবার জন্য পুলিশ তোকে টচার করবে, তখন তুই তা সহ্য করতে পারবি? প্রত্যেক বিপ্লবীর এটা একটা কঠিন পরীক্ষা।

-ওরা গায়ে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়, তাই না?

-শুধু কি ঐ একরকম! আমাদের বাড়িতে তো অনেক পলিটিক্যাল সাফারার আসে, এমনকি ফর্টি সেভেনের আগে ব্রিটিশের হাতে যারা টচারড হয়েছে তাদের অনেককে দেখেছি ছেলেবেলা থেকে, তাদের মুখে জেলের গল্প শুনেছি, এক একটা পুলিশ অফিসার হয় চূড়ান্ত সেডিস্ট, আসামীকে যন্ত্রণা পেতে দেখে হা-হা করে হাসে। আর যন্ত্রণা দেবার কত যে কৌশল... তোর ওপর দু'একটা ট্রাই করবো, দেখবি তুই সহ্য করতে পারিস কি না?

অতীন সম্মতি জানাবার আগেই পমপম তার একদিকের জুলপি ধরে এমন জোরে টান মারলো যে অতীন আঁতকে উঠে আ-আ-আ চিৎকার করে উঠলো। সেই চিৎকার শুনে মানিকদারা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। মানিকদা জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো, কী হলো?

অতীন বললো, এই পমপমটা কি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর, আর একটু হলে মেরে ফেলেছিল আর কি!

পমপম বলল, বাচ্চা ছেলে একটা! একটু জুলপি ধরে টেনেছি, তাতেই এত চিৎকার। পুলিশ যখন আসল টচার করবে, তখন জুলপি পটপট করে ওপড়াবে, তখন কী করে সহ্য করবি?

-সে তখন দেখা যাবে। সত্যি সত্যি কিছু গোপন করার কথা থাকলে তবে তো সহ্য করার প্রশ্ন ওঠে! এখন কী আছে!

মানিকদা বললেন, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম চিৎকার শুনে। ভাবলুম কাঁকড়া বিছে-টিছে কামড়ালো নাকি! একবার একটা বিছে বেরিয়েছিল, সাবধানে থাকিস!

আড্ডা চললো অনেক রাত পর্যন্ত। অতীন শুধু ভাত রান্না করেছে। প্রথম দিনের পক্ষে সে ভাত একেবারে আদর্শ বলা যায়। খাওয়া শেষ হলো পৌনে বারোটায়, তারপর শুতে শুতে রাত দুটো। কৌশিক আর সে এক ঘরে শুয়েছে, কৌশিক ঘুমিয়ে পড়ার পরেও তার ঘুম আসছে না। ঘুম চটে যাওয়া বলে একে। দুপুরের ঘুম পাওয়াটাকে সে সম্মান করেনি বলে রাত্তিরেও আর ঘুম আসবে না সহজে।

অন্ধকারে ভাসছে অলির মুখ। সারাদিনে এক মুহূর্ত নিরিবিলি সময় পাওয়া যায়নি, তাই অলিকে চিঠি লেখা হয়নি। এখন লেখা যায়। কিন্তু আলো জ্বেলে চিঠি লিখতে গেলে কৌশিক জেগে যেতে পারে, সে ঠাট্টা করবে।

সত্যি সারা রাত আর ঘন ঘুম হল না অতীনের, ভোরের আলো ফুটতেই সকলের আগে সে জেগে উঠলো। তাড়াতাড়ি সে চোখ ধুয়ে এসে বসে গেল চিঠি লিখতে।

প্রথম চিঠিখানা লিখলো মাকে। মোটামুটি এই জায়গাটার বর্ণনা দিল, মানিকদার কথা, পমপমের কথা, এমনকি তার ভাত রান্নার বিরাট সার্থকতাও বাদ গেল না। খাওয়া-থাকার সত্যিই কোনো অসুবিধে নেই এখানে, সে বিষয়ে মিথ্যে কথা বলতে হলো না। মা যে মশারি কিনে দিয়েছে, সেটা খুব কাজে লেগে গেল। কলকাতায় বাবলু কখনো মশারির নিচে শোয়নি।

মায়ের চিঠি হলো দু পাতা। তারপর দ্বিতীয় চিঠি :

আলি,

বদমেজাজী মানুষেরা নিজেদের যেমন ক্ষতি করে, অন্যদেরও তেমন ক্ষতি করে। অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়। এসব আমি জানি, কিন্তু এক এক সময় জ্ঞান থাকে না। সেদিন তোর বাবার...

একটু থেমে, চিন্তা করে অতীন তোর বাবার কেটে লিখলো, জ্যাঠামশাই।

সেদিন জ্যাঠামশাই আমাকে যে-সব কথা বললেন, তা আমি মোটেই পছন্দ করিনি, যদিও তাঁর মুখে মুখে কোনো উত্তর দিইনি। আমি ছেলেমানুষ নই, আমার ভবিষ্যৎ আমি নিজেই ঠিক করবো। আমার বাবা আমার কোনো কাজে বাধা দেন না। যাই হোক, সেদিন তোর সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করেছি, সেজন্য পরে খুব লজ্জা পেয়েছি। তোর সঙ্গে অনেক কথা ছিল, কিন্তু আসবার আগে আর দেখাই হলো না।

এখানে একটু গুছিয়ে বসি, তারপর তোকে আবার লিখবো।

ইতি-

বাবলুদা

চিঠিখানা দু'বার পড়লো সে। খুব ছোট হয়ে গেল। নিজেই বুঝতে পারলো, চিঠিটা বড়ই সাদামাটা আর রসকষহীন। কিন্তু আর কী লেখা যায়? মাকে যে-সব কথা লিখেছে, সেগুলোই আবার অলিকে লিখতে ইচ্ছে করছে না। কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর একজন জেগে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি পুনশ্চ দিয়ে লিখলো, অলি, তোর বিষণ্ণ মুখখানা প্রায় সব সময়েই মনে পড়ছে।

চিঠির কাগজ একটা বই দিয়ে চাপা দিতেই পমপম এসে দাঁড়ালো সেখানে। ঘুমের পর মানুষের মুখখানা বোধ হয় একটু ফোলা ফোলা দেখায়। পমপমের মাথার চুল সব খোলা,

শাড়িটা আলগা ভাবে শরীরে জড়ানো। অন্য সময় পমপম যে মেয়ে তা সব সময় খেয়াল থাকে না। এখন তাকে নারী বলে মনে হচ্ছে। মুখখানা বেশ কোমল।

–এত ভোরে উঠে কী করছিস রে, অতীন? পড়ছিস?

–চিঠি লিখছি। মাকে কথা দিয়েছিলাম–

–অলিকে লিখবি না?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে পমপমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অতীন। পমপমের কোমরের খাঁজ যে এত সুন্দর, তা আগে কোনোদিন চোখে পড়েনি। সে পম্‌পমকে কখনো এই। ভাবে দেখেনি। পমপমের নাভিটা যেন কুয়াশার মধ্যে একটু একটু দেখা চাঁদের মতন।

আশ্চর্য, অলিকেই ভালোবাসে অতীন, অলিকেই সে চায়, তবু পপমের নাভি ও কোমরের খাঁজের দিকে তার বারবার তাকাতে ইচ্ছে করছে কেন? কেন সে টুনটুনির বুকে হাত রেখেছিল? এগুলো কি সত্যিই অন্যায়? এ বিষয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। কৌশিককে জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি, কৌশিক বড্ড থিয়োরিটিক্যাল কথা বলে।

হয়তো পপমের সঙ্গেই এ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করা যেতে পারে। অতীন আর একবার মুগ্ধ চোখে পপমের কোমরের দিকে তাকালো।

পমপম তার চুল হাতে জড়িয়ে একটা গিট বাঁধছে। মুখের নরম ভাব কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এবার সে সারাদিনের জন্য তৈরি হবে। সে অন্যমনস্ক ভাবে বললো, অলি মেয়েটা বেশ ভালো। তবে বাবা-মায়ের বড় আদুরে। একটু স্পয়েল্‌ট!

বাথরুমের দিকে চলে গেল পম্‌পম। কেন যেন একটা অপরাধ বোধ জেগেছে অতীনের মনে, সে ঝিম মেরে একই জায়গায় বসে রইলো অনেকক্ষণ।

খানিকটা বেলা হতে কলেজে গিয়ে জয়েনিং রিপোর্ট দিয়ে এলো অতীন। কলেজ এখন ছুটি। আমাগীকাল জেনারাল ইলেকশান। শিলিগুড়ি শহরে ইলেকশানের কোনো টেম্পোই নেই। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টারে দ্বিপাক্ষিক গলাবাজি আছে ঠিকই, কিন্তু সবই যেন নিয়মরক্ষা। কংগ্রেসের বুড়োগুলো আবার এসে বসবে গদি আঁকড়ে, অপোজিশানের শুধু গলাবাজিই সম্বল। বড়জোর মাঝে মাঝে বন্ধ ডাকবে। রাবিশ!

তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে মানিকদা সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শিলিগুড়ি শহরটা লম্বাটে, এত দোকানপাট আর কোনো মফস্বল শহরে দেখা যায় না। সাইকেল রিকশা ও লরিতে সব সময় রাস্তা জ্যাম। শহর ছাড়িয়ে জলপাইগুড়ির রাস্তায় এসে পড়ার পর বেশ ভালো লাগলো অতীনের। শীতের ফিনফিনে হাওয়া বইছে, পরিষ্কার আকাশ।

ওরা রিকশা নেয়নি, হাঁটছে পাশাপাশি। পপমের শরীরটা এখন আবার সরলরেখার মতন, মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। হাঁটাতে তার ক্লান্তি নেই, হাঁটতে হাঁটতে সে মানিকদার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। অনর্গল। তপনকে কিছু একটা বোঝাচ্ছে কৌশিক, অতীন একা একটু পেছনে।

জোরে ছুটে আসা একটা লরি একটা ধুলোর ঝড় ছুঁড়ে দিয়ে গেল ওদের ওপরে। ওদের রাস্তার পাশে নেমে পড়তে হলো। লরিটার গতি দেখে ভয় পেয়ে একটা গরুর গাড়িও নেমে পড়েছে মাঠে। সে জায়গাটা অনেকটা ঢালু, গাড়োয়ান ছপটি মেরে মেরেও গরুদুটোকে তুলতে পারছে না। কৌশিক বললো, আয়, আমরা হাত লাগিয়ে গাড়িটাকে তুলে দিই।

গাড়িটার মাঝখানে বসে আছে একটি মাঝবয়েসী লোক, গায়ে একটা শাল জড়ানো। ওর হাতের আঙুলে অনেকগুলো আংটি, ডান বাহুতে একটি রূপোর তাগা, মুখে মিটিমিটি হাসি। এতগুলি ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে একটা গরুর গাড়ি ঠেলায় হাত লাগিয়েছে দেখে সে যেন বেশ মজা পেয়েছে।

জোরে দু'বার ধাক্কা দিতেই গাড়িটা উঠে গেল রাস্তায়, তারপর তড়বড়িয়ে ছুটতে লাগলো।

পমপম বললো, ঐ লোকটা কী অসভ্য! আমরা গাড়ি ঠেলছি, তবু ও ওপরে বসে রইলো, নামলো না?

তপন বললো, ঐ লোকটা একাই তো গাড়িটাকে ঠেলে তুলতে পারতো, তা না, ওজন বাড়িয়ে বসে রইলো!

মানিকদা বললো, আমরা সাহায্য করেছি, গরুদুটো আর গাড়োয়ানের জন্য। ঐ লোকটাকে আগে লক্ষ করিনি, ওকে চিনি আমি, ব্যাটা এক জোতদার। নামে-বেনামে অনেক জমি। ওর জমি দখল করবার কথা আছে, দাঁড়াও না, মার্চ মাসটা পড়ক, ঠ্যালা বুঝবে! মোটামুটি ঠিক আছে যে থার্ড মার্চ থেকে অ্যাকশান শুরু হবে।

তপন বললো, মানিকদা, জমি দখল করতে গেলে পুলিশ বাধা দেবে না? জোতদারদের তো নিজস্ব লাঠিয়াল থাকে।

মানিকদা বললেন, আমরাও তৈরি হয়ে যাবো। ভূমিহীন কৃষকরা এখন মরীয়া হয়ে উঠেছে! সাঁওতালরা তাদের হাতিয়ার নিয়ে যাবে, তাদের বলাই হয়েছে যে দরকার হলে মারতে হবে, মরতে হবে। পুলিশ তো জোতদারদের হেল্প করতে আসবেই, এবারে সরাসরি কনফ্রনটেশান হবে পুলিশের সঙ্গে।

অতীন যেন চোখের সামনে দেখতে পেল দৃশ্যটা। মাঠের মধ্যে ছুটছে দলে দলে মানুষ,, লাঠি নিয়ে তাড়া করছে পুলিশ, পুলিশের মাথাতেও ইট-পাথর পড়ছে, এবার পুলিস বন্দুক তুলেছে, কোথাও একটা বোমা ফাটলো, অতীনের হাতে ফ্ল্যাগ, একটা গুলি লাগলো তার কাঁধে, মাটিতে পড়ে যাবার আগে সে ঝাণ্ডাটা তুলে দিচ্ছে কৌশিকের হাতে...।

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে অতীন ভাবলো, তার মা বাবা ঘুণাক্ষরেও জানেন না, অতীন, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে শিলিগুড়ি এসেছে। এখানে পুলিশের গুলিতে যদি সে সত্যিই

একদিন মরে যায়? সে এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ছে কেন? কলেজের চাকরি নিয়েই খুশী থাকতে পারতো, হাজার হাজার ছেলে এম এসসি পাশ করে যা করে, সেও যেতে পারতো সেই লাইনে। তা না গিয়ে সে যে বিপদের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, তার কারণ সে কি সত্যিই বিপ্লবী হতে চায়? সে কি দেশটাকে বদলাতে চায়, শ্রমিক-কৃষকের রাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে রাজি আছে? অথবা সে এসব কিছু করছে শুধু মানিকদার কথা শুনে, মানিকদার মুখ রক্ষা করার জন্য? মানিকদাকে সে নিজের দাদার মতন মনে করে, এতদিন মিশেও সে মানিকদার চরিত্রে কোনো খাদ দেখতে পায়নি, মানিকদার কথায় সে অনায়াসে প্রাণ দিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু তার প্রাণ কি সম্পূর্ণ তার নিজের? তার দাদা আগে চলে গিয়ে তাকে এমন একটা বন্ধনে জড়িয়ে গেছে, সেটা থেকে সে বেরুবে কী করে?

৬৫ শহরের সমস্ত লোক

শহরের সমস্ত লোক যেন বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে সন্ধেবেলা। সকলেরই মুখে বিস্ময়। এ কি সত্যি, এ কি সম্ভব?

সাধারণ মানুষ ভোটের ফলাফল নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। সেই তো থোড়বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-ঘোড়। এর চেয়ে আর উনিশ-বিশ কী হবে? কংগ্রেসের দু-চারটে আসন কমবে কিংবা বাড়বে, এ ছাড়া তো আর কিছু না!

দুপুর থেকেই হঠাৎ রটে গেল যে কংগ্রেস এবার গো-হারান হারছে। রাস্তা দিয়ে জিপ গাড়ি নিয়ে হুল্লোড় করতে করতে যাচ্ছে অল্পবয়েসী ছেলেরা। বিকেলের দিকে বেরিয়ে গেল টেলিগ্রাম। কংগ্রেসে সত্যিই ইন্দ্রপতন ঘটে গেছে, বড় বড় নেতারা ডুবেছেন প্রায় সবাই। পূর্ব ভারতে কংগ্রেসের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা, প্রতিটি ভোটযুদ্ধে যিনি সার্থক সেনাপতি, সেই অতুল্য ঘোষ নিজেই হেরে গেছেন সি পি আই-এর এক প্রায় অপরিচিত প্রার্থী জিতেন্দ্রমোহন বিশ্বাসের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে হারালেন তাঁর আজীবন

সহকর্মী ও বন্ধু, বর্তমানে কংগ্রেস-বিরোধী নেতা অজয় মুখার্জি। বেয়াল্লিশ সালের খ্যাতনামা বিপ্লবী, কিছুদিনের জন্য ব্রিটিশ শাসন থেকে মেদিনীপুরের খানিকটা অংশকে মুক্তাঞ্চল করেছিলেন যিনি, সেই অজয় মুখার্জিকে কিছুদিন আগে চরম লাঞ্ছনার সঙ্গে বিতাড়ন করা হয়েছিল কংগ্রেস অফিস থেকে, আজ তিনি তার প্রতিশোধ নিলেন।

বর্ষীয়ান নেতাদের মধ্যে প্রকাশ্য রেষারেষি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হলেও কংগ্রেসের এতখানি বিপর্যয় সত্যি বিস্ময়ের। কারণ বিরোধী দলগুলি শেষ পর্যন্ত এককাট্টা হতে পারেনি। বিরোধীদের মধ্যেও আলাদা দুটি ফ্রন্ট। অনেক আসনে লড়াই হয়েছে ত্রিমুখী। কংগ্রেসের সংগঠন অনেক বড়, সরকারি শাসনযন্ত্র তাদের হাতে এবং ভোটের জন্য টাকা খরচ করার ক্ষমতাও অনেক বেশি, তবু যে কংগ্রেস হারলো তাতেই প্রমাণ হয় যে জনসাধারণ কতটা বিরক্ত হয়েছিল তাদের প্রতি।

নামতে নামতে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা এসে থামলো ১২৭-এ। বিধানসভায় ২৮০টি আসনের মধ্যে সরকার গড়ার মতন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কংগ্রেসের রইলো না। ওদিকে মার্কসবাদী কমুনিস্ট দল পেয়েছে ৪৪টি, সি পি আই ১৬, ফরোয়ার্ড ব্লক ১৩, বাংলা কংগ্রেস ৩৪, বাকিগুলি অন্যান্য ছোট ছোট দলের। তা হলে সরকার গড়বে কারা?

দ্বিধাবিভক্ত বিরোধীদের এ দুই ফ্রন্টে একতা এসে গেল চট করে, তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও মার্কসবাদী কমুনিস্ট পার্টি মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি ছেড়ে দিল, সেই সম্মান দেওয়া হলো বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখার্জিকে, তাঁর আহত-অপমানিত ভাবমূর্তি কংগ্রেসকে ভাঙতে অনেকটাই সাহায্য করেছে।

ঠিক তিরিশ বছর পর কংগ্রেস আবার বসলো বিরোধীদের আসনে। স্বাধীনতার আগে, ১৯৩৭ সালে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে ফজলুল হকের দলের সঙ্গে হাত মেলায় নি কংগ্রেস। গড়তে দিয়েছিল লীগ মন্ত্রীসভা। এবারেও কংগ্রেস বিরোধীদের হাতে ছেড়ে দিল সরকার।

স্পীকারের বাঁ পাশে বসে বিরোধী দল, তাই তাদের নাম বামপন্থী; অনেকে বলাবলি করতে লাগলো, তাহলে কি আগের বামপন্থীরা এখন শাসক দলে গিয়ে দক্ষিণপন্থী হয়ে গেল?

পরাজয়ের পর যেন খানিকটা শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ফিরে পেল কংগ্রেস। ১২৭টি আসন পেয়েও সরকার গড়ার লোভ ছেড়ে দিল কংগ্রেস, খুচরো খুচরো দলগুলো থেকে ১৩-১৪ জন এম এল এ কি তারা টাকা দিয়ে কিনে নিতে পারতো না? সে রকম উদ্যোগ না নিয়ে তারা গণতন্ত্রের মান রক্ষা করেছে। তা ছাড়া আগে, বিরোধীরা অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেনদের নামে বহু কুৎসা রটিয়েছে, লোকে তা বিশ্বাসও করেছে। অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেনরা চুরি করেছেন কোটি কোটি টাকা, ডালহাউসি স্কোয়ারে অফিস পাড়ায় বেনামীতে কিনেছেন বিশাল অট্টালিকা, খবরের কাগজে ছাপা হতো এইসব কাহিনী। ক্ষমতাচ্যুত হবার পর দেখা গেল, এদের ব্যক্তিগত ধন সম্পদ তেমন নেই। তবে কংগ্রেস দলের মধ্যে দুর্নীতি যে তাঁরা রোধ করতে পারেন নি, সে দায়ভাগ তাদের নিতেই হবে।

এ বছর সারা ভারতেই কংগ্রেসের অবস্থা শোচনীয়। পশ্চিমবাংলা ছাড়াও কংগ্রেসের হাত ছাড়া হয়ে গেছে কেরল, পাঞ্জাব, রাজস্থান। এবং উড়িষ্যা, বিহার, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশেও কংগ্রেসের টলমল অবস্থা। কেন্দ্রের লোকসভায় ৫২২টি আসনের মধ্যে ২৭৬টি পেয়ে ইন্দিরা গান্ধী কোনো রকমে সরকার গড়তে পেরেছেন। সাধারণ মানুষ কংগ্রেসকে খানিকটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু এতটা হীনদশা চায়নি, এখনো অনেকের ধারণা কংগ্রেস দলটা ভেঙে পড়লে এতবড় দেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলায় এই প্রথম শুরু হলো কংগ্রেস-বিরোধী এক পাঁচমিশেলি যুক্ত ফ্রন্টের শাসন।

ঠিক তার কয়েকদিন পরেই উত্তর বাংলায় নকশালবাড়ি থানার অধীনে একটি গ্রামে একটি জমি দখলের ঘটনা ঘটে গেল। একদল আদিবাসী কৃষক তীরধনুক, বর্শা, লাঠি-সোঁটা নিয়ে হৈ করে ছুটে এসে বসে পড়লো জমির ওপর, জমির মালিক বিশেষ প্রতিরোধের

সুযোগ পেল না। সেই জমির চারপাশে লাল পতাকা পুঁতে দিয়ে ঘোষণা করা হলো যে এই জমি এখন থেকে কিষাণ সভার সম্পত্তি।

ছোট্ট একটি ঘটনা, আপাতত এর তেমন গুরুত্ব নেই। জোর করে জমি দখল করার চেষ্টা বা ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া এমন কিছু নতুন ঘটনা নয় পশ্চিম বাংলায়। এ বছর মার্চ মাস থেকে। উত্তরবঙ্গে ভূমিহীন কিষাণদের জন্য এরকম জমি জবর দখলের সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল কৃষাণ সভা। তখন অবশ্য কেউ কল্পনাও করেনি যে কংগ্রেসের হাত থেকে সরকারি ক্ষমতা চলে যাবে। হঠাৎ ঘটে গেল এক বিরাট পরিবর্তন, এখন পশ্চিম বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু, পুলিশ বাহিনী তাঁর হাতে।

তার ফলে উৎসাহ উদ্দীপনা অনেক বেড়ে গেল। পরবর্তী দশ সপ্তাহে কাছাকাছি তিনটি থানার অধীনে এরকম জমি দখলের ঘটনা ঘটলো ৬০টি, কোথাও কোথাও সংঘর্ষ হলো সামান্য, কিন্তু জয় হলো কিষাণ সভার নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষকদের।

কিষাণ সভা শুধু জমি দখলেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু শিলিগুড়ির নেতা চারু মজুমদারের ধারণা অন্যরকম। তিনি চিন্তা করছেন সশস্ত্র বিপ্লবের, যার প্রথম ধাপ এলাকা ভিত্তিক ক্ষমতা দখল। চাষী মজুরদের নিত্য ব্যবহার্য অস্ত্র দিয়েই ছোট ছোট এলাকা দখল করে বিপ্লবকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

২৫শে মে ঐ নকশালবাড়ি থানার অধীনেই একটি গ্রামে জয়ের স্বাদ পাওয়া উগ্র কৃষক মজুরদের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো একটি পুলিশ বাহিনীর। পুলিশেরা তেমন তৈরি ছিল না। আহত হলো বেশ কয়েকজন পুলিশ, তাদের মধ্যে একজন ইন্সপেক্টর ওয়াংদি দুদিন পরে মারা গেলেন হাসপাতালে। ওয়াংদি যেদিন মারা যান, সেদিনই আর একটি পুলিশ দলকে ঘেরাও করলো উত্তেজিত জনতা। আজ পুলিশের বাহিনী তৈরি, তাদের চোখে জ্বলছে সহকর্মী হত্যার প্রতিহিংসার আগুন, গুলি চালালো সামান্য প্ররোচনাতেই। দশজন নিহতের মধ্যে সাতজন নারী এবং দুটি শিশু! যেন একটা ছোটখাটো জালিয়ানওয়ালাবাগ!

এই প্রথম নকশালবাড়ি নামে উত্তরবঙ্গের একটি অকিঞ্চিৎকর জায়গার নাম উঠলো খবরের কাগজে। ঘটনার বিবরণে সবাই স্তম্ভিত! মার্কসবাদী কমুনিস্ট পার্টির নেতার হাতে এখন পুলিশ দফতর। এই দল বরাবরই কৃষক ও মজুরদের ওপরে পুলিশের গুলি চালনার বিরোধী, সেই দলেরই আমলে পুলিশের হাতে মারা যায় সাতজন গ্রামের মহিলা ও দু'জন শিশু? মার্কসবাদী কমুনিস্ট দলও এই ঘটনায় সাংঘাতিক বিব্রত, তারা সরকারি শাসনযন্ত্র পরিচালনায় এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে নির্দেশ দেওয়া হলো, ঐ রকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেই জন্য যেখানে কৃষকরা বেশি সংঘবদ্ধ, যেখানে তারা বেশি ক্ষুব্ধ, সেখানে আপাতত আর পুলিশ পেট্রল পাঠাবার দরকার নেই।

পুলিশের ঐ গুলি চালনার পর জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির কিছু তরুণ শপথ নিয়েছিল, নারী ও শিশুদের ঐ রক্তপাত ও প্রাণদান বৃথা যাবে না, প্রতিশোধ নিতে হবে।

কিছু কিছু এলাকা এখন পুলিশের টহল মুক্ত। সেখানে সরকারি শাসন নেই। এতে চারু মজুমদারের তত্ত্বই যেন সমর্থিত হলো। এই ভাবেই তো ছোট ছোট অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করা যায়। বিদ্রোহী মজুররা এইভাবেই জয়ের স্বাদ পেতে পারে!

হঠাৎ একমাস বাদে পিকিং রেডিও এক অদ্ভূত ঘোষণা করলো। নকশালবাড়িতে নাকি মাও সে তুঙ-এর নির্দেশিত পথে বিপ্লবী ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ দেখা দিয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে তিনটি পুলিশ স্টেশন, নিহত হয়েছে এগারো জন পুলিশ, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে লড়াই, পুলিশ এখন অনেক গ্রামে ভয়ে যায় না। চীনের জনগণের অনুসরণে ভারতের মানুষ সে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের উচ্ছেদ করবে। আগে গ্রামে গ্রামে তৈরি হবে বিপ্লবের ঘাঁটি, তারপর গ্রাম থেকে ঘিরে ফেলা হবে বড় বড় শহরগুলি, সেই পথেই আসবে বিপ্লবের বিজয়!

কয়েকদিন পর চীনের পিপলস্ ডেইলি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো এক প্রবন্ধ, 'ভারতের ওপর বসন্ত-বজ্র'। তাতেও বলা হলো যে ভারতের কমুনিস্ট পার্টির একটি বিপ্লবী অংশ সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করে দিয়েছে। সেই বিপ্লব কোন পথে গেলে সার্থক হবে, তারও নির্দেশ দেওয়া হলো ঐ প্রবন্ধে। উগ্রপন্থীদের সমর্থন করে, ভারতের দুটি কমুনিস্ট পার্টিকে তীব্র শ্লেষ, বিদ্রূপ ও নিন্দেও করা হলো। এক দেশের কমুনিস্ট পার্টির অন্যদেশের কোনো কমুনিস্ট পার্টির ওপর এরকম আক্রমণ অভূতপূর্ব। ভারতের কমুনিস্ট পার্টিগুলি তৈরি থাক বা না থাক, এখনই ভারতে একটা। বিপ্লব শুরু করিয়ে দেবার ব্যাপারে চীন খুব ব্যস্ত।

ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে বেশ কিছু অংশ সারা দেশের ক্রম-অধোগতি দেখে দেখে ফুঁসছে ভেতরে ভেতরে। সম্পূর্ণভাবে এই সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে না পারলে এ দেশের মানুষের মুক্তির কোনো আশা নেই এবং একমাত্র সর্বাত্মক বিপ্লবই আনতে পারে সেই পরিবর্তন। এবারের নির্বাচনের পর বামপন্থীরাও গণতান্ত্রিক পথ আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে। দেখে তারা আরও ক্ষুব্ধ। এই গণতন্ত্রে গ্রামের মানুষ চলে যাচ্ছে দারিদ্র্য সীমার নীচে, ক্রমশ আরও নীচে, শুধু শহরে শহরে চলছে রাজনীতির কচকচি। এই সময় হঠাৎ চীনের কাছ থেকে এই বিপ্লবের ডাক সেই তরুণদের মনে জাগিয়ে তুললো আগুন!

কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে দেখা গেল নকশালবাড়ির সংগ্রামের সমর্থনে পোস্টার। মাও সে তুঙ-এর লাল বই থেকে উদ্ধৃতি, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, এই ঘোষণা। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভালো ছাত্ররা অসীম চ্যাটার্জির নেতৃত্বে শুরু করলো সরকার-বিরোধী মিছিল ও সংগঠন।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়া ছিল খুবই প্রত্যাশিত। শুধু কংগ্রেস বিরোধিতা নিয়েই বাঁধা হয়েছে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে গাঁটছড়া, তাছাড়া আর কোনো আদর্শের মিল নেই। অজয় মুখার্জির বাংলা কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসেরই বি-টিম। জাতীয়তাবাদ ও ধনতন্ত্রের সঙ্গে আপোসনীতি তাদের মর্মে গেঁথে আছে। চীন তাদের চোখে ভারতের আগ্রাসনকারী তো বটেই, তাছাড়া পাকিস্তানের বন্ধু। সেই চীনের সমর্থনে পোস্টার এবং বিপ্লবের ডাক দেখে তাদের গাত্রদাহ হবেই।

বাংলা কংগ্রেস ও অন্যান্য শরিকদের চোখে উত্তরবঙ্গের হাঙ্গামাকারীরা সবাই মার্কসবাদী কমুনিস্ট দলের লোক। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল এরা তো ঐ দলেরই সদস্য। কলকাতার শক্তিশালী মার্কসবাদী নেতা পরিমল দাশগুপ্তও নকশালবাড়ির সমর্থক। এদিকে মার্কসবাদী কমুনিস্ট দল সরকারের অংশীদার, পুলিশ দফতর তাদের হাতে, অথচ তারাই বেআইনী জমি দখল ও আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রতিশ্রুতি দেবে, এ কী করে হতে পারে; গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে জিতে সংবিধানের শপথ নিয়ে তারা মন্ত্রিসভায় এসেছে, তবু তাদেরই দলের এক অংশ বিপ্লবের ডাক দিচ্ছে, এ যে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর।

মার্কসবাদী কমুনিস্ট দলও এই রকম ঘটনায় বিব্রত অবস্থা কাটিয়ে ওঠার পথ খুঁজতে লাগলো। উত্তরবঙ্গের হঠকারী বিদ্রোহীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা হলো অনেক। চীনা বেতারের ক্রমাগত প্রচার বিভ্রান্তি ছড়ালো আরও। চীনা বেতারের খবর অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের প্রকৃত বিপ্লবীরা সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে মাও সে তুঙ-এর চিন্তাধারায়, সুবিধাবাদী ও অনুগ্রহলোভী কমুনিস্ট দলগুলি তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না।

মাদুরাই-এ মার্কসবাদী কমুনিস্ট দলের সেন্ট্রাল কমিটি মিটিং-এ জবাব দেওয়া হলো চীনা বক্তব্যের। নকশালবাড়ির সামান্য একটা বিচ্ছিন্ন দলকে সমর্থন জানিয়ে ভ্রাতৃপ্রতিম কমুনিস্ট দলকে আক্রমণ কখনো মার্কসবাদী লেনিনবাদী নীতি সম্মত হতে পারে না। চীনের এই অপপ্রচারে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীলদেরই মদত দেওয়া হচ্ছে। রুশ কমুনিস্ট পার্টির হস্তক্ষেপে এবং প্রচারে চীনারা এক সময় ক্ষিপ্ত হয়েছিল, আজ ভারতের ব্যাপারে চীনা কমুনিস্ট পার্টি তো সেই একই কাণ্ড করছে!

চারু মজুমদার ও তাঁর সমর্থকদের যখন কিছুতেই চুপ করানো গেল না তখন মার্কসবাদী কমুনিস্ট দল থেকে খারিজ করে দেওয়া হলো তাঁদের নাম। দার্জিলিং জেলা কমিটি ভেঙে দেওয়া হলো, দল থেকে বহিষ্কৃত হলো প্রায় এক হাজার জন উগ্রপন্থী, সৌরেন বোস, সরাজ দত্ত, এমনকি দেশহিতৈষী'র সম্পাদক সুশীতল রায়চৌধুরীর মতন প্রবীণ নেতাও

বাদ গেলেন না। সরকারের অন্যান্য শরিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে উত্তরবঙ্গের হাঙ্গামায় মার্কসবাদী দলের সমর্থন নেই। এতদিন পুলিশকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল, চীনের বেতারের মতে সেটাই সরকারি শক্তির পরাজয়, সশস্ত্র কৃষকদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পুলিশ বাহিনীর নেই, সুতরাং বিপ্লব সেখানে শুরু হয়ে গেছে।

এবারে পুলিশকে যতদূর সম্ভব কম রক্তপাত ঘটিয়ে ঢুকে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হলো গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায়। সুসংহত পুলিশবাহিনীর সামনে কৃষকরা প্রতিরোধে দাঁড়াতেই পারলো না। সংঘর্ষ হলো অতি সামান্য। বন্দী করা হলো প্রায় এক হাজার মানুষকে, পনেরো দিনের মধ্যে সব বিদ্রোহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জঙ্গল সাঁওতাল গ্রেফতার হলেন, কানু সান্যাল পলাতক। অসুস্থ চারু মজুমদার আটক হলেন নিরোধমূলক আইনে। বাংলার বিপ্লব তখনও শুধু গর্জন করতে লাগলো পিকিং বেতারে।

এরপরেও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ফাটলে জোড়াতালি দেওয়া গেল না। আজ যায়, কাল যায় অবস্থা। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ এখন প্রতিদিন রাজনীতির আলোচনায় মত্ত। সরকারের মধ্যে দলাদলি ও কলহ বেশ একটা মুখরোচক বিষয়।

শিলিগুড়িতে চাকরি নিয়ে যাওয়ার পর সাত আট মাস কেটে গেছে, অতীন এর মধ্যে একবারও কলকাতায় আসে নি। সে চিঠিপত্তর দেয় বটে, তবু মমতার উদ্বেগ কমে না। এতদিন একটানা ছেলেকে না দেখার যে কষ্ট তা অন্য কেউ বুঝবে না। মমতা নিজেও যেন বুঝতে পারেন না। ছেলে বড় হয়েছে। সে তো বাইরে থাকবেই, লেখাপড়ার জন্য, চাকরির জন্য সন্তানদের আরও কত দূর দূর দেশে যেতে হয়। এ সব জেনেও তাঁর বুক টনটন করে কেন? ছেলেটা বড় হয়েছে ঠিকই, তবু ওর মধ্যে একটা বাচ্চা বাচ্চা ভাব রয়ে গেছে, যখন তখন মাথা গরম করে, পরে দুঃখও পায় সেজন্য। ছেলেটার মন যে কত নরম, তা শুধু মমতা জানেন, নতুন জায়গায় নতুন মানুষজনের সঙ্গে ও কি মানিয়ে নিতে পারবে? নর্থ বেঙ্গলে কী সব যেন গণ্ডগোল হচ্ছে, তা শুনে মমতার আরও আশঙ্কা হয়।

মমতার খুব ইচ্ছে একবার শিলিগুড়িতে গিয়ে বাবলুর থাকার জায়গাটা দেখে আসার। ছেলেটা কেমন ঘরে থাকে, দু বেলা ঠিক মতন খেতে পায় কি না, রাত্তিরে মশারি টাঙাতে ভুলে যায় কি না, এসব জানতে পারলে অনেক স্বস্তি হয়। বাবলু সে সব কিছু লিখতেই চায় না। প্রথম প্রথম একবার লিখেছিল, বেগুন ভাজতে গিয়ে গরম তেলের ছিটে লেগে তার বাঁ গালে একটা ফোস্কা পড়েছে। সে চিঠি পড়ে মমতা হেসেছিলেন। যে ছেলে কোনদিন এক কাপ চা তৈরি করে খায় নি, সে রান্না করতে শিখছে। তবু হোটেলের খাওয়ার চেয়ে নিজে রান্না করে খাওয়া ভালো।

এখন বাবলু আর বাড়ির কথা কিছু লেখে না। শুধু একটা পোস্টকার্ড পাঠায়। প্রতিবার প্রায় একই কথা, আমি ভালো আছি, তোমরা কেমন আছো? চিঠি লিখতে জানে না ছেলেটা, সেই তুলনায় তুতুল অনেক সুন্দর চিঠি লেখে। প্রথম বিদেশে গিয়ে বেশ বিপদে পড়েছিল তুতুল, এখন সামলে নিয়েছে অনেকটা। একটা চাকরিও পেয়েছে।

একটা ব্যাপারে খটকা লাগে মমতার। মা বাবার সঙ্গে দেখা করার গরজ না থাক, অলির সঙ্গে দেখা করার জন্যও ছেলেটা আর এলো না? এমন তো কিছু দূর নয়, কলেজের চাকরিতে ছুটিছাটাও থাকে অনেক। প্রত্যেকটা ছুটিতেই বাবলু দার্জিলিং, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ারে বেড়াতে যাবার কথা লেখে।

ছেলের বিয়ে দেওয়ার চিন্তা করেননি মমতা। অলি আর বাবলু যে পরস্পরকে খুব পছন্দ করে, তা মমতা জানেন। অলি অত্যন্ত ভালো মেয়ে, বাবলুর মতন ছন্নছাড়া নয়, ওদের বিয়ে হলে বাবলুই ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা বিয়ে করতে চায় কিনা তা কী করে বোঝা যাবে? বাবলুর সঙ্গে এ সম্পর্কে কখনো কোনো কথা হয়নি মমতার। প্রতাপের কাছে দু একবার এই প্রসঙ্গ তুলেছেন, প্রতাপ পাত্তাই দেন নি। বিমানবিহারীর কাছে প্রতাপ কোনোক্রমেই এরকম প্রস্তাব দিতে পারবেন না। বিমানবিহারীরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি অবস্থাপন্ন, তাঁরা কোথায় মেয়ের বিয়ে দেবেন, সে তাঁরা বুঝবেন। প্রতাপ কিছুতেই বন্ধুত্বের সুযোগ নিতে চান না।

মমতা ঠিক করেছেন, তিনি অপেক্ষা করবেন। অলির যদি অন্য কোথাও বিয়ের কথাবার্তা হয়, তখন তিনি লক্ষ করবেন তাঁর ছেলের প্রতিক্রিয়া। বাবলু যদি কষ্ট পায়, তা হলে তিনি নিজে গিয়ে অলির মা কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলবেন।

মমতা একদিন প্রতাপকে বললেন, চলো না, আমরা কয়েকদিনের জন্য শিলিগুড়ি ঘুরে আসি। কতদিন কোথাও যাওয়া হয় না। সেই মা থাকার সময় তবু দেওঘর যাওয়া হতো, তারপর তো সে সব চুকেবুকে গেছে, এখন কলকাতায় একেবারে দম বন্ধ হয়ে আসে।

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, বাবলু কি তোমাকে শিলিগুড়িতে যাবার জন্য একবারও লিখেছে?

মমতা বললেন, না, সে কথা লেখেনি। তবে, সে আমাদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাবে তার কি মানে আছে? আমরা নিজের থেকে যেতে পারি না?

প্রতাপ বললেন, ছেলেদের কাজের জায়গায় মা বাবাদের হুটহাট করে যেতে নেই। তুমি কোথায় থাকবে, না থাকবে, তা নিয়ে বাবলু মুশকিলে পড়ে যেতে পারে!

–আমরা না হয় হোটেলে উঠবো!

–আমাদের বুঝি অঢেল টাকা পয়সা? মাসে মাসে ধার শোধ করছি। সামনের মাসে মুন্নির পরীক্ষার ফি দিতে হবে।

–আমি তোমায় একশো টাকা দিতে পারি।

–মমো, তোমার কাছে যদি একশো টাকা থাকে, সেটা বর্ষার দিনের জন্য জমিয়ে রাখো। আমার সব কটা সোর্স শুকিয়ে আসছে!

–তা বলে আমরা কোথাও একটুও বেড়াতেও যেতে পারবো না? কষ্ট করেও লোকে মাঝে মাঝে যায় বাইরে ... বছরের পর বছর কলকাতায় এই একঘেয়ে জীবন।

–এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? ছেলেটাকে একটু সেটল করার সময় দাও। আমারও একবার দার্জিলিং ঘুরে আসার ইচ্ছে আছে।

একথায় মমতা সান্ত্বনা পেলেন না। মাঝে মাঝেই তিনি বাবলুকে স্বপ্ন দেখছেন। তুতুল নেই, বাবলু নেই, বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বাবলুর বন্ধুরাও কেউ আসে না।

মমতা ঠিক করলেন তিনি একাই যাবেন শিলিগুড়ি। অসুবিধের কী আছে, ট্রেনে চাপবেন, শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে বাবলু তাঁকে নিয়ে যাবে। এতগুলি বছর সংসার সামলাতে তিনি বাধ্য হয়ে ঘরকুনো হয়েছেন, কিন্তু প্রয়োজনে একা চলাফেরা করতে এখনো তাঁর অসুবিধে হয় না। প্রতাপ সময় পান না, বাবলু নেই, এখন প্রায়ই মমতাকেই বাজারহাট করতে যেতে হয়!

মুন্নির সামনেই পরীক্ষা, তাকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না। টুনটুনিকে নিলে আরও অসুবিধে হবে। বরং মমতা চলে গেলে ওরা প্রতাপকে দেখাশুনো করতে পারবে। একা একা ট্রেনে করে অনেক দূরে যাওয়ার চিন্তাটা মমতাকে বেশ আরাম দেয়। কল্পনায় যেন মুক্তির বাতাস লাগে। এতখানি জীবনে তো নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী কিছুই করা হলো না।

মমতা যেদিন শিলিগুড়ি যাওয়ার ব্যাপারে একেবারে মনস্থির করে ফেললেন, তার পরের দিনই একটা খামে চিঠি এলো বাবলুর। চিঠিটা পড়ে মমতা খুশী হলেন তো বটেই, আবার একটু একটু নৈরাশ্যও বোধ করলেন। সামনের সপ্তাহেই বাবলু কলকাতায় ফিরছে, মমতার আর যাওয়া হবে না। বাবলু লিখেছে :

মা,

আমাদের কলেজে একটা গোলমাল চলছে, ক্লাস বন্ধ, শিগগিরই খুলবে বলে মনে হয় না। আমার পক্ষে ভালোই হলো। প্রত্যেক মাসেই কলকাতায় একবার ফিরবো ফিরবো ভাবছিলুম, কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠছিল না। এই মাসে একসঙ্গে বেশ কিছু কলেজ ডি এ পেয়েছি। আগে প্রত্যেক মাসেই কিছু না কিছু জিনিসপত্র কিনতে হচ্ছিল। মাঝখানে

আমাদের বাড়িতে চোর এসে বিছানা-বালিশ জামা-কাপড় সব নিয়ে গেছে। জলের কুঁজো দুটো ভেঙে দিয়ে গেছে। আমাকে একটা কম্বল কিনতে হলো, দু'বার দুটো ছাতা হারিয়েছি। কিন্তু এখানে ছাতা ছাড়া চলে না।

আমি ১২ তারিখ সোমবার কলকাতায় পৌঁছোবো। কৌশিক এসেছে, কৌশিকও আমার সঙ্গেই ফিরবে। মানিকদার হাঁপানি বেড়েছে, ওঁকেও নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। মানিকদা হয়তো কয়েকদিন আমাদের বাড়িতেই থাকবেন। অনেকদিন নিজেদের রান্না খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে। অনেকদিন তোমার হাতের মুগের ডাল খাইনি। মানিকদাকে তুমি একদিন নারকেল চিংড়ি খাইয়ো। এদিকে চিংড়ি মাছ ভালো পাওয়া যায় না।

টুনটুনি পড়াশুনো করছে তো? মুন্নিরও পরীক্ষা এসে গেল। পিসিমাকে আমি আগে চিঠি দিয়েছি দুবার, পিসিমা একবারও নিজের হাতে উত্তর দেননি। পিসিমা ফুলদিকে চিঠি লেখেন, আমায় লিখতে পারেন না? বাবা ভালো আছেন নিশ্চয়ই! বাবার একজন বন্ধুর সঙ্গে এখানে আলাপ হয়েছে।

তোমরা আমার প্রণাম নিও।

বাবলু

বিছানার ওপর জোড়াসনে বসে চিঠিটা বারবার পড়ে যেতে লাগলেন মমতা। বাবলুদের ওখানে চুরি হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই রাত্তিরে দরজা বন্ধ করতে ভুলে যায়। আজকাল চোরের উপদ্রব সব জায়গায়। মুগের ডাল খাবার শখ হয়েছে বাবলুর, আগে তো কোনোদিন বলেনি যে মুগের ডাল তার প্রিয়? এতদিন পর ছেলে আসছে, মমতার তো খুব খুশী হবারই কথা। তবু একটু একটু ক্ষোভও হচ্ছে, তাঁর আর একা একা ট্রেনে চেপে শিলিগুড়ি যাওয়া হলো না!

৬৬ সিঁড়ির মুখে ল্যান্ডলেডি

সিঁড়ির মুখে ল্যান্ডলেডিকে দেখে তুতুল বললো, গুড মর্নিং মিসেস সেফেরিস!

ল্যান্ডলেডিটি এক বিশাল বপু গ্রীক রমণী। প্রায় পৌনে ছ'ফিট লম্বা, চওড়াও প্রায় ততখানি, তার হাত দুটি গদার মত, স্তন দুটি যেন ঈষৎ চোপসানো ফুটবল, যে-কোনো পোশাকেই যেন তার শরীর ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। মিসেস সেফেরিসের বয়েস পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হবে, কিন্তু শরীরে এখনও বার্ধক্যের ছায়া পড়েনি। দু'গালে মেচেতার দাগ, কিন্তু মুখখানা সব সময় হাসি-খুশি। এর স্বামীটি অতিশয় গোমড়ামুখো, তাকে দেখলেই তুতুল এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

ল্যান্ডলেডি সিঁড়িতে বসে ঘেঁড়া কার্পেট সেলাই করছিল, মুখ ফিরিয়ে বললো, মর্নিং দত্তর! ইউ আউট সো আর্লি? হোয়াটস দা ওয়েদার লাইক?

তুতুল বললো, আজ সকালে বাইরে রোদ ঝকঝক করছে!

কয়েকটা জিনিস কেনাকাটি করতে বেরিয়েছিল তুতুল, তার হাতে শপিং ব্যাগ। সেদিকে ঘন দৃষ্টি দিয়ে ল্যান্ডলেডি সোৎসাহে জিজ্ঞেস করলো, ইউ বাই ফিস টু দে? বিগ ইনদিয়ান ফিস?

তুতুল হেসে দু'দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না, মাছ কিনিনি!

এই একটা মজার ব্যাপার। এ দেশে আসার পর থেকেই তুতুল শুনেছিল নিজের ঘরে মাছ রান্না করলেও ল্যান্ডলেডিরা চটে যায়। ডালে লঙ্কা ফোঁড়ন দিলে তো সেই ভাড়াটেকে তক্ষুনি নোটিস দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের এই গ্রীক বাড়িউলীর কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। মাঝে মাঝে তুতুল যখন রান্না করে, বাড়িউলী এসে তার ঘরে নক করবেই। তুতুল কী রান্না করছে জানতে চাইবে, তারপর বলবে, মে আই তে ইত? তুতুল যা দেবে, সোনা

মুখ করে খেয়ে নেবে মিস সেফেরিস। মাছ খেতে তো খুবই ভালো বাসে। সারাদিন ধরেই এই স্ত্রীলোকটি কিছু না কিছু খেয়ে চলেছে। খাওয়াটাই তার নেশা।

ল্যান্ডলেডি খানিকটা নিরাশ হয়ে বললো, নো ফিস? দেন হোয়ত ইউ বাই? তুতুল বললো, তোমার জন্য একটা আইসক্রিম এনেছি।

ল্যান্ডলেডির মুখখানা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। যেন একটি বাচ্চা মেয়ে, তুতুল যখনই বাজারে যাবে, তখনই এর জন্য কিছু না কিছু আনতেই হবে। অতি সাবধানে টিপে টিপে পয়সা খরচ করতে হয় তুতুলকে, তবু এই খরচটা সে ধরেই রেখেছে।

তুতুল রান্না খুবই কম করে। দিনের পর দিন শুধু স্যান্ডুইচ খেয়ে কাটায়। তার বাড়িউলীর স্যান্ডুইচে খুব আপত্তি, ঐ জিনিসটা সে পছন্দ করে না। গ্রীকরা যে পরোটা মাংস ও ভাত এত পছন্দ করে, তুতুলের জানা ছিল না। তুতুলকে স্যান্ডুইচ খেতে দেখলেই ল্যান্ডলেডি বলে, নো কুকিং? ইউ দতর, ইউ আর্ন স্যাকফুল অফ মানি!

মিসেস সেফেরিসের ধারণা, ডাক্তার মানেই বড়লোক। তুতুল যে রাত্রে সামান্য একটা চাকরি করে ও সেই টাকায় পড়াশুনো করতে হয় দিনের বেলায়, তা এই মহিলাটি কিছুতেই বুঝবে না!

এখনো এক বছর পুরো হয়নি, এর মধ্যেই অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে তুতুলের। লন্ডন শহরটা যে কতখানি কসমোপলিটন তা এখানে না এলে জানা যায় না। কত জাতের লোক যে এখানে রয়েছে তার ঠিক নেই। ইটালিয়ান, আর্মেনিয়ান, গ্রীক, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান, সিলেটী, পঞ্জাবী, গুজরাতি এই সব জাতিগোষ্ঠি বেশ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। কতরকমের জীবিকা, জীবনযাত্রা। তাদের বাড়িওয়ালাবাড়িউলী এক সময় একটা মাংসের দোকান চালাতো, এখন দোকানটি বিক্রি করে দিয়ে এই বাড়িটি কিনেছে, ছোট ছোট চারটে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দিয়ে ওদের দিব্যি চলে যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে ভালো করে ইংরিজি না শিখেও এই ইংরেজদের দেশে ওরা বেশ চালিয়ে যাচ্ছে। মিসেস

সেফেরিস লন্ডনে আছে টানা পঁয়তিরিশ বছর। এখনও তার ইংরিজি কলকাতার বউবাজারের জুতোর দোকানের চীনেদের মতন।

আরও দু'জায়গা ঘুরে, তুতুল এই বাড়িতে এসেছে মাত্র তিন মাস আগে। পুরো একটা অ্যাপার্টমেন্ট সে ভাড়া নেয়নি, সে ক্ষমতা তার নেই। একটি রেস্তোরাঁর দরজায় হাতে লেখা বিজ্ঞাপন দেখে সে এই জায়গাটার সন্ধান পেয়েছিল। একটি গুজরাতি মেয়ের সঙ্গে তাকে অ্যাপার্টমেন্টটা শেয়ার করতে হয়।

সেই মেয়েটির নাম ভাবনা প্যাটেল। দু'জনে যদিও সমান ভাড়া দেয়, কিন্তু ভাবনা আগে সম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্টটি নিজের নামে ভাড়া নিয়ে তারপর তুতুলকে সাব-লেট করেছে বলে সে বেশি সুযোগের অধিকারিণী। ভাবনার খাটটি জানলার পাশে, আলমারিতে তার তিনটে তাক, তুতুলের দুটো, একটি মাত্র বেড-ল্যাম্প সে-ই ব্যবহার করে, তার ভাবভঙ্গি আর একটি বাড়িউলীর মতন। তুতুল এমনিতেই লাজুক ও মুখচোরা স্বভাবের, ভাবনা তার ওপর প্রায়ই এটা ওটা হুকুম চালায়।

অবশ্য ভাবনা মেয়েটি এমনিতে ভাল। প্রাণখোলা, স্পষ্ট বক্তা। তার গায়ের রং মাজা-মাজা ও চুলের রং কালো, এ ছাড়া তার মধ্যে আর কোনো ভারতীয়ত্ব খুঁজে পাওয়া শক্ত। ভাবনা প্যাটেলের পরিবার দুপুরুষ ধরে আফ্রিকায় উগান্ডার অধিবাসী। ভাবনার বাবা সেখানে মশলার ব্যবসায়ী, মেয়েকে লন্ডনে পাঠিয়েছেন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়াতে।

ভাবনা ইংরিজি ছাড়া কথাই বলে না, ইংরিজি বলেও সে মেমসাহেবদের মতন, গুজরাতি সে জানেই না ভালো করে, সে শাড়ি পরতেও জানে না। একমাত্র গুজরাতি চরিত্র যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে, তা হলো নিরামিষ খাওয়া, মাছ-মাংস সে ছোঁয় না, তবে কেকের মধ্যে ডিম থাকলে তার খেতে আপত্তি নেই। এবং সিগারেট ও মদ যেহেতু আমিষের মধ্যে পড়ে না, তাই বাড়িতে থাকলে অধিকাংশ সময় তার এক হাতে থাকে বিয়ারের টিন, অন্য হাতে লম্বা সিগারেট।

আজ শনিবার, ছুটির দিন, ভাবনা বিছানায় শুয়ে হেনরি মিলার পড়ছে। এখনো মুখও ধোয়নি। তুতুল কত আগে উঠে, বাথরুমটাথরুম সেরে, বাজার পর্যন্ত করে নিয়ে এলো। আজ অনেকদিন বাদে তুতুলের ভাত-ডাল-বেগুন ভাজা খেতে ইচ্ছে হয়েছে, সে রান্না করবে, মাছ-মাংস আনেনি, যদিও তুতুল এ ঘরের মধ্যে মাছ-মাংস এনে খেলে ভাবনা আপত্তি করে না। কিন্তু ভাবনা খায় না বলে তারও বিশেষ খেতে ইচ্ছে করে না। সে নিরামিষ রান্না করলে ভাবনা তার সঙ্গে খেয়ে নিতে পারে। সপ্তাহে দু'একদিন তুতুল কলেজ ক্যান্টিনে ফিস অ্যান্ড চিপস খেয়ে নেয়!

তুতুলকে দেখে ভাবনা বললো, হ্যালো, বহ্নি, এরমধ্যে কেনাকাটি করে এলে, তোমার জন্য কি দোকানগুলো আগে আগে খোলে? এখন ক'টা বাজে?

তুতুল হেসে বললো, পৌনে দশটা!

ভাবনা বইটা মুড়ে বললো, কিছুই না। ডার্লিং, তুমি নিশ্চয়ই আর একটু চা খাবে এখন? আমার জন্যও একটু বানাবে? আমার কৌটোয় ভালো চা আছে, সেটা তুমি ইউজ করতে পারো!

তুতুল জিজ্ঞেস করলো, শুধু চা, না একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেবে? আমি কর্নফ্লেকস আর কলা এনেছি, তৈরি করে দিতে পারি।

ভাবনা বললো, না, না, এখন শুধু চা। বেশি করে বানিও।

একটাই বড় ঘর। দুটি খাট ও দুটি টেবল ছাড়া, এক কোণে রয়েছে একটা সিঙ্ক, একটা গ্যাস স্টোভ। হাত-মুখ ধোওয়া ও চা ব্রেকফাস্ট, ছোটখাটো রান্না ঘরের মধ্যেই হয়ে যায়। বারান্দার এক কোণে আছে একটা কমন রান্না ঘর, অন্য কোনে বারোয়ারি বাথরুম। এ বাড়ির অন্যান্য অ্যাপার্টমেন্টে থাকে কয়েকটি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ছাত্র, এক বৃদ্ধ ইটালিয়ান দম্পতি ও দুই আইরিশ মোটর মেকানিক। রান্না ঘরটায় গেলেই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তারা বড্ড গায়ে পড়ে ইয়ার্কি মারতে আসে বলে তুতুল পারতপক্ষে

যায় না। তবে পচনশীল খাদ্য টাদ্য কিছু থাকলে রান্না ঘরের বড় ফ্রিজটায় রেখে আসতে হয়। এখানে কেউ অন্যের খাবারে ভুলেও হাত দেয় না।

ঘরে ফোন নেই, বারান্দায় সকলের জন্য একটি টেলিফোন। তুতুল চা বসিয়েছে, এমন সময় বারান্দায় ফোন বেজে উঠলো, ভাবনা অমনি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল ফোন ধরতে। লজ্জায় কর্ণমূল রক্তিম হয়ে গেল তুতুলের। বাড়িতে যখন থাকে, তখন ভাবনা শুধু একটা ড্রেসিং গাউন ছাড়া তলায় আর কিছু পরে না। বোতামও লাগায় না ভালো করে। তার শরীরের যে-কোনো অংশ যখন তখন দেখা যায়। এমনকি পোশাক বদলাবার সময় তুতুলের সামনেই সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যেতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। তুতুল মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু তার খুব অস্বস্তি লাগে। ভাবনা বুকের বোতামগুলো খোলা অবস্থায় শুধু এক হাতে চেপে ঐ অবস্থায় বাইরে গেল, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ছেলেগুলো বারান্দা দিয়ে সর্বক্ষণ যাওয়া আসা করে, তুতুল এরকম ভাবতেই পারে না। সে আজও ড্রেসিং গাউন, হাউস কোট, বা শ্লিপিং স্যুট ব্যবহার করে না। শাড়ি পরে ঘুমোয়, সকালে উঠেই সেই শাড়ি বদলে অন্য শাড়ি পরে নেয়। বাইরে বেরুবার সময়েও সে প্যান্ট পরেনি আজ অবধি, সে বুঝে গেছে লন্ডনে শাড়ী পরে চলা ফেরায় কোনো অসুবিধে নেই, খুব শীতের সময় তলায় একটা ড্রয়ার পরে নিতে হয় শুধু।

ভাবনার টেলিফোন ছাড়তে ছাড়তে চা প্রায় জুড়িয়ে এলো। আবার জল গরম করতে হলো তুতুলকে। ঘরে ফিরে উৎসাহ-ঝলমল মুখে ভাবনা বললো, বহ্নি, বহ্নি, আজ নাইট শো-তে একটা মুভি দেখতে যাবে? আমাদের পাড়ার হলে মেরিলিন মনরোর একটা দারুণ, দুর্দান্ত ছবি এসেছে। মিসফিট, তুমি দ্যাখোনি নিশ্চয়ই? ইটস টেরিফিক, উইথ ক্লার্ক গেবল অ্যান্ড মন্টগোমারি ক্লিফট...তুমি চিন্তা করতে পারো, দুই নায়ক এক নায়িকা, ইউ মাস্ট সি ইট!

সিনেমা থিয়েটার প্রায় কিছুই দেখা হয় না তুতুলের। চাকরি আর পড়াশুনো, দুটোতেই প্রচণ্ড খাটুনি, এ দেশে চাকরিতে ফাঁকি দিলে এক কথায় ছাড়িয়ে দেয়, আর পড়াশুনোয়

ফাঁকি দিলে নিজেরই টাকা নষ্ট, তাই একদমই সময় পাওয়া যায় না। ছুটির দিনে তুতুল তার। পড়াশুনো খানিকটা এগিয়ে রাখে।

ভাবনার উৎসাহ দেখে সে বললো, ঠিক আছে, যাবো। টিকিট পাওয়া যাবে? না, আমি দুপুরে গিয়ে অ্যাডভান্স টিকিট কেটে আনবো দু'খানা?

তুতুল মনে মনে হিসেব করলো, তার কাছে চার পাউন্ড আর কিছু খুচরো শিলিং আছে, দুটো টিকিটে অন্তত দু'পাউন্ড লাগবে, আর পপ কর্নের জন্য কিছু, তার মাইনে পেতে আরও পাঁচ দিন বাকি, তবু এই দিয়েই চালিয়ে দিতে হবে, দরকার হলে সন্ধেবেলা শুধু দুধ খেয়ে থাকবে, তবু ভাবনার পয়সায় সে সিনেমা দেখবে না।

ভাবনা তুতুলকে জড়িয়ে ধরে বললো, না। মাই সুইট গার্ল, তুমি টিকিট কাটবে কেন? আমি টিকিট কেটে দেবো! তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, তোমার সঙ্গে আর কে যাবে সেটা তুমি ঠিক করো!

–আমার সঙ্গে আর কে যাবে মানে? তুমি দেখবে না সিনেমাটা?

সারা মুখে দুষ্টু হাসি ছড়িয়ে ভাবনা বললো, আমি কী করে যাবো, আজ সন্ধেবেলা যে আমার কাছে টম আসবে! তা ছাড়া ঐ ছবিটা আমার দেখা। আমি চাই ওরকম একটা ভালো ফিল্ম তুমিও দ্যাখো! ইউ মাস্ট নট মিস ইট।

ব্যাপারটা তুতুলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সন্ধের পর ভাবনা এই ঘরটা শুধু নিজের জন্য পেতে চায়, এই জন্যই তুতুলকে সিনেমায় পাঠাবার জন্য তার এত গরজ! এই এক উপদ্রব এখানে। এক একটা শনিবার ভাবনার ছেলে বন্ধু এসে পড়ে, সঙ্গে মদের বোতল, কিছু খাবার। তুতুলের সঙ্গে সে কিছুক্ষণ ভদ্রতার কথা বলে, তারপর ভাবনার সঙ্গে জড়াজড়ি শুরু করে দেয়। ভাবনা তখন তুতুলের দিকে এমনভাবে তাকায়, যার একটাই অর্থ। তুতুলকে তখন সিঁড়িতে কিংবা রান্নাঘরে গিয়ে বসে থাকতে হয়। সে এক অসহ্য অবস্থা। একদিন একটি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ছেলে মাতাল অবস্থায় রান্না ঘরে এসে তুতুলের

হাত ধরে টানাটানি করেছিল। তারপর থেকে তুতুল রান্না ঘরে বসে থাকতে আপত্তি জানিয়েছিল, সেই জন্য আজ তাকে সিনেমায় পাঠানো হচ্ছে!

ছেলে বন্ধুকে নিয়ে বেমালুম দরজা বন্ধ করে দেয় ভাবনা। ওর জন্য তুতুলেরই যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়। ভাবনার একজন বয়-ফ্রেন্ড নয়, দু'জন, তারা বদলে বদলে আসে, এদের কারুর সঙ্গেই ভাবনার বিয়ের কিছু ঠিক নেই। টম নামে যে লোকটি আসে, সে আসলে ভারতীয় এবং নাকি বিবাহিত, তবু তার সঙ্গে শুতে একটুও দ্বিধা নেই ভাবনার! আফ্রিকায় জন্মেও সে খাঁটি মেমসাহেব হয়ে গেছে। সব মেমসাহেবরাও কি এরকম করে?

ভাবনার চরিত্রের এই দিকটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, তবু এই অ্যাপার্টমেন্টটা সে ছাড়তে চায় না একটি মাত্র কারণে, এখান থেকে তার চাকরির জায়গা খুব কাছে। রাত্তিরে হেঁটে ফিরতে পারে।

তুতুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তা হলে দুটো টিকিটের দরকার নেই। আমি একাই যাবো, আমার টিকিট কেটে নেবো।

ভাবনা বললো, আজ শনিবার, আজ কোনো মেয়ে একা সিনেমা দেখতে যায়? যাঃ! কেন, তোমার কোনো ছেলে বন্ধুর সঙ্গে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো!

-তার দরকার নেই, সেরকম কোনো বন্ধু নেই আমার!

-তুমি মাঝে মাঝে অনেক রাত্তির পর্যন্ত বাইরে থাকো, আমার ধারণা তোমার কোনো স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে।

-মাঝে মাঝে রাত্তিরে আমি লাইব্রেরিতে পড়তে যাই!

-আর কত পড়াশুনো করবে, ডার্লিং! শোনো বহ্নি, তুমি লজ্জা করো না। তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড থাকলে তাকে এখানে ডাকতে পারো। আমি সেলফিস নই, সেদিন আমি তোমাদের জন্য ঘর ছেড়ে দেবো!

–বলছি তো আমার সেরকম কেউ নেই।

–তিনতলায় থাকে জেফ্রি, সে তোমার দিকে নরম চোখে তাকায়, আমি লক্ষ করেছি, সে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

–ঐ দৈত্যের মতন নিগ্রোটা?

–ছিঃ, নিগ্রো বলতে নেই। তোমার কালোদের সম্পর্কে প্রেজুডিস আছে বুঝি?

–না, না, তা নয়, ওকে দেখলেই আমার ভয় করে।

–ঠিক আছে, তোমার দেশের কোনো ছেলে, তারও তো অভাব নেই। সেই যে একটি ছেলে প্রথম প্রথম দু'চারবার এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে!

অমরনাথদের বাড়ি ছাড়বার পরও রঞ্জন কিছুদিন তুতুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছে, তার চোখের দৃষ্টিতে ছিল অতি ব্যস্ত লোভ। সে ধরেই নিয়েছিল তুতুল একটি অসহায় বোকাসোকা মেয়ে, চিন্ময়ী কলকাতায় ফিরে যাবার পরে সে বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে, তাকে কিছু সাহায্য ও লন্ডনে পা রাখার জায়গা করিয়ে দেবার অছিলায় সম্পূর্ণ নিজের কজায় রাখা যাবে। তুতুল তার কোনো সাহায্য নেয়নি, তবু সে লেগেছিল আঠার মতন, তার ধারণা তার চেহারা দেখে যে-কোনো মেয়েই মুগ্ধ হবে এবং এক সময় বিছানায় যেতে চাইবে। তুতুলের পিঠে সে হাত রাখলে তুতুল পিছলে সরে গেছে, পরে সে সরাসরি তুতুলকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলে তুতুল শান্ত, দৃঢ় গলায় বলেছে, প্লীজ, ওরকম করবেন না! একদিন সিনেমা দেখাতে গিয়ে রঞ্জন অন্ধকারে তার উরুতে হাত রেখেছিল, তুতুল উঠে চলে গেছে মাঝ পথে। তারপর থেকে রঞ্জন উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে তুতুল সম্পর্কে।

তুতুল ভাবনাকে বললো, হি ওয়াজ যাস্ট অ্যান অ্যাকোয়েনটেন্স!

ভাবনা বললো, তা হলে, তা হলে, একদিন পিকাডেলি সাকাসে তোমার সঙ্গে একজন ছিল, তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে, একজন মুসলিম ডক্টর, সে তোমার বন্ধু নয়?

তুতুল বললো, হ্যাঁ, সে একজন ভালো বন্ধু, শুধুই বন্ধু, তার বেশি কিছু নয়! কাজের ব্যাপারে মাঝে মাঝে দেখা হয়।

--বহ্নি, ব্যাক হোম, তুমি কি একটি রেখে এসেছো? তুমি বিবাহিতা? ইন্ডিয়াতে শুনেছি অল্প বয়েসেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়।

তুমি তো ইন্ডিয়াতে যাওনি কখনো। এখন অনেক মেয়েরই বিয়ে করার বা না-করার স্বাধীনতা আছে।

-তবে কি তোমার কোনো ফিয়াসে আছে? কারুর প্রতি তুমি বাগদত্তা।

তুতুল হাসি মুখে দু'দিকে মাথা-ড়লো। ফস করে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে চোখ বড় বড় করে ভাবনা বললো, ইন্ডিয়াতে তোমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই। এখানে তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই, ডু ইউ মীন টু সে, ইউ আর স্টিল আ ভারজিন?

-এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার বুঝি?

-আর ইউ ক্রেজি অর হোয়াট? তুমি তোমার জীবনের সুন্দর সময়টুকু এভাবে নষ্ট করছো?

-সুন্দর সময় কাটানো সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি আর আমার দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো আলাদা, ভাবনা।

-লিস্ন বহ্নি, তুমি লাজুক লাজুক আর ভীতু ভীতু ভাব করে থাকো, কিন্তু আমি জানি তুমি যথেষ্ট ইনটেলিজেন্ট আর স্মার্ট। আমার চেয়েও বেশি বুদ্ধি তোমার। তা ছাড়া তুমি ডাক্তারি পড়ছে, তোমার বোঝা উচিত এরকম লোনলি জীবন কাটানো অস্বাভাবিক।

তোমার স্বাস্থ্য ভাললা, চেহারা সুন্দর, তুমি কেন জীবনটা ভোগ করবে না? হঠাৎ একদিন দেখবে শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে!

-পুরুষ বন্ধু ছাড়া বুঝি জীবন উপভোগ করা যায় না? পৃথিবীতে কত কী দেখবার আছে, শোনবার আছে, বোঝবার আছে।

-ডোন্ট টক ননসেন্স। এটা ইন্ডিয়া নয়, এটা ইওরোপ। এখানে মানুষ জানে স্বাধীনতা কাকে বলে। চিন্তার স্বাধীনতা, ইচ্ছে মতন জীবন কাটাবার স্বাধীনতা। যদি শুধু শুধু কয়েকটা ইনহিবিশান আঁকড়ে থাকো, অকারণে শরীরকে কষ্ট দাও, গান্ধীর মতন রিপ্রেশানেই আত্মার শুদ্ধি হয় মনে করো, তা হলে এক সময় পস্তাতেই হবে। নাইনটিথ সেঞ্চুরির মরালিটি নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে বাঁচা যায় না। একটা ভালো সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার মতনই একটি মনোমত পুরুষের সঙ্গে বিছানায় কিছুক্ষণ কাটানো একটা সুখকর অভিজ্ঞতা। তার বেশি কিছু নয়! এতে লজ্জা বা গ্লানির কি আছে?

তুতুল কৃত্রিম ভয়ের ভঙ্গি করে দু'হাতে কান চাপা দিয়ে বলে, রক্ষে কর! তোমার এই জীবন-দর্শন আমার একদম পোষাবে না! আমি বেশ আছি।

ভাবনা এক লাফে বিছানায় উঠে একটা হাত তুলে স্টাচু অফ লিবার্টির ভঙ্গিতে হুকুমের সুরে বলে, অবস্টিনেট গার্ল, আই বিসিচ ইউ, গো, গেট আ বয়ফ্রেন্ড রাইট নাও! প্রন্টো!

তুতুলকে সিনেমায় যেতেই হয়, ভাবনা ছাড়লো না। রাত্তিরের শো-তে একা একা সিনেমা দেখা যে কী কষ্টকর! এই সব শহরে ছুটির সায়াহ্নে যেন কারুর একা থাকার অধিকার নেই। সব একারাই দোকা খোঁজে। এখানকার সিনেমা হলে সীট নাম্বার থাকে না, অনেক সীট খালি থাকে প্রায়ই। তুতুল নিরিবিলিতে বসবার চেষ্টা করলেও কেউ না কেউ দূর থেকে তার পাশে এসে বসবেই। ফিস ফিস করে কথা বলবে। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় কেউ চাঁছাছোলা অসভ্য প্রস্তাব দেবে।

সিনেমাটা ভালো, তবু তুতুলের মন বিষিয়ে রইলো। রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আস্তে আস্তে, একবার সে ঘড়ি দেখলো। ভাবনা বলে দিয়েছে বারোটার আগে ফেরা চলবে না, এখনো চল্লিশ মিনিট বাকি, এতক্ষণ কোথায় সময় কাটাবে সে! ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া দিচ্ছে, তুতুল গ্লাভস নিয়ে আসেনি, ওভারকোটের পকেটে হাত দুটো রেখেও আঙুলের ডগাগুলো যেন অসাড় হয়ে আসছে। এখন ভাবনা শুয়ে আছে গরম বিছানায়...

তুতুলের কান্না পেয়ে গেল। এক সময় সে বেশ জোরেই বলে উঠলো, উঃ মা, আমি আর পারছি না! কবে বাড়ি যাবো? আমার এই লন্ডন-ফন্ডন কিছু ভালো লাগছে না।

হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সামনে দিয়ে একবার চলে গেল তুতুল। দোতলায় তাদের ঘরে আলো জ্বলছে। ভাবনার ছেলেবন্ধু এখনো যায়নি, সে সহজে যেতেই চায় না। ওর মুখোমুখি পড়তে চায় না তুতুল। তার খুব অস্বস্তি লাগে। তুতুল আবার এগিয়ে যায়, ঠাণ্ডায় তার মুখ বেঁকে যাচ্ছে, নাঃ, এরকমভাবে আর চলে না। এরপর ভাবনাকে বলতেই হবে! ইচ্ছে মতন সে নিজের বিছানায় শুতে পারবে না, অথচ প্রতি মাসে ভাড়া গুনছে? রান্না ঘরে বসে থাকার ব্যাপারে আপত্তি জানাতে ভাবনা হাসতে হাসতে বলেছিল, তা হলে তুমি ঘরের মধ্যেই থেকো, চোখ বুজে, দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে, আই ডোন্ট মাইন্ড! মেয়েটার মুখে কিছুই আটকায় না!

আরও খানিকটা দূর এগিয়ে যাবার পর তুতুল ফিরলো। খাঁ খাঁ করছে রাস্তা, অবিরাম ঝরে পড়ছে গাছের পাতা।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা লোক এসে চলতে লাগলো তুতুলের পাশে পাশে। গায়ে লম্বা ওভারকোট, মাথায় টুপী। কালো নয়, কিন্তু কোন জাতের মানুষ বোঝা যায় না। লোকটি হেসে, জড়িত গলায় বললো, হ্যালো, সুইদার্ট, ফিলিং লোনলি? মি টু!

তুতুল কোনো উত্তর দিল না, দ্রুত সরে যাবার চেষ্টা করলো।

লোকটি তুতুলের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, কাম অন, লেটস হ্যাভ ফান!

কুঁকড়ে গেল তুতুলের শরীর। যে-কোনো পুরুষের স্পর্শেই তার এরকম হয়। ঘেন্না ঘেন্না লাগে।

সে অসম্ভব আর্ত গলায় কেঁদে উঠে বললো, লেট মি গো প্লীজ, প্লীজ!

লোকটা হকচকিয়ে গেল। সে এরকম আশা করেনি। একলা একটা মেয়ে হাঁটছে, সে তাকে এই ঠাণ্ডার রাতে উষ্ণতা দিতে চেয়েছে। মেয়েটা যদি তাতে রাজি না থাকে, সে কথা বললেই পারে। কাঁদবার কী আছে? সে তো মেয়েটার ব্যাগ কেড়ে নেয়নি।

তুতুল ছুটতে ছুটতে নিজেদের বাড়ির কাছে পৌঁছে বাড়ির সিঁড়িতে বসে রইলো। দু'হাতে ঢাকলো মুখ, কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীর।

একটু বাদে ফিরলো বাড়িওয়ালা। বেশ মাতাল অবস্থা। সন্ধের পর পাবে গিয়ে মদ খাওয়া ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। তুতুলকে দেখে অবাক হয়ে সে বললো, হ্যাল্লো, দকতর!

তুমি এখানে বসে কী করছো?

নিজেকে সামলে নিয়ে তুতুল বললো, সদর দরজার চাবি নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। বেল বাজাইনি, অন্যরা বিরক্ত হবে।

দারুণ মজা পেয়ে হো হো করে হাসতে লাগলো বাড়িওয়ালা। তারপর সহানুভূতির সুরে বললো, আই নো, আই নো, ইয়োর রুমমেট, নটি গার্ল, চলো, ভেতরে গিয়ে তুমি আর আমি একসঙ্গে একটু কফি খাই!

আস্তে আস্তে বেশ কিছু লোকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তুতুলের। দু'তিনটি বাঙালী পরিবার, বেশ কিছু ছাত্র। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গেলে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। তুতুলদের ব্যাচের দু'জন ছাত্র ও একজন ছাত্রীও আছে লন্ডনে। 'মিলনী' নামে একটি

বাঙালী ক্লাবের অনুষ্ঠানেও সে গেছে দু'একবার, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীরাও আসে।

পরিচিতদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে সত্যিকারের সাহায্য করেছে। আবার সে একা একটি মেয়ে বলেই কেউ কেউ তার সঙ্গে বেশি বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে চেয়েছে, অনুপ নামে তার দু'বছরের সিনিয়র একজন প্রায়ই তুতুলকে তার গোল্ডার্স গ্রীনের সুসজ্জিত অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে চায়। অনুপের অনেক টাকা, সে নাকি স্ট্যাম্প জমাবার মতন, বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে বিছানায় শোওয়ার অভিজ্ঞতা জমায়। ইংরেজ মেয়েদের মাথার দু'একটি চুল দেখিয়ে বন্ধুদের কাছে গর্ব করে।

তুতুল সকলের সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে যায়। কেউ উইক এন্ড পার্টিতে নেমন্তন্ন করলে সে কোনো একটা ছুতো দেখিয়ে না বলে দেয়। অন্যের পয়সায় সে খেতে চায় না, অন্যদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার ক্ষমতাও তার নেই। প্রতিটি পাউন্ড হিসেব করে চলতে হয় তাকে। প্রতাপ মামা ধার করে তার প্যাসেজ মানি দিয়েছেন। কলকাতায় তাদের সংসার কত কষ্ট করে চলছে সে বুঝতে পারে। একবার সে অতি কষ্টে পঞ্চাশ পাউন্ড পাঠিয়েছিল বাড়িতে, তাতে খুব ধমক দিয়ে চিঠি লিখেছেন প্রতাপ মামা। তুতুলের কিছুতেই টাকা পাঠাবার দরকার নেই, সে যেন তার পড়াশুনোর ক্ষতি না করে, অতিরিক্ত পরিশ্রম না করে। তুতুল ঠিক করে রেখেছে কোনোরকমে তিন বছরের মধ্যেই পড়াশুনো শেষ করে সে দেশে ফিরে যাবে!

কিন্তু সেই তিন বছর আরও কতদূর! এখনও এক বছরও পুরো হয়নি। মাঝে মাঝে তার অসহ্য লাগে, দেশের জন্য মন ছটফট করে। ইচ্ছে করে, সব ছেড়েছুঁড়ে একদিন দৌড়ে গিয়ে প্লেনে উঠে পড়তে। গত শীতটা কিছুতেই কাটতে চায়নি, আবার শীত আসছে! প্রথম তুষারপাতের সময়, চারদিক নির্জন, বিষণ্ণ, তখন দেশের প্রিয় মানুষদের কথা ভেবে মনের মধ্যে একটা আকুলি-বিকুলি ভাব হয়!

সারা সপ্তাহ ধরে শুধু যন্ত্রের মতন কাজ আর পড়াশুনো। সকালবেলা ঘর থেকে বেরুবার পর যার সঙ্গেই দেখা হয় তার সঙ্গেই শুকনো গুড মর্নিং, গুড মর্নিং বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামা। ল্যান্ডলেডির সঙ্গে প্রত্যেকদিন প্রায় একই রসিকতা আর আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা। তারপর হাঁটতে হাঁটতে টিউব স্টেশান। আটটা বাজলেই ভিড় শুরু হয়ে যায়, তাই তুতুলকে একটু আগে আসতে হয়। তুতুল খবরের কাগজ কেনে না, অন্যের ফেলে যাওয়া খবরের কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে। ট্রেন থেকে নামলেই জনস্রোতে মিশে যাওয়া।

৬৭ তুতুল যে সার্জারিতে কাজ করে

তুতুল যে সার্জারিতে কাজ করে, তার কাছেই মার্ক অ্যাণ্ড স্পেনসারের একটি বড় দোকান। সেখানে একদিন দেখা হয়ে গেল শিরিনের সঙ্গে। শিরিন জানালো যে কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে ফিরে আলম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আলম বহ্নিশিখার খোঁজখবর নিচ্ছিল, সে তার নতুন বাসার ঠিকানা জানে না।

আলম তুতুলের জন্য অনেক কিছু করেছে। রঞ্জনের সূত্রেই আলমের সঙ্গে পরিচয়, কিন্তু দু' জনের চরিত্র একেবারে আলাদা। প্রথম প্রথম আলমের পরামর্শ ও সাহচর্য না পেলে তুতুল আরও বিপদে পড়তো। আলমই এই চাকরিটা জোগাড় করে দিয়েছে তুতুলকে, তার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেজন্য আলম কোনো প্রতিদান চায় না। তাকে ধন্যবাদ দিতে গেলেও সে এমনভাবে হেসে উড়িয়ে দেয় যেন এটা কোনো আলোচনার ব্যাপারই না। আলম কখনো তুতুলের শরীর ছোঁওয়ার চেষ্টা করেনি, বরং সে একটা সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রাখে। আলমের কাছে তুতুল সত্যিই কৃতজ্ঞ। যদিও ইদানীং আলমের সঙ্গে বেশি দেখা হয় না। সে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে পড়েছে, বছরে দু তিনবার ঢাকা যায়।

আলম অসুস্থ, তাকে একবার দেখতে যাওয়া উচিত। তুতুল শিরিনকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি দু' একদিনের মধ্যে যাবে ওর বাড়ি? তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

শিরিন একটু ভেবে-চিন্তে পরদিন সন্ধে সাতটায় সময় দিল। সে একটা নির্দিষ্ট টিউব স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, সেখান থেকে আলমের বাড়ি দু তিন মিনিট।

যথা সময়ে গিয়ে তুতুল সেখানে দাঁড়িয়ে রইলা, কিন্তু শিরিনের দেখা নেই। তুতুল অপেক্ষা করলো আধঘণ্টা। এই সময় ট্রেনের সংখ্যা অনেক, একটা ধরতে না পারলে পাঁচ-সাত মিনিট পরেই আর একটা পাওয়া যায়, এত দেরি হবার তো কোনো কারণ নেই। নিশ্চয়ই শিরিন কোনো কারণে আটকে গেছে। বিশেষ কিছু না ঘটলে কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেইল করে না। প্রত্যেকবার ট্রেন থামার পর যাত্রীরা হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসে। তুতুল উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে।

চল্লিশ মিনিট পরে তুতুল অস্থির হয়ে উঠলো। আর আশা নেই। ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পায়নি। এমনকি হতে পারে? তুতুল তো নিউজ স্ট্যাণ্ডের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, সব পত্র-পত্রিকার হেড লাইন তার মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন তুতুল কি করবে? আলমের বাড়িতে একা যাওয়া যায়? আলম অতি ভদ্র, তাতে কখনো অসুবিধে নেই। তাছাড়া, আলম যেমন আড্ডাবাজ, নিশ্চয়ই ওর আরও বন্ধু-টন্ধু আছে। শিরিন তাকে খুঁজে না পেয়ে হয়তো ওখানেই চলে গেছে। অনেক বলে-কয়ে তুতুল আজ সাজারি থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে, এরপর আর সময় পাবে না। এত দূর এসেও সে ফিরে যাবে?

আলমের সঙ্গে তুতুলের দেখা করতে ইচ্ছে করছে। ফিরে যেতে একেবারেই মন চাইছে না।

হাঁটতে হাঁটতে তুতুল ভাবতে লাগলো, শিরিনের সঙ্গে আলমের কী সম্পর্ক? ঠিক বোঝা যায় না। আলম বলেছিল শিরিন তার কাজিন। এক এক সময় মনে হয়, শিরিন তার বান্ধবী। শিরিনের একবার ডিভোর্স হয়ে গেছে, কিন্তু দেখলে মনে হয় কুমারী, ফুটফুটে বাচ্চা বাচ্চা চেহারা। শিরিন কি আলমকে ভালোবাসে? ওদের মধ্যে তো কাজিনের সঙ্গেও বিয়ে হয়।-

দোতলার ফ্ল্যাটটির দরজা খুললো আলম, সে সম্পূর্ণ একা। সে একটা পাজামা ও গেঞ্জি পরে আছে। বাইরে সাত ডিগ্রি টেম্পারেচার। বাড়ির মধ্যে গরম। আলমের চোখ দুটি লালচে, চুল উস্কোখুস্কো, মুখখানা কিছুটা শীর্ণ। তুতুলকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো।

ঘরের মধ্যে ঢুকে, ওভারকোট খুলে তুতুল জিজ্ঞেস করলো, আপনার অসুখ হয়েছে শুনলাম?

আলম সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বললো, আরে ধুৎ, কিছু না, কিছু না! সামান্যই ব্যাপার। কে তোমারে খবর দিল? শিরিন? বাঃ, শিরিন তো একখান বেশ ভালো কাম করছে। সে নিজে আসলো না ক্যান?

তুতুল নিজের ঠাণ্ডা হাতখানা আলমের কপালে ছোঁয়ালো। আলমের বেশ জ্বর, অন্তত চার সাড়ে চার তো হবেই!

আলম হেসে বললো, এক ডাক্তার আসছে আর এক ডাক্তারের চিকিৎসা করতে! হোঃ! আমার একটা বিশ্রি ঠাণ্ডা লাগার ধাত আছে। এ দ্যাশে বরফের মধ্যে হাঁটলেও ঠাণ্ডা লাগে না। কিন্তু নিজের দ্যাশে গ্যালে গরমে-ঠাণ্ডায় সর্দি বসে যায়। কী মুশকিলের কথা! ঠিক হয়ে যাবে, দু' দিনে ঠিক হয়ে যাবে।

তুতুল আলমের নাড়ি টিপে বললো, পালস্ রেট বেশ হাই। কী ওষুধ খাচ্ছেন?

-তোমারে সদারি করতে হবে না। বসো তো! কী খাবে? তুমি তো ওয়াইন-টোয়াইন খাও না, বীয়ারও চলে না, একটু কফি করে দেবো?

-কিছু করতে হবে না, আপনাকে বেশ দুর্বল দেখাচ্ছে। আপনি বসুন। শিরিন কি ফোন করেছিল এখানে?

-না তো। বাদ দাও এখন শিরিনের কথা। তুমি এসেছো, সেটাই বড় কথা। এবারে ঢাকায় গিয়ে কী হলো জানো? আমার যাওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কী সাঙ্ঘাতিক খারাপ

অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের। আয়ুবের কোঁতকা খেয়ে সব পলিটিশিয়ান চুপ মেরে গেছে। অধিকাংশই জেলে। যারা বাইরে আছে, তারাও ভয়ে বাড়িতে বসে থাকে। শেখ মুজিবের নামে কী বদনাম দিয়েছে জানো? শেখ মুজিব নাকি ইণ্ডিয়ার স্পাই। ইণ্ডিয়ার সাথে ষড়যন্ত্র করে শেখ সাহেব নাকি পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

–এখানকার কাগজেও একটা খবর বেরিয়েছিল।

–মিথ্যা কথা! সব মিথ্যা কথা! মোনেম খাঁ'র উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। আইয়ুবও এমন একটা ডাহা মিথ্যার সুযোগ নিয়ে শেখ মুজিবকে শেষ করে দিতে চায়। ক্যান্টনমেন্টে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু তার থেকেও খারাপ কথা কী জানো, ঢাকার কোনো উকিল ব্যারিস্টার শেখ সাহেবের পক্ষ নিয়ে মামলাও লড়তে চায় না। শেখ সাহেবের এত ফলোয়ার, এখন তারা সবাই মুখ সেলাই করে রেখেছে। যেন শেখ সাহেব খতম। পূর্ব পাকিস্তানের সব আন্দোলন খতম! আমি আমার বন্ধু মওদুদ আমেদ ও আর কয়েকজনের সাথে এক সন্ধ্যাবেলা গ্যালাম বেগম মুজিবের সাথে দেখা করতে। ধানমণ্ডির সেই বাড়ি একেবারে অন্ধকার, আগে সব সময় সেখানে পাটির লোকজন থাকতো, আজ একজনও নাই। বেগম আমাদের দেখে কেন্দে ফেলান। তিনি কইলেন, আত্মীয় বন্ধুরা কেউ আর এই রাস্তা দিয়েও হাঁটে না, একটা কাউয়াও এই বাড়ির উপর দিয়া উইড়া যায় না, তোমরা ক্যান আসছো? আমাগো তিনি বিশ্বাস করতে পারতেছিলেন না। আমরা প্রস্তাব দিলাম, শেখ মুজিবের পক্ষে লড়ার জন্য আমরা ব্রিটিশ ব্যারিস্টার নিয়া যাবো। দুই তিনদিন আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত মানিক মিঞার মধ্যস্থতায় তিনি রাজি হইলেন। ওকালতনামা, মানে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছেন আমাদের নামে। বহ্নিশিখা, তুমি দেখবে সেই কাগজ? এবার তুলকালাম হবে। ব্রিটিশ ব্যারিস্টার নিয়া গেলে ওয়ার্ল্ড প্রেসের নজর পড়বে...

এক একজনের সঙ্গে গল্প করার জন্য কোনো বিষয় খুঁজতে হয় না, শব্দ ভাবতে হয় না। সাবলীলভাবে এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়া যায়। আলমের নানান ব্যাপারে

কথা বলার খুব উৎসাহ, তুতুল মুগ্ধ শ্রোতা। কখন যে সময় কেটে যায়, হিসেব থাকে না তার।

এক সময় তুতুল ঘড়ি দেখে বললো, ইস, সাড়ে নটা বাজে! আমাকে এক্ষুনি উঠতে হবে, কত দূরে যাবো!

আলম উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে দেখে বললো, বাইরের শব্দ তো শোনা যায় না। দ্যাখো, এসো, কী রকম কুকুর-বিড়ালে বৃষ্টি হচ্ছে, সেই রকম ঝড়ো হাওয়া। এর মধ্যে যাবে কী করে?

তুতুল পরমাশ্চর্য হয়ে বললো, ঝড়বৃষ্টি? আজ সকাল থেকে চমৎকার সানি ওয়েদার। একফোঁটা মেঘ দেখিনি আকাশে। আজই আমি রেইন কোট নিয়ে বেরুইনি।

আলম বললো, এই হচ্ছে লণ্ডন ওয়েদার। নারীর চরিত্রের মতন দুর্জ্ঞেয়। এই বৃষ্টি মাথায় পড়লে জ্বর হবে নির্ঘাৎ। বসো, বসে যাও!

–আপনার রেইন কোট কিংবা ছাতা যদি ধার নিই। এরপর টিউবে উঠতেও ভয় করবে।

–আগে ঝড়টা তো থামুক। তুমি কি ডিনার করে এসেছো? একটু সুপ আছে, গরম করে দিতে পারি।

জানলার কাছে গিয়ে ঝড় দেখতে দেখতে তুতুল মিথ্যে করে বললো, আমি খেয়ে এসেছি। এখন কিছু লাগবে না।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আলম একটি সিগারেট ধরালো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, এবার ঢাকায় গিয়ে আর একটা সমস্যা হয়েছিল। এতরকম ঝঞ্ঝাট, তার মধ্যেও বন্ধুরা জিজ্ঞেস করছিল, তুই এত অন্যমনস্ক কেন রে? তাদের কী করে বলি যে বহ্নিশিখা নামে একটি হিন্দু মেয়ের মুখ আমার মাথায় ঘুরে ফিরে আসছে, সে কেমন আছে, তার কোনো অসুবিধা হলো কি না, থাকার জায়গা নিয়ে যে গণ্ডগোল চলছিল

তুতুল মুখ ফেরালো। এখন আলমের কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ফুটে উঠেছে, যা হৃদয়ের কোনো একটা জায়গায় লাগে। তুতুল কোনোক্রমেই আর কারুর বাড়িতে এত বেশি সময় বসে থাকতো না। আলমের এখানে তার ঘড়ি দেখার কথা খেয়াল হয়নি কেন?

তুতুল বললো, আপনি আমার কথা এত ভাবতে যাবেন কেন, আমি কি ছেলেমানুষ? এখন, সব চিনে গেছি।

-মনকে তো বোঝানো যায় না। যখন তখন তুমি আমার মনের মধ্যে চলে আসো। তোমার মনে আছে, প্রথম দিন তুমি লণ্ডনে পৌঁছালে, এয়ারপোর্টে দু কদম হাঁটতে গিয়ে তুমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে, আমি তোমার হাত ধরলাম? সেইদিন থেকেই আমার মনে হয়, তুমি কোনো বিপদে পড়লে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে। তোমার হাত ধরতে পারলে আমি ধন্য হয়ে যাবো। একথা এতদিন বলি নাই।

-আমি এবার যাই!

-যাবে? বৃষ্টি থামে নাই এখনো, বেশ জোর। ঠিক আছে, একটা ট্যাক্সি ডাকি, তাতে চলে যাও!

তুতুল আঁতকে উঠে বললো, ট্যাক্সি? সে তো অনেক ভাড়া হবে, আমার বাড়ি কি এখান। থেকে কম দূরে? অসম্ভব!

আলম বললো, তবে আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো। টিউবে, একেবারে বাড়ি পর্যন্ত। আমার ফেরার কোনো অসুবিধা নাই। আমার নিজের গাড়িটাও সারাইতে গেছে। নইলে তাতেই তোমারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসতে পারতাম।

গাড়ি থাকলেও আপনাকে যেতে দিতাম না। আপনার এত জ্বর, টিউব স্টেশনেও যেতে হবে না, আমি একাই যেতে পারবো। একটা শুধু ছাতা।

–এত রাত্তিরে তোমার একা টিউবে যাওয়া সেইফ না। আমাদের এই লাইনটায় প্রায়ই মাগিং হয়। একটা বাজে গ্রুপ আছে। একা কোনো মেয়ে এই সময় যায় না...আর একটা অলটারনেটিভ আছে, আমার আর একটা ছোটঘর আছে, একটা সোফা আছে। সেখানে আমি সচ্ছন্দে শুয়ে থাকতে পারি, তুমি যদি এই ঘরে থাকো।

তুতুল মুখ নিচু করে বললো, না, তা সম্ভব নয়।

–কেউ তো তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবে না? তোমার রুমমেটকে টেলিফোন করে বলেও দিতে পারো।

–তার দরকার নেই, আমি ঠিক চলে যেতে পারবো। আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়, মানে, কাল খুব সকালেই

–সম্ভব নয়, ও আচ্ছা! আমি তবে তোমার সঙ্গে যাবোই।

–নাঃ, প্লীজ, এই জ্বর গায়ে গেলে...আমার রাত্তিরে ঘুম হবে না!

–বহ্নিশিখা, আমি তোমার কাছে কিছু চাই না। বাট আই ডু কেয়ার ফর ইউ! তোমাকে আমি ভালোবাসি, শুধু সেই কথাটা জানিয়ে রাখতে চাই।

তুতুল দেয়ালের দিকে মুখ করে উদাসীন গলায় বললো, আমাকে ভালোবাসলে আপনি ভুল করবেন। আমি অপয়া।

–তার মানে?

–আমাকে যারা ভালোবাসে, তারা কেউ বাঁচে না।

আলম এবার সকৌতুকে হেসে উঠে বললো, মরণ আমারে তিনবার দেখা দিয়ে গেছে। এখনও তালে তালে আছে। আমি যদি বাঁচি তবে অন্য কারুর আয়ুর জোরে। ভালোবাসার জোরেই বাঁচবো। হয়তো তুমিই আমাকে বাঁচাতে পারো।

তুতুল অনেকটা যেন নিজেকে শোনাবার জন্যই বললো, আমার এতক্ষণ এখান থেকে জোর করে চলে যাওয়া উচিত ছিল। তবু আমি যেতে পারছি না।

–কেন পারছো না?

–বোধহয় আমার মনের জোর কমে যাচ্ছে। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছি।

–সেজন্য কি তোমার অনুতাপ হচ্ছে? তুমি কিছু ভুল করছো?

–না, তা বোধহয় বলা যায় না। ঠিক জানি না।

–বহ্নিশিখা, তুমি এ ঘরে এসেই টিপিক্যাল ডাক্তারের মতন অটোমেটিক্যালি আমার কপালে হাত রাখলে, আমার পাস দেখলে। এখন একবার, এমনিই, অকারণে, আমার হাতটা একটু ধরবে?

আলমের দিকে ফিরে তুতুল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

আলম আবার অনুনয় করে বললো, আমি কি তোমার হাতটা একটু ছোঁবার অনুমতি পেতে পারি?

তুতুল বাড়িয়ে দিল নিজের হাত।

শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিতেই ফিরতে হলো তুতুলকে। আলম কিছুতেই শুনলো না, টেলিফোনে একটা ট্যাক্সি ডেকে, সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতেই খুঁজে দিল দশটা পাউণ্ড। সেই ট্যাক্সি থেকে নেমে, বাড়ির সদর দরজা চাবি দিয়ে খুলতে খুলতেই তুতুল ভিজে গেল অনেকটা।

ভাবনা ঘুমিয়ে পড়েছে, তবু শাড়ী বদলাবার জন্য তুতুল গেল বারান্দার বাথরুমে। ভিজে শাড়ী, ব্লাউজ, ব্রা, শায়া খুলে সে দাঁড়ালো আয়নার সামনে। দেয়াল জোড়া আয়না, এভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুতুল কখনো আশিরপদনখ নিজেকে দেখেনি। তার

মুখে একটা তীব্র অনুভূতির ছাপ। তার জীবনের একটা দিকবদল আসন্ন, সে টের পাচ্ছে যে এতদিনে তার শরীর জেগে উঠেছে।

আয়নার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তুতুল। তার মনে পড়লো পিকলুর কথা। আলমের ঘরে থাকতে থাকতেই পিকলুদার কথা মনে পড়ছিল। পিকলুদা একদিন দুপুরে দেখতে চেয়েছিল এই শরীর, এইভাবে। তুতুল রাজি হয়নি। পিকলুদার সেই আহত দৃষ্টি...

কোথায় হারিয়ে গেছে পিকলুদা। জয়দীপও হারিয়ে গেল। আলমকেও কি সে হারিয়ে যেতে দেবে? এমন সম্মান দিয়ে কেউ তো তার শুধু হাত ধরতে চায়নি।

তুতুল অনেকক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদলো। যেন একটা বহুদিন জমে থাকা বরফ গলে যাচ্ছে। জন্ম হচ্ছে একটি নতুন ঝনার, প্রবল তার তোড়, কাঁপিয়ে দিচ্ছে তুতুলের সর্বাঙ্গ।

এর পর প্রায় প্রতিদিন দেখা হতে লাগলো আলমের সঙ্গে। আলম নিজের কাজ নষ্ট করে তুতুলের কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত্রে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়, দরজা পর্যন্ত, তুতুলদের বাড়ির মধ্যে ঢোকে না। নিজের অ্যাপার্টমেন্টেও তুতুলকে ডাকে না। সে শুধু তুতুলের সঙ্গে থাকতে চায়। তার রাগ-অভিমান নেই, হাসি-ঠাট্টায় মশগুল রাখতে চায় তুতুলকে। তুতুলই একদিন দুপুরে আলমকে বললো, তুমি বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছে, কিছু খাওনা বুঝি? এসো, আজ আমার বাড়িতে এসো, আমি তোমায় ভাত বেঁধে খাওয়াবো।

সেই রাতে তুতুল তার মাকে চিঠি লিখতে বসলো। এতদিন সে শুধু কাজের কথা, পারিপার্শ্বিকের কথা, অন্য মানুষজনের কথা লিখেছে। আজ লিখলো নিজের মনের কথা।

সেই চিঠি কলকাতায় পৌঁছোলো পাঁচ দিন বাদে। সকালের ডাকের চিঠি। প্রতাপ তখন আদালতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। পোস্টম্যানের হাত থেকেই খামটা নিয়ে মুন্নি চেঁচিয়ে বললো, পিসিমণি, তোমার চিঠি! ফুলদি নতুন স্ট্যাম্প পাঠিয়েছে, খামটা আমি নেবো।

জপ করতে বসেছিলেন সুপ্রীতি, মেয়ের চিঠির কথা শুনে তিনি দ্রুত মন্ত্র শেষ করলেন। এবারে তুতুলের চিঠি একটু দেরিতে এসেছে। মাত্র সাত আট লাইন পড়েই তিনি দারুণ এক আর্তনাদ করে উঠলেন, ও খোকন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। ও মমতা...

সে রকম চিৎকার শুনলেই সাঙ্ঘাতিক কোনো দুঃসংবাদের আশঙ্কা হয়। প্রতাপ ও মমতা ছুটে এলেন এক সঙ্গে। উৎকণ্ঠায় ছাই বর্ণ মুখে প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে দিদি? দেখি চিঠিটা!

সুপ্রীতির নাভিমণ্ডল থেকে হাহাকার উঠে এলো। সর্বনাশ হয়েছে! আমি বিষ খাবো। তুতুল মুসলমান বিয়ে করতে চায়!

প্রতাপ দ্রুত চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। সুপ্রীতি সত্যিই যেন বিষের জ্বালায় ছটফট করছেন। বেশ কিছুদিন ধরে সুপ্রীতি একেবারে নির্জীব হয়ে গিয়েছিলেন, বাড়িতে তাঁর গলার আওয়াজ শোনাই যেত না। আজ এক প্রচণ্ড আঘাতে যেন তিনি আবার জেগে উঠেছেন। কণ্ঠে ফুটে উঠছে রাগ ও দুঃখের তীব্রতা। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, বিষ দে। ও খোকন, বিষ দে আমাকে। নিমক হারাম, অকৃতজ্ঞ মেয়ে, এত কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছি, তোদের কত কষ্ট হয়েছে। এ বাড়িতে কেউ একটু দুধ খায় না, মাছ খায় না, সেই মেয়ে বিলেতে গিয়ে মুসলমান বিয়ে করবে, একথা শোনার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে হলো?

সুপ্রীতির এতখানি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে প্রতাপ খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। তুতুল ডাক্তারি পাস করে বিদেশে গেছে, সে তো তার নিজস্ব ইচ্ছে অনিচ্ছে অনুসারেই জীবনটা ঠিক করবে। দিদিকে কী করে সান্ত্বনা দেবেন প্রতাপ? চিঠিটা মমতার হাতে দিয়ে তিনি বললেন, দিদি, তুমি মুসলমান বলে এত আপত্তি করছো কেন? তুতুল বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে যাকে পছন্দ করবে, সে নিশ্চয়ই ভালো ছেলেই হবে। সে ছেলে যদি মুসলমানও হয়...

সুপ্রীতি চোটপাট করে বললেন, তার মানে? মুসলমান জামাই আমি মেনে নেবো? কক্ষনো না? ওদের জন্য আমাদের দেশ ছাড়তে হয়নি? আমাদের সর্বস্ব গেছে! দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, কত মানুষকে মেরে ফেলেছে! লক্ষ লক্ষ রিফিউজি এখনো ভিখিরি, সেই রিফিউজিদের হাতে খুন হয়েছে আমার স্বামী, তার জন্যও তো মুসলমানরাই দায়ী! কত লাঞ্ছনা, কত অপমান সহ্য করেছি, সেসব আজ ভুলে যাবো? তুই এত কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছিস, সবই তো ওদেরই জন্য...আমার মেয়ে, সে এ কী করলো খোকন, বংশের মুখে চুনকালি দিল, ওরে খোকন।

প্রতাপ বললেন, দিদি, আস্তে, আস্তে, পাড়ার লোকে শুনলে ভাববে আমাদের বাড়িতে বুঝি কেউ...

সুপ্রীতি বললেন, তার থেকে কম কী হয়েছে? ও মেয়ে মরে গেলেও আমি এত কষ্ট পেতাম না রে, ওঃ ওঃ, খোকন, আমার বুক ধড়ফড় করছে। এত কষ্ট, নিজের পেটের মেয়ে এত কষ্ট দিতে পারে মাকে...

মমতা বললেন দিদি, আগেই এত উতলা হচ্ছেন কেন? বিয়ে তো এখনও হয়নি। তুতুল লিখেছে, আলম নামে একটি ছেলেকে তার পছন্দ হয়েছে, ছেলেটি ডাক্তার, খুব ব্রিলিয়ান্ট, ভালো বংশের ছেলে।

-সে মুসলমান!

-হ্যাঁ, আলম নাম যখন, মুসলমান তো হবেই। তবে, বিয়ের তারিখস্টারিখ এখনো কিছু ঠিক হয়নি, তুতুল লিখেছে সে আপনার আশীর্বাদ চায়...।

মমতার দিকে কটমট করে তাকিয়ে সুপ্রীতি বললেন, আশীর্বাদ? তাকে লিখে দাও, সে যেন পত্রপাঠ ফিরে আসে। দরকার নেই তার বড় ডাক্তার হওয়ার। ওদেশে ছেলেরা গিয়ে মেম বিয়ে করে, আর আমার মেয়ে গিয়ে বিয়ে করতে চাইলো...খোকন, তুই আরও লিখে দে, সে যদি আসতে না চায়, কোনোদিন সে আর আমার মুখ দেখতে পাবে

না...আমার আশীর্বাদ চায়, এত নির্লজ্জ বেহায়া হয়েছে সে! লণ্ডন শহরে বিষ পাওয়া যায় না? আমার অভিশাপ, সে বিশ খেয়ে মরুক! মুসলমানের বউ হওয়ার চেয়ে ও মেয়ের মৃত্যুর খবর পেলেও আমি চোখের জল ফেলবো না!

৬৮ পমপম একটা রেডিও রেখে গেছে

পমপম একটা রেডিও রেখে গেছে। রেডিওটি দেখতে ছোট কিন্তু শক্তিশালী, পমপমের বাবা একবার হংকং থেকে কিনে এনেছিলেন। মানিকদার বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই তাই রেডিওটি চালাতে হয় ব্যাটারিতে। এইসব ব্যাটারি এখনও ভারতবর্ষে তৈরি হয় না, কিন্তু শিলিগুড়ির একটা বাজারে ভালোভাবে খুঁজলে পাওয়া যায়। এই বাজারটিরও স্থানীয় ডাকনাম হংকং মার্কেট।

এই রেডিওতে বি বি সি এবং পিকিং ধরা যায়, একটু রাতের দিকে স্পষ্ট শোনা যায় পিকিং-এর ইংরিজি অনুষ্ঠান। অতীন, মানিকদা আর তপন গভীর আগ্রহ নিয়ে সেই খবর ও ভাষ্য শোনে। প্রথম যেদিন, ২৮শে জুন, পিকিং বেতারে উত্তর বাংলার কৃষক বিদ্রোহের সংবাদ শোনা গেল, সেদিন কী বিপুল উত্তেজনা! বিপ্লবের ডাক এসেছে! সেদিনকার সেই বাতায় একটা লাইন মুখস্থ করে ফেলেছে অতীন, 'দা ফ্রন্ট প অফ দা রেভোলিউশানারি আর্মড স্ট্রাগল লড বাই ইন্ডিয়ান পিল আন্ডার দা গাইডেন্স অফ মাও সে-তুং'স টিচিংস।

তারপর থেকে প্রায় প্রতিরাত্রেই খাওয়াদাওয়ার পর ঘণ্টা দু'এক ধরে পিকিং রেডিও শোনার চেষ্টা করে ওরা। লেনিনের পর মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার নেতৃত্ব এখন যাঁর হাতে, সেই চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর সরাসরি নির্দেশে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে ভারতের বিপ্লব স্ফুলিঙ্গ, এটা একটা বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। শুনলেই রোমাঞ্চ হয়।

পিকিং বেতারের নারী-ভাষ্যকারটির কণ্ঠস্বর অতি ধারালো, ইংরিজি বাক্যগুলি বলে ভেঙে ভেঙে, বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। একদিন সেই মেয়েটি জানালো, উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি অঞ্চলের তিনটি গ্রামের পুলিস স্টেশন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, একজন পুলিস অফিসার ও দশজন পুলিস নিহত। পুলিসরা এখন ভয়ে অনেক গ্রামে ঢুকতে সাহস করে না।

তপন জিজ্ঞেস করলো, মানিকদা, একজন ইনস্পেক্টর ওয়াংদি তো শুধু মারা গেছে, দশজন পুলিসের মরার খবর তো এখানে শোনা যায়নি?

মানিকদা বললেন, ওরা ঠিকঠাক খবর রাখে। এখানকার গভর্নমেন্ট অনেক কিছু চেপে যায়। দেখছিস না দিল্লিরও টনক নড়ে গেছে, তা কি এমনি এমনি। হরেকৃষ্ণ কোঙার বারবার শিলিগুড়িতে ছুটে আসছেন কেন? এই নিয়েই তো অজয় মুখার্জির সঙ্গে জ্যোতিবাবুর ঝগড়া লেগে গেছে!

অতীন বললো, মানিকদা, হরেকৃষ্ণ কোঙারের মতন মানুষও বুরোক্রেসি মানছেন? উনি আইন-আদালত মেনে ভূমিহীন চাষীদের জমি দিতে চান?

মানিকদা বললেন, সংবিধানের শপথ নিয়ে মন্ত্রী হয়েছেন যে। তাতে মোল্লার দৌড় ঐ মসজিদ অবধি!

অতীন বললো, আমি তো মনে করি, আগে জোতদার-জমিদারদের কাছ থেকে সব জমির দলিল কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। নইলে এদেশের কিচ্ছু হবে না।

মানিকদা মৃদু মৃদু হেসে মাথা নাড়তে থাকেন।

অতীন কলেজে ক্লাস নেওয়া শুরু করে দিয়েছে অনেকদিন। তার ভয় ছিল, সে ঠিক মতন পড়াতে পারবে না, মফস্বল কলেজের ধেড়ে ধেড়ে ছেলেদের সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাবে। কিন্তু সেদিক থেকে তার কিছু অসুবিধা হলো না। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের

ইনঅরগানিক কেমিস্ট্রি পড়ানো এমন কিছুই না, প্রায় গল্প বলে যাওয়ার মতন। এমনিতেই অর্ধেক ছেলে আসে

ক্লাসে, কলেজও বন্ধ থাকে প্রায়ই। ক্লাসে যারা আসে, তাদের মধ্যে মাত্র তিনচারজনের পড়াশুনোয় কিছুটা মন আছে, অতীনও ঠিক করেই রেখেছে যে শুধুমাত্র পড়াশুনোয় যারা খুব আগ্রহী তাদেরই সে সাহায্য করবে। বাকি ছাত্ররা যার যা খুশি করুক। কোনোরকমে একটা ডিগ্রি নিয়েই বা তাদের কী এমন হাতি-ঘোড়া হবে?

ক্লাস রুমে রাজনীতির আলোচনা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন মানিকদা। কলেজের গভর্নিং বডিগুলো কংগ্রেসের ঘাঁটি। অতীন অস্থায়ী নিয়াগপত্র পেয়েছে, সামান্য কারণে তার চাকরি যেতে পারে। চাকরি চলে গেলে তার আর উত্তরবঙ্গে থাকা হবে না।

ক্লাস রুমে অতীন সে রকম কিছু না বললেও সে সহকর্মীদের কাছে নিজেকে চেপে রাখতে পারে না। প্রফেসার্স রুমে এখন কোনো পড়াশুনোর কথা হয় না, সব সময় রাজনীতির আলোচনা। যারা বাড়ির চাকরদের সঙ্গে, রিকশাওয়ালা, বাজারের ছোট দোকানদার, গ্রামের চাষা, কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে তুই-তুকারি ছাড়া কথা বলে না, তাদের মুখেও শ্রমিক কৃষক শ্রেণী সম্পর্কে বড় বড় কথা শুনলে অতীনের পিত্তি জ্বলে যায়। তাছাড়া, বেশীর ভাগ এইসব তথাকথিত শিক্ষিত অধ্যাপকদের পৃথিবীর ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান যে এত কম, অতীনের তা ধারণায় ছিল না। কিছুদিন আগেও সে ছিল ছাত্র, অধ্যাপক শ্রেণীকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হতো, আরও মনে হতো, এরা সবাই অন্য চাকরি না নিয়ে শিক্ষা জগতের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে অনেক আত্মত্যাগ করছেন। এখন অতীন অনেক বয়স্ক অধ্যাপকদের সঙ্গে এক ঘরে বসে আড্ডা দেয় এবং টের পায় যে এরা অধিকাংশই অতি স্যাঁতসেঁতে ধরনের সাধারণ মানুষ। এদের এত কাছাকাছি না এলেই ভালো হতো।

সখের বামপন্থীদের মতন অতীন ধীর, স্থির, যুক্তিবাদী নয়। অন্যদের মুখে প্রতিক্রিয়াশীল কথাবার্তা শুনেও সে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি হাসতে পারে না। সে রেগে ওঠে, সে টেবিল

চাপড়ায়, কারুর মুখের ওপর বলে দেয়, আপনি মশাই মঙ্গলকাব্য পড়েছেন বলে লাও চাও-এর লেখা পড়বেন না, এমনকি কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছে আপনাকে।

সহকর্মীদের মধ্যে অতীনের গোপন ডাকনাম হয়ে গেছে রাগী মজুমদার।

গরমের ছুটিতে অতীনের কলকাতায় যাওয়া হলো না, সেই সময়েই তো আসল ঘটনাগুলো ঘটতে লাগলো উত্তরবঙ্গে। অতীন আশা করেছিল, ভূমি দখলের লড়াইগুলিতে গোপনে গোপনে তারাও অংশ নেবে। কিন্তু মানিকদা বলেছেন, তার কোনো প্রয়োজন নেই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের ঐ সব জায়গায় দেখা গেলে পুলিশ তৎপর হয়ে উঠবেই। এখনও তার সময় আসেনি। অতীন আর কৌশিক অবশ্য মানিকদাকে না জানিয়ে তবু দুটো জায়গায় জমি অধিকার দেখতে গিয়েছিল। দু জায়গাতেই প্রতিরোধ হয়েছে অতি সামান্য।

মানিকদার আখড়ায় এখনও অতীন আর তপন নিয়ে তিনজনই স্থায়ী বাসিন্দা। পমপম আর কৌশিক আসে মাঝে মাঝে। পুরোনো স্টাডি সার্কেলের আরও কেউ কেউ আসে, কিন্তু বেশিদিন থাকে না।

অতীন তার মন থেকে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেছে। বিপ্লব শব্দটা শুনলেই তার রক্ত চনমন করে ওঠে। একটা সত্যিকারের বিপ্লবে অংশ নেবার জন্য তার আর তর সইছে না। একটা অটুট যুক্তিও তৈরি হয়ে গেছে মনের মধ্যে। তার বাবা ও তাদের পরিবারকে সে অনেক কষ্ট সহ্য করতে দেখেছে। সে দেখেছে অনেক মূল্যবোধের অবক্ষয়। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এখনো এদেশে মাথা গোঁজবার জায়গা পায়নি কিংবা পায়নি মানুষের সম্মান। তারা যেন মানুষের চেয়ে হীনজাতীয় কিছু। এজন্য তার বাবা এবং আরও অনেকে শুধু দেশ বিভাগকেই দায়ী করেন। আসলে এটাই চরম ভুল! ভারতের স্বাধীনতাই তো নিছক সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই না। তাদের পরিবারের মতন আরও অনেক পরিবারই দিন দিন নেমে যাচ্ছে নীচে, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা যে-অবস্থায় আছে, এদেশের কোটি কোটি ভূমিহীন খেত মজুরদের অবস্থা তাদের থেকে কোনো অংশে ভালো নয়। আসলে সমাজ ব্যবস্থারই

কোনো পরিবর্তন হলো না। ঘুচলো না শ্রেণী বিভেদ, আর সমবণ্টনের কথা তো শাসক শ্রেণী উচ্চারণই করে না। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ঘুচলো না ধর্মীয় বিভেদ। জাতীয়তাবাদের মিষ্টি মিষ্টি বুলি দিয়ে ক্রমাগত ঢাকা দেবার চেষ্টা হচ্ছে দেশ জোড়া দারিদ্র্যের দগদগে ক্ষত। এতদিন ব্রিটিশরা শুষেছে, এখন শুষছে মহাজন, জোতদার, ব্যবসায়ী ও আমলাতন্ত্র। সশস্ত্র আঘাত না দিলে, আগুন না জ্বাললে এই ব্যবস্থা বদলাবে না। সেই বদলের প্রক্রিয়ায়, সেই বিপ্লবে অতীন যদি অংশ নিতে পারে, তাহলে সে তো তার বাবা-মায়ের আক্ষেপই দূর করবে। সে একদিন তার বাবার সামনে গিয়ে বলতে পারবে, দ্যাখো, তোমরা যা পারোনি, আমরা তাই করেছি, আর কোনো বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে ভারি হবে না এদেশের বাতাস।

পুজোর ছুটিতে অলি দার্জিলিং বেড়াতে আসবার কথা লিখেছিল। অতীন তাকে নিষেধ করেছে। অলি বলে রেখেছিল, অতীন উত্তরবঙ্গে চাকরি নিলে সে এই দিকটা ভালো করে বেড়াবে। একা আসবে না অবশ্য, দু একজন বান্ধবীকে আনবে, ছোট বোন বুলিকেও আনতে হবে, তাছাড়া অলির এক মামাতো বোন সঙ্ঘমিত্রাও আসতে চায়। কিন্তু এখন অতীনের পক্ষে অলিদের গাইড হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করা একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া, এই কি বেড়াবার সময়? যে-কোনোদিন বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অলির তিন চারখানা চিঠির উত্তরে অতীন একটা চিঠি লেখে, তাও বেশ সংক্ষিপ্ত। অলি ঠিক কোনো অনুযোগ করে না, তবু অতীনের মনে অপরাধ বোধ জমে। সে কেন ভালো করে চিঠি লিখতে পারে না? অলি ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্রী, সে বাংলাও ভালো জানে, সে সুদীর্ঘ, বর্ণনামূলক চিঠি লেখে। অতীন রবীন্দ্রনাথের মতন সাহিত্য-সাহিত্য চিঠি লিখবে তা নিশ্চয়ই কেউ আশা করে না, কিন্তু সে কেন নিজের মনের কথাও লিখতে পারে না স্পষ্ট করে? সে অলিকে ভালোবাসে এতে তো কোনো ভুল নেই, দূরে এলে ভালোবাসার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বোঝা যায়, প্রতিদিন অলির কথা তার মনে পড়ে অনেকবার, সে কথা আর কারুকে বলা যায় না, কিন্তু অলিকেও চিঠিতে লেখা যায় না? সে চিঠি লিখতে বসলেই মানিকদা, কৌশিক, পমপমের মুখগুলো মনে পড়ে, ওরা তো

কারুর সঙ্গে প্রেম করে না, প্রেমের চিঠি লেখে না, তবে অতীন কি স্বার্থপর? কৌশিক, মানিকদা, পমপম জীবনে অন্য কারুকে চুমু খেয়েছে একথা ভাবাই যায় না। ওরা যদি জানতে পারে...তাহলে কি অতীনকে নিজেদের দল থেকে বাদ দিয়ে দেবে? ঠাট্টা করবে?

তবু একদিন অলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে খুব আশ্চর্য ঘটনা। অলি চিঠিতে কিছুই লেখেনি, অতীনেরও সেদিন ঐ সময় হিল ভিউ হোটেলের সামনে যাবার কথা নয়। কয়েকদিন আগেই কৌশিক চিঠিতে জানিয়েছিল যে ধর্মতলা স্ট্রিটে "দেশহিতৈষী" অফিসে পার্টির একদল ক্যাডার জোর করে ঢুকে পড়ে সুশীতল রায়চৌধুরীকে তাড়িয়ে দিয়ে পত্রিকাটার দখল নিয়েছে! তারপরেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থকরা "দেশব্রতী" ও "লিবারেশান" নামে দুটি পত্রিকা বার করার সিদ্ধান্ত নেয়, দু'চারদিনের মধ্যেই বেরুবে। হিল ভিউ হোটেলের তলায় মনোজবাবুর কাছে পাওয়া যাবে সেই পত্রিকা। অতীন গিয়েছিল সেই খোঁজ নিতে।

সেই পত্রিকার কোনো কপি আসেনি, অতীন দেখতে পেল অলি আর তার তিনজন বান্ধবীকে। তাদের মধ্যে একজন বর্ষা।

অতীন প্রথমেই ভাবলো, বইওয়ালা বিমানবিহারী খুব মডার্ন হয়েছে তো! কোনো পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছে? এমনকি ইনফরমার হিসেবে ছোট মেয়ে বুলিকেও পাঠায়নি?

অলি তখনও দেখতে পায়নি অতীনকে, সে পেছন ফিরে কথা বলছে একজন ড্রাইভার জাতীয় লোকের সঙ্গে। বর্ষার সঙ্গেই তার প্রথম চোখাচোখি হলো, বর্ষার মুখে একটা চাপা বিদ্রূপের হাসি। অতীন বেশ খানিকটা দ্বিধার মধ্যে পড়লো। এমনভাবে, কোনো খবর না দিয়ে, এক দঙ্গল মেয়ে নিয়ে এসে পড়লো অলি! এখন ওদের থাকার ব্যবস্থা করা যাবে কোথায়? মানিকদার ওখানে ঘর আছে বটে, কিন্তু সেখানে ওদের নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে? মানিকদা একদিন বলেছিলেন, খাঁটি রাজনৈতিক কর্মীদের শুধু নৈতিক চরিত্র বিশুদ্ধ রাখাই বড় কথা নয়, তাদের সব সময় সজাগ থাকা দরকার যাতে কেউ তাদের

লঘুচিত্ত, বিলাসী বলে মনে না করে। সত্যিকারের কর্মীদের খাওয়াদাওয়া নিয়ে একেবারেই খুঁতখুঁতে হলে চলবে না, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করার ব্যাপারে সব সময় সংযত থাকা দরকার। পমপমের কথা আলাদা, সে এলে একসঙ্গেই থাকে, কিন্তু স্টাড়ি সার্কেলের অন্য মেয়েরা এসে উপস্থিত হলে মানিকদা তাঁর মামাবাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

অলিকে চেনেন মানিকদা, অলি স্বেচ্ছায় স্টাডি সার্কল ছেড়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে রয়েছে। আবার উগ্র সাজপোশাক করা দুটি মেয়ে আর বর্ষা, ঐ বর্ষা নামের মেয়েটা মানিকাদার মুখে মুখে কী কথা বলে বসবে তার ঠিক নেই। এদের মানিকদার আস্তানায় নিয়ে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ওদের জন্য একটা হোটেল ঠিক করে দিতে হবে! অতীন বেশ বিরক্ত বোধ করলো অলির ওপর।

বর্ষা অলির কাঁধ ছুঁয়ে ইঙ্গিত করতেই অলি পেছন ফিরে অতীনকে দেখলো। তার সরল দুটি চোখে ফুটে উঠলো প্রকৃত বিস্ময়। সে লজ্জা লজ্জা ভাব করে হেসে জিজ্ঞেস করলো, বাল্লুদা, তুমি কী করে খবর পেলে? মুন্নি বুঝি চিঠি লিখে দিয়েছে? তুমি আমাদের জন্য কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছো এখানে? ট্রেন একটু লেট ছিল...আলাপ করিয়ে দিই, এই আমার মামাতো বোন সঙ্ঘমিত্রা, আর এ হচ্ছে অনীতা, আমাদের সঙ্গে পড়তে এক সময়।

অতীন বললো, চল আগে তোদের জন্য হোটেল ঠিক করি, এখানে এই সময়টায় হোটেল পাওয়া মুশকিল।

অলি বললো, আমরা এখানে থাকবো কেন? আমরা তো দার্জিলিং যাচ্ছি।

অতীন ভুরু কুঁচকে বললো, দার্জিলিং যাবি? এতজনে মিলে সেখানে থাকবি কোথায়? আগে থেকে বুক না করলে কি দার্জিলিং-এ হোটেল পাওয়া যায়?

–এই সঙ্ঘমিত্রাদের একটা বাড়ি আছে ম্যালের কাছেই, সেখানে থাকবো, সব ব্যবস্থা করা আছে! তাছাড়া দার্জিলিং-এর এস পি বাবার বন্ধু...

অতীন ধরেই নিয়েছিল যে অলিদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা ও দেখাশুনো করার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। কিন্তু অলিরা শিলিগুড়িতে থাকতে আসেনি, দার্জিলিং ভ্রমণের ব্যবস্থা তারা আগেই ঠিক করে নিয়েছে। কোনো অচেনা জায়গায় থাকতে গেলে অতীন হোটেলের কথাই ভাবে, সে উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান, তার খেয়াল থাকে না যে অলিরা অনেকটা উচ্চস্তরের মানুষ, তার মামা কিংবা কাকাদের বাড়ি থাকে দার্জিলিং কিংবা পুরীতে, হাইকোর্টের জজ ব্যারিস্টাররা তাদের মেলোমশাই-পিসেমশাই হয়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিসের এস পি-দের তারা অমুকদা, তমুকদা বলে ডাকে। প্রথমে অলিদের থাকার ব্যবস্থা তাকে করতে হবে ভেবে অতীন অস্বস্তি বোধ করছিল, এখন ওদের জন্য কোনো ব্যবস্থাই তাকে করতে হবে না। জেনে সে একটু অপমানিত বোধ করলে।

সঙ্ঘমিত্রা নামের মেয়েটি বললো, আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে? চলুন না, তিন-চারটে ঘর আছে, কোনো অসুবিধে হবে না।

অলি ছেলেমানুষের মতন আবদারের সুরে বললো, চলো, বাবলুদা, চলো! দুটো তিনটে দিন কলেজ থেকে ছুটি নিতে পারবে না?

উত্তর বাংলায় চাকরি করতে এসেও এতদিনের মধ্যে অতীনের দার্জিলিং কালিম্পং দেখা হয়নি। নিছক ভ্রমণের জন্য হয়তো ওদিকে কখনো যাওয়াও হবে না। মানিকদা বলেছেন এখন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির তরাই অঞ্চলেই সংগ্রামের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে।

অলি আর সঙ্ঘমিত্রার কথা শুনে অতীনের একবার লোভ হলো। চট করে দিন তিনেকের জন্য ঘুরে এলে কেমন হয়? কলেজে ছুটি নেওয়া কোনো সমস্যাই নয়।

পরমুহূর্তেই সে ভাবলো, এটা অসম্ভব! চারটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে সে একা পুরুষ মানুষ হিসেবে পাহাড়ে বেড়াতে যাবে? যে-কেউ এটাকে বেলেল্লা মনে করবে না? মানিকদা

শুনলে ছি ছি করবেন। এই যে সে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে এদের সঙ্গে কথা বলছে, এটাই কি শোভন হচ্ছে, তার ছাত্রেরা ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই দেখছে, যদি কিছু বদনাম ছড়ায়?

অলির প্রতি তার অভিমান হলো! অলি একা আসতে পারতো না? অলির সঙ্গে তার কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি। সেই শুধু একবার কৃষ্ণনগর যাওয়ার পথে ...

সে শুকনো গলায় বললো, আমি কী করে যাবো! আমার কয়েকটা জরুরী কাজ আছে। অলি তবু বললো, বাল্লুদা, প্লীজ চলো। খুব মজা হবে। অতীন বললো, আমার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তোরা কি টয় ট্রেনে দার্জিলিং যাবি?

–না। ট্যাক্সিতে, ঠিক করা হয়ে গেছে।

তাহলে তো আর কিছুই বাকি নেই। অতীন কি ওদের অন্তত এককাপ করে চা খাওয়াবে? এতদিন পর অলির সঙ্গে দেখা, তার বুকের ভেতরটা এখনও উত্তেজনায় থরথর করছে, অথচ অলির সঙ্গে একটাও ব্যক্তিগত কথা বলা হলো না। বাকি তিনটি মেয়ের কাছ থেকে অলিকে আলাদা করে সরিয়ে নেওয়া যায় না। অলি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অতীনের মুখের দিকে। সে যেন কিছু শুনতে চাইছে।

কিন্তু আর কিছুই বলা হলো না। ট্যাক্সি ড্রাইভার তাড়া দিচ্ছে, ওরা উঠে পড়লো গাড়িতে। অতীন ওদের চা খাওয়াবার প্রস্তাবও দিল না। বর্ষা একটাও শব্দ উচ্চারণ করেনি, কিন্তু তার ঠোঁটে সেই চাপা হাসি, যেন সে বলতে চায়, অলির ওপরে অতীনের চেয়ে তার অধিকার বেশী।

গাড়িটা ছাড়ার আগের মুহূর্তে অলি জিজ্ঞেস করলো, ফেরার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

অতীন খানিকটা যুক্তিহীনভাবে বললো, আমি সামনের সপ্তাহে কলকাতা ফিরছি, তোরা এই সময়ে কেন এলি? আমাকে অনেক কিছু কাজকর্ম গুছিয়ে নিতে হবে।

অলি বললো, তুমি যে ফিরছো, সেকথা তো আমায় জানাওনি। আমরা ভেবেছিলুম, তোমার আর কলকাতায় যেতে ইচ্ছেই করে না। তুমি কবে যাবে, আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে ফিরো। আমরা মঙ্গলবার বিকেলে এখানে চলে আসছি।

–আমায় রোববার ট্রেন ধরতে হবে।

–কেন, দুটো দিন অপেক্ষা করতে পারবে না? আমরা ট্রেনে একসঙ্গে যেতে পারি তাহলে

–মাকে চিঠি লিখে দিয়েছি সোমবার পৌঁছোবো, এখন আর বদলানো যাবে না।

ট্যাক্সিটা যানবাহনের স্রোতে মিলিয়ে যাবার পরেও অতীন সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মিনিট। মাকে সে ফেরার তারিখ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে, অলিকে কিছু লেখেনি। আজই সে অলিকে চিঠি পাঠাবে ঠিক করেছিল, একথাটা অলিকে বলা হলো না, বললেও অলি কি বিশ্বাস করতো? এই কয়েক মাসেই অলি যেন অনেকটা বদলে গেছে!

সাইকেল রিকশা না নিয়ে অতীন হাঁটতে লাগলো বাড়ির দিকে।

আজ অতীনের অফ ডে। কলেজ যাবার তাড়া নেই, আজ তার ওপর রান্নার ভার। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে সে দেখলো, তপন অফিস যায়নি, রান্নাবান্না সে-ই সেরে রেখেছে এর মধ্যেই। মানিকদা মেঝেতে বড় একটা কাগজ মেলে মন দিয়ে ম্যাপ আঁকছেন। ইদানীং ম্যাপ আঁকার খুব ঝোঁক হয়েছে মানিকদার। একদিন তিনি খুব দ্রুতগতিতে, মাত্র কয়েকটা টানে অতীনের মুখের একটা স্কেচ করেছিলেন, তাতে বোঝা যায় মানিকদার বেশ ভালোই আঁকার হাত কিন্তু তিনি ঐ প্রসঙ্গ তুললেই উড়িয়ে দিতে চান।

আজ সকালের ঘটনায় অতীনের ঠিক মন খারাপ হয়নি কিন্তু মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। চারটে মেয়ে ঝলমলে পোশাক পরে দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছে, এরকম অনেকেই যায়,

কিন্তু তাদের মধ্যে অলি থাকবে কেন? অলিকে মানায় না। বর্ষাও পরেছে শাড়ির বদলে শালোয়ারকামিজ, যথারীতি সিগারেট টানছিল, ঐ মেয়েটাকে অতীন পছন্দ করে না জেনেও অলি কেন ওকে প্রশ্রয় দেয়? এরপর অলিকে একদিন স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে, তুমি বর্ষা আর আমার মধ্যে একজনকে বেছে নাও!

নিজের ঘরে গিয়ে সাদা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে রইলো অতীন। ছোটবেলায় তার রাগ হলেই দেয়ালের এক কোণে গিয়ে এইভাবে বসে থাকতো সে। একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেশলাই কাঠির বারুদটা ফস করে অনেকটা জ্বলে গিয়ে তার আঙুলে ছ্যাঁকা লাগলো। এক একদিন এরকমই হয়। কেন সে আজ ঐ সময়ে বাস স্টেশনে গেল, অলির সঙ্গে তার আজ দেখা না হলেই ভালো হতো! অতীন শিলিগুড়িতে রয়েছে, তবু তাকে কিছু না জানিয়েই অলি দার্জিলিং যাবার ব্যবস্থা করবে, এটা অন্যায় নয়?

মানিকদা একসময় অতীনকে ডেকে ম্যাপটা দেখাতে লাগলেন। একটা পিন টানতে টানতে বললেন, এই দ্যাখ, পশ্চিমে নেপাল, পুবে সিকিম আর ভুটান, আর দক্ষিণে হলো

পূর্ব-পাকিস্তান। এইটুকু এরিয়ার মধ্যে আমাদের কাজ। আর্মড স্ট্রাগল শুরু করার পক্ষে এরকম স্ট্র্যাটেজিক এরিয়া পাওয়াই একটা দারুণ ব্যাপার। নকশালবাড়ি আর নেপালের মাঝখানে এই যে নদীটা দেখছিস, এর নাম মেচি, শীতকালে প্রায় শুকিয়ে যায়, পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। এরপর যখন সরকার-পুলিসের সঙ্গে আমাদের সত্যিকারের কনফ্রনটেশান হবে, তখন আমাদের হাইড আউট হবে এই নদী পার হয়ে নেপালে।

তপন বললো, কিন্তু আন্দোলন তো থেমে গেল, মানিকদা। টাঙ্গি, লাঠি, শাবল নিয়ে যে বন্দুকধারী পুলিসের বিরুদ্ধে লড়া যায় না, তা তো প্রমাণ হয়ে গেল।

মানিকদা বললেন, না, কিছুই প্রমাণ হয়নি। আন্দোলন থামেনি, এটা হচ্ছে প্রথম রাউন্ড। এর থেকে কিছু কি শিক্ষা পাওয়া যায়নি? প্রধান শিক্ষাই হলো এই যে এই প্রথম দেখা গেল চাষীরা শুধু জমি কিংবা ফসলের জন্য লড়েনি, তারা লড়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য। সরকার কিংবা পুলিসের বিরুদ্ধে তারা তাদের নিজস্ব অস্ত্র নিয়ে লড়তে

ভয় পায়নি। কোনো কোনো জায়গায় পুলিসের হাত থেকে রাইফেলও কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কী হয়নি?

তপন দুবার মাথা নাড়লো। অতীন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, তবু সে যেন ঘাড় ধরে তার মনটাকে ফেরাতে চায়।

মানিকদা আর একটি ম্যাপ বার করে বললেন, এটা দ্যাখ, এটা হচ্ছে ফাঁসি দেওয়া থানা এরিয়ার ডিটেইল, তার মধ্যে এই জায়গাটার নাম চৌপুখুরিয়া।

অতীন জিজ্ঞেস করলো, এখানে কী হবে?

মানিকদা বললেন, আজ দুপুরে ঐ চৌপুখুরিয়ায় যাবো, যদি তোদের আপত্তি না থাকে। কিন্তু কেন যাচ্ছি, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা চলবে না।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা বেরিয়ে পড়লো। খানিকটা রাস্তা যাওয়া হলো বাসে, তারপর মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটা। সকালে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। দুদিকের মাঠে কোনো কোনো জমিতে ফসল ফলেছে, কোনো কোনো জমি ফাঁকা। এরই কিছু কিছু জমিতে কিষান সভার ঝাণ্ডা উড়েছিল, দু'এক মাস পুলিস এদিকে পা বাড়াতেই পারেনি কিন্তু এখন সেইসব ঝাণ্ডার আর কোনো চিহ্ন নেই। মাঝারি চাষী ও জোতদারেরা ফিরে পেয়েছে তাদের জমি-জায়গা।

একটা ক্ষেতের দিকে হাত দেখিয়ে মানিকদা বললেন, এই জমিটা ছিল বিগুল কিষানের। মনে আছে তার কথা?

অতীন আর তপনের কিছু মনে নেই। মানিকদা বললেন, বিগুল কিষান ছিল একজন বগাদার। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা যেদিন থেকে এলো, সেদিন থেকে হঠাৎ রটে গিয়েছিল যে এই অকংগ্রেসী সরকার এবার মাঝারি চাষী ও জোতদারদের জমির মালিকানা কেড়ে নিয়ে বগাদার আর ভূমিহীন শ্রমিকদের দিয়ে দেবে। তাই 'জোতদারেরা, বগাদারদের

হঠাতে শুরু করে দিল, জমি চাষ করা বন্ধ করে দিল। এই বিগুল কিষানও জমি থেকে বিতাড়িত হয়ে মামলা লড়তে গেল কোর্টে এবং আশ্চর্যের ব্যাপার জিতেও গেল। এতে আমাদের হরেকৃষ্ণ কোঙারদের মতন নেতাদের খুশি হওয়ার কথা। তাঁরা তো আইনের পথেই চাষীদের অধিকার দিতে চান। দ্যাখ কোঙারদাকে তো আমি অনেকদিন ধরে চিনি, মানুষটা সাচ্চা, গ্রামে-গঞ্জের চাষীদের অবস্থাও খুব ভালো বোঝেন, তবু তিনি যে কেন আইন কানুনকে এত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শুরু করলেন সেটাই বুঝি না।

তপন জিজ্ঞেস করলো, বিগুল কিষান জেতবার পর কী হলো?

লবডঙ্কা হলো। মামলায় জেতবার পরেও জমির মালিক তাকে জমিতে পা দিতে দিল, মেরে ধরে তাড়িয়ে দিল তাকে। এত ভেতরের দিকের গ্রামে কে আইনকানুন মানে? কে কোর্টের রায় গ্রাহ্য করে? যারা একটু অবস্থাপন্ন তারা পয়সা দিয়ে পুলিসকে হাত করে রাখে। মামলায় জিতেও বিগুল কিষান কিছুই পেল না। তখন সে গেল জঙ্গল সাঁওতালের কাছে। গত মে মাসে কিষাণ সভার একটি বড় দল এসে জবর দখল করে গেল এই জমি, এখানে ঝাণ্ডা পোঁতা হলো, জোতদারের গুণ্ডারা এদিকে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

তারপর আবার তার জমি চলে গেল, এই তো?

–হ্যাঁ, আবার জোতদার আর পুলিস হাত মিলিয়ে তাকে হঠিয়েছে বটে, কিন্তু বিগুল একটা জিনিস বুঝেছে। তার মতন গরিব লোকদের আদালতের দ্বারস্থ হয়ে কোনো লাভ নেই। যদি তাকে অধিকার ফিরে পেতে হয়, তাহলে সঙ্ঘবদ্ধ চাষীদের সঙ্গে থেকেই সে তা পাবে। এরপর, তাদের আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

–আচ্ছা মানিকদা, বিগুল কিষানের মতন যারা এবছর কোনো জমিই চাষ করার সুযোগ। পেল না, তারা এখন কী করবে, তারা সারা বছর কী খেয়ে বাঁচবে?

–যারা জেলে যায়নি, তারা অনেকে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে লড়াই থেমে যায়নি, তারা হেরে যায়নি, কিছুটা প্রস্তুতি নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

একটু থেমে পকেট থেকে ভাঁজ করা ম্যাপটা বার করে দেখতে লাগলেন মানিকদা। এর মধ্যে মেঘে আকাশ কালো হয়ে এসেছে, ভালো করে দেখা যায় না। এক জায়গায় আঙুল দিয়ে মানিকদা বললেন, আর একটু পরেই একটা ছোট নদী পেয়ে যাবার কথা। তার পাশে একটা ছোটখাটো জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা মুসলমানদের গ্রামে যেতে হবে আমাদের।

তপন বললো, মানিকদা, মাঠের মধ্যে খুব জোর বৃষ্টি এসে গেলে মুশকিলে পড়ে যাবো।

মানিকদা বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু বৃষ্টির চেয়েও বেশি মুশকিল হবে অন্ধকার হয়ে গেলে। তখন আর জঙ্গলে ঢোকা যাবে না।

তারপর পেছন দিকে একবার ঝট করে তাকিয়ে বললেন, তোরা কি লক্ষ করেছিস, অনেকক্ষণ ধরেই ঐ তিন-চারটে লোক আমাদের পেছন পেছন আসছে? ওরা কি আমাদের ফলো করছে, না এমনি গ্রামের লোক।

তপন বললো, আমিও অনেকক্ষণ ধরেই ওদের দেখছি। আর কোনো লোক নেই, শুধু ওরা তিনজনই আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই যাচ্ছে।

মানিকদা চিন্তিতভাবে বললেন, তাহলে বোধ হয় আজ আর না যাওয়াই ভালো, চল বড় রাস্তায় উঠে পড়া যাক।

অতীন অবাক হয়ে বললো, আমরা মাঠ দিয়ে হেঁটে যাবো, তাতে আমাদের কেউ ফলো করবে কেন? এদিকে যাদের বাড়ি তারা তো মাঠ দিয়েই যায়। আমরা কারুর জমি দিয়ে যাচ্ছি না, আল দিয়ে হাঁটছি।

মানিকদা বললেন, লোকগুলো সুবিধের মনে হচ্ছে না। চল আজ ফিরে যাওয়াই যাক।

অতীন বললো, এতদূর এসে ফিরে যাবো? আপনি হঠাৎ এত ভয় পাচ্ছেন কেন মানিকদা? চলুন, চলুন কিছু হবে না।

মানিকদা অতীনের চোখের দিকে চেয়ে বললেন, তুই বলছিস যেতে? তাহলে চল। আমি ভয় ঠিক পাচ্ছি না।

তপন বললো, ওরা যদি বাজে লোক হয়, তা হলে এই মাঠের মাঝখানে আমাদের ঘিরে ফেললে আমরা কিছুই করতে পারবো না।

অতীন তাকে এক ধমক লাগিয়ে বললো, তুই তো দেখছি মহা ভীতুর ডিম! কোনো একটা কাজে বেরিয়ে সেটা ফুলফিল না করে ফিরে যাওয়া আমি পছন্দ করি না!

আবার ওরা হাঁটতে লাগলো সামনের দিকে। এদিকের মাঠ একেবারে ফাঁকা, কাছাকাছি . কোনো জনবসতি নেই। পেছনের লোকগুলোকেও আর দেখা গেল না। মেঘ একেবারে নিচু হয়ে এসেছে, আর বিশেষ দেরি নেই বর্ষণের। কেন যেন অসংখ্য ফড়িং উড়ছে এখানে।

আকাশের গায়ে রেখা টেনে উড়ে যাচ্ছে অনেক চিল।

অতীন বললো, দেখলি তপন, ওরা এমনি নিরীহ লোকই ছিল, তুই শুধু শুধু ভয় খাচ্ছিলি। মানিকদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? আপনি অনেকক্ষণ সাসপেন্সে রেখেছেন। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, এবার জানতে পারি?

মানিকদা হেসে বললেন, হ্যাঁ, এবার বলা যেতে পারে। ইস্ট পাকিস্তান থেকে এসেছেন যে কমরেড খোকন মজুমদার, তিনি এখানে এক জায়গায় লুকিয়ে আছেন। চারুবাবু তাঁকে একটা বিশেষ খবর দেবার জন্য পাঠিয়েছেন আমাকে। খবরটা জরুরী। অন্য কারুর মুখেও পাঠানো যায় না।

অতীন বললো, কমরেড চারু মজুমদার আপনাকে একটা কাজ দিয়েছেন, তবু সেটা না কমপ্লিট করে আপনি ফিরে যেতে চাইছিলেন? কী বলছেন, মানিকদা?

–আরে, আমি যদি মাঝপথে ধরা পড়ে যাই, তাহলে আমিও পোঁছোবো না, খবরটাও পৌঁছোবে না। তাতে কি কোনো লাভ আছে?

–আমরা থাকতে আপনাকে কে ধরবে? আপনার সঙ্গে কি কোনো চিঠি-টিঠি আছে না ওয়ার্ড অফ মাউথ!

–কমরেড খোকন মজুমদারকে যা বলার তা শুধু আমাকেই বলতে হবে। সে কথা এখন তোদের জেনে লাভ নেই।

তপন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মানিকদা, ঐ খোকন মজুমদার হিন্দু না মুসলমান? মানিকদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ এই কথাটা মনে হলো কেন তোর? তপন, তুই ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাস নাকি?

তপন একটু লজ্জিতভাবে বললো, না, না, সে জন্য না। উনি পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এসেছেন কি না, সেইজন্য জানতে ইচ্ছে হলো।

মানিকদা খানিকটা ভাবগম্ভীরভাবে বললেন, খোকন মজুমদার–সাচ্চা একজন বিপ্লবী, শুধু এইটুকুই আমি জানি। নজরুলের লেখা মনে নেই? 'হিন্দু না ওরা মুসলিম, ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী, বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোরা মা' র। ...এখানে 'ডুবিছে'র জায়গায় 'লড়িছে' হবে।

একটু থেমে দু'বার কেশে মানিকদা আবার বললেন, তবু তোদের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আজ আমার কেন যেন নাভাস লাগছে, কিসের যেন একটা পিছুটান...আমি নিজেই ম্যাপ একে এখন নদীটা খুঁজে পাচ্ছি না। দে তো অতীন, তোদের একটা সিগারেট দে!

বেশ কাছেই সাত-আটটা খেজুর গাছের জটলা, খানিকটা উঁচু জমি। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে চারজন মানুষ, দু'জনের হাতে লোহার ডাণ্ডা, একজনের কাঁধে একটা ঝোলা। অন্যজন আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর রেখেছে দু'হাত, সে কর্কশ গলায় বললো, কী রে মানিক, এদিকে কোথায় চললি? তোদের কানু সান্যাল এখানেই লুকিয়ে আছে নাকি রে? অ্যাঁ?

মানিকদা লোকটিকে চেনেন না, কখনো দেখেন নি। কিন্তু এরা যখন তাঁর ওপর নজর রেখেছে, তখন এদের মতলোব খারাপ। মানিকদা নিরীহ মুখ করে বললেন, আপনাদের তো চিনলাম না? আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, বড় রাস্তাটা কোন্ দিকে হবে বলতে পারেন?

লোকটি বললো, সবচেয়ে বড় রাস্তা হলো যমের দক্ষিণ দুয়োরের দিকে। চল সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। তোদের বাপ চারু মজুমদার আর তোদের বাঁচাতে পারবে না!

মানিকদা কৃত্রিম ভয়-পাওয়া নাকি সুরে বললেন, চারু মজুমদার কে? আপনারা কার কথা বলছেন?

লোকটি সামান্য একটু ঠোঁট ফাঁক করে রসিকতার সুরে বললো, কেন ন্যাকামি করছিস, মানিক! বাপের নাম ভুলে গেলি? সব শালা চীনের দালাল! তোরা তিনটে শুয়োরের বাচ্ছা, মাথার ওপর হাত তোল, তারপর এক পা এক পা করে এগিয়ে আয়...

মানিকদা অতীন আর তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে বোঝালেন ভয় নেই। তারপর ফস করে কোমর থেকে একটা রিভলভার বার করে সেটা উঁচিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, কেন ঝামেলা করছিস তোরা? রাস্তা ছেড়ে দে। এটা দেখেছিস? এবার তোরা মাথার ওপর হাত তুলে পেছন ফিরে এক পা এক পা করে হাঁট।

মানিকদার মতন একজন নরম ধরনের মানুষের সঙ্গে যে রিভলভার থাকতে পারে তা অতীন কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। এতদিন ধরে মানিকদার সঙ্গে মেলামেশা, এক বাড়িতে থাকা, অথচ মানিকদার কাছে যে এমন একটা সাংঘাতিক অস্ত্র আছে তা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানাননি। অতীনের ভয় করছে না। মানিকদার প্রতি তার শ্রদ্ধা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শতগুণ বেড়ে গেল!

মানিকদা রিভলভার তুলতেই ঐ চারজন লোক কথা থামিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো। মানিকদা আবার আদেশ করলেন, মাথার ওপর হাত তোল, পেছন ফের! আমি কোনো ঝঞ্ঝাট করতে চাই না, আমাদের চলে যেতে দে!

ওরা এবার পেছন ফিরলো, দু'পা গেল, তারপরেই যার কাঁধে ঝোলা সে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে গিয়ে হাত উঁচু করে একটা বোমা ছুঁড়লো মানিকদার দিকে। মানিকদা ধপাস করে পড়ে গেলেন, অতীন আর তপন আত্মরক্ষার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে।

বোমা ফাটার বিকট শব্দ, তারপরেই ধোঁয়া। অতীন ওর মধ্যেই দেখলো, মানিকদা নিন্দ হয়ে গেছেন, তাঁর এক হাতে তখনও অস্ত্রটা ধরা। অতীন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, চোখের নিমেষে কী হয়ে গেল ব্যাপারটা? মানিকদা মারা গেছেন? ওদিকের লোকটা বোমাটা ছোঁড়ার জন্য হাত তুললো, টিপ করলো, তখনও মানিকদা গুলি চালালেন না? মানিকদা এ কী করলেন?

মানিকদা মারা গেছেন...মানিকদা, মানিকদা...ঐ লোকগুলোকে দেখে মানিকদা আর এগোতে চাননি, অতীনই জোর করেছিল, মানিকদা তার দাদার মতন, অতীনের জন্যই...তার দাদাও জলে ডুবে গিয়েছিল অতীনের জন্যই...মানিকদা, মানিকদা, না, না, অসম্ভব...

অতীন মুখ উঁচু করে দেখলো অপরপক্ষের একজন লোহার ডাণ্ডা উঁচিয়ে ছুটে আসছে। এবার তাকে মারবে? মানিকদার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেবে? তপন কোথায়? মানিকদা মরে গেলে অতীনও আর বেঁচে থাকতে চায় না। এই লোকটা তার মাথা চুরমার

করে দেবে? মানিকদার মৃত্যুর প্রতিশোধ'নেওয়া হবে না? মাঠের মাঝখানে সামান্য কয়েকটা গুণ্ডার হাতে এইভাবে ব্যর্থ মৃত্যু...

অতীন লাফিয়ে উঠে মানিকদার হাত থেকে রিভলভারটা খুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালো। একবার, দু'বার, তিনবার। অতীন জীবনে কখনো রিভলভার ছুঁয়েও দেখেনি, তার কোনো অস্ত্র শিক্ষা নেই। প্রথমবার তার শরীরে এমন ঝাঁকুনি লাগলো যে গুলিটা চলে গেল আকাশের দিকে...তবু একটা গুলি লেগেছে, ডাণ্ডা হাতে লোকটা পড়ে গেছে মাটিতে...-হেঁচড়ে হেঁচড়ে পালাবার চেষ্টা করছে...সাঙ্ঘাতিক রাগে 'জ্বলছে অতীনের মাথাটা, মানিকদাকে মেরেছে, ঐ লোকটাকে কিছুতেই বাঁচতে দেওয়া হবে না, বিপ্লবের শিক্ষা হলো, শুধু শুধু প্রাণ দিও না, মেরে মরো-প্রতিক্রিয়াশীলরা পাগলা কুকুর...

অতীন দৌড়ে গিয়ে ঐ লোকটার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে পেটাতে লাগলো প্রাণপণ শক্তিতে।

পেছন থেকে কারা যেন তাকে ডাকছে, অতীন, অতীন, বাবলু, বাবলু,...

যেন সহসা প্রবল ঝড় উঠেছে, আকাশে বজ্র গর্জন, পায়ের তলায় চড়াৎ চড়াৎ করে ফেটে যাচ্ছে মাটি, সেই সব কিছুর মধ্য থেকে ভেসে আসছে ডাক, অতীন, অতীন, বাবলু, বাবলুদা,

তুমি কী করছো, কী করছো, আর না, আর না, পালাও, পালাও...

সেই ব্যাকুল স্বরে মিশে আছে তার মা, বাবা, প্রেমিকা, বোন, বন্ধু সকলের আহ্বান। সবাই তাকে থামতে বলছে, ফিরে যেতে বলছে। তবু সে থামলো না।

তারপর শোনা গেল, মানিকদার গলা, এই অতীন, এই অতীন...

এবার চমকে সে ফিরে তাকালো। মানিকদা উঠে বসেছেন। সমুদ্রের বড় একটা ঢেউয়ের মতন আনন্দের ঝাঁপটা লাগলো অতীনের শরীরে। মানিকদা বেঁচে আছেন? তার নিজের দাদার মতন মানিকদা হারিয়ে যাননি এখনো...।

সে কয়েক পা পিছিয়ে এসে বললো, আপনার চোট লাগেনি মানিকদা?

মানিকদা বললেন, খানিকটা লেগেছে, খুব সীরিয়াস কিছু নয়। তুই লোকটাকে একেবারে মেরে ফেললি, অতীন?

অতীন জয়ের গর্বে বললো, বেশ করেছি! তোমার গায়ে বোমা ছুঁড়েছে, আর একটু হলে আমাকেও খতম করে দিত।

–কী করলি রে তুই! ওদের শুধু ভয় দেখালেই চলতো। একেবারে মার্ডার- ...এখনো তার সময় হয়নি...

–আমরা আত্মরক্ষার জন্য মেরেছি! আমরা না মারলে ওরা আমাদের শেষ করে দিত।

–আমাকে চেনে, তোকেও জড়াবে...মার্ডার চার্জ।

অতীনকে সত্যি সত্যি গুলি চালাতে দেখে অন্যরা পালিয়ে গেছে। যে লোকটা গুলি। খেয়েছে মানিকদা তাকে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার প্রাণ নেই। তপনকেও দেখা যাচ্ছে না!

মানিকদা বললেন, আর সময় নষ্ট করা যাবে না। ওরা এক্ষুনি ফিরে আসবে। অতীন তুই পালা...আমরা দু'জনে দু'দিকে...

–না, মানিকদা, আমি আপনার সঙ্গে থাকবো।

–ছেলেমানুষী করিস না। যা বলছি তাই শোন! দৌড়ো, দৌড়ে বড় রাস্তায় উঠে পড় কোনোরকমে, না হলে ওরা লিচ করবে, শিলিগুড়ি ফিরিস না এখন...কলকাতাতেও যাসনি, যা, যা, অতীন, এঁকেবেঁকে ছুটবি।

–মানিকদা, আপনি দৌড়োতে পারবেন না।

–আমি ঠিক পারবো, আমার সঙ্গে রিভলভারটা রইলো, আমার জন্য চিন্তা নেই... দূরে একটা হই হই রব শোনা যেতেই মানিকদা ঠেলে দিলেন অতীনকে।

অতীন দৌড়োতে লাগলো। কোন্ দিকে বড় রাস্তা? বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বৃষ্টির মধ্যে ওরা তাকে দেখতে পাবে না...অতীন মজুমদারকে ধরা অত সহজ নয়...সে ঠিক বেঁচে যাবে, মৃত্যু তাকে ছোঁয় না...আরও জোরে আসছে বৃষ্টি...অলিরা এখন দার্জিলিঙে, অলি ডেকেছিল তাকে, অলিদের সঙ্গে গেলে এসব কিছুই ঘটতো না...একটা লোক মারা গেছে...মার্ডার চার্জে অতীনকেই সবাই খুনী বলবে, সে যে আত্মরক্ষার জন্য...না, না, বিপ্লবী কক্ষনো আদালতে যায় না, সে কিছুতেই ধরা দেবে না...ইস, মাকে ফেরার তারিখটা জানিয়ে কেন চিঠিটা লিখতে গেল সে, মা অপেক্ষা করবে, কিন্তু এখন কলকাতায় ফেরা বিপজ্জনক...সে লুকোবে...পেছনে পেছনে ওরা কি তেড়ে আসছে বৃষ্টিতে সব ঝাঁপসা...কোথায়, কোনদিকে রাস্তা:...তাকে ধরার সাধ্য পৃথিবীতে কারুর নেই...

সমস্ত দিগন্ত জুড়ে এখন ধারাবর্ষণ, তার মধ্যে ছুটতে লাগলো অতীন। সে সামনে-পেছনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তবু সে অন্ধের মতন ছুটছে।

(যৌবন পর্ব সমাপ্ত)